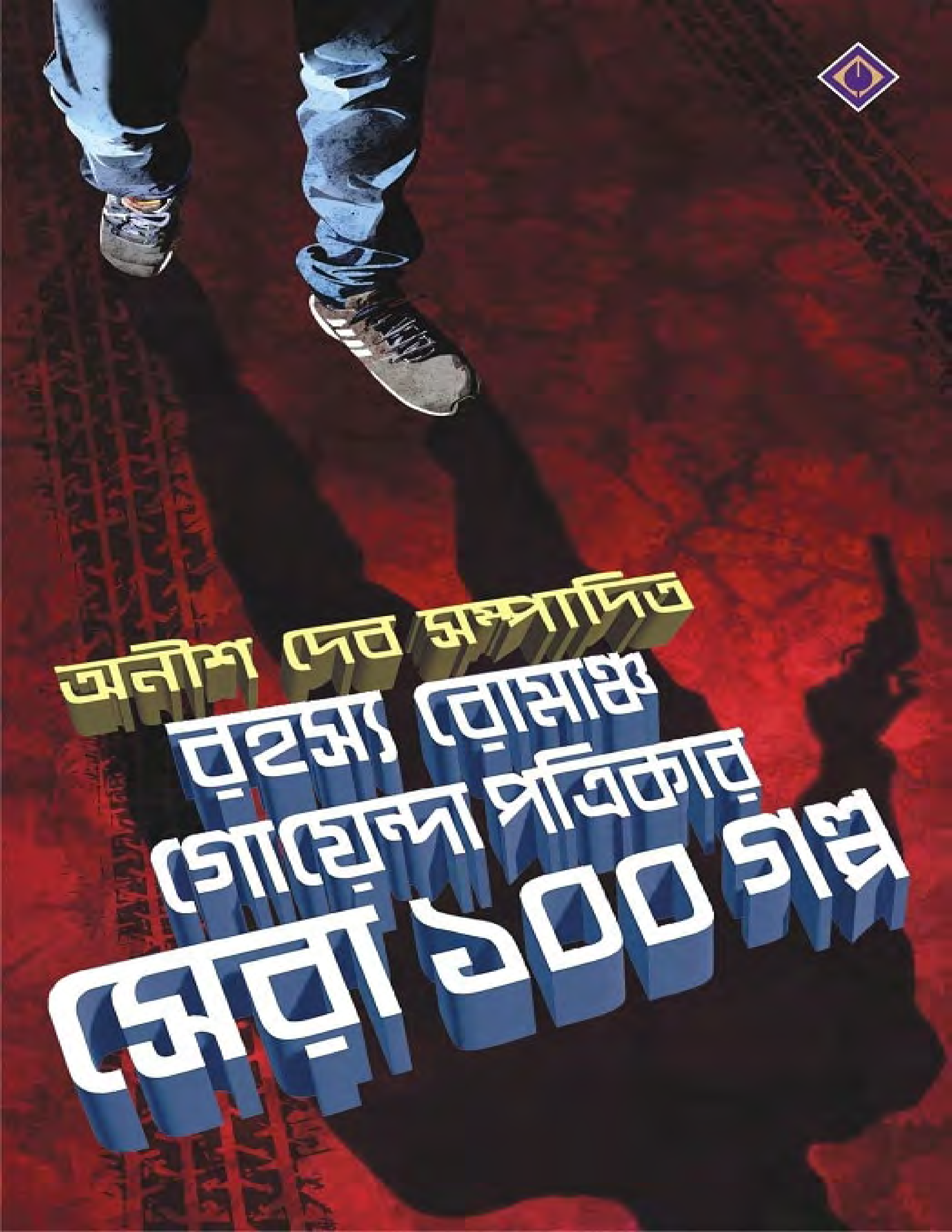

অনীশ দেব সম্পাদিত
রহস্য রোমাঞ্চ
গোয়েন্দা পত্রিকার
সেরা ১০০ গল্প

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার

সেরা ১০০ গল্প

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার

সেরা ১০০ গল্প



সম্পাদনা

অনীশ দেব

পত্রভারতী®

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫ **দ্বিতীয় মুদ্রণ** জানুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১০ **চতুর্থ মুদ্রণ** জুন ২০১৬
পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ। পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ রঞ্জন দত্ত
অলংকরণ গ্রেগরি নেমেক

RAHASYA ROMANCHA GOENDA PATRIKAR SERA 100 GALPO
Edited by Anish Deb

Published by PATRA BHARATI® 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-361-7

'কনান ডয়াল, চেস্টারটন প্রমুখ লেখক যে সাহিত্য রচনা করতে লজ্জিত নন, তা রচনা করতে আমারও লজ্জা নেই।'

—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৯ সালে নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে 'মাসিক রোমাঞ্চ'র সম্পাদক রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন 'আজকাল অনেক নামকরা সাহিত্যিক দেখেছি এই (রহস্য-রোমাঞ্চ) শ্রেণীর গল্প লিখতে লজ্জা বোধ করেন।' শরদিন্দুর উদ্ধৃতিটি তারই প্রতিক্রিয়া। সাক্ষাৎকারটি ১৯৭০ সালের নভেম্বর (কার্তিক) সংখ্যা 'মাসিক রোমাঞ্চ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

'জাত যদি যায় যাক, তবু নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করছি যে রহস্য-কাহিনী আমি ভালোবাসি।
আজ নয়, চিরকালই ভালোবাসি এবং শুধু ডিটেকটিভ গল্প নয়, রোমাঞ্চকর যতরকমের গল্প আছে সব কিছুরই বরাবর আমি ভক্ত। এখনও ভালো সেরকম গল্প পেলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে পারি।'

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯৫৭ সালে 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার 'রজতজয়ন্তী সংখ্যা'য় প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাহিত্যে রোমাঞ্চ' রচনা থেকে উদ্ধৃত।

'What makes you think I have a choice?'

—Stephen King

(When asked by an interviewer why he writes about fear and terrible manifestations.)
from *Introduction* by Kirby McCauley (Ed.) in *Dark Forces (Macdonald Futura Publishers, 1980).*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে-দুজনের সহযোগিতা এই বইটিকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে তাঁরা হলেন লেখক-বন্ধু শ্রীপার্থ (আসল নাম সৌরেন দত্ত) এবং সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। হাসিমুখে পুরোনো বহু পত্র-পত্রিকার জোগান দিয়েছেন ওঁরা। এ ছাড়া রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকার কিছু পুরোনো সংখ্যা দিয়ে সাহায্য করেছেন উপেন মান্না ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'স্প্যান' পত্রিকার ১৯৯৯ সালের মে-জুন সংখ্যা থেকে গ্রেগরি নেমেকের ছবির অংশ এই বইয়ে অলংকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি। 'স্প্যান' পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে বহু তথ্যের জোগান দিয়েছেন 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র কর্ণধার গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর রাহা, অসিত মৈত্র, অশোক রায় ও 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া 'মাসিক রোমাঞ্চ'র বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা অভ্রদীপের কাছ থেকে পেয়েছি।

অক্ষরবিন্যাসের কাজে দীর্ঘ সময় ধরে মুখ বুজে পরিশ্রম করেছেন প্রদ্যুৎ সাহা ও প্রণব সাহা। ওঁদের আমার ভালোবাসা জানাই। প্রুফ সংশোধনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন আরতি বসু। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও কয়েকজন—মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনালিসা বসাক, সায়ক দেব ও শুভাশিস ঘোষ। এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রয়াত কমলকুমার মজুমদারের স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদারকে। ওঁর কাছে কমলকুমারের 'তদন্ত' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি তথ্য পেয়েছি। আর ধন্যবাদ জানাই স্নেহভাজন রাহুল সেনকে।

লেখকরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ গল্প প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। ওঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আর বিশেষ অভিনন্দন জানাই পত্রভারতীর কর্ণধার বন্ধুবর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এই বই প্রযোজনার বিরল দুঃসাহস ও নিষ্ঠা বোধহয় শুধু ওঁকেই মানায়।

২২ ডিসেম্বর ২০০৪

অনীশ দেব

রহস্যময় দিন, রোমাঞ্চকর রাত

সত্যি, সে একটা সময় ছিল বটে! ম্যাগাজিন-স্টলে গেলেই পাওয়া যেত তিন-তিনটে লোভনীয় পত্রিকা 'মাসিক রোমাঞ্চ', 'মাসিক রহস্য পত্রিকা', আর 'মাসিক গোয়েন্দা'। কী যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ কাজ করত আমার ভেতরে! ওই পালপ ম্যাগাজিন বা মণ্ড-পত্রিকাগুলো আমাকে নিশির ডাকের মতো টানত। মনে হত, কতক্ষণে ওগুলো হাতে পাব, রুদ্ধশ্বাসে শেষ করব গল্প-উপন্যাসগুলো!

এই যে বইটা আপনি হাতে তুলে নিয়ে এই গৌরচন্দ্রিকাটি পড়ছেন, এই বই তৈরির পিছনে রয়েছে প্রায় ন' বছরের একরোখা চেষ্টা। আর সেই চেষ্টারও একটা কারণ আছে—যে-কারণটা বোঝাতে গেলে নিজের কথা কিছুটা বলতে হয়। আশা করি আপনি সেটা আত্মপ্রচার না ভেবে ক্ষমা করবেন। আসলে এ যেন ঠিক কোনও আপনজনকে কাছে পেয়ে মনের দরজা খুলে দেওয়া। এই যে আপনি এই বইটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখছেন, এ যেন আপনি নন—আমি। কারণ, পাঠক হিসেবে এই বইটা হাতে তুলে নিয়ে আদর করে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা ওলটাব, এই ছিল আমার মনের সাধ—গত ন'বছর ধরে, বিশ্বাস করুন। তাই আপনাতে আর আমাতে কোনও তফাত নেই। আমার বুকের ভেতরে জমে থাকা যেসব কথা আমি বলতে চাই সে যেন আপনারই কথা—আপনি, যিনি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনির একনিষ্ঠ পাঠক—আমারই মতো।



'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র আগস্ট, ১৯৬৮ সংখ্যার একটি পৃষ্ঠা।

খুব ছোটবেলা থেকেই রহস্যকাহিনির প্রতি একটা টান টের পেতাম। সেটা বোধহয় বুদ্ধির মারপ্যাঁচে রহস্যের জট ছাড়ানোর নেশায়। তারপর যতই বয়েস বেড়েছে, এই টান বেড়েছে ততই। ছোটবেলার 'বাজপাখি সিরিজ' ছেড়ে ধরেছি নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটি রায়, শশধর দত্তের দস্যুমোহন, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক। বয়েস আরও বাড়ছে—সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুখময়

মুখোপাধ্যায়, নিশাচর, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের তরুণ গুপ্ত, সমরেশ বসুর অশোক ঠাকুর, আরও কত নামী-অনামী লেখক এবং তাঁদের গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ।



অনন্য সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার নিজের সম্পাদনায় 'তদন্ত' নামে ডিটেকটিভ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন ১৯৫২ সালে। 'তদন্ত'-র প্রতি সংখ্যার দাম ছিল পাঁচ আনা। আজকের হিসেবে একত্রিশ পয়সার একটু বেশি। 'তদন্ত'-র চাঁদার হার ছিল :

সডাক ত্রৈমাসিক - তিন টাকা বারো আনা
সডাক ষাণ্মাসিক - সাত টাকা
সডাক বাৎসরিক - চোদ্দো টাকা

প্রেস অফিস ছিল ঃ 'রায়চৌধুরী প্রিন্টিং হোম, ১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪'।

ওপরের প্রচ্ছদটি প্রথম পর্ব,

নবম সংখ্যার।

এসবের মাঝেই কখন যেন আর্থার কোনান ডয়েল, এলান পো, আগাথা ক্রিস্টি হাতে চলে এসেছে। ফলে নদী ছেড়ে সাগরের স্বাদ পেতে শুরু করেছি। যতই দিন যায়, রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-ভৌতিক-কল্পবিজ্ঞান কাহিনির প্রতি টান ততই বাড়তে থাকে। সেই অর্থে বিশ-বাইশ বছর বয়েসেই আমি রাশি-রাশি 'অপাংক্তেয়' সাহিত্য পড়ে রীতিমতো 'নষ্ট' হয়ে গেছি। কিন্তু আশ্চর্য, এইভাবে নিজেকে 'নষ্ট' করার জন্য কখনও আক্ষেপ হয়নি।

এইসব বই পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মণ্ড-পত্রিকাগুলোও নিয়মিত পড়ছিলাম। ডবল ডিমাই ষোলো পেজি ফর্মা, লালচে নিউজপ্রিন্ট আর ফরেন নিউজপ্রিন্ট মিলিয়ে লেটার প্রেসে ছাপা, লাইন ব্লকের হেডপিস, বাইকালার লাইন ব্লকে ছাপা প্রচ্ছদ—এই অগৌরবের সাজসজ্জা নিয়েও পত্রিকাগুলো আমাকে টানত, হাতছানি দিয়ে ডাকত। 'মাসিক রোমাঞ্চ'-র গ্রাহকও ছিলাম টানা বেশ কয়েক বছর। মোটামুটিভাবে ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে (বয়েস তখন বারো-তেরো) এই পত্রিকাগুলো পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হানা দিতাম পুরোনো বই কিংবা ম্যাগাজিনের স্টলে। পত্রিকাগুলোর সংখ্যা জোগাড় করে নিয়ে আসতাম। এ-ছাড়া আর-একটা খনি ছিল যত পুরোনো খবরের কাগজের দোকান। সেখানে রাজ্যের পুরোনো কাগজ হাঁটকে এই সব পত্রিকা খুঁজে বের করে ওজন-দরে কিনে নিয়ে এসে পড়তাম।

এতসব কাণ্ডের মাঝে একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটি গোয়েন্দা-কাহিনি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম ১৬৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (এখনকার বিধান সরণি) 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র দপ্তরে। ষোলো প্লাস বয়েসে লেখা দুর্বল রচনাটি সতেরো মাইনাস বয়েসে ছাপা হয়ে গেল। সেদিন ম্যাগাজিন স্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে ছাপা অক্ষরে নিজের নাম (তখন নামের বানানটা ছিল 'অনীষ') দেখে হাত এমনভাবে কাঁপছিল যে, নিজের লেখার একটা লাইনও পড়তে পারছিলাম না। সে-রোমাঞ্চ আজও মনে আছে।

গল্পটির নাম ছিল 'ভারকেন্দ্র'। লালচে নিউজপ্রিন্ট কাগজে লাইন ব্লকে তৈরি একটি হেডপিস দিয়ে (শিল্পী বাদল ভট্টাচার্য) লেখাটি ছাপা হয়েছিল। আজ এই অঙ্গসজ্জার মান নগণ্য বলে মনে হলেও সেসময়ে আমার কাছে ছিল 'দারুণ'।

তারপর দিন যায়, সম্পাদকদের আশকারায়—'রহস্য', 'রোমাঞ্চ', গোয়েন্দা'—তিনটি পত্রিকাতেই লেখালিখির অভ্যেস দাঁড়িয়ে যায়। ধীরে-ধীরে নিজেকে আমি পালপ ম্যাগাজিনের লেখক বলে ভাবতে থাকি। আর একইসঙ্গে ওইসব পত্রপত্রিকার লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকি।

সত্তর দশকের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত একই ধরনের আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একটা সময়ে তো এ জাতীয় পত্রিকার সংখ্যা দশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল!

১৯৭৫ সালে টেলিভিশন ভারতে এল, আর আশির দশকের শুরুতে কলকাতায়। হয়তো টিভির জনপ্রিয়তার দৌরাত্ম্যে এই পত্রিকাগুলো স্তিমিত হতে শুরু করল। এবং আশির দশক যতই শেষের দিকে এগোতে শুরু করল, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পত্র-পত্রিকাগুলোও এগোতে লাগল শেষের দিকে। একে-একে নিভতে-নিভতে ১৯৯০-৯১ সালে 'ওরা' চলে গেল—আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম মাঝরাস্তায়।

সেসময়ে মনের ভেতরে কী যে দুঃখ তৈরি হয়েছিল সে আমিই জানি। বেশ মনে পড়ে, আমি আশায়-আশায় থাকতাম, এই বুঝি কেউ তোড়জোড় করে আবার একটা ক্রাইম ম্যাগাজিন বের করে ফেলল। কিন্তু তা হয়নি... আজও হয়নি।



রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রহস্যমালা' প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যার (২৮ নভেম্বর, ১৯৪৮) প্রচ্ছদ। এই সংখ্যাটিতে তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সূচিতে অন্যতম লেখক ছিলেন পঞ্চানন ঘোষাল। 'রহস্যমালা'-র প্রতি সংখ্যার দাম ছিল চার আনা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ মুখোপাধ্যায়। দপ্তরের ঠিকানা ছিল '৫২/৯ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২'।



'অন্তরালে' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার (জুন, ১৯৬৫) প্রচ্ছদ। সংখ্যাটির দাম ছিল এক টাকা। পত্রিকাটির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিমল মিত্র। সম্পাদক ছিলেন অর্চনা চক্রবর্তী।

এই পত্রিকাগুলো না-থাকার দুঃখ থেকেই এই বইটা তৈরি করার কথা ভেবেছিলাম। কোনও প্রকাশকের আশ্বাস না চেয়েই শুরু করেছিলাম এই বইয়ের কাজ। তিল-তিল করে কাজ এগোচ্ছিল আর ভেতরের দুঃখটা একটু-একটু করে কমছিল। তারপর...তারপর এতদিন পরে এই বইটা তুলে দিতে পারলাম আপনার হাতে। দুঃখ থেকে তৈরি আনন্দের বই।

আপনি হয়তো জিগ্যেস করবেন, কেন ওই পালপ ম্যাগাজিনগুলো বন্ধ হয়ে গেল? কিন্তু এই প্রশ্নের চটজলদি কোনও উত্তর আমার জানা নেই। তবে এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি ভেবেছি অনেক দিন।

উত্তরটা যে সহজে খুঁজে পাইনি তার কারণ, রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা পত্র-পত্রিকাগুলো শুরু হয়েছিল দারুণভাবে। আর তাদের ঐতিহ্যও নিতান্ত ফ্যালনা নয়।

সেই কোন ১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারি মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় '১২, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬' (উত্তর কলকাতার মানিকতলার কাছাকাছি) থেকে প্রকাশ করেছিলেন সাপ্তাহিক 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা।

পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সাহিত্য-মজলিশে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া সেদিনকার তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'প্রহ্লাদ' সবাকচিত্রের প্রচারপুস্তিকায় 'রোমাঞ্চ'র প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। 'রোমাঞ্চ'র প্রথম সংখ্যার লেখক ছিলেন গীতিকার প্রণব রায়। লেখাটির নাম 'ইয়াংসু হোটেলের কাণ্ড'। লেখাটি মাপে বড় হওয়ায় প্রথম সংখ্যায় এর একটি অংশ ছাপা হয়। বাকি অংশটি 'সিঙ্গাপুর কাফে' নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয় দ্বিতীয় সংখ্যায়।



মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকার মে-জুন, ১৯৬৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদশিল্পী নরেন রায় (সুফি)। সংখ্যাটির দাম ছিল এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (এখন যাকে পয়সা বলা হয়)। পত্রিকার অফিস ছিল ২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ১২। সম্পাদক ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দুজন ভাস্কর রাহা ও বিমল সাহা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। পরে অনেকেই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে কর্ণধার রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিমানীশ

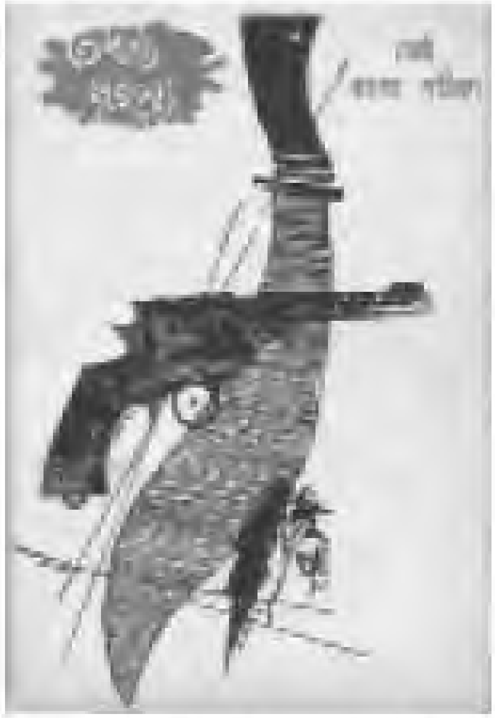
মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে দীর্ঘ সময়
পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন।
১৯৭৮ সালে তাঁর অকালমৃত্যু
হলে পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে
বন্ধ হয়ে যায়।

এইভাবে দশ বছর কেটে গেল। তার কিছুদিন পরেই মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন। কিন্তু সাপ্তাহিক 'রোমাঞ্চ' থামেনি। ১৯৫২ সালে 'রোমাঞ্চ' রূপবদল করল সাপ্তাহিক থেকে হল মাসিক। নামী-দামি লেখকরা নিয়মিত লিখতে থাকলেন 'মাসিক রোমাঞ্চ'-এ।

'রোমাঞ্চ' যখন সাপ্তাহিক থেকে মাসিক হয় তখন সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও একজনের হাড়-ভাঙা খাটুনি। তিনি হলেন রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ অমিত চট্টোপাধ্যায়। ওঁদের 'গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে মুদ্রিত হত 'মাসিক রোমাঞ্চ'—ওই ১২ নম্বর হরিতকী বাগান লেন থেকেই। অমিত চট্টোপাধ্যায় নিজেই মেশিন চালিয়ে 'রোমাঞ্চ'র ফর্মা ছাপতেন। আর পাশাপাশি লিখতেন রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি—স্বনামে এবং বেনামে। অনুজ রঞ্জিতও মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। নিজেদের পত্রিকায় লেখালিখির পাশাপাশি দিব্যি কম্পোজ করতে পারতেন। দু-ভাই যে পত্রিকাটিকে ভালোবেসে কী পরিশ্রম করতেন ভাবাই যায় না!

বিমল করের মুখে শুনেছি, তিনি আর তাঁর কবি-বন্ধু অরুণ ভট্টাচার্য মিলে একটি রহস্য জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। নাম ছিল 'বিমল করের রহস্য পত্রিকা'। সম্ভবত পত্রিকাটি ১৯৫০-৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পকালজীবী এই পত্রিকাটির কোনও সংখ্যা আমার হাতে আসেনি।

পঞ্চাশের দশকেই কোনও এক সময় কানু ঘোষের সম্পাদনায় 'কুয়াশা' নামে আরও একটি ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এ-পত্রিকাটিও আমার কাছে অধরা থেকে গেছে।



'তদন্ত-রহস্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। সম্পাদক ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য। ওপরের প্রচ্ছদটি ১৯৬৬ সালের মার্চ সংখ্যার। দাম ছিল মাত্র এক টাকা।



'মাসিক রহস্য পত্রিকা'-র নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৬৯সংখ্যার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ শিল্পী বাদল ভট্টাচার্য। সংখ্যাটির দাম ছিল এক টাকা পঁচিশ পয়সা। সম্পাদক ছিলেন নেপাল মুখোপাধ্যায়। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিকানা ছিল ১৬৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা ৬।

১৯৫২ সালে সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার 'তদন্ত' নামে একটি 'ডিটেকটিভ সাপ্তাহিক' বের করেন। কিন্তু সেটিও কয়েক সংখ্যার বেশি স্থায়ী হয়নি।

কমলকুমার যে ক্রাইম সাহিত্য নিয়ে ভাবতেন তার ইশারা পাওয়া যায় 'তদন্ত'র প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। কমলকুমার লিখেছেন :

পাঠক, বুঝিলাম 'দারোগার, দপ্তরে'এর জন্য আপনি অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়াছেন, আপনার আর্জি যে উহা এককালীন ছাপান হইতেছে না কেন? পাঠক, দারোগার দপ্তর এককালে ছাপাইতে হইলে, আমাদের নির্দ্ধারিত পৃষ্ঠার সকল পৃষ্ঠাই দপ্তরে পরিণত হয়। ফলে, উহা একটু একটু করিয়া দিতে হইতেছে, ইহাতে আমাদের কষ্টও বড় কম নহে। একটু একটু করিয়া পড়িলে গল্পের সাধারণত ঘটনাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, সুধীগণ যাহাকে আর্ট বলেন, তাহার কথঞ্চিৎও

ইহাতে দেখা দেয় না। আর্ট অতি ভীরু বস্তু, বড়ই লাজুক, এতটুকু ইতর বিশেষে তাহার মন্দা হয়। অবশ্য এখানে কি গুরু অপরাধ হইতেছে তাহা জানি না, কারণ, পূর্ব্বে উল্লেখে এই মনে হয় যে, দারোগার দপ্তরকে আর্টের পর্য্যায় ফেলা হইতেছে। গুণী সুধী অপরাধ লইবেন না। "জেনটলমেন ইন য়ুরোপীয়ান ড্রেস" দেখা সত্ত্বেও ল্যাংট পরিয়া নিরক্ষররাই ঢুকে—আমরা তাহা করিব না।

অনেকেই বলিয়াছেন, "বাপু এত শত প্রকাশ করিতেছ অথচ ভূতের গল্প দিতেছ না কেন? দিনে যেমন খুন হয়, তেমন যে খুন হয় সে ভূতও তো হয়।" কিন্তু পাঠক, আমরা বলি খুনে যেমন প্রায় ক্ষেত্রেই ধরা পড়েনা, তেমনি সে ভূত প্রায় ক্ষেত্রে আমাদের চোখে পড়ে না। গল্প পাইলেই প্রকাশ করিব।

(বানান মুদ্রণপ্রমাদ সমেত অপরিবর্তিত)

'তদন্ত'র নিয়মাবলীতে কমলকুমার লেখকদের জানিয়েছেন, 'আইন আদালতের খবর, গোয়েন্দা কাহিনী, রহস্য গল্প, ভূতের গল্প পাঠাতে পারেন।'



'রহস্য সন্ধানী' পত্রিকার ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদ। সংখ্যাটির দাম ছিল দেড় টাকা। ৩ সাকলাত প্লেস, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কমল ঠাকুর।



'ক্রাইম' পত্রিকার জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ। সংখ্যাটির দাম ছিল দু-টাকা। ১৯৭২ সালে ৯৩/৩/১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ থেকে পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়। সম্পাদক ছিলেন দীনেশচন্দ্র সাহা—যদিও পত্রিকা পরিচালনা করতেন তাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র সাহা। ১৯৭৪ সালে মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে রামচন্দ্রের অকালমৃত্যু হলে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সাহা।

১৯৫৩ সালে 'গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বোঝাই যায়, বিদেশি 'আলফ্রেড হিচককস মিস্ট্রি ম্যাগাজিন' কিংবা 'এলারি কুইনস মিস্ট্রি ম্যাগাজিন'-এর

নামের আদলে এই পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন প্রকাশক গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বছরেই নভেম্বর-ডিসেম্বরে তিনি দ্বিমাসিক 'রহস্য পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটির মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাসিক রোমাঞ্চ'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমুদ্র গুপ্ত, এস. মদনমোহন, রঞ্জন রায়, অনুপমা সেন ইত্যাদি ছদ্মনামে তিনি সেসময়ে প্রচুর রহস্য কাহিনি লিখেছেন। একইসঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ 'মাসিক রহস্য পত্রিকা' আত্মপ্রকাশ করে।

এর পরের পত্রিকাটি 'মাসিক গোয়েন্দা'। প্রকাশ করেন রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর ১৯৬০ সালে 'মাসিক গোয়েন্দা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন ভাস্কর রাহা ও বিমল সাহা। পরবর্তীকালে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিজেই। সম্পাদনার কাজ ছাড়াও তিনি নক্ষত্র মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে, বা কখনও-কখনও নিজের নামে, নানান গল্প-উপন্যাস লিখতেন 'মাসিক গোয়েন্দা'য়। তাঁর বিশেষ টান ছিল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির প্রতি।

১৯৭০-৭১ সালে নকশাল বিদ্রোহের অস্থিরতা শুরু হল। সেই অস্থির সময়ে সস্তামানের কয়েকটি যৌনপত্রিকা ম্যাগাজিন স্টলে চোখে পড়ত। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলো পিন দিয়ে আঁটা থাকত—হয়তো পাঠকদের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলার জন্য। এইরকম কয়েকটি পত্রিকার নাম ছিল 'সুন্দর জীবন', 'জীবন যৌবন', 'সুন্দরী', 'রঙ্গিনী নায়িকা', 'নায়িকা সঙ্গিনী' ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলোর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ এগুলো বাজেয়াপ্ত করে, এর সম্পাদক/প্রকাশককে ধরপাকড় শুরু করে। পত্রিকাগুলো এই চাপে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। তখন এর মালিক তথা সম্পাদকরা নতুন পত্রিকা করার কথা ভাবতে থাকেন।



'শেষ সংকেত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যার (এপ্রিল, ১৯৭৪) প্রচ্ছদ। এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম ছিল তিন টাকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অমিতাভ সেন। দপ্তরের ঠিকানা ছিল ১২৪/১এ মানিকতলা স্ট্রিট, কলকাতা ৬।



'মাসিক ক্রিমিনাল' পত্রিকার আবির্ভাব সংখ্যাই ছিল পুজো সংখ্যা (১৯৭৫)। দাম ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা। সম্পাদক ছিলেন সহদেব সাহা। পরবর্তীকালে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন তাঁরই ভাই স্বপন সাহা।

এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'ক্রাইম', 'শেষ সংকেত', 'অপরাধ' ইত্যাদি পত্রিকা—এগুলো যথাক্রমে ১৯৭২, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ থেকে শুরু হয়। আরও একবছর পরে প্রকাশিত হয় 'মাসিক ক্রিমিনাল'। এই পত্রিকাটির সম্পাদক সহদেব সাহা আগে কখনও পত্রিকা করেননি। ক্রাইম সাহিত্যকে ভালোবেসে তিনি 'মাসিক ক্রিমিনাল'-এর প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পত্রিকাটির আবির্ভাব সংখ্যাই ছিল পুজো সংখ্যা।

'মাসিক রোমাঞ্চ', 'মাসিক রহস্য পত্রিকা' এবং 'মাসিক গোয়েন্দা' ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে 'রাজত্ব' করেছিল। কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার প্রকাশ শুরু হওয়ার পর তারা নতুন ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যায়।

নতুন পত্রিকাগুলো প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিন-রঙা হাফটোন ব্লক ব্যবহার করে প্রচ্ছদপট তৈরি করত। আর কোনও প্রচ্ছদই একবারের বেশি ব্যবহার করত না। তা ছাড়া তারা আমাদের মতো নগণ্য লেখকদেরও যৎকিঞ্চিৎ সম্মান-দক্ষিণা দিত—যা 'রহস্য', 'রোমাঞ্চ' বা 'গোয়েন্দা' কখনও দেয়নি।

১৯৭২-এ 'চতুর্থ' পত্রিকা হিসেবে 'ক্রাইম' বাজারে এসেছিল। এর মালিক ছিলেন রামচন্দ্র সাহা। সম্পাদক হিসেবে ছোট ভাই দীনেশচন্দ্রর নাম থাকলেও সব কাজ করতেন রামচন্দ্র নিজেই।

'ক্রাইম' পত্রিকায় আমরা অনেকেই নিয়মিত লিখতাম এবং সাপ্তাহিক আড্ডার লোভে লেখক-বন্ধুরা কোনও চায়ের দোকানে বা কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে নিয়মিত মিলিত হতাম। সে-আড্ডায় ভাস্কর রাহা, উপেন মান্না, উৎপল ভট্টাচার্য, অভিজিৎ দত্ত, শ্রীপার্থ, অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ধ্রুবেন সেন, সুজিত ধর ইত্যাদি অনেকেই আসতেন—রামচন্দ্রও আসতেন নিয়মিত। আমাদের মধ্যে নানান বিষয়ে আলোচনা হত—আড্ডায় যেমন হয়। তারই মধ্যে একদিন উঠল সম্মান-দক্ষিণার কথা। আমরা ঠিক করলাম, বিনাপয়সায় আর লিখব না—অন্তত পাঁচ টাকা হলেও দিতে হবে। আমাদের বন্ধু হওয়ায় রামচন্দ্রের কানে সে-জেহাদ পৌঁছে যায়। আশ্চর্য, রামচন্দ্র সাহা হাসিমুখে আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে লেখা-পিছু পাঁচ টাকা করে দিতে রাজি হন। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭২ সালের শেষাশেষি আমরা গল্প বা উপন্যাস যা-ই লিখি না কেন—লেখা-পিছু পাঁচ টাকা করে পেতে শুরু করি।



'মাসিক রহস্য পত্রিকা'-র অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ। সংখ্যাটির দাম ছিল তিন টাকা। ৭০ দশকের শুরু থেকেই 'মাসিক রহস্য পত্রিকা' প্রচ্ছদে ট্রাইকালার হাফটোন ব্লক ব্যবহার করতে শুরু করে।



অপরাধ' পত্রিকার মার্চ (১৯৭৭) সংখ্যা। সংখ্যাটির দাম ছিল তিন টাকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অশোক রায়। পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ঠিকানা ছিল ১৬৬ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

রামচন্দ্র সাহার এই পদক্ষেপ কোনওদিনই ভোলার নয়। পাঁচ টাকার অর্থমূল্য নয়—সম্মান-মূল্য আমাদের সেদিন অভিভূত করেছিল। আমরা অন্যান্য রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকায়—মানে, 'মাসিক রোমাঞ্চ', 'মাসিক রহস্য পত্রিকা' আর 'মাসিক গোয়েন্দা'—বিনাপয়সায় লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেইদিনের পর থেকে আর কোনও ব্যবসায়িক পত্রিকায় বিনাপয়সায় আমাদের লিখতে হয়নি।

শুধু যে এই ঘটনার জন্য রামচন্দ্র সাহাকে আমরা মনে রেখেছি, তা নয়। রামচন্দ্র ছিলেন হৃদয়বান, মিশুকে, পরোপকারী, সদাহাস্যময় তরুণ। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে এই মানুষটি আমাদের ছেড়ে চলে যান—তখন ওঁর বয়েস মাত্র তিরিশ।

রামচন্দ্র সাহার চলে যাওয়াটা আমাদের প্রত্যেকের বুকে তীব্রভাবে বেজেছিল। 'ক্রাইম' পত্রিকার মে-জুন (১৯৭৪) সংখ্যাটি 'রামচন্দ্র সাহা স্মৃতি সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই সংখ্যায় মনের ব্যথা

থেকে আমরা সবাই কিছু-না-কিছু লিখেছিলাম। তা ছাড়াও ছিল বহু নামী এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের লেখা— যাঁদের সঙ্গে রামচন্দ্রের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, যাঁরা 'ক্রাইম' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

রামচন্দ্রের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন :

> 'ক'দিনের বা পরিচয়। মাস কয়েকের বেশী নয়। কিন্তু তাইতেই সে মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলেছিল। ছাপটা যে কারণে পড়েছিল তা হ'ল তার ভেতরকার প্রাণ-শক্তির একটা প্রচ্ছন্ন দীপ্তি।

...আমায় যা আকৃষ্ট করেছিল, তা তার অকৃত্রিম সরল আন্তরিকতা, যা তার ভেতরকার প্রাণশক্তির প্রকাশকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

> ...দেবতারা যাদের ভালবাসেন, তারা নাকি বড় সকাল সকাল চলে যায়। তাই কি চলে গেছে রাম?
> *কি দরকার ছিল দেবতাদের অত ভালবাসার! আমাদের এই এত ভালবাসা স্নেহ কি যথেষ্ট ছিল না।'*

('দেবতাদের প্রিয়'/'ক্রাইম', মে-জুন, ১৯৭৪)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত লিখেছিলেন :

> *'...আজকের যুগে অমন একজন সত্যনিষ্ঠ, কর্মঠ পরিশ্রমী, প্রত্যাশায় পূর্ণ যুবক বড় একটা চোখে পড়ে না। ভগবানের একি বিচার জানি না। ভাল ফুলটিই তিনি হাত বাড়িয়ে তুলে নেন সম্ভাবনার অবসান ঘটিয়ে।'*

('রামচন্দ্র সাহা'/'ক্রাইম', মে-জুন, ১৯৭৪)



'মাসিক রোমাঞ্চ'-এর অক্টোবর ১৯৭৭ সংখ্যার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। সংখ্যাটির দাম ছিল তিন টাকা। সম্পাদক ছিলেন রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়।



'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার ১৯৮০ সালের পুজোসংখ্যার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। সংখ্যাটির দাম ছিল পাঁচ টাকা।

রামচন্দ্রের পর ওঁর ভাই দীনেশচন্দ্র সাহা পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

১৯৭৩ সালে আমরা লেখকরা মিলে একটি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির সংকলন বের করেছিলাম। ভাস্কর রাহা, উপেন মান্না, উৎপল ভট্টাচার্য, মঞ্জিল সেন, অসিত মৈত্র এবং আরও কয়েকজন মিলে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে ন'টি কাহিনির এই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছিল। নাম ছিল 'রক্ত ফোঁটা ফোঁটা'। একেবারে বিদেশি পেপারব্যাক বইয়ের ধাঁচে বইটি আমরা তৈরি করেছিলাম। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, চব্বিশ পেজি ফর্মা, চার রঙের লাইন-হাফটোন কম্বাইন্ড ব্লকে আর্ট বোর্ডে ছাপা প্রচ্ছদ—সে একেবারে ঝকমকে ব্যাপার। দুশো চার পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বইটির দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা। এখনও বইটিকে দেখলে মনে হয় কী আধুনিক!

'রক্ত ফোঁটা ফোঁটা'র পর চাঁদা তুলে আরও একটি সংকলন আমরা বের করেছিলাম। ১৯৭৪-এ বেরোনো এই বাংলা পেপারব্যাক বইটির নাম ছিল 'কফিন'। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা একশো আটষট্টি পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল চার টাকা। 'অপরাধ' পত্রিকার সম্পাদক অশোক রায় এই বইটি প্রকাশে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আজ এই প্রচেষ্টা দুটো নগণ্য এবং হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই : রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনিকে পাঠকের প্রিয় করে তোলা।

সেসময়ে যে-ক'টি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির মাসিক পত্রিকা ছিল, তাদের মালিক/সম্পাদকদের কেউ-কেউ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সহজভাবে নেননি।



গোয়েন্দা-রহস্য' (নথিবদ্ধ নাম 'গোয়েন্দা-রহস্য পত্রিকা') পত্রিকার প্রথম বছরের পুজো সংখ্যা (১৯৮১)। দাম ছিল বারো টাকা। সম্পাদক ছিলেন বিমলকান্তি সাহা।



শারদীয়া 'উল্কা' প্রথম পূজা সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। সংখ্যাটির দাম ছিল বারো টাকা। সম্পাদক ছিলেন এস. কে. দাস।

১৯৭৫ থেকে শুরু হয়েছিল 'মাসিক ক্রিমিনাল'। তার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় 'গোয়েন্দা-রহস্য' এবং 'উল্কা'। দুটি পত্রিকারই কর্ণধার ছিলেন বিমলকান্তি সাহা—যদিও সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশ করেছিলেন শুধুমাত্র 'গোয়েন্দা-রহস্য'-তে।

যেসব পত্র-পত্রিকার কথা বললাম সেগুলো ছাড়াও কয়েকটি এজাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পুরোনো কালে 'রহস্যমালা' (১৯৪৮), তারপর ষাটের দশকে 'অন্তরালে', 'তদন্ত-রহস্য', 'রহস্য সন্ধানী', 'তদন্ত'। এদের মধ্যে একমাত্র 'রহস্য সন্ধানী' ছিল তুলনায় দীর্ঘজীবী।

আশির দশক পেরোতে-না-পেরোতেই টিভির প্রকোপ শুরু হল। টিভি ঢুকল ঘরে-ঘরে। আর এই মণ্ড-পত্রিকাগুলো ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগল। ১৯৮৪-তে অশোক রায় 'অপরাধ' পত্রিকাকে বিদেশি 'ট্রু ডিটেকটিভ' পত্রিকার ধাঁচে বদলে দিলেন। পত্রিকার মাপও ষোলো পেজি ডবল ডিমাই থেকে আট পেজি বড়

মাপে পালটে দিলেন। সেক্স-ক্রাইম লেখা ছেপে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এটাই ছিল বোধহয় শেষের শুরু।

১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ রঙিন টিভি ঢুকে পড়ল বাজারে। আর তার পরে-পরেই মুদ্রণে এল নতুন যুগ। শুরু হল ফটো টাইপ সেটিং আর অফসেট। পুঁজি অল্প থাকায় এই পত্র-পত্রিকাগুলো আধুনিক মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় যেতে পারেনি। ওদের সেই হ্যান্ড-কম্পোজ, লালচে নিউজপ্রিন্ট, আর ফ্ল্যাট মেশিন।

সুতরাং পত্রিকাগুলো একে-একে নিভতে শুরু করল।

আশির দশকের শেষের দিকে ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে একসময় পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। এমনকী, বাংলা ভাষায় সর্বকালের দীর্ঘজীবী পত্রিকা 'রোমাঞ্চ'ও! এই পত্রিকাটি ১৯৩২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত টিকে ছিল।



মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার ১৯৪৮ সালের শারদীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংখ্যাটির প্রচ্ছদ শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শারদ সংখ্যায় একটিমাত্র উপন্যাস, অনেকটা বইয়ের ঢঙে, প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম শ্রীকল্লোলকুমার দত্ত,

উপন্যাসের নাম 'অন্ধকার'। শারদ সংখ্যাটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল

শ্রীরঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু—

এই সংখ্যাটির দাম ছিল দশ আনা। সেসময়ে ডিটেকটিভ উপন্যাসের একমাত্র সাপ্তাহিক ছিল 'রোমাঞ্চ'। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু-আনা—আজকের হিসেবে সাড়ে বারো পয়সা। ষাণ্মাসিক চাঁদা ছিল তিন টাকা চার আনা, আর বার্ষিক চাঁদা ছ'টাকা। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত প্রতি শনিবার। বছরে ৪৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হত, তার মধ্যে একটি পুজো সংখ্যা। পরবর্তীকালে, ১৯৫২ সাল থেকে, পত্রিকাটি 'মাসিক রোমাঞ্চ' নামে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। মাঝে অল্প সময়ের জন্য সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অমিত চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার দপ্তর ছিল ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা ৬।

'ক্রাইম' পত্রিকার রামচন্দ্র সাহা চলে গিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৮ সালে চলে গেলেন রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এবং 'মাসিক গোয়েন্দা'কে অনাথ করে গেলেন। দিনের পর দিন এই মানুষটিকে দেখেছি কী কষ্ট সয়ে, দরকার হলে ধার-দেনা করে, পত্রিকার পুজো সংখ্যার আয়োজন করেছেন। সবসময়ে পত্রিকার ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবতেন। ওঁর অনুজ শিল্পী-বন্ধু নরেন রায় (কার্টুনিস্ট 'সুফি') প্রায়শই 'মাসিক গোয়েন্দা'র প্রচ্ছদ আঁকতেন। এ জাতীয় পত্রিকার প্রচ্ছদে হাফটোন ব্লকের ব্যবহার রবিরঞ্জনই শুরু করেছিলেন। ওঁর পক্ষে এ-কাজ সহজ ছিল, কারণ, 'গোয়েন্দা'র আগে তিনি 'সচিত্র তোমার জীবন' নামে একটি সিনেমা-পত্রিকা প্রকাশ করতেন।

১৯৯১ সালে 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকার অন্তিম পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরের বছর অমিত চট্টোপাধ্যায় বিদায় নিলেন। আর ১৯৯৮ সালে রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় নতুন একটি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯৯১ সালের পুজো

সংখ্যা 'রোমাঞ্চ'কে 'শেষ সংখ্যা' বলে কিছুতেই ওঁর মন মানতে পারেনি। তাই স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি তিনি। ওঁর স্বপ্ন শেষ হল স্বপ্নলোকে গিয়ে।

কিন্তু আমার স্বপ্ন দেখা এখনও শেষ হয়নি। সেই স্বপ্ন আর দুঃখ থেকেই এই বই।



'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৭০-জানুয়ারি ১৯৭১ সংখ্যার একটি রহস্য উপন্যাসের চিত্রণ। শিল্পী সম্ভবত নরেন রায় (সুফি)। সংখ্যাটির দাম ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।



অপরাধ' পত্রিকার মার্চ, ১৯৭৭ সংখ্যার একটি গোয়েন্দা উপন্যাসের চিত্রণ। সংখ্যাটির দাম ছিল তিন টাকা।

ওইসব পালপ ম্যাগাজিনগুলোয় কারা লিখতেন তাঁদের নাম এখনও আমি আপনাকে বলিনি। কারণ এই বইয়ের সূচিপত্র দেখলেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন। এই বইয়ের প্রথম লেখাটি ১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর শেষ লেখাটি ১৯৮৮ সালের 'মাসিক রোমাঞ্চ' থেকে। শুধু ১৯৪৯-১৯৫১ সাল, আর ১৯৫৩-১৯৫৪ সাল থেকে কোনও নমুনা-গল্প সংগ্রহ করতে পারিনি। তা ছাড়া ষোলোটি পত্রিকা থেকেই অন্তত একটি করে নমুনা পেশ করতে পেরেছি। সুতরাং এইভাবে কমবেশি চল্লিশ বছর ধরে পত্র-পত্রিকার পাতায় রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই বইতে। বইয়ের প্রতিটি গল্পের শেষে দেওয়া আছে পত্রিকার নাম এবং গল্পটি প্রকাশের মাস ও বছর। যেহেতু সংকলনটিতে গল্পের সংখ্যা একশো, সেহেতু রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের এই পত্রিকাগুলো মোটামুটি চার দশকে কোনটা কতটা ছাপ ফেলেছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া কঠিন হবে না। যদি সেই ছাপকে আমরা বলি 'ইমপ্যাক্ট ইনডেক্স' বা 'অভিঘাত সূচক' তা হলে শতকরা হিসেবে চেহারাটা দাঁড়াবে এইরকম :

পত্রিকা	**অভিঘাত সূচক(শতকরা)**
রোমাঞ্চ (সাপ্তাহিক)	১
রহস্যমালা (সাপ্তাহিক)	১
তদন্ত (সাপ্তাহিক)	১
মাসিক রোমাঞ্চ	৪২
মাসিক রহস্য পত্রিকা	২২
মাসিক গোয়েন্দা	৭
অন্তরালে	৩
তদন্ত-রহস্য	১
রহস্য-সন্ধানী	১
তদন্ত	১
ক্রাইম	৭
শেষ সংকেত	১
অপরাধ	৬
মাসিক ক্রিমিনাল	৪
গোয়েন্দা-রহস্য	১
উল্কা	১

এখানে আপনাকে জানানো দরকার, 'অভিঘাত সূচক' হিসেব করে মোটেই গল্প নির্বাচন করা হয়নি। বরং গল্প বাছাই করার পর এই সূচকটি হিসেব করা হয়েছে। এ ছাড়া কোন দশকে এই পত্র-পত্রিকাগুলো বাড়বাড়ন্তের শীর্ষে পৌঁছেছিল তারও মোটামুটি একটা হিসবে কষা যেতে পারে। তাতে ছবিটা দাঁড়ায় এইরকম :

সময়	**গল্প-সংখ্যা**
১৯৪৮ সাল	২
১৯৫১-১৯৬০ সাল	২১
১৯৬১-১৯৭০ সাল	২০
১৯৭১-১৯৮০ সাল	৩৭
১৯৮১-১৯৯০ সাল	২০

বোঝাই যাচ্ছে, সত্তর দশকের যে-উত্থান আশা জাগিয়েছিল, পরের দশকে খুব দ্রুত সেটা স্তিমিত হয়ে গেছে। তবে এর কারণ হিসেবে শুধুমাত্র অডিয়ো-ভিশুয়াল মিডিয়ামকে দোষ দেওয়া যাবে না। কিংবা আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির জাঁকজমককে দায়ী করা যাবে না। এই দুইয়ের কাছে পত্রিকাগুলো হেরে তো

গিয়েছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একঘেয়ে দুর্বল রচনার চাপ। এই তিনের কাছে নতিস্বীকার করে 'ওরা' নিভে গিয়েছিল।

বেশিরভাগ সময়েই পত্রিকাগুলোর পুজো সংখ্যা দীপ্তিমান রচনাতে সমৃদ্ধ হত। তাতে গল্প-উপন্যাস লিখতেন নামী-অনামী লেখকরা। সেই কারণেই হিসেব কষতে গিয়ে দেখছি, এই বইয়ের শতকরা ঊনষাট ভাগ গল্পই পুজো সংখ্যা থেকে নির্বাচিত।

সব মিলিয়ে বলতে পারি, এই সংকলন সেইসব দিনগুলো আবার মনে করিয়ে দেবে। যেন আপনাকে ফিরিয়ে দেবে সেই 'হারানো' পত্রিকাগুলো। আর বইটা হাতে নিয়ে আপনার মনে হবে, 'সেদিন' 'ওরা' বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের জন্য কী চেষ্টাই না করেছিল!



'ক্রাইম' পত্রিকার জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৩ সংখ্যার একটি গুপ্তচর উপন্যাসের চিত্রণ। শিল্পী সুবীর রায়। সংখ্যাটির দাম ছিল দু-টাকা।



'ক্রিমিনাল' পত্রিকার আবির্ভাব সংখ্যায় (পুজো সংখ্যা ১৯৭৫) বিস্ময় রায়ের 'বেগুনী রঙের জ্যোতি' গল্পের অলংকরণ। শিল্পী সুবীর রায়।

তাই এখন 'ওদের' হারিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে এ যেন আমার স্মৃতি তর্পণ। এই বই আমি তুলে দিচ্ছি সেইসব মানুষদের যাঁরা এই সাহিত্যকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসেন, এবং ভালোবাসবেন—অর্থাৎ, আপনার হাতে।

২২ ডিসেম্বর, ২০০৪
ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান কলেজ (রাজাবাজার)
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অনীশ দেব

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর সাহিত্য

প্রতিঘাত সম্পূর্ণ
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভয়পাতাল
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিজ্ঞান। জানা অজানা
পাই নিয়ে রূপকথা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

বয়স্ক সাহিত্য

গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র
ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ
আগুন রঙের বুলেট
লাশতালাশ
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বারোটি রহস্য উপন্যাস
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

সম্পাদিত ও পরিবেশিত বই

সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক
কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩



সূচিপত্র

(১৯৪৮ সাল—১৯৮৮ সাল)



অন্ধকার

কল্লোলকুমার দত্ত

এক

চাঁদমোহন চ্যাটার্জিকে কোনওদিনই প্রতুল সুনজরে দেখতে পারেনি।

পাশের বাড়িতেই লোকটা থাকে। রেসের বুকমেকারি বা বাড়ির দালালি—এইরকম একটা কিছু পেশা। পোশাক-পরিচ্ছদে অতি উগ্র আধুনিক, আহারে-বিহারে একেবারে ইংরাজ-ঘেঁষা। নিত্য রাতেই তার বাড়িতে হয় পার্টি, নয় জলসা লেগেই থাকত। হইচই এবং চিৎকারে কত বিনিদ্র রজনী যে প্রতুলকে বসেই কাটাতে হয়েছে!

সেগুলো চট করে ভোলবার নয়; এবং নয় বলেই লোকটাকে দরজা-গোড়ায় এসে দাঁড়াতে দেখে, সে সুস্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, এখন আমি খুব ব্যস্ত...অন্য সময় আসবেন।

চাঁদমোহন কিন্তু নাছোড়বান্দা। কাকুতির সঙ্গে বলল, বড্ড দরকার স্যার, বিশেষ জরুরি। পাঁচমিনিটও লাগবে না...।

তারচেয়েও অনেক বেশি সময় ব্যয় হবে লোকটাকে বিদায় করতে। সুতরাং রাজি হওয়াই প্রতুলের বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল। তাকে ঘরে এনে বলল, কিন্তু যত সংক্ষেপে পারেন, শুধু বক্তব্যটুকুই বলে যান—কোনও গৌরচন্দ্রিকা নয়।

চাঁদমোহন কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, যে আজ্ঞে। আপনি তো স্যার পুলিশে কাজ করেন, তাই না?

ভুল শুনেছেন আপনি। পুলিশে কেন, কোথাও কাজ করি না আমি। কিন্তু কী বলতে চান...?

বাধা দিয়ে চাঁদমোহন বলে উঠল, না-ই করুন, কিন্তু রোজই তো লালবাজারে যান?

তা যাই! কিন্তু কেন বলুন তো?

সেখানে কোনও বন্ধু বা বিশেষ জানাশোনা নিশ্চয়ই কেউ আছে?

জেনে আপনার লাভটা কী?

বলছি, স্যার, বলছি।

একটু থেমে বারকয়েক ঢোক গিলে চাঁদমোহন আবার বলল, আমার বাড়িতে কাল সিঁধ দিয়েছিল। পাশের বাড়িতে আমার এক বন্ধু থাকে বিক্রম বলে—বোধহয় তাকে দেখে থাকবেন, তার ঘরেও বাদ যায়নি,

এমনকী আমার ভাই রাইমোহনের ঘরেও...।

তাকে শেষ করতে না দিয়ে প্রতুল কৌতুকের স্বরে বলে উঠল, পাইকারিভাবে তা হলে সিঁধ দেওয়া হয়েছে বলতে চান? তা আমাকে না বলে একটু দূরেই তো থানা আছে, সেখানে গিয়ে খবর দিন।

চাঁদমোহন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি ঠিক ব্যাপারটা বুঝছেন না, স্যার! মুশকিল হচ্ছে কি, খবর দেওয়ার মতো কিছু নেই কি না...।

মানে?

মানে কিছুই নিয়ে যায়নি। কাজেই নেয়নি যখন, তখন আর থানায় খবর দিয়ে কী হবে!

প্রতুল এবার সত্যিই বিস্ময় বোধ করল। বলল, কিছুই নেয়নি? আশ্চর্য!

চাঁদমোহন তার কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠল, ঠিক বলেছেন, স্যার, আশ্চর্য! সেইজন্যেই তো বলছি, লালবাজারে গিয়ে যদি আপনার কোনও জানাশোনা লোককে বলে দেন...।

বলতে অবশ্য ইন্সপেক্টর আনন্দমোহনকে পারি। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি কিছু? যদি কিছু চুরি যেত, তা হলে না হয়...।

চাঁদমোহন ক্ষোভের সুরে বলল, যদি কিছু চুরিই যেত, তা হলে আমি ভয় পেয়ে আপনার কাছে ছুটে আসতুম না! সমস্তটা কেমন যেন গোলমেলে। রহস্যটা কী, যদি আপনার বন্ধু আনন্দবাবু আবিষ্কার করতে পারেন! বুঝতেই তো পারছেন, শত্রুর আমার অভাব নেই...।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রতুল তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বললে, বেশ, লালবাজারে গেলে আমি আনন্দবাবুকে বলব। যদি তাঁর কিছু করবার থাকে, করবেন!

অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে রেসের দু-একটা 'শিয়োর টিপের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাঁদমোহন অতঃপর বিদায় নিল।

ঘটনাটাকে কিন্তু প্রতুল অত সহজে মন থেকে ছেঁটে ফেলতে পারল না। ঘরে-ঘরে চোর সিঁধ দিল, অথচ কোনও জিনিসই অপহৃত হল না। এর কারণ কী? যে সিঁধ দিয়েছে, সে তা হলে কী চেয়েছিল? টাকা? কোনও দলিল? কিংবা...।

কতক্ষণ পর এই কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে প্রতুল লালবাজারে এসে হাজির হল।

ইন্সপেক্টর আনন্দমোহন নিজের ঘরেই ছিলেন। দেখে মনে হল, খুব ব্যস্ত! তবু একফাঁকে প্রতুলের দিকে তাকিয়ে লঘুকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, কী খবর? মেঘ না চাইতেই জল যে!

চেয়ারের ওপর চিন্তিত মুখে বসে পড়ে প্রতুল জবাব দিল, ব্যাপারটা গুরুতর নয়। তবু মনে হচ্ছে, আপনার কিছু কাজে লাগবে। আমার বাড়ির পাশেই চাঁদমোহন চ্যাটার্জি বলে এক ভদ্রলোক থাকেন। একটু আগেই এসে তিনি জানিয়ে গেলেন, কে বা কারা তাঁর ঘর, তাঁর ভাইয়ের ঘর, এমনকী তাঁর বন্ধুর বাড়িতেও সিঁধ দিয়ে তছনছ করে গেছে। অথচ মজা হচ্ছে, কোনও জিনিসই চুরি যায়নি।

আনন্দমোহনের মুখখানা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে তিনি বললেন, আবার আপনিও এই খবর নিয়ে এসেছেন? শুধু আপনার প্রতিবেশীই নয়, প্রতুলবাবু, গত তিন-চার দিনে অন্তত বিশজন জানিয়ে গেছেন যে, তাঁদেরও ঘরে সিঁধ পড়েছে।

সংবাদটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। প্রতুল আগ্রহভরে জিগ্যেস করল, এসবের পেছনে রহস্যটা কী আপনি বলতে পারেন?

মাপ করতে হবে।

আপনার কি মনে হয়, কোনও জরুরি দলিল বা কাগজ বা নকশা...।

আনন্দমোহন কাঁধ দুলিয়ে বললেন, হতেও পারে, কে জানে! হয়তো সমস্তগুলোই একটা দলেরই কাজ।

আমারও তাই মনে হয়।

যাই হোক, চুপ করে থাকা আর চলবে না। একটু বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে। ইত্যবসরে...।

ফোন বেজে উঠে আনন্দমোহনের বক্তব্যে বাধা দিল। তিনি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, হ্যালো...।

ধীরে-ধীরে তাঁর মুখখানা কালো হয়ে উঠল। কপালের শিরা দুটো হয়ে উঠল স্ফীত। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আচ্ছা, কিন্তু কেউ যেন কোনও জিনিস না ছোঁয়, কিংবা আমি না যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে না বেরোয়।

সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে তিনি প্রতুলের দিকে ফিরে তাকালেন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যই বোধকরি প্রশ্ন করলেন, কী নাম আপনার প্রতিবেশীটির—যাঁর নাম এইমাত্র বলছিলেন?

চাঁদমোহন চ্যাটার্জি। কিন্তু কেন?

তিনি মারা গেছেন। বোধহয় খুনই।

দুই

অসহ্য বিস্ময়ে প্রতুল চমকে উঠল। তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা আর-একটু হলেই ফসকে পড়ে যেত। ভ্রু দুটো কুঁচকে কতকটা আপনমনেই সে বলল, এই কিছুক্ষণ আগেই—আধঘণ্টাও হয়নি, তার সঙ্গে আমি যে কথা বলেছি! কে...।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আনন্দমোহন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসবেন নাকি, প্রতুলবাবু, আমার সঙ্গে?

গভীর আগ্রহভরে প্রতুল বলল, নিশ্চয়ই! চলুন—।

পথিমধ্যে আনন্দমোহন ফোনে-পাওয়া সংবাদটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে চললেন, চাঁদমোহন তাঁর অফিসঘরে ঢোকার মিনিটদশেক পরেই নাকি দেখা যায়, তিনি টেবিলের ওপর ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। ঘটনাটা ঘটবার একটু আগেই তাঁর ঘরে একটি লোক ঢোকে—অবশ্য তাঁরই কর্মচারী...।

সন্দেহসূচক কণ্ঠে প্রতুল বলে উঠল, আপনার কি মনে হয়, ওই লোকটিই...?

তাঁকে খুন করেছে!—বাধা দিয়ে আনন্দমোহন বললেন, তাও হতে পারে। তবে ওখানে না গিয়ে, কিছু না দেখার আগে তো আর কিছু বলতে পারি না...।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, স্থানীয় একজন কনস্টেবল বাড়ির দরজায় পাহারায় নিযুক্ত। গম্ভীর স্বরে আনন্দমোহন তাকে জিগ্যেস করলেন, এখান থেকে কেউ পালায়নি, বা পালাতে চেষ্টাও করেনি?

নমস্কার জানিয়ে কনস্টেবলটি বললে, আজ্ঞে না, পালায়নি কেউই; তবে পালানোর চেষ্টা করেছিল—তাকে ধরে রাখা হয়েছে। আমি তার নাম-ঠিকানা লিখে রেখেছি।

কথাশেষে সে পকেট থেকে একখানা খাতা বের করে, বারকয়েক তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা চালে বলল, লোকটার নাম ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী; ঠিকানা ১৩ নম্বর কটু ঘোষাল স্ট্রিট।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে-ঢুকতে আনন্দমোহন প্রতুলের পানে ফিরে বললেন, এ-নামটা আমার যথেষ্ট পরিচিত। যদ্দূর মনে হয়, এ-ই আমাকে ফোনে খবর দেয়।

একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে তাঁরা দ্বিতলে উঠে এলেন। দু-ধারে সারিবন্দি ঘরের একটাতে দেখা গেল, দরজায় পিতলের ফলকে লেখা :

চাঁদমোহন চ্যাটার্জি

সশব্দে দ্বারটা খুলে ফেলতেই প্রতুল দেখল, ঘরখানা বেশ বড়ই। তবে তিন পিস কাঠ দিয়ে সেখানাকে গোটাকয়েক ছোট-ছোট অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। কোনওটায় লেখা 'অফিস', কোনওটায় বা 'প্রাইভেট'।

দরজার সামনেই যে-অংশটা—সেখানে জনকয়েক লোক সগর্জনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। দেখে মনে হয়, মুহূর্তকয়েকের প্রতীক্ষায় যেন তাদের লক্ষ-লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

প্রতুল আর আনন্দমোহনকে দেখে তারা সমস্বরে চিৎকার করে ছুটে এল : আমাদের এভাবে আটক রাখার মানে? আমরা কি বুনো জানোয়ার? না এটা মগের মুলুক যে, যা মনে করেন, তাই করবেন?

তাদের এই অভদ্রোচিত কথায় ক্রোধে আনন্দমোহন ফেটে পড়বার উপক্রম হলেও এগিয়ে যেতে-যেতে তিনি যথাসম্ভব নিজেকে শান্ত করে নিয়েই বললেন, আপনাদের মধ্যে ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী কার নাম?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি শীর্ণকায় লোক বেরিয়ে এসে বলল, আমার নাম। কিন্তু কেন বলুন তো?

তার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে আনন্দমোহন বললেন, সামান্য দু-চারটে কথা আছে আপনার সঙ্গে। আশা করি...।

কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করেই ত্রিবান্দম বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

কিছুক্ষণের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে বলে আনন্দমোহন 'প্রাইভেট' চিহ্নিত অংশটায় প্রবেশ করলেন।

মেহগনি কাঠের তৈরি মসৃণ একখানা টেবিলের ওপর চাঁদমোহন মুখ গুঁজড়ে পড়ে ছিল। হাত দুখানা দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ। তারই নীচে মেঝেয় কতকটা রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে।

ঘরের চারধারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র। কোনওটা ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি, কোনওটা বিল, কোনওটা বা চালান।

মৃতদেহের পানে কতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একসময় আনন্দমোহন বললেন, পিছন থেকে তীক্ষ্নধার ছুরিখানা এমনভাবে ছোড়া হয়েছে যে, বুক ভেদ করে সেটা চলে গেছে।

প্রতুল কিন্তু তাঁর কথার কোনও প্রত্যুত্তর করল না। সে তখন চারদিকে ছড়ান কাগজপত্রগুলো বাছতে শুরু করে দিয়েছে—কোনও সূত্রের আশায়। অকস্মাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে একখানা কাগজ আনন্দমোহনের পানে এগিয়ে দিয়ে সে খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এই দেখুন আনন্দবাবু...।

প্রতুলের হাত থেকে আনন্দমোহন কাগজখানা একরকম ছিনিয়েই নিলেন। দেখলেন, চাঁদমোহন তাঁর ভাই রাইমোহনের উদ্দেশে লিখেছে আমি ভয়ার্ত...।

কথাটা শেষ হয়নি! শুধু তলায় কতকগুলো কালির আঁচড়—শিশুর হাতে আঁকা ছবির মতো।

সন্দেহের সুরে প্রতুল বলল, আমার মনে হয়, চাঁদমোহন যখন লিখছিলেন, তখন তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

কথাশেষে সহসা টেবিলের তলায় লক্ষ্য পড়তেই সে দেখল, একটা কলম পড়ে। সেটা তুলে নিয়ে সে আবার বলল, এই দেখুন, আরও একটা মস্ত প্রমাণ। হাত থেকে খসে পড়ে কলমের নিবটা একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে।

আলোর সামনে হাতের কাগজখানা মেলে ধরে, সেটার ওপর একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আনন্দমোহন বললেন, এই যে, কতকগুলো ফুটোও আছে এখানে। তা হলে আমাদের ধারণাটা...।

মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে গেল। মৃতদেহের পানে তাকিয়ে, কী একটা কথা মনে হতেই তিনি আবার বললেন, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ইনি তো বসেছিলেন; তবে ছুরিটা পিঠের ওপর বিদ্ধ হল কী করে...?

প্রতুল তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হয়তো হত্যাকারী এঁর সামনে দিয়েই ঘরে ঢোকে। তাকে দেখবামাত্র ভয় পেয়ে কাগজের ওপর কথাটা লিখতে গিয়ে মাঝপথে মারা পড়েন।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটা একবার ঘরের চারপাশে বুলিয়ে নিয়ে আনন্দমোহন ত্রিবান্দমকে ডাক দিলেন।

ডাক শোনামাত্র কেন জানি না, ত্রিবান্দমের মুখখানা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। তত্রাচ নিজেকে সংযত করে নেওয়ার জন্য গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে, এগিয়ে এসে বললে, বলুন স্যার, যা বলবার...।

কঠিন কণ্ঠে আনন্দমোহন প্রশ্ন করলেন, চাঁদমোহনবাবুর মৃতদেহ কখন আপনার চোখে পড়ে?

ত্রিবান্দম চুপ করে রইল।

প্রবলভাবে কাঁধটা নাড়া দিয়ে আনন্দমোহন আবার বললেন, কই, বলুন?

বলছি, স্যার, বলছি। মিস্টার চ্যাটার্জি আজ দুটো বাজার পরে এসেছেন...।

অন্যদিন কখন আসেন?

অন্যান্য দিন আসেন ঠিক দশটায়। কোনওদিন বা দু-পাঁচমিনিট আগেও এসে পড়েন। তবে দেরি একদিনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তা হলে হঠাৎ আজ ব্যতিক্রম ঘটল কেন?

সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে আজ তাঁকে একটু বিরূপ দেখেছিলাম। তার খানিক বাদেই আমি এই অবস্থায় দেখি।

কথার ফাঁকে প্রতুল লক্ষ করছিল, ত্রিবান্দম কাঁপছে—বোধকরি বা ভয়ে। সে প্রশ্ন করল, তখন আন্দাজ ক'টা?

চাপা স্বরে ত্রিবান্দম বলল, আড়াইটে নাগাদ।

আপনি কী কারণে তাঁর ঘরে ঢুকছিলেন? তিনি কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, না অন্য কোনও কারণে...।

পরের রেসের জন্যে যে-টাকা সংগ্রহ হয়েছিল, আমি সেটা কোথায় রাখব, জিগ্যেস করতে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা, এই আধঘণ্টার মধ্যে আর কেউ তাঁর ঘরে ঢুকেছিলেন?

নিশ্চয়ই! সবসময়েই তাঁর ঘরে লোক যাওয়া-আসা করে। মিস্টার চ্যাটার্জি অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল মানুষ ছিলেন। তাই কারও সঙ্গেই গল্পগুজব করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আজকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই সুনজরে দেখতে পারা যায় না। তাঁরা এসেছিলেন টাকা ধার করতে।

পেয়েছিলেন কি?

মাথা নেড়ে ত্রিবান্দম বলল, কেউ পেয়েছেন, কেউ পাননি। আর কিছু আমি জানি না, আমি তখন বড্ড বেশি ব্যস্ত ছিলাম কাজে।

তার শেষের কথাগুলোতে আনন্দমোহন একটু রুষ্ট হলেন বলেই মনে হল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, তবে আপনি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কেন?

ত্রিবান্দমের মুখখানায় মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ফুটে উঠল। আমতা-আমতা করে কোনওরকমে বললে, আমি—আমি—মানে আমার স্ত্রীকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।

ছুরির তীক্ষ্ন ফলার মতোই ঠোঁটের ফাঁকে একটুকরো হাসি টেনে এনে আনন্দমোহন বললেন, স্ত্রীকে ফোন করতে চেয়েছিলেন, না সোজা লালবাজারে খবর দিয়েছিলেন? কোনটা?

শুকনো ঠোঁটটায় বারকয়েক জিভটা বুলিয়ে নিয়ে ত্রিবান্দম বলল, আমি—আমি—মানে—আমার...।

ধমক দিয়ে আনন্দমোহন বললেন, তা হলে আপনিই তাঁকে খুন করেছেন, কেমন?

বাঁশপাতার মতোই ত্রিবান্দমের দেহটা বারকয়েক কেঁপে উঠল। কপালে দেখা দিল বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তত্রাচ প্রতিবাদ জানিয়ে সে বলল, আমি খুন করেছি, কে আপনাদের বলল? তাঁর ওপর আমার কোনও রাগ নেই, বা আমিও তাঁকে আর কোনওরকম ঘৃণা করি না...।

মৃদু হেসে প্রতুল কৌতুকের স্বরে বলল, আপনি তা হলে স্বীকার করছেন যে, আগে তাঁকে ঘৃণা করতেন?

কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান সাক্ষীর মতোই শুষ্ক কণ্ঠে ত্রিবান্দম বলল, আপনারা আমাকে এমন থতমত খাইয়ে দিচ্ছেন যে, আমি কী বলছি, তা আমি নিজেই জানি না...।

তা হলে আপনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কেন?

আমি—মানে—ভয় পেয়ে...।

হাতঘড়িটার পানে একবার তাকিয়ে আনন্দমোহন বললেন, তা হলে আপনাকে একটু কষ্ট করে যেতে হবে...।

কোথায়?

এই—একটু লালবাজারে।—পরক্ষণেই অপর লোকগুলিকে উদ্দেশ করে আনন্দমোহন বললেন, আপনাদেরও একটু কষ্ট করতে হবে। যতক্ষণ না এই ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত হতে পারছি, ততক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। কী করব বলুন, আমার করবার কিছু নেই।

তাঁর কথাই বহাল রইল। ত্রিবান্দমকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হল। বাকি লোকগুলিকে ওই বাড়িরই একতলায় একখানা ঘরে পুরে কনস্টেবল-পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

প্রতুল বলল, আপনার কি মনে হয়, আনন্দবাবু যে, ত্রিবান্দম এ-খুনের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত আছে?

ঠিক বলা যায় না। তবে লোকটা খুনির সম্বন্ধে যে কিছু জানে এবং সে-কথা আমাদের কাছে গোপন করেছে, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। আমার মনে হয়, চাঁদমোহন তাঁর ঘরে ঢোকার আগেই হত্যাকারী সেখানে কোথাও লুকিয়েছিল। আর সে-কাজে তাকে সাহায্য করেছে ত্রিবান্দমই।

লুকিয়েছিল? কোথায়?

ওই ঘরেই। আপনি অত লক্ষ করেননি। একপাশে একটা পরদার আড়ালে একখানা চাবি-দেওয়া ছোট ঘর আছে। সেখানেই সে লুকিয়েছিল। অবশ্য এটা আমার নিছক অনুমান।

পুনরায় মৃতদেহের ঘরে এসে আনন্দমোহন দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর শুরু করলেন তীক্ষ্ন অনুসন্ধান। মৃতের জামার পকেটগুলো হাতড়ে প্রথমে বের করলেন কিছু খুচরো টাকা-পয়সা, তারপর একখানা ডায়েরি, তারপর বের হল একথোলো চাবি।

তার মধ্যে থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে পরদার আড়ালের দরজাটা খুলে ফেলে বললেন, এই দেখুন, প্রতুলবাবু, এই ঘরখানার কথা বলছিলাম।

আসবাবহীন ঘরখানার চারদিক লক্ষ করতেই দেখা গেল, মেঝের ওপর দু-পাটি জুতোর দাগ। কাদাসমেত নিশ্চয়ই কেউ এখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আনন্দমোহন বলে উঠলেন, দেখুন, প্রতুলবাবু, যা ভেবেছিলাম, অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেছে। জুতোর ছাপ...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, কিন্তু চাবিবন্ধ ঘরে ঢুকল কী করে লোকটা?

হত্যা করার আগে যেমন করেই হোক, হত্যাকারী দরজাটা খোলে এবং সময়মতো এখান থেকে বেরিয়েই কাজ সেরে সে সরে পড়েছে। তবে এমনও হতে পারে যে, ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় এমনভাবে সেটা বন্ধ করেছে যে, 'টেপা-কলটা' আটকে গেছে।

ডায়েরি থেকে প্রতুল তেমন কিছুই পেল না। পাতার পর পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একসময়ে রাইমোহনের ঠিকানাটা বের করে সে বলল, অতঃপর আমাদের এখানেই যেতে হবে। আমার মনে আছে, সিঁধ দেওয়ার ব্যাপারে চাঁদমোহন তাঁর ভাই রাইমোহনের নামটাও উল্লেখ করেছিলেন।

মৃতদেহ একজন পুলিশের হেফাজতে রেখে প্রতুল আনন্দমোহনকে সঙ্গে করে রাইমোহনের বাড়ির উদ্দেশে পথে নেমে পড়ল।

ডোভার লেনে আরও পাঁচখানা হালফ্যাশনের বাড়ির চেয়ে রাইমোহনের ফ্ল্যাট বাড়িখানা উচ্চতায় এবং দৈর্ঘ্যে বেশ বড়। ভিতরে ঢুকতেই সামনে লিফট। আর যাই হোক, ভাড়াটেদের সুবিধের জন্য বাড়ির মালিক যে দয়া করে এটা করে দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে সত্যিই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

বাড়িখানার চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে প্রতুল লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কাউকেই না দেখতে পেয়ে নিজেই লিফট চালিয়ে দ্বিতলে উঠে এল।

ঘরের পর ঘর দেখতে-দেখতে তারা দরজায় পিতলের ফলকে 'রাইমোহন চ্যাটার্জি' লেখা ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়াল। কলিংবেলটা চোখে পড়তেই প্রতুল সেটা সজোরে টিপতে লাগল।

মিনিটপাঁচেক ক্রমাগত টেপবার পরেও যখন ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তারা ফিরে যাওয়ারই উপক্রম করল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে সবে পা দিয়েছে, এমনসময় সশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

কতকটা চাঁদমোহনের মতোই দেখতে একজন লোক বেরিয়ে এল। কোনও কথা বলবার অবসর তাকে না দিয়ে আনন্দমোহন প্রশ্ন করলেন, আপনারই নাম কি রাইমোহন চ্যাটার্জি? চাঁদমোহনবাবু...।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অকস্মাৎ লোকটি অব্যক্ত এক আর্তনাদ করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

তিন

পুনরায় বিস্ময়ের পালা!

এক লহমার জন্য উভয়ে উভয়ের পানে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই আনন্দমোহন মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে, লক্ষ করে বললেন, এঁকেও ছুরি মারা হয়েছে। আমরা বড্ড দেরি করে ফেলেছি।

প্রতুল বলল, আপনি কি মনে করেন, খুনি এখনও এই বাড়িতে আছে?

ঘরের ভেতর এগিয়ে যেতে-যেতে আনন্দমোহন বললেন, আমরা লিফটে চড়ে ওপরে আসার সময়ই সে সরে পড়েছে। তবুও একবার...।

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি শুরু করলেন অনুসন্ধান। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু না, কারও ছায়াটুকু পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হল না।

ঘরটা দেখে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই সেখানে যেন একটা প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। টেবিলের কাগজপত্র এধার-ওধারে ছড়ানো, হাতলবিহীন চেয়ারগুলো, পিতলের ফুলদানি দুটো স্থানভ্রষ্ট, আলমারির কাঁচগুলো শতফালি, এমনকী জানলার পরদাটাও শতটুকরো হয়ে একপাশে পড়ে রয়েছে। সকলের চেয়ে বিস্ময়কর—মেঝের ওপর কার্পেটটা রক্তে মাখামাখি। লোকটা যেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ল, ঠিক ততদূর পর্যন্ত একটা গাঢ় রক্তের রেখা।

আনন্দমোহনের দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াল না। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমরা আসার দু-পাঁচ মিনিট আগেই যে এখানে একটা বড়রকমের দ্বন্দ্ব ঘটে গেছে, তার প্রমাণ দিচ্ছে এখানকার বিশৃঙ্খল অবস্থা।

প্রতুল বলল, আপনার কি মনে হয়, এটাও ওই একই লোকের কাজ?

ঠিক তাই।—পরক্ষণেই মৃতদেহের ওপর পুনরায় ঝুঁকে পড়ে আনন্দমোহন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ করতে লাগলেন। ছুরি—হ্যাঁ, ছুরিই মারা হয়েছে লোকটিকে। তীক্ষ্নফলা একখানা ছুরি এমনভাবে ছোড়া হয়েছে যে, আয়তনে ক্ষতটা তেমন বেশি না হলেও, গভীরতাটা যেন তার একটু সীমা অতিক্রম করেছে। পরিশেষে হত্যাকারী ছুরিখানা সঙ্গেই নিয়ে গেছে।

প্রতুল দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলল, আমি একবার সারা বাড়িখানা দেখে আসি। যদি কারও সন্ধান পাই, হয়তো তার কাছ থেকে আমরা কিছু জানতে পারব।

প্রথমে আশপাশের ঘরগুলো দেখে নিয়ে প্রতুল নীচে নেমে এল। দেখল, সামনে একজন ঝাঁকড়া চুলওলা লোক বসে-বসে ঢুলছে—বোধকরি সারা রাত্রি ঘুম না হওয়ার অবসাদে তন্দ্রাটা তার এসেছে গভীরভাবেই।

দেখলেই তাকে মনে সন্দেহ জাগে, বুদ্ধি বলতে কোনও পদার্থ সত্যই কোনওদিন তার মাথায় ছিল কি না! তত্রাচ প্রতুল তার সামনে গিয়ে চড়া গলায় তাকে ডাকল, ওহে, শুনছ?

আচমকা তন্দ্রাটা ভেঙে যেতে লোকটা কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে বলল, আজ্ঞে, কী বলছেন?

গত দু-ঘণ্টার মধ্যে রাইমোহনবাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি না বলতে পারো?

হতভম্বের মতো লোকটা প্রতুলের কথার পুনরুক্তি করে বলল, রাইমোহনবাবু...।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দোতলায় সামনের ঘরেই যিনি থাকেন...।

লোকটা যেন লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়ে বলে উঠল, ওঃ, তাঁকে!

হ্যাঁ, তাঁকে! ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

উত্তরে লোকটা যা বলল, তা শুনে প্রতুল আর বৃথা তার সঙ্গে বাক্যব্যয় করা সমীচীন বোধ করল না। দ্রুতপদে সে পুনরায় দ্বিতলে উঠে এল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আনন্দমোহনকে তার পানে তাকাতে দেখে সে বলল, নীচে একজন লোক আছে, কিন্তু সে একেবারে খাজা আহম্মক ছাড়া আর কিছুই নয়।

গভীর বিরক্তিভরেই আনন্দমোহন বললেন, থাক। আমি ফোন করে দিয়েছি লালবাজারে। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এখনই আমাদের লোক এসে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এলেন। এসেই শুরু করলেন পরীক্ষা। পরে বললেন, ছোরা যে মারা হয়েছে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ছোরাখানার মুখে কোনও তীব্র অ্যাসিড মাখানো ছিল কি না, সেটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আনন্দমোহন বললেন, বেশ, পরীক্ষা করে দেখুন। আমরা এখন চললুম। আপনার কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দেবেন লালবাজারে।

বাকি লোকগুলোকে সারা বাড়িখানা পাহারা দেওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন প্রতুলকে সঙ্গে নিয়ে।

সবেমাত্র পথে পা বাড়িয়েছেন, এমনসময় একখানা কালো রঙের মোটর এসে থামল সেখানে।

মোটর থেকে নামল একটি অল্পবয়েসী তরুণী। তার পানে চেয়ে আনন্দমোহন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, কী, মা, তুমি হঠাৎ কী মনে করে?

প্রতুলও তাঁর সঙ্গে বলে উঠল, তটিনী, তুমি হঠাৎ কেন এলে, মা?

তটিনী আনন্দমোহনের মেয়ে। বয়েস বেশি না হলেও বাপের সঙ্গে থেকে-থেকে এরই মধ্যে সে গোয়েন্দাগিরিতে বেশ পটু হয়ে উঠেছে। শানিত দৃষ্টি মেলে সে বললে, একটা খবর আছে।

সেটা কী?

কিছুক্ষণ আগে আপনারা যাকে বন্দি করেছিলেন, সে পালিয়েছে...।

চার

আনন্দমোহনের বুকের রক্ত যেন চমক খেয়ে উঠল। দৃষ্টি হল বিস্ফারিত, কণ্ঠ বিস্ময়-বিমূঢ়। বললেন, পালিয়েছে মানে? ঠিক বলছ তো?

প্রতুলও তাঁর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলে উঠল, ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী নাম তো?

কণ্ঠে জোর দিয়ে তটিনী বলল, হ্যাঁ, ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী, আপনারা যাকে একটু আগেই বন্দি হিসেবে লালবাজারে পাঠিয়েছিলেন...।

আপনমনেই আনন্দমোহন বিড়বিড় করতে লাগলেন, আচ্ছা বেকুবদের হাতে দিয়ে ভরসা করেছিলুম বটে!

প্রতুল ফস করে বলে উঠল, সে নিশ্চয়ই আমাদের আশেপাশে ঘুরছে সুযোগ খোঁজার আশায়। চলুন, লালবাজারে গিয়ে এখনই এর একটা কিছু...।

তাকে শেষ করতে না দিয়ে আনন্দমোহন বললেন, চলুন, আগে লালবাজারে তো যাই, তারপরে ভাবা যাবে কী করব না করব।

মুখে তিনি ও-কথা বললেও আসলে কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর তখন ঝড় বইতে শুরু করেছে। ত্রিবান্দম পালিয়েছে? তবে কি সত্যিই সে খুনি?

জন-যান-পূর্ণ চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে তিনি গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চললেন—গতি-সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে লাল আলোটা জ্বলে উঠল, তত্রাচ গতি তিনি স্তব্ধ করলেন না। বিপরীতমুখী দুখানা গাড়ির মাঝ দিয়ে হু-হু শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

পথচারীর দল সবিস্ময়ে সরে দাঁড়াতে লাগল, ট্র্যাফিক পুলিশ গাড়ির নম্বর টুকে নিল, অন্যান্য যানবাহনগুলোও ফুট-ঘেঁষে থেমে পড়ল; কিন্তু কোনওদিকেই তখন আনন্দমোহনের লক্ষ ছিল না। রাগে ক্ষোভে অন্তরটা মনে হল যেন তাঁর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। অনেক আশা নিয়ে ত্রিবান্দমকে তিনি বন্দি করেছিলেন, কিন্তু নিরাশ হতে হল সম্পূর্ণরূপে।

লালবাজারের ফটক দিয়ে গাড়িটা ঢুকতেই সামনে ইন্সপেক্টর কুঞ্জলালকে দেখা গেল। মনে হল, সে যেন দীর্ঘক্ষণ তাঁদেরই প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

আনন্দমোহন নামতেই সে বলল, প্রকৃত খুনিকে আমরা বন্দি করেছি। সে নিজেই এসেছে তার দোষ স্বীকার করতে।

পদোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে আনন্দমোহন কঠিন কণ্ঠে আদেশ করলেন, যাও, লোকটাকে আমার ঘরে নিয়ে এসো। পরক্ষণেই তিনি প্রতুল ও তটিনীকে সঙ্গে করে নিজের ঘরের দিকে চললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্সপেক্টর কুঞ্জলাল একটা লোককে নিয়ে এসে হাজির হল।

লোকটার বয়েস যতই হোক, চুলগুলো সব পেকে গেছে। সারা মুখখানা অসম্ভবরকম ব্রণ ভর্তি, খোঁচা-খোঁচা ভ্রূ'র তলায় চোখ দুটো এত ছোট এবং সে-চোখের দৃষ্টি এতই বীভৎস যে, তার পানে লক্ষ করলেই অতি বড় সাহসীর বুকও ক্ষণেকের জন্য অন্তত কেঁপে উঠবে।

সহজ কণ্ঠেই আনন্দমোহন তাকে প্রশ্ন করলেন, তা হলে তুমিই খুনি?

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই। আমিই তো তাকে খুন করেছি।

কথাশেষে সে এমন এক বিকৃত হাসি হাসল যে, তাতেই বেশ বোঝা যায়, বিকৃত হাসির মতো মাথাটাও তার বিকৃত।

সকৌতুকে আনন্দমোহন পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কাকে খুন করেছ?

কেন, সেই যে...সেই বুকমেকারকে।

কারণ?

কারণ, সে আমাকে প্রতারিত করেছে।

একপাশে একখানা চেয়ারে প্রতুল এতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল। লোকটার কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল, কিন্তু তোমার বন্দুকটা—বন্দুকটা কোথায়?

আমি সেটা মা পতিতপাবনীর কোলে তুলে দিয়েছি...।

প্রতুলের রসিকতাটা বুঝতে পেরে আনন্দমোহন ধমকের সুরে কুঞ্জলালের উদ্দেশে বলেন, কেন তোমরা আমায় বিরক্ত করবার জন্যে এই পাগলগুলোকে নিয়ে আস? যাও, বের করে দাও ওকে এখান থেকে।

প্রতুল কিন্তু স্বরে কোনওরকম উষ্মা প্রকাশ না করেই বলে চলল, এরা আছে বেশ! একটা লোককে খুনি হিসেবে দোষ স্বীকার করাতে এখানে পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য, আমরা যাতে ওকেই খুনি বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, আর ইতিমধ্যে বাবুরা নিজেদের কাজ গুছোতে থাকেন...।

টেবিলের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আনন্দমোহন রিসিভার কানে লাগালেন। পরক্ষণেই পকেট থেকে নোটবুক বের করে একটা ঠিকানা টুকে নিয়ে তিনি বললেন, বেশ, কাল সকালেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে দিন...।

সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রতুল জিগ্যেস করল, নতুন কিছু খবর পেলেন নাকি?

হ্যাঁ, আরও কয়েকটা বাড়িতে সিঁধ পড়েছে।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতুলের ললাটে চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল। আপনমনেই কী খানিক বিড়বিড় করে একসময় সে প্রশ্ন করল, কাল সকালে যাঁর কাছে যাবেন—তিনি কে?

বিক্রম রায়, বোধহয় নামটা শুনে থাকবেন। মুহূর্তেই প্রতুলের চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠল। মনে পড়ল, চাঁদমোহন ওই নামটাও করেছিল। তা হলে...।

আনন্দমোহন বলে চললেন, আজও সকালে তাঁর বাড়িতে কে বা কারা ঘরের জিনিসপত্তর ভেঙেচুরে তছনছ করে গেছে। আমার মনে হয়, যারা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কাকেও খুন করা। সেটা বুঝতে পেরেই ওঁরা আমাকে সেখানে প্রহরী মোতায়েন করার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

প্রতুল ভেবে পেল না কীসের সন্ধানে লোকগুলো এ-বাড়ি ও-বাড়ি সিঁধ দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তারপরই একটা করে লোক খুন করছে। তবে কি নিহতেরা তাদের কাছে ঋণী ছিল? ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় কি তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে?

কথাটা জিগ্যেস করতেই আনন্দমোহন বললেন, সেই খোঁজেই তো আমি কাল যাব। আচ্ছা, তা হলে চলি। আসছে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আনন্দমোহন বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রতুল তটিনীকে বলল, আমাদের সঙ্গে এবারে তোমাকেও একটু কাজ করতে হবে।

আগ্রহভরা কণ্ঠে তটিনী বলল, বেশ, আমাকে কাজ দিন।

আজ পর্যন্ত যাদের-যাদের বাড়িতে সিঁধ পড়ার খবর আমরা পেয়েছি, তাদের বাড়িতে একবার করে তোমাকে যেতে হবে। আমার মনে হয়, সিঁধ যারা দিচ্ছে, তাদের একটা বড় দল আছে। যদি তাই হয়, তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটা সিঁধ দেওয়ার প্রণালী একইরকম কি না।

আপনাদের তালিকার প্রথম বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিন।

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সেটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রতুল বলল, ৫৫/১ সি, ছাতাওয়ালা গলি, বৌবাজারে তিলাঞ্জলি বারুই-এর বাড়িতে তোমাকে প্রথমে যেতে হবে। মনে থাকে যেন, তুমি যাচ্ছ দৈনিক 'বিশ্বদূতে'র একজন সাংবাদিক হিসেবে—গোয়েন্দা হিসেবে নয়...।

তটিনী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, থাক, আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি বুঝে নিয়েছি।

বাকি কয়েকটা ঠিকানা দিয়ে প্রতুল বলল, আর দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়ো এখুনি।

পথে নেমে পড়ে প্রতুল একখানা ট্যাক্সি ডেকে তটিনীকে বলল, যা-যা করতে বললাম, ভুলো না যেন!

কাজ শেষ করে তটিনী যখন ফিরে এল, রাত তখন ন'টা। বলল, আপনি যা ধারণা করেছিলেন, প্রতুলবাবু, তা ভুল। সিঁধ দেওয়ার প্রণালীটা তাদের এক নয়। তারা যে একটা দলভুক্ত এ-কথাটা কোনও কাজের মধ্যেই তেমন প্রকাশ করেনি। তবে একটা জিনিস লক্ষ করলাম, কোনও বাড়িতে সিঁধের কাজটা সারা হলে সেখানে লেখা থাকছে 'ফিয়ার'। আমার যতদূর মনে হয়, ও-কথাটা লেখার মানে এই যে, তারপর ওই বাড়ির লোকটির খুন হওয়ার পালা।

তটিনীর দূরদর্শিতা দেখে প্রতুল তাকে সত্যই প্রশংসা না করে থাকতে পারল না। বলল, তোমার অনুমানটা ঠিক হয়েছে, মা। রাইমোহনের বাড়িতে এবং চাঁদমোহনের বাড়িতে ওই লেখাটা আমরা লক্ষ করেছিলাম। কিন্তু তখন আর অত মাথা ঘামিয়ে দেখিনি।

আরও সামান্য দু-চারটে কথা আলোচনা হওয়ার পর তটিনী বাড়ি ফিরে গেল, প্রতুল চলে এল তার বাসায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবেমাত্র সে শুতে যাবে, এমনসময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই বিস্ময়ে প্রতুলের চোখ দুটো অসম্ভব রকম বড় হয়ে উঠল। বলল, কে?...ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী...হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে যাও...।

ওধার থেকে স্বর ভেসে এল আমায় কোনও প্রশ্ন করবেন না, সময় আমার অল্প। আমি মিস্টার চাঁদমোহনকে খুন করিনি। তবে আমি জানি, কে করেছে। আমি পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, কেননা, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকেই অপরাধী হতে হত। আর তখন নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করে রক্ষা পাওয়া আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াত। আমি এখন যাচ্ছি আসল অপরাধীর কাছে। কাল যদি আমার সঙ্গে একবার ৯৩সি, মাধব মণ্ডল লেনে দেখা করেন, তা হলে বড় ভালো হয়। একা আসবেন, সঙ্গে কেউ যেন না থাকে। মনে রাখবেন, যেখানে যাবেন, সেটা একটা গুদোমঘর। আর ঢুকবেন আপনি সেখানে পেছনের দরজা দিয়ে...।

পরক্ষণেই ওধার থেকে ভেসে এল রিসিভার রাখার শব্দ।

রিসিভার রাখার আংটাটা বারকয়েক নেড়েও প্রতুল কোনও সাড়া পেল না। পরক্ষণেই মনটা তার সন্দেহ-দোলায় দুলতে লাগল। একবার ভাবল, হয়তো এটাও একটা ফাঁদ; তাতে তাকে জড়ানোর জন্য হয়তো

চেষ্টা চলছে। তারপর আবার ভাবল, হয়তো ত্রিবান্দম সত্যি কথাই বলছে। হয়তো পুলিশকে সে সত্যিই ভয় করে, তাই তার সামনে সে আসতে চায় না।

যাই হোক, ব্যাপারটা আনন্দমোহনকে জানিয়ে দেওয়া প্রতুল জরুরি মনে করল। তিনিই যখন এ-ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন এগুলোও জানা তাঁর একান্ত প্রয়োজন।

পুনরায় প্রতুল আনন্দমোহনের উদ্দেশে রিসিভার তুলে নিল। কথা শেষ হওয়ার পর একসময় সে সেটা নামিয়ে রেখে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল।

পরদিন সন্ধে নাগাদ প্রতুল আনন্দমোহনের কাছে গেল।

ঘটনাটা ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সুতরাং আনন্দমোহনের মেজাজটা রুক্ষ থাকাই স্বাভাবিক। প্রতুল ঘরে ঢুকতেই তিনি একবার শুধু গম্ভীরভাবে তার পানে তাকালেন।

প্রতুল প্রশ্ন করল, আর কোনও খবর আছে নাকি, আনন্দবাবু?

গম্ভীর স্বরেই আনন্দমোহন জবাব দিলেন, আছে।

কারও খুনের খবর?

না।

তবে কী?

মিস্টার বিক্রম রায় নিরুদ্দেশ। তাঁকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

পাঁচ

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আনন্দমোহন পুনরায় বলতে শুরু করলেন, আজই সকালে আমি তাঁর বাড়িতে গেছলাম। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হল—কেমন যেন মনমরা-মনমরা ভাব। গত রাত্রে বিক্রম রায়কে কারা ফোন করেছিল। তারপরই তিনি 'শিগগির ফিরব' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বাড়ির লোক সেই তাঁকে শেষ দ্যাখে।

কোথা থেকে ফোন করা হয়েছিল, আন্দাজ করতে পারলেন কিছু?

হ্যাঁ, আমার মনে হয়, বেলগাছিয়ার আশপাশে কোনও জায়গা থেকে করা হয়েছিল।

বেলগাছিয়া! —গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করেই প্রতুল আক্ষেপের সুরে বলল, আমাকে আগে যদি একবার জানাতেন, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে সেখানে পৌঁছতে পারতাম।

তার মানে?

সেই পাড়াতেই আমার এক জানাশোনা লোক আছে...।

পরক্ষণেই প্রতুল প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে বলল, কিন্তু তিনি গেলেনই-বা কোথায়? কী-ই বা তাঁর পক্ষে ঘটতে পারে?

সেটাই তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না...।

সিঁধ দেওয়ার ব্যাপার আর কিছু আপনার কানে এল?

হ্যাঁ, আরও তিনটে বাড়ির খবর পেয়েছি। সবই রাত্রে ঘটেছে।

সেই আগেকার মতোই তো? মানে—কিছুই চুরি যায়নি, অথচ...।

ঠিক আগেরগুলোর মতোই এগুলো ঘটেছে।

কোনও সূত্রও পাওয়া যায়নি?

না।

ত্রিবান্দমের আর কোনও খবর পেলেন?

মাথা নেড়ে আনন্দমোহন জবাব দিলেন, না। তবে এবারে যে-ফাঁদ পাতার মতলব মনে-মনে এঁটে রেখেছি, তাতে আমি জোর করে বলতে পারি, আর সাতদিনের মধ্যে আমি এ-ব্যাপারের একটা কিছু কিনারা করতে পারব।

মতলবটা কী?

পরে শুনবেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতুল বলল, তা হলে আমি এখন চললুম। পরে দেখা করব আবার।

পথে নেমে আসতেই তটিনীর সঙ্গে তার দেখা হল।

তটিনী বলল, আমি মিস্টার বিক্রমের খোঁজ দিতে পারি আপনাকে। কাল তাঁর বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বেরোতেই তাঁর মুখখানা দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়। তাই তাঁর পিছু নিয়েছিলাম।

কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলে?

গেলাম বেলগাছিয়া অবধি। খালের এপারে মাধব মণ্ডল লেন...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, ৯৩সি, মাধব মণ্ডল লেনে একটা গুদোমঘর, তাই তো?

সবিস্ময়ে তটিনী বলে উঠল, আপনি জানলেন কী করে, প্রতুলবাবু?

জেনেছি কোথাও থেকে নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি তাঁকে চিনলে কী করে?

চিনতাম আগেই। 'দৈনন্দিন' সংবাদপত্র অফিসের তিনি ম্যানেজার। কাগজে একবার তাঁর ছবি দেখেছিলাম।

তা হলে এখন আমি চলি।

কোথায়?

বেলগাছিয়া।

আমিও কেন আপনার সঙ্গে যাই না?

না। তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

কথাশেষে প্রতুল আর একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

আর. জি. কর রোডের ডানদিক থেকে মাধব মণ্ডল লেনটা বেরিয়ে সোজা গিয়ে মিশেছে খাল-পাড়ে। পূতিগন্ধময় অপরিচ্ছন্ন গলিটার দু-পাশে সারি-সারি ক'টা গুদোমঘর—কোনওটা কাঠের, কোনওটা টিনের কোনওটা-বা লোহার।

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি থেকে প্রতুল যখন নামল, তখন সেখানে জনপ্রাণী বলতে কেউই নেই। একে গলিটা সরু, তার ওপর আবার নোংরা।

সারা গলিটা প্রতুল প্রথমে একবার ঘুরে নিল। আশপাশে যদিও দু-একখানা দ্বিতল কোঠা আছে, তাও আবার সেগুলো অন্ধকারে নিঝুম হয়ে রয়েছে। দূরে-দূরে যে-গ্যাসপোস্টগুলো আছে, তার মৃদু আলোটুকু যেন সেখানকার নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর রহস্যময় করে তুলেছে।

পরপর ক'টা নম্বর দেখতে-দেখতে একসময় প্রতুল '৯৩সি' গুদোমখানা দেখতে পেল। দেখেই তার মনে হল, এ-গলিটার ভেতরে যতগুলো বাড়ি ও গুদোম আছে, বয়েসের দিক দিয়ে বোধহয় এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং বয়েসের ভারেই যেন মনে হল একপাশে হেলে পড়েছে। জানলাগুলো পাল্লাহীন, দরজাটার অবস্থাও প্রায় সেইরকম। বায়ু-চলাচলের পথটুকুও নেই। যত রাজ্যের মাকড়সা সেখানে নির্বিচারে জাল বুনে রেখেছে।

সামনের দরজাটার কাছে এসে সে দেখল, দেওয়ালে লেখা রয়েছে : ভাড়া দেওয়া হইবে।

এইসময় মনে পড়ল প্রতুলের, ত্রিবান্দম বলেছিল পিছনের পথ দিয়ে ঢুকতে।

চারদিকটায় একবার সে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর ওপাশের কোণের দিকে টিন, কাঠ, রাশীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে সে একটা দরজা আবিষ্কার করল এবং পরক্ষণেই দেশলাইয়ের একটা কাঠির মৃদু আলোকে কোনওরকমে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা আরও অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিস পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। চারধারে কেমন একটা গুমোট গন্ধ। তারই মধ্যে প্রতুল কোনওরকমে হাতড়াতে-হাতড়াতে এগিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শব্দটা কীসের? কোনও মানুষের পদধ্বনি, না আর কিছুর?

দেশলাইয়ের আর একটা কাঠি জ্বালল সে। কিন্তু তার ভাগ্য আজ এমনই বিমুখ যে, সেটিও হঠাৎ গেল নিভে।

মনে-মনে কিন্তু প্রতুল তখন ভাবছিল, যদি ত্রিবান্দমই এ-রহস্যের প্রকৃত হোতা হয়, তা হলে আজ আর তাকে যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না—এটা ঠিক...।

সহসা কাদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্সপেক্টরকে ফোন করে দাও, আর এর ভার তারই কাঁধে চাপিয়ে দাও। সে-ই এর প্রতিকার করবে।

কণ্ঠস্বরটার উদ্দেশে প্রতুল চারদিকটায় কান পাততে লাগল। কোন দিক থেকে স্বরটা ভেসে আসছে? কে-ই-বা কথা বলছে? ত্রিবান্দম? তা হলে...।

পর মুহূর্তেই চিন্তাস্রোতটা তার ভিন্নমুখী হল। কিন্তু মিস্টার বিক্রমের ব্যাপার কী? তিনি কোথায়?

এলোমেলোভাবে নানা কথা চিন্তা করতে-করতে প্রতুল এগোতে লাগল। হঠাৎ সামনে কিসে ধাক্কা খেতেই অনুভব করে সে বুঝল, একটা দরজা। ধীরে-ধীরে সেটা খুলে ফেলে সে লঘু সন্তর্পিত পদে পূর্বের মতো ভেতরে এগোতে লাগল। কিন্তু সেখানটা তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। আলো নেই বটে, তবে কোথা থেকে যেন অল্প একটু আলোর আভা এসে পড়েছে।

আরও দু-এক পা অগ্রসর হতেই সহসা তার নজরে পড়ল, হাতকয়েক দূরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বসে রয়েছে।

হয়তো ত্রিবান্দম। প্রতুল ধীর কণ্ঠে তাকে ডাকল, কিন্তু কোনও সাড়াই এল না।

পকেট থেকে আর-একবার দেশলাইটা বের করে সে একটা কাঠি জ্বালল। কিন্তু দূরের মানুষটাকে তেমন চেনা গেল না। আবছা মতো শুধু দেহটাই চোখে পড়ল।

চোখে না পড়লেও সে ত্রিবান্দম—মনে-মনে ভেবে নিয়ে প্রতুল তার কাছে এগিয়ে গেল। বার দুই ডাকার পরও যখন সে সাড়া পেল না, তখন আপনমনেই সে গর্জন করতে লাগল, ঘুমোনো হচ্ছে বাবুর, এদিকে...।

আর-একটা কাঠি জ্বালতেই প্রতুল বিস্ময়ের এক অব্যক্ত ধ্বনি করে উঠল। এতক্ষণ যাকে সে মানুষ ভেবেছিল, সে মানুষই, তবে মৃত। একেও ছুরি মারা হয়েছে। তার সমস্ত জামা-কাপড় তাজা রক্তে জমাট বেঁধে গিয়েছে।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কেটে গেলে প্রতুল লোকটিকে চেনার উদ্দেশে মুখ বাড়াতেই কোথা থেকে একঝলক বাতাস এসে কাঠিটাকে দিল নিভিয়ে।

ছয়

চিন্তাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে হাতড়াতে-হাতড়াতে প্রতুল কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে এল। আনন্দমোহনকে একটা ফোন করতে হবে। কিন্তু ফোন পাওয়া যায় কোথায়?

মনে পড়ল বন্ধু লোকেশের কথা। সম্প্রতি সে একটা ফোন নিয়েছে বটে! দ্রুতপদে প্রতুল বড় রাস্তার মোড়ে একখানা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকেশ তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডেকে তুলতে তাকে অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হল না।

আনন্দমোহন তখন লালবাজারেই ছিলেন। তাঁকে সব খবরটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে প্রতুল বলল, আপনি চলে আসুন এখুনি...।

ওধার থেকে স্বর ভেসে এল আমি এখুনি যাচ্ছি লোক সঙ্গে নিয়ে...।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই লোকেশ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিয়ে প্রতুল বলে উঠল, এখন আর একমিনিটও দাঁড়ানোর সময় নেই ভাই, পরে একদিন এসে গল্পসল্প করব'খন।

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতুল পুনরায় গলিটার ভেতরে এসে দাঁড়াল। মাথার মধ্যে তখন তার রাশি-রাশি চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। কে খুন হল? ত্রিবান্দম, না আর কেউ? ত্রিবান্দম কী জন্য তাকে সেখানে আসতে বলেছিল? তাকে বন্দি করার জন্য নয়তো?

পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে সে একটা সিগারেট নিল। পরক্ষণেই দেশলাইটা বের করতে গিয়ে তার মনে পড়ল, সেটা সে ফেলে এসেছে ভেতরে।

এর জন্য প্রতুল মনে-মনে নিজেকে অভিসম্পাত করতে লাগল। কিন্তু আনন্দমোহন আসছেন না কেন এখনও? আধঘণ্টার ওপর সময় বয়ে গেল, অথচ তাঁর দেখা নেই কেন? পথে কোনও বিপদ-আপদ...।

মোড়ের মাথায় অকস্মাৎ পুলিশ-ভ্যানের অত্যুজ্জ্বল হেডলাইট চোখে পড়তেই প্রতুলের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। তা হলে তিনি এসে গেছেন!

গাড়িটা এসে থামল প্রতুলেরই প্রায় দু-হাত আগে। ব্যস্তসমস্তভাবে আনন্দমোহন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে এল জন-দুই পুলিশ ও একজন সার্জেন্ট।

আনন্দমোহন প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কী, প্রতুলবাবু? এটাও কি সেই 'স্ট্যাবিং'-এর ব্যাপার নাকি?

ঘাড় নেড়ে প্রতুল জবাব দিল, ঠিক তাই।

প্রহরী তিনজনের দুজনকে আনন্দমোহন বললেন, তোমরা এদিকটায় পাহারা দাও, কেউ যেন পালিয়ে না যায়। —পরে তৃতীয়জনকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি পিছনদিকে যাও। ওদিকটায় একটু ভালো করে লক্ষ রেখো। ওদিক দিয়ে পালানোই বেশি সম্ভব।

পরমুহূর্তেই তিনি সামনের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রতুল বলল, ওদিক দিয়ে নয়। ওপাশে আর-একটা পথ...।

'ভাড়া দেওয়া হইবে' লেখাটা নজরে পড়তেই আনন্দমোহন বললেন, এটা তো দেখে মনে হচ্ছে, মান্ধাতার আমল থেকে টাঙানো রয়েছে।

প্রতুল কোনও মন্তব্য করল না। তাঁকে সঙ্গে করে সে জঞ্জালের ধারে ঢোকার পথটায় এসে দাঁড়াল।

পকেট থেকে টর্চ বের করে আনন্দমোহন বললেন, ভেতরে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন নাকি আপনি?

না, কাউকে দেখতে পাইনি, তবে কার যেন কথা শুনতে পেয়েছিলাম। স্বরটা কার—সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ধীরে-ধীরে আনন্দমোহন অগ্রসর হতে-হতে অকস্মাৎ কীসে একটা হোঁচট খেতেই তাঁর হাতের টর্চটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

হাতড়ে-হাতড়ে সেটাকে তুলে প্রতুল দেখল, সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ডুমটা পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আপশোসের সঙ্গে আনন্দমোহন বলে উঠলেন, যাঃ, তা হলে উপায়? আপনার কাছে দেশলাই আছে?

সেটা আমি ভেতরে ফেলে এসেছি।

অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে তারা স্খলিত চরণে অগ্রসর হতে লাগল। চারদিকে যেমনই গাঢ় অন্ধকার, তেমনই প্রগাঢ় স্তব্ধতা।

অকস্মাৎ আনন্দমোহন বলে উঠলেন, আছে, আছে, আমার পকেটেই দেশলাই আছে। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম! পকেট থেকে তিনি দেশলাইটা বের করে একটা কাঠি জ্বাললেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর বারুদের শিখাটা তাদের কাছে মনে হল যেন বিদ্যুতের আলো।

কিন্তু তা কতক্ষণের জন্যই বা! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটা গেল নিভে।

কাঠির পর কাঠি জ্বালাতে-জ্বালাতে তারা সতর্ক দৃষ্টি আর উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে ক্রমশ ভেতরে ঢুকতে লাগল।

এবারও কথা কইলেন আনন্দমোহন। বললেন, আর কতটা, প্রতুলবাবু...?

অদূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রতুল বলে উঠল, ওই যে—ওই দেখুন লাশটা...।

পকেট থেকে রুমালখানা বের করে আনন্দমোহন প্রথমে সেটা সলতের মতো পাকালেন। তারপর আলোটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে বলে তার একটা মুখে অগ্নিসংযোগ করে তিনি তীক্ষ্ন দৃষ্টি একবার মৃতদেহের ওপর ফেললেন। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময়ের একটা বিচিত্র ধ্বনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দুটোও মনে হল যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। তেমনি স্বরেই তিনি বলে উঠলেন, এ যে বিক্রম রায়ের মৃতদেহ!

প্রতুলও তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তুলে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, বিক্রম রায়! তা হলে তটিনীর কথা মিথ্যে নয় দেখছি!

প্রতুলের পানে ফিরে আনন্দমোহন বললেন, তটিনী? সে কি এখানে এসেছিল নাকি?

হ্যাঁ, কাল রাত্রে বিক্রম রায় বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই তটিনী তাঁকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত এসেছিল...।

সে তো আমাকে জানায়নি কিছু...।

না, সে জানায়নি। তার কারণ এই যে, সে আপনাকে রীতিমতো ভয় করে চলে। অত রাত্রে অনুসরণ করেছে জানলে পাছে আপনি রাগ করেন, তাই সে জানায়নি।

অতঃপর আনন্দমোহন শুরু করলেন অনুসন্ধান। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর তীক্ষ্ন হলেও আলো না থাকাতে কিছুই ধরা পড়ল না। তবু যথাসম্ভব তিনি চারদিকটা দেখে নিলেন। নাঃ, কেউ নেই কোথাও। কাজ শেষ করে বোধকরি বহুক্ষণ আগেই সরে পড়েছে।

প্রতুল তখন প্রকৃত হত্যাকারীর চিন্তায় মগ্ন। সত্যিই কি ত্রিবান্দম হত্যাকারী? কেন সে এখানে আসার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চোখের সামনে মৃতদেহ ফেলে রেখে সরে পড়ল? এ-ও কি তবে তার আর-একটা কৌশল?

সাত

একান্ত নিরাশ মনে আনন্দমোহন বাইরে বেরিয়ে এলেন। পুলিশ দুজনকে ডেকে বললেন, তোমরা ভেতরে ঢুকে লাশটা বের করে নিয়ে এসে মর্গে চালান দাও। তার আগে একবার আলো নিয়ে চারদিকটা ভালো করে খুঁজে দ্যাখো। জিনিসপত্তর যা আছে নিয়ে আসবে। যদি কারও হাতের ছাপ...।

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে প্রতুল বলল, আপনার কি মনে হয়, এ-খুনটার সঙ্গেও ত্রিবান্দম জড়িত আছে?

ঠিক তাই। সে-ই যে প্রকৃত খুনি—এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।

তা হলে সে আমায় ওইভাবে ফোন করেছিল কেন?

উদ্দেশ্যটা তার মহৎ ছিল না নিশ্চয়ই। ভেবেছিল, আপনাকেও যদি এ-জগৎ থেকে সরাতে পারে...।

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সে কি ভেবেছে যে, আমি এতই বোকা? আর আমাকে ওই ধরনের ফোন করে ডেকে নিয়ে এসে খুন করার কথা ভাবা যে কতখানি মূর্খামি—আপনি কি বলতে চান, সে তা বোঝে না?

গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আনন্দমোহন বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাই গোড়া থেকে কেমন যেন গোলমেলে। কিছুই...।

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রতুলের পানে তাকিয়ে তিনি বললেন, আসবেন নাকি আমার সঙ্গে?

না, আমাকে আর-একটা কাজ সারতে হবে। আপনি চলে যান।

আনন্দমোহনের গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতেই প্রতুল একখানা ট্যাক্সি ডাকল। তারপর ড্রাইভারকে আদেশ দিল, সোজা বাড়ির পথে যাওয়ার জন্যে।

বাড়ি ফিরে প্রতুল দেখল, তটিনী তারই প্রতীক্ষায় বসে।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রতুল বলল, মিস্টার বিক্রম রায় খুন হয়েছেন।

তটিনী যেন আকাশ থেকে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, খুন হয়েছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু কে করেছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্রিবান্দম ভাণ্ডারীকে কি...?

প্রতুল তার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ত্রিবান্দম লোকটাকে আমার তিলমাত্র সন্দেহ হয় না। তোমার বাবা কিন্তু বলছেন, প্রকৃত হত্যাকারী ও-ই।

আপনি তার দেখা পেয়েছিলেন?

না, ওখানে দেখা পাইনি। বুঝতে পারলুম না, কী কারণে সে আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল। যদি মিস্টার বিক্রমের মৃতদেহ দেখানোর জন্যেই হয়...।

টেবিলের ওপর ফোনটা বেজে উঠতেই তার কথায় ছেদ পড়ে গেল অকস্মাৎই। রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রতুল কানে লাগাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখখানা তার এক অজানিত কারণে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বলল, কে, ত্রিবান্দম! কী খবর?

ওধার থেকে স্বর ভেসে এল হ্যাঁ, আমি ত্রিবান্দম ভাণ্ডারী কথা বলছি। আপনি নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব চটে গেছেন? অবশ্য যাওয়ারই কথা। কিন্তু কী করব বলুন, এমন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি পড়েছি যে, কোনও কাজ স্থিরভাবে করতে পারছি না।

এক লহমার জন্য চুপ করে ত্রিবান্দম পুনরায় বলল, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। অত্যন্ত জরুরি কতকগুলো কথা আছে। আপনি একবার দয়া করে...।

ঝাঁঝালো স্বরে প্রতুল বলে উঠল, আমি তোমার চাকর নই। আর কোথাও আমি যেতেও পারব না। কী এমন জরুরি দরকার, শুনি?

সেটা আপনার সাক্ষাতেই বলব। কিন্তু...।

তা হলে আমার বাড়িতে চলে এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব'খন।

দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি পুলিশের চোখে আমি এখন অপরাধী। তাই...।

মুহূর্তের জন্য কী একটা ভেবে নিয়ে প্রতুল বাধা দিয়ে বলে উঠল, না, না, তোমার কোনও ভয় নেই। নিঃসন্দেহে তুমি আসতে পারো।

বেশ, তাই যাচ্ছি।

পরস্পরের কথা শেষ হতেই প্রতুল রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

আট

কয়েকমিনিট চুপ করে থাকার পর কী একটা ভেবে নিয়ে তটিনী বলল, আপনি কি ত্রিবান্দমকে পুলিশের হাতে দিতে চান নাকি, প্রতুলবাবু?

পরিহাস-তরল কণ্ঠে প্রতুল বলল, তা হলে তো আমাদের দেশের সব ক'জন সিদ্ধ মহাপুরুষকেও ফাটকে পুরতে হয়।

তার মানে? আপনি কি ত্রিবান্দমকে একেবারেই সিদ্ধ মহাপুরুষের পর্যায়ে ফেলতে চান?

না, তা ফেলতে চাই না, তবে এ-ব্যাপারে সে যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কতক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। চারদিকে বিরাজ করতে লাগল একটা শ্বাসরোধকারী কুশ্রী নীরবতা। দেওয়ালে বিলম্বিত বড় ঘড়িটা শুধু অবিরাম টিকটিক শব্দ করে চলেছে।

অকস্মাৎ দ্বারপথে কলিং বেলটা সজোরে বেজে উঠতেই প্রতুল চকিত হয়ে উঠল। দ্রুতপদে এসে সে দরজাটা খুলতেই দেখে ত্রিবান্দম দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে তার মুখ-চোখের! মনে হয় যেন, এরই মধ্যে তার দেহের এবং মনের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। চুলগুলো বিশৃঙ্খল, দেহটা পরিশ্রান্ত, মুখখানা মলিন।

প্রতুল তাকে ভেতরে ডেকে আনল।

চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ তটিনীর ওপর নজর পড়তেই ত্রিবান্দম প্রতুলের পানে ফিরে বলে উঠল, আপনার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। তাই বলছিলাম কি, যদি দয়া করে...।

কথাটা সে শেষ না করে তটিনীর পানে ধীরে-ধীরে মুখখানা ফেরাল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে প্রতুল মৃদু হেসে বলল, তোমার কোনও ভয় নেই। এ হচ্ছে আমার ঘরের লোক। নির্ভয়ে তুমি এর সামনে তোমার বক্তব্য বলে যেতে পারো।

কথাশেষে সে দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাওয়ার উপক্রম করতেই ত্রিবান্দম বাধা দিয়ে বলল, না, না, বন্ধ করবেন না, দরজাটা খোলাই থাক।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রতুল প্রশ্ন করল, কেন বলো তো?

কেন, তা বলতে পারব না। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন।

তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে না পেরে একখানা চেয়ারে বসে প্রতুল নিজের পকেটের ভেতর হাত ভরে রইল। স্পর্শে দেখে নিল, পিস্তলটা ঠিক আছে কি না। তারপর বলল, এবার বলো, তোমার যা বলবার আছে। — পরক্ষণেই সে টেবিলের ওপর সিগারেট কেসটা দেখিয়ে বলল, খাও নাকি?...না, না, লজ্জা করবার কিছু...।

না, দয়া করে আমাকে আমার বক্তব্য বলতে দিন। দেরি করলে হয়তো আমারও প্রাণটা তারা...।

তারা? তারা কারা?

তা ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, আমার পেছন-পেছন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক সে-কথা। এখন কথা হচ্ছে এই যে, পুলিশের হাত থেকে আমার পালিয়ে আসার সংবাদ বোধহয় আপনি জানেন?

গম্ভীর স্বরে প্রতুল বলল, জানি।

প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় পুলিশ-ভ্যানে উঠতে গিয়ে হঠাৎ আমার একটা লোককে স্মরণ হল। আমাদের অফিসে লোকটা নিয়মিত আসত না বটে, তবে আমার সন্দেহ হয়েছিল ওরই ওপর। চাঁদমোহন খুন হওয়ার দিন সে এসেছিল। প্রহরীদের বললাম, আমি একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে আনন্দমোহনের আদেশ নিয়ে ছুটি চাই। তারা তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। তখন বাধ্য হয়েই আমি তাদের গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে এলাম।

তারপর কী করলে?

যে-লোকটার কথা বললাম আপনাকে—তারই উদ্দেশে আমি ফকির সরকার লেনে যাই। সেখানেই সে থাকে। তার বাড়িখানা খুঁজে বের করে আমি একটা জানলার আড়ালে লুকিয়ে থাকি। হঠাৎ আমার কানে এল, সামনের ঘর থেকে সেই লোকটার গলার স্বর। সে আর-একজনকে হিন্দি ভাষায় বলছে, 'খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। যে-কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আমি রাইমোহনকে খুন করেছি, এবার পালা বিক্রমের। তাকে কাল একবার আমাদের মাধব মণ্ডল লেনের গুদোমে রাত্রি ন'টার সময় দেখা করতে বলেছি। কারণ, ওই ঘরটাই তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা।' তারপর তাদের আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝলাম, তারা এবার বেরোবে। তাই আমিও সরে পড়লাম সেখান থেকে।

মুহূর্তের জন্য থেমে ত্রিবান্দম বলে চলল, তখন প্রথমেই আমার মনে হল, লালবাজারে একটা খবর দিই। কিন্তু আমার কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন কি না—সন্দেহটা মনে জাগতেই ভাবলাম, আগে একবার মাধব মণ্ডল লেনে গুদোমঘরটা দেখে আসি। তাতে হয়তো আপনাদের সাহায্য করা আমার পক্ষে অনেকটা সহজ হবে। আমি গুদোমঘরটা খুঁজে বের করলাম। তারপর আপনাকে ফোন করি।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রতুল প্রশ্ন করল, তারপর?

তারপর আমি রাত্রে বাড়ি না ফিরে পথেই কাটালুম। আজও তাই কেটেছে। রাত ন'টার সময় কথামতো গুদোমঘরে গিয়ে দেখি, মিস্টার বিক্রম রায়কে শয়তানরা খুন করে রেখেছে। তারপর কী ঘটল না-ঘটল, আমি জানি না। আপনি হয়তো ভাবছেন, স্যার, আমি নিজের দোষ ঢাকার জন্যে সব মিথ্যে বলছি। কিন্তু না, আমার কথা বিশ্বাস করুন...।

হঠাৎ কী মনে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কাল খুনিদের ঠিকানাটা বের করেছি। আপনার যদি কাজে লাগে, আমি জানাতে পারি। আনন্দবাবুকে বললে হয়তো...।

বাধা দিয়ে প্রতুল আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে উঠল, বলো—বলো ঠিকানাটা কী...

ত্রিবান্দমের চোখ দুটো এক অজানা আশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। খুশিভরা কণ্ঠে বলল, তার ঠিকানা হচ্ছে...।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরের মধ্যে একটা 'সোঁ' করে কীসের শব্দ উঠল। পরক্ষণেই দেখা গেল, যন্ত্রণার একটা অস্ফুট ধ্বনি করে ত্রিবান্দম লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

বিস্ময়-চকিত হয়ে প্রতুল তার পানে ঝুঁকে পড়তেই দেখল, তীক্ষ্নধার একখানা ছোরা তার বাঁ-দিকের ফুসফুসের ওপর প্রোথিত। ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল ধারায় রক্তস্রোত নির্গত হয়ে জামাটাকে সিক্ত করে তুলছে।

প্রতুল আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে হত্যাকারীর উদ্দেশে দ্রুতপদে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অদূরে সিঁড়ির গোড়ায় একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েই সে ছুটে গেল সেদিকে। ছায়ামূর্তিটিই নিশ্চয় হত্যাকারী।

অগ্রবর্তী লোকটিও পিছনে পদশব্দ শুনে তীরের বেগে ছুটতে লাগল। প্রথমে একতলায়, পরে সবেগে সে রাস্তায় গিয়ে পড়ল!

প্রতুলও নাছোড়াবান্দা। হিংস্র জানোয়ার যেমন তার শিকারের পিছনে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে থাকে, সে-ও সেইরকম লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু তবু মনে হল, মাঝের ব্যবধানটা তাদের যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

গভীর রাত। পথ জনবিরল। গাড়িঘোড়াও তেমন নেই। তাই ফাঁকা পথ পেয়ে তারা উভয়েই ছুটে চলল—জোরে—আরও জোরে।

অকস্মাৎ পথের ওপর অন্ধকারে কীসে একটা হোঁচট খেতেই অগ্রবর্তী লোকটা সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এই অবসরে প্রতুলও তার কাছে এসে সজোরে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল তার কাঁধে।

কিন্তু লোকটি তার আগেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। লোহার একখানা বিমে ধাক্কা খেয়ে সে এমনভাবে পড়েছে যে, তার কপালটা অনেকখানি কেটে গেছে।

আরও একটু ঝুঁকে পড়তেই প্রতুল ভাবল, অনতিবিলম্বেই তাকে হাসপাতালে পাঠানো প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে এধার-ওধার থেকে লোক ছুটে এল। নানাজনের নানা মত সেখানকার নীরব আবহাওয়াটুকু কয়েকমিনিটের মধ্যেই সরগরম করে তুলল।

পিছন ফিরে প্রতুল দেখল, তটিনীও ছুটে আসছে। কাছে আসতেই সে বলল, একে এখুনি অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। তুমি একবার খবর দাও।

নিকটস্থ একটা ডাক্তারখানা থেকে ফোনে হাসপাতালে খবরটা পৌঁছে দিয়ে তটিনী এসে দাঁড়াতেই প্রতুল বলল, তোমার বাবাকে একবার খবরটা দিতে হবে।

তটিনী বলল, দিচ্ছি, কিন্তু আগে এদিককার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাক।

মিনিটদশেকের মধ্যেই একখানা অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হল। স্থানীয় থানা থেকে খবর পেয়ে দারোগাও ছুটে এল। এসেই শুরু করল তদন্ত। পথচারীর মন্তব্যে সে প্রতুলকেই দোষী সাব্যস্ত করে থানায় নিয়ে যেতে চাইল।

মৃদু হেসে প্রতুল এগিয়ে যেতেই তটিনী বলে উঠল, আপনি কি চললেন নাকি, প্রতুলবাবু?

গভীর বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়-বড় করে দারোগাটি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, প্রতুলবাবু? মানে প্রতুল লাহিড়ী? বাংলার...।

তাকে শেষ করতে না দিয়ে তটিনী বলে উঠল, হ্যাঁ, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী।

জিব কেটে সলজ্জ কণ্ঠে দারোগাটি কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে প্রতুল তাকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে কীসব বলে দিল। তারপর পুনরায় অচৈতন্য লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল।

স্ট্রেচারে করে লোকটিকে গাড়িতে তোলা হলে দারোগাটি অর্থপূর্ণ হাসি হেসে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল।

তটিনী বলল, এবার আমি চললুম বাবাকে খবরটা দিতে। আপনি যা হয় এদিককার একটা ব্যবস্থা করুন।

সে চলে যেতেই প্রতুল বাসায় ফিরে এল। ত্রিবান্দমের দেহটা তখনও মনে হল যেন কাঁপছে। ছুটে গিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়তেই প্রতুল দেখল, ওষ্ঠপ্রান্তটা তার বারেকের জন্য কেঁপে উঠেই চিরতরে স্থির হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পরও যখন তটিনী কিংবা আনন্দমোহন কেউই এলেন না, প্রতুল তখন রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠল।

টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে সে কানে লাগাল। একটু পরেই বলতে শুরু করল, কে? আনন্দবাবু? ...হ্যাঁ, আমি প্রতুল কথা বলছি। ...কী বললেন, তটিনী যায়নি আপনার কাছে?

সংক্ষেপে এদিককার ঘটনাটা বর্ণনা করে প্রতুল বলল, আপনি তা হলে এখুনি একবার আসুন।

আনন্দমোহন আসতেই সে সমস্ত ঘটনাটা বিশদভাবে বর্ণনা করে পরিশেষে বলল, আমি তো তটিনীকে পাঠালুম আপনার কাছে! বুঝতে পারলুম না ঠিক...।

হয়তো পথে কোথাও আটকে পড়েছে। ভাববার কিছু নেই। কিন্তু আপনি খুনির কী ব্যবস্থা করছেন?

মৃদু হেসে প্রতুল বলল, আগে বেচারা একটু সামলে নিক, তারপর...।

ত্রিবান্দমের দেহটা নজরে পড়তেই সে বলে উঠল, এর ব্যবস্থাটা আপনাকেই করতে হবে। আমাকে এখুনি একবার যেতে হবে হাসপাতালে।

নয়

পরদিন সকালে চায়ের পেয়ালায় সবেমাত্র প্রতুল চুমুক দিয়েছে, এমনসময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে আনন্দমোহন তার ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, এদিকে বিপদ, প্রতুলবাবু!

আবার কী হল?

তটিনী কাল থেকে এখনও ফেরেনি।

বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে প্রতুল বলল, এখনও ফেরেনি? কোনও খোঁজখবর নিয়েছেন কি?

কোথায় আর নেব! আজ এখুনি একটা চিঠি পেয়েছি।—কথাশেষে একখানা কাগজ আনন্দমোহন প্রতুলের হাতে দিলেন।

প্রতুল সেখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল :

> *শ্রীচরণেষু—*
>
> *বাবা, আপনারা হাসপাতালে যে-লোকটিকে বন্দি করেছেন, তাকে ছেড়ে দিন। নইলে এরা আমাকে বন্দি করে রেখেছে —ছাড়বে না।*
>
> *তটিনী*

পড়া শেষ হতেই প্রতুলের চোখ দুটো ক্রোধে যেন জ্বলে উঠল। বলল, শয়তানরা দেখছি বাঘের ঘরে ঘোগ হয়ে ঢুকতে চায়! পরক্ষণেই নিম্নকণ্ঠে সে বলল, তাহলে কী করা যায় বলুন তো? তটিনী তো কোনওরকম ঠিকানাও দেয়নি...।

আনন্দমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় একজন লোক ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রতুলের পানে তাকিয়ে সে বলল, আপনি আপনার রুগিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন?

তার মানে? আমরা তো কিছুই জানি না?

তা হলে সে পালিয়ে গেছে। তার মাথায় আঘাত তেমন লাগেনি, তাই ভোরে উঠেই পালাতে পেরেছে।

লোকটির শেষের কথাগুলোয় প্রতুলের মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। আনন্দমোহনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বলল, ঠিক এইটাই আমি ধারণা করেছিলুম। যাক, চলুন একবার হাসপাতালে। দেখা যাক, কীভাবে পালালেন মহাপ্রভু।

হাসপাতালে এসে তারা জানল, ভোরবেলাতেই লোকটা পালিয়েছে। সকল রুগি তখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, নার্সরা যখন সবেমাত্র কিছুক্ষণের জন্য পাশের রুমে গেছে, সেই অবসরে সে তার জামা-জুতো নিয়ে সরে পড়েছে।

কতক্ষণ নীরব থেকে একসময় প্রতুল বলল, আনন্দবাবু, আপনি জনকয়েক পুলিশ আর সার্জেন্টের ব্যবস্থা করুন। আমি লোকটিকে আজই ধরব।

সবিস্ময়ে আনন্দমোহন প্রশ্ন করলেন, আপনি তার সন্ধান পাবেন কী করে?

সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি।

বাক্যালাপে সময় নষ্ট না করে আনন্দমোহন আধঘণ্টার মধ্যেই প্রতুলের কথামতো জনআষ্টেক সশস্ত্র পুলিশ আর জনছ'য়েক সার্জেন্টকে তার সামনে হাজির করলেন। বললেন, এবার কী করবেন, করুন।

সন্ধানী দৃষ্টিটা একবার হাসপাতালের চারধারে বুলিয়ে নিয়ে পিছন দিকের একটা পথ দিয়ে প্রতুল তাদের সঙ্গে করে যাত্রা করল।

এখনকার পদক্ষেপটা প্রতুলের অন্য সময়ের পথ-চলা থেকে যেন একটু স্বতন্ত্র। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা যেমন ট্রেন ফেল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কোনওদিকে না তাকিয়ে সজোরে পা চালাতে থাকে মাঝে-মাঝে প্রতুল ঠিক তাদের মতো চলতে লাগল। আবার কখনও এমনভাবে গতিটা সে কমিয়ে দিল—যাতে মনে হয়, দুনিয়ায় তাগিদ বলতে যেন তার আর কিছুই নেই।

পিছনে হাত পঞ্চাশেক ব্যবধানে সদলবলে আনন্দমোহন তার গতি লক্ষ করে এমন বিস্মিত ও বিরক্ত হচ্ছিলেন যে, যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর পক্ষে ফিরে যাওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

গলির পর গলি পার হয়ে প্রতুল কিন্তু সমানেই এগিয়ে চলল। দৃষ্টিটা মাঝে-মাঝে পথের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, আবার কখনও আশপাশের বাড়িগুলোর প্রতি শ্যেনের মতো গিয়ে পড়ছে।

চিন্তিত মস্তিষ্কে কতক্ষণ পার হয়ে আসার পর একসময় খিদিরপুরের একখানা দোতলা বাড়ির সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে পুলিশ ও সার্জেন্টদের সারা বাড়িখানা ঘিরে ফেলার আদেশ দিয়ে সে আনন্দমোহনের সঙ্গে ফটকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, এই বাড়িতে ঢুকেছেন মহাপ্রভু।

সবিস্ময়ে আনন্দমোহন বললেন, এই বাড়িতে? আপনি কি আগেই জানতেন নাকি?

আগে জানতাম না, এখন জানলাম। যাক ও-কথা, এখন ভেতরে আসুন।

লঘু সন্তর্পিত পদে তারা ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর উঠল দ্বিতলে। বারান্দার একেবারে শেষের ঘরখানার সামনে প্রতুল মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়েই ভেজানো দরজাটা চট করে খুলে দিল।

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসেছিল যে-দুটি লোক, মুহূর্তেই মনে হল, যেন তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন—মাথায় যার ব্যান্ডেজ বাঁধা, তাকে উদ্দেশ করে প্রতুল বলল, আপনি হঠাৎ হাসপাতাল থেকে চলে এলেন কেন?

লোকটি বাধা দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু আপনারা এখানে এলেন কী করে? এ-বাড়িই বা চিনলেন কেমন করে?

কথাশেষে সে দ্বিতীয় লোকটিকে ইশারায় কী বলে দিতেই লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, যাবেন না, আপনিও এখানে দাঁড়ান...।

প্রথম লোকটি এইসময়ে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল। প্রতুলের পানে সেটা উদ্যত করে বলল, ওকে বাধা দেওয়ার আপনি কে? ছেড়ে দিন, নইলে...।

নইলে কী করবে?

এখুনি গুলি করে মারব। আপনি কার হুকুমে এ-বাড়িতে ঢুকেছেন?

তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও দেখি। তটিনী কোথায়?

দ্বিতীয় লোকটি সহসা টেবিলের পাশে সরে এসে গুরুভার একটা বস্তু প্রতুলের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করল।

প্রতুল যেন এ-মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। চকিতে এক-পা সরে দাঁড়িয়ে সে তার জবাব দিল পিস্তলের গুলিতে।

অব্যর্থ লক্ষ্য। পরক্ষণেই দেখা গেল, লোকটি ডানহাতখানা বাঁহাত দিয়ে চেপে ধরেছে।

প্রথম লোকটি এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতুলের ওপর। কিন্তু তার শক্তি কতটুকু? মুহূর্তেই প্রতুল তাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে ঘরের অপর পার্শ্বে অবস্থিত টেবিলের ধারে নিক্ষেপ করল।

টাল সামলাতে না পেরে লোকটি ছিটকে গিয়ে পড়ল। পুনরায় আঘাত পাওয়ামাত্রই তার ললাটের ক্ষতস্থান থেকে অঝোরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটি এইবার ছুটে এল। হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েও যেন তার কিছুই হয়নি—এমনই ভঙ্গিতে সে প্রতুলের দিকে এগিয়ে আসতেই পিছনদিক থেকে আনন্দমোহন পিস্তলের কুঁদোটা সজোরে বসিয়ে দিলেন তার মাথায়।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। চোখের সামনে ফুটে উঠল কালো আকাশের বুকে অসংখ্য স্তিমিত তারকা।

প্রথম লোকটি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াতেই প্রতুল বলল, এখনও কিছু পাওনা আছে বুঝি?

দেখো দেখি, এটা কেমন লাগে! বলেই সে আর-একটা ঘুষি এমনভাবে তার মুখের ওপর বসিয়ে দিল যে, সঙ্গে-সঙ্গে তার নাকের পাতাটা চিরে গেল। সামনের দাঁত দুটো খসে পড়ল জিবের ওপর।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতুল বলল, এখনও বলো তটিনী কোথায়? নইলে তোমার শাস্তির সবে শুরু হয়েছে, মনে রেখো।

লোকটির তখন আর কথা কইবার মতো শক্তি বোধকরি ছিল না। তত্রাচ ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে ধীরে-ধীরে বলল, পাশের ঘরে।

আনন্দমোহনকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে প্রতুল ছুটে এল পাশের ঘরে। তটিনী অচৈতন্য। সম্ভবত ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে প্রতুল তাকে দু-বার ডাকল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

পুনরায় সে এ-ঘরে চলে এল। পূর্ববৎ কঠিন স্বরেই লোকটিকে বলল, কতক্ষণ তাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে?

কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে লোকটি বলল, ঘণ্টাদুয়েক।

আনন্দমোহনের পানে ফিরে প্রতুল বলল, তাহলে এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

লোকটির জীবনীশক্তি বোধকরি শেষ হয়ে এসেছিল। তাই সে বলল, যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা কথা শুনে যেতে চাই, প্রতুলবাবু। কী করে আপনারা এ-বাড়ির সন্ধান পেলেন?

মৃদু হেসে প্রতুল বলল, খুবই সহজ উপায়ে। তোমার জুতোর তলাটা একবার দ্যাখো। দেখবে, একটা 'দ' অক্ষর লেখা। অর্থাৎ, তুমি দস্যু। সেটা হাসপাতালেই আমি করে রেখেছিলাম। আর তারই সঙ্গে এমন একটা

কালি লাগিয়ে রেখেছিলাম যে, যেখান দিয়েই তুমি চলো না কেন, ওই অক্ষরটার ছাপ পড়তে-পড়তে যাবে। —কথাশেষে সে নিজেই লোকটির একপাটি রবারের জুতো তুলে দেখাল।

আনন্দমোহন সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার প্রতুলের পানে তাকালেন।

প্রতুল পুনরায় বলল, কিন্তু তোমরা এতগুলো লোককে খুন করলে কেন?

পাশ ফিরে লোকটি ধীরে-ধীরে বলে চলল, আমি যখন রেঙ্গুনে, তখন আমার বাবা একটি ক্লাব তৈরি করেন। তাতে একসময় চাঁদমোহন, রাইমোহন, বিক্রম রায়—এরা তিনজন সভ্য হতে চেয়েছিল। কী কারণে জানি না, বাবা তাদের সভ্য করেননি। তার কিছুদিন পরেই বাবাকে তারা হত্যা করে—পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়ে। রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে খবরটা শুনে আমি তার প্রতিহিংসা নেব বলে বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজে এসেছি, কিন্তু তাদের খোঁজ পাইনি। শেষে একদিন চাঁদমোহনকে একটা অফিসে দেখলাম। পরে জানলুম ওইটে তার নিজেরই। তারপর একে-একে সবাইকে খুঁজে বের করে আমি...।

বাধা দিয়ে প্রতুল প্রশ্ন করল, ত্রিবান্দমকে মারলে কেন?

ত্রিবান্দম আমাদের গোপনীয় অনেক কিছু জানতে পেরেছিল। তাই তাকেও...তাই তাকেও...তাই...।

লোকটির কথা শেষ হল না। বোধকরি আর কোনওদিনই হবে না। শুধু রক্তাক্ত ওষ্ঠটা তার বারেক কেঁপে উঠল। একসময় দেহটাও তার ধীরে-ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

রোমাঞ্চ (সাপ্তাহিক)

পুজো সংখ্যা, ১৯৪৮



হারানো কথাটা

নীলিমা মুখার্জি

ব্যবস্থা যা হয়েছে, এর মধ্যে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। এখন একটা জিনিসের শুধু দরকার, সে হচ্ছে শক্ত নার্ভ-এর। নার্ভ মিঃ চৌধুরীর যথেষ্ট শক্ত। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মেহতা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের তিনি সুদক্ষ জেনারেল ম্যানেজার, নিজের নার্ভের উপর সেটুকু বিশ্বাস তাঁর আছে।

একটা জায়গায় চৌধুরীর একটু ভয় ছিল। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই প্রাইভেট সেক্রেটারি নটরাজ যা বলল, তাতে সে-ভয়টাও কেটে গেল। নটরাজ বলল, 'এম. ডি. আপনাকে ফোন করেছিলেন স্যার, আপনি আসবার একটু আগেই।'

যেন কিছুই জানেন না এইভাবে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর? মিঃ মেহতা নিজে?'

'হ্যাঁ, স্যার। বললেন, দুটোর পর থেকে তিনি থাকবেন, আপনি যেন সময়মতো তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন। বোর্ড মিটিং-এর আগেই।'

'আপনি ঠিক বলছেন তো, মিঃ মেহতা নিজেই ফোন ধরেছিলেন?'

'বাঃ, মিঃ মেহতার গলা আমি চিনি না? প্রায়ই তো তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলছি। তা ছাড়া তাঁর গলার স্বর তো ভুল হওয়ার মতো নয়।'

'তা বটে।'

একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ চৌধুরী নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। তাঁর এই প্রাইভেট সেক্রেটারিটিকে প্রায়ই ফোনে কথাবার্তা বলতে হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মেহতার সঙ্গে। সে যখন মিঃ চৌধুরীর গলার স্বরকে মিঃ মেহতার গলা বলে ভুল করতে পারে, তখন আর ভাবনা কী? অফিসের বাকি লোককে ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ। বোর্ড মিটিং-এর ঘরে ফোন করাই ভালো, ততক্ষণে ডিরেক্টরদের অনেকে এসে হাজির হবে। তাদের ধোঁকা দেওয়া তো আরও সহজ। কলেজে একসময় ভালো অভিনেতা বলে নাম ছিল, গলার স্বর নকল করার দক্ষতা এইবার কাজে লাগবে। বিপদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার যে-প্ল্যানটি মিঃ চৌধুরী ছকে রেখেছেন, তার মধ্যে এইটেই সবচেয়ে শক্ত ধাপ। আর বাকি সব তো তুচ্ছ খুঁটিনাটির ব্যাপার—আপনা থেকে যন্ত্রের মতন ঘটবে।

খুন ব্যাপারটা আসলে খুবই সহজ, আর নিজের গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে নিরাপদে পার পেয়ে যাওয়া, হিসেব করে চলতে জানলে তাও খুব শক্ত নয়। অন্তত এ-ক্ষেত্রে। হিসেব পাকা, বন্দোবস্ত নিখুঁত।

মিঃ চৌধুরীর প্ল্যানটি সত্যিই ভালো। হাজাররকম হিসেব করে তিনি দেখেছেন, কোনওদিক থেকেই কোনও ত্রুটি নেই। সব রকমের সম্ভাবনাগুলিকেই বিচার করে দেখা হয়েছে, কোনও ফাঁক নেই। সত্যি কথা বলতে কী, লোকে ধরা পড়ে বুদ্ধির দোষে, হিসেবের গলদে। চৌধুরীর হিসেবে আজ পর্যন্ত কোনওদিন কোনও গলদ বেরোয়নি, আজও বেরুবে না। গরিবের ছেলে তিনি, সামান্য অবস্থা থেকে ধাপে-ধাপে এগুতে-এগুতে আজ তিনি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। কীসের জোরে? বুদ্ধি, হিসেব আর শক্ত নার্ভ।

ভয় পেলে চলবে কেন? আর তা ছাড়া অন্য উপায়ও তো কিছু নেই। এতগুলি টাকা তিনি এখন জোগাড় করবেন কোথা থেকে? অথচ দুদিন বাদেই ডিসেম্বর-অডিট শুরু হবে। তার আগে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এখন ব্যবস্থা বলতে এই একটিই,—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। গত আটমাস বোম্বাই'র ফাটকাবাজারে বেনামিতে জুয়া খেলে তিনি কোম্পানির প্রায় এগারো লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। কাজটা অবশ্য ঠিক হয়নি, কিন্তু শেয়ারবাজার যে এমন একটা ডিগবাজি খাবে তা কে জানত? সে যাই হোক, অ্যাকাউন্টের মারপ্যাঁচে এই চুরিটা তিনি এতদিন বেশ কৌশলে ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু আর বোধ হয় পারা গেল না... অডিট শুরু হতে আর মোটে দু-সপ্তাহ বাকি!—বাঁচার একমাত্র পথ এখন...।

এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। মাথার ওপর অন্য কেউ আর থাকবে না। মেহতাকে বাদ দিলে, আর বাকি যে-সব ডিরেক্টর তাদের মধ্যে এমন মুরোদ কারওই নেই যে চৌধুরীকে রুখতে পারে। মিঃ মেহতা অবশ্য সাংঘাতিক ধূর্ত—যাকে বলে বাস্তুঘুঘু।

পরিকল্পনাটি গোড়া থেকে হিসেব করে দেখা যাক, সত্যিই কোনও খুঁত কোনও ফাঁকে রয়ে গেছে কি না। প্রথম কথা হচ্ছে, মেহতার ঘরে ঢুকবার বা বেরুবার সময় কারও নজরে না পড়ে যাওয়া। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। লম্বা করিডর; তার ডান দিকটাই বন্ধ থাকে। আর বাঁ-দিকটা লন, তারপর দেওয়াল, তারপর রাস্তা, ওদিক থেকে দোতলার ব্যাপার কিছুই দেখা যায় না, কেউ দেখবারও থাকবে না। যেতে পনেরো সেকেন্ড, আসতে পনেরো সেকেন্ড। মিঃ চৌধুরী ঘড়ি ধরে হেঁটে দেখেছেন। কুড়ি পা, বড়জোর তিরিশ পা...not more than thirty paces। তিরিশ পা বলতে কী-একটা খারাপ কথা যেন মনে পড়ল?

'From the condemned cell to the scaffold was not more than thirty paces.'—সে কবেকার কলেজে-পড়া একটা ইংরেজি কবিতার লাইন! ফাঁসির সেল থেকে ফাঁসির মঞ্চ মোটে তিরিশ পায়ের পথ। আচ্ছা ঝকমরি! এই কি এসব কথা ভাববার সময়? এসব এলোমেলো ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। চৌধুরীর মন অবশ্য এত সহজে দুর্বল হওয়ার মতো নয়,—চৌধুরী হচ্ছেন হিসেবি লোক, পাকাপোক্ত লোক —ধুরন্ধর বিজনেসম্যান।

আচ্ছা, তাহলে মেহতার কামরায় ঢোকা গেল, এ-পর্যন্ত পাকা। কিন্তু নটরাজ? চৌধুরীকে নিজের ঘর থেকে বাইরে কাটাতে হচ্ছে মোট সাড়ে চার মিনিট। এই সময়টুকু নটরাজকেও সরিয়ে রাখতে হবে। অন্তত মিনিট পাঁচ-ছয়। তার ব্যবস্থাও মিঃ চৌধুরী করে রেখেছেন। বেশ কিছু দিন থেকেই তিনি নটরাজকে একবার করে রোজ নিয়মিত রেকর্ডরুমে পাঠাচ্ছেন,—ফাইল-পত্তর খুঁজে-খুঁজে আনতে। কাজেই নটরাজকে রেকর্ডরুমে পাঠালে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

পাঁচমিনিট নটরাজ অনুপস্থিত থাকবে। তাকে রেকর্ডরুমে যেতে হবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের করিডরের উল্টোদিকের বারান্দা দিয়ে। চৌধুরীর দরজায় 'এনগেজড' বোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়ে যাবে, কাজেই সে-সময়টা কেউ উঁকি মারবে না। ঠিক পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরের দরজায় হাজির। কাছেপিঠে কেউ থাকবে না, অন্তত না-থাকাই স্বাভাবিক। তবু, যদি থাকেই, হিসেব করে রাখা ভালো।

যদি থাকে, কাজটা তা হলে আর একদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হবে। গোটা কার্যক্রমটার আগাগোড়া প্ল্যান করে ছকে রাখো, ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি ধাপ কল্পনায় চোখের সামনে দেখে নাও।—ব্যস, বাকিটা

জলের মতো সহজ।

ধরা যাক, সব ঠিক আছে। ঘরে ঢোকা গেল। দরজাটি সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে, ভুল হলে চলবে না।

তারপর

'এ-সপ্তাহের প্রোডাকশন চার্টটা দেখবেন, স্যার?'

দৈবাৎ যদি এমন হয় যে মিঃ মেহতা সঙ্গে-সঙ্গে প্রোডাকশন চার্টটা দেখতে নিলেন না, একটু দেরি করলেন? না, সে সম্ভাবনা নেই। চার্ট দেখবার জন্যে বুড়ো যে-রকম উতলা হয়ে বসে থাকে! তবু দৈবের কথা কিছু বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। স্থগিত রাখো, আর-একদিন হবে।

আচ্ছা ধরা যাক এ-পর্যন্ত ঠিক আছে। ঘরে ঢোকামাত্র মিঃ মেহতা চার্টটি দেখতে চাইলেন। চার্টটি হাতে নিয়েই ডানদিকের দেরাজটি টেনে খুললেন, সেখানে আগের সপ্তাহের চার্টগুলি থরে-থরে সাজানো। আগের সপ্তাহের সঙ্গে এ-সপ্তাহের চার্ট যথারীতি মিলিয়ে দেখতে লাগলেন।

এম. ডি. চেয়ারে বসা, শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, দৃষ্টি চার্টে নিবদ্ধ। ঠিক পিছনে একটু ডানদিক ঘেঁষে চৌধুরী দাঁড়ানো, হাতের খুব কাছে খোলা ড্রয়ার। এই ড্রয়ারেই ফাইলের তলায় রয়েছে এম. জি.-র গুলি-ভরা রিভলবার। গত ধর্মঘটের পর থেকে গুলিভরা রিভলভারটা এম. জি. এখানেই রাখেন...শ্রমিকদের মতিগতি তো ভালো নয়। তারপর? তারপর মোটে এক সেকেন্ড!

চৌধুরীর ডানহাতে দস্তানা পরা থাকবে, রিভলবারে নিজের আঙুলের ছাপ থাকলে চলবে না। কিন্তু দস্তানা দেখে মিঃ মেহতা যদি কিছু প্রশ্ন করে বসেন? তা হলে জবাব হবে, ডানহাতের একটা আঙুল একটু ছেঁচে গেছে, দস্তানা পরলে ব্যান্ডেজটা ঠিক থাকে।

এ-পর্যন্ত তো বেশ হল, এইবারে টেলিফোন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 'কল'...জবাব সঙ্গে-সঙ্গেই আসবে। শুনে অন্তত মিনিটখানেক তো সবাই স্তম্ভিত হয়েই থাকবে! তারপর শুরু হবে হাঁকডাক, ছুটোছুটি। বোর্ডরুম থেকে অফিস-ঘরে আসতে অন্তত দেড়মিনিট—খুব জোরে ছুটে এলে। সেখান থেকে ছুটে মিঃ চৌধুরীর কামরা পর্যন্ত আসতে আরও ষোলো সেকেন্ড। মোট একশো ছয় সেকেন্ড। ফোন সেরে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পনেরো সেকেন্ড। তা হলে ঘরে এসেও একানব্বই সেকেন্ড সময় হাতে থাকছে। অর্থাৎ, দেড় মিনিটের 'সেফটি-লাইন।' যথেষ্ট সময়, তাড়াহুড়ো করার কিচ্ছু নেই।

আর কিছু? কোনও পয়েন্ট বাদ রইল কি? করিডরে অথবা এম. জি.-র ঘরে যদি কিছু পড়ে-টড়ে থাকে? থাকলেই বা কি? সন্দেহ করবার কিছু নেই। দিনের মধ্যে অনেকবারই চৌধুরীকে করিডরে অথবা এম. জি.-র ঘরে যেতে হচ্ছে... অনায়াসে কিছু একটা পড়ে থাকতে পারে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে মিঃ চৌধুরী একেবারে ফাইলপত্তরে ডুবে যাবেন। পাইওনিয়ার-এর টেন্ডার খোলা থাকবে। সকলে ব্যস্তসমস্তভাবে এসে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়বে। গোলমালে মিঃ চৌধুরীর ধ্যান ভেঙে যাবে, ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে চড়া গলায় তিনি ধমকে উঠবেন 'ব্যাপার কী! আগুন লেগেছে? না, ডাকাত পড়েছে? এত শোরগোল কীসের?'

তারপর? তারপর যা ঘটার আপনা থেকে ঘটে চলবে। আসল কাজটা তখন সমাধা হয়ে গেছে। অডিটে সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে; কিন্তু মিঃ চৌধুরীর ওপর একটু দোষও পড়বে না। যার ওপর পড়বে, তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে কোথায়!

মিঃ চৌধুরী একটু মুচকি হাসলেন। এক ঢিলে দুই পাখি বর্তমানের বিপদ থেকে উদ্ধার আর ভবিষ্যতের পথও চিরকালের জন্য নিষ্কণ্টক! একটু বুদ্ধি, একটু হিসেবে, একটু দূরদৃষ্টি।

ঠিক আছে। জলের মতো সহজ।

মিঃ চৌধুরী ঘড়িটি একবার দেখে নিয়ে কলিংবেলে আঙুল রাখলেন। টেবিলে পাইওনিয়ারের টেন্ডার।

'স্যার?' নটরাজ ঘরে ঢুকল।

'হ্যাঁ দ্যাখো, গতমাসে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে যে টেন্ডারগুলি এসেছিল, সেগুলো সব নিয়ে এসো তো। সেই সঙ্গে পাইওনিয়ারের গত বছরের পেপারসগুলিও এনো—ওদের কেসটা আজই শেষ করব।'

নটরাজের ফিরতে অন্তত দশ মিনিট। নটরাজ চৌধুরীকে টেন্ডারের কাজ করতে দেখে গেল। 'ওরা' যখন আসবে তখনও চৌধুরীকে টেন্ডারের কাজ নিয়েই মগ্ন দেখতে পাবে। সাক্ষীতে-সাক্ষীতে মিল হয়ে রইল। পাকা কাজ।

আধমিনিট অপেক্ষা করা যাক। কী জানি, নটরাজ যদি কিছু জানার জন্য আবার ফিরে আসে! মিঃ চৌধুরী সেই অবসরে দস্তানাটা হাতে পরে নিলেন।

তিরিশ পা, not more than thirty paces, ফাঁসির সেল থেকে ফাঁসির মঞ্চ—না-না, এখন ওসব ভাবনা নয়।

মিঃ চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দরজায় নক করলেন।

'ভেতরে আসুন—' মিঃ মেহতার ভাঙা-গলার আওয়াজ।

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে চৌধুরী মেহতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সৌম্যদর্শন পক্ককেশ বৃদ্ধ, মুখে সেই অমায়িক হাসি, শুধু চোখ দুটোয় ধূর্ততা মাখানো।

বুড়ো ঘুঘু!—মিঃ চৌধুরী মনে-মনে বললেন। মুখে বললেন, 'এ-সপ্তাহের প্রোডাকশন চার্টটা একবার দেখবেন, স্যার?'

'ভালো রিপোর্ট তো হে?'

'বেশ ভালো স্যার। আগের হপ্তা থেকেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে।'

'বেশ, বেশ!' মিঃ মেহতা আরও অমায়িক, আরও হাসিখুশি হয়ে উঠলেন, 'তোমার এফিসিয়েন্সি আমাকে ক্রমেই বেশি করে ইমপ্রেস করছে, চৌধুরী। রোসো, আগের হপ্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।'

এম. ডি. ডানদিকের দেরাজটা খুলে একতাড়া কাগজ বের করলেন। কয়েকটা ফাইল দিয়ে রিভলভারটা চাপা দেওয়া রয়েছে। কালো বাঁটটা মিঃ চৌধুরীর নজরে পড়ল। মিঃ মেহতা ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছেন চার্টটা। চট করে রিভলভারটা চৌধুরী তুলে নিলেন। এক, দুই, তিন—ব্যস।

ট্রাফিকের শব্দপ্রবাহে আওয়াজটা অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। বুড়ো মেহতার দেহ নিঃশব্দে এলিয়ে পড়ল রিভলভিং চেয়ারের ওপর। কার্পেটের একটা অংশ রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

মেহতার ডান হাতের মুঠোয় রিভলভারটা পুরে দিয়ে হাতটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলেন মিঃ চৌধুরী। তর্জনীটাকে ট্রিগারের সঙ্গে মানানসই করে লাগিয়ে দিলেন। ঠিক হয়েছে। তাড়াহুড়ো কোরো না, ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে এগুতে হবে—ঠিক প্ল্যানমাফিক।

রক্ত! সাবধান, হাতে বা কাপড়ে যেন রক্ত না লাগে!

এইবারে আসল কাজ, টেলিফোন। গলাটা দুবার খাঁকারি দিয়ে মেহতার গলার আওয়াজটা এনে নিলেন নিজের গলায়। তারপর টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'এক্সচেঞ্জ, স্যার,' এক্সচেঞ্জের বিনয়াবনত কণ্ঠ।

'বোর্ডরুম দাও।' মেহতার গলায় চৌধুরী বললেন।

'বোর্ডরুম? মেহতা স্পিকিং। কে, গণেশপ্রসাদ? বেশ, বেশ। তোমরা সকলেই হাজির আছো তো? দ্যাখো, আজ একটা কথা—আঃ, আমাকে বাধা দিয়ো না, চুপ করে শোনো—আজ একটা কথা তোমাদের বলব। গত দু-বছর ধরে তোমাদের আমি ঠকিয়ে আসছি, গত দু-বছর ধরে আমি কোম্পানির টাকা দু-হাতে চুরি করে আসছি। ডিসেম্বর-অডিটে সবই প্রকাশ পেয়ে যাবে। অবশ্য তাতে আমার কিছু আর এসে যাবে না তখন, কারণ তখন আমি আর এ-পৃথিবীতে নেই। শোনো, আমার বাঁচবার শেষ পথ যেটা ছিল, আজকে তাও বন্ধ হয়ে গেছে...টাকাটা জোগাড় করতে পারলাম না। ...হ্যাঁ, সুইসাইড ছাড়া আর পথ নেই। একহাতে ফোন ধরে কথা বলছি, আর-এক হাতে পিস্তল। আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই আমি...।'

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে মিঃ চৌধুরী একবার মুচকি হাসলেন, গলার স্বরটা ভারি নিখুঁত হয়েছে!

ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে মিঃ চৌধুরী একবার চারদিকে ভালো করে দেখে নিলেন। সব ঠিক আছে। সব শান্ত, নিস্তব্ধ, যেমন ছিল তেমনি, শুধু রিভলভিং চেয়ারে মিঃ মেহতা—একটা অসাড় দেহ—মৃতদেহ। যাক, মৃতদেহকে ভয় করবার কিছু নেই। পরিশ্রম তা হলে সফল হল! কত সহজ—একটু হিসেব, একটু দূরদৃষ্টি—ব্যস, সিদ্ধি!

ঘর থেকে বেরুবার জন্য মিঃ চৌধুরী দরজার হ্যান্ডেলটা ধরলেন। টান দিতেই হ্যান্ডেলটা তাঁর হাতের মধ্যেই খুলে চলে এল। এক সেকেন্ডের জন্য মিঃ চৌধুরী হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন। যে 'পিন'-টার সঙ্গে হ্যান্ডেলটা লাগানো ছিল, তার একটু মুখ বেরিয়ে আছে, দরজার বাইরের দিকের ভারি হ্যান্ডেলটার সঙ্গে সেটা সংযুক্ত। এদিকটা খুলে যেতেই বাইরের হ্যান্ডেলের ভারে বেরিয়ে-থাকা 'পিন'-টুকু ক্রমে গর্তে ঢুকে যেতে লাগল। চট করে হাত বাড়িয়ে সেই পিনের মুখটুকু চৌধুরী ধরতে গেলেন, হাতের ধাক্কায় সেটা আরও ভেতরে ঢুকে গেল! বাইরের ভারি হ্যান্ডেলটা পিনসুদ্ধ দরজার সামনে বাইরের মেঝেতে ঝনঝন করে পড়ে গেল।

হুড়কোটা ঠেলে সরাতে হবে—একটা কিছু দিয়ে দরজার হুড়কোটাকে চাড় দিয়ে খুলে ফেলতে হবে—একটু কিছু চাই যা দিয়ে চাড় দেওয়া যায়। একটা কিছু চাই! কিছুই নেই নাকি? একটা লোহার শিক-টিক কিছু। আধমিনিট কেটে গেছে। ছুরি-টুরি কিছু নেই?—জানলা? জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না? অসম্ভব, জানলার কথা ভেবে মিছিমিছি সময় নষ্ট করা—জানলা দিয়ে বেড়ালটা পর্যন্ত গলে যেতে পারে না।

মিঃ চৌধুরী দরজা ধরে জোরে টানতে গেলেন, হাত ফসকে আসে। তাছাড়া, ল্যাচ আটকে আছে, টানলে কী হবে? রেগে গিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারলেন দরজায়। কী আহাম্মক, ধাক্কা মারলে খোলে কখনও? রাগ করে লাভ হবে না, জবরদস্তির সময় এখন নয়, ভেবে বের করো, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে একটা উপায় বের করো। এখনও তিরিশ সেকেন্ড সময় আছে। তিরিশ! তিরিশ সম্বন্ধে কী একটা কথা যেন খানিক আগে ভাবছিলেন মিঃ চৌধুরী? 'ফাঁসি-সেল থেকে ফাঁসি-কাঠ—' দুর ছাই, যা-তা সব এলোমেলো ভাবনা!...কাগজ-কাটা ছুরি নেই?

একটা কাগজ-কাটা ছুরি পাওয়া গেল একটা মেহতার টেবিলের ওপর। ল্যাচের ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ছুরিটা বেঁকে গেল!

শান্ত হয়ে একটু ভাবো, এখুনি উপায় বেরিয়ে যাবে। পথ একটা আছেই,...এত ভালোভাবে হিসেব করে প্ল্যান করা হয়েছে!

পাওয়া গেছে, উপায় পাওয়া গেছে...হঠাৎ পথ! একটা আইডিয়া...।

বারান্দায় পায়ের শব্দ, দরজায় ঘন-ঘন করাঘাত। ওরা এসে পড়েছে! ওদের শোরগোলে মিঃ চৌধুরীর ভাবনাগুলি আবার গুলিয়ে গেল। একদম গুলিয়ে গেল সব। উপায় একটা ছিল, মিঃ চৌধুরীর ভেবে বের করেছিলেন, হারিয়ে গেল। আইডিয়াটা এসেই আবার চলে গেল, মরীচিকার মতো! আবার ভেবে বের করতে হবে। ভাবো, মাথা ঠান্ডা করে ভাবো।

জোরে-জোরে ঘা পড়ছে দরজার ওপর। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করঞ্জিয়ার গলা শোনা যাচ্ছে...আহাম্মকটা প্রাণপণে চিৎকার করছে। এত শব্দ করে কেন? মানুষকে ওরা একটু ভাবতেও দেবে না? দুমদাম-দুমদাম—মৃতের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। জানে যে এম. ডি. ঘরে শুয়ে আছেন! এত শব্দ কীসের!

'শিগগির, মিঃ চৌধুরীকে কেউ একজন গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো।'

ভাবো, ঠান্ডা মাথায় ভাবো, সেই উপায়টাকে ভেবে বের করো, সেই মোক্ষম যুক্তি যা বললে কেউ আর তাকে কিছু বলবে না। ...এম. ডি. কেমন শান্ত হয়ে শুয়ে আছেন! রক্ত, কত রক্ত!...নাঃ! কিছুতেই মাথায় এল না হারানো কথাটা।

'দরজা ভেঙে ফ্যালো।'

একমুহূর্তে মিঃ চৌধুরী মন ঠিক করে ফেললেন। এই শেষ পথ তো এখনও খোলা।

এম. ডি.-র শরীর এখনও গরম রয়েছে দেখছি, আশ্চর্য তো! শিথিল মুঠো থেকে সহজেই রিভলভারটা বেরিয়ে এল। পাঁচটা গুলি এখনও অটুট। আর মোটে একটি খরচ হবে।

আর-একবার রিভলভারের আওয়াজ হল। বাইরের লোকজন আর্তনাদ করে উঠল।

অবসর, ভাববার অনন্ত অবসর।—চকিতে সেই হারানো কথাটা বিদ্যুৎঝলকের মতো মনে পড়ে গেল! বললেই হত, 'ঘরে ঢুকে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই কাণ্ডটা ঘটে গেল! ঠেকাবার সময় পেলাম না।'

দরজা ভেঙে সবাই যখন ঘরে ঢুকল, মিঃ চৌধুরীর দেহে তখনও ক্ষীণ একটু প্রাণের স্পন্দন ছিল। মুখে তৃপ্তির হাসি, হারানো কথাটা শেষ পর্যন্ত তিনি ভেবে বের করতে পেরেছেন!

রহস্যমালা (সাপ্তাহিক)

২৮ নভেম্বর, ১৯৪৮



ঘুঘু

সমীর চৌধুরী

ঘুঘুর কথা লিখতে বসেছি।

ঘুঘু দু-রকম। একরকম যারা ডালে-ডালে ঘোরে। আর একরকম যারা ঘোরে পাতায়-পাতায় অর্থাৎ 'মানুষ ঘুঘু'।

সেদিন দুপুরবেলা মটর রায়ের দোকানে এক অ্যাংলো ছোকরা এসে হাজির বললে আমার বাবার জন্যে একটা চশমা চাই—দু-একটা ফ্রেম দেখাবেন? মটর রায় ফ্রেম দেখালেন, একটা ফ্রেম পছন্দও করলে, বললে ফ্রেমটা বাবাকে একবার দেখানো দরকার, বাবা এই স্টেটসম্যান অফিসে চাকরি করেন, আপনার চাকরের হাতে দিন, ও আমার সঙ্গে আসুক। স্টেটসম্যান হাউস মটর রায়ের দোকানের সামনেই। দোকানের চাকর বিষ্টুচরণের হাতে ফ্রেমটা দিয়ে অ্যাংলো বাচ্চার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন—সাবধান অবশ্য করে দিতে ভুললেন না, কারণ হুঁশিয়ার লোক মটর রায়, বলে দিলেন, হাতছাড়া করবি না খবরদার।

কিন্তু আধঘণ্টা বাদে বিষ্টুচরণ খালি হাতেই ফিরে এল। সাহেব নাকি তাকে একটা মস্ত কাচের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে সেই যে ভেতরে ঢুকেছে আর বেরোয়নি।

ব্রজেন রায় বললেন, কাজটা তোমার ভুলই হয়েছে মটর—ও ব্যাটা খাস আমদানি উড়িষ্যার এক গণ্ডগ্রাম থেকে, স্টেটসম্যান হাউসের মতো বাড়ি আর সাহেব-টাহেব দেখে হকচকিয়ে যাবে, এ তো জানা কথাই।

মটর রায়ের মেজাজটা এমনি সর্বদা বেসুরো বেতালা হারমোনিয়ামের মতন—ব্রজেন রায়ের উপদেশ শুনে আরও খচে টং—বললেন, এখন আর উপদেশ মারতে হবে না, চুপ করুন, যখন নিয়ে গেল তখন কোথায় ছিলেন?

এই অ্যাংলোর বাচ্চা একজাতের ঘুঘু—ইংরেজিতে এদেরই নাম 'ফোর টোয়েন্টি'।

ঘুঘুর পাল্লায় পড়েনি এমন লোক কমই আছে। যেখানে-সেখানে এনতার ঘুঘু ঘুরছে সর্বদাই এবং বহু ঘোড়েল লোকও এদের হাত থেকে নিস্তার পায় না।

তপন সেবার বি.এসসি. পাশ করে দিনকতক চাকরির জন্যে হামলা চালিয়েছিল আফিসে, দপ্তরে। ছোকরার বুদ্ধি নেই তা নয়, তবে খাস পশ্চিমে প্রায় চোদ্দো বছর কাটানোয় মাথায় বোধহয় কিঞ্চিৎ শ্যাওলা জমেছিল। অবশ্য ইদানীং কলকাতার জল-হাওয়ায় মাথা খুলে গেছে। অম্বল ধরেছে—মাথা তো খুলবেই।

সকালবেলা উঠে প্রতিদিন চা এবং খবরের কাগজের 'কর্মখালি' একসঙ্গে গিলত সে। সেদিনকার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া লিমিটেড)'-এ অফিসার, কেরানি, কেমিস্ট ইত্যাদি বহু লোক চাই। মাইনে ভালোই। তপন দরখাস্ত ছেড়ে দিল।

তিন দিন বাদে জবাব এল—দেখা করতে হবে, সামনের শনিবার বেলা দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে।

মটর রায় বললেন, এ-চাকরিটা তোর লেগে—বুঝলি তপন, তা নইলে এত তাড়াতাড়ি কখনও জবাব দেয়?

শনিবার তপন সেজেগুজে দস্তুরমতন স্যুট চাপিয়ে—মটর রায়ের টাইটা ধার করে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ম্যাঙ্গো লেনে অফিস। একতলায় একটা ফার্নিচারের দোকান—দোতলায় একখানা বড় ঘর। বহু লোক বসে আছে—একদিকে পার্টিশানের ওপাশে দু-তিনজন লোক কাজ করছে। বাইরে চাপরাশি অপেক্ষা করছে। পাশেই আর-একটা ঘর—বাইরে প্লেট ঝুলছে 'এস. ধাক্কালাল, সেক্রেটারি।'

যথাসময় তপনের ডাক পড়ল এস. ধাক্কালালের ঘরে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে দামি স্যুট পরে চোখে মোটা শেলের চশমা এস. ধাক্কালাল—তপনকে দেখে স্মিত হেসে বললেন, বসুন, মিঃ রয়।

তপন বসল। অনেক কথা বললেন তিনি তপনকে। বললেন, আপনার মতন লোকই আমরা চাই—ইয়াং অ্যান্ড এনারজেটিক, ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড স্মার্ট। সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি আপনার স্বাস্থ্য দেখে।

তারপর বললেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার হয়ে গেছে ধরে নিন। তবে আমাদের কোম্পানির আইন অনুযায়ী আপনার একটা মেডিকেল টেস্ট হবে। আমি আপনার অ্যাপ্লিকেশানের ওপর লিখে দিচ্ছি। মেডিকেল ফি'র টাকা আমাদের অফিসে জমা দিয়ে দিন। ডাক্তার আমাদেরই—আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং কবে মেডিকেল টেস্ট হবে কালই জানিয়ে দেওয়া হবে চিঠিতে। প্রচুর লোক নেওয়া হচ্ছে তো, তাই আজই আপনাকে তারিখটা বলে দেওয়া যাচ্ছে না। এই বলে মিঃ ধাক্কালাল কলিং বেলে চাপড় মারলেন। উর্দিপরা চাপরাশি এসে দাঁড়াল।

সাবকো আফিসমে লে যাও।—বললেন মিঃ ধাক্কালাল।

পাশের ঘরে সেই পার্টিশনের মধ্যে গিয়ে তপন টাকা জমা দিল—রসিদ নিল।

দু-দিন পরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং মেডিকেল টেস্টের তারিখ সে পেয়ে গেল—সাতদিন পরেই মেডিকেল টেস্ট।

সাতদিন পরে ম্যাঙ্গো লেনের আফিসে হাজির হল তপন।

তপন একঘণ্টা আগেই হাজির হল। দেখলে ম্যাঙ্গো লেনের আফিসের সামনে বিরাট ভিড় আর ভয়ঙ্কর গোলমাল, চিৎকার—পুলিশ-পল্টন উপস্থিত। বেঙ্গল ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ঘরে এক মস্ত তালা ঝুলছে।

একতলার ফার্নিচারওয়ালার কাছ থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ হল, তাতে জানা গেল আফিসের যেসব ফার্নিচার, তা এদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া। অবশ্য মাত্র পনেরো দিনের ভাড়া আগাম পেয়েছিল তারা।

সকালে তাদের লেটার বক্স থেকে একটা চাবি পাওয়া গেছে, সঙ্গে একটা চিঠি :

> *আপনাদের ফার্নিচারের জন্য ধন্যবাদ। চাবি রইল, ঘর খুলে আপনাদের ফার্নিচার বের করে নেবেন। আমাদের কাজ ফুরিয়েছে।*

ভিড়ের মধ্যে চাপরাশি দুজন এবং কেরানি দুজন যারা টাকা জমা নিয়েছিল তাদেরও দেখা পাওয়া গেল। বিনা মাইনেতে দিনকতক চাকরি করে নিয়েছে এরা এই দুর্দিনে, এইটাই ওদের সান্ত্বনা।

ঘুঘু ধাক্কালাল ফুড়ুত করে সরে পড়েছেন।

ম্যাঙ্গো লেন থেকে ফিরে এসে মুখখানা ছাঁচি কুমড়োর মতন ফ্যাকাশে করে মটর রায়ের দোকানে একটা চেয়ার টেনে বসল তপন।

সব শুনে ব্রজেন রায় বললেন, আমার কিন্তু ওই আট টাকা ফি শুনেই কেমন খটকা লেগেছিল।

এই ব্যাপারে মটর রায় মুখখানা অস্বাভাবিক রকম বিকৃত করে বসেছিলেন। ব্রজেন রায়ের কথা শুনে এক ধমক মারলেন, বললেন, বাজে ফ্যাচফ্যাচ করবেন না, চুপ করুন।

মিঃ বর্মন এতক্ষণ কৌচের মধ্যে সেঁধিয়ে ছিলেন। এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন, বললেন, উঃ, কী ব্রেন মাইরি—দেখুন একবার কী সাহস শালার!—তারপর বললেন, পালিয়ে গেল, নইলে শালাকে পুলিশ দিয়ে এমন ঠ্যাঙাতুম। শালা জানে না কার সঙ্গে লেগেছে।

মিঃ বর্মনের কথা শুনে সকলে না হেসে থাকতে পারল না।

এরপর মিঃ বর্মন আর এক ঘুঘুর গল্প ফাঁদলেন—এক বাস্তুঘুঘুর গল্প।

গুলনগরের যুবরাজ এসে উঠলেন কোলকাতায় এক মস্ত হোটেলে। হোটেলের এক সেরা কামরা বেছে দিলেন ম্যানেজার—যুবরাজ মানুষ, ম্যানেজার তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য ব্যস্ত হওয়ার আর-একটা কারণ হল যুবরাজ হোটেলে ঘর রিজার্ভ করেই একশো টাকা আগামের সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ওর খানসামাদের বখশিস এটা। ম্যানেজার বখশিসের মোটা অংশটা নিজের পকেটেই রাখলেন।

তিন-চারদিন পরে হঠাৎ যুবরাজ ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারকে—বললেন, আমার স্টেট থেকে টাকা এসে পৌঁছনোর কথা ছিল আজ—পৌঁছয়নি। হয়তো কাল-পরশু আসবে—আমাকে হাজারখানেক টাকা ধার জোগাড় করে দিতে হবে।

ম্যানেজার একটু কী ভাবলেন, তারপর চলে গেলেন। আধঘণ্টা বাদে একজন কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে ফিরলেন। যুবরাজের টাকা পেতে অসুবিধে হল না। কাবুলিওয়ালাকে বললেন, পরশু বিকেলে সাড়ে তিনটের সময় তোমার টাকা নিয়ো।

এক মিনিট এদিক-ওদিক হল না। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে সাড়ে তিনটের সময় সুদসমেত কাবুলিওয়ালার টাকা মিটিয়ে দিলেন যুবরাজ। ম্যানেজারকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন এবং পকেট থেকে থেকে তাঁর গোল্ড ক্যাপ শেফারস পেনটা ম্যানেজারের পকেটে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, বিপদের সময় আপনি যে—সাহায্য করলেন তা কোনওদিন ভুলব না।

ম্যানেজারের চিবুকের তলার চর্বি আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠল।

একহপ্তা পরে যুবরাজের আবার টাকার দরকার হল। ম্যানেজার প্রায় ছুটতে-ছুটতে কাবুলিওয়ালাকে ধরে আনলেন। এবারে পাঁচ হাজার টাকা চাই।

কাবুলিওয়ালা টাকা দিল এবং দু-দিন পরে ঠিক সময় সুদসমেত ফেরত পেয়ে গেল। ম্যানেজারকে একখানা একশো টাকার নোটে বন্ধুর শুভেচ্ছা জানিয়ে সই করে নিলেন। বললেন, এটা রেখে দিন—যতদিন এটা থাকবে ততদিন অন্তত বন্ধুকে মনে থাকবে।

ম্যানেজারের চিবুকের তলার চর্বি ঝুলে পড়ল।

এরপর দু-হপ্তা কেটে গেছে। হঠাৎ এক শনিবার দুপুরে যুবরাজ কোথায় গিয়েছিলেন ট্যাক্সি করে, ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন, বললেন আজ শনিবার খেয়াল ছিল না—ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ আমার এখুনি তিরিশ হাজার টাকা চাই।

কাবুলিওয়ালার ডাক পড়ল। তার নিজের কাছে অত টাকা নেই—সে ছুটল—অন্য সব কাবুলিদের কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় করে আনল।

যুবরাজ বললেন, চেক দিয়ে দেব—সোমবার ফার্স্ট আওয়ারে পেয়ে যাবে। কাবুলি জানাল, কোনও প্রয়োজন নেই, সে সোমবারই নেবে।

টাকাটা পেয়ে হাঁফ ছাড়লেন যুবরাজ। তারপর ম্যানেজারকে বললেন, আজ একমাস হতে চলল আমি এসেছি অথচ আপনি একপয়সাও বিল নেননি এখনও—এটা ঠিক নয়—সোমবার দিন বিলটা দিয়ে সমস্ত পাওনা মিটিয়ে নেবেন।

ম্যানেজার একগাল হেসে বললেন, তার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? নিলেই হবে একসময়।
এরপর যুবরাজ বেরুলেন।
কিন্তু এই যে বেরুলেন, আর ফিরলেন না।
বাস্তুঘুঘু যুবরাজ ম্যানেজার আর কাবুলিদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলে গেলেন।
ব্রজেন রায় কথাটা শুনে বললেন, আমার কিন্তু তখনই সন্দেহ হয়েছিল।
মটর রায় এক ধমক মেরে বললেন, আপনি বড় বাজে ফ্যাচফ্যাচ করেন।

তদন্ত (সাপ্তাহিক)
৩১ অক্টোবর, ১৯৫২



দক্ষিণান্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ির ভেতরে অন্ধকার দুলছে। একটা বিরাট কালো পেন্ডুলাম যেন। সকালবেলা মোগলসরাইয়ের আগে স্টপেজ নেই আর। চাকায়-চাকায় বেড়ে-চলা স্পিডের অস্থিরতা। কত মাইল জোরে ছুটতে পারে এই ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনগুলো? পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর?

গাড়ি—অন্ধকার—সময়। একসঙ্গে ছুটে চলেছে। মোগলসরাইয়ে পৌঁছবার আগে অনেকগুলো নক্ষত্র ঝরে যাবে। আর অনেক মাইল। আর এলোমেলো সহস্র স্বপ্নের ভিড় ঠেলে চেতনার সীমান্তে এসে চোখ মেলে তাকাবে ঊর্মিলা। কিন্তু তার আগেই সাপের জিভের মতো ধারালো টর্চের আলো এসে পড়ল ঊর্মিলার চোখে।

ঊর্মিলা জাগল না। তরল ঘুমের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির মতো হয়তো মনে হল যেমন হয়—পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনও স্টেশনের ইলেকট্রিকের আলোই বুঝি কাচের জানলা দিয়ে। ঘুমের মধ্যে আচমকা খানিক তপ্ত রোদের স্বপ্নই দেখল হয়তো বা।

কিন্তু টর্চ যে জ্বেলেছিল সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। সেই যে কেঁপে উঠেই টর্চটা নিভে গিয়েছিল, তারপরে তার অবশ আঙুল আর টর্চের বোতামটাকে খুঁজে পেল না। চলন্ত গাড়ির বেপথু অন্ধকারে আশ্চর্য দৃঢ়তায় সে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। একটা পাহাড়ী নদীর স্রোতের উলটো মুখে প্রাণপণে জল ঠেলে যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—ঠিক সেইরকম।

গাড়ি—অন্ধকার—সময়। সব একসঙ্গে ছুটে চলেছে। বাইরে নয়, তার মনের মধ্যেই। এইবারে তার দুটো পা বেয়ে একটা তীক্ষ্ন হিমার্ততা উঠে আসতে লাগল ওপর দিকে। একবারের জন্য মনে হল, যে-পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই পথ দিয়েই সে ছিটকে চলে যায় বাইরে। কিন্তু হাতের কাছে হঠাৎ কখনও একশিশি প্রাণঘাতী বিষ পেলে যেমন অকারণে, অর্থহীন কৌতূহলে সেটাকে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করে—তেমনি একটা বিষাক্ত মাদকতায় সে অভিভূত হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর : তারপর সেই ঠান্ডা সর্পিল অনুভূতিটা যখন তার বুকের কাছে উঠে আসতে লাগল, যখন একটা নিষ্ঠুর বরফের মুঠি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল তার হৃৎপিণ্ড, তখন—।

তখন আর থাকতে পারল না। দু-পা পিছনে সরে এসে খুট করে সুইচটা টেনে দিল সে।

উজ্জ্বল খরধার আলোয় ভরে গেল কামরা। একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ তুলে অন্ধকারটা যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চাকার তলায়।

আর সচকিতে উঠে বসল ঊর্মিলা। সন্ত্রস্তভাবে পায়ের দিকে টেনে দিল শাড়িটা। চোখের সামনে বিভীষিকার মতো ফুটে উঠল একা গাড়িতে আর-একটি অপরিচিত মানুষ। মুখের ওপর নিচু করে নামানো কালো একটা ফেলট হ্যাটের ছায়া পড়েছে। ছাইরঙা টাউজারের পকেটে একটা হাত পুরে দিয়ে, আর একটা হাত সুইচের ওপর রেখে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

আর্তস্বরে প্রাণান্তিক একটা চিৎকার করে উঠল ঊর্মিলা—হাত বাড়াতে গেল মাথার কাছে অ্যালার্ম সিগন্যালের দিকে। সেই মুহূর্তেই ধীরাজ ডাকল, ঊর্মিলা!

চমকে উঠেই নিঃসাড় হাতখানা খসে পড়ল ঊর্মিলার পাশে। কাঠের পুতুলের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে। ততক্ষণে মাথা থেকে ফেলট হ্যাটটা সরিয়েছে ধীরাজ। সেই লালচে রঙের কোঁকড়ানো চুল, একটা মোটর দুর্ঘটনার স্মারক ডান চোখের ওপরের সেই কাটা দাগটা। চারবছর পরে হলেও ভুল হওয়ার কারণ নেই বিন্দুমাত্র।

তুমি!

নিঃশব্দে হাসল ধীরাজ। আর-একটা নির্ভুল প্রমাণ হিসেবে ঝিলিক দিয়ে উঠল বাঁধানো দাঁতের দুটো রূপালি ক্লিপ।

দেখাটা খুব নাটকীয়ভাবে হল, তাই না?—মুখের ওপরে হাসিটা জাগিয়ে রেখেই এগিয়ে এল ধীরাজ—বসে পড়ল ঊর্মিলার কাছে। একবারে গা ঘেঁষে বসল না—একটা সৌজন্য-সঙ্গত দূরত্ব বজায় রাখল মাঝখানে। আবার স্তব্ধতা। ছুটন্ত টেনের সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের মনে অজস্র কথা কল্লোলিত হয়ে ওঠার স্তব্ধতা। বিস্ময়ের ঝড়টা ভেঙে পড়বার আগে থমথমে কঠিন স্তব্ধতা।

তুমি—তুমি!—এবার গোঙানির মতো মনে হল ঊর্মিলার গলা।

নিজের কথাগুলোকে নিয়ে আলতোভাবে খেলা করবার ভঙ্গিতে ধীরাজ বলল, অনেক দিন পরে দেখা হল, ঊর্মি। বড় ভালো লাগছে তোমাকে। একটু মোটা হয়েছ—আরও সুন্দর হয়েছ দেখতে।

আস্তে-আস্তে বিহ্বলতার ছায়াটা সরে যেতে লাগল ঊর্মিলার মুখ থেকে। তার জায়গায় কয়েকটা তীক্ষ্ন যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতে লাগল।

আমার সুন্দর হওয়া না-হওয়ায় কী আসে যায়?—মৃদু কণ্ঠে ঊর্মিলা বলল, আমি তো তোমায় বাঁধতে পারিনি। আজ এ-গাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকলেই তুমি খুশি হতে।

হঠাৎ হা-হা করে একটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ধীরাজ।

তুমি কি মনে করো, ঊর্মি—এই যোগাযোগটা নেহাত কাকতালীয়? মোটেই না। গয়া স্টেশনে ট্রেনে উঠতে গিয়েই এই কামরায় তোমায় দেখতে পেলাম। কী করব ভাবতে-ভাবতে গাড়িটা দিল ছেড়ে। খানিকক্ষণ ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার হাতল ঘোরালাম। লক করা ছিল না—চলে এলাম ভেতরে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না ঊর্মিলা। প্রশ্ন করল না, জানলার সূক্ষ্ম জালের ভেতর দিয়ে কী উপায়ে অন্ধকার কামরায় তাকে দেখতে পেল ধীরাজ। বলতে চাইল না, ঘুমোনোর আগে নিজের হাতেই সে শক্ত করে লক করেছিল দরজাটা।

এ ভারি অন্যায়, ঊর্মি।—ধীরাজের গলায় অনুযোগের রেশ : এতবড় একটা লেডিজ কম্পার্টমেন্টে তুমি একা। দরজা লক না করে ঘুমোতে আছে এভাবে? পথেঘাটে কতরকম বিপদ ঘটে আজকাল।

তুমি আসবে বলেই দরজা খুলে রেখেছিলাম।

আমাকে ঠাট্টা করছ, ঊর্মি?—ধীরাজ ব্যথিত হল অবশ্য সে-দাবি তোমার আছে। তোমার সম্পর্কে যে-অন্যায় আমার হয়েছে তার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না। তাহলেও এরকম অসাবধান হয়ে চলাফেরা করাটা—।

কিছুক্ষণ ধীরাজের মুখের দিকে অদ্ভুত বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ঊর্মিলা। তারপর বলল পৃথিবীতে সব বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার ভার ছিল তোমারই। সে-ভার তুমি যখন বইতে চাও না, তখন কোনও বিপদকেই আমার ঠেকানোর সাধ্য নেই। চারদিকের দেওয়াল যার ভাঙা, একটা দরজা লক করা না-করায় তার কতটুকু আসে যায়?

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল ধীরাজ। মলিন জুতোটা ঠুকতে লাগল মেঝের ওপর।

তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না, ঊর্মি। সে-জোর নেই। কিন্তু তোমার তো উপায় ছিল।

কী উপায়?

হিন্দুমতে বিয়ে করে তোমাকে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনে জড়াইনি আমি! সিভিল ম্যারেজ হয়েছিল আমাদের। আদালতে একটা দরখাস্ত করে দিলেই তুমি মুক্তি পেতে আমার কাছ থেকে।

মুক্তি!—এতক্ষণে হাসল ঊর্মিলা। মৃদুরেখ—নীরক্ত।

দূরে থাকলেও আমি তোমার খবর নিয়েছি বরাবর। আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি কেন তুমি এখনও ঊর্মিলা মুখার্জি থেকে আমার অপরাধকে বয়ে চলেছ। কেন তুমি ফিরে যাওনি কুমারী ঊর্মিলা মল্লিকের মর্যাদায়?—একটা অনুতপ্ত জিজ্ঞাসায় এসে থমকে গেল ধীরাজ।

জানলার জালের ওপর চোখ রেখে বাইরের তরঙ্গিত অন্ধকারে কী দেখতে চাইল ঊর্মিলাই জানে। স্বগতোক্তির মতো বলল, পদবি বদলালেই কি সব বদলায় বলে তোমার ধারণা?

মন?—নিজের অজান্তেই ধীরাজ উচ্চারণ করল শব্দটা।

ঊর্মিলা আবার ধীরাজের দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি—বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল তা থেকে।

তুমি তার অস্তিত্ব মানো কি না জানি না। কিন্তু ওটা অনেকের থাকে।

তাহলে—ধীরাজ প্রায় গুঙিয়ে উঠল এবার তাহলে আজও তুমি আমাকে ভালোবাসো, ঊর্মিলা?

ঊর্মিলা জবাব দিল না।

প্রায় আর্তস্বরে ধীরাজ বলল, কিন্তু এর তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমাকে মনে রাখার মতো কিছুই তোমাকে আমি দিয়ে আসিনি। বিয়ের একমাস না কাটতেই যখন আমার চোখের নেশাও কাটল, তারপর দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে একটি দিনও তোমার সুখের স্মৃতি নয়! বাবার চেকবইয়ের পাতা জাল করে টাকা চুরি করেছি—স্বীকারোক্তির স্বর্গীয় অনুতাপে উদ্বুদ্ধ গলাটাও একবারের জন্য ধরে এল ধীরাজের : বন্ধুর স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি—।

থাক—থাক।—যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে ধীরাজকে থামিয়ে দিল ঊর্মিলা : থাক ওসব।

ধীরাজ চুপ করল। তা-ই বটে। এসব কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই আর। স্বীকারোক্তিটা আত্মপ্রসাদের রূপ নিচ্ছে যেন। অপরাধের তালিকা পেশ করতে গিয়ে যেন নিজের গৌরব প্রচার করছে সে। নতুন করে অস্ত্রোপচার করছে ঊর্মিলার শুকিয়ে আসা ক্ষতের ওপরে।

কিন্তু এরকম বিয়ে তো অনেকেই নাকচ করে, ঊর্মি।—ধীরাজ আবার সূত্র ধরল সন্তর্পণে।

সবাই করে না।—অল্প-অল্প কাঁপতে লাগল ঊর্মিলার ঠোঁট। হঠাৎ হাতের পিঠে সে চোখের থেকে আড়াল করে ধরল আলোটা। বড্ড বেশি জোরালো—বড্ড বেশি জ্বালা করছে চোখে। ঝরঝরিয়ে জল নেমে আসবে কি না কে জানে।

প্রেম অনেকের জীবনে ঋতুতে-ঋতুতে আসে—বারে-বারে ফুল ফোটায়।—চোখের জলটাকে কিছুতেই ঝরতে না-দেওয়ার প্রতিজ্ঞায়, ঠোঁটে একটা প্রাণপণ চাপ দিয়ে ঊর্মিলা শেষ করল কেউ-কেউ দেউলে হয়ে যায় একবারেই।

অনুভূতি-কল্লোলিত স্তব্ধতায় আবার নীরব হয়ে বসে রইল দুজন। গাড়ির চাকায় ছিটকে সরে যেতে লাগল দেশ-কাল—দু-একটি তারা ঝরে যেতে লাগল কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশে। একটা ব্রিজ গুমগুম করে গুমরে চলল পায়ের নীচে। শোন? তাই হবে হয়তো।

কী করা উচিত এর পরে? ধীরাজ ভাবতে লাগল। রক্তের মধ্যে একটা উদ্বেলিত আবেগ ঠেলে উঠতে চাইছে। কতদিন পরে আজ সে নতুন করে দেখল ঊর্মিলার মুখ! পাঁচবছর আগেকার একরাশ নীল বিকেল, রোমাঞ্চিত সন্ধ্যা, কথা বলা না-বলা রাত্রি—সব একসঙ্গে দীপিত হয়ে উঠল ঊর্মিলার মুখে।

এখনই একটা আশ্চর্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে ধীরাজ। আবার পুরোনো দিনগুলোর মতো ঊর্মিলাকে বুকে টেনে নিতে পারে—ক্ষমা চাইতে পারে, বলতে পারে : সব শোধবোধ হয়ে গেছে। এসো, আবার শুরু করা যাক নতুন পালা। ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। অনেক অন্ধকার পার হয়েছি—হাতড়ে ফিরেছি অনেক চোরাগলির আনাচে-কানাচে। দেখেছি, দাঁড়ানোর জায়গা কোথাও নেই—কোথাও নেই আশ্বাসের একান্ত আশ্রয়। আজ আবার তুমি নতুন করে আমার হাত ধরো, ঊর্মিলা! মুক্ত করো আমাকে—আমাকে উত্তীর্ণ করো—।

কিন্তু সে-সাহস কোথায় ধীরাজের? তিনবছরের বিচ্ছেদ যে-প্রেমকে জাগিয়ে রেখেছে, একটা মুহূর্তের ছোঁওয়া তাকে ঘৃণার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেবে হয়তো। না—সাহস নেই ধীরাজের।

আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল ঊর্মিলা। যেন মুক্তি পেতে চাইল অসহ্য স্নায়বিক পীড়ন থেকে।

চা খাবে একটু?

চা!—ধীরাজ নড়ে বসল।

আছে আমার ফ্লাস্কে। হয়ে যাবে দুজনের।

দাও।—অন্য প্রসঙ্গে সরে যেতে পেরে ধীরাজও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভালো হল—এই-ই ভালো হল। পুরোনো দিনগুলো জীর্ণ হয়ে যাক কবরের ভেতরে। তার ওপরে মাথা তুলুক এলোমেলো আগাছার সারি। কোনও একদিন পরিচয় ছিল—আজ দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। যেটুকু ধীরাজের পক্ষ থেকে বলার একটা নৈতিক কর্তব্য ছিল, তা বলা হয়ে গেছে; উত্তরে যা বলার ছিল, তাও বলেছে ঊর্মিলা। এর পরে চা খাওয়া যাক সহজভাবে। সকালবেলায় যখন মোগলসরাইতে ট্রেন পৌঁছবে, তখন বিদায়-সম্ভাষণ জানানো যাবে সৌজন্য-সঙ্গত স্মিত হাসিতে। হয়তো এমনও বলা যাবে : দুজনে একসঙ্গে কিছুটা সময় নেহাত মন্দ কাটল না। কী বলো?

বার্থের তলা থেকে ফ্লাস্কটা টেনে আনল ঊর্মিলা। একটা বেতের ঝুড়ি থেকে বের করল চায়ের পেয়ালা আর প্লাস্টিকের গ্লাস। ছুটন্ত টেনের দোলার ভেতরে যথাসম্ভব সাবধানে চা ঢালল গ্লাসে আর পেয়ালায়। তারপর পেয়ালাটা ধীরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কিছু খাবে?

না, থাক।

থাকবে কেন?—কোমল গলায় ঊর্মিলা বলল, অনেক খাবার আছে টিফিন কেরিয়ারে।

না, না—এই অসময়ে কিছু খেতে পারব না।

চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় উঠে বসল ঊর্মিলা। হাসল একটু। এতক্ষণ পরে তার হাসিটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

ভুলে গেছ সব? ট্রেনে উঠলেই তোমার খিদে পেত। দিন হোক, রাত হোক—যে-স্টেশনে যা পেতে তাই কিনে খাওয়ার অভ্যেস ছিল তোমার। পুরি, মিঠাই, গরম দুধ থেকে চিনেবাদাম পর্যন্ত।

কথাটা বলেই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল ঊর্মিলা। ঘুরেফিরে সমস্ত আলোচনা আবার সেই ব্যথার জায়গাটায় এসে কেন্দ্রিত হচ্ছে। মুহূর্তে সেটা লক্ষ করল ধীরাজ। গুমোট মেঘটাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য হেসে উঠল হা-হা করে।

বাস্তবিক, কী পেটুকই যে ছিলাম! কিন্তু এখন ওসব বদ অভ্যেস ছেড়ে গেছে, ঊর্মি। বয়েস বাড়ছে তো! অসময়ে খেলে আজকাল আর সহ্য হয় না।

বয়েস বাড়ছে! তা বটে। সেই আশাতেই তো দিন কাটাচ্ছে ঊর্মিলা। আরও কয়েকবছর পার হয়ে যাবে। পাক ধরবে মাথার চুলে, আজকের বেদনা নুন-ঝালের স্বাদের মতো আবসরিক রোমন্থনে পরিণত হয়ে যাবে।

সেদিন ঊর্মিলার মনে হবে না—কী হতে পারত, কী হয়ে গেছে সে! সেদিন নিশ্চিত হয়ে ভাবা যাবে—যা হওয়ার তা হয়েই গেছে, এখন শান্ত নির্লিপ্তিতে নিজেকে ভাটার মুখে ভাসিয়ে দেওয়ার পালা।

তাই হোক। বয়েস বাড়ুক ঊর্মিলারও। সেই নির্লিপ্তির নিরাসক্তিতে সে-ও সমাহিত হোক।

কোথায় চলেছ তুমি?—ঊর্মিলাই প্রশ্ন করল।

জবাব দেওয়ার আগে নিজেকে একবার সামলে নিল ধীরাজ। তারপর বলল, মোগলসরাই।

ওখানেই থাকো?—জিজ্ঞাসাটা অর্থহীন জেনেও ঊর্মিলা রোধ করতে পারল না।

গয়াতে থাকি। ডেরি-অন-শোন, মির্জাপুরেও কখনও-কখনও।—ধীরাজ হাসতে চাইল : সে যাক। তুমি?

কলকাতাতেই আছি।—চায়ের গ্লাসটা নামাল ঊর্মিলা, অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হল চা-টাকে একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটারের চাকরি নিয়েছি।

তবু ভালো।—চাপা উত্তেজনায় ঠোঁটের একটা কোণ বেঁকে এল ধীরাজের : আমার বাবার অন্ন তোমাকে মুখে দিতে হয় না। আমার অপরাধে সে-অন্ন দিনের পর দিন বিষ হয়ে উঠত তোমার মুখে।

জানলার জালের মধ্যে দিয়ে ঊর্মিলা আবার তাকাল বাইরের দিকে। রাত্রির রং ধূসর হয়ে আসছে। আরও—আরও নক্ষত্র ঝরে গেছে। ঝরে গেছে আরও সময়।

কোথায় চলেছ?—ধীরাজই জের টানল।

দেরাদুন। বাবা আজকাল ওখানেই বদলি হয়েছেন।

এই গরমে দেরাদুন!—হৃদ্যতার আমেজ আনল ধীরাজ।

কাছেই মুসৌরি।—অদ্ভুত দৃষ্টিতে ধীরাজের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ঊর্মিলা : তা ছাড়া তুমি জানো, আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।

মনে ছিল না।—ধীরাজ সপ্রতিভ হতে চাইল।

আবার নীরবতা। আবেগচঞ্চল নয়, কথামুখর নয়। সব কথা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার—সব অনুভূতি নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার নীরবতা। বিস্ময়, অনুতাপ, আবেগের পালা শেষ হয়ে গেছে। চা খাওয়া, দুটো-একটা ভদ্রতাসুলভ বাক্য-বিনিময়—তাও ফুরিয়ে গেল। তারপর?

আর থাকা যায় না—আর বসা যায় না ঊর্মিলার কাছে। এইবার পালানো দরকার—যেমন করে এসে উঠেছিল এই গাড়িতে, তেমনি করে বিনা নোটিশে আবার নিজস্ব কক্ষপথে ছিটকে পড়া। এই ট্রেন যখন দেরাদুনে পৌঁছবে, তখন এই রাত্রিটিকে ঊর্মিলার অতীত দিনগুলির মধ্যে বিলীন করে দেওয়া দরকার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল ধীরাজ। ট্রেনটা পাংচুয়াল। আর দশমিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে মোগলসরাই। টুকরো-টুকরো কথা নিয়ে নৈঃশব্দ্যকে জুড়তে-জুড়তে কী করে পার হয়ে গেল এই দীর্ঘ সময়টা!

এবারে মরিয়া হয়ে ধীরাজ জিগ্যেস করল, তুমি ভালো আছ তো?

হ্যাঁ, ভালোই আছি।—ঊর্মিলার জবাব। একটা লোহার প্রাচীর পড়ল এইবার। দশমিনিট ধরে অসহ্য অস্বস্তিতে, একটার পর একটা মুহূর্ত গুনে যেতে হবে এরপরে। বুকের ওপরে চেপে ধরা একটা পাথরের মতো এই নীরবতা নিশ্বাস বন্ধ করে আনবে। মোগলসরাই পৌঁছনোর আগেই বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি ধীরাজ?

না, একটা উপায় আছে এখনও। পকেট থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বের করে আনল সে। তারের জালটায় চোখ রেখে দুর্ভেদ্য তন্ময়তার আড়ালে হারিয়ে রইল ঊর্মিলা।

স্টেশন মোগলসরাই। আরক্ত সকাল। কুলি আর যাত্রীর কোলাহল।

এই স্টেশনে নিশ্চয় নতুন যাত্রী উঠবে কামরায়। যদি না-ও ওঠে—একটা সুদীর্ঘ দিন পড়ে রইল সামনে। অন্তত ধীরাজ আর ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে না আর-একটা মর্মচ্ছেদী দুঃসহ রাত।

ট্রেনটা থেমে এল আস্তে-আস্তে। তারের জালটা তুলে দিল ঊর্মিলা। বাইরে থেকে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে পড়ল ফ্যানের বাতাসে জ্বালা-ধরা ঊর্মিলার মুখে-চোখে।

ধীরাজ উঠে দাঁড়াল। কালো ফেলট হ্যাটটা পরে নিল মাথায়।

আসি তবে।

এসো।—অন্যমনস্ক জবাব এল ঊর্মিলার।

একবার কী ভাবল ধীরাজ—কী একটা বলতেও চাইল। আর কখনও বোধহয় দেখা হবে না—এমনি কিছু হয়তো এগিয়েও এল ঠোঁটের কোনায়। কিন্তু কী হবে বলে? কী লাভ?

অবসাদ-জর্জর আড়ষ্ট পায়ে ধীরাজ এগিয়ে গেল দরজার কাছে। নিরুদ্যম হাতে হাতলটা ঘোরাল।

চকিতের জন্য মনে হল : কেমন হয় ঊর্মিলার সঙ্গে দেরাদুন পর্যন্ত চলে গেলে? আগের চাইতে আরও সুন্দর হয়েছে—আবার যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করেছে তাকে। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। সব বদলে যেতে পারে, মন বদলে যেতে পারে, আবার ভালো লাগতে পারে ঊর্মিলাকে—।

কিন্তু কী মানে হয় এসব পাগলামির? ধীরাজ নিজেকে সংযত করে নিল। একটা আকস্মিক প্রেরণায় লাফিয়ে পড়ল নীচের প্ল্যাটফর্মে। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

শোনো!

একটা তীক্ষ্ন অস্বাভাবিক চিৎকারে ফিরে চাইল ধীরাজ। ঊর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়! একটা অপরিচিত তীব্র দ্যুতিতে জ্বলছে ঊর্মিলার চোখ।

আমাকে ডাকছ?—ধীরাজ থেমে দাঁড়াল। দু-পা এগিয়ে এল মন্ত্রবন্দির মতো।

ঊর্মিলা অস্বাভাবিক গলায় বলল : টয়লেটের জানলা ভেঙে ঢুকেছিলে, পকেটে নিশ্চয়ই ছোরা কিংবা রিভলবার ছিল। আমার কাছ থেকেই বা পাওনাটা না নিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেন?

বজ্রাহতের মতো কেঁপে উঠল ধীরাজ—একটা অব্যক্ত শব্দও করল হয়তো। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ঊর্মিলার গলার হারছড়া এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। ধীরাজ ছুটে পালানোর আগেই তার দিকে ছুটে এল আর-একজোড়া ভারি কঙ্কণ—একটা গিয়ে লাগল ডান চোখের কাটা দাগটার ওপরে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ধীরাজ—খানিকটা গরম রক্ত উছলে পড়ল চোখে।

দরজার পাশ থেকে তখন সরে গেছে ঊর্মিলা—এসে লুটিয়ে পড়েছে বার্থের ওপরে। এইবারে প্রাণভরে কাঁদতে পারছে ঊর্মিলা। এতক্ষণ পরে।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫



দুপুর এখানে মৃত্যু

নির্মলকুমার

সুচিত্রার সারা মনটা আনন্দে ভরপুর। সত্যি, তিমিরের পছন্দকে প্রশংসা করতে হয়।

মফস্বল শহরে বদলি হওয়ার সময় সুচিত্রা ভয়ে মুষড়ে পড়েছিল।

ওগো, বুঝলে, কলকাতার বাইরে আমি বেশিদিন থাকতে পারব না।

আচ্ছা, আচ্ছা, একবার দ্যাখোই না কলকাতা ছেড়ে। ভারি চমৎকার জায়গা।

তিমিরের কথায় সুচিত্রা ম্লান হেসেছিল। কিন্তু আজ সারা মনটা খুশিতে ছেয়ে গেছে। মফস্বল শহর। গভীর সান্ত্বনা। তার ওপর এই বাড়িটা। সামনে একটু ফুলের বাগান। দূরে লাল মাটির রাস্তাটা বাঁক নিয়ে তেপান্তরের মাঠে হারিয়ে গেছে। জানলার পাশে বসে কতদূর দেখা যায়!

সত্যিই তোমার পছন্দ আছে। এত চমৎকার জায়গা, এত সুন্দর বাড়ি তুমি জোগাড় করবে আমি ভাবতেই পারিনি।

সুচিত্রার কণ্ঠস্বরে তিমির বলে, কেন, আমার বুঝি পছন্দ করার ক্ষমতা নেই?

তোমার পছন্দের যা নমুনা দেখেছি! মনে নেই, একটা চওড়া হলদে পাড়ের শাড়ি নিয়ে সেদিন বাড়িতে কী হাসাহাসিই না পড়েছিল!

তিমির হাসে, ওটা তো ছোট জিনিস। আমার পছন্দের তারিফ কিন্তু বন্ধুরা ভয়ানক করে। একজনের রূপের ছটায় তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

যাও।—সুচিত্রা হাসে। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সুচিত্রা।

সুচিত্রার হাতটা টেনে নেয় তিমির : পছন্দের বাজারে তোমার হার হয়েছে চিত্রা, আমার মতো একজন....।

বাধা দিয়ে বলে সুচিত্রা, বেশ বলো, যত পারো বলো, আমি চলে যাচ্ছি।

গভীরভাবে টেনে নেয় তিমির সুচিত্রাকে : রাগ হল বুঝি!

সুচিত্রা গভীর খুশিতে ডুব দিয়ে তিমিরের বুকে মুখ লুকোয়। জীবনে এত আনন্দ আছে! জীবনে এত সুখ!

সুচিত্রা হঠাৎ বলে, জানো, আজ দুপুরে বেশ মজা হয়েছে।

কী?

দুপুরে জানলার পাশে বসে সেই বইটা পড়ছি। হঠাৎ চোখ পড়ল রাস্তায়। মনে হল, দূরে তুমি আসছ। সেই ছাই রঙের ট্রাউজার, সাদা শার্ট। ভাবলাম, অফিস থেকে পালিয়েছ। তাকিয়ে রইলাম। তুমি এলে।

বাগানের গেটটা খুলে দরজার কড়া নাড়লে। তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, দুষ্টুমি করে খুলব না। কড়া নাড়লে। একবার...দুবার...তিনবার। দরজা খুলে দেখি কেউ নেই! অবাক হয়ে গেলাম।

তিমির হাসে : ইস, ভয়ানক ভয়ের কথা। একেবারে হেডঅফিসে নজর!

সুচিত্রা হাসে : শুধু একবার নয়, তিনবার কড়া নাড়ে। যতবার খুলে দিই, দেখি কেউ নেই।

পাগলি! বাতাসে কড়া নড়ে ওরকম। এ তো আর কলকাতা নয়, বাতাসের নাম-গন্ধ পাবে না! একটু থেমে তিমির বলে, ভূতটুত বলে ভয় হচ্ছে নাকি?

ঘোড়ার ডিম, ওসব কুসংস্কার আমার নেই। ডিটেকটিভ নভেল পড়তে-পড়তে মাথাটা একটু খারাপ হয়েছিল আর কী।—একটু থেমে বলে সুচিত্রা, চলো, খাবে চলো।

আজ মনটা আমার বৈরাগ্যে ভরে উঠেছে। খাওয়ার আর ইচ্ছে নেই, দেবী।

বৈরাগ্যের কথা মনে রেখো গোঁসাই, শোধ নেব।—সুচিত্রা হেসে পালায়।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় তিমিরের। একটা হাত তার কপালে, চুলে বয়ে যাচ্ছে। উঃ, কী ঠান্ডা হাত! যেন বরফ। সুচিত্রার হাত এত ঠান্ডা!

অসহ্য এই হাত। কপালের রক্তটা যেন জমে আসছে। হাতটা সরিয়ে দেবে মনে করে তিমির নিজের হাতটা তোলে। হাতটা সরে যায়। পাশ ফিরে মনে হয় সুচিত্রা ঘুমোচ্ছে। অঘোরে। সুচিত্রার হাতটা স্পর্শ করে। অনুভব করে, বেশ গরম। তিমির আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে।

একটা অস্বাভাবিক ঠান্ডা নিশ্বাস তার মুখে চলাফেরা করছে। হিমশীতল নিশ্বাস, প্রাণের যেন ছোঁওয়া নেই। পাশ থেকে দেশলাইটা নিয়ে জ্বালায় তিমির। না, সুচিত্রা ঘুমোচ্ছে। তবে কে? ভুল? কিন্তু—।

সে সম্পূর্ণ অনুভব করছে। সম্পূর্ণ। মৃত্যুর মতো ঠান্ডা হাতের স্পর্শ একটা।

হিমশীতল নিশ্বাস। ধীরে একটা হাত টেনে নেয় সুচিত্রার।

সকালে চায়ের টেবিলে চায়ের প্রস্তুতির ফাঁকে সুচিত্রার মুখে একটা দুষ্টুমি হাসি খেলে। তিমিরের এখনও ইয়ে গেল না। পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে সুচিত্রা বলে, কী দুষ্টু বাবা!

কেন?

আর ন্যাকা সাজতে হবে না। কী দুষ্টুমিই করেছ কাল!

আমি?—বিস্মিত হয় তিমির। সে-ও এই প্রশ্ন করবে ভেবেছিল। দিনের আলোয় রাতের ঘটনাগুলো নিছক মনের ভুল বলেই ধরে তিমির। কিন্তু সুচিত্রাকে কাল.....।

কী, চুপ করে রইলে যে?—একটু হেসে বলে সুচিত্রা, রাগ করলে?

না, রাগ করব কেন, দুষ্টুমি করে রাগ করাটা একেবারে অন্যায়।—তিমির চেপে যায় রাতের নিজস্ব কথাগুলো।

উঃ, তোমার হাতটা কী অসম্ভব ঠান্ডা ছিল কাল! আমার সমস্ত রক্ত যেন জমে যাচ্ছিল।

ঠান্ডা! আমার হাত!—একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় কথাগুলো বেরিয়ে আসে তিমিরের মুখ থেকে।

হ্যাঁগো হ্যাঁ। বাবা, আমার যা ভয় লেগেছিল!—সুচিত্রা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে, মনে হচ্ছিল, তোমার আঙুলগুলো যেন আমার গলা চেপে ধরছিল। ভয়ে তোমাকে ঠেলা দিলাম, তবে তো ছাড়লে!

তিমির বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়—সুচিত্রার সামনে শুধু হাসে : তোমাকে পরখ করছিলাম।

মরে যাই কি না তাই!—সুচিত্রা হেসে জবাব দেয়।

তিমির হাসে। একটা গভীর রহস্যের ধোঁওয়ায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

একটা নিদারুণ বিস্ময়!

অফিসে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করে তিমির। কিন্তু তলিয়ে যেতে পারে না।

কাল রাতের অনুভূতি। একটা বরফের মতো প্রাণহীন ঠান্ডা হাত.....হিমশীতল স্পর্শ। সুচিত্রাকে খুন করতে গিয়েছিল সে.....সেই ঠান্ডা হাত। সুচিত্রা পেয়েছে সেই মৃত্যুর স্পর্শ। তার হাত ঠান্ডা নয়।

অসীমবাবু, শুনুন!—তিমির হঠাৎ ডেকে ওঠে।

কী বলছেন, স্যার?

কাছে আসুন।—হঠাৎ অসীমের হাতটা চেপে ধরে তিমির, ফিসফিসিয়ে বলে, আমার হাতটা বরফের মতো প্রাণহীন ঠান্ডা?

কী বলছেন?

বলুন, আমার হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা?

না, স্যার।

যান।—তিমির উত্তেজিত হয়ে হাতটা টেনে নেয়।

অসীম দু-পা এগিয়ে গিয়ে বলে, স্যার, একটা কথা বলব?

কী কথা?

অসীম একবার ভালো করে তাকায় তিমিরের দিকে : স্যার, কাল রাত্রে আপনার বাড়িতে কিছু হয়েছিল?

তিমির বিস্ময়ে মুখ তোলে। এক চূড়ান্ত আগ্রহে সমস্ত মনটা মাতাল হয়ে যায়। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রেখে বলে, কেন?

স্যার, ওই বাড়িটার একটা বদনাম আছে। বছরদুই আগে ওই বাড়িটা তৈরি করেন কলকাতার কোনও এক ভদ্রলোক। কী করতেন সঠিক জানা যায় না। মাঝে-মাঝে স্ত্রীসহ এসে থাকতেন। দুজনের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। অন্তত আমরা কোনওদিন দেখিনি। হঠাৎ একদিন বিকেলে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে শুনলাম। ছুটে গিয়ে শুনলাম, স্বামী আত্মহত্যা করেছে। ভদ্রমহিলার গলা কে যেন টিপে ধরেছিল। পুলিশ রিপোর্টে পরে জানা যায়, খুনি স্বয়ং তাঁর স্বামী। তারপর থেকে কেউই ওই বাড়িতে বাস করতে পারেনি। নানারকম অদ্ভুত জিনিস দেখা যায় বলে গুজব। অবশ্য আমি নিজে কোনওদিন দেখিনি।—অসীম হাসে স্যার, আমি বলছিলাম—বাড়িটা আপনি ছেড়ে দিন।

আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।—তিমিরের স্বরটা চুপসানো বেলুনের মতো শোনাল। সমস্ত মাথাটা যেন ঝনঝন করছে। কাল রাত্রের ঘটনা...তাহলে...।

তিমির হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। সুচিত্রা একা আছে বাড়িতে। কোনও দুর্ঘটনা যদি ঘটে!

দূর থেকে দেখতে পায় তিমির, কে যেন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ট্রাউজার-পরা ছিপছিপে চেহারা। কে? হঠাৎ এখন?

জোরে পা চালায় তিমির। কড়া নাড়ে। একবার...দুবার...তিনবার...কড়া নাড়ছেই।

উঁচু গলায় চিৎকার করে ওঠে তিমির, সুচিত্রা! সুচিত্রা!

দরজা খুলে বলে সুচিত্রা, এত তাড়াতাড়ি এলে যে!

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কোনও উত্তর নেই কেন?—তিমিরের স্বরে বিরক্তি।

কতবার দেখব? এই নিয়ে আটবার দরজা খুললাম।—সুচিত্রা বলে।

আটবার!—তিমির মুখ তোলে : একটু আগে কে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন মনে হল।

বিস্ময়ে মুখ তোলে সুচিত্রা : কী পাগলের মতো বকছ!

আমি নিজের চোখে দেখেছি।—দিশেহারা চিন্তায়, কেমন একটা উত্তেজনায় তিমির কাঁপতে থাকে। এক অসহায় উত্তেজনা।

সুচিত্রা মুখ তোলে। তিমিরের চোখ দুটো কেমন যেন অস্বাভাবিক লাল মনে হচ্ছে। কেমন যেন অপরিচিত।

কী বলছ তুমি! কেউ আসেনি। আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলব!

তিমিরের উত্তেজনা থার্মোমিটারের পারার মতো এগিয়ে চলেছে। সুচিত্রাকে সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। একটা পাশব প্রবৃত্তি কাঁপছে যেন তার মনে, চিন্তায়, দেহে।

তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?—একটা প্রচণ্ড ভয় সুচিত্রার গলাকে কাঁপিয়ে দেয়।

নিশ্চুপ তিমির। সুচিত্রার গলাটা কী লম্বা! কী সরু! দু-পা এগোয় তিমির।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হয়, জোরে—ঝড়ের মতো।

সুচিত্রা প্রায় দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে।

স্যার, আমি।—অসীম ঢোকে। মনে হয় সে যেন দৌড়ে এসেছে।

মুখ ফেরায় তিমির। সমস্ত শরীর অসম্ভব ঘেমে উঠেছে।

কী ব্যাপার, অসীমবাবু?—তিমির কথা বলে।

বলছি।—অসীম উত্তর দেয়।

তিমির সুচিত্রার দিকে তাকায় : আমার অফিসে কাজ করে।

অসীম হাতজোড় করে নমস্কার করে : আপনি বেরিয়ে আসার পরই আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আপনার মুখ দেখে, কথা শুনে মনে হল, কী যেন ঘটেছে অথচ আপনি আমায় লুকোচ্ছেন। তা ছাড়া এর আগে এই বাড়িতে দুপুরে দুটো দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সুচিত্রা বিস্ময়ে মুখ তোলে।

তিমির বলে, পরে বলছি, তুমি অসীমবাবুর জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করো।

সুচিত্রা চলে যায়।

অসীমবাবু, আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। জানি না কীসের তাড়নায় আমি যেন একটা কিছু করে ফেলতাম। আপনাকে সব বলছি।

অসীম হাসে : আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। দুপুর এখানে মৃত্যু। এক নির্মম ঘটনার হাতছানি এখানকার দুপুরে মিশে আছে।

সুচিত্রা চা নিয়ে ঢোকে।

ওর ভয়টা কেটে গেছে।*

* নির্মলকুমার চক্রবর্তী নামে প্রকাশিত

মাসিক রহস্য পত্রিকা

জুন-জুলাই, ১৯৫৫



মৃৎপ্রদীপ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ঘোষক : একটি কাহিনি আজ আপনাদের শোনাব। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। না-ই বা যদি বিশ্বাস করেন তো মনে করবেন না হয় স্বপ্ন। রাত্রি এগারোটা। (*ঢং ঢং করে রাত্রি এগারোটা বাজার শব্দ শোনা যাবে*) একাকী সুমিত্রা স্বামীর অপেক্ষায় জেগে বসে আছে। আর ভাবছে। এমন সময়—

সুমিত্রা : (*স্বগত*) এত রাত হয়ে গেল এখনও ফিরছে না কেন? সত্যি, কী সুন্দর প্রদীপটা! এমন চমৎকার জিনিসটা, অথচ মিউজিয়াম ঘরের কিউরিয়োর মধ্যে ফেলে রেখেছিল! আশ্চর্য! আমারও এতদিন নজরে পড়েনি! সত্যি! প্রদীপের আলো তো নয়, মনে হচ্ছে যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত ঘরটা ভরে গিয়েছে—!

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা যায়। গাড়ির শব্দ।

ওই বুঝি এল এতক্ষণে। সত্যি চমকে দেব। অবাক হয়ে যাবে।

গাড়ি থামার শব্দ : সিঁড়িতে মচমচ জুতোর শব্দ। Music-solo।

ওই আসছে।

সমীর : এ কী, বারান্দায় আলো জ্বালোনি! অন্ধকার! কী ব্যাপার? ভূতের মতো বন্ধ দরজার সামনে অমন চুপটি করে দাঁড়িয়ে কেন, সুমি?

সুমিত্রা : আজ তোমাকে একটা surprise দেব।

সমীর : সত্যি! কী বলো তো?

সুমিত্রা : যদিও তোমারই প্রথম আবিষ্কার, কিন্তু নতুন করে আজ তাকে আবার আমি আবিষ্কার করেছি।

সমীর : তোমাকেও যেন মনে হচ্ছে সুমি, নতুন করে আজ রাত্রে আবার আবিষ্কার করলাম। কই, কোথায় তোমার আবিষ্কার, চলো দেখি! ওই ঘরে নাকি—?

সুমিত্রা : না। জুতো খোলো, তারপর ঘরে—।

সমীর : (*হাস্য*) বেশ! যথা আজ্ঞা দেবী। নাও, এই পাদুকা মোচন করলাম।

জুতো খোলার শব্দ। দরজা খোলার শব্দ।

সুমিত্রা : এসো—দ্যাখো। সত্যি বলো এখন, আবিষ্কার করেছি কি না নতুন কিছু?

সমীর : ও কী! ও-প্রদীপ তুমি কোথায় পেলে—! নিভিয়ে দাও। নিভিয়ে দাও ও-প্রদীপ। অভিশপ্ত ওর আলো—নিভিয়ে দাও—।

প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় সমীর।

সুমিত্রা : ও কী করলে? অমন চমৎকার আলোটা নিভিয়ে দিলে?

সমীর : (ব্যাকুল স্বরে) তুমি তো জানো না কী নিদারুণ অভিশাপ আছে ওই প্রদীপের আলোয়! ও আলো নয়—মৃত্যুর হাতছানি!

সুমিত্রা : কী বলছ তুমি?

সমীর : হ্যাঁ। তাই তো মিউজিয়াম ঘরে সংগোপনে রেখে দিয়েছিলাম ওই প্রদীপটা!

সুমিত্রা : কিন্তু কী সুন্দর নীল আলো!

সমীর : নীল আলো নয় সুমিতা, ও বিষাক্ত নীল মৃত্যু—!

সুমিত্রা : মৃত্যু—!

সমীর : হ্যাঁ। আমার মিউজিয়াম ঘরে যে-ছবিটি আছে তিনি আমার শিক্ষাগুরু ডক্টর রুদ্র। দশ বৎসর আগের কথা। নতুন চাকরি। ডক্টর রুদ্রের সহকারী হিসাবে দক্ষিণ ভারতে খননকার্য চলেছে। মাস দুই বাদে হঠাৎ একদিন অকাল বর্ষা নামল টিপটিপ করে। তার মধ্যেই খনন চলেছে। আমি আর ডক্টর রুদ্র তাঁবুতে বসে আছি, হঠাৎ কুলিদের একটা গোলমাল কানে এল। কী ব্যাপার! গিয়ে দেখি ছিন্ন মেঘের আড়াল থেকে বৈকালী রোদ সিক্ত প্রকৃতির 'পরে ঝলমল করছে। যে-জায়গাটা ওই সময় খোঁড়া হচ্ছিল সেটা বোধহয় ছিল একটা মন্দির। খুঁড়ে বের করা সেই অতীতের মন্দিরের একটা ভগ্ন গম্বুজের পাদমূলে—।

সুমিত্রা : কী?

সমীর : ওই প্রদীপটা। আর ওই প্রদীপটাকে বেষ্টন করে আছে একটা ভয়ঙ্কর বিষধর কালসাপ।

সুমিত্রা : কালসাপ!

সমীর : হ্যাঁ। ডক্টর রুদ্রও আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ মতো আগুন জ্বেলে সাপটাকে তাড়িয়ে প্রদীপটা তাঁবুতে নিয়ে আসা হল। কুলিরা সাপটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু ডক্টর রুদ্র তা করতে দিলেন না। আমারও মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সাপটাকে মেরে ফেললেই হত—!

সুমিত্রা : তারপর?

সমীর : ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর রুদ্রর নাম তখন সারা ভারতে। তাঁর মুখেই একদিন শুনেছিলাম প্রথম যৌবনে একটি মেয়েকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহের মাত্র কয়েক দিন আগে হঠাৎ সর্পদংশনে সেই মেয়েটি মারা যায়।

সুমিত্রা : সর্পদংশনে?

সমীর : হ্যাঁ। আর তিনি বিবাহ করেননি। সেই মৃতার একটি ফটোই ছিল যেন তাঁর জীবনের সমস্ত সান্ত্বনা। কিন্তু যা বলছিলাম। সেইদিন সন্ধ্যার পর ডক্টর রুদ্রর তাঁবুতে গিয়ে দেখি হ্যাজাক আলোর পরিবর্তে তাঁবুতে সেদিন তিনি ওই প্রদীপটি জ্বেলেছেন। স্নিগ্ধ একটা জ্যোৎস্নার মতো নীল আলোয় তাঁবুটা যেন স্বপ্নসুন্দর হয়ে উঠেছে—আজও ভুলিনি সে-রাতটার কথা! সেই রাত—।

বলতে-বলতে সমীর থেমে যায়। Music শোনা যায় কয়েক সেকেন্ড।

ডক্টর রুদ্র : কে? ও, সমীর, এসো!—দ্যাখো, প্রদীপটা জ্বেলেছি! কী চমৎকার নীল আলো দিচ্ছে দ্যাখো!

সমীর : নীল আলো!

ডক্টর রুদ্র : হ্যাঁ। নীল আলো। দেখতে পাচ্ছ না?

সমীর : বাইরের চাঁদের আলো তাঁবুর মধ্যে এসে পড়েছে বলে—।

রুদ্র : না—না—ওটা ওই প্রদীপেরই আলো। বোসো, সমীর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আশ্চর্য! জানো সমীর, ওই প্রদীপের আলোর দিকে এতক্ষণ চেয়ে থাকতে-থাকতে আমার কী মনে হচ্ছিল জানো?

সমীর : কী, স্যার?

রুদ্র : একটা হারিয়ে যাওয়া সুর—অস্পষ্ট একটা অনুভূতি—অনেক—অনেক দিন বাদে যেন আবার হঠাৎ খুঁজে পেয়েছি। দক্ষিণ ভারতের এক প্রান্তে এই খোলা নির্জন প্রকৃতি—চারিদিকে অতীতের ভগ্নস্তূপ—এতকাল যা মাটির অন্ধকার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে ছিল আচমকা যেন তার ঘুম ভেঙেছে। কী যেন ওরা বলতে চায়। কী যেন ওরা জানাতে চায়—।

ভৃত্য রামরূপের প্রবেশ

রাম : সাব—!

রুদ্র : কে! রামরূপ—!

রাম : হাঁ, সাব। খানা তৈয়ার হো গিয়া—।

সমীর : চলুন, স্যার!

রুদ্র : না, সমীর। তুমি খেয়ে নাও গে যাও। আমি আজ আর কিছু খাব না।

সমীর : খাবেন না! কেন, স্যার—?

রুদ্র : শরীরটা যেন একটু—না হে, চিন্তার কোনও কারণ নেই! যাও!

রামরূপ ও সমীর চলে গেল। Silence; Music।

আশ্চর্য! কেন? কেন মনে হচ্ছে ওই প্রদীপ—প্রদীপের নীল শিখাটি আমার বড় পরিচিত? যেন কত—কতকালের চেনা নীল ওই শিখার মধ্যে কার—কার ওই মুখ ভেসে উঠছে! কে?

শাড়ির খসখস আওয়াজ। চুড়ির রিনঝিন মিষ্টি শব্দ। কে? কে?

প্রতিমা : (*মৃদুকণ্ঠে*) আমি!

রুদ্র : কে! কে—কাছে এসো! সামনে এসো!

প্রতিমা : আমায় চিনতে পারছ না?

রুদ্র : না তো! কে তুমি?

প্রতিমা : চিনতে পারছ না! আমিই তো সেই! জন্মে-জন্মে যাকে তুমি কামনা করে এসেছ! জন্ম হতে জন্মান্তরে আজও যার জন্য চলেছে প্রতীক্ষা! এই মুহূর্তেও যাকে তুমি ভাবছিলে—?

রুদ্র : কে—কে তুমি? তুমি কি—?

প্রতিমা : হ্যাঁ, আমিই সে-ই!

রুদ্র : তুমিই যদি সে-ই তবে সামনে আসছ না কেন? এসো—।

প্রতিমা : আমি তো তোমার পাশে-পাশেই আছি। তোমায় ছেড়ে যাব কেমন করে! এ যে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন!

রুদ্র : চিনেছি! চিনেছি—তুমি প্রতিমা! কিন্তু—কিন্তু সর্পদংশনে কি তোমার মৃত্যু হয়নি?

প্রতিমা : না—!

রুদ্র : প্রতিমা। প্রতি—তুমি—তুমি সত্যিই—!

প্রতিমা : না, প্রতিমা মরেনি—রঞ্জাও মরেনি! সুন্দর—সুন্দর—শিল্পী সুন্দর—।

রুদ্র : (*চেঁচিয়ে*) রঞ্জা! রঞ্জা!—

Clashing music for a while. সেই music-এর মধ্যে ক্রমে-ক্রমে 'রঞ্জা' ডাকটা যেন হারিয়ে গেল।

ঘোষক : রঞ্জা মরেনি—সুন্দরও মরেনি। কিন্তু কোথা থেকে এল তারা! কোথায় ছিল? কবেকার কথা? কতদিনকার কথা? হে অতীত, কথা কও! অনাদি অতীত কথা কও—!

Music চলতে থাকে। ঘোষকের কণ্ঠ মিলিয়ে যায়। ক্রমে নর্তকীর রুণুঝুনু নূপুর নিক্কণ শোনা যায় আর শোনা যায় তার সঙ্গে বীণের সুর-ঝংকার।

মহারাজ আদিত্য : বাঃ, বাঃ! সত্যি! অপূর্ব নৃত্য তোমার রঞ্জা! সুন্দর—সার্থক তোমার বীণ-সাধনা!

সুন্দর (রুদ্র) : মহারাজের অশেষ করুণা—!

Music—কিছুক্ষণ। লোহার গায়ে হাতুড়ি ধাবনের শব্দ ও হাপরের শব্দ শোনা যায়। নদীতীরে অস্ত্র-উদ্ভাবক অর্জুনের কুটির। অর্জুন অস্ত্র তৈরি করছে। হঠাৎ দুয়ারে করাঘাত শোনা যায়। হাতুড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করে।

অর্জুন : কে?

সুন্দর : দুয়ারটা খোলো, অর্জুন। আমি সুন্দর।

ঝাঁপ খোলার শব্দ।

অর্জুন : আরে, বীণবাদক সুন্দর! কী ব্যাপার, এত রাত্রে এই নির্জন শহর-প্রান্তে নদীতীরে? তাই তো, এই দীনের কুটীরে তোমায় কোথায় বসতে দিই বলো তো! বোসো—ওই প্রস্তরখণ্ডের 'পরেই বোসো। তারপর কী সংবাদ! মুখখানা অত গম্ভীর কেন যন্ত্রবিদ?

সুন্দর : অর্জুন, আমাকে একটা জিনিস তৈরি করে দিতে পারো?

অর্জুন : নিশ্চয়ই। বলো।

সুন্দর : একটি তীক্ষ্ন ছোট ছুরিকার প্রয়োজন আমার!

অর্জুন : ছুরিকা! বীণবাদক—যন্ত্রশিল্পী তুমি, অস্ত্রের প্রয়োজন কেন তোমার? ব্যাপারটা কী বলো তো? উহুঁ। এ তো ভালো ঠেকছে না!

সুন্দর : করে দেবে কি না বলো! আর কত পারিশ্রমিক দিতে হবে বলো?

অর্জুন : পারিশ্রমিকের প্রয়োজন নেই। এমনিই তোমাকে আমি একটি ছুরিকা তৈরি করে দেব, যন্ত্রবিদ!

সুন্দর : কবে আসব বলো? কবে পাব?

অর্জুন : কয়েকটা দিন দেরি করতে হবে। হাতে কিছু কাজ আছে।

সুন্দর : খুব শীঘ্র চাই।

অর্জুন : আগামী সপ্তাহে পাবে।

সুন্দর : বেশ! আসব আমি। এখন তাহলে উঠি।

অর্জুন : এখুনি যাবে?

সুন্দর : হ্যাঁ।

বিরতি—music—রাজপ্রাসাদ। মহারাজ আদিত্য ও তাঁর বয়স্য ভার্গব।

মহারাজ : বীণবাদক সুন্দর তো এল না, ভার্গব?

ভার্গব : খোঁজ নিয়েছিলাম মহারাজ। আজকাল গৃহে সে বড় একটা থাকেই না। প্রায়ই নদীতীরে একা-একা নাকি ঘুরে বেড়ায়। সেদিন সন্ধ্যায় তাই নদীতীরে গিয়ে তাকে ধরেছিলাম।

মহারাজ : তারপর? বললে আমার কথা?

ভার্গব : বলেছিলাম। তাতে সে বললে বীণ নাকি আর সে বাজাবে না। বীণ-বাদন ছেড়ে দিয়েছে।

মহারাজ : তাকে দেখা করে বলো আগামী বাসন্তী পূর্ণিমা উৎসবে তাকে বীণ বাজানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছি। বুঝেছ?

ভার্গব : নিশ্চয় জানাব, মহারাজ।

Music—মন্দির-সংলগ্ন কালভৈরবের কুটীর। রঞ্জা ও তার সখী মিত্রা।

রঞ্জা : সংবাদ পেলি তার, মিত্রা?

মিত্রা : হ্যাঁ সখী, পেয়েছি। মহারাজের নৃত্যশালায় সে আর বীণ বাজাতে যায় না। বাড়িতে থাকে না। একা-একা শুনি কেবল নদীতীরে ঘুরে বেড়ায়।

রঞ্জা : সামনের বাসন্তী পূর্ণিমা উৎসবেও তাহলে হয়তো সুন্দর রাজপ্রাসাদে যাবে না। তবে কী হবে, মিত্রা!

মিত্রা : তুমি যাবে শুনলে হয়তো যাবে।

রঞ্জা : কিন্তু যদি না যায়! একটা সংবাদ দিতে পারিস তাকে?

মিত্রা : এখানে ডেকে আনব!

রঞ্জা : না। কালভৈরব দেখলে সর্বনাশ হবে। শুধু একটা সংবাদ দিস তাকে : আগামী বাসন্তী পূর্ণিমা উৎসবে যেন সে যায়—আর।

মিত্রা : আর কী—?

রঞ্জা : আর বলিস, উৎসবের শেষে রাজোদ্যানে বকুলবৃক্ষমূলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তার অপেক্ষায় আমি থাকব। পারবি সখী এ-সংবাদটা তাকে দিতে?

মিত্রা : কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

রঞ্জা : কেউ যেন না জানতে পারে। বিশেষ করে ওই ভৈরবের অনুচর শকুনি—ওই শল্যটা।

মিত্রা : ভয় নেই। সন্ধ্যা হয়েছে, এখুনি যাচ্ছি।

Music—মিত্রা চলেছে। পশ্চাতে শল্যের ডাক শোনা গেল।

শল্য : আরে—শোনো! শোনো—প্রিয়ে মিত্রা, অত চঞ্চল চরণে কার অভিসারে চলেছ প্রিয়দর্শনা—?

মিত্রা : আ মরণ মিনসে! পিছু ডাকলে কেন বলো তো! কী? হয়েছে কী?

শল্য : এই অত্যাসন্ন সন্ধ্যায় কোথায় চলেছ, প্রিয়দর্শিকা। অভিসারে বুঝি?

মিত্রা : না! যমালয়ে। যাবে?

শল্য : আহা—হা—ও-কথা কেন? তুমি বিহনে যে আমার জগৎই অন্ধকার।

মিত্রা : অন্ধকারই যদি হয় তো একটা মশাল জ্বেলে নিয়ো—।

শল্য : হায় রে! মনের সে-অন্ধকার কি মশালের আলোয় দূর হয়, প্রিয়ভাষিণী? তুমিই যে আমার হৃদয়ের আলো! তোমা বিনে যে সব অন্ধকার।

মিত্রা : (*সকৌতুকে*) সত্যি?

শল্য : এখনও কি তা বুঝতে পারোনি, মিত্রা—তোমারই আলোয় যে আমি আলোকিত।

মিত্রা : আ-হা-হা! চু চু—চ—এতবড় প্রেম এ-অভাগিনীর কি সইবে—?

শল্য : সইবে না কি! বুকে করে রাখব তোমায়—।

মিত্রা : তাই রেখো—তবে তোমার বক্ষদেশে বড় কর্কশ রোমের প্রাচুর্য—কুটকুট করবে। (*টানা হাসি*)

শল্য : উৎপাটন করব। সব সমূলে উৎপাটন করে ফেলব।

মিত্রা : তাই তবে আগে করো—ততক্ষণ আমি একটু ঘুরে আসি—।

হাসতে-হাসতে মিত্রার পলায়ন।

শল্য : (*দীর্ঘশ্বাস*) হায় নারী!

বিরতি—music সহযোগে।

রুদ্র : তারপর?

রঞ্জা : তারপর এল সেই কালরাত্রি তোমার আমার জীবনের—সেই মধু বাসন্তী পূর্ণিমা উৎসব রাত্রি। মহারাজ আদিত্যদেবের নৃত্যশালায় সে-রাত্রে হয়েছে বিরাট নৃত্য-গীতের আয়োজন। নৃত্যশালার একধারে উচ্চাসনে আসীন স্বয়ং মহারাজ আদিত্য। পার্শ্বেই তাঁর রুদ্রেশ্বরের পূজারি কালভৈরব। নৃত্যশালায় সে-রাত্রে দর্শকের শ্রোতার দল যেন ভিড় করে এসেছে। তানপুরা সহযোগে গায়ক রঘুনাথ বসন্তরাগ আলাপ করছে।

তানপুরায় বসন্তরাগ আলাপ চলেছে। একটু পরে শেষ হতেই—।

সকলে : বাঃ! বাঃ! বাঃ!

মৃদু গুঞ্জন শোনা যায় দর্শকজনের। সহসা ভার্গব বলে।

ভার্গব : এবারে রঞ্জার নৃত্য! স্থির হন। আপনারা চুপ করুন।

ঘোষক : নৃত্যশালার সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল একে-একে। জ্বলতে লাগল কেবল একটি প্রদীপ। কিন্তু সেই একটি মাত্র প্রদীপের আলোয় যেন স্বপ্নের মতো একটা নীল দ্যুতি নৃত্যশালায় ছড়িয়ে গেল। ওই আসছে রঞ্জা। ওই শোনা যায় তার নূপুর নিক্কণ।

রঞ্জার নূপুরের শব্দ শোনা যায়। সভামধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনও শোনা যায়।

রঞ্জা : দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন, মহারাজ।

রঞ্জার নৃত্য শুরু হল। তার চরণাঘাতে নূপুর বেজে ওঠে।

মহারাজ : কী সুন্দর, বীণ তোমার নীরব কেন? যন্ত্রবিদ, যন্ত্রে তোমার সুরঝংকার তোলো।

সুন্দরের বীণ তার করাঙ্গুলি স্পর্শে টিং-টিং করে ওঠে। নৃত্য শুরু হয়। বীণ ও নৃত্য যেন পরস্পরের মধ্যে হারিয়ে যায়। সহসা বীণ মুহূর্তের জন্য থেমে যায়—একটা আর্ত চিৎকার কালভৈরবের কণ্ঠ হতে বের হয়। রঞ্জার নূপুর থেমে যায়।

সকলে : কী হল! কী হল!

কালভৈরব : আঃ!

মহারাজ : কী হল! কী হল প্রভু! আলো। আলো। সব আলো জ্বেলে দাও নৃত্যশালার।

কালভৈরব : (*যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে*) উঃ! গোপন ছুরিকাঘাত। আঃ—।

নৃত্যশালায় বহুকণ্ঠের একটা কাঁপা গুঞ্জনধ্বনি।

সুন্দর : (*চাপা কণ্ঠে*) রঞ্জা! রঞ্জা!

রঞ্জা : (*বিস্ময়ে*) অ্যাঁ—!

সুন্দর : চুপ! এসো—শিগগিরি চলে এসো!

রঞ্জা : কোথায়?

সুন্দর : দেরি কোরো না। এ প্রশ্নের সময় নয়, এসো। হাত ধরো আমার!

নৃত্যশালায় গোলমাল ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যায়—।

রঞ্জা : কোথায় চলেছ, সুন্দর?

সুন্দর : শীঘ্র চলো, আপাতত নদীতীরে অর্জুনের গৃহে—।

রঞ্জা : কিন্তু কালভৈরবকে হত্যা করলে কে?

সুন্দর : আমি—!

রঞ্জা : তুমি?

সুন্দর : হ্যাঁ। আমি! কিন্তু সময়ক্ষেপের অবসর নেই এখন—চলো পালাই!

রঞ্জা : কিন্তু মৃত্যুর আগে কালভৈরব যদি বলে দিয়ে থাকে। কিংবা মহারাজ যদি সন্দেহ করেন?

সুন্দর : তার আগে দূরে, বহু দূরে চলে যাব—!

এদিকে নৃত্যশালায় কালভৈরব মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে বলছে—।

কালভৈরব : উঃ, নিশ্চয় বলছি মহারাজ, এ সেই যন্ত্রবিদ সুন্দর—সে-ই ছুরিকা নিক্ষেপ করেছে আমায় —আর রঞ্জা—!

মহারাজ : সে কী! সুন্দর! সুন্দর কই?

ভার্গব : সুন্দর! সুন্দর!—তাই তো মহারাজ, নৃত্যশালায় সুন্দরকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না। রঞ্জাও নেই।

মহারাজ : দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈনিক এক্ষুনি প্রেরণ করো ভার্গব, দিকে-দিকে। যেমন করে হোক জীবিত বা মৃত তাদের দুজনকে ধরে আনা চাই—।

নদীতীর। সুন্দর ও রঞ্জা।

রঞ্জা : আর তো চলতে পারছি না, সুন্দর!

সুন্দর : আর সামান্য পথ। ওই সামনে অর্জুনের কামারশালা দেখা যাচ্ছে—আর একটু!

দূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি অস্পষ্ট শোনা যায়।

রঞ্জা : ও কী! ও কীসের শব্দ?

সুন্দর : মনে হচ্ছে অশ্বক্ষুরধ্বনি! শিগগিরি চলো রঞ্জা। ওই যে! ওই যে অর্জুনের কামারশালার আলো দেখা যায়। আমরা এসে পড়েছি।

অর্জুনের দরজায় করাঘাত।

অর্জুন! অর্জুন!

অর্জুন : কে?

সুন্দর : শীঘ্র দোর খোলো অর্জুন...!

দরজা খোলার শব্দ। অশ্বক্ষুরধ্বনি স্পষ্ট হয়।

অর্জুন : এ কী! যন্ত্রবিদ সুন্দর! সঙ্গে এই নারীই বা কে?

সুন্দর : সব বলব। আগে দুয়ার বন্ধ করো।

দুয়ার বন্ধ করার শব্দ।

আজ রাত্রের মতো আশ্রয় দিতে হবে ভাই। রাজসৈন্যরা আসছে আমাদের ধরবার জন্য।

অর্জুন : কিন্তু—।

সুন্দর : বন্ধু, কালভৈরবকে হত্যা করে রঞ্জাকে আমি তার কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি।

অর্জুন : কালভৈরব শয়তানটাকে হত্যা করেছ! বেশ করেছ। ভয় নেই। নির্ভয়ে এখানে থাকো তোমরা, কেউ তোমাদের সন্ধান পাবে না!

দরজায় এমন সময় করাঘাত।

সৈনিক : দুয়ার খোলো। দুয়ার খোলো।

অর্জুন : কে?

সৈনিক : রাজসৈনিক!

দুয়ার খোলার শব্দ।

অর্জুন : কী চান আপনারা?

সৈনিক : এ-পথ দিয়ে যন্ত্রবিদ সুন্দর আর নর্তকী রঞ্জাকে যেতে দেখেছ?

অর্জুন : না তো! কেন?

সৈনিক : পূজারি কালভৈবরকে সুন্দর হত্যা করে পালিয়েছে। যদি দেখতে পাও অবিলম্বে রাজদ্বারে সংবাদ দেবে।

অর্জুন : নিশ্চয়ই।

সৈনিক : চলো হে। আরও এগিয়ে চলো।

অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমে দূর-দূরান্তে মিলিয়ে গেল। বিরতি—Music।

রঞ্জা : তারপর মনে পড়ে, সুন্দর—স্থান হতে স্থানান্তরে আমরা কেবল ছুটে-ছুটে বেড়িয়েছি। পশ্চাতে আসছে তাড়া করে আদিত্যদেবের অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈনিকের দল। যে—সুখের ঘর আমরা বাঁধতে চেয়েছিলাম, তা আর বাঁধা হল না। মৃত কালভৈরবের সেই অভিশাপ আমাদের তাড়া করে ফিরতে লাগল। ওদিকে ক্লান্ত সৈনিকের দল ফিরে গেল ব্যর্থ হয়ে।

সৈন্য : কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না, মহারাজ।

মহারাজ : খোঁজো। যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে।

ভার্গব : আমার একটা নিবেদন ছিল, মহারাজ।

মহারাজ : বলো!

ভার্গব : সুন্দরকে আপনি ক্ষমা করুন।

মহারাজ : ক্ষমা করব! কী বলছ তুমি, ভার্গব! রুদ্রেশ্বরের পূজারি কালভৈরবকে সে হত্যা করেছে।

ভার্গব : তা সত্য। তবু বলব মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর শোধ তোলা যায় না। তা ছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটারই আমি খোঁজ নিয়েছি। সুন্দর আর রঞ্জা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। কালভৈরব সেটা সহ্য করতে পারলে না। তার কারণ—।

মহারাজ : কারণ?

ভার্গব : কারণ কালভৈরব মনে-মনে রঞ্জাকে চেয়েছিল। তাই সে—।

মহারাজ : বলো কী ভার্গব! এ-কথা কি সত্য? রুদ্রেশ্বরের পূজারি। আজন্ম ব্রহ্মচারী—।

ভার্গব : হ্যাঁ, সত্য—রঞ্জার সখী মিত্রাই আমায় সে-কথা বলেছে—তা ছাড়া কালভৈরবের ব্যভিচারের কথা সবাই জানে এ-রাজ্যে! এতকাল ভয়ে স্বর ফোটেনি কারও। কিন্তু এখন সব প্রকাশ্যেই বলাবলি করে।

মহারাজ : সত্য বলছ তুমি, ভার্গব! ওই কুৎসিত পুরোহিতটা!

ভার্গব : সত্য। তাই তাদের প্রেমের অন্তরায় কালভৈরবকে সুন্দরের পক্ষে হত্যা করা ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রেমের যুদ্ধে এ তো অন্যায় নয়, মহারাজ! আপনি ভেবে দেখুন—।

মহারাজ : কিন্তু সে নিজ হাতে বিচারের ভার তুলে নিল কেন? আমায় জানাল না কেন?

ভার্গব : তাতে করে তার চিরন্তন পৌরুষ কি অপমানিত হত না, মহারাজ! শুধু কি তাই, নিজেও কি সে তার প্রেমিকার কাছে ছোট হয়ে যেত না? নিজের প্রেমকে সে লজ্জা দিত না?

মহারাজ : তা হলে—?

ভার্গব : তাকে আপনি ক্ষমা করুন। ফিরিয়ে আনুন সুন্দর আর রঞ্জাকে। রঞ্জার মতো নর্তকী আর সুন্দরের মতো বীণবাদক এ-দেশের শিল্পের গৌরব। কে বলতে পারে হয়তো তাদের মিলনের মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্প-প্রতিভা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। এতবড় দুটো সম্ভাবনাকে অকালে এমন করে নষ্ট করে দেবেন না। মহারাজ, রাজদণ্ডের তরবারি-মুখে—।

মহারাজ : বেশ। তবে তাই হোক। সর্বত্র ঘোষণা করে দাও, সুন্দর ও রঞ্জাকে আমি ক্ষমা করেছি। তারা ফিরে আসুক। নিজ হাতে তাদের হাতে আমি মিলন-রাখি বেঁধে দেব।

Music—বিরতি।

ঘোষক : সেই ঘোষণা শুনে আনন্দে সুন্দর আর রঞ্জা ফিরে এল আদিত্যদেবের রাজ্যে একটি বৎসর পরে। এতদিনে সত্যি বুঝি তাদের সুখের ঘর বাঁধা হবে। কিন্তু হায় রে নিয়তি! কিন্তু থাক সে-কথা। এক বৎসর পরে আজ আবার সেই মধু বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রি। উৎসব অন্তে তাদের প্রথম মিলন রাত্রির মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের পরস্পরকে আরও কাছে আরও নিবিড় করে পাবে। রাজার নৃত্যশালায় আজ সেই বাসন্তী পূর্ণিমা উৎসব—সেই প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। স্বপ্নময় প্রদীপের নীল আলোয় লাস্যময়ী রঞ্জা নৃত্য করে। সুন্দর বাজায় বীণ!

নৃত্যের-নূপুর ধ্বনি। বীণের ঝঙ্কার শোনা যায়। হঠাৎ নূপুর থেমে গেল। রঞ্জার আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

রঞ্জা : উঃ!

সুন্দর : কী! কী হল রঞ্জা! ও কী, সাপ! সাপ—!

রঞ্জা : (*যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে*) হ্যাঁ, দংশন করেছে। বিদায় প্রিয়তম—(*মৃত্যু*)।

সুন্দর : রঞ্জা! রঞ্জা...!

মহারাজ : সুন্দর। সুন্দর—সরে যাও! সরে যাও—সাপটা তোমায় দংশন করল—!

সুন্দর : আঃ, দংশন করেছে বন্ধু! রঞ্জা! রঞ্জা—আমিও যাছি—আমিও যাচ্ছি। দাঁড়াও। দাঁড়াও—।

মহারাজ : এ কী! এ কী—সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপছে।

সকলে : (*ভয়ার্ত কণ্ঠে*) ভূকম্প! ভূকম্প!

একটা মিলিত গোলমাল। ভূমিকম্পের শব্দ। ঘরবাড়ি ভাঙার শব্দ। মানুষের আর্ত চিৎকার। Music।

বিরতি—Music! দূর হতে যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

সুন্দর : রঞ্জা। রঞ্জা।

রঞ্জা : সুন্দর। সুন্দর। কোথায় তুমি! কোথায়?

সুন্দর : সত্যি তুমি ফিরে এসেছ রঞ্জা! সত্যি এসেছ?

রঞ্জা : সুন্দর। সুন্দর—সাপ! সাপ—!

সুন্দর : কোথায়?

রঞ্জা : ওই। ওই যে—পালাও। পালাও—।

সাপটা যেন রূপান্তরিত হয় কালভৈরবে।

কালভৈরব : হাঃ হাঃ—।

রুদ্র : কে! কে!

রঞ্জা : কে! কে!

আবার হাসি। হাঃ হাঃ হাঃ।

রুদ্র : এ কী! এ কী—কালভৈরব!

রঞ্জা : কালভৈরব!

আবার হাসি : হাঃ হাঃ হাঃ—।

কালভৈরব : হ্যাঁ, তোদের নিয়তি।

রুদ্র : নিয়তি!

ফোঁস! সাপের গর্জন ও ছোবল।

রঞ্জা : আঃ!

রুদ্র : (*চিৎকার করে ওঠে*) রঞ্জা! রঞ্জা! প্রতিমা .....!

হাঃ হাঃ একটি হাসির অট্টরবে 'রঞ্জা' ডাকটা যেন হারিয়ে গেল।

Music চলবে কিছুক্ষণ—বিরতি।

সুমিত্রা : তারপর?

সমীর : তারপর পরদিন সকালে বেচারা রামরূপের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে উঠে তাঁবুতে গিয়ে দেখি মেঝেয়—ডক্টর রুদ্রের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। সর্বাঙ্গ নীল। সর্পদংশনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সুমিত্রা : সর্পদংশনে?

সমীর : হ্যাঁ। কারণ সামনেই মাটির 'পরে প্রদীপটা পড়েছিল আর প্রদীপটাকে চক্রাকারে বেষ্টন করেছিল একটা ভয়ঙ্কর বিষধর কালসাপ। কিন্তু এবারে আর সাপটাকে রেহাই দিলাম না। রামরূপ ও আমি লাঠির ঘায়ে সাপটাকে যমালয়ে পাঠালাম। তাই বলছিলাম সুমিত্রা, ওই প্রদীপ অভিশপ্ত—ওর নীল আলোর মধ্যে আছে মৃত্যু-বিষ।

সুমিত্রা : তোমার ধারণা, সেই সাপটার দংশনেই ডক্টর রুদ্রের মৃত্যু হয়েছিল?

সমীর : নিশ্চয়ই। তাতে কোনও ভুল নেই।

সুমিত্রা : আশ্চর্য! কিন্তু কেন?

সমীর : ডক্টর রুদ্রের সর্পদংশনে মৃত্যু, কালসাপ ও প্রদীপটার সত্য স্পষ্ট ছিল। কেবল স্পষ্ট হল না সেই রাত্রির মধ্যখানের কয়েক ঘণ্টার রহস্যটা। চিরদিন অন্ধকারাবৃত অস্পষ্টই থেকে গেল। তাই ওই 'কেন'র জবাব পাওয়া যাবে না।

সুমিত্রা : তোমার কী মনে হয়?

সমীর : আমার! আমার কী মনে হয় জানো, সুমি! ডক্টর রুদ্রের মৃত্যু, মাটি হতে খুঁজে পাওয়া ওই প্রদীপটা, আর সেই কালসাপের সঙ্গে হয়তো জড়িয়ে আছে একটা স্বপ্ন—একটা অতীতের হারিয়ে-যাওয়া কাহিনির ছিন্ন পৃষ্ঠা। ঘুম-ভাঙা স্বপ্নের মতো যা হারিয়ে গিয়েছে, যার কোনও সন্ধান আর পাওয়া যাবে না। তাই তো ওই প্রদীপটি সবার চোখের আড়ালে গোপন করে রেখে দিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন—একটা স্মৃতি!

Music।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৫৫



ছিপ

অদ্রীশ বর্ধন

কলোনির অন্যান্য লোকেদের কাছে শুনেছিলাম, অতীতে বোম্বাই-এর গোয়েন্দা-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন বৃদ্ধ মৃগাঙ্কবাবু। এই কথা শোনার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার বাসনা আমার মনে জেগেছিল। বয়সের বিরাট ব্যবধান থাকলেও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পর্যায়ে আমি পৌঁছেছিলাম। আমার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি শুধু এইটুকুই জানতেন যে, আমি, দেবব্রত ব্যানার্জি, কলকাতার ব্যাঙ্কের একজন কেরানি, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এসেছি সমুদ্রতীরবর্তী এই স্বাস্থ্যকর কলোনিটিতে। কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেননি, বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাপ্রবরদের অন্যতম আমিই শ্রী প্রশান্ত লাহিড়ী, ছদ্মনামে স্বাস্থ্য ফেরাতে এসেছি এখানে। শহরের কলরোল ছেড়ে এসেছিলাম শুধু শান্তি আর নির্জনতার লোভে—তাই নিজের নাম প্রকাশ করে সে-আশাটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনি।

তারপর একদিন কথায়-কথায় তাঁকে যে-প্রশ্ন আমি করলাম, সে-প্রশ্ন বোধহয় সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে প্রত্যেক গোয়েন্দাকে শুনে আসতে হয়েছে। জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, আপনি কোনও হত্যা-মামলায় কোনওদিন কাজ করেছেন?'

আমার দিকে তিনি একটা বিদ্যুচ্চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—অর্ধ-কৌতুকময়, অর্ধ-সন্দিগ্ধ সে-দৃষ্টি। তারপর বললেন, 'আমি সি.আই.ডি ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ছিলাম। যত রাজনৈতিক আর সন্দেহজনক বিদেশিদের নিয়েই ছিল আমার কার্যক্ষেত্র। তবে একবার একটা হত্যায় আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম—সেটা অবশ্য আত্মহত্যা—' এই বলেই তিনি চুপ করে গেলেন, চোখের তারা দুটি ঝিকমিক করে উঠল : 'আপনাকে সে-সম্বন্ধে আমি পরে একটা অদ্ভুত কাহিনি বলব—!'

হপ্তাখানেক পরে অপরাহ্নে চা-পানের পর আমরা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলাম। তিনি বিষন্ন-শান্ত চোখে সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্য দেখছিলেন। মুখটা বিষাদাচ্ছন্ন, চোখের দৃষ্টিতে কেমন জানি উদাস ভাব মাখানো। অধিকাংশ সময়েই উনি এইভাবে চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসেন। আমিও বসেছিলাম চুপ করে।

এক সময়ে আস্তে-আস্তে বললাম, 'মৃগাঙ্কবাবু, আপনি একদিন বলেছিলেন একটা আত্মহত্যার কাহিনি বলবেন....।'

যেন চমক ভাঙল মৃগাঙ্কবাবুর। পাইপটায় তামাক ভরে নিয়ে আবার তাকিয়ে রইলেন স্থির চোখে—দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিলেন বহুদূরে আকাশের কোলে, যেখানে অস্তগামী সূর্যের অপূর্ব সুষমায় আকাশ রাঙা হয়ে আছে।

সেখান থেকে যখন দৃষ্টি ফেরালেন, তখন বুঝলাম বিগত দিনের মালঞ্চ থেকে উনি চয়ন করে আনছেন একটি স্মৃতি-পুষ্প।

বললেন, 'দেবব্রতবাবু, বোম্বাইতে কাজ করার সময়ে আমায় একবার বিশেষ কাজে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকতে হয়েছিল। খিদিরপুরের দিকে আমার বাড়ি ছিল, আর ছিল আমার এক বন্ধুর। নাম তার জয়ন্ত। সত্যিই—জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ হলে তাকে আপনি পছন্দ না করে পারবেন না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেশবার তার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল—সেটা তার বিশেষত্ব। আমরা দুজনে প্রায় প্রতি রোববারেই হাঁটতে-হাঁটতে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতাম—ফিরতে রাত হয়ে যেত।...যে-রাতের কথা আমি বলছি, সে-রাতে বেশ এক চক্কর ঘুরে এসে জয়ন্তর বাড়িতেই আমি রাতের আহারটা সেরে নিলাম। ঘুম আমার তখন দু-চোখ জুড়ে আছে। ওর বাড়ি থেকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরেই আমার বাড়ি! জয়ন্ত কিন্তু বলে উঠল, ''এসো হে মৃগাঙ্ক! দু-এক পেগ খেয়ে যাবে না!'' নেশা ছিল না—তবে যে-লাইনে ছিলাম, সেখানে অত্যধিক ক্লান্তির পর শরীরটাকে তাজা করবার জন্য মাঝে-মাঝে রাম, হুইস্কি, ভারমুথের স্মরণ নিতে হত। জয়ন্তর অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না—ঢুকে পড়লাম ওর ঘরে। ভেতর থেকে একে-একে জানালাগুলোর ছিটকিনি তুলে দিতে লাগল জয়ন্ত।

'ওর এই ব্যাপারটা নিয়ে ওকে নিয়মিত ঠাট্টা করতাম। সারাদিন যখন সে বাইরে থাকত, জানালাগুলো থাকত খোলা—আর রাতের বেলা যত কিছু ছিটকিনি, খিল আর তালা! একদিন নয়, দু-দিন নয়—প্রতিরাত্রে এই ছিল তার অভ্যাস। এমনকী শোবার ঘরেও সে জানলা-দরজা ভেতর থেকে এঁটে শুত। যাই হোক, গ্লাস-বোতলগুলো তুলে রেখে যখন পথে বেরোলাম, শুনতে পেলাম জয়ন্ত আমার পেছনেই তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

'জয়ন্তকে আমি সেই শেষবারের মতো জীবিত দেখি।

'পরের দিন সকালে ট্রাম ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম সামনের দিক থেকে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে আমার দিকে হনহন করে এগিয়ে আসছে। শুনলাম, সকালবেলা ঠিকে ঝিটা যথাসময়ে কাজ করতে এসে যখন দেখল দরজা বন্ধ, কোনও সাড়া নেই আর গ্যাসের তীব্র গন্ধ—তখন সে ডেকে আনলে পাহারাওলাকে। পাহারাওলা ইন্সপেক্টরকে ডেকে এনে জানলা ভেঙে বাড়িতে ঢুকল, তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখলে, বিছানায় ওপর শায়িত জয়ন্তর মৃতদেহ, আর সবকটা বুনসেন বার্নারের গ্যাসের চাবি খোলা।

'জয়ন্ত কেমিস্ট ছিল। ওর শোওয়ার ঘরেই পার্টিশান-ঘেরা ছোট্ট একটা কাবার্ডে তাই সবসময়ে বুনসেন বার্নার, কেমিক্যালস আর অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত থাকত। সবকটা বার্নার থেকে এত গ্যাস বেরিয়েছে, পাহারাওলাটা নাকি ঘরে ঢুকেই প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল।

'যাই হোক, ইন্সপেক্টর আমায় চিনত, এ-সংবাদও রাখত যে, জয়ন্ত আমার বিশেষ বন্ধু। তাই সর্বপ্রথমেই ছুটে এসেছে আমার কাছে। তার সঙ্গে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে। মনে পড়ে যে, প্রথমেই সিঁড়ির নিচে খুপরি-ঘরটায় গ্যাসমিটারটার ওপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। শুধালে, ''আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, আমার তো মনে হয় এটা নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না। ধরুন, উনি বার্নার জ্বালতে গিয়ে দেখলেন যে, মেন-ককটা বন্ধ। অত রাতে আর কে নিচে নামে বলুন! উনি চাবিগুলো বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আচ্ছা, এই সময়ে যদি একটা বেড়াল ওই ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মেন-ককটার ওপর—'' খুপরি-ঘরটার প্রায় ছাদের কাছে, মিটার থেকে ফুটদশেক উঁচুতে একটা ভেন্টিলেটর ছিল। চারচৌকো গর্ত একটা, এবড়ো-খেবড়ো, কিন্তু মোটা-মোটা শিক বসানো। ''কিন্তু তাও দেখছি সম্ভব নয়'', হতাশভাবে মাথা নাড়তে থাকে ইন্সপেক্টরটি ''যদিও মেন-ককটা খুবই আলগা—কিন্তু একে খুলতে হলে তো দেখছি ওপর দিকে পাক দিতে হয়।''

'মৃতদেহটার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। দুঃখিতভাবে ইন্সপেক্টরটি বললে, ''চমৎকার মানুষ ছিলেন জয়ন্তবাবু। শেষে আত্মহত্যা করলেন।''

'তারপর যথারীতি পুলিশি তদন্ত হল। জয়ন্ত সবকটি জানলা-দরজা ভালো করে এঁটে বার্নারগুলোর চাবি খুলে দিয়েছিল—কাজেই যথাসময়ে করোনার তাঁর রায় দিলেন—আত্মহত্যা।

'পুলিশি তৎপরতার শেষ ওইখানেই।...কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা ছিল না, কেননা জয়ন্ত মোটেই আত্মহত্যা করেনি—তাকে ধীর মস্তিকে খুন করা হয়েছিল!'

আমি লাফিয়ে উঠলাম। বৃদ্ধের বাচনভঙ্গীতে আমি এমনই বিস্ময়-চকিত হলাম যে, মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে গেল : 'খুন! কেমন করে?'

'একটা ছিপ দিয়ে।' বললেন মৃগাঙ্কবাবু।

বিস্ফারিত চোখে আমি তাকিয়ে রইলুম। জয়ন্তবাবু গ্যাসে আত্মহত্যা করেননি—একটা ছিপ দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে!...'এ-সংবাদ তাহলে পরে প্রকাশ পেয়েছিল—তাই নয় মৃগাঙ্কবাবু?' বললাম আমি।

'না, কোনওদিনই প্রকাশ পায়নি।'

'কিন্তু আপনি তো জানতেন? আপনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন...'

'তবু কেন আমি বললাম না?' মাথাটা কাত করে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'অনেক কারণে, মশাই, অনেক কারণে। অতবড় একটা সত্য কোনও সি.আই.ডি.-অফিসারের চোখ এড়িয়ে যাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার—আমারও যায়নি! কিন্তু জয়ন্ত মৃত। তার হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলালে কি সে আর ফিরে আসবে? তা ছাড়া, আমি নিজেও একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, তার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু সে পেয়েছে।'

'কিন্তু আপনার ক্লু কী?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'ক্লু খুঁজতে গেলে আরও ছ'বছর পিছিয়ে যাওয়া দরকার। আর-একজন লোকের প্রসঙ্গে তাহলে আসা দরকার—তার নাম এখনও পর্যন্ত আমি উল্লেখ করিনি। জয়ন্তর বন্ধু সে, তার নাম.....না, তার নামে কোনও প্রয়োজন নেই। তার সন্তান এখনও জীবিত। ধরা যাক, তার নাম ছিল তন্ময়।

'আমার সঙ্গে জয়ন্তর আলাপ যতদিনের, তন্ময়ের সঙ্গেও জয়ন্তের ঘনিষ্ঠতা প্রায় ততদিনেরই। জয়ন্তর মৃত্যুর ছ-বছর আগে পর্যন্ত তাদের সে-ঘনিষ্ঠতা অম্লান, অক্ষুন্ন ছিল। ওই সময়ে তন্ময়ের বিবাহ হয়। আর এরপর থেকেই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হত ক্বচিৎ-কদাচিৎ।'

'আমরা—?'

মাথা নত করে সায় নিলেন মৃগাঙ্কবাবু : 'আমরা মানে তিন বন্ধু—আমি, তন্ময় আর জয়ন্ত। ব্যবসার কাজে কখনও-কখনও তন্ময়কে কলকাতার বাইরে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে হত। তা সত্ত্বেও, সে সময়ে যখনই আমরা কোনও ছুটি পেয়েছি—তিন বন্ধু মিলে একসঙ্গে উপভোগ করেছি সে-ছুটি। এমনিই নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তন্ময় তার অবসর সময় কাটাতে শুরু করলে তার নব-পরিণীতা তরুণী ভার্যার সঙ্গে। আর সত্যিই ভালোবাসত বটে তন্ময়! সমস্ত হৃদয়টা সে যেন স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়েছিল—' সংযত স্বরেই কথা বলছিলেন মৃগাঙ্কবাবু, তবুও শেষ শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময়ে তাঁর গলা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। বলে চললেন উনি, 'নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে এরকম গভীর ভালোবাসা বড় একটা দেখা যায় না—স্ত্রীকে তার অদেয় কিছু ছিল না, স্ত্রীর সামান্য শরীর খারাপ হলে চিন্তায় তার নিজের শরীরও যেন হয়ে উঠত অসুস্থ। প্রথম যৌবনের সে-ভালোবাসায় কোনও মলিনতা, কোনও স্বার্থ তার ছিল না।'

'আর তাঁর স্ত্রী?'

'তিনিও ভালোবাসতেন,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন মৃগাঙ্কবাবু : 'সত্যিই স্বামীকে ভালোবাসতেন তিনি। তবে তন্ময়ের মতো নয়। তন্ময় যেন নিজের হৃদয় দিয়ে তাঁকে দেবীর মতো আরাধনা করত, আর তিনি শুধু তাকে ভালোবাসতেন। কী সুন্দর.....কিন্তু তবুও তাদের এই সুখের পথের শেষে অপেক্ষা করছিল এক শোচনীয় বিয়োগান্তক ঘটনা। একটি শিশু : আর সূত্রপাত হল যত অনিষ্টের। যমে-মানুষে টানাটানি চলল,

ডাক্তাররা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনলেন তার স্ত্রীকে—কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাতে পারলেন না। যাওয়ার সময়ে ডাক্তাররা তন্ময়কে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন, আবার যদি তিনি গর্ভবতী হন, তাহলে পৃথিবীতে তাঁকে আর কেউ ধরে রাখতে পারবে না। আপনার বোধহয় শুনতে ভালো লাগছে না, নয়? জীবন আর মৃত্যু...অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা...আর তবুও...।'

বললাম, 'আপনি থামবেন না, আমার ভালোই লাগছে।'

গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন মৃগাঙ্কবাবু। দূরে দিগন্তরেখার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে ধরলেন। 'আমার আর ক'টা বছরই বা পরমায়ু...যাক, তন্ময় ডাক্তারের সতর্কবাণী কোনওদিন ভোলেনি, কিন্তু তার স্ত্রীর ভালোবাসায় বুঝি মালিন্য এসেছিল—তাই এর পরের শিশুটি তন্ময়ের ছিল না। সতর্কবাণীও ব্যর্থ হল না—' চোখের ইঙ্গিতে মৃগাঙ্কবাবু বাকি কথাটা শেষ করে দিলেন।

'তন্ময়বাবু জানতে পেরেছিলেন?'

'প্রকৃত পিতা কে? না, তখনও নয়....সে-সময়ে ডাক্তাররা শিশুটিকে রক্ষা করতে সমর্থ হল। স্ত্রীর দেহ ছাই হয়ে যাওয়ার পর তন্ময় একজন ভালো নার্স এনে শিশুটিকে সঁপে দিলে তার হাতে।'

বিষণ্ণভাবে মৃগাঙ্কবাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'এরপর সব গল্পে যে-রকম লেখে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। তন্ময়ের উচিত ছিল, শিশুটিকে দেখবামাত্র ঘৃণায় সরে যাওয়া, ও-শিশু তো তার নয়—আর ওর জন্যেই তো তাকে হারাতে হয়েছে তার স্ত্রীকে। কিন্তু কেন জানি না, শিশুটিকে না দেখলে সে থাকতে পারত না। যত দিন যেতে থাকে বয়স তার বাড়তে থাকে—বাড়তে থাকে তার ওপর তন্ময়ের স্নেহ।

'আর তারপরেই ঘটল অদ্ভুত ব্যাপার। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ পেল যে, শিশুটির ডান হাতের চেয়ে বাঁ-হাতটি অধিক তৎপর, অর্থাৎ, সে ন্যাটা। আপনি হয়তো বলবেন, এতে আর এমন কী হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল আর-একটি আশ্চর্য ব্যাপার—প্রশ্ন করবার সময়ে শিশুটি অদ্ভুতভাবে একটা ভুরুকে বেঁকিয়ে ওপরদিকে তুলছে। অনেক এইরকমভাবে আর কী—না, আমার দ্বারা হবে না। যাই হোক, আমি কী বোঝাতে চাইছি, তা নিশ্চয় বুঝছেন আপনি।'

মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম আমি : 'ওরকম সাধারণত দেখা যায় না। কতকগুলি স্নায়ু যদি একসঙ্গে মিলে-মিশে কাজ না করে—এরকম ভুরু বেঁকিয়ে প্রশ্ন করা দেখা যায় বটে। যাই হোক, ঘটনাটা রীতিমতো ইন্টারেস্টিং কিন্তু!'

'শিশুটির মধ্যে এই দুটি লক্ষণ আবিষ্কার করার পর তন্ময়ের মনে নরকের আগুন জ্বলে উঠল। কারণ, সে জানত তারই জানাশুনো একজন মাত্র লোকেরই ওইরকম ভুরু তুলে প্রশ্ন করার অভ্যাস আছে.....আর সে বাঁ-হাতেই সব কাজ করে।.....জয়ন্তই সে-পুরুষ—তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।'

'কিন্তু সেটা তো কোনও প্রমাণ নয়—।'

'প্রমাণ নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করছি না,' ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'বিষ্টা তন্ময়ের মনে কীভাবে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ল—শুধু সেই ছবিটাই আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আমি করছি। এতদিন তার মনে সন্দেহের বাষ্পটুকুও ছিল না—কিন্তু নিতান্ত অকস্মাৎ বিশ্বাস তার দৃঢ় হয়ে গেল। শিশুর মাকে সে যেমন ভালোবাসত, তেমনিই ভালোবাসত সেই বাচ্চাটিকে—দেখত তারই সামনে তাকে খেলাধুলো করতে—আর দিনের-পর-দিন এই দৃশ্য তাকে স্মরণ করিয়ে দিত শিশুর জন্ম-রহস্য। এই কথা চিন্তা করলেই তার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো রক্তের চাপে যেন ফেটে পড়বার মতো হত—মাঝে-মাঝে মনে হত এবার বুঝি সে উন্মাদ হয়ে যাবে—অসহ্য, দুঃসহ সে-চিন্তা....কিন্তু জয়ন্তর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রইল আগের মতোই নিবিড়, অম্লান। অপেক্ষা করতে লাগল তন্ময়, অপেক্ষা করতে লাগল উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের জন্যে, অপেক্ষা করতে লাগল সেদিনের জন্য—যেদিন সে নেবে স্ত্রী-হত্যার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ...।'

পাইপটার আগুন নিভে গেছল। তামাক ভরে আবার জ্বালিয়ে নিলেন মৃগাঙ্কবাবু। জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, খুনটার প্ল্যানটা এখনও ধরতে পারেননি আপনি?'

'আপনি একটা ছিপের কথা বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, সাধারণ ছিপ না—ফোলডিং ছিপ।'

'পেরেছি। কিন্তু আপনার মুখেই শুনতে চাই।'

বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকলেন মৃগাঙ্কবাবু : 'আপনি প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ', বললাম আমি।

চুপ করে রইলেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, 'ছিপটা বাগানের গুদোমের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল তন্ময়। আপনাকে তো আগেই বললাম, আমরা তিনজন বহুবছর ধরে মাইলখানেক জায়গার মধ্যে বাস করে এসেছি। বাড়ির বাইরে আর ভেতরে একজনের গতিবিধি আর-একজনের কাছে অজানা ছিল না।...যে-সন্ধ্যাতে আমি আর জয়ন্ত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, তখন তন্ময় জয়ন্তর বাড়িতে ঢুকে প্রথম সিঁড়ির তলায় মেন-ককটা দিয়েছিল বন্ধ ক'রে। তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে সবকটা বুনসেন বার্নারের চাবি দিল খুলে। অত রাতে ফিরে জয়ন্ত যে বার্নার জ্বালিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবে না—তা সে জানত। আর তা ছাড়া, ক'টা চাবি ঘোরানোর মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিকতা নেই যে, জয়ন্তর চোখে তা ধরা পড়বে। অত রাতে অ্যালকোহলের নেশায় বিছানায় শোওয়ামাত্র গভীর ঘুমে সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল।

'দরজার কাছ থেকে জয়ন্তর কাছে বিদায় নিয়ে আমি যখন চলে আসি, তখন বাগানে লুকিয়ে ছিল তন্ময়। শোওয়ার ঘরের আলো না নেভা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে রইল, তারপরেও আধঘণ্টা রইল লুকিয়ে। তারপর যখন, আমার অনুমান—যখন জয়ন্তর নাসিকাধ্বনি শুনতে পেলে, তখন বেরিয়ে এল বাইরে। গ্রীষ্মকালের পরিষ্কার রাত—হাতে সময়ও রয়েছে প্রচুর। কাজেই ধীরে-সুস্থে কাজ শুরু করল তন্ময়। ছিপের টুকরো-টুকরো অংশগুলো নিয়ে পরপর জুড়ে ফেলল—তারপর এসে দাঁড়াল জয়ন্তর শোওয়ার ঘরের জানলার নিচে। জানলার শার্সিতে লম্বা ছিপটা দিয়ে দিলে ছোট্ট একটা টোকা।

'তারপর অনুমান করে নিন। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করল সে—অবশেষে সে নিশ্চিন্ত হল যে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে জয়ন্ত। এরপর বাকি কাজটা খুবই সহজ—ছিপটাকে আবার টুকরো-টুকরো করে ফেলা হল, খুপরির ঘুলঘুলি দিয়ে একটির পর একটি টুকরো গলিয়ে দিয়ে আবার জুড়ে ফেলতে লাগল তন্ময়। তারপর খুপরির অন্ধকারে ছিপটা কিছুক্ষণ নাড়লে এদিক-ওদিক। শেষকালে ছিপের ডগায় যে-গোল রিংটা ছিল, সেটা আটকে গেল মেন-ককে। ওপরদিকে ছোট্ট একটি টান—খুলে গেল গ্যাসের পথ, আস্তে-আস্তে ছিপটাকে খুলে নিয়ে বাইরে বার করে আনল তন্ময়। সবশেষে ছিপের বান্ডিলটাকে রেন-কোটের তলায় রেখে বেড়াতে-বেড়াতে ফিরে এল বাড়িতে। শেষ হয়ে গেল সব!'

'জয়ন্তবাবুর যদি ঘুম ভেঙে যেত?' বললাম আমি।

'তাতে তন্ময়ের বিশেষ কিছু হত না। আধখানা জীবন পড়েছিল তাদের সামনে—একদিন-না-একদিন আর-একটা উপায় খুঁজে বার করতই। কিন্তু বিচারের সেই রাতটিতে জয়ন্তর ঘুম ভাঙেনি—কোনওদিন আর ভাঙল না...।'

প্রায় হপ্তাদুয়েক পরে বিকালের দিকে বেড়াতে-বেড়াতে গেলাম মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি। কিন্তু চায়ের আসরে সেদিন তিনি আর একলা নন। একজন মধ্যবয়সি লাবণ্যময়ী সুশ্রী ভদ্রমহিলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সীমান্তে অঙ্কিত তাঁর সিঁদুর-রেখা।

চলে আসছি, কিন্তু পেছন থেকে সমস্বরে ডাক দিলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'আরে মশাই, চললেন কোথা! বসুন, বসুন।'

যেতে আর পারলাম না। উনি হাসিমুখে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দেওয়ার আর দরকার নেই, একটু আগেই আপনার কথাই বলছিলাম। এই আমার একমাত্র কন্যা—পদ্মিনী চ্যাটার্জি—শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটে এসেছে আমায় দেখতে।'

উনি একদিনও ওঁর কন্যার উল্লেখ আমার কাছে করেননি। কিন্তু দুজনে মিলে আমায় এমন আন্তরিকভাবে অনুরোধ করতে শুরু করলেন যে, তাঁদের নির্বন্ধ এড়াতে না পেরে থেকে গেলাম। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, পদ্মিনী চ্যাটার্জি শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায়ই চলে আসেন এখানে। বৃদ্ধের জ্বরা-অঙ্কিত মুখে সেদিন যে কী অস্বাভাবিক উল্লাস আর আনন্দের প্রতিচ্ছবি দেখলাম! কন্যার সংস্পর্শে এসে যেন বেশ কয়েক বছর বয়স তাঁর কমে গেছে। অনর্গল তিনি কথা বলতে লাগলেন, মুহূর্তের জন্যেও কন্যার ওপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না। দেখলাম পদ্মিনী দেবীও পিতা-অন্ত প্রাণ।

নিঃশব্দে এই স্নেহ-মধুর দৃশ্য অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি, এমন সময়ে আমার ওপর চোখ পড়তেই হেসে ফেললেন পদ্মিনীদেবী।

'আমাদের এই বকবকানি শুনে আপনি কিছু মনে করছেন না তো? অনেক দিন বাদে বাবার সঙ্গে দেখা হল কিনা, তাই। কিন্তু এখন তো দেখছি বাবা একজন সত্যিকারের সঙ্গী পেয়েছেন—আমার পক্ষে সেটা খুব বিপদের কথা।' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই নয়, বাবা?'

বলে একটা সুদৃশ্য ভুরু অদ্ভুতভাবে বেঁকিয়ে তুললেন ওপর দিকে, আর তারপর লক্ষ করলাম, তিনি চা ঢালছেন বাঁ-হাত দিয়ে!

মাসিক রোমাঞ্চ

জুন, ১৯৫৬



আমার কান্না

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমশাই,

ছেলেবেলা থেকেই বড়দের মুখে শুনে আসছি যে, আমি ভীষণ বোকা। আর বড়রা যেহেতু নাকি গুরুজন, তাই ওই গুরুগম্ভীর গুরুজনদের অবশ্য দোষ দিই না আমি, কেননা ইস্কুলে যত পরীক্ষায় ফেল করা সম্ভব তার একটিতেও কখনও আমি পাশ করিনি। ফেল করতে-করতে আমি ছ'ফিট লম্বা হলাম, আমার গলার আওয়াজ বড়দের মতোই মোটা হয়ে উঠল, ঠোঁটের ওপরে নাকের তলায় গোঁফ গজাল, আর মাঝে-মাঝে, কোনওই কারণ নেই অথচ, খামকা বেজায় মনখারাপ হতে লাগল—ইজের-পরা বাচ্চাদের সঙ্গে এক ক্লাসে বসতে আর ভালো লাগল না—তাই একদিন কারু কোনও কথা কানে না-দিয়ে ইস্কুল ছেড়ে দিলাম।

বাবা গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন, যেহেতু তাঁরই নাকি সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব, 'এখন তবে কী করবে ভাবছ?'

কিছু না-ভেবেই ধাঁ করে আমি জবাব দিলাম, 'ব্যবসা করব।'

তারপর তো, আপনি জানেন, বাবার দেওয়া সামান্য মূলধন নিয়ে আমি যখন ব্যবসা চিনতে শিখেছি, ঠিক তখনই লাগল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং বলা বাহুল্য, কী করে যে আমি ভাগ্যের ঘোড়াকে জোর কদমে একরকম লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে নিয়ে চলেছি, তা আপনার আর অজানা নয়। এখন আমার যা রোজগার, আমার বয়েসের কোনও বি.এ.-এম.এ. পাশ ছেলেও তা ভাবতে পারে না। বেশ একটু মোটাসোটা আর ভারিক্কি হয়েছি। আমার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির চেহারাও ফিরেছে, চালচলনই এখন আলাদা, মণীশের কথায় বলতে গেলে 'রীতিমতো ফাটাফাটি ব্যাপার', আর এ-কথাও আপনি জানেন যে, বাড়ির লোকেরা এখন আমার সম্বন্ধে যা বলে তা শুনতে মোটেই খারাপ লাগে না। গুরুজনদের কথার তালেও বেশ একটা লঘু সুর এসেছে আজকাল।

কিন্তু বড়-সম্প্রতি আমি এক বিষম বিপদে পড়েছি। এবং সেই কারণেই আপনাকে সমস্ত খবর জানিয়ে এই চিঠি দিচ্ছি। কী-যে করা কর্তব্য আমার, আপনি তা জানালে, মিথ্যে বলছি না জানবেন, আমার প্রাণ বাঁচবে। আপনার হয়তো হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে, তাই পুরো ব্যাপারটা খুলেই বলি।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি ঠিকানা পালটেছি। আরও স্পষ্ট করে বলাই ভালো—আমি এখন আর কলকাতায় নেই। ঠিকানাটা আমার জানানো উচিত, এ-কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমার এখানকার

বাসস্থান পাঁচকান হলে আমাকে আর এই ধরাধামে আপনারা কেউ দেখবেন না। একটা প্যাঁচা কিংবা সোনালি চিল হয়ে হয়তো আপনাদের আশপাশে ঘুরব, আপনারা আমাকে চিনতেই পারবেন না।

আমি কী বলছি, তা বোধহয় এখনও আপনার কাছে স্পষ্ট হয়নি। হয়তো বুঝতে পারছেন না আমার কথা। যদি বুঝতে চান, তবে আসুন একবার আমার সঙ্গে আমার মাসতুতো ভাই মণীশের কাছে। আপনারা হয়তো মণীশকে চেনেন না, সে-ও আপনাদের কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। কিন্তু মণীশ পৃথিবীর সমস্ত পাখিদের চেনে। আর পাখিরাও নাকি মণীশকে চেনে। এই বিষয়টিই, অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, হয়েছে আমার অতর্কিতে এমনিভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার আসল কারণ।

গোটা ব্যাপারটা খুলে বলার আগে মণীশের একটু পরিচয় দিয়ে নেওয়া ভালো। মণীশের বয়েস আমারই মতো এবং আমার মাসতুতো ভাই হলেও আপনার হয়তো অবাক লাগবে শুনে যদি বলি পড়াশোনায় ও চিরকালই দুর্দান্ত ভালো। পরীক্ষায় কখনও ওকে দ্বিতীয় হতে দেখিনি। আমাদের বাড়ির সকলেই চিরকালই ওকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। ছেলেবেলায় তো যখন-তখন ওকে উদাহরণ হিসেবে জাহির করে আমাকে যা-তা কথা বলত আমার গুরুজনেরা। এ-হেন যে মণীশ, সে সম্প্রতি ডাক্তারি পাশ করে মাসকয়েক হল ডাক্তারখানা খুলে বসেছে। প্রথম-প্রথম উৎসাহ থাকলেও মাসতিনেকের মধ্যে যখন একটিও রুগি ওর হাতে মরতে এল না, তখন থেকেই ওর উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। ও অবশ্য নিজের পাড়ায় ডাক্তারখানা খুলে বসেনি, কেননা ও তো আর আমার মতো বোকা নয় এবং ওর চোখ-কানও চিরকাল খোলামেলা থাকে। ও তো জানে যে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। যদি-বা পায় কখনও-সখনও সে-ভিক্ষায় পুষ্টির চাইতে বিষই বেশি থাকে। দু-বেলা ক্ষিতীশের অবস্থা দেখেছে তো! ক্ষিতীশ মণীশের আগে ডাক্তারি পাশ করেছে, পাড়াতেই ডাক্তারখানা খুলেছে। রুগি আসে তার বেশ, কিন্তু টাকা আসে না, পকেট থাকে গড়ের মাঠ। অমুক-জেঠা ডেকে নিয়ে যান ব্যস্তসমস্ত হয়ে, 'শিগগির চলো একবার, ক্ষিতীশ, তোমার জেঠাইমার শরীর বড় খারাপ।' রুগি দেখা হয়, ওষুধ দেওয়া হয় রীতিমতো। আর অমুক-জেঠা পিঠ থাবড়ে বলেন, 'তুমি তো আমার ছেলের মতো। হেঁ-হেঁ-হেঁ, তোমার বাবা আমার প্রাণের বন্ধু ছিল হে, একেবারে হরিহর-আত্মা।' ক্ষিতীশ শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এবং ক্ষিতীশের এ-হেন বিচ্ছিরি হাল দেখেই পাড়া থেকে অনেক দূরে ডাক্তারখানা খুলল মণীশ, বড়সড় রংচঙে এক সাইনবোর্ড দিব্যি উৎসাহে টাঙাল, কিন্তু তবু তার রুগি আর আসে না। সকালে খবরকাগজ পড়ে, পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। এই নিয়মমাফিক চলেছে গত তিন-তিনটে মাস। কিন্তু তারপরও যখন কোনও রুগিই এল না, তখন 'ধুত্তোর ছাই' বলে বাড়িতেই প্রায়দিনই বসে-বসে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তাস পেটে বা আড্ডা মারে সবসময়, আর ফাঁক পেলেই আমাকে পক্ষী-চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

মণীশ আজকাল আমাকে প্রায়ই বলে, মানুষের আত্মা অমর। আর মানুষ মরলেই পাখি হয়ে বেঁচে ওঠে। প্রত্যেকটি পাখিই আসলে একেকজন ফউৎ-হওয়া মানুষ।

বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একদিন বলে ওঠে, 'দ্যাখ-দ্যাখ, ওই, পাখিটাকে দ্যাখ। আহা-হা, তাড়িয়ে দিস না, নমস্কার কর,' বলতে-বলতে নিজেই নমস্কার করে।

আমি হাঁদার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাই ওর দিকে, আর শুধোই, 'কেন? খামকা একটা পাখিকে সেলাম ঠুকতে যাব কেন?'

বিরক্ত গলায় মণীশ উত্তর দেয়, 'তোর মতো উজবুক আর দ্বিতীয় দেখিনি। উনি আর-জন্মে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন।'

প্রথম-প্রথম, সত্যি বলছি সম্পাদকমশাই—ওর এই অদ্ভুত ধরনের পাগলামিতে হাসতুম, আর আদ্ধেক কথাই বিশ্বাস করতুম না, এবং ভাবতুম গল্প লিখতে জানলে কোনও পত্রিকায় ওর কথা লিখে পাঠানো যায় 'বিচিত্র এক বাতিক' এই শিরোনামায়। মণীশ অবশ্য চুপ করে থাকত, কোনও কথা বলত না। ছাদে দাঁড়িয়ে

চুপ করে একদৃষ্টে পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর নীচের চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবত, ওদের মধ্যে কে আবার ওই বিশাল খোলা আকাশের প্রজা হয়ে তার হৃদয় অধিকার করবে!

বুঝতে পারছি আপনি হাসছেন, হয়তো ভাবছেন, লোকটা আগে শুধু গাড়ল ছিল, এখন আবার পাগলও হল। বিশ্বাস করুন, যদি আমার কথা মিথ্যে হত তবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুশি আমিই হতুম এবং আমিই হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠতুম।

সেদিন বিকেলবেলা আমি আর মণীশ ছাদের ওপরে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ মণীশের বুক ঠেলে একটা বেজায় করুণ দীর্ঘশ্বাস বেরুল, 'আহা!'

ওর মুখের দিকে তাকাতেই একটা শালিখ দেখিয়ে বললে, 'বেচারির বড় কষ্ট, আহা, একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে! সঙ্গী-সাথী কিচ্ছু নেই বেচারার!'

আমার ভয়ানক হাসি পেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে জীবনানন্দ দাশ আওড়ালাম, 'এ-জীবনে আমি ঢের শালিখ দেখেছি, তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়?'

মণীশ ভীষণ রেগে গিয়ে বিদঘুটে মুখ করে বলল, 'ঠাট্টা করছিস!' তারপর আবার গম্ভীরভাবে বসে থাকল, ওর সামনে চায়ের পেয়ালার সোনালি চায়ে উষ্ণ ধোঁয়া মিলিয়ে গিয়ে চায়ের ওপর সরের মতো একটা পাতলা পরদা পড়ল। তারপর হঠাৎ মুখ-চোখ ঝকমকিয়ে উঠল ওর, বলল, 'আচ্ছা, সত্যনারায়ণবাবু তো বড় একা-একা থাকেন, না? ওঁরও তো তিনকুলে কেউ নেই।'

আমি মাথা নাড়তেই বলল, 'ওঁরও তো তবে ভয়ানক কষ্ট। আহা, বেচারি!' তারপর এক চুমুকে সেই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা নিঃশেষ করে বললে, 'আচ্ছা, আমি একটু সিনেমা দেখে আসি। ''শহর থেকে দূরে'' ছবিটা নাকি তোফা হয়েছে!'

মণীশ চলে গেল। রাত্রে কখন বাড়ি ফিরেছে জানিনে, কেননা রাত্রে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সকালবেলায় খবরকাগজ খুলেই চমকে উঠলুম। লেখা আছে, বিখ্যাত স্বদেশী নেতা সত্যনারায়ণ লাহিড়ীর রহস্যজনক মৃত্যু। মণীশকে কাগজটা দেখালুম। প্রথমটা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল ও, তারপর বলল, 'চল তো, একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

ছাদে গিয়ে দেখি, আজ বসে আছে একটি না—দুটি শালিখ। আমাদের দেখে একটা শালিখ ভয়ে উড়ে গেল, আর-একটা আনন্দে চিৎকার করতে-করতে তার পিছু নিল।

মণীশ হাসিখুশি গলায় বললে, 'দেখেছিস শালিখটার কী আনন্দ? আগে একটা একাচোরা গোছের শালিখ কীরকম মনমরা হয়ে থাকত।'

শুনে প্রথমটা আমার বুকের রক্ত কীরকম যেন ছলকে উঠল। আমি ইচ্ছে করেই শালিখদের থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলুম। অন্যদিকে তখন কত-কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বকবকম করছে। দেখতে পেলুম, আমাদের বাড়ির সামনের দিকে গম্বুজের মতো করা, তাতে খোপ-খোপ আছে, পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া-আসা করছে। চারদিকে একটা পায়রা-পায়রা গন্ধ। ওপরে আকাশে একঝাঁক পায়রা দেখা গেল। শুনতে পেলুম, ওরা নানান সুরে কখনও রেগে চেঁচিয়ে, কখনও নরম সুরে ফুসলিয়ে আমাকে ডাকছে।

আমি সে-ডাকের কাছ থেকে যত দূরে পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালুম। কতগুলো কচি-কচি লালমুখো পায়রার ছানা আমাকে অবাক হয়ে দেখছে, আর তাদের মায়েরা চ্যাঁ-চ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। সারি-সারি খোপে অনেক পায়রার বাসা। চারদিকে পায়রার পালক, পায়ের নীচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে। আর কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ আছে—পায়রার গুয়ের।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, সব খোপে পায়রার বাসা, কেবল এককোণে দুটি খোপ ছাড়া। মণীশও আমার মতো ওই খালি খোপদুটির দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে চোখ পড়তেই বললে, 'বাড়িতে এত পাখি, কিন্তু দুটো চড়ুই না-হলে ভালো দেখায় না।'

সেই দিনই মণীশ গেল গঙ্গায় স্নান করতে। বাড়িতে ফিরে এসে বললে, 'দেখেছিস, কী সুন্দর দুটো চড়ুই!'

জিগ্যেস করলুম, 'কিনলি বুঝি?'

ও জবাব দিলে, 'না, এমনিই উড়ে এসে বসেছে।'

পরদিন খবরকাগজে দেখি, 'গঙ্গাবক্ষে দুইটি বালক-বালিকার আকস্মিক জলনিমগ্ন হইয়া মৃত্যু'। মণীশের গঙ্গাস্নান, দুটি বালক-বালিকার অপঘাত মৃত্যু এবং তারপরেই দুটো চড়ুই—নাঃ, এ যে বড়ই ভাবনার কথা! ব্যাপার খুব সহজ ঠেকল না আমার চোখে।

এখন কেন যেন মণীশকে দেখলেই একটু ভয়-ভয় করে। ও আবার এখন মাঝে-মাঝে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়, কিন্তু আমার সাহসে কুলোয় না। হাঁদা হলেও এটুকু বেশ বুঝতে পারি, পাখিদের জন্যে সমবেদনায় মণীশের প্রাণ অভিভূত হয়ে ওঠার পরেই কোনো-না-কোনো রহস্যজনক দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় এবং তাদের সঙ্গে মণীশের যোগাযোগ, প্রত্যক্ষভাবে যদি না-ও বা হয়, পরোক্ষভাবে একটু-না-একটু থাকেই—এ-সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ভারী কঠিন হয়ে ওঠে।

তারপর একদিন দেখা গেল, আমাদের অত-জোড়া পায়রার মধ্যে একটি মারা গেছে। এবং বিজোড় হওয়ার দরুন একটি পায়রাকে খুব আকুলি-বিকুলি করে ডানা ঝাপটাতেও দেখা গেল। অবশ্য সত্যি-বলতে-কী, আমি পায়রা-চরিত্র কিছুই বুঝি না। কোথাকার কোন নূহ বন্যার সময় পায়রা উড়িয়েছিল, তাদের জাতভাই ঘুঘুরা চড়ে বেড়ায় কারু-কারু ভিটেয়, কোন কবি নাকি সব প্লাবনের মধ্যেই একটি মাত্র পায়রাকে শোনেন—এসব উটকো অসংলগ্ন কথা ছাড়া কিছুই আমার জানা নেই পায়রাদের বিষয়ে। মণীশই আমাকে বার্তাটা দিলে, বললে, 'দেখেছিস, ওই পায়রাটার কী কষ্ট!'

সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল। কাল খবরকাগজে কী দেখব ভাবতেও শিউরে উঠলুম। যেমন ভাবেই হোক, আজ আর মণীশকে বাইরে বেরুতে দেব না।

সন্ধের মুখোমুখি মণীশকে বাইরে যেতে দেখে বললুম, 'মণীশ, আজ আর বাইরে যাসনি। আয়, লোক জোগাড় করে ব্রিজ খেলতে বসি।'

মণীশ বললে, 'আজ যে একটু বাইরে না-গেলেই চলবে না।' এবং আমাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দিলে না ও, সাঁ করে চলে গেল—চলে গেল নয়, কেটেই পড়ল বলা যায়।

পরদিন খবরকাগজে প্রকাশ বিখ্যাত দানবীর শিশিরকুমার ভট্টাচার্যর রহস্যজনক আত্মহত্যা। ছুটে গেলাম ছাদে—দেখি আর-একটা নতুন পায়রা কোত্থেকে উড়ে এসে ওই পায়রাদের সঙ্গে জুটেছে।

ভাবলুম এভাবে আর থাকা উচিত না, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। পুলিশকে একটা খবর দেওয়া উচিত—অন্তত আরও পাঁচজন নির্ভয়ে বাঁচুক, শান্তিতে থাকুক। জামা পরে বেরুতে যাব, দেখি মণীশ বাড়ি ঢুকল। একটা বাচ্চা পাখি দেখিয়ে বললে, 'একটা প্যাঁচার বাচ্চা। আহা, এর মা মরে গেছে! একে দেখার জন্যে একটা বড়ো ধাড়িমতো প্যাঁচা না-পেলে এর বড় কষ্ট হবে।'

তারপরেই আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোর তো দোকান আজ বন্ধ। রোববার না!' আমি মাথা নাড়তেই বললে, 'তুই বড় ঘরকুনো, বড় একা-একা থাকিস। এত একা-একা থাকা মোটেই ভালো দেখায় না। আহা, প্যাঁচাটাও বড্ড একা—।'

কী যেন বলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু গলা দিয়ে একটা কথাও বের হল না, আতঙ্কে চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল। ভয়ে, অস্বস্তিতে এই শীতের দিনেও সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। এবার ওই প্যাঁচার সঙ্গী আর-একটি প্যাঁচা হতে কি আমাকে এই সাধের মনুষ্যজীবন ছেড়ে যেতে হবে? বিশেষত ঠিক যখন আমি ব্যবসায় দেদার পয়সা লুটছি! পুলিশে খবর দেওয়ার সাহসও হল না। একটু সময় নষ্ট করলেই হয়তো একটা বিপত্তি হয়ে যাবে। সোজা ছুটলুম স্টেশনে, তারপর এখানে।

এখানকার ঠিকানা আপনাকে আর দিলুম না। দয়া করে খবরকাগজ ভালো করে পড়বেন। প্যাঁচার সঙ্গী হওয়ার মতো অন্য লোক না-পেলে মণীশ নিজেই হয়তো আত্মহত্যা করে বসতে পারে—অন্তত এইটেই আমি বিশ্বাস করি। ওই খবরটা কাগজে বেরুলেই আপনাদের কাগজে প্রকাশ করবেন। এখন এই মফস্বলে

ছোট্ট স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে চিঠি লিখতে-লিখতে জানলা দিয়ে সামনের হুইলারের স্টল দেখতে পাচ্ছি, সেখানে না কি আপনাদের মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত আসে।

প্রীতি ইত্যাদি। আশা করি, আপনারা সকলে কুশলেই আছেন। ইতি—।*

* সূর্য মিত্র ছদ্মনামে প্রকাশিত

মাসিক রোমাঞ্চ
মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৭



বড় ঘর

নেপাল মুখোপাধ্যায়

তারপর অনেকদিন চলে গেল। একদিন অনেক রাত্রে একজোড়া নূপুরের শব্দে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। মনে হল, বিবিঘর থেকে শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আর থাকতে পারলাম না। আস্তে-আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর খিলটা খুলে অন্ধকার বাগানের দিকে চেয়ে রইলাম। সেই যেখানে চোরকুঠুরি আছে। যার চাতালে আমি প্রথম আপনাকে দেখি। মনে পড়েছে? আপনি আমাকে দেখে মাথাটা নিচু করে ফেললেন আর রানিমা খানিকটা ঠাট্টা করতে কসুর করলেন না। ঠিক সেই চাতালের ওপরে একটা আলো এ-পাশ থেকে ও-পাশ পায়চারি করছিল। সমস্ত শরীরটা আমার দুলে উঠল। আগ্নেয় আলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিথর অন্ধকারে দৃষ্টিটা ছুড়ে মারলাম। মুঠো-মুঠো ঘন কালো বাতাস আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আবছা গাছের পাতাগুলো অন্ধ-কারের চাদরে কুঁকড়ে রইল আর শিশিরের কান্না ঝরল ডালে-ডালে। কতক্ষণ আমি চেয়েছিলাম জানি না। কিন্তু পায়চারি-করা আলো হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নূপুরের শব্দ থেমে গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু ডাকলেন : নায়েবমশাই! নায়েবমশাই—!

—আজ্ঞে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে বিবিঘরের দরজা খুলে গেল : আপনি তো জানেন, সেই বসন্ত-বাঈজিকে। আর এও তো জানেন, জমিদার বিশ্বম্ভরবাবু বসন্ত-বাঈজির নাচে রাতের পর রাত কত টাকাই না ঢেলেছেন। আমি জানতাম, রানিমা কেন আপনাকে অত ডেকে পাঠাতেন। বসন্ত-বাঈজির কাছে রাতের পর রাত মদ খেয়ে চলা রানিমাকে আঘাত দিয়েছিল বেশি। আর সেই ক্ষতস্থল যখন জ্বালা করে উঠত, তখন আর থাকতে পারতেন না। নায়েবমশাইয়ের হাত দিয়ে চিঠি ফেলতে পাঠাতেন। আমি জানতাম যে, চিঠি আপনাকে দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে মনে হত, চিঠিটা একবার খুলে দেখি। পিয়নের সামনা-সামনি কতবার গেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আসলে যে-দুঃখ রানিমার আছে, রানিমা যা চান, সে-কথা কখনওই চিঠিতে লেখা থাকবে না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি কোনওদিন এর জবানবন্দি দেওয়ার দিন আসে, তবে সেদিনের আলো যেন আমাকে দেখতে না হয়। কারণ, আপনি তো জানেন, আমি আর তাদের বাড়ির শিক্ষক নই। আর আমাকে জমিদারের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয় না। আমাকে যদি জমিদার বিশ্বম্ভরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে সত্য কথাটা বলতে হয়, তবে লোকে আমাকে বলবে মিথ্যেবাদী। এ অপরিচিতের জুলুম। সেইজন্যে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আর সেইজন্যেই

রানিমাকে আমার কোনও ঠিকানা জানাইনি। আজ যখন কলকাতার একটি কানাগলির বাড়িতে বসে আপনার চিঠিখানা পড়ছি, তখন সেদিনের সেই নূপুরধ্বনির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, খাসমহলের একটা ঘর থেকে ভেসে-আসা রানিমার কান্না আর নায়েবমশাইয়ের চঞ্চল পদক্ষেপ।

আপনি হয়তো শুনলে অবাক হবেন, আমি যেন কেমন বিমনা হয়ে পড়েছিলাম। বেশ মনে পড়ে, সেই অন্ধকার আমবাগানের মধ্য দিয়ে আমার লঘু পধ্বনি কেমন যেন শিরশিরিয়ে উঠছিল। কখন যে আমি বিবিঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তা জানি না। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, জমিদার বিশ্বম্ভরবাবু মাতাল হয়েছেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আঙুল উঁচিয়ে কী যেন বলছিলেন নায়েবমশাইকে। বসন্ত-বাঈজি—হ্যাঁ, বসন্ত-বাঈজিকে যদি আজ সামনে পাই, তা হলে আমার এতদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। মনের মধ্যে যে-প্রশ্নের পাহাড় জমে উঠেছে আজ, সেগুলো লাভার চাদর হয়ে মুড়ে দেবে বাঈজির দেহ। বিশ্বাস করুন, সেদিন বাঈজি মদ খায়নি—কিন্তু মাতাল হয়েছিল। মাঝে-মাঝে ঢলে পড়ছিল বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে। আমি জানালা দিয়ে একবার মুখ বাড়ালাম। ইচ্ছে করল, একবার রানিমার ঘরে যাই। ধীরে-ধীরে শরীরটা জ্বলে উঠল, আর আমি জানালা থেকে নেমে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালাম।

—রানিমা—রানিমা!—থরথর করে কেঁপে উঠলাম।

—রানিমা! শুনছেন, দরজাটা—।

খিল খোলার শব্দ হল। আমি ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লাম।

যেন সাপ দেখে চমকে উঠলেন রানিমা : আপনি—আপনি হঠাৎ এত রাত্রে? কেউ যদি দেখতে পায়?

—জানি—জানি। তবু—।

গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে। সমস্ত শরীরটা দুলছে। পায়ের তলায় আর-একটা প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় সমস্ত শরীরটাকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। ওপরে ঝাড়লণ্ঠনের আলোগুলো কী করুণ—কী মর্মান্তিক। দেওয়ালে টাঙানো বিশ্বম্ভরবাবুর ডাগর-ডাগর চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। ঝিঁঝি-ঝিল্লির একটানা শব্দ আছাড় খেয়ে পড়ছে কাচের শার্সির ওপর আর আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি সামনে।

হঠাৎ রানিমার ধমক শুনে চমকে ফিরে তাকালাম।

তিনি বলছেন : ভুলে যাবেন না, এসেছেন স্কুলে কাজ করতে। কোয়ার্টার পেয়েছেন এখান থেকে অনেক দূরে। এই মধ্যরাত্রে নিজের ঘর ছেড়ে নিশ্চয়ই ভুল করে এই অন্দরমহলে এসে পড়েননি। জেনে রাখুন বিদ্যুৎবাবু, এর জন্যে আপনাকে অনুশোচনা ভোগ করতে হবে। আপনি ধরা পড়বেন।

ধরা পড়ব! ইচ্ছে করল, রানিমার ওই সুন্দর মুখখানা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি। সমস্ত ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে ফেলি খানখান করে। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। আস্তে-আস্তে বললাম, ছুরি—রানিমা, বাঈজির হাতে ছুরি।

রানিমা প্রথমটা তাকিয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে। তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন : বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম, রানিমার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না। কেবল মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

বাইরেটা নিরঙ্কুশ অন্ধকার। মাথার ওপরে আকাশের অসংখ্য চোখ জ্বলছে। দশমীর একফালি চাঁদ মেঘের দোলায় ধাক্কা খেতে-খেতে থমকে দাঁড়াল খানিকটা। তারপর আবার ভাসতে লাগল একটানা। দূরে কোন এক পাকুড়গাছে কুবো পাখি শব্দ করে চলেছে। বাঁশের মাচানে মড়া শুইয়ে একদল লোক চলেছে শেওড়াফুলির গঙ্গায়। দূর থেকে তাদের হরিধ্বনির আওয়াজ ঘন বাতাসে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ারগাড়ির একটা অস্পষ্ট স্বর এগিয়ে আসতে লাগল সামনে। আমি বুঝলাম, এবারে আমাকে তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে। যে-কোনও মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কালো রাতের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিখ্যাত

জমিদার বংশের যে-পাপ এতদিন ধূমায়িত হচ্ছিল, শত-শত দরিদ্র চাষির ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত দিয়ে তৈরি যে-টাকা এতদিন ধরে মদের পেয়ালা আর বাঈজির নৃত্য-ছন্দে মিলিয়ে যাচ্ছিল, তার অবসান আজ আসন্ন। কিংবা নায়েব চারুচন্দ্র সান্যাল আজ জমিদার বিশ্বম্ভর হতে চলেছেন।

কুবো পাখিটা এখনও থেকে-থেকে ডেকে উঠছে। একটা সাদা প্যাঁচা অস্পষ্ট আলোয় পাখনা ভর করে উড়ে চলেছে। আর মিলকি বাদামতলা গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের জুনিয়র টিচার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে একটা অনাগত পরিবর্তন। ইচ্ছে করলে, পারতাম—পারতাম ওই কর্কশ গাড়ির আওয়াজকে মাটির ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। অথবা বসন্ত-বাঈজির হাত থেকে তীক্ষ্ন ছুরিটা কেড়ে নিতে। কিন্তু কী জানেন, নিজের ব্যক্তিত্বকে আমি কখনও নষ্ট করতে চাইনি। আর চাইনি বলেই আমি নিথর-নিস্পন্দ পাথরের মতো গাছের গায়ে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়িটা এসে দাঁড়াল রাজফটকের সামনে। দূর থেকে যে-আলোটা চাতালের ওপর ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম, সেটা এখন বেরিয়ে এল বিবিঘর থেকে। দপদপ করতে-করতে একেবারে নিভে গেল। সমস্ত অঞ্চলটা যেন মৃত্যুপুরী। মৃত্যুর তুষার-শীতল গুহায় আমরা কতকগুলো বন্য পশু সেই আদিম যুগে ফিরে গেছি। আমাদের তীক্ষ্ন নখর দিয়ে পৃথিবী চিরে-চিরে দেখছি আমাদের পূর্বপুরুষের ফসল। অক্টোপাসের মতো লোমশ বীভৎসতা আমাদের পাকে-পাকে গ্রাস করে ফেলেছে। জোরে-জোরে নিশ্বাস নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পায়ের কাছে কীসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। না, অন্য কিছু নয়—মানুষ। কিন্তু কোনও মানুষ যে পড়েছিল, তা অত দেখবার সময় পাইনি। বাগানের পাঁচিল টপকে যখন রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন রীতিমতো আমি হাঁপাচ্ছি। সমস্ত পৃথিবীটা আমার কাছ থেকে সরে গেছে। আমি একা—ভয়ানক একা। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে আমি সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে চলেছি। তারপর বেশ মনে আছে, খানিকটা ফিসফাস কথার আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি, ঘোড়ারগাড়ি আমাকে ফেলে রেখে পালাতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে কালো-কালো কতকগুলো লোক অচৈতন্য বিশ্বম্ভরবাবুকে এনে তুলল গাড়ির মধ্যে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। কিন্তু কী জানেন, বলতে এখনও সঙ্কোচ হচ্ছে। দেখলাম, রানিমাও তাদের দলে রয়েছেন। আপনি হয়তো কথাটা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। নয়তো ভাবছেন, আমি মিথ্যেবাদী। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে অনুরোধ করছি, আমরা শিক্ষকের জাত, সুতরাং মিথ্যে কথা খুব কমই বলে থাকি। রানিমাকে দলের মধ্যে দেখে আমি বিস্মিত হইনি, বরং এইটাই আশা করেছিলাম। রানিমা ধীরে-ধীরে গাড়ির মধ্যে উঠলেন। উঠল বসন্ত-বাঈজি। তারপর ধরাধরি করে বিশ্বম্ভরবাবুকে গাড়ির চালের ওপরে তুলে দেওয়া হল।

নায়েবমশাই বললেন, ফটকের ওপর ভার রইল এই সমস্ত নিয়ে যাওয়ার। গাড়িটা বাবুর বাগান পর্যন্ত খুব জোরে যাবে। তারপর মাটচিপি পড়লে বেগ কমিয়ে আনবে। সবাইকে বলে দিচ্ছি, খুব সাবধান—অন্তত ফাঁড়ির কাছ বরাবর গিয়ে যেন ভুল করে বসো না। তোমরা এগোও, আমি সাইকেলে যাচ্ছি পেছন-পেছন।

—শুনছেন?—এবারে বাঈজির গলা আমি কিন্তু ওখান থেকেই পাড়ি জমাব। আমার টাকাটা মিটিয়ে দিলে হত না!

—হবে—হবে। কাজ উদ্ধার হলে আপনি টাকা আসবে হাতে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

—তাহলে একটা কথা আছে।—বাঈজি এবারে নেমে এল গাড়ি থেকে। নায়েবমশাইকে সঙ্গে নিয়ে একটু সরে গেল। ফিসফিস করে কথা বলল অনেকক্ষণ। কী কথা বলেছিল আমি শুনতে পাইনি। তবে দুটো কথা ছিটকে এসেছিল হঠাৎ।

নায়েবমশাই বলেছিলেন কী যে বলেন আপনি! তবে আসবেন মাঝে-মাঝে। দেখা যাবে'খন।

আবেগে নায়েবমশাইয়ের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল বাঈজি। রানিমা একটাও কথা বলেননি। কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন বাগানের দিকে। বোধহয়, আমার ঘরের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তিনি। কী জানি কেন আজও বুঝতে পারিনি।

কিছুক্ষণ পরে সকলেই গাড়িতে উঠে পড়ল। আস্তে-আস্তে চলতে লাগল ঘোড়া।

গাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে আচ্ছন্নের মতো বেশ বসেছিলাম। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি

খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু-পাশে অফুরন্ত মাঠ। মিঠেল বাতাসের ঝাপটা চোখ স্বপ্নাতুর করে তোলে। আমি যেন কেমন কাল্পনিক হয়ে পড়ি। কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে কিছুই আর মনে স্থান পায় না। মন মাঠ-ঘাট ছাড়িয়ে বাগানের এক কোণে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। আকাশে চাঁদের চাঁদোয়া। মাঝে-মাঝে দিকচক্রবাল আশ্রয় করে শালবন উঁকি মারছে। আর হয়তো একটা-একটা করে শেয়াল আর্ত চিৎকারে রাত্রির বুক বিদীর্ণ করছে। ঘোড়ারগাড়িটা থেমে পড়ল। হয়তো কোনও এক বিপদের ইশারা পেয়েছে। নয়তো মাঝপথে কোনও প্রয়োজনের তাগিদ মনে পড়েছে। কিন্তু তাই বলে আমার যে ভয় করছিল, তা বলব না। বরং কেমন এক অশরীরী-আনন্দ আমার দেহে ভর করেছিল। অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পদক্ষেপ আমার বক্ষের স্পন্দনের সঙ্গে আমি যেন অনুভব করছিলাম। সামনের সিটে বসেছিল বসন্ত-বাঈজি। আবছা অন্ধকারে তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে বেশ বুঝতে পারছিলাম, দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের বিভিন্ন চিহ্ন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। কথা বলতে ইচ্ছে করলেও তাই চেষ্টা করলাম না।

একটা লোক ওপর থেকে নেমে বসন্তকে বলে, মাইজি, দূর থেকে সিপাহিরা সন্দেহ করেছে।

—তাহলে উপায়?—কেঁপে উঠল বাঈজির গলা।

—সামনের ওই পোলের তলায় গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিলে ভালো হয় না?

—আর এখান থেকে কতদূর যেতে হবে?

—ঠিক আছে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না।—লোকটা পিছনে তাকাল।

নায়েবমশাই সাইকেলে আসছেন। হাত নেড়ে ইশারা করে কী যেন বলছেন উনি : আরে, কী ব্যাপার? সামনে একটা লাইট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?

—আজ্ঞে স্যার, পোলের তলায়—।

—ঝটপট করো। লাশটা নামিয়ে নাও কাঁধে করে। তারপর মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলো। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। সামনের জঙ্গলটার মধ্যে গেলেই ওরা আর খুঁজে পাবে না।

দুটো বন্দুকের আওয়াজ হল।

ঘোড়া আর গাড়িটাকে টানতে-টানতে পোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল লোকগুলো। তারপর লাশটাকে কাঁধে করে নিয়ে ছুটে চলল সামনের জঙ্গলের দিকে। আমাকে আর বাঈজিকে সাইকেলে বসিয়ে নায়েবমশাই দুর্দান্ত বেগে সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললেন।

তুমি হয়তো হাসছ। কিন্তু তখন অত ভাববার সময় ছিল না। প্রাণ বাঁচাবার সমস্যাই ছিল কঠিন।

পেছনে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা। নায়েবমশাই মৃদু হেসে বললেন, মরুক খানিকটা ফাঁকা আওয়াজ করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পরে আমরা বনের মধ্যে এক পরিষ্কার জায়গায় এসে পৌঁছলাম।

নায়েবমশাই বললেন, হারি-আপ—হারি-আপ।

লোকগুলো অচৈতন্য বিশ্বম্ভরবাবুকে ধরাধরি করে একটা গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম। কোনও প্রতিবাদ করতে পারলাম না। বাধা দিতে পারলাম না। বরং মনের দরজা খুলে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, হাই-স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পরম নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। আঘাত পেয়েছে সে রানিমার কাছ থেকে। না-না, এখন আর তাচ্ছিল্য করব না তোমায়। তোমার জন্যেই যে এতসব কাণ্ড। গর্তের মধ্যে স্বামীকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার মনে কোনও কান্নার পাহাড় লুকিয়ে নেই। গর্তের মধ্যে সবাই মাটি ফেলছে অনবরত। অথচ চোখের জল আমার বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে না। কথাটা ভাবতে হয়তো তোমার বিশ্রী লাগছে। কিন্তু কী করব, মন যখন একজনের আকর্ষণে নিয়ত ছিন্নভিন্ন হয়, টাটিয়ে ওঠে বিষফোঁড়ার মতো, তখন নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যেতে বসি, ভাই। স্বামীকে পথের কাঁটা বলে

মনে করে ফেলি। তাই বলে কি আমি চেষ্টা করিনি? অনেক করেছি। তিলে-তিলে নিষ্পেষিত করেছি আমার দেহ। কতবার আমার গলা টিপে ধরেছি। কুটনো-কোটার বঁটি তুলে ধরেছি মাথায়। রাগে কখনও মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলেছি মুঠো-মুঠো করে। যখন কিছুতেই কিছু হয়নি, তখন অফুরন্ত চোখের জল ফেলতে দ্বিধাবোধ করিনি। কিন্তু—।

যখন স্কুলের ঘণ্টা পড়েছে, তখন হাতুড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি বুকে। পা ছড়িয়ে কান্নার বদলে জানালা খুলে দৃষ্টিটা ছুড়ে দিয়েছি স্কুলের খোলা চত্বরে। দেখেছি, একখানা ফরসা কাপড় পরে, দীর্ঘ ছায়া ফেলে এগিয়ে চলেছে হাই-স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস।

সেইজন্যে স্বামী তখন হয়ে গেছে আমার কাছে তুচ্ছ। সংসার হয়েছে নরকের রাজ্য। স্বামীকে গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে। নেশায় বেহুঁশ হয়েছে বলে তার এইরকম মৃত্যু।

জীবন্ত কবর কখনও দেখেছ তুমি? আমি ভাই দেখতে পারিনি। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, সেই রাত্রেই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারকে নিয়ে পাড়ি জমাব অন্য দেশে।

প্রাণপণে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটেছিলাম আমি। কতবার যে পড়েছি, তা বিচার করিনি। আমাকে যেতে হবে। পাঁচিল টপকে বাগানে নামতে হবে। তারপর দরজায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে টিচারকে। কাক-পক্ষীটি টের পাবে না। টিচারকে অবাক হওয়ারও সময় দেওয়া হবে না। ভোর হওয়ার আগেই আমাদের চলে যেতে হবে অনেক দূরে।

কিন্তু ভাই, ভোর হয়েই গেল। আমাদের চলে যাওয়া হল না।

হাঁপাতে-হাঁপাতে যখন পাঁচিল টপকালাম, যখন আস্তে-আস্তে ধাক্কা দিলাম দরজায়, তখন দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু আমার মনের মানুষকে দেখতে পেলাম না। বিছানাটা খাঁ-খাঁ করছে। বুকের ভেতরটা হু-হু করে পুড়ে যাচ্ছে।

আমি কি ক্রমশ আমার স্বামীর মতো মৃত্যু-গহ্বরে নেমে যাব? নয়তো পায়ের তলায় মাটি অত দুলছে কেন? ঘরের দেওয়ালগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে কেন?

বিশ্বাস করো তুমি, আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। ধপ করে বসে পড়লাম সেখানে।

ভোর হল।

এরপর গোটা চারটে সূর্য আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি খেলাম না, ঘুমোলাম না। কেবল শুনলাম, বাঈজির নূপুরের আওয়াজ আর নায়েবমশাইয়ের বিকট অট্টহাসি। ইচ্ছে করল, বিক্ষোভে ফেটে পড়ি। জোর করে প্রচার করে দিই, নায়েবমশাই যে বাইরের লোকদের বলে বেড়াচ্ছেন, বিশ্বম্ভরবাবু বিদেশে হাওয়া বদল করতে গেছেন, সে-কথা ভুল। বিশ্বম্ভরবাবুকে মেরে ফেলা হয়েছে। জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। কেঁদে-কেঁদে বলতে ইচ্ছে করল, ওগো, তোমরা চলো—দেখবে চলো সেই জায়গা। আমি জানি গো জানি, সেখানে গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘাস জন্মেছে। আমাকে তোমরা ফাঁসি দাও—জেলে দাও—কিন্তু নায়েবমশাইকে ছেড়ো না।

কথাগুলো সমুদ্র-সফেনের মতো আছাড় খেয়ে পড়ল হৃদয়ের পটভূমিতে। আমি বুকফাটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। সকলে বলল, আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছি।

সত্যিই তো, নইলে অমন করে আমি বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকব কেন? আর কেনই বা হঠাৎ নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে বসন্ত-বাঈজির ঝগড়া শুনে পালানোর চেষ্টা করব।

ঘর যেন আমার কাছে কয়েদখানা। বাইরের খোলা আকাশ আমার কাছে মুক্তির সমুদ্র। হয় আমার মনের মানুষকে ফিরিয়ে দাও, নয়তো কবরখানা থেকে উদ্ধার করো আমার স্বামীকে। তা না হলে আমি বাঁচব কাকে নিয়ে? তুমি তো বলেছিলে নায়েবমশাই, বিশ্বম্ভরবাবুর মৃত্যুর বদলে আমায় এনে দেবে মনের মানুষকে। কই, সে-সত্য পালন করলে কই?

কোথায় যাব—কোথায় যাব আমি?

দুরন্ত ঝড়ের মতো আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন নায়েবমশাই : না, তোমার যাওয়া হবে না।

—মানে! কী বলতে চাও তুমি?—ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়ালাম আমি।

বসন্ত-বাঈজি ছুটতে-ছুটতে এল—বলল, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ওকে।

—না, ছাড়ব না।

—কী ভেবেছ তুমি? এতদিন ধরে আমাকে কথা দিয়ে—।

—ভুল—ভুল বাঈজি। আমি রানিকে ভালোবেসেছি।

—ওঃ, তাই নাকি!—ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো বাঁকা হাসি বসন্ত-বাঈজির : তুমি বসন্ত-বাঈজিকে চেনো না, নায়েব। এই মুহূর্তে তোমাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন—।

কারও কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই। সমস্ত জঙ্গল খাঁ-খাঁ করছে। আমি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম সেই কাঁটা-ঝোপের মধ্যে। যখন চেতনা ফিরে এল, দেখলাম, সকাল হয়ে এসেছে। কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি, ভাই। আজ দশদিন পরে তোমার কাছে আমার মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু মন আর সাড়া দিচ্ছে না। যতবার মনে ভাবছি, এই ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই—ততবার মন আমাকে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে। কখনও ভাবছি, আবার ফিরে যাই। কিন্তু কবর থেকে জ্বলন্ত চোখ নিয়ে আমার স্বামী আমায় পুড়িয়ে মারছে কেবলই। কী করি—কী করতে পারি আমি? আচ্ছা, বলতে পারো, কেন এমন হল?

মাসিক রহস্য পত্রিকা

এপ্রিল-মে, ১৯৫৭



নিশ্বাস

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

ভয়ঙ্কর এই নিশ্বাস। এই নিশ্বাসের জন্যই দত্ত-বাড়ির সমস্ত শান্তি বিনষ্ট। অশান্তির চেয়েও ভয়াবহ এই নিশ্বাস। ছোট থেকে বড়, বড় থেকে বৃদ্ধ সকলের মনেই কী এক উৎকণ্ঠা, কী এক দারুণ ভীতি চোখে-মুখে। মনে হয়, এ-বাড়ির কারও চোখেই ঘুম নেই। ঘুমোতে পারছে না ওরা বহুকাল ধরে। নিশ্বাস বলে যে ছোট্ট কথাটা—নাসারন্ধ্র-পথে বায়ুগ্রহণ আর পরিত্যজন এই নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ভীতির প্রসারও যে হওয়া সম্ভব, সে কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু কঠিনই নয়, নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে পৃথিবী চলে না। সুতরাং বাস্তবে সত্যই এরকম ঘটেছে। যার জন্য রাত্রির নৈঃশব্দে এ-বাড়ির কারও দুটি চোখের পাতা এক করবার উপায় নেই। উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয় সকলকে সেই একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য। সেই ভয়, সেই উৎকণ্ঠা। কখন পড়বে সেই নিশ্বাসটা, আর সেইসঙ্গে তীব্র আর্তনাদে সমস্ত বাড়িটাতে শোরগোল পড়ে যাবে। হইচই করে আসবে সকলে। তারপর রীতিমতো একটা কলরব, আর সেই-সঙ্গে এ-বাড়ির প্রত্যেকের মনে ছায়া-ছায়া দুলবে সেই ভয়-ভয় রহস্য। এ ওর মুখে-মুখে তাকাবে এবং সেইসঙ্গে প্রবলতম ত্রাসে গায়ের লোমগুলোও কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে যাবে টানটান হয়ে।

গত ছ'মাস ধরেই এই দারুণতম ভীতি দত্ত-বাড়ির কোঠায়-কোঠায়, আনাচে-কানাচে আর প্রত্যেকটি মানুষের মনে। প্রতিটি রাত্রির আসন্ন সম্ভাবনায় কী এক অজানিত ত্রাসে সকলে কুঁকড়ে আসে। ওরা ভয় করে রাত্রিকে। জানে, রাত্রি আসা মানেই সেই নিশ্বাস—আর নিশ্বাস মানে যে কী ভয়ঙ্কর—সে-কথা ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠতে হয়।

ছ'মাস আগেও বাড়ির সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। ঘুমোবে না-ই বা কেন? অশান্তির কোনও ইঙ্গিতই ছিল না এ-বাড়িতে। দত্তরা শহরের মান্যগণ্যই শুধু নয়, রীতিমতো ধনশালী পরিবার। দু-তিন রকমের চালু ব্যবসা, প্রচুর ধন-সম্পত্তি রেখে স্বর্গে গেলেন প্রাণহরি দত্ত। সংসারে পড়ে রইল তাঁর বিধবা-স্ত্রী উমাসুন্দরী, দুই ছেলে নন্দ আর অরিন্দম, আর একটি মাত্র মেয়ে সুজাতা। সুজাতার বিয়ে হয়ে গেছে। নন্দকে আগেই বিয়ে দিয়ে সংসারী করে গেছেন প্রাণহরি দত্ত। বাকি অরিন্দম। সে এখন পোস্ট-গ্রাজুয়েটের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। বলতে গেলে রীতিমতো সুখের সংসার। কিন্তু সেই সংসারে এমন করে অশান্তির আগুন জ্বলবে কে ভাবতে পেরেছিল তখন?

সেই ভয়ঙ্কর নিশ্বাসটা যে কখন, রাত্রির কোন নির্দিষ্ট প্রহরে পড়বে তার স্থিরতা নেই। ছ'মাস আগে শ্রাবণ মাসের এক রাত্রিতে হঠাৎ মৃত্যুদূতের মতো নিশ্বাসটা ঢুকেছিল। ঢুকে সকল শান্তি বিনষ্ট করে ভয়াবহ সঞ্চারিত ত্রাসে সকলের সুখ কেড়ে নিয়েছিল চোখের পাতা থেকে।

শ্রাবণের থমথমে বর্ষা-রাত্রি। ঝিরঝির করে সন্ধ্যা থেকেই ক্লান্ত বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির সঙ্গে একটু শৈত্যের মোলায়েম রমণীয় স্পর্শে ঘুম নেমে আসতে বিলম্ব হয়নি। বাইরে বর্ষণমুখর শ্রাবণ তামসী কী এক নৈঃশব্দ্যের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেছে। দত্ত-বাড়ির ঘরে-ঘরে সকলে পরম আয়েশে ঘুমোচ্ছে। এমনকী তেতলার বারান্দার এক কোণে গুটিশুটি হয়ে ঘুমে অচৈতন্য হয়েছে অরিন্দমের শখের কুকুর বিউটি পর্যন্ত। হঠাৎ, একান্ত আকস্মিকভাবেই সেই সতেরোই শ্রাবণ বর্ষণ-ঘন তামসীর মধ্য-প্রহরে সমস্ত বাড়িটাকে সচকিত করে ফেটে পড়ল ভয়াবহ তীব্র আর্তনাদ। সে-আর্তনাদে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর ত্রাস। হুটোপুটি, ঝুটপাট অন্ধকারের মধ্যে। তারপর সঙ্গে-সঙ্গেই টুকটাক আলো জ্বলে উঠল সমস্ত ঘরে।

মুহূর্তের মধ্যে সকলে জড়ো হল বারান্দায়। এ-ওর দিকে তাকাল। এই মধ্যরাত্রে অমন করে আর্তনাদ করে উঠল কে? সহসা সকলে ছুটে এল। একসঙ্গে দুপদাপ দরজায় ঘন-ঘন করাঘাত। একসঙ্গে।

উমাসুন্দরী হঠাৎ কেঁদে ফেললেন, বললেন, এ আমার কী হল? ও নন্দ, নন্দ। দরজা ভাঙ বাবা, ভেঙে ফেল।—বলেও যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না উমাসুন্দরী। দরজায় ঘন-ঘন করাঘাত করছেন, চিৎকার করে বলছেন, অরু, অরু, দরজা খোল বাবা। কী হল রে তোর?

ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। চুপচাপ। নিঃশব্দ। তারপর দরজায় কান পেতে একসময় উমাসুন্দরী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন : ওরে নন্দ, তোরা দরজা ভাঙ, অরু গোঙাচ্ছে।

রীতিমতো ভয়ের কারণ। কে জানে এমন মধ্যরাত্রিতে কোন আততায়ী কী করে বসেছে। খুন? জখম? হ্যাঁ, তাও হতে পারে। হতে পারে না এ-কথা বলা শক্ত। আর সেই কথা ভেবে উমাসুন্দরী ঠকঠক করে কাঁপছেন। কী একটা সংশয়ে রুদ্ধ-নিশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে যখন একসঙ্গে সকলে ঢুকল, দেখল, সোফার ওপর আধশোয়া হয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে অরিন্দম। এমনভাবে বসে রয়েছে যেন হঠাৎ দেখলে মনে হবে একটা নিষ্প্রাণ দেহ। কিন্তু না, নিষ্প্রাণ নয়। অরিন্দমের বুকের পাঁজরের তলায় ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। নিশ্বাস নিচ্ছে। নিচ্ছে খুব আস্তে। কিন্তু ওর চুলগুলোর ওপর দিয়ে এই কিছুক্ষণ আগে যেন ধুলোর ঝড় বয়ে গেছে। পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো অবিন্যস্ত। সেখানে একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন। সারা দেহে ওর অবশ ক্লান্তি। সেই ক্লান্তিতে চোখ দুটো আধ-বোজা করে স্থাণুর মতো নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। ঘরখানিও এলোমেলো। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড একটা টাইফুনে ছত্রখান হয়ে গেছে একটা জনপদ আর তার মধ্যে মূলোৎপাটিত পত্রবহুল বিটপীর মতো কাত হয়ে পড়ে রয়েছে অরিন্দম।

ঝড়ের বেগে ছুটে এসে উমাসুন্দরী জাপটে ধরলেন ছেলেকে। বার-দুই ঝাঁকি দিয়ে বললেন, কী, কী হয়েছে রে, অরু?

অরিন্দম নিরুত্তর।

সে-দিন বাকি রাত্রিটুকু আর শয্যায় ফিরে যায়নি কেউ। অরিন্দমকে নিয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় ঘুম দূরে থাক, একটু ঘুমের আমেজ পর্যন্ত আসেনি দু'চোখের পাতায়।

দ্বিতীয় দিনও ঠিক একই ব্যাপার। রাত্রির মধ্যপ্রহরে আবার সেই তীব্র আর্তনাদ। আবার দুপদাপ হইচই। তৃতীয় দিনে নন্দ আর উমাসুন্দরী অরিন্দমের ঘরে বিছানা করলেন। দেখা যাক, কী এমন হয়। দুজনেই অরিন্দমের মাথার কাছে বসেছিলেন। খানিকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রার আবেশ দেখা গেল অরিন্দমের চোখে। চুপচাপ বসে-বসে দেখছিলেন মা-ছেলে দুজনে। কিন্তু এমনি আশ্চর্য যে, একই ঘরে তিনজন মানুষ থাকা সত্ত্বেও উমাসুন্দরী আর নন্দের মনে ছমছমে একটা ভয় নেমে এল। রুদ্ধ নিশ্বাসের প্রহর গুনতে লাগল ওরা সন্ত্রাসে।

সময় এগুচ্ছে যত, তত মা আর ছেলে মুখোমুখি তাকাচ্ছে। বাইরে ঝিমঝিম করছে নিথর কালো রাত্রি। সমস্ত এলাকাটা বরফ-শীতলতায় সুষুপ্ত। জানালার পরদা উড়িয়ে কয়েকবার ঝাপটা বাতাস এসে দেওয়ালে-দেওয়ালে আছড়ে পড়ল। আহত পাখির মতো ঝটপট করে ডানা ঝাপটাল ক্যালেন্ডারগুলো। ঘরের ঠিক মাঝখানে দড়িঝোলা বিজলি-বাতিটা দুলল। আর তারচেয়েও রহস্যজনকভাবে দুলতে লাগল, অতন্দ্র উৎকণ্ঠিত দুটি প্রাণীর ত্রাসায়িত মন। সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ভয়ে-ভয়ে ওরা তাকাল দেওয়ালের দিকে, জানালায় আর দড়িঝোলা বিজলি-বাতির দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই ভয়ঙ্কর আর্ত-চিৎকার। সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল। প্রাণপণ শক্তিতে লাফিয়ে উঠে এসে সোফার মধ্যে এলিয়ে পড়ল অরিন্দম। সদ্য জবাই-করা পাঁঠার মতো ছটফট করল খানিকক্ষণ। তারপর স্থির, পাষাণ।

পাঁচ দিনের মাথায়ও এ-রহস্যের কোনও নিশ্চিন্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। ওরা তো পারলই না তিনজন ডাক্তার পর্যন্ত হিমসিম। তাঁদের মতে এটা নিতান্তই ভয় থেকে উৎপত্তি। কিন্তু মধ্যরাত্রিতে অরিন্দমের হঠাৎ এই আর্তনাদের পশ্চাতে কোন রোগ, কোন রহস্য অথবা কোন ভৌতিক আত্মার কারসাজি দিন-দিন নিরঙ্কুশ ভীতি-প্রাবল্যে এমন করে ত্রাসায়িত করে তুলেছে সকলকে, তার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আবিষ্কার হল না। আর হল না বলেই এ-ঘরে কায়েমি হয়ে রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে নন্দ আর উমাসুন্দরীকে। প্রায় প্রত্যেকটা রাত্রি সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ঝিমঝিম মধ্যরাত্রির বরফ-শীতল নৈঃশব্দ্যে সেই ঝলক-ঝলক ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। পরদা উড়ু-উড়ু জানালার। দড়িঝোলা বিজলি-বাতির দোদুল্যতা আর দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারগুলোর ঝটপটানির থরথর আশ্চর্য রহস্য। আর সেই মুহূর্তে সহসা অরিন্দমের তীব্র আর্তনাদ।

উমাসুন্দরী ভেবে পেলেন না, এমন সোনার ছেলে—তার কেন এ-পরিণতি! হ্যাঁ, বলতে গেলে অরিন্দম দত্ত সোনার টুকরো। ভয়ানক লাজুক স্বভাব। যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে, ওই পড়ার ঘর আর বই-খাতা-কলম। ইউনিভার্সিটিতে অরিন্দম জুয়েল। চেহারায় রাজপুত্র। বয়স ছাব্বিশ। রঙ ফরসা। হৃষ্টপুষ্ট নাতিদীর্ঘ দেহ। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত। সেই ছেলে এমন হবে, কে ভাবতে পারে সে-কথা?

প্রায় দিন দশেক পরে প্রথম কথা বলল অরিন্দম। এ-দশ দিনের মধ্যে তার কণ্ঠ থেকে কোনও একটা বাক্যাংশও কেউ শুনতে পায়নি। দুজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকা সত্বেও নয়।

গভীর রাত্রির দ্বিতীয় যামে ঠিক তেমনি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল নন্দ আর উমাসুন্দরী।

সহসা লাফিয়ে উঠল অরিন্দম। তীব্র আর্তনাদ করে উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : নিশ্বাস! নিশ্বাস! উঃ! আগুন!

নিশ্বাস! অবাক হয়ে মা-ছেলে মুখোমুখি তাকাল।

ডাক্তাররাও অবাক। নিতান্তই একটা রহস্যজাল ওই নিশ্বাস কথাটার মধ্যে। রোজ নিয়মিতভাবে রাত্রির মধ্যপ্রহরে ওই নিশ্বাসটা নির্দিষ্ট একজনের ওপর পড়বে। সামান্য সেই নিশ্বাসের জন্য এমন করে আর্তনাদ করে ওঠবার মূলে কোনও রহস্য থাকতে পারে কেউ ভেবে পেল না। তবে কি ভৌতিক অথবা প্রেতাত্মাজনিত কোনও ব্যাপার! না, তাও হতে পারে না। এই বিংশ শতাব্দীতে সেরকম কিছু সন্দেহ করাটা নিতান্ত মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেতাত্মাজনিত কোনও কুসংস্কারে ডাক্তারদের বিশ্বাস নেই। তাহলে কী হতে পারে? কেউ বলল এটা ম্যানিয়া, কারও মতে নিউরোসিস, আর একজন বলল অ্যানিমিক রিয়্যাকশন অথবা মানসিক ব্যাধি। কিন্তু মেন্টাল আন-ইজিনেসটা কী থেকে আসতে পারে?

মাসতিনেক কাটল এইভাবে। এই তিন মাসে স্বাস্থ্য ভাঙল, চেহারা হল বিশীর্ণ আর সেইসঙ্গে চোখের ঘুমটুকু পর্যন্ত মুছে গেল। স্পষ্ট একটা কালিমা চোখের কোলে গাঢ় হতে লাগল দিনে-দিনে। কিন্তু অনেক রাত্রির বিনিময়েও সেই নিশ্বাসের ত্রাসটা কমল না অথবা কমবার কোনও সম্ভাবনাও দেখা গেল না।

ডক্টর পুরকায়স্থের ডায়েরি

আজ আমার নতুন রোগী অরিন্দম দত্তকে দেখলাম। প্রথমত, ওকে চেয়ারে বসিয়ে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করলাম। পালসের বিটিংস উইক। অ্যানিমিক টেন্ডেন্সি। অতি সহজ কারণেই হার্টের প্যালপিটিশন হয়। অন্য সব নরমাল। একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি, যখনই যতবার আমি কাছে গিয়েছি, রোগী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছে আমার দিকে। খানিকটা বোকার মতো, খানিকটা আতঙ্ক ওর চোখের তারায়। যত আমি ওর চারপাশে ঘুরছিলাম, ভয়ে-ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে তত তাকাচ্ছিল আমার দিকে। রোগীর অনুভূতি প্রবল। গা স্পর্শ করলে চমকে ওঠে। একেবারে কথা বলতে চায় না। অনেকগুলো প্রশ্ন একাধিকবার জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাইনি। এবারে আমি মুখোমুখি বসে ওর চোখের দিকে তাকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কী?

রোগী চোখ তুলল না।

বললাম, তাকাও তো, তাকাও আমার চোখের দিকে। শুনছ? ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

চমকে উঠল ও। ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছিল। চোখ দুটো ঘন কুঞ্চিত করে শিউরে উঠল চোখ!

—হ্যাঁ, তাকাও এদিকে।

ভয়ে-ভয়ে তাকাল ও।

—কষ্ট হয় কোথাও?

আবার সেই আতঙ্ক।

ইশারা করে বললাম, কষ্ট, ব্যথা?

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোগী।

—কোথায়?

রোগী নিরুত্তর।

......তিনদিন ধরে পরীক্ষা করে, লক্ষণ, দু-একটি কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে রোগটা মানসিক। অভিভাবকদের রিপোর্ট থেকে জানলাম, শ্রাবণ মাসের কোনও এক রাত্রে হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে রোগী। তার কয়েকদিন পরে একটা কথাই শুধু বলেছিল। বলেছিল—''নিশ্বাস, নিশ্বাস, উঃ! আগুন।'' তারপর থেকে প্রায় রোজই এক ব্যাপার। সেই নিশ্বাস। আগেকার ডাক্তারদের মতে রোগী নিশ্বাসজনিত কোনও একটা ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অথবা ভৌতিক ব্যাপারে ভয় পেয়ে থাকবে। কিন্তু যতদূর জানতে পেরেছি ভৌতিক ব্যাপারে রোগীর কোনও আস্থা নেই বা ছিল না।

.....আজ সাতদিন। কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাকে। ওর খাতাপত্র ও অন্যান্য ছুটছাট কিছু লেখা কাগজ। ওগুলো সংগ্রহ করেছি এইজন্যই যে, ওগুলো থেকে যদি কিছু সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কাগজপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেও বিশেষ কোনও ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কার করা দুরূহ। অনেকগুলো কাগজে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আনমাইন্ডফুলি দু-একটা করে কথা লেখা রয়েছে। এক জায়গায় খাতার কোণে লিখেছে, 'তা হলে তাই হোক।' অন্য এক জায়গায় 'ভুলব না'। তারপর একের পর এক কথাগুলো যথাক্রমে —'সু—', 'রজনীগন্ধা', 'একুশে', 'দু-দিন', 'শান্তি হোটেল', 'ভালো লাগে না', 'বুধবার', 'দুই', 'ডাকগাড়ি', 'আনন্দ', 'মন' ইত্যাদি।

....কেসটা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। ডক্টর গুপ্তকে সব বললাম, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলাম কেসটা নিয়ে। ডক্টর গুপ্তের মতে রোগীকে মেসমেরিজম করে, ডিলিরিয়াম থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়।

মেসমেরিজমের পর ডিলিরিয়ামের নোট

...বিকেল! হ্যাঁ, বিকেলের মতো লাগছে। আকাশটা ফ্যাকাশে...ছাদ! তারপর আকাশ! আকাশ হলদে...কিন্তু মেঘ কই? আকাশ আর মেঘ এক হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য! ক্রিসানথিমামের ঝাড়টা কেমন? কষ্ট হচ্ছে আমার, তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ নাচছে—তাকাতে পারছি না। না না, পারব না...ভয় করছে। রডোডেনড্রনে উৎকট ওটা কী!...নড়ছে। সাদা হলদে হয়ে গেল...নীল-সবুজ,...হ্যাঁ লাল-কমলা। পাখি! হ্যাঁ,

পাখা ঝাপটায়...তাকায়, কটমট করে তাকায়। ভয় করে—পাখির মানুষ-মুখ! পাখি-মানুষ! মাথা ঘুরছে। মারবে, পাখি কাঁদে! জ্বালা, এইখানে জ্বালা—উঃ! আগুন, আগুন!'

ডক্টর নলিনাক্ষ পুরকায়স্থ ইঙ্গিত করলেন। নার্স এগিয়ে এল। কলম তুলে নার্সের কানের কাছে মুখ এনে আস্তে করে বললেন, টেক অ্যাওয়ে দি লাইট শেড! নার্স শেডটা সরাল রোগীর মুখের ওপরকার আলো থেকে। সরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডক্টর পুরকায়স্থ কলম নিয়ে আবার ব্যস্ত হলেন।

'দিন! বিকেলের পর দিন! কিন্তু! না না, দিনের পর—উঃ! জ্বালা। আগুন। ধরো ধরো, মা আমাকে ধরো।' একটু অনুচ্চ চিৎকারের পর স্তব্ধ হয়ে গেল রোগী।

ডক্টর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। শুধু স্টকিংস পরা পা দুটো টিপে-টিপে রোগীর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্পর্শ না করে কিছুক্ষণ দেখলেন, রোগীর চোখ দুটো বিস্ফারিত প্রায়। কপালের ওপর তিন-চারটি ভাঁজ স্পষ্ট। চোখের তারা স্থির।

আবার এসে নিজের চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। বসে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।

টুক করে আলো নিভিয়ে দিল নার্স। একরাশ অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত থিয়েটারে। শুধু শেড দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের এক চিলতে আলোর রশ্মি ডাক্তারের ছোট্ট টেবিলে। রোগীর বেড থেকে অনেক নিচু টেবিল, আর ঠিক মাথার কাছ-বরাবর রাখা। অন্ধকারের মধ্যে দু'পাশের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো কাচের সুদৃশ্য আলমারির মধ্যে ঝকঝক করছে পালিশ করা স্টিলের দ্যুতি। অনেক রকমের ইনস্ট্রুমেন্টের ঝকমকানি। মাথায় ওপরে দুশো পাওয়ার বালবে সাদা শেডটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। বেডের ওপর বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে আবৃত রোগী মৃত মানুষের মতো পড়ে আছে। মাথার কাছে ডাক্তারের আদেশের অপেক্ষায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে নার্স। ওর সমস্ত পরিচ্ছদ সাদা। অন্ধকারের মধ্যে নিঝুম একটা ভৌতিক ভাব।

কয়েকটা মুহূর্তের পর পা টিপে আস্তে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে নার্স বলল, হি ইজ শেকিং।

কয়েকটা মুহূর্ত ব্যবধান।

'উঃ! মাথা ঘুরছে। জল...না না, জল নয়। গলা বুজে আসছে—হলদে জল! হলদে—না না, কান্না, জলে কান্না—। ভুল।'

আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ।

'রাত! না না, যাব না...ভুল। আমার শেষ—যাক। ব্যথা—। ঘুম আসে না। ভয়। আসবে—হ্যাঁ, আসবে, আসছে—জল—কান্না—উঃ! আগুন! জ্বলে গেল, নিশ্বাস, নিশ্বাস—মা—!'

টুক করে টেবিলে কলম ঠুকে শব্দ করলেন ডক্টর পুরকায়স্থ। মাথার ওপরের দুশো পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল। ঝলমল করে উঠল সমস্ত থিয়েটার। রোগী নিস্তব্ধ।

ডিলিরিয়ামের নোটস আর অরিন্দমের টুকরো-টুকরো কথাগুলো পাশাপাশি রেখে অনেক ভাবলাম। একটা সূত্র আমার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পেশেন্ট ইজ মেন্টালি শকড বাই সাম পার্সন। কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মেন্টাল শক-এর সঙ্গে নিশ্বাসের যোগসূত্রটা কোথায়!

....পরপর কয়েকটা রাত্রি রোগীর সঙ্গে একই ঘরে কাটালাম। আজকাল ভয়ঙ্করভাবে আর্তনাদ করে না, কিন্তু সেটা ওর দুর্বলতার জন্যে। ও পারে না। রোগী এতদিন এত বয়স পর্যন্ত এমন শাসনে ছিল বা পরিবারের খ্যাতির জন্যেই কোথাও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। দৈহিক ক্ষুধা আমার রোগীর মধ্যে আগে ছিল অধিক পরিমাণে। কিন্তু কোনও স্কোপ না পেয়ে, অথবা শাসনের ভয়ে অগ্রসর হতে সাহস করেনি। আমার মনে হয় নারীঘটিত কোনও ব্যাপারে মানসিক আঘাত পেয়ে রোগীর এ-অবস্থা। আমার মনে হচ্ছে, আমি অন্তত পঞ্চাশ পারসেন্ট ওর রোগটা ধরতে পেরেছি।

....অরিন্দম দত্তের একখানা ডায়েরি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আর ওর রুমের বাক্স-পেঁটরা হাতিয়ে একখানা মাত্র চিঠি পেয়েছি। ডায়েরিটা আগাগোড়া আমি পড়লাম, এ থেকে তিন দিনের লেখা আমাকে

সাহায্য করবে বলে। তিনটি তারিখের লেখা তুলে নিলাম আমি।

২০ জুলাই : আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। কী এক অজানিত আশঙ্কায় থেকে-থেকে নিজেই নিস্পৃহ হয়ে পড়ছি আমি। কিন্তু উপায় নেই। এ যদি না হয়, তা হলে আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। আর সে-ব্যর্থতার নিদারুণ জ্বালা নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না। কী করে বাঁচব যদি না পাই সেই আকাঙ্ক্ষিতাকে। এতদিন যে ভয় করতাম শাসনের, তাকাতাম আমাদের বংশ-গৌরবের দিকে, আজ যদিও সে-জন্য একটু আধটু ভয় করছে আমার, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি এসব কিছুই নয়। আমার জীবনের মুখ্য যদি কিছু থেকে থাকে, সে আমার ফুটবার অপেক্ষা, আমার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা। আর তার জন্য আমি অনায়াসে সব ফেলে দিতে পারব। হ্যাঁ, আমাকে সুখী হতে হবে। কয়েকটা বৎসর ধরে যে-জ্বালা শুধু শাসন আর বংশ-গৌরবের দিকে তাকিয়ে পুষে-পুষে মরছি, অবশেষে সেই জ্বালা ফুলের মতো হাসবে সে কি কম আনন্দ! আমার অনেক কথা মনে হচ্ছে, আর মাত্র একটা দিনের ব্যবধান। সত্যি, যতবার ভাবছি তত আনন্দে ভরে উঠছে আমার মন।

২৬ : জুলাই না না না, এ হতে পারে না। কিছুতেই নয়। কী কথা ছিল আর কী হয়ে গেল! এমনই করবার যদি ইচ্ছা ছিল ওর তবে কেন এ-প্রবঞ্চনা? কী ক্ষতি করেছিলাম আমি ওর? আর এতই যদি মনে ছিল তবে শেষ প্রতিশ্রুতিরও কোনও কারণ নেই। এখন বুঝতে পারছি সবটাই প্রবঞ্চনা। কিন্তু আমি বাঁচব কেমন করে, কী নিয়ে! মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত বুকটাই বুঝি ভেঙে যাবে। আমার কেমন করছে যেন। আমি মরব। কিন্তু....এ-সৌজন্যের কী দরকার? চিঠি আমি চাইনি।

১৩ মে : আজ দু'দিন। কিন্তু কেন আসছে না? কিছুই ভালো লাগছে না আমার। সময়-সময় আমার মনে হয়, ওকে ছাড়া কিছুতেই বাঁচব না আমি। একদণ্ড বেঁচে থাকতে পারব না। তবে কি যাব? কিন্তু বড় লজ্জা করে। কেমন একটা মোহ আমাকে পাগল করে তুলছে। ফুলের কলি যেমন প্রস্ফুটিত হয়ে সার্থক হয়, তেমনি মানুষও সার্থক হতে চায় জীবনে। আমিও তাই চাই। ওকে পেলে আমিও ফুটব।

...পুরো কয়েকটা দিন ভয়ানক পরিশ্রম গেছে আমার। কাগজপত্র, ডায়েরি এবং চিঠি থেকে কেসটা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে, প্রেমঘটিত কোনও কারণে পেশেন্ট শকড। কিন্তু এতে নিশ্বাস-সম্বন্ধীয় কোনও ইঙ্গিত পাচ্ছি না আমি। যে-চিঠিটা আমি উদ্ধার করেছি, সেটা একটি মেয়ের চিঠি। চিঠিটা লোক-মারফত পাঠিয়েছে সে অরিন্দমের কাছে। তাতে লেখা আছে :

কলিকাতা-২৬

অরু,

আমার জীবনের সব কিছু তছনছ হয়ে গেল। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু সত্যিই আমার মনের কথা বলছি তোমাকে—এ আমি চাইনি। কিন্তু আমরা যে কত অসহায়, তা তুমি বুঝবে না। প্রতিশ্রুতি ভেঙে গেল মা-বাবার জন্যে। হল না—কিছুই হল না আমাদের। কিন্তু আর আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই। তুমি ভুলে যেয়ো—হ্যাঁ, ভুলো। আমিও তাই চাই।

ইতি—

সু

চিঠি পড়ে অরিন্দমের ডায়েরিটা খুললাম। অনেক আগেই ওটা লক্ষ করেছি আমি। ডায়েরির একেবারে এক কোণে যত ছোট সম্ভব সেইরকমভাবে অস্পষ্ট একটা ঠিকানা লেখা ছিল। খুলে দেখলাম, সেটাও কলিকাতা-২৬। গোয়েন্দাগিরি করতে হয়েছে আমাকে। আমি গিয়েছিলাম সেই ঠিকানায়। গৃহকর্তার সঙ্গে অনেক বাক্যালাপের পরে জানলাম তাঁর কন্যার নাম সুমনা। ওঁরা ব্রাহ্মণ। সান্যাল। এবং বিয়ে হয়েছে তেইশে জুলাই তারিখে।

অনেক রকম কথা বলে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলাম—বললাম, আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় আমার চেম্বারে একদিন আসুন। আমিই অরিন্দমের কেসটা হাতে নিয়েছি।

শুনেই চমকে উঠলেন। একটু অস্থিরও। বললেন, হ্যাঁ, যাব। কাল দুপুরেই যাব আপনার ওখানে।

....বেলা আড়াইটার সময়ে সুমনা দেবী এলেন। একা নয়—সঙ্গে আর-একটি মেয়ে। সম্ভবত মেয়েটি সুমনা দেবীর বোন। এসেই বললেন, সময় বেশি দিতে পারবেন না তিনি। সিনেমা দেখার নাম করে এসেছেন। আমি বললাম, দু-ঘণ্টা সময় পেলেই আমার যথেষ্ট। কিন্তু আপনাকে এ-পাশের রুমে আসতে হবে।

—কেন?

—সব কথা বলতে পারবেন, এঁর সামনে?—মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম আমি।

কেমন লজ্জা পেলেন সুমনা দেবী—বললেন, চলুন—ও-ঘরেই চলুন।

প্রথমে চিঠিটা আমি ওঁর হাতে দিলাম। বললাম, এটা চিনতে পারেন?

একবার চমকে উঠলেন। তারপর মুখটা নিচু করে বললেন, হ্যাঁ, এটা আমিই লিখেছিলাম অরুকে।

বললাম, তার বর্তমান অবস্থা জানেন?

—শুনেছি।

সুমনার কথা

সুমনা সান্যাল আকাশ থেকে পড়ল সেদিন। হ্যাঁ, খবরটা মা দিলেন। কথাবার্তা চলছিল, বিয়ের তারিখও পাকাপাকি। আপত্তি জানাল সুমনা। অনুরোধ করল মাকে কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিতে। কিন্তু যে-বিয়ের তারিখ পর্যন্ত স্থির, তা পিছিয়ে দেওয়া কি অতই সোজা? যে ওর স্বামী হতে যাচ্ছে, সব দিক দিয়েই সে উপযুক্ত। পাটনা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। ব্যবসায়ী মানুষ। বিরাট ধনী লোক। কিন্তু জীবনের সেটাই মুখ্য কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নয় সুমনার। মনকে প্রতারণা করে কে কবে খুশি হতে পেরেছে? সুমনার মন জুড়ে শুধু একজনই ধ্রুবতারার সম্ভাবনায় জ্বলজ্বল করছিল। সত্য হয়ে উঠতে চাইছিল। সে অরিন্দম। ভালো লাগা এবং ভালোবাসার প্রশ্ন সেখানে। সেখানে জাতি-ধর্মের কোনও পার্থক্যই নেই। আর সেই বিশ্বাসেই অরিন্দমকে জীবনের পরমপুরুষ ভাবতে দ্বিধা আসেনি মনে। হৃদয় যা চায়, তার চেয়ে বড় চাওয়া মানুষের জীবনে কী থাকতে পারে? তিন-তিনটি বৎসর ধরে প্রেমের অনাবিল স্রোতে ওরা দুজনে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। অনেক রোমাঞ্চ, অনেক মোহনীয়, রমণীয় মুহূর্ত কেটেছে একসঙ্গে। ও ভেবেছিল, অরিন্দম সত্য হবে ওর জীবনে। কিন্তু সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়ল, যতই দিন এগোতে লাগল। দুজনেরই অনেক রাত্রির অতন্দ্র প্রহর কেটেছে। ঘুমোতে পারেনি। এখানে-ওখানে একসঙ্গে বেড়িয়েছে, আর সমাধানের পথ খুঁজে মরেছে।

কিন্তু আর নয়। আর বিলম্ব নয়। যা হোক, স্থির করতে হবে। উনিশে জুলাই ওরা এল আউটরামের জেটিতে। গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন হয়ে বসে রইল। দুজনের মনেই ঝড়ের দুর্বার তুফান তছনছ করে দিচ্ছিল। যেন এই মুহূর্তে ওরা অনেক শূন্যে ঝুলছে। নাগাল পাচ্ছে না কিছু আঁকড়ে ধরবার।

সুমনা বলল, যা হয় করো, অরু। আমি বাঁচতে চাই। আর সে বেঁচে থাকায় তুমি না থাকলে আমার সব অন্ধকার। তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না আমি।

—কিন্তু—। কী যে বলবে, স্থির করে উঠতে পারছে না অরিন্দম। বলল, কিন্তু কী করব?

এই মুহূর্তে আকাশ-পৃথিবীতে বিরাট ফারাক রাখা চলবে না। খেইহারার মতো শূন্যে ঝোলাও চলবে না। আকাশ-পাতাল সব এক করতে হবে। তারপর স্থির হল, পালাবে ওরা। হ্যাঁ, পালিয়ে যাবে। প্রথমে সরাসরি মাদ্রাজ-মেলে ওয়ালটেয়ার। সেখানে শান্তি হোটেলে ক'দিন থাকবে। তারপর গন্তব্য স্থির করা যাবে।

মাঝখানে একটা দিনের ব্যবধান। ওরা স্থির করল, সঙ্গে কিছুই নেবে না। অরিন্দম কিছু মোটা টাকা নেবে। আর সুমনা তার অলঙ্কার ছাড়াও ধনী-বাবার তহবিল হাতিয়ে যা পারে নিয়ে সরে পড়বে। কলকাতা থেকে রাত্রিতে ট্যাক্সি করে ওরা পাড়ি দেবে বাগনানে। পরদিন মাদ্রাজ-মেল।

হ্যাঁ, একুশে জুলাই রাত্রিবেলায় দিন স্থির। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় শেষ সিনেমা-শো থেকে বেরিয়ে সুমনা চলে আসবে লেকে। সেখান থেকে ওর দুজনে একসঙ্গে রওনা হবে।

২১ জুলাই, রাত

রাত এগারোটা। হ্যাঁ, অরিন্দম এসেছে। কিন্তু কেন যেন এই দু'দিন থেকে মনটা ভয়ানক খারাপ লাগছে সুমনার। আশা-নিরাশা, বাস্তব-কল্পনার রৌদ্র-ছায়া খেলা করছে ওর মনে। ও নিজেই খেই হারিয়ে ফেলেছে। পালিয়ে যাবে এই যে কথাটা, তাই ভেবে বার-বার ও নিজে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছে। সিনেমায় যায়নি সুমনা। বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণের অজুহাতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও। কিন্তু ও রিক্ত। সামান্য কপর্দকও সঙ্গে নেই ওর। মনস্থির করে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। যে দুটো জীবন অনায়াসে ফুল হয়ে ফুটতে পারে, সার্থক হতে পারে, আর তারই জন্য পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আজ। কিন্তু কেন? পালিয়ে গেলে জীবনের সার্থকতা যতটা, তার চেয়েও ব্যর্থতার কলঙ্ক অনেক বড়—অনেক বেশি। আর পালিয়ে গিয়েই জীবনের স্থিরতা আসবে, তারও কোনও মানে নেই। এ যেন জেনেশুনে অগাধ সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অক্ষমের আপ্রাণ প্রস্তুতি। নিজের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন যা বলে বলুক। কিন্তু অরিন্দমের পরিবার থেকে কথাটা যখন উঠবে, সকলেই বলবে, হ্যাঁ, সেই ডাইনিটাই ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ছেলেকে। না-না, সে হতে দেবে না সুমনা। কলঙ্ক নিয়ে চাঁদ হওয়ার মূলে যত সার্থকতাই থাক, চাঁদে যে কলঙ্ক রয়েছে সে-কথাটা ঘুচবে না। কোনওদিন, কোনওকালে।

অরিন্দম বলল, চলো।

সুমনা নিরুত্তর।

—চটপট চলো।

সুমনা নির্বাক, স্থির।

—কী হল?

আস্তে করে সুমনা বলল, যাব না।—যেন কথা নয়, ওর একঝলক কান্না।

—মানে?—বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে ওঠে অরিন্দম।

—হ্যাঁ। যে-জীবনে কোনওদিন স্বীকৃতি নেই, সে-জীবন না চাওয়াই ভালো, অরু।

—তবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল সুমনা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল। তারপর খুব কাছে সরে এল। অরিন্দমের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর একসময়ে বলল, না-না, সে আমি পারব না অরু। আমি স্বীকৃতি চাই। তুমি আমার হবে, এই স্বীকৃতি চাই সকলের কাছ থেকে। আর যতদিন তা না পারো, সে যত সময়ই হোক, আমি বিয়ে করব না। কাউকে নয়। শুধু যেদিন তুমি সত্য হবে আমার জীবনে, সেদিন আমি হাসব। অরিন্দমের বুকে মুখ রেখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সুমনা বলল, আর তুমি? হ্যাঁ, তুমিও আমাকে কথা দাও।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল অরন্দিম। তার দু-চোখেও তখন অশ্রুর প্লাবন। একসময়ে ধরা গলায় সে বলল, দিলাম—তোমাকে কথা দিলাম সুমু।

ঠিক সেই অবস্থায় অনেকগুলো মুহূর্ত কাটল ওদের। সুমনার চোখের জলে অরিন্দমের জামার খানিকটা ভিজে গেছে। ঠান্ডা-ভেজা স্পর্শ লাগছে বুকে। ওর মাথায় চিবুক ঘষে বলল, কিন্তু কী করে থাকব সুমু?

জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল সুমনা। যেন ওর হৃদয়ের যত উত্তাপ, ওর যত মনের আগুন সব নিঃশেষে বেরিয়ে এল। ভিজে জামার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সেই আগুনের স্পর্শ পেল অরিন্দম। মনে হল, ওর সমস্ত বক্ষদেশটাই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সুমনা চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ডক্টর নলিনাক্ষ পুরকায়স্থ। হৃদয়-মনের সমস্ত যেন কী এক অভূতপূর্ব বেদনায় টনটন করছে। নিজের ডায়েরিটা তুলে নিয়ে অরিন্দম দত্তের সেই ছুটছাট কথাগুলো ডায়েরির যে-পাতায় নোট করেছিলেন, চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন সেই জায়গা। দেখলেন, সু—, রজনীগন্ধা, একুশে, দু-দিন, শান্তি হোটেল, ডাকগাড়ি, আনন্দ। সব যেন নক্ষত্রের দ্যুতির চেয়ে ভাস্বর। সব স্পষ্ট। স্পষ্টতম।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
জুন-জুলাই, ১৯৫৭



দানবিক

সুবোধ ঘোষ

বিহারের সেই ভূমিকম্প! কী ভয়ানক রাগ করে ফণা নেড়েছিলেন বাসুকী নাগ! পটপট করে বেজে উঠেছিল ধরিত্রীর পাষাণের পাঁজর। বড়-বড় খেত আর মাঠের বুক ফেটে গিয়ে গরম জল আর বালুর ফোয়ারা উথলে উঠেছিল। মাটির গভীরে লুকিয়ে থেকে ছোট-ছোট অগস্ত্য যেন এক চুমুকের টানে ওপরের এক-একটা ঝিল আর পুকুরের জল শুষে নিয়েছিল। কত কুয়োর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড়-বড় সড়কের জায়গায়-জায়গায় বড়-বড় দহ দেখা দিয়েছিল। আর শহর, বাজার ও বস্তির ছোট-বড় কত বাড়ি যে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু বিবরণ আর পরিচয় এখনও সেই রিলিফ কমিটির রিপোর্টের পুরোনো ফাইলে পাওয়া যাবে, যদি সে-রিপোর্টের ফাইল এখনও থেকে থাকে।

কোথা থেকে একটা অদৃশ্য আক্রোশের ঝড় হঠাৎ মত্ত হয়ে উঠে যেন প্রচণ্ড এক ধ্বংস আর হাহাকারের খেলা খেলে তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধ্বংসের কান্না আর হাহাকারের রেশ থেমে যেতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। একবছর পরেও দেখা যেত, বিধবা নারী পথের ধারের একটা ইঁটের স্তূপের কাছে বসে কাঁদছে। সে-নারীর স্বামীর লাশ সেই ইঁটের স্তূপের ভিতর সমাধিস্থ হয়ে কবেই মাটি হয়ে গিয়েছে। তবু অবুঝ বিধবা যেন একটা প্রাণের সাড়া শোনবার লোভে ইঁটের স্তূপের কাছে বসে থাকে। সেই সময় ক্যাপ্টেন দেবেশ মল্লিক দেওঘর থেকে শ্বশুরবাড়ির চিঠি পেয়ে চমকে উঠেছিল।

—তুমি আর কোনও চিন্তা কোরো না দেবেশ। সুলেখা ভালো আছে, বেবিও ভালো আছে।

থ্যাঙ্ক গড! বহু পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সুলেখা আর সুলেখার বেবি।

রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে মেডিক্যাল অফিসার হয়ে তখন নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের রাজমাক ফোর্টের ভিতরে, শান্ত-সুন্দর পাথুরে কোয়ার্টারের সামনে, আখরোট গাছের ছোট ছায়ার পাশে আরাম-চেয়ারে বসে বাংলা উপন্যাস পড়ছিল দেবেশ। চিঠি পড়তে-পড়তে বুকটা বারবার কেঁপে উঠেছিল। কী অদ্ভুত রক্ষা! চারটে দিন যেন একটা রসাতলের অন্ধকারে সমাধিস্থ থেকে, তারপর বেঁচে উঠে বাইরে এসে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে সুলেখা আর বেবি।

সেদিনই ছুটির জন্য দরখাস্ত করতে চেয়েছিল দেবেশ। সেই মুহূর্তে ছুটে এসে একবার সুলেখার মাথায় হাত রাখতে আর বেবিটাকে কোলে তুলে নিতে মনটা ছটফট করে উঠেছিল। কিন্তু যাক, যখন বিপদ কেটে গিয়েছে, তখন আর এতটা উতলা হওয়ার দরকার হয় না।

আর উতলা হয়নি দেবেশ। কয়েকদিন পরে সুলেখারই কাছ থেকে চিঠি এল। সে-চিঠির লেখা পড়ে মনটা একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আহত হয়নি সুলেখা। না সুলেখা, না বেবি, কারও গায়ে সেই নিষ্ঠুর ভূমিকম্পের একটা আঁচড়ও লাগেনি।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ধসে গেল, ইঁট-পাথর কড়ি-বরগার একটা বিরাট স্তূপ কবরের মতো নিরেট হয়ে এতগুলি মানুষের প্রাণ চাপা দিল। তবু বেঁচে গেল সুলেখা আর বেবি! তিনটে দিন আর রাত সেই রসাতলের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে থাকতে সুলেখার বুকের পাঁজর ভয় পেয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়নি, এই তো আশ্চর্য! আরও আশ্চর্যের কথা, চিঠিতে কোনও ভয়ের কথা লেখেনি সুলেখা। বরং, শেষ লাইনে যেন একটা উল্লাসের ঝঙ্কার আছে।

> *—বললে বিশ্বাস করবে না, এই তিনটে দিন আর রাতকে তিনটে ঘণ্টার বেশি বলে মনেই হয়নি। বুঝতেই পারিনি যে, তিন-তিনটে দিন আর রাত পার হয়ে গিয়েছে, এমনই অদ্ভুত অন্ধকার! একমিনিটও ঘুমোইনি। চোখ দুটো মাঝে-মাঝে অবশ হয়েছে, এই মাত্র।*

পরের চিঠিতে একটা দুঃখের খবর ছিল, যে-খবর পড়ে কয়েকটা দিন দেবেশের মনটা বেশ বিমর্ষ হয়েছিল। দেবেশের কাকা আর কাকিমা খুব বেশি জখম হয়েছেন। প্রাণে বেঁচেছেন ঠিকই, কিন্তু বোধহয় আজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। দুজনেই এখন মুঙ্গের হাসপাতালে আছেন। সুলেখা লিখেছে :

> *বাবা আবার চলে গিয়েছেন মুঙ্গের। কাকা আর কাকিমাকে পাটনাতে নিয়ে যাবেন। তুমি ছুটি নিয়ে চলে আসবার চেষ্টা করো।*

তারপরের চিঠিতে ভালো খবর।

> *না, চিন্তা করবার আর কিছু নেই। কাকা আর কাকিমা সেরে উঠেছেন। হাড় ভাঙেনি। তবে, চোখের দৃষ্টির জোর কমে গিয়েছে, দুজনেরই। ওঁরা দুটো দিন সেই রসাতলের অন্ধকারে ছিলেন, আর তাইতেই চোখের জোর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু...।*

সুলেখার চিঠির শেষ লাইনে আবার একটা খুশির ঝঙ্কার আছে।

> *—কিন্তু আমার চোখ দুটো তেমনই টনটনে আছে। আশ্চর্য!*

সেই চিঠির পর একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। তারপর এই আজ। আজ আর রাজমাক ফোর্টের ভিতরে আখরোটের সেই ছায়ার কাছে বসে কল্পনায় সুলেখার আর বেবির মুখ দেখতে হচ্ছে না। পাটনাতে এসে, কদমকুঁয়ার এই বাড়িতে ঢুকে সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়েছে দেবেশ। সুলেখার কোলে বেবি। হেসে-হেসে বেবির মুখটাকে দেখছে দেবেশ।

—এ কী!—বেবির মুখের দিকে তাকাতেই যেন চমকে উঠেছে দেবেশ। বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছে।

হেসে ওঠে সুলেখা : আগে একবার কাকা আর কাকিমার সঙ্গে দেখা করে নাও। এসো।

দেবেশের চোখের বিস্ময়টাকে যেন হঠাৎ হাসির মায়া দিয়ে ভুলিয়ে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেল সুলেখা। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে, দোতলার একটি ঘরে ঢুকে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করে দেবেশ।

দোতলার একটি ঘরে বিছানার ওপর ঘুমিয়ে আছে বেবি। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে। প্রকাণ্ড মিররটাও প্রকাণ্ড একটা আলো হয়ে ঝকঝক করছে। রাত হয়েছে অনেক।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়। এতক্ষণে বেড়িয়ে ফিরল দেবেশ। গ্যারেজে ঢুকছে গাড়ি, তার শব্দও শোনা যায়। হাতের বই রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা।

ঘরে ঢুকেই দেবেশ হাসে। —খাওয়ার হাঙ্গামা সেরে এসেছি। মোরাদাবাদ গিয়েছিলাম। বলাইয়ের স্ত্রী পেটভরে লুচি-মাংস খাইয়ে ছেড়েছে।

তারপরেই বিছানার ওপর ঘুমন্ত বেবির দিকে তাকায় দেবেশ।—বেবিটা যে এত কালো হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি।

ঠিকই বলেছে দেবেশ। বেবির বয়স যখন তিনমাস, তখন ঘুমন্ত বেবির গালে চুমো খেয়ে রওনা হয়েছিল দেবেশ। পাটনা থেকে পেশোয়ার, তারপর পিণ্ডি, তারপর রাজমাক ফোর্টে গিয়ে রেজিমেন্টাল হাসপাতালের চার্জ নিতে হয়েছিল। সেদিন বেবিটা কী চমৎকার ফুটফুটে ফরসা একটা ডলের মতো চেহারা নিয়ে ঘুমিয়েছিল! একবছরের মধ্যে কত কালো হয়ে গিয়েছে বেবি! কোথায় গেল সেই রং?

সুলেখা হাসে—হ্যাঁ, সত্যিই বেশ কালো হয়ে গিয়েছে বেবি।

ঘুমন্ত বেবির কাছে গিয়ে বেবির গাল টেপে দেবেশ। সুলেখা হাসে—ঘুমের মধ্যে আদর কোরো না। শেষে ঝগড়াটে স্বভাবের একটা দুষ্টু হয়ে উঠবে।

একটা সোফার ওপর বসে ডাক দেয় দেবেশ।—তুমি কি এখনই ঘুমিয়ে পড়বার মতলব করছ?

—না।—সুলেখা হাসে। আর হেসে-হেসেই পট করে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে দেবেশের পাশে সোফার উপর বসে।

—এ কী!—একটু আশ্চর্য হয় দেবেশ।

সুলেখা—এই তো ভালো।

দেবেশ—অন্ধকার ভালো লাগে?

সুলেখা—হ্যাঁ।

দেবেশ—নতুন অভ্যেস মনে হচ্ছে!

সুলেখা বিব্রতভাবে বলে, অ্যাঁ? তার মানে?

দেবেশ—আগে দেখেছি, অন্ধকার সহ্য করতেই পারতে না।

সুলেখা যেন আনমনার মতো আস্তে-আস্তে বলে—তা বটে।

গল্প করে দেবেশ। খৈবার পাস, আফ্রিদির উপদ্রব আর পাখি শিকারের গল্প। তারপর একটা খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে দেবেশ। —কিন্তু তোমার ভূমিকম্পের গল্পের কাছে এসব গল্পের আশ্চর্য কিছুই নয় বোধহয়।

সুলেখা বলে—হ্যাঁ।

দেবেশ—তবে বলো।

সুলেখা—কী?

দেবেশ—ওই তিনটে দিন চারমাসের বেবিকে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটক হয়ে থেকে, না খেয়ে...আমার মনে হয়, এইজন্যেই বেবিটা কালো হয়ে গিয়েছে।

সুলেখা বলে—হ্যাঁ। রেস্কু্য-পার্টি যখন ভিতরে ঢুকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এল, যখন ভালো করে চোখে দেখতে পেলাম, তখন দেখলাম, বেবিটা বেশ কালো হয়ে গিয়েছে।

—তোমার খুব দুঃখ হয়েছিল নিশ্চয়।

—অ্যাঁ? দুঃখ? না, এতে খুব দুঃখ করবার কী আছে!

দেবেশের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। তারপর দেবেশের কাঁধের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে।—আশ্চর্য!

—কী?—প্রশ্ন করে দেবেশ।

—এই যে বেবিটা কালো হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্পের মতো মনে হয়!

—গল্পের মতো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কী করে বলব বলো? মনে হয়, এইমাত্র।

কথা শেষ করেই আস্তে একটু কেঁপে ওঠে সুলেখা। তারপরেই যেন নিঝুম হয়ে যায় শরীরটা।

মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে সুলেখা, কোলের বেবিকে কোলে নিয়ে আবার স্বামীর গা ঘেঁষে বসবার সৌভাগ্য হয়েছে। সৌভাগ্যের আনন্দ যেন এতক্ষণ পরিপূর্ণ হয়ে সুলেখার চেতনায় রিমঝিম করে বাজছে। সুলেখার পিঠে হাত বোলায় দেবেশ।

কিন্তু সুলেখার এই সুখের আবেশের মধ্যে যেন একটা বোবা গল্পের বিস্ময় ছটফট করতে থাকে। সুলেখা নিজেও বোবা হয়ে আর দু-চোখ বন্ধ করে সেই গল্পের ছবিটাকে যেন সারা অনুভব দিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু বলতে পারে না।

সবই মনে পড়ে সুলেখার। সেদিন মুঙ্গেরে পৌঁছে সূর্যকুণ্ড দেখবার কথা ছিল। মুঙ্গেরের চারুবাবু কাকা আর কাকিমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন :

একবার সস্ত্রীক এসে মুঙ্গের বেড়িয়ে যাও, পরেশ।

তাই, অন্য কোনও কারণ ছিল না। পরেশবাবু বললেন, তুমিও চলো, বউমা।

কাকিমা আপত্তি করেছিলেন—চারমাসের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে সুলেখা আবার কেন ছুটোছুটি করে হয়রান হবে?

পরেশবাবু—কোনও অসুবিধা হবে না। পাটনা থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত যেতে এখন ভালো সড়ক পাওয়া যাবে। নিজের গাড়িতে যাব। অসুবিধার কী আছে?

জায়গাটা বোধহয় বেগুসরাই থেকে মুঙ্গের যেতে পড়ে। একটা বাজার ছিল। আর নতুন একটা ধর্মশালাও ছিল।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে পরেশবাবু বললেন, বিকেল পর্যন্ত এই ধর্মশালাতে একটু রেস্ট নেওয়া যাক বউমা, কী বলো? সন্ধ্যায় আবার রওনা হওয়া যাবে।

সেই ধর্মশালা। তিনতলা বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, দেখতে কেল্লার মতো বিরাট। সেদিন লোক গিজগিজ করছে ধর্মশালায়। সূর্যকুণ্ডে স্নানে যাওয়ার জন্যই এই ভিড়।

বেবিকে ফ্লানেল দিয়ে জড়িয়ে আর কোলে নিয়ে এই ধর্মশালার বারান্দাতে আস্তে-আস্তে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল সুলেখা। আর, একটা ঘরের ভিতরে চৌকির ওপর বসে খবরের কাগজ সামনে রেখে গল্প করছিলেন কাকা আর কাকিমা। সেই সময়...সেই ধরিত্রীর পাঁজর-কাঁপানো শিহরন, সেই ভয়াল শব্দ, আর সেই প্রচণ্ড হাহাকার, আর্তনাদ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে তিনতলা ধর্মশালা। প্রচণ্ড ধুলোর ঝাপটা আর অন্ধকারের মধ্যে যেন ছিটকে গেল সুলেখার প্রাণটা।

প্রথমে বুঝতেই পারেনি সুলেখা, একটা নিরেট অন্ধকারের মধ্যে মুখ থুবড়ে কেন পড়ে আছে ও? মূর্ছাটা তখনও ঠিক ভাঙেনি।

তারপরেই চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সুলেখা—বেবি! আমার বেবি কোথায়?

নিরেট অন্ধকারে ঢাকা কবরটা যেন সুলেখার চিৎকারের সঙ্গে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ তুলে প্রতিধ্বনি ছড়ায়। হাতড়ে-হাতড়ে হাঁটতে থাকে সুলেখা। কিন্তু পদে-পদে হোঁচট খায়। এগিয়ে যেতে পারে না।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দেওয়ালের টুকরো এদিকে-ওদিকে হেলে, বেঁকে, গড়িয়ে আর খানখান হয়ে পড়ে আছে। গুমরে-গুমরে একটা শব্দ ভেসে আসছে, যেন অনেক দূর থেকে। যেন একটা বাজারের শোরগোল চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে কান্নাকাটি করছে।

ভয়ানক করুণ শব্দ, তবু তো জীবন্ত শব্দ। ওরই কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করে সুলেখা। আর চারদিকে ছড়ানো ইঁটের ওপর হাতের খাবলা ফেলে-ফেলে ঘুরতে থাকে।—বেবি! আমার বেবি! শূন্য অন্ধকারকে খিমচে-খিমচে বেবিকে খোঁজে আর কাঁদতে থাকে সুলেখা।

হঠাৎ...যেন পাতালপুরীর একটা দানবের হাতের ছোঁওয়া সুলেখার পিঠের ওপর এসে লুটিয়ে পড়ে। যেন সুলেখার পিঠের মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য পাঁচ আঙুলের নখ এগিয়ে দিয়েছে সেই দানবিক আগন্তুক।

লাফ দিয়ে সরে যায় সুলেখা। দম বন্ধ করে সুলেখা। যেন সুলেখার এই যন্ত্রণাক্ত বুকের একছিটে নিশ্বাসের শব্দও শুনতে না পায় দানবটা।

কিন্তু দানবের নিশ্বাস আর পায়ের শব্দ শুনতে পায় সুলেখা। সুলেখার পায়ের শব্দ লক্ষ করে ঘুরছে দানবটা। মড়মড় করে ইঁটের স্তূপ বাজছে। সুলেখার রক্তমাংসের গন্ধ অন্বেষণ করছে রসাতলের সেই দানবিক আবির্ভাব। মস্ত বড় একটা ইঁট হাতে তুলে সেই মরণগুহার নিভৃতে এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে সুলেখা।

দানবটা হাঁসফাঁস করে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সুলেখাকে খুঁজে পায় না। শুধু শুনতে থাকে সুলেখা, অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ছাড়ছে দানব।

চমকে ওঠে সুলেখা। হাতের ইঁট ঝুপ করে খসে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে উঠেছে এই মরণগুহার দানব।—কে আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন? কোথায় গেলেন আপনি?

—আপনি কে? সুলেখার হৃৎপিণ্ডটা যেন উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে।

—আমিও আপনার মতো মরেছি।

—কী সব্বনেশে কথা বলছেন!—ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—সত্যি মরিনি, কিন্তু মরতে হবে যে।—লোকটাও চেঁচিয়ে ওঠে।

—কিন্তু আমার বেবি!—সুলেখার কান্না এইবার সেই মরণগুহার সব অন্ধকার গলিয়ে দিয়ে গুনগুন করে বাজতে থাকে।

—আপনার কোলে ছেলে ছিল কি?

—হ্যাঁ।

—খুঁজেছেন?

—কত খুঁজলাম, পেলাম না।

—আপনি খুঁজবেনই বা কী করে? আপনার সাধ্য কী?—লোকটা যেন বিচলিত স্বরে আক্ষেপ করে।

—আপনি দয়া করে একটু খুঁজবেন?

—নিশ্চয়।—লোকটা আবার হাঁসফাঁস করতে-করতে, অন্ধকারের বুকের ভিতর দিয়ে টলতে-টলতে কোনদিকে যেন চলে যায়।

কী আশ্চর্য, এই মরণগুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে সুলেখার মনের ভিতর থেকে মরণভয়ের ভ্রূকুটিগুলি যেন আস্তে-আস্তে মরে যাচ্ছে। মরতে হবে, সে-মরণ কি এইরকম জীবন্ত হয়ে থাকার চেয়েও অদ্ভুত? ভয় নয়, ভয় করবার মতো ভীরু জীবনটাই যেন মরে যাচ্ছে। সুলেখার প্রাণ শুধু একটি প্রার্থনা সাধছে। বেবিটাকে চাই। মরে যাওয়ার আগে বেবিকে একবার কোলের ওপর তুলে বুকের কাছে চেপে ধরতে চাই। বেবির গালে একটা চুমো দিয়ে এখানে এই রসাতলের অন্ধকারে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়লে দুঃখ কীসের?

—আপনি আছেন?—বেঁচে আছেন?—লোকটা সুলেখার নিকটে এসে আবার হাঁক দিয়েছে।

—আছি। আপনি বেঁচে আছেন তো?—উত্তর দেয় সুলেখা।

হেসে ওঠে লোকটা।—এখনও আছি।

—আমার বেবি কই?

—এখনও পাইনি।

—তবে আশা কি নেই?—আবার ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—আছে। আশা ছাড়বেন না।

চলে গেল লোকটা। কিন্তু তখুনি ফিরে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, আপনি জল খাবেন যদি, তবে এখানে এসে দাঁড়ান।

ইঁট তুলে নিয়ে একটা ভাঙা দেওয়ালের ওপর ঠকঠক করে আঘাত করে জায়গাটাকে চিনিয়ে দেয় লোকটা। —এখানে একটা চৌবাচ্চা আছে, তাতে জল আছে। বলতে-বলতে চলে গেল লোকটা।

হ্যাঁ, জল। এই রসাতলের সবই তা হলে দানবিক নয়! এখানেও জল আছে, করুণা আছে। সুলেখার কান্না শুনে বিচলিত হওয়ার মতো প্রাণ আছে। এমন কিছু রিক্ত, শূন্য আর শ্রীহীন নয় মরণময় এই অন্ধকারের সংসার। হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জল খায় সুলেখা।

—আপনি বেঁচে আছেন?—আবার সেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। সুলেখার প্রাণের জন্য, সুলেখার কোলের ছেলেকে খুঁজে আনবার জন্য এই ধ্বংসের ইঁট-পাথরের ভিতর দিয়ে মাথা ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে-মানুষটা, তারই কণ্ঠস্বর। সত্যিই মানুষ তো?

—বেবি কই?—চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা।

—এই নিন। এগিয়ে আসুন।

—পেয়েছেন, পেয়েছেন!—রসাতলের সেই অন্ধকারের এক মহা করুণার উপহার নেওয়ার জন্য দু-হাত তুলে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলেখা।

লোকটার হাত থেকে বেবিকে তুলে নিয়ে বেবির বুকের ওপর কান পাতে সুলেখা। তারপরেই বেবিকে বুকের ওপর চেপে ধরে। চারমাসের একটা কোমল ও নশ্বর শরীর। তৃষ্ণার্ত বেবি সুলেখার বুকের ওপর মুখ ঘষতে থাকে।

সুলেখা ডাক দেয়, আপনি কোথায়?

—এই তো, কাছেই আছি।

—এখানেই থাকুন।

—হ্যাঁ। আর পারি না!—লোকটা যেন অলসভাবে একটা হাঁপ ছেড়ে বসে পড়ে।

—বেবিকে কোথায় পেলেন?—প্রশ্ন করে সুলেখা।

—ওদিকের একটা ঘরের একটা তক্তপোশের নীচে। কান্নার শব্দ শুনে, অনেক চেষ্টা করে ইঁটের রাশ ঠেলে-ঠেলে, শেষে বাচ্চাটাকে ধরতে পেরেছি। কিন্তু...।

—কী?

—যাক সে-কথা। এখনও বাঁচবার আশা আছে মনে হচ্ছে।

—কী করে বুঝলেন?

—ওদিকে যারা বেঁচে আছে, তারা খুব জোরে হল্লা করছে। বাইরে থেকে কাজ শুরু হয়েছে বলে ওদের ধারণা।

—কীসের কাজ?

—উদ্ধারের। কোদাল-গাঁইতির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওপরের ইঁট-পাথর সরানো শুরু হয়েছে।

উদ্ধার! কথাটা যেন একটা অবাস্তব স্বপ্নের প্রলাপের শব্দ বলে মনে হয় সুলেখার। ওপরের সেই সূর্যের আলোক, গাছের সবুজ আর ফুলের গন্ধকে এখানে বসে যে নিতান্তই পর বলে মনে হয়। এখানে, এই নিরেট অন্ধকারের মরণময় মোহ তারচেয়ে কম মধুর নয়। এখানে দানবের হাতের নখ সুলেখার রক্ত-মাংস লুঠ করতে চায় না, কী আশ্চর্য! এইরকম দানবিক মায়ার গা ঘেঁষে বসে থাকতেই যে ইচ্ছা করে। উঠতে ইচ্ছা করে না। ওপরের সূর্যালোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে এই শান্তির চোখ যে ঝলসে যাবে!

লোকটার হাতটা হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেছে সুলেখা। সেই হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। লোকটা বলে —না, আমি আপনাকে একলা রেখে পালিয়ে যাব না। মরলে দুজনে একসঙ্গেই মরব।

—বেশ তো!—সুলেখার হাতটা কেঁপে ওঠে। লোকটার অবশ হাতটাকে আস্তে-আস্তে কাছে টানে সুলেখা। যেন মরণবাসরের সঙ্গীকে একটা মধুর উত্তাপের ছোঁয়া দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চায়।

কিন্তু মরণগুহার বুকটাই ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ঘণ্টা বাজছে। হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। আর টর্চের আলো যেন ঝাঁক বেঁধে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে।

ওপরের রাবিশের স্তূপ সরিয়ে ভিতরে নেমেছে রেস্ক্যু-পার্টি। ভলান্টিয়ার আর পুলিশ আর স্কাউট।

একটা স্ট্রেচারও যেন ছুটতে-ছুটতে সুলেখার চোখের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। —চলে আইয়ে।—হাঁক দেয় ভলান্টিয়ার।

বেগুসরাই ক্যাম্প হাসপাতালের বেডের ওপর শুয়ে যখন ভালো করে চোখ মেলে তাকাবার মতো চোখের জোর পায় সুলেখা, তখন কোলের কাছে ঘুমন্ত বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। সুলেখার সেই বেবি নয়, কিন্তু মানুষেরই বেবি। বেশ গোলগাল নরম-নরম আর বেশ কালো একটা চারমাসের মানুষ!

প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে ভেজা চোখ নিয়ে আনমনার মতো বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলেখা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকে।

—কী হল? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, সুলেখা?—সুলেখার কপালে হাত রেখে ডাক দেয় দেবেশ।

—অ্যাঁ? তুমি কোথায়?—চমকে ওঠে সুলেখা।—সুলেখার বুকের ভিতরে যেন অদ্ভুত এক দানবিক মায়ার স্মৃতি চমকে উঠেছে। যেন এক পরম নিবিড় অন্ধকারের সংসারে একটা প্রীতিময় হাত কাছে টেনে নিতে চায় সুলেখা।

দেবেশের হাতটাকে আস্তে-আস্তে কাছে টেনে নেয় সুলেখা।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৫৭



সাপুড়ের গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাপ নিয়ে যারা কারবার করে তারাই সাপুড়ে। সাপ নিয়ে কারবার অনেকেই করে—বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ প্রভৃতি; নবশাকদের মধ্যেও অনেকে করে। ও-কারবারের যেন একটা নেশা আছে। এবং ওই নেশায় নেশাখোরের যে-চেহারা দাঁড়ায় সেটা বন্য ও বাউণ্ডুলে। গাঁজা খায়, মদ খায়, ঘর-সংসারে মন বসে না, এককথায় খেপে ওঠে, আবার ভালোবাসলে প্রাণ ঢেলে দিয়ে দেউলে হয়ে গ্রীষ্মের জলহীন নদীর মতো হা-হা করে। খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে-জাতের যারা—তাদের তো কথাই নাই। খাল-বিলের কাছে—পতিত প্রান্তরে সেই আরণ্য যুগের ঘর-দুয়ারে বাস করে; খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান, ভিতর-বাহির, দেহ-মনও তাই। সেই আদিম এবং আরণ্য। চেহারায় পর্যন্ত সেই ছাপ। পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে মানুষের মনে-দেহে কত না পালটাপালটি, কত না চাঁছাই-ছোলাই হয়েছে—কিন্তু ওদের হয়নি। দেহের মিশমিশে কালো রঙে—করকরে ঘন চুলে, নাক-মুখ-চোখের গড়নে সে-সত্য দিনের আলোয় কালো সাপের মতো স্পষ্ট। গ্রামে আসে, ভিক্ষে করে, সাপ নাচায়—মানুষের সঙ্গে হাসিখুশিতে বাঁশির সুরে সাপের হেলে-দুলে নাচার মতো মনোরম ভঙ্গিতে মন রেখে কথা বলে, আবার খোঁচা খেলেই ছপ করে ছোবল মারতে চেষ্টা করে এবং দিনেরবেলা ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে পড়া সাপের মতো যত শিগগির পারে ভিক্ষের ঝুলি বোঝাই করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যায় ডেরার দিকে। ডেরা ওরা ঘরের ভিতরে কিছুতেই বাঁধবে না। বাঁধবে বাইরে—হয় আমবাগানে, নয় বটগাছতলায়। পুরুষের চেয়ে মেয়েগুলো আশ্চর্য। অবশ্য তার কারণ আছে। দুনিয়ায় রাজত্বিটা পুরুষের। তাই ভিক্ষার কারবারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের পাতা-হাতই ভরে ওঠে বেশি। উপচেও পড়ে। এবং অন্দরের দরজায় পুরুষের পাহারা—সে-পাহারা পার হয়ে মেয়েরা সহজে যেতে পারে। মেয়েরা ছলতে পারে, মিষ্টি গলায় বলতেপারে, হেলতে পারে, দুলতে পারে। তাই মেয়েরা আশ্চর্য। সেই মেয়েদের মধ্যেও আশ্চর্য এই মেয়েটা। মেয়েটা তরুণী নয়, যুবতী—কিন্তু দেখতে যেন ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে। ছিপছিপে চেহারা, মিশমিশে কালো রং, ঠোঁট দুটো আরও কালো, তারও চেয়ে কালো রুক্ষু কালোচুলের রাশি। সে অল্প নয়, একরাশ। ওদের দলের কাছেও ও বিচিত্র। তিন-তিনবার বিয়ে করে স্বামী ছেড়েছে। আচারে-বিচারেও ওর অনেক স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু তবু ওকে সহ্য করে চলে দলের লোক। ওর যত সাহস, তত বুদ্ধি। বাবুভাই, দারোগা, জমাদার—এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ও একেবারে উকিল-মোক্তার। তার ওপরে মোহিনী জানে। পুরুষেরা ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু না মেনে পারে না।

মেয়েরা ওকে একবাক্যে মনে-প্রাণে ভালোবাসে; ও যাই হোক, যাই করুক, কারুর বাড়া ভাতে হাত বাড়ায় না; কারুর ঘর ভাঙে না। মাগনে অর্থাৎ ভিক্ষেয় বেরিয়ে ও ঘোরে-ফেরে একা। পুরুষেরা মনে-মনে বলে—পাপ। কিন্তু মুখে সে-কথা ফোটে না। মেয়েরা মুখ মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনে বলে—ভালোয়-ভালোয় ঘুরে এসো! ভাগ দিয়ো। একা সব খেয়ো না।

মেয়েটা বলে, মিঠাই পেলে ভাগ দিব, মদের চেয়ো না। তারপরেই হাতের বিষম ঢাকিতে ঘা মেরে হাঁক দেয় : সাপার নাচন। সাপার মাথার আঁটুলি। মাদুলি করে হাতে বাঁধলে রাজা হয়। লিবা গো!

অবলীলাক্রমে ঘুরে মাগন সেরে সবচেয়ে বেশি ভিক্ষে নিয়ে ডেরায় ফিরে বসে—খিলখিল করে হাসে আর গ্রামের রসিক ছোকরা-বাবুদের কথা গল্প করে সঙ্গিনীদের কাছে। তারপর একটা ঝাঁপি একটু খুলে বাঁ হাত পুরে দেয়; শব্দ ওঠে ক্যাঁক—ক্যাঁক। বের করে আনে ব্যাঙ; ওই ঘোরাফেরার ফাঁকেই পুকুর-ডোবা থেকে সংগ্রহ করেছে। ব্যাঙটা বের করে এনে বড় ঝাঁপিটা খুলে একটা জোয়ান গোখুরা বের করে তাকে ছেড়ে দেয় এবং ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিয়ে বলে—খাও বঁধু। ওইটে ওর বঁধু। সাপটা গেলে, ও দেখে। খাওয়া শেষ হলে পূর্ণোদর সাপটাকে মালার মতো গলায় জড়িয়ে আদর করে।

অ—কালীনাগ! তুমি নাগ হইলে ক্যানে? নাগর হইলে না? অঙ্গে-অঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গ জুড়াইতাম। তুমি নাগ হইলা ক্যানে? কালীনাগ? সাপের ঝাঁপিটার ওপর কাপড় পাট করে রেখে ঘুমোয়। এ-সাপটার ওপর বহুজনের হিংসে। বিশ্বাস নেই।

সাপটা হঠাৎ মরল। বিচিত্র ঘটনা : দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়ায় সাপুড়ের দল। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে এক গ্রামে ফেলেছিল ডেরা। শুশুনিয়া পাহাড় ওদের না-জানা জায়গা নয়। এখানে ওরা সাবধান! 'ভোরবেলার আগে কেউ বাইরিবা না। দিদিমণি চাকিতে থাকতি-থাকতি ডেরায় ফিরবা। সিঁধেল চোর লয় রে মানিক, ডাকাত আছে ওত পেত্যা।' মানে সাপ নয়, বাঘ। সাপ সিঁধেল চোর, বাঘা ডাকাত। 'আঁধার নামলেই বন থেকে লাল গামছা মাথায় বেঁধ্যা পথের ধারে বস্যা হাঁই তুলবে, এই লম্বা জিব বার কর্যা আপন মুখ চাটবে।' 'শিয়াল ডাকিলে পরে—বেদেরা লিবে না ঘরে'; ঘরে না নিলে পথ থাকে; চলে যাও যেদিকে দু-চোখ যায়। এখানে কিন্তু শিয়াল ডাকে না, ফেউ ডাকে, ফেউ ডাকলে কেউ নাই, আছে বাঘা ডাকাত; সকল পথের শেষ সাবধান।

এই শুশুনিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে হনহন করে ফিরছিল কালী। মেয়েটার নাম কালী। বেলা তখনও আছে। তেষ্টা পেয়েছিল। দারুণ তৃষ্ণা। পাহাড়ের কোলে একটা ঝরনা আছে, সেই ঝরনায় গেল খেতে। ঝরনার গায়ে দেবতার স্থান। জল খেয়ে উঠছে কালী—হঠাৎ হি-হি করে হেসে কে বললে, বেদেনী!

কালী চমকে উঠে মুখ তুললে। এক সন্ন্যাসী। লম্বা চওড়া শাহি চেহারা, গাঁটপড়া শালের গুঁড়ির মতো। মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় রুখু চুল, তাতে দু-চারগাছায় পাক ধরেছে। সন্ন্যাসী আবার হেসে বলে, কী সাপ আছে রে ঝাঁপিতে?

কালী মুখ মুচকে হেসে বললে, সাপ নয়, সাপা গোঁসাই। ছেড়ে দিলে মাথা তুললে ছাতিতে ডংশাবে। লাল চোখ ঘোলা হয়ে যাবে।

হি-হি করে হেসে উঠল গোঁসাই।—যদি মাথা না তোলে।

—মাথা তুলবে না?

—না।—সন্ন্যাসী একেবারে কাছে এসে বললে, খোল ঝাঁপি। দেখি তোর সাপা!

—তার আগে বল, ডংশালে মোর নাম দোষ নাই। কামানের সময় হইছে। কামাই নাই।

—নাই তোর নাম দোষ। কিন্তু তুই বল যদি মাথা না তুলে!

—মাথা না তুললে সাপার মাথা ছেঁচ্যা দোব।

—আমাকে কী দিবি?

—থাকবার মধ্যি থাকবে তো জাতিকুল আর সাপের খালি ঝাঁপি। লিবা? সন্ন্যাসীর জপতপ-ভাসায়ে ঝাঁপ দিবা বেদে যুবতীর দহে। গো-খাপুরিতে? (গান্দদে) লিলে দিব।

—দেখিস?

—হ্যাঁ।

—খোল তবে ঝাঁপি।

সাপার ঝাঁপিটা খুলে একটা নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে ইচ্ছে করেই সরে দাঁড়াল কালী। প্রকাণ্ড সাপটা উঠল মাথা নিয়ে, কিন্তু সন্ন্যাসী তার আগেই ঝুলিতে হাত পুরে কী একমুঠো বের করে রেখেছিল—ফাং গঙ্গারাম—ব্যোম শঙ্কর!—বলে চিৎকার করে সে সেই মুঠোর ধুলোর মতো বস্তুটুকু দিলে সাপটার মুখে-চোখে-ফণায় ছিটিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড! সাপটা মাথা নুইয়ে একেবারে কেঁচোর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটিয়ে গেল। সন্ন্যাসী হি-হি করে হাসতে লাগল। ছুটে এগিয়ে এল কালী : কী হল? কী দিলা?

—ধুলো পড়া।

—না, ওষুদ! কী ওষুদ দিলা? সাপ মের‍্যা দিলা আমার? আমার সাপ?—কেঁদে ফেলল মেয়েটা। সে একেবারে ঝরঝর করে কান্না; সে-কান্না দেখে সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রস্তুত হল। বললে, সাপ তোকে আমি দিচ্ছি। ওই দেখ, হাঁড়ি করে গাছের ডালে টাঙানো রয়েছে। যেটা খুশি নিয়ে যা।

অবাক কাণ্ড—সত্যিই কালো পোড়া হাঁড়ি টাঙানো রয়েছে। একটা দুটো তিনটে—ওই দুটো, ওই একটা। বেদের মেয়ে উঠল। নামালে হাঁড়িগুলো। সত্যি সাপ গর্জাচ্ছে। কিন্তু—।

—কিন্তু—কী?—সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে।

—ই সাপ নিয়ে কী করব?

—কেন?

—আমার উটা সাপা ছিল। সাপা কই?

হা-হা অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল সন্ন্যাসী।—সাপা!

—হাসছ কেন? সাপা আমার পয়মন্ত। সাপার বিক্কমে আর এই মাদীগুলোর বিক্কমে? ইয়ারা পায়ের তলা থেকে কুটুস করে কামড় দিয়া ল্যাজ কাটা দিয়া পালাতে পারে। সাপা অ্যাই ফণা তুলে। তুমি হাসছ ক্যানে?

হি-হি হাসি সন্ন্যাসীর ফুরোয় না।

হাসতে-হাসতে বলে, আমার ভৈরবী হবি? বাজিতে তুই হেরেছিস। তোর জাতকুল-ঝাঁপি আমার। আমার সঙ্গে চল; উড়িষ্যাতে তোকে শঙ্খচূড়ের সাপা ধরে দোব। এই সাপা! সে-সাপা তুই চোখে দেখিস নাই।

মেয়েটা সর্বনাশী। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। আপাদমস্তক লেহন করছে দৃষ্টি দিয়ে। সন্ন্যাসী বললে, দেখছিস কী? যাবি?

—এখুনি যাবা? উই গাঁয়ে আমাদের দল। এখুনি ইখান থেকে যাও তো চলো। যাবা?

—চলো।

—আমাকে শঙ্খচূড় সাপা দিবা? এই সাপা?—আপন মাথার ওপর হাত তুলে সে সাপের আকার দেখাল।

—দোব।

—তিনবার বলো। তিনসত্যি করো।

হা-হা শব্দে হেসে উঠল সন্ন্যাসী : দোব। দোব। দোব।

মাস পাঁচেক পর। খণ্ডগিরি-উদয়গিরি থেকে ভুবনেশ্বরের পথের ধারে। গাছের তলায় ভৈরব আর ভৈরবী। ভৈরব গাঁজা খাচ্ছে। ভৈরবী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে। মাথার ওপর গাছের ডালে ঝুলানো বিরাট একটা হাঁড়ি। সাপের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

—নে খা।—ভৈরব গাঁজার কলকে ভৈরবীর দিকে এগিয়ে দিল। হাতটা ঠেলে দিয়ে ভৈরবী বললে, না।

—কী হল তোর?

—কিছু না। দেহ ভালো লাগছে না।

—তবে মদ খা। দেহ ভালো হবে।

—তু খা।

ভৈরব মদের বোতল বার করে মদ খেয়ে বোতলটা ওকে দিলে খা। খা বলছি। তোকে যা বলেছিলাম আজ তাই দিয়েছি, শঙ্খচূড়ের সাপা। তবু তুর ই কী? এমন তো ছিলি না।

এবার মদের বোতলটা তুলে মুখে খানিকটা ঢেলে দিয়ে গিলে ফেললে ভৈরবী। বুকে হাত বুলিয়ে বললে, হল? লে, এবার তু খা। খা।

—দে।—আবার খানিকটা গলগল করে গিলে ভৈরব বললে, লে আর-এক ঢোক খা।

—দে। এই লে। বাকিটা তু একঢোকে খা দেখি। লে।—সে নিজেই হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে তার মুখে বোতলটা ঢেলে দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। মদের নেশা লাগল। ভৈরবীর উদাস ভাব কেটে যাচ্ছে। সে মুহূর্তে-মুহূর্তে জাগছে। ফুলে-ভরা লতার বাতাসে দোল খাওয়ার মতো ভৈরবের গায়ে দুলে আছাড় খেয়ে পড়ছে। ভৈরব দু-হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। বললে, কাল তুকে সেই ওষুদ দিব। না বললে শুনব না। খেতে হবে। হ্যাঁ। ভৈরব-ভৈরবীর সন্তান—।

—চুপ!—ভৈরবী তার বাকরোধ করে দিলে।

—উঃ!—বলে উঠল সন্ন্যাসী।

খিলখিল করে হেসে উঠল ভৈরবী। ঠোঁটে হাত দিয়ে মুছে নিয়ে দেখে ভৈরব বললে, রক্ত বার করেছিস?

—সাপিনীর কামড় যি।—আবার খিলখিল করে হেসে উঠল ভৈরবী। ভৈরব শিউরে ওঠে সে-হাসিতে।

—দে, মদ দে! নেশাটা জমছে না।

—লে।—আবার নতুন মদের বোতল বের করলে ভৈরবী।

মদের নেশায় অচেতনের মতো পড়ে আছে ভৈরব। একটা গাঁটওয়ালা শালগাছের গুঁড়ি যেন। ভৈরবীর চোখে ঘুম নেই। রাত্রির অন্ধকার থমথম করছে চারিদিকে। তারই মধ্যে একটা হাতছানি ঝিলমিল করছে। মাথার ওপর গাছের ডালে শঙ্খচূড়ের সাপা গর্জাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে—ওটাকে গলায় জড়িয়ে গান গায়।

ও কালীনাগ গ! তুমি নাগ হইলে ক্যানে? নাগর হইলে না?

'সাপার নাচন! সাপার মাথার আঁটুলি। মাদুলি করি ধারণ করলি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!' হাঁক দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জাত সাপুড়ের মেয়ে! হাঁড়িটাকে নামিয়ে সাপটাকে বের করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু না। ভৈরব সাপা নয়, বাঘা। বাঘা জেগে উঠবে। তা ছাড়া, সাপটার বিষ আজই সবে গালা হয়েছে। বিষ তো কম নয়। প্রায় আধ ঝিনুক। কোথায় সে ঝিনুকটা? উঠল সে। সন্তর্পণে বের করে আনলে ভৈরবের ঝুলি থেকে। ভৈরব বিষ সংগ্রহ করে রাখে। গাঁজার সঙ্গে খায়। মদের অভাব হলে একটু ঢেলে নিয়ে চেটে খেয়ে ফেলে—তারপর সারাটা দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। বিশাল শালগুঁড়ির মতো পড়ে আছে। নাক ডাকছে ঝড়ের গোঙানির মতো। ঝুঁকে পড়ল সাপুড়ের মেয়ে। ঠোঁটের ওপর এই তো কাটা দাগটা! দেশলাই জ্বাললে। এখনও কাঁচা রক্ত জমে রয়েছে একটি কুঁচফুলের মতো! আঙুল দিয়ে খসিয়ে দিলে। আবার রক্ত বের হচ্ছে। ঝিনুকটা উপুড় করে দিলে তার ওপর। গাছের ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে নিলে মাথায়, কাঁধে ঝোলালে ভৈরবের ঝোলাটা। তারপর সাপিনীর মতো শনশন করে চলল।

হঠাৎ এক জায়গায় বসল। গা বমি-বমি করছে। দেহখানা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। পেটের ওপর হাত রেখে সে যেন কিছু অনুভব করতে চাইলে। হ্যাঁ। পারছে অনুভব করতে। অনেক—অনেক—অনেক দূরের কান্নার মতো কী শুনতেও পাচ্ছে সে। হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠল। পাশে রাখা হাঁড়ির ভিতর থেকে সাপটা অকস্মাৎ কী কারণে নিষ্ঠুরভাবে গর্জে উঠছে। গোঙাচ্ছে। সে-গোঙানি শুনে হঠাৎ রাগ হল তার।

শয়তান! ঘেন্না জন্মাচ্ছে! রাগ হচ্ছে। যত বিষ তত রাগ, তত হিংসে।

ভৈরবের ঝুলি থেকে একটা কৌটো বের করে খুললে। ওষুধের গুঁড়ো! এই গুঁড়োর ধুলো পড়ায়—তার সেই সাপটা মরেছিল। কটু গন্ধ উঠছে।

সাপের হাঁড়িটার মুখের সরাটায় একটা পাথর দিয়ে ভেঙে একটু ছিদ্র করে একটু গুঁড়ো ঢেলে দিলে। নি—গর্জা। গর্জা। হুঁ।

খিলখিল করে হেসে উঠল জাত সাপুড়ের মেয়ে। গর্জন থেমে গেছে। হুঁ।

—নে, আরও নে। নে। খা, আরও খা!—ঢেলে দিলে সে অনেকটা গুঁড়ো।

—এই, গর্জা! নে গর্জা!

আর গর্জায় না! ব্যস! নিশ্চিন্ত! এইবার ছোট একটি আশ্রয়! মাস কতকের জন্যে। না চিরকালের জন্যে!

চুপ করে শুল সে। আকাশে চাঁদ উঠছে।

'আয় চাঁদ আয় চাঁদ আয় চাঁদ-আ-রে! আয় আয় আ-রে।
চাঁদের কপালে চাঁদ চিত দিয়ে যা-রে!'

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৫৮



কে তুমি?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম আমি কখনও দেখিনি। শহরেই জন্ম, শহরেই বড় হয়েছি। শহরেই কেটেছে জীবনের এই পঁচিশটি বসন্ত।

আমার এক বন্ধু জুটেছে চাকরি করতে গিয়ে। বন্ধুর নাম সুজিত। বীরভূম জেলার কোন একটি গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। হঠাৎ একদিন সুজিত আমাকে বললে, যাবি আমাদের বাড়ি? গ্রাম কখনও দেখিসনি বলছিস, দেখে আসবি।

সামনে চারদিন ছুটি। বললাম, যাব।

সুজিতদের গ্রামে এসেছি। রেল স্টেশান থেকে বহু দূরে—কতক গরুর গাড়িতে, কতক-বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। দুই বন্ধুতে বেড়াতে-বেড়াতে তাই গেলাম।

গ্রামখানি চমৎকার। ঢেউ-খেলানো মাটি, চারিদিকে ধানের মাঠ। গ্রামের দক্ষিণে একটি জঙ্গল। শাল, তাল আর তমাল গাছের সারি। মনে হয়, প্রতিটি গাছ যেন যত্ন করে পোঁতা। একে এরা জঙ্গল কেন বলে বুঝতে পারি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ওপর শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়া-নিবিড় তপো-বনের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম জায়গাটি আমার এত ভালো লাগল যে, সহজে সেখান থেকে আসতে মন চাইল না।

সুজিতের বাড়িখানা পুরোনো। আগেকার দিনের তৈরি দোতলা বাড়ি—কিছু ভেঙেছে, কিছু বা মেরামত করা হয়েছে।

দোতলার একটি ঘরে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খুললে দেখা যায়—পাশেই একখানি মাটির বাড়ি। পোড়ো-বাড়ি বলেই মনে হয়। লোকজন কেউ বাস করে না। উঠোনে একটি আমের গাছ। গাছে তখন অজস্র মুকুল ধরেছিল। আমের মুকুলের গন্ধে আমার ঘরখানা যেন ভরে আছে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। সেদিন কার ডাকে যেন ঘুম ভেঙে গেল শুনছেন? শুনছেন?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

জানলার পথে তাকিয়ে দেখলাম, সেই পোড়ো-বাড়িটার উঠোনে আমগাছটির তলায় তন্বী এক তরুণী দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নার আলো গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এসে পড়েছিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। মেয়েটি সুন্দরী বলেই মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলছেন?

মেয়েটি বললে, আমার মা কোথায় বলতে পারেন?

বললাম, আমি নতুন এসেছি এ-গ্রামে। আমি কিছু জানি না।

আর কিছু বললে না মেয়েটি।

মনে হল যেন সে চলে গেল। আলোছায়া ঘেরা সেই গাছের তলায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। কোন দিক দিয়ে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না।

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না। পরের দিন সকালে বললাম সুজিতকে।

সুজিত বললে, ও জানলাটা আর খুলো না। বন্ধ করে দিয়ো।

কেন বলো দেখি? মেয়েটা কি—।

সুজিত বললে, না, না, সেরকম কিছু নয়। কাজ কী বাবা পরের মেয়ের সঙ্গে...দু-দিনের জন্যে এসেছিস—।

বুঝলাম। সেই ভালো।

সেদিন রাত্রে জানলাটা বন্ধ করেই আমি শুয়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন আবার। আবার সেই কণ্ঠস্বর। আবার সেই ডাক শুনছেন? শুনছেন?

জানলার কপাটটা ঠেলছে বলে মনে হল।

বাধ্য হয়ে জানলাটা খুলে ফেললাম।

কিন্তু এ কী? সেই সুন্দর মুখখানি জানলার শিকগুলোর ঠিক পেছনে! মেয়েটি মনে হল যেন জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? জানলার পেছনে তো কিছু নেই! মেয়েটি তা হলে দাঁড়িয়ে আছে কীসের ওপর।

এই কথা ভাবতেই টপ করে মাথাটা আমার ঘুরে গেল।

বললাম, আমি জানি না—কাল তো বলেছি আপনাকে!

আমার কপালে তখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি কাঁপছি ঠকঠক করে। জানলাটা বন্ধও করতে পারছি না, চিৎকার করে ডাকতেও পারছি না সুজিতকে।

আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

সুন্দর সাজানো দাঁতের সারি। উজ্জ্বল দুটি টানা-টানা চোখ।

মেয়েটি বললে, আমি তো কোনও কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি! আমি জানি আপনি নতুন এসেছেন। ক'দিন থাকবেন?

খুব খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জানলাটা বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলাম বোধহয়। কিন্তু জানলাটা বন্ধ করবার অবসর আমি পেলাম না। তার আগেই মেয়েটি এসে দাঁড়াল একেবারে আমার সুমুখে—ঘরের ভেতর।

আবার তার সেই হাসি!

তারপর কী হয়েছে আমার আর কিছু মনে নেই।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান যখন ফিরে এল দেখি, আমি শুয়ে আছি সুজিতের ঘরে। সুজিতের ছোট বোন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাওয়া করছে। মাথার চুলগুলো ভিজে। মাথায় বোধ করি জল ঢালা হয়েছে।

সুজিত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছিস যে? কী হয়েছিল রে?

সুজিত বললে, কীরকম ভীতু রে তুই! ওরকম করে চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন?

কেন তা আমি কেমন করে বলি! বললাম, তারপর?

সুজিত বললে, তোর চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস দোরে খিল বন্ধ করিসনি। নইলে কী যে হত কে জানে!

খুব হয়েছে আমার গ্রাম দেখা!

পরের দিনই বললাম, আমি কলকাতায় যাব।

সুজিতকেও আসতে হল আমার সঙ্গে।

গ্রামে থাকতে সুজিত আমাকে কোনও কথাই বলেনি। কোনও রহস্যই ভাঙেনি।

ট্রেনে আসতে-আসতে সুজিত বললে, বেচারা সুবী! ওকে আমরা দেখেছি সবাই। কিন্তু আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা গ্রাহ্য করি না। মেয়েটা আসে। তার মায়ের খবর জানতে চায়। বলে, তার মা কোথায় তোমরা বলো।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বল সব কথা।

সুজিত বললে, তা হলে শোন!

সংসারে মাত্র দুটি মানুষ। মা আর মেয়ে।

মায়ের বয়স হয়েছে, মেয়ের বয়স এই সবে আঠেরো-উনিশ, কিন্তু দুজনেই বিধবা।

ঝগড়াঝাঁটি তাদের চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকে। মেয়েটাই দিবারাত্রি খিটির-খিটির করে। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়। আবার অবাক কাণ্ড—খুব খানিকটা ঝগড়া করে নিজেই শেষে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।

মা বলে, তুই একটা কিছু না করে আর ছাড়বিনে দেখছি! মাথার একপিঠ চুল এলিয়ে এই ভর দুপুরবেলা কাঁদতে বসলি যে? আয়, চুলগুলো বেঁধে দিই।

এই বলে চুলগুলো বেঁধে দেওয়ার জন্যেই মা হয়তো তার কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেয়ে তখন রেগে একেবারে টং। চুলে হাত দিতে সে কিছুতেই দেবে না। বলে, যাও, যাও, খুব হয়েছে। তোমাকে আ—।

মায়ের চোখ দুটি তখন জলে ভরে আসে।

আঁচলে চোখ মুছে বলে, থাক তবে, কাঁদ ওইখানে! বলে ধীরে-ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে এর বাড়ি খানিকক্ষণ বসে, ওর বাড়ি খানিকক্ষণ বসে, কথা কইবার মতো কাউকে যদি কাছে পায় তো বলে, ওই বয়েস আর ওই রূপ নিয়ে বিধবা হল, মা, মেয়েটার মুখের পানে আর তাকাতে পারছিনি।

প্রতিবেশিনী হয়তো আশ্বাস দেয়। বলে, ভেবো না, মা, গা-সওয়া হয়ে যাবে।

মা কিন্তু তার নিজের কথাই বলতে থাকে। বলে, আমার কী মনে হয় জানিস বাছা, মনে হয়—এই নিয়ে সুবী হয়তো দিবারাত্তির ভাবে। ভেবে আর যখন কিছু কূলকিনারা পায় না, তখন হয়তো ও অমনি করে। হয় কাঁদতে বসে, নয়তো ঝগড়া করবার জন্য খুনসুটি করে বেড়ায়।

প্রতিবেশিনী মেয়েটি এবার নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে কথাটা সমর্থন করে।

সুবীর মা তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে, বুঝতে সবই পারি, বাছা, কিন্তু মা হয়ে আমি যে আর—।

বলতে-বলতে ঠোঁট দুটি তার থরথর করে কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে আসে।

সে চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না। আঁচল দিয়ে মোছে আর তৎক্ষণাৎ কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

মায়ের সে-কান্না বুঝি বিধাতারও সহ্য হল না। তাই সে-কান্নার পালা হঠাৎ একদিন চুকে গেল। বিধাতা চুকিয়ে দিলেন কি সুবী নিজেই চোকালে কে জানে!

সেদিন দুপুরে মা ও মেয়ে দুজনেই খেতে বসেছে। ভাত চিবোতে গিয়ে কটাং করে সুবী তার দাঁতে একটা কাঁকর চিবিয়ে ফেললে। হাতের গ্রাসটা তৎক্ষণাৎ সে থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, না, আর পারিনে বাবা! কেন, চালগুলো বেছে নিতে পারোনি?

মা বললে, চাল আর কত বাছব, বাছা! ভাতে কাঁকর-পাথর দু-একটা অমন থাকে। তাই বলে তোর মতো এমন বিটকেল কেউ করে না—খা।

মেয়ে আর না খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল দেখে মায়ের মনে সত্যিই এবার একটুখানি রাগ হল। বললে, এমন তিরিক্ষে মেজাজ তোর কেন হল সুবী? কই, আগে তো এমন ছিল না!

সুবীর মুখখানা ভারি হয়ে উঠল।

তাই না দেখে মা আবার বললে, এতই যদি লবাবের মেয়ে হয়ে থাকিস তো চালগুলো কাল থেকে তুই নিজের হাতে বেছে দিস।

—তাই দেব।—বলে থালাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সুবী উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ! বিধবা মেয়ে, একবারের বেশি খেতে নেই! মা চট করে বাঁ-হাত বাড়িয়ে তার আঁচলটা চেপে ধরে বলে উঠল, বোস মা বোস, চারটি খেয়ে নে! কেউ দ্যাখেনি, তাতে দোষ নেই, নে বোস!

ঝাঁকানি দিয়ে সুবী তার আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে। বললে, না, আর খাব না।

—সারাদিন খেতে যে আর পাবি নে হতভাগী, উপোস দিয়ে মরবি?

—মরণ হলে তো বাঁচি! মরণ যে হয় না ছাই!

—তাই মর তুই! আমারও হাড়টা জুড়োয় তা হলে।

বিড়বিড় করে কী যেন বলতে-বলতে সুবী আঁচাতে চলে গেল।

মা-ই বা আর কেমন করে খায়! থালাটা সরিয়ে দিয়ে মা-ও উঠে দাঁড়াল।

খিড়কির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুবী দেখলে, এঁটো থালা তেমনি পড়ে আছে, আর ঘটির জলে উঠোনে হাত ধুয়ে মা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

তার মা সেদিন যেখানে-সেখানে কেঁদে-কেঁদে সারা হল।—না, মা, রইল ওই দস্যি মেয়ে আমার বাড়িতে, আমায় দেখছি কোনও দেশ গিয়ে পালাতে হল।

প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ বা সান্ত্বনা দেয়, আবার কেউ বা বলে, কী জানি, মা, তোমাদের ঝগড়ার কিছু বুঝিনে আমরা!

মায়ের চোখ দিয়ে জল আসে। বলে, বুঝতে কি ছাই আমিই পারি, বাছা? ও যে কেন অমন করছে, মা, তা কে জানে!

মা আবার সে-বাড়ি থেকে উঠে আর-এক বাড়িতে গিয়ে বসে। সেখানেও সেই কান্না আর ওই এক কথা! —আজ আর আমি বাড়ি ঢুকছিনে। দেখি, ও আমায় খুঁজতে আসে কি না।

এমনি করে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করতে-করতে সূর্য ডুবল। রোজ ঠিক এমনি সময় পুকুর থেকে এক কলসী করে খাবার জল তাকে আনতে হয়। পাড়ার মেয়েরা সব কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল, করালীর মা বললে, চলো, না-হয় আমার একটা কলসী নিয়েই চলো আজকে।

সুবীর মা বললে, না, বাছা, থাক, আজ আর যাব না। মজাটা একবার বুঝুক।

মজা বোঝাবার জন্যে সে বসে রইল বটে, কিন্তু দেখতে-দেখতে চারদিক আঁধার হয়ে এল, ঘরে-ঘরে প্রদীপ জ্বলল, তবু সুবী তাকে ডাকতে এল না।

মায়ের মন ঘর ছেড়ে এমন করে কতক্ষণই বা বাইরে থাকে। তুলসীতলায় এখনও হয়তো সন্ধে পড়ল না...এতক্ষণে সে হয়তো তার নিজের লণ্ঠনটি জ্বেলে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে গেছে....মা তার মরল না বাঁচল বয়ে গেছে তার দেখতে!

সরু একটা গলির অপরপ্রান্তে একেবারে একটেরে তাদের সেই ছোট্ট মাটির ঘরখানি—চারদিকে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা পেরিয়েই বাঁ-হাতি উঠোনের একপাশে বহুদিনের প্রাচীন একটা আমের গাছ —অজস্র ডালপালা বিস্তার করে জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। তা হলেও ঘরে যদি আলো জ্বলে তো

বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু আলো জ্বলা দূরে থাক, সুবীর মা সদর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দ্যাখে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

হেঁকে বললে, সুবী, দরজা খোল! কাজ দ্যাখো দেখি মেয়ের! ঘরে ঢুকতে না দেওয়ার মতলব!

ভেতর থেকে সুবী সাড়া আর কিছুতেই দেয় না, দরজাও খোলে না।

কাছেই তারাপদদের বাড়ি। তারাপদ তখন সবেমাত্র গোয়ালে গাইগরুগুলিকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় সুবীর মা এসে বললে, আয় তো, বাবা, সুবীকে একবার আচ্ছা করে ধমকে দিবি। সদর দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, আমায় ঢুকতে দেবে না।

তারাপদ হেসে বললে, ঝগড়া হয়েছে বুঝি? বলেই লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় বারকতক জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, খোল বলছি, সুবী, নইলে কিছু বাকি রাখব না।

দরজা তবু খুলল না।

লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে তারাপদ বললে, তুমি দাঁড়াও, মাসি, আমি পাঁচিল টপকে দরজাটা খুলে দিই।

খাটো মাটির প্রাচীর। উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

কিন্তু ঝুপ করে ওপাশে নেমেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কী যেন দেখে সে আমগাছের তলা থেকে সহসা বিকৃতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, মাসি! মাসি!

বাইরে থেকে সুবীর মা বললে, কী, বাবা?

কিন্তু জবাব দেওয়ার অবসর তখন আর নেই। দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলেই তারাপদ কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে আমগাছের তলায় দিয়ে দ্যাখে—সর্বনাশ!

সুবীর মা তো অস্ফুটকণ্ঠে বিকট একটা চিৎকার করে সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়ল।

আর স্তম্ভিত নির্বাক তারাপদ কম্পিত হস্তে লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে দেখলে—আমগাছের একটা ডালের গায়ে মোটা একটা দড়ির ফাঁসি লটকে সুবী আত্মহত্যা করেছে। পায়ের নীচে দড়ির ভাঙা খাটিয়াটা উলটে পড়ে আছে। টকটকে ফরসা গায়ের রং যেন দুধে-আলতায় গোলা, পিঠের ওপর ঢেউখেলানো কালো একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায় নেই, দাঁতের ফাঁকে খানিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটো বড়-বড়, গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোচ্ছে। হতভাগী মরবার আগে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করেছিল কি না তাই-বা কে জানে!

ব্যস! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠান্ডা।

গ্রামদেশে আত্মহত্যা এমন কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়, দু-দশ বছর পরে কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাৎ যদি বা এক-আধটা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো কিছু বলবার থাকে না।

এখন এ-মৃতদেহ নিয়ে কী করা যায়—এই হল গ্রামের লোকের ভাবনা। আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও তাদের আছে কি না কে জানে! সুবীর মা তো সেই যে মাটিতে উপুড় হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে সেই থেকে আর ওঠেনি।

শিবমন্দিরের পাশে গ্রামের একটা রাস্তার ধারে সেই রাত্রেই মজলিশ বসল। অনেক কথা-কাটাকাটির পরে শেষে এই ঠিক হল যে, কী জানি বাবা, আত্মহত্যার মড়া শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবার পর কেউ যদি পুলিশে খবর দিয়ে দেয় যে, সে আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে মেরে ফেলে দিয়ে গাছে অমনি টাঙিয়ে রেখেছিল—তখন?...তারচেয়ে আগে থেকেই পুলিশে খবর দেওয়া হোক।

গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে থানা। কিন্তু সুবীর দুর্ভাগ্য, চৌকিদার ফিরে এসে খবর দিলে—দারোগাসাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন, জমাদারসাহেব আসবেন কাল সকালে। বলেছেন, দাঁড়া, আমি দেখাচ্ছি মজা, গলায় দড়ি নিয়ে মরা আমি বের করছি।

গ্রামের লোক তো ভয়ে অস্থির!

দুগ্গু ভটচায বললে, কেন, তখনই তো বলেছিলাম, দাদা, পুলিশে খবর দিয়ে কাজ নেই—দিই জ্বালিয়ে।

লোকনাথ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল।—ব্যাটা বলে কী হে! তারপর? তারপর ঠেলাটি কে সামলাত?

দুগু বললে, ঠেলা আবার কীসের?

হরিপদ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, কেউ যদি বলত যে, না, ও গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি, দুগু ভটচাযের সঙ্গে দিনেরবেলা ঝগড়াঝাঁটি না কীসব যেন হয়েছিল—।

দুগু ভটচায কালা মানুষ, কানে ভালো শুনতে পায় না। এদের আগেকার মন্তব্য সে কিছুই শোনেনি। হরিপদর মুখে তার নাম শুনে সে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, খবরদার বলছি, হরিপদ, মিছে কথা বলিসনে। আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি।

সবাই তখন মুচকি-মুচকি হাসছে।

হরিপদর সঙ্গে শেষে হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়! অনেক কষ্টে ভটচাযকে থামানো গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থানা থেকে জমাদারসাহেব এলেন না।

গ্রামে মানুষ মরেছে, বাসী মড়া তো হলই, তার ওপর আত্মহত্যার মড়া। ঠাকুর-দেবতার শিলা-বিগ্রহের নিত্য সেবা যাদের বাড়িতে আছে তারা তো ভেবেই অস্থির। ঘর থেকে মৃতদেহটাকে বের না করা পর্যন্ত ঠাকুর-দেবতার পুজো হবে না এবং পুজো যারা করবে, পুজো না হলে তাদের জলগ্রহণ করার উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ি প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার ভোগ হয়। সকালে উঠেই ভিন্নগ্রামে সে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাতে গিয়েছিল, প্রায় বেলা বারোটার সময় তেতে-পুড়ে ফিরে এসেই শুনলে, পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও ঘরের উঠোনেই পড়ে আছে। মড়া দেখতে যারা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি তাদের প্রত্যেককেই কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে মড়াটাকে একটুখানি বের করে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে শালগ্রামের পুজোটা করে দিয়েই জল খাবে। কিন্তু তাও যখন হল না, তখন সে নিজেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

দেখা গেল, আপাদমস্তক ঢাকা-দেওয়া সুবীর মৃতদেহ আগলে তার মা আমগাছের তলায় একাকিনী চুপ করে বসে আছে। চোখে জল নেই, মুখখানি শুকনো—কেঁদে-কেঁদে সে যেন হয়রান হয়ে গেছে।

দরজার বাইরে থেকে লোকনাথ চেঁচিয়ে উঠল, বলি ও ঠাকরুন, মেয়ে তো না হয় সাতকুল উজ্জ্বল করে দিয়ে মলো, তাই বলে কি ও-হারামজাদীর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও মরতে হবে নাকি? মড়া বের না করলে যে ঠাকুরের ভোগ হয় না!

মুখ তুলে একবার চাইতেই সুবীর মায়ের চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এল। কথা সে কিছুই বলতে পারলে না, গলা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকনাথ ভাবলে, বুঝি মাগী এইবার হয়তো তাকেই অনুরোধ করে বসবে।

রাগের মাথায় এখানে আসবার আগে অতটা সে ভাবেনি, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘোঁতঘোঁত করতে-করতে সেখান থেকে চলে গেল।

জমাদারসাহেব এলেন সন্ধের সময়। পিলপিল করে লোকজন তাঁর পিছু-পিছু ঢুকল সুবীদের বাড়ি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দ্যাখে, আমগাছের তলায় সেই ভাঙা খাটিয়াটা মাত্র পড়ে আছে, সুবীর মৃতদেহও নেই, সুবী মা-ও নেই।

কোথাও গেল তারা? বাগদিদের একটা ছোঁড়া আঙুল বাড়িয়ে দূরের একটা পুকুর দেখিয়ে বললে, উ-ইকানে বসে রয়েছে দেখলাম।

কিন্তু কখন যে সেখানে গেছে কেউ তা জানে না। লোকনাথ চলে যাওয়ার পর সুবীর মা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিজেই একবার মৃতদেহটা তার কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারি মৃতদেহ কাঁধে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন সে সুবীর মাথার দিকটা দু-হাত দিয়ে ধরে কোনওরকমে টেনে-টেনে তাকে ঘরের বার করে এবং অমনি করেই একটু-একটু করে দূরের ওই পুকুরটায় নিয়ে গিয়ে ফ্যালে।

আরও দূরে নিয়ে হয়তো সে যেত, কিন্তু পুকুরের চারিপাড়ে শুধু শক্ত-শক্ত কাঁকর আর পাথরের কুচি, এইতেই সুবীর রাঙা টুকটুকে পা দুখানি পথের ধুলোয় ম্লান হয়ে গেছে, তার ওপর মা হয়ে ওই শক্ত কাঁকর-পাথরের ওপর দিয়ে মেয়েকে তার হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়ই বা কেমন করে? তাই সে ওইখানেই চুপটি করে বসে আছে।

জমাদারসাহেব ভেবেছিলেন যা, এসে দেখলেন ঠিক তার উলটো। ভেবেছিলেন, অবস্থাপন্ন লোকের বিধবা মেয়ে, আত্মহত্যা করেছে, মর্গে চালান দেওয়ার নামে বেশ একটু ধমকা-ধমাকি করলেই কিছু বেরিয়ে আসবে। সাহেবের স্ত্রী নাকি অন্তঃসত্ত্বা, বাড়িতে এ-মাসে মোটারকম টাকা পাঠানো তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সারা রাস্তা তিনি তাই ভাবতে-ভাবতে এসেছেন—আত্মহত্যা করে মানুষ মরেছে, তার দরুণ টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি বাড়িতে পাঠাবেন, আর সেই টাকা খরচ হবে তার সন্তানের জন্মোৎসবে! তা হোক, পুলিশের কাজ করে অত সব ভাবতে গেলে চলবে না।

কিন্তু সাহেবের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কিছু না নিয়েই তাঁকে ফিরতে হল। মৃতদেহ সৎকার করবার হুকুম তিনি দিয়ে গেলেন।

শীতকালের রাত। মৃতদেহ সৎকারের পর স্নান করতে হবে। তার ওপর রাত্রে আর বাড়ি ফিরতে নেই। শ্মশানেই রাত কাটাতে হয়। সুতরাং কেউ আর বাড়ি থেকে সহজে বেরোতে চায় না।

গামছা কাঁধে নিয়ে লোকনাথ এসে দাঁড়াল।

দুগু ভটচায লাফিয়ে উঠল : ব্যস, কাউকে চাইনে। একজন সঙ্গী পেলে আমি একাই পুড়িয়ে ফেলতে পারি!

লোকনাথ ঘাড় নেড়ে বললে, উঁহু, ভেবে দেখলাম, পোড়ানো চলবে না।

সকলেই তার মুখের পানে তাকিয়ে আর কী বলে শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইল।—বাঁচালে বাবা! শীতকালের রাত—।

লোকনাথ বললে, একে গলায় দড়ি, তায় বাসী মড়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত না করলে ওর মুখাগ্নি চলবে না, আর মুখাগ্নি না করে অগ্নিক্রিয়া করতে দোষ আছে। তা ছাড়া যারা ওকে নিয়ে যাবে তাদেরও যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

কে যেন বলে উঠল, তা হলে দরকার নেই বাপু!

ভুবন তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মহা উৎসাহে গামছা কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, লোকনাথের কথা শুনে তা মা দরজা থেকে ডাকলে, ওরে ও ভুবন! তা হলে চলে আয় বাবা! শুনছিস তো!

লোকনাথ বললে, শাস্ত্রে বলছে—গলরজ্জুঃ বৃক্ষশাখায়াং ত্রিসন্ধ্যাং কালেং যদি মৃত্তিকায়াং প্রোথিত অগ্নিক্রিয়া নৈবচ নৈবচ।—এর পরেও যদি কেউ যেতে যায় তো যাক—আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার বিবেচনায় গ্রামের দুজন বাউরি-বাগদি নিয়ে ওকে পুঁতে ফেলাই উচিত।

এমন সময় বিকট একটা চিৎকারের শব্দে সবাই যেন চমকে উঠল। গ্রামের বাইরে থেকে চিৎকার। মনে হল যেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ খেয়াল হল সুবীকে আগলে সুবীর মা সেই পুকুরের ধারে একাকী এই অন্ধকারে এখনও চুপ করে বসে আছে। এ তারই গলার আওয়াজ!

ব্যাপারটা দুগু ভটচায ভালো বুঝতে পারেনি, হাঁ করে এর-ওর মুখের পানের তাকিয়ে বললে, কী?

কে একজন জোরে-জোরে তাকে বুঝিয়ে বললে, সুবীর মা চেঁচাচ্ছে।

এই কালা-খ্যাপা মানুষটির কোথায় গিয়ে যে বাজল কে জানে, সর্বাগ্রে সে উঠে দাঁড়াল এবং কাউকে কোনও কথা না জিগ্যেস করে যে একাই সেইদিক পানে চলে গেল।

খানিক পরে, তার দেখাদেখি জন দশ-বারো গ্রামের ছোকরা প্রত্যেকেই হাতে একটা করে লণ্ঠন নিয়ে সেখানে গিয়ে দ্যাখে, পুকুরের পাড় থেকে খানিক দূরে একটা মাঠের ওপর দুগু ভটচায দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে

হাঁপাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে সুবীর মৃতদেহ অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাপার কী?

দুগু ভটচায বললে, একপাল শেয়াল এসেছিল আর দুটো বড়-বড় গো-বাঘা! বাপরে বাপ! ব্যাটারা ছাড়তে কি চায়! ওই দ্যাখো না, পায়ের কাছটা কেমন করে খুবলে নিয়েছে।

দেখা গেল, সুবীর বাঁ-পায়ের আঙুলগুলো একরকম নেই বললেই হয়। তা ছাড়া সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ন দাঁতের চিহ্ন।

মা তার তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটা সামলাচ্ছে। কারণ, ওরই সঙ্গে প্রথমে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। এবং জন্তু-জানোয়ারের মুখ থেকে কন্যার মৃতদেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে পরনের কাপড়খানা তার একেবারে শতচ্ছিন্ন জর্জরিত হয়ে গেছে।

লোকনাথও ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে। বললে, তা হলে ওই ব্যবস্থাই হোক। দুগু যখন মড়াটা ছুঁয়েইছে তখন ও-ই যাক শ্মশানে, সঙ্গে আরও জনকতক বাউরি-বাগদি নিক, নিয়ে বেশ ভালো করে পুঁতে দিয়ে আসুক। অগ্নিক্রিয়া যখন হবেই না, তখন পোঁতা ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু শোনো, ভটচায, যেন শেয়াল-কুকুরে টেনে না বের করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

মা তার একটি প্রতিবাদও করলে না।

দু-একদিন পরেই দেখা গেল, গ্রামের খেঁকি কুকুরের দলে কীসের যেন একটা মহোৎসব লেগে গেছে। খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করে তারা ক্রমাগত গ্রামের চতুর্দিকে ছুটে-ছুটে বেড়াচ্ছে!

নিবারুণ বললে, মেষের পুকুরের পাশে সুবীর আস্ত একখানা হাত নিয়ে কয়েকটা কুকুরকে কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করতে সে দেখে এল। তোমাদের বিশ্বাস না হয় তো তোমরাও স্বচক্ষে দেখে আসতে পারো।

তারপর শুধু হাত নয়, সেইদিনই গ্রামের ছেলে-ছোকরার দল আবিষ্কার করলে যে, সুবীর মৃতদেহ শেয়ালে গো-বাঘায় মাটি থেকে টেনে তো তুলেইছে এবং হাত-পা আর পাঁজরার হাড়গুলো শ্মশান থেকে মুখে করে এনে সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে চলেছে।

কুকুর দেখলেই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সুবীর হাড় দেখবার জন্যে। কিন্তু ফিরে তারা আর বাড়ি ঢুকতে পায় না।

মায়েরা সব হাঁ-হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে, খবরদার বলছি ঘরে ঢুকিসনে। মরা মানুষের হাড় ছুঁয়ে এলি নাকি—যা, পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয়গে।

কাউকে বা ডুব দিতে হয়, কেউ বা মাথায় জল ঢালে, আবার কাউকে বা মাথায় একটুখানি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, আর কখনও সে সুবীর হাড় দেখতে যাবে না।

গ্রামের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের মজলিশে এই নিয়ে কথা ওঠে। বলে, সর্বনাশ হল দেখছি। এইবার ঘরে-ঘরে ভূত নাচবে।

নিবারণ বললে, ওই শালা দুগু ভটচাযকে যে এত করে বলে দেওয়া হল—ভালো করে পুঁতিস, যাতে শেয়াল-কুকুরে না তুলতে পারে, তা শালা দিয়ে এসেছে হয়তো, এমনি নাম-নাম পুঁতে, তা না হলে এমন হয় কখনও?

দুগু ভটচায বললে, মাইরি বলছি, আমি একবুক গর্ত খুঁড়ে তবে পুঁতেছিলাম। বিশ্বাস না হয় তো বলো—আমি ঠাকুরঘরে হাত দিয়ে বলতে পারি।

কিন্তু সে-কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, গ্রামের মধ্যে ভূতের ভয় যদি হয় তো শালা বুঝতেই পারবি, তোকে সুদ্ধ খণ্ড-খণ্ড করে কেটে আমরা সুবীর সঙ্গী করে দেব।

ভটচায কালা মানুষ, শুনতে পায় না তাই রক্ষে, নইলে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজদারি বেধে যেত।

সেদিন থেকে এমন হল যে, সন্ধে হলে আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। অপমৃত্যুতে মরা মানুষের হাড়-পাঁজরা যখন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তার প্রেতাত্মাই বা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে না কেন?

নবীন বললে, মাইরি বলছি, আমি কাল স্বচক্ষে দেখেছি, সুবীদের বাড়ির পাশ দিয়ে সন্ধেবেলা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, আমগাছটা ঝড়ঝড় করে নড়ে উঠল। গা-টা শিউরে উঠতেই 'রাম-রাম' বলতে-বলতে এগিয়ে গেলাম। রাম নাম করেছিলাম বলে ছুঁতে আমায় পারলে না, কিন্তু পেছনের পুকুরটার জলে মনে হল যেন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই না শুনে গ্রামের গিরিশ চৌকিদার তো রাত্রিবেলা এ-পাড়ায় হাঁক দেওয়া একরকম ছেড়েই দিলে। আবালবৃদ্ধবনিতা ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অন্ধকারে হঠাৎ কুকুর-বেড়াল দেখলেও লোকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠতে লাগল।

সুবীর মা তো সেইদিন থেকে অন্ধকারে-অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, যে-আমগাছে দড়ি বেঁধে মেয়ে তার মরেছিল, গভীর রাত্রে সেই আমগাছটির তলায় চুপটি করে বসে থাকে। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে বলে, কোথায় মা, তার চিহ্নও কোনওদিন দেখতে পাই না। বলেই সে কাঁদতে থাকে।

লোকে তা বিশ্বাস করে না। ভাবে, বুঝি মাগী মিথ্যা কথা বলছে।

লোকনাথ তাই সেদিন দুপুরে তাকে ডেকে বললে, ওগো, শোনো! তুমি তো দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছ, এদিকে তোমার মেয়ের দায়ে আমাদের গ্রামে টেঁকা ভার হয়ে উঠল দেখছি। তার চেয়ে শোনো বাপু, ভালো চাও তো গয়ায় গিয়ে মেয়ের নামে একটা পিণ্ডি দিয়ে এসো।

গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে সুবীর মায়ের ছিল না, তবু তাকে জোর করে সবাই মিলে বলে-কয়ে গয়ায় পাঠিয়ে দিল। বেচারা একাকিনী কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল গয়ায়। মেয়ের নামে দুর্নাম রটবে তাই-বা সে সহ্য করে কেমন করে? অথচ সে নিজে যদি তাকে একটিবার দেখতে পেত! মায়ের মন—যে-মেয়ে তার রাগ করে চলে গেছে, তাকেই সে একটিবার শুধু চোখে দেখতে চায়। শ্মশানের যে-জায়গাটায় সুবীকে পোঁতা হয়েছিল, সুবীর মা সেইখানে বসে কাঁদতে লাগল। ভাবলে, না, সে গয়ায় যাবে না। ভূত হয়েও মেয়েটা যদি একবার দেখা দেয়! গয়ায় পিণ্ডি দিলে সে-আশাও হয়তো আর থাকবে না! সুবীর মা ভাবলে রাত্রিটা সে আজ এই শ্মশানেই কাটিয়ে দেবে। ভূত হয়েও যদি সে আসে তো একবার জিগ্যেস করবে, হতভাগী, রাগ করে তুই কেন গেলি!

সারারাত সুবীর মা সেই অন্ধকারে শ্মশানের মাঝে বসে রইল।

এদিকে গ্রামের লোক জানে যে, সে গয়ায় গেছে।

দিন দুই পরেই গ্রামের মধ্যে আবার এক হুলস্থুল ব্যাপার।

থানা থেকে পুলিশ এসেছে। গ্রামের জনকতক ভারিক্কি মাতব্বর লোককে তারা থানায় নিয়ে যাবে। কী জন্যে নিয়ে যাবে জিগ্যেস করলে বলে না। বলে শুধু, সেখানে গিয়ে কী একটা বস্তু শনাক্ত করতে হবে!

জ্বালাতন!

এই গ্রামের ওপরেই যত অত্যাচার রে বাবা!

লোকনাথ বললে, দাঁড়া, তবে আর ভূতের উপদ্রব বলেছে কাকে? বললে, গয়া থেকে সুবীর মা ফিরে আসুক, এলেই দেখবি সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।

কিন্তু গ্রামের লোক থানায় গিয়ে দ্যাখে, কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা কী একটা জিনিস।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, দেখুন দেখি চিনতে পারেন কি না?—বলে যেই ঢাকা খুলেছে আর চক্ষুস্থির!

সবাই দেখলে, রেলের লাইনে কাটা তালগোল পাকানো একটা মৃতদেহ, মুখখানা কিন্তু তখনও পর্যন্ত দেখলে চেনা যায়—সুবীর মা ছাড়া আর কেউ নয়।

ব্যস, সেই অবধি সুবীদের বাড়িখানা রইল অমনি পড়ে। মানুষ বাস করা দূরে থাক, সন্ধের অন্ধকারে ও-পথ দিয়ে কেউ আর সহজ যেতে চায় না। যেতে হলে এখনও গা ছমছম করে। প্রথম বছর ঘরের খড়ো চাল গেল উড়ে, দ্বিতীয় বছর কাঠামোটাও গেল ভেঙে—আজকাল খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওই চারপাট মাটির দেওয়াল। যে-আমগাছে সুবী মরেছিল, গাছটা এখনও ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ঠিক সময়ে তার শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, কচি-কচি পাতা গজায়, মুকুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, শেষে থলো-থলো আম ধরে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এত যে ডানপিটে ছেলে তারা কেউ আর সাহস করে ও-আমগাছটার তলা দিয়ে পেরোয় না—ও-আমও কেউ খায় না—গাছের আম গাছেই পাকে। আবার সময় হলে ঠিক মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায়।

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৫৮



সেই অচেনা মেয়েটি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরম বিচ্ছেদের আবেদনপত্র যথারীতি সই করেছিলাম, ধীরেশবাবু সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েও গেলেন, আর উনি? উনিও চুপচাপ বসে রইলেন অভ্যাগত কোনও পরিজনের মতো আমার সেলাইয়ের টেবিলের সামনের চেয়ারটায়। ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বাইরের আলো পাণ্ডুর হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল, রাস্তার কোনও আলোর ছটা ওঁর পাঞ্জাবির সোনার একটা বোতামের ওপর আবছা এসে পড়ে ঝিলমিল করে উঠল। বোধহয়, তারপরই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঘর ছেড়ে ওঁর নিজের ঘরে যেতে-যেতে বললেন, অন্ধকার। আলোটা জ্বেলে নাও।

রাত বাড়তে লাগল। আমার ঘুঙুর দুটো টেবিলের ওপর পড়েছিল, ওদুটো তুলে টিনের বাক্সে রেখে দিতে গিয়ে একটা ঘুঙুর হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ঝনঝন করে বিশ্রী একটা শব্দ তুলল।

বিকেলের স্কুলে সেদিন আর যাওয়া হয়নি। যে দুটি মেয়েকে 'ভারতনাট্যম' শেখাই, তারা নিশ্চয় স্কুলে এসে আমার জন্য কিছুক্ষণ বসে থেকে নিজেদের মধ্যে আজে-বাজে গল্প করে—হয়তো আমাকে নিয়েই ওদের মনোমতো গল্প—অবশেষে ওরা বাড়ি ফিরে গেছে। নাচের স্কুলের মালিক ও অধ্যক্ষ প্রৌঢ় আদিত্যবাবু আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই ঘর আর বার করেছেন, কারণ আমার গত তিন বছরের নৃত্য-শিক্ষকতার জীবনে একটি দিনের জন্যও অনুপস্থিতি ঘটেনি।

স্কুল আমার দুটি। সকাল আর বিকেল। সকালের স্কুলটা হচ্ছে আমাদের সুরুচিদির। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত এমন কে আছেন যে তাঁর নাম শোনেননি? কিন্তু আমি তো গান শিখিনি, আজীবন ধরে যা শিখেছি, তা নাচ এবং নাচের মধ্যেও অন্য নাচে আমার তেমন দক্ষতা নেই, যেটা যত্ন নিয়ে মাদ্রাজে দীর্ঘদিন থেকে শিখেছিলাম, সে হচ্ছে ভারতনাট্যম। কিন্তু সুরুচিদি ছাড়বেন না, ছোট মেয়েদের প্রাথমিক নৃত্যশিক্ষা দিতে হবে আমাকেই।

ভাবছিলাম, কাল সকালেও কি সুরুচিদির স্কুলে যেতে পারব? ওখানেও তাহলে ঘটবে গত তিন বছরের কর্মজীবনে একটি দিনের অনুপস্থিতি।

কিন্তু কীই-বা করা যায়? মনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহটাও ক্লান্তিতে ভরেছিল সেদিন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে এলাম যখন, রাত দশটা বেজে গেছে। উনি ওঁর ঘরে গেছেন যথানিয়মে। হয়তো টেরাকোটা-আর্টের সেই ভাঙা যক্ষিণী-মূর্তিটি এই রাত্রে টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ধরে অতসী কাচ

দিয়ে কী-কী সব লক্ষ করছেন। মূর্তিটি নাকি ভয়ানক দামি, ওঁর কোন এক গবেষণারত সরকারি বন্ধু ওঁকে কিছুদিনের জন্য দেখতে দিয়েছেন গবেষণার সুবিধার জন্য। ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণপুর না কী নামের যেন একটা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে ওই মূর্তি।

উনি ইতিহাসের গবেষক ও অধ্যাপক। কিন্তু, এযাবৎ যা নিয়ে উনি নিজের খেয়ালে গবেষণা করছিলেন, তা হচ্ছে নৃত্য। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরে তার স্থাপত্য লক্ষ করেছেন। 'মেলাটুর' বলে মাদ্রাজের যে গ্রামে গুরুগৃহে আমি নাচ শিখেছিলাম, সেই গ্রামে গেছেন আমাকে নিয়ে, আমার যিনি 'নট্টুবান' বা নৃত্যশিক্ষক, তাঁর সঙ্গে তো দেখা করেছিলেনই, অন্য 'নট্টুবান'দের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও 'ভারতনাট্যম' সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিচ্ছিলেন।

সেদিন বলেছিলাম, এসবের দিকে ঝোঁক হল কেন?

বলেছিলেন, যেজন্য তোমার দিকে ঝুঁকেছিলাম, সেজন্য এসবের দিকেও ঝুঁকছি! অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলাম, ও, মাত্র ঝোঁকের মাথায় আমাকে বিয়ে?

একটু হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ঝোঁকটা কিন্তু ভালোবাসার ঝোঁক।

—Love at first sight?

হেসে উঠলেন, তারপরে আমার মুখখানা দু-হাতে ধরে মুখের ওপর ঝুঁকে কী যেন দেখতে লাগলেন, বললেন, সেটা হয়। অন্তত আমার হয়েছিল, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি। তোমার হয়নি বুঝি?

মনে-মনে বলেছিলাম, বলা শক্ত!—কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ করতে পারিনি, এসব ক্ষেত্রে সোজা সাদাসিধে কথা পুরুষরা সহ্য করতে পারে না। তাই, একটু হেসে ওঁর চোখের দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ, তা হয়েছিল আমারও।

উনি আদরে-আদরে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলেন। কিন্তু, আমি মনে-মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এত বড় একজন পণ্ডিত লোক, আমার এই সামান্য কথাটায় ভুলে গেলেন কেমন করে!

পরে, অনেক পরে, ভেবে দেখেছি, পুরুষদের কাছে এই উচ্ছ্বাসটাই বুঝি সব। উচ্ছ্বসিত হয়ে কিছু বানিয়ে বললেও, তৎক্ষণাৎ ওরা বিশ্বাস করে নেয়।

সেই প্রথম কলকাতায় এসে আমার নাচ দেখানো। বাবা বললেন, খুকি, কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাই। মাত্র এই ছুটি-ছাটাতে মাদ্রাজ-কলকাতা, কলকাতা-মাদ্রাজ,—আর ভালো লাগছে না!

—তোমার চাকরি?

বাবা বললেন, ট্রান্সফারের চেষ্টা করছি। বোধহয় পেয়ে যাব।

তা বাবা অবশ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্য কি? আবার হঠাৎ এখনি বদলির আদেশ-পত্র এসে পৌঁছল, এবং সে আর মাদ্রাজ থেকে নয়, একেবারে ওপার থেকে—যেখান থেকে মানুষ আর ফেরে না। মাকে তো হারিয়েছিলাম ছোটতেই, এরপর বাবাকেও হারালাম।

ওঁর সঙ্গে বিয়ে অবশ্য ততদিনে হয়ে গেছে। সেই প্রথমদিনের নাচ দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল ওঁর। বাবার সঙ্গে আলাপ করে একরাশ ফুল নিয়ে একেবারে আমার গ্রিন-রুমে।

—Love at first sight?

বারবার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেতাম, সেটা হয়।

আমার বিয়ে হয়েছিল কুড়িবছর বয়সে—আজ আমি আঠাশ। দেখায় নাকি আরও কম। অবশ্য এটা শোনা কথা—উনিও বলেন, ওঁর বন্ধু ধীরেশবাবুও বলেন। নিজে বুঝতে পারি না। নিজের যেটা মনে হয়, সেটা চুপিচুপি বলতে পারি। মনে হয়, দশ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটিই আমি আছি, কাঁদছি 'মা-মা' করে—আর বাবা কোলে নিয়ে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন, বলছেন, খুকু, আমি তোর মা-বাপ। বলতে-বলতে নিজেই কেঁদে ফেলেছিলেন ঝরঝর করে।

আট বছরের বিবাহিত জীবনে কোনও সন্তান আসেনি, আমি আসতে দিইনি।

বছরতিনেক আগে একবার টাইফয়েড হয়েছিল। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কী একটা স্নায়বিক রোগও নাকি দেখা দিয়েছিল। ডাক্তার বারণ করে দিয়েছিলেন নাচতে।

চোখ ফেটে কান্না এসেছিল। নাচবই না যদি, তাহলে কী শিখলাম সারা জীবনের সাধনায়? তাছাড়া, বিভিন্ন জলসায় নাচ দেখিয়ে, বা কোনও-কোনও নাচের দলের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরে, কিম্বা দুটি-তিনটি ছায়াছবিতে বিশিষ্ট একক নৃত্য প্রদর্শন করে, অর্থ ও খ্যাতি,—দুই-ই অর্জিত হচ্ছিল মন্দ নয়। বললাম, নাচ ছেড়ে দেব? তুমিও বলছ?

উনি বললেন, তা আমি কোনওদিনই বলব না। তোমার শিল্পী-জীবনকে ব্যর্থ করার অধিকার আমার নেই। তাছাড়া, তোমার কোনও কাজে বাধা তো আমি দিইনি।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু মনে হল, কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত অভিমানও যেন ফুটে উঠল।

মনের মধ্যে বুঝি ঝড় বইছিল, একে শারীরিক দুর্বলতা, তার ওপরে এই মানসিক উত্তেজনা। ওঁর দুটি হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠেছিলাম, কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে?

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ, মুখখানা যেন আকস্মিক বেদনার আঘাতে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে দ্বিগুণ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেদিন রাত্রে আমার 'ফিট'ও হয়েছিল।

ধীরেশবাবু ওঁর বন্ধু। অদ্ভুত লোক, ওকালতিও করেন, অধ্যাপনাও করেন, পত্রিকায় মনস্তত্ত্বের ওপর সারগর্ভ প্রবন্ধও লেখেন। আবার, পাড়ার গরিবদের হোমিওপ্যাথির বই দেখে দেখে বিনা পয়সায় ওষুধও দেন। বিয়ে-থা করেননি, চিরকুমারই থাকবার নাকি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বয়স সম্প্রতি চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়ায়, হঠাৎ মত বদলাতে শুরু করেছে। বলেন, সত্যি কথা বলব, মিসেস চৌধুরী? মনের মতো মেয়ে পাই তো, বিয়ে করি। নিচের তলাটা পুরো ভাড়া দিয়েছি, ওপর তলাকার চারখানা ঘর একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

হেসে বলেছিলাম, ভাড়া দিন না।

—না, না, ভাড়া নয়,—হাসতে-হাসতে বলে উঠেছিলেন, নিজেকে দিয়েই ভরাতে চাই।

—কীরকম!

উনিও ছিলেন আমার পাশে বসে, বললেন, এটা বুঝলে না? ধীরেশ বিয়ে করে এক থেকে বহু হতে চায়।

কথাটা বুঝতে পেরে লজ্জায় বোধহয় রাঙা হয়ে উঠেছিল আমার মুখ—ওঁর গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে জনান্তিকে বলে উঠেছিলাম, যাঃ! অসভ্য!

হাসছিলেন তখনও উনি, বললেন, যাই বলো, ছেলেপিলে না হলে ঘর মানায় না।

ওঁরা দুজনে মহাকৌতুকে হাসছিলেন, কিন্তু আমার সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, চারদিকে প্রবল একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। এর প্রতিরোধ করতেই হবে।

মাথাধরার অজুহাতে নিজের ঘরে এসে খিল দিয়েছিলাম। আঁচলটা বুক থেকে নামিয়ে ফেলে আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখছিলাম সেদিন।

সত্যি কথা বলতে কী, গর্বই হচ্ছিল মনে-মনে। মাথায় সিঁদুর আর হাতে লোহা না থাকলে আজও আমাকে বিবাহিত বলে ভাবা শক্ত, পুরুষদের পক্ষে তো বটেই, মেয়েদেরও ভ্রম হতে পারে।

আধুনিক লেখকরা আমাকে নিয়ে গল্প লিখলে, আমাকে বর্ণনা করতে বসে রীতিমতো সুন্দরীই বলে বসবেন আমাকে, এ আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি। কেন, সেই যে কী-সব সিনেমা-পত্রিকা হয়েছে আজকাল, যা বেরোলে নাকি পঞ্জিকার মতো ঘরে-ঘরে কিনে নেয় অনেকে, তার একটিতে কিছুদিন আগে আমার ছবি ছাপিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে আমার দেহ-লাবণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখই হয়ে উঠেছিলেন লেখক।

অস্বাভাবিক নয়। ধীরেশবাবু প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসেন ঠিক ঘড়ি ধরে রাত আটটায়, দু-ঘণ্টা গল্প করে ঠিক দশটায় বাড়ি ফিরে যান। বলেন, সারাদিনের খাটুনির পর এটুকুই আমার recreation—অর্থাৎ, নিজেকে নতুন করে উজ্জীবিত করা।

হাসিমুখে বলতাম, কিন্তু, ঠিক আটটা কেন, ধীরেশবাবু?

বলতেন, ওই যে আপনি স্কুল সেরে আটটার মধ্যে ফিরে আসেন।

বলতাম, তাহলে আমিই?

—কী?

—আপনার recreation?

বলতেন, আপনারা দুজনেই। দুজনেরই মিলিত একটি সুর।

উনি সকৌতুকে বলতেন, ভণ্ড কোথাকার। আমার ওপর তোর টান? রোববার আসিস?

বলতেন, না, রোববারটা কোথাও আসা-আসি নয়। ও-দিনটা আমি নিজেকে নিয়ে কাটাই। ওটা আমার আত্মদর্শনের দিন। আর তাছাড়া, রোববারটা নিছক তোমাদেরই দুজনের থাকা দরকার। Two is company, three is crowd.

উনি বলতেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি?

ধীরেশবাবু মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যেতেন, বলতেন, না। ওটা দরকার।

তারপরেই আবার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলতেন, মিসেস চৌধুরী কিন্তু great inspiration.

—কীরকম?

ধীরেশবাবু আমার প্রশ্নে আমার দিকে ফিরে বলতেন, দেখছেন না আপনার কর্তার দশা! কী নিয়ে পড়াশুনা করত, আর আপনাকে বিয়ে করার পর থেকে ও এই আট বৎসর ধরে 'ভারতনাট্যম' নিয়ে পড়েছে। ঘোরাঘুরি করতে আর বই কিনতে ও কি কম পয়সা নষ্ট করছে!

—কী যে বলেন!

লজ্জিত হয়ে কথাটা বললেও মনে-মনে ভয়ানক খুশি হতাম। ওঁর 'ভারতনাট্যম' সম্পর্কে এই ঔৎসুক্য, এর খুঁটিনাটি, এর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, এর সুবিস্তৃত ও সু-বিচিত্র ইতিহাস জানবার ওঁর বিপুল আগ্রহ যে এই আমি, নিছক এই মেয়েমানুষটিকেই জানবার নামান্তর, এটা বুঝতে আমার ভুল হত না। প্রেমের এই অদ্ভুত এক দিগন্তের বিকাশ আমাকে মনে-মনে এত অভিভূত করত যে, আমি আরও বেশি নাচের অনুশীলনে ডুবে যেতাম, আরও বিচিত্র ও কঠিন ভঙ্গিমা অনুক্ষণ আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা করতাম।

আহারে-বিহারে নিয়ম মেনে চলা আর এই নৃত্যের শ্রম আর অভ্যাস, এবং ভারতনাট্যমেরই অনুপূরক হিসাবে পরিমিত কুম্ভক ও রেচক, এই যৌগিক প্রক্রিয়া যে আমার দেহচ্ছন্দনকে অপরূপ করে রাখবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

তার প্রতিফলন দেখতাম ধীরেশবাবুর চোখে। গল্প করতে-করতে ওঁর দুটি চোখে যে মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখতাম, তার অর্থ বুঝতে নারী হয়ে ভুল করব কেন? প্রশ্রয় দিতাম না বটে, নিবারণও করতাম না। মনে হত মুগ্ধ ভক্তের নীরব পুষ্পাঞ্জলি এসে আমার পায়ে পড়ছে!

ঘর-সংসার আমি দেখতাম না, তার জন্য ঝি ছিল, রাঁধুনি ছিল। আর তাছাড়া, সংসার তো দুটি লোকের, আমি আর উনি। আমার দেওর বা ভাশুররা নানান জায়গায় থাকেন, বিশেষ আসেনও না। গত আট বছর ধরেই এটা দেখে আসছি। আমাকে বিয়ে করায় তাঁদের ভাইয়ের প্রতি তাঁরা খুশি নন। শ্বশুর নেই, বিধবা শাশুড়ি তাঁর বড় ছেলের কাছে সুদূর পুনায় পড়ে আছেন, কলকাতা আসেনও না, মাঝে-মাঝে চিঠি আসে শুধু তাঁর।

সেদিন শুয়ে-শুয়ে সমস্ত অতীতটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে ছায়াছবির মতো। টাইফয়েডের পর নিজে নাচ দেখানো ছেড়েছি বটে, কিন্তু নাচ শেখানো ধরেছি। বাড়ি বসে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারব না, সে

উনি জানতেন। গত তিনবছর ধরে চলেছে আমার শিক্ষকতা। কিন্তু শিক্ষকতা চললেও, অন্য এক ঝড় চলেছিল সংসারে। অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের মানসিকতার ঝঞ্ঝা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে-ভিতরে বিপর্যস্ত করে দেয়।

বিবাহের পঞ্চম বর্ষ থেকেই এর শুরু হয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম, এবং বুঝেই শুরু হয়েছিল আমার প্রতিরোধ। মুখে উনি কিছু বলতেন না, কিন্তু হাবে-ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হত, উনি কী চাইতেন।

বলতাম, আমার এই জীবন আমি নষ্ট করব?

চমকে উত্তর দিতেন, কোন জীবন?

বলতাম, তুমি কী চাও, আমি কি তা বুঝি না? পারব না, পারব না নষ্ট করতে আমাকে।

বলে কেঁদে উঠে ছুটে চলে আসতাম নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়।

উনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারতেন না, একটু অবাক হয়েই চলে আসতেন পেছনে-পেছনে। বলতেন, কী বলছ তুমি, মানসী?

বলতাম, বোঝো না? কী ভাবে আমি থাকি? আমার এই 'ফিগার'—।

কথা শেষ না করে থেমে যেতেই উনি যেন মুখের দিকে তাকিয়ে বাকিটা বুঝে নিতেন, বলতেন, ও, এই! না মানু, তুমি তো জানো, আমি সেসব চাই না। তোমাকে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট। সন্তান-টন্তান আমার দরকার নেই।

মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন ওঁর ঘরে। আমি আরও অবাক হয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখতাম ওঁর চলে যাওয়া। কিন্তু বারবার মনে হত, ঠিক উনি বলেননি। বৈজ্ঞানিক যুগে সন্তানের জন্ম এড়ানো সম্ভব, আমরাও তা সম্ভব করেছি। অথচ—।

বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল সেদিন। বোধহয়, আবারও ফিট হয়েছিল আমার। গলির মোড়ে তাঁর বাড়ি থেকে আবার ডেকে আনতে হয়েছিল ধীরেশবাবুকে। ধীরেশবাবু আর তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধ।

তিনবছর ধরে ক্রমাগত এইভাবে সংগ্রাম করতে-করতে বিবাহের অষ্টম বর্ষে পড়ে মনে হল, এ চলবে না, চলতে পারে না। বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

উনি বললেন, বেশ। তোমার কোনও ইচ্ছায় বাধা দিইনি, আজও দেব না। ধীরেশকে ডাকি। করো Legal separation-এর দরখাস্ত।

করলাম। ধীরেশবাবু প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, ভিতরে-ভিতরে খুশিই হয়েছেন তিনি। কোর্টের আদেশ হলেই আলাদা থাকব তিনবছর, তারপরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ।

বললেন, কোর্টের হুকুমটা বেরুক, তখন আলাদা বাড়ির খোঁজ করা যাবে, এখনই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

বলেছিলাম, সে আপনি বুঝবেন না।

ধীরেশবাবু বললেন, আমার দোতলায় চারখানা ঘর। না হয় একখানা ঘর আপনাকেই ভাড়া দেব।

বলেছিলাম, খুবই ভালো। বাড়ির যা প্রব্লেম কলকাতায়।

ধীরেশবাবু বলেছিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কেন এটা করতে যাচ্ছেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি তা বুঝবেন না।

আবেদনপত্র সই করার আগের দিন। ওঁর ঘরে গেছি। সেই তাকিয়াশোভিত খাটো তক্তপোশ, আর অসংখ্য বই আর খাতাপত্র। হঠাৎ দেখি, বহু পুরোনো মাটির একটা ভাঙা পুতুল, লালচে রঙের।

বললাম, এটা কী?

উনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, বললেন, ধরো না, পড়ে গিয়ে ভেঙে যাবে। ওটা একটা যক্ষিণী মূর্তি, বহু পুরাতন যুগের। হরিনারায়ণপুরে পাওয়া গেছে।

তাড়াতাড়ি রেখে দিলাম যথাস্থানে, বললাম, হবে কী ওটা দিয়ে?

বললেন, ওটা নিয়েই তো গবেষণা করছি আজকাল!

—কীসের গবেষণা?

—বাঙলার পুরোনো ইতিহাসের। জানো, কলকাতাকে ঘিরে পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। হরিনারায়ণপুরে গঙ্গার ভাঙনে—।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, থাক, শুনতে চাই না।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোনওক্রমে কথাটা বলে নিজের ঘরে এসে আবার আশ্রয় করেছিলাম বিছানা। মনে হল, সব আমার চলে গেল। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়েছিলাম, সেই মাটিটাই যেন মুহূর্তে সরে গেল পায়ের নিচে থেকে।

ওই যক্ষিণী এসে আমার সমস্ত সত্তাটাকে যেন মুহূর্তে চুরমার করে দিয়ে গেল। কিন্তু, ওঁরই বা এই পরিবর্তন কেন? 'ভারতনাট্যম'-এর গবেষণা ছেড়ে অন্য বিষয়ে এইরকম অখণ্ড মনোনিবেশ?

কীসের এ প্রতিক্রিয়া? আমি মনে-মনে বুঝতে পারছিলাম, কীসের এ প্রতিক্রিয়া। মাত্র আমিই নয়, আরও কিছু ওঁর চাই। সন্তান—সন্তান ওঁর চাই।

কিন্তু মুখ ফুটে সে-কথা বলেন না কেন?

মুখে সেই ক্ষমাশীল হাসি, চোখে সেই অপার স্নেহ। কে চায় ক্ষমা, কে চায় স্নেহ!

ওই যক্ষিণী মূর্তিটির কথা যত চিন্তা করতে লাগলাম, ততই যেন আগুন ধরে যেতে লাগল মাথায়। মনে হল, এই ঘর, এই আসবাব, এই বাড়ি—এগুলো সব ভেঙে, গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিই।

উনি সব শুনে স্থির মনে বলে গেলেন ওঁর কথা। বললেন, আমার নামেই দোষারোপ দিও আবেদনপত্রে। আমার নিষ্ঠুরতা, আমার—।

আরও কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন উনি।

গায়ের জামাটা খুলে টকটকে লাল সেই আটপৌরে তাঁতের শাড়িটা পরেই শুয়েছিলাম। এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। বুকটা কেমন যেন আপনিই ধড়াস-ধড়াস করছে—কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে—চোখেও যেন কেমন অন্ধকার দেখছি মনে হল। বেডসুইচ টিপে আলোটা জ্বেলেও আঁধার কমছে না। দেয়ালের ঘড়িতে রাত প্রায় তিনটে—টকটক করে পেন্ডুলামটা প্রহর গুনে যাচ্ছে।

কিন্তু, আবার কি ফিট হবে নাকি আমার? কেমন যেন ভয় হল। গরমও লাগছে ভীষণ। ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে সামনের বারান্দার দরজাটা খুললাম। বারান্দাটা রাস্তার দিকে। বারান্দায় বেরিয়ে বাঁদিকে ফিরলেই ওঁর ঘর। খোলা জানলা দিয়ে একঝলক আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই লালচে আলোর ছটার দিকে তাকাতে-তাকাতে মনে হল, এত রাতে করছেন কী উনি, জেগে?

যাব না মনে করেও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে। জানলার পাশেই ওঁর শোওয়ার খাট, দেখি, খাটে উনি নেই, নিচের সেই বই-ছড়ানো তক্তপোশের ওপরে বই পড়তে-পড়তে বই খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ কী?

ঠিক ওঁর মাথার কাছটিতে পা মুড়ে বসে কে একটি মেয়ে পরম যত্নে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে ওঁকে, আর অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ওঁর মুখের দিকে। একরাশ খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপরে, খালি গায়ের ওপর লাল শাড়িটির আঁচলটা জড়ানো।

কে এই মেয়েটি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভুল দেখছি না তো? ভালো করে চোখ মুছে নিয়ে দেখতে লাগলাম—মেয়েটি আঁচলের খুট দিয়ে ওঁর মুখের বিন্দু-বিন্দু ঘাম অতি যত্নে মুছে নিচ্ছে!

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করতে লাগল। পাছে ফিট হয়ে পড়ে ওদের ব্যাঘাত ঘটাই, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হতে লাগল। কে—কে—কে এই মেয়েটি? কোথা থেকে এল ও?

লুকিয়ে-লুকিয়ে তাহলে এইসব হচ্ছে?

এইজন্যেই বিচ্ছেদের প্রস্তাবে এককথায় উনি বলতে পেরেছিলেন, আচ্ছা, বেশ।

বেশ। তাই হবে। আমিও মুখ ফুটে কথাটিও কইব না।

আর, কইবও-বা কেন? আর কী সম্পর্ক রইল ওঁর সঙ্গে আমার?

পরদিন ধীরেশবাবু আসতেই বললাম, কোর্টে দিয়েছেন? কবে নাগাদ আদেশ পাব?

বললেন, শিগগিরিই হবে। ব্যস্ত হবেন না।

—ব্যস্তই হয়ে পড়েছি।—বললাম, ধীরেশবাবু, আপনি আমায় বাঁচান। আপনার ঘরই কিন্তু ভাড়া নেব। যত শিগগিরি পারেন, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুন।

ধীরেশবাবু বললেন, কী হয়েছে বলুন তো? অসুস্থ? শুনলাম, ইস্কুলেও যাননি!

—না। কোথাও যাব না। এখান থেকে না বেরুলে কোনও কাজই করতে পারব না।

—একটা কথা বলবেন?—ধীরেশবাবু বলে উঠলেন, আসল ব্যাপারটা কী?

—সে আপনি বুঝবেন না!—বলতে-বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে এসেছিলাম নিজের ঘরে। উনি ছিলেন। ওঁতে আর ধীরেশবাবুতে কী কথা হয়েছিল জানি না।

পরদিন। ঠিক সেই রাত তিনটে। দরজা খুলে ওঁর জানলায় গিয়ে আরও কাছ থেকেই মেয়েটিকে দেখলাম। আমার বয়সিই হবে। সুন্দরী। সেইরকম খালি গা, এলো চুল। হলদে একটা শাড়ি পরা। ওঁর খাটের ওপর উনি শুয়ে আছেন। মেয়েটি ঠিক পাশেই শুয়ে। দুটি হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে—।

দু-হাতে চোখ ঢেকে ছুটে চলে এলাম নিজের ঘরে।

নাঃ! আর দেরি নয়, কোর্টের আদেশ আসুক বা না—আসুক, কাল ধীরেশবাবু এলেই ওঁর সঙ্গে আমাকে চলে যেতে হবে।

সকালেই ডেকে পাঠালাম।

—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার যাই হোক, এক্ষুনি আমাকে নিয়ে চলুন। এক মুহূর্তও টিকতে পারছি না

এ-বাড়িতে।

বললেন, কোর্ট থেকে আদেশটা নিয়ে আসবই আজ।

—তাহলে সন্ধ্যাতেই চলুন।

উনি বললেন, সেই এক কথা—বেশ। তাই হোক।

তারও পরের দিন। ধীরেশবাবুর সারাদিন দেখা নেই। এলেন রাত্রে।

বললেন, ক্ষমা করুন। আরও একটি দিন দেরি হবে।

বললাম, আমি কী করব? আমি কিছুতেই এখানে থাকব না।

বললেন, কী ব্যবস্থা করবেন!

—কাল আমিই চলে যাব।

—কোথায়?

বললাম, সে যেখানেই হোক।

ধীরেশবাবু বললেন, না, তা নয়। আমার বাড়িতেই নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

উনি ছিলেন না কাছে। কথার মাঝে হঠাৎই উঠে চলে গিয়েছিলেন বারান্দায়।

রাত তিনটের সময় যথারীতি ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে ওঁর জানলায় এসে যা দেখলাম, তা কোনও মেয়েই সহ্য করতে পারে না। সেই অচেনা মেয়েটি। খালি গা, এলো চুল, সাদা একটা শাড়ি পরা। ওঁর পাশে খাটের ওপর শুধু শুয়েই নয়—ওঁকে দু-হাতে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে বারবার কী যেন

বলছে। শুনছে না ওঁর কোনও বারণ—শুনছে না ওঁর কোনও কথা। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, মেয়েটি বলছে, আমি মরে যাচ্ছি! বোঝো না তুমি! সন্তান—ছোট একটি সন্তান চাই আমার কোলে!

প্রচণ্ড একটা শব্দ। আর কিছু মনে নেই। ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম বারান্দার ওপরে।

কী আর বলব, দুটি দিন নাকি অজ্ঞান অবস্থাতেই কেটে গিয়েছিল আমার। যমে-মানুষে টানাটানি।

যখন চোখ খুললাম, দেখি আমারই বিছানায় আমি শুয়ে। সামনের চেয়ারে বসে ধীরেশবাবু। পাশে আর-একটি চেয়ার। সেটি খালি। সম্ভবত উনিই বসেছিলেন এতক্ষণ।

ধীরেশবাবু বললেন, ভয় নেই। ভালো হয়ে গেছেন। ভয় পেয়েছিলেন, না?

ওঁকে ডেকে আনলেন ধীরেশবাবু। সব শুনলেন আমার কাছ থেকে। কেউ কিছু বললেন না, শুধু ধীরেশবাবুকে কিছুটা চঞ্চল মনে হল।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আরও কাটল দুটো দিন। ডাক্তার আর নার্সের ঘনঘন আনাগোনা।

দু-দিন পরে নার্স বিদায় নিল। আমিও উঠে বসলাম।

ধীরেশবাবু বললেন, মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখেছিলেন লাল শাড়ি পরে?

—হ্যাঁ।

—পরদিন দেখেছিলেন হলদে শাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—তার পরদিন সাদা শাড়িতে?

—হ্যাঁ।

ধীরেশবাবু আমার স্বামীকে ডাকলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আলনার দিকে তাকান তো!

তাকালাম। পাশাপাশি তিনটি আটপৌরে শাড়ি ঝুলছে। লাল, হলদে, সাদা।

বললেন, যে-মেয়েটিকে দেখেছিলেন, সে আর কেউ নয়, সে আপনি নিজে। আপনারই অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবি আপনি দেখেছিলেন, মিসেস চৌধুরী।

—আমি!—অবাক হয়ে মনস্তত্ত্ববিদ ধীরেশবাবুর কথা শুনছি।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে ধীরেশবাবু আমার স্বামীর নাম উচ্চারণ করলেন, বললেন, বিচ্ছেদের দরখাস্ত আমি কালই কোর্ট থেকে নাকচ করিয়ে আনছি।

বলে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমার স্বামী তাকালেন আমার মুখের দিকে। নতুন এক দৃষ্টি। অথবা, দৃষ্টি আমারই নতুন, যা দেখছি, তা-ই নতুন লাগছে!

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৫৮



দুই ডিটেকটিভ,

দুই রহস্য

পরিমল গোস্বামী

প্রস্তাবনা

আমি একটি যুবককে অনুসরণ করছি, পাঠক, তুমি আমাকে অনুসরণ করো। ওই যে গান্ধী-টুপি পরা যুবকটি চলেছে, ওর নাম বেণীমাধব। ওর একটি ইতিহাস আছে, আমি সেই ইতিহাসটিই অনুসরণ করছি। ওর সেই আশ্চর্য কাহিনিটি আমি শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এবং সে তারও বন্ধু।

প্রথম অধ্যায়

বেণীমাধব ছিল কলেজের ছাত্র এবং ঘোর বাবু। স্বাস্থ্য তার ভালো, বয়সোচিত উদ্দীপনা আর উৎসাহের অভাব ছিল না, পড়াশোনায় ছিল প্রখর। বৃত্তি পাওয়া ছেলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কুসুমেও যেমন কীট প্রবেশ করে, এই যুবকটির মধ্যে তেমনি এক ব্যাধির প্রবেশ-লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। লক্ষণ যেটি সবচেয়ে প্রবল বোধ হল, সে হচ্ছে পারিবারিক আকর্ষণে শৈথিল্য, ঘরের প্রতি ঔদাসীন্য। এ-লক্ষণটি তার মায়ের চোখে আগে ধরা পড়ল। তিনি মনে-মনে নানা কল্পনা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মনে হয়, কিছু বুঝতে পারলেন একদিন। বুঝে বড়ই ভাবনায় পড়লেন। তিনি ছেলের ঘরে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলেন, তার টেবিলে যে ক'খানা পড়ার বই ছিল, তার সংখ্যা অকারণ অনেক বেড়ে গেছে। তিনি ইংরেজি বই পড়া শেখেননি কখনও, কিন্তু বইয়ের মলাটে যে-চিহ্ন ছিল, তা থেকে তিনি চকিতে বুঝতে পেরেছিলেন অবস্থা খুব সুবিধের নয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল, ছেলের প্রসাধনেও বেশ বদল ঘটেছে। অর্থাৎ, এদিকেও তার ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। একটি চুল বেঁকে দাঁড়ালে যে-ছেলে তাকে প্রাণপণে সোজা করতে বসত, সেই ছেলের দু-তিনটি চুল কিছুকাল ধরে খাড়া থাকতে দেখেছেন, এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কেমন যেন উদভ্রান্ত, উদাস এবং স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব। সব মিলিয়ে মায়ের প্রাণ থেকে-থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কা, অথচ মুখ ফুটে কাউকে তা বলবার উপায় নেই—অশুভ কথাটা উচ্চারণ করতে তাঁর মুখে আটকায়।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। তার ছোট বোনকে সে ডেকে-ডেকে পড়াত, এখন আর পড়ায় না। সেজন্য তার মন ভার। তার বাবা লক্ষ করেও লক্ষ করলেন না, ভাবলেন ও-বয়সে তিনিও ওইরকম হয়েছেন,

কোনও একটা আদর্শবাদ মাথায় ঢুকে থাকবে, কিন্তু সে আর কত দিন!

কিন্তু তাঁর অনুমান ঠিক হল না। ক'দিন নয়, বছরখানেকের মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ এমন বেড়ে গেল যে, তাঁর পক্ষেও আর চুপ করে থাকা চলল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু রহস্যভেদ করার কাজ হচ্ছে ডিটেকটিভদের, আপন ছেলের বিষয়ে কোনও রহস্য বাপ ভেদ করতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করে। এ-ক্ষেত্রেও তাই হল। রাধামাধব সেরকম চেষ্টা করলেন না, শুধু স্ত্রীকে বললেন, কৌশলে মেয়েটার পরিচয় নাও এবং নিতান্ত অসম্ভব না হলে সব ঠিক করে ফ্যালো। কিন্তু স্ত্রী তো ভিতরের খবর সবই জানেন, কাজেই তাঁর ভয় আরও বেড়ে গেল। তিনি আরও জানেন, ছেলের যে-ব্যাধি তিনি অনুমান করেছেন, তার বিষয় কিছুই না জেনে যদি প্রেসক্রিপশানে কোনও বিয়ের কনের ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি একটা অজানা ভয়ে অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন, অথচ মনের মধ্যে যে-কথাটি কাঁটার মতো বিঁধে আছে তা কতবার বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেছে, বলতে পারেননি।

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক, তুমি কি কিছু অনুমান করতে পারো? না, কী করে পারবে, তুমি তো ডিটেকটিভ নও। আধা ডিটেকটিভ হতে গিয়ে যিনি পিছিয়ে এসেছেন, তাঁর কথাই তো এতক্ষণ বলছিলাম, তিনি বেণীমাধবের মা। তিনি মনের সব কথা সম্পূর্ণ গোপন করে স্বামীকে ভারী গলায় বললেন, দ্যাখো চেষ্টা করে, আমি এর মধ্যে নেই। কিন্তু রাধামাধব প্রিনসিপলওয়ালা লোক, তিনি নিজে এ-দায়িত্ব নিতে চান না। এবং আসল কথা না জেনে কনে দেখতেও রাজি নন। মস্ত বড় সঙ্কট! তিনি একটি সম্পূর্ণ রাত শার্লক হোমস-এর অনুকরণে বসে-বসে তামাক খেলেন এবং সামান্য কয়েকটি সূত্র ধরে ইনডাকটিভ এবং ডিডাকটিভ উভয়বিধ পদ্ধতিতে চিন্তা করেও কিছুই কিনারা করতে পারলেন না। সকালবেলা শুধু তাঁর মাথা দপদপ করতে লাগল, চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি মনে-মনে একটি শপথ করে বসলেন এবং যে-বিষয়ে এতদিন তিনি প্রায় উদাসীন ছিলেন, সেই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তবে ছেলের ব্যাপারে নিজে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না, এ-নীতিটি তিনি তখনও বজায় রাখলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠক, তুমি কি ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকারের কথা ভুলে গিয়েছ? অবশ্যই ভুলতে পারো না। সে সামান্য চার-পাঁচটা রহস্য ভেদ করেই তো ভারতবিখ্যাত হয়েছিল, সে-কথা কে না জানে? তবে তাকে আমরা বহুদিন দেখিনি। কিন্তু দেখিনি বলেই যে সে লাম্বার রুমে পড়ে-পড়ে গায়ে মরচে ধরাচ্ছে, তা মনে করার কোনও হেতু নেই। সে আজ কয়েকবছর ধরে ইওরোপের নানা জায়গায় মেক-আপবিদ্যা, ছদ্মবেশ ধারণের নতুন-নতুন কৌশল শিখে বেড়িয়েছে। ছদ্মবেশ ধারণে তার তুল্য এখন ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধু ছদ্মবেশ নয়, সে এখন অসাধ্যসাধন করতে পারে। খাড়াভাবে পোঁতা গ্রিজ-পোলের মাথায় সে শুধু দুখানা পায়ের সাহায্যে, দেহটিকে পোলের সমকোণ অবস্থায় রেখে উঠতে পারে। ওঠবার সময় দু-হাতে তার প্রিয় যে-কোনও একখানা বই পড়ে। অথবা নোট লেখে। বেণীমাধবের বাবা রাধামাধব এই ব্রজবিলাসকেই নিযুক্ত করলেন পুত্রের রহস্যভেদের কাজে। কিন্তু ফি হাজার টাকার নীচে সে কিছুতেই নিতে রাজি হল না। এইরকমই হয়। আগে সে পাঁচ টাকা বা সাড়ে সাত টাকায় যে-কোনও রহস্য ভেদ করত, এখন বিদেশ ঘুরে এসে তার দাম বেড়ে গেছে। রাধামাধব কৃপণ নামে খ্যাত, তাঁর পক্ষে এত টাকা একসঙ্গে দেওয়া প্রাণান্তকর। অথচ ব্রজবিলাস সব টাকা অগ্রিম না নিয়ে কাজ করবে না। শেষে তিন দিনের কচলাকচলির পরে ব্রজবিলাস দুটি কিস্তিতে টাকা নিতে রাজি হল এবং পাঁচশো টাকা অগ্রিম নিয়ে টাকার রসিদ এবং রহস্যভেদের গ্যারান্টিপত্র লিখে দিয়ে বিদায় নিল।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঠক, ওই যে দেখতে পাচ্ছ রাজপথে বেণীমাধবের থেকে দশ-বারোহাত দূরত্ব বজায় রেখে একটি শুকনো নোংরা কুকুর তাকে অনুসরণ করে চলেছে, ওটি আসলে কুকুর নয়। ওই হচ্ছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার। কিন্তু সে খুব নিশ্চিন্ত মনে চলছে না, ছদ্মবেশ ধরা-পড়ার ভয়ে নয়, তার ভয় কর্পোরেশন থেকে তাকে ধরে নিয়ে না যায়। কর্পোরেশন থেকে কুকুর ধরার হিড়িক চলছিল তখন। অবশ্য সে অন্য যে-কোনও ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না, এই বিশেষ কেসটিতে কুকুর সাজাই নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন হলে সে পাখি সাজতেও পারে, এমনই তার বিদ্যা। এই তো একবছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে সে লন্ডনে একটি কেস হাতে নিয়ে ভারতীয় ময়না সেজে অপরাধীর বাড়িতে গিয়ে ধরা দিল এবং সেখানে খাঁচায় অতি আদরে পালিত হয়ে তাদের সমস্ত গোপন তথ্য জেনে নিল এবং খাঁচা থেকে পালিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এসে সব জানিয়ে দিল। ব্লেকও এই কেস হাতে নিয়েছিল, কিন্তু ব্লেক ছুটে আসার আগেই ব্রজবিলাসের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। ব্লেক পরাজিত হয়ে ফিরে গেল, বলল, এসব ভারতীয় ম্যাজিক। কিন্তু ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনার ব্রজবিলাসের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে মুগ্ধ এবং গদগদ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে এমন চুমো খেয়েছিলেন যে, সে-দাগ তার মুখ থেকে এখনও মেলায়নি। কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রজবিলাসকে প্রশংসাপত্র দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজবিলাস তা নিতে অস্বীকার করে হেসে বলেছিল, আর ওসব কেন, এই দাগ রইল, এটাই বড় সার্টিফিকেট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রজবিলাস পুরো একটি সপ্তাহ বেণীমাধবকে অনুসরণ করে তার ডায়েরির খাতা বিচিত্র তথ্যে বোঝাই করে ফেলল এবং অতি সহজেই রহস্যের তলদেশে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তখনই তা রাধামাধবকে জানাল না, কারণ মাত্র সাতদিনে কাজ উদ্ধার হয়েছে দেখলে রাধামাধব ভাববে, এমন সহজ কাজের জন্য এতগুলো টাকা জলে গেল। তাই সে পনেরো দিন পরে আরও একবার বেণীমাধবকে শেষবারের জন্য (এর প্রয়োজন ছিল না, তবু ডবল নিশ্চিত হওয়ার জন্য) অনুসরণ করে কুকুরের বেশেই রাধামাধবের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

রাধামাধববাবু প্রতিদিনই ব্রজবিলাসের অপেক্ষা করছিলেন এবং তাকে না দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, এমনসময় ব্রজবিলাসের পরিবর্তে দরজায় এক শুকনো কুকুর দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করতে গেলেন। কুকুরবেশী ব্রজবিলাস মানুষের ভঙ্গিতে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি চিনতে পারেননি, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। শুনুন, আপনার পুত্র কমিউনিস্ট হয়েছে, আর কোনও ভাইস তার নেই। তাকে আমি দু-ভাবে বিচার করেছি—কুকুর সেজে তাকে অনুসরণ করে দেখেছি কোথায়-কোথায় সে যায় এবং নিজে মার্কসবাদী সেজে তার সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, তার বিশ্বাসকে কারও নাড়া দেওয়ার সাধ্য নেই। আমি অবশ্য প্রায় ছাত্ররূপে দীক্ষিত হতেই গিয়েছিলাম, তর্কও করেছিলাম, কিন্তু পরাজিত হয়েছি। অবশ্য জোর করে তার বিশ্বাসকে নাড়া দিতে গেলে সে অবিশ্বাস করত, আমাকে সন্দেহ করত। কিন্তু এ-বিষয়ে তার জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি, আমাকে সে অনেককিছু শেখাতে পারে। যাই হোক, তার সম্পর্কে আমাকে যা জানতে দিয়েছিলেন, তা জানিয়েছি, এবারে বাকি টাকাটা দিয়ে দিন।

রাধামাধব সব শুনে খেপে গেলেন। বললেন, আমি এর একটা কথাও বিশ্বাস করি না, তুমি ভুল লোককে অনুসরণ করেছ।

আসন্ন বিপদ বুঝে তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন সেখানে এবং বললেন, উনি মিথ্যা বলেননি, আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম সব, কানেও এসেছে অনেক কথা।

রাধামাধববাবু এবারে আরও ক্ষিপ্ত হলেন, বললেন, তুমি—তুমি জানতে, অথচ বলোনি? হাজার টাকা খরচ করালে এজন্যে?

স্ত্রী তাঁকে বললেন, তুমি এখন একটু থামো তো। কেন বলিনি সে-কথা তোমাকে পরে বলব, আপাতত তুমি ওঁর সঙ্গে কথা মিটিয়ে ফ্যালো। আর ব্রজবিলাসবাবু, আপনি ওই কুকুরের ছদ্মবেশ ছাড়ুন, একটা

কুকুরকে 'আপনি' বলতে আটকাচ্ছে।

রাধামাধববাবু এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন এবং অপরিচিত লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ শুরু করে কিছু লজ্জিতও হয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি করে অনেকটা শান্ত সুরে ব্রজবিলাসকে বললেন, 'আপনি' বলতে আমারও আটকাচ্ছে, আমি আগে 'তুমি' বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

ব্রজবিলাস বলল, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিন।

পাঁচমিনিটের মধ্যে ব্রজবিলাস নিজ মূর্তিতে বেরিয়ে এল, কুকুরের ছালটা তার হাতে ব্যাগের মতো ঝুলছে।

কিন্তু রাধামাধববাবুর উদ্বেগ কমল না। তিনি উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন এবং হঠাৎ ব্রজবিলাসের দিকে ফিরে বললেন, ওকে ফেরাবার উপায় কী?

ব্রজবিলাস বলল, সে-কাজ আমার নয়। আমার কাজ আমি করেছি, টাকাটা দিয়ে দিন।

রাধামাধববাবু ঘোঁতঘোঁত করতে-করতে ব্রজবিলাসের প্রাপ্য বাকি টাকাটা দিয়ে দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

পাঠক, শুনে দুঃখিত হবে, রাধামাধব পুত্রকে ফেরাতে পারলেন না। ফেরানোর উপায় চিন্তা করতে-না-করতে শোনা গেল, ছেলে কোন এক আইন-অমান্য দলে ধরা পড়েছে এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' করতে-করতে জেলে গিয়েছে। জেল হয়েছে একবছরের। এ-সংবাদে বেণীমাধবের বাবা ও মায়ের কী অবস্থা হল তা আমাদের জানবার দরকার কী? কোনও নায়কের বাপ-মাকে নিয়ে পাঠকদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পাঠক, তোমার পুত্র কখনও জেলে গিয়েছে কি? যদি না গিয়ে থাকে, তবে আর ওদের দুঃখ কল্পনা করতে চেষ্টা কোরো না, দরকারও নেই। মাত্র একটি বছর! কিন্তু তা কত দীর্ঘ—তা নির্ভর করে বছরটা কার, তার ওপর। পাঠকের কাছে এই একবছর দশবছর মনে হতে পারে যদি বলতে আরম্ভ করি। কিন্তু নাঃ, বলব না। বেণীমাধবের বাপ-মায়ের কাছে এই একবছর অবশ্যই একটা যুগ মনে হল, কিন্তু সব যুগেরই পার আছে এবং সে-পার শুধু ক্যালেন্ডারের বছরেই হয় না, মানুষের মনের বছরও পার হয়। কিন্তু পাঠক, তত্ত্বকথা শুনতে চেয়ো না, ঘটনা অনুধাবন করার চেষ্টা করো। বেণীমাধবের মুক্তির আর সাতদিন মাত্র বাকি, এমনই সময় সে তার বাবাকে জানাল, তাকে অবিলম্বে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি এবং একটি গান্ধী-টুপি পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে রাধামাধববাবু প্রায় নাচতে শুরু করলেন। তিনি মনে-মনে ঠিক করলেন, পুলিশকে এজন্য তিনি পুরস্কার দেবেন। এত বড় মহৎ কাজ আর কারও দ্বারা সম্ভব হত না। অবশেষে এল মুক্তিদিবস। বেণীমাধব চমৎকার কংগ্রেসী পোশাকে সেজে, গান্ধী-টুপি মাথায়, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে জেলখানা মুখরিত করে বাইরে বেরিয়ে এল। কংগ্রেসের এক বিরাট দল তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে চলল, এ-দলের পুরোভাগে রাধামাধব। তিনি কোনও দলেই ছিলেন না, কিন্তু ছেলে খদ্দর-পোশাক চাওয়ার পরই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

কংগ্রেসী পাঠক, তোমার কোনও কমিউনিস্ট ছেলে হঠাৎ কখনও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে কি? না দিলে বুঝতে পারবে না রাধামাধব ও তাঁর স্ত্রীর মনে আজ কী আনন্দ! বিশেষ করে তাঁরা এখন কংগ্রেসী হওয়াতে আনন্দের পরিমাণ শতকরা অন্তত পঁচিশ গুণ বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধিটাও তোমার মনে কোনও আলোড়ন জাগাবে না। কিন্তু না জাগায় যদি বয়েই গেল। অতএব সে-কথা থাক। পরবর্তী সমস্যা তাঁদের নয়, বেণীমাধবের বন্ধুদের। কারণ সে গান্ধী-টুপি পরার পর থেকে আর তাদের সঙ্গে মেশে না। পথের ছেলেরা বেণীমাধবের মাথার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'বেণীমাধবের ধ্বজা দেখে যা।' বেণীমাধব অবশ্য এতে বিচলিত হয় না। বেণীমাধব কাউকে কিছুই বলে না, মনটা তার কিছু বিষণ্ণ, অথচ তার কোনও হেতু খুঁজে পায় না কেউ। অতএব কানাঘুষো চলতে থাকে নানারকম। অনেক জাগতিক ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়

না এ-কথা সত্য, এমনকী অনেক মানসিক ঘটনারও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এ-কথাও সত্য, কিন্তু তাই বলে কেউ চুপ করে বসে থাকে কি? থাকে না। বেণীমাধবের বন্ধুরাও চুপ করে বসে রইল না।

নবম অধ্যায়

পাঠক, এইবার বেণীমাধবের এক ভূতপূর্ব বন্ধু ধনঞ্জয় গুপ্তকে (কঃ পাঃ) অনুসরণ করি, এসো। ওই যে সে বসে আছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাসের মুখোমুখি। ব্রজবিলাস বলছে, হাজার টাকার নীচে আমি কোনও কেস নিই না। ধনঞ্জয় প্রাণপণে বোঝাচ্ছে, এ কোনও লাভের ব্যাপার নয়, একটি বিশুদ্ধ রহস্য, এ-রহস্য আদৌ ভেদ করা যায় কি না তা দেখতে কি আপনার কৌতূহল নেই? থাকা তো উচিত।

ব্রজবিলাস নিবিষ্ট মনে পাইপ টানতে-টানতে বলল, রহস্যের জন্য রহস্য—আর্ট ফর আর্টস সেক—কথাটা শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু আমি সে-অবস্থা পার হয়ে এসেছি। আপনি বরং আমার ভূতপূর্ব শাগরেদ শম্ভুর কাছে যান, সে-ও খুব ওস্তাদ ডিটেকটিভ এবং সস্তাও বটে। তার ফি মাত্র আড়াই টাকা, এখনও দর বাড়ায়নি। কী কষ্টে যে সংসার চালায়! কিন্তু লোকটা খাঁটি। তাকে আমি আমার সহকারী করে নেব কিছুদিনের মধ্যেই। যাবেন তার কাছে? এই নিন তার কার্ড।

আড়াই টাকার কথা মন্ত্রের কাজ করল। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ শম্ভুর কাছে চলে গেল।

দশম অধ্যায়

পাঠক! শেষ অধ্যায়টি বড়ই জটিল, বড়ই করুণ এবং নিরাশায় ভরা, কিন্তু শম্ভুর অসাধারণ কৃতিত্বের কথায় এসবের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। শম্ভু কেসটি হাতে নিয়েই বেণীমাধব যে-জেলে ছিল সেখানে চলে গেল। তার পরিচয় পুলিশ-মহলে জানা, অতএব কোনও অসুবিধে হল না। সে প্রথমে বেণীমাধব যে-ঘরটিতে ছিল সেখানে গিয়ে বসল। তারপর গুরুর অনুকরণে একপাইপ তামাক খেল বসে-বসে। একঘণ্টা লাগল। একঘণ্টার ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হল, কিন্তু তার আচ্ছন্ন বুদ্ধিও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বেণীমাধবকে একখানা চেয়ার ও টেবিল দেওয়া হয়েছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে শম্ভু আবার তামাকের ধোঁয়া এবং চিন্তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি কাগজ, ছোট্ট এবং দোমড়ানো, টেবিলের নীচে দেওয়ালের অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। সেখানা খুলে তার লিখন পাঠ করতেই তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং সে অবিলম্বে তার হাতব্যাগ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে টেবিলের ওপর অদৃশ্য কোনও বস্তু খুঁজতে লাগল। লিখনটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বাঞ্ছিত জিনিস তাকে পেতেই হবে টেবিলে। দুই আর দুই চার, এই অমোঘ বিধান আজও কেউ বদলাতে পারেনি, ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকতেই হবে, এ-কথাও তো সকলের জানা। কিন্তু ডিটেকটিভের কাজ ঠিক এর উলটো দিক থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ, আগুন যখন আছে, তখন কোনওকালে ধোঁয়া অবশ্যই ছিল, অতএব তার চিহ্ন তাকে আবিষ্কার করতে হয়।

শম্ভু অল্পক্ষণের সন্ধানেই প্রচুর চিহ্ন পেয়ে গেল এবং তা খুব যত্ন করে একখানা ছুরির সাহায্যে জড়ো করে প্লাস্টিকের একটি কৌটোয় সংগ্রহ করে রাখল। তারপর সে গেল জেল-ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে সে গেল ওষুধ-তৈরির ঘরে। কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে সে অনেককিছু জেনে নিল।

পাঠক, ভাবছ, শম্ভু যদি সবটা আগেই বুঝে থাকে, তা হলে এত কাণ্ড করার দরকার কী! কিন্তু এরকম ভাবা ঠিক নয়। সব জানলেও, সব মিলিয়ে না দেখলে ডিটেকটিভ কখনও তৃপ্ত হয় না, গল্পেরও সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু পাঠক, ওই দ্যাখো, শম্ভু বাড়িতে এসে তার গবেষণা-ঘরে বসে জেল থেকে সংগৃহীত একশিশি ক্লু মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেলে দেখছে আর শিস দিচ্ছে। শম্ভু বড় ডিটেকটিভ হওয়ার জন্য নিজে কয়েকবছর মেডিকেল কলেজে পাঠ নিয়েছিল।

একাদশ অধ্যায়

পাঠক, আর দেরি নয়, এবারে রহস্যভেদ! ওই যে ধনঞ্জয় বসে আছে শম্ভুর সামনে। শম্ভু অগ্রিম একটাকা নিয়েছিল, বাকি দেড়টাকা নিয়ে তার অদ্ভুত রহস্যভেদের কথা বলতে আরম্ভ করল : দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, এটি বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক কেস। বেণীমাধব চেহারা বিষয়ে ছিল অত্যন্ত মনোযোগী এবং সে-কথা আপনি যেদিন আমাকে কেস দেন, সেইদিন বলেছেন। আরও বলেছেন, সে তার চুল বিষয়ে আগে অত্যন্ত বিলাসী ছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট হওয়ার পর চেহারা, চুল এবং পোশাক, সব বিষয়েই উদাসীন হয়ে পড়েছিল এবং আমি সে-কথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন, মনের কোনও বাসনা দমিত থাকলে ভবিষ্যতে যে-কোনও সময় তা আবার জাগতে পারে। বেণীমাধবেরও তাই হয়েছিল, সে কিছুদিন জেলবাসের পরেই চুল সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দৈব ছিল প্রতিকূল, হঠাৎ তার মাথায় অতি মারাত্মক রকমের একজিমা দেখা দেয় এবং তার ফলে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পাঠক, তুমি কখনও কারও মাথায় একজিমা হতে দেখেছ? না দেখলে বুঝতে পারবে না তা কী ভয়ঙ্কর হতে পারে। বেণীমাধবেরও অবস্থা তাই হল এবং ক্রমে তার চুল উঠে যেতে লাগল। এই চুল উঠে যাওয়ার মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না, এলোমেলোভাবে এক-এক জায়গা থেকে এক-একগোছা উঠে গেল। তাই জেল থেকে তার মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই লজ্জায়, ক্ষোভে সে অস্থির হতে লাগল। শেষে একদিন স্থির করল, সে আত্মহত্যা করবে। সমস্ত রাত সে চিন্তা করল, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব, তা তার মাথায় এল না। শেষে হঠাৎ একসময় সে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এখন ওটাই তার একমাত্র পথ। অর্থাৎ, সে স্থির করল, কংগ্রেসে যোগ দেবে।

তার পরের ঘটনা পাঠকের জানা আছে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য গান্ধী-টুপি পরা ভিন্ন সত্যিই তার আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু হাজার টাকা খরচ করলেও যে-রহস্য ভেদ করা কঠিন ছিল, শম্ভু আড়াই টাকা ফি নিয়ে গান্ধী-টুপির নীচে মাত্র পাঁচ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে এতবড় একটা রহস্যের সন্ধান পেল, এজন্য আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে চুমো খেয়ে এসেছি। আশা করি, পাঠক, তুমি আমার অনুসরণ করবে না, তুমি নিজ রুচিতে যা বলে, তাই করবে।

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৫৯



চাওয়া পাওয়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তেত্রিশ নম্বর বাসটায় রীতা সেন পারতপক্ষে উঠতে চায় না। এ-বাসে সকাল-সন্ধ্যা নেই, সবসময়ে ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু এন্টালি থেকে শ্যামবাজার যেতে হলে, আর বারবার ওঠা-নামার হাত এড়াতে হলে এই তেত্রিশ নম্বরেই উঠতে হয়। অফিস থেকে বেরিয়ে বেলা এগারোটার সময় 'অঞ্জলি' পত্রিকার সম্পাদিকা রীতা সেনও তাই মৌলালির মোড় থেকে তেত্রিশ নম্বর বাসই ধরল। যা ভেবেছে তাই। বাসটায় ঠাসা গিজগিজ করছে লোক। বসবার-দাঁড়াবার কোথাও জায়গা নেই। রীতাকে দেখে অবশ্য দুজন ভদ্রলোক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েদের জন্যে সংরক্ষিত দুজনের সিট দখল করে বসল রীতা। জানালার ধারে সরেই বসল।

যাতায়াতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে। তা লাগুক। অঞ্জলির 'শারদীয়া' সংখ্যার জন্য মণিমোহন রায়ের কাছ থেকে আজ গল্প আদায় করে ছাড়বে রীতা। এর আগে লোক পাঠিয়েছে, ফোন করেছে—গল্প আদায় হয়নি। অথচ বিজ্ঞাপনে নাম দেওয়া হয়েছে। সে-নাম যদি সূচিপত্রে না দেখা যায় তাতে সম্পাদিকার কৃতিত্ব কমে। সেই জন্যেই। না হলে মণিমোহনের গল্প না হলেও চলত। আজকাল মণিমোহনও যা লেখেন, ফণিমোহনও তাই লেখেন, বিশেষ করে পূজাসংখ্যায়। এই অসংখ্য গল্পের কটির মধ্যেই বা গল্পত্ব থাকে, ক'জনেই বা পড়ে! তবু লেখা হয়, ছাপা হয়, এই আজকাল রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'হ্যাঁচ্চো।'

একটি হাঁচির শব্দে রীতা চোখ ফিরিয়ে তাকাল। শুধু রীতা নয়, বাসের সব যাত্রীই তার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়েছে। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে লোকটির। গায়ের রঙিন পাঞ্জাবিটার আসল রং বুঝবার জো নেই। যেমন ময়লা, তেমনই জীর্ণ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। মুখে দু-দিনের দাড়ি জমেছে। লোকটি নোংরা। নইলে বাসের মধ্যে এমন করে হাঁচে!

সকলের অপ্রসন্ন দৃষ্টির উত্তরে লোকটি তার কালো ময়লা দাঁতগুলি বের করে হাসল। তারপর কৈফিয়তের সুরে বলল, 'কদিন যাবৎ এত সর্দি করেছে। রোদে ঘুরে-ঘুরে গরম লেগেই হয়েছে সর্দিটা। ঠান্ডার সর্দির চেয়ে গরমের সর্দি আরও খারাপ।'

কেউ কিছু বলল না দেখে লোকটি চুপ করে গেল।

কাণ্ড দ্যাখো! আর কোথাও জায়গা না পেয়ে লোকটি একেবারে রীতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বেঁটেখাট মানুষ। হাত বাড়িয়ে মাথার ওপর রডটি ধরতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে লোকটিকে। মাঝে-মাঝে ড্রাইভারের আচমকা ব্রেক কষায় প্রায় পড়ি-পড়ি করছে মানুষটি। শেষ পর্যন্ত গায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে, তাহলেই হয়েছে!

ওদিককার বড় লম্বা লেডিজ সিটটিতে জনচারেক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। আরও একজনের জায়গা হয় সেখানে। এক ভদ্রলোক রীতার সামনের লোকটিকে ডেকে বললেন, 'আপনি এখানে এসে বসুন না। ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝুলছেন কেন?' লোকটি জবাব দিল, 'ওখানে বসে লাভ নেই, মশাই। ওরা কেউ এসে পড়লে ঝাঁকসুদ্ধ উঠতে হবে। তখন দাঁড়াবারও জায়গা মিলবে না। আমি বাসের ভিতরে ঝুলি, বাসের বাইরেও ঝুলতে-ঝুলতে যাই। তবু লেডিজ সিটে কখনও বসিনে।'

কেউ-কেউ হেসে উঠল তার কথায়।

রীতা একটু ভ্রূ-কুঁচকে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মাণিকতলার মোড় ছাড়িয়ে এল বাস।

রীতা অনুভব করল লোকটি রড ধরে তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এতক্ষণেও কি বসবার কোথাও জায়গা পায়নি লোকটি, নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কতগুলি স্টপেজ ছাড়িয়ে এল বাস। এর মধ্যে কত লোক উঠল, কত লোক নামল। কিন্তু লোকটির কোথাও গিয়ে বসবার ইচ্ছা নেই। খেয়ালই নেই যেন কিছুতে। যেন ভারি অন্যমনস্ক, ভারি চিন্তিত। আসলে উদ্দেশ্যটা কী তা রীতা টের পেয়েছে। বাসে-টামে অনেকের এমন অভব্য উপদ্রব সহ্য করতে হয়। অথচ লোকটির বয়স নেহাত কম নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। বেশিও হতে পারে। মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকাবার ওর বয়স গেছে। কিন্তু বয়স গেলেই কি বয়সের দোষ যায়!

রীতার বয়স এখনও পঁচিশ পূর্ণ হয়নি। নামের আগের শ্রীমতীটুকু ত্যাগ করলে কী হবে, তার চেহারায় একটা স্থায়ী শ্রী আছে তা সে জানে।

স্বামী নিরুপম মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'তোমাকে এক-একা বাসে-ট্রামে ছেড়ে দিতে আমার ভারী চিন্তা হয়।'

রীতা জবাব দেয়, 'কেন, চিন্তা কীসের? আমাকে বিশ্বাস হয় না?'

নিরুপম হেসে বলে, 'সে জন্যে নয়। তোমাকে অবিশ্বাস করে যাব কোথায়? কষ্ট হয় তোমার সহযাত্রীদের জন্যে। তুমি যতক্ষণ বাসে থাকবে, ততক্ষণ তাদের নিষ্পলক হয়ে থাকতে হবে যে!'

রীতা বলে, 'আহা।'

স্বামীর মুখ থেকে, কী তার বন্ধুদের মুখ থেকে এমন স্তবস্তুতি মন্দ লাগে না। কিন্তু বাসে-ট্রামের যে-কোনও বয়সের যে-কোনও যাত্রী যদি এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাকায়, তা কি সহ্য করা যায়?

রীতা শ্যামবাজারের মোড়ে নেমে পড়ল। আশ্চর্য, লোকটিও সঙ্গে-সঙ্গে নামছে, রীতা হাঁটতে শুরু করল। লোকটিও আসছে পিছনে-পিছনে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে, রীতা আর সহ্য করবে না। রাস্তার লোক কি পুলিশ ডাকার দরকার হবে না, নিজের সম্মান রীতা নিজেই রাখতে জানে।

খানিকটা এগোলেই মণিমোহন রায়ের একতলা নতুন বাড়ি। আগে আর-একবার এসে এ-বাড়ি চিনে গেছে রীতা। কড়া নাড়তে গিয়ে দ্যাখে লোকাটি দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য সাহস!

এবার আর কথা না বলে পারল না রীতা। ভ্রূ-কুঁচকে চাপা কিন্তু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চান আপনি?'

লোকটি একটু হাসল, 'আমিও মণিমোহনবাবুর কাছে এসেছি গল্প নিতে। আপনি তো ''অঞ্জলি'' পত্রিকার। নিউ বেঙ্গলে সেদিন বিজ্ঞাপন নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে দেখেছি আপনাকে।'

রীতা এবার কৌতূহলী হয়ে বলল, 'ও। আপনি কোন পত্রিকা থেকে এসেছেন?'

লোকটি বলল, 'যুব ভারত।'

এইবার রীতা একটু অসহায় বোধ করল। যুব ভারত ধনীর কাগজ। অনেক টাকা দিয়ে লেখা নেয় ওরা। আর রীতাদের 'অঞ্জলি' আধা-শখের। কয়েকজন বান্ধবী মিলে বের করেছে। দক্ষিণা হয়তো দিতে পারবে না, কি সামান্যই দেবে। লেখকদের দাক্ষিণ্যের ওপর ভরসা। এই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কি এঁটে উঠতে পারবে রীতা? শোনা যায় মণিমোহন এবার দুটি-একটির বেশি লিখছেন না। যদি একটিমাত্রই লিখে থাকেন তাহলে কি 'যুব ভারত'-এর মুঠি থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারবে! লোকটির এই দীন বেশ আসলে ছদ্মবেশ, ওর পিছনে আছে ওর মনিবের টাকার পেটি। আর টাকায় কী না মেলে! টাকা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, অনিচ্ছুক লেখকের হাত থেকে সাহিত্যের রস চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ে।

কড়া নাড়ার শব্দটা আপনাথেকেই যেন বড় মৃদু হয়ে এল রীতার হাতে।

লোকটি এবার এগিয়ে এসে বলল, 'সরুন, আমি কড়া নাড়ছি। অল্প নাড়ায় ওঁরা আবার শুনতে পান না।'

শোনবার মতো করে কড়া নাড়াবার শক্তি আছে বইকি 'যুব ভারত'-এর। তবু রীতা অত সহজে নিজের জায়গা ছাড়ল না। বলল 'আপনি দাঁড়ান, আমিই ডাকছি।'

এবার সশব্দে কড়া নাড়ল রীতা। হাতের কাঁকনও বাজল সেইসঙ্গে।

প্রৌঢ় লেখক মণিমোহন রায় নিজেই এসে দোর খুলে দিলেন। সাধারণ গোবেচারা গোছের চেহারা। লেখক না হয়ে অন্য কোনও পেশা ধরলেও মানাত।

মণিমোহন দুজনকেই একসঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। 'আসুন, আসুন। আসুন শ্রীবিলাসবাবু, আসুন রীতা দেবী।'

রীতা একটু হাসল, 'যুব ভারত'-এর নাম তাহলে শ্রীবিলাস! তা হতে পারে, শ্রী তো আর সবসময় মানুষের চেহারাতেই থাকে না। মনিবের অর্থ-সামর্থ্যেও থাকে।

দুজনকেই বাইরের ঘরে অভ্যর্থনা করে বসালেন মণিমোহন। রীতা ভাবল, বোধহয় দুটি গল্পই তৈরি হয়েছে।

চাকরকে ডেকে মণিমোহন বললেন, 'ওরে দু-কাপ চা নিয়ে আয়।'

শ্রীবিলাস বলল, 'এত বেলায় চায়ের কী দরকার।' কিন্তু লোকটির মুখের ভাব দেখে মনে হল চায়ের দরকার আছে। রীতাও আপত্তি জানাল, 'না-না, চা থাক।'

কিন্তু মণিমোহন শুনলেন না। দুজনের সামনে একই ধরনের দুটি সাদা সুদৃশ্য চায়ের কাপ এগিয়ে ধরলেন।

রীতা বলল, 'তাতো হল। আমার গল্প কই?'

মৃদু হাসল রীতা।

মণিমোহন মাথা নাড়লেন, 'গল্প হয়নি, গল্প এবার আর লিখতে পারলাম না।

শ্রীবিলাস বলল, 'সে কী। আমাদের ''যুব ভারত''-এর গল্পটিও লেখা হয়নি?'

মণিমোহন বললেন, 'না।'

শ্রীবিলাস বলল, 'কিন্তু আর যে সময় নেই! আমাদের আজই ছাপা শেষ করতে হবে।'

রীতা বলল, 'আমরাও আর দেরি করতে পারিনে। মহালয়ার আগেই কাগজ বার করতে হবে...আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন।'

মণিমোহন বললেন, 'তখন বুঝতে পারিনি এবার আর কিছুতেই কথা রাখতে পারব না। বুঝতে পারিনি আমার সব কথা এমন করে ফুরিয়ে গেছে।'

করুণ নৈরাশ্যের সুর ফুটে উঠল মণিমোহনের গলায়।

রীতা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। এ তো দাম্ভিক অর্থলোভী লেখকের কথা নয়।

শ্রীবিলাস বলল, 'তাহলে ''যুব ভারত''-এর লেখাটিও দিতে পারবেন না?'

মণিমোহন বললেন, 'না।'

শ্রীবিলাস বলল, 'বড় মুশকিলে ফেললেন কিন্তু, মণিমোহনবাবু। যাই কর্তাকে বলি গিয়ে, জায়গা খালি পড়ে রয়েছে, তা-তো ভরতি করা চাই!'

চায়ের কাপ শেষ করে শ্রীবিলাস উঠে পড়ল।

আরও দু-এক মিনিট বসে রইল রীতা। ভেবেছিল আজ গল্প না পেলে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেবে মণিমোহনবাবুকে। বলবে, আপনারা কথাশিল্পীরাই কথার খেলাপ করেন সবচেয়ে বেশি। রীতা আর-একবার জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যিই পারলেন না লিখতে?'

মণিমোহন বললেন, 'না। চেষ্টা করে দেখলাম, হল না।'

রীতা বলল, 'ভাববেন না, এবার হল না, সামনের বছর হবে। আমরা আবার আসব।'

নমস্কার বিনিময়ের পর বিদায় নিল রীতা।

শ্রীবিলাস যায়নি। মোড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। বোঝা গেল রীতার জন্যই অপেক্ষা করছে সে। রীতাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল 'কী, পেলেন গল্প?'

রীতা বলল, 'না। শুনলেন তো উনি এবার লিখতে পারছেন না।'

শ্রীবিলাস বলল, 'সত্যি পাননি?'

রীতা মাথা নেড়ে বলল, 'না। আপনার কাছে মিথ্যে বলে আমার কী লাভ।'

শ্রীবিলাস বলল, 'তা ঠিক। আমি-আপনি কাগজের লোকেরা লেখকদের মতো অত মিথ্যে কথা বলিনে।'

রীতা এবার সকৌতুকে জিগ্যেস করল, 'ওঁরা মিথ্যে কথা বলেন বুঝি?'

শ্রীবিলাস বলল, 'খুব, খুব। যেমন মিথ্যে কথা বানিয়ে-বানিয়ে লেখেন, তেমনি বানিয়ে-বানিয়ে বলেন। শুধ অসুবিধে এই, সেই বানানো কথাগুলি ধরে নিয়ে প্রেসে দেওয়া যায় না। তাহলে আপনার ''অঞ্জলি'' আর আমার ''যুব ভারত''-এর অমন পঞ্চাশটা পুজোসংখ্যা ভরে যেত।'

বাস এসে স্টপেজে দাঁড়াতে দুজন একসঙ্গেই উঠল। ছোট লেডিজ সিটটায় বসে রীতা এবার ডাকল শ্রীবিলাসকে, বলল, 'বসুন এখানে।'

শ্রীবিলাস ইতস্তত করল। এতখানি দাক্ষিণ্য বোধহয় আশা করেনি। রীতা দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে সে এবার পাশে এসে যথাসাধ্য ব্যবধান রেখে বসল।

শ্রীবিলাস বলল, 'আপনার নিজের কাগজ, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আপনি সুখে আছেন। কিন্তু আমার দুর্ভোগটা একবার ভেবে দেখুন দেখি। কর্তাবাবু, সম্পাদকমশাই, কেউ কি বিশ্বাস করতে চাইবেন যে, উনি লিখতে পারলেন না? কতরকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। আবার হয়তো রাতদুপুরে দৌড়ে আসতে হবে এই মণিমোহনবাবুর কাছেই। এদিকে বাড়িতে পরিবারের অসুখ। ছেলেমেয়েগুলো টো-টো করে বেড়াচ্ছে। একেবারে কোলেরটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। আর আমি শহর ভরে লেখকদের দোরে-দোরে ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছি গল্প কই, গল্প কই।'

রীতা সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'সত্যি, আপনার তো ভারী অসুবিধে তাহলে। আচ্ছা, যেসব গল্প ছাপা হয় আপনি কি পড়ে দেখেন? ধরুন এই মণিমোহনবাবুর লেখা—।'

শ্রীবিলাস বলল, 'আপনিও যেমন, সময় কই যে পড়ব! খেটেখুটে রাত বারোটার সময় কি আর মানুষের পড়বার শখ থাকে? তা ছাড়া বাড়িতে নিজের গল্প নিয়েই অস্থির, আর তো পরের গল্প!'

রীতা মুখে কিছু বলল না, শুধু চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি জানাল।

তেত্রিশ নম্বর বাস মির্জাপুর ছাড়িয়ে মৌলালির দিকে এগিয়ে চলল। এই গল্পসন্ধানী কাগজের অফিসের দরিদ্র কর্মচারীর পাশে বসে থাকতে-থাকতে সালঙ্কারা সুসজ্জিতা রীতার ভারি অদ্ভুত লাগতে লাগল। মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে সে-ও আজ প্রত্যাশিত গল্পটি পেল না। এই শেষ মুহূর্তে কাগজ কী দিয়ে ভরবে সে উদ্বেগ তারও কম নয়। তবু সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ছাপিয়ে আজ এই মানুষটির কথাই তার বারবার মনে

হচ্ছে। তার দুর্ভোগ, তার দুর্ভাবনা, তার দুঃস্থ পরিবারের কথা, একটি অতি পুরোনো গল্প। আর একটি অতি পরিচিত স্পর্শ—একজন সাধারণ প্রতিবেশী মানুষের।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ***১৯৫৯***



পরাশর বর্মা ও ধাঁধানো ছবি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুক্রবার কাগজের কাজ-কর্ম দুপুরেই একরকম শেষ হয়ে যায়। এরপর যা দায় তা ছাপাখানার আর দপ্তরির। শেষ ফর্মাটায়, মানে কাগজের প্রথম ফর্মায়, প্রিন্ট অর্ডার দিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম আড়াইটে এখনও বাজেনি।

মনে হল, অনেকদিন ছবি-টবি দেখা হয়নি। গেলে হয়। ছবি দেখার সেরকম বাতিক আমার নেই। কিন্তু কলকাতায় দু-মাস ধরে নাকি এমন এক ছবি চলছে যা না দেখলে আর মান থাকে না।

চেনা-অচেনা যার সঙ্গে দেখা হোক, খানিক আলাপের পর এ-ছবির কথা উঠবেই।

দেখেছেন ছবিটা! —কেউ গদগদ উচ্ছ্বাসে।

কী যে রুচি হয়েছে আজকাল মানুষের! পয়সা দিয়ে ওই আজগুবি ছবি কেউ দ্যাখে! —যিনি ঘৃণায় নাক সেঁটকান, তিনিও অবশ্য পয়সা দিয়ে ছবিটা না দেখে পারেননি!

অর্থাৎ, ভালো লাগুক বা না লাগুক, এ-ছবি না দেখলে সভ্য-সমাজে নাম কাটা যাওয়ার ভয়।

টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিয়ে তাই ওঠবার উপক্রম করছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

ধরব না ভেবে দরজার দিকে দু-পা বাড়িয়েও চলে যেতে শেষপর্যন্ত বাধল। ফিরে এসে ফোন ধরতেই পরাশরের গলা।

—হ্যালো, কৃত্তিবাস! আছ তাহলে? এখুনি যাচ্ছি। একটা বিশেষ দরকার।

আমায় কথা বলবার কোনও সুযোগ না দিয়েই পরাশর ওধারে ফোনটা নামাল।

সত্যি কথা বলতে গেলে পরাশরের সঙ্গলাভের সম্ভাবনায় খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে উঠলাম আপাতত। বিশেষ দরকার মানে তিন দিস্তে কবিতা নিশ্চয়। সিনেমায় যাওয়ার তো দফারফা, তার ওপর পরাশরী কবিতার ধাক্কা সামলাতে ক'টা অ্যাসপিরিন লাগবে কে জানে!

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। মিনিটদশেক বাদেই পরাশর এসে হাজির। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার হাতে কবিতার খাতা নয়, একটা খবরের কাগজ।

আজকাল সে খবরের কাগজেই কবিতা ছাপাচ্ছে নাকি? না, তাও নয়, লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া কাগজের একটা বিজ্ঞাপন আমায় দেখিয়ে সে একটা জরুরি ব্যাপার আলোচনা করতে চায়।

কবিতার বদলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন শুনে তখন আমার মেজাজ খোশ হয়ে সাহস বেড়েছে। খবরের কাগজটা মুড়ে পকেটে রেখে বললাম, তোমার সব কথা শুনতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে তোমায় সিনেমায় একটা ছবি দেখতে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

ছবি! কী ছবি? —পরাশর সত্যি হতভম্ব।

তোমার পছন্দসই ছবি। —তাকে ভরসা দিলাম।

আমার পছন্দসই? কোনও কবি-টবির জীবনী? সেরকম কোনও ছবি কোথাও দেখাচ্ছে নাকি?

আরে না, কবির জীবনী হবে কেন? গোয়েন্দাগিরির রহস্য-রোমাঞ্চের ছবি।

পরাশর নাক সিঁটকে বললে, না, না, ওসব ছবি আবার মানুষে দ্যাখে!

হ্যাঁ, দ্যাখে। কলকাতার অর্ধেক মানুষ দেখেছে। তোমাকেও আজ আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি অনেক জুলুম তোমার সয়েছি। আমার এ-অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে।

পরাশর আর আপত্তি করলে না। কিন্তু কুইনিন গেলার মতো যেরকম মুখ করে সিনেমা হলে গিয়ে বসল, তাতে মনে-মনে হাসিই পাচ্ছিল।

কয়েকটা ছোটখাটো সংবাদ-চিত্র ইত্যাদির পর একটু বিরতি। তারপর আসল ছবি আরম্ভ। ছবি তিন রিল কী বড়জোর চার রিল চলবার পরই হঠাৎ পাশে চেয়ে দেখি সিটে যতখানি সম্ভব হেলান দিয়ে পরাশর পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে।

সত্যি, একটু রাগই হল। হতে পারে পরাশর মস্ত গোয়েন্দা, তা বলে এরকম একটা পয়লা নম্বরের ছবিতেও তার মন বসে না! আমি তো তখন সত্যি মশগুল হয়ে ছবির গোলকধাঁধায় নাজেহাল হচ্ছি। অত বড় গোয়েন্দাই যখন, তখন এ-ছবির আসল শয়তান কে, ধরবার চেষ্টা করুক না!

কনুইয়ের একটা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তাকে সেই কথাই চাপা গলায় বললাম।

হুঁ! —বলে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে পরাশর ছবিটায় মনোযোগ দেওয়ারই চেষ্টা করলে বোধহয়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! খানিক বাদেই আবার যথা পূর্বং।

এবার ঠেলা দিতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বললে, ছবি শেষ হয়ে গেছে নাকি?

ছবি এরই মধ্যে শেষ হবে কী হে! সবে তো অর্ধেক!

এখনও অর্ধেক!—হতাশভাবে সে আবার সিটে এলিয়ে পড়ে একটা কাগজে কী লিখে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, এটা রাখো। আর শেষ হলে আমায় জাগিয়ো।

তাই জাগাব!—বিরক্তভাবে বলে তার দেওয়া কাগজটা তাচ্ছিল্যভরে পকেটে রেখে দিলাম।

ছবিটা সত্যি তখন দারুণ জমে উঠেছে। তিনজনের ওপরই সমান সন্দেহ। মেয়েটি, তার বর্তমান প্রেমিক, আর তার মৃত স্বামীর কাগজপত্রসমেত ব্রিফকেস সমুদ্রতীরে যে কুড়িয়ে পেয়েছিল সেই লোকটি। মেয়েটির নাম মার্থা। বড় সম্ভ্রান্ত ধনীর ঘরের মেয়ে। নিজের সমাজ ছেড়ে ভালোবেসে এক বাউণ্ডুলে অভিনেতাকে বিয়ে করেছিল। চেষ্টা করেও স্বামীর স্বভাব শোধরাতে পারেনি, বিয়েও সুখের হয়নি। স্বামীর জুয়া আর বদখেয়ালের টাকা জোগাতে-জোগাতে হয়রান হয়ে একদিন খেপে যায়। আর এক কপর্দকও স্বামীকে দেবে না বলে জানিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ করবার প্রতিজ্ঞা করে। স্বামীর তখন মত্তাবস্থা। সে মার্থাকে মারধর করবার চেষ্টা করে। মার্থাকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসলেও যে বিয়ে করতে পারেনি, সেই ইউজিন ছেলেটি সেখানে কী কারণে হঠাৎ এসে পড়েছিল। সে মার্থাকে স্বামীর হাত থেকে বাঁচায়। মার্থার স্বামীকে উত্তমমধ্যম কিছু দিয়ে বাড়ি থেকে বারও করে দেয়।

কিন্তু তারপর থেকেই মার্থার স্বামী একেবারে নিরুদ্দেশ। প্রায় মাসখানেক বাদে দূরের এক সমুদ্রতীরে তার একটি ব্যাগ একজন কুড়িয়ে পায়। ব্যাগটি পুলিশের হাতে যথারীতি দেওয়া হয় ও পুলিশ সেই ব্যাগে মার্থার

স্বামীর হাতে লেখা সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যার সঙ্কল্পের চিঠি পায়।

ব্যাপারটা সেইখানেই চুকে যেত, কিন্তু কিছুদিন বাদেই মার্থার স্বামীর আত্মহত্যা সরকারিভাবে স্বীকার করবার খুঁটিনাটি সারতে গিয়ে পুলিশ ধরতে পারে যে, মার্থার স্বামীর আত্মহত্যার চিঠিটি জাল। মার্থার স্বামীর হাতের লেখা সুকৌশলে কেউ নকল করবার চেষ্টা করেছে। আত্মহত্যা না করে থাকলে মার্থার স্বামীর কী হয়েছে তাহলে? সন্ধান করতে জানা যায়, ইউজিনকে কিছুকাল আগেও ওই সমুদ্রতীরের একটি হোটেলে দেখা গেছল। মার্থাও কয়েকদিন বাদে সেই হোটেলে এসে উঠে দিন-দুই থেকে আবার চলে যায়। মার্থা ও ইউজিন অবশ্য পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে, হ্যারল্ডই বোঝাপড়া করতে ফোনে তাদের ডেকেছিল। হ্যারল্ডকে তারা অবশ্য পায়নি।

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে সমুদ্রতীরে যে-লোকটি মার্থার স্বামীর ফোলিও ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার ব্যবহারে। সে গোপনে একদিন মার্থার কাছে এসে একটি চিঠি দেখায়। চিঠিটি মার্থার স্বামী হ্যারল্ডেরই লেখা। লোকটি স্বীকার করে যে, হ্যারল্ডের ব্রিফকেসটি পুলিশের হাতে দেওয়ার সময় সে কিছু কাগজপত্র সরিয়ে রেখেছিল। চিঠিটা পড়ে বোঝা যায়, হ্যারল্ড সেটা মার্থার কাছেই লিখেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত ডাকে আর কেন পাঠায়নি কে জানে। হয়তো সময় পায়নি। চিঠি ছোট, তাতে হ্যারল্ড সকাতরে মার্থা ও ইউজিনকে তাকে রেহাই দিতে অনুরোধ করেছে। লিখেছে, প্রতি মুহূর্তে এই ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে বাঁচা আর তার সহ্য হচ্ছে না। মার্থা বিবাহবিচ্ছেদ করে ইউজিনকেই বিয়ে করুক, সে বাধা দেবে না। সে শুধু নিরাপদ শান্তি চায়। তার জন্য সে আমেরিকা ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতেও প্রস্তুত।

মার্থাকে চিঠি পড়ে স্তম্ভিত মনে হয়। সে প্রথমে রেগে বলে, এ-চিঠিও জাল। লোকটি সায় দিয়ে বলে, তা হওয়া সম্ভব। কিন্তু পুলিশের হাতেই দেওয়া উচিত হলেও সে মার্থাকে একবার এটা দেখাতে এসেছিল। মার্থা এবার সোজাসুজিই চিঠিটা লোকটির কাছে কিনে নিতে চায়। লোকটি প্রথমে রাজি হয় না, কিন্তু শেষে প্রচুর টাকার বিনিময়ে চিঠিটি মার্থাকে দেয়। মার্থা গোপনে চিঠিটি একজন বড় হস্তাক্ষর-বিশারদকে দিয়ে পরীক্ষা করায়। তাতে জানা যায় চিঠিটি জাল নয়।

পুলিশ এদিকে হ্যারল্ডের ব্যাগের জিনিসপত্র নতুন করে পরীক্ষা করতে গিয়ে 'সোনেরিল' নামে একটি ওষুধের শিশির ভেতর কয়েকটি বিষাক্ত বড়ি পেয়েছে। ওষুধটা সেই জাতের যাতে স্নায়ু শান্ত রাখে। কিন্তু গোপনে অনেকে সেটা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। হ্যারল্ডও করত। কিন্তু শিশির ভেতর এই নকল করা চেহারার বিষাক্ত বড়ি গেল কী করে! পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে তারপর যে, ইউজিন শহরের এক মস্ত বড় ডিসপেন্সারির মালিক। মার্থার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে ইউজিনের দোকান থেকেই এক রাত্রে হ্যারল্ড ওষুধ কেনে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিষাক্ত ও বদ নেশার জিনিস বলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে এ-ওষুধ নিতে হয়। ডিসপেন্সারির খাতায় হ্যারল্ডের ওষুধ কেনা তাই ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে এ-কথাও জানা গেছে যে, নিজে হাতে ওষুধ না বেচলেও ইউজিন সে-রাত্রে ওই সময়ে দোকানের দৈনিক বিক্রির শেষ হিসেব নেওয়ার জন্যে ভেতরে ছিল।

হ্যারল্ডের ফোলিও ব্যাগ যে পেয়েছিল, তাকেও সন্দেহক্রমে পুলিশ এবার গ্রেপ্তার করেছে। মার্থার কাছে হ্যারল্ডের আগের চিঠি বেচবার পরই সে আবার একদিন হ্যারল্ডের লেখা একটি রোজনামচার বই নিয়ে আসে। তার ভেতরে হ্যারল্ডের হাতের লেখায় যা পাওয়া যায় তা সাঙ্ঘাতিক। সেখানে স্পষ্টই লেখা আছে যে, দিনের পর দিন সে প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে কাটাচ্ছে। মার্থা ও ইউজিন তার পেছনে খুনে-গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু পুলিশকে জানাতেও তার সাহস হচ্ছে না। তার মতো হতভাগা জুয়াড়ি মাতালের কথা কে বিশ্বাস করবে! মার্থা প্রচুর টাকা দিয়ে সে-ডায়েরি কিনে নেওয়ার পরই লোকটি গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে যে, হ্যারল্ডকে শেষ দেখা যায় সমুদ্রতীরের বন্দর থেকে একটি ছোট মোটর-লঞ্চ ভাড়া করে এক রাত্রে সমুদ্রে বেড়াতে যেতে। তার সঙ্গে ওই লোকটিও ছিল বলে একজন অন্তত এজাহার দিয়েছে। পুলিশ আরও খুঁজে বার করেছে যে, ওই লোকটি এককালে ইউজিনের অধীনেই কাজ

করত। ইউজিন অবশ্য এই বলে সাফাই গেয়েছে যে, লোকটির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বহুকাল আগে চুরির অভিযোগে তাকে সে বরখাস্ত করেছিল মাত্র।

হ্যারল্ডকে তাহলে সত্যি পৃথিবী থেকে সরিয়েছে কে? ইউজিন একা, না মার্থার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে? সে-ষড়যন্ত্রে ওই লোকটিও কি ছিল, না ইউজিন বা সেই লোকটি একাই এ-কাজ করেছে?

ছবি শেষ হওয়ার পর অভিভূতভাবে পরাশরের দিকে তাকিয়েছি। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও তখন সোজা হয়ে বসেছে। বললাম, কী যে তুমি হারালে তা জানো না! এ-গল্পের শেষ তুমিও কল্পনা করতে পারতে না!

তাই নাকি!—পরাশরের সত্যি একটু আপশোস হয়েছে বলেই মনে হল।

অফিসেই ফিরে গিয়ে আমার কাছে পরাশরের আসার আসল কারণটা শুনতে হল। এমন কিছু জরুরি ব্যাপার আমার অবশ্য মনে হল না।

মজার কথা শুধু এই যে, এই ব্যাপারটাও একটা ফোলিও ব্যাগ সংক্রান্ত। খবরের কাগজে একটি ফোলিও ব্যাগ হারানোর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে বক্স নম্বর দিয়ে। কেউ সে-ব্যাগ পেয়ে থাকলে যেন উক্ত বক্স নম্বরে চিঠি লেখেন। আসল মালিক তখন প্রমাণ দিয়ে ফোলিও ব্যাগ নিয়ে যাবেন এবং সেইসঙ্গে হাজার টাকা পুরস্কারও দেবেন।

পরাশরের অনুরোধ, আমিই যেন ব্যাগটি পেয়েছি বলে বক্স নম্বরে একটা চিঠি দিই।

তার মানে?—হতভম্ব হয়ে বললাম, যে-ব্যাগ চোখেও দেখিনি তাই পেয়েছি বলে চিঠি দেব!

আহা, দিয়েই দ্যাখো না।—পরাশর অম্লান বদনে জানালে।—কে ব্যাগটা চাইতে আসে দেখাই যাক না! তোমার বাড়ি—না, না—এই অফিসের ঠিকানাতেই দেখা করতে বলবে।

একটু চটে উঠেই বললাম, এ তোমার আচ্ছা পাগলামির জুলুম দেখছি! কোথায় কী ব্যাগ কিছুর ঠিক নেই, এক হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে একটা মিথ্যে চিঠি লিখব! পুরস্কারটা যখন অমন, তখন ব্যাগটা নিশ্চয় দামি। ব্যাগ না পেলে তো আর পুরস্কার কেউ দেবে না!

হঠাৎ কথাটা মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি, তুমি কি ব্যাগটা পেয়েছ নাকি?

আমায় একেবারে নির্বাক করে দিয়ে পরাশর নেহাত হালকাভাবেই বলল, না, পাইনি এখনও, কিন্তু পেতে পারি।

পরাশরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। যত তর্কই করি, শেষপর্যন্ত তার আজগুবি অনুরোধ রাখতেই হল।

চিঠি দেওয়ার দুদিন বাদে দুপুরবেলা একটা ফোন পেলাম। ব্যাগ হারানোর বিজ্ঞাপন যিনি দিয়েছেন, কখন দেখা করতে এলে আমার সুবিধে হয় তিনি জানতে চাইছেন। পরাশর যেরকম পরামর্শ দিয়েছিল, সেই অনুসারে অফিস বন্ধ হওয়ার পর রাত আটটায় তাঁকে দেখা করতে বললাম। পরাশরকেও আগের ব্যবস্থামতো জানিয়ে দিলাম।

কী অস্বস্তিতে আটটা পর্যন্ত তারপর কাটল, তা বোঝানো অসম্ভব। পরাশর সাড়ে সাতটা নাগাদ এল। আমার মেজাজ তখন প্রায় সপ্তমে উঠেছে। তিক্ত স্বরে বললাম, ভদ্রলোক তো ব্যাগ নিতে এসেছেন, এখন কী বলব কী!

সে তোমায় ভাবতে হবে না, যা বলবার আমি বলব।—পরাশরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছেলেখেলা।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় বেয়ারা রামদীন এসে খবর দিলে একজন দেখা করতে এসেছেন। অফিসের সকলকে ছুটি দিয়ে এই রামদীনকেই শুধু রেখে দিয়েছিলাম ফাইফরমাসের জন্যে। রামদীনের সসম্ভ্রমে ঘোষণা করবার ধরন থেকে যা অনুমান করেছিলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকের চেহারা তার সঙ্গে মিলল। শুধু লম্বা-চওড়া দশাসই নয়, দস্তুরমতো সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন চেহারা। সাজ-পোশাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু একবার

চাইলেই বোঝা যায়, পদাতিকদের একজন তিনি নন। দামি গাড়িটা চোখে না দেখলেও যেন অনুমান করা যায়।

ভদ্রলোক নিজেই আগে পরিচয় দিলেন। আমার অনুরোধে সামনের চেয়ারে বসে আমাদের দুজনকে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম উমাপতি রায়। আপনাদের চিঠি পেয়ে আমাকেই আসতে হয়েছে।

পরাশর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, যা আপনারা বলতে চাইছেন আমি জানি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে যাঁর কাছে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন, আমি সেই গুণধর হাজরা নই। কিন্তু আপনাদের চিঠি পেয়ে আমিই আপনাদের ফোন করেছিলাম এবং আমাকেই গুণধর হাজরার জায়গায় আসতে হয়েছে।

কেন বলুন তো!—সসম্ভ্রমে আমি প্রশ্ন করলাম। চেহারা দেখার পর নাম শুনে উমাপতিবাবুর পরিচয় আমি বুঝে ফেলেছি। বাঙালি ব্যবসায়ী মহলে বিচক্ষণ শিল্পপতি হিসাবে তাঁর নাম ইদানীং যথেষ্ট।

এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করে উমাপতিবাবু বললেন, আসতে হয়েছে, কারণ ওই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর থেকে গুণধরবাবুকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে? আপনি তাহলে আমাদের চিঠি পেলেন কী করে? গুণধরবাবুর হয়েই বা এলেন কেন?—পরাশর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

সব কথাই বলছি শুনুন।—বলে উমাপতি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই : উমাপতিবাবু নানা শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তাঁর সমস্ত কাজের একরকম ডান হাত ও বিশ্বাসী সহায় এই গুণধর হাজরা। হাজরা তাঁর স্কুলের সহপাঠী ছিল, তারপর তাঁর ব্যবসায়ের একজন কর্মচারী হিসেবে ঢুকে নিজের ক্ষমতায় এত উঁচু দায়িত্বের পদে উঠেছে। অধিকাংশ জায়গায় সে-ই উমাপতিবাবুর প্রতিনিধি হয়ে যায়। দিন-দশেক আগে এমনই একটি অত্যন্ত জরুরি কাজে বেরিয়ে কাজ না সেরেই হাজরা শুকনো ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে ফিরে আসে। যে-ফোলিও ব্যাগে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল ও কাগজপত্র নিয়ে হাজরা এই কাজে বেরিয়েছিল, তা সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে কিছুই মনে করতে পারছে না। এই মনে-করতে-না-পারা উমাপতিবাবুর সব চেয়ে আশ্চর্য লেগেছে। হাজরার কিছুদিন যাবৎ শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছিল। কিছুদিন লম্বা ছুটি নিয়ে কোথাও বিশ্রাম করবার কথাও উমাপতিবাবু বলেছিলেন, কিন্তু এরকম স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার মতো কোনও লক্ষণ তখন তার মধ্যে ছিল না। কোনও উপায় না দেখে উমাপতিবাবু তাকে শেষ চেষ্টা হিসেবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিলেন। হাজরা তা-ই দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার পরদিন থেকেই সে নিরুদ্দেশ। বিজ্ঞাপনের উত্তরে কোনও হদিশ মিলবে, এ-আশা উমাপতিবাবুর ছিল না। আমাদের চিঠি পেয়ে তিনি তাই হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। ব্যাগটি কীরকম ও তাতে কী-কী ছিল, সমস্ত তিনি লিখে এনেছেন, সেই সঙ্গে পুরস্কারের টাকাও। এখন আমরা ফোলিও ব্যাগটি ফেরত দিয়ে যদি তাঁকে বাধিত করি।

উমাপতিবাবু একটি হাতে লেখা কাগজ আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে টাকার জন্যেই পকেট থেকে 'ওয়ালেট' বার করলেন।

পরাশরই কাগজটা হাতে নিয়ে উমাপতিবাবুকে বাধা দিয়ে বললে, টাকা এখন থাক, মিস্টার রায়। কিছু যদি মনে না করেন দু-একটা কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করি।

একটু বিস্মিত হয়েই উমাপতিবাবু বললেন, করুন।

গুণধরবাবুর হঠাৎ এরকম নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী আপনার মনে হয়? টাকাকড়ি সংক্রান্ত কোনও গোলযোগ বা...।

উমাপতিবাবু পরাশরকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না। একটু অপ্রসন্নভাবেই বললেন, শুনুন, গুণধর সম্বন্ধে কিছু জানলে এরকম কথা উচ্চারণও করতেন না। যুধিষ্ঠিরের 'ইতি গজ'টুকুও তার মধ্যে ছিল না। সারাজীবনে অনেকবার তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি, তবে...।

উমাপতিবাবু হঠাৎ থেমে যেতে পরাশর বেশ একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তবে কী?

না, ওই যা বলেছি, ইদানীং তার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না।

বেশ বোঝা গেল উমাপতিবাবু কী একটা কথা চেপে গেলেন।

পরাশর কিন্তু এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলে না। তার বদলে জিজ্ঞাসা করলে, গুণধরবাবু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সন্ধান নেওয়ার কী ব্যবস্থা করেছেন? পুলিশে খবর নিশ্চয় দিয়েছেন?

পুলিশে!—উমাপতিবাবু একটু চুপ করে থেকে ধীরে-ধীরে বললেন, না, পুলিশে এখনও খবর দিইনি। শিল্প-ব্যবসার একেবারে ওপরতলায় বাজার কীরকম কানপাতলা আপনারা জানেন না। এতটুকু কানাঘুষোয় রাতারাতি সেখানে রাজ্য উলটে যায়। রায় সিন্ডিকেটের গুণধর হাজরা অমূল্য সব কাগজপত্র সমেত হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে ঘুণাক্ষরে জানলে এখুনি সেখানে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে। তাই গোপনে যা খোঁজ নেওয়ার নিচ্ছি আর একান্তভাবে আশা করছি গুণধর এখনও ফিরে আসবে।

শেষ কথাগুলোর সময় উমাপতিবাবুর গলাটা একটু যেন ধরা শোনাল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন, এসব কথা আপনাদের বলার দরকার ছিল না, উচিতও নয়। তবে ফোলিও ব্যাগটা ফেরত দিয়ে আসল সর্বনাশ থেকে আপনারা বাঁচাচ্ছেন বলেই বোধহয় এত কথা কৃতজ্ঞতায় বলে ফেললাম। আচ্ছা, অনুগ্রহ করে ব্যাগটা যদি এবার দেন।

ব্যাগটা আজ আপনাকে দিতে পারছি না, মিস্টার রায়।

কেন?—উমাপতিবাবুর গলা ও মুখের চেহারা এক মুহূর্তে বদলে গেল। যাঁর আঙুল নাড়ায় হাজার-হাজার লোকের ভাগ্যের চাকা ঘোরে, সেই জবরদস্ত মানুষের অসহিষ্ণুতার সুরই পাওয়া গেল তাঁর কণ্ঠে : যে-প্রমাণ আমি দিচ্ছি, তা কি যথেষ্ট নয়? না, সুবিধে পেয়ে আরও বেশি টাকা নিংড়ে নিতে চান? বেশ, বেশি টাকাই পাবেন। হাজারের জায়গায় দু-হাজার, নয় পাঁচ হাজার। দেখি আমার ব্যাগ।

আমি তখন প্রমাদ গুনছি, কিন্তু পরাশর নির্বিকার। একটু হেসে সে বললে, অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, মিস্টার রায়? বেশি টাকা আমরা চাই না। ফোলিও ব্যাগও আপনাকেই দেব। কিন্তু আজ নয়, কাল।

কাল, কখন?—উমাপতিবাবুর স্বর অত্যন্ত কঠিন।

এই ধরুন, বেলা দুটোয় আপনার অফিসেই নিয়ে যাব।

বেশ, তাই যাবেন। যেন ভুল না হয়।

উমাপতিবাবু নমস্কার পর্যন্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি সভয়ে পরাশরের দিকে ফিরে বললাম, কী ফ্যাসাদ এখন বাধালে বলো তো? আজ তো ধাপ্পা দিয়ে ঠেকালে, কিন্তু কাল দুটোর মধ্যে ও-ব্যাগ কি ভেলকিতে তৈরি হবে?

হবে, হবে! তুমি ভেবো না, কাল বেলা দেড়টায় তৈরি থেকো, আমি এসে নিয়ে যাব তোমায়!—বলে পরাশরও বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ঠিক বেলা দেড়টায় সে হাজির। আর হাতে তার সত্যি দামি চামড়ার একটা ফোলিও ব্যাগ।

প্রথমে অবাক হলেও পরে ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললাম, ও-ব্যাগ তা হলে তুমি আগেই পেয়েছিলে!

না।—বলে পরাশর হাসল।

তা হলে এখন পেলে কোথায়, কী করে?

পেলাম ট্রাম-কোম্পানির অফিসে প্রমাণ দিয়ে!—আমার হতভম্ব চেহারা দেখে পরাশর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে বিশদভাবে টাকাকড়ি যখন নেই, তখন ব্যাগটা নেহাত চোর-ছ্যাঁচড়ের হাতে না পড়লে মারা যাবে না আমি বুঝেছিলাম। স্টেট ট্রান্সপোর্ট, বাস সিন্ডিকেট, ট্রাম কোম্পানির অফিস আর থানা, সব জায়গাতেই ও-বিজ্ঞাপন পড়বার পর আমি খোঁজ নিই। তার মধ্যে ট্রাম কোম্পানির অফিসেই ওরকম একটা ব্যাগের সন্ধান মেলে, কিন্তু তখনও প্রমাণ হাতে নেই। কাল মিস্টার রায়ের কাছে প্রমাণের যে-কাগজ পেয়েছি, তারই জোরে আজ ব্যাগ ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম!

ওই ব্যাগ হারাবার একটা সামান্য বিজ্ঞাপন পড়ে এত কাণ্ড তুমি করেছ?

বাঃ, হাজার টাকা পুরস্কার নিতে হবে না!—বলে আমায় একরকম টানতে-টানতে পরাশর অফিস থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

উমাপতিবাবুর নিজস্ব অফিস কামরায় যখন পৌঁছলাম, তখনও দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট।

তাঁর খাস কামরায় ঢোকবার সময় উমাপতিবাবুর মুখে যে-ভ্রূকুটিটুকু ছিল, পরাশরের হাতের ব্যাগটা দেখে তা কোথায় উবে গিয়ে প্রায় আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখা গেল। অভ্যর্থনার ঘটা তখন দেখে কে!

আসুন, আসুন, বসুন! কী আনব বলুন, চা, কফি? কোল্ড ড্রিঙ্কস?

কিছু না। আগে ব্যাগটা পরীক্ষা করে দেখুন, সব ঠিক আছে কি না!—পরাশর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখল।

এ-অনুরোধ আর দুবার করতে হল না। ব্যাগটা খুলে কাগজপত্রগুলো তাড়াতাড়িতেও বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে উমাপতিবাবু হেসে বললেন, না, সব ঠিক আছে। এখন কত টাকার চেক লিখব, বলুন।

তার আগে ব্যাগটা আর-একটু ভালো করে দেখলে হত না! সবই ঠিক আছে বলছেন!

একটু অবাক হয়ে আর-একবার কাগজগুলো গুনে উমাপতিবাবু বললেন, হ্যাঁ, আছে তো দেখছি।

পকেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে পরাশর বললে, এই ওষুধটাও ব্যাগে ছিল।

তাই নাকি!—প্যাকেটটা হাতে নিয়ে উমাপতিবাবু বললেন, এ তো দেখছি অ্যাভোমিন।

হ্যাঁ, প্লেন বা জাহাজে চড়লে যাদের মাথা ঘোরে বা গা গুলোয়, তাদের দরকার হয়। জাহাজে তো নিশ্চয় নয়, গুণধরবাবু প্লেনে সম্প্রতি কোথাও গেছলেন?

প্লেনে? হ্যাঁ, আসামে আমাদের এক চা-বাগানে কিছুদিন আগেই গেছল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তখন সেখানে ছিলাম।

এই ফোলিও ব্যাগ হারানোর আগেই?

উমাপতিবাবু মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, সেখান থেকে ফেরার পরই এই ব্যাপার ঘটে। আমি তার দুদিন বাদে ফিরে জানতে পারি।

কাল যে-কথাটা চেপে গেছলেন সেটা এখন তা হলে বলুন, মিস্টার রায়। —পরাশরের প্রায় যেন আদেশের সুর।

একটু থতমত খেয়েও উমাপতিবাবু বিস্ময়ের ভান করলেন। —কী কথা আমি চেপে গিয়েছি?

'তবে' বলে শুরু করে বলতে গিয়েও গুণধরবাবু সম্বন্ধে যে-কথাটা বলেননি।

পরাশরের স্থির দৃষ্টির সামনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করেই উমাপতিবাবু আবার গরম হয়ে উঠলেন : যদি না বলে থাকি, তাতেই বা কী হয়েছে! ব্যাগ ফেরত দিয়েছেন, পুরস্কার নিয়ে যান। আমায় জেরা করবার কী অধিকার আপনার আছে?

জেরা করবার অধিকার নেই, আছে সাহায্য করবার ইচ্ছে।

ধন্যবাদ! আপনার সাহায্যে আমার দরকার নেই।—উমাপতিবাবু একটা মোটা খাম পরাশরের দিকে একরকম ছুড়েই দিলেন যেন। বুঝলাম তাতেই পুরস্কারের টাকা।

সেটাকে অগ্রাহ্য করে পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, সাহায্য না চান, সত্যি কথাটা শুনে রাখুন। তাড়াতাড়িতে পরীক্ষা করে আপনি বুঝতে পারেননি, ও-ব্যাগের বেশিরভাগ কাগজপত্র ও সিকিউরিটি জাল।

ঘরে সত্যিই যেন বজ্রপাত হল। নির্বোধের মতো খানিক চেয়ে থেকে উমাপতিবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, জাল!—তারপর একটানে কাগজপত্রগুলো ব্যাগ থেকে বার করে তিনি সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বোঝা গেল পরাশর মিথ্যে বলেনি।

উমাপতিবাবু বিহ্বলভাবে বললেন, এর মানে?

মানে অনেক গভীর।—পরাশর শান্ত ও দৃঢ় স্বরে জানালে, শুধু এই সামান্য ক'টাই নয়, আমার বিশ্বাস রায় সিন্ডিকেটের এরকম বহু দামি শেয়ার ও সিকিউরিটির কাগজপত্র গত এক বছর ধরে সিন্দুক থেকে সরে গিয়ে তার জায়গায় জাল কাগজ রাখা হয়েছে। সত্যি কথাটা তাহলে শুনুন : এইরকম একটা গোলমেলে ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়ে একটি ব্যাঙ্ক গোপনে এ-ব্যাপারের তদন্ত করবার জন্যে আজ দু-মাস হল আমার ওপর ভার দিয়েছে।

আপনাকে!

হ্যাঁ,—পরাশর সবিনয়ে বললে, আমি মাঝে-মাঝে এসব কাজ করি। নাম পরাশর বর্মা।

পরাশর বর্মা নামটা উমাপতিবাবুর খুব পরিচিত বলে মনে হল না। তিনি শুধু হতাশভাবে বললেন, এখন উপায়, মিস্টার বর্মা।

উপায় গুণধর হাজরাকে খুঁজে বের করা। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু গোপন করবেন না। বলুন, সেদিন কী কথা চেপে গিয়েছিলেন।

সে এমন কিছু নয়, মিস্টার বর্মা। এ-ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও যোগ আছে বলেও মনে করি না। আমি আবার বলছি, গুণধর যুধিষ্ঠিরের মতো সৎ ও সাধু।

সাধুদেরও পতন হয়, মিস্টার রায়। এখন বলুন যা লুকিয়েছেন।

না, লুকোইনি ঠিক, তবে গুণধরের একটা ব্যাপার ইদানীং একটু খারাপ লাগছিল। তার কোথাও কেউ নেই। বিয়ে-থা করেনি। সারাজীবন একা কাটিয়েছে। সম্প্রতি কোনও একটি মেয়ের পাল্লায় বুড়ো বয়সে সে পড়েছে মনে হচ্ছে।

কে সে মেয়ে?

জানি না। একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে দেখেছিলাম। গুণধরের তুলনায় বয়েস অনেক কম। সুন্দরীও বলা চলে। সকলেরই শত্রু থাকে। গুণধরেরও ছিল। কেউ-কেউ আমাকে ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করেছে—আমি কান দিইনি, গুণধরকেও কখনও কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি।

একটু চুপ করে থেকে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, গুণধরবাবুর কি হার্টের অসুখ ছিল?

হার্টের অসুখ!—উমাপতিবাবু অবাক হয়ে বললেন, আমি তো অন্তত জানি না। কিন্তু এ-প্রশ্ন করছেন কেন?

তা এখন না-ই জানলেন। হার্টের অসুখ তাহলে ছিল না বলছেন?

না,—উমাপতিবাবু একটু ভেবে বললেন, তাই বা কী করে বলি। কিছুদিন তার শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল আগে বলেছি। কিন্তু সেটা সাধারণ লিভারের দোষ-টোষই ভেবেছিলাম। দাঁড়ান, দাঁড়ান, একদিন এই ঘরে হঠাৎ বুকটা চেপে সে বসে পড়েছিল মনে আছে। জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, ও কিছু নয়। গুণধর এমনিতেই খুব কম কথা বলে।

ধন্যবাদ।—পরাশর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মনে হচ্ছে দু-চার দিনের ভেতরই গুণধরবাবুকে আপনার সামনে হাজির করতে পারব। জাল-কাগজপত্রের রহস্য তখন বোঝা যাবে।

গুণধরকে সত্যি দু-চার দিনেই পাবেন আশা করেন?—উমাপতিবাবু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাই তো করি। রোগাটে, লম্বা, ময়লা রং, মাথার সামনে টাক পড়তে শুরু করেছে। পোশাকে-আশাকে একটু ঢিলেঢালা—এই তাঁর বর্ণনা তো?

সায় দিয়ে উমাপতিবাবু বললেন, পুরস্কারটা নিয়ে যান তাহলে।

না, এখন থাক। ওর চেয়ে বড় পুরস্কারই আপনার কাছে নেওয়ার আশা করি। বলে পরাশর আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

তারপর পরাশর বর্মার সব জারিজুরি ভাঙবার দাখিল। দু-চার দিনের জায়গায় সাতদিন কেটে গেল, গুণধরের টিকির খোঁজ মিলল না।

এ-ক'দিন আমার হয়রানিরও অন্ত নেই। অফিস থেকে যেটুকু ছাড়া পাই, তার খামখেয়ালে শহরের সর্বত্র ওষুধের দোকানে ঘুরতে হয়। কী যে এক অদ্ভুত ওষুধের পরাশর দোকানে-দোকানে নাম করে! ছোটখাটো দোকান তো জানেই না, খুব কম বড় দোকানেই সেটা পাওয়া যায়। শেষপর্যন্ত চৌরঙ্গী ও অন্যান্য অঞ্চলের যে-ক'টি দোকানে ওষুধটা পাওয়া গেল, তারাও প্রেসক্রিপশান ছাড়া সে-ওষুধ দিতে নারাজ। কিন্তু পরাশরও নাছোড়বান্দা। যেখানে যেমন ম্যানেজার বা মালিকের সঙ্গে তারপর তার দেখা করা চাই। কী যে তর্কাতর্কি সে তাদের সঙ্গে করে জানি না, কারণ আমি বেশিরভাগ সময় বিরক্ত হয়ে বাইরেই তখন থাকি। কিন্তু ওষুধটা পেতে তাকে কোথাও দেখলাম না।

শেষে একদিন জ্বালাতন হয়ে তাকে বললাম, অত যদি ওষুধটার দরকার, কোনও ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসক্রিপশান করিয়ে নিলেই তো পারো।

প্রেসক্রিপশান করাব!—পরাশর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

হ্যাঁ, তোমার এই পাগলামির ধারেকাছে আমি পারতপক্ষে থাকি না, কিন্তু সেদিন কোন দোকানে যেন কোনও মেয়ে-টেয়ে প্রেসক্রিপশান এনে এ-ওষুধ নিয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করছিলে না? ওই কথাটা কানে গেছল, তাই বলছি।

ঠিকই বলেছ।—বলে পরাশর আমার পরামর্শটাকে বেমালুম চাপা দিলে।

তার পরদিনই সন্ধ্যায় আমার অফিসে এসে পরাশর আমায় এই মারে তো সেই মারে! সে কী তার মেজাজ!

তোমার জন্যেই আমার এই হাল!

হতভম্ব হয়ে বললাম, আমি আবার কী করেছি?

কী করেছ? ওরকম একটা রদ্দি ছবি দেখতে জোর করে নিয়ে গেছল কে! ওই ছবির ছাপ মনের ওপর ছিল বলেই আমার সব গুলিয়ে গেছল। ওসব বাজে ছবি কখনও দেখতে আছে?

কিন্তু তুমি ছবি দেখলে কখন! অর্ধেকটা পর্যন্ত না দেখেই তো ঘুমিয়েছ, শেষ কী হল তাও জানো না।

জানি না! তোমার পকেটে যে-কাগজটা দিয়েছিলাম সেটা পড়েছ?

তাই তো! কী ভাগ্যি কাগজটা তখনও পকেটে ছিল। বার করে পড়ে সত্যি আমি থ। অভিভূতের মতো জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আগেই বুঝতে পেরেছিলে!

তার প্রমাণ তো তোমার হাতেই রয়েছে, কিন্তু এখন ওসব বাজে কথার সময় নেই। বলে সে ফোন ধরে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের একজন মাথাকে যা জানাল, তাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত।

লালবাজারের ফোন সেরে সে স্বয়ং উমাপতিবাবুকেই ফোনে ডাকল—হ্যালো, হ্যাঁ, মিস্টার রায়কে দিন।...তিনি ব্যস্ত! তা হোক, বলুন পরাশর বর্মা ডাকছেন, তাহলেই হবে।

তাই হল। পরাশর বর্মার নামে উমাপতিবাবু নিজেরই ফোন ধরলেন এবার।

হ্যালো!—হ্যাঁ, আমি বর্মা, আপনার কাছে এখুনি যাচ্ছি। এখুনি বেরুচ্ছিলেন? তবু আধঘণ্টা একটু অপেক্ষা করুন। সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। গিয়ে সব বলছি। আপনার এখন একেবারে সময় নেই? কিন্তু এ-কাজটা যে সবচেয়ে জরুরি, মিস্টার রায়। গুণধরবাবুকে? না, তাঁকে পাইনি, তবে পাব নিশ্চয়। তাঁর মৃতদেহটা অবশ্য। আবোলতাবোল বকছি? না, সেখানে পুলিশ খোঁজ শুরু করেছে, খবর এল বলে। আপনার চা-বাগানের নিজস্ব নির্জন বাংলো থেকে বেরিয়ে যে-পাহাড়ি রাস্তাটা গৌহাটির দিকে গেছে, তারই পাশের কোনও খাদে অবশ্যই পাওয়া যাবে। না, না, ফোন ছাড়বেন না, অনেক কথা এখন বাকি। রায় সিন্ডিকেটের টাল-বেটাল অবস্থা সামলাতে নিজেই যেসব কাগজ জাল করেছেন, ফাটকা বাজারে বেনামীতে যত শেয়ার কেনা-বেচার জুয়া খেলেছেন, শেষপর্যন্ত একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু ও সহায় গুণধর হাজরাই যেন সব নষ্টের মূল বুঝিয়ে তার নিরুদ্দেশ হওয়াটা যেভাবে সাজিয়েছেন, সব কথাই বলতে হবে যে! সব কিছু মিথ্যার মধ্যে একটা সত্যি কথা আপনি শুধু বলেছিলেন, মিস্টার রায়। বলেছিলেন যে, গুণধর হাজরা যুধিষ্ঠিরের মতো

সাচ্চা মানুষ। বাল্যবন্ধু হলেও সেই সাচ্চা মানুষ আপনার সব কীর্তি শেষপর্যন্ত বুঝে ফেলে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল বলেই আপনি তাকে মিথ্যে অজুহাতে চা-বাগানে ডাকিয়ে যেভাবে হোক দুনিয়া থেকে সরানোর ব্যবস্থা করেন। পাগলের প্রলাপ আর শুনতে চান না? এখুনি বেরুচ্ছেন, কিন্তু তা তো পারবেন না। লালবাজারে খবর গেছে, তারা এতক্ষণে আপনার অফিস নিশ্চয়ই ঘেরাও করে ফেলেছে—কী হল?

ফোনের ভেতরই ঝন-ঝনাৎ করে একটা কী পড়ে যাওয়ার আওয়াজ আমিও পেলাম।

'হ্যালো, হ্যালো!' করে কয়েকবার ডেকে পরাশরও ফোনটা নামিয়ে রেখে হতাশভাবে বললে, না—মিস্টার রায় এখন সব গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বাইরে।

তার মানে?

মানে! পুলিশ গিয়ে ওঁর মৃতদেহটাই পাবে। ওঁরই হার্টের অসুখ। ফোলিও ব্যাগে অ্যাভোমিন-এর সঙ্গে একটা পেন্টানাইটাইট-এর শিশিও আমি পাই। রোগ যাদের গুরুতর, হার্টের হঠাৎ ব্যথা উঠলে তারা খায়। এ-ক'দিন সব ওষুধের দোকানে ওই ওষুধটারই আমি খোঁজ করেছি, কে-কে সম্প্রতি এ-ওষুধ কিনেছে জানবার আশায়। আমার ধারণা ছিল ওষুধটা যখন ব্যাগে থেকে গেছে, তখন গুণধর হাজরা নিজে বা তার বুড়ো বয়েসের প্রেম সেই মেয়েটির সাহায্যে এ-ওষুধ কোথাও কেনার চেষ্টা করবেই। কিন্তু গুণধরবাবুর হার্টের অসুখই ছিল না। তার প্রেমের গল্পটাও মিস্টার রায়ের বানানো। তোমার সঙ্গে ওই বাজে ছবি দেখতে না গেলে গোড়াতেই মিস্টার রায়ের কারসাজি আমি ধরে ফেলতাম।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, কিন্তু ও-ছবি দেখে তোমার মাথা গুলোল কেন? ওখানে তো শেষপর্যন্ত জানা গেল যে, হ্যারল্ড সত্যি মরেনি। মার্থার কাছে টাকা আদায়ের জন্যে আর তাকে ও ইউজিনকে জব্দ করার জন্যে সে-ই নিজের মৃত্যুটা ওইভাবে সাজিয়ে সেই লোকটির সাহায্যে সকলকে ধোঁকা দিচ্ছিল!

হ্যাঁ, ওই ছবিটা মাথায় থাকার দরুনই আমি একরকম চোখ বন্ধ করে ধরে নিয়েছিলাম যে, গুণধর হাজরাই রায় সিন্ডিকেটকে ফাঁক করে ফোলিও ব্যাগটা ফন্দি করে ট্রামে ফেলে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ব্যাগটা ইচ্ছে করেই ট্রামে ফেলে যাওয়া হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ফেলে গেছল গুণধর নয়, মিস্টার রায়। আসামের চা-বাগান থেকে গুণধরের ওই ব্যাগটি নিয়েই তিনি কলকাতায় আসেন ও একদিন ট্রামে ফেলে গিয়ে গুণধরের নামে ওই বিজ্ঞাপন দেন। ব্যাগে যে মনের ভুলে অ্যাভোমিন আর পেন্টানাইট্রাইট-এর শিশি দুটো থেকে গেছে, তাঁর খেয়ালই হয়নি।

কিন্তু ছবিতে হ্যারল্ডই যে আসল শয়তান, ওইটুকু দেখে বুঝেছিলে কী করে?

বুঝেছিলাম হ্যারল্ডের বা যে গল্প লিখেছে তার অতিবুদ্ধির বহর দেখে। আত্মহত্যার বদলে খুন প্রমাণ করবার জন্যে ফোলিও ব্যাগে জাল চিঠিই যথেষ্ট। তার ওপর আবার বিষের বড়ির ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি। বিষে যদি কেউ মরে তো তাহলে সমুদ্রের তীরে তার ব্যাগটা শুধু পড়ে থাকবে কেন! আর ব্যাগটা যে-লোকটি পায়, আর যাকে এক রাত্রে মোটর বোটে হ্যারল্ডের সঙ্গে যেতে দেখা যায়, সে নিজের গরজে বা কারুর টাকা খেয়ে যদি হ্যারল্ডকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে ব্যাগটা সে সাধ করে পুলিশের হাতে নিশ্চয় দেবে না! নাঃ, ওসব বাজে ছবি আর কখনও দেখবে না, তার চেয়ে বুদ্ধিতে শান দেওয়ার জন্যে আধুনিক কবিতা পড়া অনেক ভালো।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৫৯



চিরকুমারী

সন্তোষকুমার ঘোষ

এক

উইন্ডস্ক্রিন বেয়ে দরদর ধারায় জল ঝরছিল। কিছু দেখা যায় না। ওয়াইপারটাকে সবেগে চালিয়ে দিল পূর্ণেন্দু, তাতে নিয়মিত গতিতে যান্ত্রিক গোঙানির মতো একটা অস্পষ্ট আওয়াজই সৃষ্টি হল শুধু, অস্পষ্টতা বাড়ল বই কমল না।

পকেট থেকে রুমাল বের করল পূর্ণেন্দু, কাচ ভিতর থেকে ঘষল। একবার ভাবল গাড়িটা দাঁড় করাই, বৃষ্টির কতদূর দৌড়, খানিক দেখি। কিন্তু মন সায় দিল না, অতএব ইঞ্জিনটাকে সচল রাখতেই হল। বৃষ্টি পড়ছে, ফিনকি দিয়ে জল ছিটকে পড়ছে দু-পাশে—পূর্ণেন্দু বুঝতে পারছিল। রাস্তার দু'-পাশের নালায় যেন ঢল নেমেছে। যে-গাছগুলো ভুতুড়ে প্রহরীর মতো, তারা দু-ধার থেকে ঝুঁকে পড়ে নিজেরাই চুলোচুলি করে মরছে।

এই দুর্যোগ যে নামবে, বেরোবার একটু আগেও যদি তার আভাস পাওয়া যেত! তখন আকাশ ছিল খটখটে—হঠাৎ ঝড়-জল পিছে-পিছে ধাওয়া করে এসে যেন তাকে ধরে নিল।

এখন অন্ধকার, অপরিচিত গন্তব্য, গাড়িতে সে একা। পূর্ণেন্দু একবার শিউরে উঠল। শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে। সেই শীতে, না ভয়ে? পূর্ণেন্দু নিজেকে তিরস্কার করল। পুলিশ অফিসার—হলেই বা জুনিয়র—এই অহেতুক ভয় তাকে মানায় না। আর, সে না এক ভয়ার্ত মহিলাকে অভয় দিতে চলেছে? নিজেই যে ভয়ে জড়োসড়ো, সে অভয় দেবে কাকে? কী করে?

বস্তুত আজকের এই দায়িত্ব পূর্ণেন্দুর মোটে মনঃপুত ছিল না। এই ঠান্ডায় খিচুড়ি জমত বেশ। অবশেষে গভীর ঘুম। কিন্তু পুলিশের কাজে সে-সুখ কপালে নেই।

পাশের জানালা দিয়েও জল পড়ছিল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে। পূর্ণেন্দু থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিল। মানে হয় না, একটি টেলিফোনে উড়ো খবর পেয়ে তাকে ঝড়-জলের এই সন্ধ্যার পথে ঠেলে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। 'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ'—পূর্ণেন্দু একবার স্কুলে-পড়া কবিতাটার অংশ মনে-মনে আবৃত্তি করল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কে এই কমলা দেবী—যিনি বড়সাহেবকে আজ ফোন করেছিলেন?—'আমার বিপদ আসন্ন, একটা অঘটন কিছু ঘটবে আমার মন বলছে, কাউকে পাঠান।'

সে যেন আসবে, আমার মন বলেছে! প্রিয় গানের কলিটি মনে পড়ে গেলে পূর্ণেন্দু হেসে ফেলল। মুখ ভেঙচে উচ্চারণ করল কথা কয়টি। কে জানে, ন্যাকা কোন স্ত্রী-লেখকের এই কারসাজি। হয়তো গিয়ে দেখা যাবে, কিছুই নয়, কমলা দেবী আসলে মৃগী রোগী, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, অথবা নার্ভাস, কিংবা পাগল। ভয়ের কোনও কারণই নেই।

যদি থাকেও, তাহলে? পূর্ণেন্দু—একা পূর্ণেন্দু কী করবে, করতে পারে! অন্যের প্রাণ বাঁচাবে সে, কিন্তু তার নিজের প্রাণ বাঁচায় কে। কোমরের কাছে রিভলভারটা একবার টিপে দেখল পূর্ণেন্দু, ঠিকই আছে। একটু যেন ভরসা পেল। না, অন্তত একজন সঙ্গী আছে।

কমলা, বিমলা, রমলা। আর—আর কে? সুব্রত। পূর্ণেন্দু মনে-মনে সাহেবের মুখে শোনা নামগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল। 'অনন্ত আলয়'—বাড়িটার নাম। তিন মহলা, প্রাচীন বাড়ি—অনন্ত রায়ের পৈতৃক ভদ্রাসন। এই পরিবারটি সাহেবের চেনা, অনন্ত রায় তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তিনটি মেয়েকেই চেনেন তিনি। হয়তো তাই এই টান। টেলিফোন পেয়েই বিচলিত হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন পূর্ণেন্দুকে।

বিমলা কিন্তু অনন্ত রায়ের মেয়ে নন—বিধবা বোন। তাঁর বয়সও অন্তত সত্তর-বাহাত্তর। চোখে কম দেখেন। কানে আদৌ শোনেন না। সাহেব পাখি-পড়ানোর মতো করে পূর্ণেন্দুকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন। বিমলা রায় বালবিধবা। কবে বিবাহ হয়েছিল আজ কারও তা মনেও নেই, সম্ভবত বিমলার নিজেরও না। বড়-বড় থাম, ফাঁকে-ফাঁকে পায়রার বাসার মতো বিমলাকেও সকলে ওই বিরাট নোনা-ধরা বাড়িটারই অংশ বলে ধরে নিয়েছে। সুব্রত সম্পর্কে বিমলার ভাশুরপো, আজ কয়েকবছর ধরে কাকিমার আশ্রয়েই আছে। কলেজের ছাত্র, স্পোর্টসে দক্ষ, আইন কলেজের খাতাতেও নাম আছে।

কমলা আর রমলা। কমলাই অনন্ত রায়ের মেয়ে—একমাত্র সন্তান। রমলা ভ্রাতুষ্পুত্রী। আশ্চর্য, দু-জনই অবিবাহিত। বিয়ে হয়নি কেন? এ-রহস্য সাহেব নিজেও ভালো জানেন না। দুজনকেই অনন্ত রায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন—বোধহয় কতকটা জেদ করে। বিয়ে যে দেননি, তা-ও বোধহয় জেদ। অনন্ত রায় অত্যন্ত একরোখা মানুষ ছিলেন। বড়লোকের মেয়ে—আজ দুজনেরই বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, তাদের ভাগ্য নিয়ে অনন্ত রায় নিষ্ঠুর খেয়ালের বশে এমন কাণ্ড করলেন কেন? বোন বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিল, তার সেই চেহারা অনন্ত রায় সহ্য করতে পারতেন না—সেই ক্ষোভ কি গোটা বিবাহ-প্রথার ওপর দিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন?

এমনও হতে পারে, বড় ঘরের মেয়ে, মনোমতো পাত্র বাছাই করতে-করতেই কবে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু ক্ষতি তো বিবাহ-প্রথার হল না, সমাজব্যবস্থারও না, তাঁর মেয়ে দুটিই চিরকুমারী হয়ে রইল। তীব্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চেপেই অনন্ত রায় মারা গিয়েছিলেন।

অবশ্য উইলে তিনি ভুল করেননি। বিধবা বোন আর কুমারী কন্যা দুটিকে সমান তিন ভাগে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিন মহল বিরাট প্রাসাদটিতেও তিনজনেরই সমান অধিকার।

বড়সাহেব পরিবারের ইতিহাসটা সবিস্তারেই বলে দিয়েছেন পূর্ণেন্দুকে। পূর্ণেন্দু মনে-মনে তাই ঝালিয়ে নিচ্ছিল, যাতে ওখানে পৌঁছে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা না ঘটে।

অনন্ত রায়ের মৃত্যুর পরও তো প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে। হঠাৎ এমন কী ঘটল, যাতে কমলা ব্যাকুল হয়ে টেলিফোন করলেন পুলিশের বড়সাহেবকে?

দুই

ঘসঘস শব্দ করে দেউড়ি পেরিয়ে পূর্ণেন্দুর গাড়ি দাঁড়াল। সাহেব পথের নিশানা ভালো করে বুঝিয়েই দিয়েছিলেন। প্রাসাদের বর্ণনাও। নারিকেল-সুপারি গাছের পাতার আড়ালে প্রায় ঢাকা-পড়া বাড়িটাকে দূর থেকে চিনতেও অতএব পূর্ণেন্দুর কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু আলো নেই কেন?

পরপর কয়েকটা অন্ধকার খুপরি—এককালে হয়তো অতিথি-মহল ছিল। কিংবা মালি-ঠাকুর-চাকরদের আস্তানা। এখন তাদের চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো অবস্থাতেও কুলোয় না।

সদর আর অন্দরমহলের মধ্যে প্রশস্ত অঙ্গন পড়ে আছে। কোনওকালে হয়তো বাগান ছিল। একটি ফোয়ারার চিহ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। কুন্দশুভ্র কোনও নগ্নিকা ঈষৎ নুয়ে পড়ে ঝারি থেকে জল ঢালছিল। এখন জল নেই, জল ঢালার ভঙ্গিটা শুধু আছে।

বৃষ্টি থেমে একটু মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না ফুটেছিল, পূর্ণেন্দু তাই সবই অস্পষ্ট আবছায়াভাবে দেখতে পেল। শত অনাদরেও গোটা কয়েক পাম আর ঝাউ আজও মরেনি। তখনও থেকে-থেকে কনকনে ভিজে হাওয়া বইছিল।

একটা কুকুর হঠাৎ ডেকে উঠল, পূর্ণেন্দু চমকে উঠল, আর-একটু হলেই ফাটল ধরা সিঁড়িটার ফাঁকে-ফাঁকে অশ্বত্থের শিকড়ের জালে পা জড়িয়ে হোঁচট খেত।

ওই সিঁড়ির পরে ভারী কালো রঙের কাঠের কপাট। পা টিপে-টিপে উঠে পূর্ণেন্দু কপাট ঠেলল।

ভিতর থেকে বন্ধ।

ঘাড় উঁচু করে দেখল পূর্ণেন্দু, ওপরের কোনও বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আলোর ক্ষীণ আভাসও যদি আসে।

আলো ছিল না। কাঠের জানালা নয়, খড়খড়িও নেই—কাচের শার্সি। বাইরের মরা-মরা জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করে উঠছিল। কিন্তু ভিতরের দিকে আলোর রশ্মিটুকুও ছিল না।

টর্চ জ্বালিয়ে দেখল পূর্ণেন্দু, যদি কপাটের গায়ে কড়া দেখতে পায়।

কড়াও ছিল না।

পূর্ণেন্দু তখন ভাবল, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে কি না। পরক্ষণেই টের পেল, সে-চেষ্টাও নিষ্ফল হবে। এই ছমছমে আধো-অন্ধকার যে পাথরের মতো ভারী হয়ে সাহসকে নিঃশেষে পিষে মারে। কণ্টকিত শরীর শুধু অস্বস্তির পুঁটলি হয়ে ওঠে। এই অস্পষ্ট আলোকে বিশ্বাস নেই। এর যে-কোনও বিন্দু সহসা বিস্ফারিত হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হবে—পূর্ণেন্দু যেন তারই অপেক্ষা করছিল।

এই রহস্যপুরীর অধিবাসিনী কমলা রায় বৃথা ভয় পায়নি।

পূর্ণেন্দুর তখনই শিকলটা চোখে পড়ল। ভারী কপাটের কবজার ফাঁকে এই শিকলটা কেন, অথবা কোথায় গিয়েছে, এসব প্রশ্ন বিন্দুমাত্র বিচার না করেই পূর্ণেন্দু শিকল ধরে টানল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে নিথর নিস্তরঙ্গ পরিবেশটা যেন সহসা আর্তনাদ করে উঠল। একটি গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি চমকিত করল প্রাসাদপুরীর অন্তঃপুর। দেয়ালে-দেয়ালে সেই ধ্বনি প্রতিহত হয়ে অসংখ্য প্রতিধ্বনির বুদ্বুদ সৃষ্টি করে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

কপাটজোড়া অল্প ফাঁক হল। অনেক দূর থেকে কে যেন প্রশ্ন করল, 'কে?'

পূর্ণেন্দু বলে উঠল, 'আমি।'—যদিও কথাটার কোনও মানে হয় না।

তবু ভরসা পেয়ে কপাট এবার একটু জোর দিয়ে ঠেলল পূর্ণেন্দু। মুহূর্ত পরেই টের পেল, সে এক প্রশস্ত আঙিনায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আঙিনার যেখানে শেষ, তার পরেই অপরিসর একটি দীর্ঘ বারান্দা, যার দু-ধারে মৃদু দীপের সারি।

যা-হোক, অন্দরমহলে তবু দেখছি আলো আছে! পূর্ণেন্দু অস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করল।

সরু স্বল্পালোক প্যাসেজের শেষে দীর্ঘ একটি নারীমূর্তি। শুভ্রদেহ, শুক্লবাস—হঠাৎ মনে হতে পারত যে, এটিও কোনও মর্মরমূর্তি।

কিন্তু সেই নারীদেহ ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছিল।

একেবারে কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল : 'কে? কে আপনি?' জিজ্ঞাসা করল তীক্ষ্ন স্বরে।

সেই স্বর থেকে পূর্ণেন্দু অনুমান করল, বাইরে থেকেও সে এঁরই গলা শুনেছিল।

কার্ড বের করে পূর্ণেন্দু এগিয়ে দিল। মধ্যবয়সিনী মহিলা, চুলেও দু-একটি পাক ধরেছে।

'কমলা দেবী?' পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করল সাহসে ভর করে, 'আপনিই কি পুলিশে ফোন করেছিলেন?'

মাথা নীচু করে সেই শীর্ণ শুভ্র মহিলা কার্ডটা পড়ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে রূঢ়তার রেখা ক'টি ধীরে-ধীরে অপসৃত হচ্ছিল।

'পুলিশ? আপনি পুলিশের লোক বুঝি?' মহিলাটি বললেন, মৃদু স্বরে, 'আসুন।'

বারান্দা পার হয়ে বসবার ঘর। সে-ঘরে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে দেখে পূর্ণেন্দু আশ্বস্ত হল। সেকেলে রীতিতে সাজানো ঘর—আসবাবও দামি কিন্তু সেকেলে। ভারী একটা চেয়ারে বসে পূর্ণেন্দু বলল, 'আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'ফোন?' মহিলাটির কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল। বললেন, 'ফোন আমি তো করিনি।'

পূর্ণেন্দু বলতে গেল, 'কিন্তু কমলা দেবী—।'

'ভুল করছেন, আমি কমলা নই। আমি রমলা।'

পূর্ণেন্দু সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভুলটা টের পেল। ইনি কমলা নন, রমলা। অনন্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। চিরকুমারী দুটির অন্যতমা।

রমলা দেবী বললেন, 'বসুন। কমলাকে খবর দিই।'

আকাশের মেঘের মতোই ভয় কেটে যাচ্ছিল পূর্ণেন্দুর মন থেকে। জানালার কাছে উঠে এসে সে এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাতে পারল। রেনকোটটা চুঁইয়ে জল পড়ছিল তখনও। পূর্ণেন্দু সেটাকে খুলে রাখল চেয়ারের হাতলে।

রমলা দেবীর ফিরতে একটু দেরি হল। হাতে চায়ের পেয়ালা। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। দেরি হয়ে গেল।'

ব্যস্ত-লজ্জিত হয়ে পূর্ণেন্দু হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনি নিজে কষ্ট করে—।'

রমলা দেবী বললেন, 'ঠাকুর-চাকর দুজনেরই আজ ছুটি। বিকেলবেলাই শহরে গেছে, কী একটা হিন্দি ছবি এসেছে নাকি।'

ঠান্ডায় চা ভালোই লাগছিল পূর্ণেন্দুর, গলার ধরা-ধরা ভাব কেটে যাচ্ছিল। রমলা নিজের জন্যও এক পেয়ালা চা এনেছিলেন।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে রমলা বললেন, 'কমলা আপনাকে ফোন করেছিল?'

'আমাকে ঠিক না। বড়সাহেবকে।'

'কী বলেছিল?'

একটু ইতস্তত করল পূর্ণেন্দু। সব কি খোলাখুলি বলা ঠিক হবে? টের পেল, উৎসুক রমলা ওর দিকে চেয়ে আছেন।

অগত্যা পূর্ণেন্দুকে বলতেই হল, 'প্রাণের ভয়ে তিনি ভীত, সবসময়েই বিপদের আশঙ্কা করছেন।'

রমলার শঙ্খ-শুভ্র মুখে বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। চেয়ারটা ওঁর কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে গেল পূর্ণেন্দু : 'রমলা দেবী বলতে পারেন, কমলা দেবীর ভয়ের হেতুটা কী।'

ঈষৎ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রমলা : 'ঠিক জানি না।'

'ভয়ের কি সত্যিই কোনও কারণ আছে?'

রমলা যেন ত্রস্ত হলেন। এদিক-ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আছে।'

'কী ভয়, কীসের ভয় রমলা দেবী?' পূর্ণেন্দু যেন ওঁকে আশ্বাস দিতেই আরও সন্নিহিত হয়ে এল।

দু-হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে রমলা বলে উঠলেন, 'পারব না, আমি বলতে পারব না। আপনি, আপনি বরং কমলাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।'

'কমলা দেবী কোথায়?'

'ওপরে। ওর শোওয়ার ঘরে। বিকেল থেকেই বলছিল, মাথায় খুব যন্ত্রণা। শুয়ে পড়েছে।'

'একবার যদি ওঁকে—'

'আসুন না আপনি ওপরে।'

রমলা উঠে দাঁড়ালেন। রমলা কৃশকায়, বয়সের পক্ষে বেশ তাড়াতাড়িই সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন, উঠছিল পূর্ণেন্দুও। শ্বেত পাথরের ধাপ, ধবধবে মসৃণ। রেলিং বরাবরও কোমর অবধি পাথর বসানো। ঠান্ডা। যেন অনেককালের জমানো বরফ এরই আড়ালে কোথাও স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই আবার দীর্ঘ বারান্দা। একেবারে সামনের ঘরখানিতে কালো পুরু পরদা ঝুলছিল।

'কমলার ঘর।' রমলা বললেন ফিসফিস করে, 'আপনি দাঁড়ান। আমি খবর দিই।'

পরদা ঠেলে রমলা ভিতরে ঢুকেছিলেন, কিন্তু বেরিয়েও এলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে। আগের মতোই মৃদু গলায় বললেন, 'এখনও ঘুমোচ্ছে। তুলে দেব?'

পূর্ণেন্দু যদিও অধীর হয়ে উঠেছিল, তবু তাকে বলতেই হল, 'থাক না। না-হয় আর কয়েকমিনিট অপেক্ষাই করি।'

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রমলা : 'দাঁড়িয়ে থাকবেন—সে কী! আসুন, আপনাকে বরং বড়পিসিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের পিসিমা বিমলা দেবী—এঁর কথা শোনেননি?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'শুনেছি।'

বারান্দার একেবারে শেষপ্রান্তে যে-ঘর, সেখানে আলো জ্বলছিল। রমলা দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'পিসিমার ঘর।'

হেঁট হয়ে পূর্ণেন্দু জুতো খুলছিল। কেন না সে দেখতে পেয়েছে, এ-ঘরের মেঝেও পাথরে বাঁধানো। প্রকাণ্ড ঘরখানারই একদিকে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ, সামনে ধূপ-দীপ জ্বলছে। ধোঁয়ায় ঘরখানা মৃদু সুরভিত, ঈষৎ আচ্ছন্ন।

এ-ঘরে বিজলি আলো নেই, পূর্ণেন্দু লক্ষ করেছিল। পুরোনো আমলের বেলোয়ারি ঝাড়ে কয়েকটি মোমবাতিই জ্বলছিল। সেই আলোয় মেঝেয় আসন পেতে যিনি একটি বই পড়ছিলেন, তাঁরও গায়ের রং, পূর্ণেন্দুর মনে হল, মোমের মতো। সাদা, নিষ্প্রভ। এখান থেকে তাঁর শুভ্র কেশের কয়েকগুচ্ছই মাত্র দেখা যায়, আর দেখা যায় একটি ধারালো নাক, যার পাশের চামড়া কুঞ্চিত।

এই প্রাচীনপুরীর ইনিই বুঝি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এঁর বয়স কত, পূর্ণেন্দু অনুমান করতে পারল না। এই প্রায়-নিস্পন্দ সমাহিত দেহ কয়টি শরৎ আর বসন্ত দেখেছে? কতবার স্নান করেছে, বর্ষার নবধারা-জলে? সেই মুহূর্তে কেউ যদি বলত, উনি এই প্রাসাদপুরীরই সমবয়সী, পূর্ণেন্দু অবিশ্বাস করতে পারত না। একটি প্রাচীন বট, গভীর অরণ্য, অতল নদী বা অটল পাহাড় যেমন করে তার পত্র-প্রচ্ছায়ে, জলের তলায় বা নিঃসঙ্গ শিখরে কাল আর ইতিহাসকে ধরে রাখে, এঁর জ্ঞানে, স্মৃতিতে আর ব্যক্তিত্বে তেমনই যেন এই রহস্যপুরীর বহু কাহিনি সঞ্চিত আছে।

'পিসিমা সবরকম আধুনিকতার বিরোধী', রমলা দেবী বলছিলেন ফিসফিস করে, 'তাই ওঁব ঘরে ইলেকট্রিক আলো পর্যন্ত লাগাতে দেননি। আজকাল আর চলাফেরা করতে পারেন না। তাই স্থাপিত বিগ্রহ শ্যামরায় আর রাধা-রানিকেও এনে বসিয়েছেন এই ঘরে। কানে ভালো শোনেন না, চোখের জ্যোতিও কম, তবু দেখছেন না—এখনও, এত রাত্রেও ভাগবত পুঁথিখানা খুলে রেখেছেন?'

দেখছিল, পূর্ণেন্দু অবশ্যই দেখছিল। এ-ঘরের পরদাটা থেকে-থেকে উড়ে ঘরখানাকে অনাবৃত করে দিচ্ছিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যে-জরাজীর্ণ মহিলা বসে আছেন, তাঁর বসবার আড়ষ্ট ভঙ্গি ওর চোখ এড়ায়নি। ভালো করে এ-বয়সে উনি আর বসতেও পারেন না, সে সহজেই বুঝেছিল, নইলে আর পিঠের

কাছে, ঘাড়ের কাছে বালিশগুলোই বা নেবেন কেন। ওঁর পাশেও তাকিয়া, যে-হাতে ভাগবতের পুঁথি সে-হাতটিও তাকিয়াতেই ন্যস্ত। পুঁথিটি সামনে একটি ডেস্কের ওপরে রাখা। চোখে পুরু চশমা।

যে-বিড়ালটি মাত্র বিঘতখানেক দূরে প্রসাদের থালা চাটছিল, তাকেও দেখতে পেয়েছিল পূর্ণেন্দু। সাহস তো কম নয় বিড়ালটার। ওই তো বিমলা দেবী মোটে আধহাত মাত্র দূরে—অথচ নির্ভয়ে প্রসাদে মুখ দিয়েছে?

পূর্ণেন্দু বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু বিস্ময়কে নিরস্ত করার যুক্তিও সে খুঁজে পেয়েছিল। নিষ্ঠা আর ভক্তি যতই থাক, আচারে যতই থাক আস্থা—নিঃসন্তান বালবিধবা আর চিরকুমারীদের একটি দুর্বলতার কথা সে জানে—জীবে মায়া। কুকুর-বিড়ালকে এঁরা ভালোবাসেন, আদর করেন। এই বিড়ালটির প্রতিও নিতান্ত মায়াবদ্ধ বলেই প্রশ্রয় না দিয়ে বিমলা দেবীর উপায় নেই। ইশারায় ওকে দাঁড়াতে বলে রমলা দেবী খালি পায়ে ঢুকলেন ঘরে। পূর্ণেন্দু দেখল চকিতে বিড়ালটা লাফ দিয়ে জানালায় গিয়ে উঠল। জোরে, প্রায় চেঁচিয়েই রমলা ডাকলেন, 'পিসিমা!'

পূর্ণেন্দু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। প্রথমবার সাড়া পেলেন না রমলা, আবার ডাকলেন, 'পিসিমা!'

এবার যেন দূর থেকে ক্ষীণ উত্তর ভেসে এল, 'উঁ!'

'আপনার পুজো সারা হয়েছে?'

'একটু বাকি আছে।'

'পিসিমা, আজ বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন।'

'অতিথি? বেশ তো, আদর-যত্ন করো।'

'পিসিমা, ইনি পুলিশের লোক।'

'পুলিশ? পুলিশ কেন? সনাতন কি কিছু চুরি করে—।'

'না-না। কমলা ওঁকে ডেকে এনেছে। কমলা ভয় পেয়েছে।'

'ভয়? কমলা বড় ভিতু।'

'কমলা এখনও কিন্তু ঘুমোচ্ছে। পিসিমা আপনি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবেন? ডেকে আনি?'

'না-না। ডেকো না, পুজো এখনও সারা হয়নি। আর ওঁর জামাকাপড় কেমন কে জানে। যদি আ-ছাড়া হয়? আমি বরং—বরং পরে কথা বলব।'

'পিসিমা আপনার বালিশগুলো সরে গেছে। ঠিক করে দিই?'

'দাও।'

'রাত্তিরে কী খাবেন, দুধ? এখানে পাঠিয়ে দেব?'

'দিয়ো।'

'সনাতন বাড়ি নেই। পরে এসে ও আলো নিবিয়ে দেবে, কেমন?'

'বেশ।'

রমলা দেবী বেরিয়ে এলেন। পূর্ণেন্দুকে কিছু বলতে হল না। সব কথাই সে শুনেছিল। বিমলা দেবী অত্যন্ত ক্লান্ত, নির্জীব গলায় যে-কয়টি কথা বলছিলেন, তাও। কথা বলতে ওঁর অসুবিধা হয়, তা-ও বুঝেছিল পূর্ণেন্দু। ওঁর বুঝি উপরের পাটিতে দাঁত একটাও নেই। বারবার জিভ ঠেকাচ্ছিলেন তালুতে, তাতে কয়েকটি বিকৃত স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। ফোকলা দাঁতে বৃদ্ধ বয়সে যে-বাচনভঙ্গি হয়, হুবহু তাই।

রমলা বললেন, 'এবার কমলার ঘরে যেতে পারেন। এতক্ষণে ও বোধহয় উঠেছে। তবে সাবধান।'

'সাবধান কেন?'

রমলা হেসে বললেন, 'কবিতা শুনিয়ে দিতে পারে। কমলা একজন মহিলা-কবি, জানেন না!'

পূর্ণেন্দু সসঙ্কোচে বলল, 'কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম।'

'থাকলেও জানতেন না। ওর কবিতা কোথাও ছাপা তো হয় না। সব ফেরত আসে। তবু লেখে। একবার ঘটা করে নিজেই খরচ করে একটা বই ছেপেছিল। কিছু বিলিয়েছে, কিছু পোকায় কেটেছে, কিছু পড়ে আছে এখনও নীচের গুদামঘরে। বিক্রি হয়নি।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ও।'

'এই অভ্যাস ও পেয়েছে জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে। জ্যাঠামশায়—মানে অনন্ত রায়েরও এই স্বভাব ছিল কিনা! তিনি অনেক ছড়া লিখেছিলেন, পালা বেঁধেছিলেন।'

পূর্ণেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি! আমি তো জানি, উনি একজন শাঁসালো জমিদার—।'

'সে তো পৈতৃক। পরে অবশ্য সম্পত্তির আয় আর পরিমাণ বাড়িয়েও নিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর ভিতরে একটি কবিও ছিল। প্রকৃতিতে খুব কোমল ছিলেন জ্যাঠামশাই। আমার বাবা ঠিক উলটো।'

এই পরিবারের বিচিত্র ইতিহাসের আরও কিছু জেনে নেবে বলে ঔৎসুক্য হয়েছিল পূর্ণেন্দুর, কিন্তু রমলা সে-অবসর দিলেন না : 'আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে—যাই জলখাবার নিয়ে আসি।' বলে তরতর করে নীচে নেমে গেলেন।

পূর্ণেন্দু আস্তে-আস্তে পরদা ঠেলল কমলার দরজার।

তিন

কমলা সত্যিই ঘুম ভেঙে উঠেছিলেন।

ছোট টেবিলটিতে বসে কী যেন লিখছিলেন, পূর্ণেন্দুকে দেখে লজ্জিত হেসে কাগজ লুকোলেন। পূর্ণেন্দু অনুমান করল, কবিতাই হবে।

কমলা ওঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। পূর্ণেন্দু দেখল, আকারে ইনিও রমলার মতোই দীর্ঘ হবেন, বর্ণেও গৌর, তবে রমলার মতো ফ্যাকাশে পাণ্ডুর নন। সবচেয়ে অবাক হল পূর্ণেন্দু কমলার চোখ দেখে। মণি দুটি কেমন যেন আবিল, আচ্ছন্ন। কমলা স্মিত মুখে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই হাসির ভঙ্গি যেন কেমন অস্বাভাবিক।

রমলার গালের হাড় দুটি যেমন উঁচু কমলার তেমন নয়, কিন্তু চোখের কোলে কয়েকটি রেখা আর কালি।

কমলা বললেন, 'আসুন আ-প-নি—।'

'আমি পুলিশ থেকে আসছি। আপনি কি ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে ফোন করেছিলেন?'

পলকে কমলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন চৌধুরী আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। বিপদে পড়ে—।'

পূর্ণেন্দু একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল : 'কমলা দেবী, আমি আপনার বিপদ দূর করতেই এসেছি। কী বিপদ, আমাকে একটু খুলে বলবেন?'

চোখে সেই অস্বচ্ছ বিহ্বল দৃষ্টি, কমলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনাকে কি বোঝাতে পারব আমি! এ বিপদ আছে আমার অনুভবে।'

ধোঁয়াটে কথা, পূর্ণেন্দু নিজেই বিপন্ন বোধ করল। প্রথম থেকেই তার যা মনে হয়েছিল ব্যাপারটা সত্যিই হয়তো তাই। ভদ্রমহিলা হয়তো অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ—স্নায়বিক রোগগ্রস্ত, সহজেই ভীত, ত্রস্ত, বিহ্বল। এই জাতীয় কবিপ্রকৃতির মেয়েরা যা হয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করে বিশেষ ফল হবে না জেনেও সে বলল, 'তবু যদি একটা আন্দাজ দেন!'

নেশাগ্রস্তের মতো কমলা কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। চোখ তুলে চেয়ে যখন কথা বলতে শুরু করলেন, পূর্ণেন্দুর চকিতে সন্দেহ হল, যেন কমলা নয়, যেন তার মুখ দিয়ে অন্য কেউ কথা কইছে।

ক্লান্ত, ভাঙা-ভাঙা গলায় কমলা বলছিলেন, 'কী বিপদ, তা কি বলে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব? আপনি কি টের পাননি? রমলা আপনাকে কিছু বলেনি? বিপদ এই বাড়ির নিশ্বাসে। এর প্রতিটি ইটের ফাটলের কনকনে বাতাসে।'

'এ-ধারণা আপনার কেন?'

কমলা বললেন, 'কী জানি কেন। হয়তো এই বাড়ির আয়ু পূর্ণ হয়ে গেছে। এর হয়তো এখন মৃত্যুই মঙ্গল। জানেন, নির্দিষ্ট আয়ুকে অতিক্রম করার চেষ্টাও করতে নেই। সেই চেষ্টাই বিপদ ডেকে আনে। সময় পূর্ণ হলে নীরবে চলে যাওয়াই ভালো। এই বাড়ির কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। একে একদিন যেতেই হবে। একগুঁয়েমি করে আজও টিকে আছে। যেদিন যাবে, সেদিন এই মৃত্যু-ফাঁদে আমরা সবাই পিষে যাব, মরব।'

মন্ত্রমুগ্ধের স্বরে কমলা আবার বললেন, 'আমরা সবাই মরব। জানেন, আমার কেবলই মনে হয় কোনও অশরীরী আত্মা ভর করেছে এ-বাড়িতে। চারদিকে খালি ফিসফিস শুনি। অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটছে এখানে। সেদিন কী হয়েছে জানেন? বারান্দা দিয়ে সন্ধ্যার পর হাঁটছি। রমলার ঘরে স্পষ্ট শুনলুম, কারা যেন কথা কইছে। কারা? কান পাতলুম দরজায়। একটা গলা চিনতে পারলুম, পিসিমার। আর-একটা রমলার। আশ্চর্য, রমলার ঘরে পিসিমা নেই তো! ঠিক তখনই পিসিমার ঘরে সোজা গিয়ে ঢুকলুম। তিনি তো যেমন থাকেন, তেমনই পূজার আসনে বসে আছেন। জানেন, সেদিন থেকেই আমার দৃঢ়মূল বিশ্বাস হয়েছে যে, কোনও অশরীরী কাণ্ড এ-বাড়িতে ঘটছে। আরও ঘটবে। ভয় পেয়েছি কি সাধে!'

পূর্ণেন্দুর আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিল না। এই ভদ্রমহিলা অন্তত অংশত অপ্রকৃতিস্থ, এ-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আর ছিল না।

ঠিক তখনই নীচে কার প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সিঁড়ি দিয়ে শিস দিতে-দিতে কে যেন উঠছে। কমলা বললেন, 'সুব্রত। পিসিমার ভাশুরপো। এই বুঝি ফিরল।'

সুব্রতর নাম আগেই শোনা ছিল পূর্ণেন্দুর। এবার চাক্ষুষ পরিচয় হল। কুড়ি কিংবা বাইশ বছরের যুবক। একটা নীল হাফ-শার্ট গায়ে, পরনে ট্রাউজার, কলেজের আর-দশজন ছাত্র যেমন হয়ে থাকে। একটা হকিস্টিক ছিল সুব্রতর হাতে, সেটাকে দরজার কোণে রাখতে-রাখতেই সে বলছিল, 'ঝড়-জলে আটকা পড়ে গিয়েছিলুম।' ঠিক তখনই তার চোখ পড়ল পূর্ণেন্দুর দিকে। সুব্রত অপরিচিত লোক দেখে থমকে দাঁড়াল।

কমলা পরিচয় করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ যেন করল না সুব্রত। সে কমলার দিকেই চেয়ে-চেয়ে বলতে থাকল, 'বড়দি, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবে?'

'পঞ্চাশ টাকা, এত টাকা কেন?'

'কলেজের সোশ্যাল হবে যে, ওরা সবাই ধরেছে।'

'তোমার তো ফি-মাসেই একটা না একটা লেগে আছে। এত টাকা আসে কোথা থেকে শুনি!'

'লেগে থাকবেই তো। আরও কত টাকার দরকার আমার জানো? নভেম্বরে সবাই মিলে এক্সকারশনে বেরুব। তখন আমার কিন্তু কমসে-কম তিনশো টাকা চাই, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।' পরপর আরও কয়েকটা টাকার ফিরিস্তি দিল সুব্রত।

শেষ পর্যন্ত রাগ করে কমলা বলে উঠলেন, 'আমাকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ নেই, সুব্রত। তোমার আপন জ্যাঠাইমা আছেন, তাকে বোলো।'

কথা না বাড়িয়ে সুব্রত ভিতরের দরজা দিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল 'যাই, চান করে আসি।'

'চান করবি এই শীতে? তুই কি পাগল?'

'ঘামে শরীর জবজবে হয়ে গেছে যে।'

সুব্রত চলে যেতে কমলা পূর্ণেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন, 'খালি টাকা আর টাকা। কোথা থেকে যে আসবে, ছেলেটা একেবারে বোঝে না। সম্বলের মধ্যে তো এই পৈতৃক বাড়ি। এটাকে বিক্রি করতে চাই—আমিও চাই, রমলাও চায়। কিন্তু পিসিমা চান না একেবারে। এই বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়বেন না। অথচ বাড়িটা বিক্রি করে ছোট একটা বাসায় যদি উঠে যাই—।'

একটু থেমে কমলা বললেন, 'সুব্রতকে তাই তো বলি, তুমি বাপু তোমার নিজের জ্যাঠাইমাকে বলে-কয়ে রাজি করাও। পিসিমাই ওকে ছেলেবেলা এ-বাড়িতে এনে রেখেছেন কিনা! মানুষ করেছেন।'

রমলা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। একবার নীচে আসবেন?'

চার

নীচের ঘরেই পূর্ণেন্দুর বিছানা হয়েছিল। আজ রাত্রে রাস্তার যা অবস্থা, ফেরবার কথা মনে আনাও যায় না। তা ছাড়া কাল সকালে সে দিনের আলোয় বাড়িটাকে ভালো করে দেখবে, আরও খোঁজখবর নেবে বলে স্থির করে রেখেছিল।

দেওয়ালে কয়েকটা বাঘের মাথা আর হরিণের শিং সাজানো। তাদের ছায়া আরও বিস্তৃত হয়ে মেঝের কার্পেটে পড়েছিল।

ঘুম এসেছিল পূর্ণেন্দুর, কিন্তু রমলা ছোট একটি মোড়া পেতে বসেছিলেন ওর ঘরেই, মাথা নিচু করে উল বুনছিলেন। মাঝে-মাঝে কথাও বলছিলেন রমলা। এ-বাড়ির ইতিহাস। একদিন কত গৌরব, কী ঐশ্বর্য ছিল এই বাড়ির। শৌর্যও কম ছিল না। রমলার বাবা ছিলেন মস্ত শিকারি—এই যে দেয়ালে বাঘের মাথা আর ভালুকের চামড়া—সব তারই স্মৃতি।

পূর্ণেন্দু জড়িত গলায় বলল, 'ও।' তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। ঝনঝন করে ওপরের কোনও ঘরে যেন সব ক'টা শার্সি ভেঙে পড়ল।

পূর্ণেন্দু ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। অভ্যাসবশতই সে হাত দিয়েছিল নীচের ব্রাকেটে, যেখানে রিভলভার গোঁজা আছে। উত্তেজিত স্বরে পূর্ণেন্দু বলে উঠল, 'গুলির শব্দ।'

রমলার মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গিয়েছিল। রমলা ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। লোক-লজ্জা ভুলে পূর্ণেন্দুকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন।

পূর্ণেন্দু তাঁকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রিভলভারটা হাতে বাগিয়ে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। চাপা গলায় রমলাকে বলল, 'আপনি আমার পেছনে-পেছনে আসুন।'

দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে কাঁপছিলেন কমলাও। সুব্রত—মুখ রক্তিম, চুল বিশৃঙ্খল—বেরিয়ে এল বিমলার ঘর থেকে। তার রুদ্ধ গলা থেকে মাত্র একটি শব্দই বেরিয়ে এল, 'জ্যাঠাইমা।'

পূর্ণেন্দুও ছুটে সেই ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল। দেখার অবশ্য আর কিছু ছিল না। উঁকি দিতেই সব স্পষ্ট হল। যেখানে ছিলেন বিমলা দেবী, ঠিক সেখানেই আছেন। তেমনি রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে, ধ্যানাসনে, শুধু তাঁর মাথাটি বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

পিছন দিকে তাকিয়ে পূর্ণেন্দু বিহ্বল গলায় বলে উঠল, 'একজন ডাক্তার পাওয়া যায় না!'

তখনই কোনও ডাক্তার পাওয়া গেলেও লাভ হত না। বিমলাকে স্পর্শ করেই পূর্ণেন্দু টের পেয়েছিল বিমলার দেহে প্রাণ নেই। ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ওরাও। কমলা, রমলা আর সুব্রত। সকলেরই মুখ আতঙ্কে পাণ্ডুর। চোখের মণি বিস্ফারিত। এ-ওর মুখের দিকে চাইছিল আর কানাকানি করছিল।

'কে! কে!' বলছিলেন রমলা। কমলার দৃষ্টিতেও সেই প্রশ্নই ছিল। সুব্রত এগিয়ে গেল জানালার দিকে, যেখানে শার্সিগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। কী একটা কুড়িয়ে এনে সে পূর্ণেন্দুর হাতে দিল।

পূর্ণেন্দু বলল, 'গুলি? জানালার কাছেই পড়ে আছে যখন, তখন গুলিটা নিশ্চয় ভেতরের দিক থেকেই এসেছে। অর্থাৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেউ তাক করে বন্দুক ছুড়েছে।'

কিন্তু কে? একটা শিহরণ হিল্লোলিত হয়ে গেল সেই পরিবেশে। নিস্তব্ধতা দীর্ণ করে রমলা অকস্মাৎ কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'কে! কে মারল পিসিমাকে? এইরকম নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করল কে?'

আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে কমলা বললেন, 'জানি না।'

তীক্ষ্ন গলায় আবার বলে উঠলেন রমলা, 'কিন্তু তোমরা দুজনই তো মাত্র ওপরে ছিলে। তুমি আর সুব্রত। তোমরা নিশ্চয় জানো।'

কমলা আবার বললেন, 'না, আমরা ঘরে ছিলুম। সুব্রত বই পড়ছিল, আওয়াজ শুনে আমরা বেরিয়ে এসেছি।'

রমলার চোখ জ্বলছিল, সেই চোখে এবার একটি ইঙ্গিতও খেলে গেল। অতি ধীরে প্রায় চিবিয়ে-চিবিয়ে রমলা উচ্চারণ করলেন, 'তোমরাই কেউ নও তো?'

কমলা ভয়ার্ত পাণ্ডুর, আরও কুঁকড়ে আরও পিছিয়ে গেলেন : 'আমি? আমি এই কাজ করব?'

সুব্রত বলে উঠল, 'আমি হত্যা করব আমার জ্যাঠাইমাকে? কেন ছোড়দি, কেন?'

অতি স্পষ্ট কণ্ঠে রমলা উচ্চারণ করলেন, 'তোমার টাকার দরকার ছিল।' বলতে-বলতে হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রমলা, রুদ্ধস্বরে বলে গেলেন, 'জানি, আমি জানি। তুমি কুসংসর্গে মিশছ। বাজি ধরে তাস খেল। তোমার রোজই টাকার দরকার। কমলার লেখা কেউ ছাপায় না। তাই নিজেই একটা কাগজ বার করবার ফন্দি আঁটছিল। কিন্তু টাকা ছিল না, একমাত্র উপায় এ বাড়ি বিক্রি করা। অনেক বুঝিয়েও তোমরা পিসিমাকে রাজি করাতে পারোনি। তিনিও এ-বাড়ির একজন শরিক। সেটাই ছিল তোমাদের আক্রোশ। সেই আক্রোশেই তোমরা তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছ।'

এই বিচিত্র কলহে পূর্ণেন্দুর রুচি ছিল না। সে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করছিল ঘরটাকে। একবার দরজার স্কাইলাইটের দিকে তাকাল, চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। গম্ভীর গলায় বলল, 'চেঁচামেচি করবেন না। আজ রাত্রে কোনও উপায় নেই। কাল সকালে যতক্ষণ না ডাক্তার আর পুলিশ এসে পড়ছে ততক্ষণ এ-ঘর আমিই আগলাব। আপনারা তিনজনেই ও-ঘরে গিয়ে বসুন। শুধু এই অনুরোধ, আমার অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বেরোবেন না।'

পাঁচ

পরদিন সকালে পূর্ণেন্দু টেলিফোনে পুলিশকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিল। ডাক্তারও এসেছিলেন। একটা গাড়িতে ওরা তুলে দিল মৃতদেহ। ডাক্তার যাওয়ার আগে ফিসফিস করে পূর্ণেন্দুকে কী বললেন। কেউ শুনতে পেল না। পূর্ণেন্দুর মুখভঙ্গি দৃঢ়তর হল মাত্র।

ওদের রওনা করে দিয়ে ফিরে এল পূর্ণেন্দু, যে-ঘরে কমলা, রমলা, সুব্রত বসেছিল। অনিদ্রাজড়িত ক্লান্তির ছাপ সকলের মুখে, শোকেরও ছায়া, চোখের কোলে কালি। পূর্ণেন্দু প্রথমে কমলাকে ডাকল বাইরে। কঠিন গলায় কিছুক্ষণ জেরা করল। ডাকল সুব্রতকেও। সবশেষে ইশারায় ডাকল রমলাকে, অনেকটা দূরে বারান্দার এককোণে ডেকে নিয়ে এল। গম্ভীর কিন্তু শান্ত গলায় বলল, 'আমার গাড়িটা তৈরিই আছে, রমলা দেবী, আপনিও তৈরি হয়ে নিন।'

রমলা বলে উঠলেন, 'সে কী! কেন? আমি কোথায় যাব?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'কেন, থানায়। আপনার পিসিমার মৃত্যু সম্পর্কে আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করবার আছে রমলা দেবী।'

'আমাকে? আমি কী জানি?'

পূর্ণেন্দু আগের মতোই নির্বিকার কিন্তু স্থির কণ্ঠে বলল, 'আপনি সবই জানেন। এই মৃত্যুর সঙ্গে আপনি কারণ হিসাবে জড়িত এ-কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে।'

অপ্রকৃতিস্থের মতো রমলা হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'পূর্ণেন্দুবাবু, আপনি হয় মূর্খ নয় তো পাগল। ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি নীচেই ছিলাম, আপনিই তার সাক্ষী।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু এই বস্তুটা কী রমলা দেবী?' বলতে-বলতে পূর্ণেন্দু পকেট থেকে যেটা বার করল সেটা একটা অ্যালার্ম ঘড়ি। তার সঙ্গে 'তার' দিয়ে একটি রিভলভারের ট্রিগার জড়ানো। পূর্ণেন্দু আবার অবিচল গলায় বলল, 'এটা কী? এটা আমি স্কাইলাইটে পেয়েছি। এতে সময় দেখানো আছে ঠিক এগারোটা।'

মুখ ঢেকে রমলা বসে পড়েছিলেন। হাত সরিয়ে হঠাৎ আবার হিংস্র গলায় বলে উঠলেন, 'প্রমাণ কি এই একটাই? মোটিভ কোথায় পূর্ণেন্দুবাবু?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তাও আছে। স্থির হয়ে বসুন, আপনাকে বলছি। গোপনে-গোপনে আপনি শেয়ার কিনে লোকসান খেয়ে যে একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন এ-খবর আপনাদের ঠাকুরই আমাকে বলেছে। ওই লোকটিই আপনার এজেন্ট ছিল কিনা। দুটো ধমক দিতেই ও সব কবুল করতে পথ পায়নি। এ-বাড়ি বিক্রি করাতে আপনারও স্বার্থ কারুর চেয়ে কম ছিল না। ঠাকুর আর চাকরকে বাড়ি থেকে আপনিই কাল ছুটি দিয়েছিলেন। কমলাকেও কি ড্রাগ স্টোরে পাঠিয়েছিলেন আপনিই? আর সেই অবসরেই কি কাজটা হাসিল করেছিলেন?'

বাধা দিয়ে রমলা বললেন, 'কিন্তু তার পরেও তো পিসিমা বেঁচেছিলেন, আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আপনি শুনেছেন।'

পূর্ণেন্দু বলে উঠল, 'আঃ রমলা দেবী, আপনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। আমি যদি বলি, আমি আপনার পিসিমার কথা শুনিনি, যে-গলা শুনেছি সেটা আপনারই? দরজায় পরদা ছিল, আপনি আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হরবোলার মতো নিজেই কথা বলেছিলেন নিজের সঙ্গে? কমলা দেবী যে ভয় পেয়েছিলেন সে-তো এই জন্যেই। এ-বাড়িতে অশরীরী অস্তিত্বের কথা তাঁর কল্পনায় এসেছিল, আপনার ঘরে আপনার পিসিমার গলা শুনে। অথচ আপনার পিসিমা সে-ঘরে ছিলেন না। রমলা দেবী, আপনি কি মহড়া দিচ্ছিলেন, ফোকলা দাঁতের ফ্যাঁসফেসে কথা কেমন শোনায়? আপনার পিসিমার কথা বলার ধরন নকল করছিলেন? এই পরিকল্পনা আপনার তো তবে অনেকদিনের। হত্যাকাণ্ডটা তাহলে সুপরিকল্পিত। ভাগ্যক্রমে আমি না এসে পড়লে এই অভিনয় আপনি হয়তো অন্য কাউকে শোনাতেন। কমলা দেবীর মুখে অশরীরী স্বরের কথা শুনেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়, পরে ডাক্তারের কাছে আমার সন্দেহেরই সমর্থন পেলাম। তিনি বলে গেছেন, বিমলা দেবীর মৃত্যু রাত এগারোটায় ঘটেনি, তিনি মারা গেছেন অন্তত তারও চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে। সম্ভবত বিষ প্রয়োগের ফলে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সেটা চূড়ান্তভাবে জানা যাবে। এই গুলির ব্যাপারটা একেবারেই সাজানো। আপনার অ্যালার্ম ঘড়ির টাইমিং কিন্তু পারফেক্ট। কিন্তু কোনও কাজ হল না, রমলা দেবী। অত তাড়াতাড়ি কমলা আর সুব্রতকে জড়াতে গিয়ে আপনি নিজেকে কিন্তু বড় সহজে ধরা দিয়ে ফেললেন। ফাঁসিকাঠে ওদের তুলে দিতে আপনার আগ্রহ দেখে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হল। ...আর-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। বালিশগুলো ঠিক করে দেওয়ার নাম করেই কি আপনি আপনার পিসিমার দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে এসেছিলেন? ওখানে তো আমি ছিলাম না। আমি দেখতে পাইনি।'

রমলার চোখ জ্বলছিল, কোনও উত্তর এল না।

পূর্ণেন্দু একটু থেমে আবার বলল, 'তাছাড়া হত্যা তো আপনার রক্তে, রমলা দেবী। আপনার বাবা বড় শিকারি ছিলেন, দেওয়ালে বাঘের মাথা আর হরিণের শিংগুলোই তার সাক্ষী। আপনাকে গুলি ছুড়তে তিনিই হয়তো শিখিয়েছিলেন। এ-বাড়ির অন্য কারও হাতে সে-সুযোগ ছিল না।'

রমলা এবারও কোনও উত্তর দিলেন না।

পূর্ণেন্দু বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি করুন, রমলা দেবী।'

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৫৯



সংঘাত

প্রবীরগোপাল রায়

মির্জাপুর স্ট্রিটের অভিজাত খাবার দোকানে ঘেরা-জায়গাটিতে বসে কাজল ভালো করে অদ্রীশকে দেখার সময় পেল। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কেটেছে এতক্ষণে। মিনিটপাঁচেক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ করে বাইরে বেরিয়েছে, এমন সময়ে গেটের পাশ থেকে অদ্রীশ ওকে ডাক দিয়েছিল। বোঝাই যায় এ-সাক্ষাৎকে দৈবের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ওকে ওর 'দিশদার' এতদিন পরে হঠাৎ কী দরকার পড়ল তা বারদুয়েক প্রশ্ন করেও জানতে পারেনি। কুশল প্রশ্নের বিনিময় সমাপ্ত। এইবার আসল কথাটা কীভাবে পাড়বে তাই বোধহয় ভাবছে অদ্রীশ। চশমার আড়ালে চোখের দৃষ্টি নত। দিশদার চেহারা খুব বদলায়নি, ভাবল কাজল। মাথার চুল কপাল থেকে একটু পশ্চাদপসরণ করেছে, চেহারা ভারী হয়েছে সামান্য—আর কিছু নয়। চল্লিশের চেয়ে কি বেশি বয়স ওঁর। 'কৃষ্ণা চৌধুরী নামে কবিতা লেখে এমন কারও নাম শুনেছিস?' জিগ্যেস করল অদ্রীশ।

'না। হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

অদ্রীশ কিছু জবাব দেওয়ার আগেই আচমকা কাজল বলে বসল, 'নাম শুনে মনে হয় আমাদের কোনও বোন।'

আইসক্রিমের পাত্রে চামচটা রেখে দিয়ে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে এক জায়গায় সেটা খুলে কাজলের দিকে বাড়িয়ে দিল অদ্রীশ, 'পড়ে দ্যাখ।'

গুটিতিন-চার কবিতার নকল। পাশে-পাশে কবে কোথায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাও উল্লিখিত। সব ক'টিই বেরিয়েছে গত তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকায়।

কাজল একে-একে পড়ে আর ওর বিস্ময় বেড়ে চলে। শ্লথ কিন্তু উত্তপ্ত কাব্য। চিত্রকল্প একান্তভাবে ব্যক্তিক। শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ সুপ্রচুর। একটি কবিতায় 'সহজ' শব্দটিকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। সহজ, সহ-জ এবং স-হজ—তীর্থযাত্রার পুণ্য সমেত। ভাব নয়, রূপের দিক থেকে এ-কাব্যের সঙ্গে আর-একজনের কাব্যের অভূত দৃশ্য হঠাৎ দেখতে পেল কাজল। কিন্তু দ্বিতীয়জন আট বৎসর পূর্বে মৃত।

নোটবইটা ফেরত দিয়ে কাজল বলল, 'ভারি মজার ব্যাপার। ছোড়দির কবিতা অনুকরণ করার মতো লোকও বাংলা সাহিত্যে আছে।'

'কবিতারও অনুকরণ হয়!' প্রশ্নটি ভাবতে কয়েক-মুহূর্ত সময় নিল অদ্রীশ, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'ও-কবিতা অসিতারই লেখা।'

'আপনি এই বলে বেড়ান আর লোকে অসিতা গাঙ্গুলিকে ফোর-টুয়েন্টি মনে করুক।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর মুখে ওই বোম্বাই মার্কা ভাষা শুনে বিচলিত হলেও ওর কথার ইঙ্গিত বুঝতে অদ্রীশের অসুবিধে হয়নি। মৃত লেখকের পুনর্জীবন লাভ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। যে-কবি আজ থেকে আট বৎসর পূর্বে মৃত বলে বিজ্ঞাপিত, তাঁরই কলম থেকে বেরুনো বলে এখন যদি লোকে কৃষ্ণা চৌধুরীর কবিতাগুলিকে সন্দেহ করে তাহলে তারা স্বভাবতই ধরে নেবে অসিতার মৃত্যু-সংবাদটা ব্যবসায়িক কৌশলমাত্র। অসিতা নাম্নী কোনও মহিলা আদৌ ছিলেন না, এমনও মনে হবে।

কিন্তু কোথাও একজন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে এ তো অদ্রীশ জেনেছে। পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে ছুটে গিয়েছিল কৃষ্ণা চৌধুরীর ঠিকানা জোগাড় করতে। ঠিকানা জোগাড় হয়েছে, কিন্তু সেসব ঠিকানাই কল্পিত। কেন এমন হয়?

কাজলের কথায় চমক ভাঙল।

'দিশদা, আপনি রাজীববাবুর কাছে গেলে উনি বলতে পারেন হয়তো যে, ছোড়দির অপ্রকাশিত কবিতা কেন কৃষ্ণা চৌধুরীর নামে বেরুচ্ছে।'

'কে? রাজীবলোচন মুখার্জির কথা বলছিস? তাঁর সঙ্গে এ-ঘটনার কী সম্পর্ক?'

'ছোড়দি নিজের সমস্ত কবিতা ওঁকেই দিয়ে গেছে। কবিতার বইটা তো উনিই প্রকাশ করেছেন।'

অদ্রীশের কাছে সংবাদটি অপ্রত্যাশিত। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল ও।

'রাজীববাবুর ঠিকানা জানিস?'

'প্রকাশকদের কাছে চেয়ে নেবেন। বাবাও জানতে পারে।'

দুই

চৌধুরী জমিদারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেয়ে রাজীববাবু প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। গ্রামে মেয়েদের স্কুল ছিল না বলে অসিতার মা নিজে ডেকে পাঠিয়ে মেয়েদের শিক্ষার ভার রাজীববাবুর হাতে দিয়েছিলেন।

অসিতা বলত, 'মাস্টারমশাইয়ের কাছে শিখেছি জীবনকে আর জীবনের যা-কিছু ভালো তাকে ভালোবাসতে।'

অদ্রীশ পরিচয় দিতেই রাজীববাবু চিনলেন। ছেলেমানুষের মতো একটি হাত ধরে টানতে-টানতে ওকে ঘরে নিয়ে বসালেন। তক্তপোশের ওপর বই-খাতা সব ছড়ানো। হাত দিয়ে একপাশে সেগুলো ঠেলে সেখানেই বসল ও।

'আমার অসিতাদিদির মুখে আপনার কথা শুনেছি। ইদানীং বলত, ''মা গিয়ে আমার আত্মীয়ের মধ্যে এক দিশদা।'' '

'আর বান্ধবের মধ্যে মাস্টারমশায়।'

সলজ্জ হেসে রাজীববাবু উড়িয়ে দিলেন অদ্রীশের কথা।

দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসে দেখে যাও কে এসেছেন।'

মোটাসোটা চেহারার রং ময়লা একজন গিন্নি বেরিয়ে এলেন দরজার আড়াল থেকে। মাথায় কাপড় নেই। গায়ে সোনার ভারী গহনা। মুখে পান। রাজীববাবুর পাশে কেমন ভালো লাগল ওঁকে। নিরাসক্ত মুখে অদ্রীশের পরিচয় শুনলেন। প্রতি-নমস্কার করাটা উচিত সে-খেয়াল করলেন না।

দশ বছর আগে অসিতার যখন বিয়ে হয়নি, তখন সে এর কাছে কীরকম ব্যবহার পেয়েছে না জানি, মনে-মনে ভাবল অদ্রীশ।

'কী খাওয়াচ্ছ আজ আমার এই ভাইটিকে?'

বলাবাহুল্য, ভাইটির প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন রাজীববাবু। গিন্নি রান্নাঘরে যেতে অদ্রীশ আরম্ভ করল নিজের কথা।

'দেখুন, অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'হবে এখন সে-কথা। আপনাকে যা দেখাচ্ছি আগে দেখুন।'

তক্তপোশের তলায় রাখা একটা টাঙ্ক থেকে একটা ফাইল বেরুল।

'কাগজে-কাগজে অসিতার বই-এর কী সুন্দর সব সমালোচনা বেরিয়েছিল দ্যাখো।' ফাইলটা ওর হাতে দিতে-দিতে বললেন, 'তোমায় আর ''আপনি'' বলব না।'

দু-একটা কাটিং অদ্রীশ পড়ে দেখল। একজন লিখছেন :

> *গ্রন্থখানির 'শবরী' নামকরণ লেখিকার মনোভঙ্গির যথাযথ পরিচায়ক। কবিতাগুলির মধ্য দিয়া সংসারের সংঘাতে আহত একটি নারীহৃদয় তাহার করুণ প্রেমের অর্ঘ অনাগত অভিরামের উদ্দেশে মেলিয়া ধরিয়াছে!...*

'ওর অপ্রকাশিত কবিতাও তো কিছু আছে?'

প্রশ্নের জবাবে রাজীববাবু টাঙ্ক থেকে একটা মোটা বাঁধানো খাতা বার করলেন। একনজরেই ধরা পড়ে, তাতে লেখা কবিতাগুলো একই সময় নকল করা হয়েছে। অপ্রকাশিত কবিতাগুলো দেখা শেষ হলে অদ্রীশ প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে আর কবিতা নেই?'

রাজীববাবু মাথা নাড়লেন।

'অন্য কারও কাছে আছে বলে জানেন?'

'কী ব্যাপার বলো তো? কুচো কবিতা দু-একজনের কাছে নিশ্চয়ই আছে। তোমার কাছেই কি আর নেই? কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর এই আটবছর বাদে কে আর সেগুলোর কথা মনে করে রেখেছে। তা ছাড়া অসিতা সেগুলোকে স্বীকার করে না।'

'সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে। কে বা কারা অসিতার কিছু কবিতা অন্য কবির নামে পত্রিকায় চালাচ্ছে।'

'অসম্ভব।'

পকেট থেকে নোটবইটা বের করে দিল অদ্রীশ। উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল। পড়তে-পড়তে বিস্ময়, অবিশ্বাস ইত্যাদি ভাব খেলা করল রাজীববাবুর মুখে। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। স্বগতোক্তি করলেন, 'আশ্চর্য!'

উৎসাহভরে অদ্রীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। উনি অধৈর্যের সঙ্গে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, 'আশ্চর্য হওয়ার আসল কারণ কোথায় তা তুমি ধরতেই পারোনি।'

অদ্রীশ চুপ।

'তোমার আনা কবিতাগুলো অসিতারই লেখা বলে মনে হয়। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! ভাবের দিক থেকে ওগুলো ''শবরী''র কবির পরিণত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি বলে মনে হয় যে। কিন্তু দুজন কবির কাব্যে রূপগত এত মিল!'

নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল অদ্রীশ। ভাবের পরিণতির ব্যাপারটা এখন ওর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হচ্ছে। সেটা ওর কাছে এতদিন ধরা পড়েনি কেন? ভেবে বুঝল তার কারণ আছে। মহৎ কবির সৃষ্টিতে ভাবের পালাবদল কাব্যের রূপে পরিবর্তন আনে। ভাবের সঙ্গে রূপের সে-মিলন অসিতার সেই কাব্যে কোথায়? রূপের পুনরাবৃত্তি সেখানে ভাব-বৈলক্ষণকে স্পষ্ট করে ধরতে বাধা দিয়েছে। তথাপি, শবরীর প্রতীক্ষা যে শেষ হয়েছে, এ প্রেমস্নিগ্ধ স্বীকৃতি চাপা পড়েনি। শুধু জীবন নয়, আগে প্রেম তারপর জীবন, এই নবীন উপলব্ধির ঘোষণা অস্পষ্ট হতে পারে কিন্তু তা অকৃত্রিম। পরিণত অভিজ্ঞতা? যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে...

অদ্রীশের চমক ভাঙল। রাজীববাবু একটা চিঠি ওকে দেখবার জন্য দিলেন। ও পড়ে গেল :

৩রা অক্টোবর, ১৯৫০

শ্রীচরণেষু মাস্টারমহাশয়,

আমার রচনার উপর আপনারও কিছু অধিকার আছে। সঙ্গের খাতাটায় যে আশিটি কবিতা আছে সেগুলির পরিবর্তন, প্রকাশন ইত্যাদি যাবতীয় স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দিলুম। কখনও ভালো লাগলে ছাপাবেন। আমার অন্য কোনও রচনাকে আমি স্বীকার করি না। আপনি এ-দায়িত্ব নিলে আমি স্বস্তি পাই। প্রণাম জানবেন। ইতি—

অসিতা

অদ্রীশের চিঠিটা পড়া শেষ হলে রাজীববাবু বললেন, 'দিদি আমার যেন বুঝতে পেরেছিল ভগবান ওকে এইবার নিজের কাছে ডেকে নেবেন।'

কিন্তু অদ্রীশ ভাবছিল অন্য কথা। অসিতা মারা গেছে ১৯৫০-এর ৫ অক্টোবর। ভয়ঙ্কর মৃত্যু। রাঁচি থেকে কিছু দূরে মবাইয়ায় তখন অসিতা থাকে। পাটনায় যে-স্কুলে ও শিক্ষকতা করছিল সেখানে পুজোর ছুটি হওয়াতে ও ওখানে গিয়েছিল। ৫ তারিখে ভোরে উঠে ও বেড়াতে বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি। কয়েকশো ফুট গভীর একটা খাদের ধার দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ চলে গেছে। সেই পথে বেড়ানোর সময়ে ও খাদে পড়ে যায়। দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। খাদের নীচে বর্ষ-শেষের খরস্রোতা জলধারা বইছে। ওর পরনের কাপড়খানা খাদের গায়ে একটা গাছে আটকেছিল। দু-পায়ের স্লিপারও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

সেদিন রাজীববাবুর কাছে বিদায় নেওয়ার আগে অদ্রীশ জানিয়েছিল কৃষ্ণা চৌধুরীর ভুয়ো ঠিকানা দিয়ে কবিতা পাঠানোর কথা।

'হাতের লেখা?' প্রশ্ন করেছিলেন রাজীববাবু।

'সব ক'টি কবিতাই সাদা কাগজের ওপর টাইপ করা। প্রত্যেকবারই কলকাতার কোনও-না-কোনও অঞ্চল থেকে সেগুলো ডাকে দেওয়া হয়েছিল।'

বহু পরে, রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে অদ্রীশ জেনেছিল কৃষ্ণার বাবা কলকাতায় কর্মোপলক্ষে এলে কবিতাসুদ্ধ খামগুলো ডাকে দিয়ে দিতেন।

তিন

জমিদারবাড়ির সনাতন-রীতি অনুসারে অসিতার দুই দিদি অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। অসিতার বেলা ব্যতিক্রম হল। রাজীববাবু ওর মার কানে কী মন্ত্র দিলেন, তিনি জেদ করে মেয়েকে কলেজে পড়াবেন বলে কলকাতায় নিজের বাপের বাড়িতে পাঠালেন। অদ্রীশ অসিতার মামার বাড়ির দিক থেকে ওর দূরসম্পর্কের ভাই। কলকাতার দুজনের আলাপ। অসিতা বলত, 'জীবন নয়, জীবন সংগ্রামের দীক্ষা আমার দিশদার কাছে। কেবল ভালোবাসা নয়, গ্রহণ।'

মা-মরা মেয়ে অসিতাকে ওর বাপ বনেদী ঘরের একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বছর না ঘুরতে যখন মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ি এসে উঠল তখন বোঝা গেল রাজীববাবু আর অদ্রীশের শিক্ষাদানের ফল। বোঝার যেটুকু বাকি ছিল তাও পূর্ণ হল যখন অদ্রীশের পরামর্শে পাটনায় একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে অসিতা চলে গেল। বিবাহ-বিচ্ছেদের উপায় থাকলে সেটাও বোধহয় বাদ পড়ত না।

এসব হল প্রায় দশবছর আগের ইতিহাস। অসিতার ছোড়দা রজত চৌধুরী এখন কলকাতার ডাক্তারি করেন। তাঁর ওখানে মেজদা শুভ্র চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়ে অদ্রীশের মনে সংশয় ছিল কেমন অভ্যর্থনা পাবে। ক্রটিহীন মৌলিক আপ্যায়নে শুভ্র চৌধুরী ওকে নিশ্চিন্ত করলেন। সাহস পেয়ে ও কাজের কথা পাড়ল।

'অসিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে মবাইয়া গিয়েছিলেন আপনিই তো?'

'হ্যাঁ।' কঠিন হয়ে গেল শুভ্র চৌধুরীর মুখ : 'কিন্তু অতদিন আগের কথা আর টেনে আনছেন কেন?'

'দুর্ঘটনার ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজানো ছিল না তো?'

'বুঝলুম না।'

'সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে। ও আজও অজ্ঞাতবাস করছে।'

কিছুক্ষণ কেটে গেলে তবে কথা সরল শুভ্র চৌধুরীর মুখে : 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

অদ্রীশ নিজের সন্দেহের কারণ আগাগোড়া বলে গেল। ওর কথা শেষ হতে শুভ্র চৌধুরী ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠলেন : লোকের লেখা এক ধরনের হল বলে আপনি মরা মানুষকে জ্যান্ত করে তুলবেন!'

'কিন্তু কৃষ্ণা চৌধুরী নামটা? মিথ্যে ঠিকানায় টাইপ করে কবিতা পাঠানো?'

পুনর্বার চিন্তার প্রয়োজন আছে বলে শুভ্র চৌধুরী মনে করলেন না।

ওঠবার আগে অদ্রীশ বলল, 'আমি সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বুঝে ছাড়ব।'

'তাতে অসিতার কী উপকারটা হবে? মরে শান্তি পেয়েছে ও।'

'শুভ্রবাবু, আমি নাস্তিক।'

'তাই বোঝেন না যে, কুলবধূর জীবনে মৃত্যুর চেয়েও বড় ক্ষতি আছে।'

'আপনার এ-কথার অর্থ আমি ভেবে দেখব।'

চলে যাচ্ছিল অদ্রীশ। শুভ্র চৌধুরী ডাকলেন। রাগে জ্বলছে তাঁর চোখ।

'এত যদি আপনার শোনার ইচ্ছে তো শুনুন। দুর্ঘটনায় মরেনি অসিতা। তাকে খুন করা হয়েছিল। আর খুনিকে নির্জন রাতে বাড়িতে ডেকে এনেছিল আপনার প্রগতিশীলা ভগ্নীটি।'

নিষ্ঠুর কঠিন শোনাচ্ছিল শুভ্র চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। বিস্ময় সামলে নিয়ে অদ্রীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি দরজার দিকে সঙ্কেত করলেন : 'বেরিয়ে যান এবার।'

চার

চৌধুরীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ নিচু করে হনহনিয়ে হাঁটছিল অদ্রীশ। কাজল এসে ধরল : 'মাগো, রাস্তার লোক প্যাট-প্যাট করে দেখছে। আপনাকে ধরতে প্রায় ছুটে আসছি।'

কাজলের দিকে তাকিয়ে অদ্রীশ হাসল।

'সাজগোজের বাহারটা একটু কম করলে তো আরও আগে এসে ধরতে পারতিস।'

একটু লজ্জিত হল কাজল। সেটা চাপা দিতে অনেক কথা বলল।

'ইস। মেজদার সঙ্গে নীচে তর্কাতর্কি করছিলেন কানে আসছিল। তা আমার সঙ্গে একবার দেখা করে এলে কি মান যেত? নাকি, ছোড়দি ছাড়া আমরা সব পর?'

একটু ভেবে অদ্রীশ বলল, 'চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।' সেদিনের মতো আবার রেস্তোরাঁর একটি নিভৃত কোণে দুজন বসল। কালো মোটা সাপের মতো দুই বিনুনি বুকের ওপর এসে পড়েছে কাজলের। টান-টান হয়ে বসে কাজল বলল, 'আমি আর কচি খুকিটি নেই।'

সকৌতুকে অদ্রীশ বলল, 'আচ্ছা!'

'সব কথা আমি শুনতে চাই।'

'কীরকম?'

'মেজদার সঙ্গে আপনার কী কথা হচ্ছিল?'

একটু চুপ করে থেকে অদ্রীশ কী বলবে ভেবে নিল।

'লোককে যা-ই বোঝানো হোক তোর মেজদা অন্তত আগাগোড়াই জানে যে, অসিতা দুর্ঘটনায় মরেনি।'

'তাহলে কি...'

'তোর মেজদার বিশ্বাস ওকে খুন করা হয়েছিল।'

রুদ্ধনিশ্বাসে কাজল বলল, 'সর্বনাশ!'

একটু দম নিয়ে অদ্রীশ বলল, 'আচ্ছা ধরে নে খুন ও হয়নি। তাহলে কী সমাধান হতে পারে?'

'আত্মহত্যা।' চটপট জবাব এল।

'ঠিক। কিন্তু অসিতার এ-চিঠিটা পড়বার পরও কি তুই বলবি আত্মহত্যা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল?'

নোটবই থেকে বের হওয়া চিঠিটা কাজল পড়ল।

মবাইয়া
৩ অক্টোবর, ১৯৫০

দিশদা,

কী ভালোই লাগছে এখানে এসে। বাংলাদেশে শরতের শিউলিবিছানো সৌন্দর্য দেখেছি। এখানকার সৌন্দর্যে কিন্তু বিশেষ একটি গৌরব চোখে পড়ে। এখানকার মাটি শ্যামলিমার অনুকূল নয়। তবু যে-গাছপালাগুলি প্রতিজ্ঞা করেছে বাঁচবে তারা আজকের এই শরতের ভোরে শিশিরে স্নান করে রৌদ্রালোক পান করছে। দেখতে-দেখতে মন থেকে সংস্কারের মায়া, হতাশার বাঁধন আলগা হয়ে যায়। ওদের কাছে জীবন বরণের মন্ত্র নিই। লোকালয়ে যতক্ষণ থাকি দেখি জীবনের অপচয়। চারিদিকের অন্ধকার আর বাধা সেখানে মানুষকে ব্যঙ্গ করছে। এখানে এসে বুঝলুম হার স্বীকার করাটা প্রকৃতির নিয়ম নয়। তুমি ঠিক এই কথাই কতদিন বুঝিয়েছ, নয় কি? ভালোবাসা জেনো। ইতি—

অসিতা

চিঠিটা পড়া শেষ হলে কাজল ওটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এই চিঠি লেখার দুদিন পরে ছোড়দি যদি আত্মহত্যা করে থাকে তবে খুব আশ্চর্য বলতে হবে।'

অদ্রীশ কিছু বলছে না দেখে আবার বলল, 'ভাবছেন বোধহয় নারীর মন কত বিচিত্র।'

'না, সে-কথা নয়। ভাবছিলুম শেষ সম্ভাবনাটির কথা। অসিতা আদৌ মরেনি এমন হওয়াটা কি খুব অসম্ভব?'

অর্ধস্ফুট আওয়াজ বেরুল কাজলের মুখ থেকে।

'তখন সব শুনতে চাইছিলি না? শোন তবে।'

রাজীববাবু ও শুভ্র চৌধুরীর সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণ দিল অদ্রীশ।

'মেজদার শেষ কথা শোনার পরও আপনি জল ঘোলা করতে চান?'

'একশোবার। পৃথিবীতে একটি লোকও কথায় বা কাজে অসিতার প্রতি অন্যায় করছে চিন্তা করলে আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।'

'তবে আর কী! আটবছর আগে ছোড়দি কীভাবে মরেছিল তাই নিয়ে গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করুন।' রেগে উঠেছে বলে কাজল আর নিজেকে সামলাতে পারল না। 'আপনার কাণ্ডজ্ঞান আর-একটু বেশি থাকলে আপনি বুঝতেন ছোড়দির প্রতি আপনার এই দৃষ্টিকটু মনোযোগের জন্যে ওকে বেঁচে থাকতে কত দুঃখ পেতে হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে। এ-কথা বাড়ির সবাই জানে।'

'মনের মিল ওদের দুজনের প্রথম থেকেই হয়নি। তারপরে একটা বাগদী মেয়েকে নিয়ে স্বামীর কেলেঙ্কারির জন্য অসিতা চলে এসেছিল জানি। নিজের মুখরক্ষা করতে তোর জামাইবাবু ওর নামে নিন্দা রটনা করেছিল।'

কাজল নিজের মত বদলাল কি না বোঝা গেল না। তবে চুপচাপ রইল। কিছুক্ষণ পরে অদ্রীশ বলল, 'তোর ছোড়দিকে কতটুকু দেখেছিস তুই! বড় সুন্দর ছিল ও। কাউকে সুন্দর বললে তো তোরা নিজেদের প্রিয় অভিনেত্রীর মুখটা কল্পনা করে নিস। বললে বুঝবি কী করে সে কী ধরনের সুন্দর ছিল। এমন একটি করুণ মায়া সে সৌন্দর্যকে ঘিরে থাকত যে, ওকে স্পর্শ করতে ভয় লাগত—মনে হত সে-সৌন্দর্য বুঝি ভেঙে পড়বে। ওকে ভালোবাসতুম। কিন্তু তা কি এমন কিছু—' কথাটা মাঝপথে থামিয়ে আবার বলল, 'অসম্ভব।'

'দিশদা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

টেবিলের ওপর রাখা কাজলের শুভ্র নিটোল হাতখানির ওপর অদ্রীশ একটু চাপ দিল 'দূর পাগলি! তুই নাকি আবার বড় হয়ে গেছিস!'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময়ে অদ্রীশ বলল, 'তোর মেজদার সঙ্গে কথা বলার পর আবার তোর সঙ্গে কথা বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, অসিতার মৃত্যু সম্বন্ধে সব খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব আমার রয়েছে।'

কাজল কিছু বলি-বলি করছিল। সেদিকে নজর যায়নি বলে বিদায় নিয়ে অদ্রীশ চলে যাচ্ছিল। কাজল ওর পাঞ্জাবি ধরে টানল।

'তুমি তিন সত্যি করো, যা খবর পাবে সব আমায় জানাবে।'

হেসে আজ্ঞা পালন করল অদ্রীশ।

পাঁচ

অসিতার মৃত্যুর তদন্ত করেছিলেন দারোগা রামাবতার মিশ্র। উচ্চতর পদ পেয়ে তিনি এখনও রাঁচিতেই ছিলেন। কর্মজীবনে অদ্রীশ কৃতী। রামাবতারবাবুর মুখ খোলানোর উপযুক্ত পরিচয়পত্র জোগাড় করতে ওর অসুবিধে হয়নি। খবর দিয়েছিল আগেই। উনিই কেস-ফাইলটা দেখে রেখেছিলেন।

দুজনের কথাবার্তা ইংরেজিতেই হল। কাজের কথায় এসে অদ্রীশ স্পষ্টই বলল, 'অসিতা দেবী দুর্ঘটনাতেই মারা গেছলেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।'

'এতদিন বাদে আপনার কাছে বলতে আমার আপত্তি নেই যে, উনি দুর্ঘটনায় মরেছিলেন, না, খুন হয়েছিলেন তা পুলিশ ঠিক ধরতে পারেনি। কেবল আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে পুলিশ ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা বলেই প্রচার করেছিল।'

'পুলিশ প্রথমে দুর্ঘটনা বলেই সন্দেহ করেছিল বোধহয়।'

'অবশ্য। রোজই ভোরে বেড়াতে বেরুতেন। সেদিন সকালে ঝি এসে দ্যাখে দরজায় তালা দেওয়া। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ফিরলেন না তখন খুঁজতে বেরিয়ে খাদের ধারে...।'

'সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো হওয়া সম্ভব নিশ্চয়ই?'

'খুবই সম্ভব। মৃতদেহ পাওয়া গেল না এবং বেড়াতে বেরুতে কেউ দেখেনি।'

'তা যখন দেখেনি তখন যে চার তারিখ রাতেই মারা যাননি তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

রামাবতারবাবুকে এ-যুক্তির সারবত্তা মানতে হল। 'যাক, তারপরে বলুন।'

'ছ'তারিখ সকালে শুভ্রবাবু এসে পৌঁছলেন। দুপুরে রাঁচির ব্যাঙ্ক থেকে খবর পাওয়া গেল যে, চার তারিখে অসিতা দেবী ওঁর অ্যাকাউন্টস-এ যে-দশহাজার টাকা ছিল সেটা তুলে নিয়েছিলেন। কলকাতার অফিসের সঙ্গে আগেই এ-ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি। সে-টাকার খোঁজ পাওয়া গেল না যখন, তখন পুলিশ সন্দেহ করল দুর্ঘটনাটা সাজানো ব্যাপার হয়তো।'

অসিতার স্বামী অজিত গাঙ্গুলি বাপের একমাত্র ছেলে। সাত-পাঁচ ভেবে বুড়ো গাঙ্গুলি ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরেই পুত্রবধূর নামে দশহাজার টাকা লিখে দেন। এ-কথা অদ্রীশের অজানা ছিল না।

'শুভ্রবাবু এবং অজিতবাবুর দুর্ঘটনা সম্পর্কে কী মতামত ছিল?'

'শুভ্রবাবু প্রথমে খুনের থিয়োরি স্বীকার করেছিলেন এবং বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যেন অপরাধী শাস্তি পায়। বিকেল হতে-হতে দেখলুম, ওঁর উৎসাহও কমে গেল। বিকেলে অজিতবাবুও এসে পৌঁছুলেন। খুনের থিয়োরি উনি মানতে চাননি। স্ত্রীর জীবন অসুখী করে তোলার জন্যে তিনি বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, পারিবারিক অশান্তির জন্য অসিতা দেবী আত্মহত্যা করে থাকবেন। টাকাটা কেউ সুযোগ বুঝে সরিয়েছে এই ছিল তাঁর মত।'

'নিজের থিয়োরির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দিয়েছিলেন অজিতবাবু?'

'তিনি বলেছিলেন যে, দু'তারিখে লেখা একটা চিঠিতে ওঁর স্ত্রী অনুরোধ করেছিলেন ওঁদের বিবাহটা একটা ভুল বলে ধরে নিয়ে স্বামী যেন আর-একটি বিবাহ করেন। নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনাও নাকি করেছিলেন সে-চিঠিতে।'

'পুলিশের কাছে আছে সে-চিঠি?' ব্যগ্রতা ফুটে উঠল অদ্রীশের কণ্ঠস্বরে।

'অজিতবাবু সে-চিঠি হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

'মবাইয়ার দিনগুলো অসিতা দেবী কীভাবে কাটাতেন আভাস দিন।'

'সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াতেন, অন্য সময়ে লেখাপড়া নিয়ে কাটাতেন। মাঝে-মাঝেই প্রায় সারা দিনটা রাঁচিতে কাটিয়ে দিয়ে আসতেন।'

'রাঁচিতে কী জন্যে আসতেন?'

'মনে হয় বেড়াতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে—এই সবের জন্যে আর কী।' বোঝা গেল উত্তরটা অদ্রীশের খুব মনঃপুত হল না।

'চার তারিখে এমন কিছুই ঘটেনি কি যাতে রহস্যের হদিশ মেলে?'

'সেদিন ব্যাঙ্কে এসেছিলেন এই মাত্র। দু-বেলা ঝি এসে অস্বাভাবিক কিছুই লক্ষ করেনি।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে কেউ আসত না?'

'না। এখানে এক তরুণেশ রায় ছাড়া ওঁকে কেউ চিনতই না।'

'তরুণেশ রায়টি কে?'

'একটা বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের রাঁচি শাখার প্রধান হয়ে সদ্য পাটনা থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন। পাটনা থাকার সময়ে অসিতা দেবীর সঙ্গে স্কুল কমিটির মেম্বার হিসাবে সামান্য পরিচয় ছিল। দুঃসংবাদ শুনে ছ'তারিখ বিকেলে নিজে এসে শুভ্রবাবু ও অজিতবাবুর সঙ্গে আলাপ করে যান।'

'এখনও রাঁচিতে থাকেন?'

'না। অনেকদিন আগেই এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন।'

'অসিতা দেবীর নামে চিঠিপত্র আসত?'

'না।'

'পাটনায় উনি যে-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন সেখানে ওঁর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'নেওয়া হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য তথ্য কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'পুজোর ছুটি কাটাতে উনি বেছে-বেছে রাঁচির কাছেই কেন এসেছিলেন তা খোঁজ নিয়েছিলেন কি?'

অবাক হয়ে রামাবতারবাবু কিছুক্ষণ অদ্রীশের দিকে চেয়ে রইলেন।

'রাঁচি ছুটি কাটানোর জায়গা বলেই তো জানি।'

'যাকগে। যে-ঝি ওঁর ওখানে কাজ করত তার নাম-ঠিকানাটা দিন।'

দীর্ঘকাল আগের একটি ঘটনা সম্বন্ধে ওকে এক স্পষ্ট ধারণা গড়ে দিলেন রামাবতারবাবু।

ওঁর প্রশ্নের জবাবে অদ্রীশ জানাল অসিতা এখন বাঙলা-সাহিত্যের একজন বিখ্যাত মহিলা-কবি। তাঁর বিস্তৃত জীবনী-গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহ করতেই অদ্রীশের এতদূর ছুটে আসা।

ছয়

ঝিকে খুঁজে বের করল অদ্রীশ। জানিয়ে দিল শীঘ্রই ওর পরিবারের সকলে রাঁচি আসছে। এখন ওর মতো একটি ভালো বাঙালি ঝি যদি পাওয়া যায় তো বেশি মাইনে দিয়েও ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিছুক্ষণ কথা বলেই ঝিটি বুঝল বাবু কেচ্ছার মহাভক্ত। অদ্রীশের প্রতি ওর রীতিমতো ভক্তি জন্মাল যখন দেখল অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা খুব স্পষ্টভাবে মনে রেখেছে।

'তা তেনাকে লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো দেখতে হলে কী হয়, স্বভাব-চরিত্তির মোটেই ভালো ছিল না।'

'কেন বলো তো?'

'মরার আগের দিন সন্ধেয় গতিক দেখে মনে হল কেউ আসবে। জিগ্যেস করতে স্পষ্ট বললেন, কেউ না তো। ঘরে ফিরছি, একটি বাবু আমায় তেনার নাম করে বাড়ি দেখায়ে দিতে বলল।'

'এ-কথা পুলিশকে বলোনি কেন?'

'এই দ্যাখো। মারা যাওয়ার পর তাঁর নিন্দে করে নিমকহারামি করি কেন? তেনার ভাই আবার আমায় বুঝায়ে দিলেন যে, পুলিশের লোকগুলোর আমার কথায় বিশ্বেস হবে না। ভাববে, আমিই টাকা সরিয়ে গল্প বানাচ্ছি।'

অদ্রীশ বুঝল ঝির মুখ বন্ধ রাখতে শুভ্র চৌধুরী কোনও অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাকি রাখেননি। কলকাতা থেকে এসেই বোধহয় ওর কাছ থেকে সব কথা বের করেছিলেন।

'সে-বাবুটিকে পরে চিনতে পারোনি?'

'চিনব! অন্ধকারে কাপড়-চোপড় জড়ানো ভাল্লুকের মতো মানুষটা ফিসফিস করে দুটো কথা কয়েছিল। তবে হ্যাঁ...।'

ঝি ইতস্তত করছে দেখে অদ্রীশ বলল, 'বলে ফেলো।'

'রাত্তিরের সেই বাবুটির হাতে ছোকরোট ছিল, ভারী সুন্দর তার গন্ধ। মারা যাওয়ার পরের দিন বিকালে দারোগাবাবু আবার দশরকম কথা জিগ্যেস করতে ডাকছিলেন। ফিরতিছি, নাকে এল ঠিক সেই গন্ধ। একটা ঘরে দিদিমণির ভাই আর দুজন বাবু বসেছিলেন। তেনাদের কারও ছোকরোট হবে। দাঁড়িয়ে নজর করব তার জো ছিল না।'

আর কোনও কথাই বের করা গেল না ঝিটির কাছ থেকে। অদ্রীশ কেবল ভাবছিল চার তারিখে রাত্রে কে এসেছিল অসিতার কাছে। অজিত গাঙ্গুলি? তরুণেশ রায়? না কি, শুভ্র চৌধুরী?

সাত

পাটনায় স্কুল-হস্টেলে থাকত অসিতা। হোস্টেল-সুপারিনটেনডেন্ট মহিলাটিকে কার্ড পাঠাতে তিনি এসে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন অদ্রীশকে।

'আপনি অসিতার দাদা তো? মনে আছে আমার।'

'এতদিনের কথা ভোলেননি, আশ্চর্য!'

'ওকে আপনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ চিঠি দিত না তো!'

অদ্রীশ বুঝল নিজের দায়িত্ব মহিলা একটু ভালোভাবেই পালন করতেন।

'ওর সঙ্গে কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসত?'

'না। যা রিজার্ভড মেয়ে ছিল। অনেকে আলাপ করতে চেয়ে হতাশ হত।'

'কীরকম?'

'স্কুল-কমিটির মেম্বার ছিলেন তরুণেশ রায়। ও বই পড়তে ভালোবাসে শুনে দু-দিন মোটরে করে এসে নিজের একগাদা বই দিয়ে গেলেন। তৃতীয় দিন যখন এলেন অসিতা আমার পাশে দাঁড়িয়ে বাগানে জল দিচ্ছিল। তরুণেশবাবু কিছুক্ষণ কথা বলেছেন, ও হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ''আপনার দেওয়া বইগুলোর একটি পাতাও আমার পড়া হয়নি।'' মালিকে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বইগুলো আনিয়ে মোটরে তুলে দিল।'

'তারপর?'

'তরুণেশবাবু আর আসেননি! সামান্য অবস্থা থেকে জীবনে উন্নতি করেছিলেন। আত্মমর্যাদা জ্ঞানটা কিছু বেশি ছিল।'

মানী লোকেরা কি হার মানে, মনে-মনে ভাবল অদ্রীশ।

মুখে বলল, 'ওঁর জীবনের কথা বাড়ির লোকদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলেন বোধহয়?'

'উনি একলা মানুষ ছিলেন। ওঁর বিষয়ে এমনি নানা জনের মুখে শোনা।'

'অসিতা ছুটিতে রাঁচির কাছে গিয়েছিল কি তরুণেশবাবুর মুখে ও-জায়গার সুখ্যাতি শুনে?'

বিস্মিতস্বরে মহিলা বললেন, 'কই, শুনিনি তো সে-কথা। আপনার কেন ও-কথা মনে হল?'

'না, এমনি।'

'আপনি আমার কাছে কীসের জন্যে এসেছিলেন বললেন না।'

'দরকার শেষ হয়ে গেছে। আর-একটি কথা। অসিতা দুর্ঘটনায় মরেছিল আপনার বিশ্বাস হয়?'

'আমার মতে আত্মহত্যা করেছিল। ওকে দেখলে আমার কোনও ট্র্যাজেডি কুইনের কথা মনে পড়ত। বোম্বাই ফিল্মের এক হিরোইনের মতো।' এতজন ছাত্রী ও শিক্ষিকার চরিত্র রক্ষার ভার যার ওপর তাঁর মুখে এ-মন্তব্য শুনে অদ্রীশ একবার ভাবল প্রশ্ন করে, নায়কের মুখ রসগোল্লার মতো হলে ভালো হয়, নাকি ঝাঁটার কাঠির মতো গোঁফেই বেশি মানায়!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গম্ভীরস্বরে বলল, 'দেখুন, যারা কবিতা লেখে বা ছবি আঁকে তারা আমাদের চেয়ে ঢের-ঢের বেশি জীবনকে ভালোবাসে। জীবনে ওরা তাই আমাদের চেয়ে বেশি দুঃখও পায়। তবু যদি কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, বন্ধ হয় তো বুঝবেন জীবনের প্রতি ভালোবাসা তখনও মরেনি।'

আট

দিলদরিয়া মেজাজে অজিতবাবু অভ্যর্থনা জানালেন।

'যাক, একযুগ পরে সম্বন্ধীর পায়ের ধুলো পড়ল এই গরিবের বাড়িতে।' অদ্রীশের এখনও বিবাহ হয়নি শুনে চোখ কপালে তুললেন।

'পরজন্মের জন্যে ওটা বোধহয় তোলা রইল?'

'পরজন্ম আমি মানিই না। আসল কথা, আপনারা দুটো করে বিয়ে করলে আর আমরা পাত্রী পাই কোথায়?'

হো-হো করে হাসলেন অজিতবাবু। হাসি থামলে বললেন, 'কেন, আমার দু-নম্বর বউটিকেও কি আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা নাকি?''

অদ্রীশ বিচলিত হল। উঠে এসে দুটি হাতে অজিতবাবুর হাত চেপে ধরে গভীর স্বরে বলল, 'আমার আর অসিতার সম্পর্ককে আপনি ভুল বুঝেছিলেন।'

দৃষ্টি অন্য দিকে করে অজিতবাবু জবাব দিলেন, 'সেসব তো অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গেছে।'

অদ্রীশ সেইভাবেই দাঁড়িয়ে বলল, 'অসিতার কিছু ত্রুটি থাকলে আপনি মাপ করে দিন।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অজিতবাবু তীব্র দৃষ্টিতে অদ্রীশকে দেখলেন।

'স্ত্রীর যদি স্বামীকে পছন্দ না হয় তো স্বামীর কী কষ্ট আপনি বুঝবেন না। আপনার স্ত্রী যদি লুকিয়ে আর-একজনের সঙ্গে প্রেম করে আপনার কেমন লাগে?'

'কী বললেন আপনি?'

'অসিতাকে লেখা প্রেমপত্র আমি পেয়েছি।'

'কোথায় গেল সেগুলো?'

'নষ্ট করে ফেলেছি।'

'আপনার উদারতা আশ্চর্যজনক।'

অদ্রীশের কণ্ঠে এত বিদ্রূপ ছিল যে, অজিতবাবু প্রায় খেপে গেলেন।

'এই গাঙ্গুলিবাড়ির অনেক বউকে অসিতার অপরাধের মতো অপরাধের জন্যে এক সময়ে খুন করা হয়েছে আপনি জানেন?'

'আমার কাছে এমন সব প্রমাণ আছে যেগুলো পুলিশকে দিলে আপনার পক্ষে তাদের বোঝানো শক্ত হবে যে, আপনিও স্ত্রীকে খুন করেননি।'

অজিতবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'অসিতা মরবার পর এই আটবছর বাদে আপনি এইসব কথা আমায় শোনাতে এসেছেন! কী জানেন আপনি?'

'অনেক কিছুই জানি। কিছু আন্দাজ করতে পারি। তেসরা অক্টোবর (অসিতা মারা যায় পাঁচই অক্টোবর) আপনি অসিতার একটা চিঠি পান। নয় কি?'

'মিথ্যে কথা।'

'আপনি পুলিশের কাছে কিন্তু স্বীকার করেছেন চিঠি পাওয়ার কথা।'

তেতো ওষুধ গেলার মতো মুখ হল অজিতবাবুর।

অদ্রীশ প্রশ্ন করল, 'কী ছিল সে-চিঠিতে?'

'এতদিন বাদে কখনও মনে রাখা সম্ভব?'

'আমি আন্দাজে বলি তাতে কী ছিল। অসিতা আপনাকে মবাইয়াতে ডেকেছিল।'

অজিতবাবুর গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, 'তারপর?'

'আপনি চৌঠা সকালের গাড়িতে রাঁচিতে গিয়ে রাত্রে অসিতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঝি আপনাকে দেখেছিল। আপনার গলার স্বর শুনে চিনতে পারে।'

'কিন্তু আমি অসিতাকে জীবিত দেখে এসেছিলুম।'

'কোনও প্রমাণ নেই তার। আপনার এখানকার লোহার ব্যবসা ১৯৫০-এর শেষে আরম্ভ করেছিলেন। প্রায় দশহাজার টাকা মূলধন। কোথা থেকে হঠাৎ এল অত টাকা? সে-টাকা আপনি যে অসিতাকে খুন করে নিয়ে আসেননি কোনও প্রমাণ নেই তার।'

'আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। কী জানতে চান বলছি।' প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল অজিতবাবুর গলা।

'অসিতাকে ব্ল্যাকমেল করে প্রেমপত্রগুলোর বদলে টাকাটা আদায় করেছিলেন বোধহয়?'

মুখখানা প্যাঁচার মতো করে অজিতবাবু মাথাটা নাড়লেন। বললেন, 'বিদায়ের সময়ে অসিতা কিন্তু বলেছিল, ''তোমার বাবার দেওয়া দশ হাজার টাকা তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেলুম।'''

'আর কী বলেছিল?'

'ওকে যেন ভুলে যাই, আর একটি বিয়ে করি, ক্ষমা করে দিই যেন—এইসব আর কী। পরে বুঝেছিলুম আত্মহত্যার ইঙ্গিত ওতেই ছিল।'

কী ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অদ্রীশের মুখ।

মুখে বলল, 'তখন ওর কথায় কী বুঝেছিলেন?'

'রাতটা ওর ওখানে কাটিয়ে আসতে চেয়েছিলুম। ও রাজি হল না। সেই জন্যে ক্ষমা চাইল বলে মনে হয়েছিল। বোধহয় বুঝেছিল গাঙ্গুলিবাড়ির ছেলে অবাধ্য স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে না।'

বুক ফুলিয়ে অজিতবাবু গাঙ্গুলিবাড়ির গৌরবকে প্রকাশ করলেন। দেখে ওঁর প্রতি করুণা হল অদ্রীশের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বিদায় নিয়েছিলেন কোথায়?'

'রেল-স্টেশনে। রাত দশটায় আমার টেন ছাড়ার সময়ে।'

'অত রাত্রে সাত মাইল দূরে নিজের বাড়ি ও ফিরবে কেমন করে তা বলেনি? তখন তো বাস বন্ধ হয়ে গেছে।'

'এটা তো জিগ্যেস করা হয়নি। এ হে। তা কোনও হোটেলে-টোটেলে ছিল বোধহয়।'

'হ্যাঁ। তারপর ভোরে উঠে সাত মাইল এসেছিল কেবল আত্মহত্যা করতে।'

সন্দিগ্ধচোখে ওকে দেখে নিয়ে অজিতবাবু ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে মজা করছেন।'

'ওহো না, না। আপনি প্রেমপত্রগুলোর বিষয়ে যা মনে করতে পারেন বলুন দেখি।'

'তিনখানা বাংলায় লেখা চিঠি। পাটনার একজন ওর ট্রাঙ্ক থেকে ওগুলো চুরি করে আমায় দিয়েছিল। চিঠিতে তারিখ আর অস্পষ্টভাবে নামের সই ছাড়া আর প্রেরকের ঠিকানা বলে কিছু ছিল না। খামগুলো পাওয়া যায়নি বলে ডাকঘরের ছাপ থেকে কিছু ধরব তার উপায় ছিল না। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ছেলের চিঠি।'

'কেন বলুন তো?' অদ্রীশের মজা লাগছিল।

'অত্যন্ত ভদ্র ভাষা। কোথায় কুমুদিনী নামে একটা মেয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়েছিল, নাম ভুলে গেছি কোন বিলেতি বউ পরপুরুষকে ভালোবেসে শেষ পর্যন্ত রেলের তলায় আত্মহত্যা করেছিল...এইসব আগড়ম-বাগড়ম কথা। পাটনায় কত ধুলো, স্কুল কেমন চলছে, মাস্টারি করতে কেমন লাগে, নিজেকে সরিয়ে রাখার কত যন্ত্রণা, অসিতা কত সুন্দর, জীবনে আর্থিক উন্নতি করেও সব পাওয়া যায় না, প্রেম ভিক্ষায় অগৌরব নেই...।'

'থাক, থাক। কিন্তু সত্যিই আপনি পত্রলেখকের পরিচয় জানতে পারেননি? আপনার এজেন্ট কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?'

'না।'

অদ্রীশের হঠাৎ কী সন্দেহ হল। বলল, 'আপনি আবার আমাকেই সন্দেহ করে বসেননি তো?'

অজিতবাবু উত্তর দিচ্ছেন না দেখে অদ্রীশ হেসে ফেলল।

'হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট মহিলা ছিলেন। তাঁর নজর এড়িয়ে সাধ্য কী কোনও লোক আপনার স্ত্রীর অমর্যাদা করে। ও চিঠিগুলো হাতে-হাতে কোনোওরকমে দেওয়া হত। ডাকে আসত না।'

'মানে?'

'মানে এই যে, আপনি-আমি যখন কলকাতায় বসে, তখন পাটনারই কোনও বীরপুরুষ অসিতাকে একটির পর একটি প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছিলেন।'

বিদায় নেওয়ার আগে অদ্রীশ বলল, 'আপনার অনেক কথাই আমি বিশ্বাস করলুম। আপনি আমার অন্তত একটা কথা বিশ্বাস করুন।'

'বলুন।'

'অসিতা আত্মহত্যাই করেছিল। এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ রাখবেন না।'

বিশ্বাস করলেন কি না অজিতবাবু মুখ দেখে বোঝা গেল না।

নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় অদ্রীশের চিঠি পেল কাজল।

বোম্বাই
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

কাজল,

কদিন আগে তোর জামাইবাবুকে বলে এসেছি অসিতা আত্মহত্যা করেছে। মিথ্যে বলিনি। তোরা মেয়েরা প্রেমে চিরদিন আত্মবিলোপই তো করে এসেছিস।

অসিতা মরেনি। কেবল গাঙ্গুলি-পরিবারের বধূ পরিচয়টিকে সে মুছে ফেলেছে। এতে কারও ক্ষতি হয়েছে মনে করি নে। ও মনের মতো মানুষকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। মবাইয়ার ছলনাটুকুর আশ্রয় না নিলে ও অন্য কীভাবে আমাদের সমাজে আরেকজনের স্ত্রী হতে পারত জানি না।

সামাজিক ভালোমন্দের দিক দিয়ে ওকে বিচার করিস নে। ভাবাবেগে শিল্পী তো মুহূর্তে দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম করছে। আমাদের ক্ষুদ্র সংস্কারে ওদের বাঁধব কী করে। 'তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে'—অসংখ্য প্রধান কবির সঙ্গে-সঙ্গে এ তো অসিতার মতো অপ্রধান কবিরও উপলব্ধি।

দিদিকে দেখতে চাস তো আয়। হোটেলের ঠিকানা দিলুম। বাড়িতে যেন কিছু জানতে না পারে। ভালোবাসা নিস। ইতি
—

দিশদা

বাড়ির সামনের লনে বসে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক পাইপ মুখে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পাশে বসে ফুটফুটে ছোট একটি মেয়ে খবরের কাগজের অতিরিক্ত সংবাদগুলি পরিবেশন করছিল।

অদ্রীশ নমস্কার করে বলল, 'তরুণেশবাবু, আমার সঙ্গের এই মহিলা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।'

ভদ্রলোক স্মিতাহাস্যে নমস্কার করে মেয়েটিকে বললেন, 'যাও তো মা কৃষ্ণা, এঁকে মার কাছে দিয়ে এসো।'

অদ্রীশ আর তরুণেশ তখন বোম্বাইতে ডাকটিকিট জমানোর শখ তৈরি করা কত সহজ সেই নিয়ে সারগর্ভ আলোচনায় মেতে উঠেছে। কৃষ্ণা নাচতে-নাচতে এসে অদ্রীশের হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল।

'দিশ-মামা, মা-মণি তোমায় ডাকছে।'

তরুণেশের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে অদ্রীশ ভিতরে চলে গেল। গিয়ে দেখে দুই বোন বসে হাসতে-হাসতে আঁচলে চোখের জল মুছছে।

ওকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে কাজল কলরব করে বলল, 'জানিস ছোড়দি, তোকে খুঁজতে বেচারা কী ছুটোছুটিই না করলে।'

অদ্রীশ ধরা গলায় অসিতাকে বলল, 'তোমায় আজ সুখী দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে! পরিশ্রম সার্থক।' নিচু হয়ে কৃষ্ণার গালে ঠোনা দিয়ে বলল, 'যা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

অসিতা কাজলের দিকে তাকিয়ে অদ্রীশকে বলল, 'এইবেলা যদি কিছু পুরস্কার চাও তো বলো।'

অসিতার চোখের দিকে তাকিয়ে কাজল হঠাৎ লাল হয়ে উঠল।

অদ্রীশ মাথা চুলকে বলল, 'আর বুড়ো হয়ে গেলুম। এখন কি আর চাইবার জোর আছে?'

কাজল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে অসিতা তার পিঠে গুম করে এক কিল মেরে বলল, 'মর মুখপুড়ি, প্রণাম করে বলবি তো, ''ওগো, আমার শিবের মতো বুড়ো বর চাই।'' '

মাসিক রহস্য পত্রিকা

জুলাই-আগস্ট, ১৯৬০



সেই মুখ, সেই সুটকেস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ভিড় কম ছিল। তাই দুই বন্ধু দোকানে বসে গল্প করতে পারছিলাম। তা ছাড়া অবিনাশ তিনদিনের ছুটি নিয়েছে। কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ সে, দেখা পাওয়া ভার। কাজেই দেখা হয়ে যাওয়ার পর তাকে আর ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। হুঁ, তখন বেলা তিনটে। সারাদিন ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায়, পার্কে বেরোনোর অসুবিধে ছিল। বসে গল্প করতে দুজন ধরমতলার চায়ের দোকানটা বেছে নিয়েছিলাম।

আবহাওয়া, বাজার-দর, আসাম, দিল্লি ইত্যাদি কোনও প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনায় ছিল না—না সিনেমা, না খেলা! আমরা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বলে সুখ পাচ্ছিলাম। কেননা অবিনাশ আমার বাল্যবন্ধু। আমরা নিজেদের কথা, পরিবারের কথা বলে যত আনন্দ পাই অন্য কিছুতে তত আনন্দ পাই না। অথচ আমি একজন ডাক্তার, অবিনাশ পুলিশের লোক। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন ছাড়া আমাদের অনেক কিছু পরস্পরের কাছে বলার ছিল, পরস্পরের কাছ থেকে জানবার ছিল। অদ্ভুত ঘটনা, আশ্চর্য কাহিনি, রোমাঞ্চকর সংবাদ—যা প্রায় প্রত্যেক ডাক্তারের, প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা থাকে। কিন্তু সেসব কোনওদিনই দুজনের মধ্যে আলোচনা হত না। সেদিনও হয়নি। এমন সময়—।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে উঠল। কাঠিটা নিভে গেল।

'কী হল?' অবিনাশ হাসল, কিন্তু সেইসঙ্গে আমার চেহারা দেখে, চোখ দেখে তার হাসি নিভে গেল।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সিগারেট ধরালাম।

অবিনাশ চুপ করে রইল।

আমি আরও একবার ওধারের দেওয়ালের কাছের টেবিলটা দেখলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। লক্ষ করে অবিনাশ বলল, 'কী হে, তোমার পরিচিত কেউ নাকি?'

আমি আস্তে মাথা নাড়লাম।

এমনভাবে মাথা নাড়লাম, যেন বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম, 'বলব, বলছি, আর-একটু অপেক্ষা করতে দাও।'

তাই অবিনাশ অপেক্ষা করল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে সে আমার হাতের মেডিকেল জার্নালটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। আর আমি তাকিয়ে রইলাম দেওয়ালের কাছের টেবিলের দিকে। সাদা পরোটা আর

কষা মাংসের অর্ডার দিয়েছে বলে মনে হল। ফাইবারের প্রকাণ্ড সুটকেসটা পাশের একটা শূন্য চেয়ারে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল ও চকচকে টাকের জল মুছছে। না, আমি অবাক হচ্ছিলাম, ভদ্রলোক কখন দোকানে ঢুকল দেখলাম না বলে, অথচ আমি ও অবিনাশ প্রায় দরজার কাছটায় একটা টেবিল নিয়ে বসেছিলাম। টাক, ফাইবারের সুটকেস এবং গায়ের আধময়লা টুইলের হাফ শার্ট একরকম আছে, কিছুই বদলায়নি, কাজেই আমার চিনতে কষ্ট হয়নি।

খাবার আসতে ভদ্রলোক গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল। যেন খুব খিদে পেয়েছে। অন্য কোনওদিকে দৃষ্টি নেই। খাচ্ছে আর পেঁয়াজ রঙের বড়-বড় চোখ দুটো মেলে ধরে প্লেটের পাশে রাখা মাংসের হাড়গুলি দেখছে—অর্থাৎ, যথেষ্ট চিবোনো হল কি না, এক-আধটু মাস-মজ্জা চর্বি হাড়ে থেকে গেল কি না, এমন একটা ভাব। হাসি পাচ্ছিল আমার। হাসলাম না যদিও। অবিনাশের ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু উপায় নেই। আমি অপেক্ষা করছিলাম ফাইবারের সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক কখন দোকান থেকে বেরোবে। কেননা তার হাঁটা ও চলাটাই আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। কেননা তখনই যা-কিছু ঘটবার ঘটবে—অতীতে ঘটেছিল।

খাওয়া শেষ হল। গ্লাসের জলে হাত ডুবিয়ে হাত ধোয়া শেষ হল এবং ভেজা হাতটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে মুখ ধোওয়ার কাজ শেষ হল। তারপর রুমাল দিয়ে ঘটা করে মুখ ও হাত মোছা হল। বিল এসে গেল। বিল মেটানো হল। কিছু খুচরা ফিরিয়ে নিয়ে এল বয় পিতলের থালায় করে। যেন তাকে একটা দশ নয়া পয়সা বকশিশ দেওয়া হল। বয় খুশি হয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক বাকি পয়সা পকেটে পুরে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চেয়ারের শব্দ হল। দাঁড়িয়ে সুটকেসটা হাতে নিল, তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে দরজা পার হয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল। আমি এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে তার গতিবিধি দেখছিলাম। লোকটা রাস্তায় নেমে যেতে একটা হালকা নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু তখনও আমার দেখা শেষ হয়নি। রাস্তার ভিড়ে সেই টাক-পড়া মাথা ও প্রকাণ্ড সুটকেসটা হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে তাকিয়ে থাকতে হল। কেননা আমার আশঙ্কা তখনও দূর হয়নি। বিশেষ, ভদ্রলোক যখন চলতে আরম্ভ করে তখনই তো যত গোলমাল—।

প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমায় চেয়ার থেকে রাস্তার লাইটপোস্টের ওপাশটা আর দেখা যাচ্ছিল না, অথচ ভদ্রলোক সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি সামনের দিকে ঝুঁকে মাথাটা কাত করে ধরি।

'কী ব্যাপার—' অবিনাশ বোকা হয়ে গেছে আমার রকমসকম দেখে। হাতের ইশারায় তাকে চুপ করতে বললাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—দেখলাম লাইটপোস্ট পর্যন্ত এগিয়ে ভদ্রলোক পেভমেন্ট থেকে নেমে রাস্তা ক্রস করছে, একটা ডবল ডেকার দুর্বার বেগে ছুটে আসছে—টাক-পড়া মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে নাকি—'গেল গেল গেল!' অনেক মানুষের গলা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, একসঙ্গে উত্তেজনা ও আতঙ্ক আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। কাঠের মতো স্থির শান্ত ধীর আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাকিয়ে আছি। না, টাক-পড়া ভদ্রলোকের হাতে সুটকেস ঝুলছে। নির্বিঘ্নে দ্রুত ধাবমান ডবল ডেকারের পাশ কাটিয়ে রাস্তার ওপারে পেভমেন্টের ওপর উঠে গেল। দুর্ঘটনা তাকে স্পর্শ করল না। তবে? প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিললাম। চিৎকার শুনে অবিনাশও চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছিল।

'কী হল?'

'ট্রামের তার ছিঁড়েছে—।'

'কারও গায়ে লাগল?'

'না, লাগতে-লাগতে বেঁচে গেছে—'

দু-তিনজন রেস্টুরেন্টে ঢুকে কথা বলছিল : 'ধর্মের ষাঁড় কিনা, তাই বেঁচে গেছে।

আর-একটু হলে—।'

আমি এবং অবিনাশ দুজনে শুনলাম। দুজন আবার নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে বসলাম।

'তুমি মনে করেছিলে তোমার সেই পরিচিত ভদ্রলোক বুঝি চাপা পড়েছে?' অবিনাশ প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নাড়লাম।

'পরিচিত ঠিক বলা যায় না, তবে তাকে এর আগে একদিন দেখেছিলাম বটে। আশ্চর্য লোক—তার মধ্যে একটা দৈবশক্তি লুকিয়ে আছে।'

'কীরকম?' অবিনাশ ভুরু কোঁচকাল।

'ভদ্রলোক যখনই যেদিক দিয়ে যাবে একটা-না-একটা দুর্ঘটনা ঘটবেই—অথচ তাকে কোনওদিন দুর্ঘটনা স্পর্শ করে না।'

'এ আবার কী কথা বলছ!' পুলিশ অফিসার হাসল : 'বিজ্ঞানের ছাত্র তুমি—দৈব-টৈব বিশ্বাস করো?'

'করতে হচ্ছে—ওই মানুষটা করাচ্ছে।'

অবিনাশ হাসল।

'তিনি যখনই যেখানে যাবেন দুর্ঘটনা ঘটবে—অথচ তিনি বেঁচে যাবেন—এই তো? তবে আর দৈবশক্তি বলছ কেন—বলো দানোর শক্তি তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

'ওই একই কথা—মানে আমার-তোমার মধ্যে যা নেই।' সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করবে কি? তবে বলছি শোনো। আমি ট্রেনে করে সেদিন হাওই যাচ্ছি—আমার শ্বশুরবাড়ি সেখানে তুমি জানো নিশ্চয়—।'

'জানি।' অবিনাশ মৃদু মাথা নাড়ল : 'তারপর?'

'এই ভদ্রলোক আমাদের কামরায় ছিল। এক কামরায় কত মুখ থাকে কাউকে মনে নেই, এই মুখটি মনে আছে। কারণ অবশ্য তার মাথার টাক এবং হাতের প্রকাণ্ড সুটকেসটা তুমি বলতে পারো। কিন্তু টাক এবং সুটকেস ছাড়া আরও কারণ আছে তাকে মনে রাখবার। বলছি। কোলাঘাটের কাছাকাছি একটা স্টেশনে ট্রেন ধরল। ভদ্রলোক নামল। যেন তখন মনে পড়েছে গাড়ি তার গন্তব্যস্থান ছেড়ে যাচ্ছে। যা হোক তাড়াহুড়ো করে ভদ্রলোক যেমন নামতে গেছে কী নেমে পড়েছে, এমন সময় একটা ''গেল-গেল'' চিৎকার কানে এল। আমরা চমকে উঠলাম। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলাম সবাই। কী ব্যাপার! কামরার সমস্ত যাত্রী আশঙ্কা করছিলাম ভদ্রলোক হয়তো ঠিকমতো নামতে পারল না, হয়তো পা ফসকে চাকার নীচে চলে গেল। না, তা নয়। দেখলাম সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক দিব্যি লাইনের ধারের সরু মাটির পথ ধরে হাঁটছে। একটা ছাগল কাটা পড়েছে শোনা গেল। কী করে ছাগল কাটা পড়ার কথাটা জানাজানি হয়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে তা টের পেলাম না যদিও, কিন্তু জানলাম এবং নিশ্চিন্ত হলাম আমাদের কামরার সেই ভদ্রলোক চারটে হাত-পা নিয়ে দিব্যি হেঁটে চলেছে দেখে।'

অবিনাশ ঠোঁট কুঁচকে হাসল।

'চার হাত-পা আর সুটকেসটা নিয়ে।'

বন্ধুর হাসির নমুনা দেখে বুকের ভিতর ঢিব করে উঠল।

'কেন, সুটকেসটা সম্পর্কে তোমার হঠাৎ কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি?' প্রশ্ন করলাম।

'না, তা নয়।' অবিনাশ আর হাসল না, কিন্তু দৃষ্টিটা হঠাৎ সূক্ষ্ম করে ফেলল, তার কপালে একটা রেখা ফুটে উঠেছে লক্ষ করলাম।

'তারপর বলছি, শোনো।' আরম্ভ করলাম, 'কী কারণে গাড়িটা কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, সম্ভবত সিগন্যালের গোলমাল ছিল, আর সেই দাঁড়ানো আধঘণ্টার ওপর। সামনে একটা ছোট নদী, একটা ব্রিজ, হয়তো ব্রিজের কোনও গোলমাল হয়েছে আমরা আশঙ্কা করছিলাম। যা হোক, মাঝ-পথে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে যাত্রীদের মনের অবস্থা কী হয় তোমার আইডিয়া আছে নিশ্চয়। আমরা ছটফট করছিলাম। কেউ-কেউ ট্রেন থেকে নেমে ঘাসের ওপর পায়চারি করছিল। কেউ-কেউ গার্ড সাহেবের গাড়ির কাছে গিয়ে গাড়ি কখন ছাড়বে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল—কিছু যাত্রী ইঞ্জিনের কাছে চলে গেছে। প্রচণ্ড

গরম। আমি জানালার বাইরে গলা বাড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় যেন হঠাৎ কানে এল কাছের-দূরের অনেকগুলি গলা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল ''গেল-গেল।'' কী ব্যাপার? চোখ তুললাম, এদিকে-ওদিকে তাকালাম। আমার এক সহযাত্রী কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ''ওই দেখুন, ওখানে নদীর দিকে তাকান, খেয়াটা মাঝামাঝি গিয়ে ডুবে গেল।'' তাই দেখলাম। সাঁতার কেটে কিছু মানুষ তীরের দিকে আসছে, দুটো জেলে ডিঙ্গি ছুটে গেছে নিমজ্জমান নৌকোর কাছে—টেনে-টেনে যাত্রীদের তুলছে। হাওয়া ছিল না, নদীতে বড় ঢেউ ছিল না, অথচ—' আমি চুপ করলাম।

'তো এর সঙ্গে টাক-পড়া ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক ছিল?' অবিনাশ আমার চোখ দেখছিল।

'ছিল।' পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, 'যখন নৌকোটো ডুবছিল তখন সেই ভদ্রলোক লাইনের পাশ দিয়ে হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে মাটির রাস্তা ধরে গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছিল।'

'তাই নাকি!' এবার শব্দ করে হেসে উঠল অবিনাশ : 'মানে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকাতে হেঁটে তিনি তোমাদের ধরে ফেলেছিলেন।'

'তাই।' ঘাড় কাত করলাম : 'কিন্তু আবার কখন তার দেখা পেলাম একবার চিন্তা করে দ্যাখো!'

'যখন একগাদা যাত্রী নিয়ে মাঝ-নদীতে নৌকোটা ডুবছিল।' অবিনাশ বলল, 'হাওয়া ছিল না, কিন্তু ওভারলোডেড হয়েছিল বলে খেয়ার ওই দুরবস্থা হয়েছিল, ওরা অধিকাংশ সময় তাই করে—কলকাতার গঙ্গায় ওইভাবে কত খেয়া রোজ ডুবছে, স্টিমবোটগুলো পর্যন্ত তলিয়ে যায়!'

বললাম, 'তা হবে, কিন্তু সেদিন একসঙ্গে দু-দুটো দুর্ঘটনা ও টাক-পড়া ভদ্রলোক দর্শনলাভের কী অর্থ হয় তুমি বলতে পারো? আজ আবার দ্যাখো, যখনই তার মুখটা দেখলাম, তখনই সে রাস্তা ক্রস করছিল, ঠিক তখনই ট্রামের তার ছিঁড়ে পড়ল—ভাগ্যিস—।'

'না, কোনও মানুষ মারা পড়েনি—একটা ষাঁড় মরতে-মরতে বেঁচে গেছে।' অবিনাশ এবার মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে বসল : 'আমি কিন্তু তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

অবিনাশের চোখে গোয়েন্দা-পুলিশের সন্দেহ ঝিকিয়ে উঠেছে লক্ষ করলাম।

'করো।' আমি তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে তৈরি, এমনভাবে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালাম।

যেন একটু সময় কী চিন্তা করল অবিনাশ, তারপর বললে, 'লোকটা কোন স্টেশনে তোমাদের কামরায় উঠেছিল?'

'বলতে পারব না। সে যখন ট্রেন থেকে নেমে যাবে তার মাত্র মিনিট-পনেরো আগে আমি আবিষ্কার করেছিলাম এমন একটি যাত্রী আমাদের মধ্যে আছে যার মাথায় প্রকাণ্ড টাক, সঙ্গে একটা সুটকেস আছে। ছাই রং। সম্ভবত ফাইবারের, তখন লক্ষ করেছ কি?'

অবিনাশ ঘাড় কাত করল।

'আচ্ছা, যখন তুমি তাকে প্রথম দেখতে পেলে তখন ভদ্রলোক কী করছিল?'

'চুপ করে বসেছিল।'

'কারও সঙ্গে কথা বলছিল কি?'

'না।' ঢোক গিললাম : 'অন্তত আমি যতটা সময় দেখেছি কারও সঙ্গে তাকে আলাপ করতে দেখিনি।'

'সুটকেসটা কোথায় ছিল? বাঙ্কের ওপর?'

'না, কোলের ওপর বসানো ছিল।' একটু থেমে থেকে পরে বললাম, 'হয়তো আগে বাঙ্কের ওপর কী নীচে রাখা হয়েছিল, নেমে যাবে বলে কোলে করে বসেছিল এমনও হতে পারে।'

'কী হতে পারে, কী হতে পারে না আমার জানার দরকার নেই। তুমি নিজের চোখদুটো দিয়ে কী দেখেছিলে তাই আমাকে বলো।'

'ওই তো, সেটা কোলের ওপর রেখে চুপ করে বসেছিল ভদ্রলোক।'

আবার একটু সময় চিন্তা করল অবিনাশ।

'কোন স্টেশনে তার নামবার কথা ছিল? মানে, স্টেশনে গাড়িটা ধরল অথচ নামল না, পরে ট্রেন যখন ছেড়ে দেয় তখন নেমে পড়ে? তাই তো?'

'হুঁ, খুব সম্ভব বাগনান স্টেশন ছিল ওটা।'

বন্ধু মোলায়েম করে হাসল।

'একটা লোক তার গন্তব্য স্টেশনে নামবে বলে পনেরো মিনিট আগে তৈরি হয়ে বসে আছে, অথচ যখন স্টেশনে গাড়ি ধরল তখন তার খেয়াল নেই, ব্যাপারটা একটু কেমন মনে হয় না?'

'তা হয়তো বলতে পারো তুমি। কিন্তু তার গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে-সঙ্গে ছাগল কাটা পড়া, হেঁটে নদীর কাছাকাছি গেছে সে এমন সময় নৌকাডুবি। আজ, একটু আগে ভদ্রলোক রাস্তা পার হচ্ছে যখন, অমনি ট্রামের তার ছিঁড়ে পড়া—এ সবের কী উত্তর আছে আমায় বলো?'

'কোইনসিডেন্স, এমন হয়,' গম্ভীর হয়ে বন্ধু বলল, 'লোকটার অনুপস্থিতিতেও দুর্ঘটনাগুলো ঘটতে পারত—।'

'আবার ঘটতে না-ও পারত।' কেমন যেন জিদের গলায় বললাম, 'ভদ্রলোক যখন যেখানে যাবে দুর্ঘটনা সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'মানে দুর্ঘটনার এজেন্সি নিয়েছে টাক-পড়া মানুষটা বলতে চাও?'

'নিশ্চয়।' হেসে বললাম, 'তার সুটকেসে কী আছে, কী উদ্দেশ্যে সে চলতি গাড়ি থেকে নামে, কারও সঙ্গে কথা না বলার পিছনে কী কারণ লুকিয়ে আছে, বা আজ হঠাৎ এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে গোগ্রাসে মাংস-পরোটা গিলতে এল কেন, এসব তোমরা পুলিশের লোকেরা সহজে খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যরকম। এবং এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের পুলিশি শাস্ত্রে আছে বলে মনে হয় না।'

অবিনাশ হাসতে লাগল।

'সংস্কার ছাড়তে পারছ না তুমি, অথচ তুমি একটা বি এসসি, এম বি, পুরোপুরি বিজ্ঞানের ছাত্র—।'

তার কথা শেষ করতে দিলাম না।

'বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সব সমস্যা, সব রহস্যের বিচার করা যায় আমার তো মনে হয় না—অন্তত এক্ষেত্রে করা যাবে বলে ভরসা পাচ্ছি না।'

দু-বন্ধু সেদিন এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। বৃষ্টি ধরে গিয়ে রোদের টিকি দেখা গিয়েছিল শেষ বেলায়। একটা পার্কে ঢুকে দুজনে বেশ কিছুক্ষণ বেড়ালাম। আলোচনা শেষ করে অবিনাশ একসময় বলছিল সুটকেসটার মধ্যে রিভলবার বা বোমা আছে বলে সে মনে করে না, বা বেআইনি সোনা চালান দেওয়ার কারবার করে তাও না, তবে আফিং-গাঁজা যে নেই-ই নিশ্চয় করে বলা যায় না। সম্ভবত ওই জাতের কিছু চোরাই মাল লোকটা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় বয়ে বেড়ায়। লোকটার গতিবিধি দেখে এবং আমার মুখে আগের ইতিহাসটুকু শুনে অবিনাশ এই সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে পেরেছিল। আর হেসে বলেছিল, 'দৈব-টৈব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও, কিন্তু অত সব সূক্ষ্মতার মধ্যে আমরা পুলিশের লোকেরা বাঁচতে পারি না, আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' অর্থাৎ ঠাট্টা করছিল সে।

কিন্তু রাগ করিনি। অবিনাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার বউবাজার স্ট্রিটের ডিসপেনসারিতে চলে গেলাম। সন্ধ্যার দিকে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। আপনারা কেউ-কেউ লক্ষ করে থাকবেন বৈঠকখানা বাজারে ঢুকবার গলির মুখে আমার ছোটখাটো ডিসপেনসারির সামনে দুটো ফলের দোকান। বৃষ্টির জন্যে ডিসপেনসারির দরজায় রীতিমতো একটা ভিড় জমেছিল। জলের হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই আমার ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, দরজার কাছে একটু ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি হচ্ছে, যেন একজন কে ভিতরে ঢুকতে চাইছে, পারছে না। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে ভিড়ের ভিতর দিয়ে মোটা দেহখানা গলিয়ে ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা সুটকেস। জলে ভিজে টাকটা ইলেকট্রিক আলোর নীচে চকচক করছে। আমার মুখ শুকিয়ে গেল।

'নমস্কার।' আগন্তুক ঘাড় নাড়ল।

পাল্টা নমস্কার জানাতে আমিও থুতনিটা নাড়লাম। কিন্তু আমার বুকের ভিতর কাঁপছিল। সত্যি বলতে কী, ভদ্রলোককে চেয়ারে বসতে বলার আগে আমি আমার চারদিকটা দেখে নিলাম। পাখাটা ঠিকমতো ঘুরছে তো, ইলেকট্রিক লাইন-টাইন কিছু খারাপ নেই তো, এমনকী যে-চেয়ারে বসেছিলাম সেটা পর্যন্ত নেড়েচেড়ে দেখতে চাইছিলাম, স্ক্রু-পেরেক কোথাও খসে-টসে পড়েনি বা আলগা হয়ে যায়নি তো, চেয়ারটা ভেঙে পড়বে কি!

চেয়ার ভাঙল না, পাখা ছিঁড়ল না, ইলেকট্রিক লাইনে আগুন ধরবে এমন কোনও আশঙ্কাও দেখা গেল না। রুমাল দিয়ে টাক মুছে ভদ্রলোক হেসে বলল, ডিসপেনসারির জন্য কিছু ওষুধপত্রের দরকার আছে কি না। বুঝলাম এজেন্ট। এবং কোন কোম্পানির ফাইল স্যাম্পল-এ ফাইবারের সুটকেসটা বোঝাই হয়ে আছে ডালা খোলামাত্র তাও নজরে পড়ল। খুশি হলাম। কিছু অর্ডার রাখলাম। ভদ্রলোক খুশি হল। নোটবই ও পেনসিল পকেটে পুরল। সুটকেসের ডালা বন্ধ করল। ভদ্রলোক উঠে নমস্কার জানিয়ে যখন দরজার কাছে গেছে তখন আমার হাতের কাছে টেলিফোন গর্জন করে উঠল। যেন 'গেল-গেল' বলে টেলিফোনটাই চিৎকার করে উঠেছিল। হাত কাঁপছিল। রিসিভার তুললাম। বন্ধুপত্নী রেখার গলা এইমাত্র অবিনাশ ওয়েলিংটনের মোড়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তার মোটরবাইক একটা ডবল ডেকারের ফুটবোর্ডে লেগে ছিটকে পড়েছিল। পুলিশ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অবিনাশকে। আমি যেন খবর পাওয়ামাত্র সেখানে বন্ধুকে দেখতে যাই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। টাক-পড়া ভদ্রলোক ততক্ষণে দরজার ভিড়ের মধ্য দিয়ে মোটা শরীরটা টেনে-টেনে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৬০



একটি নিঃস্ব যৌবনের মৃত্যু

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্য কাহিনি আমি কখনও লিখি না। একটি রহস্যের ঘটনা মানুষের স্নায়ুকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করতে পারে মাত্র। তার বেশি কিছু স্থায়ী মূল্য এর কী আছে জানিনে। তবু রহস্য কাহিনিই একটি লিখতে হবে।

একটি হত্যার রহস্য আমি জানি। হত্যাকারী কে তাও আমি জানি। তার কথাই বলব।

হত্যাটি অত্যন্ত রহস্যময়। সবাই একে হত্যা বলে ভাবতেই পারেনি। ভোরবেলা দেখা গেল সবিতা ট্রেনে কাটা পড়েছে। এটাকে হত্যা বলা যায় কী করে? এ তো আত্মহত্যা! এতে রহস্যই বা কী থাকতে পারে?

আমি জানি এটা হত্যা। এ-হত্যার পেছনে রহস্য আছে।

সবিতা মরেছে। লাইনের বাইরে তার কাটা মাথা, ভেতরের দিকে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন দেহ। রেলের চাকার তলায় কি এমন গলা কেটে যায়? তা হয়তো যায়। তবু এটা হত্যা।

দুটি মানুষ তাকে মারতে পারে। এক তার স্বামী, আর না হয় ব্রজদুলালবাবু। কে মেরেছে বুঝতে হলে তাদের দুজনের কথাই আমাকে বলতে হবে।

সবিতা রূপবতী। গায়ের রং বেশ ফরসা, কিন্তু ফ্যাকাসে। যৌবন ছিল, কিন্তু এখন সে-যৌবনকে বিধ্বস্ত বলা যায়। নানা কঠিন চাপে পড়ে যেন থেঁতলে গেছে ওর যৌবন। মুখে হাসি থাকত সর্বদাই। কিন্তু সে-হাসি একটু লক্ষ করলে বোঝা যেত, বড়ই ম্লান। চাপা বেদনায় ভরা।

কে-ই বা লক্ষ করত?

স্বামীর লক্ষ করা উচিত ছিল। কিন্তু সংসারে যা উচিত, তা বেশিরভাগ সময়ই হয় না।

বিয়ে হয়েছিল ওর পনেরো বছর বয়েসে। মণীন্দ্র ছেলে ভালো। দরিদ্র হলেও কয়েক ভাই মিলে কোনওমতে চলে যেত। মণীন্দ্র শক্ত-সমর্থ, বলিষ্ঠ, কিন্তু বদমেজাজি।

কাজে লাগালে কাজ করতে পারত, কিন্তু কেউ জোর করে কাজে না লাগালে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে-বসে থাকতে পারত। এটা ওর চিরকালের স্বভাব।

বিয়ের পর সবিতা বছরকয়েক বেশ ভালোই ছিল। মণীন্দ্র গ্রামের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাস্টারি করত। রেগে গেলে ছেলেদের প্রচুর মার দিতে পারত। ছেলেরা যমের মতো ভয় করত। বিয়ের পর বউও তাকে ভয় করবে, এমন একটা আশা তার ছিল। এটা তার একটা গর্বও বটে। সবিতা কিন্তু ভয় করল না।

মাঝে-মাঝে সামান্য ব্যাপারে মণীন্দ্র মেজাজ দেখালে সবিতা কিছুই বলত না। তার এই কিছুদিন না-বলাটা অনেকদিন পর্যন্ত চলত। একটা কথাও বলত না স্বামীর সঙ্গে।

অগত্যা বদমেজাজি মণীন্দ্রকেই মেজাজটা ঠান্ডা করে সাধাসাধি করতে হত।

তাতেও কি রেহাই আছে?

একবার সকালে তার খাওয়া নিয়ে রাগারাগি করেছিল মণীন্দ্র।

—সকালে দুটিখানি ভাত খেয়ে নেবে।

সবিতা ঠান্ডা চোখ দুটো তুলে বললে, সকালে ভাত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

—আমি যা বলছি শুনতে হবে। তোমার জন্যে সকালবেলায় সন্দেশ-রসগোল্লা দিতে পারব না।

সবিতা বুঝল কথাটা স্বামীর কানে তুলেছে ওর মেজ জা।

বললে, আমি তো সন্দেশ-রসগোল্লা আনতে বলিনি! শুধু চা খাব।

—ফের কথার ওপর কথা!

ইস্কুলের ছাত্রের মতো একটা জোর ধমক দিয়ে বসেছিল মণীন্দ্র।

ব্যস! সেই যে সবিতা মুখ বন্ধ করল, সে-মুখ খোলাতে মণীন্দ্রের কালঘাম ছুটে গেল। ফরসা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল সবিতার। কিছুতেই কথা বলল না।

শেষপর্যন্ত মণীন্দ্র ওর পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে।

—বেশ, আমার অন্যায় হয়েছে। তোমার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম। সকালে ভাত খেলে শরীর ভালো থাকে। শুধু চা খেলে শরীর খারাপ হবে তাও বোঝো না? বেশ, আর কখনও বলব না।

সবিতা নীরব। ছোটখাটো ধবধবে ফরসা নিটোল দেহটি বাঁকিয়ে বসে রইল।

—না হয় মাপ চাইছি।

সবিতা কঠিন।

মণীন্দ্র ওর হাতে ধরে শেষপর্যন্ত কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, মাপ করো আমায়! আমি আর থাকতে পারছি না। সত্যি বলছি, তোমার মুখ ভার দেখলে আমার কিছু ভালো লাগে না।

এতক্ষণে সবিতা কথা বলে,—হাত ছাড়ো।

—ছাড়ব না।

সবিতার চোখ দুটো এতক্ষণে জলে ভরে ওঠে।

আরও অনেক সাধ্য-সাধনার পর সবিতা স্বাভাবিক হতে পারে।

এমনি ভীষণ জেদি স্বভাব সবিতার।

বছরপাঁচেক এমনি করেই কাটল। তিনটি মেয়ে হল ওর। তিন মেয়ের মা হলেও সবিতার শরীর দেখে কিছু বোঝবার জো নেই। ছোটখাটো আঁটসাট গড়ন। ফরসা রং। চোখ দুটো বাদামি।

মণীন্দ্র মাস্টারির ওপরেও দু-একটা ছেলেকে পড়ায়। তাতেও কুলিয়ে ওঠে না।

মেজ জা মাঝে-মাঝে দু-চারটে কথা শোনাতে শুরু করল। মেজ ভাশুর রোজগার করত সবচেয়ে বেশি, তাই কথাবার্তা বলতে-কইতে মেজ জা সর্বেসর্বা।

একদিন বলে বসল, কারও যদি না পোষায়, চলে যেতে পারে যেখানে খুশি।

সবিতা রান্নাঘরে ছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, এ-কথাটা আরও আগে বললেই পারতেন, মেজদি।

মেজ জা ছাড়বার মেয়ে নয়, বললে, সব কথাই কি স্পষ্ট করে বলতে হয়!

—বেশ, চলেই যাব।

যে কথা সেই কাজ। মণীন্দ্র ফেরবার পর বললে সবিতা, এ-বাড়িতে আর সে জলগ্রহণ করবে না। এ-বাড়ি থেকে চলে যেতেই হবে।

মহা বিপদে পড়ল মণীন্দ্র। তার যা বিদ্যে, তাতে চাকরি ছাড়লে আর কি চাকরি পাবে?

—চলে যাব বললেই তো হয় না। পকেটে যে পয়সা নেই!

খুব হবে।—বললে সবিতা, চলো, কলকাতায় গিয়ে আমার বাপের বাড়ি উঠি। আমার ভাইরা একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

মণীন্দ্র জানত, সূর্য ভেঙে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সবিতার জেদ ভাঙবে না। তবে যাওয়াই যাক।

কলকাতায় চলে এল ওরা। বাপের বাড়িই উঠল সবিতা। ভাইয়েরা যখন শুনলে, স্বামীর কাজকর্ম কিছু নেই, কিছু একটা না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকবে, শুনে বিরক্ত হল। তবু রয়ে গেল সবিতা।

অতি কষ্টে ভাই-বউদের মন জুগিয়ে চলতে হত। তবু শ্বশুরবাড়ি আর সে কিছুতেই যাবে না। যা বলেছে তা করবেই।

বড় ভাই এক বন্ধুর প্রেসে মণীন্দ্রকে কম্পোজিটরের কাজ জুটিয়ে দিলে। প্রথম তিন মাস শিখতে হবে। তারপর মাইনে পাবে।

এর ভেতর আর-একটি বাচ্চা হল সবিতার। এটি ছেলে।

মাসপাঁচেক কাটাবার পর ভাইরা বললে আলাদা বাসা করতে—যদি প্রয়োজন হয়, তারা না হয় মাঝে-মাঝে কিছু সাহায্য করবে।

বাসা খুঁজতে লাগল মণীন্দ্র। সত্তর টাকা মাইনে পায় মণীন্দ্র। কলকাতায় এ-টাকায় কী করে চলবে?

সবিতা বললে, তবে না হয় কলকাতার একটু বাইরের দিকেই ঘর দ্যাখো।

—তাই হবে।

কলকাতার বাইরে ঘর পাওয়া গেল খড়দায়। মণীন্দ্রকে ট্রেনে যাতায়াত করতে হবে। তাই করবে মণীন্দ্র। ঘরখানি পেয়েছে ভালো আর ভাড়াটাও সস্তা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেখে ভদ্রলোক দয়া করে ভাড়া দিয়েছে।

এই ভদ্রলোকের নাম ব্রজদুলাল।

ব্রজদুলাল পয়সা করেছে, পয়সা রাখতেও জানে। তার পুরোনো লোহার দোকান আছে।

এ-ব্যবসায় প্রচুর পয়সা। তার ওপর ব্যবসা করতে বসে যে সাধু হলে চলবে না এ-কথা ব্রজদুলাল ভালোভাবেই জানত। তাই ব্যবসাই করত। খাঁটি ব্যবসা।

সবিতা চারটি সন্তান নিয়ে উঠল এই বাড়িতে। ব্রজদুলালের নিঃসন্তান স্ত্রী এসে কোলে টেনে নিলে বাচ্চা ছেলেটিকে। আদর করে অস্থির করে তুলল।

—আহা! কেমন গোপালের মতো চ্যায়রা দেখেচো?

ব্রজদুলাল হাসল। সবিতাও হাসল।

ব্রজদুলাল তাকাল। সবিতাও তাকাল।

ওর স্ত্রী কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সে ছেলে নিয়ে ব্যস্ত রইল। মণীন্দ্রও কিছু দেখতে পেল না। সে ঘর গোছাতে ব্যস্ত ছিল।

ব্রজদুলাল ভাবল, ব্রাহ্মণ কন্যাটি পরমাসুন্দরী—যেন স্বয়ং লক্ষ্মী।

কী জানি কেন মনে হল স্বয়ং লক্ষ্মী তার ঘরে এল।

সবিতা ভাবল, ভদ্রলোক বেশ সদাশয়। ধনী।

তাদের ওপর যদি সুনজর পড়ে, তবে এতদিনে একটা আশ্রয় পাওয়া গেল।

ব্রজদুলালের বন্ধ্যা, কালো স্ত্রী ভাবল, এতদিনে কয়েকটি বাচ্চা ঘরে এল তার। বড় ভালো হল। সে এতদিনে বাঁচল।

মণীন্দ্র কিছুই ভাবল না। ওর সব ভাবনা ও সবিতার ওপর ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন থেকে।

কিছুদিনের ভেতরেই ব্রজদুলালের স্ত্রী আপন করে নিলে সবিতাকে। তার কারণটা সবিতার ওপর ভালোবাসা নয়। ছোট ছেলেটির ওপর ভালোবাসা। ছেলেটিকে দিনরাত কোলে-কাঁখে রেখে ছানা-দুধ খাইয়ে একেবারে নিজের করে নিলে ব্রজদুলালের স্ত্রী।

সবিতা বাঁচল।

শরীরেও আর সবিতার সয় না। শেষ সন্তানটি হওয়ার পর সবিতা যেন রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। শরীর দুর্বল লাগে। ফরসা রং এখন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

ব্রজদুলালের সঙ্গে মণীন্দ্রর বন্ধুত্ব বেশ পাকা হয়ে উঠেছে, সেই সুবাদে ব্রজ সবিতাকে বলে, বামুনগিন্নির শরীর রোগা হচ্ছে কেন?

সবিতা হাসে। ঠাট্টা করেই বলে, যাকে ভালোবাসি, তাকে ভেবে-ভেবে।

—সে সশরীরে বর্তমান রয়েছে তো!

সবিতা বলে, শরীরটাই কি সব?

ব্রজদুলাল হাসে। কথাটার যে-মানে বুঝে ব্রজ হাসে সেই মানে বুঝেই হয়তো সবিতা হাসে। ওরা হাসে বলে মণীন্দ্র হাসে।

শুধু ডাল আর ভাত, একটি হয়তো তরকারি। এ ছাড়া আর কিছুই হয় না সত্তর টাকায়। তাও তিন মাসের ঘরভাড়া বাকি পড়ে।

মণীন্দ্র বলে, শেষকালে যদি উঠিয়ে দেয়।

—সে আমি বুঝব।

মণীন্দ্র মুখ বুজে ডাল-ভাত খেয়ে প্রেসের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে ছেলে নিতে এসে সবিতা দেখে ব্রজদুলাল খেতে বসেছে। সামনে বসে।

ব্রজ বলে, কী খবর বামুনগিন্নি?

সবিতা মিষ্টি হেসে বলে, অপরাধ হয়ে যাচ্ছে, তাই জানাতে এলাম।

—কী আবার অপরাধ?

—ভাড়াটা এ-মাসেও দিতে পারলুম না।

ব্রজ হেসে ওঠে।—এই কথা। ভাড়া না হয় না-ই দিলেন। আপনি আসবার পর ব্যবসা আমার ফেঁপে উঠেছে। শিগগিরই আর-একখানা বাড়ি কিনব।

—এ তো আনন্দের কথা!

ব্রজ গলাটা নিচু করে বলে, আমি জানি এ আপনার বরাতে। আপনাকে আমি ছাড়ব না কখনও।

সবিতা খিলখিল করে হেসে ওঠে। —পরের বউকে কি ধরে রাখা যায়?

ব্রজ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ওর স্ত্রী ঘরে ঢুকতেই চুপ করে যায়।

ব্রজর এই চুপ করে যাওয়াটা সবিতার একটু অদ্ভুত লাগে। মুখখানা ওর রাঙা হয়ে ওঠে। এ কী আশ্চর্য কাণ্ড! তার বুকটাও যেন কাঁপছে। মনটা যেন এক অভূতপূর্ব আবেগে ভরে উঠেছে।

সে চারটি সন্তানের মা। এ কথাও কি ভুল হয়ে গেল?

সবিতা ওখান থেকে উঠে চলে আসে।

ঘরে এসেও সবিতার বুকের কাঁপুনি থামে না। এ কী বিস্ময়! নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে সবিতা।

সত্তর টাকায় নিদারুণ অনটনে মাসকয়েক কাটে। তবু ব্রজদুলালকে কিছু বলে না। মণীন্দ্রকেও বলে না।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, ব্রজদুলালকে সবিতা প্রশ্রয় দেয় ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে। কেন যে ও প্রশ্রয় দিচ্ছে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। অথচ নিজের অভাবের কথা, কষ্টের কথা কিছুই বলে না।

ব্রজদুলালই একদিন সন্ধ্যায় বলে, বামুনগিন্নি, আমি যদি তোমাকে মাসে একশো টাকা দিই তোমার আপত্তি আছে?

—কেন দেবে?

ব্রজর স্ত্রী বাড়ি ছিল না। ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়েছিল আশেপাশের বাড়ি।

ব্রজ একটু এগিয়ে এসে বলে, সত্যি কথা বলব?

—বলো।

—তোমার কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না!

সবিতা হাসে। দুর্বল শরীরে হাসির প্রচণ্ড বেগে কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ে।

ব্রজ বলে, কিন্তু আমার স্ত্রী যেন না জানে।

সবিতা আরও হাসে। হাসতে-হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর থেকে প্রত্যেক মাসেই একশো টাকা করে দিয়েছে ব্রজ। সবিতা নিয়েছে। কী জানি কেন ওর মনে হয়েছে এটা ওর প্রাপ্য।

মণীন্দ্র খাবার-দাবার ভালো দেখে জিগ্যেস করেছে, টাকা কোথায় পেলে?

সবিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—কী হল, অত হাসছ কেন?

—ব্রজবাবু আমার ছেলেমেয়েদের দুধ খেতে টাকা দেয়।

মণীন্দ্র আর কথা বলে না।

কথা হয়তো মণীন্দ্র কোনওকালেই বলত না—একদিন সন্ধ্যায় যদি নিজে চোখে ওই দৃশ্যটি না দেখত। সন্ধের দিকে ব্রজর স্ত্রী বেড়াতে বেরোয় পাড়ায়।

এই সময়টায় সবিতা ব্রজর কাছে আসে। দুজনে গল্প করে। সবিতা হাসে। ব্রজ মুগ্ধ নয়নে দ্যাখে।

সেদিনও তেমনি এসেছিল।

ব্রজ ঘরের নীল আলোটা জ্বালিয়ে সবিতার গা ঘেঁষে বসল। সবিতা সরে বসল। হাসতে লাগল। ব্রজ বলল, একটু কাছে বসতেও পারো না?

—পরের বউয়ের কাছে বসতে নেই।

তুমি কি সত্যিই আমার পর?—ব্রজর কথায় একটু নাটকীয় ঢং ছিল।

সবিতা হাসতে লাগল। হাসিটা ওর রোগ হল কি না কে জানে?

ব্রজ সরে এসে ওর কাঁধের ওপর মুখটা রাখল। সবিতা কিছু করার, কিছু বলবার আগেই দেখতে পেল, মণীন্দ্র দরজার সামনে থেকে সরে গেল।

মুহূর্তে ওর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল ও। ব্রজকে একটা কথা বলবার অবসর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে দেখল মণীন্দ্র জামা পরনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সবিতাকে দেখে একবার তাকাল শুধু। চোখদুটি বেশ রাঙা।

সবিতা ইচ্ছে করেই দু-চারবার ঘরের ভেতর এটা-ওটা নিতে ঢুকল, বেরোল, কিন্তু মণীন্দ্র ওর দিকে আর তাকালও না। কথাও বলল না।

রাতের পূর্বাভাষ। সবিতা আশঙ্কা করছিল, বদমেজাজি মণীন্দ্র কখন ওর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠবে। চিৎকার কিন্তু করল না মণীন্দ্র।

সবিতা একটু বিস্মিত হল, ভীতও হল।

সাহস করে একবার জিগ্যেস করলে, শরীর খারাপ লাগছে? শুয়ে পড়লে যে?

মণীন্দ্র তাকাল। তেমনি রক্তবর্ণ চোখ। বললে, এমনি।

সবিতা আর কথা বলল না। মণীন্দ্র তখন আর কথা বলল না। কথা বললে খাওয়ার সময়। সবিতা বললে, খেতে চলো।

মণীন্দ্র গম্ভীর স্বরে শুধু বললে, তোমার হাতে খেয়ে কি জাতটা দোব?

সবিতা ভ্রু দুটো কুঁচকে বললে, তার মানে?

—মানেটা খুবই সোজা। ন্যাকা সাজবার কোনও প্রয়োজন নেই। কাল থেকে আমি হোটেলে খাব।

—বেশ, খেয়ো।

সবিতা আর কথা না বলে চলে গেল।

এরপর থেকে সবিতা সন্ধের পর পর্যন্ত ব্রজদুলালের কাছে থাকত। মণীন্দ্র এলেও গ্রাহ্য করত না। অগ্রাহ্যটা ইচ্ছাকৃত।

মণীন্দ্র কী ভাবত কে জানে! শুধু ওর কানে আসত ব্রজর সঙ্গে ওর টুকরো-টুকরো কথা আর সবিতার খিলখিল হাসি। আশ্চর্য এই যে, মণীন্দ্র কিছুদিন পর্যন্ত এ সবই সহ্য করল, কিছুই বলল না। সবিতা অবাক হল।

একদিন রাত ন'টা বেজে গেছে।

সবিতা তখনও ঘরে ফেরেনি। ছেলেপুলেরা না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। মণীন্দ্র শুয়ে আছে তেমনি।

এত দেরি সবিতা কখনও করে না। হয়তো ব্রজদুলালের স্ত্রী এখন নেই বলেই এত দেরি করছে। ওর স্ত্রী গেছে বাপের বাড়ি। সঙ্গে সবিতার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। ছেলেটা সবিতার কাছে এখন থাকেই না। ব্রজদুলালের স্ত্রীর কাছেই থাকে। তাকেই মা বলে।

সবিতার এতে একটু ক্ষোভ তো নেই-ই উলটে যেন ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়েছে মনে হয়। বাড়াবাড়িটা তাই বড় বেশি হচ্ছে। এই যে এতদিন মণীন্দ্র হোটেলে খাচ্ছে, একটা কথাও বলছে না। তাতে সবিতার যেন কোনও ভ্রুক্ষেপও নেই। মাথার চাঁদিটা জ্বলতে থাকে মণীন্দ্রর।

ইচ্ছে হয় সবিতার গলাটা টিপে মেরে ফেলে।

রাত দশটা বেজে যায়।

আর অপেক্ষা করা যায় না। মণীন্দ্র ওঠে।

বাইরে এসে দ্যাখে দরজাটা ভেজানো। দরজাটা খুলতে ওর সাহস হয় না। জানালাটাও বন্ধ। রাগে-ক্ষোভে কাঁপতে-কাঁপতে এসে শুয়ে পড়ে মণীন্দ্র।

রাত এগারোটা বেজে গেছে।

সবিতা ঘরে ঢোকে। আলোয় একটু লক্ষ করলে দেখা যায় মুখখানা ওর কাগজের মতো সাদা। এসে মণীন্দ্রকে ধাক্কা দেয়।—শুনছ?

সবিতার হাতদুটো বরফের মত ঠান্ডা।

শুনছ।—সবিতার গলা কাঁপছে।

মণীন্দ্র গর্জন করে ওঠে।—ছুঁয়ো না। ও-ঘরে রাতটা কাটিয়ে সকালে কিছু টাকা নিয়ে এলেই পারতে?

তুমি ইতর।—সবিতার গলা এখনও কাঁপে উত্তেজনায়।

—চোপ! আর একটা কথা বললে গলা টিপে কথা বন্ধ করে দোব।

সবিতার কথা শোনা যায় না আর।

মণীন্দ্র হঠাৎ উঠে সবিতাকে ধরে কাঁপায়।—একটা কথা আমার কাছে আজ স্বীকার করো। আমাকে কি কখনও একটু ভালোবাসনি? বলো।

সবিতা পাথর হয়ে গেছে।

—আমি কথা দিচ্ছি, কাল আমি ছেলেদের নিয়ে এ-বাড়ি থেকে চলে যাব। তোমাকে ব্রজদুলালের কাছে দিয়ে যাব। বলো, একটুও ভালোবাসনি আমাকে?

সবিতা কঠিন কণ্ঠে বলে, না।
মণীন্দ্র হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে।
এর পরদিনই ভোরে সবিতাকে রেল লাইনের ধারে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে কি মণীন্দ্রই ওকে রাত্রে গলা টিপে মেরে লাইনের ওপর গলাটা পেতে ওকে শুইয়ে এসেছিল!
মণীন্দ্রই ওকে মেরেছে তবে?
এত বড় অপরাধ মণীন্দ্র কেন করল? ও তো সবিতাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। তবে?
ব্রজদুলালের সঙ্গে সেদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কী কথা হয়েছিল সবিতার?
রাত সাড়ে ন'টার পর থেকে সবিতা বারবার উঠতে গিয়েছিল। ব্রজদুলাল বাধা দিয়েছে।
—রাত অনেক হল। এবার যাই।
ব্রজদুলাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সবিতার হাতদুটো চেপে ধরে বলে, যেতে দেব না।
আপনার কী মতলব?—সবিতা কঠিন স্বরে হঠাৎ ওকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিল।
ব্রজদুলাল একটুও না ঘাবড়ে বলেছিল, আমার মতলব কি তোমার অজানা? আমার টাকা আছে কিন্তু আমি অত্যন্ত অসুখী। আমার স্ত্রী আমাকে সুখী করতে পারেনি।
—তা আমি কী করতে পারি?
—তুমি আমার হও, সবিতা।
—কী যা-তা বলছেন। ছাড়ুন।—সবিতা জোর করে।
হাতদুটো জোর করে চেপে ধরে ব্রজদুলাল বলে, না, ছাড়ব না।
সবিতা ভয় পেয়ে বলে, ছাড়ুন, নইলে আমি চেঁচাব। ও-ঘরে আমার স্বামী আছে, জানেন?
ব্রজ হাসে।—তোমার স্বামীকে আমি একটা পোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে পারি।
—আপনি এত নীচ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। গরিবকে দয়া করেন, ভালোবাসেন বলে ভাবতাম। আপনার সাহায্য করবার পেছনে এত নীচ মতলব ভাবতেও পারিনি।
—মাসে-মাসে একশো টাকা করে দিয়েছি, সে কি ভেবেছ তোমরা খেতে পাওনা বলে দয়া করে?
—তাই ভেবেছিলাম। তাই আপনাকে শ্রদ্ধা করেছিলাম। আপনার অনেক অন্যায় আবদার সহ্য করেছিলাম। এখন দেখছি সহ্য করে ভালো করিনি।
ব্রজদুলালের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।—দ্যাখো, লোহার কারবার করি। মনটাও লোহার মতো। তোমাকে আমি চাই। যদি না পাই, তোমাকে জন্মের মতো মেরে ফেলব, আর কাউকে ভোগ করতে দেব না।
সবিতা হেসে ফেলেছিল।—মারবেন? আপনি কি পাঁচবছরের মেয়ে পেয়েছেন?
ব্রজদুলালের গলা কাঁপে।—তুমি আমাকে চেনো না সবিতা। খুন না করলেও আধমরা আমি অনেক মেয়েকে করেছি। টাকায় সব হয়। তুমি তো রাস্তার ভিখিরি, তোমাকে আর তোমার ওই স্বামীকে মেরে পুঁতে ফেললেও কেউ টের পাবে না।
সবিতা সত্যি-সত্যি ভয় পায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বেশ, আসব, এখন ছাড়ুন। রাত তিনটের সময় আসব।
—আসবে? না এলে রাত তিনটেয় আমি যাব। জ্যান্ত না পারি তোমাকে মেরে নিয়ে আসব।
সবিতা আর কথা না বলে বেরিয়ে এসেছিল।
রাত তখন সওয়া এগারোটা। ঘরে ঢুকে ও মণীন্দ্রকে ডেকে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিল যে, পুলিশে খবর দাও। আর না হয় চলো আমরা এখুনি কলকাতায় ভাইদের ওখানে চলে যাই।
বলবার সুযোগ মণীন্দ্র দেয়নি। তার আগেই চিৎকার করে উঠল।
বুকটা ভেঙে গেল সবিতার। পাথর হয়ে বসে রইল।

পরদিন ভোরে রেললাইনের ধারে কাটা অবস্থার পাওয়া গেল ওকে। তবে কি ব্রজদুলালই ওকে মেরে ফেলল! রাত তিনটের সময় ঘরে গিয়ে মুখ চেপে ধরেছিল। সবিতা হয়তো ধস্তাধস্তি করতে গিয়েছিল। পাছে মণীন্দ্রর ঘুম ভেঙে যায় তাই ব্রজদুলাল হয়তো ওর মুখ-নাক-গলা চেপে ধরেছিল। পরে যখন দেখল মরে গেছে, তখন রেললাইনের ওপর গলাটা দিয়ে ওকে শুইয়ে রেখে চলে এসেছিল। নিজে বাঁচবার জন্যে। তাই কি?

আমি জানি কে সবিতাকে মেরেছে। আপনারাও জানেন কিন্তু—হয়তো তাকে চিনেও চেনেন না। সে অতি ভীষণ, অতি বীভৎস।

আমি নিশ্চিত জানি, সে-ই সবিতাকে মেরেছে।

ব্রজদুলাল তাকে মারেনি। ব্রজদুলাল মুখে যা-ই বলুক। তার পয়সা আছে, কিন্তু সে ভিতু। সে কাপুরুষ। সে মারতে পারে না।

মণীন্দ্র মারেনি। মণীন্দ্র সবিতাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। মণীন্দ্র গরিব, কিন্তু মণীন্দ্র তার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছিল সবিতাকে। মণীন্দ্র ওকে মারতে পারে না। মণীন্দ্র বরং নিজে মরতে পারত, কিন্তু ওকে মারতে পারত না।

ওকে যে মেরেছে সে অতি ক্রুর অতি নিষ্ঠুর, ভীষণ ভয়াবহ তার স্বভাব।

আমি তার নাম জানি। বহু অসহায় জীবন সে হত্যা করেছে। এই নিষ্ঠুর বীভৎস হত্যাকারীটিকে আমি চিনি।

আমি তার নাম জানি।

কে জানে না? তার নাম দারিদ্র্য।

সে-ই সবিতাকে মেরেছে।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৬০



ভয়ঙ্কর সবুজ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভাদুড়ী এতক্ষণ মুখ খোলেনি। এইবারে খুলল। বলল, 'অর্থাৎ মার্ডারটা আপনাদের নাকের ডগাতেই হয়েছে। কেমন?'

প্রশ্ন শুনে শ্যামজি একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর, ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে লজ্জিত গলায় বললেন, 'আমি বুঝতে পারছিনে, আপনি ঠাট্টা করছেন কি না। অবশ্য, ঠাট্টাও যদি করেন, আমাদের কিছু বলবার নেই। হ্যাঁ, মার্ডারটা একেবারে একজিবিশন-হাউসের মধ্যেই হয়েছে বটে।'

'এবং এটা একটা ক্রাইম-একজিবিশন?'

'হ্যাঁ।'

'এবং পুলিশ-বিভাগ থেকেই এই ক্রাইম-একজিবিশনের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই না?'

'ঠিক তাই।'

ভাদুড়ী তার টিন থেকে একটি সিগারেট ধরিয়ে নিল। তারপর টিনটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'শ্যামজি, আমি ঠাট্টা করছিনে। পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক ঠাট্টা-তামাশার নয়। তবু যে এত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছি, তার কারণ, কয়েকটা ব্যাপারে আমি একেবারে নিঃসংশয় হতে চাই। এবং সেইজন্যেই আমি আশা করব যে, ঘটনার বিবরণটা আপনি গোড়া থেকে, আর একবার বলে যাবেন। আপনার আপত্তি আছে?'

শ্যামজি বললেন, 'কিছুমাত্র না। কিন্তু, তার আগে এক কাপ চা খাওয়ান।'

চা এল। নিঃশব্দে চা খেলাম আমরা। তারপর শ্যামজি আবার গোড়া থেকে তাঁর গল্প বলতে শুরু করলেন।

পাঠককে এইখানে স্থান-কাল-পাত্রের একটা আভাস দিয়ে রাখা দরকার। স্থান—পশ্চিম ভারতের একটি প্রধান শহর। কাল—নভেম্বরের সন্ধ্যা। পাত্র—ভাদুড়ী, শ্যামজি এবং আমি।

না, ঘনশ্যাম ভাদুড়ীকে আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা বলতে পারিনে। পেশায় সে অধ্যাপক। এখানকার একটি কলেজে সে দর্শনশাস্ত্র পড়ায়। তবে, অবসর সময়ে সে অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করে বটে। ইতিপূর্বে গুটিকয়েক মার্ডার-কেসের কিনারা করতে সে এখানকার পুলিশকে কিছু সাহায্যও করেছে। তা নইলে কি আর শ্যামজি আজ এইখানে ছুটে আসতেন? শ্যামজির পুরো নাম শ্যামনন্দন শাস্ত্রী। তিনি এখানকার পুলিশ-বিভাগের একজন মাঝারি অফিসার।

বাকি রইলাম আমি। আমার পরিচয় আর কী দেব? সুবিখ্যাত লেখক কৃতাঞ্জলি কারফর্মাকেও যদি আজ আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে হয়, তবে তার চাইতে শোকাবহ ব্যাপার আর কী হতে পারে। সে যাক, ঘনশ্যামের আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে নিয়ে একখানি বইও আমি লিখেছি। বইখানির নাম ''ভাদুড়ীর বাহাদুরি''। আপনারা পড়ে থাকবেন।'

শ্যামজি বললেন, 'মিঃ ভাদুড়ী, আপনি জানেন যে, পুলিশ-বিভাগ থেকে ফি বছরই এই শহরে একটা ক্রাইম-একজিবিশনের আয়োজন করা হয়। একজিবিটগুলি নানারকমের। ডাকাতি, রাহাজানি, গুণ্ডামি ইত্যাদি ব্যাপারে যেসব অপরাধীর নাম এখন প্রায় কিংবন্তিতে পরিণত হয়েছে, এই একজিবিশনে তাদের ফটোগ্রাফ তো থাকেই, তা ছাড়া থাকে অসংখ্য রকমের অস্ত্রশস্ত্র। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্রগুলিরও প্রায় প্রত্যেকটিরই কিছু-না-কিছু ইতিহাস আছে। বিখ্যাত ডাকাত কদম সিংয়ের কোমর থেকে যে-তলোয়ার ঝুলত; কিংবা প্রসিদ্ধ পকেটমার বিল্লু খাঁ যে-কাঁচি ব্যবহার করত; কিংবা দি গ্রেট রেডল্যাম্প ব্যাঙ্কে ডাকাতির সময় মুখোশধারী দস্যুরা যে-স্টেনগান চালিয়েছিল; কিংবা সাধু-লুঠেরা জিওনবাবার সেই ভয়ংকর চিমটে, যা দিয়ে সে কিনা অন্তত পঁচিশজন তীর্থযাত্রীর প্রাণ-সংহার করেছে, একজিবিশনে গেলে এই সমস্তই আপনি দেখতে পাবেন।

'কিন্তু না, তলোয়ার কিংবা কাঁচি কিংবা স্টেনগান কিংবা চিমটের কথা আমি বলতে আসিনি। আমি বলতে এসেছি একগাছা দড়ির কথা। এবারকার সেরা একজিবিট ছিল এই দড়ি।'

একমিনিট চুপ করে রইলেন শ্যামজি। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'মিঃ ভাদুড়ী, দেড়শো বছর আগে যার দৌরাত্ম্য ছিল সীমাহীন, যার দাপটে তখন শাহি সড়ক দিয়ে কেউ হাঁটতে সাহস পেত না, সেই দিলওয়ার খাঁ-র নাম আপনি শুনেছেন কি না, আমি জানিনে। এই দড়িগাছা আর কারও নয়, দিলওয়ার খাঁ-র। দিলওয়ার ছিল দস্যুরাজ। সিল্কের একটা সরু লিকলিকে দড়ি, তাই দিয়ে যে কত লোককে সে ফাঁসি দিয়েছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। মিউটিনিরও প্রায় বছর চল্লিশেক আগে—আনুমানিক ১৮২০ সনে—তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুটা ঈষৎ রহস্যময়। অনেকে বলে, সে অসুখে ভুগে মারা যায়। আবার অনেকে বলে, তার এক শাকরেদ, ওই সিল্কের দড়ি দিয়েই তাকে হত্যা করেছিল।

'সে যা-ই হোক, দিলওয়ারের মৃত্যুর পর এ-হাত ও-হাত ঘুরতে-ঘুরতে সেই ভয়ঙ্কর দড়িগাছা যে শেষপর্যন্ত—১৮৯০ সনে—কীভাবে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছয়, তা যদি জানতে হয় তো দয়া করে আপনি কর্নেল রাউটল্যান্ডের ''মাই ডেজ ইন ইন্ডিয়া'' বইখানা একবার পড়ে দেখবেন। আপাতত জেনে রাখুন যে, এবারকার ক্রাইম-একজিবিশনে ওই দড়িগাছাই ছিল আমাদের সেরা একজিবিট। এবং ওই দড়িগাছাই আরও একটি মনুষ্যজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।'

ভাদুড়ী বলল, 'কোথায় হচ্ছিল আপনাদের একজিবিশন?'

'বরাবর যেখানে হয়। পুলিশ-ক্লাবে।'

শুনে, এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভাদুড়ী। তারপর বলল, 'পুলিশ-ক্লাবের বাড়িটা আমি দেখেছি। কিন্তু ভিতরে যাইনি। সুতরাং আমি খুশি হব, আপনি যদি এই বাড়িটার একটা নিখুঁত বর্ণনা দেন।'

শ্যামজি বললেন, 'বর্ণনার বিশেষ কিছু নেই। সামনে একটা বড় ঘর। তার ঠিক পেছনে, ঠিক সেই মাপেরই, আর-একটা ঘর। তারপর বারান্দা। বারান্দার পেছনে আরও-একটা ঘর আছে। তবে সেটা অনেক ছোট মাপের। এবং ছোট্ট সেই ঘরটাতে এবারে আমরা একটিমাত্র একজিবিট রেখেছিলাম।'

'অর্থাৎ সিল্কের দড়িগাছা রেখেছিলেন, কেমন?'

'হ্যাঁ।'

'আর কিছু ছিল না?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে শ্যামজি বললেন, 'ছিল। দিলওয়ার খাঁ-র একটা ছবি। বলা বাহুল্য, ফটোগ্রাফ নয়। দিলওয়ার খাঁ সম্পর্কে যেসব গালগল্প এবং কিংবদন্তি চালু রয়েছে, তাতে তার চেহারার কিছু-কিছু বর্ণনা

পাওয়া যায়। সেই বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে, এখানকারই একজন আর্টিস্টকে দিয়ে আমরা একখানা ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলাম। ছোট্ট একটা টেবিলের ওপরে, সিল্কের সেই দড়ির পাশে, দিলওয়ারের ছবিখানাকেও একটা একজিবিট হিসেবে রাখা হয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর এই খুন।'

'কখন খুন হয়েছে?'

'সোমবার বিকেলে। পৌনে পাঁচটার সময়।'

'আর আজ মঙ্গলবার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ভাদুড়ী। তারপর বলল, 'কিন্তু, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে, শ্যামজি। একজিবিশন-বাড়ি, মানুষজনের ভিড় সেখানে লেগেই আছে, তার মধ্যে কী করে খুন হয়?'

শ্যামজি বললেন, 'সেই কথাই বলছিলাম। একজিবিশন তো সারাদিনই খোলা থাকে, কিন্তু ভিড় সাধারণত ছ'টার আগে হয় না। তার কারণ, অফিস-কাছারি এখানে সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ হয়। আর, এক্ষেত্রে খুন হয়েছে মোটামুটি পৌনে পাঁচটার সময়। একজিবিশন-হল তখন ফাঁকা। থাকবার মধ্যে শুধু একজন দারোয়ান ছিল। সে ছিল সামনের ঘরে, সেইখানেই তার থাকবার কথা।'

'দারোয়ান কী বলল?'

'তার কথায় কোনও ক্লু নেই। সে বলছে যে, বিকেল স-চারটে নাগাদ তিনজন দর্শক এসে একজিবিশন-বাড়িতে ঢোকে। দুজন এসেছিল একসঙ্গে; একজন আলাদা। সামনের ঘরটায় মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র থাকে। সেখানে তারা মিনিটদশেক ছিল। সেখান থেকে, পেছনের ঘর হয়ে, তারা ওই ছোট-ঘরটার দিকে চলে যায়। তারও মিনিটদশেক বাদে, দারোয়ান হঠাৎ শুনতে পায় যে, সেই ঘরটার দিকে থেকে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসছে।'

'দারোয়ান তখুনি ছুটে গিয়েছিল নিশ্চয়?'

'তক্ষুনি। সে গিয়ে দেখতে পায়...ওঃ, সে এক বীভৎস দৃশ্য! মেঝের ওপরে টান হয়ে শুয়ে আছে একটা মানুষ। গলায় তার ওই সিল্কের দড়ি। আর...আর বাকি দুজনে পরস্পরকে জাপটে ধরে আছে। জাপটে ধরে চেঁচাচ্ছে "খুন! খুন!" বলা বাহুল্য, দরোয়ান তাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করে। এবং তারপরেই সে বড় থানায় একটা ফোন করে দেয়।'

'ফোন পেয়েই আপনি বড়-থানা থেকে পুলিশ-ক্লাবে চলে যান?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, অনেক জেরা করেও, কে যে আসল খুনি, তা আপনি জানতে পারেননি?'

'শুধু জেরা নয়,' ডান চোখটাকে অল্প একটু ছোট করে শ্যামজি বললেন, 'অন্য কিছু ওষুধও আমি প্রয়োগ করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। দেওশঙ্কর বলছে, রঘুবীর খুনি। আর রঘুবীর বলছে, দেওশঙ্করই খুন করছে।'

'যে-দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বুঝি ওই নাম?'

'হ্যাঁ।'

'আর যে মারা গিয়েছে, তার?'

'প্রীতম।'

'প্রীতম কি একলা এসেছিল?'

'না। প্রীতম এসেছিল রঘুবীরের সঙ্গে। দেওশঙ্কর এসেছিল একলা।'

'রঘুবীর কী বলছে?'

'বলছে যে, ছোট-ঘরটার সঙ্গে যে একটা অ্যাটাচড বাথরুম আছে, মিনিটতিনেকের জন্যে সে সেই বাথরুমে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে দ্যাখে, প্রীতম ভূমিশয্যায় শুয়ে আছে, এবং দেওশঙ্কর পালাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে দেওশঙ্করকে জাপটে ধরে।'

'দেওশঙ্কর কী বলছে?'

'দেওশঙ্করও ওই একই কথা বলছে। বলছে যে, সে বাথরুমে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে দ্যাখে, একজন একেবারে মেঝের ওপর শুয়ে আছে, এবং অন্যজন পালাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গেই, একটা কিছু ঘটেছে সন্দেহ করে, পলায়মান ব্যক্তিটিকে সে জাপটে ধরে।'

হতাশ ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়লেন শ্যামজি। তারপর বললেন, 'আশ্চর্য! কাল বিকেল থেকে, ক্রমাগত, এই একই কথা তারা বলে যাচ্ছে। এ বলছে, ও খুনি; ও বলছে, এ। খুনের ব্যাপারে এ ছাড়া আর একটা কথাও তাদের মুখ থেকে আমি বের করতে পারিনি।'

আমি, শ্রীকৃতাঞ্জলি কারফর্মা, এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম। কিন্তু আর আমার পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হল না। ঘনশ্যামের টিন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে, আমি বললাম, 'কিন্তু, শ্যামজি, এমনও তো হওয়া সম্ভব যে, রঘুবীর আর দেওশঙ্করের মধ্যে কেউ খুন করেনি। এমনও তো হতে পারে যে, তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এসে প্রীতমকে হত্যা করেছে।'

শ্যামজি বললেন, 'না, তা সম্ভব নয়। এইজন্যে নয় যে, পুলিশ-ক্লাবের বাড়িতে ঢুকবার আর দ্বিতীয় কোনও দরজা নেই। দরজা ওই একটিমাত্র। সামনের দিকে। এবং সামনের দরজা দিয়ে যদি আর-কেউ আমাদের ক্লাবে ঢুকত, অথবা ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেত, তা হলে দারোয়ানই তাকে দেখতে পেত। না, খুন এক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি করেনি। করেছে ওই দুজনের মধ্যেই একজন। কিন্তু সেই একজন যে কোনজন, রঘুবীর না দেওশঙ্কর, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিনে।'

বললাম, 'আরও একটা অলটারনেটিভ আছে, শ্যামজি। এমনও হতে পারে যে, দুজনেই ওরা খুনি। ষড় করে, সম্মিলিত উদ্যোগে, ওরা প্রীতমকে হত্যা করেছে।'

শ্যামজি বললেন, 'তাও সম্ভব নয়। রঘুবীর আর দেওশঙ্করের মধ্যে যদি যোগসাজশ থাকত, প্রীতমকে হত্যা করে তাহলে নির্বিঘ্নেই ওরা সরে পড়তে পারত, এবং সেইটেই হত স্বাভাবিক।'

আমি বললাম, 'ও।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু, রঘুবীর আর দেওশঙ্করের মধ্যেই একজন যে খুনি, তাতে তো আর সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে ওদের দুজনকেই আপনি ঝুলিয়ে দিচ্ছেন না কেন? দুজনকেই যদি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নির্দোষেরও শাস্তি হবে বটে, কিন্তু দোষীরও হবে।'

শ্যামজি বললেন, 'ছিয়া-ছিয়া, কারফর্মাজি, ঝুলিয়ে দেওয়ার আমি কে! আর তা ছাড়া, ঝুলিয়ে দেওয়ার মালিক যদি আমি হতুমও, তাহলেও ঝুলিয়ে দিতুম না। কেননা, আমি হুবার্ট-সাহেবের শিষ্য। সাহেব বলতেন, ''দোষীকে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া আরও বড় পাপ।'' না, কারফর্মাজি, পাইকিরি শাস্তিবিধানে আমার আস্থা নেই।'

আমি বললাম, 'অ।'

তারপর নিস্তব্ধতা। আমি কথা বলছিনে; শ্যামজি কথা বলছেন না; ভাদুড়ী নীরব। করতলে থুতনি রেখে সে চুপটি করে বসে আছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই একটা চিন্তা হঠাৎ আমার মাথায় এসে ঝিলিক দিয়ে গেল। অত্যন্তই অদ্ভুত এবং অত্যন্তই ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা। শ্যামজির কানের কাছে মুখ নিয়ে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে, আমি বললাম, 'কিন্তু শ্যামজি, একটা কথা আপনি ভেবে দেখেননি। দিলওয়ার খাঁ হয়তো মারা যায়নি; সে হয়তো বেঁচে আছে। এবং...এবং... দারোয়ানের ছদ্মবেশে...দিলওয়ারই হয়তো...।'

'প্রীতমকে হত্যা করেছে! কেমন?'

বলতে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু শ্যামজি এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে, আমার আর বাকস্ফূর্তি হল না। অনেকক্ষণ, প্রায় মিনিটদুয়েক, সেই একই দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কারফর্মাজি, আপনি অঙ্ক জানেন?'

ঢোক গিলে বললাম, 'না।'

শ্যামজি বললেন, 'খুবই স্বাভাবিক। কেননা, যোগ-বিয়োগের অতি সাধারণ নিয়মগুলোও যদি আপনার জানা থাকত, তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে যার জন্ম, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই যার অত্যাচার ছিল অবাধ, বিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠ দশকে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এক যদি মন্ত্রবলে বেঁচে থাকে, তো সে আলাদা কথা। কিন্তু, আমি পুলিশের লোক, তার চাইতেও বড় কথা, আমি হুবার্ট-সাহেবের শিষ্য। মন্ত্রবলে আমার বিশ্বাস নেই।'

শুনে আমি চুপ করে গেলাম।

ভাদুড়ী তখন মুখ খুলল। বলল, 'শ্যামজি, আর মাত্র একটা কথা আমি জানতে চাই। যে-দড়ির বয়স প্রায় দেড়শো বছর, আজও তা এত শক্ত আছে কীভাবে?'

শ্যামজি বললেন, 'এ অতি সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরে বলি, সিল্কের দড়ি সাধারণত সুতোর দড়ির চাইতে অনেক মজবুত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে এই সিল্কের দড়িটা আজও জীর্ণ হয়ে যায়নি, তার একটা দ্বিতীয় কারণ আছে। দড়িটা যাতে জীর্ণ হয়ে না যায়, তার জন্যে আমরা অনেক কাল থেকেই একটা কেমিক্যাল সলিউশন ব্যবহার করে আসছি।'

ভাদুড়ী বলল, 'ব্যস, আর আমার কিছু জানবার দরকার নেই। শ্যামজি, কাল সকালে আবার আপনার সঙ্গে কথা হবে। আজ আপনি যেতে পারেন।'

রাত হয়েছিল। শ্যামজিকে বিদায় দিয়ে আমরা খেতে বসলাম। খাবার টেবিলে রোজই আমাদের মধ্যে নানারকমের কথাবার্তা হয়ে থাকে। আজ হল না। ভাদুড়ী একেবারে নীরব। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দুজনে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ভাদুড়ী তবু মুখ খুলল না।

মুখ খুলল একেবারে শোওয়ার ঘরে গিয়ে। বলল, 'কৃতাঞ্জলি, তুমি তো সাহিত্যিক, ''সবুজ'' কথাটার বিশেষণ তুমি জানো?'

প্রশ্নটা অতি অবান্তর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাদুড়ীকে আমি চিনি। মাঝে-মাঝে তার মস্তিষ্কে এইসব অবান্তর প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। অন্য-কেউ হলে এসব প্রশ্ন শুনে হয়তো চটে যেত। কিন্তু আমি যেহেতু তার অত্যন্তই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অবান্তর হলেও এইসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমার উপায় থাকে না।

বললাম, 'কেন? সবুজের বিশেষণ তোমাকে দিয়ে কী হবে?'

'আচ্ছা, বলোই না।'

'এই ধরো ''গাঢ়'' সবুজ, কী ''ঘন'' সবুজ।'

ভাদুড়ী বলল, 'না-না, ওসব গাঢ় কিংবা ঘন দিয়ে হবে না।'

'কী দিয়ে হবে?'

'এই যেমন ''টকটকে'' লাল কী ''কুচকুচে'' কালো। তেমন কিছু জানো?'

বললাম, 'না। সবুজের, আমার মনে হয়, টকটকে কী কুচকুচে-র মতন কোনও বিশেষণ নেই। তবে হ্যাঁ, সবুজ যদি খুব ভয়ঙ্কর রকমের সবুজ হয়, তবে তাকে তুমি ''কটকটে'' সবুজ বলতে পারো।'

ভাদুড়ী বলল, 'শাবাশ!'

তারপর, শিয়রেই ফোন ছিল, ক্র্যাডল থেকে রিসিভারটা তুলে ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে বলল, 'হ্যালো...কে? ...শ্যামজি...হ্যাঁ, আমি...আমি ভাদুড়ী কথা বলছি...একটা অনুরোধ আছে...কাল সকালে, এই ধরুন আটটা নাগাদ, আপনি চলে আসুন...হ্যাঁ, দেওশঙ্কর আর রঘুবীরকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে আসবেন...ধন্যবাদ।'

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। ভাদুড়ীর রিডিংরুমে আমরা বসে আছি। আমি, ভাদুড়ী আর শ্যামজি। রিডিংরুমের সামনের ঘরটাই বৈঠকখানা। বৈঠকখানা থেকে রিডিংরুমে ঢুকতে হলে যে-দরজাটা পেরিয়ে আসতে হয়, অন্যদিন সেটা খোলাই থাকে। আজ ভেজানো।

বৈঠকখানায় কারা বসে আছে, আমি জানি। বসে আছে রঘুবীর, দেওশঙ্কর আর একজন পাহারাওয়ালা। বাড়ির বাইরে, সুরকি-ঢালা পথের ওপরে, কালো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রিজন-ভ্যান। যাতে করে ওরা তিনজন—রঘুবীর, দেওশঙ্কর আর পাহারাওয়ালা—এই একটু আগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। শ্যামজি এসেছেন আলাদা গাড়িতে। জিপে। ভাদুড়ীর মুখটা যেন থমথম করছিল। আমি জানি, সারারাত সে ঘুমোয়নি। মাঝরাত্তিরে—তখন প্রায় আড়াইটে বাজে—আমার একবার ঘুম ভেঙে যায়। ঘরে তখন আলো জ্বলছিল না। কিন্তু আকাশে তখনও জ্যোৎস্না ছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, ভাদুড়ী তার বিছানার ওপরে বসে আছে। মনে হচ্ছিল, মানুষ নয়, কালো পাথরের একটা স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তি। আমি তাকে ডাকিনি। বিছানা থেকে সে উঠে গেল, রিডিংরুমে গিয়ে ঢুকল, তখনও না। তার খানিক বাদে আমি শুনতে পেলাম, টাইপরাইটারের আওয়াজ আসছে। খটখট, খট—খটখট, খট—খটখট...।

ভাদুড়ী টাইপ করছিল। কী যে টাইপ করছিল, আমি জানিনে। টাইপরাইটারের সেই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর শব্দ শুনতে-শুনতেই আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ভাদুড়ী বলল, 'শ্যামজি, আপনি রঘুবীরকে ডাকুন।'

শ্যামজি উঠতে যাচ্ছিলেন। ভাদুড়ী তাকে বাধা দিল। বলল, 'উঠতে হবে না। আপনি এখান থেকেই ডাকুন।'

ডাক শুনে, মাঝখানকার ভেজানো দরজাটাকে খুলে দিয়ে, সে এসে রিডিংরুমে ঢুকল। তার চেহারাটা সত্যিই দেখবার মতো। বয়েস বড়জোর পঁচিশ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ' ফুট। খড়্গনাসা। গায়ের রঙে যেন আগুন জ্বলছে। চোখ দুটি গাঢ় নীল; দৃষ্টিতে ঈষৎ কৌতুক মেশানো। শুধু, কপালের বাঁদিকে—প্রায় ছন্দপতনের মতো—মস্ত একটা ক্ষতচিহ্ন।

ভাদুড়ী বলল, 'বোসো। তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করব।'

চেয়ারে বসে, হাতলে হাত রেখে, নির্লিপ্ত কণ্ঠে রঘুবীর বলল, 'করুন। পরশু বিকেল থেকে তো শুধু প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যাচ্ছি।'

ভাদুড়ী বলল, 'এতেই এত আপত্তি? এরপর যখন তোমাকে কোর্টে প্রডিউস করা হবে, পাবলিক-প্রসিকিউটর যখন জেরায়-জেরায় তোমাকে জেরবার করে দেবেন, তখন মনে হবে, পুলিশি প্রশ্নই বুঝি ভালো ছিল। সে যাক, কোনও অবান্তর প্রশ্ন আমি করব না। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই। তুমি যে হত্যা করোনি, তার প্রমাণ কী?''

'আমি যে হত্যা করেছি, তারই বা প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ দেওশঙ্কর। সে বলেছে, বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে দেখতে পায় যে, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ। সে তখন তোমাকে জাপটে ধরে।'

'বাজে কথা। আমিই বরং বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি যে, প্রীতমকে হত্যা করে সে পালিয়ে যাচ্ছে। আমিই তখন তাকে জাপটে ধরি।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল ভাদুড়ী। তারপর আবার যখন সে মুখ খুলল, তখন আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে, তার কণ্ঠস্বর একেবারে পালটে গিয়েছে।

স্পষ্ট, দৃঢ় গলায়, থেমে-থেমে—প্রতিটি শব্দকে আলাদা-আলাদা উচ্চারণ করে—সে বলল, 'রঘুবীর, মানুষ বড় বোকা। মানুষ বোঝে না যে, প্রতিটি অপরাধেরই একটা-না-একটা প্রমাণ থেকে যায়। প্রীতমকে যে হত্যা করেছে, সেও বড় বোকা। সে জানে না যে, তার অপরাধের অন্তত একটা প্রমাণ সে রেখে গিয়েছে। সে জানে না যে, সিল্কের যে-দড়িটা দিয়ে সে প্রীতমকে হত্যা করেছে, সেই দড়িটা একটা কেমিক্যাল

সলিউশনের মধ্যে ডোবানো থাকত। এবং সেই সলিউশনের এমনই গুণ যে, ও-দড়ি যে-ই ছুঁক না কেন, ছোঁওয়ার ঠিক চল্লিশ ঘণ্টা বাদে তার হাতের ওপরে একটা সবুজ দাগ ফুটে উঠবে। কটকটে সবুজ একটা দাগ। রঘুবীর, তোমার হাতের দিকে একবার তাকাও।'

নিস্তব্ধতা। ভৌতিক নিস্তব্ধতা। মেঝের ওপরে একটা পিন পড়লেও বোধহয় আমরা তার শব্দ শুনতে পেতাম। আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম যে, রঘুবীর তার ডান-হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে পেলাম যে, তার তালুর ওপরে—।

গাঢ় সবুজ একটা দাগ!

রঘুবীরের মুখের দিকে তাকালাম। সে-মুখ ছাইয়ের মতন সাদা। মনে হল, তার শরীর থেকে যেন শেষ রক্তবিন্দুটিকেও কেউ হঠাৎ নিংড়ে শুষে নিয়েছে।

বিস্ফারিত, শূন্য, উন্মত্ত দৃষ্টিতে সেই দাগটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রঘুবীর। তারপর প্রায় পাগলের মতন সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

'মেরেছি! আমিই মেরেছি প্রীতমকে! আমিই মেরেছি! আমিই...আমিই...আমিই...!'

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। রিডিংরুমেই আমরা বসে আছি। ভাদুড়ী আর আমি। বৈঠকখানা আর রিডিংরুমের মধ্যবর্ত্তী দরজাটা এখনও ভেজানো। সেই ভেজানো দরজা খুলে শ্যামজি এসে ঢুকলেন। রঘুবীর আর দেওশঙ্করকে তিনি থানা-হাজতে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। ভিতরে ঢুকে, ভাদুড়ীর ঠিক সামনে সেই চেয়ারটায় তিনি বসলেন, একটু আগেই রঘুবীর যেখানে বসেছিল।

ভাদুড়ী বলল, 'কনফেশন-স্টেটমেন্টটায় আপনি রঘুবীরকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন তো?'

শ্যামজি বললেন, 'অবশ্য। ওটা কি আপনি কালকেই টাইপ করে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কাল রাত্তিরেই আমার মনে হল যে, স্টেটমেন্টটা তৈরি করে রাখা দরকার।'

'তার মানে আপনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, রঘুবীর কনফেস করবে?'

'না, তা আমি ধরে নিইনি। তবে রঘুবীর আর দেওশঙ্করের মধ্যে একজন-না-একজন যে খুনি, তাতে তো আর সন্দেহ ছিল না। আমি তাই দু-দুটো স্টেটমেন্ট টাইপ করে রেখেছিলাম। একটা রঘুবীরের নামে। অন্যটা দেওশঙ্করের নামে। রঘুবীর যদি কনফেস না করত, তো দেওশঙ্করকে ডেকে পাঠাতে হত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার আর দরকার হল না।'

শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন শ্যামজি। তারপর বললেন, 'ভাদুড়ীসাব, আপনি অদ্ভুতকর্মা মানুষ। কিন্তু...কিন্তু...একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে। দড়িটায় যে-সলিউশন আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেই সলিউশন আমার চেনা। তাতে তো কোনও দাগ ফুটে ওঠবার কথা নয়। তাহলে?'

ভাদুড়ী বলল, 'আপনাদের ওই কেমিক্যাল সলিউশনের খবর আমি রাখিনে। শুধু আপনাদের কেন, কোনও সলিউশনেরই খবর রাখিনে আমি। এবং পৃথিবীতে অদ্যাবধি এমন কোনও রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কি না যাকে স্পর্শ করবার চল্লিশ ঘণ্টা বাদে স্পর্শকারীর হাতের ওপরে একটা সবুজ দাগ ফুটে ওঠে, তাও আমার জানা নেই। আমি শুধু একটি কথাই জানি। জানি যে, শুধু রঘুবীর কেন, আপনিও যদি আপনার হাতের দিকে তাকান, তাহলে আপনিও সেখানে একটা সবুজ দাগ দেখতে পাবেন। কৃতাঞ্জলির ভাষায়, ''কটকটে'' সবুজ একটা দাগ।'

চমকে গিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকালেন শ্যামজি। এবং আমি স্পষ্ট দেখলাম যে, তাঁর হাতের তালুর ওপরে—।

গাঢ় সবুজ একটা দাগ!

শ্যামজি বললেন, 'এ কী! আমি তো ওই দড়িটাকে ছুঁইনি। তাহলে? আমার হাতে তাহলে কোত্থেকে এই দাগ এল!'

ভাদুড়ী হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, ' কী, শ্যামজি, আপনার জন্যেও একটা কনফেশন স্টেটমেন্ট টাইপ করে আনব নাকি?'

শ্যামজি বললেন, 'থামুন, ভাদুড়ীসাব! এটা রসিকতার সময় নয়। আমি বুঝতে পারছি, এর মধ্যে একটা বংগালি-ফিকির আছে। ব্যাপারটা আপনি খুলে বলুন। দোহাই আপনার।'

ভাদুড়ী বলল, 'বলছি, শ্যামজি, বলছি। তার আগে আপনি জেনে রাখুন যে, শুধু রঘুবীর আর শ্যামনন্দন শাস্ত্রী কেন, যে-কেউই ওই চেয়ারটাতে বসুক না কেন, খানিকবাদেই তার হাতের তালুতে একটা সবুজ দাগ ফুটে উঠবে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ওই সবুজ-স্টিলের চেয়ারটার হাতলের ওপরে আমি আগে থাকতেই কিছু সবুজ গুঁড়ো রং ছড়িয়ে রেখেছি। এবং হাতলের রংটাও যেহেতু সবুজ, সেই গুঁড়োগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।'

আমি বললাম, 'অর্থাৎ, ওই চেয়ারটা আসলে চেয়ার নয়, একটা ফাঁদ?'

ভাদুড়ী বলল, 'বিলক্ষণ। মনস্তাত্ত্বিক একটা ফাঁদ। বড় মারাত্মক ফাঁদ। কিন্তু না, আমার কলেজ আছে। এবারে আমি উঠব।'*

* একটি বিদেশি গল্পের ঈষৎ ছায়া নিয়ে

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৬০



সেই রাত,

সেই অন্ধ রাত

দিব্যেন্দু পালিত

বেগমগঞ্জে পৌঁছে প্রথম রাত্রেই সেই দুঃসহ অস্বস্তির স্পর্শ পেলাম। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল সমস্ত ঘর। মনে হল, জীবনে এই প্রথম যেন অন্ধকার দেখছি।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই তিনটে জোনাকি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মুখের ওপর। আর ঠিক তখনই শুনতে পেলাম সেই কান্না। প্রথমে অস্পষ্ট, বাতাসের হাহাকারের মতো। তারপর একটু-একটু করে তা রক্ত-মাংসের রূপ নিতে লাগল।

কিন্তু আমার সমস্ত ভয়, সব সংশয় হারিয়ে গেল কুমারবাহাদুরের মেয়ে চন্দ্রার সান্নিধ্যে এসে। রাজকুমারীর রূপ ছিল জলের বুকে শ্বেত-পদ্মের প্রথম পাপড়ি-মেলা মুহূর্তটির মতো। এমনই উজ্জ্বল, জীবন্ত আর পবিত্র! আমার কথা শুনে চন্দ্রার সে কী হাসি!

'ও মা! এখনও ভূতের ভয় আছে আপনার?'

নিঃশব্দে হেসে বললাম, 'ও-কথা যেতে দাও। বলো তো, কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো? মাকে!'

তুমুল প্রতিবাদে মাথা দোলাল চন্দ্রা 'উহুঁ, না, না। বাবাকে।'

রাজকুমারীর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'বিশ্বাস হয় না।'

'তবে?'

'পারিজাতবাবুকে।'

চন্দ্রার লাজ-রক্ত কপোলের অস্থির বর্ণাভাস আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। বুকের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সলজ্জভাবে বললে, 'মাস্টারমশাই, আপনি যেন কী!'

অনুমানে অনেক কিছু বুঝলেও পারিজাতবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তখনও আমার হয়নি। তবে, রমেনের সঙ্গে আলাপ হল বেগমগঞ্জে আসবার পরদিনই। আশ্চর্য ছেলে এই রমেন! পৃথিবীর তালাবন্ধ রহস্যঘরের চাবিকাঠি যেন তার হাতে। পরে মনে হয়েছিল : রমেন নিজেই বুঝি একটি ঘনীভূত রহস্য, যার শুরু আছে, শেষও আছে; কিন্তু মাঝের অংশটুকু অন্ধকারের পুরু চাদরে ঢাকা!

কাছারিবাড়ি আর কুমারবাহাদুরের বসতবাটীর মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেকখানি। আমরা কয়েকজন, কোনও-না-কোনও কাজে এসে যারা কুমারবাহাদুরের আশ্রয় নিয়েছিলাম, তাদের থাকবার জন্য কয়েকটা ছোট-ছোট দু-ঘরের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা ছিল। বেগমগঞ্জের এই দিকটা ছিল জনবিরল। পথে বেরুলে একসঙ্গে দুজন লোক চোখে পড়ত না। তবে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হয়নি। জমিদারি এস্টেটের সবকিছু ছিল স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মতো। পথের দু-ধারে হিজল, হরিতকীর ঘনবদ্ধ গাছের সারি; মাঠের মাঝখানে কাচের চৌবাচ্চায় রং-বেরঙের ছোট-ছোট রকমারি মাছ। প্রকাণ্ড জাল-ঘেরা খাঁচায় অজস্র পাখি। তবে...।

আমার কাছে যা সবচেয়ে বিস্ময়ের মনে হয়েছিল, তা হল রানিঝিল। কুমারবাহাদুরের বসতবাটী থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে মিনিটপাঁচেকের পথ রানিঝিল। আশেপাশের বাগানটা ছিল একটু বেশি ঘন। নানারকমের দেশি-বিদেশি ফুলের গাছগুলো যেন নিবিড় আশ্লেষে ঢলে পড়েছে একে অন্যের গায়ে। সন্ধের পর যখন জমাট অন্ধকার নামত সেখানে, পিঙ্গল আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়াত লক্ষ-লক্ষ জোনাকি, ঝিঁঝির অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁরব শোনা যেত—তখন মনে হত মৃত্যুর মতো অপ্রত্যক্ষ একটা আত্মা সবসময় আকর্ষণ করছে সেদিকে। ভয় করত। পরে বুঝেছিলাম, সকলের আর-সবকিছুর আকর্ষণ হল রানিঝিল।

রমেন বললে, 'কুমারবাহাদুরের মনের সব শান্তি নষ্ট করেছে ওই রানিঝিল।'

অবাক হলাম 'কুমারবাহাদুরের মনের শান্তি!'

রমেন বললে, 'কেন, ওঁর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারোনি?'

'কই, সেরকম কিছু লক্ষ করিনি।'

'চেষ্টা করো, পারবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেন আবার বললে, 'সবরকম সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও যে শান্তি পাওয়া যায় না, কুমারবাহাদুরকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না।'

আমি কিছু বললাম না।

'ছাত্রী কেমন পড়াশুনা করছে?' হাঁটতে-হাঁটতে রমেন জিজ্ঞাসা করলে।

বললাম, 'ভালোই। খুব ইনটেলিজেন্ট মেয়ে।'

'চালচলন?'

রমেনের ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হয়েছিল। বললাম, 'নেহাতই ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ!' রমেন হাসল 'হ্যাঁ, ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী! চলো, ফেরা যাক।'

রাত হয়েছিল। রমেন নিজের কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। আমার কোয়ার্টার খানিকটা দূরে। সেখানে পৌঁছে দেখলুম, বাজার-সরকার শিবতোষবাবু অন্ধকারেই একটা চেয়ার টেনে বসে

আছেন। অসময়ে ওঁর উপস্থিতি আমাকে বিব্রত করল।

'সরকারমশাই, আপনি!'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'বসুন। আলোটা জ্বালি।'

'না।' শিবতোবাবু বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার মঙ্গলের জন্যেই বলছি, রমেন ছোকরার সঙ্গে বেশি মিশবেন না।'

বলেই দ্রুত হেঁটে কাছারিবাড়ির পথে অদৃশ্য হলেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একরাশ প্রশ্ন মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলল মস্তিষ্কে। কিন্তু কোনও প্রশ্নের জবাব পেলাম না। ঘরে তালা খুলে আলো জ্বালতেই জানালার ওপাশে রমেনের হাসি-মুখ উঁকি দিল।

'কী হে, কী ভাবছ?'

'তুমি!'

'চুপ, চুপ।' ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস স্বরে রমেন বললে, 'বুড়ো কী বলে গেল এরমধ্যেই ভুলে গেলে?'

রাত বাড়তে লাগল। যেটুকু শব্দ ছিল—গাছের আর পাতার, কিংবা পাখিদের আচমকা কোলাহলে, ক্রমে সেটুকুও হারিয়ে গেল। রিস্টওয়াচে দেখলাম, রাত একটা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কেমন এক ধরনের ভয়-ভয় অনুভূতি গ্রাস করছিল আমাকে। ভাবলুম জানলাটা বন্ধ করে দিই। কিন্তু অসহ্য গরম।

ঘুম আসছিল না। ছেলেবেলায় নামতা মুখস্থ করার চেয়েও এ এক ক্লান্তিকর অস্বস্তি। প্রতিটি মুহূর্ত ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম হয়ে জমল কপালে, গলায় আর বুকে। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল।

পিঙ্গল আলো জ্বেলে উড়ে এল অসংখ্য জোনাকি।

তারপর, আবার। হ্যাঁ, আমার শুনতে একটুকু ভুল হয়নি। প্রথমে অস্পষ্ট। বাতাসের হাহাকারের মতো। তারপর ক্রমশ তা কান্নার রূপ নিতে লাগল।

একটা সিগারেট জ্বেলে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালাম। শুক্লা-রাত্রির ধবল জ্যোৎস্নায় পরীরা নেমে এসেছে রানিঝিলের বুকে। হঠাৎ ডানা ঝটপটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল কতগুলি পাখি...।

ঘুম ভাঙল খুব সকালে। তখন আকাশে থরথর কাঁপছে ভীরু শুকতারা, পাখির ঠোঁটে ভোরের কাকলি তখন সবে শুরু। আমার কোয়ার্টার থেকে বেশ খানিকটা দূরে বকুল গাছের পাশে দুটি ছায়া দুলে উঠল যেন। রাজকুমারী চন্দ্রাকে চিনতে দেরি হয়নি। অনুমানে চিনলাম পারিজাতবাবুকে। দেখলাম, চন্দ্রার খোঁপায় পরম আদরে ফুল গুঁজে দিচ্ছেন পারিজাতবাবু।

তারপর দুজনে লঘু অন্তরঙ্গ পায়ে হাঁটতে শুরু করল। বারান্দার এক কোণে—যেন কিছুই জানি না, ভান করে—দাঁড়িয়ে রইলাম। চন্দ্রার ভুরুতে বিস্ময় কেঁপে গেল।

'মাস্টারমশাই, এত ভোরে আপনি!'

মৃদু হেসে তাকালুম পারিজাতবাবুর দিকে। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাজকুমারীর সুশুভ্র মুখাবয়বে সিঁদুরের আভা ছড়িয়ে পড়ল। আয়ত চোখ দুটি সামান্য তুলে বললে, 'আমার কাকা, মাস্টারমশাই।'

সেই প্রথম দেখলুম পারিজাতবাবুকে। লক্ষ করলুম, পরিজাতবাবুর প্রসঙ্গে কেমন আরক্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রা! আরও পরে বিস্মিত হয়ে ভাবলুম, রানিমার প্রশ্নে অমন আতঙ্কের শিহরন জাগে কেন রাজকুমারীর চোখে-মুখে?

অথচ, রানিমাকে তখনও চাক্ষুষ দেখিনি।

রমেন বললে, 'জীবনের সবকিছুরই দুটো মানে আছে। একটা যা অত্যন্ত সহজ, আর দ্বিতীয়টি অত্যন্ত জটিল আর রহস্যময়। কুমারবাহাদুরের আশ্রয়ে এতদিন আছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আজও কাউকে চিনলুম না। যখন মনে হয়, কুমারবাহাদুরকে চিনেছি, রানিমা তখন অস্পষ্ট হয়ে যান। আবার যদি ভাবি, রানিমাকেই চিনতে পেরেছি, কুমারবাহাদুর তখন অতলান্ত রহস্য!'

আমার মনে হল রমেন নিজেও একটি রহস্য। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পারিজাতবাবু কি কুমারবাহাদুরের সহোদর?'

'না, বৈমাত্রেয়।' রমেন বললে, 'বেগমগঞ্জ এস্টেটের অর্ধেক মালিক পারিজাতবাবু।'

পরদিন শুক্লপক্ষের চাঁদ খুব সাদা হয়ে দেখা দিল আকাশে। অনেক রাতে দরজায় টোকা পড়তেই খিল খুলে বেরিয়ে এলাম। রমেন বললে, 'আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব তোমাকে।'

'কোথায়?'

'রানিঝিলে। চুপ, আর কথা নয়। এসো।'

কারও চোখে পড়বার ভয়ে উলটো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পায়ের তলায় শুকনো পাতার মৃদু মর্মর। কানের পরদায় অবিরাম ঝিল্লিরব। চাঁদ উঠে এসেছে রানিঝিলের মাথায়। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে।

রানিঝিলের পশ্চিম দিকে একটা অশ্বত্থের ঘন ছায়ায় দাঁড়ালাম আমরা। আমার কবজিটা দৃঢ় মুঠিতে ধরে রমেন বললে, 'দেখতে পাচ্ছ কিছু?'

তাকালুম। প্রথমে বিশ্বাস হল না। তারপর যেন একটা হিম শৈত্য অনুভব করলুম সর্বাঙ্গে।

রানিঝিলের পূর্বদিকে মার্বেল পাথরের বাঁধানো বেদির পাশে স্ট্যাচুটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে এক সুন্দরদেহী পুরুষ এবং তার পাশে এক অপরূপা নারী। যেন দুটি সৌন্দর্যের ভঙ্গিমা কেউ ভুল করে সাজিয়ে দিয়েছে এই পৃথিবীর বুকে!

'চিনতে পারো?' রমেনের ডাকে বিস্ময় ভাঙল।

চাপাস্বরে বললাম, 'কুমারবাহাদুর?'

'না।'

'তবে? পারিজাতবাবু?'

অদ্ভুতভাবে হাসল রমেন 'আর একজন?'

মেঘের ছায়া ধীরে-ধীরে সরে আসছিল স্ট্যাচুটার গায়ে। স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছিল না।

বললাম, 'চিনতে পারছি না!'

'চন্দ্রা।'

'রমেন!'

'ছেলেমানুষি কোরো না। চলো।'

'কিন্তু—।'

আমার হাত চেপে ধরল রমেন 'এসো বলছি।'

ফিরে চললাম। আবার সেই শুকনো পাতার শব্দ, জোনাকির আলো। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললাম, 'তোমার ভুল হয়েছে, রমেন। ও রাজকুমারী হতেই পারে না!'

দ্রুত পথ চলতে-চলতে রমেন বললে, 'কী জানি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

কিন্তু...সেই কান্না! যেন এক নতুন রহস্য! মাঝে কিছুদিন শুনতে পাইনি। তারপর হঠাৎ একদিন রাতে আবার কানে এল।

কী যেন আবিষ্কারের আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠলাম।

শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ছুটছে। রানিঝিলের পথে পা বাড়ালুম। আজ আর রমেন সঙ্গে নেই—আমি একা। দেখতে হবে, তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে। যদি কিছু পাই।

কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই বাধা পেলুম।

'মাস্টারমশাই!'

থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে তাকিয়ে জিভ শুকিয়ে গেল। আর কেউ নয়, কুমারবাহাদুর স্বয়ং। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করতে হল।

'এত রাত্রে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, মাস্টারমশাই?'

আড়ষ্ট কণ্ঠে মিথ্যে বললাম, 'এই এমনি, একটু বেড়াতে।'

'আপনি দুঃসাহসী!' কুমারবাহাদুরের কথায় যেন তলোয়ারের ধার, 'অসম্ভব দুঃসাহসী! যাক, ফিরে যান এবার।'

যন্ত্রচালিতের মতো আদেশ পালন করলাম। সব শুনে রমেন বললে, 'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিলে? তুমি একটা হোপলেস!'

আমি যে সত্যিই কী, তা ভাববার অবসর পাইনি। কিন্তু, সত্যি বলতে কী, সেদিনের পর আর কান্না শুনতে পাইনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে, ভয়ে—দুঃস্বপ্নে। পরে বুঝেছি, সবই অচেতন মনের ভুল।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে নতুন আর ভালো একটা চাকরির খোঁজ পেয়ে স্থির করলুম, এই অস্বস্তির জগৎ থেকে চলে যাব। আমার ধারণা ছিল, সেই রাতের ঘটনার পর কুমারবাহাদুর নিশ্চয় আমাকে ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু, দশ-বারো দিন হয়ে গেল, কুমারবাহাদুরের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মনে আছে, কিছুদিন পরে কুমারবাহাদুর আমাকে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আশঙ্কায় দুরু-দুরু বুকে গিয়েছিলুম সেখানে।

বিরাট হলঘরের চতুর্দিকে সুচারুরূপে সাজানো সারি-সারি বই ভরতি আলমারি। তার মাঝখানে বসে আছেন কুমারবাহাদুর। দেওয়ালে পিতা-প্রপিতামহের বড়-বড় অয়েল পেন্টিং, ল্যান্ডস্কেপ, আর একটি জিনিস—যা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করল। এই পবিত্র পরিবেশের সমস্ত মাধুর্য মলিন করে দেওয়ালে ঝুলছে সাপের মতো লিকলিকে কতকগুলো চাবুক।

কোনও ভূমিকা না করেই কুমারবাহাদুর বললেন, 'সেদিন রাতে আমার ব্যবহারে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন, মাস্টারমশাই। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন, কোনও উপায় ছিল না বলেই অমন রূঢ় ভাষায় কথাগুলো বলতে হয়েছিল।'

সোজাসুজি তাকালুম কুমারবাহাদুরের চোখের দিকে।

কুমারবাহাদুর বললেন, 'আপনি আমার অতিথি—বিপদ-আপদে আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আপনি জানেন না, অত রাতে বনে-জঙ্গলে কত বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে।'

সসঙ্কোচে মাথা হেঁট করলুম। একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি, বিপদ তো সব মানুষকেই আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু, আপনি সেখানে কী করছিলেন? কিন্তু দুর্বার দ্বিধায় মেরুদণ্ড সোজা হল না।

আমার শরীর ও মনের খবর নিলেন কুমারবাহাদুর। জিজ্ঞাসা করলেন চন্দ্রার কথা। বললুম। উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন কুমারবাহাদুর 'ও-ই আমার একমাত্র সন্তান, মাস্টারমশাই। ওর ওপর একটু নজর রাখবেন।'

চলে আসবার আগে ইতস্তত করে আমার অভিপ্রায় জানালুম। অনেকক্ষণ বইয়ের পাতায় চোখ ডুবিয়ে রাখলেন কুমারবাহাদুর। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'চলে যাবেন? জানতাম। এখানে কারও মন টেকেনি। এ এক যন্ত্রণার পৃথিবী, মাস্টারমশাই। বাইরেই চটক, ভিতরটা ফোঁপরা। আপনাকেও বেঁধে রাখতে চাই না। তবু, একটি অনুরোধ...।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম। কুমারবাহাদুর বললেন, 'বিশেষ কাজে কাল একবার বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দিন পনেরো লাগবে। যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে ওই ক'টা দিন থেকে যাবেন?'

বললাম, 'থাকব।'

কিন্তু অনুরোধ রাখতে পারিনি।

কুমারবাহাদুর চলে যাওয়ার দিনতিনেক পরে সহসা একদিন সন্ধেবেলায় ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামল। সে-বৃষ্টি চলল মাঝরাত অবধি। বেগমগঞ্জের রহস্য আর স্মৃতি আমার মনে অবসাদ এনেছিল। জানি না, তখন রাত দুটো কী একটা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানালায় ঝড়ের ক্রুদ্ধ মুষ্ঠি, বাতাসে আহত জন্তুর নিশ্বাস। হঠাৎ, দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

এমন অসময়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কে আসতে পারে, ভাবতে-ভাবতে দরজা খুললাম। কিন্তু, এ কী!

কালো বোরখায় ঢাকা ভিজে মূর্তিটার মুখের কাপড় সরে গিয়ে একঝলক বিদ্যুতের আলো পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। এর আগে কখনও দেখিনি, তবু রাজকুমারীর মুখের সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল! বুঝলাম, কুমারবাহাদুরের স্ত্রী—রানিমা!

ক্ষীণ সম্ভাষণ বেরুল গলা দিয়ে, 'আপনি!'

'হ্যাঁ।' আবেগে, উত্তেজনায় আর শীতে কাঁপছিলেন রানিমা 'অনেক কলঙ্কের বোঝা নিয়ে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এসেছি, মাস্টারমশাই। আপনি অন্তত একটু দয়া করুন।'

দয়া? আমি! নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালুম।

দরজাটা ভেজিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন রানিমা। আর আমি তাকিয়ে রইলুম এক অনুপম সৌন্দর্যের দিকে।

আবার বললাম, 'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আপনি!'

স্থির, শান্ত দুটি চোখ তুলে তাকালেন রানিমা 'ঘৃণা আর ভালোবাসা, ভালোবাসা আর ঘৃণা, মেয়েমানুষের জীবনে দুটিই চরম, মাস্টারমশাই। স্বামীর চোখে, সন্তানের চোখে, ঘৃণা আর ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকার বিড়ম্বনা যে কী, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আপনি বুঝবেন না, কী অসহ্য জ্বালায় দিন কাটছে আমার!'

নির্বোধ কণ্ঠে প্রশ্ন জোগাল না।

রানিমা বললেন, 'বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখেই দেখুন।'

চোখের পলকে পেছন ঘুরে পিঠের আবরণ উন্মুক্ত করে দিলেন রানিমা। চমকে উঠলাম। মাখনের মতো নরম, কোমল, মাংসল ধবধবে পিঠের ওপর ঘন হয়ে বসে গেছে কতকগুলো সরু লম্বা ক্ষতের শুকিয়ে যাওয়া দাগ। অনিন্দ্য সুষমার মধ্যে প্রেতলোকের জঘন্য সঙ্কেত।

রানিমা বললেন, 'ক্ষতের জ্বালাও একদিন জুড়িয়ে যাবে; কিন্তু মনের জ্বালা—।'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রানিমার দীর্ঘশ্বাস আর্তনাদ করে উঠল 'কেউ বুঝতে পারল না—কেউ না।'

তারপর এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো চেপে ধরে বললেন, 'শুনলাম, আপনি চলে যাচ্ছেন। কিছুই যদি না বুঝে থাকেন, তবে এটুকু জেনে রাখুন, শুধু এইজন্যেই এসেছি—আপনার যাওয়া হতে পারে না, মাস্টারমশাই। বেগমগঞ্জ ছেড়ে আপনি যাবেন না।'

কোনও জবাব দিতে পারলাম না। রানিমা হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার চোখ বলছে, কথা রাখবেন।'

তারপর বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সঙ্গে যাব আপনার?'

'না।'

শুধু যতদূর চোখ গেল, দেখলুম, একটা অন্ধকার ছায়া ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে কুমারবাহাদুরের বসতবাটীর দিকে।

বেগমগঞ্জের কোনও অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। কুমারবাহাদুরের ফিরে আসবার অপেক্ষাটুকুও সহ্য হয়নি। কেন, তা বলতে পারব না। পরদিন রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি। আসবার সময় দেখলুম চতুর্দিকে মৃত্যু-ঘন অন্ধকার। এত অন্ধকার জীবনে কখনও দেখিনি।

মাসিক রহস্য পত্রিকা

পুজো সংখ্যা, ১৯৬০



চতুষ্কোণ

পঞ্চানন ঘোষাল

কিছুকাল সুখে-দুঃখে আমাদের কেটে গিয়েছে। এইদিন ক্ষুণ্ণ মনে কোয়ার্টারে ফিরে আমি যুদ্ধের খবর শুনছিলাম। ইতিমধ্যে জাপান ব্রিটিশের তথা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। রেডিয়োতে শুনলাম, এরা কোহিমার নিকট এসে গিয়েছে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে সহকারী সুরেনবাবুকে বললাম, 'সর্বনাশ! একেবারে যে এরা ঘরের কাছে এসে গিয়েছে।' সহকারী এই সংবাদ শুনে নির্বিকার চিত্তে উত্তর করল, 'তাতে আর হয়েছে কী, স্যার! মোগল পিরিয়ডে বাম থেকে আমরা ডানে লিখেছি, ব্রিটিশ অধিকারে আমরা ডান থেকে বামে লিখেছি, এবার না হয় ওপর হতে নীচে লিখতে শুরু করব। আমাদের বেকাদায় ফেলা এত সহজ নয়। এ ছাড়া এই ডামাডোলের মধ্যে পড়ে আমরা আবার স্বাধীন হয়েও যেতে পারি।' এমনি হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ সময় হয়তো অতিবাহিত হয়ে যেত, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। পাশের ঘর থেকে অপর এক সহকারী ছুটে এসে বলে উঠলেন, 'স্যার! কড়েয়ার ফাঁড়িতে এখনই একদল সান্ত্রি পাঠানো দরকার। সেখানে এক ভীষণ কাণ্ড বেধে গিয়েছে। সেখানকার সার্জেন্ট সাহেব এক মাতাল আমেরিকান সৈন্যকে হাজতে পুরে দিয়েছিল। এই খবর পেয়ে এক টাক মাতাল আমেরিকান ফৌজ ফাঁড়িতে এসে ড্রাম বাজিয়ে জানাচ্ছে যে, আমেরিকা ডিক্লেয়ার্স ওয়ার অন কড়েয়া থানা।

আমি এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে সহকারীকে বললাম, 'তা আমি আর এতে কী করব! আমেরিকান মিলিটারি পুলিশে এখুনি তুমি ফোন করে দাও। ওরা এক্ষুনি এসে এইসব যুদ্ধ বন্ধ করে যাবে-এখন।'

সহকারী অফিসারের কথায় আসাম রেলওয়ের এক পুরোনো কাহিনি আমার মনে পড়ে গেল। সবেমাত্র জঙ্গলের মধ্যে রেললাইন পেতে কয়েকটা স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। হঠাৎ একদিন এক স্টেশন মাস্টার সদরের অফিসে টেলিগ্রাম করে উপদেশ চেয়েছিলেন, 'টাইগার অন দ্য প্ল্যাটফরম, অ্যাওয়েটিং ইনস্ট্রাকশন। এর উত্তরে ওই রেলওয়ের কর্মকর্তা শুধু জানিয়েছিলেন, 'ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড।' সহযোগী অফিসারকে কিন্তু আমি এইদিন এতটা রূঢ় কথা শোনাতে পারিনি। তাঁকে আমি তাঁর করণীয় কার্যের ব্যাপারে শুধু যথাযোগ্য উপদেশই দিয়েছিলাম।

এ-কাজ ও-কাজ সে-কাজ—চারিদিকেই শুধু কাজ। কোন কাজটা আগে করব তার ঠিক পাই না। সারাটা দিন শুধু তাল সামলাতেই কেটে গেল। কাজের-কাজ একটাও শেষ করতে পারিনি। অথচ সারাদিন ধরে শুধু কাজই করেছি। এগুলো এমন সব কাজ যেগুলো কাজের হিসেবের মধ্যে বাঁধা পড়ে না। ধীরে-ধীরে বেলা

গড়িয়ে চলেছে। একটু পরে এইদিনের দিনটিও শেষ হয়ে যাবে। এমন সময় আমার চিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়ে সহকারী সুরেনবাবু ঘুরে ঢুকে বললেন, 'আপনার ওই ঘুঁড়িওয়ালা-ওয়ালিদের মামলা আদালতে শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল।' সহকারী সুরেনবাবুর মুখে শোনা ওইদিনের চমকপ্রদ বিচার-কাহিনি আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। একজন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী অনারারি হাকিমের এজলাসে এই মামলাটি উঠেছিল। এই চাঞ্চল্যকর নারী-হরণের মামলা শুনবার জন্যে আদালতে এইদিন তিলধারণেরও স্থান নেই। হঠাৎ চশমার কাচ মুছতে-মুছতে হাকিমবাহাদুর মেয়েটিকে বললেন, 'হুঁ, গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ, তা তো গিয়েছিলাম,' উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, 'কিন্তু মরা হল কই? গঙ্গায় যে সেদিন বড্ড বেশি জল। আপনাদের এসব কথা জেনেই বা কী হবে? আপনারা বিচারের নামে একটি ছেলেকে চোর-ছ্যাঁচোড় ও একটি মেয়েকে পতিতা তৈরি করতে চান। আপনারা ভালো করেই জানেন যে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমাকে পিতৃকুল ও স্বামীকুল—কোনও কুলই আর গৃহে স্থান দেবে না। এইসব জেনে-শুনে এই ছেলেটিকে জেলে পাঠিয়ে আমাকে আপনারা নিরাশ্রয় করতে চান। যে-আইন সমাজের প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে সমস্যা আরও জটিল করে তোলে, সে-আইন নিশ্চয়ই শ্রেয়ের আইন নয়। আমার বয়েস হয়তো অপ্রাপ্তবয়স্কার সীমার অব্যবহিত নীচে আছে। কিন্তু আমার মনের প্রাচুর্যের কথাও তো এই সম্পর্কে আপনাদের ভাবা উচিত।'

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, আইনানুযায়ী শুধু ছেলেরাই মেয়েদের নিয়ে পালাতে পারে, কিন্তু মেয়েরা ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলে তাতেও অপরাধ হয় মাত্র ছেলেদের। হয়তো এর মধ্যে সমাজ ও দেহ-বিজ্ঞানের কোনও মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। তবে এই বিষয়ে পুরুষালি মেয়েদের কথাও বিবেচনা করা উচিত হবে। এই ধরনের মেয়েদের খপ্পরে পড়ে অনেক নিরীহ ছেলেদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

'হুঁ, বুঝলাম সব,' একটু চিন্তা করে আমি সহকারী অফিসারকে জিগ্যেস করলাম, 'তা এত সহজে এই মামলার নিষ্পত্তি হল কী করে?'

'মামলায় ওই মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে মামলা মিটিয়ে নিলে, স্যার,' প্রত্যুত্তরে সহকারী অফিসার আমাকে জানালেন, 'অপহরণের মামলা টেকেনি। তবে ব্যভিচারের মামলাটা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু মেয়েটির স্বামী একহাজার টাকার বিনিময়ে মামলাটি তুলে নিল। কিন্তু এইখানেও মেয়েটা আদালতসুদ্ধ লোককে হকচকিয়ে দিয়ে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করলে যে—।'

'সে আবার কী হে? মিটমাট হয়ে যাওয়ার পরেও এত কাণ্ড?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠে সহকারীকে জিগ্যেস করলাম, 'ওখানে কী গণ্ডগোল করল আবার মেয়েটা? এইরকম বেপরোয়া মেয়ে ইতিপূর্বে আমিও কখনও দেখিনি। মেয়েটা বোধহয় জীবনধর্মী। নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সে জীবনটাকে পুরোপুরি ভোগ করতে চেয়েছে। যাক এখন ওসব কথা। এখন বলো, তারপর কী হল।'

'স্যার! সে এক তাজ্জব কাণ্ড,' একটু সলজ্জভাব প্রকাশ করে সহকারী উত্তর করলে, 'আসামীর উকিলই ক্ষতিপূরণের টাকা ক'টা আপনার ওই জীবনধর্মী মেয়েটির স্বামীকে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় মেয়েটি ছুটে এসে ছোঁ মেরে নোট ক'টা কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে সেগুলো তার বাতিল স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, ''নে-নে, তোর বউয়ের দাম নে। এইজন্যে তাহলে তুই মামলা এনেছিলি!'' '

এই মেয়েটির স্বামীকে আমিই ডাকিয়ে আনিয়ে এই মামলার একজন পার্টি করে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে আমি এই নিদারুণ অপমানের হাত হতে রক্ষা করতে পারিনি। ওই হতভাগ্য স্বামীটি কিছুকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই মামলায় পাওয়া ওই ক্ষতিপূরণের টাকা ক'টা নিয়ে সে এখন করবে কী? আর যাই সে তা দিয়ে করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই টাকা দিয়ে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোনও অলঙ্কার সে গড়িয়ে দেবে না তো?

মাসিক রহস্য পত্রিকা

পুজো সংখ্যা, ১৯৬১



শরদিন্দু ও এই দেহ

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু ফিরবে না। সেই যে গেছে, তার পর থেকে ও আর একবারের জন্যেও আমার কাছে আসেনি। এবং আমিও জানি, আমার আগেকার জীবনে বারেকের জন্যেও আমি আর ফিরে যেতে পারব না।

এখন আমাকে যেখানে রাখা হয়েছে, জায়গাটা আর-পাঁচজনের কাছে আদৌ সুখকর নয়। সাধারণ সুস্থ মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত।

অন্ধকারময় ছোট্ট একরত্তি ঘর। সিলিংয়ের গা ছুঁই-ছুঁই গরাদ লাগানো একফালি জানালা। একটিমাত্র যে লোহার দরজা, তাতে তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে আলো-হাওয়া আসে কদাচিৎ।

আটকা পড়ে আছি এই চার-দেওয়ালের মধ্যে।

একটু পরেই হয়তো দরজা খুলে আমার এখানে দুই কিংবা তিনটি মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। মুখে তাদের অটুট গাম্ভীর্য।

সেই তরল অস্পষ্টতার মাঝে আমার তরফ থেকে কোনও অভ্যর্থনার আভাস থাকবে না। কারণ, স্থিরপ্রজ্ঞের গাম্ভীর্য আঁটা এইসব মানুষ প্রায় প্রতিদিনই এখানে আসছে। আমার ব্যক্তিত্বের ওপরে কেন আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাটল ধরিয়েছি, সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে।

বিষাক্ত জ্বালা আর অনুপায় আক্রোশে আমি এক-এক সময়ে জ্বলতে থাকি, রক্ত যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে চায়।

তবু আমি বুক ভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিই সেই সময়ে। শান্ত হতে চেষ্টা করি।

কারণ, ওদের প্রশ্নের উত্তর আমার অজানা নেই।

অতিমাত্রায় উত্তেজিত নিছক কল্পনা, আত্ম-পরিকল্পনা, বাধা-পাওয়া হৃদয়াবেগের সহজ ধারা থেকে পথ পরিবর্তন, আরও কত কী।

শরদিন্দু—আগে আমি এমন ছিলাম না। স্মৃতির ঝকঝকে উজ্জ্বল কাচের ভেতর দিয়ে এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অতীতকে। পাঠাভ্যাসের কালেই, অসময়ে বিবাহ হয়েছিল আমার। তখন সবেমাত্র আই. এসসি. পাশ করেছি। কিশোরী স্ত্রী শর্মিষ্ঠার অনুরোধেই মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হই। তারই পরামর্শমতো কলকাতায় এসে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতে থাকি। শর্মিষ্ঠাকে ভালোবেসে একান্ত করে পাওয়ার আগেই, বিরহ-জ্বালা আর মনের মধ্যে মাথা-কুটে মরা রাশি-রাশি দুঃখবোধের শিকার হয়ে পড়ি।

কত সন্ধ্যা রাত্রির তিমিরে নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে। আড়াইশো মাইল দূরে থেকে কত কথাই ভেবেছি শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে। ভেবেছি, যাই একবার, দেখা করে আসি। কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করতে সাহস পাইনি, ভরসা পাইনি শর্মিষ্ঠার অনুরোধ উপেক্ষা করার।

শর্মিষ্ঠা মারা গেছে, ভালোই হয়েছে। ওকে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। আজও করি।

সময়ের দুর্বার বন্যায় যৌবন তখন বুঝি আমার একটু-একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। শর্মিষ্ঠা এত দেরি করে মারা গেল! আমি তখন নামকরা মনস্তত্ত্ববিদ। ন্যায়নীতির অনুশাসনে বাঁধা পড়ে গিয়ে জীবনের ধারাটিকে এক সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে, তখন আমার ভগ্নপক্ষ জটায়ুর মতো অবস্থা। নিজেকে একান্তভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছি।

বড় দেরি করে মারা গেল শর্মিষ্ঠা! একটু আগে হলে হয়তো সময় পেতাম নতুন স্বাধীনতা উপভোগ করার। আমার জীবনের রূপ হয়তো পালটে যেত। শিরা আর স্নায়ুতে রক্তের উল্লাস নতুন করে উপলব্ধি করতাম না এ-কথা বলি কী করে!

শনিবারের দুপুরের একটা ঘণ্টা যেসব রোগী বা রোগিণী আমার কাছে শুধুমাত্র পরামর্শ নিতে আসত, তাদের কাছ থেকে কোনওরকম পারিশ্রমিক গ্রহণ করতাম না। নির্দিষ্ট এই সময়টুকুর মাঝেই শর্মিষ্ঠা মারা গিয়েছিল মোটর দুর্ঘটনায়। শনিবারের অন্য কোনও সময়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনও রোগী বা রোগিণীর চিকিৎসা আমি করতাম না।

পরের সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার আগে, মনস্তাত্ত্বিকের নিজের মন পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন বলেই আমার বিশ্বাস। তাই শর্মিষ্ঠার মৃত্যুর পর থেকে তার বিয়োগ-ব্যথা ভুলবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের মধ্যে আমি ডুবে গেছি।

আমার বেদনাদায়ক সেই সময়টুকুর ভেতরেই একদিন এসে হাজির হল শরদিন্দু।

সুন্দর চেহারা। ঋজু, দীর্ঘ, একমাথা রুক্ষ চুল। পরনে পাজামা, হাতা-গোটানো ফুলশার্ট গায়ে।

আমার এই নতুন রোগীটি চেম্বারে ঢুকল ধীরে-ধীরে। এগিয়ে এসে একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকাতে লাগল সন্দেহের চোখে।

তার উপস্থিতিটা আমার সেদিন ভালো লাগেনি। আমার ঠিক বিপরীত দিকের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম চোখের ইশারায়।

চেম্বারে আমি ও শরদিন্দু ছাড়া আর কেউ ছিল না।

একসময়ে আপনাথেকেই মুখ খুলল সে। শান্ত ও মোলায়েম গলায় বলল, আপনার রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা মিস গুপ্ত একটা ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো এ-সুযোগ ঘটত না। শুনেছি, আপনার নাম-যশ—।

ইচ্ছা করেই শরদিন্দু কথার মাঝপথে থেমে যায়।

সংযত কণ্ঠে আমি বলি, যা শুনেছেন তার সবটুকু যোগ্যতা আছে কি না জানি না। আসলে আপনার মতো আমিও একজন মানুষ।

হ্যাঁ।—টেবিলে একটা ছোট্ট মুষ্ট্যাঘাত করে সম্মতির সুরে বলে ওঠে সে, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন!

শরদিন্দুর কথাটা মিথ্যা নয়। চেহারায় ওর সঙ্গে আমার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। তবে তার তুলনায় আমার বয়েস কিছুটা বেশি। আমার মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে। পেছনের দিকে টাকও পড়েছে খানিকটা। হয়তো ওর মতো খেয়াল-খুশিকে অবাধে অনুসরণ করে চলার মতো স্পর্ধা আমার নেই।

আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমাকে জানাননি!—আমি বললাম।

চেয়ারের পেছনে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে ও বলল, শরদিন্দু সান্যাল। আপনি আমাকে শরদিন্দু বলেই ডাকবেন। মিস গুপ্তের কাছে আপনার সাফল্যের অনেক ইতিবৃত্তই আমার কানে গেছে। মানুষের বহু সমস্যার সমাধান আপনি করে দিয়েছেন।

আমি বললাম, ঠিক তা নয়। প্রত্যেকের নিজের সমস্যার সমাধান নিজেরই করে নেওয়া উচিত। আমার কাজ তোমাকে সাহায্য করা, তোমার সত্যিকারের সমস্যাটা হৃদয়ঙ্গম করা।

বাঃ চমৎকার লোক তো আপনি! আপনি আপনার 'ফি' নেবেন, আর আমার নিজের প্রয়োজনটুকু নিজেকেই করে নিতে হবে!

শরদিন্দুর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। কিন্তু তাতে আমি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলাম না। সহজ শান্ত

ভঙ্গিতে বললাম, সপ্তাহের এই দিনের এই সময়টুকুতে কোনওরকম পারিশ্রমিক আমি গ্রহণ করি না, এটা আমার অফিসের রিসেপশনিস্ট নিশ্চয় তোমাকে জানিয়েছে। আচ্ছা শরদিন্দু, তুমি কারও দ্বারা প্রতারিত হয়েছ এ-ধারণা কখনও তোমার হয়েছে?

ভুরু কুটিল করে শরদিন্দু আমার পানে তাকিয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

আমি এবার গলায় উত্তাপ মাখিয়ে বললাম, আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে তোমাকে সাহায্য করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

চেষ্টা করলেও আপনি পারবেন না। —অসহায়ভাবে বলে শরদিন্দু, কেউই পারবে না। আমার দোষ সম্পর্কে আমি ভালোরকমই বুঝে ফেলেছি।

তাহলে আলোচনা করতে বাধা কোথায়?

ভয় হয় ডাক্তার, কোনওকিছুর দ্বারা নিবৃত্ত না হলে হয়তো আমি অন্যায় কিছু করে ফেলতে পারি।

অন্যায় বলতে কী বোঝাতে চাইছ?—আমার কণ্ঠে কৌতূহলের সুর।

শরদিন্দুর ডান হাতের আঙুলগুলো যেন কুঁকড়ে যায় প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায়। তীব্র একটা পাশবিক উত্তেজনায় দু-হাতের আঙুল মোচড়াতে থাকে। বুকভরে একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে শরদিন্দু বলে, আমার এই দু-হাতের মুঠোর ভেতরে কাউকে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়।

মানুষের ভেতরে সে-প্রবৃত্তি অল্পবিস্তর বর্তমান, শরদিন্দু। এ-নিয়ে নিজেকে অস্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়াটা তোমার উচিত কাজ নয়। ভালো কথা শরদিন্দু, কখনও কারও ওপরে চড়াও হয়ে মারধোর করেছ?

না এখনও সেটা হয়নি। তবে—।

থামলে কেন, বলো।

পরের জিনিসপত্রের দিকে ভীষণ ঝোঁক যাচ্ছে। চুরি করছি। তবে প্রয়োজনে করি বললে আমার ওপর অবিচার করা হয়। কীসের যেন প্রচণ্ড টানে এটা করতে বাধ্য হই।

কী-কী চুরি করো?

এই ধরুন সুন্দরী মেয়েদের শৌখিন সব জিনিসপত্তর। আমার সেও খুব সুন্দরী ছিল কিনা।

শরদিন্দুর কাছে জানতে চাইলাম, চুরি করার সময়ে ওর মানসিক অবস্থা কীরকম থাকে, ও পরে এ-সম্পর্কে ভাবে কিনা।

আমি জানি, চুরি করা জিনিসগুলো থেকে চৌর্যবৃত্তির সূত্র পাওয়া যায় সময়ে-সময়ে।

কিন্তু শরদিন্দু আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় এজন্যে আমি চিন্তিত নই, ডাক্তার।

চৌর্যবৃত্তিটা নীচে নামার প্রাথমিক সোপান, এটা বিশ্বাস করো?

যা করি তাগিদে।—শরদিন্দু বলে, কী জানেন ডাক্তার, জীবনে দুটো মস্ত আঘাত আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

আঘাত!

হ্যাঁ, হৃদয় সংক্রান্ত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় শরদিন্দু। শান্ত সংযতকণ্ঠে বলে, পারিশ্রমিক আজ যখন আপনি নেন না তখন এর বেশি আর আপনার সময় নষ্ট করি কেন। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারলে এই আপনার সঙ্গে শেষ দেখা। আচ্ছা, নমস্কার—।

প্রতি-নমস্কারের অবকাশ আমাকে না দিয়ে চেম্বারের সুইং-ডোর ঠেলে শরদিন্দু বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই আমার রিসেপশনিস্ট মঞ্জুশ্রী গুপ্ত আসে।

মঞ্জুশ্রী বুদ্ধিমতী মেয়ে। প্রায় বছরখানেক হল আমার এখানে কাজ করছে। বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ হবে।

কথাবার্তায় ভদ্র, ব্যবহারে মার্জিত ও। অহেতুক ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। কাজলের ছোঁয়াচ লাগানো ভুরুর নীচে দুটি গম্ভীর চোখ। আর সেই অতল স্বচ্ছ চোখদুটিতে আশ্চর্য এক আকর্ষণ।

ডক্টর, মিস্টার ঘোষ চৌধুরী কাল সকালে তাঁর বাড়িতে আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছেন।—মঞ্জুশ্রীর কণ্ঠস্বরে কোমলতা।

ফোন করেছিলেন বুঝি তিনি?—আমি জানতে চাইলাম।

ঘাড় নেড়ে মঞ্জুশ্রী সম্মতি জানাল।

আচ্ছা আমি যাব'খন।

মঞ্জুশ্রী চলে যেতে উদ্যত হতেই আমি ডাকলাম, মিসেস গুপ্ত, ওয়েটিং রুমে আর কোনও রোগী আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দুজন অপেক্ষা করছেন।

খুব সিরিয়াস কেস কিছু?

একজনের সিজোফ্রেনিয়া—।

মঞ্জুশ্রী কথাটা শেষ করবার আগেই আমি নিজের কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম, মাথাটা বড় ধরেছে—আগের রোগীটার বক্তব্য শুনতে-শুনতে—।

ইচ্ছা করেই শেষ করলাম না কথাটা।

মৃদু হেসে ধমকের সুরে মঞ্জুশ্রী বলল, মাথার আর দোষ কী বলুন! দাঁড়ান 'অ্যাসপিরিন' এনে দিচ্ছি।

মঞ্জুশ্রী চলে গেল চেম্বার থেকে।

আশ্চর্য মেয়ে এই মঞ্জুশ্রী। সবসময়ে আমার ওপর ওর তীক্ষ্ণ নজর। মাঝে-মাঝে ভারী ভালো লাগে। শিক্ষিত ও পাশ করা নার্স হয়েও ওর এতটুকু আত্মম্ভরিতা নেই।

ডক্টর।

মঞ্জুশ্রীর ডাকে যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। তাকালাম।

আমার সামনে অ্যাসপিরিনের দুটো ট্যাবলেট ও একগ্লাস জল।

মঞ্জুশ্রীর হাত থেকে নিয়ে ওর নির্দেশ পালন করলাম। তারপর খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলাম।

ডাক্তার, আজ একটু আগে যাব ভাবছি,—মঞ্জুশ্রী বলে।

কেন?—আমি জিগ্যেস করি।

একটু সঙ্কুচিত হয়ে মঞ্জুশ্রী বলে, আয়োজনের ব্যবস্থা কিছু হয়নি। তাই আপনাকেও বলিনি। মৃণাল আর আমার—।

বিবাহ-বার্ষিকী! বুঝেছি-বুঝেছি।—আমি বলি, দেখতে-দেখতে একটা বছর কখন যে কেটে গেল—।

আমি আনমনা হয়ে গেলাম।

মঞ্জুশ্রী বলল, না, ছ'মাস হল। আপনার কাছে হয়তো অস্বাভাবিক ঠেকবে। ছ'টা মাস তো আর কম নয়!

হঠাৎ আমি হেসে উঠলাম। একান্ত নিঃশব্দে নয়, শব্দ করে। নিজের কানেই কেমন বিশ্রী ও বেমানান মনে হল। হাসি থামিয়ে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললাম, ঠিক—ঠিক বলেছ, মঞ্জু।

এ-জগতে সুখী দম্পতি আর কজন!

ভেবেছিলাম, শরদিন্দু হয়তো আর আসবে না। কিন্তু সপ্তাহের সেই বিশেষ দিনটিতেই সে এসে হাজির হল আমার চেম্বারে।

গায়ের জামা-কাপড় অসংবৃত, চুলগুলো অবিন্যস্ত। একহাতে ঝুলছিল একটা এয়ার-ব্যাগ।

ব্যাগ আমার টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

আমি বললাম, কী ব্যাপার? আছ কেমন?

খুব খারাপ। প্রায় শেষ হওয়ার দাখিল।—বলল শরদিন্দু।

সেকী!—আমার এবারে অবাক হওয়ার পালা।

শরদিন্দুর অবস্থা নিশ্চল পর্বতের মতো। হাত-পা অবশ।

ব্যাগটা খুলুন তো ডাক্তার! জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রাখুন।

শরদিন্দুর নির্দেশ পালন করলাম কৌতূহলভরে।

টেবিলের ওপর জমে উঠল কয়েকটি শাড়ি ও ব্লাউজ।

এগুলো নিয়ে কী করবে?—আমি জিগ্যেস করি।

শরদিন্দু সোজা হয়ে বসে—গলায় উত্তাপ মাখিয়ে বলে, আমার স্নায়ুতে-স্নায়ুতে হীরার বিষের জ্বালা ডাক্তার। ক'দিন ধরে এক তীব্র নেশা আমার মস্তিষ্কের ভেতরটা কীটের মতো কেটে-কেটে খাচ্ছে। আবার আমি চুরি করতে আরম্ভ করেছি।

শরদিন্দুর কথায় বিস্মিত হই না। কিন্তু চোখ চকিত হয়ে ওঠে। কপালে চিন্তার ছায়া পড়ে।

চেয়ারের হাতলে হাত রেখে তার ওপর থুতনিটা ছেড়ে দেয় শরদিন্দু। সংশয়-ক্লান্ত ক্ষীণ গলায় বলে, আমি কী ভালো হতে পারি না, ডাক্তার?

অভয়ের ভঙ্গিতে হেসে বলি, কেন পারবে না? আত্ম-সংবরণ করো শরদিন্দু। নিজেকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে কোনওদিনই শান্তি পাবে না। আত্মসংযমী হও। একটা দুঃখকে ভুলে থাকতে গিয়ে এভাবে নিজের সর্বনাশ কোরো না।

সহসা খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে অনুরোধের সুরে শরদিন্দু বলে, সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসা, ডাক্তার। যেসব বাড়ি থেকে ওগুলো চুরি করেছি, তাদের ঠিকানাও ব্যাগের মধ্যেই পাবেন। দয়া করে আপনি ওগুলো ঠিক-ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন। ওতে ঠিকানাও লেখা আছে। কথা দিচ্ছি ডাক্তার, আর কখনও অমন কাজ করব না।

আমি সম্মত হলাম, যদিও জানতাম কাজটা সহজসাধ্য নয়। চুরি করা জিনিসগুলো ফেরত দিতে গিয়ে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তার উত্তর দেওয়াটা রীতিমতো বিরক্তিকরও বইকি। সেই কারণেই এয়ার ব্যাগে ভরা জিনিসগুলো তখনকার মতো আমার চেম্বারের স্টিলের আলমারিতে ভরে রাখলাম।

কিন্তু আমার অপকীর্তিটা মঞ্জুশ্রীর কাছে ধরা পড়ে গেল। ও আবিষ্কার করে ফেলল একদিন।

এক সকালে চেম্বারে ঢুকতেই মঞ্জুশ্রী সরাসরি জিগ্যেস করে বসল, ডক্টর মুখার্জি, আলমারিতে একটা এয়ার ব্যাগ দেখলাম। ব্যাগের ভেতরে কতকগুলো জিনিসও আমার চোখে পড়ল। কী ব্যাপার? ওগুলো ওখানে কেন?

ব্যাপারটা ওকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলাম। তবে শরদিন্দুর নামটা উল্লেখ করলাম না। মঞ্জুশ্রী হেসে বলল, এ-রকম হাস্যকর চুরির কথা কখনও শুনিনি।

তোমার কাছে এটা হাসির খোরাক জোগাবে।—আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তবে আমি স্থির নিশ্চিত, আমার এই রোগীটি মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভীষণভাবে জর্জরিত। ওর জন্যে সত্যিই আমার মায়া হয়।

শরদিন্দু আমার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিল। চৌর্যবৃত্তিকে আর প্রশ্রয় দেয়নি।

দু-সপ্তাহ পরে যখন আমি কাজে ব্যস্ত, একজন রোগীর প্রস্থানের পরমুহূর্তে বেল টিপে পরবর্তী রোগীকে আসতে জানাব মঞ্জুশ্রীকে, ঠিক সেই সময়ে মূর্তিমান বিশৃঙ্খলার মতো এসে উপস্থিত হল শরদিন্দু।

এসেই ধপ করে সামনের চেয়ারটা অধিকার করে আমার সামনে দশ টাকার খানকয়েক নোট মেলে ধরে বলল, আজ আর পরামর্শ নয়, আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

'ফিস' দিচ্ছ?—আমি জিগ্যেস করলাম।

শরদিন্দু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, পঞ্চাশ টাকা, তাই না?

হ্যাঁ, ওটা মঞ্জুশ্রীকে দিয়ে আগে থাকতে দেখা করার ব্যবস্থা করাই তোমার উচিত ছিল, শরদিন্দু।

ফুরসত পেলাম না। যাই হোক, যথাস্থানেই দিয়ে দেব।—টাকাটা আবার সাইড পকেটে চালান করে দিয়ে শরদিন্দু বলে, ডাক্তার, আমি একটা বাইনোকুলার কিনেছি। যত সুন্দরী স্ত্রীর ওপর আমার দারুণ মোহ! নিজের বাড়ির চারতলার বারান্দায় বসে আশেপাশের যত বাড়ির সুন্দরী স্ত্রী দেখা যায়—।

থামিয়ে দিয়ে আমি বলি, তোমার স্ত্রীও সুন্দরী ছিল বুঝেছি। পেয়ে হারানোর ব্যথাটা এমনি করে মনের মধ্যে আজও পুষে রেখেছ কেন?

সে-জ্বালা বড় ভয়ানক, ডাক্তার। গতকাল বিকেলে সামনের ওই পার্কের বেঞ্চিতে বসে আপনার ওই মঞ্জুশ্রীকে দেখলাম চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে। চা খাচ্ছিল আর কী যেন লিখে নিচ্ছিল নোটবুকে। মেয়েটার রূপ আছে মানতে হবে।

গম্ভীরভাবে আমি বললাম, মঞ্জুশ্রী বিবাহিত। ওর স্বামী এক মার্চেন্ট অফিসে ক্যাশিয়ার। সুখের সংসার ওদের। ওর দিকে নজর না দিলে আমি খুশিই হব।

ওকে আমার চাই ডাক্তার।—শান্ত সমাহিতের মতো বলল শরদিন্দু।

শরদিন্দু!—আমি ধমকে উঠলাম।

শরদিন্দু বিন্দুমাত্র আহত হল না। নির্বিকার গলায় বলল, আমি অন্যায় কিছু বলিনি। মঞ্জুশ্রীকে আমি ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছি।

দেশে আরও অনেক মেয়ে আছে। দেখেশুনে তাদের যে-কোনও একজনকে বিয়ে করে সুখী হতে চেষ্টা করো।

আমি যদি ওকে চিঠি লিখে মনের কথা জানাই!

বাধ্য হয়ে তখন আমাকে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে।

বুঝেছি, ডাক্তার। সব বুঝেছি।—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শরদিন্দু বলল, আপনি আমাকে সারিয়ে তুলতে চান না। আমার অবস্থাটা আপনি উপভোগ করতে চান। বেশ, করতে হবে না আমার চিকিৎসা। এই নিন আপনার 'ফিস'।

টেবিলের ওপর দশ টাকার পাঁচখানা নোট রেখে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে।

রাগে সমস্ত শরীর তখন আমার জ্বলছিল। ভাবলাম, পুলিশে সবকিছু জানিয়ে শরদিন্দুর প্রসঙ্গটার নিষ্পত্তি করে দেওয়া যাক। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে ডায়ালও করলাম টেলিফোনের রিসিভার তুলে। অপর প্রান্ত থেকে সাড়াও এল। কিন্তু কিছুই বললাম না। স্থির করলাম, শরদিন্দুর সঙ্গে আর-একবার সাক্ষাৎকারের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম, শরদিন্দু আবার আসবে।

দুদিন পরে আমার অফিসের ডাকবাক্সে মঞ্জুশ্রীর নামে একখানা চিঠি আবিষ্কার করলাম। মঞ্জুশ্রীর নামে কোনও চিঠিই এতাবৎকাল এখানে আসে না। কৌতূহল হল। এনভেলাপ ছিঁড়ে নীল রঙের একটা কাগজ বের করলাম।

মঞ্জুশ্রীকে প্রেম নিবেদন করেছে শরদিন্দু।

আমার কপালে চিন্তার ছায়া পড়ল। ঘৃণা মেশানো বিদ্রূপে ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেল আপনাথেকেই। এনভেলাপ সমেত চিঠিখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেললাম।

তিনদিন পরে আবার চিঠি এল।

শরদিন্দুর চিঠি। মঞ্জুশ্রীকে লিখেছে। সেই একই বক্তব্য।

মঞ্জুশ্রীকে কিছুই জানালাম না।

এরপর প্রতিদিনই একখানা করে চিঠি মঞ্জুশ্রীর নামে আসতে লাগল শরদিন্দুর কাছ থেকে।

পড়তাম, ছিঁড়ে ফেলতাম, আর শরদিন্দুর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলতে থাকতাম।

শরদিন্দু এল শনিবারের নির্দিষ্ট সেই দুপুরটিতে। শেষ রোগী তখন বিদায় নিয়েছে। আমিও উঠব-উঠব ভাবছি, শরদিন্দু সুইং-ডোর ঠেলে প্রবেশ করল আমার চেম্বারে।

আমি বললাম, কেমন আছ শরদিন্দু! আমাদের আগের কথাগুলো সম্পর্কে এতদিনে নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত তুমি করে নিয়েছ!

শরদিন্দু আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে আমার সম্মুখীন হল। চেয়ারে বসল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলল, হ্যাঁ, আলো একটা দেখতে পেয়েছি। এরপর থেকে আমার কোনও অভিযোগই তোমার কাছে আসবে না, ডাক্তার মুখার্জি।

ভুরু কুঁচকে আমি বললাম, বক্তব্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, শরদিন্দু।

শরদিন্দু বলল, মঞ্জুশ্রীর সমস্ত ভার নেওয়ার পরেই দেখবে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। দেখবে, আমার সব মানসিক রোগ কেটে গেছে।

শরদিন্দু, এখনও সময় আছে ভুল শুধরে নেওয়ার—।

আমার কথার মাঝপথে শরদিন্দু বলে ওঠে, হিতোপদেশ শুনতে এখানে আসিনি, ডাক্তার। দিনের পর দিন চিঠি লিখলাম, একটা উত্তরও পেলাম না। এ থেকে বেশ বুঝতে পেরেছি, এতে ওর সম্মতি আছে। ডাকো ওকে—।

শরদিন্দুর কণ্ঠে আদেশের অগ্নি।

আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করি। আমতা-আমতা করে বলি, এটা একেবারেই সম্ভব নয়। পরের সংসার ভেঙে—।

খুব সম্ভব। গায়ে আমার কম শক্তি নেই। জানো তো, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।—শরদিন্দু এবারে গলার সুর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলে, আমি বাঁচতে চাই, ডাক্তার—আমি বাঁচতে চাই। এভাবে একটু-একটু করে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না।

সহসা ও কলিং বেলটা টিপে ধরে। শব্দের তরঙ্গ ওঠে। আমি বাধা দিতে পারি না।

কয়েক মুহূর্ত পরেই মঞ্জুশ্রী প্রবেশ করে চেম্বারে।

কিছু বলবেন, ডক্টর?—মঞ্জুশ্রী জানতে চায়।

কাছে এসো।

সে-কথার বিরুদ্ধাচরণ করল না মঞ্জুশ্রী।

শরদিন্দু এগিয়ে যায় ওর দিকে। মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

মঞ্জু!

বাঁকা চোখে মঞ্জুশ্রী তাকায়।

সহসা ওর একখানা হাত চেপে ধরে শরদিন্দু বলে, আমায় এভাবে কষ্ট দিয়ে কী আনন্দ পাও, মঞ্জু!

নিজের হাতখানা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেয় মঞ্জুশ্রী, প্রতিবাদের ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, এসব কী বলছেন আপনি?

বিশ্বাস করো, অন্যায় কিছু বলছি না। তোমাকে একান্তভাবে নিজের করে পেতে চাই। আমার শূন্য জীবনকে তুমি ভরে তোলো, মঞ্জু!

পাগল হলেন নাকি!—মঞ্জুশ্রী প্রস্থানোদ্যত হয়।

এগিয়ে গিয়ে শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে শরদিন্দু কঠোর স্বরে বলে, আমার ভালোবাসার আবেদনটা তাহলে প্রত্যাখ্যান করার সাহস তুমি রাখো!

হ্যাঁ, একটা উন্মাদের সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে।

সেই মুহূর্তে এক বিচিত্র আকুলতা শরদিন্দুকে পেয়ে বসে। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে মুখখানা বীভৎস করে মঞ্জুশ্রীর গলাটা চেপে ধরে দু-হাতে।

একী—একী করছেন!—মঞ্জুশ্রীর বিস্ফারিত ওষ্ঠের মাঝ দিয়ে একটা আর্তধ্বনি বেরিয়ে আসতে চায়।

ঠিকই করছি। এতকাল না-পাওয়ার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে আজ আর কারও প্রত্যাখ্যান সহ্য করব না। আমি তো মরেছিই, তুমি সুখে থাকো কেন!

দম নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে-করতে মঞ্জুশ্রীর গলা থেকে বেরিয়ে আসে ডক্টর—।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমার দেহে চমক খেলে যায়। মঞ্জুশ্রী শরদিন্দুর নাম ধরে ডাকেনি—ডেকেছে আমাকে। আমাকে ডাকছে কেন!

ডক্টর মুখার্জি, আমাকে খুন—। —আর বলতে পারল না মঞ্জুশ্রী।

এতক্ষণে যেন নিজের অস্তিত্ব ফিরে পেলাম। মঞ্জুশ্রীকে ছেড়ে দিয়ে দেখলাম চেম্বারের চারিপাশ। না, তৃতীয় কোনও প্রাণী নেই।

তাকালাম কার্পেট-পাতা মেঝেয়।

আমার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে মঞ্জুশ্রীর মৃতদেহ।

তাহলে আজকের এই ঘটনায় আমি দর্শক নই—আমিই নায়ক! শরদিন্দুর মানসিক ব্যাধি আমার সঙ্গে না মিললে আমি আজ তার ভূমিকায় অংশ নেব কেন!

শরদিন্দু আজ আসেনি।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, **১৯৬২**



ড্রাগনভিলা

রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অদৃশ্য বস্তুর মতন এমন অনেক পার্থিব জিনিসই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশে, যাকে আমরা দেখেও দেখি না। এটা হয়তো সত্যিকারের কোনও অলৌকিক ঘটনার মতনই শোনাবে, তা হলেও এটা একটা বাস্তব সত্য। অত্যন্ত নিদারুণ সত্য বলেই এর বাস্তবতা ভয়ঙ্কর। ভ্রমণবিলাসী এবং পুরাতত্ত্ববিলাসী তাঁর সংবেদনশীল মন নিয়ে রূঢ় গোপনতার ভেতরে প্রবেশ করে যদি একটা নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন (অবিশ্যি সত্যিই তাঁরা যে ফিরে আসতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা দেওয়া না-ই ভালো) তাহলেও সে-গুপ্ত পৃথিবীর রূপটা অন্য সবার কাছে অপরিজ্ঞাতই থেকে যাবে। এর একটা কারণ এই যে, পুরাতত্ত্ববিলাসী যখন সেই জগৎ থেকে ফিরবেন তখন তিনি আর চক্ষুষ্মান থাকবেন না। দু-চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বাইরের পৃথিবীর আলোর জগতে তিনি যখন প্রবেশ করবেন তখন সবই তাঁর কাছে অন্ধকার আর চোখের কোটরের অন্দরের তীব্র ও বিভীষিকাময় এক অনুভূতি।

সে কী! আমরা চিৎকার দিয়ে উঠলাম, সুরম্য, তুই এসব কী বলছিস?

ঠিকই বলছি! বললে সুরম্য একটু ম্লান হেসে, জানিস, আমি গিয়েছিলাম সেই অন্ধকার কন্দরে!

কীসের কন্দরে?

ড্রাগনভিলায়! অবশ্য 'ভিলা' শব্দটা আমরাই যোগ করেছি। সুরম্য ধীর ও শান্ত কণ্ঠে কফি খেতে-খেতে বললে, নাম তার ড্রাগনভিলা। সংসারে অনেক অদৃশ্য বস্তুর মতনই সেই ড্রাগন-ভিলাও এতকাল লোকচক্ষে অদৃশ্যই ছিল। এই সেদিন, ধর মাসদুয়েক আগে এক শিকারি ভদ্রলোক হঠাৎ সেই ভিলাটা আবিষ্কার করেন। কী বলব, জামালপুর-মুঙ্গেরের পাহাড়ে-ঘেরা সে-

জঙ্গলের রূপ দেখলে তোরা শিউরে উঠবি। জামালপুর স্টেশনের পেছনে রেল কলোনি, সেই কলোনির পেছনে পাহাড়সারি ডিঙিয়ে চলে যাও পুব-দক্ষিণমুখো। পাহাড়ের চুড়োয় ওঠো—দেখবে পাহাড়ের সারি চলে গেছে যত দূর চোখ যায়। সেই ধোঁয়া-নীল পাহাড়ের তলায় অচেনা এক অরণ্য। শিকারিরা প্রায়ই যায় সে-জঙ্গলে। আমরাও গিয়েছিলাম। জামালপুর থেকে আমরা তিনবন্ধু শিকারের লোভে সেই প্রথম ওই অরণ্যে প্রবেশ করি। খুব ভোর-ভোর থাকতেই বেরিয়েছিলাম। প্রথমে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে বেশ কয়েক মাইল পরিক্রমা করে দুপুরের দিকে এমন একটা পাহাড়ের গায়ে এসে নামলাম যেখান থেকে একদিক বাদে আর তিন-দিকের কোনও কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশাল চেহারার দুটি পাহাড়-চুড়ো দু-দিক

থেকে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হয়ে দিগন্তকে গ্রাস করে ফেলেছে। তারই কোলে নীচের উপত্যকায় সুবিশাল এক জঙ্গল। আমরা যখন সেই জঙ্গলের উপত্যকায় নেমে এলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। তিনদিকেই পাহাড়ের দেওয়াল বলে উপত্যকার জঙ্গলে কেমন আধো-আলো আধো-অন্ধকার ভাব। আমরা বুঝলাম, আমরা দিক ভুল করেছি। পাহাড়ের চুড়ো থেকে দূরবিনে গঙ্গার রেখা যতটুকু দেখে-দেখে এগিয়েছি—তারপর সেই রেখা অদৃশ্য হয়ে গেলে সম্পূর্ণ অজানা এদিকটায় আর এক পা-ও আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত হয়নি। যদি এই মুহূর্তে ফিরবার উদ্দেশ্য নিয়ে আবার পাহাড়ের চুড়োপথে না উঠি তো বাকি দিনটুকু এবং রাত্রিটা এই ভয়াবহ জঙ্গলেই কাটিয়ে দিতে হবে। সেটা আমাদের পক্ষে হয়তো শুভ নাও হতে পারে, কারণ, শুনেছি এদিকের জঙ্গলে নাকি ভয়াবহ ধরনের প্যান্থার আর নেকড়ের আস্তানা। আমরা অবশ্য শিকারে এসেছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, একমাত্র দিব্যেন্দুই ছিল আমাদের মধ্যে প্রকৃত শিকারি। আমি আর প্রণব বলতে গেলে শখ করেই এসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, শিকারি না হলেও আমরা দুজন ভ্রমণবিলাসী ছিলাম তো বটেই। আর প্রণব তো ছিল পুরাতত্ত্ববিদের ছাত্র।

হঠাৎ প্রণব বলে উঠল, তবে কি আমরা সেই অনুরাধাপুরেই এলাম?

চমকে উঠে আমি বললাম, কী বললি তুই প্রণব? কী পুর যেন বললি?

প্রণব বললে, অনুরাধাপুর!

দিব্যেন্দু তার দূরবিন চোখে রেখে প্রশ্ন করলে, অনুরাধাপুর কি কোনও ঐতিহাসিক নাম, প্রণববাবু?

প্রণবের দু-চোখে তীব্র এক অনুসন্ধানী দৃষ্টি। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে সে জবাব দিলে, হ্যাঁ, ঐতিহাসিক তো বটেই। সম্রাট অশোকের সময়ে পত্তন হয়েছিল সেই অনুরাধাপুরের। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময়ে সম্রাটের এক নাতি, যতদূর সম্ভব মনে আছে, নাম তাঁর অনঙ্গদেব, তিনিই এই নগরী তৈরি করেছিলেন। সম্রাটের অনুরোধে পরে তিনি এ-নগরী বৌদ্ধদের দান করেন। তাঁর মেয়ে অনুরাধার কিন্তু এতে সায় ছিল না। অনুরাধা পরে কয়েকজন তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে চক্রান্ত করে মঠের বৌদ্ধদের হত্যা করে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়। সম্রাট অশোকের তখন মৃত্যু হয়েছে। চিনদেশের দু-একজন ভ্রষ্টচরিত্র ভিক্ষুও অনুরাধার সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে অনুরাধা বিয়ে করে অনুরাধাপুরে শাসনকার্য চালাতে থাকে। এরপরে একদিন অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে অনুরাধার মৃত্যু হয়। তার চোখ দুটো ঝলসে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তার মৃত্যুর পর তার স্বামী সেই চিনে ভিক্ষুটিরও আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। মৃত অনুরাধার দেহের পাশে পাওয়া গিয়েছিল একটা বীভৎস আকৃতির ড্রাগনের মূর্তি। আর—আর—।

প্রণব হঠাৎ থেমে গেল।

আমি বলে উঠলাম, আর, আর—বলেই ফেল না সবটা।

প্রণব কেমন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, আর সেই ড্রাগনের দাঁতগুলোর সঙ্গে গাঁথা ছিল অনুরাধার অমন সুন্দর চোখজোড়ার মণি দুটো!

শিউরে উঠলাম প্রণবের কথায়। এমন বিদঘুটে কাহিনি ইতিহাসের কোন জীর্ণ পাতা ঘেঁটে সে উদ্ধার করলে সেসব প্রশ্নের মধ্যে আর না গিয়েও বললাম, তা তুমি কী করে জানলে যে, এই উপত্যকার জঙ্গলের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সেই অনুরাধাপুর?

প্রণব এবার হাসল। তীব্র অনুসন্ধানী চোখ দুটো আশ্চর্যরকমের সপ্রতিভ হয়ে উঠল তার। নীচ থেকে একটা ভাঙা পাথরের মূর্তির অংশ টেনে তুলে নিয়ে সে বললে, এই দ্যাখো,

জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। প্রথম দৃষ্টিতে বোঝাই যায় না এটা কোনও মূর্তির অংশ কিংবা একটা বাজে পাথর। এর এককোণায় প্রাচীন পালি হরফের একটা বাক্য ফুটে উঠেছে যার সরল অর্থ হচ্ছে, 'অনুরাধাপুরের দেবদাসী'। তার মানে এই ভাঙা পা-টা কোনও দেবদাসীর পাথরের মূর্তির অংশ!

অন্ধকার তখন আরও জমাট হয়ে এসেছে। উপত্যকার জঙ্গলের রূপ দেখে আমরা ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। রাইফেলধারী দিব্যেন্দু দেখলাম বেশ নিশ্চিন্তমনে সমুখের উঁচু টিলার জঙ্গলটার দিকে ওঠবার

উপক্রম করছে। সে বরাবরই শিকারের সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে এক-আধটু রোমাঞ্চ ভালোবাসত। কিন্তু আমরা নতুন শখ করে এসেছি। দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় আমার মুখ ঘনায়মান হয়ে উঠল।

আমি বললাম, চলুন দিব্যেন্দুবাবু, এবার ফেরা যাক। পাহাড়ের মাথায় উঠলে এখনও আলো পাওয়া যাবে। অন্তত দু-চার মাইল তো দিনের আলোয় হাঁটতে পারব।

দিব্যেন্দু ওখান থেকে চেঁচিয়ে বললে, কিন্তু শিকার? কিছু একটা না করে ফিরে গেলে, আপনারা তো কলকাতা চলে যাবেন, আমার কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে হতাশা আর ব্যর্থতার মধ্যে থেকে-থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু এই রাত্তিরে, এই ভয়াবহ জঙ্গলে!—কেমন বিবর্ণ কণ্ঠে বললাম।

ভয় কী, তাঁবু আর খাবার তো সঙ্গে রয়েছেই।—তেমনই চেঁচিয়ে বললে দিব্যেন্দু।

প্রণবেরও দেখলাম পুরোপুরি ইচ্ছে এই জঙ্গলে রাতটা কাটানো। পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের নেশা ধরেছে হঠাৎ তার। আর একজনের শিকারের নেশা। এমন বিচিত্র লোকদের সঙ্গে কখনও বের হতে হয়! অগত্যা সব আশা ছেড়ে দিয়ে প্রণবের অনুগামী হলাম। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আর সে কী জঙ্গল—ভাষায় বর্ণনা করি এমন সাধ্য নেই আমার। শাল আর সেগুনের ফাঁকে-ফাঁকে বুনো পলাশ, পিয়াল, বোংগা, কদম আর ধওড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এক ধরনের রাক্ষুসে তৃণলতা আর চীহড় লতায় বেষ্টিত হয়ে সেই জঙ্গল উঁচু-উঁচু টিলার এ-ধারে ও-ধারে ছড়িয়ে থেকে যেন অসংখ্য ব্যূহের সৃষ্টি করেছে। একবার যদি সেই ব্যূহের ভেতরে ঢোকো তো আর বের হতেই পারবে না। আর সেই ব্যূহবেষ্টনীর ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমনিতরো জঙ্গল প্রায় মাইলদেড়েক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে বিপরীত দিকের একটা পাহাড়ের কোলে। শুনলাম এ-জঙ্গলে নাকি চিতাবাঘ আর বন্য বরাহও রয়েছে। দিব্যেন্দুর মুখখানা দেখলাম খুশিতে ডগমগ করে উঠেছে।

অগত্যা আমি বললাম, ওহে পুরাতত্ত্ববিদ, তোমার সেই অনুরাধাপুরের কোনও একটা ধ্বংসস্তূপ-টুপও কী পাওয়া যাবে না এই জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে?

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে প্রণব বললে, তাই তো খুঁজছি, সুরম্য! কিন্তু একটা কথা, অনুরাধার চোখের মণি দুটো ড্রাগনের মূর্তির দাঁতে গাঁথা হল কেমন করে?

আমি হেসে বললাম, হয়তো কোনও গুপ্তস্থানে অনুরাধার পর্যাপ্ত ধনসম্পদ রক্ষিত ছিল। চিনে ভিক্ষুটা সেসব লুঠ করে সরে পড়বার আগে তাকে হত্যা করে লোককে ভয় দেখানোর জন্যেই চোখ দুটো তুলে নিয়ে ওই ড্রাগনের দাঁতে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

প্রণব দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, তা নয়। তা হতেই পারে না।

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, হয়তো নয়! কিন্তু তুমি এ-সব উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন এখন?

জঙ্গলের একেবারে মাঝামাঝি এসে একটা উঁচু টিলার ওপরে উঠছিলাম আমরা। চীহড় লতার এমন ঘন সন্নিবেশ এতক্ষণের মধ্যে আর চোখে পড়েনি। হঠাৎ টিলার ওপার থেকে দিব্যেন্দুর চিৎকার শোনা গেল, প্রণববাবু, দেখে যান—আপনার কথাই সত্যি হল তাহলে!

অন্ধকার হলেও তখনও কিছু-কিছু আলো দেখা যাচ্ছিল চারদিকের। প্রণব ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে উঠে ওপারের ঢালুর দিকে নেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পশ্চাদ্ধাবন করলাম তার, কতকটা প্রাণের দায়েই। স্পষ্ট অনুভব করলাম, কাঁটায় ভরা শিমূল গাছের সঙ্গে ঘষা লেগে আমার ডানদিকের ঘাড় আর হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে। জামাটা তো সঙ্গে-সঙ্গেই ছিঁড়ে গিয়েছিল।

দিব্যেন্দু কেমন বড়-বড় চোখ নিয়ে টিলার দেওয়ালের একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই দেখুন, একটা সুড়ঙ্গপথ। চীহড় লতার আড়ালে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। দিব্যেন্দুর জোরালো ইলেকট্রিক টর্চ যেদিকে তীব্র ফোকাস ফেলে স্থির হয়ে রয়েছিল, জঙ্গলে-ভরা বিরাট ও বিশাল সেই টিলাটার এ-প্রান্তের দেওয়ালে চীহড় লতার

ঘন-সন্নিবেশের আড়ালে সত্যিই দেখতে পেলাম একটা প্রবেশমুখ। অনেকটা সুড়ঙ্গমুখের মতন।

প্রণব তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে সেদিক পানে।

দিব্যেন্দু বললে, আপনার অনুরাধাপুরের কোনও ধ্বংসাবশিষ্ট গুপ্ত প্রাসাদের পথ হয়তো এটা, প্রণববাবু।

প্রণব বলে উঠল, চলুন, ভেতরে ঢোকা যাক!

আশঙ্কার সুরে আমি বললাম, কিন্তু ওই সুড়ঙ্গপথের ভেতরে হয়তো কোনও হিংস্র জন্তু-টন্তুর আস্তানাও থাকতে পারে, দিব্যেন্দুবাবু!

তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়ে প্রণব বলে উঠল, না, তা থাকতে পারে না। চীহড়ের গড়ন এবং সন্নিবেশটা বেশ ভালো করে দ্যাখো!

দেখলাম।

প্রণব বললে, যদি বন্য জন্তু এই পথে যাওয়া-আসা করে থাকে তাহলে চীহড়ের ঘন সন্নিবেশ এমন মজবুত ও অনড় থাকত না। অন্তত এই চীহড় ও পরগাছা লতাগুলোর মাঝবরাবর একটা ফাঁক থাকতই, যেখান দিয়ে বন্য জন্তুরা ওই সুড়ঙ্গপথে যাওয়া-আসা করত। কিন্তু এখানে তা কই?

সত্যি তা কই? বিস্মিত হলাম আমি। কিন্তু তবুও বললাম, কিন্তু পাইথন থাকতে পারে। বিশেষ করে ভাঙা বাড়ি বা দুর্গ-টুর্গর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শুনেছি ভয়াবহ জাতের পাইথনেরা বাস করতে ভালোবাসে।

টর্চ হাতে দিব্যেন্দু বললে, তা থাকতে পারে।

তবে—তা সত্ত্বেও ঢুকতে চাইছেন?

কিন্তু পাইথন তো এ-জঙ্গলের সর্বত্রই রয়েছে, সুরম্যবাবু, সবখানেই তার ভয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো এই জঙ্গলে আপনি আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চলুন, রাতটা বাইরে তাঁবুর বদলে ওই সুড়ঙ্গ-শেষের অনুরাধাপুরীর মধ্যে গিয়েই থাকি!

বুঝলাম, এ-যাত্রা আর এদের হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। পৈতৃক প্রাণটা এবার রেখে যেতেই হবে এ-জঙ্গলের তলার সুড়ঙ্গগর্ভে। কী কুক্ষণেই না সোল অ্যাভেন্যুর কফি হাউসে বসে প্রণবের কাছে মুঙ্গেরে আসার কথাটা বলেছিলাম। পুরাতত্ত্ববিদ প্রণব কথাটা শুনেই আমার সঙ্গে আসার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। শেষপর্যন্ত এলও। তারপর মুঙ্গেরের বিখ্যাত শিকারি দিব্যেন্দুর বাড়িতে এসে দুজনে উঠলাম। তারপর দেখলাম, ওরা দুজনে বেশ মিলে গেছে। দুজনেই রোমাঞ্চ ভালোবাসে। আমিও ভালোবাসি, তবে মুখে, কাজে নয়। অথচ দিব্যেন্দু আমারই বন্ধু—প্রণবের সঙ্গে তার পরিচয় এই প্রথম। আমরা দুজন তার অতিথি। কিন্তু প্রণবের সঙ্গে তার সেয়ানে-সেয়ানে মিল হয়ে গেছে। শালুক চিনেছে ঠাকুর। দিব্যেন্দু চিনেছে প্রণবকে। সে বেপরোয়া শিকারি—রোমাঞ্চকর তার জীবন। প্রণবও পুরাতত্ত্ববিদ—জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরতে ভালোবাসে। সেই সঙ্গে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে। দিব্যেন্দু তার মনের মতো সঙ্গী খুঁজে পেলে। তারপর এই অভিযানে আসা।

রাত্রির রূপ ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাঁরা রাত্রির এ-ভয়াল রূপ দেখেননি তাঁদের কাছে এর বর্ণনা সহজসাধ্য নয়। জঙ্গলের দিকে-দিকে হিংস্র জানোয়ারদের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। জঙ্গলের আকৃতি এতই ঘন যে, তার ফাঁক দিয়ে রাত্রির আকাশের এতটুকু চেহারাও নজরে পড়ছিল না।

প্রণব বলল, আমিই প্রথমে ঢুকছি।

দিব্যেন্দু হেসে বললে, তাতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

প্রণব আগে-আগে, তারপর দিব্যেন্দু আর আমি সুড়ঙ্গমুখের ঝোপঝাড় আর চীহড় সরিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রণবের হাতে টর্চ জ্বলছে। সমুখের সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি আমরা। দুজন মানুষ চলতে পারে এমন একটা গহ্বর-পথ নেমে গেছে ক্রমশ নীচের দিকে। দু-ধারে নিরেট মাটি আর পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে কোথাও সোরা আর বিবর্ণ শ্যাওলার মতন উদ্ভিদ। খয়েরি ভেলভেটের মতন দেখতে অনেকটা।

অত্যন্ত সতর্কপদে অগ্রসর হচ্ছিলাম আমরা। ক্রমশই ঢালুর দিকে নেমে গেছে গহ্বর-পথটা। পথের ওপর মাঝে-মাঝে প্রতিবন্ধকের মতন ভাঙাচোরা দু-চারটে পাথরের স্তম্ভ এবং দেওয়াল থেকে ধসে পড়া পাথরখণ্ড। সেগুলো ডিঙিয়ে যেতে আমাদের কোনও কষ্টই হল না।

হঠাৎ প্রণব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, পথ শেষ। গহ্বর-পথের ভেতর দিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি আমরা।

প্রণবের কথা শেষ হলে বিস্মিত ও আতঙ্কিত চোখে দেখতে পেলাম, আমাদের সমুখে বিরাজ করছে নিশ্ছিদ্র কালো রঙের নিরেট এক পাথরের দেওয়াল, তার গায়ে কোথাও এতটুকু ফাঁক বা প্রবেশপথের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তাহলে?—কেমন থমথমে গলায় আমি বলে উঠলাম।

কতটা নীচে নেমেছি আমরা, প্রণববাবু?—দিব্যেন্দু কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

অন্তত একশো ফিট নীচে তো হবেই। তাহলেই বুঝুন, কতটা নীচে চাপা পড়ে আছে হাজার-হাজার বছর আগেকার সেই অনুরাধাপুর।

কিন্তু আর পথ কই?

পথ সম্ভবত এখানেই শেষ।—প্রণব তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পাথরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল আমার মনে হয়, এই দেওয়ালটার গায়ে কোনওখানে একটা দরজা রয়েছে। কালের প্রভাবে মাটি আর পাথরে চাপা পড়ে গেছে সেটা।

তন্নতন্ন করে চারধারটা খুঁজে দেখেও দেওয়ালের কোথাও কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, যদি এখানে একটা নিরেট দেওয়ালই থাকবে তাহলে

এ-সুড়ঙ্গপথ তৈরি করবার অর্থ কী! এমন কোনও মহামূর্খ থাকতে পারে সেই ইতিহাসের যুগে, যে শুধু-শুধু একটা বন্ধ সুড়ঙ্গপথ তৈরি করানোর জন্যে অর্থ আর শ্রম ব্যয় করেছিল?

আমি বললাম, চলুন দিব্যেন্দুবাবু, ফিরে যাই। প্রায় ঘণ্টাখানেক তো ঘুরেই মলাম এই বিদঘুটে গহ্বর-গলিতে—আর কেন?

কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রণবের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। জোরালো পাওয়ারের চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। মানুষের চোখের দৃষ্টি যে অমন হতে পারে, বিশেষ করে মাটির তলার ওই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি কেমন বোবার দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইলেকট্রিক টর্চ তেমনি জ্বলেই চলেছে।

প্রণব আচমকা এক চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, শোনো, ওই শোনো, আমি অনুরাধার ডাক শুনতে পাচ্ছি। এই দেওয়াল—দেওয়ালের ওপরই।

সমস্ত সুড়ঙ্গ প্রতিধ্বনিত করে প্রণবের চিৎকারটা যেন পাতালের কোন অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছল। দিব্যেন্দুকে দেখলাম, ধীর ও সংযতভাবে সে প্রণবের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রণবের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল শেষপর্যন্ত! গল্পে বর্ণিত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দৈত্যের মতো লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্রণব এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারল নেই নিরেট দেওয়ালের গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে যে-বিস্ময়কর কাণ্ডের সৃষ্টি হল তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রথমে ঝুরঝুর শব্দ করে তারপর প্রচণ্ড এক শব্দ করে সমুখের দেওয়ালটা ধসে পড়ল গহ্বরের মধ্যে। আর সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে ঠেকল সমুখে হঠাৎ আবির্ভূত এক সুদৃশ্য কারুমণ্ডিত প্রবেশপথের দিকে। দরজার প্রশস্ত পাল্লা দুটো খোলাই ছিল। বিকট এক চিৎকার দিয়ে ধ্বংসস্তূপটা লাফিয়ে পার হয়ে প্রণব সেই দরজাপথ দিয়ে ভেতরের কক্ষে ঢুকে গেল।

আমরা দুজনে হতমৌন হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম। একটিমাত্র আলো—সে ওই টর্চ, তাও প্রণবের হাতে।

অন্ধকারে অনুভব করছি, দিব্যেন্দু তার দামি টেলিস্কোপিক রাইফেলটার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট কণ্ঠে কী আবোল-তাবোল বকে উঠছে।

আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম, অনুরাধাপুর না ছাই! কোনও একটা প্রাচীন গুম্ফার ধ্বংসস্তূপ হবে এটা!

দিব্যেন্দু বললে, যাই হোক, শুনুন, প্রণববাবুকে উদ্ধার করে আনতে হবে ওই গুম্ফা থেকে! যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন আবিষ্কারের নেশায় তাতে ওই গুম্ফার ভেতরের কোনও একটা কুঠুরির মধ্যে গিয়ে বেঘোরে মারা না পড়েন!

তা সত্যি।

তাহলে চলুন ভেতরে ঢুকে পড়ি।

কিন্তু এই তীব্র অন্ধকারে কিছুই যে দেখতে পাচ্ছিনে, দিব্যেন্দুবাবু।

কী করব ভাবছি, ঘড়িতে খুব সম্ভবত রাত দশটা, অকস্মাৎ গুম্ফার ভেতরের কোনও একটা কক্ষ থেকে প্রণবের একটা নির্দয় চিৎকার ভেসে এল, আমার চোখ—আমার চোখ! অনুরাধা, আমার চোখ দুটো তুমি তুলে নিয়ো না,—কে আছ, বাঁচাও—বাঁচাও—।

এক ঝটকায় আসুরিক বিক্রমে একটা লাফ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই সেই ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে দিব্যেন্দু গিয়ে পৌঁছল গুম্ফার অন্ধকার কক্ষে। মিনিটকয়েক ধরে তার পায়ের শব্দ শুনলাম। তারপর একসময় ক্ষীণ হয়ে তাও মিলিয়ে গেল। গুম্ফার অন্ধকার প্রবেশপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কী এমন অপার্থিব জীব থাকতে পারে ওই কুৎসিত গুম্ফার বিষাক্ত কন্দরে যার ভয়ে প্রণব অমন ভয়ার্ত কণ্ঠে সাহায্য চাইছে?

হঠাৎ আমার দৃষ্টি ঘুরে গেল গুম্ফার একেবারে অভ্যন্তরে। অসংখ্য জোনাকি দিয়ে গড়া দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন ধেয়ে-ধেয়ে এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝিঁঝির ডাকের মতন সুরেলা অথচ বীভৎস একটা শব্দ তীব্র ঐকতান সৃষ্টি করে নৃত্যের তালে-তালে অগ্রসর হচ্ছে।

আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, প্রণব, দিব্যেন্দুবাবু—।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তবে? তবে কি তারা কেউ বেঁচে নেই! এ-অভিশপ্ত গুম্ফায় কেন প্রবেশ করলাম ওদের সঙ্গে? ভয়ে আমার সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। একবার ভাবলাম, পালাই এ-অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ ধরে। পরমুহূর্তেই বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। ওই মৃত্যুপুরীর মধ্যে ওদের ফেলে রেখে কোন আক্কেলে পালাব আমি। দিব্যেন্দুর বাড়িতে গিয়ে (অবশ্য যদি সশরীরে গিয়ে পৌঁছতে পারি) এ-মুখ দেখাব কেমন করে?

ঝিঁঝির শব্দ আর সেই বীভৎস জোনাকিপুঞ্জের চোখ ক্রমশই ধেয়ে-ধেয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। ক্রমে দরজার গোড়ায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালে সে-চোখ দুটো। ঝিঁঝির তীব্র ঐকতানবাদন তেমনই বিশ্রী সুরে বেজেই চলল।

মনে-মনে ভাবলাম, ওটা কি অনুরাধার প্রেতাত্মা? অবশ্য যদি প্রেতাত্মা বলে কোনও জিনিস থেকে থাকে!

সেই মুহূর্তেই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। গুম্ফাটা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। জোনাকি-চোখ অপচ্ছায়াটার পেছন দিক থেকে তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল ঝিঁঝির বাদ্যধ্বনি—আর মিইয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল জোনাকিপুঞ্জের নৃত্যরত চোখ দুটো। শুধু হিস—সাঁ—ই—করে একটা তীব্র শব্দ হয়ে সবকিছুই নীরব হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে।

টর্চের আলোয় পলকের জন্যে একবার জোনাকি-চোখের নৃত্যরত জীবটার চেহারা দেখেছিলাম আমি। সে-চেহারার কথা আর বলতে চাইনে। সে-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই না বলাই ভালো।

একটু পরে রক্তাক্ত মুখ হতচেতন প্রণবকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল দিব্যেন্দু। তারপর আমার হাতে টর্চ দিয়ে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন এ-সুড়ঙ্গ ছেড়ে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আমরা সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চলতে লাগলাম। এবার সুড়ঙ্গের পথ চড়াই। বাঁকগুলো অতি কষ্টে পার হয়ে এলাম। দিব্যেন্দুর কাঁধে তখনও প্রণবের অজ্ঞান দেহটা নিথর। সুড়ঙ্গের বাইরে এসে বিবর্ণ কণ্ঠে দিব্যেন্দু হঠাৎ বলে উঠল, প্রণববাবুর চোখদুটো আর নেই, সুরম্যবাবু! একেবারে অন্ধ হয়ে গেছেন উনি।

সে কী!—নিদারুণ বিস্ময়ে চমকে গেলাম আমি।

হ্যাঁ, অনুরাধা ওর চোখ দুটো ছিনিয়ে নিয়েছে!

কিন্তু আপনি গুলি ছুড়লেন যাকে লক্ষ্য করে, সেটা কী?

সেটা?—দিব্যেন্দু মাটির ওপর শুইয়ে রাখলে প্রণবের হতচেতন দেহটাকে। তারপর বললে, একটা ড্রাগন! আর ওই গুম্ফাটাও ড্রাগনের গুহা।

গল্প আমার শেষ হয়ে গেল। এ থেকে যে যা-খুশি আন্দাজ করে নিতে পারেন। অনেকে আমাকে পাগল বলবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথা সত্যি, অভিশপ্ত ওই অনুরাধাপুর জামালপুরের অনেক পাহাড় পেরিয়ে এখনও সে-উপত্যকার জঙ্গলের তলায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কে প্রণবের চোখ দুটো কেড়ে নিয়েছিল জানিনে এবং প্রণবও এ-সম্বন্ধে তারপর থেকে নিশ্চুপ, কিন্তু দরজাপথে অন্ধকারের মধ্যে যে একটা বীভৎস অপচ্ছায়া আমি দেখেছিলাম তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

আমি বললাম, তাহলে তুই টর্চের আলোয় যা দেখলি সেটা কী?

সেটা?—এদিক-ওদিক তাকিয়ে চুপিচুপি কণ্ঠে সুরম্য বলল, সেটা একটা অতিকায় চেহারার হিংস্র গিলা। অনেকটা গোসাপের মতন দেখতে। হাত-পায়ের নখগুলো তীক্ষ্ম ধারালো! হাঃ হাঃ হাঃ—গিলা!

আমরা বললাম, হ্যাঁ, টেক্সাস ও ব্রেজিলের অরণ্যে এমনি গিলার কথা পড়েছি আমরা!

আমি বললাম, ও-ই ড্রাগন! চুপ-চুপ—প্রণব হয়তো এখুনি এসে পড়তে পারে!

কিন্তু প্রণব গুম্ফার মধ্যে ঢুকে 'অনুরাধা আমার চোখ নিয়ো না—নিয়ো না'—বলে অমন অমানুষিক চিৎকার দিয়ে উঠেছিল কেন?—আমরা প্রশ্ন করলাম।

প্রণব হয়তো অন্ধকারে গিলাটাকে ভালো করে দেখতে পায়নি। সে আন্দাজ করেছিল, অনুরাধার প্রেতাত্মাই হয়তো ড্রাগনের রূপ ধরে তার চোখ ছিনিয়ে নিচ্ছে। তাই সে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল অমনি করে।

কিন্তু তুমি এমন ফিসফিস করে কথা বলছ কেন?

কারণ, প্রণব শুনতে পেলে তার সেই অন্ধ-বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তার ধারণা, অনুরাধাই তার অন্ধ হওয়ার মূল কারণ। যেই মুহূর্তে জানতে পারবে আসল রহস্য, পরমুহূর্তেই সে এতটুকু দ্বিধা না করে তার বিকলাঙ্গ জীবনের অবসান ঘটাবে।

আমি নিঃশব্দ হলাম।*

* নক্ষত্র মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

মাসিক গোয়েন্দা

পুজো সংখ্যা, ১৯৬৩



কুসুমের কীট

কমলবরণ মুখোপাধ্যায়

উঃ, বড় অন্ধকার। দু-চোখ মেলে এ-অন্ধকার আমি সহ্য করছি না। চাপ-চাপ অন্ধকার এসে চারদিক থেকে আমাকে চেপে ধরেছে। এই নিটোল-নিশ্ছিদ্র তামসগহ্বরে আমি কি সমাধিস্থ হয়ে যাব? তবে কি আমার সমস্ত চেতনা আষাঢ়ের অশ্রান্ত বর্ষণে ভেসে যাবে বিস্মৃতির মহাসমুদ্রে? তবে কি মানুষের কাছে আমার দাবি, আমার দান সবই শেষ হয়ে গেছে? আমার নিঃশ্বাস গ্রহণের পথ কি কেউ দু-আঙুলে সজোরে রোধ করে আছে?

বাইরে আর-একবার বিদ্যুৎ চমকাল।

আমি সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম এই অন্ধকারের শাসনের মধ্যেও মনোতোষ নির্লিপ্তের মতন হাসছে। অবাক হলাম। ও হাসছে! কিন্তু কী করে?

উঃ! আলো জ্বালো, মনোতোষ।—মাথার দুপাশের শিরা দুটি সজোরে চেপে ধরে বললাম। ও হাসল কি? না আমাকে বিদ্রূপ করল?

বলল, খুবই কি খারাপ লাগছে? থাক না। সমাজে আলো জ্বালতেই তো আমরা এসেছি। আলো জ্বালার চেষ্টাও করছি। কিন্তু তার আগে অন্ধকারের সঙ্গে একটু পরিচিত না হলে কী করে বুঝব যে, অন্ধকারেরও একটি স্বরূপ আছে—আছে তার একটি প্রকৃত আকৃতি!

এই অন্ধকারের মধ্যেও আমার সুমুখের চেয়ারে উপবিষ্ট মনোতোষকে আর-একবার দেখতে চেষ্টা করলাম। মনোতোষ অন্ধকারের স্বরূপ দেখতে চায়। কী আশ্চর্য! ওর কবি হওয়াই উচিত ছিল। হাসি পেল আমার। কিন্তু হাসতে পারলাম না। মনে হল এই অন্ধকারের আকৃতি গড়বার পেছনে হয়তো আমারও কিছু অংশ আছে। সকলেরই থাকে? তাই আমি হাসব না, হাসতে পারলাম না।

মনোতোষ বলে চলল, তেতোর আস্বাদ না জানতে পেলে যেমন মিষ্টির কথা মনে পড়ে না, আলোর জন্যে অন্ধকারও তো তেমনই!... আমরা আলো জ্বালতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ক'টি বাতি জ্বালতে পেরেছি, দেবাশিস? শান্তি-রক্ষণের উচ্চপদস্থ কর্মচারি আমরা, কিন্তু ক' জায়গায় আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি? এই অশান্তি আর অন্ধকারের অস্তিত্ব আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে আছে। মানবশিশুর প্রথম পরিচয় অন্ধকারের সঙ্গেই—মাতৃ-জঠরে। তাই নয় কি? সেই সহজাত বা আদি পরিচিত রিপুকে না জানলে কী করে তার বিপরীতকে জানব?

মনোতোষ আলো জ্বালল না। বলল, এই তো বেশ! কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ চেতনায় একটি সাড়া জাগছে, আমরা আছি—আছি দু-মনের কাছে-কাছেই। কত গভীর করে বুঝতে পারছি আমাদের প্রশ্বাসেরও একটি স্পন্দন আছে, আছে একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাষাও!—মনেতোষ থামল একটু। তারপর আবার বলল, আচ্ছা দেবাশিস, বর্তমান সমাজের সঙ্গে পুরোনো সমাজের একটি বিরাট পার্থক্য তুমি কি বুঝতে পারো? না কি তোমার মনে হয় আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে?

আমি যেন চমকে উঠলাম। এর জন্যে তো প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তো দেখতে চাইনি, আমার সমাজের আমার পৃথিবীর কোথাও পচন ধরেছে! কিন্ত অতীতের দর্শনের ছাত্র মনোতোষ তার দুটিমাত্র চোখের তীকষ্নতায় সমস্ত বিশ্বকে দেখতে চায়। ভাবতে চায় সমাজের কথা। একটু কেশে বললাম, আমি ভাবিনি, মনোতোষ।

ও বলল, ভাবা উচিত ছিল দেবাশিস। বিশেষ করে তুমি যখন গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। কিন্তু আমি ভেবেছি। আমি দেখেছি, আমরা অনেক নীচে নেমে গেছি। আমাদের চারপাশ অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচারে ভরে আছে। কিন্তু সেই অতীতের কথা ভাবো তো! দেখবে সেদিন একটি প্রকৃত স্নিগ্ধতা ছিল যা আজকে নেই। তাই আজ প্রতি তিন থেকে পাঁচটি লোকের পেছনে একটি করে পুলিশের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কিন্তু কে দমন করবে এই অন্যায়কে? আসলে যে রক্ষক সে-ই তো ভক্ষক! হয়তো তুমি-আমিও কোনওদিন কোনও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম বা লিপ্ত হতে পারি। তাই নয় কি?

সে কী! আমি শান্তি রক্ষক... আমি...আমিও কি...? ধমক দিয়ে বললাম, থামো তুমি, মনোতোষ। তোমার মন্তব্য অসহ্য লাগছে আমার।

মনোতোষের হাসির শব্দ শুনলাম। শহরতলির থানায় আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে বসে মনোতোষ বলছে, হিউম্যান মাইন্ড। আমরা কেউই অ্যাবনর্মাল নই। মনের গতি যে কখন কোনদিকে যায় তা কি আমরা কেউ বলতে পারি?

বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার কী হল, এ প্রশ্নের উত্তর আছে ছোট্ট একটি শব্দে! না। কিন্তু আমি তা বলব না। আমার আজ কোনও কিছুই ভালো লাগছে না।

মনে হল মনোতোষ যেন এবার উঠল। হ্যাঁ, আমাকে জিগ্যেস করছে আলো জ্বালবে কি না? আমি কি বলব, না? না কি জিগ্যেস করব, আলোর কি প্রয়োজন আছে?

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। বাইরে পুলিশ-ভ্যান থামবার শব্দ হল। অশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের অন্ধকারে এতক্ষণ ওর আগমন-বার্তা পাইনি। শেষবার একটি ভয়ঙ্কর শব্দ করে থামল। নড়েচড়ে বসলাম। ভাবলাম উঠব কি না? কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ডাক এল ভ্যান থেকে মুখার্জি, তাড়াতাড়ি আসুন। একটি নতুন জিনিস অপেক্ষা করে আছে।—কথা শেষ করেই হো-হো করে হেসে উঠলেন এই থানার ও. সি. অটলবিহারী তালুকদার।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মনোতোষ মুহূর্তে জ্বালল আলোটি। বলল, চলো, দেখা যাক।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিঃ তালুকদার ওয়াটারপ্রুফ কোটটি খুলছেন। দুটি পুরুষ্টু ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরেছেন একটি জ্বলন্ত বর্মা চুরুটকে। তার অপরিচিত গন্ধে জায়গাটি ভরে গিয়েছে যেন। আমাকে দেখেই চুরুট চেপে ধরেই বলতে লাগলেন, খুন নয়, জখম নয়, অ্যাঁ! একটি জলজ্যান্ত...। আর কিছুক্ষণ এই বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থাকলেই মারা যেত। এর চেয়ে খুন করাও তো ভালো। সমাজ যে কোথায় চলেছে, কে জানে? —শেষের দিকে মিঃ তালুকদারের স্বর যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে এল। তারপর হাঁক দিয়ে বললেন, বের করে নিয়ে এসো, হরিধন!

দুরন্ত বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চল ভ্যান থেকে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এল হরিধন। বুকের কাছে দু-হাতে শক্ত করে ধরা একটি কাঁথার পুঁটলি। মিঃ তালুকদার চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আমার কপালটি কুঁচকে উঠল। বললাম, কী এ?

বারান্দার খালি টেবিলটির ওপরে আস্তে-আস্তে নামাল হরিধন পুঁটলিটি। তারপর কাঁথার আবরণ কিছুটা অপসারণ করতেই চমকে উঠলাম। মুখ থেকে একটি দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল আমার। তালুকদার একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, পশুসম নরশিশু। যারা আসে, কিন্তু কোনও পরিচয়ের দাবি করতে পারে না, এও তাদেরই একজন। অত ঠান্ডায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মনোতোষ এগিয়ে গেল। বলল, মনে হচ্ছে, মাত্র কয়েকঘণ্টা হল জন্মেছে। তাই নয় কি, মিঃ তালুকদার?

তালুকদার আস্তে বললেন, হ্যাঁ! যাচ্ছিলাম উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের কাছ থেকে। তখন মাত্র দুটো। পকেট হাতড়ে সিগারেট না পেয়ে গাড়ি থামিয়ে সামনের একটি ঝাঁপ খোলা বিড়ির দোকানের কাছে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দূর থেকে ডাক শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। দেখলাম ছাতা মাথায় একটি লোক এগিয়ে আসছে ভ্যানের দিকে। মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাপার কী?

কিন্তু উত্তর পাওয়ার আগেই লোকটি কাছে এসে জানালেন যে, তিনি ওই স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। বিপদে পড়েছেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কে একজন এসে টিকিট কাটবার অছিলায় একটি রেশনের থলি রেখে গেছে কাউন্টারের সামনে। বৃষ্টির জন্যে কেউ আর আসছে না দেখে ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে থলেটা দেখতে পেয়ে একটু ফাঁক করে দেখেই তো অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমার দেখা পেয়ে যেন একটু শান্তি পেলেন ভদ্রলোক। বললেন, ভাবছিলাম থানায় ফোন করব। কিন্ত আপনাকে যখন পেয়েই গেলাম তখন আর...।

তার পরের বৃত্তান্ত এমন কিছুই নয়। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর নিয়ে আসা। হ্যাঁ, ভদ্রলোক বলেছেন যে, যে-লোকটি থলেটি রেখে গেছে তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন তিনি। কোনওদিন যদি দেখা পান তবে জানাবেন।

তালুকদার থামলেন। আমি বললাম, বাঁচবে তো?

তালুকদার হাসলেন, বললেন, ওরা মরে না, লাঞ্ছনা ভোগ করে। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন, বাঁচবে।—তারপর একটু থেমে বললেন, হয়তো আপনারা অন্য কিছু ভাবছেন। হ্যাঁ, বলতে পারেন, এ আর এমন কী! কথাটি খুবই সত্যি। কিন্তু সেটা ইওরোপ-আমেরিকার জন্যে, কারণ ওখানে এসব হামেশাই ঘটছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এ কি ব্যভিচার নয়? যতদিন এই অন্যায় সমূলে বিনষ্ট না হবে ততদিন সমাজ সুস্থ হবে না, মুখার্জি। আমাদের আর অবহেলা করলে চলবে না। এর একটি জোর তদন্ত করতে হবে। আমাদের বার করতেই হবে কারা এই হতভাগ্য শিশুটির মা-বাবা? হ্যাঁ, এ ভার আপনাকেই নিতে হবে। আপনি ঠিক পারবেন।

আমি কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু মনোতোষ বাধা দিল। চেঁচিয়ে বলল, কী সুন্দর! এমন শিশুকেও কেউ ফ্যালে নাকি?

আমি এগিয়ে গেলাম। দু-চোখের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করলাম শিশুটির মুখে। চোখ বুজে পড়ে আছে। গলার কাছের একটি নালি কাঁপছে। কী আশ্চর্য গঠন। নবজাত শিশুর এমন সুন্দর গঠন এর আগে কি আমার চোখে পড়েছে কোনওদিন? মাথা ভরতি কালো চুল বৃষ্টিতে ভিজে লেপটে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য...।

মনোতোষ এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে বলল, কী আশ্চর্য! একটি কথা না বলে পারছি না, দেবাশিস। মনে হয় এ যেন তোমারই সন্তান।

চমকে উঠলাম আমি। মাথার ভেতরটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল। চোখের দৃষ্টি কি ক্ষীণ হয়ে যাবে নাকি? তবুও তাকালাম মনোতোষের দিকে। ও হাসছে। বলছে, অবিকল তোমার মুখ। কিন্তু তুমি তো বিয়ে করোনি।

হ্যাঁ, মনোতোষ ঠিক বলেছে, আমি বিয়ে করিনি। এ আমার সন্তান নয়। একরকম দেখতে কি দুজন বিরল এই পৃথিবীতে? প্রশ্ন করলাম নিজেকে।

তালুকদার বললেন, আজকে আমাদের এখানেই থাক। কাল শিশু-হাসপাতালে দেওয়া যাবে।

উঃ, বড় অন্ধকার। চাপ-চাপ অন্ধকার সমস্ত বিশ্বজগৎকে চেপে ধরেছে। এর মধ্যে কোথাও একটু আলোর উৎস কি নেই! মাথাটা ধরে এল। কেমন অস্বস্তি লাগছে। এখনই শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু ওই যে শিশুটি—

আমারই মতো যাকে দেখতে, আমারই সন্তান বলে ভুল হয় যাকে, সে কি আমাকে চেনে? না-না। মিথ্যে, এ মিথ্যে। ওর পরিচয় আমি জানি না।

ও-ও আমাকে জানে না। হায় শিশু! নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে জন্মেছে, অন্ধকারেই ওর ভবিষ্যৎ লুপ্ত হয়ে গেছে। যে প্রলয়ের সঙ্গে এল, হয়তো সমস্ত জীবন প্রলয়ের সঙ্গেই লড়বে। শ্রান্ত হবে। শেষে একদিন হয়তো...হয়তো...।

আমি কীসব ভাবছি? ও কে? আর আমিই বা কে? একটু শক্ত হলাম। হরিধন ভেতরে নিয়ে গেল ওকে। সেই দিকে তাকিয়ে থেকেই মনোতোষকে বললাম, মাথাটা ধরেছে। বাড়ি যাব না। শুয়ে পড়লাম।

মনোতোষ হাসল। বলল, এত দুর্বল?

কোনও কথা বললাম না। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম জানলার ধারের খাটে। আমি জানি মনোতোষও আসবে। বাড়ি যেতে ও-ও পারবে না। তাই আসবে। এসে হয়তো সমাজের ব্যভিচারের কথা বলবে। ধিক্কার দেবে শিশুটিকে। কিন্তু ও কী করেছে, যার জন্যে মনোতোষ ওকে ধিকৃত করবে? ওর কী দোষ?

আমি জানি না, অবিবাহিত নর-নারীরা তাদের সাময়িক ভুল বা আবেগে—আনন্দের মধ্যে যে-শিশুর জন্ম দেয় তারা, তাকে কেন গ্রহণ করতে পারে না। তাকে কেন পরিচিত করতে বাধে? সাতপাকের বন্ধনের পরে যেভাবে নরশিশুর জন্ম হয়, সেই ভাবেই তো এরাও জন্মায়। তবে এদের বেলায় কেন এই বিধান? আজ অনেকদিন পরে পম্পার কথা মনে পড়ে। ও একদিন বলেছিল, শিশুরা কোনও দোষ করে না। কিন্তু এ শিশু কী দোষ করেছিল? হ্যাঁ, দোষ—দোষ, কেন ও জন্মেছে?

বেলা বারোটার সময় শিশু হাসপাতালের নার্স এলেন একজন। শিশুটিকে দু-হাতে তুলে নিয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন কতটা ওজন ওর। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চমকেই উঠলেন। ভয় পেলেন নাকি? না, ভয় নয়, বিস্ময়।

একবার শিশুটির দিকে তাকিয়ে আমাকে আবার দেখলেন। বিব্রত বোধ করলাম আমি। একটু কেশে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করলাম। নার্স ইতস্তত করে বললেন, দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সন্তানই বটে। তবে অবৈধ। না হলে ফেলে দেবে কেন?

তালুকদার শুধু একটি শব্দই করলেন, হুঁ।—তারপর আবার বললেন, তদন্ত আমরা চালাব এবং এর বাবা-মাকে খুঁজে বের করবই। ততদিন আপনাদের কাছেই থাকবে। পরে তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেব। বুঝলেন?

নার্স ঘাড় নাড়লেন। মনোতোষ ইংরেজি দৈনিকটা দেখতে-দেখতে বলল, দেবাশিস, তবে আজ থেকেই ফিল্ডে নামা যাক, কী বলো?

আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, আমাকে মাপ করো, ভাই। তুমি নিজেই কাজ শুরু করো।

তালুকদার ঘাড় নাড়লেন। বললেন, তা কি হয়, মুখার্জি? দুজনকেই চেষ্টা করতে হবে।

ও যে আপনাদের সোশ্যাল ডিউটি।

নার্স চলে গেছেন।

ওঁরা আমাকে ছাড়বেন না। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারে এত আয়োজন...অর্থাৎ আমাকে কেন? সে-কথা কেউ শুনবে না। কেননা, আমিই যে লোকের কথা একের পর এক শুনে যাই। শোনাই তো আমার অভ্যাস, বলা নয়। তবুও...আমার ভালো লাগছে না। আপাতত কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নেব আমি।

ওপর থেকে আদেশ এসেছে—আই. জি.-র আদেশ। আমাকে তাঁরা ছুটি দেবেন না। উপরন্তু আমাকেই কাজ করতে হবে এ-ঘটনার। অটলবাবু বলেছেন এটা আমাদের সোশ্যাল ডিউটি। হ্যাঁ, ওকে ওর মা-বাবার হাতে তুলে দিতেই হবে। যেমন করেই হোক ওর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে লীন হতে দেব না। কিন্তু আমার এত অসুস্থ বোধ হচ্ছে কেন? কে জানে! হয়তো, হ্যাঁ, ওকে দেখামাত্রই আমি শান্তি পাই না। কেন? ও কে? কীসের জন্যে আমার সমস্ত চেতনাকে ও আচ্ছন্ন করে আছে?

স্টেশন মাস্টারকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন মনে করে উপস্থিত হলাম তাঁর ওখানে। কী আশ্চর্য! লোকটি আমাকে বললেন, স্যার, সমাজের কথা আর বলবেন না। যত সব অসভ্যের দল এইসব কাণ্ড করে মাঝখানে নিরীহ আমাদের জড়িয়ে রেখে যায়। তা ছেলেটি সুস্থ আছে তো? দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোকেরই সন্তান!

অবাক না হয়ে পারলাম না। এই ভদ্রলোকও শিশুটির কুশল কামনা করছেন। তবে কি সমাজে-সভ্যতায় ওদেরও বাঁচবার অধিকার আছে? বললাম, হ্যাঁ, ভালোই আছে। আচ্ছা, যে-লোকটি থলেটি রেখে গেছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোনও চিহ্ন কি আপনার মনে আছে?

ভদ্রলোক একটু ভাবলেন। তারপর সোৎসাহে বললেন, হ্যাঁ, আছে বটে। তার হাতের কড়ে আঙুলটার অর্ধেক নেই। তা ছাড়া নাকের কাছটায়, অর্থাৎ, ঠোঁটে শ্বেতীর দাগ রয়েছে। দেখে মনে হয়েছে যেন নিচু-স্তরের...অর্থাৎ চাকর-টাকর হবে।

আগে দেখেছেন?

না। তবে...হ্যাঁ, আমি লক্ষ রাখব। এলেই আপনাকে খবর দেব।

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ কাউন্টারের কাছে প্রায়-পরিচিত মেয়েলি কণ্ঠের আলোড়নে তাকালাম সেদিকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যেন চমকে উঠলাম। অনেকদিন পরে...। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। যেন বিরাট একটা উন্মেষের সঙ্গেই বললাম একী, পম্পা, তুমি?

চমকে তাকাল ও। তারপর মুখের দিকে চেয়ে হাসল একটু। বলল, হ্যাঁ, আমিই।

অনেকদিন পরে দেখা, তাই না?

হ্যাঁ, আট মাস পরে।

এতদিন কোথায় ছিলে?

বারাকপুর।—হেসে বলল সে।

কেন?

ওখানেই বাসা পালটেছি। এবং এখন ওখানেই যাব। তুমি ভালো আছ তো?—করুণ চোখে তাকাল পম্পা।

উত্তর দিলাম না। বললাম, এতদিন আমাকে তোমার মনে পড়েনি?

তোমার পড়েছিল কি?—তীক্ষ্ন দৃষ্টির সঙ্গে আমার দিকে তাকাল পম্পা।

এর উত্তর কী দেব আমি! বলব, হ্যাঁ। কিন্তু মনে পড়লেও ওর খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছি কি? বললাম না সে-কথা। শুধু বললাম, এখন কী করছ?

কী আর করব? আমাদের মতো হতভাগ্য মেয়েরা তোমাদের কাছে, তোমাদের সমাজে, কী করবার দাবি নিয়ে আসতে পারে? বলো?

পম্পা যেন দুরন্ত হয়ে উঠছে। বললাম, মানে?

মানে?—আস্তে-আস্তে বলল, তোমাকে কোনওদিন ভুলব না—সেই তোমারই কওয়া কথাটা কি ভুলে গেছ, দেবাশিস?

এ কী? পম্পা কি আমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই আজ এখানে এসেছে? হারানো অতীতকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যেই এসেছে ও! রাগ হল। ভাবলাম ধমক দিই একটা। কিন্তু পারলাম না। একদা যার কাছে আমার প্রতিটি দুষ্টুমির বদলে ধমক খেয়েছি আজ তাকেই সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আমার নেই। আস্তে-আস্তে একটু আর্দ্র কণ্ঠেই বললাম, সে-কথা থাক, পম্পা। কিন্তু তুমি...তোমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে! আশ্চর্য!

গৌরী শিবের আরাধনা করে কৃপা পেয়েছিলেন, আমিও শিবের আরাধনা করেছিলাম। তাই আমারও এই পরিণতি। হায়, ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। তা ছাড়া তুমি পুলিশের লোক, আজ যেন তোমাকে আমার ভয়

করছে। তুমি আর সেই—আমার সেই দেবাশিস নও। —থামল ও। তারপর হাসল। বলল, চলি। যদি কোনওদিন দেখা হয়, তবে এ-কথাগুলোর উত্তর দিয়ো। আর বোলো, কী অপরাধ আমি করেছিলাম।

তারপর দু-মাস কেটে গেছে। রহস্যের কোনওই সন্ধান করতে পারিনি। পারবও না হয়তো। আমি তো হাল ছেড়েই বসে আছি। কিন্তু মনোতোষ নাছোড়। অত সহজে ছাড়বে না সে। বলল, তুমি না পারো, আমি করব, দেবাশিস। ছেলেটাকে যথাস্থানে পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু যথাস্থান কোথায়? কারওরই তো খোঁজ পাইনি আমরা!

ঠিক এমনই দিনে ফোনে ডাকলেন স্টেশন মাস্টার। বললেন, ঠিক সেইরকমই একটি লোক স্টেশনে আছে। এইমাত্র টিকিট কিনল। তাড়াতাড়ি আসুন।

মনোতোষের মাথাটা আনন্দে দুলে উঠল। বলল, নৌকো এবার তীরে ভিড়বে, দেবাশিস।

হ্যাঁ, সেই লোকটি বটে। দুটো ধমক খেয়েই সত্যি কথা ফাঁস করেছে। কাজ করে এক বাবুর বাড়ি। তার-ই কলেজে পড়া অবিবাহিতা মেয়ের গর্ভে জন্মেছে শিশুটি। লোকলজ্জার ভয়ে, এবং যে এই শিশুটির পিতা তার কোনও খোঁজ না পাওয়ায়, বাধ্য হয়ে ফেলে দিতে হয়েছে।

লোকটা বলল, পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে আমাকে। বলেছিল আরও দেবে। কেউ জানে না, হুজুর। কিন্তু সত্য কি চাপা আছে?

যে-বাড়িতে তুমি কাজ করো, সেখানে নিয়ে যেতে হবে, নইলে তো বোঝোই।—শাসালেন অটলবাবু।

নিয়ে যাব, হুজুর, দেখিয়েও দেব তার মা-কে।—লোকটা প্রায় কেঁদেই ফেলল।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে এসেছিলে কেন আজ?

আত্মীয়-বাড়ি হুজুর।—বলল লোকটা।

অটলবাবুর সঙ্গে মনোতোষ চলে গেল শিশুটির মায়ের খোঁজে। শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি যাইনি। ইচ্ছে করেই যাইনি আমি। মনে হয়েছে, লজ্জার ভয়ে যেখানে মা তার সন্তানকে বিসর্জন দিতে পারে, সেখানে আমি আর নাই-বা গেলাম। তাতে কি কোনও ক্ষতি আছে? উত্তর কে দেবে? আমার সমাজ? না, সে বোবা হয়ে গেছে। উত্তর দেবে মানুষ, উত্তর দেবে তাদেরই জৈবক্ষুধা।

দু-ঘণ্টা পরে ফিরল মনোতোষরা। আমি একান্তে নির্লিপ্ত হয়েই বসে ছিলাম। ওদের ডাকে হুঁশ হল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রাহতের মতো চমকে উঠলাম। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম, এ কী, পম্পা, তুমি?

একটু হাসল ও। বলল, ক্ষতি কী? হ্যাঁ আমিই।

আপনার স্বামী?—অটলবাবু প্রশ্ন করলেন।

মারা গেছে।

কবে?

যেদিন ও পেটে এল, সেদিনই।

আপনি বিধবা?

না, বিয়ে হয়নি।

আমার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে কি? না, আমাকে কথা বলতেই হবে! যেমন করে হোক। চেঁচিয়ে বললাম, মনোতোষ, ও যে আমারই সন্তান...।

পম্পা কাঁদল এবার। ভেঙে পড়ে বলল, দেবাশিস, তুমি আমাকে ভোলোনি? ওকে স্বীকৃতি দিয়েছ, এবার সমাজে বাঁচতে দাও।

পম্পাকে আমি ভালোবাসতাম—আজও ভালোবাসি। কিন্তু বিয়ে করতে পারিনি। আজ করব। মনোতোষের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, তুমি বোসো, পম্পা। সব অপরাধ যে আমারই। বিচার হবে আমার।

না-না...।—কাঁদল পম্পা, তোমার যশ, তোমার প্রতিষ্ঠা...সব...সব যে নষ্ট হয়ে যাবে, দেবাশিস।

যাক,—দৃঢ় কণ্ঠে বললাম আমি। হতভম্ব অটলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে অ্যারেস্ট করুন, অটলবাবু।

মনোতোষ এতক্ষণে যেন প্রাণ ফিরে পেল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কুসুমে এত বিষাক্ত কীট থাকে, জানতাম না, দেবাশিস।—আর কিছু বলতে পারে না সে।

আমার ইচ্ছে হল, হাসি। হো-হো করে হাসি। কিন্তু পারলাম না। মাথাটা বড্ড ধরেছে। আর মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত চাপ-চাপ অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না। আমার সমস্ত চেতনা একটি সূর্যের ধ্যানে অন্ধকারে লীন হয়ে গেছে।

মাসিক গোয়েন্দা

মে-জুন, ১৯৬৪



ঝকমারির মাশুল

মনোরঞ্জন দে

আমার নিরুপদ্রব শান্ত জীবনে ছন্দপতন ঘটল। পাঁচ-পাঁচটা বছর একনিষ্ঠ সৎ কর্মচারী হিসেবে সুনাম অর্জন করার পর হঠাৎ কেন যে এমন দুর্বুদ্ধি ঘাড়ে চেপে বসল, তা আজও বুঝতে পারি না। মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য মাঝে-মাঝে ভাবি, ভবিতব্যকে বোধহয় স্বয়ং বিধাতাও খণ্ডন করতে পারে না—আমিও পারিনি। আর পারিনি বলেই আমার আজ এই দুর্দশা।

কত লোককে দেখেছি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। টাকা যেন তাদের কাছে মুড়ি-মুড়কির মতো। আমার চোখের সামনে কত লোক রাতারাতি ভুঁইফোঁড় হয়ে উঠেছে। দেখেছি, আর আমার চোখে জ্বালা ধরে গেছে। হতাশ হয়ে ভেবেছি, ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়ার মতো এভাবেই কি জীবনটা ধুঁকতে-ধুঁকতে কাটিয়ে দিতে হবে আমাকে? ভাগ্যের কাছে এভাবেই কি নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকব? না, তা চলবে না। কিছু একটা করতেই হবে আমাকে। জীবনটাকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে তুলতে হবে। এ জন্যে যত বড় ঝক্কিই আসুক না কেন, তার মোকাবিলা করতে হবে। হায়, তখন যদি কেউ আমাকে সাবধান করে দিত! কেউ যদি বলে দিত—এ-পথে যেয়ো না। এ-পথে শান্তি নেই, সুখ নেই। এ-পথে গেলে তোমার ভাঙা কপাল আরও ভাঙবে!

এখন বুঝতে পারি, চাকরির শেষ ছ'টি মাস যে-সমস্ত পরিকল্পনা করেছি, তাতে সৌভাগ্যের ভিত স্থাপন করিনি, বরং কবরই খুঁড়েছি। ব্যাঙ্কে চাকরি করেছি, আর সুযোগ খুঁজেছি মোটা টাকা বেমালুম লোপাট করে দেওয়ার। হাজতঘরের কথা কি ভাবিনি? তাও ভেবেছি। কিন্তু বামাল গ্রেপ্তারের কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি। নেহাৎ যদি ধরাই পড়ি, না-হয় জেল খাটব। আর ধরা যে পড়বই তাতেও কোনও সন্দেহ ছিল না। সুবোধ কয়েদি হিসেবে জেলারের মন জয় করবার কথাও চিন্তা করে রেখেছিলাম, যাতে করে হাজতবাসের মেয়াদ দু-তিন বছর মাপ হয়ে যায়। শাস্তি ভোগ শেষ হলে যখন বেরিয়ে আসব, তখন চুরি করা টাকা একান্তই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে—তাতে কারও কোনও ভাগ থাকবে না। বাকি জীবনটা পরের গোলামি না করেও প্রাচুর্যের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারব।

আপনারা ভাবছেন, সবটাই বুঝি পাগলের প্রলাপ—পরিকল্পনাটা কার্যে রূপায়িত করা বুঝি একেবারেই অসম্ভব! আমি কিন্তু মোটেই তা ভাবিনি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে কীভাবে উঠে-পড়ে লেগেছিলাম, সে-

কথাই এবার শুনুন। অবশ্য পুরো ছ'টি মাস লেগেছিল তিল-তিল করে জবরদস্ত একটা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে।

বিজলি ছিল আমারই সহকর্মিণী—সহধর্মিণীও বটে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বলতে-বলতে কখন যেন সে আমার ওপর বেশ কিছুটা অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিদানে তার ওপর অনুরাগ দেখানোর মতো মনোভাব আমার তখন ছিল না। আমার মাথায় তখন কামিনী অপেক্ষাও কাঞ্চনের চিন্তা চরকিবাজির মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরছিল। একসঙ্গে গঙ্গার ধারে বসে থাকবার সময় কত কথাই না কলকলিয়ে বলে যেত সে। কিছু আমার কানে ঢুকত, কিছু ঢুকত না। সে প্রায়ই বলত, টাকা নাকি হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাকে ধরতে জানা চাই। অর্থাৎ, আমার রোজগারের টাকা আমাদের বিবাহিত জীবন-যাপনের পক্ষে যৎসামান্য বলেই মনে হত তার। তার বাড়ি ছিল হলদিয়ায়। সেখানে নাকি ছোটখাট একটা শহরের পত্তন হতে চলেছে। সেখানে নাকি বিরাট একটা পরিবর্তনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এসব কথা প্রায়ই শুনতাম তার মুখে।

তাকে আমার প্রয়োজন ছিল। তাই ভাব জমিয়ে রাখলাম বাধ্য হয়ে। রূপ তার আহামরি কিছু না হলেও একটি রূপবান পুরুষকে কাত করবার পক্ষে যথেষ্ট। অন্যসময় হলে হয়তো তার ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কুন্তল এবং ডাগর-ডাগর চোখ দুটি দেখেই মজে যেতাম। হয়তো বা কোনও দুর্বল মুহূর্তে বলেও বসতাম, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—।'

বিজলি যখন এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে হলদিয়ায় চলে গেল, তখনই আমার বহু-প্রতীক্ষিত পরিকল্পনাটি ষোলোকলায় পূর্ণ হল। যাওয়ার দিন সন্ধেবেলা বহুক্ষণ গঙ্গার ধারে আমার গা ঘেঁষে বসেছিল সে।

বলেছিল, 'তোমার মুরোদ কত এবার টের পাওয়া যাবে। বাবার কাছে গিয়ে বীরপুরুষের মতো বলতে পারবে যে, আপনার মেয়েটিকে আমার চাই!'

আমি বলেছিলাম, 'আমার কী দরকার, তুমিই তো বলতে পারো তোমার বাবাকে।'

'তুমি আস্ত একটি বুদ্ধির ঢেঁকি। মুখ ফুটে বলতে আমার বুঝি লজ্জা করবে না?'

'আচ্ছা, আমিই না হয় বলব।'

তারপর বহুক্ষণ আমরা নিতল স্তব্ধতার মধ্যে চুপচাপ বসেছিলাম। গঙ্গার হাওয়া উত্তাল হয়ে উঠেছিল। নবযৌবনা নারীর বিলোল কটাক্ষ ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্ধ করছিল আমাকে। কিন্তু আমার মন তখন সেখানে ছিল না—ভবিষ্যতের ভাবনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

বিজলি শুক্রবার হলদিয়ায় চলে গেল। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মন থেকে তার স্মৃতি সাময়িকভাবে মুছে ফেলে দিলাম। সমস্ত মনটাকে কেন্দ্রীভূত করলাম পরের শুক্রবারের দিকে। মতলব হাসিল করবার চরম দিন সেটি।

জীবন এগিয়ে চলল। ধীর ছন্দে এসে হাজির হল সোমবার। ব্যাঙ্কে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যা ছিল তুলে নিলাম। সুদ নিয়ে সর্বসাকুল্যে সাতশো টাকার মতো হবে।

মঙ্গলবার বিজলির পত্র পেলাম। তার বাবা নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। শনিবার আমাকে অবশ্য হলদিয়ায় হাজির হতে অনুরোধ করা হল। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পালটা জবাব দিলাম আমি।

বৃহস্পতিবার রাত্রে অনেকগুলি জিনিস কিনলাম আমি। যেমন—একটি মাটি সরানোর বেলচা, কিছুটা ভারী ফয়েল পেপার, জলের ফ্লাস্ক, বড় টর্চলাইট, মাঝারি আকারের একটা চামড়ার সুটকেস, ক্যাম্বিসের থলে ইত্যাদি। হলদে রঙের কিছুটা চটও জোগাড় করে রাখলাম। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসগুলি ক্যাম্বিসের থলেতে ভরে নিলাম। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে দিনসাতেকের জন্যে একটা মোটরগাড়ি ভাড়া করেছিলাম আগেই। তারই পেছন দিকে মালপত্রগুলো বোঝাই করে নিলাম।

শুক্রবার গাড়িসমেত হাজির হলাম নিজের অফিসে। খালি সুটকেসটাকে বয়ে নিয়ে গেলাম নিজের কাউন্টারে। পাশের কাউন্টারের সহকর্মী বলে উঠল, 'খুব তোড়জোড় দেখছি যে—যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

আচমকা প্রশ্নে কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম। সামলে নিয়েই উত্তর দিলাম, 'আর বলেন কেন! হলদিয়া থেকে বিজলির চিঠি এসেছে। আমার কাল নাগাদ সেখানে পৌঁছনো চাই-ই চাই।'

'বেশ তো, যান না।'

গিয়েছিলাম আমি ঠিকই, কিন্তু হলদিয়ায় নয়। কীভাবে গিয়েছিলাম, সে-কথা মনে হলে এখন সবই যেন স্বপ্নের মতো লাগে। আমাদের ব্যাঙ্কে একই সারিতে পরপর যে-দশটি কাউন্টার ছিল তাদের সবার শেষেরটি ছিল আমার। কাউন্টারের দেওয়ালে ছিল একটি কুলুঙ্গি, আর মেঝেতে ছিল একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট। তিনটে বাজার সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টারও বন্ধ হল, আর ঝাড়ুদারও এসে হাজির আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য। আমার অলক্ষিতে আমার পেছনে তার উপস্থিতি আমি আশাই করতে পারিনি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চমকে উঠলাম।

দাঁত বের করে সে হেসে ফেলল, 'হে-হে, আজ আমি একটু আগে বেরিয়ে যেতে চাই কিনা, তাই এখনই ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছি।'

বাস্কেটের পাশেই চামড়ার খালি সুটকেসটা রাখা ছিল। সেটিকে ধরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল, সে-ও অপ্রস্তুত হল দারুণ। আকারের তুলনায় সুটকেসটার ওজন ছিল খুব কম। অথচ ওটাকে ভারী মনে করে প্রথমেই অত্যধিক বলপ্রয়োগ করার ফল হল এই যে, হঠাৎ পেছন দিকে ছিটকে পড়বার উপক্রম হল তার।

আমি অনুযোগের সুরে বললাম, 'কত আর ওজন হবে বলো, আছে তো একটা পাজামা, আর একটা টুথব্রাশ।'

সে খানিকটা বোকার মতো হেসে নিজের কাজ সেরে চলে গেল। আমি স্বস্তির শ্বাস নিলাম।

পাঁচটা বাজবার আগেই ক্যাশবাক্স জমা দিয়ে বেরিয়ে গেল সবাই। রইলাম শুধু আমি। আমার ক্যাশবাক্স ইতিমধ্যে খালি হয়ে গিয়েছিল—বাক্সের সমস্ত টাকা সযত্নে সুটকেসে ভরে নিয়েছিলাম। খালি ক্যাশবাক্স নিয়ে ভল্টের দিকে এগোনোর সময় বন্দুকধারী দারোয়ানটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টি কিছুটা নরম করবার জন্যে বললাম, 'কী হে হীরালাল, কেমন আছ?'

'তবিয়ত আচ্ছা নেহি, হুজুর।'

'দাঁড়াও, ক্যাশবাক্সটা রেখে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

ফিরে এসে সুটকেসটা তুলতেই বোঝা গেল, বড্ড বেশি ভারী হয়ে গেছে সেটা।

দারোয়ান পুরোনো কথার খেই ধরে শুরু করল, 'আপ তো হলদিয়ামে যা-হি রহে হেঁ, মেরে ভাইকো জরুর মেরা সেলাম ভেজ দিজিয়েগা। আউর কহিয়েগা, আগলে মাহিনেমে ম্যায় রুপেয়া ভেজুংগা।'

'ঠিক আছে, বলব।'

'আউর কহিয়েগা, দেশোয়ালী কি চিঠ্‌ঠি আয়ি হ্যায়—জায়দাদ কা চিন্তা মত করনা।'

'আচ্ছা।'

'এ ভি কহিয়েগা, চিঠ্‌ঠি মে লিখ্যা হ্যায় কে মেরা এক লড়কি হুয়ি হ্যায়।'

'আচ্ছা বাবা, বলব।'

আর অপেক্ষা না করে সুটকেস নিয়ে সদর দরজার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। দারোয়ানজি আবার মনে করিয়ে দিল, 'ভুলিয়েগা মাত।'

'না, ভুলব না।' উত্তর দিলাম।

আমার মন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। ব্যাঙ্কের মোটা টাকা ডাকাতি করে নিয়ে পালাচ্ছি আমি—এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ামাত্র পা দুটো দৌড়োনোর জন্যে উসখুস করতে লাগল। অতি কষ্টে দৌড়নোর ইচ্ছা থেকে নিজেকে সামলে নিলাম।

সুটকেসটা মোটরের পেছনে রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করছিল। গাড়ির বেগও বেড়েই চলেছিল। কিন্তু মনের সঙ্গে মোটেই এঁটে উঠতে পারছিল না সে—মন যেন ছুটতে চাইছিল জেট প্লেনের গতিতে।

পথে নানারকম বাধা—লাল আলোর শাসানি, পুলিশের হাত দেখানো, পথচারীদের ভিড়। তবুও বেহালা পৌঁছতে খুব বেশি বিলম্ব হল না। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তখন ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে আমার গাড়ি ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলেছে। বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখলাম আমাকে কেউ অনুসরণ করছে কি না। থামলাম একেবারে ফলতা গিয়ে। নদীর পাড়ে নিরিবিলি জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালাম।

দ্রুত হাতে সুটকেস থেকে টাকাগুলো বের করে নিলাম। পোশাক-আশাক সব ভরে নিলাম সুটকেসে। নোটের তাড়াগুলো গুনে-গুনে ক্যাম্বিসের থলেতে পুরে নিলাম। পুরো বিশ লাখ টাকা। কিছু পরিষ্কার পাথরের কুচিও ভরতে হল, যাতে করে বান্ডিলটা প্রায় গোলাকার দেখতে হয়। ফয়েল পেপার দিয়ে নোটের পুঁটলিটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিলাম। ঝড়-বাদল কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এই ব্যবস্থা। সবার শেষে বাঁধা হল চট এবং দড়ির সাহায্যে। তারপর মাটি দিয়ে এমনভাবে রাঙিয়ে দিলাম, যেন বড় একটা মাটির ঢেলা ছাড়া আরে কিছুই মনে না হয়। গভীর পরিতৃপ্তিতে বান্ডিলটাকে নেড়ে-চেড়ে পরখ করলাম অনেকক্ষণ ধরে।

জায়গাটার নাড়ি-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে। টাকার তোড়াটা কোথায় পোঁতা হবে আগেই ঠিক করা ছিল। এমনকী গর্তও খুঁড়ে রেখেছিলাম কয়েকদিন আগে। জায়গাটার সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম ছিল না। লোকেরা পারতপক্ষে সেখানে যেত না। তবুও নিজে যাচাই না করে জায়গাটার নির্জনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইনি। একনাগাড়ে পনেরো দিন সেখানে আস্তানা গেড়েছিলাম। একটি জনপ্রাণীকেও পথ ভুলে সেখানে যেতে দেখিনি। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গাই তো আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান!

কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ফালি-ফালি করে কেটে আমার টর্চ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এক হাতে বেলচা, অপর হাতে নোটের বান্ডিল।

মানুষ-প্রমাণ গর্তটার মধ্যে বান্ডিলটাকে ছুড়ে দিয়ে বললাম, 'বিদায় বন্ধু! অহল্যার মতো পাথর হয়ে পড়ে থাকো কয়েকবছর। আমিই আবার উদ্ধার করে নিয়ে যাব তোমাকে। আমার সঙ্গে তোমার জীবনও ধন্য হয়ে উঠবে তখন। বিদায়! বিদায়!'

টর্চটাকে জ্বালিয়ে মাটিতে রেখে ত্রস্ত হাতে বেলচা চালাতে লাগলাম। ঝপাঝপ মাটি গিয়ে পড়তে লাগল গর্তের ভেতর। কাজ সাঙ্গ হলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম, কোনও ত্রুটি আছে কি না। না, এখানে যে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল বোঝবার উপায় নেই। দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই।

এখন সম্পূর্ণ নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে আমাকে। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর বিন্দুমাত্র অনাস্থা আমার কোনওকালেই ছিল না। তবু সাবধানের মার নেই। বটগাছটার ওপর ছুরি দিয়ে যে-সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো লিখে রেখেছিলাম, বেশ কয়েকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম তার ওপর। টর্চের জোরালো আলোয় জায়গাটার নকশা মনে গেঁথে নিলাম আরও একবার।

মোটরে ফিরে গিয়ে সুটকেস ছাড়া সন্দেহজনক সব ক'টি জিনিসই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম! মাটির সামান্যতম দাগও জুতো থেকে মুছে দিলাম কাপড় দিয়ে ঘষে-ঘষে। কারণ, আমি জানতাম, মাটির নমুনা দেখেই সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের পক্ষে জায়গার হদিশ পাওয়া সম্ভবপর।

মোমিনপুরে যখন ফিরে গেলাম, তখন রাত দশটা বাজে। ট্রাম-বাসের আনাগোনা কমে এসেছে। পথে-পথে সেই শ্বাসরোধী ভিড় আর নেই। টিউব লাইটের আলোয় কলকাতাকে এত অপূর্ব দেখাচ্ছে যে, আর কখনও এমন রূপ দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হইনি। হয়তো সাফল্যের আনন্দে নেশা জেগেছিল।

ভালো একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। ভেতরে ঢোকার আগে গাড়ির স্পার্ক-প্লাগ আলগা করে দিয়ে গিয়েছিলাম।

রেজিস্ট্রি খাতায় নাম-ধাম লিখে বয়ের হাতে নিজের সুটকেসটা ঝুলিয়ে দিয়ে তার পিছু-পিছু নিজের কেবিনের দিকে চললাম। মোটা বকশিস দেওয়াতে মুহূর্তে বয়ের মধ্যে বেশ সমীহপূর্ণ আচরণ লক্ষ করা গেল।

কিছুক্ষণ পরে নীচে নেমে এসে ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে ফোন করলাম হলদিয়ায়। ফোন ধরল বিজলির বাবা।

বলল, 'আপনি কে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমার নাম বিমান মিত্র—আপনার মেয়ের সহকর্মী।'

'ও, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?'

'কালীঘাট।'

'হলদিয়ায় আসার কথা ছিল, তার কী হল?'

'আর বলেন কেন—মোটরটা বিগড়েছে।'

'আচ্ছা, আমি বিজলিকে ডেকে দিচ্ছি।'

বিজলি ফোন ধরেই গর্জে উঠল, 'নাঃ, তোমার মতো বাউন্ডুলে ছেলে জীবনে দেখিনি। নিশ্চয়ই এখানে আসার কথা বিলকুল ভুলে বসে আছ?'

'না।'

'তবে? আবার কারও সঙ্গে পিরিত হয়েছে নাকি?'

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না।'

'না, করবে না! এদিকে আমরা সবাই তোমার আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি, আর তুমি এতক্ষণে সবে কালীঘাটে। তুমি কথা ঠিক রাখতে পারবে না, আর এ-জন্য আমাকে ভুগতে হবে? এঁদের কাছে এখন মুখ দেখাই কী করে বলো তো?'

'এঁরা আবার কারা?'

'এঁরাই তো তোমাকে হাতকড়ি পরানোর জন্যে বসে আছেন।'

'তার মানে? ইয়ার্কি ভালো লাগে না—যা বলবার পরিষ্কার করে বলো।'

'এই সামান্য কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ না? এঁরা হচ্ছেন আমার আত্মীয়-আত্মীয়া। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা যে পাকা হয়ে গেছে, এঁরা তা জানেন। তোমার ফটো দেখে সবাই পছন্দ করেছেন তোমাকে। প্রাথমিক মনোনয়ন হয়ে গেছে, এবার তুমি এলেই পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা তুমি আসছ কখন?'

'আজ তো আর হচ্ছে না—গাড়ি বিগড়ে বসে আছে। সারাতে পারলে কাল নাগাদ পৌঁছতে পারি। আমি কালীঘাটে বাঙালি হোস্টেলে উঠেছি। তুমি বরং কাল সকালে একবার ফোন কোরো।'

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমেই গেলাম গাড়ির কাছে। স্পার্ক-প্লাগ আবার যথা জায়গায় সংযোগ করে দিলাম। এবার ডিস্ট্রিবিউটারটা খুলে ফেললাম। রোটরের তলা থেকে স্প্রিংটাকে সরিয়ে নিলাম। তারপর ইগনিশান ওয়ারের মধ্য দিয়ে এমনভাবে একটা সাধারণ পিন ঢুকিয়ে দিলাম যাতে পিনের অগ্রভাগ মোটরের সংস্পর্শে আসে। ডিস্ট্রিবিউটার যথাস্থানে লাগিয়ে মনে-মনে বললাম, মোটরের মেকানিকও এবার সহজে বুঝতে পারবে না গোলযোগটা কোথায়।

স্থানীয় মোটর মেরামতের কারখানায় ফোন করতেই একজন মেকানিক এসে হাজির হল। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও গোলযোগটা ধরতে পারল না। অগত্যা ট্রাক পাঠিয়ে গাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া হল কারখানায়। বিকেলবেলা গ্যারেজ থেকে ফোন এল। আমাকে জানানো হল, মোটরটা ঠিক করতে হলে আরও একদিন সময় দিতে হবে। আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম।

বিজলি ফোন করতেই জানালাম, 'গাড়িটার দোষ ধরা যাচ্ছে না। মনে হয়, সোমবারের আগে কিছু হবে না। অগত্যা তোমার ওখানে যাওয়ার কর্মসূচি বানচাল করতে হল। কারণ, সোমবার হলেই তো আবার অফিসে ছুটতে হবে।'

বিজলি সব কথা শুনে কেঁদে ফ্যালে আর কী। ওর জন্যে মনে-মনে বেশ দুঃখ অনুভব করলাম। কিন্তু আমি তখন নিরুপায়। একবার মনে হল, ওকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। ও যাতে ভেঙে না পড়ে সেটা দেখাও আমার কর্তব্য। পরেই ভাবলাম, লাভ কি মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে? আঘাত তো ওকে পেতেই হবে—দু-দিন পরে না হয়ে সেটা না হয় আগেই হল।

ম্যাগাজিন পড়ে আর রেডিয়ো শুনেই রোববারটা কেটে গেল। বিকেলে আমার গাড়ি এসে হাজির। মেকানিক বলল, 'দেখুন দাদা, আপনার গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। কেউ দুষ্টুমি করে অমন করেছে।'

আমি বললাম, 'হয়তো তাই হবে। আমি যখন হোটেলে চা খাচ্ছিলাম, তখন কোনও বদমাশ ছোঁড়া এমন করেছে কি না কে জানে। নিরীহ লোকদের উত্যক্ত করবার শয়তানী বুদ্ধি অহরহই এদের মগজে চক্কর খাচ্ছে। যাক, আপনি যে গলদ ধরতে পেরেছেন, এজন্যে ধন্যবাদ।'

পাওনা মিটিয়ে দিয়ে লোকটাকে বিদায় দিলাম। মুখে কিছু না বললেও সন্দেহের দৃষ্টিতে অপাঙ্গ নিরীক্ষণ করে লোকটা চলে গেল।

গাড়িটাকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সোমবার যথাসময়ে অফিসের কাজে যোগদান করলাম। সবকিছুই যেন কেমন অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। সবাই যেন ফিসফিসিয়ে কী সব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। সকলের চোখে চকিত বঙ্কিম চাউনি। আমিই যেন তাদের সমালোচনার মূল বিন্দু। এমনকী, বচনবাগীশ কালো মোটা ভদ্রলোকটিও আমার সঙ্গে অন্যান্য দিনের মতো অযাচিত আলাপে মেতে উঠলেন না। দারোয়ানপ্রবরও জানতে এল না তার ভাই কোনও কুশল সমাচার পাঠিয়েছে কি না।

ব্যাঙ্কের কর্মমুখর পরিবেশের মধ্যে যেন সত্যিই ছন্দপতন ঘটেছে। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় ব্যাঙ্কের দরজা খুলেছে। লোকেরা যথারীতি ভিড় করেছে কাউন্টারের সামনে। টাকা-পয়সার লেনদেনও হয়েছে নিয়মমাফিক। সবকিছুই স্বাভাবিক। তবু যেন কেমন একটু থমথমে গাম্ভীর্য সর্বত্র। অর্কেস্ট্রা পার্টির ঐকতান সঙ্গীতের মধ্যে যেন দু-একটা সুর বেসুরো লাগছে।

তিনটের সময় দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। তিনটে পনেরোর মধ্যে কাজ সেরে বাইরের লোকজন সব চলে গেল। সাড়ে তিনটের সময় প্রেসিডেন্টের মহিলা সেক্রেটারি আমার সামনে এসে হাজির।

তিনি জানালেন যে, ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আমাকে ডাকছেন। বলার ভঙ্গি গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং দৃষ্টি মাটির ওপর দৃঢ়নিবদ্ধ। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না তিনি।

তাঁর পিছু-পিছু যাওয়ার সময় আমিও কোনও দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। তবে অনুভবে বুঝতে পেরেছিলাম, বিশ-পঁচিশ জোড়া চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

কেতাদুরস্ত সাহেবি পোশাকে প্রেসিডেন্ট বসেছিলেন একটা রিভলভিং চেয়ারের ওপর। মুখখানা তাঁর বিষাদ-মাখানো—যেন বহুদিন যাবৎ কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন তিনি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু-পাশে দুজন লোক বসেছিলেন। পুলিশি পোশাক পরা না থাকলেও তাঁদের নির্লিপ্ত অভিব্যক্তিহীন মুখ দেখেই বুঝেছিলাম যে তাঁরা পুলিশেরই লোক।

কোনওরকম ভূমিকা না করেই প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন, 'দেখুন বিমানবাবু, বিশ লাখ টাকার হিসেব মিলছে না আমাদের। আপনি যে সরিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন ভালোয়-ভালোয় সেটা বের করে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার শাস্তির মেয়াদ যাতে কম হয় আমি যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করব।'

আমি যেন দুম করে আকাশ থেকে পড়লাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল, শুকনো ঢোক গিললাম। শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। আচমকা একটা মানসিক আঘাতে কথা

হারিয়ে ফেললাম। অন্তত এমন ভাব দেখালাম যেন কথাটা আমার বোধগম্য হয়নি। তারপর প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে হতভম্বের মতো বললাম, 'টাকা! কীসের টাকা? আপনি কি কোনও টাকা চুরির অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন নাকি?'

শান্ত গলায় প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন, 'দেখুন, দোষ অস্বীকার করে কোনও লাভ হবে না। টাকাটা আপনিই নিয়েছেন। এখন বলুন, কী করেছেন সেই টাকাটা দিয়ে? আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি—লঘু শাস্তির বিধান দেওয়া হবে আপনার ক্ষেত্রে। আমার ওপর আপনি ভরসা করতে পারেন।'

আমি ক্রোধভরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী মজার ব্যাপার! টাকা সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি, অথচ আমাকে দোষ স্বীকার করতে হবে? কোন অধিকারে আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন?'

পুলিশ অফিসারদের একজন উঠে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'দেখুন মিস্টার, আপনি যে এরকম একটা উত্তর দেবেন আমরা তা জানতাম। আমরা এও জানতাম, আপনাকেই আমাদের হাতকড়ি পরাতে হবে। আপনার মতন লোকদের কীভাবে ঘাঁটাতে হয় আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। প্রথমে আপনারা সবই অস্বীকার করেন। তারপর বড় ঘরে গিয়ে বাপ-বাপ বলে সব স্বীকার করে ফেলেন। কেন দাদা ঝামেলা পাকাচ্ছেন? আগেভাগে সব স্বীকার করে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

আমি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বসলাম। আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সাধ করে বিপদ ডেকে আনছেন আপনি, আমি আর কী করতে পারি বলুন?'

খুট করে একটা শব্দ হতেই দেখি হাতে হাতকড়া লেগে গেছে আমার।

জনপ্রবাদ আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে একশো আট। কথাটা যে কতদূর সত্য অচিরেই সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম। স্বপক্ষের উকিলের সঙ্গে বিপক্ষের উকিলের তুমুল তর্কযুদ্ধ হল। আমার কথার কোনও হেরফের নেই, আগাগোড়া একই কথা বললাম—টাকা সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। আমার বিপক্ষে প্রচুর সাক্ষী হাজির হল। স্বপক্ষে শুধু তিনজন—বিজলি, তার দিদি এবং বাবা। তাদের বক্তব্য, শনিবার হলদিয়ায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শুক্রবার বিকেলে আমি যাত্রাও করেছিলাম। কিন্তু গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

মামলার প্রথম কয়দিন বিজলি একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমার মতো ভালো ছেলে দুর্বিপাকে পড়ে যে কাঠগড়ার আসামী সেজেছি, এজন্যে সহানুভূতির অন্ত ছিল না তার। কিন্তু পঞ্চমদিন থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করলাম। আমি তার দিকে তাকালেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে লাগল। বুঝলাম, তার মধ্যেও সন্দেহ সংক্রামিত হয়েছে। অপর সকলের মতো সেও আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে বসে আছে।

সরকারি সাক্ষী মানা হল অনেককে। প্রথমেই এলেন হোটেলের ম্যানেজার। বেঁটেখাটো চেহারা। উদর বর্তুলাকার, যেন একটি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আছে। তিনি বললেন যে, হোটেলে ঢোকবার সময়ও আমার গাড়িটি চমৎকার কাজ দিচ্ছিল, পরে সেটা হঠাৎ বিগড়ে যায়। আমি যে হলদিয়ায় ফোন করেছিলাম সে-কথাও তিনি বললেন।

মোটর মেকানিকও অনেক কথাই বলল। গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগও নাকি ইচ্ছাকৃত। আমি নাকি তাকে বলেছিলাম যে, কোনও দুষ্টু ছেলের কাজ সেটা। আমি যখন হোটেলে চা খেতে ঢুকেছিলাম, তখনই নাকি ব্যাপারটা ঘটেছিল। মোটর স্প্রিং নাকি স্থানচ্যুত হয়েছিল এবং মোটরের ইঞ্জিনে একটা পিন ঢুকিয়ে শর্ট সার্কিট করে দেওয়া হয়েছিল। তার মতে, এ-জাতীয় গোলযোগ থাকলে কোনও গাড়ি একচুলও এগোতে পারে না।

এরপর এল ঝাড়ুদার এবং দারোয়ানের সাক্ষ্য। তাদের সাক্ষ্যই এক্ষেত্রে বেশি মূল্যবান। ঝাড়ুদার আমার সুটকেসটাকে শনাক্ত করল। উকিল তাকে জেরা করল, 'যখন তুমি সুটকেসটাকে সরিয়ে একপাশে রেখেছিলে, তখন এটাকে ভারী মনে হয়েছিল কি?'

'একদম না।'

'পুলিশ সুটকেসটাকে খুলে তার ভেতর অনেক কিছুই পেয়েছে। যেমন, একজোড়া শার্ট, একজোড়া পাজামা, একটা প্যান্ট, আয়না-চিরুনি, সেফটি রেজার বক্স এবং একজোড়া চটি। তোমার কি মনে হয়, এই জিনিসগুলো তখন ওই সুটকেসটাতেই ছিল?'

'একেবারেই না—সুটকেসটা বিলকুল ফাঁকা ছিল।'

এরপর এল দারোয়ানের পালা। সে বলল যে, আমাকে সে গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত লক্ষ করেছে। আমার চলার ভঙ্গি দেখেই তার মনে হয়েছিল যে, সুটকেসটি খুব ভারী। গাড়ির পেছনে ওটাকে রাখবার সময় আমি যে দুটি হাতই ব্যবহার করেছিলাম, এ-কথাও বলতে ভুলল না।

আরও ভালোভাবে প্রমাণ খাড়া করবার জন্যে আমাকে খালি সুটকেস নিয়ে হাঁটতে বলা হল প্রথমে। তারপর বিশ লাখ টাকার সমান ওজনের জিনিস ভরে দিয়ে সুটকেসটা হাতে নিয়ে হাঁটতে বলা হল। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুবারের চলার ভঙ্গি একইরকম করতে পারলাম না।

আমি অবশ্য আগাগোড়া দোষ অস্বীকার করে গেলাম। বেকসুর খালাস যে পাব না তা জানতাম। অবশেষে রায় বেরুল—দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলাম।

হাজতবাসের প্রথম দিনেই বিজলি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি বিব্রত বোধ করলাম। কারণ, তার আচার-আচরণে স্পষ্টই সন্দেহের ভাব দেখা গিয়েছিল।

সে বলল, 'আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েই ভালোবাসতাম, এবং এখনও বাসি। কিন্তু এ কী বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল বলো তো?'

'তুমি এখনও আমাকে সন্দেহ করছ দেখছি।'

'আচ্ছা, তুমিই বা এত একরোখা কেন বলো তো? ভুল না হয় একটা করেই ফেলেছ। এখন বলে ফেললেই তো হয়, টাকাটা কোথায় রয়েছে। হাজতবাসের মেয়াদ অনেক কমে যাবে তাহলে।'

'তোমাকে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠিয়েছে নাকি? দ্যাখো, একটা কথা বলে রাখি—আমার ভালো-মন্দ আমি ভালোই বুঝি। আমার ভাগ্যকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু একটা অনুগ্রহ করো—আর কখনও আমার সামনে এসো না। তোমাকে আমি কোনওদিনও ভালোবাসতে পারিনি।'

ব্যস, সেদিনই বিজলির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন হয়ে গেল।

সময়—সময়—সময়! অনন্ত অপার বিশ্বচরাচরে অবাধ প্রবাহে অতিবাহিত হয়ে চলেছে সময়। খাওয়া, ঘুম, কাজ আর কাজ, খাওয়া, ঘুম। সীমাহীন একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছি জেলের ভেতরে। সময়কে যেন শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে এখানে—যেন একচুল এদিক-ওদিক নড়বার জো নেই। ছকবাঁধা জীবন। মেশিনের মতো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এখানকার প্রতিটি মানুষের জীবন। বড়ই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন তার চলার পথ। কতবার যে সূর্য উঠল আর কতবার অস্ত গেল, হিসেব রাখিনি। কতবার গাছে ফুল ফুটল আর ঝরে গেল, বলতে পারব না।

জেলের দুর্বিসহ জীবন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। অবশেষে তার হাত থেকে রেহাই পেলাম। মেয়াদ শেষ হল। জীবনের দশটি মূল্যবান বছর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়ে দিলাম।

জেলারের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এলাম। পাখিদের কলকাকলি যেন কানে মধু বর্ষণ করল। হিল্লোলিত ডালপালার মর্মরধ্বনি নয়া জীবনের প্রতিশ্রুতি দিল। জলজ্যান্ত মানুষটা এতকাল যেন মরে ছিলাম। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবে। যেখানে যাব সেখানেই আমার জয়জয়কার হবে। আর এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা অক্লেশে সহ্য করা তো এই দিনটির জন্যেই।

আমার সাতশো টাকা ফেরত পেলাম। ফেরত পেলাম সুদসমেত। অল্প টাকার ঘর ভাড়া নিলাম। একটা হোটেলে ছোটখাটো একটা চাকরিও জুটিয়ে নিলাম। ঝরঝরে একটা মোটরগাড়িও ভাড়া নিলাম।

আমি জানতাম, আমার পেছনে ফেউ লেগে থাকবে। তাই যা করবার সাবধানে করতে হবে আমাকে। দু-দুবার বহুদূর বেড়িয়ে এলাম মোটরটাতে চেপে। একবার গেলাম গ্র্যান্ড টাঙ্ক রোড ধরে, আরেকবার কলকাতা-দার্জিলিং রোড বরাবর। প্রত্যেক জায়গায়ই বিরাট পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। নতুন-নতুন সুদৃশ্য ইমারতগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম একদিন। কালের করাল হাত থেকে আমিও তো রেহাই পাইনি! নিজেই যে চিনতে পারছি না নিজেকে!

দু-মাসে দশবার বাড়ি পালটালাম। বেড়াতে লাগলাম এলোমেলো। একবার গ্র্যান্ড টাঙ্ক রোড ধরে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, একটা হেলিকপ্টার আমাকে অনুসরণ করছে। মনে-মনে ওদের নির্বুদ্ধিতায় হাসলাম একচোট। যে-লোকটা দশ-দশটা বছর অপেক্ষা করতে পেরেছে সে এই মুহূর্তেই আহাম্মকের মতো এমন কোনও কাজ করবে না যাতে মতলব ফেঁসে যায়।

অবশেষে বহু-প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। সকাল থেকেই সেদিন বাদলা হাওয়ায় সারা কলকাতা ব্যতিব্যস্ত, বৃষ্টির ছাটে পথ চলা দায়। এমন দুর্যোগের দিনে মোটরগাড়িই হোক আর হেলিকপ্টারই হোক আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না। 'দুর্গা-দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লাম অভীষ্টের সন্ধানে।

ডায়মন্ডহারবার রোডের মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে পরীক্ষা করলাম, ফেউ পিছু লেগেছে কি না। কোনও গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই ত্যাগ করলাম। তিনবার থামার পরেও সন্দেহজনক কিছুই নজরে এল না।

বারবার থেমে-থেমে ফলতার নদীর পাড়ে যখন হাজির হলাম তখন হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে গেছে। আর কিছু দূরেই আমার গুপ্তধন লুকোনো রয়েছে। বিশ লাখ টাকা! আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত ধন! যার কথা চিন্তা করে জীবনের সমস্ত দুঃখ-গ্লানি-তাপ ভুলে আছি, যার জন্যে সুরূপা নারীকেও পায়ে ঠেলেছি। আবেগে গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এক-পা দু-পা করে এগোতে লাগলাম। বিগত দশ বছরে দেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই অজ পাড়াগাঁয়েও বিরাট-বিরাট সব অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ওই তো সেই জটাজুটধারী বটগাছটা ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে এসব পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী। আর এ কী! ওই জায়গাটাতেই তো আমার বহু-স্মৃতি-বিজড়িত গুপ্তধন রক্ষিত ছিল! তারই ওপর আজ দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা!

পায়ের তলার পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। এত সাধের স্বপ্ন এক লহমায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! প্রবল হতাশায় হু-হু করে কান্না পেল আমার। আর ঝোড়ো বাদলা হাওয়া গাছে-গাছে শনশন আওয়াজ তুলে বিদ্রূপ করে ফিরতে লাগল আমাকে।

মাসিক রোমাঞ্চ

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫



রানিমা

বিমল মিত্র

রানিমা কলকাতায় আসছেন। মহারানি মানে নাহারগড় স্টেটের খাস রানি। নাহারগড়ের যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তিনি সেখানেই চলে গিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে আজ প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। আসলে রানিমা সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। নেহাত পাঁচ-পাঁচী। ডাক নাম ছিল গৌরী। গৌরী দেবী নামটাই ছাপানো হত কাগজে।

রানিমা এতদিন পরে কলকাতায় আসছেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় রানিমার এস্টেট ছিল জানতাম। মার্লিন প্লেস না কোথায় একটা প্যালেস ছিল। সারা বছর ফাঁকাই পড়ে থাকত। বিরাট বাড়ি শুনেছি সেটা। বাড়ি, বাগান, চাকর, মালি সবই ছিল, শুধু মালিক ছিল না। মালিক থাকত ছোটনাগপুরে, নিজের রাজ্যে।

টেলিফোন পেয়ে তাই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনি কি মিঃ মিত্র?

বললাম, হ্যাঁ, কথা বলছি—।

বোধহয় ভদ্রলোক রানিমারই নায়েব-গোমস্তা-সেক্রেটারি কেউ হবেন। সম্পত্তি দেখাশোনা করেন।

বললেন, রানিমা বুধবার সন্ধেবেলা কলকাতায় আসছেন, চার ঘণ্টার জন্যে, রাত্রেই আবার চলে যাবেন সুইজারল্যান্ডে—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—।

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এত বছর পরে গৌরী দেবীর সঙ্গে যোগসূত্রটা ঠিক তাড়াতাড়িতে ধরতে পারিনি।

—আপনি বিকেল পাঁচটার সময় এলেই চলবে। পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা আপনাকে টাইম দিয়েছেন—।

আমি রাজি হলাম। রাজি না হওয়ারও কারণ ছিল না। রাজি না হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ গৌরী দেবীকে আমি ভালো করেই চিনে নিয়েছিলাম।

তখনকার দিনে গৌরী দেবীর বেশ নাম। এখনকার লোকে সে-নাম ভুলে গেছে। সে-যুগেই দু-একটা ছবিতে ভালো অভিনয় করে নাম করেছিলেন গৌরী দেবী। 'ঋষির প্রেম' কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিংবা 'পুরাণ-ভকত'-এ ভালো পার্ট করেছিলেন। সবে তখন টকি শুরু হয়েছে। এক-একটা ছবি আসে আর আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। টিকিট-ঘরের জানালা-দরজা ভাঙা-ভাঙি হয়। রানিবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা

দাশগুপ্তার যুগ তখন। সেই যুগেই আরও কয়েকটা ছবি করলেই গৌরী দেবী একেবারে ফিলিম-স্টার হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ গৌরী দেবী একদিন ফিলিম লাইন থেকেই একেবারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এ-গল্পের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই।

বলতে গেলে গৌরী দেবীর সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ। আমি তখন সেই বাচ্চা বয়সে একটা নাটক লিখে ফেলেছিলাম। একেবারে আস্ত তিন অঙ্কে সমাপ্ত সম্পূর্ণ একখানা নাটক। কাঁচা বয়সের লেখা হোক আর যাই হোক, নাটকখানি পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের ভালো লেগেছিল। সামাজিক বিষয়বস্তু। নাম দিয়েছিলাম 'ত্রিভুজ'। ক্লাবে আমি ছিলাম সবচেয়ে কম বয়সের ছেলে। বড়রাই পাণ্ডা। আমার মাস্টারমশাই আসতেন সন্ধেবেলা, তাই রিহার্সালে কোনওদিন যেতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার উপায় ছিল না। শুধু অতুলদার কাছে শুনেছিলাম, বিখ্যাত অভিনেত্রী গৌরী দেবী নাকি হিরোইনের পার্ট করতে রাজি হয়েছেন। অতুলদাই ছিল ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি! অতুলদা অনন্যকর্মা লোক। অতুলদাই চেষ্টা করে বড়-বড় লোককে ক্লাবে আনত। তখনকার দিনে মেয়র-শেরিফ-লাটসাহেব কাউকেই ক্লাবের ফাংশানে আনতে বাকি রাখেনি অতুলদা। সেই অতুলদা যে আমার নাটকে গৌরী দেবীকে হিরোইনের পার্ট করতে রাজি করাতে পেরেছে, তা শুনে আমি খুব বেশি অবাক হইনি। তবে আনন্দ হয়েছিল খুবই নিশ্চয়। ভেবেছিলাম ডি. এল. রায়ের মতো কী গিরিশ ঘোষের মতো না-হোক, একটা ছোটখাটো নাট্যকার আমি বড় হয়ে হবই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতুলদা এল বাড়িতে।

বললে, ওরে, একটা মুশকিল হয়েছে—।

আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাহলে কি আমার নাটক হবে না?

—না তা নয়, গৌরী দেবী বলছেন ওই লাভ-সিনটা ঠিক হয়নি। ডায়ালগগুলো পছন্দ হচ্ছে না ওঁর—।

—তাহলে কী হবে? প্লে করবেন না উনি?

অতুলদা বললে, কিছু বুঝতে পারছি না।

জিগ্যেস করলাম, উনি কী বললেন?

—জিগ্যেস করলেন ড্রামাটিস্ট কে? আমি তোর নাম করলুম। তখন উনি আবার জিগ্যেস করলেন, বয়স কত? আমি তোর বয়সটাও বললাম। বললাম—সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট—।

—শুনে কী বললেন?

—শুনে গৌরী দেবী বললেন—লাভ সম্বন্ধে এর কোনও আইডিয়া নেই—।

—কেন?

অতুলদা বললে, তা কিছু বললেন না। আমি তো অত বড় আর্টিস্টকে কিছু বলতে পারি না। তখন আমি বললাম, এখন কী করা যায় বলুন? শুনে গৌরী দেবী বললেন, ড্রামাটিস্টকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি তার সঙ্গে একটু ডিসকাস করব—।

খানিক থেমে অতুলদা বললে, তুই এক কাজ কর, তুই একবার গিয়ে দেখা কর গৌরী দেবীর সঙ্গে—গিয়ে ডিসকাস করে দ্যাখ না কী বলেন।

বললাম, আমি একলা যাব?

—হ্যাঁ, তুই একলাই যা—আমার যাওয়া ঠিক হবে না। যা-যা বলেন তাই তাই-ই করা যাবে। অত বড় আ.স্ট যখন পাওয়া গেছে, তখন আর ওঁর টেস্ট মতো নাটক বদলাতে ক্ষতি কী?

—বাড়ির ঠিকানা কী?

অতুলদাই ঠিকানা বলেছিল। অতুলদাই বলতে গেলে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

দিন-ক্ষণ ঠিক করে আমি একদিন গিয়ে হাজির হলাম গৌরী দেবীর বাড়ি। আনোয়ার শা রোডের ওপর বাড়ি। তখন আনোয়ার শা রোড আরও জঙ্গল ভরতি ছিল। সামনে নিউ থিয়েটার্সের দু-নম্বর স্টুডিয়ো। আমি

সেই স্টুডিয়ো বাঁয়ে রেখে আরও কিছু দূর গিয়ে ডান-হাতি একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরের বাগানে ঢুকে পড়লুম।

গৌরী দেবীকে সশরীরে আগে কখনও দেখিনি। সিনেমায় দেখা ছিল। চাকর দরজা খুলে দিতেই আমি আমার নাম বললাম। চাকরটা আমায় ভেতরে নিয়ে একটা ড্রইংরুমে বসাল। বেশ সাজানো ঘর। চারিদিকে আসবাব। ওয়ালে গৌরী দেবীরই কয়েকটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি টাঙানো।

একটা সোফার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলাম। চাকরটা পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

ভাবছিলাম জীবনে কখনও কোনও অ্যাকট্রেসের বাড়ি ঢুকিনি। এরা কীরকমভাবে কথা বলবে আমাদের মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে তারও অভিজ্ঞতা ছিল না, তা ছাড়া, বহুদিন, বহুরাত পরিশ্রম করে নাটকটা লিখেছি। এর অভিনয় না হলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। আর গৌরী দেবী অভিনয় না করলে শেষপর্যন্ত এ-নাটকের অভিনয় হবে না। পাড়ার ক্লাবের লোকেদের কাছে নাটকটা আকর্ষণ নয়, আকর্ষণ হল গৌরী দেবী। নাটকের তো অভাব নেই বাংলা ভাষায়। শেষপর্যন্ত আমার নাটক না নিয়ে হয়তো অন্য কোনও নাটক পছন্দ করে বসবে। গৌরী দেবীরই কোনও পছন্দসই ড্রামাটিস্টের নাটক! সেই গৌরী দেবীই অভিনয় করবেন, ক্লাবেও থিয়েটার করবেন, মাঝখান থেকে আমিই শুধু বাদ পড়ে যাব।

হঠাৎ যেন নাকে সেন্টের গন্ধ লাগল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে আঁচলটা ওড়াতে-ওড়াতে ঘরের ভেতর এসে হাজির হলেন গৌরী দেবী।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করলাম।

গৌরী দেবী সামনের সোফাটায় বসলেন। বললেন, বোসো তুমি—।

চেয়ে দেখলাম সেজেগুজেই এসেছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত।

বললাম, আমাকে অতুলদা পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমার একটা ড্রামা ওঁদের ক্লাব প্লে করছে, আপনি বলেছিলেন একটা সিন নিয়ে একটু ডিসকাস করবেন আমার সঙ্গে—।

গৌরী দেবী আবার বললেন, হ্যাঁ, ওদের আমি বলিনি, কিন্তু ড্রামাটাই আমার ভালো লাগেনি—ওটা ড্রামাই হয়নি—।

বললাম, কেন? ও-কথা বলছেন কেন? ওঁরা সবাই ভালো বলছেন—।

—ওঁরা বলুন গে, ওঁরা তোমার মুখ-রাখা কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমি তো আর্টিস্ট, আমি তো বুঝি কীসে ড্রামা হয় আর কীসে ড্রামা হয় না—।

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম গৌরী দেবীর মুখের দিকে। আমি এখানে আসবার সময় আশাই করিনি এমন হতাশ করবেন গৌরী দেবী।

বললাম, কোন জায়গাটায় ডিফেক্ট আছে যদি বলে দেন তো আমি সেটা সংশোধন করতে পারি—।

গৌরী দেবী বললেন, সংশোধন করলেও হবে না—আগাগোড়াই ডিফেক্ট—।

এরপর আর আমার কোনও কথা বলবার রইল না।

গৌরী দেবী বললেন, আসলে তোমার লাভ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। ওভাবে প্রেম হয় না—বিশেষ করে নাটকে—।

জিগ্যেস করলাম, কিন্তু...?

গৌরী দেবী বাধা দিয়ে বললেন, যে-জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই, তা নিয়ে লেখো কেন তোমরা? শুধু তুমি নও, আজকাল অনেকের লেখাতেই এটা দেখছি—কেউ লিখতে জানে না—।

বললাম, কোনটা সম্বন্ধে বলছেন?

—ওই লাভ সম্বন্ধে! প্রেম সম্বন্ধে! তোমার বয়েস কত?

বললাম, উনিশ!

—উনিশ বছর বয়েসে কতটুকু জানা সম্ভব! ক'টা মেয়ের সঙ্গে মিশেছ? এক মা-বোন ছাড়া সংসারে কার সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয় তোমাদের?

আমি স্বীকার করলাম যে, সে-সৌভাগ্য আমার হয়নি। আর মা ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিইনি। তা ছাড়া আমার নিজের বোনও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের সে-যুগে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগই ছিল না এখনকার মতো।

—তাহলে? তোমার 'ত্রিভুজ' নাটকে হিরোইনকে করেছ অপরূপ রূপসী, আর হিরোকে করেছ আগলি। হিরো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে হিরোকে হিরোইন কী করে ভালোবাসে? যদি নায়ক খোঁড়া হয় তাহলে নায়িকা তাকে ভালোবাসতে পারে?

—কিন্তু খোঁড়াদের কি বিয়ে হয় না? স্ত্রীরা কি খোঁড়া স্বামীদের ভালোবাসে না? স্যার ওয়ালটার স্কট তো—বইতে পড়েছি—খোঁড়া ছিলেন, তাঁরও তো বিয়ে হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী তো তাঁকে ভালোইবাসত!

গৌরী দেবী যেন চটে গেলেন।

বললেন, দ্যাখো, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক কোরো না। লাইফের ট্রুথ আর লিটারেচারের ট্রুথ কি এক? নাটক কি লাইফের কার্বন-কপি?

আমি শুনেছিলাম গৌরী দেবী গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু তাঁর যে এত জ্ঞান তা জানতাম না। কথাগুলোর কোনও জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আর তখন আমি এত ভেবেচিন্তে লিখিনি। নাটক লিখব বলেই নাটক লিখেছি। বেশ জমাটি হলেই হল, শেষপর্যন্ত সাসপেন্স থাকলেই হল, তার বেশি আর কিছু জানতাম না।

বললাম, তাহলে কী করব?

—নাটকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ও তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে মনে করো!

বললাম, আর কি আমার উৎসাহ হবে? খুব ইনসপিরেশন নিয়ে লিখেছিলাম, আর ওঁরাও বললেন প্লে করবেন, তাই দু-মাস রাত জেগে লিখে ফেলেছিলাম—।

গৌরী দেবী বললেন, কিন্তু আমি তার কী করব! আমি তো বলছি প্লে করতে পারি আমি যদি হিরোকে খুব বিউটিফুল দেখতে করে দাও! ও হয় না, কোনও ইয়াং মেয়ে ও-রকম খোঁড়া ছেলেকে ভালোবাসতে পারে না! ওরকম চেহারা দেখলে আমার মুখ দিয়ে প্রেমের কথা বেরোবে না!

বললাম, কিন্তু প্লে করলে আপনি দেখতেন খুব হাততালি পেতেন, দর্শকদের সিম্প্যাথি পেতেন—।

—না না না, আমি তো বলেছি, জীবনে বা আর্টে অসুন্দর জিনিসের ঠাঁই নেই! খোঁড়া লোককে কি কুঁজো লোককে আমি দেখতে পারি না—।

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—রাস্তার খোঁড়া ভিখিরি দেখলেও আপনার মায়া হবে না?

গৌরী দেবী বললেন, রাস্তার ভিখিরিকে কি আমি ভালোবাসি? তার সঙ্গে কি আমার ভালোবাসার সম্পর্ক? তার দিকে তো একটা পয়সা ছুড়ে দিলেই হল। কিন্তু স্বামী? খোঁড়া স্বামীকে আমি কী করে ভালোবাসব? তার দিকে চেয়ে দেখতেই যে আমার ঘেন্না হবে! তুমি তো শেষ দৃশ্যে তাদের বিয়ে হল দেখিয়েছ—অ্যাবসার্ড! আর্টের এলিমেন্টারি নলেজও তোমার নেই! তুমি অন্য নাটক লেখো, কিন্তু হিরোকে সুস্থ-স্বাভাবিক সুন্দর করে দাও, আমি গ্ল্যাডলি প্লে করব!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আর অত কথা থাক। এই যে তুমি, তুমি তো সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে খোঁড়া ছেলেটার চূড়ান্ত প্রেম দেখিয়েছ, তুমি নিজে কোনও খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারো? খোঁড়া মেয়েকে দেখলে তোমার প্রেম জাগে? বলো, উত্তর দাও—।

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, আরে নাটক লেখা যদি অত সোজা হত তো বাংলাদেশে কেউ আর বাদ থাকত না—সবাই ড্রামাটিস্ট হয়ে যেত—।

আমার আর কোনও কথা বলবার রইল না। আমি চুপ করে রইলাম। গৌরী দেবীর শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে পড়ে যাচ্ছিল, আর বারবার তিনি সেটাকে তুলে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম আবহাওয়া, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দুজন। সেই কমবয়েসের চোখ দিয়ে সেদিন গৌরী দেবীকে যেরকম সুন্দরী দেখেছিলাম, পরে আর কখনও কোনও মেয়েকে আমার চোখে অত সুন্দর মনে হয়নি। পায়ের আঙুলের নখগুলো রং করা, হাতের নখগুলোও রঙিন। গাল ঠোঁট শাড়ি ব্লাউজ সবই রঙিন। সেদিন গৌরী দেবী আমার জন্যে অনেকখানি সময় নষ্ট করেছিলেন, সে-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু গৌরী দেবীর মতের সঙ্গে আমি মত মেলাতে পারিনি। সৌন্দর্য কি শুধু বাইরের জিনিস? ভালোবাসা কি সত্যিই দেহ নির্ভর? তাহলে মন নিয়ে কেন এত মারামারি? আমার সেই অল্প অপরিণত বয়সেই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, গৌরী দেবীর কথা সত্য নয়। গৌরী দেবী বড় আর্টিস্ট হতে পারেন, কিন্তু নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতটাই শেষ মত নয়!

গৌরী দেবী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন, আমার আবার এক্ষুনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—।

আমিও দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। বললাম, তাহলে অতুলদাকে গিয়ে কী বলব?

—বোলো ও নাটকে আমি প্লে করব না।

—কিছু কারণ বলব?

গৌরী দেবী বললেন, হ্যাঁ, তাও বলতে পারো। বোলো খোঁড়ার সঙ্গে প্রেম হয় না, খোঁড়াকে ভালোবাসা যায় না—।

এর পরে আমি আর দাঁড়াইনি। সে-দিন আমি তাঁকে নমস্কার করেই চলে এসেছিলাম গৌরী দেবীর বাড়ি থেকে। আমার জীবনে নাটক লেখার প্রয়াসের সেখানেই ইতি হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আসতেই অতুলদা বলল, কী রে, কী হল?

সব বললাম। নাটক হয়নি। নাটক লেখাতেই গোলমাল আছে। যা-যা গৌরী দেবী বলেছিলেন সব খুলে পরিষ্কার করে বললাম।

সব শুনে অতুলদা বলল, বড় ভাবিয়ে তুললে। এতদূর প্রগ্রেস করে এখন পেছিয়ে যাওয়া... বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি।

বললাম, তোমরা অন্য প্লে ধরো না—।

শেষপর্যন্ত অবশ্য তাই-ই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা চলতি নাটক ধরে প্লে করা হয়েছিল। গৌরী দেবী তাতে প্লে-ও করেছিলেন। হাততালি পেয়েছিলেন খুব, তারিফ পেয়েছিলেন খুব। অত বড় আর্টিস্ট, তিনি যে দয়া করে একটা অ্যামেচার ক্লাবের প্লে-তে নেমেছিলেন তাতেই সমস্ত লোক ধন্য হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। শুধু আমি সে-প্লে দেখতে যাইনি। দেখতে যাইনি অভিমানে নয়, ক্ষোভে। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হল বলে নয়, আমার শিল্প-প্রচেষ্টার কদর্থ হল বলে। সবাই জানল এবং বিশ্বাস করল আমার নাটক নাটকই হয়নি। সবাই বুঝল, আমি নাটক লিখতে পারি না। নাটকের এ-বি-সি-ডি-ও আমি জানি না। ক্লাবের রিহার্সালে এসেই গৌরী দেবী সকলকে সে-কথা বলে গিয়েছেন শুনলাম। আমি ক্লাবের সকলের সঙ্গে চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

এরপর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। গৌরী দেবীও সিনেমা-থিয়েটারের লাইন থেকে বিদায় নিয়েছেন। রানিবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশগুপ্তার মতো গৌরী দেবীও একদিন অভিনেত্রী-জীবন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কিন্তু বড় হঠাৎ। ঠিক উঠতির সময়। পরে শুনলাম নাহারগড় স্টেটের যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদ সিংকে বিয়ে করে তিনি নাহারগড় স্টেটের রানি হয়ে গেছেন। ছোটনাগপুরের বিরাট স্টেট নাহারগড়। কোটি টাকার রেভিনিউ স্টেট। নানারকম কথা ছড়ানো। একজন বললে, গৌরী দেবী দলবল নিয়ে থিয়েটার করতে যান নাহারগড়ে, সেই সময়ই ঘটনা ঘটে। যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদের নজরে পড়ে যান গৌরী দেবী। মহারাজার আপত্তি সত্ত্বেও গৌরী দেবীকে তিনি বিয়ে করে বিলেতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা।

এরপর স্টেট মহারাজার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মহারাজাও মারা গেছেন। কিন্তু স্টেটের যা প্রপা. তার সবটুকু গভর্নমেন্ট নিতে পারেনি। বহু সোনা, বহু জুয়েলারি সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বাপ মারা যাওয়ার পর বিন্ধ্যপ্রসাদ মহারাজা হয়েছেন। গৌরী দেবীও মহারানি হয়েছেন। নাহারগড়েই বিরাট প্যালেস। এয়ারকন্ডিশনড প্যালেস। তারপর এইবার, এই গেলবার, জেনারেল ইলেকশনের সময়...মহারাজা নাহারগড় থেকে পার্লামেন্টের ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে এম. পি. হয়েছেন। এসব খবর সেসময় খুব শুনেছিলাম। শুনেছিলাম গৌরী দেবী নাকি প্রজাদের প্রত্যেকের বাড়িতে পায়ে হেঁটে গিয়ে-গিয়ে ভোট চেয়ে-চেয়ে বেড়িয়েছেন। যে-মহারানিকে প্রজারা জীবনে চোখে দেখেনি, সেই তাঁকেই স্পষ্ট করে ভোট চাইতে দেখে প্রজারা নাকি কেঁদে ভাসিয়েছিল। প্রজারা নাকি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল, ধন্য হয়ে গিয়েছিল মহারানির কষ্ট দেখে। সেইসব কিছু-কিছু বোম্বাই-এর কোন ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নাকি ছাপাও হয়েছিল।

তা এতদিন পরে সেই মহারানি কলকাতায় আসছেন সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার পথে। আর আমাকে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন। এতে আমার কৃতার্থ হওয়ারই কথা। কিন্তু আমি মনে-মনে কৃতার্থ হতে পারিনি। আমার নাটক লেখা হয়নি বলে নয়। জীবন সম্বন্ধে আমার বোধই বদলে গিয়েছিল এই ক'বছরে। বাংলাদেশে এখন লোকে আমাকে গল্প-উপন্যাস লেখক বলে জানে। কিন্তু সেদিন সেই গৌরী দেবীর দেওয়া আঘাত আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। নাট্যকার হতে পারিনি। নাট্যকার হতে পারিনি বলে তবে কি আমার মনে ক্ষোভ আছে? এখনও কি আমি নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারিনি?

দেখা হলে রানিমা আর কীই-বা বলবেন আমাকে? কীই-বা বলতে পারেন?

বড়জোর সবাই যেমন মাতব্বরি করে সেইরকম দু-চারটে মাতব্বরির কথা বলবেন। আমার লেখার কী দোষ-ত্রুটি তাই-ই খুঁটিয়ে বলবেন। কোন লেখককে এ-দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি তা তো জানি না। একমাত্র হোমার আর বাল্মীকি ছাড়া পৃথিবীর সব লেখককেই সমালোচকের কুৎসা-কটূক্তি শুনতে হয়েছে। যে-লেখক সমালোচককে ভয় করে তার লেখাই উচিত নয়, এই সিদ্ধান্তই জীবনে পাকা করে নিয়েছি।

তাই গৌরী দেবীর নিমন্ত্রণ পেয়ে সেদিন তৈরি হয়েই গেলাম।

বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। ঠিকানা মিলিয়ে মার্লিন প্লেসে গিয়ে পৌঁছলাম। গেটে দারোয়ানের কাছে নাম-ধাম কুলুজি দিলাম।

যথা সময়ে সে আমাকে ভেতরের পার্লারে নিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর বোধহয় ভেতরে গিয়ে খবর দিলে। আমি চুপ করে বসে-বসে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। বাগানের তেমন যত্ন নেই। মহারাজা বা রানিমা কেউই কলকাতায় কখনও আসেন না। বছরের অর্ধেকটাই কাটে বাইরে। এখন মহারাজা এম. পি. হওয়াতে দিল্লিতে আসেন। চাকর-বাকর-মালি কেউই তাই মন দিয়ে কিছু কাজ করে না।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন, আপনি এসেছেন? এই আধঘণ্টা হল রানিমা এসেছেন, এসেই আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন—।

হঠাৎ বাইরের বাগানের দিকে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখি দুজন উর্দি পরা চাকর একটা ছোট ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বছরচারেক বয়েস হবে। ফুটফুটে ফরসা চেহারা। চমৎকার দামি সাজপোশাক।

জিগ্যেস করলাম, ও কে? কার ছেলে?

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের মহারাজকুমার, রানিমার এই প্রথম ছেলে, একটিই হয়েছে—।

কী রকম যেন ভূত দেখতে লাগলাম চোখের সামনে।

ভদ্রলোক বললেন, মহারাজকুমারকে নিয়েই রানিমা সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন, অপারেশান করতে...।

অপারেশান করতে! দেখি ছেলেটা খোঁড়াচ্ছে। একটা পা সোজা কিন্তু আর একটা পা ত্রিভঙ্গ হয়ে বেঁকে গেছে। সেই খোঁড়া পায়ে বেড়াতে গিয়ে বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করতে হচ্ছে ছেলেটিকে। বড় করুণ, বড় কষ্টকর সে-দৃশ্য।

ভদ্রলোক বললেন, আমি খবর দিচ্ছি রানিমাকে—।

বলে ভদ্রলোক আবার ভেতরে চলে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হল আমার নাট্যকার হওয়া হয়নি, তা না হোক। কিন্তু আমার সেদিনের সেই আঘাতের প্রতিশোধ ঈশ্বর এমন করে নিলেন কেন? আমি তো এ চাইনি! আমি তো এ কল্পনাও করতে পারতাম না। গৌরী দেবী কি এই খোঁড়া ছেলেকে ভালোবাসতে পারবেন? নিজের পেটের সন্তানকে তিনি গুলি করে মারতে পারবেন? তবে কেন সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছেন অপারেশান করবার জন্যে? লাইফের টুথ আর লিটারেচারের টুথ কি সত্যিই আলাদা? লিটারেচার কি সত্যিই লাইফের কার্বন-কপি নয় তাহলে?

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে নামলাম। তারপর গেট পেরিয়ে একবারে সোজা রাস্তায়। রাস্তায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। মহারানির পরাজয় যেন আমারও পরাজয়। গৌরী দেবীর এ-লজ্জা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতুম না।

তারপর সেই রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি পেলাম।

অন্তরালে

পুজো সংখ্যা, ১৯৬৫



এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার

শিবরাম চক্রবর্তী

একটা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখলে হয়।

আমার জীবনে এই ধরনের একটা অ্যামবিশন অনেক দিন ধরেই ছিল। কিন্তু কী করে যে ওই সব লিখি, গল্পচ্ছলেই যদিও, যাতে করে অদ্ভুত আর বিচ্ছিরি যত কাণ্ড—যার মাথা নেই, মুন্ডু নেই—একটার পর একটা ঘটে যায়—পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ঘটতে থাকে—কৌতূহল আর অনিদ্রা সমান তালে জাগিয়ে রাখা যায় ধারাবাহিকভাবে, কিছুতেই আমি ভেবে উঠতে পারিনি। সত্যি, ভাবতে গেলে, আশ্চর্য নয় কি? প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এসেই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ো। এর পরে, এরও পরে আরও কী দুর্ঘটনা ঘটবে, ঘটতে পারে, ধারণা করতেই তোমার মাথা ঘুরবে—এবং পরের পরিচ্ছেদের গোড়াতেই যখন ব্যাপারটা আরও একটু খোলসা হবে, তখন আবার আপনমনেই বলবে হয়তো, 'দুর-দুর! এই! এর জন্যেই এত!' বলতে কী, সমস্ত বইটা শেষ করতে পারলে, অবশেষে, বইটাকে দূরীভূত করতেই ইচ্ছা জাগে—এবং বলা বাহুল্য, দেরিও বিশেষ হয় না। কেউ না কেউ এসে—ছেলেপিলেরাই সচরাচর—বইটাকে বাগিয়ে নিয়ে চলে যায়, এবং সে-বই, সেই বিদূরিত অ্যাডভেঞ্চারের বই, আর কখনও ফেরত আসে না। নিজের অ্যাডভেঞ্চারের পথেই বেরিয়ে পড়ে বোধহয়।

কিন্তু সে যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চারের একটা বই লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরূহ আকাঙ্ক্ষা, আমারও ছিল। কিন্তু কী করে যে মাথা খাটিয়ে ওইরকমের একটা গল্প ফাঁদা যায় কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না।

সেই আমারই জীবনে যে এমন এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ঘটবে কে জানত! একেবারে সতিকারের অ্যাডভেঞ্চার, গল্পের বইয়ে ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে, মাথামুন্ডুহীন নিখুঁত রকমের হুবহু! কেন যে হল, কী জন্যে যে হল, এমনকী, কী যে হল তার কিছুই আমি খুঁটিয়ে বলতে পারব না। কোথায় যে হল তাও আমার কাছে ধোঁয়াটে।

সেই অ্যাডভেঞ্চারের কেবল একটি পরিচ্ছেদই আমি জানি। সেইটাই আমি এখানে বিবৃত করব। তার আগে কী ঘটেছে এবং পরেই বা কী ঘটিতব্য—জানা নেই আমার। জানার বাসনাও নেই। এই একটি-মাত্র পরিচ্ছেদই আমার জীবনে ঘটেছিল, অথবা, সেই ক্রমশ প্রকাশ্য অ্যাডভেঞ্চারের এই পরিচ্ছেদটি যখন

ঘটছিল, সেই অশুভ মুহূর্তে, আমার জীবন নিয়ে আমি হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম—এবং সুখের কথা যে, জীবন নিয়েই ফিরতে পেরেছি।

বেশিদিন আগের কথা নয়, বিশেষ এক জরুরি কাজে ডায়মন্ডহারবার-এ যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করেই লাস্ট বাস-এ চেপেছিলাম, যতই ঢিমে তেতালায় চলুক, রাত দুটো-তিনটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছতে পারব। মনে-মনে একটু অ্যাডভেঞ্চারের দুরভিসন্ধিও যে না ছিল তা নয়! কলকাতার বাইরে তো কখনও পা বাড়াই নে। রাত-দুপুরের পর ডায়মন্ডহারবারের মতো এক অচেনা জায়গায় পৌঁছে, বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করে চৌকিদার-পুলিশ ইত্যাদির সন্দেহ এড়িয়ে, কড়া নাড়ানাড়ি করে কিংবা দরজা ভেঙেই, বন্ধুকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলা—একটুখানি অ্যাডভেঞ্চারই বইকি!

বাসে আমি একাই যাত্রী।

হুস-হুস করে বাস চলেছে। কলকাতা পেরিয়ে অনেক দূর এসেছি বেশ বোঝা যায়। অন্ধকার রাতের ভেতর দিয়ে উত্তাল হাওয়ায় পাড়াগেঁয়ে মেঠো গন্ধ ভেসে আসছে। দু-ধারে কোথাও আমবাগান, কোথাও বা বাঁশঝাড়, কোথাও চষা খেত, কোথাও বা খড়ো-ঘরের বসতি—আবছায়ার মতো চোখে এসে লাগে। এরই মাঝখান দিয়ে যেতে-যেতে ভীষণ এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল হঠাৎ।

কল বিগড়েছে, গাড়ি আর চলবে না, জানা গেল। আজকের মতো এখানেই নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি? বলতে কী, বেশ একটু ভয়ই করতে লাগল আমার। অজানা জায়গায়, নির্জন নিশুতিতে কেবলমাত্র ড্রাইভার আর ওই কন্ডাক্টর—ওদের কন্ডাক্ট অকস্মাৎ কী দাঁড়াবে কে বলবে? ওধারে ষণ্ডা-ষণ্ডা ওই দুজন আর এধারে নামমাত্র আমি—আমার রীতিমতো হৃৎকম্প শুরু হল।

অবিশ্যি, নিজেকে আশ্বাস দিতেও কসুর করলাম না। তেমন ভয়ের কিছু না, সত্যিই হয়তো কল বিগড়েছে। বেগড়াতেও তো পারে। বেগড়ায় না কি? পথে-ঘাটে আকছারই তো মোটরের কল বেগড়ায়—না বলে-কয়েই বিগড়ে যায়। কেবল স্থান-কাল-পাত্র তেমন সুবিধের নয়, আমার মনের মতো নয় বলেই কি আর মোটরের কল বেগড়াবে না? বেশ তো আমার আবদার!

তা ছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে, ড্রাইভারের বেজায় ঘুম পাচ্ছে, গাড়ি টানতে আর রাজি নয়—এবং ঘুম পায় না কি মানুষের? মোটর চালাতে গেলেও ঘুম পেতে পারে।

কিংবা সবচেয়ে যেটা বেশি সম্ভব, একজনমাত্র আরোহীকে এতটা পেটল খরচ করে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলে মজুরি পোষাবে না, তা ভেবেই মোটরের কল বিগড়েছে হয়তো—।

গাড়ি ফের চলবে কখন? জিগ্যেস করতেই, আমার শেষের আশঙ্কাটাই যে সত্য, সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম।

জবাব এল 'সেই কাল সাতটা-আটটায়। সকাল না হলে কোনখানকার কল বিগড়েছে জানব কী করে?'

'এই রাত্রে—এত রাত্রে তাহলে তো ভারি মুশকিল!'

'কাছে একটা বেসরকারি বাংলো আছে। সেইখানে গিয়ে শুয়ে থাকুন—গেলেই শুতে দেবে। আর রাতও তেমন অন্ধকার নয়। চাঁদও উঠে গেছে এতক্ষণে।' কন্ডাক্টরটা জানাল।

চাঁদ উঠেছে বটে। সরু একফালি চাঁদ। অন্ধকারও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে দেখলাম।

'কোন ধারে বাংলোটা? যাব কোন দিক দিয়ে?'

'রাস্তা থেকে নেমে, চষা খেতের ওপর দিয়ে চলে যান। আল ধরে-ধরে যান চলে। একটু গিয়ে, সামনের ওই বাগানটার আড়ালেই বাংলোটা। বাবুর্চিকে ডাকবেন। লোকটা ভালো—বকশিস পেলে এত রাত্রেও উঠে রেঁধে দেবে। বাংলোর মালিকও খুব ভদ্রলোক—তাঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

কেবল শোওয়ার জায়গাই নয়, খাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের কল বিগড়ে ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

একেই বলে বরাত! না চাইতেই বর পাওয়া!

যাক, বাস থেকে নেমে রওনা তো দিলাম। চষা জমির ওপর দিয়ে, খানাখন্দে না পড়ে, হাত-পা না ভেঙে, আল এবং টাল সামলে, কোনও গতিকে, কেবলমাত্র আকাশের চাঁদের সাহায্যে সেই বাগান-ঘেঁষা বাংলোয় তো গিয়ে পৌঁছলাম।

ভেবে কাহিল হচ্ছিলাম, অনেক ডাকাডাকি করতে হবে, বন্ধুর জন্যে যে-প্ল্যান আঁটা ছিল, বাবুর্চির ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে হয়তো। কিন্তু না, কাছাকাছি হতেই বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে এবং দরজাটাও খোলা দিব্যি চোখে পড়ল!

আস্তে-আস্তে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—গলাখাঁকারি দেব কি না ভাবছি—এমন সময়ে—ও মা!

ভয়ানক এক দৃশ্য আমার চোখের সামনে উদঘাটিত হল!

ঘরের মাঝখানে, খাটে বসে সেই বাংলোর মালিকই হয়তো, হৃষ্টপুষ্ট একজন মানুষ, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—পাক্কা তিন মনের কম নয়। শুধু একটি চুল বাদে সারা মাথায় তার টাক—সেই চুলটিই কেবল খাড়া হয়ে আছে। তার ডান চোখের ওপরে কালো একটা ছোপ এবং ডান হাতের পিঠে সবুজ উলকি দিয়ে হরতনের টেক্কা আঁকা।

এবং তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর-একটা মুশকো লোক, তার হাতে রিভলভার। দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার আড়ালেই। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম বলাই ঠিক। মাটিতে হঠাৎ এঁটে গেলাম যেন।

সেই তিনমনি লোকটা বলছিল, 'দ্যাখো, আমাকে মারাটা তোমার ভালো হচ্ছে কি? আমায় মেরো না। এখনও আমার বয়েস আছে, দাঁতও রয়েছে। খুব বুড়ো হয়ে পড়িনি এখনও, এখনও আমায় বাতে ধরেনি। চোখে ছানি না পড়তেই মারা পড়ব, সেটা কি ভালো? বলো, তুমি তামাশা করছ, ঠাট্টা করছ, বলো? সত্যি-সত্যি মারছ না আমায়? অ্যাঁ।'

পিস্তল হাতে লোকটি খকখক করে একটু হাসল—হাসল কী কাশল বলা শক্ত 'হাঁ, মারব না। তাই বইকি! এত কাণ্ড করে এত কষ্ট করে শেষটায় তোমাকে না মেরেই চলে যাই আর কী!''অমাবস্যার আর্তনাদ'' বইটা তুমি পড়োনি তাই এই কথা বলছ! ''ধরো আর মারো''—সেই বইটাও তোমার না পড়াই রয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কী করব, এ-জীবনে তুমি আর পড়বার ফুরসত পাবে না, আমি নাচার—নাও, প্রস্তুত হও।'

এই বলে তিনমনি লোকটাকে প্রস্তুত হওয়ার, কিংবা দ্বিতীয় কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই...।

'গুড়ুম! গুড়ুম! গুম!'

সেই মুশকো লোকটার হাতের পিস্তলটা বাক্যব্যয় করতে শুরু করল।

তিনমনি লোকটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবং আমিও ধুপ করে বসে পড়লাম, সেইখানেই।

পিস্তলহস্ত লোকটার নজর আমার দিকে পড়ল এবার।

'কে হে? তুমি আবার কে এসে জুটলে এখানে? গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নও তো?'

'আজ্ঞে না।' ভয়ে-ভয়ে বলি সবিনয়েই, 'এমনি এসে পড়েছি। একেবারেই দৈবাৎ! এমনি এসে পড়ে না কি মানুষ? গল্পের বইয়েও তো এসে পড়ে—আপনার ওই বই দুটোতেও কতবার এসেছে দেখতে পাবেন। তবে যদি বলেন, অনুমতি করেন যদি, তাহলে এখান থেকে চলে যেতেও আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক নই—' বলতে-বলতে আমি উঠে পড়ি।

'উঁহু, সেটি হচ্ছে না। যখন এসেই পড়েছ তখন—।'

তার অঙ্গুলি-হেলনে—পিস্তল-হেলনে বললেই যথার্থ হবে, আবার বসে পড়তে হয়।

'তাহলে যদি আপনার অভিরুচি হয়, নেহাত অনিচ্ছা না থাকে—' আবার শুরু হয় আমার, 'আপনি আমাকে মারতেও পারেন। ওই পিস্তল দিয়েই মারতে পারেন, আমার তেমন খুব আপত্তি নেই। যদিও আমার দাঁত পড়েনি—তবে বাত ধরেছে কি না বলতে পারব না। তবু যে-কারণেই হোক, বাঁচতে আমার আর

লালসা নেই। বেঁচে কী হবে? বেঁচে লাভ? আপনার উল্লিখিত ওই বই দুটো আমি পড়েছি। এই সেদিনই তো পড়লাম। তাই পড়বার পর থেকেই আমার বাঁচবার স্পৃহা লোপ পেয়েছে। সেই বই থেকে জানা যায়, এরকম স্থান-কালে মারাই উচিত, এবং মরাটাই বাঞ্ছনীয়। এরকম সুযোগ ফসকাতে দেওয়া ঠিক নয়। আপনারও না, আমারও না। এ রকম অবস্থায় মরলে, মরতে পারলে, কেউ-না-কেউ আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার লিখে ফেলবেই, আর, মরে অমর হতে কে না চায়? এবং মেরে হতে পারলে তো কথাই নেই!'

'উঁহু, মরা অত সহজ নয় হে, ফাজিল ছোকরা! অমর হওয়া অত সস্তা না। ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? যেখানে আছ সেইখানে চুপটি করে বসে থাকো। আমাকে আগে ভাবতে দাও। এক রাত্রে একটা খুনই যথেষ্ট কি না, ভেবে দেখি। যদি মনে হয় আরও একটা হলে মন্দ হয় না তখন না হয় তোমাকে দেখা যাবে। ''হত্যা-হাহাকার'' বইটা তুমি পড়েছ নাকি? ওটাতে এক রাত্রে ক'টা খুন ছিল? ও-বইটা আমি অনেক খুঁজেছি, পাইনি বাজারে, কার লেখা তাও জানি নে। কার লেখা?'

'আজ্ঞে, আমি লিখিনি। অ্যাডভেঞ্চার আমার বড় আসে না।'

'ফের বাজে কথা! অমন করলে, কথার ওপর কথা বললে—ওরকম বাজে বকলে, খুন না করেই—হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি, খুন না করেই গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব তোমায়—সোজা তাড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন। অমর হওয়ার পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ করব, হুঁ।'

ভয় পেয়ে আমি চুপ মেরে গেলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ।

মুশকো লোকটা আপনমনেই বলতে থাকে হঠাৎ, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? এর মুন্ডুটা কেটে নিয়ে সেই কাটা মুন্ডুটা ম্যাজিস্ট্রেটকে গিয়ে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়? স্ট্রেট একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটকে? কোনও অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এরকমটা ঘটেছে কি? ওহে—ও! পড়েছ নাকি হে কোনও বইয়ে?'

আমাকে উদ্দেশ করেই হাঁক পড়ে, বেশ বুঝতে পারি। অগত্যা বলতে হয়, 'ঘটা আর বিচিত্র কী! এরকম ঘটেই থাকে। না পড়লেও, বলে দিতে পারি।'

'আঃ, বড্ড তুমি বাজে বকো। বলছি না যে, আমায় বকিয়ো না। ভাবতে দাও আমায়।'

এরপর সেই হত্যাকারী ভদ্রলোক একেবারেই ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হলেন।

ভেসে উঠলেন সেই ভোরবেলার দিকে। বাবুর্চি এসে পড়তেই ভেসে উঠতে হল। বাবুর্চির হাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে, তাতে রুটি, মাখন, চা, ডিম—হৃষ্টপুষ্ট লোকটির জন্যেই আনা হয়েছিল বেশ বোঝা যায়। দরজার বাইরে ওইভাবে-বসানো আমাকে এবং দরজার ভিতরে সেই মুশকো লোকটিকে দেখেই বাবুর্চির মুশকিল ঠেকেছিল। তারও পরে, অস্ত্রশস্ত্র, খুনখারাপি ইত্যাদির আমদানি দেখে চায়ের ট্রে ফেলে দিয়ে পিঠটান দেওয়াই সমীচীন হবে কি না চিন্তা করছে বেচারা। এমন সময়ে সেই হত্যাকারী হঠাৎ হাহাকার করে ওঠে, 'হয়েছে, হয়েছে, ইউরেকা! নিয়ে এসো।'

পিস্তলচালিত হয়ে বাবুর্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব্রেকফাস্টের ট্রে মুশকো লোকটির সম্মুখে ধরে দেয়, এবং নিজে এগিয়ে ধরাশায়ী সেই তিনমনির পাশে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

'এই কথাই ভাবছিলাম। এই টোস্ট-রুটির কথাই! খুন তো করলাম, কিন্তু তার পরে কী করা যায়, এতক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবছিলাম। এই তো চমৎকার হাতের কাজ রয়ে গেছে! বাঃ-বাঃ! বেশ বানিয়েছ তো টোস্টগুলো। ডিমসেদ্ধও নেহাত মন্দ করোনি তো!'

বাম হস্তে পিস্তল ধারণ করে সেই মারখুনে লোকটা ডানহাতের সদ্ব্যবহার শুরু করে দেয়।

আমিও সে-তালে একটু ফাঁক পেতেই সরে পড়ি সেখান থেকে।

ছুট! ছুট! ছুট! একেবারে সেই বড়রাস্তায়—ডায়মন্ডহারবার রোডে। কিন্তু কোথায় বা সেই বাস! কা কস্য পরিবেদনা! সদ্য উত্থিত একজন প্রাতঃকৃত্যকারীর কাছ থেকে থানাটা কোন দিকে জেনে নিয়ে আবার দৌড় লাগাই।

মাইলদেড়েক দৌড়ে পৌঁছলাম গিয়ে থানায়। একছুটেই উঠলাম গিয়ে থানার উঠোনে।

বাংলোর মালিককে বাংলোর মধ্যেই খুন করে রেখেছে, এক্ষুনি দারোগাকে খবরটা জানানো দরকার। হন্তদন্ত হয়ে, এখুনি গেলে—এখনও গেলে, হাতে-নাতে খুনেটাকে পাকড়ানো যায় হয়তো।

'পাহারোলা'র ইঙ্গিতে বুঝলাম, দারোগাবাবু ভেতরে আপিসঘরেই।

একলাফে ধাপ ক'টা টপকে দরজা ঠেলে আপিসঘরে ঢুকলাম।

ঢুকে কী দেখলাম? দেখলাম কী?

দেখলাম দারোগাবাবুটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ—পাকা তিনমনের কম যান না—পেল্লায় পরিধি নিয়ে তাঁর চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান চোখের কাছটায় কালো ছোপ, এবং ডানহাতের পেছনে সবুজ উলকিতে হরতনের টেক্কা। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ভদ্রলোকের দেহে প্রাণ নেই—পিস্তল দিয়েই তাঁকে খুন করেছে স্পষ্টই বোঝা যায়। সোজা তাঁর বুকের ভেতর দিয়ে গুলি চলে গেছে সটান।

হ্যাঁ, তাঁরও সারা মাথায় ঝাড়া টাক, শুধু একটিমাত্র চুল খাড়া দাঁড়িয়ে।

অন্তরালে

পুজো সংখ্যা, ***১৯৬৫***



সিংহের থাবা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কুমার মাধোজি রাও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার বাবা ছিলেন সেকালের ব্যারিস্টার—অত্যন্ত সাহেবঘেঁষা। তাঁর ধারণা ছিল ছেলেবেলা থেকেই বিলেতে মানুষ না হলে সত্যিকার মানুষ হওয়া যায় না। তাই যে-বয়সে বাঙালি ছেলেরা সাধারণত ধারাপাত খুলে নামতা মুখস্থ করে, প্রায় সেই বয়সেই আমি গলায় টুকটুকে টাই বেঁধে ভরতি হলাম এসে ইংল্যান্ডের এক নাম-করা পাবলিক স্কুলে। এখানে আমার মতো আরও কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র ছিল, কিন্তু তারা প্রায় সকলেই আমার তুলনায় অনেক বড়ঘরের ছেলে—বেশিরভাগই রাজা-মহারাজার ছেলে। কাজেই আমার সঙ্গে তারা খুব যে প্রাণ খুলে মিশত এমন কথা বলা যায় না।

কিন্তু মাধোজি ছিল ওদের মধ্যে স্বতন্ত্র। পশ্চিম ভারতে জুনাগড়ের কাছাকাছি নন্দকোট নামে যে-দেশীয় রাজ্য আছে—মাধোজি ছিল সেখানকারই রাজাবাহাদুরের ছেলে। কিন্তু রাজার ছেলে হলেও একেবারেই দেমাক ছিল না ওর। দুষ্টু অথচ মিষ্টি স্বভাবের জন্য হেডমাস্টার থেকে শুরু করে প্রতিটি ছাত্র ওকে ভালোবাসত,—এমনকী স্কুলের ডানপিটে ছাত্র হ্যারিস, টম, চার্লি এরাও। আর আমার সঙ্গে তো ছিল ওর গলাগলি।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। পাবলিক স্কুলের পড়া শেষ করে ইউনিভার্সিটির বেড়াও উতরে এসেছি। বাবার ইচ্ছা ছিল আমিও তাঁরই মতো ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের গণ্যমান্যদের মধ্যে একজন হয়ে উঠি। আমার কিন্তু অধ্যাপকের জীবনই বেশি পছন্দ হল। অর্থ বেশি না থাক—আছে সম্মান, স্বাধীনতা আর অবসর। আর ভালো বিলেতি ডিগ্রি থাকায়, ভদ্রগোছের একটা অধ্যাপক-পদ জোগাড় করতেও বেশি কষ্ট হল না।

পাবলিক স্কুল ছাড়ার পর মাধোজির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চিঠি পাইনি বহুদিন। তবে শুনেছি সে নাকি নানাদেশ ঘুরে এখন নন্দকোটেই ফিরে এসেছে। আমাদের মতো তো আর তার পয়সা রোজগারের চিন্তা নেই!

অনেকদিন কলকাতার বাইরে যাওয়া হয়নি, তাই এবার পুজোর ছুটিতে কোথাও একটু ঘুরে আসব ভাবছিলাম। না,—কন্টিনেন্টে আর নয়, নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের অনেক কিছু আজও দেখা হয়নি—সেটাই এখন দেখা দরকার। সত্যি কথা বলতে কী, সারা ছাত্রজীবন বিলেতে কাটিয়েও বিলেতকে ততটা

ভালোবাসতে পারিনি। হয়তো অতি কাছাকাছি থাকার ফলে ওদের গুণের সঙ্গে দোষ-গুলোও চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু যাই কোথায়?

এমন সময় হঠাৎ, আশ্চর্য কাণ্ড, একটা লম্বা তার এসে হাজির। চিঠির মতোই বড় সেই টেলিগ্রাম। বড়লোকের কাণ্ড! তার করেছে মাধোজি। লিখেছে :

> *বহুদিন দেখা হয়নি। দিনকতক এখানে বেড়িয়ে যা না! তোকে দেখলে ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়বে। কী মিষ্টিই না ছিল সেই দিনগুলি!*

এর পর আর কিছু ভাববার দরকার নেই। সুটকেসটা গুছিয়ে নিয়ে পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম নন্দকোটের উদ্দেশে।

কী চমৎকার আমাদের এই ভারতবর্ষ! ট্রেনের জানলা দিয়ে চেয়ে-চেয়ে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে—মাঠেঘাটে—বনে-জঙ্গলে। কোথাও একটুখানি কৃত্রিমতার আভাস পর্যন্ত নেই। এ ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন!

যথাসময়ে নন্দকোটে হাজির হলাম। মাধোজি নিজেই এসেছিল স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে। এখানে সে আর মাধোজি নয়—কুমারবাহাদুর, ভবিষ্যতে রাজ্যের গদির উত্তরাধিকারী সে। চেহারা দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। কোথায় সে চোস্ত সাহেবি পোশাক পরা ছোট্ট ছেলেটি আর কোথায় এই পুরোদস্তুর ভারতীয় পোশাক পরা যুবক! হাঁটু পর্যন্ত আচকানের মতো লম্বা জামা গায়ে, মাথায় ফিনফিনে রঙিন পাগড়ি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যখন সে আমার সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে শুরু করে দিল। উচ্চারণে একটু টান হয়তো ছিল, কিন্তু ভাষায় ভুল নেই একচুল। এ কী করে হল! মাধোজি ব্যাপার বুঝে শুধু মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল।

পরে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। কিছুদিন থেকে মাধোজি রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়ে। কবির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে তার এত ভালো লাগে যে, সে আসল রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়বার জন্যে বাংলা শিখতে শুরু করে। মেধাবী ছেলে সে, অল্প দিনেই এই ভাষা তার আয়ত্তে এসে যায়। এর পর আরও একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষার প্রতি তার টান আরও বেড়ে গেছে। কিছুদিন হল মাধোজি বিয়ে করেছে একটি বাঙালি মেয়েকে। বাঙালি হলেও মেয়েটি বোম্বাই অঞ্চলেই মানুষ—কাজেই ওদের পরিবারে বেশি বেমানান হয়নি। তবে রাজপরিবারের ছেলে হয়ে সাধারণ পরিবারে বিয়ে করাতে রাজাবাহাদুর খুব খুশি হননি—প্রজারাও নাকি বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু যাক সে-কথা।

রাজপরিবারে রাজার হালেই অভ্যর্থনা হল আমার। রাজবাড়ির এই অংশ রাজ-অতিথিদের মহল। তারই কয়েকখানি ঘর অধিকার করলাম গিয়ে। দুটি ভৃত্য সর্বদা আমার সঙ্গে-সঙ্গে রইল, পাছে আমার একটু আরামের ব্যাঘাত হয়। ব্যাপার দেখে আমারই লজ্জা করতে লাগল।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গেও আলাপ হল সেইদিনই। খুবই বুড়ো হয়েছেন। আর মনে হল ভারী ভালোমানুষ। শুধু ভালোমানুষ নন, বেশ একটু দুর্বল প্রকৃতিরও বলা চলে। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন আর সে-ই রাজ্যের অনেক খবরও বলে ফেললেন। মাধোজি তাঁর একমাত্র ছেলে, তাঁর অবর্তমানে সেই পাবে রাজ্যের গদি। ছেলেকে তাই তিনি উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ছেলেও শিক্ষাদীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু চালচলনে মহারাজসুলভ আভিজাত্য আজও তার এল না। রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সে অবাধে মেলামেশা করে, সমস্ত ব্যাপারে মাথা গলায়। ফলে প্রজারা হয়তো তাকে পছন্দ করে কিন্তু তেমন মান্য করে না। এটা তো ঠিক নয়। এমনকী দেওয়ান বিনায়ক রাও-ও এবিষয়ে তাঁর কাছে অনেকবার বলেছেন। রাজ্যের ছোটখাটো ব্যাপার যা দেওয়ান-বাহাদুরেরই দেখেশুনে ব্যবস্থা করবার কথা—তার মধ্যেও সে অযথা মাথা গলিয়ে নিজেকে লোকের কাছে সস্তা করে ফেলছে, অথচ দেওয়ান-বাহাদুর লোকটি খুবই কর্মঠ। চালাক-চতুর, পণ্ডিত লোক। অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। তিনি আসবার

পর রাজাবাহাদুর তাঁর হাতে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ছিলেন এত দিন, এখন দ্যাখো দেখি কাণ্ডটা—!

আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি হচ্ছ ওর বাল্যবন্ধু। তোমাকে ও খুব মানে, পছন্দ করে। তোমার কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। তা ছাড়া তোমরা, বাঙালিরা, বেশ বুদ্ধিমান। ওকে একটু বুঝিয়ে-শুনিয়ে দাও তো বাবা!'

একটু থেমে আবার বললেন, 'এই তো প্রজাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটি বাঙালি পরিবারে বিয়ে করে বসল। বউমা অবশ্য সবদিক দিয়েই খাসা মেয়ে, অল্প দিনেই আমাদের আপনার করে নিয়েছে। কিন্তু প্রজারা তো তা বোঝে না! তারা বলে, উনি তো রাজবংশের মেয়ে নন, আব্রু মানেন না—পথেঘাটে একলা বেরোন। রাজ্যের যিনি একদিন রানিসাহেবা হবেন তাঁর এরকম বে-শরম হালফিল হলে চলবে কেন? মাধোজি শুনে হাসে, বউমাও হেসে উড়িয়ে দেয়। বলো দেখি কী করি?'

তাঁকে আশ্বাস দিয়ে তখনকার মতো বেরিয়ে এলাম। পরদিন সকালেই মাধোজির ডাকে ঘুম ভাঙল। সেই কোন ভোরে সটান আমার ঘরে চলে এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। কে বলবে রাজার ছেলে! বলল, 'আর ঘুমোয় না, চল একবার স্টেশন থেকে ঘুরে আসি। আজ আমার আর-এক বন্ধু আসছেন—তোরই মতো বাঙালি—বিজন রায়। ভারী চমৎকার লোক। আলাপ হলে খুশি হবি। ফিরে এসে চা-টা খাওয়া যাবে। চল-চল।'

'তুই ফের নিজে যাবি?'

'কেন, মান খোয়া যাবে? ওঃ, বাবা বুঝি বুঝিয়েছেন তোকে?' হো-হো করে হেসে উঠল মাধোজি। সরল, প্রাণখোলা হাসি 'নাঃ, আমাকেই দেখছি এবার এই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করতে হবে।'

বিজন রায়ের সঙ্গে আলাপ হল। তিনিও আমারই মতো মাধোজির নিমন্ত্রণে বেড়াতে এসেছেন। হাসিখুশি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়েসে আমাদের চেয়ে কিছু বড়ই হবেন। আমার পাশের ঘরেই তিনি আস্তানা পাতলেন।

দেওয়ান বিনায়ক রাওয়ের সঙ্গেও আলাপ হল। আলাপ-সালাপে ভালোই লাগল। কিন্তু খুব কেতাদুরস্ত—সাধারণ লোকে যাকে বলে 'স্মার্ট'। ফরসা, ছিপছিপে চেহারা। পরনে ইংরেজি পোশাক—খুব ফিটফাট। কোথাও একটু ভাঁজ চোখে পড়বার উপায় নেই। চেহারার চাকচিক্যে বয়েস কত ঠিক বুঝবার উপায় নেই। বিনায়ক রাওয়েরও একজন অতিথি এসেছেন দেখলাম। লোকটি ইয়োরোপীয়। নাম শুনলাম মিস্টার হার্ডি। ইনি নাকি খুব ভালো শিকারি, শিকারের লোভেই এসেছেন। নন্দকোট রাজ্য হিসাবে ছোট হলেও প্রচুর অরণ্যসম্পদ রয়েছে এখানে। এই সব সংরক্ষিত বন থেকে বেশ মোটারকম আয়ও হয়। তা ছাড়া শিকারের পক্ষেও এগুলি খুব লোভনীয়। নানারকম জন্তু—এমনকী দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় সিংহও নাকি এখানে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

হইহই করে দিন কাটতে লাগল। মাধোজি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বিজন রায়কেও নয়। এদিকে মিঃ হার্ডি শিকারে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাধোজিকেও তিনি সঙ্গে না নিয়ে ছাড়বেন না। কুমারবাহাদুর সঙ্গে থাকলে নানা দিক দিয়ে সুবিধে হবে—এও হয়তো তাঁর আগ্রহের একটা কারণ। দেওয়ানজিরও ইচ্ছে তাই। মাধোজির যেতে তেমন আপত্তি নেই—তবে তার শর্ত যে, আমাদেরও সঙ্গে নিতে হবে। আমাকে আর বিজনবাবুকে। আমি বেচারা জীবনে কোনওদিন বন্দুক ধরিনি, শিকারে যাব কী! স্রেফ বলে দিলাম, ওসব আমার দ্বারা হবে-টবে না। বিজনবাবুও দেখলাম আমারই দলে। বিনায়ক রাও হাসতে-হাসতে বললেন, 'দেখলেন তো কুমারবাহাদুর, আপনার দুটি বাঙালি বন্ধুই শিকারের নামে ভয় পাচ্ছেন, আপনিও তো....।'

বিনায়ক হয়তো বলতে গিয়েছিলেন 'আপনিও তো আধখানা বাঙালি হয়ে গেছেন—বাঙালির জামাই হয়ে। আপনিও কি ওদের দলে ভিড়বেন?' নেহাত মনিব-পুত্র বলেই কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

আমি বললাম, 'যাও না হে, ওঁরা অত করে ধরেছেন। একটা দিনের তো ব্যাপার! আমরা না হয় তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করে সেদিনটা কাটিয়ে দেব।'

মাধোজি রাজি হল শেষপর্যন্ত। বিনায়ক রাও পরদিনই শিকার-যাত্রার আয়োজন করলেন। হার্ডি আর তিনি পুরোদস্তুর শিকারির পোশাক পরে নিলেন। কিন্তু মাধোজি পোশাক বদলাতে রাজি হল না, বলল, 'যখন ওদের দেশে যাব তখন ওইসব বিলিতি পোশাকের কথা ভাবা যাবে—নিজেদের দেশে যে-পোশাক এত দিন চলে আসছে তাই-ই যথেষ্ট।' মিঃ হার্ডি আর বিনায়ক অন্তত একটা ব্রিচেস আর পাগড়িটা খুলে একটা ক্যাপ পরে নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু মাধোজি তাতেও রাজি হল না। যাই হোক, শেষপর্যন্ত ওরা রওনা হয়ে গেল। আমি বিজন রায়কে নিয়ে চললাম বুড়ো রাজাবাহাদুরের কাছে, গল্প করতে।

রাজাবাহাদুর বিজনবাবুকে দেখেও খুব খুশি হলেন। বিজনের সঙ্গে এতদিন তাঁর দেখা হয়নি। বললেন, 'তোমার নামও অনেক শুনেছি। তোমার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা আর তোমার সব খেয়ালের কথা। তোমরা যখন আছ তখন ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাও। দেওয়ানজি বলেছিলেন, ইদানীং ও আবার বড় ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করছে। আরে, ওসব করলে কি মান-সম্মান বজায় থাকে? প্রায়ই নাকি পুরোনো খাতাপত্র, ফাইল টাইল চেয়ে বসে, তারপর সামান্য কর্মচারীর মতো তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। কী দরকার ওসবের? ওর জন্যে তো মাইনে করা লোকই আছে, আর ওপরে আছেন স্বয়ং দেওয়ান-বাহাদুর। তোমরা একটা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে লজ্জা পেয়ে হয়তো বন্ধ করতে পারে ওসব।'

অনেক বেলায় ওঁর কাছ থেকে ছাড়া পেলাম।

দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার একটু আগে। উঠেই মনে হল সমস্ত বাড়িময় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। যেন কী একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। চাকরটাকে ডেকে জিগ্যেস করতে যা শুনলাম তাতে সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কুমারবাহাদুর শিকারে গিয়েছিলেন। খানিক দূর মোটরে যাওয়ার পর জঙ্গল যখন ঘন হয়ে এল, মোটর আর চলে না, তখন সবাই হেঁটে এগোতে লাগলেন। কুমার আগে-আগে চলছিলেন, একটু পেছনে ছিলেন মিঃ হার্ডি আর দেওয়ানজি, বন্দুক হাতে। হঠাৎ আচমকা একটা ঝোপ থেকে একটা সিংহ বেরিয়ে এসে পেছন থেকে কুমারবাহাদুরকে আক্রমণ করে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। লোকজন ছুটে আসে, সিংহও পাশের ঝোপে গা-ঢাকা দেয়। অনেক খুঁজেও সেটাকে আর পাওয়া যায়নি। মিঃ হার্ডি প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ঝোপের ভিতর অনেকটা চলে গিয়েছিলেন, শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। ওদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় দেওয়ানজি এত বিমূঢ় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রাথমিক শুশ্রূষা করার কথাটা পর্যন্ত তাঁর মনে আসেনি। খানিক পরে দলের আর সবাই এসে পড়লে দ্যাখে—কুমারের প্রাণ তখনও ধুকধুক করছে। তখন সকলে ধরাধরি করে তাঁকে তুলে আনে মোটরে, এবং এই কতক্ষণ হল তাঁকে রাজবাড়িতে আনা হয়েছে। ডাক্তারেরা এখনও ঘিরে বসে আছেন। প্রাণ এখনও আছে, কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলাম। বিজনবাবুর খোঁজ নিয়ে শুনলাম তিনি সেই যে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে টহল দিতে বেরিয়েছেন এখনও তাঁর খোঁজ নেই।

সে-রাত কোনওরকমে কাটল। শুনলাম সিংহ মাথার ঠিক পেছন দিক লক্ষ্য করে থাবা মেরেছিল। হয়তো পাগড়ির জন্যেই থাবাটা ঠিক খুলির পেছনে লাগেনি, লেগেছে ঘাড়ের ওপর। পাঁচটা ধারালো নখের ছাপ গভীরভাবে গেঁথে গেছে সেখানে। তবে থাবা একটার বেশি মারতে পারেনি। যদি সেপটিক না হয় তবে হয়তো শেষপর্যন্ত বেঁচে যেতেও পারে। রাজাবাহাদুরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি তো হাউহাউ করে কেঁদে আকুল। বউরানি হয়তো অত বিচলিত হননি। ধৈর্য না হারিয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন।

অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটলে পর ডাক্তার বললেন, এ-যাত্রা কুমারবাহাদুরের ফাঁড়া কেটে গেছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে, ঘাড়ের ঘা-টাও আস্তে-আস্তে শুকিয়ে আসছে। এসব ঘা খুব অল্পতেই সেপটিক

হয়ে পড়ে, তাই বড় ভাবনা ছিল।

সেদিন বিজনবাবুকে নিয়ে মাধোজিকে দেখতে গেলাম। বেশ হাসিমুখেই সে আজ আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। তারই মুখে শুনলাম—জঙ্গলের পথ খুব সরু হওয়ায় তারা গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলছিল। সামনে ছিল তারা তিনজন—সে, হার্ডি আর বিনায়ক। দলের আর সবাই ছিল পেছনে। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ আর দুজন একটু পিছিয়ে পড়ে, মাধোজিও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা সিংহ এসে পেছন থেকে প্রচণ্ড বেগে তার পাগড়ি নিয়ে থাবা মারে। উলটে গুলি চালানো দূরে থাক, মুখ ফিরিয়ে সিংহটার দিকে তাকানোও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায়। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

গল্প শুনতে-শুনতে বিজন রায় কেমন যেন একটু উসখুস করছিলেন। একটু পরেই উঠে বললেন, 'চলুন জয়ন্তবাবু রোগীকে বেশি উত্তেজিত না করাই ভালো। ওঁকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দিন।'

বিজনবাবু কিন্তু নিজের ঘরে ফিরতে চাইলেন না, বললেন, 'চলুন, একটু ঘুরে আসি। কাঁহাতক ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা যায়? মন খারাপের দিন তো চলে গেছে।'

বড়রাস্তা ধরে অনেকটা হেঁটে আমরা একটা খুব বড় বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। দেখলেই বোঝা যায় বেশ বড়লোক কারও বাড়ি। বেশ ছিমছাম দেখতে। কার বাড়ি ভাবছি, এমন সময় একজন সাহেবি পোশাক পরা লোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আরে, এ যে আমাদের হার্ডিসাহেব!

হার্ডিও আমাদের দেখতে পেয়ে হাসিমুখে দেশি কায়দায় হাত তুলে বললেন, 'নমুস্টে।' আমরাও প্রত্যুত্তরে 'নমস্তে' জানালাম।

'কার বাড়ি এটা?'

'এটাই তো দেওয়ান-বাহাদুরের বাড়ি। এখানেই তো আপাতত আমার আস্তানা!'

'দেওয়ানজি বাড়ি আছেন নাকি? চলুন, এলাম যখন তখন একবারে দেখা করেই যাই।'

বলে কারও অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই বিজনবাবু আমার হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে

পড়লেন 'আপনি কোন দিকে থাকেন, মিঃ হার্ডি? চলুন, আপনার ওখানে গিয়েই বসি।'

অগত্যা মিঃ হার্ডিকেও আমাদের সঙ্গে আসতে হল।

ঘরের এক কোণে ছোট একটি শেলফ। অনেকগুলি বই রয়েছে সেখানে। দেওয়ালে অনেকগুলি জীবজন্তুর ছবি আর চার্ট। সবই প্রায় সিংহের।

'আপনি বুঝি সিংহ না মেরে ছাড়বেন না কিছুতেই! সিংহ নিয়ে দস্তুরমতো গবেষণা শুরু করেছেন মনে হচ্ছে?'

হার্ডি সলজ্জভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের চালচলন, রকম-সকম একটু ভালো করে ''স্টাডি'' করছিলাম। জানেন তো, ভারতবর্ষে সিংহ খুব কম পাওয়া যায়, শুধু এই অঞ্চলেই যা দু-চারটে এখনও আছে।'

শেলফের ওপরকার বইগুলি নাড়াচাড়া করতে-করতে বিজনবাবু বললেন, 'এগুলিও তো দেখছি সব ওই সম্বন্ধেই। বাব্বাঃ, সিংহের ওপর এত বইও আছে! বড় শিকারি হতে গেলে ল্যাঠা তো কম নয়!'

আমি টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখানেও দেখুন না, কাগজের ওপরে কত নকশা আঁকা হয়েছে। সিংহের থাবা, সিংহের নখ—কিছুই বাদ নেই! একেবারে স্কেল ফেলে মাপজোখ করে আঁকা!'

'তা তো হবেই। ভালো করে মনে রাখতে হলে নিজে হাতে ড্রইং না করলে চলে না—প্রাণিবিজ্ঞানের ওটা গোড়ার কথা।' বিজনবাবু তারিফ করে বললেন।

এই সময় বিনায়ক রাও ঘরে ঢুকলেন, আর তাঁর সঙ্গে ঢুকল একটি বছরদশেকের ছেলে। আমরা গল্প করতে লাগলাম, হঠাৎ দেখি বিজনবাবু কোন ফাঁকে ছেলেটির সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে ফেলেছেন—যেন কতকালের বন্ধু! শুনলাম ওর নাম বাজিরাও—দেওয়ানজিরই ছেলে।

'বেশ ইন্টেলিজেন্ট ছেলেটি। বাপেরই মতো।' রাস্তায় বেরিয়ে বিজনবাবু বললেন।

'এবারে কোন দিকে? বাড়ি তো?'

'তা ছাড়া আর কোন চুলোয়? চলুন, যাওয়ার পথে এখানকার পাবলিক লাইব্রেরিটা একটু ঘুরে যাই। শুনেছি খুব ভালো লাইব্রেরি।'

লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে বিজনবাবু আর বেরোতে চান না। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গেও অল্পসময়ের মধ্যে বেশ ভাব করে নিয়েছেন। অদ্ভুত লোক বটে! খানিক পরে দেখি, লাইব্রেরিয়ান সিংহ সম্বন্ধে লাইব্রেরিতে যত বই আছে সব এনে ওঁর সামনে জড়ো করেছেন।

'এসব বই এখানকার লোকেরা খুব পড়ে বুঝি? পাতা-টাতা মাঝে-মাঝে আলগা হয়ে গেছে দেখছি!' বিজনবাবু একখানা বই নাড়তে-নাড়তে প্রশ্ন করলেন।

'কোথায় পড়ে! নেহাত সিংহের দেশ, তাই রাখতে হয় লাইব্রেরিতে। তবে হ্যাঁ, হালে ওই যে সাহেব শিকারিটি এসেছেন, তিনি এর প্রায় সব বই-ই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। অদ্ভুত জাত বটে! আর হয়তো তাতেই পাতা আলগা হয়ে গেছে।'

'হুঁ,' বলে বিজনবাবু ছবির পাতাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'এই বইটা একটু নিয়ে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কুমারবাহাদুরের বন্ধুকে লাইব্রেরিয়ান খাতির না করে পারলেন না।

'আপনিও যে সিংহতত্ত্ববাগীশ হয়ে পড়লেন! কী ব্যাপার?' পথে বেরিয়ে প্রশ্ন করলাম। বিজনবাবু অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবছিলেন, চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? ও, তা দোষ কী? শুনলেন তো, এটা সিংহের দেশ!'

পরদিন সকালবেলা বিজনবাবুর সঙ্গে আবার বেড়াতে বেরোলাম।

'আজ কোন দিকে?' জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

'যেদিকে খুশি। তবে দেওয়ান-বাহাদুরের বাড়ি আর-একবার যেতে হবে। তাঁর ছেলের কাছ থেকে নেমন্তন্ন আছে—অ্যালবাম দেখতে যাওয়ার। নানারকম অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহের বাতিক আছে ছেলেটির। আমাকে না দেখিয়ে ছাড়বে না বলেছে।'

দেওয়ানজি বা তাঁর বন্ধু হার্ডি কেউই বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু বাজিরাও থাকায় অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হল না। ঘরে বসিয়ে তার যাবতীয় সংগ্রহশালা সে একটি-একটি করে এনে হাজির করল। সিগারেটের ছবি, দেশলাই-বাক্সের ছবি, চায়ের মোড়কের ছবি—এক-এক অ্যালবামে এক-এক জিনিস।

'এত চায়ের মোড়কের ছবি জোগাড় করলে কোত্থেকে? তোমাদের বাড়িতে বুঝি খুব চায়ের পাট?'

'মোটেই না। চা আমরা খুব কম খাই। কফিই ভালোবাসি সবাই। কিন্তু কফির প্যাকেট তো আর সীসে মোড়া থাকে না, তাই বাবা অনেকগুলো চায়ের প্যাকেট আনিয়েছিলেন।'

'সীসের জন্যে?' আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'ভেতরের চা ফেলে দিয়ে তোমার বাবা বুঝি সীসেটুকু জমা করেন?'

'হাসছেন যে! বাবা গলফ খেলতে ভালোবাসেন খুব। গলফের লাঠি দেখেছেন তো, তলাটা কেমন ভারী! এখানে ও-জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না। বাবার আর তর সইল না, বললেন নিজেরাই তৈরি করে নেবেন। সীসের দোকানেই অর্ডার দিচ্ছিলেন, বাবার বন্ধু ওই যে সাহেবটি, আঙ্কল হার্ডি, উনি বললেন, তার চাইতে বরঞ্চ সীসের মোড়া চায়ের প্যাকেট আনিয়ে নিন। ভেতরের চা-টা কাজে লাগবে, সীসেও পাওয়া যাবে। তাইতেই তো বাবা গাদা-গাদা চায়ের প্যাকেট এনে জড়ো করেছিলেন। সীসেটা বাবা নিয়েছেন, চাগুলো চাকর-বাকরদের বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর আমি পেয়েছি মোড়কগুলো।'

'তাই নাকি? বাঃ'! বিজনবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন 'আচ্ছা, দেখি তোমার বাবা কী রকম গলফ-স্টিক তৈরি করেছেন?'

'সে দেখাবার উপায় নেই। পাছে আমরা নেড়েচেড়ে নষ্ট করে ফেলি, সেজন্যে বাবা সেগুলো আলমারিতে চাবিবন্ধ করে রাখেন। শুধু কী তাই, লম্বা চোঙার মতো এক-একটা কেস তৈরি করে তার মধ্যে পুরে রাখেন সেগুলো। হুম বাবা!'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম।

বিজনবাবু বললেন, 'আচ্ছা ভাই বাজিরাও, তোমার অ্যালবামে তো সবই আছে, কিন্তু সিংহের ছবি নেই কেন? তোমাদের নন্দকোট তো হচ্ছে সিংহের দেশ, আর সেই সিংহের ছবিই রাখোনি—এঃ!'

বাজিরাও একটু থতমত খেয়ে বলল, 'তাও শুরু করেছি। এখনও তেমন ভালো ছবি বেশি জোগাড় করতে পারিনি, তবে হাতে আঁকা ছবি কয়েকখানা পেয়েছি। আঙ্কল হার্ডির কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি। এই দেখুন না, আর কয়েকখানা হলেই অ্যালবামে এঁটে ফেলব।' বলে বাজিরাও খাতার ভেতর থেকে পেনসিলে আঁকা কয়েকখানা ছবির স্কেচ বের করল।

বিজনবাবু তার ভিতর থেকে একখানা ছবি বেছে নিয়ে বললেন, 'এটা আমায় একটু দেবে? আমারও ছবি আঁকার শখ আছে, আর আমার কাছেও এরকম কিছু ছবি আছে। মনে হচ্ছে আমারটায় কিছু ভুল হয়েছে। তবে সেগুলো আফ্রিকার সিংহ কিনা—পায়ের গড়নটা একটু অন্যরকম। যাই হোক, তোমারটার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নেব। আর সেইসঙ্গে আরও কয়েকখানা ছবি তোমাকে দিতে পারব।'

সারাদিন আর বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা নেই। সন্ধেবেলা একজন চাকর ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বলল, 'রাজাবাহাদুর এখুনি আপনাকে একবার আসতে বললেন। খুব তাড়াতাড়ি।'

তখনই ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, রাজাবাহাদুর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঘন-ঘন আলবোলা টানছেন। সামনে বিজনবাবু বসে আছেন, আর আছেন একজন ভদ্রলোক। চেহারা আর পোশাক দেখে মনে হল এখানকার পুলিশের কর্তা-টর্তা কেউ হবেন।

আমি যেতেই রাজাবাহাদুর বললেন, 'বোসো, জয়ন্ত!' তারপর সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে উনি যা বলেছেন সত্যি-সত্যি তা মিলে গেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খানাতল্লাশ করে সব কিছুই পাওয়া গেছে। আপনার হুকুমমতো দেওয়ানজি আর তাঁর সাহেব বন্ধুটিকেও আটক করেছি।'

'করেছেন? বেশ। আচ্ছা, এখন তাহলে আসুন। কাল সকালে আবার কথা হবে।'

পুলিশ-অফিসারটি চলে গেলে রাজাবাহাদুর যেন ভেঙে পড়লেন। দু-হাতে বিজনবাবুর হাত চেপে ধরে বললেন, 'আর-জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার অত্যন্ত আপনার কেউ ছিলে। নইলে এত বড় উপকার তুমি কী করে করলে? বাঙালি বুদ্ধিমান জানতাম, কিন্তু এত বড় রত্ন তা জানতাম না।' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'রত্ন-রত্ন, জহরত। তোমাদের এই বন্ধুটি খাঁটি জহরত, জয়ন্ত!'

ফিরবার পথে বিজনবাবু সমস্ত কথা খুলে বললেন।

'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? আমার কিন্তু গোড়া থেকেই কেমন-কেমন লাগছিল। সেই কারণেই হয়তো কুমারবাহাদুরকে শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওদের আগ্রহটাও একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। বিনায়ক রাও লোকটি মুখে যেমন বিনয়ী আসলে যে সেরকম নয় তাও আমি এখানে আসার পরই জানতে পেরেছিলাম। বুড়ো রাজাবাহাদুরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আস্তে-আস্তে সে রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে সর্বময় কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। কুমারবাহাদুর এসেই কিন্তু এটা ধরে ফেললেন। ফলে তার কর্তৃত্বে অল্প-অল্প করে বাধা পড়তে লাগল। তারপর কুমারবাহাদুর ধীরে-ধীরে সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতে শুরু করায় সে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকে। হয়তো এমন সব কাণ্ড—বিশেষ করে স্টেটের টাকাপয়সা নিয়ে—ইতিপূর্বে সে করে রেখেছিল যা ধরা পড়লে সমূহ বিপদ। তাই সময় পেলেই সে রাজাবাহাদুরকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে, কুমারবাহাদুর ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে নিজের মান খোয়াচ্ছেন। কুমারবাহাদুর সাধারণের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে থাকায় তার আরও অসুবিধে হতে লাগল, কেন-না যে-কেউ যখন খুশি সত্যি কথা

ফাঁস করে দিতে পারে। এজন্যে সে রাজাবাহাদুরকে বলে সাধারণের সঙ্গে কুমারবাহাদুরের মাখামাখি বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

'কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে অবশেষে সে ঠিক করল, যেভাবেই হোক ওঁকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সে তখন বেপরোয়া!

'কিন্তু এ তো যে-সে লোক নয়, স্বয়ং রাজকুমার—রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। সরাব বললেই তো আর সরানো যায় না! নিজের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে শেষে সে একজন লোক ভাড়া করে আনাই ঠিক করল। এই ভাড়াটে লোকটিই হচ্ছে আপনাদের হার্ডি। শিকারি-টিকারি কিচ্ছু নয় ও—বিনয়ক রাও-এর ভাড়া করা গুণ্ডা। কিন্তু সাধারণ গুণ্ডা নয়—ভদ্রবেশী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান গুণ্ডা। বিলেতে এ ধরনের গুণ্ডা টাকা দিয়ে অনেক পাওয়া যায় শুনেছি। এও তাদেরই দলের একজন।

'হার্ডি এসে পরামর্শ দিল—খোলাখুলিভাবে কুমারবাহাদুরকে মারতে গেলে ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। কাজেই কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ ব্যাপারটাকে হত্যা বলে সন্দেহ না করে দুর্ঘটনা বলেই মনে করে। নন্দকোটের জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায় বলে একটা প্রবাদ আছে। আমার এখনও মনে হয় ওটা প্রবাদই, কেননা ভারতীয় সিংহ এখন প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে। অবশ্য এখান থেকে সে-জায়গাটা খুব দূর নয়। যাই হোক, এই সিংহ-শিকারের অছিলায় কুমারবাহাদুরকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যদি ছদ্মবেশী সিংহের বেশে ঘায়েল করা যায় তাহলে সহজেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু সিংহ হতে গেলে তার খুঁটিনাটি এমনভাবে জানা চাই যাতে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারে। এইজন্যেই হার্ডিসাহেবকে সিংহ সম্বন্ধে অত বই ঘাঁটাঘাটি করতে হয়েছে—অত নকশা, ছবি নাড়াচাড়ার প্রয়োজন হয়েছে। আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না, ওর ঘরে যতসব ছবি ছিল তার মধ্যে সিংহের থাবা, নখ—এইসবের ছবিই ছিল বেশি। অর্থাৎ, সিংহের অন্য সবকিছু খবরের চেয়ে ওইগুলির খবরই ছিল ওর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। সেদিন লাইব্রেরি থেকে যে বইটা এনেছিলাম আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। কেন এনেছিলাম জানেন? বইটাতে নানা জাতের সিংহের থাবার নকশা আঁকা একটা ছবি ছিল। বই নাড়তে-চাড়তে মনে হল—ছবিটা কেউ কাগজে ট্রেস করে নিয়েছে। ছবির দাগের ওপর পেন্সিলের দৃঢ় আঁচড় তখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। লাইব্রেরিয়ান বললেন, এ-বই কেউ কখনও নেয় না, তবে সম্প্রতি ওই সাহেবটি এসব বই ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছেন। তখনই সন্দেহ হল এ কি তবে হার্ডিরই কাজ? আর সিংহ-শিকার করতে গেলে শুধু তার থাবা আর নখ নিয়েই যত গবেষণা, এর মানে কী? ব্যাপারটার মীমাংসায় সাহায্য করল আমাদের বাজিরাও। হার্ডিসাহেব অকেজো ভেবে যে নকশাটা ওকে দিয়ে দিয়েছিলেন সেটাই ছিল ওই বই-এর টেস করা ছবি। তাই নকশাটা চেয়ে এনে বই-এর ছবির ওপর ফেলে দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক।

'এখন কথা হচ্ছে, থাবার ছবি নিয়ে হার্ডি কী করবে? নিশ্চয়ই একটি নিখুঁত মাপের নকল থাবা তৈরি করার মতলব ছিল তার। থাবা দিয়ে পেছন থেকে মাথার খুলিতে আচমকা মারতে পারলে কুমারবাহাদুরকে আর উঠতে হবে না। এখন, এরকম থাবা তৈরি করতে গেলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে কোনও লাঠির ডগায় থাবাটি আটকে নেওয়া। পাঁচটা নখের বদলে পাঁচটা মাপসই মোটা-মোটা লম্বা পেরেক মুখটা ঈষৎ বেঁকিয়ে নিয়ে যদি কোনও ভারী জিনিসের মধ্যে আটকে নেওয়া যায় তাহলেই কাজ হাসিল করা যেতে পারে। "ভারী" বলছি এইজন্যে যে, সিংহের থাবার যে-প্রচণ্ড জোর তা আনতে হলে খুব ভারী কোনও জিনিস ছাড়া হতে পারে না। ভারী বলতে প্রথমেই মনে আসে লোহা। কিন্তু লোহার মধ্যে পেরেক বসানো একটু কষ্টকর। তার চাইতে সীসের মধ্যে পেরেক আটকানো অনেক সহজ—কারণ, সীসে খুব অল্প আঁচেই গলে যায়। তা ছাড়া লোহার তুলনায় সীসে ভারীও অনেক বেশি।

'সীসের দোকান থেকে হঠাৎ সীসের মতো একতাল সাধারণের অ-দরকারি জিনিস কিনতে গেলে পাছে কেউ সন্দেহ করে এজন্যে হার্ডিসাহেব পরামর্শ দিল—সীসেয় মোড়া চায়ের প্যাকেট কিনে তার থেকে সীসেটা বের করে নিতে। এক-একটা মোড়কে আর কতটা সীসে থাকে—তাই অনেকগুলো প্যাকেটই

কিনতে হল। তারপর সেই সীসের তাল গালিয়ে একটা ডাণ্ডার আগায় লাগিয়ে তার মধ্যে পেরেকগুলো বসিয়ে দেওয়া হল—ঠিক যেমন সিংহের থাবায় নখগুলো বসানো থাকে। পেরেকের ছুঁচলো মুখগুলো রইল বাইরের দিকে। পাছে আবার কেউ সন্দেহ করে তাই বাড়ির লোকদের বোঝানো হল গলফ খেলার স্টিক তৈরি করা হচ্ছে। স্টিক রাখার জন্যে যে-কেস বা চোঙা, সেটা আর কিছু নয়, বন্দুকের নল। কারণ ওই নকল থাবা হাতে করে তো আর শিকারে যাওয়া চলে না। তাই একটা বন্দুক থেকে কলকবজা বের করে নিয়ে ভেতরটা ফাঁপা করে নেওয়া হল, আর তারই মধ্যে পুরে দেওয়া হল লাঠির আগায় লাগানো নকল থাবা।

'তার পরের ব্যাপার তো জানেনই। কুমারবাহাদুরকে শিকারে নেওয়ার নাম করে কী করে দল-ছাড়া করে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়, এবং আচমকা মাথার নীচে নকল থাবা দিয়ে আঘাত করা হয় সে তো বুঝতেই পারছেন। ভাগ্যিস কুমারবাহাদুর পাগড়িটা খুলতে রাজি হননি, নইলে ওরা পাগড়ির বদলে ক্যাপ পরে নেওয়ার জন্যেও কম পীড়াপীড়ি করেনি। আমার মনে হয়, ওই পাগড়ির জন্যেই উনি বেঁচে গেছেন। মাথায় পাগড়ি থাকায় আঘাতটা মাথার খুলিতে লাগতে পারেনি, পড়েছে ঘাড়ের ওপর, আর জোরটাও খানিকটা প্রতিহত হয়েছে। অবশ্য তাতেও কুমারবাহাদুরকে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হয়েছিল। উনি মারা যাবেন না এ হয়তো ওরা ভাবতে পারেনি। যে-জায়গাটায় ঘটনাটা ঘটেছে সেটা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। জঙ্গল হলেও সেখানে লোকের চলাচল আছে, সেখানে সহসা সিংহের আবির্ভাব বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা ছাড়া দলের কেউ সিংহ চোখে দেখা দূরের কথা, কোনও আওয়াজ শোনেনি বা পায়ের দাগও দেখেনি!

'সব কিছুই আমার কাছে তাই রহস্যময় মনে হচ্ছিল। তারপর কুমারবাহাদুর একটু সুস্থ হলে যখন তাঁর নিজের মুখে ঘটনাটা শুনলাম, তখন সন্দেহ গাঢ় হল। অনুমান সত্যি কি না জানবার জন্যে তথ্য খুঁজতে লাগলাম। ঘটনাচক্রে একটির পর একটি সবই মিলে যেতে লাগল। শেষটায় স্থির সিদ্ধান্তে আসবার পর রাজাবাহাদুরকে গিয়ে সব বললাম। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন, পুলিশ খানাতল্লাশি করে সব কিছু বের করে ফেলেছে। আসামীরাও ধরা পড়ে দোষ স্বীকার করেছে। কিন্তু আর বাজে কথা নয়, চলুন, একবার কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসি। বউরানি নিজের হাতে চা করে খাওয়াবেন বলেছেন। আপনাকেও নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।'

অন্তরালে
পুজো সংখ্যা, ১৯৬৫



মজারাম্পুরায় গর্জন

তারাপদ রায়

মজারাম্পুরার রাজধানীও মজারাম্পুরা।

মজারাম্পুরার একটা ম্যাপ ছিল শশকের কাছে। সেই ম্যাপটা ছোটরাজা রামকর্পূর চিঠির সঙ্গে গর্জনকে পাঠিয়েছিলেন, আর সেইসঙ্গে পথের নির্দেশ। জামশেদপুর থেকে বাসে চাইবাসা যেতে হলুদপুকুর থেকে সাড়ে ন' মাইল উত্তর-পশ্চিমে চুণা নদী। নদী নয়, খাল। চূণা নদীর দু-দিকে পরগনা, মানে সাঁওতাল পরগনার উলটোপালটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে মজারাম্পুরা-মৌজা, সেটলমেন্টেও ওই নাম রয়েছে। তবে রাজ্য কথাটা না লিখে মৌজা লেখা হয়েছে, আর সেই মৌজার কোথাও ছোটরাজা রামকর্পূর থাকেন এমন একটা জায়গায়, যেখানে জায়গার নাম ওই মৌজার নামেই।

মজারাম্পুরার ছোটরাজা রামকর্পূর দাঁত তুলতে এসেছিলেন কলকাতায়, ডক্টর জি. কে. বসু, মানে গর্জনকুমার বসু, মানে গর্জন গোয়েন্দার কাছে। গর্জন বি. ডি. এস. পাশ ডেন্টিস্ট। যখন পসার জমেনি, তখন শখ করে কিছু গোয়েন্দাগিরি করেছিল, আর সেই গোয়েন্দাগিরির গল্প ফলাও করে লিখে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, শশক যতটা পয়সা নিয়েছে নিজে, তার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিমান করেছে গর্জনকে। 'ধর্মযুগ'-এ গর্জনকে নিয়ে লেখা শশকের একটা গল্পের হিন্দি অনুবাদ পড়েছিলেন ছোটরাজা রামকর্পূর। তারপরে যখন চেম্বারে এসে কী করে জেনে ফেলেন, ডাঃ জি. কে. বসুই গর্জন, তখন সদ্য তোলা তিনটে কাঁচা দাঁতের শোক আর যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বিস্ময়ে আকুল হয়ে পড়েন।

'কী তাজ্জব বাত! আপনি গোর্জন গোয়েন্দা!'

প্রচণ্ড শোকের মধ্যেও হেসেছিলেন ছোট-রাজা 'দাঁতকা ডাগদার ভি আছেন, গোয়েন্দা ভি আছেন। আপনাকে আমার দোরকার হবে।'

সেই দরকার যে দাঁত তুলে যাওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই হবে, সেটা কিন্তু তখন বোঝা যায়নি।

প্রথমে এল টেলিগ্রাম কাম শার্প, লেটার ফলোস। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম একেবারে। লেটার ফলো করতে দু-দিন দেরি হল, তবে সেটাও এক্সপ্রেস।

চিঠি পড়ে কিন্তু ঘটনা কিছুই বোঝা গেল না। শুধু পথের নির্দেশ, রাজ্যের মানচিত্র আর দুশো টাকার একটা চেক যাতায়াত খরচ বাবদ, সেই সঙ্গে সানুনয় অনুরোধ। গর্জন শশককে ডেকে বলল, 'তাহলে চলো, যাওয়া যাক মজারাম্পুরায়।'

'কিন্তু স্যার, চেম্বার বন্ধ থাকবে!' শশক মাথা চুলকিয়ে বলে। যদিও তারও যাওয়ার ইচ্ছে কিছু কম নয়, অনেকদিন একটা গল্পও লেখা হয়নি।

গর্জন শশককে একবার আগামী তিনদিনের এনগেজমেণ্ট লিস্টটা দেখতে বলল।

শশক সব দেখেশুনে বলল, 'তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই, শুধু পরশুদিন বিকেলে মিস মার্কণ্ডেয় আসবেন।'

'মিস মার্কণ্ডেয়? পরশুদিন বিকেলেই আসবে? তাহলে তো চেম্বার বন্ধ করতেই হয়। দাঁত তুলে ছাপ্পান্ন বছরের মিসের মুখশ্রী ফেরানো আমার দ্বারা হবে না। নাও, বাক্স-বিছানা বাঁধো, আর একটা নোটিশ দিয়ে যাও দরজায়। অনিবার্য কারণে চেম্বার সাতদিনের জন্য বন্ধ থাকিবে।'

অনিবার্য কারণে চেম্বার সাতদিনের জন্যই বন্ধ রইল। জামশেদপুরে চাইবাসা যাওয়ার বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে শশক পকেট থেকে মজারাম্পুরার ম্যাপটা বের করে দেখছিল, আর গর্জন আপনমনে হিতোপদেশের সেই শ্লোকটা, সেই 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য....শশকেন নিপাতিত' 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানের সুরে গুনগুন করে গাইছিল।

একটা বাস এল—চাইবাসা মার্কা মারা। গর্জন আর শশক উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিনজন লোক বাধা দিল, 'পেছনে এক্সপ্রেস আসছে, সেটায় আসুন। এটা অনেক ঘুরে, অনেক থেমে-থেমে যাবে। এ-বাসে গেলে বাঙালিবাবুদের খুবই কষ্ট হবে।'

'এক্সপ্রেস কতক্ষণ পরে?' শশক জানতে চাইল।

বাস থেকে দুজন কন্ডাক্টরসুদ্ধ একসঙ্গে দশ-এগারোজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই একটু পেছনে—।'

একটু পিছনে মানে পাকা পৌনে চার ঘণ্টা। সকাল থেকে দাঁড়িয়ে বেলা বারোটা বেজে গেল—আর বাসের সাক্ষাৎ নেই। এক্সপ্রেস হোক, প্যাসেঞ্জার হোক, একটা বাসেরও আর দেখা নেই।

ডিসেম্বর মাসের রোদ যে কত চড়া, সেটা জামশেদপুর বাসস্ট্যান্ডে সুটকেস-বিছানা বগলে নিয়ে ঘণ্টাচারেক দাঁড়িয়ে সাড়ে সাত আনা করে চানাচুর না খেলে বোধহয় বোঝা সম্ভব নয়, অন্তত তাঁদের পক্ষে তো নয়ই, যাঁরা এই সময়ে কলকাতার বাড়ির বারান্দায় আলতো করে চাদর জড়িয়ে হালকা রোদে বসে 'রোমাঞ্চ' পাঠ করেন।

সোয়া বারোটা নাগাদ সত্যি-সত্যি বাস এল। শশক আর গর্জন পোঁটলা-পুঁটুলি নিয়ে পা-দানিতে যেই পা দিয়েছে, পা-দানির ওপরে তিনটে লোক একসঙ্গে মুখ হাঁ করতেই শশক বলল, 'একটু পেছনেই এক্সপ্রেস বাস রয়েছে না?'

'একদম খালি এক্সপ্রেস আছে পেছনেই।' তিনজনই একসঙ্গে জানাল।

শশক ধীরে-সুস্থে ভিতরের সিটে গিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসে বলল, 'তাহলে এটাতেই যাব।'

গাড়ি ছাড়তে শশক ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, এরা—।'

গর্জন বলল, 'তুমি ভাবছ বুঝি এরা রামকর্পূরের বিরুদ্ধ দলের লোক, আর আমাদের চেনে! সেসব কিছু নয়। এরা আসলে শৌখিন মিথ্যেবাদী সব। মিথ্যে কথা বলে আনন্দ লাভ করে। অনেকটা আমার সেই পেশেন্ট গুহমশাইয়ের মতো।'

'ও, সেই গুহমশাই, যিনি বলেন যে, পন্ডস কোল্ড ক্রিমের ফর্মুলা তিনিই বের করেছিলেন!' শশক বলে।

কথা বলতে-বলতে হলুদপুকুর এসে যায়।

হলুদপুকুরে রামকর্পূরের লোক একটা একঘোড়ার টমটম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোচম্যান ছাড়া গাড়িতে দুজনের মাত্র জায়গা হয়, সুতরাং রামকর্পূরের প্রতিনিধি গাড়ির সঙ্গে পায়ে হাঁটতে লাগল, আর গর্জন ও শশক গাড়িতে।

রামকর্পূরের লোকটির নাম জানা যায়নি। জানা গেলেও তার সঙ্গে বাক্যালাপ সহজ ছিল না। কেননা এ-গাড়ির ঘোড়াটা কেমন যেন, হাড়-জিরজিরে রোগা, ছুটতেই পারে না। লোকটা পায়দলে ঘোড়ার গাড়ির থেকে অনেকটা এগিয়ে গেল। গর্জন ভাবল কোচম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঘটনাটা কী একটু জেনে নিতে

পারলে ভালো হয়। কোচম্যানকে কী-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করে তাকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলল, আর ঘোড়াটা ভীষণ খেপে গিয়ে উলটোপালটা এলোপাতাড়ি ছুট লাগল। কলকাতায় বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে যাওয়া অভ্যেস আছে বলেই শশকের কিছু হল না, কিন্তু গর্জন একটু নাদুসনুদুস প্রকৃতির, সে ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের একটা বাজরা খেতের ভেতরে।

প্রায় দুই ফার্লং দূরে রামকর্পূরের লোক হাঁটছিল, সে ছুটে এল। শশক লাফিয়ে পড়ল চলন্ত টমটম থেকে, কোচম্যান অনেক চেষ্টা করে একটু দূরে গাড়িটাও দাঁড় করাতে পারল। সবাই মিলে ধরাধরি করে গর্জনকে তুলল। গর্জনের পিঠের ধুলো-টুলো ঝাড়া হয়ে গেলে রামকর্পূরের লোক কোচম্যানকে মারতে উঠল। কোচম্যান হাত জোড় করে বলল, 'আমি কী করব, আমার ঘোড়াটা গাড়ির মধ্যে কথা হলেই কীরকম ভড়কে যায়। আমি তো বাবুদের ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা গেল খেপে।'

'ঠিক আছে, তুমি মালপত্র নিয়ে গাড়িতে যাও, আমরা হেঁটেই যাব।' এই বলে গর্জন আর শশক সেই লোকটার সঙ্গে হাঁটা শুরু করে দিল।

একটু পরেই কথাবার্তা চালু হল। কিন্তু গর্জন সরাসরি কিছু জিগ্যেস করল না লোকটাকে, অর্থাৎ সুখনলালকে, (এতক্ষণে নাম জানা গিয়েছিল তার) কেননা ব্যাপারটা রাজপরিবারের বিশেষ কোনও গোপন ব্যাপারও হতে পরে; যদি সুখনলাল কিছু জানেও সেটা একটু বাজালেই বোঝা যাবে।

সুখনলালের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যেটুকু জানা গেল, তার সারাংশ হল যে,

এ-বছর এ-অঞ্চলে গম ভালো হয়নি। রামকর্পূরের এক ভাইপো বিলেতে মেম বিয়ে করেছে। রামকর্পূরের বিধবা বুড়ি বউদি, অর্থাৎ বড় রানি, ছাড়া আর সবাই সেটা জানে। সুখনলালের নাতনি, এখন যার মাত্র সতেরো দিন বয়েস, সে বড় হলে মেয়ের মতো দেখতে হবে। রামকর্পূরের মামা ছোট শিমতলার গজেন্দ্রভানু পঞ্চায়েত ইলেকশানে হেরে গিয়ে বাড়িতে বিরাট শত্রুনিধন যজ্ঞ করেছে, সেখানে পরশুদিন একহাজার একশো আটজন সন্ন্যাসী খেয়েছে। সুখনলালের ঘোরতর সন্দেহ, এর মধ্যে একশো আটজনও খাঁটি সন্ন্যাসী কিনা।

চূণা নদী এসে গিয়েছিল, নদী পেরোতে হবে। কথা থামিয়ে শশক বলল, 'আজকাল আর আসল সন্ন্যাসী দেখাই যায় না।'

চূণা নদী পেরোনো তেমন কিছু কঠিন নয়। দুটো শালগাছ পাশাপাশি ফেলে অস্থায়ী সাঁকো বানানো হয়েছে। এই শীতের সময় জল খুবই কম, এপার-ওপার বড়জোর কুড়ি হাত হবে, আর গভীরও কিছু নয়। টমটম গাড়িটা জলের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল।

প্রথমে সুখনলাল, মধ্যে গর্জন আর শেষে শশক। গুটিগুটি সবাই পেরিয়ে গেল। শশক একবার মনে-মনে ভেবেছিল এই শীতের অবেলায় স্যার যদি একবার ঠান্ডা জলের মধ্যে পড়ে যান, তবে গল্পটা এখানে বেশ জমানো যায়। আসল ঘটনা তো এখনও টুঁ-টুঁ, যদি এইখানে একটু কায়দা করা যায়—এ ছাড়া সেই বাজরা খেতের ব্যাপারটা তো আছেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন কিছুই ঘটল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সাঁওতাল পরগনার এই অঞ্চলে ডিসেম্বর মাসে যেরকম কুয়াশা আর সেইরকম শীত। কুয়াশা হলে নাকি শীত হয় না! কুয়াশায় একটাও দূরের মানুষ দেখা যাচ্ছে না আর ঠান্ডায় চোখের পাতা খোলা যাচ্ছে না, তা ছাড়া এতটা পথ হেঁটে গর্জনের হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে পিঠে গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে। কোনওরকমে তারা দুজনে যখন রামকর্পূর সিংয়ের প্রাসাদে পৌঁছল, তখন দুজনে না হলেও গর্জন প্রায় অথর্ব।

বেশ বড় দোতলা বাড়ি। চারদিকে ঘেরা বারান্দা। বারান্দায় অল্প দূরে-দূরে পুরোনো আমলের চৌকো বিলিতি কাচের লণ্ঠন, টিমটিম করে জ্বলছে। ভিতরে বাঁধানো উঠোন জুড়ে আলো করে রয়েছে একটা অতিকায় ডেলাইট।

উঠোনের ডান পাশের বারান্দা দিয়ে উঠে দুটো পাশাপাশি ঘর, ঘরের মধ্য দিয়ে দরজা রয়েছে। একটায় শশক আর একটায় গর্জনের স্থান হয়েছে। বন্দোবস্ত ভালোই। তবে লেপ নেই—কম্বল, আর কম্বল গায়ে দিলে শশকের গা বড় কুটকুট করে।

শশক গরম জল চেয়ে নিয়ে স্নান করল, কিন্তু গর্জন এই শীতে গা ভেজাতে মোটেই ভরসা করল না। গর্জন ঘরে ঢুকেই গা এলিয়ে দিল বিছানায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যে শশকের ধাক্কাধাক্কিতে চোখ খুলতে হল 'আঃ, বিরক্ত করছ কেন?'

'স্যার, আপনার পেশেন্টের মাথা খারাপ।'

'আমার পেশেন্ট মানে, রামকপূর্রের?' গর্জন জিজ্ঞাসা করে চোখ কচলিয়ে নিয়ে।

'হ্যাঁ স্যার, উলটোদিকের বারান্দায় এসে দেখুন।'

উলটোদিকের বারান্দাটা বাড়ির ভিতরের দিকে। শশক সেখানে গিয়ে ওপাশের দোতলার দিকে দেখাল। কিন্তু ওপাশের দোতলা ফাঁকা। শশক বলল, 'এইমাত্র স্যার, ওই বারান্দায় একটা শতরঞ্চি রয়েছে দেখছেন, ওর ওপরে রামকর্পূর ডিগবাজি দিচ্ছিলেন। স্নান করে আমি একটু আগে এই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখে তো বোকা বনে গেলুম।'

'তুমি নিজেই পাগল হয়ে গেছ, শশক। রামকর্পূর ষাট বছর বয়সে ডিগবাজি খাবে কোন দুঃখে? তুমি ভুল দেখেছ।'

শশক নিজেও ভাবল ভুলই দেখেছে।

একটু পরে জলখাবার এল। তারপর খবর এল, কাল সকালে ছোটরাজা দেখা করবেন, এখন আপনারা বিশ্রাম করুন।

জলখাবারের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, রাতে যখন চাকর লাল গমের রুটি, ভয়সা ঘি, আর ভেড়ার মাংস নিয়ে এল, তখন গর্জন আর শশক ঘুম থেকে উঠে সেটা স্পর্শই করল না। সেইসঙ্গে বড় দুই বাটি ভরা গরম দুধ ঠান্ডা হয়ে দই হয়ে গেল, দুজনের মাথার কাছে টেবিলে।

সকাল সাতটা নাগাদ দেখা মিলল ছোটরাজা রামকর্পূরের। সুখনলালই বোধহয় রামকর্পূরের খাস ভৃত্য। সে এসে ডেকে নিয়ে গেল চা খেতে, অন্দরে দোতলায়। গর্জন আর শশক যাওয়ার মিনিটপনেরো পরে রামকর্পূর এলেন। চোস্ত পাজামা আর টুইডের ওভারভোট পরে তাঁকে বেশ সম্রান্ত দেখাচ্ছিল। এসেই দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন 'ডিগবাজি দিতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল, বুড়ো বয়েসে অসুবিধেও হয়।'

ডিগবাজির উল্লেখে শশক আর গর্জন একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। হঠাৎ মুখ ফসকে শশক বলেই বসল, 'আপনাকে বোধহয় কাল সন্ধেবেলায় এসেই আমি দেখেছি ওই পশ্চিমের বারান্দায় ডিগবাজি খেতে।'

ডিগবাজি খাওয়া ব্যাপারটা যেন একেবারে কিছুই নয়, এইভাবে বললেন রামকর্পূর, 'আর কী, সকাল-সন্ধ্যায় ওই যা ক'টা ডিগবাজি, কীসের জোরেই বা টিকে থাকব এই বয়েসে, বলুন দেখি?'

ইতিমধ্যে চায়ের টেবিলে আরও তিনজন সমবতে হয়েছেন।

রামকর্পূর পরিচয় করিয়ে দিলেন 'এ হল রামদুলাল, আমার ভাইপো। এর দাদা রামগোপাল বিলেতে আছে আজ পাঁচ-ছ' বছর, গত বছরখানেক কোনও চিঠিপত্র দেয়নি। আমার দাদা রামগুলাব মারা গেছেন আজ প্রায় কুড়ি বছর। তখন থেকে আমিই গার্জিয়ান এদের। এর মা, মানে আমার বউদিকে জানানো হয়নি, তবে আমরা শুনেছি রামগোপাল বিলেতে গিয়ে ওই দেশের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে, আর দেশে ফিরবে না।'

গর্জন ভালো করে রামদুলালকে দেখল। সৌম্য, সুদর্শন যুবক। কথার ফাঁকে রামকর্পূর পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে একটা কোনা পাকিয়ে নাকের ভিতরে সুড়সুড়ি দেন। গর্জন লক্ষ করল, ভাবল, ডিগবাজি খাওয়ার মতো এটাও বোধহয় ছোটরাজার একটা বদ অভ্যাসই হবে।

রামদুলালের পাশে যে-রক্তচক্ষু ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, যাঁর মাথায় জরির পাগড়ি আর কাঁধে জামদানি চাদর, জানা গেল তিনিই গজেন্দ্রভানু। রামকর্পূরের মামা। গর্জনের মনে পড়ল এর কথাই পথে আসতে-আসতে সুখনলাল বলেছিল।

গজেন্দ্রভানুর পাশে সার্জের পাঞ্জাবি, তুষের আলোয়ান পরা ভদ্রলোক, যাঁকে দেখলে বাঙালি বলে মনে হয়, সত্যিই তিনি বাঙালি, নাম সুকুমার বসু। রামকর্পূরের এস্টেটের ম্যানেজার। এস্টেট বলতে জমিদারি এককালে ছিল—এখন সেটা নেই, তবে বৎসর-বৎসর সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ঝামেলা রয়েছে। পাইক-বরকন্দাজ, নায়েব-গোমস্তা এখন আর কিছুই নেই, শুধু ম্যানেজার রয়েছেন। তিনিই দেখাশোনা করেন। আগে চাইবাসা কোর্টে ওকালতি করতেন। জমিদারি দখলের আগের বছর, মানে বছরদশেক হল এখানে এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে রয়েছেন। সপরিবারে আছেন। খাই-খরচা লাগে না, আর সুকুমার বসুই বললেন, 'আমি ছিলাম জমিদারের উকিল, জমিদারি উচ্ছেদের পর একেবারে বেকারই হয়ে গেলাম। রামকর্পূরবাবুরা আমার পুরোনো মক্কেল, উনি বললেন, আমিও চলে এলাম। এঁদের এই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারটা গুছিয়ে দিয়েই আবার প্র্যাকটিসে ফিরে যাব ভাবছি।'

গর্জন আর শশক, দুজনেরই ধারণা ছিল যে, নিশ্চয়ই এখানে একটা কিছু খুন-টুন হয়েছে—অন্তত বড় রকমের একটা চুরি। কিন্তু এখন রামকর্পূরের কথা শুনে মনে হচ্ছে, সেসব কিছুই নয়। শুধু-শুধু সাতদিন চেম্বার বন্ধ করে এই সাঁওতালি রাজার কাছে জঙ্গলের মধ্যে আসা। গর্জন বিরক্ত বোধ করছিল, শশক তো স্পষ্টতই উসখুস করছিল।

দেখা গেল, রামকর্পূর বুদ্ধিমান লোক। তিনি এদের মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। সুতরাং আর বেশি কথায় গেলেন না, নাকের মধ্যে রুমাল দিয়ে আর-একবার সুড়সুড়ি দিয়ে শুরু করলেন, 'দেখুন গর্জনবাবু, আপনাকে আমি এখানে যে-জন্যে ডেকেছি, এবার সেটা বলব। ব্যাপারটা জরুরি, কিন্তু গোপন নয়। সকলের সামনেই বলব, সেটাই ভালো। আজ কিছুদিন হল, আমার মনে হচ্ছে যে, কেউ বুঝি আমাকে মারতে, খুন করতে চাইছে।'

খুন ব্যাপারটাও যে ডিগবাজির মতোই তুচ্ছ, এমনভাবে খুব সহজ স্বরেই কথাটা বললেন রামকর্পূর, কিন্তু গর্জন ব্যগ্র হয়ে বসল। শশকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, আর অন্য তিনজনও নড়েচড়ে বসলেন।

সুকুমারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'খুন করতে চাইছে?'

আর-একবার নাকে সুড়সুড়ি দিলেন রামকর্পূর 'ঠিকই সুকুমারবাবু, সেদিন রাত্রে যে আমার পড়ার টেবিলে অতবড় ঝাড়লণ্ঠনটা পড়ে গেল, বসে থাকলে তো সে-সময় আমারই থাকার কথা। দু-মিনিটের জন্যে বাথরুমে গিয়েছিলুম, হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে ঝাড়লণ্ঠনটা পড়ল একেবারে আমার চেয়ারের ওপর। অত বড় দেড়মনি ওজনের কাচের পাহাড়টা মাথায় পড়লে এই খুলিটা একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়োই হয়ে যেত।' একবার নিজেরই মাথায় খুব স্নেহভরে হাতটা বুলিয়ে নিলেন রামকর্পূর।

'কিন্তু সেটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, কাকা। এর মধ্যে খুন করার ব্যাপার তুমি পেলে কোথায়?'

রামলালের কথার উত্তরে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন গজেন্দ্রভানু, 'সাবেকি লোহার আংটা খুলে ঝাড়লণ্ঠন পড়ে কী করে? নিশ্চয়ই কারও কোনও বদ মতলব ছিল। আগে থেকে সময়মতো আংটাটা খুলে দিয়েছিল। খুব বেঁচে গেছে রামকর্পূর। সেদিন সেই অতগুলো সন্ন্যাসীকে খাওয়ালাম—তার জন্যেই আমার ভাগ্নের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।'

রামকর্পূর এসব কথার মধ্যে না গিয়ে যথারীতি নাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। কথা থামলে আবার শুরু করলেন, 'তারপর সেদিন সন্ধেবেলা বারান্দায় ডিগবাজি খেতে গেছি...।'

গর্জন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি ডিগবাজি খান কেন বলুন তো?'

রামকর্পূর যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন, 'কেন, আপনারা ডিগবাজি খান না! আপনার স্বাস্থ্য দেখে আমার তো মনে হয়েছিল খান। ডিগবাজি হল সেই ব্যায়াম, এতে ঘাড়, গর্দান, মাথা, পিঠ, মাজা, হাত, পা সমস্ত

অঙ্গের সঞ্চালন হয়। সকাল-বিকেল কুড়িটা করে ডিগবাজি দিতে পারলে, ওষুধে-ডাক্তারে পয়সা খরচ হয় না। সাঁতার, যোগব্যায়াম যাই বলুন, ডিগবাজির মতো কিছু নয়।'

গজেন্দ্রভানু বললেন, 'আমি তো এই সেদিন পর্যন্ত দৈনিক এক মাইল সাঁতার দিতাম। তারপর রামকর্পূরের কথামতো দুবেলা দশটা-দশটা ডিগবাজি দিয়ে বেশ ভালোই আছি।'

রামকর্পূর, গজেন্দ্রভানু—মামা-ভাগ্নে উভয়েরই স্বাস্থ্য এ-বয়সেও যথেষ্ট ভালো; গজেন্দ্রভানু সম্পর্কে মামা হলেও সম্ভবত রামকর্পূরেরই সমবয়েসি। রামদুলাল অবশ্য তেমন স্বাস্থ্যবান নয়, ডিগবাজির প্রসঙ্গে তার কিংবা সুকুমারবাবুর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। মনে হল, এরা দুজনের কেউই ডিগবাজি-ব্যায়ামে তেমন বিশ্বাসী নয়।

সে যা হোক, একটু পরে রামকর্পূর আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। রুমাল অতি সূক্ষ্ম করে নাকের মধ্যে ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, 'এই পরশুদিন সন্ধেবেলা বারান্দায় ডিগবাজি দিতে গেছি, দেখি শতরঞ্চিটা একটু সরানো। আমি প্রথমে কিন্তু খেয়াল করিনি। তারপরে হঠাৎ কী মনে হওয়াতে শতরঞ্চিটা টানতে গিয়ে দেখি শতরঞ্চিটার শেষে সিঁড়ির মাথার সর্ষের তেল অনেকটা পরিমাণ ফেলা...।'

'সর্ষের তেল?' শশক হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্ষের তেল আপনাদের এখানে পাওয়া যায়? আমার ছোট মাসিমা...।'

গর্জন এক গর্জনে শশককে থামিয়ে দিয়ে রামকর্পূরকে অনুরোধ করল, 'হ্যাঁ, তারপর বলুন?'

রামকর্পূর একটু থেমে খুব ধীর, শীতল দৃষ্টিতে একবার সুকুমারবাবু, একবার গজেন্দ্রভানু, আর-একবার রামদুলালের দিকে তাকিয়ে কী যেন স্টাডি করলেন, তারপর গর্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা বুঝলেন কিছু?'

গর্জন সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলল, 'না।'

রামকর্পূর যেন গর্জনের এ হেন বুঝবার ক্ষমতার অভাবে বিশেষ খুশি হলেন না। তিনি কিছুক্ষণ গুম মেরে রইলেন, তারপর বললেন, 'ডিগবাজি দিতে গিয়ে বহু সময়েই আমি ব্যালান্স না রাখতে পেরে শতরঞ্চির বাইরে গড়িয়ে পড়ি। এখন শতরঞ্চিটা সিঁড়ির মুখে সরানো আর সেখানটা তেল ঢেলে পিছল করে রাখা। মানে হল যে, ডিগবাজি দিয়ে হঠাৎ শতরঞ্চির বাইরে চলে এলে, এবং সেটা খুব অসম্ভব নয়, তৎক্ষণাৎ-ই সিঁড়ি পিছলে, এই খাড়া সিঁড়ি, ওই অবস্থায় গড়িয়ে একেবারে একতলায়, এবং খুব সম্ভব আরও গড়িয়ে পাঁচ ফুট নীচে বাঁধানো উঠোনে পড়ে যাব একতলার বারান্দা থেকে। নির্ঘাত মৃত্যু, কিন্তু হত্যা বলে প্রমাণ হবে না। সবাই বলবে...।'

রামকর্পূরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুকুমারবাবু বললেন, 'সবাই বলবে ছোটরাজা ডিগবাজি দিতে গিয়ে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে মরে গেছে।'

সব শুনে গর্জন একবার রামকর্পূরের দিকে তাকাল। কোনও উত্তেজনা নেই, রীতিমতো ঠান্ডা মাথায়, স্থিরভাবে ছোটরাজা তাঁর সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে অব্যাহতির বর্ণনা করলেন, কেবল যা একটু নাকের মধ্যে রুমাল দিয়ে ঘনঘন সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। সেটাই যদি চিত্তচাঞ্চল্যের কিঞ্চিৎ লক্ষণ হয়ে থাকে, সেটুকুই যা।

ঘরের মধ্যে শশক ছাড়া আর সবাই বেশ চঞ্চল এবং একটু সন্দিগ্ধও যেন হয়ে উঠেছে। শুধু শশক জলখাবারগুলো একটা-একটা করে বেছে-বেছে খাচ্ছে, শেষে একটা পরিতৃপ্তির হাই তুলে বলল, 'আর-এক কাপ করে চা হলে হত না?'

রামদুলাল বলল, 'নিশ্চয়।' বলে উঠে ভিতরের দিকে যাচ্ছিল।

রামকর্পূর সিং তাকে হাতের ইশারায় দাঁড় করালেন, তারপর বললেন, 'চা আবার এখুনি দিয়ে যাবে। তুমি বসো, জরুরি কথা হচ্ছে।'

রামদুলাল এসে বসল, রামকর্পূর একবার কী যেন ভেবে নিয়ে তারপর আবার ধীরে-সুস্থে কথা শুরু করলেন, 'তারপর গর্জনবাবু, আপনাকে যেজন্যে ডেকেছি। আমি বুঝতে পারছি, কেউ আমাকে খুন করতে

চাইছে। আমার বাপ মারা যান তাঁর উনত্রিশ বছর বয়েসে, তাঁর বাবা মারা যান ছাব্বিশ বছর বয়েসে, মানে এই রামদুলালের এখন যে-বয়েস সেই বয়েসে। আমার দাদা, মানে রামদুলালের বাবা, তিনিও মারা যান, যখন তাঁর বয়েস সাতাশ। সে-জায়গায় আমার এই সাতান্ন চলছে। সুতরাং বেশ কিছুদিনই বেঁচে আছি। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তিরিশ পেরুব না, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাস রোগটা আমাকে ছুঁল না, ভাইপোদেরও না। বোধহয় দাদার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

'সে যা হোক, যতদিন বেঁচে থাকা উচিত, তার চেয়ে বেশিদিন বেঁচে আছি, আর তা ছাড়া আমি বিপত্নীক, নিঃসন্তান, আমার বাঁচবার মোহও নেই। কিন্তু খুন হতে যাব কেন? আর কী এমন অন্যায় করেছি যে, খুন হতে হবে? তাই গর্জনবাবু, আপনাকে ডেকেছি যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু হদিশ করতে পারেন।'

রামকর্পূরের কথার জবাবে কোনও কিছু না বলে গর্জন 'বুদ্ধির্যস্য' গানটা গুনগুন করে ভাঁজতে লাগল। তারপর রামকর্পূরকে বলল, 'তাহলে এখন উঠি, নাকি কিছু বলার আছে আপনার?'

গর্জনের এই রকম আচরণে রামকর্পূর নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সকালের চায়ের আসল ভাঙল।

গর্জন সোজা উঠে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শশক ঘণ্টাখানেক এদিকে-ওদিকে টহল দিয়ে এল, তারপর গর্জনের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। গর্জন চোখ বুজে ছিল, সে চোখ খুলে শশককে বলল, 'কী খবর, শশক?'

'স্যার, ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন?'

'না।' বলে গর্জন পাশ ফিরে শুল।

আরও মিনিটপনেরো চুপচাপ। তারপর শশক বলল, 'রামকর্পূর বোধহয় আরও কিছু বলতে পারত।'

'তা পারত।'

গর্জনের সংক্ষিপ্ত উত্তরে শশক বলল, 'কিন্তু আপনি না-শুনে উঠে এলেন।'

'রামকর্পূরকে একটু ভাবতে সময় দিলাম। এতগুলো লোকের মধ্যে তার ওসব কথা তারই পক্ষে বিপজ্জনক। তার সন্দেহটা আর যাই হোক, খুব অমূল্য নয়। হয়তো এদের মধ্যেই সেই আসল হত্যাকারী রয়েছে। রামকর্পূর যা বলবে এদের সামনেই বলবে, হয়তো প্রকারান্তরে এদের সাবধান করতে চায়, হয়তো আসল লোক যে, সে বুঝতেও পেরেছে। সুতরাং, একটু ভেবে-চিন্তে না বললে ঘটনা সাংঘাতিক হতে পারে।'

শশক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাপারটা যেন বুঝতে চাইল, অথবা গল্পের এই জায়গাটা কীভাবে লিখবে ঠিক করতে প্লটটা মনে-মনে গুছিয়ে নিল। একটু পরে কীসব ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা স্যার, ওই গজেন্দ্রভানু মামাটা খুব সুবিধের নয়!'

এমন সময় বারান্দায় ঘাসের চটির আলতো শব্দ হল, দেখা গেল দরজায় স্বয়ং গজেন্দ্রভানু দাঁড়িয়ে। তিনি সোজা ঘরে ঢুকে বললেন, 'গজেন্দ্রভানু লোকটা অসুবিধের কীসের?'

গজেন্দ্রভানুর এই অভাবিত এবং আকস্মিক অনুপ্রবেশে শশক একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ল। গর্জন কিন্তু মোটেই বিচলিত হল না। সে সাদর অভ্যর্থনা জানাল 'গজেন্দ্রবাবু যে! আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিল।'

বলা বাহুল্য গজেন্দ্রভানু যথেষ্ট প্রসন্ন হলেন না। এ হেন আপ্যায়নেও তিনি তেতো গলায় বললেন, 'আমি লোকটা অসুবিধের কীসের?'

'আরে ওটা একটা কথার কথা। সারাবেলা দুজন অতিথি ঘরে ঠায় বসে আছি, আপনারা একবারও এদিক মাড়ালেন না। বাধ্য হয়েই বারান্দায় আপনাকে দেখে ওই একটা টোপ ফেলতে হল।' গর্জন স্মিত হেসে গজেন্দ্রভানুকে বসতে অনুরোধ করল।

গজেন্দ্রভানু বসে গজগজ করতে লাগলেন, 'আমার ভাগ্নেটার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'কী সাংঘাতিক কথা! কোন ভাগ্নে?' গর্জন উঠে বসল।

'কোন ভাগ্নে! আমার আবার ক'টা ভাগ্নে? দুটিই ছিল, এখন ওই কর্পূর।'

'কর্পূর মানে, রামকর্পূর?' এতক্ষণে শশকের গলা একটু খুলল।

'তা ছাড়া আর কে?' গজেন্দ্রভানুর পুনরুক্তি শোনা গেল, 'ডাহা খ্যাপা।'

'কেন, ওঁর কথাগুলো কি আপনার পাগলামির বলে মনে হয়?'

গর্জনের প্রশ্নের জবাবে গজেন্দ্রভানু জানালেন, 'তা ছাড়া আর কী? ঠান্ডা নির্বিবাদী মানুষ, যাকে বলে ভালোমানুষ। ওকে কে খুন করতে চাইবে? সব ওর বানানো, মনগড়া।'

গর্জন একটা হাই তুলে খুব শান্তভাবে বলল, 'ও, আমারও তাই মনে হচ্ছিল।' তারপর একটু থেমে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা গজেন্দ্রবাবু, এই সুকুমারবাবু সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

গজেন্দ্রভানু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'ছ্যাঁচোড়!'

শশক হেসে ফেলতে গিয়ে গর্জনের চোখ-রাঙানি দেখে সামলিয়ে নিল। গর্জন বলল, 'ধরুন, রামকর্পূরবাবুর ধারণাগুলো যদি সত্যিই হয়, তবে আমরা কি সুকুমারবাবুকে সন্দেহ করতে পারি?'

উত্তরে গজেন্দ্রভানু সংক্ষিপ্ততম হলেন, 'না।'

গর্জন 'কেন' জিজ্ঞাসা করতেই গজেন্দ্রভানু যেন খেপে গেলেন 'আপনারা ভাবেন কী? খুন করার কথা ভাবা কি সোজা কথা? ওই ছ্যাঁচড়টা করবে খুন?' তারপর তিনি গরগর করতে-করতে উঠে গেলেন।

গজেন্দ্রভানু বেরিয়ে যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যে রামদুলাল এসে ঘরে ঢুকল। একটুক্ষণ ভেবে-চিন্তে সোজা গর্জনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা গোয়েন্দা-বিভাগের লোক?'

'আজ্ঞে না, আমি দাঁতের ডাক্তার।' গর্জন জানাল।

'তাবে কাকা যে বললেন—' রামদুলাল যেন একটু বিচলিত।

শশকই এবার উত্তর দিল, 'ওই একটু গোয়েন্দাগিরিও করি। তবে সরকারি নয়, যাকে বলে শখের, পার্টটাইম।'

রামদুলাল কী যেন ভাবতে যাচ্ছিল, গর্জন ফস করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, গজেন্দ্রবাবু সুকুমারবাবুর ওপর খুব চটে আছেন মনে হল?'

রামদুলাল বলল, 'তার কারণ আছে।'

'কারণটা কী? অবশ্য আপনার বলতে যদি অসুবিধে না থাকে—।'

'না, অসুবিধে আর কী! এই তবে গজেন্দ্রবাবু, মানে দাদাবাবু, পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময়, এই কিছুদিন আগে, কাকার কাছে পাঁচহাজার টাকা চেয়েছিলেন। দাদাবাবুর ধারণা, ওই সুকুমারবাবুর মন্ত্রণাতেই কাকা টাকাটা ওঁকে দেননি।'

'আচ্ছা,' গর্জন একটু ঠোঁট কামড়াল 'সুকুমারবাবু সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? অবশ্য...।'

'অবশ্য-টবশ্য আবার কী মশায়! লোকটা একটা ছ্যাঁচড়।' রামদুলাল উঠে দাঁড়াল।

গর্জন একটু সামলে নিয়ে বলল, 'আপনিও কাকার কাছে কিছু টাকা-পয়সা চেয়ে পাননি নাকি ওঁর জন্যে?'

রামদুলাল একটা শুকনো উত্তর দিল, 'আপনার এত উৎসাহ কীসের মশাই?' তারপর কী ভেবে বেরিয়ে যেতে-যেতে ফিরে এসে বলল, 'আমি বিলেত যাব বলে দশহাজার টাকা চেয়েছিলাম কাকার কাছে। দাদা প্রত্যেক সপ্তাহে যেতে লিখছে। তা ওই সুকুমারবাবু কাকাকে ভাংচি দিল, গেলে নাকি আমি দাদার মতো মেম বিয়ে করব, বংশ নষ্ট হয়ে যাবে।'

রামদুলাল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল, গর্জন তাকে ঘরের ভিতরে আবার ডাকল, 'আর একটা কথা, আপনার কাকা মারা গেলে এ-সম্পত্তি তো আপনারই প্রাপ্য।'

'কাকা বেঁচে থাকলেও দাদার ভাগ আর আমার ভাগ মিলে বাবার অংশের অর্ধেক আমার এখনই প্রাপ্য। তবে আপনি যা ভাবলেন, আমাদের সংসারে সেসব কোনও গোলমাল নেই। কাকা গার্জিয়ান, আমাদের

নাবালক থেকে সাবালক করেছেন, তার ওপরে মা বেঁচে আছেন, এসব ভাগাভাগির কথা আমরা মোটেই ভাবি না।'

'না, না, আমি সেটা মিন করিনি।' গর্জন তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। রামদুলাল চলে যায়।

রামদুলাল অন্তর্হিত হওয়ার পরে গর্জন কিছুক্ষণ গুনগুন করে 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' গাইল। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল, একসময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল শশক কখন ঘরের বাইরে চলে গেছে। এ-ঘরের উলটোদিকে উঠোন পেরিয়ে সোজাসুজি যে-ঘরটা, সেটাই বোধহয় কাছারি-বাড়ি। কাছারি-বাড়ির বারান্দায় শশককে দেখা গেল। গর্জনও সেই দিকে এগোল।

কাছারি-ঘরের ভিতরে বসে সুকুমার বসু কীসব কাগজপত্র দেখছেন। গর্জন শশককে ইশারা করে কাছারি-ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। শশক একটু বিব্রত বোধ করছিল, তারও ইচ্ছে সুকুমার বসুর সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলে। এখানে আসার পরে সুকুমারবাবুই যা একমাত্র বাঙালি। সুকুমারবাবু দু-একবার বারান্দায় তাকে লক্ষ করেছেন, কিন্তু ভিতরে আসতে বলেননি। কিন্তু গর্জনকে বিনা অনুমতিতে ঢুকতে দেখে সেও ঢুকে গেল।

তাদের দুজনকে দেখে সুকুমার বসু মাথা তুলে খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'বসুন।' কিন্তু ওই পর্যন্তই, আর কোনও কথা নয়, আবার কাগজপত্র দেখতে লাগলেন।

প্রথমে শশকই কথা বলল, 'এখানে খুব শীত।'

সুকুমার বসু দলিল পরীক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হলেন।

গর্জন বলল, 'তেমন কিছু নয়।'

সুকুমার বসু এবার বললেন, 'হুঁ।'

গর্জন আর অপেক্ষা না করে জানলা দিয়ে অত্যন্ত উদাসীনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে বসল, 'আচ্ছা সুকুমারবাবু, আপনি কি জানেন রামকর্পূরবাবু, তাঁকে যারা খুন করতে পারে বলে সন্দেহ করেন, তাদের মধ্যে আপনিও একজন?'

সুকুমার বসু বললেন, 'তা হতে পারে।' খুব কঠিন চোখে তাকিয়ে নিলেন একবার 'তা আগে খুন হোক তো!'

গর্জন শশককে ডেকে বলল, 'চলো।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে পায়চারি করতে গেল।

সাঁওতাল পরগনার গণ্ডগ্রাম। কয়েক ঘর বিহারি চাষাভুষো আর অধিকাংশ সাঁওতাল। দ্রষ্টব্য কিছু নেই। একটু পরেই দুজনের খুব একেঘেয়ে মনে হল। এখনও কাহিনির মূল অংশের দেখা নেই, শশক ভাবতে লাগল, এখনও গল্পের ম্যাটার কিছু হল না, আর হবেও না। যত্তোসব উলটোপালটা ব্যাপার।

'কবে ফিরতে পারব বলে মনে হচ্ছে, স্যার?'

শশকের প্রশ্নে গর্জন বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না,' তারপর কীসব হিসাব করে বলল, 'ঠিক আছে, চব্বিশ ঘণ্টা টাইম দাও।'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কী হবে, স্যার?'

'কিছু হলে হল, না হলে তো ফিরবই। না হওয়াই ভালো। কিন্তু ব্যাপার সুবিধের নয়। রামকর্পূর লোকটা মোটেই বোকা বা খ্যাপা নয়।'

'আপনি বলছেন, স্যার, রামকর্পূর খুন হতে পারে?'

'তা পারে।'

'তাহলে আমরা?'

'দেখি আমরা কী করতে পারি।'

দুপুরে খাওয়ার ঘরে আবার সকলের একসঙ্গে দেখা হল। রামকর্পূর এবার যেন আরও স্পষ্টভাষী। রামদুলাল, গজেন্দ্রভানু, সুকুমার বসু তিনজনেরই সামনে বসে তিনি স্পষ্টই বললেন যে, তিনি যে এতকথা বলছেন, তার কারণ হল, তিনি কিছু ঢাকাঢাকি পছন্দ করেন না। এদের তিনজনকেই তাঁর অল্পবিস্তর সন্দেহ। গজেন্দ্রভানুকে পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময় টাকা দেননি, ভাইপোকে বিলেত যাওয়ার অনুমতি বা রসদ কিছুই দেননি, এদের তাঁর ওপর রাগ থাকতে পারে, আর রামকর্পূর সোজাসুজিই বললেন, রাগের মাথায় খুন করা একটা সাধারণ ব্যাপার। সুকুমার বসুর প্রসঙ্গে বললেন, জমিদারি গেছে কিন্তু এস্টেটটা যাতে উঠে না যায়, তাই তিনি প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে একটা টাস্ট তৈরি করেছেন, তিনিই তাঁর টাস্টি, অবশ্য তাঁর অবর্তমানে সুকুমারবাবুই টাস্টি হবেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে এত বড় একটা এস্টেট সুকুমারবাবুর পরিচালনাধীনে চলে আসবে, এই স্বার্থ খুন করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে।

গজেন্দ্রভানু এবং রামদুলাল দুজনেই রামকর্পূরের বলার ধরন্ধারণে অস্বস্তি বোধ করছিল, আর অস্বস্তি বোধ করারই কথা। তবে রামকর্পূর সম্ভবত আজীবন এইভাবেই কথা বলে এসেছেন, তাই কাউকে খুবই বিচলিত দেখাল না।

খেতে-খেতে বিশেষ আর কোনও কথা হল না। শুধু সুকুমারবাবু একবার বললেন, 'একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেল।'

শশক আর গর্জনের পক্ষে খাওয়া একটু বেশিই বটে। এত খাওয়ার পরে শশক যখন আর-একবার দই চাইল, গর্জন যেন একটু বিরক্তই বোধ করল। সে কটু চোখে শশকের দিকে তাকাতে গেল, তখন হঠাৎ শশকের ডান পাশেই বসেছিলেন রামকর্পূর, তাঁর দিকে গর্জনের দৃষ্টি পড়ল। তিনি কেমন যেন একটু অস্থির, ছটফট করছেন।

'কী হল আপনার?' রামকর্পূরের আর-এক পাশে বসেছেন সুকুমার বসু। তিনিও লক্ষ করেছেন। তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছি। বোধহয় কিছু নয়, খাওয়া বেশি হয়ে গেছে বলেই। ঠিক আছে, আপনারা ভাববেন না।' রামকর্পূর বললেন। কিন্তু গলার স্বর কেমন ভাঙা-ভাঙা।

'না, এ তো ভালো লক্ষণ নয়,' বলে গর্জন উঠে দাঁড়াতেই রামকর্পূর খাওয়ার টেবিলেই টলে পড়লেন।

গর্জন রামদুলালকে বলল, 'আপনি চট করে একজন ডাক্তার ডাকুন তো!'

ডাক্তার বলতে তিন মাইল দূরে এক হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ। ঘণ্টাদেড়েক পরে তিনি এসে যখন পৌঁছলেন, তার আগেই রামকর্পূর যে বেঁচে নেই...এ-বিষয়ে সবাই নিশ্চিত হয়ে গেছে।

রামকর্পূর সত্যি-সত্যি মারা গেলেন। হার্টফেল, না খুন? খুন হল গর্জনের চোখের সামনে, খাবার টেবিলে, পরিষ্কার দিনের আলোয়।

পোস্টমর্টেমে কিছু বেরোল না। জেলা সদর থেকে পুলিশ এল, সব খাবার রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা হল। না, বিষ-টিষের কোনও বালাই নেই। আর বিষ থাকলে, একই পাত্র থেকে সবাই নিজের-নিজের প্লেটে খাবার তুলে নিয়েছে, রামকর্পূর তার মধ্যে হঠাৎ মারা যেতে যাবেন কেন?

এসব অবশ্য অনেক পরের সংবাদ। রামকর্পূরের মৃত্যুর দিন বিকেলেই গর্জন আর শশক কলকাতায় চলে আসে।

'আমাদের আর কিছু করার নেই।' এই বলে গর্জন শশককে নিয়ে রওনা হয়েছিল।

শশক শুধু একবার বলেছিল, 'কিন্তু স্যার—।'

'আর কিন্তু-টিন্তু নয়, এবার ফেরো। এ-যাত্রায় আমরা হেরে গেছি।' গর্জন কলকাতায় ফিরে ময়না তদন্তের একটা রিপোর্ট আনিয়েছিল। রিপোর্টে ছিল হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে রামকর্পূর মারা যান—হার্টফেলই বলা যায়।

কলকাতায় ফেরার দিনসাতেক পরে গর্জন শশককে বলল, 'তুমি সুকুমারবাবুকে একবার কলকাতায় আসতে বলো।'

'সুকুমারবাবু কি আসবেন, আর কেনই বা আসবেন?'

শশক জানতে চাইলে গর্জন এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তিনি এতই বুদ্ধিমান যে, না এসে পারেন না।'

সত্যিই সুকুমারবাবু এলেন। চেম্বারে তখন গর্জন আর শশক। সুকমারবাবু আসার পর গর্জন তাঁকে বলল, 'আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে, খুবই সামান্য ব্যাপার, যদি কিছু মনে না করেন—।'

'কী প্রশ্ন?' সুকুমারবাবু জানতে চাইলেন।

গর্জন পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বলল, 'আচ্ছা, এই রুমালটা কি আপনার?'

সুকুমারবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে এতদূর ডাকিয়ে এনে রসিকতা করছেন কেন?'

'ব্যাপারটা যে মোটেই রসিকতা নয়, আপনি ভালো করেই জানেন। শুধু হ্যাঁ কিংবা না বলুন।' গর্জন এই বলে সুকুমারবাবুর মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুকুমারবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন 'যদি আমারই হয়, তাতেই বা কী?'

'তাতে কিছু নয়, তবে আপনাকে রামকর্পূর সিংয়ের হত্যার অপরাধে পুলিশে চালান দিতে পারি।'

গর্জনের কথা শুনে একটু হেসে সুকুমারবাবু বললেন, 'আপনার পাগলামিকে নমস্কার। এবার আসি।' সুকুমারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার আগেই সুকুমারবাবু গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে পুলিশের লোক দরজার বাইরের দিকে আগেই অপেক্ষা করছিল। গর্জন আগেই সেটার আয়োজন করেছিল।

ঘটনা এখানেই শেষ। কিন্তু শশক গল্প লেখে, তার গল্পের সুতো এখানে সে মেলাতে পারছে না। গর্জনকে যখনই সে এ-বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করে, গর্জন গুনগুন করে, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য...।'

সুতরাং কাহিনির রহস্য উদঘাটনের জন্য শশকের ওপর আর নির্ভর করে লাভ নেই। গর্জন বেশ কিছুদিন পরে রামদুলালকে এ-ব্যাপারে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা ইংরেজিতে। তার তর্জমা করে তবেই এ-হত্যা-রহস্যের গতি করা গেল।

প্রিয় রামদুলালবাবু—

আপনার খুল্লতাত আমার সম্মুখেই খুন হইয়াছিলেন, ইহা সেই মুহূর্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করিতে আমার কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। তাহা ছাড়া যে-প্রক্রিয়ায় তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা আপনাদের দূর গণ্ডগ্রামে বসিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। ঘটনাটি আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল, আমি নিজে উপস্থিত থাকিয়াও ঠেকাইতে পারি নাই, ইহা আমার গভীর পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়।

সুকুমার বসু অতি ধুরন্ধর প্রকৃতির ব্যক্তি। প্রয়োজনে পড়িয়া এবং বিষয়-সম্পত্তির প্রয়োজনে আপনার খুল্লতাত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বস্তুত সুকুমার বসুই তাঁহাকে জমিদারি গ্রহণের পর সরকারের ঘরের নানা হাঙ্গামা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর রামকর্পূর এতই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিশ্বাসবশতই হউক বা সুকুমার বসুর কোনও কৌশলেই হউক রামকর্পূরবাবুর অবর্তমানে তিনি আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির টাস্টি নিয়োজিত হন।

এত বড় সম্পত্তি রামকর্পূরবাবুর অবর্তমানে তাঁহারই দখলে আসিবে, এই লোভ সুকুমারবাবুর মতো ব্যক্তির পক্ষে কিছু কম ব্যাপার নয়। এই কারণেই আপনার বিলাত যাত্রার খরচ বা শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রবাবুর নির্বাচনী খরচের ব্যাপারে তিনি বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, এই টাকা চলিয়া গেলে তাঁহারই যাইবে। কেননা, রামকর্পূরকে সরাইবার পন্থা তিনি ইতিমধ্যেই স্থির করিয়াছিলেন।

আপনার খুল্লতাত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কিছু-কিছু অনুমান করিয়াছিলেন। ঝাড়লন্ঠন খুলিয়া পড়া বা ডিগবাজি দিবার শতরঞ্চির পাশে তেল পড়িয়া থাকা কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং হত্যার প্রচেষ্টাও হইতে পারে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সুকুমারবাবুকে সন্দেহও করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবত মনে-মনে স্থির করিয়াছিলেন টাস্টির বদল করিয়া সুকুমারবাবুকে পদচ্যুত করিবেন।

সুকুমারবাবু এই সময়টুকু দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁহার হত্যার পদ্ধতিও খুব সরল। হত্যাকে দুর্ঘটনার আকারে দেখাইতে পারিলেই তাঁহার কার্যোদ্ধার হয়। তিনি রামকর্পূরবাবুর ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অভ্যাস থাকে—সেগুলিকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কৃতিত্ব।

রামকর্পূর একটা বিশিষ্ট সময়ে তাঁহার স্টাডিতে বসেন, সেই সময়ে ঝাড়লণ্ঠন তাঁহার মাথায় খুলিয়া পড়িতে পারে। তিনি ডিগবাজি দিতে পিছলাইয়া একতলায়ও পড়িতে পারেন। কিন্তু সুকুমারবাবুর উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

ইতিমধ্যে আমরাও গিয়া পৌঁছাইলাম। রামকর্পূরবাবু প্রকাশ্যেই সকলকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সুকুমারবাবু বাধ্য হইয়াই...যাহাকে বলে ডেসপারেট হইয়া পড়িলেন। তিনি এইবার একটি অতি আধুনিক পন্থা উদ্ভাবন করিলেন।

সুকুমারবাবু উকিল, কিন্তু তাঁহার স্ট্যাম্পে দেখিয়াছিলাম, তিনি এম.এ., বি.এল. নন, এম.এসসি., বি.এল.। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে তাঁহার বিষয় ছিল ফলিত রসায়ন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসরের গেজেট দেখিয়া সুকুমারবাবু সম্পর্কে এই জ্ঞানটুকু আহরণ করি। রামকর্পূরবাবুকে হত্যা করিতে সুকুমারবাবু তাঁহার অর্জিত শিক্ষা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ডিজিটালিস গ্রুপের কোনও বিষ নিশ্বাসে প্রবেশ করিলে শ্বাসক্রিয়া দ্রুত হইয়া মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। তদুপরি পোস্টমর্টেমে এই বিষ আবিষ্কার অতি অসম্ভব।

রামকর্পূরবাবুর একটি বদভ্যাস ছিল তিনি রুমাল বা ধুতির খুঁট পাকাইয়া সূক্ষ্ম করিয়া নাকে সুড়সুড়ি দিতেন। হত্যার দিনে সুকুমারবাবু রামকর্পূরবাবুর একপাশে বসিয়াছিলেন। সবাই তখন খাইতে ব্যস্ত—তিনি সকলের অগোচরে রামকর্পূর তাঁহার যে-রুমালটি টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন, তাহা পালটাইয়া দেন নিজের পকেটের একটি রুমাল রাখিয়া। এই দ্বিতীয় রুমালটির প্রতি কোণে ডিজিটালিস মাখানো ছিল। নাকে দিয়া শুঁকিবার কিছু পরেই রামকর্পূর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মৃত্যুর সময় আমি লক্ষ করি, রামকর্পূরবাবুর কোলের উপর একটি রুমাল পড়িয়া রহিয়াছে। আমি উহা পকেটস্থ করি। তাহার পর এখানে আসিয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এদিকে সুকুমারবাবুকে আসিবার জন্য চিঠি দিই, ওদিকে আপনাদের থানায় তাঁহার অসাক্ষাতে সমস্ত জিনিস সিজ করিতে কলিকাতা পুলিশ মারফত অনুরোধ জানাই।

সুখের বিষয়, তাঁহার জিনিসপত্রের সঙ্গে রামকর্পূরবাবু যেরকম রুমাল ব্যবহার করিতেন, তাহাও একটি পাওয়া গিয়াছে। এই সামান্য প্রমাণে সুকুমারবাবুর সাজা হইবে কি না জানি না, তবে জিনিসটির জটিলতা আমি ভেদ করিতে পারিয়াছি ইহাই আমার আনন্দ।

আপনারা আমার শুভেচ্ছা জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়
গর্জনকুমার বসু
মাসিক রোমাঞ্চ
জানুয়ারি, ১৯৬৬



সচকখে দেখা

মণি বর্মা

সম্পাদকমশাই!

আপনাদের বাড়ি সেদিন বিজলি বাতির তার সারাতে গিয়ে শুনলুম আপনারা ভূত নিয়ে খুব তক্কাতক্কি করছেন। কাজের তাড়া ছিল বলে সেদিন কিছু বলিনি—আজ লিখছি মশাই, ভূত আমি দেখেছি। মেয়ে ভূত। অবিশ্যি দেখার সময় বুঝিনি। বুঝলে যে কী হত, সেটা, আপনারা কাগজ চালান—আপনারাই লোককে লিখে জানাবেন।

পেত্যয় হচ্ছে না? আমি দিব্বি গেলে বলছি মশাই, ভূত ছাড়া সে আর কিচ্ছু হতে পারে না। আর সেই বাবুমশায় যে কী করে তার পাশে বসেছিল! অ্যাদ্দিন পরে ভাবতেও গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

গল্পটা বণ্ণনা কচ্ছি—তবে লিখিয়ে নই তো, মশাই। ভুলচুক হলে শুধরে নেবেন। আপনারা হচ্ছেন শিক্ষিত, আর লেখাপড়ায় তো আমি 'গয়া গঙ্গা গদাধর'। হবে কোত্থেকে! বারো বছর বয়েস থেকেই কাজে ঢুকিছি। হাতের কাজ। ইলেকটিরিক মিস্তিরির সাকরেদ। তাও কি হেথায়? সেই যার নাম গিরিডি—যেখানে আপনাদের মতো অনেক বাবু হাওয়া বদলাতে যান। না গিয়েই বা কী করতুম বলুন। একপাল ছেলেমেয়ে রেখে পিতা ঠাকুর তো চোখ বুজল। বিধবা মা আর ক'টা পেট ভরাবে? তবু তখন ছ'পয়সা দিলে একসের চাল মিলত।

অনেক দিন আগের কথা তো! গিরিডি তল্লাটে তখন সবেমাত্তর ইলেকটিরিক গ্যাছে। কিন্তু লোকের যে ডালভাতের মতন বিজলি বাতি ছাড়া চলবে না, আমার মনিব গণেশ শাঁপুই সেটা বুঝে ফেলে এক দোকান ফেঁদে বসেছিল। ঘুণ লোক মশাই! দোকানও দিন-দিন বাড়ে, শাঁপুইমশাইও গায়ে-গতরে বাড়ে। পেটটাই মোটা হয়ে গেল জয়ঢাকের মতন। চারদিকে কাজ। সেই দূর-দূর খনি পযযন্ত। না, না কয়লার খনি নয়—অভভরের।

আট বচ্ছর কেটে গ্যাচে তখন। আমি মশাই মিস্তিরি হয়েচি। দূর-দূরের কাজে শাঁপুইমশাই আমাকেই পাঠাতেন। আমারও খুব ভালো লাগত। বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, পাহাড়ি নদী পেরিয়ে নতুন-নতুন জায়গা দ্যাখা। আর তো কোনও নেশা কী আনন্দ ছিল না, মশাই। ওই যে আপনারা ভালোবাসার কথা বইয়েতে লেখেন, ওসব আমি বুঝতুম না। আর চর্চা করবার সময়ই বা কখন বলুন?

এমনি একবার ডাক এল কিশেনগাঁও থেকে। লালাজি আমার মনিবের পুরোনো খদ্দের। আট-দশ বচ্ছর আগে শাঁপুই মশাই-ই তার বাড়িতে বিজলির তার ফিট করে দেয়। তবে সত্যি কথা বলছি, মশাই, মনিব আমার লোক ভালো হলে কী হবে, মিস্তিরি হিসেবে কাঁচা। কিছুদিন ধরেই লালাজি পত্তর দিচ্ছিল তার বাড়ির লাইন সব খারাপ হয়ে গ্যাচে। টুকরো-টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়চে। লোক পাঠিয়ে যেন সারিয়ে দেওয়া হয়। পরথম-পরথম বেশ নরম সুর। কিন্তু শাঁপুইমশাইয়ের গা যখন কিছুতেই ঘামল না, তখন গরম-গরম চিঠি আসতে লাগল। সারা বাড়িতেই নাকি আবার পিদিম আর কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালাতে হচ্ছে। এমনি টানাপোড়েন কিছুদিন ধরেই চলছিল।

লালাজির নাম ওই পরথম শুনলুম। ওর নাকি ট্যাকসি কী যেন—ওই মটরগাড়ির না কীসের যেন ব্যবসা ছিল। বেশ মোটামুটি টাকাও নাকি করেচে। অবিশ্যি মটরগাড়ির কীরকমের ব্যবসা আমার ঠিক মনে নেই—ভাড়া দেওয়া-টেওয়া হবে আর কী। যাকগে, মনে পড়লে পরে লিখব।

কিশেনগাঁওয়ে আমি কেন গেলুম, সেইটেই বলি। একটা বড় কাজ ওখানে ক'দিন ধরেই হচ্ছিল। সেটা শেষ হলেই শাঁপুইমশাই-এর হুকুম হল আমার ওপর, লালাজির ওখানে যেতে। এক ঢিলে দুটো পাখি মারা, বুঝলেন না? কেপ্পন তো!

আমিও শাঁপুইমশাইকে বলে দিলুম বড় কাজটা শেষ করে যখন ফুরসত হবে, তখন লালাজির ওখানে যাব—তখন সনধেই বা কী, আর রাতদুকুরই বা কী! পষ্ট কথায় কষ্ট নেই মশাই।

লালাজিও লিখে পাঠাল, আমার যখন খুশি যেতে পারি। কাজটা হলেই হল। ভুগছে তো কম দিন নয় বেচারা!

কিশেনগাঁওয়ে বড় কাজটা যখন মিটল, তখন সনধে উতরে গ্যাচে। অ্যাকে হাড়-কাঁপানো শীত, তার ওপর ঝিরঝিরে বিষ্টি! বুঝুন ঠ্যালা! লালাজির ওখানেই বা কতক্ষণ লাগবে, কে জানে! শেষ হলেই আবার ফিরতে হবে গিরিডিতে। সেও তো অ্যাক পহরের পথ।

লালাজির বাড়িতে পৌঁচে দরজা ধাক্কাতে লাগলুম। বাড়ি বলব, না করবখানা? কোথাও ছিটেফোঁটা আলো নেই, লোকজনের সাড়াসব্দ নেই। দরজা-জানলা সব নিপ্পিস করে বন্ধ। চারদিকে ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলো হাওয়ায় উলুটিপালুটি খাচ্চিল। পেছনের খাড়া পাহাড়টাকে মনে হচ্চিল, মশাই, সেই যাত্তারায় দেখা বামন অবতার। বলিরাজা বাড়িখানার মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনারা লেখক বলেই তুলনাটা দিলুম। আমার তখন ঠিক সেইরকমই মনে লেগেছিল। আর সত্যি বলতে কী গা-টাও ছমছম করছিল।

কতকখন ধরে দোর ঠেলাঠেলি করেছিলুম, বলতে পারব না। হঠাৎ চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল লালাজি। না মশাই, আগে ককখোনো দেখিনি। সেই পরথম দেখলুম, আর দেখেই ভিরমি যাই আর কী! ইয়া দশাশই চেহারা। মুখে পুরুষ্টু গোঁফ। চোখ দুটো অন্ধকারের ভেতরও যেন জ্বলছিল। হাতে একটা মিটমিটে কেরোসিন-বাতি। দোরটা একচিলতে ফাঁক করে জানতে চাইল আমি কে, কোত্থেকে আসছি, কী দরকার?

টাকা আছে বলেই বোধহয় অত ভয়। আমি গণেশ শাঁপুইয়ের কাছ থেকে মিস্তিরির কাজ করতে এসেছি শুনে তবে লালাজি সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে দিল। কিন্তু সত্যি বলচি, মশাই, না ঢুকলেই বোধহয় ভালো হত। ভেতরে পা দেবার সংগে-সংগে এমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে নাকে লাগল! আর কী কনকনে ঠান্ডা মশাই! যেন বরপের ঘর। এর চেয়ে বাইরে ঢের কম ঠান্ডা! সত্যি বলচি, আমার মনে হল বাড়ির সরবত্তর একটা পেরেতের নিশ্বাস বইচে।

একটা লন্ঠন নিয়ে আগেই রান্নাঘরের কাজ সারতে ঢুকলুম। যা ভেবেছিলুম। শাঁপুইমশাইয়ের কেরামতিতে বিজলির তারগুলো সব খসে-খসে পড়েচে। তবে সত্যি কথা বলতে সবটাই শাঁপুইমশাইয়ের কেরামতি নয়, বাড়িখানার কেরামতিও আছে। ড্যামপে চুনবালি সব খসে-খসে পড়েচে। নোনাধরা ইঁটগুনো সব দাঁত বার করে যেন হাসচে।

নতুন করে তার টানা ছাড়া উপায় নেই। দুগগা বলে তাই টানতে লাগলুম, আর আমার পেচনে লালাজি পরসব-বেদনা ওঠা মুরগির মতো ঘুরঘুর করতে লাগল।

হাত চালালুম, মশাই, যেন যন্তর। তাড়াতাড়ি ফিনিস করে আবার গিরিডি ফিরতে হবে তো! বললে বিশসাস করবেন না মশাই, একঘণ্টার মধ্যেই রান্নাঘর, সিঁড়ি, ওপরতলার যেখানে যা করবার সব করে ফেললুম। বাকি রইল শুধু বাইরের ঘরটা। লালাজিকে বললুম, 'এবার ওটায় হাত দিতে হয়।'

'বাইরের ঘরে।' লালাজির গলাটা কেমন যেন বেলোটিং কাগজের মতন খসখসে হয়ে উঠল : 'হ্যাঁ...তা...হাত দিতে হবে বইকি।'

তবু দাঁড়িয়ে রইল। মনে-মনে কী যেন ভাবতে লাগল। তাগাদা দিলুম 'কই চলুন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে...।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...বাইরের ঘরটা...তা করতে তো হবেই...এসো, এইদিক দিয়ে এসো...।'

তার পেছন-পেছন চললুম। দরজার সামনে এসে কিন্তু লালাজি দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকাল—যেন আমায় কিছু বলতে চায়। তারপরই বোধহয় মত বদলে শুধু দোরটা খুলে ধরল।

ঘরটা বেশ বড়ই। কিন্তু, মশাই, ভেতরে পা দিতেই এমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এল যে, দম বন্ধ হয়ে যাই আর কী। কীসের মতন গন্ধ? বলতে পারব না, মশাই। কপ্পুরের সনগে রসুন ঘোষলে যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। মোটকথা গন্ধটা নাকে গেলেই পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে ওঠে। আর সেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। সারা গায়ে কে যেন বরপের চাঁই চেপে ধরেচে। আচ্ছা, অত ঠান্ডা কেন বলুন তো? ইদিকে ঘরে ত 'বড়সি' জলা ছিল। বড়সি জানেন তো? মাটির গামলার মতন—বেহার দেশে শীতকালে তাতে আগুন করে, ঘর গরম রাখবার জন্যে। সেই বড়সির ওপর দিয়ে ঘরের ওদিকে তাকাতে গিয়েই বুকের রক্ত আমার হিম হয়ে গেল। ধুকপুকুনিটাও থেমে গেছল বুঝি। এমনটা হওয়ার যুকতি কিন্তু সত্যিকার ছিল না। হয়তো ভেবেছিনু বাড়িতে লালাজি ছাড়া দিতিয় পেরানি কেউ নেই। যতকক্ষন কাজ করেচি, আর কাউকে দেখিওনি, টুঁ শব্দটিও পাইনি। বললে না পেত্যয় যাবেন, মশাই, দেখলুম কী, বড়সির ওপাশে একজন মেয়েছেলে বসে। বলবেন তাতে আর বুকে ধাককা খাবার কী হল? ব্যাখখা করে বোঝাতে হবে? আপনারা তো লেখক, লোকের নাড়ি টিপে মনের খপর টের পান। আমারটাও এতকখন নিশ্চয় পেয়েচেন। সোজা কথায়, মেয়েছেলেটার দিকে নজর পড়তেই আমার মনে হল ঘরের হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা আর ঝাঁঝালো গন্ধ সব ওর জন্যেই।

বয়েস হবে তার লালাজির চেয়ে আট-দশ বছর কম। হাড় বের করা জিরজিরে চেহারা। পরনে কালো সাড়ি, কালো সেমিজ। হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করে, সোজা হয়ে একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বোসে। আবার হাঁসছিল, মশাই। না, আমায় দেখে নয়—আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। নাকের সোজা তাকিয়েছিল—তাকিয়েই রইল। নোড়ল না—ফিরল না—ইসপিকটি নট। কমজোরি আলোয় মুখখানা আমি, মশাই, ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি, কিন্তু কেমন জানি মনে হল—হায় ভগবান, কী করে বোঝাব—সে আসলে মানুষ নয়। আমি হলপ করে বোলতে পারি তার গায়ে রক্ত-মাংসো নেই। নইলে অত রোগা মানুষ অত ফরসা হয়? রং-এর কী জেল্লা মশাই! সেই দেখেই তো বুকের মধ্যে আমার ধকাস করে উঠেছিল।

লালাজি আমার পেছন-পেছন ঘরে ঢুকেছিল। কাঁধের কাছে মুখ এনে চাপা-চাপা গলায় বলল, 'আমার জরু হে—বউ।'

রকখে করো ভগবান! টিপটিপে বুকে লালাজির বউয়ের দিকে তাকিয়ে নোমসকার করলুম। বললুম, 'নমসতে ভৌজি!'

ভৌজি তেমনি কাঠ হয়ে বসে রইল। ফিরলও না, কথাও বলল না। সত্যি কথা বলছি, মশাই, তখন একটু ঘাবড়েই গেলুম। জিভটা যেন শুকিয়ে উঠল।

পেছনে দাঁড়িয়ে লালাজি হাসল কী কাঁদল জানি না। ঘোড়ার মতো হে-হে করে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, ছোকরা। আমার জরু...' ঠেক খেয়ে গেল লালাজি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'নাও—নাও—চট করে তোমার কাজ সেরে নাও।'

বলে মশাই লালাজি গিয়ে তার বউয়ের পাশটিতে বসল। কানের গোড়ায় মুখ এনে খুব চেঁচিয়ে বলল, 'শুনচ গো! এ-ছোকরা হচ্চে ইলেকটিরিক মিস্তিরি। তার সারাতে এসেচে। আলো ঠিক হয়ে গেলে তবে তোমায় ভালো করে দেখতে পাব।'

আদরের হাসি হেসে উঠল লালাজি টেনে-টেনে। বউ কিন্তু নড়লও না চড়লও না। তেমনি নাকের ডগায় তাকিয়ে বসে রইল। তখুনি মশাই, সিকার করছি, গা-টা আমার সিরসির করে উঠল। বুকের ভেতরে ধানাই-পানাই হচ্ছিল। আমি ভিতু নই, মশাই। ওখানে তখন থাকলে আমি দিব্বি গেলে বলতে পারি, আপনাদেরও হত।

তবু কাজ তো করতে হবে। আর না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগলুম, আর লালাজি ঠায় আমার দিকে তাকিয়ে রইল সনদেহের চোখে। পেছনে ফিরে থেকেও সেটা টের পাচ্ছিলুম। যদি ফিরি ওমনি টেনে-টেনে হাসবে। কী ঝকমারির কাজ মাইরি! নাকে সেই ভ্যাপসা, পচা গন্ধ—যেন গন্ধক পুড়িয়েচে। শীতে হাত-পা আড়ষ্ট। সেও সইছিল, মশাই, কিন্তু ওই যে মেয়েছেলেটা ঠায় একরকম করে বসে আছে—নট নড়ন-চড়ন। একটু যদি নড়ে বসত শুধু। কথা বলে কাজ নেই—হয়তো খোনা সুর বেরুবে। শুধু একটু নড়ে বসুক। আর সেই বিদঘুটে হাসিটা। বড়সির আগুনের আলোয় কেমন যেন...ইস! লালাজি যে কী করে পাশে বসে আছে!

বুকে হাত দিয়ে বলছি, মশাই, এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছিল যন্তরপাতি ছুঁড়ে ফেলে ছুটটে পালাই—যেখানে হোক—শুধু এই ভুতুড়ে বাড়ি থেকে।

কাজ একসময় শেষ হয়ে গেল। অত শীতেও কপাল দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। লালাজিকে বললুম, 'কাজ হয়ে গ্যাচে। অ্যাকবার সুইচ টিপে দেখি আলো ঠিক জলচে কি না, তারপর ছুটি।'

লালাজি যেন আঁতকে উঠল। হাঁ-হাঁ করে বলল, 'না—না—আলো জালাতে হবে না। ও ঠিক আছে—আমি বলচি সব ঠিক আছে।'

'আমাদের দসতুর মশাই অ্যাকবার জেলে দ্যাখা।'

'বলচি দরকার নেই। তোমাকে আর মিসতিরিগিরি ফলাতে হবে না। সব ঠিক আছে—' লালাজি ধমকাল, না কেঁদে ফেলল—বুঝতে পারলুম না, মশাই। আমার সামনে তার সে কী দাপাদাপি! তারপরই বউয়ের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'মিসতিরির কাজ শেষ হয়ে গ্যাচে গো। এবার যাবে ও।' কথার পর সেই টেনে-টেনে হাসি।

বউয়ের সাড়াও নেই, সবদও নেই। আমি তখন, মশাই, যনতরপাতি থলিতে ভরে ফেলচি।

এবার লালাজি আমাকে বলল, 'শাঁপুইকে বলো বিল পাঠিয়ে দিতে, টাকা দিয়ে দোব।'

কে কার কথা শোনে! সদর দোর খুলে তখন বাইরে পা বাড়িয়েচি। অ্যাকবার পেছনে ফিরে তাকালুম। মেয়েছেলেটা সেই জায়গাতেই বসে ঠিক তেমনিভাবে হাসচে মশাই। হাসি তো নয়, আমাকে ভেংচি কাটচে যেন।

তবু বলবেন ভূত নয়? বিসসাস হচ্ছে না?

তারপর কী হল? লিখচি মশাই।

ছুটটে তো রাসতায় বেরিয়ে পড়লুম। সেই বিষ্টি আর ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলোর মাতামাতি।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে তো ছুটলাম। কতকখন তা বলতে পারব না, মশাই। হঠাৎ একটা মাটির ঘরে দেখি—আলো জ্বলচে। ছোটটো একটা চায়ের দোকান। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে বললুম, 'চা—চা দাও এক ভাঁড়।'

একটু পরে গাঁয়ের অ্যাকজন চাসিভুসি এসে ঢুকল। খোসগপ্পে লোক। কথায়-কথায় শুনলুম লালাজির বাড়ির কাচেই থাকে সে। আমার পেটটা যেন ফুলে উঠল মশাই। আর থাকতে পারলুম না। নিজের বেততানত সব খুলে বললুম তাকে। বিসেষ করে লালাজির বউয়ের কথা।

'বউ!' চাসি লোকটা বোয়াল মাছের মতো মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধরা গলায় বলে, 'লালাজির বউ! জরু?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। তাজজব বনে গ্যালে যে। লালাজি সাদি করতে পারে না? তবে তাজজব বউ বটে। নড়েও না—চড়েও না। মুখে আবার বাক্কি নেই।'

'হে ভগবান! লালাজির বউ যে আটবরষ আগে মরে গ্যাচে।'

শুনেই বলব কী, মশাই, চুলগুলো আমার খাড়া হয়ে উঠল। আমতা-আমতা করতে লাগলুম, 'তবে যে লালাজি বললে তার বউ...।'

'ছিল—ছিল, ভেইয়া! লালাজি বহুৎ ভালোবাসত তাকে। জরুও ভালোবাসত বহুৎ। আমরা বলতুম—অ্যাকজোড়া কবুতর। কেউ কাউকে চোখের আড়াল করত না। তারপর বউ যেদিন মরে গ্যাল—কী বলব, ভেইয়া, লালাজির সেদিন কী অবস্থা...।'

আমার মুখে তখন আর বাক্যি ছিল না। চাসি লোকটা মাথা দোলাতে-দোলাতে বলতে লাগল, 'বউ মরে যাবার পর লালাজি কেমন য্যান পাগলের মতন হয়ে গ্যাল। আমরা তো ভেইয়্যা মড়াকে শসানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লালাজির বাড়িতে হাজির। কিন্তু অবাক কানডো, ভেইয়া। লালাজি তার আগেই নিজের একখানা গাড়ি আনিয়ে মরা বউকে নিয়ে হাওয়া। তিনমাস আর তার পাততা নেই। তারপর একদিন বন্ধ গাড়ি করে লালাজি ফিরে এল। আর সেই থেকে ভেইয়া বাড়ি ছেড়ে আর অ্যাকদম বেরোয়নি।'

পড়ে রইল চায়ের ভাঁড়, মশাই। আমি আবার অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটলুম। ছুটব না? আমি যে লালাজির বউকে সচকখে দেখেছি—দুজনকে পাসাপাসি বসে থাকতে দেখেচি। কী করে জানি না—আট বচ্চর আগে যে বউ মারা গ্যাচে তার সনগে। সে-রাত্তিরে, মশাই, যদি আমায় দেখতেন...গা থেকে ঢিলে চামড়া যেন খুলে-খুলে পড়ছিল।

সেই ভূত দেখেছিলুম। তবে দ্যাখার আগে বুঝতে পারিনি। মুকখু লোক তো, মশাই। যা দেখিচি, তাই লিখলুম।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—অ্যাকটা কথা মনে পড়চে। লালাজির ব্যবসার কথা। মটরগাড়ির কী নিয়ে যেন ছিল—লিখেচি না? ভাড়া খাটাতো। কী যেন বলে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ট্যাকসি। ঠিক—ট্যাকসি। যে-কাগজে লালাজি চিঠি লিখত—তাতে যেন ওইরকমই একটা নাম লেখা থাকত। ঠিক কী যেন?

দাঁড়ান—দাঁড়ান—মনে পড়েচে। ট্যাকসিডারমিস্ট।

দাঁত ভাংগা কথা মশাই—তাই তো মনে পড়ল।

ট্যাকসিডারমিস্ট।

কথাটার মানে কিন্তু আজও জানি না। আপনারা তো মশাই, লেখাপড়া জানা লোক—পণডিত। নিসচয় মানেটা জানেন। আপনাদের পাঠকরাও সবাই না হোক—অনেকেই জানে। আমাকে মশাই দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

নোমসকার নেবেন।

ইতি—নিবেদক

স্রি হলধর দাশ

মাসিক রোমা

মার্চ, ১৯৬৬



কার পাপে

অপরূপ

চা-বাগানের কাজ নিয়ে এসেছে দেবাশিস। নির্জনতা ভালো লাগে ওর। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। শহরের কোলাহল ভুলেই গিয়েছে বলা চলে। ভুলতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, কেন না ও প্রায় দীর্ঘ ছ'বছর শুয়েছিল হাসপাতালে। জীবনের একটা অধ্যায় কাটিয়ে দিল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে। কারও বিরুদ্ধে নালিশ নেই দেবাশিসের। বরং শুয়ে-শুয়ে দুঃখ পেত। ওর নিজের জন্য নয়, মায়ের কথা

ভেবে-ভেবে। বেচারি মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো আর কেউ রইল না বুঝি। এমন অনেকদিন গেছে, দেবাশিস ঘুমুতে পারেনি। মায়ের করুণ মুখখানি ভেসে উঠত দেবাশিসের চোখে। পাশের বেডে সুব্রত মাঝে-মাঝে ককিয়ে উঠত—বিড়বিড় করে বলত, উঃ মাগো! যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। আমাকে বাঁচতে দাও। দেবাশিস ব্যথা পেত। ওয়ার্ডের বাইরে বাঁধানো একটা নিম গাছ। নীচে জড়োকরা অন্ধকার। দেবাশিস তাকিয়ে থাকত প্রায়ই। ওয়ার্ডের বাতি নেভার সঙ্গে-সঙ্গে ওই ছায়াগুলো গাঢ় হয়ে যেত। ক্রমশ হামাগুড়ি দিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডটা দখল করে নিত। ভয়ে শরীরটা শিরশির করে উঠত দেবাশিসের। অন্ধকারে ওয়ার্ডের কতকগুলো প্রেতাত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ ভেসে বেড়াত। বাবাকে স্পষ্ট মনে পড়ে দেবাশিসের। যৌবনে তখনও পদার্পণ করেনি দেবাশিস। বাবা বাইরে কাজ করতেন। দার্জিলিং-এর কাছাকাছি কোনও চা-বাগানের ডাক্তার ছিলেন নাকি। উচ্চ মধ্যবিত্ত ছিল ওরা এককথায় বলা চলে। মা আর দেবাশিস থাকত কলকাতায়। বাবা মাঝে-মাঝে ছুটিতে আসতেন। বাবাকে ভয় পেত দেবাশিস। মাকে বাবা খুব ভালোবাসতেন, কখনও-কখনও আদর করতেন। বড় গম্ভীর ছিলেন বলেই দেবাশিস কাছে বড় বেশি একটা এগুত না। দেবাশিস জানে, কতবার দেখেছে বাবাকে। তাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না দেবাশিসের, বাবা নাকি ভীষণ প্রহার করেছিলেন মাকে একবার। এ-কথা শচির মামা বলেছে দেবাশিসকে।

না—না, কিছুতেই না। অবিশ্বাস্য। এ হতে পারে না। না—না! —আর্তনাদ করে উঠত দেবাশিস। টর্চের আলো এসে পড়ত দেবাশিসের চোখে। সিস্টার সেবা এগিয়ে আসত কাছে, মাথার চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বলত, একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

কী যেন জাদু জানত সিস্টার সেন। দেবাশিস অন্ধকারে চোখ দুটোকে ভাসিয়ে দিয়ে চুপ করে যেত।

পাশের বেডে সুব্রতর সঙ্গে অনেক কথা হত দেবাশিসের। সুব্রত ভেঙে পড়ত মাঝে-মাঝে, আর বলত দেবু, জীবনকে পেলাম না বোধহয়।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেবাশিস আঁতকে উঠত। কালো হয়ে আছে রক্তের দাগ সুব্রতর দু-গালের ঠোঁটের ফাঁকে। আলতো স্পর্শ করত দেবাশিস নিজের ঠোঁটের দু-পাশে। বোধহয় গতরাতে ব্লিডিং হয়েছে সুব্রতর।

সেই সুব্রত জীবনকে আর পায়নি। স্বচক্ষে দেখেছে দেবাশিস। বাঁচতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল বেচারি। সমস্ত বিছানাটা রক্তে মাখামাখি ছিল। দেখলে মনে হয় কেউ খুন করে গেছে ওকে। বাঁ-হাতটা বালিশের তলায় দিয়ে ডানহাতের শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে রেখেছিল বালিশটা। ঠোঁটটা কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে ছিল, আর রক্ত গড়াচ্ছিল।

সকালে লাশ সরানোর সময় দেবাশিস মুখ ঢেকে কেঁদেছিল। ওয়ার্ডার দুটোর চোখ এড়ায়নি। শুনতে পেয়েছিল দেবাশিস, একজন বলছে, ১৭ নম্বর লোকটা কাঁদছে রে। শালার ভীষণ ভয় ধরে গেছে, বুঝলি!

অপরটা নিচু গলায় বলল, শালা, তুই চুপ কর দিকিনি! শুনতে পেলে ওটাও অজ্ঞান হয়ে যাবে। তুই বরং খরচের খাতায় আর-একটা দাগ দিয়ে রাখিস।

সিস্টার সেন টেম্পারেচার নিতে এসে দেবাশিসের কাঁধে আলতো স্পর্শ করে জিগ্যেস করেছিল, খুব খারাপ লাগছে মনটা, তাই না?

—সিস্টার!

—অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারলুম না, দেবাশিসবাবু। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে—। —আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না সিস্টার সেন। কান্না মেশানো কণ্ঠে বললেন শুধু, এবার আমার ছুটি। আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। আপনার অজানা কিছুই তো নেই, দেবাশিসবাবু। এখানে আর একদণ্ড থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব নির্ঘাত।

—কিন্তু সিস্টার! —সিস্টার সেনের চোখে চোখ রাখে দেবাশিস।

—ভালোবেসেছিলাম শুধু সুব্রতকে। —ঘনায়মান স্বপ্ন-ছাওয়া দু-চোখ মেলে ক্লান্ত সুরে বলল সিস্টার সেবা সেন, সুব্রতর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল, দেবাশিসবাবু। সে একমাত্র আমার...।

অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে থাকে সেবা। যেন দশ বছরের পুরু যবনিকা তুলতে সময় লাগে ওর। তারপর ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল আবার, সুব্রতকে আর বাঁচাতে পারব না যেদিন জানলাম, সেদিন আমি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। আর তা ছাড়া সুব্রত প্রায়ই বলত, করুণভাবে বলত, 'আমাকে পারো না কি মেরে ফেলতে, সেবা? আমার জন্যে দীর্ঘ এতগুলো বছর ধরে মিছিমিছি পরিশ্রম করছ। রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও, সেবা—আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।'

—সুব্রতর তখনকার অবস্থা ভেবে, তার ঝিমিয়ে পড়া কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হইনি, দেবাশিসবাবু। বরং মায়া হল। সেদিনের সেই ক্ষিপ্ততা আমার মনের শয়তানটাকে জাগিয়ে তুলবে তা কি তখন ভেবেছিলাম!—বলতে-বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল সিস্টার সেন।

দেবাশিস ডাকল, সিস্টার।

তারপর হতাশভাবে দেবাশিসের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল ধপ করে। বলেছিল, শেষপর্যন্ত খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। আমার জীবনের সব সাধ আর কামনায় চিরকালের জন্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, দেবাশিসবাবু। আচ্ছা, নমস্কার। —বলেই বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল সিস্টার।

দিনদুই পরে সিস্টার সেনের মৃতদেহটা উদ্ধার করা হয়েছিল হাসপাতালের সংলগ্ন ঝিল থেকে। পচে উঠে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল সমস্ত বাতাসে।

ছুটি পেল দেবাশিস তার তিনদিন পরেই। ভালো হয়েছে ও। সিস্টার সেবা সেন আর নেই। সুব্রতর বেডে আর-একটি প্রৌঢ় লোক এসেছে। তবু সেবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাপা ফিসফিসে আলোচনার শেষ হয়নি। সেসব তীক্ষ্ণ বাণ থেকে দেবাশিসও নিস্তার পায়নি। প্রতিবাদ করেনি, কেন না দেবাশিসের অজানা কিছুই ছিল না। সুব্রতও বলেছিল অনেক...অনেক কথা।

মায়ের কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দেবাশিস। কিন্তু দুঃখ পেয়েছিল একটা কথা মনে পড়তেই। সুব্রত বলেছিল, দেবু তুমি ভালো হয়ে যাবে জানি...মাকে কাছে পাবে। মা তোমায় আদর করবে। কিন্তু আমি! আমার তো আর মা নেই, তাই বুঝি মরে মায়ের আদর পাব।

দেবাশিস কপট ভর্ৎসনা করে বলেছিল, ছিঃ, সুব্রত! ভেঙে পোড়ো না নিজে। সাহস রাখো মনে। তুমিও ভালো হয়ে যাবে, সুব্রত। দুজনে একসঙ্গে মায়ের কাছে ফিরে যাব। আমার মা-ও তো তোমার মা।

প্রত্যুত্তরে সুব্রত খানিকটা শুকনো হাসি হেসেছিল মাত্র।

মায়ের কাছে বেশিদিন থাকতে পারেনি দেবাশিস। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার সময় ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন চেঞ্জে যেতে। দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। ছোট একটা কাজের সংস্থান নিয়ে ও চলে আসে দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে। চাকরিটা খুব একটা পরিশ্রমের ছিল না। আপিসে হিসাব-রক্ষকের কাজ করতে হত বসে-বসে। আসার দিন বাবার বড় অয়েল পেইন্টিংটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কী যেন ভেবেছিল দেবাশিস। তারপর মাকে প্রণাম করে উঠতেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন মা। আশীর্বাদ করতে-করতে বলেছিলেন তিনি, খোকা, বাবাকে ভুলতে চেষ্টা করিস। আমি যে তোর পানেই তাকিয়ে রয়েছি, বাবা।

মায়ের কথা স্মরণে আছে দেবাশিসের। কিন্তু বাবাকে মুছে ফেলতে পারেনি কিছুতেই। দেবাশিসের কাছে বাবার সব কথাই চেপে গেছেন মা। তবে মাকে প্রহার করে সেই যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি নাকি বাবা। কিছুদিন পর খবর এসেছিল, বাবা নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে পাহাড়ের খাদে মারা গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুসংবাদের সময় দেবাশিস মায়ের কাছেই ছিল। মা কিন্তু একটুও কাঁদেননি, বরং খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু কেন? কী রহস্য! সে-কথা জানতে পারেনি দেবাশিস। তাই এই চা-বাগান বাবার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় সবসময়।

প্রায় দিনের মতো সেদিনও একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল দেবাশিস। প্রত্যেকটি চা-গাছে তখন নতুন কচিপাতা অনেক এসেছে। দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি। এগুলোকে তুলে নিয়ে কালো চা-তে পরিণত করে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। অনেক পয়সা এতে। বহু লোকের জীবিকা এই চা-গাছগুলো। দেখে দেবাশিসের মনে খুশির জোয়ার খেলে যায়। একহাতে ওদের নরম পাতা স্পর্শ করে পথ চলে দেবাশিস। চড়াই-উতরাই ভেঙে-ভেঙে অনেকটা পথ নীচে নেমে এসেছে ও। দেবাশিসের খেয়াল হল সন্ধ্যা হতেই। আস্তে-আস্তে ফেরার পথ ধরে আবার। খানিকটা উঠে একটু বিশ্রাম করে নেয় দেবাশিস। পায়ে চলার সঙ্গে-সঙ্গে পাথরের শব্দ হচ্ছিল পিছনে। মনে হয় কেউ অনুসরণ করছে দেবাশিসকে।

হঠাৎ খিলখিল শব্দে পিছনে ফিরে তাকায় দেবাশিস। দ্যাখে—একটা কুলি মেয়ে, পিঠে একটা বেতের ঝুড়ি, তাতে খানকয়েক শুকনো গাছের ডাল। কুড়িয়ে এনেছে নিজেদের রোজকার ব্যবহারের জন্য।

আবছা আলোয় দেবাশিস চিনতে পারে মেয়েটাকে। অনেকদিন দেখেছে ওকে। দেবাশিসের দিকে মেয়েটা প্রায়ই তাকিয়ে থাকত। চারিদিকে দৃষ্টি ফ্যালে দেবাশিস—না, কাছে-পিঠে কেউ নেই। চিন্তিত হয়ে পড়ে দেবাশিস। কেউ কুৎসা রটাতে পারে এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে। নির্বাক থেকে নিজের পথ ধরে। আবার হাসি। একটানা হেসেই চলেছে মেয়েটা। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর হাসি। বিরক্ত হয় দেবাশিস। হাওয়ায় বৃত্ত এঁকে দাঁড়াল একেবারে মুখোমুখি। জিগ্যেস করে, এ কী, ফুলমায়া! হাসছ কেন?

ফুলমায়া তখনও হাসি থামায়নি।

ধমকে উঠল দেবাশিস, কী হয়েছে তোমার!

হাসতে-হাসতে ফুলমায়া বলে উঠল, বাবু! ডর লাগদাই না তিমরো?

—কেন! কিসের ভয়!—দেবাশিস চমকায়।

—বাঘ বন্দেলকো!—টুকরো-টুকরো হাসে ফুলমায়া।

—এসময় কি বাঘ, শুয়োর বেরোয়!—নিঃশ্বাস নেয় দেবাশিস খানিকটা। অবশেষে ঘুরে দাঁড়ায়। আবছা অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। বুনো মুরগিগুলো পাখা ঝাপটায় আশেপাশের ঝোপে ঝাড়ে। পিছু থেকে হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজ করে ওঠে ফুলমায়া।

—বাবু। উ—খুন!—বলতে বলতে দেবাশিসের পায়ের কাছে ধপ করে ধসে পড়ে। দেবাশিস লক্ষ করে তার বাঁ-পায়ের মধ্যমা দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাঁধা দেওয়ার আগেই ফুলমায়া দেবাশিসের পা শক্ত করে ধরে ফেলেছে। অপর হাতে নিজের ওড়নার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে-দিতে বলে উঠল, ঘড় মা গায়েরে দাওয়াই দিনু, বাবু। ল!

লজ্জিত হয়ে পড়ে দেবাশিস। মৃদু গলায় বলল, আজ আর ওষুধ দিতে পারব না ফুলমায়া।

—কিনো?—সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফুলমায়া।

—দাওয়াইখানার চাবি তো আমার কাছে থাকে না তাই।

ফুলমায়া যেন বুঝতে পেরেছে কারণটা, তাই সাবধান করে দেয় অন্ত পানি ন লামানু, বাবু।

দেবাশিসের পা টা ভারি হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল। খুব জোরে বেঁধেছে মেয়েটা। অনেকটা উঠে এসেছে দেবাশিস। ফুলমায়া পিছু-পিছু আসছিল, দু-জোড়া পায়ের ঝুপঝাপ শব্দ হচ্ছিল কেবল।

দেবাশিস হাঁপিয়ে ওঠে। কামারশালার হাপরের মতো বুকটা ওঠা-নামা করে দেবাশিসের। ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত ও। একটা পাথরের ওপর বসে খানিকটা বিশ্রাম নেয়। ফুলমায়া পাশে এসে দাঁড়ায়। ঝুড়িটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখে। দেবাশিস তাকায় আকাশের দিকে। চাঁদ উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। ফুলমায়ার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিল। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দেবাশিস, এক-একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপের পিঠের খোলের মতো দেখাচ্ছে গায়ে-গায়ে নিদ্রালসতাপূর্ণ পাহাড়গুলোকে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। দুজনেই ক্লান্ত আজ। অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে, রাতও বেশ হয়ে গিয়েছে। নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বলে উঠল দেবাশিস, ফুলমায়া, তুমি বাড়ি যাবে না?

এমন ধরনের কোনও প্রশ্নের আশায় ছিল বোধহয় ফুলমায়া, সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, জ্বালানি পায়ো না ভনে, মেরো মরদলে ঘর না পশনু দিন্দাইনী, বাবু।

দেবাশিস হাসল কেন? তোমার মরদ নিজে জ্বালানি জোগাড় করতে বেরোয় না কেন?

ফুলমায়া অন্তরে আঘাত পেল। প্রত্যুত্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

—কই, কিছু বলছ না যে, ফুলমায়া!

—কী বলব, বাবু। তোমাদের মেয়েদের যে মর্যাদা দেওয়া হয় আমাদের বেলায় তা কোনওদিন হবে না।

আশ্চর্য হয়ে যায় দেবাশিস। পরিষ্কার বাংলা বলছে মেয়েটা।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ফুলমায়ার দিকে।

খিলখিল শব্দে ছোট ঝরনার মতো হাসতে-হাসতে বলে ফুলমায়া, অবাক হচ্ছ তাই না, বাবু! তোমাদের ভাষা বলছি বলে?

—ফুলমায়া!—কৌতূহল জাগে দেবাশিসের।

—বাবু।

—তোমার আসল পরিচয় কী? কোথায় তোমার জন্ম? কেমন করেই বা এত পরিষ্কার বাংলা শিখেছ?

—অতগুলো প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে কি দেওয়া যায়!

—হ্যাঁ, দিতে হবে তোমাকে।—দেবাশিস ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ফুলমায়া হাসে তখনও, বলে, একে-একে তোমার প্রশ্নের জবাব দেব, বাবু। তবে কাউকে বলতে পারবে না, কথা দাও।

কথা দেয় দেবাশিস। আরও ঘন হয়ে বসে ফুলমায়া দেবাশিসের পাশে। বুনো মুরগিগুলো ডেকে ওঠে একসঙ্গে। পাখা ঝাপটাতে থাকে অনবরত। দেবাশিস ভয় পায়। ফুলমায়া অভয় দিয়ে ওঠে।

—ওগুলো বসার জায়গা নিয়ে মারামারি করছে বোধহয়।

দেবাশিস চঞ্চল হয়ে পড়ে। একমুঠো শীতল বাতাস মাতলামি করতে থাকে। দেবাশিসের শীত-শীত করে ওঠে।

—বাবু,—মৃদু ডাকে ফুলমায়া।

দেবাশিস নড়ে বসে বলো ফুলমায়া তোমার কথা।

ফুলমায়া বলতে শুরু করে।

—আমার বাবা ছিলেন বাঙ্গালি আর মা নেপালি।

দেবাশিসের উৎকণ্ঠা জাগে। বুকটা আবার ব্যথা করছে দেবাশিসের। বাধা দেয় না ফুলমায়াকে।

—সাধারণত আমার মাতৃভাষা নেপালি হওয়াই উচিত, তাই না বাবু?

—হুঁ।

—কিন্তু বাবার কাছে আমার শিক্ষাদীক্ষা। বাঙ্গালি স্কুলে আমাকে পড়াশুনা করতে হত। একটু বড় হতেই বাবা তার মেয়েকে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়। হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা শুরু করি আমি। বাঙ্গালির পরিবেশে থাকতে-থাকতে খাঁটি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম অতি সহজে। বাবাকে ঘিরেই আমার সব প্রেরণা, কেন না বাবাকে আমি খুব ভালোবাসতাম।

একটু থেমে কী যেন চিন্তা করল ফুলমায়া।

দেবাশিস তাড়া দিয়ে ওঠে, তারপর!

—তারপর...হ্যাঁ, বাবার পেশাটাই তোমাকে বলা হল না, বাবু।

—কী করতেন তোমার বাবা, ফুলমায়া?—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অস্পষ্ট ফুলমায়ার দিকে তাকায় দেবাশিস।

—বাবা ছিলেন কার্শিয়াং-এর এক চা-বাগানের ডাক্তার।

দেবাশিস চমকাল। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হতে লাগল এক্ষুনি বুঝি রক্তক্ষরণ হবে। নিজেকে সামলে নেয় দেবাশিস।

—তোমার বাবা ডাক্তার ছিলেন বুঝি, ফুলমায়া?

—হ্যাঁ, বাবু। বাবা যে বড় ডাক্তার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতায় বাড়ি ছিল বাবার। বাবা নাকি আর-একটা বিয়েও করেছিলেন প্রথম।

দেবাশিস অন্ধকার দেখল সমস্ত চোখে। পা-দুটো ভীষণ কাঁপছে, বোধহয় মূর্ছা যাবে। মৃদু গলায় তবু বলে দেবাশিস, শেষ করে যাও তোমার কথা, ফুলমায়া।

—বাবা ওই চা-বাগানেরই হাসপাতালে একটি গরিব পাহাড়ি মেয়েকে কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। পরে তাকেই বিয়ে করেছিলেন। মা ছিলেন সেই বাগানের এক ওপরওয়ালার বড় মেয়ে। বিনা দ্বিধায় বাবা আমার মাকে স্ত্রী বলে মেনে নিয়েছিলেন।

দেবাশিস আবার নড়ে বসল। সমস্ত অন্তর ঘৃণায় রি-রি করে উঠল। কঠিন হয়ে গেল দেবাশিস। গাঢ় স্বরে জিগ্যেস করে, তোমার বাবার প্রথম স্ত্রীকে দেখেছিলে তুমি, ফুলমায়া?

—হ্যাঁ, একবার কিছুক্ষণের জন্যে দেখেছিলাম। শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি যেন, সেই মা আমার।

দেবাশিস দাঁতে দাঁত ঘষে এই সামান্য মেয়েটার 'মা' সম্বোধনে।

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয় দেবাশিস। শান্ত হয়ে আবার জিগ্যেস করল, কেমন করে প্রথম ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলে?

—সেই চেনা এক তাজ্জব ঘটনা, বাবু। বাবার খোঁজে একবার আমাদের বাগানে এসেছিলেন, কিন্তু....।

—কী? কী কিন্তু, ফুলমায়া! লুকিয়ো না আমায়। জানতে দাও তারপর কী হয়েছিল?

দেবাশিসের কঠিন স্বরে ভয় পেয়ে ফুলমায়া অনুমান করতে চেষ্টা করে কারণটা।

—চুপ করে গেলে কেন? কই, তোমার কথা বলো। সেই ভদ্রমহিলার কথা, তোমার বাবার কথা,—দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে দেবাশিস।

বাবু! কী হয়েছে তোমার!

নিজের রুক্ষ স্বর কানে বাজে দেবাশিসের। লজ্জা পায়, নিচু গলায় বলে আবার, তোমার প্রথম মা কিছু বলেনি তোমাকে!

—বলার সময় পেলেন কই! আমার মা কী যেন বোঝাচ্ছিলেন নেপালি আর ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষায়। বাবা একটা কোণে চেয়ারে বসেছিলেন। ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছিলেন। প্রথম মা আমার মায়ের দিকে ভুলেও তাকালেন না। বরং হঠাৎ বাবার কাছে দৌড়ে গেলেন। জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, আর বলেছিলেন, 'আমার কী অপরাধ বলো। কেন আমায় এত কষ্ট দিলে? ছেলে জানতে চাইলে কী বলব তাকে?' বাবা ফ্যালফ্যাল করে প্রথম মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মা তখনও কাঁদছিলেন, বলেছিলেন, 'চুপ করে থেকো না। খোকা প্রায়ই জানতে চায় তার বাবা কবে আসবে বাড়িতে।' আমি তখন জানতে পারলাম, আমার একটি দাদা আছে। বাবা সেই যে বোবা হয়ে রইলেন, আর একটিও কথা বললেন না। তেমনি কাঁদতে-কাঁদতে মা চলে গেলেন। আর দেখিনি। তবে শুনেছি, বাবা বলতেন, আমার দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়।

দেবাশিস বড় করে নিঃশ্বাস নিল। এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা টনটন করে উঠল। খুকখুক করে কেশে উঠল দেবাশিস। মাথার যন্ত্রণা তখনও সারেনি। মাকে মনে পড়ে যায় দেবাশিসের।

মা বলতেন, খোকা আমার। তুই আমার একমাত্র সম্বল। আমি তো কোনও অপরাধ করিনি, বাবা। তবু ভগবান আমায় অমৃত থেকে বঞ্চিত করেছেন কেন জানি না।

কাঁদতেন তিনি। অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ত দু-চোখ বেয়ে। মায়ের চোখে জল দেখে দেবাশিসও ডুকরে কেঁদে উঠত। মা ছেলেকে বুকে জাপটে ধরে রাখতেন।

আবার বারদুই কাশল দেবাশিস। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বড় করে কাশতে চেষ্টা করে দেবাশিস। খুক-খুক-খুক....কাশির শেষে কী যেন বেরিয়ে এল মুখ থেকে। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখে আঁতকে ওঠে দেবাশিস। মৃদু স্বরে বলে ওঠে, আবার কালরোগ?

—বাবু! তোমার ঠান্ডা লেগেছে। বাড়ি ফিরে যাও। —ফুলমায়া বলে।

—তুমি যাবে না, ফুলমায়া! —দেবাশিস নিশ্বাস নিতে-নিতে বলে।

ঝুড়িটা কাঁধে নেয় ফুলমায়া, বলে, উঁহু, আমি কাঠ কুড়িয়ে যাব। তুমি চলে যাও!

—সে কী! এত রাতে কাঠ কুড়োতে কোথায় যাবে তুমি?

ফুলমায়া কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে-দিতে বলে, তোমাকে যে শেষ কথাটা বলা হল না, বাবু।

—কী!

—বাবা কেমন করে হারিয়ে গেলেন আমাদের কাছ থেকে!

দেবাশিস প্রচণ্ড ধাক্কা খায় আবার। তাইতো, বাবা কোথায় গেলেন কিছুই জানা হল না। এ-রহস্যের শেষটুকু শুনতে হবে তাকে। আগ্রহ জানায় দেবাশিস শেষটুকু শোনার।

বলতে থাকে ফুলমায়া অবশেষে।

—বাবা একদিন রুগি দেখে নির্জন পথে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসছিলেন। এক শয়তান চুপি-চুপি বাবাকে পেছন থেকে ছুরি মারে। বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। ওরা তখন বাবাকে ছুড়ে ফেলে দেয় পাহাড়ের খাদে, অনেক নীচে।—বলতে-বলতে কেঁদে ওঠে ফুলমায়া।

দেবাশিস চিৎকার করে বলে, থেমো না, ফুলমায়া। বলো, কারা ওই শয়তান! কী অপরাধে বাবাকে শাস্তি দিল?

এবার পাষাণ হয়ে যায় ফুলমায়া।

—শুনবে, বাবু! কী অপরাধে ওরা বাবাকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে? তবে শোনো। আমার মা, অর্থাৎ, বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথমেই বাগদত্তা ছিলেন। দাদামশায় প্রচুর টাকা দিয়ে মাকে বিক্রি করেছিলেন সেই বাগানের কালু তামাং সর্দারের কাছে। এটা আমাদের বরাবরের রেওয়াজ, বাবু। তাই বলছিলাম, তোমাদের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েদের মর্যাদা দেওয়া হয় না। বাবাকে অবিশ্যি জানতে দেওয়া হয়নি...বা দাদামশায় গোপন রেখেছিলেন কথাটা। সমস্ত আক্রোশ তাই বাবার ওপর পড়েছিল। দাদামশাইয়ের অপরাধে নির্দোষ আমার বাবাকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল দস্যুরা।

এক নিঃশ্বাসে শেষের কথাগুলো বলেই দ্রুত পথ ধরল ফুলমায়া।

দেবাশিস ডাকে ফুলমায়া।

—তুমি বাড়ি চলে যাও, বাবু।—ততক্ষণে অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে ফুলমায়া।

দেবাশিস আরও একটু বড় করে ডাকে ফুলমায়া! শোনো! চলে যেয়ো না।

অস্পষ্ট উত্তর ভেসে আসে : আমার অপেক্ষায় তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না, বাবু, চলে যাও।

আবার কাশি ওঠে দেবাশিসের। তার সঙ্গে দলা-দলা রক্তও পড়ে। চিৎকার করে ডেকে ওঠে দেবাশিস : ফু...ল...মা...য়া...!

গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে চা-বাগানে। ঝটকা হাওয়া এসে দেবাশিসের কাতর চিৎকার ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে ডেকে ওঠে দেবাশিস। আবার যেন ডাকতে চায়। কিন্তু তার কণ্ঠে শক্তি নেই। কেমন এক অস্পষ্ট শব্দে বলে ফুলমায়া—লক্ষী-বোন আমার—শুনে যাও.....। একবার শুনে যাও।

চারপাশের পাহাড়ের পাঁচিলগুলো যেন অন্ধকার ঠেলে নিয়ে এসে জাপটে ধরে দেবাশিসকে।

তদন্ত রহস্য
মার্চ, ১৯৬৬



অ্যালবাম

শ্রীপার্থ

দুটি ঠোঁট সেই যে এক হল আর খুলল না। লিপিকা নীরব হল।

এমন একটা যে কিছু ঘটবে কিংবা ঘটতে চলেছে, আন্দাজের সিঁড়ি বেয়ে এতদিন যারা লিপিকাকে জানার স্তর পেরিয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছিল, তারা খবরটা শোনামাত্র বলে দিল, এ ছাড়া লিপিকার অন্য কোনও পথ ছিল না। লিপিকা নীরব হওয়াতে ওর পরিচিতরা এমন ভাব দেখাল যেন এক অস্বস্তিকর ক্রিকেট ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটাতে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

লিপিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পর্ণা সেনকে দেখে অন্তত তাই মনে হল। অথচ এই পর্ণা সেনের এমনও এক-একটা দিন গেছে যখন দুই বান্ধবীতে দেখা না হওয়ার জের চলেছে পরের দিন নিজেদের অভিমানের আড়ালে ঢেকে রাখার মধ্যে দিয়ে। সেই পর্ণা সেন কেমন সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে কথাটা বলল টালিগঞ্জ থানার ও. সি.-র প্রশ্নের উত্তরে, ওই যে দেখছেন লিপিকার চোখ-মুখ, হ্যাঁ, এখনও ভালো করে তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন চোখ-মুখের চিহ্ন লিপিকার জীবনে অশুভ ইঙ্গিতের খবর বহন করে এনেছে। তবে সে একদিনে নয়, দুদিনে নয়, অশুভ ইঙ্গিতের প্রথম দিকের সেই অস্পষ্ট রেখাটা ছোট থেকে বড় হয়েছে ক্রমশ। অবশেষে তার চরম প্রকাশ ঘটল আজ। এবং সেই সঙ্গে লিপিকা নীরব হল।

লিপিকার দিকে এখন আর তাকানো যায় না। চোখে-মুখে পাপের চিহ্ন, বিচিত্র সব অপরাধের বিজ্ঞাপন। এখন যে দেখছে সে-ই বলছে, এ-মেয়ের এ-ধরনের পরিণতি তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের একটা সহজতম সুযোগ। বলতে গেলে সুযোগটা লিপিকার কাছে হঠাৎই এসেছিল এবং বলা বাহুল্য ওর অজান্তেই! তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না লিপিকা। সুযোগটা আসার আগে পর্যন্ত ভাবতেও পারেনি লিপিকা যে, ওর এতদিনের স্তূপীকৃত পাপের বোঝা হালকা করতে, এবং জীবনের সঞ্চিত সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলতে ওকে এত ব্যাকুল হতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটা যে কী তা অনুভব করার অনুভূতি না থাকলেও তার নিষ্ঠুর পরিণতির কথা জানত লিপিকা। অবশ্য তা সত্ত্বেও একান্ত প্রয়োজন মনে করে লিপিকা সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বরণ করে নিল সেই প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ। তবে আশ্চর্য এই, এতদিন যারা ওকে এই নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে একটু-একটু করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল ওর এই প্রায়শ্চিত্ত বরণের মুহূর্তটিতে তারাই দূরে সরে রইল। লিপিকার জীবনে এই প্রথম এবং শেষ ট্র্যাজেডি। লিপিকার মৃত্যুবরণ স্বেচ্ছায় কি না, জানল না কেউ!

অথচ লিপিকার সেইসব বিচিত্র অপরাধের যারা এতদিন সাক্ষী ছিল, যারা সেই অপরাধ-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল, যারা তার পাপাচারকে অনুমোদন করেছিল তাদের সেই তথাকথিত সমাজে একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে—আশ্চর্য, তারাই এখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইল। এমনকী নীরব হয়ে যাওয়া লিপিকার পাপমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও অন্যায় মনে করল। এই প্রথম তাদের মনে হল, লিপিকা যে-পথটা আজ বেছে নিল সেটা লিপিকার অস্বস্তিকর জীবন-ইনিংসের লজ্জিত পরিণতি হলেও তাদের জীবনে যে-অবাঞ্ছিত ঘটনাটা ওত পেতে বসে ছিল এখন সেটা আস্তে-আস্তে সক্রিয় হতে পারে। অর্থাৎ, লিপিকা নিজে মরে বাঁচলেও তার পরিচিতদের নাম-মাত্র বাঁচার অনুমতি দিয়ে মুখ্যত একরকম মেরেই রেখে গেল বলতে হয়।

ঘটনাটা যে সুখের নয় বলা বাহুল্য। তবে এই দুর্ঘটনার জন্য এত শিগগির কেউ প্রস্তুত হতে চায়নি। ঠিক ছিল, একটা সুযোগ অন্তত লিপিকাকে দেওয়া যেতে পারে। সে-সুযোগ নিশ্চয়ই বাঁচার। এবং সে-বাঁচার পথ ঠিক হত তাদেরই নির্বাচনে।

কিন্তু এসবের বোধহয় কোনও প্রয়োজন মনে করেনি লিপিকা। মনে করেনি এইজন্য, কারণ, ও জানত ওর সেই বাঁচার আয়ু দীর্ঘ হলেও সুখের হতে পারে না। এবং সুখ নামক পাখিটা ওর চেনা আকাশ থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল।

কোনও নির্দিষ্ট দিনকে লিপিকা ওর জীবনে একটিমাত্র অশুভ মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করতে পারে না। কেননা লিপিকার জীবনের অশুভ দিন মাত্র একটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ ছিল না। লিপিকা জানত ওর জীবনের নিকষ কালো রং একদিনেই এত গভীর হয়নি। গোড়ার দিকে ফিকে রংটা গাঢ় করার তাগিদ যে লিপিকার একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সেই রং ফিকে থাকতে-থাকতে লিপিকা রং বদলাতে চেয়েছিল। সেইসঙ্গে নিজেকেও। কিন্তু ওর জীবনে নতুন রঙের সমস্ত রকম উপকরণ থাকলেও কে সেই নতুন রঙে তুলি বোলাতে আসবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল লিপিকার সামনে। অনেক তুলির ভিড়ে নিজেকে বড্ড অসহায় ভেবেছে লিপিকা। শেষে হাঁপিয়ে উঠেছে। তারপর একসময় যখন ও পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহের দিকে তাকাতে গিয়েছে, শিউরে উঠেছে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে।

পাপের চিহ্ন! অপরাধের বিজ্ঞাপন! দেহের স্তরে-স্তরে। লিপিকা জানত এরপর কোনও পুরুষ আর ওর ধারেকাছে আসবে না—আসতে পারে না। আসতে না পারার কারণ সেই একটাই লিপিকা একটু আগেও যে-দেহটাকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সে ওর অতীত ছায়া মাত্র। একটা সুউচ্চ পাহাড়চূড়া যেভাবে বাধ্য হয়ে মাথা নুইয়ে নেয় যন্ত্রদানবের কাছে, লিপিকা ওর দলিত বক্ষযুগলের দিকে তাকাতে গিয়ে ভেবেছে এদের অবস্থাও কতকটা তাই।

কথাটা ঠিক। তবে পদ্ধতিটি আলাদা! যন্ত্রদানব আর মানবযন্ত্রের মধ্যে তফাত শুধু...।

অথচ...।

গোড়ার দিকের কথায় ফিরে গেলে এ-ধারণা করে নিলে ভুল হবে না, লিপিকার এই নিশ্চেতন দেহটার আগে কতই না কদর ছিল।

সেইসঙ্গে পুরুষদের কাছে দেহটাকে কামাতুর করে তোলার মধ্যে একটা উৎসাহ পেত লিপিকা। সেসব উৎসাহ ভোগ করতে গিয়ে একবারও লিপিকার মনে হয়নি সেসব অন্যায়, সেসব পাপ। এবং তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

লিপিকাকে তখন যেন কী এক নেশায় পেয়ে বসেছে। ও আরও, আরও স্বাদ পেতে চায় জীবনের। ভিন্ন-ভিন্ন। নানান রঙের। গাঢ়, আরও গাঢ়। এমনি করেই লিপিকার জীবনের রং হল নিকষ কালো। যার অপর নাম অন্ধকার।

ওর সেই অন্ধকার জীবন থেকে ওকে আলোয় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল এক তরুণ লেখক। নামসর্বস্ব লিপিকার নামগোত্রহীন বন্ধু-লেখক। কাল পর্যন্ত লিপিকা তার কথা ভেবেছে। সন্ধের সময় একসঙ্গে বসে গল্প

করেছে। হেসেছে। স্বাভাবিকভাবেই। সে-হাসির মধ্যে আজকের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনও পদধ্বনি ছিল না। অন্তত লেখক তার আভাস পায়নি।

লেখকের আসল নাম লিপিকা জানত না। ছদ্মনাম 'সন্ধানী'-র সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। লেখকের নাম না জানলেও যদি কেউ তাকে দেখিয়ে দিত দূর থেকে, লিপিকা চিনতে ভুল করত না। কেননা সে-মুখ ভোলার নয়। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। আর তাকে তো লিপিকা দিনের মধ্যে কতবার যে দেখেছে তার ঠিক নেই।

মনে আছে, লেখকের মনে আছে আজও, কোনও দিন যদি দেখা না হত ওদের, বিশেষ করে সেই দেখা না হওয়ার জন্য লেখক যদি দায়ী হত, তাহলে লিপিকা প্রতিশোধ নিত দুদিন কথা না বলে। কিন্তু তৃতীয় দিনে লিপিকা পুষিয়ে দিত সুদে-আসলে।

লেখক তাই হাসতে-হাসতে এক-একদিন বলত, এ-রাগের কোনও অর্থ হয় না। এ যেন...।

কী!—লিপিকা মুখ তুলে তাকাত।

—এ যেন,—লেখক একটু থেমে আবার বলত, এ যেন বেশি করে কথা বলার জন্যেই রাগ করা।

—বয়ে গেছে আমার কথা বলতে।—লিপিকা কপট রাগ দেখাত : বেশ, এই তাহলে শেষ কথা বললাম।

—উঁহু, তুমি তা পারবে না।—লেখক তাড়াতাড়ি কাছে আসত লিপিকার। দু-বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ রেখেই বলত, নতুন করে কথা শুরু করার এ এক নতুন মতলব করছ। বলো, ঠিক কী না?

—বেশ করছি।—লিপিকা লেখকের বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে কপট রাগ দেখাত এবং ঠোঁট ফোলাত।

—তোমার এই বেশ করা ভাব কিন্তু ভালো নয়, লিপিকা।

—তোমার কাছ থেকে উপদেশ শুনতে চাই না। আমার যা খুশি তাই করব।—এরপর ও যা-খুশি করার মতো যা করত সেটা প্রকাশ পেত লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে।

লেখা পড়ে লিপিকা অনুযোগ করেছিল, কেন এসব লিখতে গেলে?

—কীসব?—না-জানার ভান করে লেখক। ইচ্ছে লিপিকার মুখ থেকেই শোনে।

লিপিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে লেখক নিজেই জিগ্যেস করে, কী হল? কই, কী বলবে বলছিলে, বললে না?

—আমি যা নই তা কেন লিখলে?

—তোমার বাইরের যে-রং সেটা তো কল্পনা। কিন্তু ভেতরের রং! সে তো আমার মনেরই প্রতিলিপি, তা তুমি বুঝতে পারো না, লিপি?

লিপিকা বোঝে। কিন্তু বোঝাতে পারে না তার প্রিয় বন্ধু ও লেখককে। কী করে সে বোঝাবে, যে-অন্ধকার জগতের মধ্যে ওর বাস সেখানকার মোহ থাকলেও দু-দিন যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠবে লেখক।

তার পরের কথা জানে লিপিকা। প্রথমে ফিরিয়ে দিয়েছিল লেখককে। লেখককে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে লিপিকাকে অনেক অশ্রু ব্যয় করতে হয়েছে। সেসব অশ্রুর কথা লেখক কিন্তু জানতে পারেনি।

টালিগঞ্জ থানার ও. সি. প্রশান্ত ব্যানার্জি কিন্তু বিশ্বাস করতে চাননি লেখকের বক্তব্য। জবানবন্দি নিতে গিয়ে প্রশান্ত জিগ্যেস করলেন, আপনার সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছিল লিপিকা দেবীর?

—গতকাল সন্ধের সময়।

—মিথ্যে কথা!

—কী বলতে চান আপনি?

—যা আপনি ঢাকতে চাইছেন—।

—থামুন!

লেখকও কম নয়। ভেবেছিল লেখার মধ্যে দিয়ে আজকের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিবাদ করবে, কিন্তু সে শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। তার আগেই প্রতিবাদ করল মুখর হয়ে, থামুন। আপনাদের কাজই

হচ্ছে গোড়ার দিকে ইচ্ছে করে ভুল পথে চলে আসল অপরাধীদের গা-ঢাকা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

—বেশ তো। প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্যে দয়া করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন না কেন!

—সহযোগিতার মনোভাব যে আমি পোষণ করছি না, এ-ধারণা আপনার হল কেন?

—এই যে ডায়েরিটা দেখছেন,—প্রশান্ত হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা ডায়েরিটা লেখকের সামনে তুলে ধরেন : এই যে ডায়েরিটা দেখছেন, মিস্টার সন্ধানী, এটাই আপনার অসহযোগিতার কারণ।

—এ-ডায়েরিটা তো আমার! এ আপনি কোত্থেকে পেলেন?

—কোত্থেকে পেয়েছি সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। —প্রশান্ত রহস্যের জাল বোনেন তার আগে বলুন শেষ কখন এই ডায়েরিতে লেখেন?

—তা তখন রাত দশটা হবে।

—ইয়েস, ইউ আর রাইট। ডায়েরিতেও তাই লেখা আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ডক্টর মিত্রের মতে লিপিকা দেবীর মৃত্যু হয় ঠিক ওই একই সময়।

—তা আমার ডায়েরি লেখার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?

—হ্যাঁ, আছে। আর আছে বলেই তো জানতে চাইছি কাল রাত্রি এগারোটার পর কেন, কেন এই বাড়িতে এসেছিলেন?

—ডায়েরিটা ফেলে গিয়েছিলাম, সেটা নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

—ওয়েল মিস্টার সন্ধানী, আপনার কথা ঠিক বলে ধরে নিলে এটা কি মনে করতে নেই যে, কাল এগারোটার পর আপনি এ-বাড়িতে আসেন এবং লিপিকা দেবীর বান্ধবী পর্ণা সেনের কাছে তাঁর খোঁজ করেন?

—হ্যাঁ, করেছিলাম।

—বেশ, তাহলে এ-খবরটা নিশ্চয় পেয়েছিলেন, লিপিকা দেবী মৃত!

—না!

—তার মানে আপনি বলতে চান লিপিকা দেবী তখন জীবিত?

—না, তাও নয়।

—তাহলে?

—লিপিকার খোঁজ আমি ঠিকই করেছিলাম মিস সেনের কাছে। তবে তখনও পর্যন্ত কোনও দুঃসংবাদ আমি পাইনি। মিস সেন বলেছিলেন, লিপিকার সঙ্গে আজ আর দেখা হতে পারে না। লিপিকা ঘুমুচ্ছে।

—তারপরেই কি আপনি ওখান থেকে—?

প্রশান্তর কথা শেষ হল না। পর্ণা সেন ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়। আক্রোশে, ঘৃণায় তার মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। থরথর করে সমস্ত শরীরটা কাঁপছে পর্ণার। বলে ওঠে সে, ছিঃ তুমি এত নিষ্ঠুর! এত হীন! এর পরেও তোমার লজ্জা করল না! নিজের সাফাই গাইতে এসেছ?

লেখক সন্ধানী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, পর্ণা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই তো লিপিকাকে...।

ঘরের সবাই স্তব্ধ, বিমূঢ়, নির্বাক। প্রত্যেকের দৃষ্টি এখন পর্ণা সেনের ওপর।

লেখক দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায় পর্ণার দিকে। কাছে গিয়ে ডাকে, পর্ণা।

লেখকের কথায় পর্ণা কর্ণপাত করে না। বরং আগের চেয়ে আরও বেশি কঠোর হয় সে। লেখকের উপস্থিতি সে যে সহ্য করতে পারছে না, সেটা প্রমাণ করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে।

লেখক পর্ণার হাত দুটো ধরে ফেলে বলে ওঠে, এ তুমি কী বললে! তুমি, তুমি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানো?

—যেটুকু জেনেছি, তার থেকে বলতে পারি, তুমি সব পারো! তোমার ওই হাত দিয়ে চমক লাগানো তোমার লেখা বেরুতে পারে, আবার ওই হাত দিয়ে তুমি খুনও করতে পারো।

—পর্ণা!—লেখক চিৎকার করে ওঠে, ভেবে দেখেছ পর্ণা, তোমার এই জবানবন্দিতে আমার কী পরিণতি হতে পারে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভেবেই বলছি, এবং...।

—এবং কী!

—তোমার পাপের পরিণতি আমি দেখতে চাই।

—পাপ!—লেখক এবার প্রতিবাদ করে ওঠে, পাপ তুমি কাকে বলতে চাও?

—লিপিকার অসহায়তার সুযোগ নেওয়াটা কি পাপ নয়?—পালটা প্রশ্ন করে পর্ণা।

লেখকের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে : পাপ! আর তুমি যা গোপন করছ সেটা পাপ নয়?

—মিথ্যে কথা। আমি কিছুই গোপন করিনি।—পর্ণা প্রতিবাদ করে।

—তাই নাকি!—বিদ্রূপ ঝরে লেখকের কণ্ঠে : আমি যা জিগ্যেস করব তার জবাব দেবে?

—বলো, কী জানতে চাও?

পর্ণাকে ঠিক এই মুহূর্তে একটু ম্লান মনে হল। একটু আগের সেই দৃঢ়তা এখন আর নেই। ও যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

সকলের দৃষ্টি এখন লেখক সন্ধানীর ওপর নিবদ্ধ। লেখক কী বলবে, কী বলতে চায় তা জানার কৌতূহল যেমন একটু-একটু করে বাড়ছে তেমনই ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে সবাই কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিল।

ও. সি. প্রশান্ত ব্যানার্জি বললেন, একটু সংক্ষেপে, সন্ধানী।

—চেষ্টা করব।—কথাটা বলে লেখক আবার তাকাল পর্ণার দিকে।

জিগ্যেস করে, লিপিকা তোমার কে?

—বান্ধবী।

—শুধুই বান্ধবী, আর কিছু নয়?—লেখকের চোখে অবিশ্বাসের ছায়া।

—না।—পর্ণা নিজের কথার সমর্থন করে।

—মিথ্যে কথা!—লেখক তখনই প্রতিবাদ করে ওঠে : লিপিকা তোমার বোন!

—কী বলছ? তুমি কি শেষে পাগল হয়ে গেলে না কি?

—পাগল বলে লেখকদের বদনাম থাকলেও এ ক্ষেত্রে আমি একজন সুস্থ-স্বাভাবিক লোক।

—প্রমাণ?

—প্রমাণ!—মুখে বিদ্রূপের হাসি লেখক সন্ধানীর। হাতে ধরে রাখা একটা অ্যালবাম ও. সি. প্রশান্ত ব্যানার্জির দিকে এগিয়ে দিয়ে লেখক বলে, এই অ্যালবামটার ভেতরেই সব প্রমাণ খুঁজে পাবেন, মিঃ ব্যানার্জি।

প্রশান্ত অ্যালবামের পাতা ওলটান দ্রুতগতিতে। তারপর একটা পাতায় এসে ওঁর দুচোখ নিবদ্ধ হয়। চোখ ফেরাতে পারেন না।

অদ্ভুত সিমিলারিটি দুটি মুখের মধ্যে। চোখ, মুখ, নাক, এমনকী চিবুকের নিচে তিলটি পর্যন্ত দুজনের একই জায়গায়। এ কী করে সম্ভব!

ফটো দু-খানার ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে প্রশান্ত বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন। একজন নিশ্চয় লিপিকা। কিন্তু অপরজন?

—দীপিকা!—লেখক পরিচয় দেয় : ওরা যমজ বোন।—তারপর ওদের পরিবারের একটা গ্রুপ ফটো বের করে লেখক বলে, লুক, ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, এর নীচে কী লেখা আছে।

প্রশান্ত দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে এবং জানলেন পর্ণা ওদের বড় বোন।

—কিন্তু লিপিকা দেবীর খুনের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?—লেখক সন্ধানীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি।

—সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগের কথা আগে বলে নিই।

ঠিক সেই সময় পর্ণা কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। লেখক ছুটে গিয়ে ওকে বাধা দেয়, দাঁড়াও! আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। টেক ইয়োর সিট। স্থির হয়ে বোসো।

পর্ণা তখন কাঁপছিল থরথর করে। কাঁপতে-কাঁপতে দু-হাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলল এবং বলতে শুরু করল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, লিপিকা আমার বোন। ওর পরিচয় দেওয়ার মতো নয়, তাই দিইনি আপনাদের কাছে। ও একটা...।

পর্ণার শেষের কথাগুলো কেমন জড়িয়ে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে কান্নাও থেমে আসতে লাগল ধীরে-ধীরে। সব শেষে পর্ণার সমস্ত শরীরটা শিথিল হয়ে গেল, অবশ দেহটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

লেখক কাছেই ছিল পর্ণার। ঝুঁকে পড়ে পর্ণার অবশ দেহটা যখন দু-হাতে তুলে ধরল, তখন আর কিছুই করার নেই।

চোখ দুটো বুজে আসছে পর্ণার।

পর্ণার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে লেখক সন্ধানী ডাকে, পর্ণা!

চোখ জড়িয়ে আসছে। কষ্ট হচ্ছে তাকাতে। তবু লেখকের ডাকে পর্ণা শেষবারের মতো চোখ মেলে তাকাল। খুব ক্ষীণ গলায় বলল, লিপিকাকে সরিয়ে বুঝতে পারছি তোমার দুঃখটা বাড়িয়েই গেলাম। কিন্তু কী করব। লিপিকাকে আমি নিজের হাতে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলাম বাধ্য হয়েই।

এর পর পর্ণা নীরব হল। দুটি ঠোঁট এক হল।

অদূরে লিপিকার অবশ দেহটাও পড়ে রয়েছে। ওর ঠোঁট দুটোও এক হয়ে আছে। লিপিকাও নীরব পর্ণার মতো।

লিপিকার মৃত্যুর তদন্ত করতে এসে এত তাড়াতাড়ি ওর মৃত্যু-রহস্যের ওপরে যবনিকাপাত হয়ে যাবে তা আশা করেননি টালিগঞ্জ থানার ও. সি. প্রশান্ত ব্যানার্জি। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, লিপিকাকে পর্ণা কেন হত্যা করল? আর নিজেই বা কেন সে আত্মহত্যা করল?

তার উত্তরও লেখক সন্ধানী দিল।

বেশ চলছিল লিপিকা দেবীর জীবন। আনন্দে ও অর্থের প্রাচুর্যে দিনগুলো ভালোই কাটছিল তিন বোনের।

পর্ণার রূপ নেই। তাই লিপিকার মতো সোসাইটি গার্ল হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাই বলে লিপিকা তাকে কোনওদিন অবজ্ঞা করেনি। বরং সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব তার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল লিপিকা। ও শুধু টাকা দিয়ে খালাস থাকত। তা ছাড়া সংসারের কথা ভাববার সময় কোথায় লিপিকার! হাই সোসাইটির মনোরঞ্জন করে টাকা লুটবে, না একঘেয়ে গতানুগতিক সংসারের খাতায় নাম লেখাবে!

আশ্চর্য, সেই লিপিকাই তার মত পালটাল শেষপর্যন্ত। অবশ্য ওর মত বদলানোর মূলে লেখক সন্ধানী ও তার লেখাগুলো। লিপিকা প্রথমে লেখকের লেখার প্রেমে পড়ল, তারপর লেখকের।

এবং সব প্রেমের যা পরিণতি হয়ে থাকে, ওদের জীবনেও তাই ঘটতে চলেছিল। অর্থাৎ, ওরা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বলা বাহুল্য পর্ণার অজান্তে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। আর যখন পর্ণা জানল, তখন থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু হল দু-বোনের মধ্যে। পর্ণার ভয় লিপিকাকে হারানোর। আর লিপিকাকে হারানো মানেই সুখ নামক পাখিটা তাদের সংসার থেকে উড়ে যাওয়া।

লেখক সন্ধানীকে বিয়ে না করার জন্য লিপিকাকে অনেক বুঝিয়েছে পর্ণা। কিন্তু লিপিকা সিদ্ধান্তে অটল।

বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেলেছিল লিপিকা। কিন্তু সে-বিয়ে একেবারে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিল পর্ণা—লিপিকার খাবার জলে বিষ মিশিয়ে।

কিন্তু কথা হচ্ছে লিপিকাকে সরিয়ে পর্ণার কী লাভ? যদি ধরা যায়, পর্ণা নির্দোষ প্রমাণিত হত, তাহলে লিপিকাকে সরানোর পর সে কী করত!

তারও একটা যুৎসই যুক্তি দেখাল লেখক।

দীপিকা বিদেশে এতদিন লেখাপড়া শিখছিল। বিদেশেই সে বরাবর মানুষ হয়ে আসছিল। এ পর্যন্ত কেউ তাকে কলকাতায় দেখেনি। লেখক অ্যালবামের রহস্যটা ফাঁস না করে দিলে কেউ জানত না, লিপিকার কোনও যমজ বোন আছে। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে পর্ণা একটি পরিকল্পনা করে নিয়েছিল। সামনের মাসে দীপিকা দেশে ফিরছে। সুতরাং এক ঢিলে দুটো পাখি মারা যাবে।

লেখককেও নিরাশ করা যাবে। সেইসঙ্গে দীপিকা ফিরে এলে ওকে অনায়াসে তাদের সেই তথাকথিত ঘৃণিত সমাজে লিপিকার ভূমিকায় চালিয়ে দেওয়া যাবে।

অদ্ভুত পরিকল্পনা!

তদন্ত

জুন-জুলাই, **১৯৬৬**



তুমি জানো না

অমলেন্দু সামুই

তোমাকে আমি প্রায়ই চিঠি লিখি। সপ্তাহে অন্তত তিনখানা। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখনই সময় পাই—তখনই মনে-মনে কথার পর কথা সাজিয়ে রাখি। তারপর বাড়ি ফিরে দরজায় খিল লাগিয়ে আমার হালকা নীল রঙের প্যাডখানা টেনে নিই। চিঠি লেখার জন্যে তুমি হাল্কা নীল রং খুব পছন্দ করতে। এখন তোমার পছন্দ আমারও পছন্দ হয়ে গেছে। তোমাকে সাদা কাগজে চিঠি লেখার কথা ভাবতেই পারি না। তোমার কাগজের রঙে রং মিলিয়ে লিখতে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই আমি হালকা নীল রঙের প্যাড ব্যবহার করি। যখনই তোমাকে চিঠি লিখতে বসি—তখনই মনে পড়ে তোমার সেই স্বপ্ন-ঘেরা বাড়ির কথা। কথাটা তুমি প্রায়ই বলতে। বলতে—বেশ সুন্দর একখানা বাড়ি হবে। শহরে নয়—গাঁয়ে। অনেক দূরে, আকাশের গায়ে দু-চারটে পাহাড় দেখা যাবে। কাছেই থাকবে ক্ষীণতনু খরস্রোতা নদী। সেই নদীর কাছে একটা একতলা বাড়ি। সামনে থাকবে ছোট একটা গেট। তার ওপর মাধবীলতার আবরণ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি গেটের নীচে ডানদিকে থাকবে ছোট একটা সবুজ রঙের লেটারবক্স। তার গায়ে হলুদ অক্ষরে লেখা থাকবে 'শিউলিবাড়ি'। তোমার নামে বাড়ির নাম। তোমার হয়তো মনে নেই, আমি বলেছিলাম, লেটারবক্সের রং হোক হলুদ—তার ওপর নাম সবুজ রঙে। তাহলে বেশ কিছুটা দূর থেকেই বাড়ির নাম, মালিকের নাম চোখে পড়বে। তুমি বলেছিলে, না, সবুজের ওপর হলুদ লেখাই আমার ভালো লাগে। লেখা দেখার জন্যে তাহলে সবাইকে খুব কাছে আসতে হবে। কাছে এলেই দেখতে পাবে—গেট থেকে লাল সুরকির পথটা সোজা বাড়িটার পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। পথের একদিকে সাদা ফুলের মেলা, অপরদিকে রঙিন ফুলের বাসর। সুন্দর সাজানো-গোছানো দুটি বাগিচা। তুমি 'বাগান' বলতে না—'বাগিচা'।

এর আগে যে-চিঠিখানা তোমাকে লিখেছিলাম—তাতে বলেছি—তোমার স্বপ্নে-ঘেরা বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মধ্যেই ছোট একটা পাহাড়ি জায়গা। কাছে নদীও আছে। কিন্তু লোকবসতি খুব কম। হোক কম—তুমি নিরালাই বেশি পছন্দ করতে। বলতে, সেখানে আমি তো কথা বলব না—শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করব। বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে কোনওকিছু বিচার করব না। হৃদয়ের কাছে যা কাম্য—তাই হবে আমার কাজ।

আমি তোমার কথা শুনে হাসতাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়েও তুমি বড় বেশি ছেলেমানুষি করতে। আমি কিন্তু ওগুলো প্রাণভরে উপভোগ করতাম। তাই তোমার গাম্ভীর্য আমায় ব্যাকুল করে তুলত।

মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের ঢেউ তুলে তোমার গাম্ভীর্যের কারণ খুঁজতাম—কিন্তু পরক্ষণেই তুমি হাসির ঢেউয়ে সবকিছু ভাসিয়ে দিতে। আমার খুব ভালো লাগত। ভালো লাগত তোমার স্বপ্ন, ভালো লাগত তোমার কথা, ভালো লাগত তোমার সবকিছু। আজও ভালো লাগে। গভীর রাতে ঘরের আলো নিভিয়ে যখন বিছানার ওপর কর্মক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিই—হয়তো জানালা দিয়ে একঝলক চাঁদের আলো আলনাটার পায়ের কাছে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে—তখন তোমার পুরোনো কথাগুলো আমার কানের কাছে মধুর স্বরে যেন গান শোনাত। তোমার কণ্ঠস্বর এত মিষ্টি, উচ্চারণ-ভঙ্গি এত সুন্দর ছিল যে, তুমি কথা বললেই মনে হত গান গাইছ। অথচ তোমাকে আমি কোনওদিন গান গাইতে শুনিনি। তুমি আবৃত্তি করতে। বিশেষ করে কবিগুরুর প্রেমের কবিতাগুলো তোমার কণ্ঠে শুনতে ভারী ভালো লাগত।

আজ যদি তুমি এখানে আসতে—দেখতে তোমার স্বপ্ন-ঘেরা বাড়িকে আমি বাস্তবে রূপায়িত করেছি। ঠিক যেখানে যা চেয়েছিলে তুমি—সব সেইভাবেই সাজিয়ে রেখেছি। আলনায় নতুন কেনা আটপৌরে শাড়ি, তার পাশে আমার ধুতি—তোমার শায়া-ব্লাউজ—আমার গেঞ্জি-জামা—সব পাশাপাশি গুছিয়ে রেখেছি। যদি কোনওদিন তুমি এসে পড়—তাহলে অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে—এই বাড়িতেই থাকতে তুমি। তোমার প্রয়োজনের সব জিনিসই আমি কিনে রেখে দিয়েছি। তুমি এলে তোমার এতটুকু অসুবিধে হবে না। কিন্তু তুমি আসবে কি? জানি না—আজও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ কি না। একটা মিথ্যাকে সত্য জেনে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ। অথচ আমাকে জিগ্যেস করবার প্রয়োজনও মনে করোনি। যদি জিগ্যেস করতে—তাহলে জানতে পারতে কতখানি ভুল তুমি করেছিলে। কিন্তু তুমি নিজের অভিমান নিয়েই পড়ে রইলে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না।

যেদিন তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল—সেদিন মুহূর্তের জন্যে এই পৃথিবীটাকে বড় কঠিন বলে মনে হয়েছিল। মায়া-মমতা-ভালোবাসা—সবকিছু যেন বইয়ের ভাষা—বাস্তবের এতটুকু ছাপ নেই। পাশাপাশি দুটো মানুষ যেন প্রয়োজনের জন্যেই কাছাকাছি থাকছে। অন্তরের টান এতটুকু নেই। বড্ড শক্ত মনে হয়েছিল তোমাদের বাড়ির সামনেকার সবুজ ঘাসগুলো। তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমার মেস—পাঁচ মিনিটের পথও নয়—কিন্তু মনে হয়েছিল, ওইটুকু পথ পেরোতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগে গেল। সেদিন মনে হয়েছিল—আমার বেঁচে থাকাটা নিরর্থক। কার জন্যে—কীসের জন্যে বাঁচব—কথাটা আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছিল।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—আমরা কয়েকজন ছাত্র তোমার বাবার কাছে পড়তে আসতাম। তোমার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। আর আমরা একটা ডিগ্রির লোভে বারবার তোমার বাবার কাছে আসতাম। তুমি বোধহয় তখন থার্ড-ইয়ারে পড়ছ। আর তোমার বোন পাপিয়া সবে কলেজে ভরতি হল।

প্রথম দিনেই তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এটি হল আমার বড় মেয়ে, নাম শিউলি। এর সঙ্গে আলাপ করে রাখো। কারণ আমার লাইব্রেরির চাবি এর কাছেই থাকে।

কথাটা বলার ধরনে আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। আমরা মানে—আমি, চন্দন সোম, অনিরুদ্ধ চৌধুরী আর কৌশিক গুপ্ত।

চন্দন সোম অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসেছিল, আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?

প্রশ্নটা তোমাকে করা হচ্ছে বুঝতে পেরেও তুমি একটু অবাক হওয়ার ভান করেছিলে। চোখ দুটো একটু নাচিয়ে বলেছিলে, আমি?

চন্দন সোম বলেছিল, হ্যাঁ—আপনি।

তুমি বলেছিলে, কেন বলুন তো?

তাহলে রোজ সেই জিনিসটা নিয়ে আসব—আর আপনি আমাদের বেশি করে বই দেবেন।

ওভাবে আমি বই দিই না। পড়াশুনোয় যার মনোযোগ বেশি, সে-ই বেশি বই পাবে।

তোমার বাবা হেসে বলেছিলেন, আমার মেয়েটি কিন্তু খুব কড়া। বই নিয়ে খেলা করতে দেখলেই রেগে যাবে।

আরও দু-চারটে হালকা কথাবার্তার পর তোমার বাবা বললেন, এটাকে তোমরা নিজের বাড়ি বলেই মনে করো। যখনই সময় পাবে চলে আসবে, আমার লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করবে। কোনওরকম সঙ্কোচ কোরো না।

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক আলাপে যে-সঙ্কোচ আমাদের ছিল—দু-চারদিনের মধ্যেই সেটা আমরা কাটিয়ে উঠেছিলাম। আমাদের মধ্যে আমিই ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই বোধহয় তোমার দৃষ্টি আমার ওপর আগে পড়েছিল। আমরা আসতাম—কোনওদিন তোমার বাবা থাকতেন—কোনওদিন হয়তো থাকতেন না। আমরা সোজা লাইব্রেরি-ঘরে চলে যেতাম। তুমি কোমরে কাপড় গুঁজে সারা ঘরে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে। এখানে এ-বইটা রাখা, ওখান থেকে সেই বইটা নামানো—শাড়ির আঁচল দিয়ে বইগুলো মুছে যথাস্থানে রাখা—আমরা বইয়ের পাতা খুলে পড়ার চেষ্টা করতাম—আর তার মাঝে লীলায়িত ভঙ্গিতে তুমি ঘুরে বেড়াতে। ওদের কথা জানি না—আমি কিন্তু তোমার উপস্থিতিতে বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ করতে পারতাম না। তোমার আলতা রাঙানো পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তোমাদের বাড়িতে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম—তোমার মাকে কোনওদিন আমরা দেখিনি। অথচ অনুভব করতে পারতাম—তিনি আছেন। তোমার মাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করত। তোমাদের যাওয়া-আসায় যখন দরজার ভারী পরদাটা একটু নড়ে উঠত, সেই ফাঁক দিয়ে আমি তোমার মাকে দেখতে চেষ্টা করতাম। তুমি জানো—আমার মা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছলেন। তাই বোধহয় মা সম্বন্ধে অত দুর্বলতা।

একদিন—মনে আছে—সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারিখটাও আমার মনে আছে। কলিংবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। আমার ভালোও লেগেছিল, আবার ভয়ও করছিল। ভালো লেগেছিল কারণ ভালো লাগাটা ছিল স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বেশি না হলেও—তোমার সম্বন্ধে আমি কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ঘরের আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম বটে, কিন্তু ঘুম আসত অনেক দেরিতে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি যেন তোমাকে দেখতে পেতাম। তুমি কথা বলছ, হাসছ—কিন্তু চোখ দুটি ব্যথামলিন। মনে হয়, কী যেন তুমি বলতে চাও—অথচ বলতে পারছ না। আমি মনে-মনে হাতড়ে মরতাম—কেন অমন সুন্দর চোখদুটি সবসময় ব্যথায় ভরে থাকে? বড্ড জানতে ইচ্ছে করত। অথচ তোমাকে জিগ্যেস করতও ভয় হত, লজ্জা করত। আমার মনে হত—আমার দুঃখের সঙ্গে তোমার ব্যথা ভরা চোখের কোথায় যেন মিল আছে। আর সেই মিল খুঁজতে গিয়ে কত রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়িতে আমি একাই গিয়েছিলাম। তুমি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে, আমাকে সামনে দেখতে পেয়ে বললে, ভেতরে আসুন।

আমি বললাম, স্যার—।

বাড়ি নেই।

তাহলে আমি বরং যাই। পরে আসব'খন।

ওমা, চলে যাবেন কেন?—ভুরু দুটো একটু কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেশ টেনে তুমি বলেছিলে, ভেতরে আসুন।

আমি ভেতরে এসেছিলাম। বুকের ভেতরটা একটা অজানা আনন্দে থরথর করে কাঁপছিল। তোমার কাছাকাছি এলেই ওটা হত। তোমার নির্দেশমতো একটা চেয়ারে বসলাম। তুমি বললে, আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে—একা-একা বোর হয়ে যাচ্ছিলাম।

একা-একা কেন?

বারে—বাবা-মা-পাপিয়া—সব চলে গেল যে!

চলে গেল? কোথায়?

বালিগঞ্জে। পিসিমার বাড়িতে।

ও—তাই বলো। আমি ভাবলাম বুঝি—।

দাঁড়ান—চা তৈরি করে আনি। চা খেতে-খেতে গল্প করা যাবে।

বলে তুমি চলে গেলে। হঠাৎ মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠল। তোমাদের অত বড় বাড়ি। অথচ তুমি-আমি ছাড়া কেউ নেই। মনে-মনে এইরকমই একটা সুযোগ আমি যেন চেয়েছিলাম। একা-একা তোমাকে অনেকগুলো কথা বলবার জন্যে মনের ভেতরটা ছটফট করতে লাগল। অথচ ভয়ও করছিল। যদি তুমি আমাকে ভুল বোঝো! আমার স্বাভাবিক চাওয়াকে যদি হ্যাংলামো ভাব। বলব কী বলব না—মনস্থির করতেই বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তুমি চা নিয়ে ঢুকলে। এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, এই অবসরে তুমি মুখে একবার পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিয়েছ। চোখে আর-একবার কাজলের সূক্ষ্ম রেখা টেনেছ। বুঝতে পারলাম, আমার কাছে তুমি নিজেকে সুন্দরতর করে তোলার চেষ্টা করেছ। সেই মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম যে, আমার প্রতিধ্বনি তোমার হৃদয়েও বাজে। যে-কথাগুলো এতক্ষণ মনের জোরে সংগ্রহ করছিলাম—সেই কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে বলে ফেললাম। লক্ষ করলাম, আমার কথা শুনতে-শুনতে বারবার তুমি ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরলে, ভুরু দুটো কী এক চঞ্চলতায় থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখের দৃষ্টি আরও গভীর হল—তোমার দু-গালে সূর্যাস্তের রং ধরল।

সেদিন আর পড়া হল না। নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আমি চলে এলাম। এর আগে বহুদিন আমি রাত্রে ঘুমোতে পারিনি, কিন্তু সেদিন না ঘুমোতে পারার মধ্যে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এ-জীবনে বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে, একটা আনন্দ আছে। একজন নারীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে যে এত সুখ আছে, তা কে জানত!

তারপর থেকে তোমাদের বাড়িতে আমার যাওয়াটা খুব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল। তোমার বাবা ভাবলেন, আমি বুঝি পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হয়েছি। কিন্তু তোমার মুখে সবসময় একটা দুষ্টু হাসি খেলা করত। সকলের চোখ এড়িয়ে তুমি ইশারায় আমাকে একটু বেশিক্ষণ থাকতে বলতে। আমি যখন রসিকতা করে তোমার সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্কের কথা বলতাম, তুমি কটাক্ষ করে আমাকে শাসন করার ভঙ্গি করতে—আমার খুব ভালো লাগত। ভালো লাগত, বোধহয় তুমি বলেই।

এমনিভাবে আমরা আরও কিছু এগোলাম। বাড়ির সীমানার বাইরেও আমাদের দেখা হতে লাগল। কোনওদিন হেদুয়া, কোনওদিন কলেজ স্কোয়ার, কোনওদিন বা আরও একটু দূরে—বালিগঞ্জ লেকে। মাঝে একদিন তোমার সঙ্গে তোমার বোন পাপিয়াও এসেছিল। পাপিয়াকে আমার খুব ভালো লাগত। অমন বোন যদি আমার একটা থাকত! পাপিয়া মাঝে-মাঝে তোমার সামনে আমাকে 'জামাইবাবু' বলে সম্বোধন করত। তুমি নকল রাগে তার চুল টেনে দিতে।

একদিন তুমি বলেছিলে, সুদীপ্ত, এভাবে আর থাকতে পারছি না। একটা কিছু করা দরকার।

আমি বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, কীসের কী করা দরকার?

অসভ্য! যেন জানে না!

সত্যি বলছি বুঝতে পারছি না।

জানি—তার মানে আমার মুখ থেকে কথাটা শুনতে চাও। বেশ বাবা—তাই বলছি।

—বলে তুমি আনমনে ঘাসের শিষ চিবোতে লাগলে। সেদিনের আবহাওয়াটা ভারি সুন্দর ছিল। সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা। দুপুরের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিকেলে কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যের মুখও দেখা গেছল। আকাশে নীল মেঘের খেলা। বালিগঞ্জ লেকটাকে সেদিন সুন্দরী তরুণীর মতো মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম, কই—বলো।

তুমি আধো-আধো স্বরে বললে, এভাবে আর তোমার অপেক্ষায় বসে থাকতে ভালো লাগে না। কখন তুমি আসবে আর আমি সারাদিন ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখতে-দেখতে পাগল হয়ে যাই। দুপুরটাকে কী বড় লাগে!

আমি কী করব বলো। তবুও তো এখন আমি পড়াশোনার নামে রোজই যাই। আগে যে সপ্তাহে দু-তিনদিন যেতাম—তখন ভালো লাগত কী করে?

আহা—তখন আমি এসব ভাবতাম! তখন তো তুমি শুধু বাবার ছাত্র ছিলে।

আর এখন?

এখন—আমারও ছাত্র হয়েছ।

তাহলে আমাকে কী করতে হবে আদেশ করুন, মাস্টারমশাই।

তোমাকে যাতে সবসময় দেখতে পাই—সেই ব্যবস্থা করো।

অর্থাৎ?

তুমি বাবার কাছে যাও।

সেইদিনই রাত্রে তোমার বাবাকে আমি সব কথা খুলে বলেছিলাম। বলেছিলাম, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে আমি চাই। তোমার বাবা আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, বেশ তো—তার জন্যে এত তাড়া কীসের! পরীক্ষা হয়ে যাক—তারপর একদিন এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে'খন।

কিন্তু সেই সুযোগ আর এল না। একটা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে। একবার জিগ্যেস করবার প্রয়োজনও অনুভব করলে না। তুমি হয়তো জানতে না যে, তোমার বোন পাপিয়ার সঙ্গে চন্দন সোমের ঘনিষ্ঠতা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে আমরা যেমন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ খুঁজতাম—ওরাও তাই করত। কিন্তু নিজেদের নিয়ে আমরা বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম বলে ওদের ঘনিষ্ঠতা আমাদের চোখে পড়েনি। চোখে না পড়লেও পাপিয়া চন্দন সোমকে ভালোবাসত, ভালোবাসত গভীরভাবেই।

তোমার হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। গোড়া থেকেই বলি। একদিন সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তুমি বাড়ি নেই। পাপিয়া একটা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। আমায় দেখে একগাল হেসে বলল, বসুন, সুদীপ্তদা—দিদি একটু বেরিয়েছে।

কোথায় গেছে?

আসবে এখুনি। বসুন না।

বসলাম। অপেক্ষা করতে-করতে ক্রমে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লাম। পাপিয়া বুঝতে পেরে বলল, একটা গল্প বলুন, সুদীপ্তদা—গল্প বলতে-বলতে দিদি এসে যাবে নিশ্চয়ই।

একটা গল্প বলতে শুরু করলাম। গল্প বলতে-বলতে হঠাৎ টেবিলের তলায় একটা খাম নজরে পড়ল। নিচু হয়ে তুলে নিলাম। পাপিয়া দেখতে পেয়ে তড়িৎগতিতে উঠে এল : ওটা আমার চিঠি—দিয়ে দিন, সুদীপ্তদা।

মজা করার জন্যে বললাম, দাঁড়াও—কে দিয়েছে দেখি।

ভালো হচ্ছে না কিন্তু—ওটা আমার পারসোনাল লেটার—আপনি পড়বেন না।

পারসোনাল লেটার! তাহলে তো একবার পড়ে দেখা দরকার।

পাপিয়া আমার হাত থেকে খামখানা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আমিও একবার এ-হাতে একবার ও-হাতে নিয়ে সেটাকে ঘোরাতে লাগলাম।

প্লিজ সুদীপ্তদা—দিয়ে দিন।

কে লিখেছে বলো?

আগে দিন—তারপর বলছি।

উঁহু—অত বোকা আমি নই। আগে বলো—তারপর দেব।

কথা বলতে-বলতেই ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে খামখানা কেড়ে নিতে গেল পাপিয়া। আমি সেই মুহূর্তে হাতটা পেছনদিকে সরিয়ে নিলাম। টাল সামলাতে না পেরে পাপিয়া আমার বুকের ওপর পড়ে গেল।

পারলে না তো!—আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

আপনি ভীষণ অসভ্য! পরের চিঠি দেখতে আছে বুঝি?

ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার আবির্ভাব হয়েছিল ঘরের মধ্যে। সেদিন বুঝিনি—কিন্তু আজ বুঝতে পারি—আমাদের ওভাবে দেখে তোমার মনে একটা নোংরা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। সন্দেহের সঙ্গে ছিল ঈর্ষা। তাই অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলেছিলে, পাপিয়া—আজ লেখাপড়া নেই?

আছে তো। দেখ না দিদি—সুদীপ্তদা আমার চিঠি দিচ্ছে না।

সুদীপ্ত, চিঠিখানা দিয়ে দাও পাপিয়াকে।

সেদিন তোমার এই আদেশকে আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম। তাই চিঠিটা ফেরত দিতে-দিতে বলেছিলাম, নেহাত তোমার দিদির আদেশ—তাই দিলাম—নইলে না-পড়ে কিছুতেই দিতাম না।

পাপিয়া এক হাতে বুকের কাপড় ঠিক করতে-করতে অপর হাত দিয়ে খামখানা আমার হাত থেকে নিল।

তুমি আবার বললে, পাপিয়া—যাও—গিয়ে পড়াশুনো করো।

পাপিয়া তোমার দিকে অপলক তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। বোধহয় তোমার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক রূঢ়তায় সে চমকে উঠেছিল।

পাপিয়া চলে যেতে আমি চেয়ার থেকে উঠে এসে বলেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে? আমি এদিকে সন্ধে থেকে এখানে বসে আছি।

সন্ধে থেকে এসে বসে আছ?

সন্ধে থেকেই তো! পাপিয়াকে জিগ্যেস করে দ্যাখো।

থাক—আর জিগ্যেস করতে লাগবে না। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

আমি একটু হেসে বলেছিলাম, জানো—কাল তোমার বাবাকে বলেছিলাম—।

তুমি উত্তর দিলে, পরে শুনবো'খন, সুদীপ্ত—আজ আমি বড় টায়ার্ড।

আমি আর তোমাকে জোর করিনি। সেদিন যদি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারতাম যে, ওটা তোমার ক্লান্তি নয়—সন্দেহ—তাহলে হয়তো তোমাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেটুকু অনুমান করার মতো সুযোগ তুমি আমাকে দাওনি। তাই তোমাকে বিশ্রাম করবার অবকাশ দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। আপাতদৃষ্টিতে তুমি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলে। লেকে বেড়াতে-বেড়াতে তুমি বলেছিলে, জানো—আমার ভারী ভালো লাগে ভাবতে—বেশ সুন্দর একটা এল-শেপের বাড়ি হবে। সামনে থাকবে ছোট একটা গেট। গেটের ওপর থাকবে মাধবীলতা। সেখান থেকে লাল সুরকি ঢালা রাস্তাটা সোজা চলে যাবে বাড়িটার পায়ের কছে। রাস্তার দু-দিকে থাকবে ফুলের বাগিচা। একদিকে সাদা, আর একদিকে রঙিন ফুলের মেলা। গেটের কাছে একটা লেটার বক্স। সবুজ রঙের। তার ওপর হলুদ রঙে ঠিকানা লেখা থাকবে।

সেদিনই মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তোমার মনের মতো করে একখানা বাড়ি তৈরি করব। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিছু টাকা আমার ছিল। সেই টাকা দিয়ে তোমার স্বপ্ন আমি সফল করে তুলব। কিন্তু তুমি তখন সন্দেহের দোলায় দুলছ। ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলছ। পাপিয়া আর আমাকে একসঙ্গে দেখলেই তোমার চোখদুটো জ্বলে উঠত।

তারপর একদিন সেই ভয়ঙ্কর দিনটা এগিয়ে এল। মনে আছে, কী-একটা উপলক্ষে সেদিন আমাদের সবাইয়ের নেমন্তন্ন ছিল তোমাদের বাড়িতে। হইহই করে আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পড়েছিলাম। তোমার আবৃত্তি, পাপিয়ার গান আসরটাকে বেশ জমিয়ে রেখেছিল। তারপর খাওয়ার সময় এল। আমরা চার বন্ধু একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম।

চন্দন তোমাকে বলেছিল, আপনারাও আমাদের সঙ্গে বসে পড়ুন। মিথ্যে রাত বাড়িয়ে লাভ কী।

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, মেয়েদের এখন খেতে নেই। সবাইকে খাইয়ে তারপর খেতে হয়।

চন্দন বলল, আপনি দেখছি এখনও সেই পুরাকালে পড়ে আছেন।

তুমি হেসে জবাব দিলে, ভুলে যাবেন না, খাওয়ার ব্যাপারটা সেই পুরাকালেও ছিল।

অস্বীকার করছি না। তবে পুরাকালে তো অনেক কিছুই ছিল, তার সবগুলোই কি আপনি মানেন?

তুমি ঈষৎ কটাক্ষে বলেছিলে, যেমন?

পুরাকালে তো মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলত না।

সেটা মানতে পারলে ভালোই হত দেখছি—তাহলে এভাবে ঝগড়া করতে হত না।

আমরা সকলে হেসে উঠলাম। চন্দন বলল, তাহলে হার স্বীকার করলেন তো?

এখনও করিনি। ঝগড়াটা মুলতুবি রইল। পরে একদিন বোঝাপড়া করা যাবে'খন।

তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আর আমার তো চিরকাল মনে থাকবে, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলোনি। ইচ্ছে করেই বলোনি। নিজেকে জোর করে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছিলে। এমনকী, পরিবেশন করার সময় একবারও মুখ ফুটে জিগ্যেস করোনি, আমার কোনওকিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। ব্যাপারটা সকলেরই চোখে পড়েছিল। পরের দিন পাপিয়ার মৃত্যুর খবরটা দিতে এসে চন্দনও আমাকে বলেছিল। আর সেইজন্যেই আমার সঙ্গে তোমার কথা না বলাটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল আমার কাছে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়েছিল। আর ঘুম ভাঙার পর তোমার কথাই প্রথম মনে পড়েছিল। এরকম প্রায়ই হয় আমার। ঘুম ভাঙার পরেও যখন বিছানায় পড়ে থাকি—তখন শুধু তোমার কথাই মনে হয়। সেদিনও হয়েছিল। আগের রাত্রে তোমার কথা-না-বলা থমথমে মুখখানা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

আগের রাতে খাওয়ার শেষে যখন পাপিয়া আমায় ডাকল, সুদীপ্তদা—আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। তখন মুহূর্তের জন্যে তোমার চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল। আমি না-দেখার ভান করে পাপিয়ার সঙ্গে ওর ঘরে গিয়েছিলাম। তোমরা দু-বোন একই ঘরে শুতে। দেখেছিলাম খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো মেয়েলি ঘর একখানা। আর ঢুকতেই নাকে একটা অপরিচিত গন্ধ এসে লেগেছিল। হতে পারে ওটা তোমাদের চুলের গন্ধ, হতে পারে ওটা পুরোনো কোনও সেন্টের গন্ধ। এমনকী শুকনো ফুলের গন্ধ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ঘরে পা দিতেই পাপিয়া বলল, বসুন।

আমি বসলাম। পাপিয়া দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর বলল, কেন ডেকেছি বুঝতে পারছেন?

বললাম, ওই যে কী একটা দেখাবে বললে।

ছাই দেখাব।—বলে আঙুল দিয়ে বালিশের ওপর দাগ কাটতে লাগল। আমি বেশ অসহায় বোধ করলাম। ঠিক এইভাবে এত রাতে অনাত্মীয়া কোনও যুবতী মেয়ের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলতে আমি অভ্যস্ত নই। নিজের চঞ্চলতা ঢাকার জন্যে পাশবালিশটা কোলের ওপর টেনে নিলাম।

আমি চুপ করে রইলাম। মনের উত্তেজনা বাড়তে লাগল।

পাপিয়া বলল, আমার কথাগুলো শুনে আপনি যদি আমাকে একটা খারাপ মেয়ে ভাবেন—তাহলে দোষ দেওয়ার মতো কিছু নেই। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম—আপনি ছাড়া আমার কোনও গতি নেই। কথা দিন—আমাকে সাহায্য করবেন।

ভেতরে-ভেতরে আমি ঘামতে শুরু করলাম। তবুও যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললাম, আগে সব কথা খুলে বলো।

আপনি বাবাকে বলে আমার আর চন্দনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।

পাপিয়ার স্পষ্ট কথায় একটু চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা জানা ছিল বলে বেশ স্বাভাবিকভাবেই বললাম, বেশ তো—তার জন্যে এত তাড়া কেন? ধীরে-সুস্থে একদিন বললেই হবে।

না—আর দেরি করা যায় না।

কেন? দেরি করা যায় না কেন! আগে তোমার দিদির বিয়ে হোক—তারপর তো—।

দিদির কথা জানি না। কিন্তু আমার এখুনি বিয়ে হওয়া উচিত।

মনের মধ্যে একটা ছোট্ট সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পাপিয়ার দেহটা দেখতে লাগলাম।

পাপিয়া মাথা নিচু করল। বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝেছেন—আমি মা হতে চলেছি।

বালিশ ফেলে দিয়ে তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম : কী বলছ তুমি পাপিয়া?

আপনি আমাকে বাঁচান, সুদীপ্তদা।

চন্দন জানে?

হ্যাঁ।

কী বলছে ও?

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

স্কাউন্ড্রেল।

একটা তীব্র ঘৃণায় সারা দেহটা রি-রি করে উঠল আমার। ভাবতে লজ্জা হল—চন্দন আমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাপিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, তুমি কিছু ভেবো না পাপিয়া, আমি এখুনি চন্দনকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে চন্দন ঘরে ঢুকল।

আমাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই, সুদীপ্ত। পাপিয়া যদি আমার কথা শুনত—তাহলে এসব কিছুই হত না। আমি ওকে অনেক বলেছি—ডাক্তার সরকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।

পাপিয়া গর্জে উঠল, থাক—তোমাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম যে, শুধুমাত্র ক্ষণিক আনন্দের জন্যে তুমি—।

আর বলতে পারল না পাপিয়া—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

চন্দন আমাকে বলল, তুই নীচে যা, সুদীপ্ত—আমি ওকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি।

চন্দনের দিকে অপলক তাকিয়ে বারান্দায় পা দিলাম আমি। ওদের ব্যাপার—ওদের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়াই ভালো। কয়েক পা এগিয়েছি, চন্দনের কণ্ঠস্বর কানে এল, কেন তুমি সুদীপ্তকে এ-কথা বললে?

আর দাঁড়ালাম না। হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। সিঁড়ির মুখে তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে। আমি চলে এলাম।

পরের দিন সকালে চন্দন এসে খবর দিল—পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে। চমকে উঠলাম খবরটা শুনে। কয়েক মিনিট আমি কোনও কথা বলতে পারিনি। ঘৃণিত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম।

চন্দন বলল, নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে, সুদীপ্ত। কিন্তু পাপিয়া যে এতখানি ছেলেমানুষি করে ফেলবে ভাবতেও পারিনি।

গম্ভীর গলায় বললাম, পাপিয়ার আত্মহত্যাকে তাহলে তুমি নিছক একটা ছেলেমানুষি ভাবছ?

তা ছাড়া আর কী ভাবব বলো। ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে—এভাবে হঠাৎ—।

আরও অনেক কথা বলেছিল চন্দন। কিন্তু সেসব শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। চন্দনের সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম—তখন পুলিশ এসে পড়েছে। তোমার বাবা পাথর হয়ে একটা সোফায় বসে আছেন। চারিদিকে এক নিদারুণ স্তব্ধতা।

পুলিশ গতানুগতিক পদ্ধতিতে সবাইকে কিছু-কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পাপিয়ার দেহ নিয়ে চলে গেল শবব্যবচ্ছেদের জন্যে।

সকলে জানল—পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে। চন্দনের কাছেই শুনলাম, তোমার ধারণা পাপিয়ার আত্মহত্যার জন্যে পরোক্ষভাবে আমিই দায়ী। আমিই নাকি তাকে অকাল মাতৃত্বদানে কলঙ্কিত করেছি। আমাদের এতদিনের মেলামেশা—এত ভালোবাসার পর তুমি যে আমার সম্বন্ধে এরকম একটা বিশ্রী ধারণা করে বসবে বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই সেই মুহূর্তেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। সেদিনও তোমাদের বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। মনের মধ্যে তীব্র একটা উত্তেজনা নিয়ে কলিংবেল বাজিয়েছিলাম। তুমি এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলে।

তোমাকে দেখে একরাশ আশা নিয়ে কথা শুরু করলাম, এই যে, শিউলি—শুনলাম তুমি নাকি চন্দনের কাছে বলেছ—।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমি রূঢ়ভাবে বলেছিলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছল। চোখের সামনে থেকে তোমাদের বাড়িটা মুছে গিয়ে একরাশ গাঢ় অন্ধকার জমা হয়ে গেছল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর পা চালালাম মেসের উদ্দেশে। তোমাদের বাড়ির দরজা থেকে আমার মেস—পাঁচ মিনিটের পথও নয়—কিন্তু মনে হয়েছিল ওইটুকু পথ পেরোতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগে গেল।

কিছুদিনের বিরতি দিয়ে আবার আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, তুমি একটা স্কুলের চাকরি নিয়ে বিহারের কোন এক গ্রামে চলে গেছ। বুঝেছিলাম, তুমি আমাকে এড়ানোর জন্যেই ওভাবে চলে গেছ। আমার সঙ্গ তুমি চাও না—তাই তোমার এই অসহায় পলায়ন। তোমার ঠিকানায় অনেক চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু একটারও জবাব আসত না। মাঝে-মাঝে তোমার বাবার কাছে যেতাম। তিনি তখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

বলতেন, বুঝলে সুদীপ্ত—শেষ জীবনে কোথায় একটু শান্তিতে দিন কাটাব ভেবেছিলাম—কিন্তু ভগবান তা চাইল না। এক মেয়ে আত্মহত্যা করল—আর-এক মেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

আমি তোমার মায়ের কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, তিনি সযত্নে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। পরে অবশ্য জেনেছি—কেন তোমরা তোমাদের মাকে এড়িয়ে চলতে, কেন তিনি রান্নাঘরের বাইরে আসতেন না। কিন্তু সে-কাহিনি এখানে অবান্তর। তা ছাড়া তুমি তো সবই জানো, তোমাকে নতুন করে শোনাবার মতো কিছুই নেই।

তুমি চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন বিশ্রী এক অবসাদের মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে লাগল। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হত—তোমার কাছে চলে যাই, তোমাকে সব বুঝিয়ে বলি। কিন্তু অভিমান এসে পথ আটকে দাঁড়াত। এতদিনেও আমি যখন তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি, তখন এই ক্ষণিক চেষ্টায় সেটা কি ফিরিয়ে আনতে পারব? তাই তোমাকে শুধু চিঠিই লিখতাম। রোজ ভাবতাম, আজ তোমার চিঠি আসবে। আজ না এলে কাল নিশ্চয় আসবে।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় থেকে-থেকে যখন একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছি—তখন হঠাৎ তোমার একখানা চিঠি এল। সেটাই তোমার শেষ চিঠি। তারপর আরও একবছর কেটে গেছে। তোমার কোনও সন্ধান পাইনি।

তুমি লিখেছিলে, তোমার চিঠিখানাই উদ্ধৃত করছি :

আমার সুদীপ্ত,

তুমি যখন আমার এই চিঠিখানা পাবে তখন আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি—ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাব—এখনও কিছু ঠিক করিনি। শুধু অনুরোধ, আমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা কোনওদিন কোরো না। সন্ধান তুমি পাবে না। পেলেও

আমি ধরা দেব না। এতদিন একা-একা নিজেকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছি—ধিক্কার দিয়েছি—কিন্তু এতটুকু শান্তি পাইনি। মনের কথা মনে চেপে রাখলে বুঝি কোনওদিনও শান্তি পাওয়া যায় না। তাই তোমার কাছে তোমার এই স্বীকৃতি। আশা আছে, এখন বুঝি একটু শান্তি পাব। তোমরা সবাই জানো, পাপিয়া আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি—তাকে হত্যা করা হয়েছে। হ্যাঁ সুদীপ্ত, আমি পাপিয়াকে খুন করেছি। খুন করেছি, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে। সেদিন যখন অত রাত্রে পাপিয়ার ঘর থেকে তোমাকে বের হতে দেখলাম তখন সারা মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে—অথচ আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করবে—কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই সকলের অজান্তে পাপিয়ার জলের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম, রোজ রাত্রে শোওয়ার আগে ওর জল খাওয়ার অভ্যেস আছে। তাই ওকে মারার জন্যে আমাকে নতুন কোনও পথ বাছতে হয়নি। এক গ্লাস জল আর ছ'টা ঘুমের ট্যাবলেট। দেখলে তো, পাপিয়ার সে-ঘুম আর কোনওদিন ভাঙল না!

আজ আমি বুঝেছি—আমার সন্দেহ কতখানি ভুল ছিল। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হত, তাহলে আমি এখানে চলে আসার পরও সপ্তাহে দু-খানা করে তোমার চিঠি আসত না। কিন্তু ভুল শোধরাবার আর সময় নেই।

জানতাম, আমি স্বীকার না করলে কেউ কোনওদিন বুঝতেও পারবে না যে, পাপিয়া আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন তুমি ইচ্ছে করলে আমার এই চিঠিখানা পুলিশের হাতে দিয়ে আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো—আমি আর কোনও কিছুতেই ভয় পাই না। সবকিছুর জন্যে তৈরি হয়ে আছি। ইতি—

তোমার শিউলি।

না শিউলি, তোমার এই চিঠিখানা আমি পুলিশকে দেখাইনি। কোনওদিন দেখাতেও পারব না। সকলে যা জেনেছে—সেটাই সত্যি হয়ে বেঁচে থাকুক। কিন্তু তুমি আর আমাকে এভাবে কষ্ট দিও না। তোমাকে আমি আজও চাই। হ্যাঁ—তুমি খুনি জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে চাই। এভাবে আমার সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলো না। যেখানেই থাকো—ফিরে এসো। ফিরে এসো আমার কাছে—তোমার স্বপ্ন-ঘেরা বাড়িতে।

মাসিক রহস্য পত্রিকা

জুন-জুলাই ১৯৬৭



দাঁত থেকে সাবধান

শ্রীধর সেনাপতি

সবিতা চৌধুরী টেলিফোন করেছিলেন, স্যার।

একমনে একটা বিদেশি মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিলেন ডাঃ পরিমল সেন। জার্নালের পাতা থেকে তিনি চোখ তুললেন।

রিনি আবার বলল, সবিতা দেবীর ইনসিসরের রেডিয়োগ্রাফ করার কথা ছিল?

নার্সের মুখের দিকে কিছুকাল অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর ডাঃ সেন বললেন, হ্যাঁ। মিসেস চৌধুরীর ওপর পাটির সামনের দাঁতটার গোড়ায় ঘা অনেকটা ভেতরে ছড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তা মিসেস চৌধুরী টেলিফোনে কী বললেন?

রিনি বলল, আজ হবে না। কাল আপনার চিঠি নিয়ে তিনি রেডিয়োলজিস্টের কাছে যাবেন।

আচ্ছা, কাল রাতে আমি চেম্বার থেকে চলে যাওয়ার পরে আবার কি সেই লোকটি ফোন করেছিল?

কার কথা বলছেন, স্যার? সেই নিশিকান্ত বাগচী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—।

রিনি চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার, ভীষণ জ্বালিয়েছে। আমি বলেছি, আজ আর নতুন কোনও রুগি আপনি অ্যাটেন্ড করবেন না। কিন্তু নিশিকান্তবাবুর সেই এক রিকোয়েস্ট : তাঁর একটা ব্যবস্থা আজ করে দিতেই হবে।

সাধারণত আগে থেকে যোগাযোগ করা না থাকলে ডাঃ সেন তেমন রুগি দেখেন না। তিনি অভিজ্ঞ ডেনটিস্ট। কয়েকটি হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। কাজেই সময় তাঁর বাঁধাধরা।

চেম্বারের কাজ শেষ করতে প্রায় একটা বেজে গেল। ক্লান্তি বোধ করা স্বাভাবিক। রিনিকে চেম্বারের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে চাইলেন তিনি।

রিনি ফিরে এল।

স্যার!

কী হল?

সেই ভদ্রলোক—নিশিকান্ত বাগচী এসেছেন।

ডাঃ সেনের পক্ষে চেয়ারে শুয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠলেও তা প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন না তিনি।

রিনি নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে রিনিকে পাশ কাটিয়ে ডাঃ সেনের সামনে এসে নিশিকান্ত হাসিমুখে নমস্কার জানাল। চেহারা খর্বাকৃতি, পেশিবহুল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। ডাঃ সেনের প্রথম যেদিকে চোখ পড়ল সেটা হল নিশিকান্তের নোংরা দাঁতের পাটির দিকে।

ইঙ্গিতে ডেন্টাল চেয়ার দেখিয়ে ডাঃ সেন বললেন, বসুন।

তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে পারলেই তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

রিনি ওয়েটিংরুমে চলে গেল।

আরাম করে বসুন। বলুন, কী কষ্ট?—পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করেন ডাঃ সেন।

নিশিকান্ত বলে, সারা মুখ জুড়ে একটা যন্ত্রণা, ডাক্তারবাবু। ওপর-নীচ দুটো মাড়িই যেন পাকা ফোড়া।

বলে চোখ বুজে হাঁ করে নিশিকান্ত।

ডাঃ সেনের দৃষ্টি কষের দাঁতের দিকে ছুটে যায়। দ্বিতীয় মোলারে একটা গর্ত। এদিকে-ওদিকে আরও কয়েকটা গোলমাল চোখে পড়ল।

কী দেখলেন, ডক্টর সেন?—নিশিকান্ত শুধোয়।

কয়েকটি দাঁতে ক্যাভিটি হয়েছে। সেকেন্ড মোলারের ক্যাভিটিই বেশি কষ্ট দিচ্ছে আপনাকে।

দাঁতটা তুলে দেবেন, না ড্রিল করবেন?

ডাঃ সেন বললেন, নড়ছে না তো! ড্রিল করে দেব। তাতে কষ্ট হবে না।

না। দাঁতে একে গর্ত হয়েছে, তাতে আবার আপনি ড্রিল করে গর্তটা বাড়িয়ে দেবেন? আমি রাজি নই।

তবে আমার কাছে এসেছেন কেন?—রেগে ওঠেন ডাঃ সেন : আমার ফিজ দিয়ে আপনি এখন চলে যেতে পারেন।

ফিজ আপনার নিশ্চয়ই দেব।—নিশিকান্তর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে এবার : আসলে আমি আপনার রুগি নই, ডক্টর সেন। রুগি সাজার ফলে আপনার কাছে আসা আমার পক্ষে একটু সহজ হয়েছে।

ডাঃ সেন চমকে উঠে লক্ষ করলেন, নিশিকান্তর দুটো চোখে ফুটে উঠেছে ধূর্ততার ছায়া।

পরমুহূর্তেই ভয়ে কেঁপে ওঠে তাঁর গলার স্বর, আপনি কী চান, মিস্টার বাগচী?

ঘরের একপাশে রয়েছে ফাইল ক্যাবিনেটে। সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টি ফেলে নিশিকান্ত বলে, আমার এক বন্ধু নতুন ডেন্টাল সার্জন হয়েছে। অভিজ্ঞতা নেই, বুঝতেই পারছেন। আপনার ওই ফাইলগুলো আমি কিনে নিতে চাই।

ডাঃ সেন ঢোক গেলেন।

কিন্তু ওগুলো আমার রুগিদের রেকর্ড। বিক্রি করার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়নি!

তা আমি জানি।—নোংরা দাঁতের পাটি বের করে হেসে নিশিকান্ত বলে, ওদের কাজ তো হয়ে গেছে। আমি হাজারখানেক টাকা দিচ্ছি, পুরোনো রেকর্ডগুলো আমাকে দিয়ে দিন।

ডাঃ সেন এবার নিজেকে কিছুটা সামলে নেন : ফাইলগুলো নিয়ে আপনার বন্ধু ডেনটিস্টের কোনও উপকারই হবে না, মিস্টার বাগচী। আমার এখনকার এবং পুরোনো সমস্ত রুগির দাঁতের অবস্থা, ট্রিটমেন্টের কথা, সবকিছু ফাইলগুলোতে লেখা রয়েছে। সেসব খবর নিশ্চয়ই বিক্রির জন্যে নয়!

নিশিকান্ত বলে, দর কষাকষি আর করতে চাই না, স্যার। দু-হাজার টাকাই রাখুন। দিয়ে দিন।

ডাঃ সেন আর পারেন না। চিৎকার করে ডাকেন, রিনি!

ডেন্টাল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় নিশিকান্ত।

ঠিক আছে। আমি এখন চলে যাচ্ছি। আপনি আরও একটু ভেবে দেখুন। কাল আবার আসব। কিন্তু বন্ধুকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, ডক্টর সেন। সে আমার ওপরে...।

রিনি ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে : স্যার!

আচ্ছা, ডাক্তার সেন, আপনার ফিজ এই ষোলো টাকা টেবিলে রেখে গেলাম। পরে যেদিন আসব, দাঁতটার ব্যবস্থা করে দেবেন। নমস্কার।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল নিশিকান্ত।

ডাঃ সেন একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। রিনিকে বললেন, এ-বেলার মতো চেম্বার বন্ধ করে দাও।

পরদিন সকাল দশটায় রিনি ডাঃ সেনকে বলল, আমি ভদ্রলোককে বলেছি, এখন আপনি ব্যস্ত আছেন—।

কাকে?

নিশিকান্ত বাগচীকে। তিনি টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

টেলিফোন থাকে ওয়েটিংরুমে। ডাঃ সেন গিয়ে টেলিফোন ধরলেন।

টেলিফোনের ওপার থেকে নিশিকান্ত বলল, আমার প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কী ঠিক করলেন, ডক্টর সেন?

শেষ কথা তো বলে দিয়েছি আপনাকে! ফাইলগুলো বিক্রির জন্যে নয়।

না, ডক্টর সেন, আমার প্রতি এতটা অকরুণ হবেন না। প্লিজ! বেশ, তিন হাজারই দেব!

ন-না!—রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইলেন ডাঃ সেন : আপনার দাঁতের সম্বন্ধে যদি কিছু বলার থাকে, বলুন। তা না হলে আমার আর সময় নষ্ট করবেন না। আমি টেলিফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

নিশিকান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওদিকে : আহা-হা! ছাড়বেন না। আমার দাঁতের অবস্থার কথাই বলছি। দাঁতের গর্তটা ভরাট করেই দেবেন। আজ সাড়ে পাঁচটায় আমি যাচ্ছি। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েই যাব, ডক্টর সেন।

বিষয়টা নিয়ে ডাঃ সেন সারাদিনই ভেবেছেন। একের পর এক রুগি এসেছে। কাজ করেছেন। কারও দাঁত তুলে দিয়েছেন। ক'টি পোকায় খাওয়া দাঁত মার্কারিতে ভরাট করেছেন। দেখেছেন দুটি জিনজিভাইটিস রুগি। তবু নিশিকান্ত বাগচীর চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পারেননি তিনি। ভেবেছেন, আর অবাক হয়েছেন।

রিনি কোনও ব্যক্তিগত কারণে বিকেলটা ছুটি নিয়েছে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় নিশিকান্ত এসে হাজির। এসেই শুয়ে পড়েছে ডেন্টাল চেয়ারে।

ভেবে দেখেছেন, ডক্টর সেন?

হ্যাঁ, ভেবেছি। খুব বেশি সময় লাগবে না। আপনার ওই দাঁতটায় সামান্য একটু ড্রিলিং করে গর্তটাকে ভরাট করে দেব। টেম্পোরারি ফিলিং। দু-দিন পরে আবার আসবেন। তখন ফিনিশ করব।

নিশিকান্ত বলল, আপনি ডাক্তার। যা ভালো বোঝেন করুন।

কাজে মন দিলেন ডাঃ সেন। নিশিকান্তকে নিয়ে তিনি এখন আর উদ্বেগ বোধ করছেন না। সব রুগিই তাঁর কাছে সমান। তারা সবাই হাঁ করে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে ডাঃ সেনের চোখের সামনে। নিপুণ অভ্যস্ত হাতে নিশিকান্ত বাগচীর দাঁতের গর্তে ড্রিল চালান ডাঃ সেন। সাময়িকভাবে গর্তটিকে ভরাট করে রাখার জন্য যেমনটি প্রয়োজন তার বেশি আর-কিছু করেন না।

ব্যথা লাগল?—কাজ শেষ করে ডাঃ সেন জিগ্যেস করেন।

না, ডক্টর সেন।—চোয়ালে হাত বুলোতে-বুলোতে নিশিকান্ত উত্তর দেয়। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বের করে সে। ডাঃ সেনের হাতে সেটা দিয়ে বলে, তিন হাজারই আছে।

না।—দৃঢ় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন ডাঃ সেন আমি দুঃখিত। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, মিস্টার বাগচী। টাকার কোনও প্রশ্ন এখানে নেই।

একটা হাসিখুশি ভাব ফুটে উঠেছিল নিশিকান্তর মুখে। দপ করে সেটা যেন নিভে গেল। খামটা ফিরিয়ে নিল সে।

আপনি যে এ-কথা বলবেন, এটা আমার বরাবরই ভয় ছিল। তবু আশা করেছিলাম, আপনি শেষপর্যন্ত রাজি হয়তো হতে পারেনও!

নিশিকান্ত জামার পকেটে হাত ভরল। টেনে বের করে আনল একটা পিস্তল।

ফাইলগুলো আমার হাতে তুলে দিন এবার, ডক্টর সেন!

এ-কাজ আপনি করতে পারেন না।—পিস্তলের নলের ওপরে নজর রেখে বললেন ডাঃ সেন : এ তো রীতিমতো ডাকাতি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। ডাকাতিই মনে করুন। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। A থেকে Z পর্যন্ত—সব ফাইল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ডাঃ সেনের বুক ঢিপঢিপ করছে। ড্রয়ার খুলে তিনি সমস্ত রুগির রেকর্ড তুলে দিলেন নিশিকান্তর হাতে।

দুই বগলে ফাইলগুলো চেপে ধরে উধাও হয়ে গেল নিশিকান্ত বাগচী।

কয়েক মিনিট শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ ফাইল-ক্যাবিনেটের দিকে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ সেন। তারপর টেলিফোনের কাছে দৌড়ে গেলেন।

হ্যালো...মুচিপাড়া থানা? আমি ডক্টর পরিমল সেন কথা বলছি। দয়া করে গোয়েন্দা দপ্তরের কোনও অফিসারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দেবেন একটু?

ক্লিক করে একটা শব্দ উঠল। তারপরেই ডাঃ সেন শুনতে পেলেন : হ্যালো...বলুন, ডক্টর সেন, কী বলতে চান? আমি ইন্সপেক্টর শিশির সিংহ।

ডাঃ সেন বললেন, শুনুন ইন্সপেক্টর, আমি একজন ডেন্টিস্ট। লোয়ার সার্কুলার রোডে আমার চেম্বার। এইমাত্র একজন অ্যান্টিসোশাল পিস্তল দেখিয়ে আমার সমস্ত রুগির রেকর্ড নিয়ে পালিয়েছে। হালে কোথাও কোনও খুন-টুন হয়নি তো? এমন কোনও কি আপনারা বডি পেয়েছেন, যাকে শনাক্ত করা যায়নি?

আপনার প্রশ্নগুলোর মানে বুঝতে পারছি না, ডক্টর সেন।

বুঝতে পারছেন না! এই লোকটা প্রথমে রেকর্ডগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চায়। আমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় পিস্তল উঁচিয়ে জোর করে সেগুলো নিয়ে গেল। যদি হালে আপনারা কোনও ডেডবডি পেয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো এই লোকটা চেষ্টা করছে যাতে সেই বডিটা শনাক্ত করা না যায়...।

আপনি আপনার চেম্বারের অ্যাড্রেসটা বলুন, ডক্টর সেন। আমরা এখুনি ওখানে যাচ্ছি।

ডক্টর সেন ঠিকানা জানালেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চেম্বারে এসে হাজির হলেন ইন্সপেক্টর শিশির সিংহ। শুধোলেন, একটা খুন সম্বন্ধে আপনি কী করে এতটা শিয়োর হলেন, ডক্টর সেন?

ডক্টর সেন ব্যাখ্যা করে বলেন, এরকম ঘটনা তো হামেশাই ঘটতে দেখা যায়, ইন্সপেক্টর। খুন করার পর খুনি ডেডবডিটা এমনভাবে বিকৃত করে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করে, যাতে সেটা শনাক্ত করা না যায়। আগুনে কিছুটা পুড়িয়েও রেখে যায় কখনও-কখনও। তখন মৃতদেহের মুখ দেখে চেনা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে তার দাঁত দেখে অনেক সময়ে পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সাধারণত প্রত্যেক ডেনটিস্ট রুগির একটা করে রেকর্ড রাখেন। আঙুলের ছাপের চেয়ে সেটা কিছু কম নয়!

শিশির সিংহ বললেন, কিন্তু আপনার রেকর্ড যে-লোকটি চুরি করে নিয়ে গেছে...।

ডক্টর সেন বললেন, প্রথমে চুরি করতে চায়নি। বিনিময়ে আমাকে তিন হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি রাজি না হওয়ায় সে ওই পথ বেছে নিয়েছে। কেন, আন্দাজ করতে পারেন? আমার কোনও একটি পেশেণ্ট হয়তো ওর ভিকটিম হয়েছে। হয়তো আমার একটি কার্ড তার পকেটে পেয়েছে ওই লোকটি। কিংবা যদি মৃতদেহ শনাক্ত করা না গিয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতেও যাতে তা করতে না পারা যায়, খুনি এখন সেই চেষ্টাই হয়তো করছে। বুঝতে পারছেন, ইন্সপেক্টর? আপনাদের ইনভেস্টিগেশানে খুনি বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। রিসেন্টলি এমন কোনও ডেডবডি আপনারা পেয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ।—গম্ভীর গলায় বললেন শিশির সিংহ, তিনদিন আগে পাওয়া গেছে। রাস্তার ধারে ইট-পাথর ঝোপঝাড়ে ভরা পরিত্যক্ত একটা মাঠের ভেতরে। বডিটা কেউ পেটল দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চেয়েছিল।

নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে ডাঃ সেন বললেন, নিশ্চয়ই সে আমার কোনও পেশেন্ট। আপনাদের এখন যা করা উচিত, শুনুন। আমি যেসব পেশেন্ট দেখেছি তাদের প্রত্যেকের খবর নিন আপনারা। দেখুন, হুইচ ওয়ান ইজ মিসিং। তারপর নিশিকান্ত বাগচীর খোঁজ করুন।

ওই লোকটা?

হ্যাঁ। নিশিকান্ত বাগচী। ও-ই খুনি!

শিশির সিংহ মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন : এখন নিশিকান্তকে খুঁজে বের করা কি সহজ হবে? সে আপনার সমস্ত রুগির রেকর্ড নিয়ে কোথায় কী করবে, কে বলতে পারে! ক্যান ইউ ডেসক্রাইব দিস নিশিকান্ত বাগচী?

নিশ্চয়ই। তবে তার চেহারার বর্ণনা শুনে আপনারা হয়তো বেশিদূর এগোতে পারবেন না, ইন্সপেক্টর। যাতে সোজাসুজি সে আপনাদের হাতে ধরা দেয়, তার উপায় আমি বলে দিচ্ছি।

হাঁ করে কষের একটা দাঁত দেখিয়ে ডাঃ সেন আরও বললেন, এই দাঁতটি সেকেন্ড মোলার। নিশিকান্ত যখনই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল, তখনই তার সম্পর্কে আমি সজাগ ছিলাম। তার ওই দাঁতটিকে ড্রিল করে এমন একটা গর্ত করে দিয়েছি, যা গভীর হয়ে সেই দাঁতের গোড়ার নার্ভকে প্রায় টাচ করেছে। তারপর ওষুধ দিয়ে সেই গর্তটাকে টেম্পোরারিলি ভরাট করে দিয়েছি। দশ-পনেরো মিনিট, বা বড়জোর আধঘণ্টা, নিশিকান্ত কিছু টের পাবে না। তারপর তার ওই দাঁতে শুরু হবে অসহ্য যন্ত্রণা। তখন সে কোনও ডেনটিস্টের কাছে না গিয়ে পারবে না, ইন্সপেক্টর। আপনারা এই এরিয়ার সমস্ত ডেনটিস্টকে গোপনে খবর দিয়ে সজাগ করে রাখুন। নিশিকান্তকে আপনারা পেয়ে যাবেন। মানে, নিশিকান্তর ওই সেকেন্ড মোলারে এমন পেইন শুরু হবে যে, এমন যন্ত্রণা সে কখনও কল্পনা করেনি। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই...মনে হয় এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। অতএব বেশিদূর সে যেতেই পারবে না।

শিশির সিংহ বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে বললেন, ধন্যবাদ, ডক্টর সেন। আবার পরে দেখা হবে।

তাতে অবাক হব না।—উত্তরে বললেন ডক্টর সেন।

মাসিক রোমাঞ্চ
জানুয়ারি, ১৯৬৮



সাপের হাঁচি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষা দিয়ে সুশান্ত তার মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ি, কিন্তু কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়। ডায়মন্ড-হারবার লাইনে রেলে চড়লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেখানে পৌঁছানো যায়।

সকালবেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে সুশান্ত দেখল, মামার বাড়িতে হই-হই কাণ্ড বেধে গেছে! মামা বেশ ভারিক্কি লোক, বয়েস হয়েছে। কিন্তু তাঁর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কখনও দু-হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন, কখনও ভীষণ চিৎকার করে গাঁ-সুদ্ধ লোককে গালাগাল দিচ্ছেন। ওদিকে বাড়ির ভিতরে মামিমা গলা ছেড়ে কান্না শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর গলার আওয়াজ যদিও খুব উঁচুতে উঠছে, তবু তিনি যে কী বলছেন তা একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

মামা যদিও গ্রামের মধ্যে বেশ বর্ধিষ্ণু লোক, তবু তাঁর বাড়ি মাঠ-কোঠার—খড়ের চাল। এ-অঞ্চলে পাকাবাড়ির বড় একটা রেওয়াজ নেই। চণ্ডীমণ্ডপে মামাকে ঘিরে অনেক লোক বসেছিল, সুশান্ত সেখানে গিয়ে মামাকে প্রণাম করে বলল, 'কী হয়েছে মামা?'

মামা মাথা থেকে একমুঠি চুল ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে বাবা! ওই শালা নিধের কাজ। এ আর কেউ নয়। নিধে আজ দেড় মাস হল জেল থেকে বেরিয়েছে। বেটা দাগী চোর! ও ছাড়া আর কারও কাজ নয়।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু হয়েছে কী? নিধে কী?'

মামা গর্জে উঠলেন, 'নিধে? শালা চোর, ডাকাত, বোম্বেটে। দত্তদের বাড়িতে সিঁধ কেটে আড়াই বছর জেলে গিয়েছিল। এবার তাকে ফাঁসি দিয়ে তবে আমি ছাড়ব।'

মামার কাছে কোনও খবর পাওয়া যাবে না বুঝে সুশান্ত বাড়ির ভেতর গেল। সামনেই তার দশ বছরের মামাতো বোন কালীকে দেখে বলল, 'কী হয়েছে রে কালী?'

কালী অমনি কেঁদে ফেলে বলল, 'ও দাদা, আমার টায়রা আর হার—ইঁ—হঁ—ইঁ—।'

সুশান্ত তাকে অনেক প্রশ্ন করল কিন্তু ইঁ-ইঁ-ইঁ ছাড়া আর কোনও কথাই বের করতে পারল না। তখন হতাশ হয়ে মামিমার কাছে গিয়ে বলল, 'মামিমা, তোমাদের কী হয়েছে আমাকে বলবে কি?'

মামিমার কান্না একটু থেমেছিল—আবার আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর তিনি সুশান্তকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই দ্যাখ বাবা, কাল রাত্তিরে চোরে সিঁধ কেটে আমাদের সমস্ত গয়নাগাঁটি চুরি করে

নিয়ে গেছে।'

কালী বলল, 'আমার টায়রা আর হার। ইঁ—ইঁ—ইঁ—।'

সুশান্ত দেখল, সত্যই দেওয়ালে মাটি কেটে একটা গর্ত তৈরি করা হয়েছে। বেশ বড় গর্ত। একটা জোয়ান লোক অনায়াসে তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র ঠিকই আছে, কেবল যে-বাক্সটার মধ্যে গহনা থাকত তার ডালা ভাঙা। ভেতরে কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে সুশান্ত দালানে বসল। মামিমা চোখ মুছতে-মুছতে তাকে মুড়ি আর নারিকেল-নাড়ু এনে খেতে দিলেন।

খেতে-খেতে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কখন তোমরা জানতে পারলে?'

মামিমা বললেন, 'অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনতে পেলুম, পাশের ঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। প্রথমটা ভাবলুম, বুঝি ইঁদুর ধরবার জন্য বেড়াল ঢুকেছে। কিন্তু তারপরই মনে হল, দরজায় তো তালা লাগানো, জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ—বেড়াল ঢুকবে কী করে? তখন তোর মামাকে গা ঠেলে তুললুম। তিনি উঠে তালা খুলে দেখলেন, চোর গয়নার সিন্দুক ভেঙে সমস্ত গয়না নিয়ে পালিয়েছে।'

'কত টাকার গয়না ছিল?'

'তা আমার আর কালীর মিলিয়ে আড়াই হাজার টাকার।' বলে মামিমা ঘন-ঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

'তারপর?'

'তারপর তোর মামা চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড়ো করলেন। সকলেই বলল, এ নিধি হাজরার কাজ। তার মতন পাকা চোর এ-অঞ্চলে আর-একটি নেই। এই সেদিন আড়াই বছর জেল খেটে বেরিয়েছে।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'নিধি হাজরা লোকটা করে কী? খেতখামার আছে?'

মামিমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের নাড়ির খবর জানতেন, বললেন, 'দু-বিঘে জমি আছে বাবা, কিন্তু সে-জমি চাষও করে না, কিছুই না—এমনি পড়ে থাকে। নিধে কাজকর্ম করে না, কেবল খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলে বসে-বসে মাছ ধরে। অথচ পয়সারও কখনও অভাব হয় না। এই তো, জেল থেকে ফিরেই নতুন মাঠ-কোঠা তুলেছে। কোথা থেকে পয়সা পেল ভগবানই জানেন।'

সুশান্ত ভাবতে-ভাবতে বলল, 'হুঁ। তারপর কাল রাত্রে আর কী হল?'

মামিমা বললেন, 'তারপর পুরুষেরা বাইরে কী করলেন তা তো জানিনে বাবা। ওই পেল্লাদকে জিজ্ঞাসা কর। ও বরাবর ওঁদের সঙ্গে ছিল।'

পেল্লাদ বাড়ির চাকর। সে এতক্ষণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। বলল, 'রাত্তিরেই সকলে মিলে ঠিক করলেন, নিধের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক, সে বাড়ি আছে কি না। লণ্ঠন জ্বেলে লাঠিসোঁটা নিয়ে সকলে নিধের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন। নিধে চোখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল, যেন ঘুমুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, ''কী হয়েছে ঠাকুরমশায়রা? এত রাত্রে গোলমাল কীসের?''

'নিধে ভয়ানক ধূর্ত সকলেই জানে। তাই তার কথায় কান না দিয়ে বাড়ির চারিদিকে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। আদাড়-বাদাড়, ঘর-দোর সমস্ত আতি-পাতি করে খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও গয়না পাওয়া গেল না। নিধে দাওয়ায় বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক খেতে লাগল।'

সুশান্ত হেসে বলল, 'ভারী শয়তান তো! তারপর?'

পেল্লাদ বলল, 'কর্তা তখন আমাকে থানায় পাঠালেন। দারোগাবাবুকে খবর দেওয়ার জন্যে। থানা এখান থেকে আড়াই ক্রোশ পথ। ভোর রাত্তিরে গিয়ে দারোগাবাবুকে তুললুম। তিনি সব শুনে বললেন, আজ সকালে আসবেন।'

সুশান্ত মুড়ি চিবোতে-চিবোতে বসে শুনছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মামিমা, গয়না ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি?

মামিমা কেবল মাথা নাড়লেন। কালী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ দাদা, আমার টিয়াপাখির খাঁচাটাও চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'খাঁচা!'

কালী বলল, 'হ্যাঁ, আমার টিয়াপাখিটা মরে গিয়েছিল। তাই তার লোহার খাঁচাটা ওই ঘরে রেখে দিয়েছিলুম। সেটাও চোরে নিয়ে গেছে।'

সুশান্ত ভুরু কুঁচকে বসে ভাবতে লাগল। তাই তো! এ তো বড় আশ্চর্য চুরি! যে-চোর সোনার গয়না চুরি করবার জন্যে সিঁধ কেটেছে, সে একটা তুচ্ছ লোহার খাঁচা চুরি করে কেন?

এই সময় বাইরে একটা গোলমাল এবং মামার হাঁকাহাঁকি, 'ওরে পান নিয়ে আয়—তামাক নিয়ে আয়,' শোনা গেল।

পেল্লাদ বলল, 'ওই বুঝি দারোগাবাবু এলেন।' বলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

সুশান্ত শহরের ছেলে। তাই পাড়াগাঁয়ে দারোগাবাবুদের কীরকম খাতির তা সে জানত না। সে-ও তাড়াতাড়ি মুড়ি খাওয়া শেষ করে বাইরে গিয়ে হাজির হল।

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে ফরাসের ওপর বসে দারোগাবাবু তখন তামাক টানছেন। একজন কনস্টেবল আর গাঁয়ের দুজন চৌকিদার নীচে একটু দূরে উবু হয়ে বসে আছে। চৌকিদারেরা খাতির করে কনস্টেবলকে খইনি টিপে দিচ্ছে।

দারোগাবাবুর বয়েস হয়েছে। মুখ দেখলেই বোধ হয় বেশ বিচক্ষণ লোক। তিনি চোখ বুজে তামাক টানতে-টানতে সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন, 'হুঁ। এ নিধে হাজরার কাজ বলেই মনে হচ্ছে। সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ, এ-তল্লাটে আর যত সিঁধেল চোর আছে, সবাইকে আমি হাজতে পুরেছি। নিধেটা পরিপক্ক শয়তান—মিটমিটে ডান—।' চৌকিদারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা তো গ্রাম পাহারা দিস। কাল নিধিকে দুপুররাত্রে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিস?'

চৌকিদারেরা হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে না, হুজুর।'

দারোগাবাবু তখন বললেন, 'আচ্ছা চলুন, নিধের ঘরখানা তল্লাশ করে দেখা যাক। সে দাগী আসামী। তার ঘর যখন ইচ্ছে খানাতল্লাশ করা যেতে পারে। সে যখন গাঁ থেকে বেরোয়নি তখন চোরাই মাল তার বাড়িতেই আছে।'

মামা বললেন, 'কিন্তু তার বাড়ি কাল রাত্তিরেই আমরা খুব ভালো করে খুঁজেছি।'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'মুখুজ্জেমশায়, আপনাদের খোঁজা আর আমাদের খোঁজার অনেক তফাত। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, জানেন তো? চলুন।'

দারোগাবাবুর সঙ্গে অনেকে চললেন। সুশান্তও গেল। নিধিরাম হাজরার বাড়ি মিনিটদশেকের রাস্তা। যেতে-যেতে সুশান্ত ভাবতে লাগল কেবল সেই খাঁচাটার কথা। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! চোর খাঁচা চুরি করল কেন? পাখি পুষবে বলে? দূর!

তবে? ভাবতে-ভাবতে সুশান্তর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল, ঠিক তো! খাঁচা চুরি করবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—গয়নাগুলো একসঙ্গে তার মধ্যে পুরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখবে? গাছের ডালে কিংবা চালের বাতায় টাঙিয়ে রাখলে তো আর চলবে না। তা হলে যে দেশসুদ্ধ লোক দেখতে পাবে! তবে? একটা লোহার খাঁচা কোথায় লুকিয়ে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না?

নিধে হাজরার বাড়িতে নিধে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দারোগাবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কিন্তু নিধের দেখা নেই। অনেকক্ষণ দোর ঠেলাঠেলি আর হাঁকাহাঁকির পর নিধে এসে দোর খুলে দিয়ে সামনে দারোগাবাবুকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে, 'আসতে আজ্ঞে হোক, হুজুর মশাই।'

দারোগাবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে হতভাগা? কী করছিলি?'

নিধে হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরছিলুম।'

নিধের চেহারাটি বেঁটেখাটো, তেল চুকচুকে কষ্টিপাথরের মতো রং। মুখে শেয়ালের মতন ধূর্ততা মাখানো। দারোগাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা, জেল থেকে বেরিয়েই আবার আরম্ভ করেছিস? এবার পাকা দশটি বছর ঘানি টানতে হবে, তা জানিস?'

নিধে মিটমিট করে চেয়ে বলল, 'কর্তা, আমি কিছু জানি না, মা কালীর দিব্যি। কাল রাতে ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। দাদাঠাকুর দেশসুদ্ধ লোক নিয়ে এসে ঘরে হানা দিলেন। গরিব মানুষ। কারও সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না—আমারই ওপর এত জুলুম কেন বলুন দেখি? সবাই মিলে ঘর-দোর ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গেলেন। এখন আবার হুজুর এসেছেন। বেশ, আপনিও খানাতল্লাশ করুন। যদি আমার বাড়ি থেকে কিছু পাওয়া যায় তখন আমাকে কড়াক্কর করে বেঁধে নিয়ে যাবেন।'

'খানাতল্লাশ করব বলেই তো এসেছি।' এই বলে দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকলেন। মামা, সুশান্ত আর দুজন সাক্ষী তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গেল। কনস্টেবল দোরগোড়ায় পাহারায় রইল। পাড়ার লোকেরা বাইরে জটলা পাকাতে লাগল।

দারোগাবাবু নিধের বাড়ির গোয়াল থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সুশান্তর তাতে মন উঠল না, তার কেবলই মনে হতে লাগল, এখানে নেই, এখানে নেই।

একটা ঘরে অনেক ভাঙাচোরা পুরোনো জিনিস রাখা ছিল। সেই ঘরে ঢুকে সুশান্ত দেখল, একটা পাখির খাঁচা পড়ে রয়েছে। বাঁশের খাঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে সুশান্ত দেখল, সেটা বেশ ভালো অবস্থাতেই রয়েছে—ভেঙেচুরে যায়নি। তার মনে বড় ধোঁকা লাগল। নিধের ঘরেই যখন খাঁচা রয়েছে, তখন সে অনর্থক খাঁচা চুরি করতে গেল কেন?

তারপর বিদ্যুতের মতো এক নিমেষে সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল! আরে! এটা যে কঞ্চির খাঁচা। এতে কাজ চলবে কী করে?

আবিষ্কারের উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু সে কাউকে কিছু বলল না। দারোগাবাবু তখন নিধেকে দিয়ে উঠানের একটা কোণ কোদাল দিয়ে খোঁড়াচ্ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর লক্ষ ছিল না। সুশান্ত এই ফাঁকে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সামনেই খিড়কির পুকুর। পুকুরটি ছোট্ট, কিন্তু খুব গভীর, কালো জল দেখেই বোঝা যায়। জলের ধারে-ধারে বাবলার ডাল ফেলা আছে, যাতে চোরে জাল ফেলে মাছ চুরি করতে না পারে। সুশান্ত দেখল, ঘাট থেকে ছিপ ফেলা রয়েছে, ফাতনাটি পুকুরের প্রায় মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। নিথর জলে ঢেউ নেই, একটা মাছও ঘাই মারছে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সুশান্ত ছিপটি তুলে নিল। ছিপের সুতোর ডগাটি, যেখানে বঁড়শি বাঁধা থাকে, হাতে তুলে নিয়ে বেশ ভালো করে দেখল। তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে আবার ছিপটি যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে আস্তে-আস্তে ফিরে এল।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে পেল্লাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'পেল্লাদ, দুটো বঁড়শি জোগাড় করতে পারিস?'

পেল্লাদ বলল, 'পারি দাদাবাবু, বাড়িতেই আছে।'

'তবে যা, চট করে নিয়ে আয়।'

পেল্লাদ চলে গেল। সুশান্ত বাড়ির ভেতর ফিরে গিয়ে দেখল—দারোগাবাবু হতাশ হয়ে দাওয়ার ওপর বসে পড়েছেন। মামারও মুখ শুকনো। কেবল নিধের চোখ-মুখ দিয়ে যেন একটা আনন্দের জ্যোতি বেরুচ্ছে।

দারোগাবাবু বললেন, 'নিধে, এখনও মাল বের করে দে, তোকে অল্পে ছেড়ে দেব!'

নিধে বলল, 'হুজুর মা-বাপ, ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। আমি কিছু জানি না।'

দারোগাবাবু আর কী করবেন, চুপ করে রইলেন। নিধের বিরুদ্ধে প্রমাণও তো কিছু নেই যে, তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন।

তখন সুশান্ত আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি জানি নিধে চোরাই মাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

মামা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সে কী! তুই জানলি কী করে?'

সুশান্ত সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিধেকে জিজ্ঞাসা করল, 'নিধিরাম, তোমার খিড়কির পুকুরে মাছ আছে?'

নিধিরাম বলল, 'আছে দাদাঠাকুর। ছোট মাছ—পুঁটি, বেলে, ন্যাটা—এই সব!'

সুশান্ত বলল, 'তুমি যে সবসময় পুকুরে বসে মাছ ধরো, কী দিয়ে মাছ ধরো?'

'আজ্ঞে, ছিপ দিয়ে ধরি, দাদাঠাকুর।'

সুশান্ত একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'ছিপ দিয়ে? বঁড়শি থাকে তো?'

নিধের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমতা-আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে—তা—তা—থাকে বইকি।'

এই সময় পেল্লাদ দুটো সুতোয় বাঁধা বঁড়শি এনে সুশান্তর হাতে দিতেই সে বলল, 'দারোগাবাবু, একটা মজা দেখবেন তো আসুন। কিন্তু তার আগে নিধিরামের হাতে হাতকড়া দিলে ভালো হয়।'

সুশান্তর কথাবার্তা শুনে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সতেরো বছর বয়সের ছেলের মাথায় যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দারোগাবাবু কনস্টেবলকে ডেকে নিধিরামকে দড়ি দিয়ে বাঁধবার হুকুম দিলেন। তারপর সুশান্ত সকলকে নিয়ে খিড়কির ঘাটে গেল।

জল থেকে ছিপ তুলে নিয়ে সুশান্ত সকলকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন, নিধিরাম কেমন মজার মাছ ধরে—বঁড়শি নেই। শুধু একটু রাংতা।'

সকলে অবাক। দারোগাবাবু বললেন, 'তাই তো।'

সুশান্ত বলল, 'নিধিরাম ভারী চালাক। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই পুকুরে ছিপ ফেলে রেখেছে। ছোট্ট পুকুর, তলায় যদি কিছু থাকে বঁড়শিতে আটকে উঠে আসবে। কিন্তু ছিপে যে বঁড়শি নেই, তা তো আর কেউ জানে না। তাই সবাই ভাবে পুকুরে কিছু নেই। থাকলে ছিপে উঠে আসত। কী বলো নিধিরাম, ঠিক কি না?'

নিধিরাম নির্বাক। তার মুখে আর কথাটি নেই।

সুশান্ত বলল, 'এবার দেখুন, কী করে সত্যিকারের মাছ ধরতে হয়'—এই বলে বঁড়শি দুটো ছিপের সুতোয় বেঁধে জলে ফেলল। বঁড়শি তলিয়ে গেল।

তারপর টান মারতেই বঁড়শি একটা ভারী জিনিসে আটকাল। সুশান্ত সাবধানে সুতো ধরে টানতে-টানতে বলল, 'কীসে আটকেছে বলুন দেখি! বুঝতে পারেননি? খাঁচা! কালীর টিয়াপাখির খাঁচা। পুঁটলি বেঁধে জলে ফেললে পাছে কাপড় পচে নিয়ে গয়নাগুলো হারিয়ে যায়, তাই লোহার খাঁচার ব্যবস্থা। কতদিনে পুকুর থেকে চোরাই মাল তোলবার সুবিধে হবে তা তো নিধিরাম জানত না।'

সুতো ধরে টানতে-টানতে শেষে সত্যি-সত্যিই একটা লোহার খাঁচা বঁড়শিতে লেগে উঠে এল। মামা ছুটে গিয়ে খাঁচার মধ্যে হাত পুরে ভেতর থেকে সব জিনিস বের করলেন। দেখা গেল, মামিমা আর কালীর সমস্ত গয়নাই সেখানে রয়েছে। একটিও খোয়া যায়নি।

মামা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সুশান্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ছেলে নয়, হীরের টুকরো। এমন বুদ্ধি কেউ দেখেছ? আর হবেই না বা কেন? মামার ভাগনে তো! কথায় বলে, নরাণাং

মাতুলক্রমঃ—।'

দারোগাবাবুও খুশি হয়ে সুশান্তর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'খাসা ছেলে! চমৎকার ছেলে! বেঁচে থাকো বাবা। আশীর্বাদ করি দারোগা হও।'

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৬৮



অন্তরাল

কালীকিঙ্কর কর্মকার

কল্পনা করুন একটি যুবককে। বয়েস ছাব্বিশ কি সাতাশ। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ-এগারো ইঞ্চি। মুখটা গোলগাল নয়, অনেকটা নিরাশ রাজনীতিবিদদের মতো, কাঠখোট্টা, গালের চোয়ালগুলো উঁচু। মাঝারি সাইজের নাকের নীচে মাঝারি সাইজের টুথব্রাশের মতো একজোড়া গোঁফ। ওই বয়েসের মানুষের যে-পরিমাণ দাড়ি থাকা উচিত, তার তুলনায় অনেক কম দাড়ি—বেশিরভাগই সীমিত কানের পাশে আর থুতনিতে। চেহারাটা তার কোনও চিত্রতারকার মতো নয়, অথচ তার স্বাস্থ্যটা যে একেবারেই একটা তাচ্ছিল্যের তা-ও বলতে পারি না।

তাকে সবরকম পোশাকেই মানায়। কখনও সে যদি চোস্ত ড্রেন-পাইপ প্যান্ট আর চকরাবকরা হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে, সাদা নাগরাই পায়ে, চোখে গগলস লাগিয়ে, হাতে লোহার বালা পরে, ঠোঁটে চার্মিনার ঝুলিয়ে কোনও সিনেমাহলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আর, সেদিনটা যদি শনিবার হয় এবং আপনার যদি ওই সিনেমাটা দেখার খুব ইচ্ছে থাকে, কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে, সামনের কাউন্টারে কোনও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনি হয়তো ওরই কাছে এগিয়ে যাবেন। আর, গলার স্বরটা যতটা সম্ভব নিচু করে জিগ্যেস করবেন, 'দাদা, টিকিট আছে?'

আবার কখনও আপনি যদি অফিস-ফেরতা ধর্মতলা স্ট্রিটের 'অন্নপূর্ণা'তে যান এককাপ চা খাওয়ার জন্যে এবং সেখানে যদি তাকে দেখেন আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, সাদা পাজামা পরে, পায়ে কোলাপুরী চটি লাগিয়ে, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল শোভিত বেশে মনোযোগ সহকারে কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি' পড়ছে এককাপ ঠান্ডা চা সামনে রেখে, তাহলে আপনি ধারণা করবেন যে, সে একজন আধুনিক উঠতি কবি। আপনি হয়তো মনে করবেন, তাকে ভবিষ্যতে আপনার পাড়ার সংস্কৃতি সম্মেলনে আনতে পারলে আপনার সম্পাদকের পদটি আরও কিছুদিন টিঁকে থাকবে। তাই তার আঙুলের ফাঁকে-রাখা সিগারেটের মাথায় কোনওরকমে লেগে-থাকা ইঞ্চিখানেক ছাইয়ের ডগাটা দেখে আপনি হয়তো এগিয়ে গিয়ে তার টেবিলে বসবেন, আর, একটা সিগারেট বের করে তাকে জিগ্যেস করবেন, 'দাদা, একটু আগুনটা দেবেন?'

আবার এমনও হতে পারে যে, ও হয়তো সকালে একটি ধুতি পরে, গলায় পৈতে লাগিয়ে, খালি গায়ে, খালি পায়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, হাতে একসাজি ফুল নিয়ে শ্যামবাজার কালীবাড়ির দিক দিয়ে আসছে। আর, আপনি তখন আপনার গিন্নির তাগিদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুরোহিত ধরার জন্যে—বাড়িতে

বারের পুজোর জন্যে। তাকে আসতে দেখে আপনি সসম্ভ্রমে মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুরমশাই, আমাদের বাড়িতে আজ বারের পুজো। আপনি কি আসতে পারবেন?'

অনেক তো শুনলেন যুবকটির কথা। এবার আমার বর্ণিত কাঠামোর ওপর আপনার কল্পনার তুলিতে রঞ্জিত এই মানুষটির একটি ভালো মানানসই নাম দেওয়া যাক—যেমন ধরুন, নৃপতি নারায়ণ নস্কর।

নৃপতির নিবাস বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। আমার সঙ্গে তার আলাপ ছিল বহু বছর আগে। কিন্তু আলাপটা কেমন করে হয়েছিল সেইটা আগে বলা উচিত। কী একটা সিনেমা দেখার জন্যে আমি প্রাচীতে লাইন দিয়েছিলাম, বেলা তখন প্রায় সওয়া দুটো। শো তিনটেয়। বইটা খুব ভালো শুনেছিলাম।

লাইনে আমার আগে আরও প্রায় জনাতিনেক ছিলেন, আমার পিছনে প্রায় জনাতিরিশেক। হঠাৎ কে যেন এসে আমার হাত ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'এই যে! এতক্ষণে ব্যাটার আসা হল! কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্যে! নে, টাকাটা ধর, টিকিটটা কাটতে থাক, আমি একটা পান খেয়ে আসছি।'

তারপর সে হুট করে চলে গেল। আমি দেখলাম, আমার হাতের মুঠোয় একটা দু-টাকার নোট আর দুটো দশ পয়সা। ওদিকে কাউন্টারে ততক্ষণ পৌঁছে গেছি। তাই কিছু ভেবে উঠে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগেই দুটো টিকিট কেটে নিয়ে গেটের কাছে এলাম। দেখি, মক্কেল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পান চিবোচ্ছে আর তার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

'দাদা, আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আমার প্রেজেন্স অফ মাইন্ড-এর জন্যে টিকিটটা পেলাম। আসলে আমার আরও আগে আসবার কথা ছিল, কিন্তু ট্রামের জন্যে দেরি হয়ে গেল।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আমার আরও একটু কাছে এসে হাতটা ধরে বলল, 'চলুন, চা খেয়ে আসি।'

'মাফ করবেন, বড্ড গরম।' আমি বললাম।

'তাহলে ঠান্ডা কিছু?' সে নাছোড়বান্দা।

আমার ওজর-আপত্তি না শুনে সে নিয়ে গেল আমাকে পাশের রেস্টুরেন্টটায়। দুটো লস্যির অর্ডার দিয়ে সে আমাকে সিগারেট অফার করল।

'আমি পানামা ভক্ত।' বলে আমি নিজের প্যাকেটটা বের করলাম।

'আমার নাম নৃপতি নারায়ণ নস্কর।' সে সিগারেট ধরিয়ে আগুনটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'আমি সন্তোষ মিত্র। বাগবাজারে থাকি।' আমি সিগারেটটা ধরিয়ে বললাম।

'আরে, আপনি তো আমার প্রতিবেশী মশাই, আমি বেলগাছিয়ায় থাকি।' নৃপতি বলল, 'তা কোথায় চাকরি করেন?'

'এক মাড়োয়ারি অফিসে।' আমি একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেই মিথ্যা করে বললাম। কারণ, কেউ আমাকে ওই প্রশ্ন করলেই আমি খেপে যাই।

'ভালো।' আমার সঙ্গী বলল, 'আপনাদের বাঁধাধরা সময়ের কাজ, আমাদের মতো না।

তাইতেই আপনি আজ মেজাজে এসে সিনেমায় লাইন দিতে পারলেন, আর আমাকে হুটপাট করে এসে সিনেমা দেখে আবার ছুট লাগাতে হবে।'

'কীরকম! আপনি করেন কী?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'সেটা বলা ঠিক হবে না। কারণ, আমি কী করি, সেটা আমি কাউকে বলতে চাই না।'

'ওঃ!' আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলাম।

কিছুক্ষণ আমরা দুজনে চুপচাপ। লস্যিও অনেকক্ষণ এসে গিয়েছিল, আমরা তা খাচ্ছিলাম।

'কিছু মনে করবেন না।' নৃপতি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনাকে দেখতে অবিকল আমার এক বন্ধুর মতো।'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে যাই।

'তার গল্প শুনবেন?' সে জানতে চাইল।

'বলুন।' আমি একটু আনন্দপ্রকাশ করলাম। সামনেই নববর্ষ আসছে, আর, আমার গল্পের স্টকও প্রায় শেষ, তাই নতুনের খোঁজে আমি উৎফুল্ল।

'তার নাম ছিল বেণীমাধব মুখার্জি।' নৃপতি বলা শুরু করল, 'আমাদের বাড়ির দোতলায় থাকত। ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। বেণুর মা ওকে পার্কে নিয়ে যেতেন, আমিও যেতাম তাদের সঙ্গে। বুঝলেন, ছোটবেলায় আমি মেয়েদের পোশাক পরতাম। আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল যে, তাঁর একটি কন্যা যেন হয়। কিন্তু ভগবান তা চাননি। তাই আমার মায়ের গর্ভে পরপর চারটি ছেলে আসে। আমি ছিলাম সবার ছোট। সুতরাং মা আমাকে মেয়ের পোশাক পরিয়ে মেয়ের অভাব ভুলতে চেষ্টা করতেন। আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার।

'যাই হোক, সেসব কথা থাক। পাশাপাশি বেণু আর আমি বড় হতে লাগলাম। কিন্তু একদিন বাবা অ্যাকসিডেন্টে তাঁর একটা চোখ হারালেন। তারপর আস্তে-আস্তে আমাদের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। আর ওদিকে যত আমরা বড় হতে লাগলাম, তত আমাদের মধ্যে দূরত্বটা বাড়তে লাগল—বেণুর আর আমার মধ্যে।

'ইতিমধ্যে বাবা মারা গেলেন। দাদা তখন সবে ইন্টার পাশ করেছে। তাই কোনওরকমে চেষ্টা করে দাদা একটা ব্যবসাদারের গদিতে কেরানির চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু ওই ক'টি টাকায় আর কী হয়? তাই মা-ও সাহায্য করতে লাগলেন। জামা-কাপড় বাড়িতে সেলাই করে সেগুলি নিয়ে গিয়ে শ্যামবাজার-হাতিবাগানের বড়-বড় দোকানে বিক্রি করে। ওইভাবে আমাদের সংসারটা বেঁচে গেল।

'আমার অন্য দুই দাদা লেখাপড়া কিছু-কিছু শিখল। কিন্তু সেজদাকে আর সোজাপথে রাখা গেল না। খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে সে উচ্ছন্নে গেল। দু'বার পুলিশের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিল। কিন্তু তারপরে আর পারল না। বাগবাজারে পুজোর ভিড়ের মধ্যে একজনের পকেট কাটতে গিয়ে আর পালাবার পথ পেল না।

'ওদিকে আমি একটু লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম, তাই কোনওরকমে স্কুল পাশ করে কলেজে ঢুকলাম। ইন্টারটাও পাশ করলাম বিদ্যাসাগর থেকে, কিন্তু তারপরেই হল গণ্ডগোল। ওই কলেজেরই একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম—সে তখন ইন্টারে ঢুকেছে।

'হাতে পয়সা নেই, অথচ প্রেম করছি। পরিস্থিতিটা যে কত হাস্যকর, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমাদের প্রেমটা টিঁকে রইল। প্রায় বছরতিনেক। তারপরেই এল ধ্বংস—বেণুর রূপে। সেদিন সন্ধ্যা আর আমি দুজনে বহুদিন পরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। আর, সেখানে বেণুর সঙ্গে দেখা। বাধ্য হয়েই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হল ওকে সন্ধ্যার সঙ্গে। আমার নিজেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বেণুর দামি পোশাক আর ফিটফাট চেহারা দেখে সন্ধ্যা প্রায় সম্মোহিত হল। সিনেমার শেষে বেণু জোর করে আমাদের নিয়ে গেল রেস্টুরেন্টে। সেখানে রকমারি খাবার-দাবার খাওয়াল আমাদের। বিল হল প্রায় সাড়ে বারো টাকা। যেন বলির পাঁঠার গলায় খাঁড়া পড়ার আগে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করা। অবশেষে তার গাড়ি করে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়ির দোরগোড়ায়। খাঁড়াটা পড়ল।

'এই ঘটনার কিছুদিন পরে টের পেলাম যে সন্ধ্যাও আস্তে-আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। আগে

গঙ্গার ধারে যাওয়ার কথা বললেই সে আনন্দিত হত। কিন্তু গঙ্গার হাওয়া তার আর ভালো লাগত না। একদিন সে বলেই ফেলল : ''আচ্ছা, তুমি ডিগ্রি পাশ করে কী করবে ঠিক করেছ?''

''অনার্স যখন নেই, তখন আর পড়ব না। কোনও চাকরি-বাকরি জোগাড় করে নেব।'' আমি জবাব দিলাম।

''কিন্তু চাকরির বাজার যা, তাতে টাকা খুব একটা আসবে কি?''

''না এলেও উপায় কী? ব্যবসা করবার মতো ক্যাপিটাল আমার নেই, আর বেকারও থাকা যায় না। তাই ওনলি সলিউশন হল চাকরি।''

''কত মাইনে পাবে আশা রাখো?'' আবার ও প্রশ্ন করল।

''দেড়শো-দুশো টাকা নিশ্চয় পাব,'' আমি বাদামের ঠোঙাটা মুড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, ''তাতে আমাদের দুজনের চলে যাবে।''

''জিনিসপত্তরের যে-রেটে দাম বাড়ছে, তাতে ওই ক'টা টাকায় কিছু হবে না।'' সন্ধ্যা একটু বিজ্ঞের মতো বলল, ''তা ছাড়া, তখন সংসার চালাতে গেলে আমোদ-আহ্লাদ সব ত্যাগ করতে হবে তার খেয়াল রাখো? তখন সিনেমা দেখতে হলে একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে। আর গঙ্গার পাড়ে বসে জলের ওপর সূর্যডোবা দেখতে হলে তোমাকে সপ্তাহে দু-চারদিন হেঁটে অফিস যেতে হবে।''

'আমি একটু আশ্চর্য হলাম ওর কথা শুনে।

''সন্ধ্যা, তুমি আজ হঠাৎ এরকম কথা কেন বলছ? তোমার সঙ্গে এতদিন ঘুরলাম... কিন্তু কই, এ সমস্ত প্রশ্ন তো আগে আসেনি! এখন এসব আসে কী করে?''

'ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর যা উত্তর দিল তাতে আমার মনে হল, কে যেন আমাকে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারল।

''এবার তাহলে তোমাকে বলছি, শোনো। আগামী বারো তারিখে আমার বিয়ে—বেণীমাধব মুখার্জির সঙ্গে। আমি তোমাকে কখনও যদি কোনও আশা দিয়ে থাকি, তাহলে তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু আমি পারতাম না তোমার সংসার করতে। মিছিমিছি আমাদের দুটো জীবন নষ্ট হয়ে যেত। তুমি যেভাবে বেঁচে থাকবার ছবি এঁকেছ, সেটা আমার বরদাস্ত হত না। জল আর হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকার কথা গড়ের মাঠে বসে প্রেমের গল্প করার সময় বলতে খুব ভালো লাগে, শুনতেও চমৎকার মনে হয়। কিন্তু কার্যকরী করা যায় না। আমাদের সম্পর্কটা এখানেই শেষ করলাম। তবে তোমাকে একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি—অযাচিত মনে কোরো না। তুমি ওই দেড়শো টাকার চাকরি পেয়েই বিয়ে কোরো না। আর-একটা জীবন নষ্ট করবার অধিকার তোমার নেই।''

'এই বলে সন্ধ্যা উঠে চলে গেল। দেখলাম দূরে রাস্তার ওপর বেণুর কালো মরিসটা দাঁড়িয়ে আছে। বেণু কিন্তু লেখাপড়া কিছুই করেনি। খেত-দেত বাপের হোটেলে, থাকত নিজের বাড়িতে, চলাফেরা করত সমাজের উঁচু স্তরে। তাই তার সামনে আমার ডিগ্রি, আমার পিতৃপরিচয় সবই নগণ্য। আমি পারব কেন তার সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতায়? সে তার বউকে দিতে পারবে টাকা-পয়সা, সমাজের অহঙ্কার, গাড়ি-বাড়ি আর অফুরন্ত আনন্দ। কিন্তু আমি দিতে পারব শুধু একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা। তাতে লেখাপড়া-জানা মেয়েকে বশ করা যায় না। তাই ভেবে দেখলাম যে, আমার মতন ছেলেদের প্রেমে পড়া উচিত নয়, বিশেষ করে শিক্ষিতার সঙ্গে।

'যাই হোক, বেণু সন্ধ্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। সেই বেণুর সঙ্গে আপনার চেহারার দারুণ মিল আছে।' বলে নৃপতি থামল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ঘড়িটা দেখলাম, তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে।

'ওঠা যাক।' আমি বললাম।

'চলুন, সময় হয়ে এল।' নৃপতিও উঠল। তারপর এগিয়ে গেল কাউন্টারে, সেখান থেকে দুটো মৌরী মুখে দিয়ে ও আমাকে বলল, 'আমি আসছি এক্ষুনি সিগারেট কিনে, প্যাকেট শেষ।'

অগত্যা আমাকেই লস্যির বিলটা মেটাতে হল।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, কলেজ স্ট্রিটে পাবলিশারের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব। কিন্তু নৃপতি বাদ সাধল। আমাকে জোর করে নিয়ে গেল ছোট একটা চায়ের দোকানে। সেখানে চা আর বেগুনি খাওয়াল, তার সঙ্গে-সঙ্গে সিনেমার সমালোচনা করতে-করতে যখন আমরা শেষ পর্যন্ত উঠলাম, তখন প্রায় ছ'টা বাজে। হিসেব করে দেখলাম যে, পাবলিশারের কাছে গিয়ে আর কোনও লাভ হবে না, কারণ তিনি এতক্ষণে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাই আমিও বাড়ি ফেরা স্থির করলাম। নৃপতিও আমার সঙ্গে যাবে বলল।

দু-তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বাসে উঠলাম। সোজা দোতলায় চলে গেলাম। সামনেই কন্ডাক্টর দাঁড়িয়ে। সে টিকিট চাইল। নৃপতি নির্বিকার চিত্তে একটা পাঁচটাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দুটো, শ্যামবাজার।'

'খুচরো নেই দাদা?' কন্ডাক্টর জানতে চাইল।

'যা আছে তাতে কুলোবে না।'

'আপনার বন্ধুর কাছে নেই?'

'আপনি চেঞ্জটা আমায় শ্যামবাজারে নেমেই না হয় দেবেন,' নৃপতি কন্ডাক্টরকে বলল, 'আমি একেবারে টার্মিনাসে নামব।'

'টিকিটটা আমিই দিচ্ছি,' আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম নৃপতিকে, 'কেন আপনি আবার এই ক'টা পয়সার জন্যে নোটটা ভাঙাবেন!' বলে আমি কন্ডাক্টরকে একটা আধুলি দিলাম।

কন্ডাক্টর নোটটা ফেরত দিয়ে দিল।

শ্যামবাজারে নেমে নৃপতি আমার সঙ্গে-সঙ্গেই আসতে লাগল। সমানে এটা-সেটা নিয়ে বকর-বকর করতে-করতে। আমি বাড়ি পৌঁছে তবে রেহাই পেলাম। যাওয়ার সময় নৃপতি ঘোষণা করে গেল : 'আবার দেখা হবে আশা করি। বেলগাছিয়া থেকে মাঝে-সাঝে আসব।'

এই ঘটনার দিনসাতেক পরে আমি অফিস যাব বলে ট্রামে উঠেছি। ট্রামে বরাবর যেমন ভিড় থাকে, সেরকমই ছিল। কোনওরকমে ঠেলে-ঠুলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চোখ পড়ল সাদা টেরিলিনের শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোকের দিকে। দেখেই চিনলাম নৃপতিকে, তাই এগিয়ে গেলাম।

'কেমন আছেন?' তাকে জিগ্যেস করলাম।

সে আমার কথা শুনলই না। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, 'চিনতে পারছেন না?'

নৃপতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'মাফ করবেন, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। আপনাকে তো আমি চিনি বলে মনে পড়ছে না!'

'সরি,' আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আপনাকে দেখতে অবিকল আমার এক বন্ধুর মতো। এমনকী আপনার গলার আওয়াজ পর্যন্ত। তাই ভাবলাম...।'

'টিকিটটা নেবেন—।' কন্ডাক্টর হাত বাড়াল।

নৃপতি নেমে গেল লালবাজারের সামনে। দেখলাম, সে পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে ঢুকল।

সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে অবাক। দেখি, নৃপতি বাইরের ঘরে বসে আমার গিন্নির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। তার সামনে ছোট্ট টেবিলটাতে চা, মিষ্টি, সিঙাড়া।

'দাদা, কেমন আছেন বলুন?' সে জিগ্যেস করল।

আমার সকালের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। নৃপতির অম্লান বদনের স্বীকারোক্তি—সে আমাকে চেনে না। ভাবলাম, কেন ও আমাকে মিথ্যে কথা বলল, কিন্তু নৃপতি নিজেই আমার কষ্ট লাঘব করল।

'আমি এসেছি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'সকালের ঘটনাটার জন্যে।'

'ও,' আমি বললাম, 'তাহলে আমি ঠিকই ধরেছিলাম।'

গিন্নি ইতিমধ্যে আমার জন্যে এককাপ চা নিয়ে এল। আমি জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে চায়ে চুমুক দিয়ে শুনলাম নৃপতির ব্যাখ্যা।

'কিন্তু কেন যে ওরকম করলাম তার উত্তর দিতেই আজকে এলাম আপনার কাছে। তা ছাড়া, আমার একটা অনুরোধও আছে।'

'কী সেটা?'

'খুবই সামান্য অনুরোধ। যদি আমাকে কখনও রাস্তায় দেখেন তো আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি যদি আমাকে দেখেন, তাহলে আমিও আপনাকে দেখব আর প্রয়োজন হলে আমি নিজে যেচে আপনার সঙ্গে কথা বলব। বুঝলেন?'

'কেন সেটা জিগ্যেস করতে পারি?'

'নিশ্চয়, আপনাকে যখন দাদা বলে ডেকেছি, তখন আপনার কাছে লুকোবার আমার কিছুই নেই।' নৃপতি একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। আমিও সেই অবসরে চায়ের কাপটা খালি করে ফেললাম।

'আমি ক্যালকাটা পুলিশের প্লেন ক্লোদস বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর,' নৃপতি বলে চলল, 'আমাদের কাজ দুর্নীতি দমন করা এবং যখন-তখন বিভিন্ন বেশভূষায় অপরাধীদের অনুসরণ করতে হয় আমাদের। সুতরাং, আপনি যদি কখনও আমাকে দেখে আমার নাম ধরে ডাকেন, তখন আমার অবস্থাটা কী হবে বুঝতেই পারছেন। তাই আমার এই অনুরোধ।'

আমি অবাক হয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম নৃপতির মুখের দিকে। শরীরের মধ্যে দিয়ে শিহরন বয়ে গেল। এত অল্প বয়েসে অত বড় দায়িত্ব নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। নৃপতি নারায়ণ নস্করের জন্যে আমার শ্রদ্ধা হল। গিন্নিকে আর-একবার চা করতে বললাম। তারপর নৃপতিকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার বয়েস তো বেশি নয়। এর মধ্যেই ইন্সপেক্টর হয়ে গেছেন! আপনার ওপর ভাগ্যদেবী খুব সুপ্রসন্ন বলতে হবে!'

'হয়তো হবে।' নৃপতি উত্তর দিল, 'কিন্তু নট ইন লাভ—সেখানে চলতি ভাষায় বলতে গেলে ''ল্যাং'' খেলাম!' বলে ও একটু হাসল, পরাজিতের হাসি।

'আপনার জীবনের গল্প বলুন দেখি?' আমি কথাপ্রসঙ্গ ঘোরালাম।

'কিছু-কিছু তো আপনাকে সেদিন বলেছি। তার ওপর বলার আর বিশেষ কিছু নেই। ডিগ্রি পাশ করে মেসোর কাছে বেড়াতে গেলাম। তিনি কালীঘাট থানার একজন সিনিয়র কর্মচারী। তাঁর চেষ্টাতেই চান্স এল পুলিশে ঢোকার। স্বাস্থ্য খুব ভালো না হলেও হাইটে হয়ে গেল। তা ছাড়া, আমার একটা বিশেষ গুণ আছে, যেটা হল এই যে, আমি খুব ভালো ডিসগাইজ করতে পারি। কলেজে থাকাকালীন একদিন তো আমি মেয়ে সেজে ক্লাসে হাজির। কী অবস্থা হয়েছিল সেদিন কী বলব! আমার সব বন্ধুরা আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়—আর মেয়েগুলো হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছিল, এসপেশিয়ালি সন্ধ্যা!

'যাই হোক, সিলেকশান হয়ে গেলে পাঠিয়ে দিল ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। সেখানে অনেক কিছু শেখাল, যেমন—অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা, অপরাধীকে অনুসরণ করা, অপরাধীর মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলাম। কয়েকটা কেস সলভ করলাম। আমার নাম হয়ে গেল। অবশেষে এক স্মাগলার দলের পিছনে-পিছনে গেলাম বম্বে পর্যন্ত। সেখানে তাদের মালসমেত হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসে জানতে পারলাম যে, আমার প্রমোশন হয়েছে।'

'তা এই পোস্টে কতদিন আছেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'মাসছয়েক হল।' নৃপতি বলল, 'পুলিশে ঢুকেছি পাক্কা আড়াই বছর।'

সেদিন নৃপতিকে আমার গিন্নি রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়ল না। ও চলে যাওয়ার পর সহধর্মিণীকে বললাম, 'ওই লোকটাকে চিনে রাখলে তো! পুলিশে চাকরি করে!'

'আমাকে বলতে হবে না, আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনছিলাম।' অণিমা বলল। অণিমা আমার বউ।

রাত তখন সাড়ে আটটা বাজে। আমি গা-হাত-পা ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। অণিমাও কিছুক্ষণের মধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুতে এল। তখনও ন'টা বাজেনি। আমাদের বিয়ে হয়েছিল বছরপাঁচেক আগে।

পরের রোববার বেলা দশটা নাগাদ আমি বেরোচ্ছিলাম বিকালের জন্যে সিনেমার টিকিট কাটতে। নৃপতি এসে হাজির। হাতে দ্বারিক ঘোষের একবাক্স মিষ্টি।

'বউদি, মিষ্টি নিয়ে এলাম, আরেকটা কেস সলভ করেছি!' বলে সে অণিমাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। তারপর বলল, 'এবার আশীর্বাদ করুন, যেন আরও ওপরে উঠতে পারি।'

গিন্নি আর আমি তাকে আশীর্বাদ করলাম। তারপর চা-মিষ্টি খাওয়ার পর্ব শেষ হলে নৃপতি আর আমি গ্যাঁজানো শুরু করলাম। হঠাৎ অণিমার আবির্ভাব।

'টিকিট কাটতে গেলে না এখনও?'

'সিনেমায় সত্যিই যাবে?' আমি একটু আশ্চর্যভাবে জিগ্যেস করলাম।

'নিশ্চয়! আর টিকিট কিন্তু তিনটে কেটো। নৃপতিবাবুকেও যেতে হবে।'

নৃপতি আপত্তি করল। কিন্তু অণিমা কারুর আপত্তি কখনও মানে না। আমারও না। তাই সে আরও ঘোষণা করল, 'আপনি আমাদের এখানে দুপুরের খাবার খেয়ে, সিনেমা দেখে আবার এখানে ফিরবেন। তারপর রাত্রে খেয়েদেয়ে একেবারে বাড়ি যাবেন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। অণিমাকে বলেছিলাম যে, নৃপতি পুলিশের লোক বলে ওকে একটু তোয়াজ করতে। তাই বলে একেবারে জামাইয়ের আদর! এরকম করলে তো আমাকে লোকের পকেট-কাটা ধরতে হবে। ঠিক করলাম, রাতে ওকে একটু বোঝাতে হবে—স্বামীর কথা অত অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলে ভবিষ্যতে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যাই হোক, দিনটা কোনওরকমে কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে অণিমার পাশে শুয়ে সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে সেটাকে ছাইদানিতে ফেলে ওকে বললাম, 'নৃপতিকে অত তোয়াজ করতে হবে না।'

'কেন?' তার পালটা প্রশ্ন হল, 'তুমিই তো সেদিন বললে...।'

'মানছি।' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু অত না।'

'আমি তো ভাবলাম, তুমি টাকার স্বার্থে বলেছ।'

'মানে?'

'তোমার ভাইয়ের চাকরির জন্যে।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এত ভালো আইডিয়াটা আমার মাথায় এল না! প্রিয়তোষটা সেই কবে বি. এ. পাশ করে রাস্তায়-রাস্তায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে। নৃপতিকে বলা যেতে পারে, ওকে পুলিশে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'অণিমা, ইউ আর এ ডার্লিং!' গিন্নিকে জড়িয়ে ধরে বললাম।

'ও মাগো, খাটের ওপর কী একটা উঠেছে গো!' বলে সে হঠাৎ আঁতকে উঠল!

'ওটা আমি।' তাকে বললাম।

'কী অসভ্য!' অণিমা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

আরও কিছুদিন পরের ঘটনা। অফিসফেরতা ট্রামে দেখা। আগেরবারের মতো এবারেও আমাকে চিনল না। তবে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ট্রামটা যখন কলেজ স্ট্রিট ক্রসিংয়ে এল, তখন সে হঠাৎ আমার হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে কানে-কানে বলল, 'এটা পকেটে রাখুন, আর ঠনঠনিয়া স্টপেজে নেমে যান। আমিও নামছি।'

আমি কিছু বলবার বা ভাববার সময় পেলাম না। তার নির্দেশ মতো ট্রাম থেকে নেমে সামনের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনলাম।

'আমার কথা ভুলে গেলেন নাকি?' বলে নৃপতি এসে হাজির আমার পাশে।

অগত্যা আরেকটা সিগারেট দিতে বললাম দোকানিকে।

সিগারেট ধরিয়ে আমরা সামনের পাঞ্জাবি হোটেলে গেলাম।

'দিন দেখি মালটা।' বলে নৃপতি হাত বাড়াল।

আমি পকেট থেকে বের করলাম তার দেওয়া জিনিসটা। অবাক হয়ে দেখলাম যে, সেটা কার যেন মানিব্যাগ।

'ভয় নেই,' নৃপতি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমার কাজ জানেনই তো। লোকের পকেট থেকে জিনিসপত্র তোলাও মাঝে-মাঝে দরকারে লাগে। আমাদের কাজে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানা প্রয়োজন।'

আমি বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম। কর্তব্যরত গোয়েন্দাকে রক্তে-মাংসে দেখলে আমার মতো আপনিও বোকা বনে যেতেন। নৃপতি মানিব্যাগটা খুলে ভেতর থেকে টাকা-পয়সা বের করে টেবিলটার ওপরে রাখল। হঠাৎ একটা কাগজ বের করে সেটা ভালো করে দেখে বলল, 'পেয়েছি, এতদিন পরে পেয়েছি!'

'কী পেলেন?' আমি জিগ্যেস না করে পারলাম না।

'প্রুফ!'

'ওঃ,' আমি বললাম, 'তা মানিব্যাগের বাকি জিনিসগুলোর কী হবে?'

'সব হেডকোয়ার্টার্সে যাবে, ওগুলো এভিডেন্স।' বলে সে দুটো লস্যির অর্ডার দিলে 'লেট আস সেলিব্রেট!'

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় হাঁটতে-হাঁটতে শ্যামবাজারের মোড়ে এলাম। ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে নৃপতি হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই যে লোকটাকে দেখছেন, ওই ফুটপাথে বইয়ের দোকানটার সামনে, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরে...।'

'দেখলাম।' আমি দেখে বললাম।

'ভদ্রলোককে চিনে রাখুন।'

'কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'উনি আমার অফিসার, নাম সুশান্ত মুখার্জি।'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, ভদ্রলোককে চিনে রাখব। তারপর দ্বিধা ত্যাগ করে তার কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করলাম, 'দেখুন, আপনাকে বহুদিন ধরে একটা কথা বলব-বলব করে আর বলা হয়ে উঠছে না।'

'কী বলুন।' নৃপতি উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল।

'ব্যাপারটা আমার ভাইকে নিয়ে।' আমি দম নিয়ে প্রায় একনিশ্বাসে বলে ফেললাম।

'একটু খুলে বললে ভালো হত বোধহয়।' নৃপতিকে একটু যেন গম্ভীর শোনাল।

'ওর একটা চাকরি করে দিতে হবে।' আমি কোনওরকমে বললাম।

'ওঃ!' নৃপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমি ভাবলাম, বুঝি কোনও সাংঘাতিক ব্যাপার-ট্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন আপনার ভাই।'

'না, না,' আমি অভয় দিলাম, 'ভাইটা আমার একটু মস্তান গোছের হলেও আইনের গণ্ডির বাইরে পা বাড়ায় না, বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু-আধটু রাখে।'

'তা আপনার ভাইয়ের কোয়ালিফিকেশনটা কী?'

'গতবার কোনওরকমে বি. এ.-টা পাশ করেছে।'

'স্বাস্থ্য-টাস্থ্য কেমন? হাইটটা?'

'আপনাদের মিনিমাম যোগ্যতা তার আছে, কিন্তু বোঝেনই তো, এইসব লাইনে একটু জানাশোনা থাকলে তবেই চান্স পাওয়া যায়...।'

'তা অবশ্য ভুল বলেননি।' সে একটু মৃদুস্বরে বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করে দেখব। কী করতে পারি, জানাব।'

'আর যদি কোথাও দু-পাঁচটাকা দেওয়ার দরকার পড়ে তো তার ব্যবস্থাও না-হয় হয়ে যাবে।'

নৃপতি হাসল।

'যদিও আমরা দেশ থেকে অপরাধ নির্মূল করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, তবুও আপনাকে বলতে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে যে, আমাদের ডিপার্টমেন্টটা সবচেয়ে কোরাপ্ট—ঘুষ বিনা একগ্লাস জল পাওয়া যায় না।'

'শুধু আপনাদের কেন, দেশের সর্বত্র ওই একই পরিস্থিতি।' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম।

নৃপতি সেটার কোনও জবাব দিল না।

একটা ট্রাম আসছিল। হাত তুলে সেটাকে থামাবার নির্দেশ দিয়ে সে আমাকে বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। আপনাকে খবর দেব।'

খবর সে দিল। তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি পাব, তা আমি আশা করিনি। আমি জানতাম যে, কলকাতায় চাকরির অভাব নেই। যারা বলে যে, চাকরি পাওয়া যায় না, তারা হয় চাকরির জন্যে চেষ্টা করেনি, নয়তো তাদের চাকরির দরকার পড়ে না। তাই যদি না হবে তাহলে বহুদিন আগে বাঙালিরা দলাদলি ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিভেদ ভুলে এক হয়ে উঠত, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত আমাদের এই ভারতবর্ষটাকে।

যাই হোক, নৃপতি খবর দিল। আমার ভাই প্রিয়তোষের জন্যে চাকরির খবর। পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি, মূর্তিমান আমার বাড়িতে হাজির।

'আপনার বরাতটা খুব ভালো।' সে আমাকে দেখে বলল।

'কীরকম?' জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে আমি জিগ্যেস করলাম।

'আপনার ভাইয়ের চাকরিটা প্রায় বাউন্ডারি পৌঁছে গেছে বলতে পারেন।'

'এত শিগগিরই!' আমি আশ্চর্য হলাম।

'পিয়োর লাক বললাম না!'

আমি লুঙ্গিটা পরছিলাম, কোনও কথা বললাম না।

'আপনার ভাই আশেপাশে আছে?'

'না। কেন?'

'থাকলে এখনই একটা ''ব্যাক ডেটেড'' অ্যাপ্লিকেশান লিখিয়ে নিতে পারলে ব্যাপারটা আরও এগিয়ে থাকত।'

'বোঝেনই তো, সে এ-পাড়ার মস্তান। তাকে সন্ধের পরে বাড়িতে পেতে গেলে ধরনা দিয়ে বসে থাকতে হয়।'

'সেটা তাহলে আপনি করিয়ে রাখবেন।'

'টাকা-ফাকা কিছু লাগবে না?'

'সে তো লাগবেই! তা না হলে যে-কেরানি আছে, সে দরখাস্তটা নেবে কেন?'

'কত আন্দাজ?' আমি ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

'পুরো ব্যাপারটা আগে শুনুন, তারপর বিবেচনা করুন কত দেবেন।'

'শোনা যাক।' বলে আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। আমার কর্তব্য-পরায়ণা স্ত্রী ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা পাঠিয়েছিল।

'আমাদের ডিপার্টমেন্টে লোক নেওয়ার লাস্ট নোটিস বেরোয় প্রায় মাসদেড়েক আগে। অনেকে অ্যাপ্লাই করেছিল, তা প্রায় আড়াই হাজার হবে। লোক নেবে মোট ছত্রিশজন। সুতরাং, অতগুলো দরখাস্ত থেকে খান পঞ্চাশেক বাছাই করা হয়। তার ভেতর থেকে ওই ছত্রিশজনকে নেওয়া হবে। এখনই ওই বাছাই করা অ্যাপ্লিক্যান্টদের থেকে একজন অন্য জায়গায় চাকরি পেয়ে চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে, আর-একজন প্রেমে বিফল হয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই যে ভ্যাকান্সি দুটো হয়েছে, সে-খবর দু-একজন ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই তারা ওই ভ্যাকান্সি দুটোকে নিলাম করছে। একটির দাম একশো পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত উঠেছে। আর

মাত্র দু-দিন সময় আছে, কারণ তারপরেই ওই বাছাই-করা পঞ্চাশজনকে রিটেন এগজামিনেশানে বসবার জন্যে ডাকা হবে। সুতরাং আপনিই বিবেচনা করুন কত দেবেন।'

আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হল।

'আচ্ছা,' আমি নৃপতির কাছে জানতে চাইলাম, 'আমি যদি একশো ষাট টাকা দিই, তাহলে আমার ভাইয়ের অ্যাপ্লিকেশানটা না হয় গেল, কিন্তু তারপরে যদি শেষরক্ষা না হয়?'

'সেজন্যে ভাবছেন?' নৃপতি যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি আছি কী জন্যে? আপনাকে দাদা বলে ডেকেছি, আর আপনার জন্যে এটুকু করতে পারব না? তা ছাড়া, একবার রিটেন এগজামিনেশানটা হয়ে গেলে তারপর সবই আমার হাতের মুঠোয়, কারণ মুখার্জিদা—মানে, আমার বস ইজ দ্য রিক্রুটিং অফিসার!

'তাহলে একশো ষাটই থাকুক।'

'হ্যাঁ, ওতেই হয়ে যাবে।' নৃপতি বলল।

'টাকাটা কি এখন দেব?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'পরেও দিতে পারেন, তবে কালকের পরে দিলে কোনও কাজ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তা ছাড়া, যে নগদ টাকা আনবে, তাকেই কেরানিরা প্রেফারেন্স দেবে।' নৃপতি বোঝাল।

'তাহলে টাকাটা আপনি এখনই নিয়ে যান।' বলে আমি ভেতরে গেলাম। সেখান থেকে অণিমার আলমারি খুলে টাকাটা নিয়ে আবার বাইরের ঘরে ফিরে এলাম। নৃপতিকে টাকাগুলো গুনে দিলাম। ষোলোটা দশ টাকার নোট।

'আর প্রিয়তোষের—মানে, আমার ভাইয়ের অ্যাপ্লিকেশানটা ওকে দিয়ে লিখিয়ে রাখব। কাল তো রোববার আছে, সকালে ওটা আপনি এসে নিয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে।' নৃপতি টাকাটা পকেটে পুরে বলল, 'ওই কথাই রইল। আপনার ভাইয়ের জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি তাহলে আজ উঠি।'

অণিমা ঘরে এসে হাজির।

'সে কী কথা! আপনি আজ খেয়ে যাবেন না?' আমার সহধর্মিণী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'আজকে পেটটা ঠিক সুবিধের নয়, বউদি।' নৃপতি বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'আর-একদিন এসে খাব'খন।'

আমি একটু ওজর-আপত্তি করলাম, কিন্তু নৃপতি বিদায় নিল।

অন্য রোববারের মতো পরদিন সকালে বাজার-টাজার সেরে বেরিয়ে পড়লাম। নৃপতির জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু নৃপতি এল না। তাই আমি গেলাম শ্যামলের অফিসে। শ্যামল আমার বন্ধু...কিন্তু রোববারেও ওর ছুটি নেই।

'কী খবর?' শ্যামল আমাকে দেখে জানতে চাইল, 'অণিমা কেমন আছে?'

'ভালো।' আমি বললাম, 'মনোতোষ আসেনি?'

মনোতোষ আমার মেজ ভাই। আমরা তিন ভাই। প্রিয়তোষ সবার ছোট।

'না। তবে আসবার সময় যায়নি।' বলে শ্যামল তার বেয়ারাকে দুটো চা আনতে পয়সা দিল।

আমরা এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে-করতে চা এসে হাজির—পিছু-পিছু মনোতোষও।

'কেমন গেল?' তাকে জিগ্যেস করলাম।

'যেমন ভেবেছিলাম, ঠিক তেমন। ব্যাটা সোজা বাড়িতে গেল। সেখানে সমস্ত রাত্তির কাটিয়ে ভোর না হতেই ব্যাগ হাতে বাজারে। আলুর দোকানে প্রথম নোট, মাছের দোকানে দ্বিতীয় নোট, আর মিষ্টির দোকানে তৃতীয় নোট ভাঙাল। তারপরেই তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করলাম। পকেটে আরও দুটি নোট পেলাম। বাড়িতে তেওয়ারিকে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে বাকি নোটগুলো ছিল।'

'মক্কেল কোথায়?' মনোতোষকে আবার প্রশ্ন করলাম।

'দ্বিবেদী নিয়ে আসছে।' বলে আমার ভাই একটা সিগারেট ধরাল। আমরাও মুখাগ্নি করলাম।

'আর দলের বাকি লোকগুলো?' শ্যামল জিগ্যেস করল।

'কান্ডারিবিহীন নৌকো হয় কি কখনও?' মনোতোষের পালটা প্রশ্ন হল।

কিছুক্ষণ সকলে চুপ। ওয়েসলি হলের বোলিং শুরু হলে ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যেরকম নিস্তব্ধতা ছেয়ে ফেলে—সাংঘাতিক কিছুর প্রতীক্ষায়, তেমনি নিস্তব্ধতা।

'তোকে বলতে ভুলে গেছি,' মনোতোষ জানাল হঠাৎ, 'লোকটা কিন্তু সত্যিই ডিগ্রি পাশ করেছে।'

'আমার ধারণাও তাই ছিল।' শ্যামল সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে ফেলে বলল, 'না হলে ওইরকমের একটা গল্প ফাঁদতে পারত না।'

'আধুনিক শিক্ষার ফলাফল।' আমি মন্তব্য করলাম, 'দোষ্টা কার—সমাজের, না শিক্ষার?'

'তোমার-আমার মুখে ওইসব কথা সাজে না।' শ্যামল বলল।

'তোর প্ল্যানটা কিন্তু অপূর্ব ছিল।' মনোতোষ আমার তারিফ করল।

'প্রশংসাটা আসলে তোর বউদির প্রাপ্য।' আমি সত্যি কথা বললাম, 'নিজের অজান্তে ও-ই আমাকে প্ল্যানটা বাতলায়।'

হঠাৎ বাইরে একটা আওয়াজ পেলাম, ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

'এবার মুখোশ খোলার পালা।' শ্যামল বলল।

'আমি তাহলে চলি।' বলে আমি উঠলাম।

দরজার আড়াল হতেই শুনলাম কে যেন বলছে, 'স্যার, একে বুক করুন। এর কাছে চোরাই টাকা পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, লোককে ঠকানোর জন্যে এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

'মিথ্যে কথা!' আর-একজন প্রতিবাদ করল, 'আমি জানি না, আমার কাছে চোরাই টাকা কী করে এসেছে। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, আমি একজনের কাছে টাকা পেতাম, সে আমাকে কাল রাতে ধারটা শোধ করে দিয়েছে। এখন সে যদি চোরাই টাকা দিয়ে থাকে তো আমি তার কী জানি?'

'কত টাকা পেতে?' শ্যামল জানতে চাইল।

'প্রায় শ'দুয়েক টাকা।' জবাব এল।

'লোকটার সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?'

'বছরচারেক তো হবেই!'

'সে তোমার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল কেন?'

'পুরো ব্যাপারটা বলতে আমার অসুবিধে আছে।'

'বেশ, যতটা বলতে পারা যায়, ততটা বলো।'

'আমার বন্ধুটি ভীষণ জুয়া খেলত।'

'লোকটা কি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ, তবে বউটা বড্ড খিটখিটে। বাড়িতে একদঙ্গল ছেলেপুলে।'

'কী কাজ করে?'

'কোন এক ব্যবসাদারের গদিতে খাতা লেখার কাজ করে।'

'যেমন তোমার দাদা করত?'

'আমার কোনও দাদা নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার কানে একটা দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ এল। আমার ভাই মনোতোষ খুশি হলে চুরুট ধরায়। চুরুটের গন্ধ পেলাম। বুঝলাম যে, মনোতোষ খুশি হয়েছে। মনোতোষ পুলিশে কাজ করে। শ্যামলও।

হঠাৎ মনোতোষের গলা আবার শুনতে পেলাম।

'আচ্ছা, ওই লোকটির নাম-ধাম কিছু জানো?'

'নিশ্চয়!' উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর এল।
'যদি তাকে এখানে হাজির করানো হয়, তাহলে তাকে বলতে পারবে এই কথাগুলো?'
'আলবাত! সত্যের জয় সব জায়গায়!'
'তাই নাকি?' বলে আমি ঘরে ঢুকলাম।
দেখলাম, আমার সামনে একজন পুলিশের হাতে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা নৃপতি নারায়ণ নস্কর।
আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
আমি বাগবাজার থানার ও. সি.।

মাসিক রোমাঞ্চ
অক্টোবর, ১৯৬৯



নৃশংস

রবীন দেব

ড্রইংরুমে বসে গোয়েন্দা অফিসার মুকুল চৌধুরী অপেক্ষা করছিল সুরেন দাশের জন্য। বারবার হাতঘড়ি দেখছিল। আশ্চর্য! আজকেও সুরেন দাশ এল না কেন?

সুরেন দাশের ওপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে। তার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সে কোনও সংবাদ আনতে পারবে। তার মতো গুণ্ডা যদি এ-সংবাদ না আনতে পারে, তাহলে আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মেয়েটি অ-শনাক্তই থেকে যাবে। যারা খুন করেছে, তারা বেশ সুস্থ মাথায় প্রতিটি প্রমাণ নিখুঁতভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। কী নৃশংসভাবে খুন করেছে মেয়েটাকে!

মুকুল এবার চমকে উঠল।

মানুষ এত হিংস্র শয়তান হতে পারে!

ক্ষুরধার ব্লেডের সাহায্যে কেটেছে। মাথা, হাত, পা—কিছুই নেই, শুধু ধড়টা আছে। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত একটুকরো মাংসখণ্ড।

ধড়টা একটা মেয়ের। পূর্ণ যুবতী, যৌবনের প্রতিটি রেখা নিখুঁত। একসময় হয়তো সুন্দরী ছিল, রংও ছিল ফরসা, এখন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। ফুলে গেছে। একটু পচা গন্ধও যেন বাতাসে ভাসছে।

মুকুলের নাকে যেন হঠাৎ পচা দুর্গন্ধ ভেসে এসে ঝাপটা মারল। আর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল মুহূর্তের জন্য। সে ডাক্তার অপরেশ মুখার্জিকে জিগ্যেস করেছিল, হোয়াইট উইল বি দ্য এজ, ডক্টর মুখার্জি?

—মে বি টুয়েন্টি ফাইভ।

ধড়টা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, অন্তত দু-তিনদিন আগে খুন করা হয়েছে। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে রং। কাটা জায়গায় একফোঁটাও রক্ত নেই, মাংস কাগজের মতো সাদা।

আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন পরিষ্কার করতে নেমে সুইপার দেহটা পেয়েছিল।

মৃতদেহের যেটুকু পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, মেয়েটির যথেষ্ট দেহ-সৌন্দর্য ছিল। বয়েস মাত্র পঁচিশ বছর। কী নিটোল দেহ!...কে এমন নৃশংসভাবে খুন করতে পারে!...শনাক্ত করাও তো সম্ভব হচ্ছে না। অথচ শনাক্ত না হলে খুনিকে ধরা সহজ হবে না। খুনি খুন করে মেয়েটির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন

করে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছে। মাত্র এই ধড়টা ছাড়া আর কোনও অংশ পাওয়া যায়নি। হয়তো আর পাওয়া যাবে না।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলেছে, তীকস্ন ব্লেডের সাহায্যে মাথা, হাত-পা কাটা হয়েছে। খুনি শরীরের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অর্থাৎ, তার বায়োলজি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। মেয়েটির পেটে অ্যালকোহল এবং অজীর্ণ মাংস পাওয়া গেছে। মৃত্যুর সময় রাত্রি একটা থেকে দেড়টার মধ্যে।

যেদিন বডি পাওয়া গেছে তার দু-দিন আগে খুন হয়েছে।

পাবলিক প্রেস এবং সংবাদপত্রে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেও কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কেন? মেয়েটির কি কোনও আত্মীয় নেই? যদি থাকে, তাহলে কেন তারা নিখোঁজ মেয়ের জন্য থানায় জানাচ্ছে না?

খুনির বায়োলজির কোনও জ্ঞান নেই। ব্লেড চালিয়েছে অপটু হাতে। তবে কি খুনি নতুন কোনও পাপী?

মেয়েটিকে শনাক্ত করতে অনেক চেষ্টা করেছে মুকুল, কিন্তু পারেনি। শেষটায় সুরেন দাশের সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার বিভিন্ন সংবাদের জন্য সুরেনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, প্রতিবারই সে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

সুরেন বলেছে, কিছু ভাববেন না, স্যার, দু-দিনেই আমি আসামিকে হাজির করছি।

আজ তিনদিন ধরে প্রতিদিনই মুকুল ভাবছে, আজ হয়তো সুরেন আসবে। কিন্তু আসেনি। আজও বসে আছে প্রতীক্ষায়।

—স্যার, খুব চিন্তা করছেন তো?—হাসতে-হাসতে সুরেন এল ড্রইংরুমে।

মুকুল হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। সে দেখল, নেভি ব্লু রঙের টাইট প্যান্টের সঙ্গে ক্রিম কালার শার্টে সত্যিই চমৎকার মানিয়েছে সুরেনকে। লাল টকটকে গায়ের রং। বলিষ্ঠ, সুদেহী সুরেনের চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। অনর্গল ইংরেজি বলতে পারে। সহসা কেউ বিশ্বাস করবে না যে, সে গুণ্ডা। অথচ গুণ্ডামি আর চোরাই আফিমের কারবারের জন্য সে দুবার জেল খেটেছে। বর্তমানে আর বেআইনি কিছু করছে না। একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোডে। মুকুল গিয়েছিল কয়েকবার। বেশ চালু দোকান। দোকানটার নামটাও বড় চমৎকার : 'সোনালি ড্রিঙ্ক'।

—বোসো সুরেন।—মুকুল হেসে বলল।

সুরেন সোফাতে বসে বলল, পেয়েছি, স্যার।

—পেয়েছ?—সাগ্রহে বলে মুকুল।

—হ্যাঁ, স্যার। মেয়েটার নাম মিস সোফিয়া বার্নার্ড। সে প্রাইভেট বিজনেস করত।

—প্রাইভেট বিজনেস! মানে?

—মানে স্যার, আপনার কাছে বলতে—।—একটু লজ্জা পেল সুরেন : এই সন্ধ্যার পর কোনও বারে বা রেস্টুরেন্টে নতুন বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে রাত কাটাত।

বুঝতে মুকুলের কোনও অসুবিধে হল না। গম্ভীর হয়ে বলল, কে বা কারা খুন করেছে জানতে পারলে?

—না স্যার, ওইখানেই ফেল মারলাম। তবে চেষ্টা করছি। হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারব। তবে স্যার, ওই 'মিডনাইট কাফে'তে একটু নজর রাখবেন। আমি জেনেছি, সোফিয়া ওখানেই নাকি শিকার খুঁজতে প্রতিসন্ধ্যায় যেত।

সুরেনের কাছ থেকে সোফিয়া বার্নার্ড-এর ঠিকানা নিয়ে মুকুল বলল, অনেক ধন্যবাদ, সুরেন। আশা করি, তুমি আরও খবর এনে দিতে পারবে।

সুন্দর হাসিতে সুরেনের মুখ ভরে উঠল। বলল, আই হ্যাভ এনগেজড মাই অল স্ট্রেংথ ফর ইউ, স্যার।

সুরেন চলে যাওয়ার পর মুকুল অনেকক্ষণ একা-একা বসে রইল।...মিডনাইট কাফে। ওখানে বেআইনি কাজ-কারবার চলে বলে সে অনেক খবর পেয়েছে। কিন্তু কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।...সোফিয়া

বার্নার্ড ওখানে যেত শিকারের সন্ধানে। ভালো জায়গা। পকেট ভারী না থাকলে মিডনাইট কাফেতে যাওয়া যায় না। তরল নেশা আর নারীর নরক। সোফিয়ার পেটে ছিল অজীর্ণ মাংস আর মদ।

শহরের সন্ধ্যা।

নিয়নের হাতছানি মেশানো আলোর মায়াজাল।

মুকুল ক্রিক রো-তে এসে তার মোটরবাইক থামাল। তারপর নম্বর মিলিয়ে এক ত্রিতল বাড়ির গেটে এসে দরজার কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল।

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা বললেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, মিস্টার?

মুকুল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলার দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আই ওয়ান্ট টু মিট মিস সোফিয়া। উইল ইউ প্লিজ শো মি হার ফ্ল্যাট?

—সোফিয়া! শি ইজ নট হিয়ার। শি ওয়েন্ট টু বোম্বে অন ফ্রাইডে বাই মর্নিং ফ্লাইট।

—বোম্বে! থ্যাংক্স, ম্যাডাম।—মুকুল ধন্যবাদ দিয়ে মোটরবাইকে স্টার্ট দিল। মনে-মনে হিসেব করল : শুক্রবার সোফিয়া বোম্বাই গেছে, আর যে-মেয়েটার ধড় পাওয়া গেছে, সে-ও খুন হয়েছে সেদিনই রাত্রি একটা থেকে দেড়টার মধ্যে।...সোফিয়া বার্নার্ডই হয়তো খুন হয়েছে। সুরেনের ইনফরমেশান মিথ্যে নাও হতে পারে।

দূর থেকেই মুকুলের দৃষ্টি আটকে গেল ঝলমলে নিয়ন লাইটে ঝলসানো 'মিডনাইট কাফে'তে।

মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে ভেতরে এল।

একটা টেবিলও খালি নেই। পরদা ফেলা কেবিনগুলোর মধ্যেও বেশ একটা মৃদু গুঞ্জন। সার্ভাররা ট্রে হাতে সার্ভ করে যাচ্ছে পেগ, গ্লাস।

মুকুল এগিয়ে গেল কাউন্টারে। একটা চেয়ারের হাতলে বসে এক সুবেশিনী। তার যৌবনপুষ্ট দেহ যেন আকাশি রঙের নাইলন শাড়ি ভেদ করে ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড় উগ্র তার দেহ-সৌন্দর্য। পাতলা লাল ঠোঁটে স্ট্র চেপে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করছে।

মুকুল এসে দাঁড়াল।

নারী তন্দ্রাচ্ছন্ন চাউনি মেলে ধরল। যেন পদ্মকোরক পাপড়ি মেলেছে। মিষ্টি সুরে বলল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, মিস্টার?

মেয়েটির ইংরেজি শুনে মুকুল বুঝল এ-ভাষাটা তার এখনও বিশেষ ভঙ্গিমায় রপ্ত হয়নি। সে বলল, মিস্টার কাপুর কোথায়?

—মিস্টার কাপুর তিন নাম্বার কেবিনে গেছেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

মুকুল আর কিছু না বলে ফিরে চাইল। প্রকাণ্ড হলে অন্তত একশোটা টেবিল। প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কী নির্লজ্জের মতো ড্রিঙ্ক করছে। তার মনে হল, হয়তো সে এ-দেশে নেই। সমুদ্রপারের কোনও বিদেশি শহরের এক বারে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা টেবিল হতে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরা বেসামাল অবস্থায় তার বান্ধবীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বেরিয়ে গেল।

মুকুল এসে বসল সেখানে।

—এনি ড্রিঙ্ক স্যার?—সার্ভার এসে দাঁড়াল।

—হুইস্কি। বড়া পেগ।—মুকুল সিগারেট ধরাল।

সার্ভার ট্রে হতে পেগ, গ্লাস নামিয়ে রেখে চলে গেল।

মুকুল স্থির দৃষ্টি মেলে দেখল, তরল নেশা টলটল করছে সুদৃশ্য কাচের গ্লাসে।

হঠাৎ সে দেখল মিস্টার কাপুর তিন নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন কাউন্টারের দিকে। মুকুল দ্রুত এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে। বলল, মিস্টার কাপুর, আই হ্যাভ সাম আর্জেন্ট টক উইথ ইউ।

—আর ইউ মিঃ চৌধুরী? —অবাক বিস্ময়ে বলেন মিস্টার কাপুর, বলুন, কী ব্যাপার।

—চলুন, আপনার চেম্বারে যাওয়া যাক।

মিস্টার কাপুরের কপালের চামড়া কুঁচকে গেল। তিনি বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মুকুলের দিকে তাকিয়ে একটা দরজার ভারী নীল পরদা সরিয়ে সরু প্যাসেজ দিয়ে তাকে নিয়ে নিজের চেম্বারে বসলেন।

—আপনি মিস সোফিয়া বার্নার্ড বলে কাউকে চেনেন?

—সোফিয়া বার্নার্ড! সোফিয়া!—বিড়বিড় করে বারকয়েক নামটা উচ্চারণ করলেন মিস্টার কাপুর। পরে পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, আই অ্যাম সরি, মিস্টার চৌধুরী। এ-নামের কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

—আপনার এখানে যেসব মেয়ে আসে, তাদের সবাইকে চেনেন?

—সবাইকে চিনি বললে ভুল হবে। তবে যারা নিয়মিত আসে, তাদের চিনি বইকি।—মৃদু হাসলেন মিস্টার কাপুর। বললেন, কেন বলুন তো?

—না, তেমন কিছু নয়। শুধু তার হোয়্যার অ্যাবাউটস জানতে চাই।—মুকুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মিডনাইট কাফের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল।...মিস্টার কাপুর সোফিয়াকে চেনেন না? আশ্চর্য তো! অথচ সে নাকি নিয়মিত এখানে শিকারের সন্ধানে আসত। তবে কি কাপুর মিথ্যে বললেন?....এই বার সম্বন্ধে অনেক খবর তার জানা আছে। তবে কি এখানেই কোনও অঘটন ঘটেছে?

হঠাৎ সে দেখল, একজন সার্ভারের কাঁধে ভর করে এক ভদ্রলোক আসছেন।

চকিতে তার মনে পড়ল, তিন নম্বর কেবিনের পরদা উঠিয়ে যখন মিস্টার কাপুর বেরিয়ে আসেন, তখন এ-মুখটাকে সেখানে সে দেখেছিল। মুকুল দ্রুত এগিয়ে এল তাদের কাছে।

এক ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন ভাড়ার জন্য ওত পেতে বসেছিল। সে এগিয়ে এল। সার্ভার আর ধরে রাখতে পারছে না বেহুঁশ লোকটাকে। মুকুল এসে লোকটাকে আর-এক হাত ধরে ঠিক করে দাঁড় করাতেই তার পকেট থেকে একটা পার্স পড়ে গেল।

মুকুল পার্সটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল, এক যুবতীর ফটোগ্রাফ আটকানো। ভ্রূ কুঁচকে গেল তার। সার্ভারের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, একে চেনো?

—জি সাব। মিস সোফিয়া।—মৃদু হেসে বলল সার্ভার।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিল মুকুল। সে ড্রাইভারের সঙ্গে লোকটাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

মিস্টার কাপুর বলেছেন, তিনি সোফিয়াকে চেনেন না। কিন্তু সেই মাতাল মিস্টার গোপাল গণেশন বলেছে, কাপুর তার সঙ্গে সোফিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সোফিয়া, ভেরি চার্মিং লেডি। হাউ নাইস শি ইজ! হাউ সুইট! অথচ আজ পাঁচদিন সে তার কোনও খবর পাচ্ছে না।

মুকুল বলেছিল, কেন, কোথায় গেছে?

—জানি না। বৃহস্পতিবার রাত্রে সোফিয়াকে নিয়ে এক জুয়েলারি দোকানে গিয়ে হীরের ব্রেসলেট কিনে দিয়েছিলাম। কথা ছিল, শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও খবর নেই। প্রতিদিন বারে গেছি। রাত এগারোটা পর্যন্ত চুপ করে বসে ড্রিঙ্ক করেছি। শূন্য গ্লাসের মতো শূন্য হৃদয়ে ফিরে এসেছি। কাপুরকে জিগ্যেস করেছি। অথচ সোফিয়া যেন হাওয়ায় মিশে গেল!—মিস্টার গণেশনের নেশা-জড়ানো চোখের কোণে অশ্রু চকচক করে উঠেছিল।

—তার বাড়িতে খোঁজ নিলেন না কেন?

—ঠিকানা জানিনে। বারেই আলাপ। সেখানেই দেখা পেতাম। তাই ঠিকানার কোনও প্রয়োজন হয়নি। —মিস্টার গণেশন ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছিল।

মুকুল নিজে ক্রিক রো-তে গিয়ে সোফিয়ার ফ্ল্যাট সার্চ করে এসেছে। কিছুই পায়নি। চলে যাওয়ার সমস্ত চিহ্ন শুধু ছড়ানো ছিল তার ঘরে। প্রয়োজনীয় কোনও জিনিস ফেলে যায়নি। হয়তো সে সত্যিই চলে গেছে এ-নগর ছেড়ে অন্য নগরের হাটে।

এয়ারওয়েজ অফিসগুলোতে খবর নিয়ে জেনেছে, সোফিয়া বার্নার্ড নামে কোনও মেয়ে বোম্বে যায়নি। ভেবেছিল, হয়তো অন্য নামের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু না। সোফিয়া বার্নার্ডের ফটোগ্রাফ দেখে এয়ারহোস্টেস বলেছে, এ-মেয়েকে সে দেখেনি।

মুকুলের মনের মধ্যে কতগুলো সন্দেহ মাথা তুলে জেগে উঠল।

কাপুর। কাপুরই এ-রহস্যের নায়ক। হয়তো সে ছিল সোফিয়ার এজেন্ট। কোনও কারণে মনোমালিন্য হওয়াতে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। নতুন পাপী এমন নিখুঁত কাজ করতে পারে না। ঠান্ডা মাথায় ব্লেড চালিয়ে দেহের অংশগুলো কেটেছে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করে শনাক্ত করতে না দেওয়ার জন্য দেহের অংশগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছে।

গণেশন হয়তো মিথ্যে বলেনি, ওরকম মাতাল এমনভাবে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে না।

—স্যার।

চমকে উঠল মুকুল। সত্যি সে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। নইলে সে জানতে পারত সুরেন কখন এসেছে। মৃদু হেসে কৌতূহলী চাউনি মেলে বলল, আর কিছু জানতে পারলে?

—একটু আভাস পেয়েছি, স্যার। মিস্টার গোপাল গণেশন আর ম্যানেজার মিস্টার কাপুর, এরা দুজনেই এ-রহস্যের নায়ক।—শান্ত কণ্ঠে বলে সুরেন।

—আমার কিন্তু গণেশনকে সন্দেহ হয় না।

—বলেন কী!—দু-চোখ কপালে তুলে বলে সুরেন।

—মাতাল গণেশনকে আমি জেরা করেছি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু বুঝতে পারিনি।

—আমি জানি, স্যার। সেসময় আমিও বারে ছিলাম। ওদের ওয়াচ করছিলাম। গণেশন কী অদ্ভুতভাবে মাতালের অভিনয় করে আপনাকে বোকা বানাল!—সুরেন রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল।

—অভিনয়?—মুকুলের ভ্রূ কুঁচকে যায়।

—হ্যাঁ, স্যার। আমি ওদের পাশের কেবিনে ছিলাম। কাঠের পার্টিশনের ফাঁকে চোখ রেখে দেখেছি। গণেশন গায়ে মদ ঢেলে মাতালের মতো টলতে-টলতে এক সার্ভারের কাঁধ ধরে বেরিয়ে আসে। আপনি যখন তাকে জেরা করেন, তখন সে মোটেই মাতাল ছিল না।

—সোফিয়াকে ওরা খুন করবে কেন?

—এখনও তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আশা করছি, দু-একদিনের মধ্যে প্রমাণসমেত ওদের আপনার কাছে ধরে দিতে পারব। তবে মনে হচ্ছে, ওদের কোনও গোপন কথা সোফিয়া জানত, তাই হয়তো সে তাদের ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল।

সুরেন চলে যাওয়ার পর মুকুলের মনে হল, হয়তো সে ঠিক খবরই দিয়ে গেল। গণেশনকে এখন কেমন যেন ঠিক মাতালের মতো মনে হচ্ছে না। নেশায় যে ঠিক দাঁড়াতে পারছিল না, সে যেন অনেকটা সুস্থ মানুষের মতো প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। সোফিয়া যে-চরিত্রের মেয়ে তার পক্ষে অন্যের গোপন কথা জানতে পারা অসম্ভব নয়। তবে কি তারা ব্ল্যাকমেলড হওয়ার ভয়েই এমন নৃশংসভাবে খুন করে প্রমাণ নষ্ট করেছে?

অফিসে এসে নিজের চেম্বারে বসে আবার গভীরভাবে প্রতিটি ঘটনা চিন্তা করতে শুরু করল। বারকয়েক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়ল। একবার ভাবলে, মিডনাইট কাফে রেইড করবে। কিন্তু কোনও প্রমাণ তো হাতে নেই! অসহায় হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল।

—স্যার!—সাব-ইন্সপেক্টর বিদ্যুৎ সেন এসে দাঁড়াল।

—কিছু জানতে পারলে?—মুকুলের ক্লান্ত কণ্ঠ।

—মিস্টার গোপাল গণেশন সম্পর্কে মাদ্রাজ পুলিশের কাছ থেকে ওয়্যারলেসে খবর এসেছে।

—তাই নাকি!—মুকুল সোজা হয়ে বসল।

—হ্যাঁ, স্যার। মিস্টার গণেশন একজন চোরাকারবারি বলে মাদ্রাজ পুলিশ সন্দেহ করে। তা ছাড়া একটা মার্ডার কেসের সঙ্গেও সে নাকি আংশিকভাবে জড়িত। তবে তার জোরালো অ্যালিবাই থাকার জন্যে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না।

—মিস্টার কাপুরের সম্পর্কে ইনফরমারদের কী রিপোর্ট?

—মিস্টার কাপুর চোলাই মদের বেআইনি ব্যবসা করছেন। সে-চোলাই মদ চন্দননগর থেকে চালান হয়ে আসে। তবে এখনও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।—বিদ্যুৎ বলল।

মুকুল হতাশ হয়ে পড়ে। আশ্চর্য! এই দুজন ক্রিমিন্যাল সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে নিখুঁতভাবে। তার যেন মনে হল, মিস্টার কাপুর আর গণেশন তার দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে উন্মাদের মতো হেসে ব্যঙ্গ করছে।

অসহ্য! ভেতরে-ভেতরে ছটফট করতে থাকে মুকুল। না, যে-করেই হোক এদের সে আর পৃথিবীর মুক্ত প্রাঙ্গণে চলাফেরা করে পাপ কাজ করতে দেবে না।

গভীর রাত্রি।

অন্ধকার আকাশের বুকে শুধু নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপন জ্বলছে।

ক্লান্ত শহর ঘুমিয়ে আছে গভীর ক্লান্তিতে।

মুকুল ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে।

স্ট্র্যান্ড রোডের ফুটপাথ থেকে নেমে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল মহাত্মা গান্ধী রোডের এক গলির মধ্যে। সরু বাই লেন দিয়ে চলতে থাকল। সামনেই বাঁদিকে সুরেন দাশের রেস্টুরেন্ট সোনালি ড্রিঙ্ক-এর খিড়কি দরজা। সুরেন এখানেই থাকে। তাকে চুপিচুপি ডেকে নিয়ে এখনই যাবে মিডনাইট কাফেতে হামলা করতে। সুরেন সঙ্গে থাকলে অনেক সহজ হবে কাজ। কারণ, মিডনাইট কাফের অলিগলি সবই তার নখদর্পণে।

দরজার সামনে দাঁড়াল মুকুল।

ভেতরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর ক্ষীণ রেখা এসে পড়ল মুকুলের মুখ হতে কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে।

সে ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়াল।

সুন্দর একটা ঘর। ও-পাশের দেওয়াল ঘেঁষে দুটো রেফ্রিজারেটর। একটা ওয়টলের সাদা চেয়ারে বসে আছে সুরেন। তার সামনের টেবিলে মুক্তো-রঙের ফ্লাওয়ার ভাসে তাজা ব্ল্যাক প্রিন্স। ও-পাশে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মুখ দেখতে পেল না মুকুল। শুধু তার দুধ-সাদা অর্গান্ডির গাউনের ফ্রিল শ্বেত-প্রজাপতির পাখার মতো ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে। নরম সোনালি হাতের কনকচাঁপা আঙুলে সদ্য-জ্বলা সিগারেট।

—কী করবে ঠিক করেছ?—জলতরঙ্গের মিষ্টি আওয়াজ মেয়েটির কণ্ঠে।

—এগুলো ঠিকমতো পাচার করতে পারলে আর চিন্তা করি না।—সুরেন ওয়াইন গ্লাসটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলল।

—মিস্টার চৌধুরী সন্দেহ করেনি তো?—মেয়েটির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

—না। শুধু আজকের রাতটা কেটে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। তাহলে আর কে...।—সুরেনের যেন দম আটকে যায়। একটু কেশে ওঠে। বার দুই ঢেকুর তোলে সে। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা রেফ্রিজারেটরের সামনে গিয়ে পাল্লা খুলে দাঁড়ায়।

—আর মাত্র একঘণ্টা। তারপর ওগুলো সরিয়ে ফেলব।—সুরেনের মুখে জাগে অদ্ভুত হাসি, চোখে ফোটে শ্বাপদের হিংস্রতা।

মেয়েটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মুকুল তার মুখ দেখতে পেল না। সে কৌতূহলী চাউনি মেলে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটার রুক্ষ চুল এসে থেমে গেছে অনাবৃত মসৃণ গোলাপি পিঠে। সাদা অর্গাণ্ডির স্বচ্ছ বুনটের ভিতরে সুন্দর নিটোল দেহ।

—এ-কাজ না করলে পারতে।

—কী যে বলো! নইলে শয়তানি সব পুলিশে বলে দিত। বর্মায় লিমাং ছিল আমার একমাত্র ভরসা। ও-ই ওখান থেকে ওপিয়াম আর গোল্ড পাঠাত। কিন্তু কী করব? সুযোগ বুঝে আমাকে ধমক দিল, ভয় দেখাল; পাঁচ লাখ টাকা না দিলে সব পুলিশে জানিয়ে দেবে। তাই তো কায়দা করে লিমাংকে এখানে এনে শেষ করে দিলাম। তা না করলে যে আমাকেই মরতে হত।

সুরেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মেয়েটি এবার আসে সুরেনের কাছে।

চমকে ওঠে মুকুল।

সোফিয়া! সেই দীঘল চোখে কেমন যেন আতঙ্ক। সোনা-রং মুখে তার ঘাম, পাতলা লাল ঠোঁট দুটো চকচক করছে। একটু কাঁপছে।

সে চাইল খোলা রেফ্রিজারেটরের ভেতরে। মধ্যের তাকে রয়েছে দুটো পা আর দুটো হাতের ছিন্ন অংশ। একটা কী যেন জড়ানো আছে রক্তাক্ত কাপড়ে। হয়তো লিমাং নামের মেয়েটার মাথা...!

শিউরে উঠল মুকুল। সে যেন অনেকটা ছুটেই এল বড় রাস্তাতে।...থানা...থানা অনেক দূরে।

মাসিক রহস্য পত্রিকা

পুজো সংখ্যা, ১৯৬৯



ইস্কাবনের বিবি

অনিলকুমার ঘোষ

পূর্ণচন্দ্র স্ট্রিটের শেষের দিকে মস্ত বড় চারতলা একটা বাড়ি।

বাড়িটা যে কতকালের, কে জানে। কালের অপ্রতিহত নিষ্ঠুর আঁচড়ে বাড়িটা ক্ষতবিক্ষত। চুন-বালির পলেস্তারা ঝরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নোনা-খাওয়া আধভাঙা ইঁট।

বাড়ির মধ্যে পায়রার খোপের মতো ছোট-ছোট অগুন্তি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরে গিজগিজ করছে মানুষ। এরা কেউই আলোকিত পথের পথিক নয়। এদের অর্থসঞ্চয়ের পথটাও রহস্যপূর্ণ। প্রত্যেকেই নোংরা, অশিক্ষিত, বিবেকহীন এক কুৎসিত জগতের লোক। কেউ চোর, কেউ পকেটমার, কেউ স্মাগলার, কেউ গুণ্ডা। প্রত্যেক রকমের অপরাধীকেই পাওয়া যাবে এ-বাড়ির কোনও-না-কোনও ঘরে।

বাড়ির সুনামের কথা পাড়ার লোকেরা জানে। সেহেতু এরা পাড়ার মধ্যে নিজেদের কোনও কলাকৌশল দেখায় না, পাড়ার লোকেরাও এদের ঘাঁটায় না, বরং সমীহ করে দূরে-দূরেই থাকে।

পুলিশ প্রায়ই হানা দেয়, কিন্তু কিছুই পায় না। শোনা যায়, বাড়িওয়ালার নাকি কড়া আদেশ—কেউ কোনও চোরাই মাল নিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। বাসিন্দারা তাই চোরাই মাল বিক্রি করে বাড়িতে ঢোকে।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা।

দোতলায় রাস্তার দিককার একটা ঘরে পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল পকেটমার রহিম ও ছিঁচকে চোর কালু। এমনসময় দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ওয়াগনব্রেকার গজু। ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এই রহিম...আরে ও কালু, তোরা এখনও ঘুমোচ্ছিস? দ্যাখ...দ্যাখ, রাস্তায় কী কাণ্ড...!'

রহিম ও কালু হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। তাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল। তারা বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? কী হয়েছে?'

গজু ততক্ষণ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রহিম ও কালু কান পেতে শুনল, বাইরে শোনা যাচ্ছে বহু লোকের সমবেত চিৎকার। গজু বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আই বাপ, রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে! ওরা এই বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে! সবাই এই বাড়ির দিকেই দেখিয়ে-দেখিয়ে কী যেন বলছে! কী ব্যাপার র‍্যা?'

ততক্ষণ রহিম ও কালু জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কালু আনমনে বলল, 'খোদা জানে কী হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, কেউ কোনও ঝামেলা করে এ-বাড়িতে ঢুকেছে। মকান-মালিক টের পেলে খাল খুলে

নেবে...।'

কালুর কথা শেষ হওয়ার আগেই দড়াম করে দরজা খুলে কে যেন ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

'কে রে?' রহিম বিরক্ত হয়ে হাঁক দিল।

'চোপ,' আগন্তুক ক্রুদ্ধস্বরে ধমক দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওস্তাদ!' এদের তিনজনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক স্বর বেরিয়ে এল।

আগন্তুক কুখ্যাত গুণ্ডা ও স্মাগলার করিম খাঁ।

প্রায় ছ' ফুট লম্বা, শক্তিশালী চেহারা। শরীরের প্রত্যেকটি পেশি সতেজ ও সবল। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল উলটো করে আঁচড়ানো। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও গোঁফ। একাধিক পুরোনো আঘাতের চিহ্ন মুখটাকে ক্ষতবিক্ষত করে কেমন যেন বীভৎস করে তুলেছে। হিংস্রতায় ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকালেই শরীরটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায়।

পুলিশের খাতায় করিমের নাম অনেকদিন থেকেই উঠে রয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে আজও ধরা যায়নি। পুলিশ ভালোভাবে জানে লোকটা বহুরকম অপরাধমূলক কাজে জড়িত আছে। কিন্তু প্রমাণ কই? ওদিকে কলকাতার প্রত্যেকটি চোর-বদমায়েশ করিমকে সমীহ করে চলে। তারা জানে, এই বদরাগী লোকটা কথায়-কথায় চাকু চালায়। তাই তারা ভয়ে বা ভক্তিতে ওকে 'ওস্তাদ' বলে ডাকে।

এ হেন লোককে ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে ওরা দু-চোখে আতঙ্ক ও বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল।

দু-পা এগিয়ে এসে করিম জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা কতক্ষণ থেকে এখানে আছিস?'

কালু ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আমরা তো ঘুমোচ্ছিলাম...।'

থাবড়া মেরে কালুর মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে করিম বলল, 'ব্যস-ব্যস, শোন কান খুলে—আমিও এখানে ছিলাম বেলা সাড়ে চারটে থেকে, বুঝলি?'

'সাড়ে চারটে থেকে!' ওরা তো আকাশ থেকে পড়ল, 'তার মানে?'

'মানে দিয়ে তোদের কী কাম?' দাঁত খিঁচিয়ে বীভৎস মুখে করিম তেড়ে এল 'শুধু মনে রাখ—আমি বেলা সাড়ে চারটে থেকে তোদের সঙ্গে বসে আছি। একবারও উঠিনি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে এই কথা বলবি। নইলে...।' বলতে-বলতে সে পকেটে হাত দিল।

পকেটে হাত দেওয়ার মানে ওরা জানত, তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'জী ওস্তাদ, ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমরা কী করছিলাম, তাহলে কী বলব?'

কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভেবে করিম চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর চট করে তাকের ওপর থেকে এক প্যাকেট পুরোনো তাস তুলে এনে বলল, 'আমরা তাস খেলছিলাম...মানে ব্রিজ খেলছিলাম...বুঝলি? যদি না বলিস, তাহলে...।' বলতে-বলতে সে পকেট থেকে একটা বড় ছোরা বের করে দোলাতে লাগল।

গজু ও কালু এ-লাইনের পুরোনো লোক। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে না বুঝলেও ওরা বুঝতে পেরেছিল, করিম কোথাও কোনও ঝামেলা পাকিয়ে এসেছে। এখন ব্যাক-টাইম বলে নিজের অ্যালিবাই সুদৃঢ় করতে চায়।

'ক্যা হুয়া রে উল্লু,' করিম গর্জন করে উঠল, 'বৈঠ ইধার।'

কোনও উচ্চবাচ্য না করে ওরা গোল হয়ে খাটিয়ায় বসে পড়ল। ঠিক সেইসময় কাঠের সিঁড়িতে শোনা গেল একাধিক ভারী বুটের আওয়াজ। এ-আওয়াজ ওরা চেনে—পুলিশ।

পরক্ষণেই বন্ধ দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিতে-দিতে গম্ভীর সুরে কে যেন বলল, 'খোল...দরজা খোল শিগগির...।'

করিম চকিতে সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'দরজা খুলে দে। কিন্তু মনে রাখিস...।' কথাটা মাঝপথে থামিয়ে একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করল।

ওদিকে করাঘাত বেড়েই চলেছে। করিমের ইশারা মতো কালু দরজা খুলতে গেল। করিম নির্বিকারভাবে বসে তাস শাফল করতে লাগল।

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন ওয়াটগঞ্জ থানার ও. সি. মিঃ মল্লিক ও তিন-চারজন পুলিশ। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মিঃ মল্লিক কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তোরা কী করছিলি?'

করিম মুখ তুলে বলল, 'সেলাম বড়বাবু।'

করিমের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মিঃ মল্লিক চমকে উঠলেন : 'এই যে করিম, তুমি এখানে? আমি ঠিক জানতাম তোমাকে এ-বাড়িতেই কোথাও পাব। তুমি কি ভেবেছিলে এখানে লুকিয়ে থাকলেই আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে?'

অবাক হওয়ার ভান করে করিম বলল, 'কী বলছেন, বড়বাবু? আমি লুকোব কেন? আমি তো এখানে বসে তাস খেলছিলাম।'

'তাস খেলছিলে?' মিঃ মল্লিক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'কতক্ষণ থেকে তাস খেলছিলে?'

নির্বিকারভাবে করিম বলল, 'সেটা আপনি ওদেরই জিজ্ঞাসা করুন।'

মিঃ মল্লিক ওদের প্রত্যেককেই চিনতেন। তিনি চোখ রাঙিয়ে কালুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'করিম কখন এসেছে?'

কালু বিনা দ্বিধায় বলল, 'আজ্ঞে, সাড়ে চারটেয়।'

প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে মিঃ মল্লিক আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী করে বুঝলি তখন সাড়ে চারটে?'

কালু তাকের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন ওই ঘড়িটা...।'

তাকের ওপর কমদামি টাইমপিসটা টিকটিক করে চলছিল। সেদিকে বারেক লক্ষ করে মিঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতক্ষণ তোরা কী করছিলি?'

কালু বলল, 'আজ্ঞে ব্রিজ খেলছিলাম।'

ভ্রূ কুঁচকে মিঃ মল্লিক প্রশ্ন করলেন, 'কী বললি, ব্রিজ খেলছিলি? তোরা আবার ব্রিজ খেলিস নাকি?'

উত্তর দিল করিম, 'কেন বড়বাবু, ওটা কি ভদ্রলোকেরই একচেটিয়া খেলা?'

মিঃ মল্লিক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : 'করিম, তোমার রসিকতা ছাড়ো এবং বলো তুমি আলীকে খুন করলে কেন?'

'খুন!' করিম যেন আকাশ থেকে পড়ল : 'বলেন কী, বড়বাবু? খুন হয়েছে নাকি? আলী লোকটা আবার কে?'

দাঁতে দাঁত চেপে মিঃ মল্লিক বললেন, 'আলী যে কে তা আমার চেয়ে তুমিই ভালোভাবে জানো। কিছুক্ষণ আগে তুমি তাকে রাস্তার ওপরে খুন করলে কেন?'

'তোবা, তোবা,' দু-হাতে নিজের কান ঢেকে করিম যেন আঁতকে উঠল 'হুজুর, আপনি নিজের কানেই তো শুনলেন আমি সাড়ে চারটে থেকে এখানে বসে তাস খেলছি। এর মধ্যে একবারও জায়গা ছেড়ে উঠিনি। এরা তিনজনই আমার সাক্ষী।...কিন্তু হুজুর, আমাকে কি কেউ খুন করতে দেখেছে? বেশ তো, ডাকুন তাকে, সে এসে আমাকে চিনিয়ে দিক।'

মিঃ মল্লিক স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে করিমের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাস্তার বহু লোকই দেখেছে খুনিকে। তারা বলেছে, খুনি লম্বা লোক। তার গায়ে বিরাট বড় একটা আলখাল্লা ছিল। মাথার চুল লম্বা-লম্বা এবং সামনের দিকে এমন করে আঁচড়ানো যাতে মুখটা সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিল।'

করিম নির্বিকারভাবে পিটপিট করে চাইতে লাগল।

মিঃ মল্লিক আবার বলতে লাগলেন, 'আমরা সেই আলখাল্লাটা সিঁড়ির নীচে কুড়িয়ে পেয়েছি...তোমার মাথার চুলগুলোও লম্বা-লম্বা...।'

'হুজুর,' ঈষৎ কড়া গলায় করিম বলল, 'আমার বিরুদ্ধে আপনি ওসব কথা ওভাবে বলতে পারেন না। আপনারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, হত্যার সময়ে আমি তাস খেলছিলাম এবং তার তিনজন সাক্ষী আছে।'

মিঃ মল্লিক তখন করিমকে ছেড়ে গজু, কালু ও রহিমকে চেপে ধরলেন। নানারকম ভয় দেখিয়ে ও জেরা করেও কোনও ফল হল না। ওদের সেই একই কথা—করিম সাড়ে চারটেয় এসেছে এবং সেই থেকে ওরা ব্রিজ খেলছে।

একটু হতাশ হয়ে মিঃ মল্লিক সাব-ইন্সপেক্টর নুর খাঁ-কে বললেন, 'আপনি অন্য ঘরগুলো দেখুন। আমি এখানেই থাকব।'

নুর খাঁ চলে গেল। মিঃ মল্লিক আনমনে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, গজুদের সাক্ষ্যই করিমকে বাঁচিয়ে দেবে। অথচ ওরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে এতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু ওদের সাক্ষ্যের মধ্যে ফাটল ধরানো যায় কী করে?

সহসা রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একজনের ওপর দৃষ্টি পড়তেই মিঃ মল্লিক আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন। তিনি একজন পুলিশকে ডেকে বললেন, 'ওই ভিড়ের মধ্যে অঞ্জনবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দেখেছ?'

পুলিশটি অঞ্জনকে চিনত, বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাও, ওঁকে সেলাম দাও।'

একটু পরে সেই পুলিশটির সঙ্গে অঞ্জন ওপরে উঠে এল। মিঃ মল্লিক তাকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ভারী বিপদে পড়েছি, অঞ্জনবাবু।'

'ব্যাপার কী, মিস্টার মল্লিক?' অঞ্জন বলল, 'শুনলাম কে নাকি খুন হয়েছে!'

'হ্যাঁ, আলী খুন হয়েছে।'

'আলী? নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'সে ছিল কুখ্যাত গুণ্ডা ও স্মাগলার করিম খাঁ-র ডান হাত। কোকেনের একটা বড় চালান চুরি করে আলী গা-ঢাকা দিয়েছিল এবং করিম শিকারি কুকুরের মতো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—এ খবর আমাদের ইনফরমার আমাকে জানিয়েছিল। আজ সন্ধে ছ'টায় খবর পেলাম, কে একজন আলখাল্লা পরা লোক, যার মুখটা লম্বা-লম্বা চুলে ঢাকা ছিল, একজন কাকে নাকি ছোরা মেরে ছুটে এই বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আমি ঘটনাস্থলে এসে দেখি, মৃত ব্যক্তি আলী। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সন্দেহ করিমের ওপর পড়ল। এ-বাড়ির সিঁড়ির কাছে আলখাল্লাটা কুড়িয়ে পেলাম। পরে ওই ঘরটায় গিয়ে দেখি, করিম আরও তিনজন বদমায়েশের সঙ্গে বসে রয়েছে। ওই বদমায়েশ তিনটে দৃঢ়ভাবে বলছে, করিম নাকি সাড়ে চারটে থেকে ওদের সঙ্গে তাস খেলছে, একবারও ওঠেনি।'

অঞ্জন চমৎকৃত হয়ে বলল, 'বাঃ চমৎকার! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। আপনি ওই তিনজন সাক্ষীকে ধরে আপনাদের বিশেষ চাপ দিলেই তো ওরা বাপ-বাপ করে সত্যি কথা বলে দেবে।'

ম্লান হেসে মিঃ মল্লিক বললেন, 'আমি ওই তিনজনকে ভালোভাবে চিনি। ওদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেললেও ওরা সত্যি কথা বলবে না।'

চিন্তিতভাবে অঞ্জন বলল, 'ছোরার গায়ে আঙুলের ছাপ...।'

মাথা নেড়ে মিঃ মল্লিক বললেন, 'ছোরার বাঁটে কাপড় বাঁধা ছিল, ফলে তাতে হাতের বা আঙুলের ছাপ পড়েনি।'

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে অঞ্জন বলল, 'আমি রাত ন'টার শো-তে একটা সিনেমা দেখতে যাব। এ-পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলেই এসেছিলাম। আমার হাতে বেশি সময় নেই। তবু

চলুন ওই ঘরে, দেখি, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।'

মিঃ মল্লিকের সঙ্গে অঞ্জন কালুদের ঘরে ঢুকল।

করিম ও অন্যান্য তিনজন উৎকণ্ঠিতভাবে দরজার দিকে চেয়ে ছিল। মিঃ মল্লিক ওদের লক্ষ করে বললেন, 'এই বাবুকে চেনো? ইনি হলেন চোর-ডাকাতের যম—রহস্যান্বেষী অঞ্জন বসু। ইনি তোমাদের যা জিজ্ঞাসা করেন, সঠিক উত্তর দিয়ো।'

অঞ্জনের নাম অপরাধ-জগতে সুপরিচিত। গজু, কালু ও রহিমের চোখে-মুখে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু করিম নির্বিকারভাবে বসে রইল। তার চোখে-মুখে কোনও ভাবের লক্ষণ দেখা গেল না।

অঞ্জন তীক্ষ্ন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সহসা কালুকে জিজ্ঞাসা করল, 'করিম এখানে কখন এসেছে?'

'সাড়ে চারটেয়,' অম্লানবদনে কালু উত্তর দিল।

'তারপর তোমরা কী করলে?'

'ব্রিজ খেলতে শুরু করলাম।'

'ব্রিজ? তা তোমাদের পয়েন্ট লেখার কাগজ কোথায়?'

'আমরা ওসব কাগজে-টাগজে লিখি না।'

'সবচেয়ে শেষ খেলায় কার ডাক ছিল?'

'গজুর।'

'কীসের ডাক ছিল?'

'দুটো নো ট্রাম্পের।'

'কী হল?'

'খেলা শেষ হওয়ার আগেই বড়বাবু এসে গেলেন।'

অঞ্জন ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল। তারপর এগিয়ে এসে গজুকে বলল, 'তুমি উঠে এসো, আমি এদের সঙ্গে একহাত ব্রিজ খেলব।'

গজু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গেল। করিম মুচকি হেসে বলল, 'বাবুজী আমার পার্টনার হবেন? আমি কিন্তু আনসান ডাক দিই।'

অঞ্জন কোনও কথা বলল না। সে তাসের প্যাকেটটা তুলে একমনে শাফল করতে লাগল।

সবাই অঞ্জনের মতলব বুঝতে পেরেছিল। সে পরীক্ষা করে দেখছিল, ওরা সবাই ব্রিজ খেলতে জানে কি না।

ঠিক সেইসময় কে যেন দরজা দিয়ে উঁকি মারল। সদা-সতর্ক অঞ্জন ভীষণভাবে চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কে ওখানে?'

চকিতে সবাই দরজার দিকে তাকাল। মিঃ মল্লিক একলাফে দরজার কাছে চলে গেলেন। ঠিক সেইসময় নুর খাঁ ঘরে ঢুকে বলল, 'আমি স্যার। সব ঘরের তল্লাশি নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু...' বলতে-বলতে সে হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

ওদিকে অঞ্জন ততক্ষণ তাস দেওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। সে বাঁদিকের কালুকে প্রথম তাস দিয়ে আরম্ভ করল। অতএব শেষ তাস তার নিজের পাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল, তাস শেষ হল ডানদিককার রহিমের কাছে।

অঞ্জন একটু আশ্চর্য হয়ে তাসগুলো তুলে আবার দিতে আরম্ভ করল বেশ সাবধানতার সঙ্গেই। কিন্তু এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

'ব্যাপার কী!' অঞ্জন চিন্তিত কণ্ঠে বলল। তারপর সবগুলো তাস তুলে সেগুলো রং অনুসারে আলাদা-আলাদা করতে লাগল। অন্যান্যরা একমনে তার কাজ দেখতে লাগল। রং আলাদা-আলাদা করার পর অঞ্জন

সেগুলো নম্বর অনুসারে সাজাতে লাগল।

একটু পরে সে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এ কী? ইস্কাবনের বিবি কোথায়?'

'ইস্কাবনের বিবি?' অজানা আতঙ্কে করিম যেন কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ, ইস্কাবনের বিবি। এই তাসের মধ্যে ইস্কাবনের বিবি নেই।'

'নেই!' ওরা বিস্ময়ে থ'।

কালুর ওপরে কঠোর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে অঞ্জন শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি বললে, তোমরা এতক্ষণ ব্রিজ খেলছিলে। আশ্চর্য, একটা তাস কমে কী করে ব্রিজ খেলা যায়, বলতে পারো?'

কালু আমতা-আমতা করতে লাগল। সে চেষ্টা করল অন্যদিকে, বিশেষ করে করিমের দিকে, চাইতে, কিন্তু অঞ্জনের জ্বলন্ত দৃষ্টির আকর্ষণ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

অঞ্জন মৃত্যুর মতো হিম কণ্ঠে বলে চলল, 'এবার মিস্টার মল্লিক তোমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবেন। আদালতে তোমাদের বিচার হবে। সেখানে তোমাদের ব্রিজ খেলার কথা টিকবে না। কেননা, একটা তাস কম হলে ব্রিজ খেলা যায় না। ফলে তোমরা সবাই আলীর হত্যাপরাধে জড়িয়ে পড়বে। তারপর ফাঁসি...।'

'না, না,' কালু চিৎকার করে উঠল। সে যেন চোখের সামনে ফাঁসির দড়িটা ঝুলতে দেখতে শুরু করেছিল : 'বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথাই বলেছি।'

'মিথ্যে কথা,' অঞ্জনের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল। সে বিদ্যুৎবেগে মিঃ মল্লিকের দিকে ঘুরে বলল, 'মিস্টার মল্লিক, এই লোকটা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে কথা বলছে। একে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করুন। আলীর প্রকৃত হত্যাকারীকে না পাওয়া গেলে এর নামেই কেস চালাবেন। এখানে একটা তাস কম রয়েছে অথচ ও বলছে, ওরা নাকি ব্রিজ খেলছিল...।'

মিঃ মল্লিক গম্ভীরভাবে কালুর দিকে এগিয়ে আসতেই কালু অকল্পনীয় আতঙ্কে শিউরে উঠে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে বাঁচান হুজুর, আমরা তাস খেলছিলাম না...।'

'খবরদার,' বীভৎস কণ্ঠে করিম চিৎকার করে উঠল।

চকিতে অঞ্জন একবার মিঃ মল্লিকের দিকে চাইল। তার চোখের ইশারা বুঝতে পেরে মিঃ মল্লিক সদলবলে করিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ ঝটাপটির পর করিমকে গ্রেপ্তার করা হল। অঞ্জনের নির্দেশ অনুসারে নুর খাঁ তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

এবার ঘরে মিঃ মল্লিক ও অঞ্জনের সঙ্গে রইল গজু, কালু ও রহিম। অঞ্জনের ইশারা মতো মিঃ মল্লিক সদর্পে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোদের তাস খেলার কথা যে মিথ্যে, তা তো প্রমাণ হয়ে গেল। এবার সত্যি কথা খুলে বল। ভয় নেই, করিম আর ফিরে আসবে না। ওর ফাঁসি হবেই। বল...বল শিগগির, যদি আলীর খুনের সঙ্গে নিজেদের না জড়াতে চাস...।'

এবার ওরা তিনজনই ভেঙে পড়ে সব কথা খুলে বলল।

মিঃ মল্লিক তক্ষুনি একটা লিখিত বিবৃতি নেওয়ার জন্য ওদের তিনজনকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে রইলেন মিঃ মল্লিক ও অঞ্জন।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অঞ্জনের দিকে চেয়ে মিঃ মল্লিক বললেন, 'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! সত্যি, আপনি অদ্ভুত কর্মী।'

অঞ্জনের মুখে একটুকরো রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সে ঈষৎ ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'এটা সাবধানে রাখুন। সুযোগ পাওয়ামাত্র এটাকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন,' বলতে-বলতে সে কোটের পকেট থেকে কী যেন একটা বের করে মিঃ মল্লিকের হাতে গুঁজে দিল।

বিস্মিত মিঃ মল্লিক হাতের মুঠো খুলে দেখলেন তাঁর হাতে রয়েছে ইস্কাবনের বিবিটা। তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী! এটা আপনার কাছে এল কী করে?'

মুখে কৃত্রিম একটা করুণ ভাব ফুটিয়ে তুলে অঞ্জন বলল, 'হাতসাফাই মিস্টার মল্লিক, স্রেফ হাতসাফাই। আসলে ওদের প্যাকেটে পুরো বাহান্নটা তাসই ছিল। আমি মওকা মতো হাতসাফাই করে...।' সহসা মুখটা আরও করুণ করে সে বলল, 'কী করব, বলুন। এরকম না করলে ওই তিন মহাত্মার সাক্ষ্য কি ভাঙা যেত?...যাই এবার, সিনেমার সময় হয়ে এসেছে।'

বিস্মিত হতবাক মিঃ মল্লিকের মুখে কয়েক সেকেন্ড কোনও কথাই ফুটল না। তারপর তিনি চমৎকৃত কণ্ঠে বললেন, 'সত্যি অঞ্জনবাবু, আপনার তুলনা নেই। আপনিও জুলিয়াস সিজারের মতো বলতে পারেন—ভিনি, ভিডি, ভিসি...।'

মাসিক রহস্য পত্রিকা
পুজো সংখ্যা, ১৯৬৯



বিড়ি

সুজিত ধর

মনে করেছিলাম চোর-ছেঁচড়ের পেছনে আর ছুটব না। জীবনের শেষ সময়টা সাহিত্য আর ধর্মচর্চা করে কাটাব। তা আর হল কই? আমি না চাইলেও একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নামিয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে এনেছে আবার সুন্দর হলুদ রোদ্দুর আর বড়-বড় ঘাসের দেশে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমি মরিনি।

মাটির দেওয়াল আর টিনের ছাদওয়ালা ঘরটায় আমাদের গাঁজার আড্ডা বসত। সন্ধে হলেই আমরা মাকড়সার জাল আর চামচিকে বাদুড় ভরতি ঘরটায় জড়ো হতাম। গল্প করতাম। তাস, পাশা খেলতাম। শেষে গাঁজার পীতাভ ধোঁয়া গিলে একটা সুস্বাদু সম্মোহনে আবিষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরতাম। সেদিন সবে ছাতাটা বগলে পুরেছি। চৌকাঠে পা দেওয়ার আগেই হীরালাল ডেকে ওঠে : ওস্তাদ, একটু শোনো।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম : কিছু বলবে নাকি, হীরালাল?

চকিতে হীরালাল চার-পাশটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমার কাছে এল। কানের কাছে মুখটা এনে প্রায় ফিসফিস করে বলল, ওস্তাদ, তুমি কি কাঞ্জিলালের নাম শুনেছ?

আমি মাথা নাড়লুম।

কাঞ্জিলালের নাম আমি অনেকদিন ধরেই শুনেছি। বড় নির্মম এই কাঞ্জিলাল। দুজন নিরীহ লোকের চোখের ভিতর গুলি চালিয়ে খুন করেছে। তা ছাড়া আফিং আর গাঁজার চোরাই বিজনেস করে বেশ টু পাইস কামিয়েছে। কলকাতা শহর থেকে একটু দূরে দুটো বাড়িও হাঁকিয়েছে। কাঞ্জিলাল হচ্ছে এসব লাইনের উস্তাদোঁ কা উস্তাদ।

আমি শুকনো ঠোঁটের ওপর সজল জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলি, কেন, কী হয়েছে, হীরালাল?

হীরালাল তার কালো-কালো দাঁত বের করে হাসল : উ শ্লা মনে হয় টেঁসে যাবে। মদ খেয়ে-খেয়ে ওর লিভারটা পাংচার হয়ে গেছে। তিনদিন ধরে বাড়িতে পড়ে আছে। আজ তুমি ওকে অ্যারেস্ট করতে পারো।

হীরালাল আমার বিশ্বস্ত শাগরেদ। সময়ে-অসময়ে নানারকম খবর-খবরাদি দেয়। হীরালালের মুখে কাঞ্জিলালের নামটা শোনার পর থেকেই মাথার ভিতর শক্ত খোলাওয়ালা পোকাটা যেন মগজটাকে কুরে-কুরে খেতে লাগল। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডিপার্টমেন্টকে ফোন করলাম।

অফিসার বললেন, তুমি স্টার্ট করো। সাদা ড্রেসের কয়েকজন পুলিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি যখন কাঞ্জিলালের বাড়ি পৌঁছুলুম তখন রাত্রি দশটা। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। ঘরের ভিতর পনেরো ওয়াটের লালচে ক্ষীণ আলোটা যেন চারপাশের অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কাঞ্জিলালের ডেরা কলকাতা থেকে একটু দূরে। এখানে এখনও ঝিঁঝি আর শেয়ালের ডাক শোনা যায়। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা যেন মাথার ভিতর উঠে গিয়ে ধুকপুক করতে থাকে।

দরজার কড়া নেড়ে ডাক দিলাম, কাঞ্জিলাল—কাঞ্জিলাল আছ?

ঘরের ভিতর নিস্তব্ধ। বিচিত্র প্রশান্ততায় থমথম করছে। শুধু আমার ভরাট কণ্ঠস্বর নিরেট দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে বিশাল এক মূর্ছনা হয়ে ঝরে পড়ে।

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। ইস্পাত-কঠিন মুখওয়ালা একটা লোক অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াল। আমি হাঁ করে লোকটার চওড়া বুক আর ইয়া মোটা হাতের কবজির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—এখানে কাঞ্জিলাল আছে?

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথাটা নাড়িয়ে ইশারা করল।

ঘরের ভিতর ঢুকতেই দরজার খিল তুলে দিয়ে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

—এখানে এত অন্ধকার কেন?—ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

লোকটা কোনও উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে বলল—যান ভিতরে যান। কাঞ্জিসাহেব ওখানেই আছেন।

টাইয়ের নটটা ঠিক করে ভিতরে ঢুকতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আমি চমকে উঠলাম। আমার গলা চিরে তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে : হীরালাল, তুমি!

—ওস্তাদ, আমিই কাঞ্জিলাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হীরালাল ওরফে কাঞ্জিলালের প্রচণ্ড এক ঘুষি আমার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তালি মারা ছাতাটা দশহাত দূরে ছিটকে পড়ল। কোনওরকমে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াই। ছাতাটা বেশ দূরেই পড়ে আছে। ওটা তুলতে যাওয়া বোকামি। অথচ ওটার ভিতরেই আমার রিভলভারটা সেট করা আছে।

ছাতাটা হাতে না পেলে কাঞ্জিলালকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব।

অথচ—।

বেশ নিরীহের মতো পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলি, হীরালাল, এবার হাত তোলো। একটু নড়লেই গুলি চালাব।

—ওস্তাদ, ওসব বাতেলা অন্য জায়গায় ঝেড়ো। ফাঁকা পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলভার আছে—ও-টেকনিক আমার কাছে দেখাতে এসো না।

এবার হীরালাল বিড়িতে বারকয়েক টান দিয়ে ঘরের এককোণে ছুড়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম, বিড়িটা কয়েকটা ম্লান আলোর ফুলকি তুলে বড় ডাঁটিওয়ালা ইলেকট্রিক পাখার তারের ওপর পড়ল।

হীরালাল চকিতে সেদিকে তাকিয়ে কোমর থেকে একটা ধারালো ছোরা বের করল।

ওয়েল, মিস্টার ওব্রায়াম,—হীরালালের ঠান্ডা-তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর বরফ টুকরোর মতো আমার গায়ে ছড়িয়ে পড়ে : তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ। আমার দলের লোককে হাজতে পুরেছ। আজ তুমি আর ছাড়া পাবে না, ওস্তাদ। তোমার জানটা আজ খুবলে নেব।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হীরালাল ওরফে কাঞ্জিলালের ঝকঝকে ছুরিটা ফ্লুরোসেন্ট আলোর কোমল অথচ নিথর পরিবেশে ঝলসে ওঠে।

আমি ভয়ে, বিস্ময়ে ও উৎকণ্ঠায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালাম।

গুল! গুল!—সুমিত্র হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, ওব্রায়াম, ওসব গুল অন্য জায়গায় ঝেড়ো, বাপধন।

তিতুদি মুখের ওপরে ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব এনে সুমিত্রর দিকে তাকায়।

—সুমিত্র, ওরকমভাবে কথা বলিসনি, ভাই। ওব্রায়াম দুঃখু পাবে।

দেবুদা গম্ভীর মেজাজে ওব্রায়ামের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল। হুঙ্কার দিয়ে ওব্রায়ামের ওপর লাফিয়ে পড়ে : দেখি বাছাধন, কাঞ্জিলালের ছুরির দাগটা আছে কিনা?

ওব্রায়াম বোকা-বোকা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহভাবে টুথ-ব্রাশ মার্কা গোঁফে হাত বুলোতে থাকে।

—কাঞ্জিলাল আর ছুরি মারল কই? তার আগেই তো দপ করে আলোটা নিভে গিয়েছিল। আমিও ঠিক সেই মুহূর্তে সাঁৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঞ্জিলালের পশ্চাৎদেশে এক লাথি হাঁকাই। কাঞ্জিলাল মুখ থুবড়ে পড়ল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিই।

—চিয়ার আপ! চিয়ার আপ!

সুমিত্র, তিতুদি আর দেবুদা ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড, ওব্রায়াম!

দেবুদা হঠাৎ টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে থাকে : বৎসগণ, একটু চুপ করো। মৃত্যুর গহ্বর থেকে, ব্র্যাকেটে কাঞ্জিলালের উদ্ধত ছুরির হাত থেকে, মিস্টার ওব্রায়াম ফিরে এলেন শুধু মাত্র ঈশ্বরের জন্যে। মহামান্য ঈশ্বরই তার প্রিয় পুত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো—কী করে তা সম্ভব হল? আমি তার উত্তরে বেশ গম্ভীরভাবে বলব, ঠিক সময়ে, চরম উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তে, ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষার নিমিত্ত সুইচ অফ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

কথা শেষ করেই ওরা তিনজনে হো-হো করে হেসে উঠল।

আমার মনে হল, তিনজন যুবক-যুবতীর নির্বুদ্ধিতার জন্যে ওব্রায়াম লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবে।

ওব্রায়াম কোনও কথা না বলে মেঝে থেকে তালি মারা ছাতাটা তুলল। ওদের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

—চলি তাহলে,—ওব্রায়ামের গলা কেঁপে-কেঁপে ওঠে : সেদিন ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন কিনা জানি না, তবে কাঞ্জিলালের আধ-খাওয়া বিড়িটাই আমাকে বাঁচিয়েছিল। ফ্যানের প্লাস্টিকের তারের ওপর জ্বলন্ত বিড়িটা পড়াতে ওপরের পিভিসি কভারটা পুড়ে যায়। আর তার ফলেই ইলেকট্রিক তারের ফ্রেজ নিউট্রাল তার দুটো জুড়ে গিয়েছিল। সর্ট সার্কিটের জন্যেই আলোটা নিভে যায়।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৬৯



বিষবাষ্প

অশোক বিশ্বাস

'না, না, হিমাদ্রিবাবু, অজিত ভট্টাচার্য লোকটা মরল আমার উপস্থিতিতেই। পুলিশের লোক বলে মনটা আমার সন্দেহপ্রবণ। তাই পোস্টমর্টেম করালাম। সার্জেন স্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট দিলেন। লোকটা প্রেশারে ভুগছিল—একটা স্ট্রোক আগে হয়ে গেছে। ফুসফুসের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে সে মারা গেছে। সবই বুঝছি, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। মৃত্যুর মুহূর্তে সে আড়ষ্টভাবে কী যেন বলেছিল, ''তুল'' এইটুকু কথা তার ঠোঁটে বিড়বিড় করে উঠেছিল। তারপর ব্যস, সব শেষ। না, না, মিস্টার সেন, কোথায় যেন একটা গরমিল রয়ে গেছে। আমার মন বলছে, আমি ভুল করছি, ঠিক হিসেব মেলাতে পারছি না...।'

'আচ্ছা, অজিতবাবুর কি এমন কোনও পরিচিত কেউ আছেন, যাঁর নামের সঙ্গে ওই ভাঙা কথাটার মিল থাকতে পারে?'

'আছে, একটি পুরুষ, একটি নারী—একজনের নাম অতুলকৃষ্ণ দাশ, অন্যজনের নাম পুতুল চৌধুরী। অজিতবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন ওই অনুষ্ঠানে অতুলেরও আসার কথা। কিন্তু সে কখন এসেছিল, তা কেউ বলতে পারেনি। তার বাসায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে সন্ধের আগেই হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে বেরিয়েছে—কোথায় গেছে কেউ হদিশ দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এই দু-দিন হয়ে গেল সে ফিরে আসেনি। অতুল দাশ অজিতবাবুর বন্ধু।'

'আর পুতুল চৌধুরী?'

'আজ থেকে বছর দশ-বারো আগে সে নিহত হয়েছে...।'

'নিহত!'

'সে আর-এক কাহিনি। আচ্ছা, আগে সিগারেট ধরিয়ে নিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পুতুল চৌধুরী—আঠেরো বছরের একটি যুবতী। রূপ তার ছিল কি না জানি না, তবে চটক ছিল—আর তাতেই সে আকৃষ্ট করেছিল দুটি তরুণকে। পুতুলের প্রফেশন ছিল যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করা। অতুল এবং অজিতও শখের অভিনয় করত। ওদের সঙ্গে পুতুলের আলাপ হল। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। পুতুল দুজনকেই পাগল করে তুলল। দুই বন্ধুর মধ্যে মেয়েটিকে আপন করে পাওয়ার জন্যে শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রেষারেষি। মাঝখান থেকে লাভ হল পুতুলের। কায়দা করে সে একের অনুপস্থিতিতে অন্যকে আমন্ত্রণ করত। কিন্তু এই বাঁদর-নাচানো খেলা বেশিদিন চলল না। একদিন সে ধরা পড়ে গেল। আর তখনই তার কোমল বুকে নেমে

এল একটি তীক্ষ্ন ছোরার আঘাত। অতুল দাশ রক্তমাখা পোশাকে ধরা পড়ল পুতুলের ঘরের বাইরে আসতেই। আদালতে সে বলল, সে খুন করেনি। পুতুলের ঘরে গিয়ে সে দেখেছিল, অন্ধকারে পুতুল শুয়ে আছে। ঘরের জানলা দিয়ে স্বল্প চাঁদের আলো আসছিল। পুতুল জানলার দিকে মুখ করে চৌকিতে শুয়েছিল। অতুল আলো জ্বালেনি। বিছানায় গিয়ে বসে পুতুলের গায়ে হাত দিয়েছিল। পুতুলকে কাছে টানতে গিয়েই দেখেছিল, তার বুকে গভীর ক্ষত। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। রক্ত ওইসময় জামাকাপড়ে লেগে থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার যুক্তি আদালতে টিকল না। তার দশ বছরের জেল হয়ে গেল। তারপর এই মাসকয়েক হল অতুল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

'জেল থেকে ফিরে আসার পর অজিতের সঙ্গে অতুলের ব্যবহার কেমন দাঁড়িয়েছিল?'

'প্রফেসর ডক্টর বরুণ ব্যানার্জি, অর্থাৎ যিনি বিবাহ-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যাঁর বাড়িতে ওই অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম এবং অজিত ভট্টাচার্য মারা গিয়েছিলেন, সেই বরুণবাবু এঁদের বন্ধু। তিনি বলেছিলেন, অতুল এবং অজিত ওরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলত। অতুলের জীবনের অনেকগুলো মূল্যবান বছর অজিতের নিপুণ কারসাজিতে নষ্ট হয়ে গেছে। অজিত পুতুলকে হত্যা করে বা করিয়ে মিথ্যে করে অতুলকে সেই হত্যার দায়ে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে নির্দোষ হয়ে সমাজে আর-পাঁচজনের মতো মাথা উঁচু করে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে—এরকম একটা ধারণা তার মনের মধ্যে দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। তাই বলছি মিস্টার সেন, অজিত ভট্টাচার্যের মৃত্যুটা মামুলি মৃত্যু নয়, এর মধ্যে এক নিখুঁত রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে-রহস্যের চাবিকাঠি আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ, এই ড্রইংরুমের মধ্যে বাঁদিকের দরজাটার পাশের ওই সোফাটায় বসে মারা গিয়েছেন অজিতবাবু।'

'আপনি এসে তাঁকে কী অবস্থায় দেখেছিলেন?'

'বরুণবাবুর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভেতরের ঘরে বসে আমি গল্পগুজব করছিলাম। সঙ্গে বরুণবাবু, তাঁর স্ত্রী প্রমীলা এবং তাঁর বান্ধবীরাও ছিলেন। বাইরের দিক থেকে কাউকে আসতে হলে এই ড্রইংরুম পার হয়ে যেতে হয়। আমরা হাসি-গল্পে মেতে ছিলাম। বরুণবাবু চাকর-বাকরদের সঙ্গে তদারক করছিলেন, সেজন্যে তিনি দীর্ঘক্ষণ বসতে পারছিলেন না, মাঝে-মাঝে তদারকির জন্যে তাঁকে উঠে যেতে হচ্ছিল, আবার এসে বসছিলেন। আমাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছিলেন। বরুণবাবুই প্রথম শুনতে পান একটা অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ। ওইসময় তিনি ড্রইংরুম থেকে বসবার ঘরে আসবার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাকরকে আর-একদফা লস্যি দেওয়ার কথা বলছিলেন। ''কী হল!''—বলে তিনিই প্রথম ড্রইংরুমের দিকে ছুটে গেলেন। আমরা উপস্থিত-সকলে তাঁর পেছনে-পেছনে গেলাম।'

'গিয়ে কী দেখলেন, ইন্সপেক্টর?'

'দেখলাম, ওই সোফাটায় বসা বা এলিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে রয়েছেন অজিতবাবু। চোখ দুটো উলটে যাচ্ছে, শরীর আড়ষ্ট, হাত-পা শক্তভাবে বেঁকে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করছে, যেন অনেক কিছু বলতে চেয়ে বলতে পারছেন না। শুধু একটা কথার অপভ্রংশ শুনতে পেলাম, ''—তুল।'' ব্যস, ওই পর্যন্ত।'

'তারপর?'

'অজিতবাবুকে আমরা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলাম। কারণ, শোনা গেল, এর আগে একবার তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল, তাই শুশ্রূষার প্রয়োজন। আমরা সবাই ড্রইংরুম থেকে চলে এলাম বরুণবাবুর শয়নকক্ষে। অজিতবাবুকে খাটে শুইয়ে দিলাম। বরুণবাবু এই আকস্মিক ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে একজন ভালো ডাক্তার ডাকতে বললাম। বরুণবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক হলেন ডাক্তার বি. কে. মিত্র। অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বরুণবাবু ড্রইংরুমে চলে গেলেন ডাক্তারকে ফোন করতে। কিন্তু অজিতবাবুর মৃত্যু রোধ করা গেল না। নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরোল। ব্যস, অজিত ভট্টাচার্য এক্সপায়ার্ড।'

'আসুন ইন্সপেক্টর, সিগারেট নিন। ও, আপনার কাছেই দেশলাই আছে! ওয়েল, ধরিয়ে নিন। আচ্ছা, এবার খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখুন তো—ড্রইংরুমে, এই যে আমরা এখানে বসে রয়েছি, এই

ড্রইংরুমে কোনও কিছু কি আপনার চোখে পড়েছিল? উঁহু, অত তাড়াতাড়ি করবেন না বন্ধু, খুব ভালো করে ভেবে দেখুন সেদিনের সন্ধের কথা। আপনি এলেন, গেলেন বসবার ঘরে, গল্পে মেতে গেলেন, বরুণবাবু আপনাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিজে ব্যস্তসমস্তভাবে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। তারপর সব আনন্দকে বিষাদে পরিণত করে দিল এক আকস্মিক মৃত্যু।'

'একটা জিনিস আমার খটকা লেগেছিল। আমি যখন এলাম তখন ড্রইংরুমের ডানদিকের দরজাটা খোলা ছিল। ওখান দিয়েই সকলে আসছে-যাচ্ছে দেখলাম। আগেই আপনাকে তো বলেছি মিস্টার সেন, বাইরে থেকে ড্রইংরুমে আসতে দু-পাশে দুটো দরজা পড়ে, একটা ডাইনে একটা বাঁয়ে। যখন অজিতবাবুকে ওই অবস্থায় পাওয়া গেল, সেসময় ডানদিকের দরজা বন্ধ ছিল, তার বদলে বাঁদিকের দরজাটা খোলা ছিল। বাইরের লোক এসে হয়তো ভিড় করতে পারে, এইজন্যে সেইসময় দরজাটা বরুণবাবু নিজের হাতেই বন্ধ করে দিলেন। তারপর সকলকে তাঁর শোওয়ার ঘরের দিকে এগোতে বলে আমার সাহায্যে বরুণবাবু অজিতবাবুকে সোফা থেকে তুলে নিলেন। একজন ভদ্রলোক বরুণবাবুকে সাহায্য করতে এলেন। বরুণবাবু তখন অজিতবাবুকে সেই ভদ্রলোক এবং আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে সকলের পেছনে-পেছনে এলেন।'

'খটকা লাগার কথা কী যেন বলছিলেন...?'

'ওই দরজার ব্যাপারটা।'

'হুঁ। আচ্ছা, ভালো করে একবার এই ড্রইংরুমটা দেখতে চাই—কেউ যেন এখানে না আসে, বলে আসুন। —বলে এসেছেন তো, ওয়েল, ওঁদের সকলকে আমার আর-কিছুক্ষণ পরে প্রয়োজন হবে, ওঁরা অপেক্ষা করুন। ওঁরা অর্থে সেদিন ওইসময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। এই দরজাটা খোলা ছিল তো, দরজায় দেখছি বেশ ভারী মোটা পাপোশ। হুঁ, আশ্চর্য, এটা কী? মেঝের ওপর এই চাকার মতো ধূসর দাগটা কীসের? মনে হচ্ছে, এখানে দীর্ঘদিন কিছু রাখা ছিল, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে...।'

'পেয়েছি হিমাদ্রিবাবু, এই যে, কোণের দিকে নটরাজের এই স্ট্যাচুটা, এটাই ওখানে বসানো ছিল দেখেছিলাম।'

'আই সি, এই মূর্তিটা! বেশ বড় মূর্তি দেখছি, প্রায় আমার মাথার সমান, নাচের ভঙ্গিতে মহাদেব। মাথায় জটার মধ্যে থেকে ফণা তুলে রয়েছে একটা বিরাট সাপ। সাপের মুখটায় একটা গর্ত! দেখুন, দেখুন ইন্সপেক্টর, মূর্তিটা কিন্তু ফাঁপা—এই সাপটা পর্যন্ত! স্ট্রেঞ্জ!'

'এটা তো পোর্সিলিনের মূর্তি। এগুলো ছাঁচে গড়া হয়। তাই ফাঁপা।'

'মূর্তিটা ফাঁপা! মূর্তিটা ফাঁপা! সাপটা পর্যন্ত! আশ্চর্য! এই পাপোশ থেকে মাত্র হাতচারেক দূরে ধূসর দাগ। অর্থাৎ, মূর্তিটা দরজার পাপোশ থেকে মাত্র হাতচারেক দূরে ছিল, না ইন্সপেক্টর?... দেশলাইটা দিন, একটা সিগারেট ধরাই। থ্যাঙ্কস।'

'ও কী মিস্টার সেন, হাত দিয়ে পাপোশটা তুলছেন কেন? ওটার তলায় তারের জালতি আছে, হাতে ফুটতে পারে, ধুলো আছে...।'

'কিন্তু ধুলোর মধ্যে তারের আঁকড়ির সঙ্গে এটা কী বলতে পারেন, ইন্সপেক্টর?'

'না। কিন্তু কী ওটা?'

'তার আগে বলুন, এ-ঘরে কবে আপনি তালা লাগিয়েছেন?'

'ঘটনার পরদিন সকালে।'

'তাই এইটুকু প্রমাণ পেলাম, না হলে...।'

'কিন্তু এটা দিয়ে কী হবে?'

'এটার মধ্যেই সব লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনি কেমন সার্চ করলেন—এত বড় জিনিসটা রয়েছে, অথচ আপনার চোখে পড়ল না! হ্যাঁ, ইউ আর রাইট, এটা একটা রবারের নলের একমুখ ছেঁড়া

অংশ। ড্রপারের পেছন দিকের মতো মোটা এর শেষাংশ এবং জোড়া—তারপর দেখুন কেমন সরু হয়ে গেছে, এই সরু দিকটা কেউ টেনে ছিঁড়েছে। কিন্তু আর নয়, এবার ওঁদের একে-একে ডাকুন।'

'স্টেটমেন্ট নিয়ে কী সিদ্ধান্তে এলেন, মিস্টার সেন?'

'বুঝলাম, মৃত অজিতবাবু অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, অর্থও ছিল, মেয়েদের মন অক্লেশে জয় করার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল। আর বুঝলাম, এঁরা সবাই অজিতবাবুর বন্ধু হলেও তাঁর মৃত্যুতে কিন্তু কেউ আঘাত পাননি।'

'আর কিছু?'

'অতুল ফেরার নয়, সে খামখেয়ালি। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে, বা তাকে কায়দা করে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাওয়ায় সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।'

'তারপর?'

'নিপুণ পরিকল্পনায় অজিতবাবুকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু অতুল এ-কাজ করেনি।'

'এ ছাড়া?'

'এ-বাড়িতে অজিত প্রায়ই আসতেন, বরুণবাবুর বন্ধু। এ ছাড়াও আর-একটি সম্বন্ধ ছিল এঁদের মধ্যে। অজিতবাবু প্রমীলা দেবীর সঙ্গে বরুণের বিয়ে দিয়েছিলেন—প্রমীলা অজিতের আত্মীয়া।'

'তারপর?'

'এবার ইন্সপেক্টর, আপনার হাতকড়া বরুণ ব্যানার্জির হাতে পরিয়ে দিতে পারেন। অজিতকে বরুণবাবু হত্যা করেছেন।'

'বিয়ের আগে থেকেই প্রমীলার সঙ্গে অজিতের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি যখন প্রমীলাকে প্রশ্ন করলাম অজিতের সম্পর্কে, তখন সে তাঁর রূপ, ব্যবহার, কৌলিন্য—সবকিছুরই ভূয়সী প্রশংসা করল। চোখে তার জল টলটল করে উঠল। প্রমীলার কাছে আসতেন অজিত। প্রমীলা তাঁর সব দিয়ে বসেছিল ওঁকে। বরুণের পৌরুষ এ-অন্যায় বরদাস্ত করল না। অতঃপর এই পরিণতি।'

'ও, তাই সেদিন জাল পেতে বরুণবাবু ছটফট করছিলেন, সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেদিনের ওই ব্যস্ততার কারণ যে অন্য, বুঝতে পারিনি।'

'এবার বুঝলেন তো, ''—তুল'' অর্থে পুতুল চৌধুরী বা অতুল দাশ নয়। ওই পুতুল—নটরাজ। ওরই মধ্যে ফাঁদ পাতা ছিল। আগেই সব পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন বরুণবাবু। নিজের হাতে ডানদিকের দরজা বন্ধ করে পাহারায় রইলেন। অভ্যাগতরা সকলে ভেতরে বসবার ঘরে, যাতে কেউ ভুল না করে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি দিয়ে অজিতের আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন বরুণবাবু। লন পার হয়ে অজিতকে আসতে দেখে সাবধানে বাঁদিকের দরজাটা খুলে সরে গেল সে। অজিত ঘরে ঢুকে পাপোশে পা দিলেন। পায়ের চাপ পাপোশে পড়তেই সেই চাপ রবারের সরু নল বেয়ে গিয়ে ধাক্কা দিল ওই পুতুলটার ভেতরে যে-বিষাক্ত গ্যাস সিলিন্ডার ছিল তার অভ্যন্তরে। অমনি এক ঝলক গ্যাস নলের অন্য মুখ দিয়ে ফোঁস করে বেরিয়ে এল। নটরাজের সাপের মুখ দিয়ে সোজা অজিতের মুখে গিয়ে পড়ল। সেকেন্ডের মধ্যে কাজ হয়ে গেল। বিষাক্ত গ্যাস তাঁর নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাঁকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল।'

'সত্যি, আশ্চর্য যন্ত্রটা! কৌশলটাও! মৃত্যুর সময়ও তিনি আমাদের সামনে, সুতরাং তাঁকে সন্দেহ করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল।'

'যন্ত্রটায় আশ্চর্যের কিছু নেই। সেলুনে যেভাবে চুলে জল স্প্রে করে দেয়, যন্ত্রটা সেই ধরনের। এমনভাবে পেতেছিল যাতে পা পাপোশে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ।'

'কিন্তু ওগুলো সরাল কখন?'

'ফোন করতে গিয়ে। পুতুলটা সরিয়ে দিয়ে যন্ত্রটা ভেতর থেকে বের করে নিল। রবারের যে-নলটা পাপোশের তলা থেকে মেঝের ওপর দিয়ে গিয়ে পুতুলের মধ্যে ঢুকেছিল, সেটা টেনে পাপোশ থেকে বের

করার সময় ছিঁড়ে যায়—খেয়াল করেননি বরুণ।'

'ছোট্ট একটি ভুল!'

'ও-ভুলটা যে ওঁকে করতেই হবে—না হলে যে অপরাধী কোনওদিন সাজা পেত না, ইন্সপেক্টর।'

'রাইট ইউ আর। আই ডু রিয়ালাইজ, হিমাদ্রিবাবু।'

মাসিক রোমাঞ্চ
মার্চ, ১৯৭০



লোহার থাবা

চিত্রা দেব

বন্ধু অমিতাভ চৌধুরীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে সঞ্জয় সোম দিনসাতেকের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছেন। অমিতাভ স্টেশনে গিয়েছিলেন। বন্ধুকে নিয়ে বাইরে এলেন। ঘন শালের অরণ্য দেখে মুগ্ধ হলেন সঞ্জয়। বললেন, 'স্বর্গরাজ্য একেবারে!'

'প্রথম-প্রথম আমারও মনে হত। তা তোর কুকুরটাকে আনিসনি?

'সিঙ্কি! কাল-পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে—আজ ওকে ''বুক'' করতে পারিনি, আমার চাকর পাঠিয়ে দেবে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।' বলে জিপে স্টার্ট দিলেন অমিতাভ।

পরের দিন সকাল হওয়ার আগেই অমিতাভ ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন সঞ্জয়ের : 'ওঠ, ওঠ, সকালে ঘুমোতে হবে না।'

'কী ব্যাপার?'

'মারাত্মক! খুন হয়েছে একটা, যাবি তো চল।'

উঠে পড়লেন সঞ্জয় সোম। বললেন, 'কোথায় খুন হয়েছে?'

অমিতাভ বললেন, 'খুন হয়েছে কি না এখনও বলতে পারছি না। এখানকার একজন ধনী ব্যক্তি সনাতন মল্লিক, বাড়ি থেকে নিখোঁজ। ভদ্রলোক চলা-ফেরা করতে পারেন না—কোমর থেকে অবশ হয়ে গেছিল। খুব বদমেজাজি বলে প্রায় কেউই সুচক্ষে দেখে না। বিরাট বাড়িতে একমাত্র ছেলে আর চাকর-বাকরদের নিয়ে থাকতেন। তোর কুকুরটা থাকলে ভালো হত।'

'আজই হয়তো আসবে।' বন্ধুকে সান্ত্বনা দেন সঞ্জয় সোম।

ঘটনাস্থল বাড়িটার সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। তার কুড়ি গজ দূরেই রেললাইন—বাড়িটার অদূরেই লেভেল ক্রসিং। ড্রইংরুমে সনাতন মল্লিকের ছেলে সীতেশ বসেছিল। তাঁদের দেখেই বলল, 'আসুন দারোগাবাবু, নমস্কার।'

অমিতাভ নীরবে তার নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'কী ব্যাপার?

'বাবাকে কাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কত রাতে জানলেন যে, সনাতনবাবু ঘরে নেই?'

'রাতে নয়—আজ ভোরবেলা চা নিয়ে রঘু বাবার ঘরে গিয়ে দেখল, তিনি নেই।'

'সারা বাড়ি খুঁজেছেন?'

'খুঁজেছি। বাবা উঠতেই পারেন না—দোতলা থেকে নামলেন কী করে?'

'দরজা কি খোলাই ছিল? আপনারা কি দরজা খুলে ঘুমোন?'

'হ্যাঁ। দরজা ভেজানো ছিল—চারপাশে গ্রিলের দরজা বন্ধ থাকে বলে ভয়ের কিছু থাকে না।'

রাত্রে শয্যায় সনাতন মল্লিক শুয়েছিলেন—সেই একটি প্রমাণ ছাড়া কোনও জিনিস অবিন্যস্ত হয়নি। বিছানার কাছে একটা সুদৃশ্য দড়ি ওপরের ভেন্টিলেটারের পাশ দিয়ে ঝুলছিল। সেটা দেখে সঞ্জয় বললেন, 'দড়িটা কীসের?'

'ও-দড়িটা টেনে বাবা রঘুকে ডাকতেন, ওর সঙ্গে ঘণ্টা বাঁধা আছে—একতলায় রঘুর ঘর।'

অমিতাভ এগিয়ে গিয়ে দড়িটা টানলেন, কিন্তু কোনও ঘণ্টা বাজল না, উলটে দড়িটা ওপর থেকে পড়ে গেল। অমিতাভ বললেন, 'এ কী!'

সঞ্জয় পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'দড়িটা কাটা রয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছ, সনাতনবাবু যাতে ঘণ্টা বাজিয়ে রঘুকে না ডাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এদিক-ওদিক দেখে নীচে নেমে এলেন তাঁরা। সীতেশ বলল, 'এই অঞ্চলের বিপ্লবীরা বাবাকে ভয় দেখাচ্ছিল। হয়তো তারাই কিছু করেছে।'

'কী করে ভয় দেখাত?'

'চিঠি দিয়ে।'

'চিঠিগুলো দেখাতে পারেন?'

সঞ্জয়ের প্রশ্নে যেন বিব্রত বোধ করল সীতেশ। বলল, 'না। বাবা কোথায় চিঠি রাখতেন, না ফেলে দিতেন, জানি না।'

'কিছু মনে করবেন না, সীতেশবাবু, আপনার বাবার সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল কি?'

'ছিল না। কাল সন্ধেবেলাই বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। বুড়ো হয়েছেন, তবু টাকা-পয়সা কিছুই আমাকে দিতে চান না।'

'আপনি কিছু করেন না?'

'না।'

'বাড়িতে ক'জন চাকর আছে?'

'চারজন। মালি একজন।'

'ওদের ডাকুন।'

'একজন চাকরকে পাবেন না—সে রাত্রে থাকে না, অন্যদের ডাকছি।'

প্রথমেই রঘু এল। মাঝারি বয়েসের একটি লোক।

'তোমারই নাম রঘু? সনাতনবাবুর কাজ করতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তোমার বাবুকে শেষবার দেখেছ কখন?'

'আজ্ঞে, রাত দশটার সময় বাবুকে খাইয়ে, যখন শুতে গেছি।'

হঠাৎ সঞ্জয় বলেন, 'তোমার বাবু কি রাত্রে মোমবাতি জ্বালেন?'

'না তো, বাবু!'

'কেন?' খর চোখে প্রশ্ন করে সীতেশ মল্লিক।

'এমনিই।' পাশ কাটিয়ে যান সঞ্জয়। বলেন, 'রঘু, তুমি বাবুর ঘরে শোও না কেন? ঘণ্টা বাজালে সবসময় শুনতে পাও?'

'আমার কান খুব সজাগ। আগে তিনতলাতেই শুতাম। ছোটবাবু—।'

তার আগেই সীতেশ বলল, 'আমিই আপত্তি করেছি। পুরোনো চাকর হলেই যে বিশ্বাস করতে হবে, তার কী মানে আছে?'

'সকালে তুমিই চা নিয়ে গেছিলে?'

'হ্যাঁ। পাঁচটার সময় চা খান আমার বাবু—নিয়ে গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় নেই।'

আরও একঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সনাতন মল্লিকের ঘরে তালা দিয়ে নেমে এসে সঞ্জয় রঘুকে বলেন, 'রঘু, যে-চাকরটি এখানে থাকে না, সে কখন আসে?'

'কে, কালী? সে তো খুব ভোরে আসে। ছোটবাবুর চাকর...তবে কাল অনেক রাতেও আমি যেন কালীর গলা শুনেছি, বাবু।'

'অনেক রাত মানে?'

'রাত দশটা হবে আজ্ঞে। আমি তখন বাবুকে খাবার দিচ্ছিলাম।'

এই কথাগুলো সীতেশ মল্লিক শুনতে পায়নি। সে অমিতাভর সঙ্গে দোতলায় গেছিল।

সঞ্জয় বলেন, 'এ-কথা এখন কাউকে বোলো না, রঘু।'

বাগানটা একবার ঘুরে নিয়ে বেরোনোর সময় সঞ্জয় দেখলেন গেটের কাছে জুতোর ছাপ, পায়ের দাগ, চাকার রেখা আর ইতস্তত থাবার আঁচড়।

'কুকুর আছে নাকি আপনাদের?'

'না তো।' নমস্কার করে গেট বন্ধ করল সীতেশ।

বাড়ি ফিরে এলেন দুজনে। সঞ্জয় চায়ের টেবিলে বসে বললেন, 'তুই কালীর খোঁজ কর! সে হয়তো অনেক কিছু জানে।'

'তুই রঘুকে মোমবাতির কথা জিগ্যেস করছিলি কেন?'

'লক্ষ করিসনি, সনাতনবাবুর ঘরের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা মোম পড়েছিল। সে-মোম কী করে এল?'

বিকেলের দিকে অমিতাভর কাজ থাকায় সঞ্জয় একাই বেড়াতে বেরোলেন। 'সিক্কি' এসে গেছে। স্টেশন থেকে তাকে নিয়ে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। মনে-মনে সনাতনবাবুর কথা ভাবতে-ভাবতে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে চলে এলেন একসময়ে। রেললাইন পার হয়ে পায়ে হাঁটা বাঁকা রাস্তাটা চোখে পড়ল তাঁর। সুন্দর শুঁড়ি-পথটার সৌন্দর্যে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন সঞ্জয়। হঠাৎ দেখলেন, সিক্কি অভিনিবেশ সহকারে মাটি শুঁকে-শুঁকে চলেছে। সামান্য ভিজে মাটিতে অনেকগুলো ইতস্তত থাবার দাগ রয়েছে। ভালো করে লক্ষ করলেন তিনি : দুটো শেয়ালের বা কুকুরের আটটা পায়ের ছাপ রয়েছে পাশাপাশি—একটা অন্যটাকে অতিক্রম করেনি, এক-একটা থাবার দূরত্ব এক বিঘতের মতন, একটা থাবার তিনটে নখ যেন মাটিতে বিঁধে গেছে। সঞ্জয় ভাবতে চেষ্টা করলেন, কোথায় তিনি এই থাবার ছাপ দেখেছেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল, আজই সকালে সনাতনবাবুর বাড়ির সামনে এইরকম থাবার দাগ দেখেছেন তিনি, বেশ গভীর থাবার ছাপ।

হাতে সময় ছিল বলে তিনি স্থির করলেন, থাবাগুলো অনুসরণ করবেন। সনাতনবাবুর বাড়ির বাগানের মাটিতে যে-থাবার ছাপ আছে, সেই ছাপ শুঁড়ি-পথ ধরে কোথায় গেছে? সিক্কিকে নিয়ে অগ্রসর হলেন সঞ্জয়। শিক্ষিত অ্যালসেশিয়ান মাটি শুঁকতে-শুঁকতে অগ্রসর হল। প্রায় এক মাইল চলার পর সঞ্জয়ের নাকে উৎকট গন্ধ এল। আরও খানিকটা যেতেই পচা গন্ধের উৎস দেখতে পেলেন তিনি। বেশ নিচু একটা জায়গা। বোধহয় শহরের বেওয়ারিশ মড়াগুলোকে এখানেই ফেলা হয়। অনেকগুলো কাক, দু-তিনটে শকুন ঘোরাঘুরি করছে। পুতিগন্ধময় দু-চারটে শবও চোখে পড়ল। ভালো করে দেখলেন, ভদ্র পোশাক পরা একজন বর্ষীয়ান লোকের শবও পড়ে আছে সেখানে। অবশ্য শিয়াল-কুকুরে খানিক-খানিক খেয়েও গেছে। সনাতন মল্লিককে আগে না দেখলেও সঞ্জয় অনুমান করলেন, এই লোকটিই বোধহয় সনাতন মল্লিক। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ

করে তাঁর মনে হল, মৃত লোকটিকে গলা টিপে মারা হয়েছে। পড়ন্ত আলোয় চোখে পড়ল তার মীনা করা আংটির ওপর লেখা রয়েছে এস. এম.। নিশ্চিন্ত হলেন সঞ্জয়। বন্ধু অমিতাভকে খবর দিতে হবে। দুটো শিয়ালের থাবার অনুসরণে লাশ আবিষ্কারের কৃতিত্ব কি কম?

আবার রাস্তায় উঠলেন সঞ্জয়। তাঁর আগে-আগে চলল সিল্কি কাঁচা মাটিতে থাবার ছাপ এঁকে। অবাক হলেন সঞ্জয়। দেখলেন সিল্কির মতো অতিকায় অ্যালসেশিয়ানের থাবার ছাপও শিয়ালের থাবার মতো গভীর নয়। তা ছাড়া শিয়ালগুলো এখান থেকে ফিরে যায়নি। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন, পাশের রেললাইনের দিকে গেছে কি না বুঝতে পারলেন না। কারণ, সেখানে সবুজ ঘাস রয়েছে। তবু তন্নতন্ন করে খুঁজেও শিয়ালের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না সঞ্জয়। সন্ধে হয়ে আসছে বলে ফিরে আসার পথ ধরলেন।

অমিতাভ বাড়িতে ফিরে বন্ধুর জন্য বসেছিলেন। সঞ্জয় ও সিল্কিকে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, 'যাক, তোর সারমেয় এসে গেছে।'

'শুধু আসেনি, সনাতনবাবুর লাশও খুঁজে বের করেছে।'

'কোথায়—কোথায়?' লাফিয়ে উঠলেন অমিতাভ।

সঞ্জয় বিকেলের অভিযানের আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললেন। থাবার দাগগুলো যে রহস্যময় মনে হয়েছে, সে-কথাও বললেন।

অমিতাভ সনাতনবাবুর লাশ তুলে আনার ব্যবস্থা করে এসে বসলেন।

সঞ্জয় বললেন, 'কী ব্যবস্থা করলি?'

'লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। সীতেশকেও জানাতে হবে।'

'এখুনি জানাবার দরকার নেই। তাতে সাবধান হয়ে যাবে।'

'তুই কি স্থির নিশ্চিত যে, সে-ই খুন করেছে?'

'প্রমাণ না পেয়ে কিছু বলা যায় না। তবে সনাতনবাবুর মৃত্যুতে আর কেউ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই যখন—।'

'সীতেশ যদি বা খুন করে, তাহলে সে কী করে সনাতনবাবুর লাশ ফেলে এল? ভদ্রলোক খুব হালকা ছিলেন না!'

সঞ্জয় আপনমনে বললেন, 'শিয়ালের থাবা, দুটো শিয়াল পাশাপাশি গেছে—তারা আর ফেরেনি...আচ্ছা, একটা শিয়ালের ওজন কত বলতে পারিস?'

'না। কোনওদিন কোলে তুলে দেখিনি।' রাগত স্বরে বলেন অমিতাভ।

'আমিও না—কিন্তু সিল্কি নিশ্চয় শিয়ালের চেয়ে ভারী।'

'তা তো হবেই, অত বড় অ্যালসেশিয়ান যখন।'

'অথচ শিয়ালের থাবাগুলোর দাগ আরও গভীর।'

'তবে কি বলতে চাস, ওগুলো শিয়ালের থাবা নয়?'

'দেখে এসেছি ওগুলো থাবারই দাগ...তবে...অমিতাভ, এখানে কামার আছে?'

'আছে। কেন?' বিস্মিত হলেন অমিতাভ।

'কাল ভোরে তাদের ডেকে পাঠাস।'

'একজনই কামার এ-অঞ্চলে আছে, যে জিনিসপত্র তৈরি করে।'

'তাকেই ডেকে আনতে হবে।'

'তোর কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না।'

'কাল পারবি।' বলে আলোচনায় ইতি টানলেন সঞ্জয়।

পরের দিন সকালে অমিতাভর কাছে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল, গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে সনাতন মল্লিককে।

'জানতাম। অমিতাভ তুই কালীর খোঁজ করেছিস?'

'কাল সে কাজে এসেছিল অনেক বেলায়—আমি আর ওদিকে যাইনি।'

'আজ ওদিকে যাব। তার আগে কামারকে চাই।'

হাসতে-হাসতে অমিতাভ বললেন, 'ডেকে পাঠিয়েছি। এখানে এসেও তুই কাজ করবি?'

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বুদ্ধির খেলায় বিপক্ষকে মেরে এনেছি, তবে প্রমাণ করতে পারব কি না কে জানে!'

ছোট শহরের কামার সাতসকালেই পুলিশের ডাক পেয়ে ছুটে এসেছে। সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, মাধব।'

'আচ্ছা মাধব, সীতেশবাবুর দু-জোড়া জুতো তাহলে তুমিই করেছ?'

'হ্যাঁ, বাবু।' বলে ফেলেই যেন পাংশু হয়ে গেল মাধব।

অমিতাভ বুঝতে পারছিলেন না কামার আবার কী জুতো তৈরি করেছে। তবু চুপ করে রইলেন। বন্ধুর ওপর অসীম আস্থা ছিল তাঁর।

'আচ্ছা মাধব,' সঞ্জয় বললেন, 'সীতেশবাবু জুতোগুলোর কথা কাউকে বলতে বারণ করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।'

মাধব চলে গেলে সঞ্জয় বললেন, 'এবার চল।'

'কোথায়?'

'সীতেশবাবুর বাড়ি—জুতো খুঁজতে।'

'জুতো! কোন জুতো? আমরা জুতো খুঁজব কেন?'

'সেই জুতো—যা সীতেশ মল্লিক অর্ডার দিয়ে তৈরি করেছে। যার পায়ের কাছে হিলের বদলে ঘোড়ার নালের মতো লাগানো আছে লোহার থাবা।'

'লোহার থাবা!' বিস্ময়ে কথা সরে না অমিতাভর।

সুসজ্জিত পুলিশ ফোর্স নিয়েই রওনা হলেন অমিতাভ। সঙ্গে চললেন সঞ্জয় ও সিল্কি। আকস্মিকভাবে অমিতাভদের আসতে দেখে চমকে উঠল সীতেশ। সে-ভাব গোপন রেখেই অভ্যর্থনা জানাল : 'আসুন, কিনারা হল কিছু?'

'হয়েছে, আপনার বাবার লাশ পাওয়া গেছে এক মাইল দূরে মড়া ফেলার আস্তানায়। তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।'

'সেকি?' সীতেশের গলা খুব অস্পষ্ট শোনাল।

'আমরা বাড়ি সার্চ করব।'

সীতেশ কোনও উত্তর দিল না। অমিতাভ ও সঞ্জয় উঠে পড়লেন। সিল্কিকে নিয়ে সঞ্জয় উপস্থিত হলেন সনাতন মল্লিকের ঘরে। অমিতাভকে বললেন কালী ও রঘুকে ডেকে আনতে। তারা আসতেই তিনি কালীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কালী, তুমি দড়িটা কেটেছ কেন?'

'দড়ি! না বাবু, আমি কাটিনি।'

'মিথ্যে কথা বোলো না।' ধমক লাগালেন অমিতাভ।

'কালী, তুমি সনাতনবাবুর লাশ ফেলে এসেছ বেওয়ারিশ মড়া ফেলার জায়গায়—আমরা খোঁজ পেয়েছি, তুমি তাঁকে খুন করেছ—।'

হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল কালী : 'হুজুর মা-বাপ আমার...আমি খুন করিনি...।'

'তবে কী করেছিস?' আবার ধমকে উঠলেন অমিতাভ।

'বিকেলে ছোটবাবুর কথায় দড়িটা কেটে দিয়েছিলাম শুধু। ছোটবাবু সেদিন বাগানে পাহারা দিতে বলেছিলেন বলে অনেকক্ষণ ছিলাম।'

'মালি কোথায় গেছিল?'

'ছোটবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিল, হুজুর।'

'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, সীতেশবাবু?'

'মাইলতিনেক দূরে একটা গাছ দেখতে—একরকমের লতা—রাজ্যের ফুল ফোটে। মালিকে নিয়ে গেছিলাম, কোনও চারা পেলে তুলে আনব বলে। সুন্দর ফুল!'

আচম্বিতে প্রশ্ন করেন সঞ্জয়, 'যাওয়ার আগে মোমবাতি হাতে সনাতনবাবুর ঘরে এসেছিলেন কেন, স্নানের তোয়ালে নিয়ে?'

'আমি আসিনি।'

'তাহলে আলনায় পড়ে থাকা ওই তোয়ালেটা আপনার নয়?'

সিল্কিকে তোয়ালেটা শোঁকাতেই সে সীতেশের দিকে তেড়ে এল। সীতেশ বিবর্ণ হয়ে বসে পড়ে।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বললেন, 'অমিতাভ, বাড়ি সার্চ না করে বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁজে দেখো তো, লোহার থাবাওয়ালা দু-জোড়া জুতো পাও কিনা।'

সঙ্গে-সঙ্গে সীতেশ লাফিয়ে উঠল। তা দেখে সঞ্জয় বললেন, 'আর অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, সীতেশবাবু। মাধব কামার স্বীকার করেছে। অমিতাভ, তুমি সীতেশবাবু আর মালিকে গ্রেপ্তার করতে পারো।'

অমিতাভ ইঙ্গিত করতেই সীতেশ এবং মালিকে অ্যারেস্ট করা হল। কিছুক্ষণ পরে বাগানের ঘন 'বোগেনভিলিয়া' গাছের নীচে, মাটির তলা থেকে, জুতো নিয়ে এল অন্যতম সার্জেন্ট। সবাই দেখল, সাধারণ জুতোর মতোই, শুধু জুতোর তলায় মুখের দিকে এবং গোড়ালির দিকে দুটো করে লোহার থাবা বসানো রয়েছে ঘোড়ার নালের মত।

অমিতাভ বললেন, 'চমৎকার!'

সঞ্জয় বললেন, 'এই জুতো পরেই সীতেশ মল্লিক এবং তার সহকারী মালি সনাতনবাবুর মৃতদেহ ফেলে এসেছে। তার আগে রাত দশটার পরে সীতেশ মোমবাতি নিয়ে সনাতনবাবুর ঘরে ঢোকে। তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ চাপা দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। তারপরই সীতেশ বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছে। শেয়ালের থাবা লাগানো জুতো পরে লাশ ফেলে এসেছে এক মাইল দূরে। ফেরবার সময় জুতো খুলে রেললাইন ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। তাই শেয়ালের ফেরার চিহ্ন আমরা দেখিনি। নরম মাটিতে মানুষের ওজন এবং সনাতনবাবুর ভার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দাগগুলো গভীর হয়েছে। মোমবাতি নিয়েছিল—সহজে নিবিয়ে অন্ধকার করা চলে বলে। দড়ি কাটা হয়েছিল রঘু যাতে কিছু না শুনতে পায়। তাড়াতাড়িতে তোয়ালেটা নিয়ে যেতে পারেনি সীতেশ। এর পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিনের—সেদিনের সন্ধ্যার ঝগড়া কিছু নয়। তাই না, সীতেশবাবু?'

সীতেশ মল্লিকের মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকে আসে।

মাসিক রোমাঞ্চ
মার্চ, ১৯৭১



জেলখানা

জরাসন্ধ

হরেকরকম নালিশ কয়েদিদের। হারাধন দাস চার-পাঁচ মাস বাড়ির কোনও খবর পায়নি, চিঠি লিখবার মতো কেউ নেই তার, একটা পিটিশন চায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। পিটিশন মঞ্জুর করলেন বড়সাহেব। পুলিশের মারফত খবর সংগ্রহ করে জানিয়ে দেওয়ার ভার নেবেন ম্যাজিস্ট্রেট। রহিম শেখের সাত বছর জেল। জানতে পেরেছে তার বউ নাকি 'নিকা বসতে' চলেছে পাশের গ্রামের ফাজেল মোল্লার সঙ্গে। সেও পিটিশন চায় নিকা যাতে বন্ধ হয়। বড়সাহেব মাথা নাড়লেন, তা হয় না। ও-ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের কিছু করবার নেই। পরান বাগদির ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে গুপি সাঁতরা। তারও একটা পিটিশন দরকার বাঁশ উদ্ধারের জন্য। মঞ্জুর হল না। যে জেলে এসেছে তার ফেলে আসা বাড়ি-ঘর, জমি-জিরেত রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকারের নয়।

একজন বললে, একটা সুটকেস-এ কিছু মূল্যবান দলিলপত্র রয়ে গেছে তার বাড়িতে। সেটা সে জেল হেফাজতে রাখতে চায়। বড়সাহেব সম্মতি দিলেন। কেউ যদি এসে জমা দেয়, সুটকেস রাখবার ব্যবস্থা হবে জেল-গুদামে, যাওয়ার সময় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে-ছিল জগা, জগন্নাথ পাড়ুই। কার সঙ্গে মারামারি করে বছরদুয়েকের মেয়াদ নিয়ে এসেছে। বড়সাহেবের উত্তর শুনে জোরে-জোরে মাথা নাড়ছিল। 'কিছু বলবে?' জিজ্ঞাসা করলেন জেলার।

'আজ্ঞে না, হয়ে গেছে।'

বড় জমাদার বলল, 'ও পাগলা আছে, হুজুর।'

বড়সাহেব চলে গেলে অন্য কয়েদীরা চেপে ধরল, 'এই জগা, অমন করে মাথা নাড়ছিলি কেন?'

জগা কিছু ভাঙল না, চোখে-মুখে খুশি-মাখা রহস্য ফুটিয়ে বলল, 'আছে, আছে।'

দিনকয়েক পরে গেটের সামনে হুলুস্থুল কাণ্ড। একজন গাঁয়ের লোক একটা বড়সড় বকনা নিয়ে এসেছে। বন্দুকধারী সান্ত্রি টহল দিচ্ছিল। হুঙ্কার দিল, 'হট যাও!'

সে হটল না, বলল, 'এজ্ঞে, এটা জমা দেব।'

'কী জমা দেবে? এই গোরু?'

'এজ্ঞে।'

সান্ত্রি তো অবাক! গোরু জমা দেবে জেলখানায়! এটা কি খোঁয়াড় না পিঁজরাপোল? লোকটাকে হাঁকিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'এজ্ঞে, চিঠি আছে।'

'কই, দেখি?'

ট্যাঁক থেকে বের করল একখানা চারভাঁজ-করা ময়লা পোস্টকার্ড। তার গায়ে জেলখানার রবার-স্ট্যাম্পের ছাপ। তাকে দাঁড়াতে বলে সান্ত্রি চিঠিখানা পাঠিয়ে দিল অফিসে। তারপর সেটা ঘুরতে লাগল এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে। যে দ্যাখে তারই মুখ চুন।

অফিস হয়েই গেছে চিঠিখানা। মাথার ওপরে ইংরেজিতে লেখা 'কয়েদি নম্বর ১২৩৭-এর জগন্নাথ পাড়ুই'। অর্থাৎ, পোস্টকার্ডখানা ওই লোকটিকে দেওয়া হয়েছিল, সেইসঙ্গে চিঠি লেখার অনুমতি। মাঝখানে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কয়েকটা লাইন, তার লেখা বা কাউকে দিয়ে লেখানো। উলটো পিঠে জেলের গোলমোহর, তার মধ্যে বড়সাহেব, অর্থাৎ, সুপারিন্টেন্ডেন্টের সই, নীচে ছোট্ট করে কানাইবাবুর 'কে' নামের আদ্যক্ষর বা ইনিশিয়াল।

জেল থেকে কয়েদিদের যত চিঠি যায়, কানাইবাবুর কাজ হল সেগুলো দেখে দেওয়া, জেলের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখছে কি না, কিংবা এমন কোনও কথা আছে কি না, যা বাইরে যাওয়া উচিত নয়। চিঠি পড়ে পিঠে রবার স্ট্যাম্প মেরে, তার মধ্যে 'কে' বসিয়ে, বান্ডিল বেঁধে নিয়ে যান বড়সাহেবের কাছে। তাঁর পক্ষে অত চিঠি পড়া সম্ভব নয়। তিনি শুধু দেখেন 'কে'টা ঠিক আছে কি না। তারপর সই করে দেন।

জগন্নাথের পোস্টকার্ডখানা হাতে পড়তেই কানাইবাবু একেবারে বসে পড়লেন। একটানা, প্রায় একই ধরনের কথা পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে একটু ঢুলুনি আসে। হয়তো সেইফাঁকেই কখন 'কে' বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন উপায়? হতভাগা পোস্টকার্ডখানা আর-একবার আগাগোড়া পড়লেন। জগন্নাথ পাড়ুই লিখেছে তার কোনও ভাইকে—

এই চিঠি পাইবামাত্র আমার মঙলীকে জেলখানার গেটে আনিয়া জমা করিয়া দিবা। অন্যথা না হয়। বড়সাহেবের হুকুম আছে।

ইতি—

তোমার জগাদা।

অফিসে কিছু লেখাপড়া-জানা কয়েদি কাজ করে। তাদের বলে রাইটার। তাদেরই কারও মারফত খবরটা জগার কাছে পৌঁছে গেল। সে কাজকর্ম ফেলে ছুটে এল। কতদিন তার মঙলীকে দেখেনি! কেমন আছে কে জানে!

চেঁচামেচি শুনে জেলারবাবু তাকে ডেকে পাঠালেন, ধমক দিয়ে বললেন, 'এসব কী লিখেছিস? বড়সাহেব বলেছেন গোরু জমা দিতে?'

জগা হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে, আমার সামনেই তো একজনকে সুটকেস জমা দেওয়ার হুকুম দিলেন।'

'সুটকেস আর গোরু এক হল?'

'আজ্ঞে হুজুর, আমার তো সুটকেস-টুটকেস নেই। থাকবার মধ্যে ওই বকনাটা। ওই আমার সব।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওটা থাকবে কোথায়? খেতে দেবে কে?'

'সে-কথা আমি কেমন করে জানব, হুজুর!'

জেলারবাবু রেগে উঠলেন : 'ওসব হবে না। ...এই, কে আছিস? ওকে ভেতরে নিয়ে যা।'

জগা গেলে তো! অফিসের মধ্যেই কাঁদতে লাগল, সে বড়সাহবের কাছে নালিশ করবে। অগত্যা তাকে সেখানেই হাজির করা হল। চিঠির ব্যাপারটাও চাপা রইল না। তিনি যখন পোস্টকার্ডখানা পড়ছেন, জগা সিপাইদের হাত এড়িয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে তাঁর পা দুটো চেপে ধরল, কিছুতেই ছাড়বে না। ক্রমাগত এক কথা : 'আমার আর কেউ নেই, হুজুর। বকনাটাকে না রাখলে সে ঘাস-জল না পেয়ে মরে যাবে।'

জেল-সুপার মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। কানাইবাবুর ওপর একহাত নিলেন, 'ডিসমিস করব' বলে শাসালেন। কিন্তু সে তো গেল পরের কথা। এখন একে ঠেকান কেমন করে? চিঠিটার পিঠে সই করে তিনিও তো জড়িয়ে পড়েছেন। অনুমতি একরকম দিয়েই ফেলেছেন বলা চলে। তাই বলে কয়েদির সম্পত্তি হিসেবে একটা জলজ্যান্ত গোরু তো আর জমা রাখা যায় না জেলখানায়! এর পিছনে খরচ আছে। সেটা কে দেবে? থাকবে কোথায়, দেখাশোনাই বা করবে কে?

বড় জমাদার রামোদর সিং এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এর আগেই সে বকনাটাকে দেখে এসেছে। খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু জাত ভালো। যত্ন-আত্তি করলে বছরখানেকের মধ্যেই বাচ্চা দেবে। চার-পাঁচসের দুধ একটানেই পাওয়া যাবে, আশা করা যায়।

দু-কদম এগিয়ে গিয়ে বুটে বুট ঠুকে বড়সাহেবকে একটা টানা সেলাম দিয়ে রামোদর সিং জানাল, সরকার থেকে যখন গোরুটার ভার নেওয়া সম্ভব নয়, হুজুরের হুকুম পেলে সে-কাজটা অগত্যা সে-ই করতে পারে! বকনা বাছুর, মা ভগবতীর অংশ। তারা পাঁচজন থাকতে না-খেয়ে মারা যাবে! কিছু না করাটা বড় অধর্মের কাজ হবে।

জেল-পাঁচিলের বাইরে বড় জমাদারের সরকারি কোয়ার্টার। সেখানে গরু রাখার হুকুম নেই। সাহেব বললেন, 'রাখবে কোথায়?'

উত্তরটা আগেই ভেবে রেখেছিল রামোদর। সঙ্গে-সঙ্গে বলল, শহরতলির কোনখানে তার এক ভাই আছে। একটা ছোটখাটো খাটালের মালিক। সেখানে রেখে দেবে। খরচ-পত্তর সব তার। কয়েদি যখন খালাস পাবে, তার গোরু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

শহরতলির খাটালে নয়, জেলখানার বাসাতেই গোপনে 'মানুষ' হতে লাগল মঙলী। বড় জমাদার ডিউটি থেকে বেরিয়ে উর্দি খুলেই লেগে যায় তার সেবায়। কোত্থেকে জুটিয়ে আনে কচিঘাস, নিজে হাতে খড় কাটে, খৈল আর ভুষি দিয়ে জাবনা মেখে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ায়। দেখতে-দেখতে চেহারা ফিরে গেল বকনাটার।

জগা মাঝে-মাঝে জিগ্যেস করে, 'আমার মঙলী ভালো আছে তো, জমাদারসায়েব?'

'ভালো আছে মানে? দেখলে চিনতে পারবি না!'

'গেটের সামনে একটু আনতে বলবেন? একবারটি দেখতাম।'

'খেপেছিস? বড়সাহেব জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না।'

বছরখানেক পরে চমৎকার একটি বাচ্চা হল মঙলীর। এবার তার খাবার-দাবারের দিকে আরও নজর দিল রামোদর। গোরুর দুধ মুখে। মাস দুই যেতেই দু-বেলা মিলিয়ে তার পরিমাণ দাঁড়াল পাঁচ-ছ' সের। কিছুটা খায়, বেশিরভাগ বাবুদের কাছেই লুকিয়ে বিক্রি করে। তার ভাইয়ের খাটালের দুধ! কারও কিছু বলবার নেই। ব্যাপারটা জানাজানি হলেও চাপা থাকে।

ইদানীং জগা আর বড়-একটা তার মঙলীর খবর নেয় না। তার একমাত্র লক্ষ্য, প্রাণপণ খেটে যতটা সম্ভব বেশি রেমিশন আদায় করে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া। ভালো কাজ করলে কয়েদিরা পুরো মেয়াদ থেকে মাসে-মাসে কিছুটা করে মাপ পায়। দু-বছর যার সাজা, মাস তিন-চার বাকি থাকতেই সে বেরিয়ে যেতে পারে।

জগার খালাসের দিন এসে গেল। বড়সাহেব তাকে ভোলেননি। 'খালাসী' সেরেস্তার ডেপুটি জেলারকে জিগ্যেস করলেন, 'ওর সেই গোরুটা ঠিক আছে?'

'আজ্ঞে স্যার, গেট থেকে বেরোলেই দিয়ে দেওয়া হবে।'

কিছুক্ষণ পরে গেটের দিক থেকে একটা শোরগোল শুনে সুপার ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। সে বলল, 'জগা পাগলা গরু নিতে চাইছে না।'

'কেন?'

'বলছে, ''এটা আমার মঙলী নয়।'''

জগাকে আবার আনা হল সাহেবের সামনে। সে হাতজোড় করে বলল, 'ও-গরু আমি নেব না। আমার মঙলীকে দিতে বলুন।'

সাহেবকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে তিনি হেসে বললেন, 'তোমারই তো লাভ। বকনার বদলে দুধলো গোরু পেয়ে যাচ্ছ। দুধ খাবে—গরিব মানুষ, কিছুটা বেচতে পারবে।'

'চাই না, হুজুর! পরের জিনিস নিয়ে অধম্মো করতে পারব না। আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন।'

সকলে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'এই তোর সেই বকনা। ছোট ছিল, বড় হয়েছে, বাচ্চা দিয়েছে।'

জগা রুখে উঠল, 'আমার বকনা আমি চিনি না! আমাকে দেখলেই ছুটে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিত, আর ওই ধেড়ে গোরুটা একবার তাকিয়েও দেখল না!'

বলতে-বলতে তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

পাগলের কথা শুনতে গেলে বড়সাহেবের চলে না। ওকে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দিলেন। জগা যেতে চায় না। সিপাইরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল। রাস্তার খোরাকি বাবদ কিছু পয়সা দেওয়া হয়েছিল তার হাতে, খালাসের সময় যেমন দেওয়া হয়। সেটা সে সাহেবের সামনেই টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিল।

গেটের বাইরে গিয়েও হল্লা করছে দেখে জেলারবাবু লোকটাকে হটিয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। সেনট্রি যখন তাকে ধাক্কা মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে চেঁচাচ্ছে : 'আমার মঙলীকে ফিরিয়ে দাও!'

ব্যাপারটা জানতে পারলাম অনেক পরে। জেলখানায় অনেকরকম লোক আসে—কেউ কয়েদি হয়ে, কেউ কয়েদিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। এমনি একদিন এল বুধন।

'স্যার, জগা পাগলা আছে?'

'আরে, সে তো কবে খালাস হয়ে চলে গিয়েছে! তাকে তুমি চিনতে নাকি?'

লোকটি একহাত জিভ কেটে বলল, 'স্যার, সে তো আমার সাক্ষাৎ বোনাই ছিল।'

একটু থেমে আবার বলল, 'ভাগ্নীটাকে তো ও-ই নিজের হাতে খুন করেছে। বোনটারও অনেক দোষ ছিল। স্বভাবচরিত্তির তেমন ভালো ছিল না।'

নড়েচড়ে বসলাম : 'আরে, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। জগার ছোট ছেলেমেয়ে, বিশেষত ছোট মেয়েদের প্রতি টান। কিন্তু বোনটার জন্যে...মেয়েটা বেশ বড় হয়েছিল, সাত-আট বছরের হবে। একদিন বোনটা ধরা পড়ল হাতে-নাতে। বেদম মারছিল জগা। তারপর...।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটা বলল, 'বোনটা বলে বসল, ''লছমী তোর মেয়েই নয়, তাকে অত আদর করিস কেন?'' কী যে হল জগার, মেয়েটাকে...।'

থেমে গেল বুধন। তার দু-চোখে জল।

জল আমারও চোখে—এই তাহলে জগার আসল রহস্য! সে তাহলে মঙলীর মধ্যে তার লছমীকেই খুঁজত! যে-লছমী বড় হলেও বদলাবে না, মরে গেলেও চলে যাবে না। এক, আদি, অকৃত্রিম স্থির-বয়েসের সেই আদরের মেয়েকে সে হারাতে চায় না কিছুতেই।

অপরাধ-তত্ত্বের একটা বিচিত্র পরিচ্ছেদ আমার চোখের সামনে খুলে গেল—অপরাধীর অবচেতন মনে সেই চিরন্তন স্নেহ-সম্পর্কটা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বিশেষত কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ বলে জগার মনে তা এমন বিচিত্র রূপ ধরেছে।

জগার জন্যে মনটা এখন সহানুভূতিতে ভরে গেল।

মাসিক গোয়েন্দা

পুজো সংখ্যা, ১৯৭১



আরক্ত রজনীর পর

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ বিপদে পড়ে গেছে অশোক শ্রীবাস্তব।

এরকম বিপদে পড়লে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না। ভয়ে-ভাবনায় ত্রিশ বছরের শক্ত-সমর্থ মানুষ একেবারে নুয়ে পড়েছে। এই বিপদের দিনে ত্রাতা হিসাবে পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন নিজের বলতে অশোকের কেউ নেই। তবে সহকর্মীরা—স্থানীয় বীমা কর্পোরেশনের পদস্থ কর্মচারী, অফিসের বন্ধুরা তাকে এই বিপদ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

সরকারি পক্ষের দুঁদে ব্যবহারজীবী বলেশ্বর সিনহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনও অশোকের কানে বাজছে। নিজের বেঁটেখাটো নিরেট চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বিচারকক্ষে তখন শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করছে। তিনি রুমাল দিয়ে একবার মুখ মুছে নিয়ে আরম্ভ করলেন, ইয়োর অনার, আসামী অশোক শ্রীবাস্তব ও দয়ানন্দ ভর্মার মধ্যে বিবাদ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। দুজনের পাশাপাশি বাড়ি। বাড়ির পেছন দিকের বাগানের কিছু অংশ নিয়েই বিবাদ। গত ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় এই বিবাদ চরমে ওঠে। অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে দয়ানন্দ গালিগালাজ করছিলেন। আসামী তাঁকে মারতে তেড়ে যায়—প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দুজনকে থামান কোনও-রকমে। তার পরের দিন, অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর ভোরে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে।

ঘুম থেকে উঠেই দয়ানন্দের স্ত্রী বিশ্রী ধরনের গন্ধ পান। লক্ষ করেন, বিছানায় স্বামী নেই। খোঁজাখুঁজি করার পর বাগানের সেই বিতর্কিত জমির ওপর দয়ানন্দকে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর শরীর জ্বলছিল—বাঁচার তাগিদে তিনি ছটফট করছিলেন। কোনওরকমে আগুন নিভিয়ে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ইয়োর অনার, দয়ানন্দ মারা যাওয়ার আগে এক স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন। তা থেকে জানা যায়, ভোরবেলায় তিনি যখন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন তখন অশোক শ্রীবাস্তব অতর্কিতে সেখানে উপস্থিত হয়। মুখে আঘাত করে দয়ানন্দকে পেড়ে ফেলে মাটিতে। একজন যুবকের পক্ষে একজন প্রৌঢ়কে আয়ত্বে আনা কিছুই নয়। তারপর সে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় দয়ানন্দের শরীরে। ইয়োর অনার, পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা-প্রসূত এই হত্যা। দীর্ঘদিনের বিরোধকে এইভাবে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১২০-র বি এবং ৩০২ ধারায় আসামী অশোক শ্রীবাস্তবকে সোপর্দ করার আবেদন আমি আদালতের কাছে রাখছি।

অশোকের উকিল গুণেশ্বর প্রসাদ বেলের জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সে-আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। অগত্যা, সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে দেখে নেওয়ার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করলেন। বিচারক উনিশ দিন সময় দিয়ে তারিখ ফেললেন। অশোককে সেলে নিয়ে যাওয়া হল।

তারপর পাঁচদিন কেটে গেছে। চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থেকে অশোক ভয়ে-ভাবনায় আধমরা হয়ে পড়েছে। অথচ, সে ছাড়া আর বেশি করে কে জানে এই হত্যাঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এখন মামলা সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আইনের তীক্ষ্ন সমস্ত ধারা খুঁজে বের করা দরকার। গুণেশ্বর প্রসাদ কি পারবেন?

তা ছাড়া, অনেক দৌড়োদৌড়ি, অনেক তদ্বির, এ-সমস্তই বা করবে কে? অশোকের নিজের বলতে তো কেউ নেই। অবশ্য লীনা আছে। কিন্তু, এই ঘটনার পর ওর সম্পর্কে তার মনে কি আর কোনও আগ্রহ বজায় আছে? না থাকলে, দোষ দেওয়া যায় না।

লীনা শহরের বিত্তশালী ব্যবসাদার লালা আনোখেলালের একমাত্র মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী কিছু নয়। তবে একটা আলগা শ্রী তাকে মিষ্টি মেয়ে করে তুলেছে। বছরদুয়েক আগেকার কথা। পুজোর ছুটিতে অশোক বেনারস বেড়াতে যাচ্ছিল। লীনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় ট্রেনে। বাবা-মার সঙ্গে সে যাচ্ছিল দিল্লি। ঘণ্টাকয়েক ট্রেনে কথাবার্তার মধ্যে ভালোই কেটেছিল।

বেনারস থেকে ফিরে আসার পর ইচ্ছে হয়েছে তাদের বাড়ি যাওয়ার, কিন্তু যেতে পারেনি। সঙ্কোচ বাধা দিয়েছে। অথচ অনাহূত অতিথি হয়ে যে ওখানে উপস্থিত হবে, তা নয়। লীনার মা বলেছিলেন, আমরা তো মাত্র এক সপ্তাহ দিল্লিতে থাকব। তুমিও বেনারস থেকে ফিরে আসবে। তারপর একদিন এসো আমাদের বাড়ি।

লীনাকে কিন্তু মোটেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না অশোক। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে দিন-কুড়ি সময় লেগে গেল। একদিন সন্ধ্যার মুখে পৌঁছল তাদের ওখানে। বলতে গেলে দুজনের মনের মিলের সূত্রপাত তখন থেকেই। তারপর দিন গড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটা দশজনে আঁচ করেছে।

লীনার মা-বাবাও।

একদিন বলেছে অশোক, আমার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে তোমার বাবার আপত্তি হবে না?

আপত্তি হবে কেন!

আমি আহামরি গোছের তো আর কিছু নই। তোমরা প্রচণ্ড বড়লোক। পয়সাওয়ালা ছেলের হাতেই তো তিনি তোমাকে দিতে চাইবেন।

তাই হয়তো চাইতেন। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। আমি যে তোমাকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছি, এ-কথা ওঁরা জানেন কিনা। আর এ-কথাও ওঁরা বিশ্বাস করেন, এ-ব্যাপারে আমার পছন্দই হল শেষ কথা।

কথাটা শেষ করেই লীনা মৃদু হাসল।

এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। আগেকার লেখা খাতার পুরোনো পাতাগুলো পড়া যায় কিন্তু নতুন করে আর কিছু লেখা যায় না। হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যে, তাকে আর মনের মণিকোঠায় রাখা যায় না, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতেই ইচ্ছে হয়।

তালা খোলার ঝনঝনানিতে অশোকের চিন্তাস্রোত বাধা পেল। চোখ তুলে দেখল, একজন সুট পরিহিত ভদ্রলোক সেলের মধ্যে প্রবেশ করছেন। গম্ভীর মুখ। চোখে লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা। মনে হল, এঁকে আগে কয়েকবার কোথায় যেন দেখেছে!

ভদ্রলোক কোনও ভূমিকা না করে নিজের পরিচয় দিলেন।

আমি শৈলেন সান্যাল। স্থানীয় কোর্টে প্র্যাকটিস করি। আপনার কেসের দায়িত্ব বর্তমানে আমার হাতে। সেই সম্পর্কে—।

তাঁকে বাধা দিয়ে অশোক বিস্মিত গলায় বলল, আমার উকিল তো গুণেশ্বর প্রসাদ। আপনাকে তো—!

আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন লালা আনোখেলাল। গুণেশ্বরের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে আমাকে অ্যাসিস্ট করবে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়।

এ-ক'দিন যা ভেবেছে সমস্ত মিথ্যে! লীনা তাকে মোটেই মন থেকে সরিয়ে দেয়নি! ওর মা-বাবাও নয়! বরং ওঁরা বারের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবীকে নিযুক্ত করেছেন তাকে মুক্ত করে আনার জন্য! এতক্ষণে শৈলেন সান্যালের খ্যাতির কথা অশোকের মনে পড়ে গেছে। আনন্দ আর বিস্ময় মনকে মথিত করে তুলল, চোখে জল এসে গেল তার।

সান্যাল আবার বললেন, গুণেশ্বর আমাকে ঘটনাটা বলেছে। তবে আপনার মুখ থেকে বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই।

বিস্তারিতভাবে বলতে যা বোঝায় তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ৯ই নভেম্বর বেলা আটটার সময় আমি পড়াশুনো করছিলাম—এমনসময় পুলিশ গিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করে।

পাশের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গেছে আপনি বুঝতে পারেননি?

একেবারেই না। দুটো বাড়ি সাঁটাসাঁটি হলেও পাশাপাশি বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। আমার সদর হল প্রধান সড়কের ওপর। ও-বাড়ির সদরে পৌঁছতে গেলে গলি দিয়ে যেতে হবে। কাজেই ওধারে কিছু ঘটলে আমার পক্ষে চট করে জানা সম্ভব নয়।

দয়ানন্দের সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

আগের দিন সন্ধ্যায়। আমার বাগানের কাঠাতিনেক জমি চেপে উনি পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন, শুনেছেন বোধহয়? মনকষাকষি আমাদের মধ্যে ছিল। সেদিন দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, এ-সমস্ত ব্যাপারে আইনের সাহায্য নেওয়াই তো হল উপযুক্ত ব্যবস্থা। তা আপনি নেননি কেন?

শেষ পর্যন্ত আমাকে কোর্টেই যেতে হত। তবে—।

মৃত দয়ানন্দ কী করতেন?

সুদের কারবার করতেন।

ভালো কথা, আপনার সঙ্গে যখন দয়ানন্দের বচসা হয় তখন সেখানে আর কেউ ছিল?

তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনিও দু-চারটে টিপ্পনি কেটেছিলেন।

স্ত্রী ছাড়া কোনও চতুর্থ ব্যক্তি সেখানে ছিলেন না?

ভদ্রলোকের ভাইপো এসে পড়েন। কথাকাটাকাটি হচ্ছিল উচ্চগ্রামে। তাই কয়েকজন প্রতিবেশীও আসেন।

শৈলেন সান্যাল ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, ডাইং ডিক্লেয়ারেশনই আপনাকে বেকায়দায় ফেলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন স্বীকার করে নেয়, মানুষ মরার পূর্বমুহূর্তে বড় একটা মিথ্যে কথা বলে না। তবে একটা ফাঁক দেখতে পেয়েছি...দেখা যাক, কতদূর কী হয়। আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি যা করবার করছি।

আরও দু-চার কথার পর সান্যাল বিদায় নিলেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে টাউন থানায় এলেন তিনি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখলেন। কেরোসিন তেল দিয়েই শরীর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হয়েছে। তবে মাথায় আঘাতের আঁচ পাওয়া গেছে। মৃত্যু হয়েছে সকাল চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে।

ডাইং ডিক্লেয়ারেশনের কপির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সান্যাল বললেন, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শেষ জবানবন্দি নেওয়া হয়নি দেখছি। এটা কি ভ্যালিড, ইনস্পেক্টর?

থানা ইনচার্জ কিন্তু-কিন্তু ভঙ্গিতে বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট হাসপাতালে উপস্থিত হওয়ার আগেই দয়ানন্দ বর্মা মারা যান। এক্ষেত্রে—।

আপনারা সেসময় উপস্থিত ছিলেন?

ম্যাজিস্ট্রেটকে আর থানায় একইসঙ্গে খবর পাঠানো হয়েছিল। আমরা প্রায় একই সময় উপস্থিত হয়েছিলাম। উপায়হীন অবস্থায় শেষ জবানবন্দি নিতে ডাক্তার বাধ্য হয়েছিলেন। তবে ডাইং ডিক্লেয়ারেশনের কথা ছেড়ে দিলেও, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আপনার মক্কেল রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। অবস্থার গতি সম্পূর্ণ তাঁর বিরুদ্ধে।

আর কথা না বাড়িয়ে সান্যাল ওখান থেকে বিদায় নিলেন। তিনি অসম্ভব একরোখা লোক। যে-কাজ হাতে নেন তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত থাকেন। বাড়ি ফিরেই তিনি লালা আনোখেলালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন।

হ্যালো...লালাজী...আমি সান্যাল—বিশেষ একটা কথা বলার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করলাম...।

ও-সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন...কেসের তারিখ খোলার পর যা করণীয় তা আমি নিশ্চয় করব...তবে...।

না, না, হেজিটেশানের কোনও প্রশ্ন নেই...কেস যে দারুণ ঘোরালো তা আপনি বুঝতেই পারছেন...আমার মত হল...যে-সময় পাওয়া গেছে এর মধ্যে পুরো ব্যাপারের ভালোরকম তদন্ত করানো...।

আহা-হা! আমি তো আছিই...আমি যা করবার কোর্টে করব...ভাবী জামাইকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে আগে কিছু করা দরকার...।

ঠিক আছে...এ-ব্যাপারের যিনি অথরিটি তাঁকেই কলকাতা থেকে আনাবার ব্যবস্থা করতে হয়...খরচপত্র অবশ্য একটু বেশি পড়বে...।

খরচপত্রের জন্যে চিন্তা নেই বলছেন...আমি তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছি...এখন ছেড়ে দিলাম...কাল সকালে আপনার ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে রইল, লালাজী...।

সান্যাল রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

দিনদুয়েক পরেই বাসব পৌঁছল।

সান্যাল যতদূর যা জানেন, গুছিয়ে বললেন ওকে। এবং এ-কথাও জানালেন, তাঁর ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে দয়ানন্দের সুন্দরী স্ত্রী। মহিলাটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়, এইরকমই সংবাদ পাওয়া গেছে। কারও সঙ্গে যোগসাজস করে বৃদ্ধ স্বামীটিকে সরিয়ে দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।

দাঁতে পাইপ চেপেই বাসব বলল, কিন্তু ডাইং ডিক্লেয়ারেশন? ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে না হলেও, হাসপাতালের চিকিৎসকের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সামনে দয়ানন্দ সবার আগে বলেছেন, অশোক শ্রীবাস্তব এই ঘটনার জন্যে দায়ী। এই ভাইটাল পয়েন্টকে উপেক্ষা করলে আমরা ভুল করব, মিস্টার সান্যাল।

হুঁ, বেশ জট পাকিয়ে গেছে।

দেখি চিন্তা-ভাবনা করে। এখন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার বেসরকারি তদন্তের অনুমতি নেওয়া আছে তো?

সান্যাল সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন।

বাসব রিকশায় চেপে রওনা হয়ে গেল। পুলিশ সুপার নরেন্দ্র গোয়েল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। পরিচয় পেয়ে সাদরে আহ্বান জানালেন। বাসবের সুনাম তাঁর অজানা নয় বলেই মনে হল। কথাবার্তা আরম্ভ হল দুজনের মধ্যে।

বাসব বলল, আমি সকলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। একজন সাব-ইনস্পেক্টরকে যদি আমার সঙ্গী করে দেন তাহলে ভালো হয়। নইলে কেউই আমায় আমল দিতে চাইবে না।

বেশ। কার-কার সঙ্গে দেখা করতে চান?

দয়ানন্দের স্ত্রীর সঙ্গে, ভাইপোর সঙ্গে, হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে, প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলার ইচ্ছে আছে।

দয়ানন্দের স্ত্রী সুনীতাদেবী এখন হাসপাতালে—।

কেন?

স্বামীর মৃত্যুর পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন পেইংবেডে রয়েছেন ওখানে।

উনি হাসপাতালে থাকলেও, বাড়িতে একবার যেতে হবে। দুর্ঘটনাস্থলের চারপাশে একটু ঘোরাঘুরি করতে চাই।

ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কখন যাবেন বলুন?

ধরুন, কাল সকালে। আজ বিকেলে ভদ্রমহিলা ও আর-সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেব ভাবছি।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা হল দুজনের মধ্যে। নরেন্দ্র গোয়েল ওকে চা না খাইয়ে ছাড়লেন না। পুলিশ সুপারের বাংলো থেকে বেরিয়ে বাসব আর কোথাও না দাঁড়িয়ে হোটেলে ফিরে এল। নটরাজ এখানকার সেরা হোটেলের অন্যতম। লালা আনোখেলাল ওখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

সারা দুপুর বাসব হোটেলে কাটিয়ে বিকেলে থানায় পৌঁছল। পূর্ব ব্যবস্থামতো সাব-ইনস্পেক্টর দয়াল ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। বেশ চটপটে ছোকরা। সময় নষ্ট না করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের উদ্দেশে।

হাসপাতালের অবস্থান শহরের একপ্রান্তে। আহামরি ধরনের কিছু নয়। সাদামাটা, ছোটখাটো। প্রধান চিকিৎসককে তাঁর অফিসেই পাওয়া গেল। তাঁকে দেখে বাসব অবাকই হল একটু। বয়েস চল্লিশের কিছু নীচেই। দর্শনীয় চেহারাই শুধু নয়—অত্যন্ত স্মার্ট। এত অল্প বয়েসে এরকম দায়িত্বে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না।

দয়াল আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, যা জানি তা তো আগেই বলেছি।

বাসব বলল, হত্যাকারী হিসেবে যিনি চিহ্নিত হয়েছেন তাঁর হয়েই আমি তদন্তে নেমেছি। প্রকৃতপক্ষে, এখনও আমার কিছুই জানা হয়নি। আপনার সহযোগিতা চাই, ডক্টর।

কী জানতে চান বলুন?

ডাইং ডিক্লেয়ারেশন তো আপনিই নিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

সেই সময়কার অবস্থাটা যদি বিস্তারিতভাবে বলেন তাহলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়।

একটু থেমে ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, ভোর তখন পাঁচটা হলেও চারিধার অন্ধকারে ঢাকা। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানা থেকে উঠব-উঠব করছিলাম, এমনসময় চাকর এসে খবর দিল, রিকশায় করে একটা পোড়া বডি বয়ে আনা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটলাম এমার্জেন্সিতে। সুইপাররা তখন বডি শুইয়ে দিয়েছে যথাস্থানে। নিদারুণভাবে পুড়ে গেছে সারা দেহ। ভেবেছিলাম, মারা গেছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, প্রাণ তখনও আছে, এমনকী জ্ঞানও রয়েছে। ক্ষীণস্বরে ভদ্রলোক বললেন, তিনি কিছু বলতে চান। কম্পাউন্ডার এসে পড়েছিল। আমি তাকে পাঠালাম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, তিনি যাতে এসে পড়েন। পুলিশকেও খবর দিয়ে যেতে বললাম।

তারপর?

এরকম ভয়ানকভাবে ঝলসানো মানুষ, সত্যি কথা বলতে, আগে দেখিনি। করণীয় যা কিছু সমস্তই করলাম। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে নিতে হল ভদ্রলোকের শেষ জবানবন্দি। ম্যাজিস্ট্রেট যখন এসে পৌঁছলেন তখন আর কিছু করার নেই। মৃত্যু মিনিট-দশেক আগেই ভদ্রলোকের তীব্র যন্ত্রণাকে লাঘব করে দিয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের স্ত্রী তখন কোথায় ছিলেন?

ওখানেই ছিলেন। কী হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল বুঝতেই পারছেন। এমনই দুর্ভাগ্য, এইরকম অবস্থার মধ্যেই আমাদের বারবার পড়তে হয়।

মহিলাটি এখন এখানেই আছেন?

হ্যাঁ। স্বামীর মৃত্যুর পর শকড হয়ে হিস্টিরিয়ার মতো হয়েছে। পেইংবেডে রয়েছেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, সেদিন রাত্রে ডিউটিতে ক'জন ডাক্তার ছিলেন?

একটু হেসে ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, শুনলে অবাক হবেন, একজনও নয়। আসল কথা হল, ডাক্তারের শর্টেজ চলছে হাসপাতালে। লেখালেখি করেও কাজ হচ্ছে না। নাইট ডিউটিতে একেবারেই কাউকে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময় আমাকেই আসতে হয় ছুটে-ছুটে।

ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। মহিলাটির কী যেন নাম—সুনীতা ভর্মা। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

আসুন আমার সঙ্গে।

ডাক্তার দ্বিবেদী ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের মেন বিল্ডিং-এ এলেন। দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করে পেয়িং ওয়ার্ডে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। নির্দিষ্ট কেবিনের ভেতর আর ডাক্তার গেলেন না। প্রবেশ করল বাসব ও দয়াল। সুনীতা বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। দু-চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া।

বাসব দেখল অপরূপ এক নারীমূর্তির ছন্দোময় অবস্থান। গায়ের রং থেকে শরীরের গঠন, সবই যেন তুলনারহিত। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হবে না। দয়াল বাসবের এখানে আসার কারণ বর্ণনা করল। সুনীতার মুখ এবার কিছুটা গম্ভীর হয়ে উঠল। উঠে বসে আঁচল ঠিক করে নিলেন নিজের।

আমার মনের অবস্থা ভালো নেই। আপনারা কেন যে বারবার এসে আমাকে বিরক্ত করেন বুঝতে পারি না।

বাসব বলল, আমরা দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও তো আর কিছু নেই! আপনার স্বামী মারা গেছেন ঠিকই—এদিকে আমার মক্কেলেরও তো জীবন-মরণ সমস্যা। মানবিকতার কথা মনে রেখে আপনার উচিত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা।

একটু উষ্ণভাবেই সুনীতা বললেন, আপনার মক্কেল আমার স্বামীকে পুড়িয়ে মেরেছেন—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

নিজের চোখে দেখেছেন কি?

না দেখলেও আমি জানি ব্যাপারটা সত্যি। আমার স্বামী তো মারা যাওয়ার আগে অশোক শ্রীবাস্তবের নাম করে গেছেন।

তা হয়তো করেছেন। তবে কথাটা কী জানেন মিসেস ভর্মা, আমি যা প্রশ্ন করব তার উত্তর আপনাকে দিতেই হবে। না দিতে চাইলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ আপনাদের জুলুম।

আমি তা মনে করি না।

বেশ, বলুন।

সেদিন ঠিক কী অবস্থায় আপনার স্বামীকে আবিষ্কার করেছিলেন প্রথমে সে-কথাই বলুন।

বাথরুম যাওয়ার তাগিদে শেষরাত্রির দিকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় স্বামীকে না দেখে অবাক হলাম। খোঁজাখুঁজি করতেই দেখলাম, বাগানের ধারে যে-বারান্দা, তারই সামনে পড়ে আছেন। আগুন আর তাঁর শরীরের কিছু রাখেনি বলতে গেলে। তারপর কীভাবে যে রিকশা জোগাড় করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না।

সেসময় আপনার স্বামীর জ্ঞান ছিল?

এখানে আসার পথে জ্ঞান হয়েছিল।

বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন?

না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ থাকত না।

চাকর-বাকর?

ছোট সংসার। ঠিকে ঝি দিয়েই কাজ চলে যায়।

আর কোনও আত্মীয়স্বজন আপনার কাছাকাছি ছিল না, এই বিপদের সময় যে সাহায্য করতে পারত?

পাড়াতেই আমার স্বামীর ভাইপো থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাই আর ডাকিনি।

আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

হাজারিবাগে।

বাসব থেমে-থেমে বলল, কিছু মনে করবেন না। প্রশ্নটা একটু ব্যক্তিগত হলেও না করে পারছি না। শুনলাম, দয়ানন্দ ভর্মা বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, আপনার মতো অল্পবয়েসী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল কীভাবে?

ভ্রূ কুঁচকে উঠল সুনীতার। তবে পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, গরীব বাপরা বড়লোকের ঘরে মেয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যায়, পাত্রের বয়েস দ্যাখে না।

আর আপনাকে বিরক্ত করব না। চলি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর দয়াল বলল, কীরকম বুঝলেন?

আরও অনেক কিছু এখনও বুঝতে বাকি আছে। চলুন, দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক। এখান থেকে কতদূর?

কাছেই। রিকশার দরকার হবে না।

ঠিকই বলেছিল দয়াল। দয়ানন্দের বাড়ি পৌঁছতে মিনিট-সাতেকের বেশি সময় লাগল না। সদর রাস্তার দিকে মুখ করে অশোক শ্রীবাস্তবের বাড়ি। আর পিছনদিকেরটা দয়ানন্দের। সেখানে যেতে হলে গলি দিয়ে যেতে হয়। নির্জন পাড়া। অধিকাংশ বাড়ির লাগোয়া ফুলের বা সবজির বাগান।

দয়ানন্দের বাড়ির সদরে তালা লাগানো ছিল। সেকেলে বাড়ি হলেও বেশ ঝকঝকে অবস্থা। সংলগ্ন বাগানের গেটে লোহার ফাঁস লাগানো ছিল। দয়াল বাসবকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঢুকে এগিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে। তারপর থামল করোগেট শেড দেওয়া বারান্দার সামনে। বারান্দার শেষেই আরম্ভ হয়েছে মূল বাড়ির পিছনের অংশ। দরজা-জানলা অবশ্য সমস্তই ভিতর থেকে বন্ধ।

এখানেই কাণ্ডটা ঘটে।

দয়ালের নির্দেশ করা জায়গাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল বাসব। জায়গাটা খাপচা-খাপচা ঘাসে ছাওয়া। ঘাসের ওপর হাত বুলিয়ে কী যেন অনুভব করবার চেষ্টা করল। সেই হাত তুলে আনল চোখের কাছে। তারপর আরও মুখ নিচু করে জমির ঘ্রাণ নিতে লাগল। অবাক হয়ে ওর কার্যকলাপ দেখতে থাকল দয়াল।

হিসেব তো মিলছে না, মিস্টার দয়াল?—বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

কীসের হিসেব?

এই জায়গায় দয়ানন্দকে পোড়ানো হয়েছিল, আপনারা বলছেন?

সুনীতা দেবী আমাদের সে-কথাই বলেছিলেন।

একটা মানুষকে পোড়াতে গেলে প্রচুর কেরোসিন তেল দরকার হবে। চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়াও স্বাভাবিক। অথচ দেখুন, এই জায়গাটা মোটেই ভিজে নয়। এমনকী কেরোসিনের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না। ঘাসও পুড়ে যায়নি।

এখানে ব্যাপারটা ঘটেনি বলছেন?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এইসময় গেটের সামনে থেকে কে বলে উঠল, আমি কি আপনাদের কাছে যেতে পারি?

দুজনে মুখ ফিরিয়ে দেখল। গেটের ওপর হাত রেখে একজন মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়েস আন্দাজ চল্লিশ। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মাথা জুড়ে চকচকে টাক। বিচিত্র মূর্তি।

খাটো গলায় বলল দয়াল, দয়ানন্দের ভাইপো সদানন্দ।

আসুন।

বাসবের আহ্বান পেয়ে সদানন্দ হেলতে-দুলতে এলেন।

পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। আপনি কে আমি জেনেছি। আপনার কাছে আমায় যেতে হত। এসে পড়ে ভালোই করেছেন। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন যে, আমরা এখানে এসেছি?

একগাল হেসে সদানন্দ বললেন, আমার বাড়ির সামনে দিয়েই তো এলেন। ভাবলাম, দারোগাবাবু আবার কেন এলেন! বলতে পারেন, একটু আগ্রহ নিয়েই এখানে চলে এলাম। কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না?

দয়াল বাসবের পরিচয় দিল।

তাই নাকি! ভারী খুশি হলাম। কাকা যেভাবে মারা গেছেন—তার জোর তদন্ত নিশ্চয় হওয়া দরকার।

বাসব বলল, এ-কথা বলছেন কেন? হত্যাকারী তো ধরা পড়েছে।

তা পড়েছে। তবে—।

আপনার কি সন্দেহ অশোক শ্রীবাস্তব খুন করেনি?

জিভ কেটে সদানন্দ বললেন, সে কী কথা! সকলেই যখন বলছে তখন আমার সন্দেহ থাকবে কেন!

এ কোনও কাজের কথা নয়। আমি আপনার মতামত জানতে চাইছি।

সত্যি কথা বলতে কী, পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে আমি রাজি নই। সে বড় দায়িত্বের ব্যাপার।

বাসব পাইপ ধরাল। ঘন-ঘন কয়েকবার টান দেওয়ার পর বলল, শুনলাম, সুনীতা দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো নয়। কেন ভালো নয়, বলবেন কি?

নির্বিকার গলায় সদানন্দ বললেন, আমরা দুজনেই দুজনকে দেখতে পারি না।

দেখতে না পারার কারণ একটা নিশ্চয় আছে?

আছে বইকী! দেখুন, তাহলে অনেক কথাই বলতে হয়। এতে অবশ্য পারিবারিক কেচ্ছা গাওয়া হবে। শুধুমাত্র আপনার তদন্তের সুবিধের জন্যেই বলছি।

পকেট থেকে পানের ডিবে বের করলেন সদানন্দ। একটা পান মুখে ফেলে দিয়ে প্রায় একমিনিট ধরে চর্বণ-সুখ উপভোগ করে বললেন, টাকা রোজগারের ধান্দায় জীবনের বেশিরভাগ সময় বিয়ে না করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন কাকা। বছরচারেক আগে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন। বলা নেই, কওয়া নেই, বিয়ে করে ফিরলেন ওখান থেকে। কাকিমার বয়েস আর রূপ দেখে তো আমি হতবাক। কাকার তখন সে কী গদগদ ভাব! গানের মাস্টার রেখে দিলেন। ছ'মাস বেশ কাটল। তারপর বুঝলেন কিনা, গানের মাস্টার আর মহিলাটিকে একটু বেকায়দা অবস্থায় ধরে ফেললাম। কাকা তো সব শুনে রেগে আগুন। মাস্টারকে তাড়ানো হল গলাধাক্কা দিয়ে। সেই থেকে কাকিমা আমার ওপর চটলেন, আমি তাঁর ওপর চটলাম।

এরপর আর বোধহয় আপনার কাকিমা বিপথগামী হননি?

হননি! বলেন কী মশাই? রগরগে যৌবন নিয়ে দিনের পর দিন বয়স্ক স্বামীকে ভালো লাগতে পারে? ইদানীং তো আমার বাড়িতে বিশেষ যাওয়া-আসা ছিল না। কাকার সঙ্গে এই বাগানেই মাঝে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হত। তবে আঁচ পেয়েছিলাম, রাতে-বেরাতে কেউ একজন এখানে আসত। কাকিমাও মাঝে-মাঝে কোথায় যেন যেতেন। পাড়ার লোকেরাও এ-সমস্ত কথা জানে।

আপনার কাকা জানতেন না?

বলতে পারি না। তবে বছরদুয়েক থেকে বউ-এর আঁচল ধরে বসে থাকার চেয়ে, নোট আর টাকা গুনে থাক লাগাবার কাজেই আবার নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন বলে মনে হয়।

আচ্ছা, আপনার কাকা-কাকিমা সম্পর্কে আরও তথ্য কে আমায় দিতে পারে বলতে পারেন?

মনে হয় কপিলবাবু আর রামশঙ্করবাবু পারেন। ওঁরা কাকার বন্ধু। এ-বাড়িতে যাতায়াত আছে।

হুঁ, আপনি কী করেন সদানন্দবাবু?

আমিও সুদের কারবার করি।

আপনি আমাকে অনেক নতুন কথা শুনিয়েছেন, ধন্যবাদ! আচ্ছা, কপিলবাবু আর রামশঙ্করবাবু থাকেন কোথায়?

এ-পাড়াতেই থাকেন।

ভালোই হল। অনুগ্রহ করে তাঁদের যদি এখানে ডেকে আনেন তবে আমার কাজের কিছুটা সুবিধে হয়।

আপনার কিন্তু হওয়ার কিছু নেই। এখুনি ডেকে আনছি।

সদানন্দ চলে গেলেন।

দয়াল বলল, দারুণ ধূর্ত! কথাবার্তার ধরন হল, ধরি মাছ না ছুঁই পানি। সুনীতা দেবীর ইদানীংকালের অন্তরঙ্গটিকে ভালোভাবেই জানে—কেচ্ছা শুনিয়ে আমাদের উসকে দিয়ে গেল, নামটা বলল না!

বাসব কিছু বলল না। তার দৃষ্টি তখন, বারান্দা যেখানে শেষ হয়ে গেছে, সেখানকার একটা চালাঘরের ওপর। ঘরখানা মূল বাড়ির সঙ্গে যুক্ত নয়। দরজা বন্ধ, কড়ায় তালা আছে। তবে তালা লাগানো নেই, খোলা অবস্থায় ঝুলছে।

ওই ঘরের মধ্যে আগে আপনারা গিয়েছিলেন নাকি?

না।

তালা খোলা রয়েছে যখন—চলুন, দেখে আসা যাক ঘরখানা কী কাজে ব্যবহার করা হয়।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে পাল্লা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। প্লাস্টারিং করা নয়, মাটির গাঁথনি দেওয়া দেওয়াল। ফ্লোরিংও সিমেন্টের নয়। ঘরের একপাশে পড়ে আছে ঘাসকাটার যন্ত্র, কয়েকটা খুরপি, গাছকাটা কাঁচি এবং ওই ধরনের আরও অনেক কিছু। অর্থাৎ, বাগানের কাজে লাগে এমন সমস্ত সরঞ্জাম রাখার জন্যই এই ঘর।

বাসব তীক্ষ্ন চোখে চারিধার দেখে নেওয়ার পর বলল, বিশেষ কিছু আপনার চোখে পড়ছে?

দয়াল বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মনে হচ্ছে না কি, সম্প্রতি জায়গাটাকে গোবর দিয়ে নিকোনো হয়েছে? এমনকী তারপর কেউ হাঁটা-চলা করেনি?

তাই তো!

এমন ছন্নছাড়া ঘরকে এমন ভালোভাবে নিকোনোর মানে কী? তা ছাড়া দেখুন, নিয়মিত যে-ঘর নিকোনো হয়, চৌকাঠ বা ওই ধরনের উঁচু জায়গায় গোবরের জমাট লেয়ার পড়ে যায়। এখানে সেরকম কিছু নেই। এর মানে, এই প্রথমবার ঘরখানা নিকোনো হয়েছে।

কিছু ঢাকবার চেষ্টা করা হয়নি তো?

মনে হচ্ছে, তাই। আসুন, গোবর চেঁচে ফেলে দেখি, ব্যাপারটা কী।

দুজনে দুটো খুরপি নিয়ে উবু হয়ে বসে গোবর চাঁচার কাজে লেগে গেল। মিনিট-দশেকের মধ্যে মাঝের অংশ পরিষ্কার হতেই দেখা গেল মাটির খানিকটা বেশ ভিজে রয়েছে। জলে ভেজা নয়, শুঁকে বোঝা গেল কেরোসিন তেল।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুন এই ঘরেই হয়েছে।

সবিস্ময়ে দয়াল বলল, বাগানে পোড়া অবস্থায় দয়ানন্দ পড়েছিলেন এ-কথা সুনীতা দেবীর বানানো! তবে কি—।

বাগানে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল। সদানন্দ দুই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। বাসব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর অনুমানই ঠিক! তবে দুজন নয়, একজন এসেছেন।

সদানন্দ বললেন, কপিলবাবু গতকাল কী কাজে পাটনা গেছেন। দিনকয়েক পরে ফিরবেন। রামশঙ্করবাবুকে নিয়ে এলাম।

প্রবীণ রামশঙ্করবাবু চওড়া খাঁচার মানুষ। মাথার কাঁচা-পাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে ঔৎসুক্য, মুখের ভাব শান্ত। পরনে ধুতি আর খাদির গলাবন্ধ কোট।

আমার পরিচয় বোধহয় পেয়েছেন।—বাসব বলল, আপনাকে এইভাবে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। নিতান্ত...।

ভরাট গলায় রামশঙ্করবাবু বললেন, আমি মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। অশোককে পাড়ার সকলেই স্নেহ করে। তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমরা সকলেই সচেষ্ট।

অশোক এ-কাজ করেনি বলে আপনার ধারণা?

আমার তো তাই মনে হয়।

পুলিশকে এ-কথা বলেছিলেন?

নিশ্চয়।

কেউ তো একজন দয়ানন্দ ভর্মাকে খুন করেছে। অশোক যদি না করে থাকে তবে এ-কাজ কার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয়?

একটু থেমে রামশঙ্করবাবু বললেন, সন্দেহের ওপর নির্ভর করে দু-একজনের নাম যে না করা যায় তা নয়, তবে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলাটা বোধহয় ঠিক নয়।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে-ঠাসতে বলল, একদিক থেকে অবশ্য কথাটা যথার্থ। দয়ানন্দের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

সে আমার বাল্যবন্ধু ছিল।

তিনি নিশ্চয় আপনাকে নিজের মনের-প্রাণের কথা বলতেন? স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর ইদানীংকার অভিমত কী ছিল?

একটু ইতস্তত করে রামশঙ্কর বললেন, সে প্রায়ই বলত, অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে বিয়ে করা ঠিক হয়নি।

তিনি তাহলে স্ত্রীর চালচলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন?

বিলক্ষণ! আগে কয়েকবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ফল না পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়। স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠাবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্যপক্ষের জেদের দরুণ সফল হয়নি।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এক্ষেত্রে ডিভোর্স করে দেওয়া তো সহজ পন্থা ছিল। আইন গ্রাহ্য করে এমন প্রমাণ সংগ্রহ করাও কঠিন হত না।

আমিও সেই পরামর্শ দিয়েছিলাম। রাজি হয়নি। বলত, এমন করলে শহরে মান-সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না। আমার ধারণা, মুখে যাই বলুক, ভেতরে-ভেতরে স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা ছিল।

এবার কিন্তু মূল প্রশ্নে এসে পড়ছি। সুনীতা দেবীর প্রেমিকটি কে? সদানন্দবাবু তো বলতে চাইলেন না। আপনি অন্তত বলুন!

সত্যি কথা বলতে কী, নিজের চোখে আমি তাঁকে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখিনি—অনুমান করেছি।

তাই বলুন।

হাসপাতালের পেছন দিকে যে-ছোট গেট আছে, তাই দিয়ে তাঁকে কয়েকবার বেরিয়ে আসতে দেখেছি। একবার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে দেখে মহিলা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

আপনার ইশারা কি ডাক্তার দ্বিবেদীর দিকে?

আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাই না। তবে তিনি ছাড়া অল্পবয়স্ক বা অবিবাহিত ডাক্তার হাসপাতালে আর কেউ নেই?

আপনি ভাবিয়ে তুললেন! পরিস্থিতি ক্রমেই বিচিত্রভাবে মোড় নিচ্ছে। যা হোক, আপনি কী করেন, রামশঙ্করবাবু?

আমার ট্রান্সপোর্টের বিজনেস আছে। ট্রাকে বিভিন্ন ধরনের মাল ক্যারি করি। বিহার-বেঙ্গল সার্ভিস।

কপিলবাবুর সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। তিনি হয়তো আমাকে কিছু নতুন কথা শোনাতে পারতেন। আচ্ছা, দয়ানন্দের কি ফলাও কারবার ছিল?

আগে তাই ছিল। ইদানীং সামলে উঠতে পারত না বলে ব্যবসা গুটিয়ে এনেছিল। জন-পনেরোর বেশি খাতক ইদানীং রাখত না।

মাত্র পনেরো জন!

সকলেই বড় পার্টি। খাতকের সংখ্যা কম হলেও, চার-পাঁচলাখ টাকার কম খাটত না বাজারে।

এখন আর আপনাকে আটকাব না। পরে দরকার পড়লে...।

নিশ্চয়। খবর দিলেই আমি উপস্থিত হব।

সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে রামশঙ্করবাবু বিদায় নিলেন। বাসব আকাশের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বাড়ির ভেতরটা একবার ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই। চাবি কি আপনাদের কাছে আছে?

যতদূর জানি, চাবি সুনীতা দেবীর কাছে আছে।

হুঁ। চলুন, এবার যাওয়া যাক।

গতরাত্রে বাসবের ভালো করে ঘুম হয়নি। চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খেতে-খেতে শেষরাত্রের দিকে মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছে, ঘটনার গতি কোন পথ ধরে এগিয়েছে। তারপর ঘুম দু-চোখের পাতা ভারী করে তুলেছে। তখন তিনটে, এখন বেলা ন'টা, বিছানা ছেড়ে সবেমাত্র উঠেছে।

গতকাল দয়ানন্দের বাগান থেকে বেরিয়ে বাসব পুলিশ সুপারের বাংলোয় চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সুপার জানিয়েছিলেন, বাড়ির চাবি তাঁদের কাছে নেই, সুনীতা দেবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখবেন। আগামীকাল দুপুরে বাসব কাজ সেরে নিতে পারবে। সঙ্গে থানা ইনচার্জ থাকবেন।

প্রাতঃকৃত্য সেরে বাসব সামান্য কিছু খেয়ে নিল। এখানে পা দেওয়ার পর থেকে লালা আনোখেলালের সঙ্গে দেখা করেনি। ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রলোক তাকে নিয়োগ করেছেন—একবার গিয়ে কথাবার্তা বলে আসা নিতান্ত দরকার। তাঁর বাড়ির উদ্দেশে বাসব রওনা হয়ে গেল।

দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে এসে থানা ইনচার্জ বাসবকে দয়ানন্দের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। প্রথমে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখা হল। মোট আটখানা ঘর আছে। শোওয়ার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা-আলাদা খাট। একবার দেখলেই বুঝতে পারা যায়, তার পরের ঘরটাতেই দয়ানন্দ ব্যবসার কাজকর্ম করতেন।

চেয়ার-টেবিলের ব্যবসা নয়। ফরাস পাতা, মাঝামাঝি জায়গায় নিচু ডেস্ক। ডেস্কের সামনে ডানলোপিলোর কুশন। তার ওপর বসেই গৃহকর্তা কাজকর্ম করতেন। একপাশে রয়েছে ছোট সাইজের স্টিলের আলমারি। দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা কাটা রয়েছে।

বাসব ডেস্কের ডালা তুলল। ভেতরে খবরের কাগজের বিল, পৌরসভার রসিদ, সাংসারিক খরচ লেখার খাতা...এই সমস্ত রয়েছে। এবার স্টিলের আলমারি খোলা হল। নীচের দুটো তাক খালি। ওপরের তাক দুটোয় গোটাকয়েক বাঁধানো খাতা, ফিতে দিয়ে বাঁধা দুটো ফাইল, চেক বুক, ব্যাঙ্ক বুক, ডায়েরি—এইসব।

দয়ানন্দের কোমরেই আলমারির চাবি বাঁধা থাকত। পোড়া কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে ওটাও হাসপাতালে পৌঁছেছিল। পুলিশ পরে হস্তগত করেছে। আলমারিতে লকারও ছিল একটা। বাসব লকারটাই প্রথমে ভালোভাবে পরীক্ষা করল। বড় ও ছোট নোট মিলিয়ে ষোলোশো টাকা আছে, আর আছে কিছু জড়োয়া ও সোনার গহনা এবং একটি রিভলভার—লাইসেন্স অবশ্য আছে। ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজপত্রও রয়েছে।

লকার বন্ধ করে বাঁধানো খাতাগুলো নিয়ে পড়ল বাসব। কোন বছর কাকে কত টাকা ধার দেওয়া হয়েছে তার ধারাবাহিক লিস্ট। আগে প্রচুর লোককে টাকা ধার দেওয়া হত, ইদানীং কমে এসেছে। চলতি বছরের লিস্টে মাত্র একজনের নাম দেখা গেল। খাতা রেখে বাসব ফিতে-বাঁধা ফাইল দুটো খুলল। প্রথমটায় পাওয়া গেল, এই বাড়ি ও শহরে যে-সমস্ত সম্পত্তি আছে তার রেজিস্টার্ড ডিড এবং সুদের কারবার চালাবার সরকারি হুকুমনামা। দ্বিতীয় ফাইলটায় ছিল, চলতি বছরে টাকা ধার দেওয়া সম্পর্কের দলিল। গুনে দেখা গেল আটখানা রয়েছে। বাসব ভুরু কুঁচকে দলিলগুলির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

থানা ইনচার্জ বললেন, কী ভাবছেন?

খাতায় নাম রয়েছে ন'জন খাতকের, অথচ দলিল আছে আটখানা! বাসব আবার খাতা খুলল। দলিলের সঙ্গে কী সমস্ত মিলিয়ে দেখল যেন। তারপর আলমারি বন্ধ করে বলল, এখানে আর কিছু দেখার নেই, চলুন।

সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দুজনে রিকশায় চেপে বসল।

একজনকে আপনাদের আটক করতে হবে।

বিস্মিত থানা ইনচার্জ বললেন, কাকে?

চাকর শ্রেণীর একজনকে। তবে কাজটা এমনভাবে সারতে হবে যাতে তার মালিক বুঝতে না পারে।

আমি কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

থানায় চলুন, সমস্ত বুঝিয়ে বলছি। ভালো কথা, সরকারি পক্ষের উকিল ও আসামী পক্ষের উকিলকে খবর পাঠাবেন—বিশেষ প্রয়োজনে আজ রাত্রিটা আমার সঙ্গে তাঁদের জাগতে হবে। পুলিশ সুপারও অবশ্য থাকবেন। তাঁকে আমিই না হয় বলে রাখব।

রাত সাড়ে বারোটা।

হাসপাতাল কম্পাউন্ডের পিছনের গেট দিয়ে কয়েকজন ছায়ায় গড়া মানুষ ভেতরে ঢুকল। বেশিদূর তারা না এগিয়ে আই ওয়ার্ডের সামনের ঝাঁকড়া গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। হাসপাতালের প্রধান বাড়ির কাছাকাছি যে-সমস্ত ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, তার আভা এতদূর এসে পৌঁছয়নি।

গাছতলা থেকে বেরিয়ে একজন প্রধান বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চুপভাবে। দু-মিনিট, চারমিনিট...ক্রমে দশমিনিট কেটে গেল। সেই লোকটি এবার ফিরে এল গাছতলায়।

কী হল?

নেই।

আর কাউকে দেখলেন?

দারুণ অব্যবস্থা! একজন নার্স পর্যন্ত নেই। শুধু জনকয়েক সুইপার এধারে-ওধারে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ।

ট্রেজারির পেটা ঘড়িতে একটা বেজে গেছে কয়েকমিনিট আগে।

দারুণ মশা কিন্তু।

মশার কামড় খেয়ে আর লাভ নেই! চলুন এবার।

সকলে আই ওয়ার্ডকে ডানদিকে ফেলে এগিয়ে গেল ছোট একটা বাড়ির দিকে। বারান্দায় সকলে ওঠার পর একজন এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারল। ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এরপর ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি চলল। শেষে...।

কে?

দরজা খুলুন।

কে আপনি?

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস কথা বলছি।

মিনিটখানেক পরে দরজা খুলে গেল। আলো যেন চলকে পড়ল বারান্দায়। স্লিপিং সুট পরিহিত ডাক্তার দ্বিবেদী মহা বিরক্তি সহকারে বললেন, এই অসময়ে আপনারা?

বাসব মৃদু গলায় বলল, সুনীতা দেবী কি পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়লেন? ওখানে কিন্তু আমাদের লোক আছে।

আপনারা অনধিকারচর্চা করছেন!

পুলিশ সুপার ততক্ষণে সকলকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। বাসব ছাড়া তাঁর সঙ্গে রয়েছেন থানা ইনচার্জ, সরকারি পক্ষের উকিল, শৈলেন সান্যাল, সদানন্দ এবং রামশঙ্করবাবু।

আমি মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা চানটা কী?

বাসব বলল, অবুঝ হওয়ার চেষ্টা না করে পরিষ্কার কথায় আসুন। আমরা জানি, সুনীতা দেবী অসুখের ভান করে পেয়িংবেডে আছেন এবং প্রতি রাত্রে আপনার কোয়ার্টারে চলে আসেন, আজও এসেছেন।

অসীম বলে নিজেকে সংযত করে ডাক্তার দ্বিবেদী বললেন, বিষয়টি লজ্জাজনক হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে খুব কি দূষণীয়? অপারগ, বৃদ্ধ স্বামীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে সুনীতা যদি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে, তাতে আপনাদের কিছু বলার থাকতে পারে না।

ঠিকই বলেছেন আপনি! অবৈধ প্রেম নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। মুশকিলটা কোথায় হয়েছে জানেন, আপনার প্রেমিকার স্বামী খুন হয়ে বসে আছেন।

আপনারা বলতে চান, আমিই দয়ানন্দ ভর্মাকে খুন করেছি?

এইসময় থানা ইনচার্জ সুনীতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতর থেকে এলেন। লজ্জায় কি না জানা গেল না, তাঁর মুখ অসম্ভব লাল। মাথা তুলছেন না।

বাসব বলল, ও-কথা পরে আসছে। আগে বলুন, আপনারা দুজন পুলিশকে বা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?

কোনও মিথ্যে কথা বলিনি।

আপনার চাকর সন্ধ্যার সময় বাজারে বেরিয়েছিল, তারপর ফিরে আসেনি লক্ষ করেছেন বোধহয়? সে এখন থানায়। তার মুখ থেকে জানা গেছে, ৯ই নভেম্বর শেষরাতে সুনীতা দেবী একাই এসেছিলেন প্রথমে। তারপর আপনার পরামর্শ অনুসারে দয়ানন্দকে এখানে বয়ে আনা হয়। তখন তাঁর ডাইং ডিক্লেয়ারেশন দেওয়ার মতো অবস্থা নয়, আগেই মারা গেছেন। চাকরটা সবই বুঝতে পেরেছিল। সে যাতে কাউকে কিছু না বলে তার জন্যে তাকে আপনি একশো টাকা দিয়েছিলেন। এমন কথাও ছিল, পরে আরও দেবেন।

এবার অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়লেন ডাক্তার দ্বিবেদী। এই শীতকালেও বিন্দু-বিন্দু ঘাম তাঁর সারা কপাল ছেয়ে গেল। কয়েকবার মুখ খুললেন কিছু বলবার জন্য, কিন্তু বলতে পারলেন না।

শেষে ভেঙে-পড়া ভঙ্গিতে বললেন, বিশ্বাস করুন আপনারা, খুন আমি করিনি। সেদিন ভোররাত্রে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে সুনীতা এসে জানাল, দয়ানন্দ ভর্মাকে কে পুড়িয়ে মেরেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে। আমি সুনীতাকে বাঁচাবার জন্যে উতলা হয়ে উঠলাম। শেষে তাকে মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসতে বললাম। ডাইং ডিক্লেয়ারেশনের ব্যবস্থা করে সমস্ত দিক রক্ষা করা যাবে। অশোক শ্রীবাস্তব যে এ-কাজ করেছে সে-সম্পর্কে ধারণা আমাদের মনে কেন জানি না বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কাজেই...।

এতক্ষণ পরে সুনীতা দেবী বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন। নিজেকে সন্দেহমুক্ত করার জন্যেই ওই পথ আশ্রয় করতে হয়েছিল।

আপনিই বোধহয় চালাঘর থেকে মৃতদেহ বের করে এনে গোবর দিয়ে মেঝে নিকিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। খুন বাগানে হয়েছে, পুলিশ এ-কথা জানুক, তাই চেয়েছিলাম।

বাসব বলল, দু-পক্ষের উকিল, পুলিশ এবং দুজন বেসরকারি ভদ্রলোক রামশঙ্কর ও সদানন্দবাবুর সামনে আপনারা স্বীকার করলেন, স্বার্থের জন্যে একজন নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন! আমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি—আমার মক্কেল অবশ্যই ছাড়া পাবেন। পুলিশ সুপার স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন, আপনাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব এখন তাঁর।

সুনীতা বা দ্বিবেদী আর কিছু বলতে পারলেন না।

সদানন্দ এতক্ষণ পরে বললেন, এবার আমি বাড়ি যেতে পারি কি?

নিশ্চয়, আপনারা এবার যেতে পারেন।

সদানন্দ ও রামশঙ্করবাবু বিদায় নিলেন।

শৈলেন সান্যাল বললেন, খুন কে করেছে, তা এখনও বোঝা গেল না।

মৃদু হেসে বাসব বলল, আইনজ্ঞ হিসেবে এ-কথাটা আপনার বলা ঠিক হচ্ছে না। কে খুন করেছে এ-কেসের স্ট্যান্ড কিন্তু তা নয়। অশোক শ্রীবাস্তব খুন করেছেন কি না, সেটাই হল প্রশ্ন। এখন আমরা প্রমাণ করতে পারব তিনি নির্দোষ।

সুপার বললেন, তা ঠিক! তবে হত্যাকারীকে ধরার জন্যে তো পুলিশকে উঠে-পড়ে লাগতে হবে। আপনি কি এ-সম্পর্কে কোনও আঁচ পাননি?

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল, আঁচ কেন? আমি তো জানি কে খুন করেছে।

জানেন আপনি?

জানি বইকী।

কে?

দয়ানন্দ ভর্মার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রামশঙ্করবাবু।

এইমাত্র যিনি চলে গেলেন? ওঁকে যেতে দিলেন কেন?

কী করব বলুন? প্রমাণ কই? আপনারা অবশ্য সত্যি উঠে-পড়ে লাগলে প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। পরে হাতকড়া তো রইলই।

সমস্তই কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। খুলে বলুন।

দয়ানন্দের ব্যবসায়িক খাতায় দেখলাম, মাত্র মাসদেড়েক আগে রামশঙ্কর পঁচাত্তর হাজার টাকা ধার নিয়েছেন। এরপর দলিলগুলো দেখলাম, হিসেবমতো সমস্তই রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁর টাকা ধার নেওয়ার দলিলটা নেই। বুঝলাম, টাকাগুলো মেরে দেওয়ার জন্যে তিনি বন্ধুকে সরিয়েছেন। দয়ানন্দ খুন হলে তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না, সন্দেহ করবে সুনীতা দেবী বা অশোক শ্রীবাস্তবকে। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা সর্বাঙ্গসুন্দর হত, যদি তিনি ব্যবসায়িক খাতাটাও সরিয়ে ফেলতেন। তাহলে কখনওই বুঝতে পারা যেত না, তিনি এত টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, যে-কোনওভাবেই হোক রামশঙ্কর জানতে পেরেছিলেন, সেদিন শেষরাত্রে দয়ানন্দ বাগানে আসবেন। ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। প্রথম সুযোগেই আঘাত করেন। চাবিটি হাতিয়ে ঘরে গিয়ে দলিলটা বের করে নেন। তারপর আহত দেহটা করোগেটের শেড দেওয়া ঘরে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তবে এখনও বুঝতে পারিনি, খুন করার অনেক সহজ পন্থা ছিল, আগুনে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা তিনি কেন করেন। কিন্তু আর কথা নয়, এবার আমি হোটেলে ফিরব।

মিস্টার সান্যাল, কাল সকালে আমার পেমেন্ট যাতে রেডি হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করবেন।—আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মাসিক গোয়েন্দা
পুজো সংখ্যা, ***১৯৭১***



খুন-খুন খেলা

অসিত মৈত্র

রহস্য কাহিনীর পাতায়-পাতায় অনেক খুনের গল্পই আপনারা পড়ে থাকেন। সেইসব গল্পের গোয়েন্দাদের দক্ষতা কী অসাধারণ! কত নিপুণ তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা! যে-কোনও জটিল চক্রান্তের বেড়াজাল তারা অনায়াসে বুদ্ধির ছুরি দিয়ে কেটে দু-ফাঁক করে দিচ্ছে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না। মঁসিয়ে দ্যুপাঁ, শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারো, মিস মারপল, ব্যোমকেশ বক্সী—এঁদের কাজ-কারবার তো রীতিমতো ভেলকি বলেই মনে হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কী, সাহিত্যের পাতা থেকে বাস্তব পৃথিবীটার ফারাক প্রায় আশমান-জমিন। এই সমস্ত খুনের গল্পের জমকালো গোয়েন্দাদের যদি বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে পৃথিবীর খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে দেখবেন দু-দিনেই তাঁদের খ্যাতির ফানুস ফেটে চুপসে গেছে। দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রায়ই তো সেইসব বিকৃত দেহের ছবি ছাপা হয়, রেললাইনের ধারে বা জংলা মাঠের মধ্যে যাদের মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন, হত্যাকারীর হদিস পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সঠিক পরিচয়টাই খুঁজে বের করতে পারে না পুলিশ। তা ছাড়া, পথে-ঘাটে খুন তো আকছারই ঘটছে। তার মধ্যে কতগুলোর কিনারা হচ্ছে, আর কতগুলো পুলিশের ফাইলের চাপে পড়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাচ্ছে তারই বা সঠিক হিসেব রাখছে কে!

এই যেমন আমার কথাই ধরুন না। এ-পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে, কচি-বুড়ো মিলিয়ে মোট পাঁচটা খুন করেছি আমি। রাঁচির পাগলাগারদে বসে আমি আপনাদের গল্প শোনাচ্ছি ভেবে হাসবেন না। আমি এই শহর কলকাতার একজন স্বাধীন নাগরিক। যদি জিগ্যেস করেন, আমাদের সরকার কি এতই বেহেড যে, এমন একখানা খাসা স্বীকারোক্তি পাওয়ার পরও তারা এখনও আমায় গ্রেপ্তার করছে না? অবশ্য সেদিকটাও আমি বেশ ভালো করে ভেবেচিন্তে রেখেছি। তাদের কাছে এটাকে সোজা গপ্পো বলেই চালিয়ে দেব। গপ্পো লেখার অধিকার তো আপনার-আমার সকলেরই আছে।

তবে এমন মনে করবেন না, আমি একের-পর-এক এতগুলো খুন করে গেলাম আর পুলিশের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগল না। প্রথম খুনটার পর তো তারা আমাকে যথেষ্টই নেকনজরে দেখতে শুরু করেছিল। জাঁদরেল দারোগা প্রকাশ মিত্তির বার-দু-তিন আমার ডেরায় এসে হানা দিল। জেরায়-জেরায় আমাকে একবারে জেরবার করে তুলতে চাইল। কেন এসেছিল? কোথায় গেল? রোজ আসত কি না? আমার সঙ্গে মেয়েটার কীরকমের সম্পর্ক? কী-কী কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে? এই সমস্ত সাত-সতেরো নানান ধরনের

প্রশ্ন। কিন্তু আমিও তেমন কাঁচা ছেলে নাকি! সবক'টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি হিসেব করে। শেষকালে একসময় মুখ চুন করে আস্তে-আস্তে উঠে গেল প্রকাশ দারোগা। এর পরেও অবশ্য কিছুদিন ফেউ-এর মতো লেগে রইল আমার পিছু-পিছু, তবে তাতে কাজ কিছু হয়নি, শুধু হয়রানিই সার হয়েছে।

আমাকে যদি আপনারা সাধারণ আর-পাঁচটা পেশাদার খুনির মতো মনে করেন, তা হলেও মস্ত ভুল করবেন। দস্তুরমতো ভদ্রঘরের ছেলে আমি। লেখাপড়া শিখে বি. এসসি. পাশ করেছি। খুন করা আমার পেশা নয়। তবে ইদানীং সুবিধেমতো এবং মনের মর্জিমাফিক দু-চারটে খুন আমি করেছি। লীনাকে দিয়েই আমার খুনের হাতেখড়ি। এখন অবশ্য মাঝে-মধ্যে মেয়েটার জন্যে যে একটু-আধটু মনখারাপ না হয় এমন নয়। আমাকে আপনারা এতটা নিষ্ঠুর ভাববেন না। কিন্তু কথায় আছে, নিয়তির লিখন কে খণ্ডাবে? আমি তো ছার নিমিত্ত মাত্র! এই লীনাকেই তো একদিন বুকভরে ভালোবাসতাম আমি। কলেজ-জীবনের সেই স্বপ্নমদির দিনগুলোর কথা কি ভোলা যায়! লীনার যেদিন বিয়ে হয়ে গেল সেদিন আমার গোটা হৃদয় কি শূন্য হয়ে যায়নি? আমার বুকের ভেতরকার আকাশ-পাখিটা কী অসহ্য যন্ত্রণাতেই না ভগ্নপক্ষ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল বাস্তব পৃথিবীর কঠিন মাটির ওপর! তবে সময়ই সব ব্যথা মুছে নেয় মন থেকে। ক্রমে-ক্রমে আমার বুকের ওপরও বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দিল সে।

ছেলেবেলায় বাবাকে কবে হারিয়েছি সঠিক মনে পড়ে না। তাঁর মৃত্যুর পর প্রভিডেন্ট ফান্ড আর লাইফ ইনশিয়োরেন্সের একটা থোক টাকা এসে পড়ল মায়ের হাতে। তার ওপর নির্ভর করেই মা আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দুঃখের সংসারের তিলমাত্র আঁচটুকুও কখনও আমার গায়ে লাগতে দেননি। আমার মা ছিলেন যথেষ্ট মিতব্যয়ী প্রকৃতির। তাই বাবার মৃত্যুর পর আঠেরো বছর সংসার চালিয়েও সেই টাকার তখনও কিছু অবশিষ্ট রেখে যেতে পেরেছিলেন ব্যাঙ্কে।

লেখাপড়ায় কোনওকালেই আমি নেহাত খারাপ ছিলাম না। মায়ের নিজের বিদ্যের দৌড় 'কথামালা' আর 'বোধোদয়' পর্যন্ত। কিন্তু ছেলের পড়াশুনোর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রচণ্ড সজাগ। প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমাকে পড়তে বসিয়ে নিজেও বসে থাকতেন কাশীরাম দাসের মহাভারতখানা কোলে টেনে নিয়ে। আমি কী পড়ছি সেটা হয়তো সবসময় বুঝতেন না, কিন্তু পড়ায় আমার মন আছে কি না তা ঠিক বুঝতে পারতেন। আর পাছে নষ্ট হয়ে যাই সেই আশঙ্কায় বাইরের কোনও ছেলের সঙ্গে আদৌ মিশতে দিতেন না আমায়। তাই মা ছাড়া আমার বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ ছিল না।

স্কুল-জীবনটা মায়ের কড়া নজরের মধ্যে দিয়েই কাটাতে হয়েছে আমাকে। তারপর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একসময় কলেজে এসে ঢুকলাম। ছেলে এবার বড় হয়ে উঠেছে দেখে মায়ের প্রখর দৃষ্টি একটু-একটু করে শিথিল হয়ে এল। তবুও ফার্স্ট ডিভিশনেই আই. এসসি. পাশ করলাম।

লীনা যখন আমাদের কলেজে প্রথম অ্যাডমিশন নিল তখন আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বড়লোকের মেয়ে। দেখতে-শুনতেও বেশ ভালো। তাই সকলেই একটু বুক ফুলিয়ে চলার চেষ্টা করত ওর সামনে দিয়ে। আর রূপবান ধনীর দুলালেরও অভাব ছিল না আমাদের কলেজে। কিন্তু অদৃষ্টের কী অদ্ভুত পরিহাস—হঠাৎ একদিনের আলাপের পর থেকে কেন জানি না, আমার সঙ্গেই তার সম্পর্কটা নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল ধীরে-ধীরে।

নারী-চরিত্রের বিচিত্রতম দুর্গমতার অন্ত আমার অজানা। তাই আমার প্রতি লীনার এই আকর্ষণের কারণ খোঁজার চেষ্টা করিনি কখনও। তার এই ভালোবাসাকে সহজ, সত্য এবং স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমি বরাবর নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে সঙ্গী বলতে মা ছাড়া আমার কেউ ছিল না। লীনার সঙ্গ আমায় কোন অপার্থিব আনন্দলোকে নিয়ে গেল! সে যে কী আনন্দ, ভাষায় তাকে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমার দিন-রাতের সমস্ত স্বপ্ন লীনাকে ঘিরে উদ্বেল হয়ে উঠল।

বুঝতেই পারছেন, আমার দেহ-মনে তখন নবীন যৌবনের জোয়ার। বয়েস কম—অভিজ্ঞতা কম। বাস্তব পৃথিবীর কঠিন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি একবারও। এই অবস্থায় কল্পনার পাখা কত না সুদূর-বিস্তৃত হয়।

আর, এই স্বপ্নগুলোর ওপর দিয়ে যেন দিনগুলো বরাবর হেঁটে চলেছে....হেঁটে চলবে, ভাবতে ভালো লাগে।

সেবারে গরমের ছুটিতে লীনারা দার্জিলিং বেড়াতে গেল। লীনার যদিও যাওয়ার ইচ্ছে আদৌ ছিল না, কিন্তু বাড়ির সকলেই যখন যাচ্ছে তখন কোন ছুতোয় বা সে কলকাতায় পড়ে থাকবে! অগত্যা মা-বাবার সঙ্গে তাকেও যেতে হল। যাওয়ার আগের দিন লীনা নিজে থেকেই আমাকে আউটরাম ঘাটে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে কলেজে গরমের ছুটি পড়বে। বিকেলের ক্লাস শেষ করে লীনা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। গঙ্গার ধারে একটা নির্জন বেঞ্চে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম আমরা। দুজনের বুকের ভেতর এত বেশি কথা এসে ভিড় করছিল যে, সেগুলোকে ধীরে-সুস্থে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কেউ। শুধু এক অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করে গুমরে-গুমরে কেঁদে মরছিল মনটা। একটু-একটু করে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল তাকিয়ে দেখিনি। আমাদের স্বপ্নের দিনগুলোর ওপরও বুঝি নিয়তি সন্ধ্যার কালো ছায়া টেনে দিল।

মাস-দেড়েক বাদে যখন লীনা ফিরে এল, তখন আর তাকে যেন চেনাই যায় না। আপেলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর নিটোল গালদুটো। সারা গায়ে টসটস করে ফেটে পড়ছে গোলাপি আভা। শুধু চেহারাতেই নয়, ইতিমধ্যে হাবভাব, স্বভাব-চরিত্রেও যেন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর। কলেজের করিডরে আমাকে দেখে আড়ষ্ট, ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ। কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে চলে গেল দ্রুতপায়ে। আমি ব্যথা-বিস্মিত দু-চোখ তুলে তাকিয়ে রইলাম ওর চলে-যাওয়া পথের দিকে।

এর পরের দিন থেকে লীনা আর কলেজেই এল না। শুনলাম, ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র এক তরুণ ডাক্তার। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথে আলাপ হয়েছে দুজনের। তারপর ছেলেটা সুযোগ বুঝে আত্মীয়তা পাতিয়ে নিয়েছিল ওদের পরিবারের সঙ্গে। লীনার বাবাও মৃদু হেসে প্রসন্ন মনে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাকে। এর মাসখানেক বাদে বিয়ে হয়ে গেল ওদের।

আমার সে-দিনগুলোর কথা আপনাদের বোঝাই কেমন করে! দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়, হতাশায় সমস্ত বিশ্বটাই ঝাপসা হয়ে এল দু-চোখের সামনে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বটাও বুঝি আর টের পাচ্ছিলাম না নিজের মধ্যে। পাগলের মতো দিনকতক ঘুরে বেড়ালাম সকাল-সন্ধে। তারপর একসময় লীনার স্মৃতিটা ঘুমিয়ে পড়ল বুকের গভীরে।

আমি যেবার কলেজ থেকে পাশ করে বেরোলাম, সেই বছরের ডিসেম্বরে মা-ও গত হলেন। এতদিন ধরে মাকে দেখে আসছি, কিন্তু তাঁর যে মরবার মতো বয়েস হয়েছে, এ-কথা কখনও ভাবিনি। তাই প্রথমটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মনে হল, এই দুনিয়ায় আমার আর কোনও প্রয়োজনই নেই। সকলের মধ্যে থেকেও আমি যেন সম্পূর্ণ একা। সঙ্গীহীন, সাথীহীন একক নিঃসঙ্গ জীবন। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই সময় কাটিয়ে যাওয়া।

মনের যখন এইরকম অবস্থা সেইসময় একদিন হঠাৎ ট্রামের মধ্যে নীরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুনলাম, টালিগঞ্জে ও এখন একটা পোলট্রি ফার্ম ফেঁদে বসেছে। কী খেয়াল চাপল, নীরেনের সঙ্গে ওর পোলট্রি দেখতে গেলাম। তারপর থেকে আমার মাথাতেও পোলট্রির মতলব ঘুরে বেড়াতে লাগল। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে আমাকে একটা উপায়ের ব্যবস্থা দেখতে হবে। আর শহরের ভিড়ে চাকরি করে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই আমার অসহ্য লাগে। হিসেব করে দেখলাম, ব্যাঙ্কে এখনও হাজার পনেরোর মতো অবশিষ্ট পড়ে আছে। সেই টাকা দিয়েই একটা চান্স নেব ঠিক করলাম। সব যদি ডুবেও যায় তাতেই বা ক্ষতি কী? আমি এখন কোনও কিছুরই পরোয়া করি না।

এইসব ভেবেচিন্তে দিনকতক নীরেনের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। পোলট্রি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল আমার। তারপর আমার কাজ শুরু করলাম।

এদিক থেকে ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নই বলতে হবে। প্রথমে টলমল করলেও আস্তে-আস্তে আমার ফার্ম নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল। আমিও দিনরাত এই ফার্ম দিয়েই পড়ে রইলাম। শহরের এক নির্জন প্রান্তে

একা-একা দিনগুলো মন্দ কাটছিল না।

চার বছরের মধ্যে আমি আমার পোলট্রিটাকে মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গড়ে তুললাম। কাঠা-ছয়েক জমি নিয়ে আমার এই পোলট্রি। চারধারে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। মুরগিদের জন্যে জাল দিয়ে ঘেরা দুটো বিরাট খাঁচা। এককোণে অ্যাসবেসটসের শেড দেওয়া আমার থাকার আস্তানা। বারান্দার একধারে ইনকিউবেটর, আর মুরগিদের জন্যে মাংসের কিমা বানাবার প্রমাণ সাইজের সেই মেশিনটা। যদিও আমার ছোট ফার্মের পক্ষে এত বড় মেশিনের দরকার ছিল না, তবে পার্ক স্ট্রিটের এক নিলামের দোকানে জিনিসটা খুব সস্তায় পেয়েছিলাম বলেই কিনে এনেছিলাম।

সেটা শরৎকাল। আকাশ থেকে হিম-হিম ঠান্ডা ঝরছিল সন্ধেবেলা। আমার সারাদিনের কাজের লোক তিনকড়িও ছুটি নিয়ে চলে গেছে কিছু আগে। একা-একা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একটা বিলিতি ক্রাইম নভেলের পাতা ওলটাচ্ছিলাম অলসভাবে। খুব বেশি আগ্রহ ছিল না বইটার ওপর। এমনসময় সদরে কলিংবেলের আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, ছোট একটা সুটকেস হাতে লীনা দাঁড়িয়ে। লীনা যে আবার কোনওদিন আমার কাছে আসবে, আবার কোনওদিন আমি ওর দেখা পাব, সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার বিমূঢ়, বিস্মিত চোখের সামনে লীনা দাঁড়িয়ে ছিল।

আরও কিছুক্ষণ বাদে লীনাকে আমি ঘরে এনে বসালাম। ওকে দেখে আমার মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, না বেদনায় নীল হয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার সমস্ত অনুভূতি একবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। লীনার সঙ্গে কোনও কথাই বলতে পারলাম না।

আমার পেছন-পেছন লীনাও ঘরে এসে ঢুকল। প্রথমে একটু ইতস্তত করল। তারপর আমার অনুমতি নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। যদিও তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কেননা, এই অসময়ে কেউ কোনওদিন আমার কাছে আসে না।

প্রথম কথা কে বলবে লীনা বোধহয় তাই ভাবছিল। দু-একবার ঢোক গিলল। মুখ ফুটে কী যেন বলতে গেল। তারপরই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যাওয়ার পর আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এই ক'বছরে বেশ খানিকটা ভারী হয়ে পড়েছে লীনা। দু-চোখের তারায়-তারায় ঝকমকে হাসির ছটাও কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মুখটাও আরও বেশি স্থূল। এরমধ্যে পুরোপুরিই বদলে গেছে লীনা! ওকে দেখতে এখন আমার ভীষণ বিশ্রী লাগল। ওর এই কান্নাটাও যেন রং-মাখা অভিনেত্রীর ছলাকলা। চোখের জলে মুখের প্রসাধন ধুয়ে গিয়ে ওকে আমার রীতিমতো অসহ্য লাগছিল।

আমার তখন সময়ের কোনও হুঁশ ছিল না। কতক্ষণ ও ফুলে-ফুলে কাঁদল তাও জানি না। অবশেষে একসময় বর্ষণ-ক্লান্ত লীনা একটু-একটু করে থেমে-থেমে ওর নিজের কথা বলল।

ওদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম ক'টা বছর নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে দিয়েই কেটেছিল। আদরে-সোহাগে ওর স্বামী ওকে ভরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু চিরটাকাল কবে কার একভাবে কেটেছে! ওদের স্বপ্ন-রঙিন প্রেমের আকাশেও অবসাদের কালো মেঘ জমে উঠল। ওর তরুণ স্বামী ডাক্তার অরুণাংশু নবাগতা এক নার্সের আকর্ষণে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ল। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা সে গোপন রাখার চেষ্টা করত। লীনাকে কিছু বুঝতে দিত না। কিন্তু ক্রমশই তার সে-ভাব কেটে গেল। অরুণাংশু এখন প্রকাশ্যেই সেই নার্সকে নিয়ে ঘোরাফেরা করে। নাইট শো-তে চৌরঙ্গি পাড়ায় সিনেমা দেখতে যায় দুজনে। অনেক রাতে আকণ্ঠ মদ গিলে টলতে-টলতে বাড়ি ফেরে। লীনা মরে গেলেও কিছুতেই অমন একটা লম্পট লোকের ঘর করতে পারবে না। ইতিমধ্যে এক উকিলকে দিয়ে কোর্টে ডিভোর্সের আবেদন জানাবার ব্যবস্থা করেছে ও। তারপর অনেক খুঁজে আমার বর্তমান আস্তানার সন্ধান পেয়েছে। ও এখন নতুন করে আবার আমায় ফিরে পেতে চায়।

একটু-একটু করে থেমে-থেমে লীনা ওর নিজের কথা বলছিল। ওর নিজস্ব যা কিছু অলঙ্কার সব এই সুটকেসের মধ্যে ভরে নিয়ে এসেছে। এখন এটা আমার কাছে রেখে যাবে। হপ্তাখানেক বাদে ও যখন

অরুণাংশুকে সবকিছু জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে, তখন যদি এগুলো নিয়ে কোনও গন্ডগোল বাধে, সেইজন্যেই আগে থেকে এই সাবধানতা।

লীনাকে দেখে, লীনার কথা শুনে, আমার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। ভাবলাম, এ কী উটকো ঝঞ্ঝাট হঠাৎ করে আমার ঘাড়ে এসে চাপল! আমার নির্জন শান্তির প্রাঙ্গণে এই স্থূল আপদটা তবে কি চিরকাল অনড় হয়ে বসে থাকবে! কিন্তু লীনাকে আমি ফেরাই কোন মুখে? বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে ও আজ আমার কাছে এসেছে। বিপদে পড়ে ছুটে এসেছে লীনা। কোন মুখে আমি ওকে ফিরে যেতে বলব!

ভাবতে-ভাবতে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। প্রথম যৌবনে ভালোবাসার যে-পাখিটা বুকের মধ্যে মরে গেছে, হাজার বসন্তের ডাকেও সে আর কখনও সাড়া দেবে না। একটা জটিল প্রশ্নের জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো লীনা আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি এর সমাধান করব কোন পথে?

লীনা আমার মনের অবস্থা ঠিকমতো অনুভব করতে পারেনি। সেদিকে কোনও নজরই ছিল না ওর। ছটফট করতে-করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ভাবনা-চিন্তার গ্রন্থিগুলো সব যেন জট পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। অতিরিক্ত রক্তের চাপে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল কান দুটো। আর লীনা তখনও টেবিলে মুখ গুঁজে আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসেছিল।

আমি যখন ঘুরতে-ঘুরতে ওর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালাম, তখনও লীনা আমার দিকে চোখ তুলে চায়নি। মাঝে-মাঝে শুধু বোবা কান্নার দমকে থরথর করে কেঁপে উঠছিল ওর সারা শরীরটা। কিন্তু আমি আর সে-দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না। সবল পেশল দুটো হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ওর গলাটা টিপে ধরলাম।

না.....না, আমি ওকে ফিরে যেতে বলব কেমন করে?

লীনা প্রথমটা ধড়ফড় করে উঠল। ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে বোধহয় বুঝতে পারেনি। তারপরই আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জোর করে। কিন্তু ওর সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দাঁতে দাঁত চেপে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে আমি ওর গলাটা টিপে ধরেছিলাম। ধীরে-ধীরে লীনার মাথাটা নেতিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। আর আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আমার সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছিল দরদরিয়ে।

লীনাকে খুন করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনও বোধশক্তি ছিল না। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে নেশাচ্ছন্নের মতো বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর ক্রমে-ক্রমে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

আমি যে কী করলাম আর কেনই-বা করলাম ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। তুহিন শীতল ভয়ের একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল দেহের শিরায়-শিরায়। লীনার মৃতদেহটা সাক্ষাৎ যমদূতের মতো ঘাড় মটকে পড়ে আছে চোখের সামনে। ওকে যতই দেখতে লাগলাম, ততই ভয়ে আড়ষ্ট হতে শুরু করল আমার সর্বাঙ্গ। একবার ভাবলাম, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু কোথায় যাব? কোথায় গেলে এই বীভৎসতার হাত থেকে নিস্তার পাব? এই দুনিয়াটা যে বড়ই ছোট! তা ছাড়া, আমার মনে হল, আমি যেখানেই যাই না কেন, লীনা নিশ্চয়ই তাড়া করে ফিরবে আমার পেছন-পেছন। কোনওদিনই ও আমাকে মুক্তি দেবে না।

মার খেতে-খেতে মানুষ একসময় মরিয়া হয়ে ওঠে। ভয়ের হাতে মার খেতে-খেতে আমিও এবার মরিয়া হয়ে উঠলাম। যেভাবেই হোক না কেন, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। দু-হাত দিয়ে ভয়কে প্রতিরোধ করে দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালাম, আর আশ্চর্যরকমভাবে আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিগুলো ক্রমশই তীক্ষ্ণ আর সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। একাগ্র চিত্তে আমি উদ্ধারের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হলাম। এত রাতে আমার আস্তানায় যে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব, এইটুকু অবসরের মধ্যেই আমার অপকর্মের সমস্ত চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে।

প্রথমে ভাবলাম, লীনার মৃতদেহটা কোথাও গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসি। কিন্তু পরে মনে হল, তাতে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর। শেয়াল-কুকুরের দৌরাত্ম্য তো আছেই! ওরা কোনওভাবে একবার যদি টের পায়, তবে ঠিক টেনে-হিঁচড়ে সেটাকে মাটির তলা থেকে বের করে আনবে। তা ছাড়া, লীনা বাড়ি ফিরে না গেলে ওর স্বামী অরুণাংশু নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে। আর পুলিশও লীনার খোঁজ করতে-করতে আমার পোলট্রি পর্যন্ত এসে হাজির হবে। এ-পর্যন্ত তারা লীনার হদিশ করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তারপর যে লীনা কোথায় হারিয়ে গেল তার কোনও খোঁজই তারা পাবে না। ফলে ওদের সমস্ত সন্দেহটা এসে পড়বে আমার ওপর। আমি যে লীনাকে খুন করতে পারি এ-কথাও তাদের মনে হবে। আর, খুন করার পর লীনার দেহটা কাছাকাছি কোথাও পুঁতে ফেলাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক। ওরা তখন সেটার সন্ধান করতে শুরু করবে। তাই আমি ভুলেও এ-পথ মাড়াব না বলে ঠিক করলাম।

তবে আমার মুক্তির উপায় কি হবে না? কোন কুক্ষণেই যে লীনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! নিজের মৃত্যু দিয়েও লীনা আমায় এ কোন বিপদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিল! মনে হল, লীনা যেন ছল করে টেবিলে মাথা গুঁজে নিষ্ঠুরভাবে হেসে চলেছে আমাকে ব্যঙ্গ করে। আমার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রাহুর মতো গ্রাস করে নেওয়ার জন্যেই বুঝি ওর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে। বারে-বারে ও এসে আমার সব সোনার স্বপ্নকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভাবতে-ভাবতে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছিল। এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে! আর, ঠিক সেই মুহূর্তে মেশিনটার কথা আমার মনে পড়ল। মুরগিদের খেতে দেওয়ার জন্যে মাংস কিমা করার বিরাট মেশিনটা তো আমার নাগালের মধ্যেই রয়েছে। সাতশো লেগহর্ন আর পাঁচশো রেড আইল্যান্ডের জন্যে মাসে দু-বার মাংসের ব্যবস্থা করতে হয়।...পৈশাচিক আনন্দে আমার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বিপদের উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে আমার মনটা এতক্ষণে বুঝি কোনও নিরাপদ বন্দরের আশ্রয় পেল। নিষ্ঠুর আগ্রহে লম্বা ধারালো ছুরিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে প্রস্তুত হলাম আমি।

সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজটা শেষ করতে ঘণ্টা তিন-চার সময় লাগল আমার। একটা বড় ঝুড়ির মধ্যে দলা-পাকানো কিমা করা মাংসের তালগুলোকে জড়ো করলাম। লীনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ওর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় ঘরের মধ্যে চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে উঠেছিল। নিজের হাতে ধুয়ে-মুছে সাফ করলাম সবকিছু।

এতখানি অমানুষিক পরিশ্রমের পর স্বভাবতই আমার হাত-পা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল। চোখের পাতা দুটোও অসহ্য ভারী-ভারী ঠেকল। আপাতত আমার কর্তব্য শেষ। বাকি কাজটুকু খুব ভোরে উঠে সেরে ফেলতে হবে। ঘড়িতে পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার দু-চোখ জুড়ে ঘুমের ঘোলা বন্যা নেমে এল।

পাঁচটা বাজার মিনিট-দুয়েক আগেই আপনা থেকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার অবচেতন মন থেকে কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল। মুরগিগুলো দু-একটা করে তখন সবে ভোরের ডাক ডাকতে শুরু করেছে। বারোশো মুরগিদের মধ্যে আমি এক বিরাট ভোজ লাগিয়ে দিলাম। আশাতীত সৌভাগ্যে ওরা বেশ মশগুল হয়ে উঠল। আধঘণ্টার মধ্যে লীনার দেহের শেষ চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে।

যাক!...এতক্ষণ পরে আবার আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সবচেয়ে কঠিন সমস্যার নিখুঁত সমাধান আমি করতে পেরেছি। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন থেকেও বিপদের অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করল। ভোরবেলার তরুণ সূর্য নতুন করে আশার আলো জ্বালিয়ে দিল বুকের মধ্যে। এখন আর আমার কোনও ভয় নেই।

নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে এসে এবার লীনার সুটকেসটা খুলে দেখতে বসলাম। একজোড়া নেকলেস, গন্ডাকতক ইয়াররিং, আংটি, চুড়ি এবং এই জাতীয় আরও অনেক অলঙ্কারে ছোট্ট সুটকেসটা পুরো ঠাসা।

কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার জিনিস তো হবেই! কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, সেগুলোর ওপর বিন্দুমাত্র লোভও আমার হল না। বরং লীনার জিনিস বলে কেমন এক ধরনের বিতৃষ্ণার ভাব জাগল মনের মধ্যে। আর তা ছাড়া, পুলিশ যে লীনার খোঁজ করতে-করতে আমার আস্তানা পর্যন্ত এসে হাজির হবে সে-বিষয়ে আমি প্রায় একশো ভাগ নিশ্চিত। তখন যদি গয়না-ভরতি এই সুটকেসটা তাদের হাতে তুলে দিতে পারি, তা হলে টাকার জন্যে আমি যে লীনাকে খুন করিনি এটুকু অন্তত তারা বুঝতে পারবে। লীনাকে খুন করার পেছনে আমার আর কী মোটিভ থাকতে পারে তার কোনও হদিশই তারা খুঁজে বের করতে পারবে না। পুলিশের সন্দেহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। এ-সুযোগ আমি হেলায় হারাতে পারি না। তাই সযত্নে লীনার সুটকেসটা আয়রন সেফের মধ্যে তুলে রাখলাম।

এর পরের দিন থেকেই আমি মনে-মনে পুলিশের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এই একটি মাত্র বিপদের ঘাঁটি এখন আমায় পার হয়ে যেতে হবে। তারপর আবার আমি আগেকার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনে ফিরে যেতে পারব। বুকের মধ্যে থেকে এই অস্বস্তির কাঁটাটা যত তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায় আমার পক্ষে ততই মঙ্গল।

পুলিশ এসে আমায় কোন ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, আমিই বা তার কী জবাব দেব, সে-সম্পর্কেও নিজেকে ভালো করে তালিম দিয়ে রাখলাম। অবশ্য, ওরা যে আমায় এত সহজে রেহাই দেবে না, তা আমি জানি। একবার যখন ওদের সন্দেহ আমার ওপর এসে পড়বে, তখন জেরায়-জেরায় আমাকে আরও নাজেহাল করে ছাড়বে। কথার মারপ্যাঁচে কখন যে কী করে বসব তার ঠিক কী? কিন্তু বুদ্ধির খেলায় আমায় জিততেই হবে। দক্ষ দাবাড়ুর মতো আমার প্রতিটি চালই নির্ভুল হওয়া চাই। এর ওপরই আমার জীবন-মরণ সর্বস্ব নির্ভর করছে।

এই ঘটনার সতেরো দিন বাদে বরানগর থানার জাঁদরেল দারোগা প্রকাশ মিত্তির আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। খুব সমাদর করেই তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকে প্রকাশ মিত্তির প্রথমে মাথা থেকে টুপি খুলে টেবিলের ওপর রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল। তারপর লীনা যে-চেয়ারে বসে ধরাধাম ত্যাগ করেছিল সেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। আমি তিনকড়িকে চা আর জলখাবারের কথা বলে দিয়ে তার সামনে গিয়ে বসলাম।

আপনি মিসেস লীনা বোসকে চেনেন? ডাক্তার অরুণাংশু বোসের স্ত্রী?

আমি চেয়ারে বসতে-না-বসতেই প্রকাশ দারোগা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমায় জেরা শুরু করে দিল।

কেন বলুন তো? —আমার গলায় যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগের সুর। —দিন পনেরো আগে লীনা একবার আমার এখানে এসেছিল। আর শুধু চেনেন বলছেন কী, লীনা তো একসময় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল! আমরা দুজনে একই কলেজে পড়তাম।

আপনার এখানে তাহলে তিনি প্রায়ই আসতেন, বলছেন?

না...না, প্রায় আসতে যাবে কেন! বিয়ের পর লীনার সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা।

তবে যে বললেন লীনা দেবী আপনার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু? তা হলে কি তিনি মাঝে-মধ্যে এখানে আসতেন না?

এবারে আমার গলায় খানিকটা রাগের সুর ফুটিয়ে তুললাম। বেশ ঝাঁজালো স্বরে বললাম, কলেজ-জীবনে আমাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু সেই সূত্রে বিয়ের পরও লীনা আমার এখানে আসত এমন আজগুবি খবর আপনি জোটালেন কোত্থেকে? তা ছাড়া, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে-সম্পর্কেও দেখছি আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে!

আমার শেষের কথাটায় বুঝি একটু আঁতে ঘা লাগল প্রকাশ দারোগার। এভাবে কথাটা বলা যে উচিত হয়নি সেটা তার মগজে ঢুকল। তাই একটু নড়েচড়ে বসে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বলল, আহা...আপনি একটুতেই এত চটে উঠছেন কেন! দিনরাত চোর-ডাকাতদের সঙ্গে কারবার করতে হয় কিনা, তাই আমাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণও কিছুটা কাটখোট্টাগোছের হয়ে গেছে। ওটাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করবেন না।

এখন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, হপ্তাদুয়েক হয়ে গেল লীনা দেবীর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধান করে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে এখানে আসার জন্যেই তিনি শেষ বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই মিসেস বোসের আর কোনও হদিশ নেই। তিনি এখানে আদৌ এসেছিলেন কি না, যদি এসে থাকেন তবে তারপরই-বা কোথায় গেলেন, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল জানার বিষয়।

এমনসময় চা-জলখাবার হাতে নিয়ে তিনকড়ি ভেতরে ঢুকল। চায়ের সঙ্গে ডবল ডিমের ওমলেট চিবোতে-চিবোতে প্রকাশ মিত্তির আমার কথা শুনতে লাগল।

আগাগোড়া সমস্ত ইতিবৃত্তই তাকে খুলে বললাম। লীনার সঙ্গে আমার আগেকার সম্পর্ক, তার বর্তমান দাম্পত্য জীবনের কথা, কেনই-বা সেদিন সন্ধেবেলা লীনা আমার কাছে এসেছিল। সবকিছুই চোখ বুজে শুনে গেল দারোগাসাহেব। অবশেষে লীনার গয়না-ভরতি সুটকেসটাও এনে দেখালাম। বললাম, হপ্তাখানেক বাদে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লীনা সেদিন আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। আমি ওকে অবশ্য অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। অরুণাংশুর সঙ্গে গন্ডগোলটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যেও বারবার অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু লীনা বরাবরই ভীষণ জেদি আর একগুঁয়ে স্বভাবের। আমার কোনও কথাই কানে তুলতে চাইল না। বরং উলটে আমাকেই ভয় পাইয়ে দিল। অভিমানের সুরে বলল, তুমি যদি আমায় আশ্রয় না দিতে চাও তবে আমাকে সুইসাইডই করতে হবে—এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। ওর কথা শুনে মনে-মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তাই বাধ্য হয়ে শেষমেশ লীনার প্রস্তাবেই রাজি হতে হল আমাকে। ভাবলাম, আপাতত এটা না-হয় আমার কাছেই থাকুক। পরে ওর মতিগতি বদলে যেতে পারে। তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গয়নার বাক্সটা ফেরত দিলেই চলবে। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে ওর আর কোনও সংবাদই পাইনি। আমার ধারণা ছিল, ওদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মিটমাট হয়ে গেছে। হাজার হোক, অরুণাংশু ওর স্বামী। তাই লীনা হয়তো লজ্জায় আমার কাছে আসতে পারছে না। কিছুদিন বাদে অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে সুটকেসটা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি। —তারপর প্রকাশ দারোগাকে লক্ষ করে চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে বললাম, কিন্তু এখন তো মশাই, আপনি আমাকে বেশ ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি! লীনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ তার গয়না-ভরতি সুটকেসটা পড়ে রইল আমার কাছে! এটা নিয়ে আমি এখন কী করি?

আমার কথাবার্তার ধরনে প্রকাশ মিত্তির একটু ঝিমিয়ে পড়ল। এখান থেকে অনেক কিছু খোঁজখবর পাবে বলে ছুটে এসেছিল, কিন্তু যে-তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। তবু অমায়িক হেসে বলল, মিথ্যেই আপনি ভয় পেয়ে নার্ভাস বোধ করছেন। আপনার আর ফ্যাসাদের কী আছে? শুধু একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে একবার আপনাকে থানায় যেতে হবে। এই সুটকেসটা সেখানে আমরা জমা করে নেব। এর মধ্যে কী-কী আছে তার একটা লিস্ট করা দরকার। তারপর আপনার ছুটি।

আমি ভয়ের সুরে বললাম, কী জানি মশাই, কোত্থেকে কী হয়ে যায়! কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা। আপনারাও তো বাঘের চেয়ে কিছু কম যান না।

আমার কথার ধরনে প্রকাশ দারোগা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তার বাইকে চেপেই থানায় হাজির হলাম। তিনকড়িকে দিয়ে এককুড়ি ডিমও তুলে দিলাম তার ক্যারিয়ারে। দারোগাসাহেব খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, আপনাদের মতো ইয়াং ছেলেদেরই তো এখন দরকার আমাদের দেশে। কী গভীর অধ্যবসায়েই না তিল-তিল করে গড়ে তুলেছেন এই পোলট্রিটাকে! অথচ আজকালকার সব ছেলে-ছোকরাদের দেখুন...রকে বসে গুলতানি করছে, আর মাঝে-মধ্যে এর-ওর কাছ থেকে চাকরির জন্যে দরখাস্ত লিখিয়ে আনছে। নিজের থেকে একটা কিছু করার আগ্রহ একবারেই নেই।

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে বললাম, এ আর কী দেখছেন! কোনওরকমে এটাকে দাঁড় করিয়েছি মাত্র।

থানা থেকে কাজ শেষ করে যখন বাইরে বেরুলাম তখন আমার প্রাণ মুক্তির আনন্দে ভরপুর। বিপদের কালো পাথরটা এতদিন ধরে বুকের ওপর চেপে বসেছিল। আজ সেটা নেমে যেতে মনটা হালকা হল। জলভারহীন মেঘের মতো স্ফূর্তির হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে পোলট্রিতে ফিরে এলাম। এখন ওরা অনন্তকাল ধরে লীনার খোঁজ করুক!

খুন করাটা যে এত সহজ এ-কথা আগে কখনও ভেবে দেখিনি। সত্যি বলতে কী, খুন করার পর লোকগুলো কী করে ধরা পড়ে সেটাই এখন আমার কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হল। আর এইসব মোটা মাথাওয়ালা প্রকাশ মিত্তিররাই তো তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরে!

এর পরও প্রকাশ দারোগা আমার ডেরায় বারদুয়েক এসেছিল। ঘুরে-ঘুরে সমস্ত পোলট্রি দেখল। আমার সব কাজ-কারবারও লক্ষ করল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। অবশেষে একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বিরস বদনে বিদায় নিল।

এই ঘটনার মাসদুয়েক বাদে আমি তিনকড়িকে খুন করলাম। তিনকড়ির সেবায় মুরগিগুলো বেশ ভালোই ছিল। তিনকড়িকে সেবা করে তারা আরও পুলকিত হল। ঘাড় ফুলিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও কার্পণ্য করল না। পরের দিন সকালে আমি নিজে থানায় গিয়ে তিনকড়ির নামে একটা ডায়েরি করে এলাম। বললাম, গতকাল রাতে তিনকড়ি আমার আলমারি থেকে হাজার-দুয়েক টাকা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে। ডায়েরি লিখতে-লিখতে গম্ভীর গলায় প্রকাশ মিত্তির আমায় উপদেশ দিল : এখনকার দিনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, মশাই! কার মনে কোন মতলব খেলা করছে আগে থেকে তার কোনও আঁচ পাওয়া যায় না। এবার তো শুধু দু-হাজার টাকার ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে। ও যে আপনাকে খুন করে যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে যায়নি এর জন্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

আমি বিনীত হাসি হেসে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রকাশ দারোগাকে দেখে আজ আমার খুব মজা লাগছিল।

গত দেড় বছরে আরও তিনটে খুন করেছি আমি। তবে শেষের খুনটা আমার মনটাকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছে। অনেক খুঁজে-পেতে বিশুকে জোগাড় করেছিলাম। শ্যামবাজারের এক রেস্তোরাঁয় বয়-এর কাজ করত। বছর চোদ্দো বয়েস। খুব চটপটে, শরীর-স্বাস্থ্যও খুব ভালো। মুখে সবসময় একটা হাসি-হাসি ভাব। বেশি মাইনে কবুল করায় আমার পোলট্রিতে কাজ করতে রাজি হল। দেশে তার বুড়ো বাপ-মা আছে। মাসে-মাসে মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠায় তাদের নামে। মাসদুয়েক কোনও খোঁজখবর না পেয়ে একদিন বুড়ো-বুড়ি দুজনেই সশরীরে হাজির হল আমার ফার্মে। কিন্তু আমি তো কোন ছার, আমার মুরগিগুলোও হয়তো এতদিনে বিশুর কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে। তাদের বললাম, অনেকদিন হল বিশু আমার এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তার হিসেব-পত্তরও সব কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি সঙ্গে-সঙ্গে।

আমার কথা শুনে বুড়ি মা-টা তো ভেউভেউ করে কান্না জুড়ে দিল।—তবে আমাদের বিশু কোথায় গেল...বাবু? সে কি বুড়ো-বুড়িকে কোনও খবর না দিয়েই পালিয়ে গেল?

তার এই নাকি কান্না আমার ভীষণ অসহ্য লাগল। কড়া ধমক দিয়ে দুজনকেই গেটের বাইরে বের করে দিলাম। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেল তারা। কিন্তু এরপর থেকেই আমার মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেছে। ভাবছি, এবার থেকে খুন করার অভ্যেসটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। বড্ড বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়। আগে থেকে হিসেব করে আটঘাট বেঁধে কাজে নামা, কোথাও একচুল ভুলচুক হওয়ার উপায় নেই—তাহলেই একবারে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। আর সত্যি বলতে কী, এতে আমার লাভও তেমন কিছু নেই। মাঝে-মধ্যে মুরগিদের পেছনে মাংসের খরচটা বেঁচে যায় এইমাত্র! তার জন্যে মানুষ খুন করা খাটুনিতে পোষায় না। তবে প্রকাশ মিত্তিরকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ওকে বাগে পেলে আমি ছাড়ব না। ওই গোবরগণেশ লোকটা মাসে-মাসে গভর্নমেন্টের এতগুলো করে টাকা গিলছে এটাই বা সহ্য করা যায় কেমন করে! একদিন ফাঁক বুঝে দারোগাসাহেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে আসতে হবে। মুরগির বিরিয়ানি আর ঝাল-ঝাল কষা মাংসের লোভ দেখালে নিশ্চয়ই না এসে থাকতে পারবে না। তবে

সেটা লোকচক্ষুর অগোচরে হওয়া প্রয়োজন। কেউ যেন তার আগমন-বার্তা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। পুলিশের লোক বলে কথা! কোথা থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না। তার জন্যে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। তা ছাড়া, দারোগাসাহেব যদি আবার নিজের বাইকে চেপে আসে তবে তো আর-এক ফ্যাসাদ। বাইকটার একটা সদগতির ব্যবস্থা আগে থেকে ভেবে রাখতে হবে। কেননা, সেটা তো আর জোর করে মুরগিদের গিলিয়ে দেওয়া যাবে না।

মাসিক রোমাঞ্চ

নভেম্বর, ১৯৭১



একটি রাত্রি :

একটি অভিজ্ঞতা

হরিনারায়ণ বিশ্বাস

অন্ধকারাচ্ছন্ন থমথমে রাত্রি। নিবিড় অরণ্য। ওই অরণ্যের একটা বড় গাছের তেডালায় বসে আছি আমি। একটু দূরে অন্য একটা ডালে রঘুবীর। আমার হাতে দোনলা বন্দুক, রঘুবীরের কাছে সড়কি ও লাঠি।

আসামের এই অরণ্য নিবিড় ও দুর্ভেদ্য। বড়-বড় মহীরুহ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে। দিনেরবেলাও সূর্যরশ্মি মাটিতে পড়তে পায় না। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু আলো আসে। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, ততক্ষণ অরণ্যের মধ্যে মোটামুটি দৃষ্টি চলে। যখনই সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়, তখনই এই বনানীর অভ্যন্তর অন্ধকারে ভরে যায়। অন্ধকারের রাজত্ব এখানে, আলো নির্বাসিত। তাই অরণ্যের মাটি কালো ও স্যাঁতসেঁতে। অরণ্যের গভীরে বাস করে চিতা, হায়না, ভাল্লুক, বাঘ, বুনো শুয়োর, অজস্র হরিণ, আরও নানান প্রাণী।

আমি আবগারি বিভাগে চাকরি করি। স্থানীয় অধিবাসীদের মন নানা কুসংস্কারে ভরা। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয় অত্যন্ত প্রবল। সন্ধ্যা নামার পর পারতপক্ষে কেউ আর বাড়ির বার হয় না। ফলে প্রচণ্ড পরিশ্রমে তারা যে ফসল ফলায়, রাত্রিতে হরিণ ও বুনো শুয়োর তা নষ্ট করে। সরকার থেকে তাই হরিণ ও বুনো শুয়োর মারার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে।

আমার অখণ্ড অবসর। তাই রঘুবীরকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ি। অরণ্যের শান্ত পরিবেশে আমরা যেন মূর্তিমান ভগ্নদূত। যখন ফিরি, সঙ্গে থাকে দু-একটা হরিণ বা শুয়োর।

সম্প্রতি গুজব রটেছে যে, অরণ্যের দেবতা নাকি মানুষের এই অনধিকার প্রবেশকে বরদাস্ত করতে পারছেন না। প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে, আজকাল শিকারিরা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেই নানা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। হরিণ বধ করার জন্যে যখনই তারা লক্ষ্য স্থির করে, তখনই নাকি লক্ষ্যপথে এসে হাজির হয় এক মানবশিশু।

আর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই হরিণগুলো কোথায় হারিয়ে যায়।

মানবশিশুকে বধ করার মনোবৃত্তি কোনও শিকারিরই থাকে না। অবাক বিস্ময়ে যখন তারা চিন্তা করে কোথা থেকে এল এই মানবশিশু ভয়াবহ অরণ্যে, ঠিক সেই সময়েই একটা ভয়াবহ আওয়াজ শোনা যায়

আর চকিতে মানবশিশু অন্তর্ধান করে। সেইদিন অরণ্যে আর কোনও প্রাণীকেও পাওয়া যায় না।

শিকারিদের মতে ওই মানবশিশু অরণ্যের রক্ষা-কর্তা। প্রজাকুলকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনের সময় রক্ষাকর্তা আবির্ভূত হন।

সেদিন সোমসাহেবও সেই কথা বললেন। সোমসাহেব একজন নামকরা কন্ট্রাক্টর। তাঁর কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।

সোমসাহেব বললেন, চৌধুরীবাবু, ওই নির্জন, ভয়াবহ, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে মানবশিশুর আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়জনক।

আমি বলি, আপনার দেখার ভুল হয়নি তো?

—আরে মশাই, আমি তো একা ছিলাম না। আমার সঙ্গে ছিল আরও চার-পাঁচজন। আপনি কি বলতে চান, সকলেরই চোখ খারাপ?

—না-না, তা কেন! তবে কী জানেন, আজকের যুগে ওইসব সব আজগুবি ব্যাপার কি কেউ বিশ্বাস করবে?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আর বলবেন না। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। ওই মানবশিশুও অমনি এক বিতর্কের বিষয়। আপনার যদি ইচ্ছা থাকে, স্বচক্ষে দেখে আসুন। সন্দেহভঞ্জন হয়ে যাক।

—কোন জায়গায় আপনি তার দেখা পেয়েছিলেন?

—অরণ্যের ঠিক মাঝখানে, যেখানে নুনো মাটি আছে, সেইখানে।

গাছের ওপর বসে সোমসাহেবের কথাগুলো ভাবছিলাম। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন চারিদিক। কাছের ও দূরের থেকে নানা প্রাণীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে গম্ভীর স্বরে বাঘের ডাক শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম, রঘুবীরও নিশ্চল।

আমাদের সামনে সেই লবণক্ষেত্র। অন্ধকার রাত্রিতে সাদা নুনের ওপরে চাঁদের আবছা আলোর রেশ। উজ্জ্বল সাদা রং দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ছে বিরাট-বিরাট মহীরুহের কালো-কালো কাণ্ড। সহসা জোরে বাতাস বইতে লাগল। নিথর বনানী নানান শব্দে মুখর হয়ে উঠল। পাতার মর্মরে, জোনাকির দ্যুতিতে, শৃগালের হুক্কারবে, রাতজাগা পাখির কাকলিতে, শ্বাপদের হুঙ্কারে, বাতাসের শীতল স্পর্শে অদ্ভুত এক রহস্যময়, অপার্থিব অনুভূতি ক্রমে-ক্রমে আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। মনে হল, আমি যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রবিহীন গুহামানব। আমার সামনে এক বিরাটকায় অজগর ধীরে-ধীরে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। তাকে প্রতিহত করার মতো কোনও শক্তিই আর আমার শরীরে অবশিষ্ট নেই। ভয়ের স্পর্শে ও অজগরের দৃষ্টিতে আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি। নিশ্চিত মৃত্যু আমাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছে...আসছে...আসছে...। সহসা একটা চাপা কণ্ঠের আওয়াজে চমক ভাঙল। সম্মোহনের ঘোর থেকে আমার মুক্তি ঘটল। শুনলাম রঘুবীরের কণ্ঠস্বর,—বাবুজি, হরিণ!

হরিণ! চমকে উঠলাম। চমকের চোটে হয়তো পড়েই যেতাম ওই উঁচু ডাল থেকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলাম বলেই অপঘাত-মৃত্যু থেকে রক্ষা পেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল সামলে নিতে। তারপর ওই সাদা নুনভরা জমিটার দিকে তাকালাম। ওই সাদা ক্ষেত্রের মধ্যে দুটো কালো ছায়া। ছায়াগুলো নড়ছে। নড়ছে বলেই ওগুলো যে প্রাণী তা বোঝা যাচ্ছে। নইলে এই ঘন অন্ধকারে কিছুই বোঝা যেত না। বন্দুকটা ঠিক করে নিয়ে আলো ফেললাম লক্ষ্যস্থলের দিকে। আলোকবৃত্তে দেখা গেল দুটি সুন্দর হরিণ চরে বেড়াচ্ছে আর নুন চেটে-চেটে খাচ্ছে। গুলি ছুড়লাম। একটা হরিণ পড়ে গেল। অন্যটা ছুটে পালাল। যে-ভয় আমার চেতনাকে ধীরে-ধীরে গ্রাস করে ফেলছিল, বন্দুকের আওয়াজে তা কেটে গেল। এখন আর কোনও কাজ নেই। চুপচাপ প্রভাতের জন্যে অপেক্ষা করা। নীচে নামলে শ্বাপদের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা।

একটা সিগারেট ধরালাম। রঘুবীরকেও একটা দিলাম।

রঘুবীর বলল, সাব, লক্ষ রাখবেন যেন বাঘে হরিণটা নিয়ে না পালায়।

বললাম, ঠিক আছে। তুমিও লক্ষ রেখো। আর, বাঘ যদি আসে, ক্ষতি কী! চাই কী হরিণ শিকার করতে এসে বাঘ শিকার হয়ে যাবে।

রঘুবীর সহসা থেমে গেল। ইশারা করে নীচের দিকে দেখাল। দেখলাম, মৃত হরিণের কাছে কী একটা জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। চকিতে বন্দুক বাগিয়ে স্পটলাইট জ্বালালাম। জ্বালিয়েই চমকে উঠলাম। দেখলাম, মৃত হরিণের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মানবশিশু। সম্পূর্ণ নগ্ন। কাঁধে ধনুক-বাণ। ধীরে-ধীরে হরিণটাকে ঠেলছে।

আলো পড়তেই সে তাকাল। কী বীভৎস সে-দৃষ্টি। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুটো চোখ, হিংস্র দাঁত। মাথার চুল রক্তাভ। আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে আবার হরিণটাকে ঠেলতে লাগল। বিস্ময়ের চোটে বন্দুকটা সহসা স্থানচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে গেল। দেখলাম, মৃত হরিণটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং সেই ধনুর্ধারী মানবশিশু তার পিঠে চড়তেই সেটা ক্ষিপ্রপদে অরণ্যের গভীরে চলে গেল। এবং হঠাৎই আমার স্পটলাইটটা নিভে গেল। তারপরই শোনা গেল একটা অপার্থিব আওয়াজ। যেন অতৃপ্ত আতৃত্মারা মাটি ভেদ করে উঠে আসতে চাইছে। অরণ্যের সমস্ত প্রাণীর আওয়াজ একদম থেমে গেল। খানিক পরে ওই অপার্থিক আওয়াজও থামল।

সারারাত আমি আর রঘুবীর স্থাণুর মতো বসে রইলাম। আমাদের কোনও বোধশক্তিই আর অবশিষ্ট নেই। এ কী দেখলাম আমরা? এই গভীর অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদের মাঝে মানবশিশুর অস্তিত্ব তো কল্পনারও অতীত। তবে তো সোমসাহেবের কথাই ঠিক। ওই কি অরণ্যের রক্ষাকর্তা? অরণ্যদেব। নইলে মৃত হরিণের জন্যে তার প্রাণ আকুল হবে কেন! তবে কি সে মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার করতে পারে? এই সব ভাবতে-ভাবতেই রাত্রি প্রভাত হল।

আমি আর রঘুবীর গাছ থেকে নেমে ভাঙা বন্দুকের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে এগিয়ে গেলাম সেই লবণক্ষেত্রের দিকে। যেখানে হরিণটা পড়েছিল, সেখানে প্রচুর রক্তের দাগ। কিন্তু তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও আমরা মৃত বা আহত কোনও হরিণের দেখা পাইনি।

গল্প শেষ করে দাদু বলেছিলেন, তোরা একালের মানুষ। হয়তো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তোরা নিছক গল্প বলে অবিশ্বাস করবি। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, আমার না হয় ভুল হতে পারে, কিন্তু রঘুবীর, সোমসাহেব, আরও অনেকের কি একই ভুল হবে?

দাদুর প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারিনি, শুধু চুপচাপ বসেছিলাম।

রহস্য সন্ধানী

ডিসেম্বর, ১৯৭২



ছায়া

মঞ্জিল সেন

আসাম থেকে এক বন্ধু ঘন-ঘন পত্রাঘাত করছিল, লিখছিল :

একবার এখানে এসে বেড়িয়ে যাও, বুঝবে প্রকৃতিকে কেন লীলাচঞ্চল বলা হয়।

একটু খোঁটা দিয়ে লিখেছিল,

তোমরা পাহাড়-পর্বত কল্পনা করো আর তারই বর্ণনা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দাও—অথচ ইঁট, কাঠ, পাথর ছাড়া কিছুই তোমরা দ্যাখো না।

ভেবে দেখলাম অপবাদটা একেবারে মিথ্যে নয়, তাই ওটা ঘোচাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

বন্ধু যে এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি তা টেনে যেতে-যেতেই টের পেলাম। জানলার ধারে বসে শুধু ঘন সবুজের শোভা আর পাহাড়ের সারি—অ-কবির মনেও কবিত্ব এসে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বন্ধু স্টেশনে এসেছিল। আনন্দে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমিও অভিভূত হলাম। দেবু, অর্থাৎ আমার বন্ধু, ওখানকার ডাক্তার। অল্প কিছুদিন হল প্র্যাকটিস শুরু করেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই নাম করে ফেলেছে। এখনও বিয়ে করেনি—একা থাকে। তাই আমাকে নিয়ে ও মেতে উঠল।

কয়েকটা দিন বেশ হইচই করে আনন্দে কেটে গেল। শুনেছিলাম, আসামে রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকার খুব কদর। দেবু আবার বেশ ফলাও করে আমার নাম চাউর করে দিয়েছিল—বলেছিল, ওসব পত্রিকায় আমি নিয়মিত লিখি। ফলে, কিছু স্থানীয় বাসিন্দা কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ করে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। অবশ্য আমি যে মনে-মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিনি এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

একদিন সকাল দশটায় আমি দেবুর বাড়ির রাস্তার দিকের বারান্দায় একটা বই নিয়ে বসেছি। মাঝে-মাঝে মুখ তুলে পথ দিয়ে লোকজনের চলাফেরা দেখছি। দেবু একজন রোগীর বাড়ি গিয়েছিল, ফিরতে একটু দেরি হবে বলেছিল। গেট খোলার শব্দে আমি চোখ তুললাম।

যিনি এলেন তাঁর নাম মিস্টার হাজারিকা, দেবুরই একজন পেশেন্ট। দেবুর মুখেই শুনেছিলাম, ভদ্রলোকের বয়েস বেশি নয়। একসময় নাকি খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিল, কিন্তু গত ক'বছর ধরে তিনি কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের দু-চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, পাণ্ডুর মুখ, গায়ের রং অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে...যেন একটা জীবিত শব। ভদ্রলোকের রোগ যে আসলে কী, তা বহু পরীক্ষা করেও ধরা যায়নি। খিদে হয় না, ঘুম হয় না,

দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন, অথচ সবরকম প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করেও শরীরে কোনও অস্বাভাবিকতা, বা কিছুর অভাব, ধরা পড়েনি। দেবুই বলেছিল, কেসটা বড় অদ্ভুত। সে মেডিক্যাল জার্নালে ভদ্রলোকের কেস হিস্ট্রি প্রকাশ করেছিল। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাকে বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি বাতলেও দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও কোনও উপকার হয়নি।

আমার মুখে 'ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই' শুনে তিনি বললেন, সেটা তিনি জানেন, আমার কাছেই তিনি এসেছেন। আমি ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে বসতে বললাম। মনে-মনে ভাবলাম, আমার কাছে আবার তাঁর কী দরকার পড়ল!

একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি তিনি বসলেন। সত্যি কথা বলতে কী, ওই উজ্জ্বল দিনের আলো সত্ত্বেও তাঁর সান্নিধ্য কেন জানি না আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল, গা ছমছম করে উঠল। যেন ওঁর উপস্থিতি অশরীরী আত্মার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিল।

ভদ্রলোক কোটরে ঢুকে যাওয়া দু-চোখ দিয়ে আমাকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু কৌতুকের হাসি ঝিলিক খেলে গেল। আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

ভদ্রলোক খুকখুক করে বারকয়েক কাশলেন। তারপর যেন অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করছি বলে যেন কিছু মনে করবেন না...।'

'আপনার কয়েকটা গল্প আমি পড়েছি,' ভদ্রলোক একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'অলৌকিক কাহিনি নিয়েই আপনি বেশি লেখেন...।'

একজন গুণমুগ্ধ পাঠক, এই ভেবে এতক্ষণে আমি যেন ধাতস্থ হলাম।

'আপনাকে আমি একটা কাহিনি শোনাতে চাই,' ভদ্রলোক সোজাসুজি প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন।

আমি নিজের প্রশংসা শুনব বলে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, হতাশ হলাম। যা হোক, মুখে বললাম, 'বেশ তো, বলুন, আমি শুনব।'

'ধন্যবাদ।' ভদ্রলোক ভাবলেশহীন মুখে উক্তি করলেন। একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'আমি জানি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এমনকী কবে মারা যাব তাও আমার অজানা নয়। তাই এখন আপনাকে বলতে কোনও বাধা নেই।'

আমি একটু চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক বলেন কী? কবে মারা যাবেন তাও তিনি জানেন!

'একজনকে সব খুলে না বলা পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। আপনিই উপযুক্ত লোক। দয়া করে আমার কাহিনি আপনি পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবেন। আমার অপরাধের কথা সবাই জানুক, তাই আমি চাই।' ভদ্রলোক তাঁর পাশের চেয়ারটার দিকে মুখ ফেরালেন, যেন কেউ সেখানে বসে আছে, তাকে শুনিয়েই কথাটা বললেন।

আমার গা আবার শিউরে উঠল।

'পাঁচ বছর আগে আমার চেহারা এমন ছিল না,' ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে শুরু করলেন 'আমি একজন ভালো অ্যাথলিট ছিলাম। শরীরে মেদের বালাই ছিল না, অথচ পুষ্ট দেহ ছিল। আমি এক চা-বাগানের হেড-অফিসে কাজ করতাম। সেখানেই বড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ।'

ভদ্রলোক আবার চুপ করলেন, যেন পুরোনো দিনের কথায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, 'বড়ুয়া আমার থেকে বয়েসে ছোট হলেও আগেই ওই অফিসে ঢুকেছিল। বেশ সুন্দর চেহারা, অনেকটা মেয়েলি ধরনের। ওর বাড়ি লামডিংয়ে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে ও ছিল। প্রথম থেকেই কেন জানি না ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার থাকার জায়গা নেই, হোটেলে আছি, শুনে ওর সঙ্গে থাকার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমিও ভেবে দেখলাম তাতে আমার অনেক সুবিধে। যা মাইনে পাই তার বেশিরভাগ হোটেলের খরচায় চলে যায়। তার চাইতে ওর সঙ্গে শেয়ার করে থাকলে অনেক কম খরচ হবে। রান্নার জন্যে একজন লোক রেখে দিলে আরও সুরাহা হবে।

'আমি ওর প্রস্তাবে সম্মত হলাম। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ভালোই ছিলাম, টাকা-পয়সাও বাঁচছিল। বড়ুয়া ক্রমেই আমার একান্ত অনুগত হয়ে পড়ল। আমার সুখ-সুবিধের দিকে ওর তীক্ষ্ন দৃষ্টি লক্ষ করে আমি বেশ মজা পেতাম। ক্রমে এমন অবস্থা হল যে, ও যেন আমার মধ্যে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলল। মাঝরাতে আমি ওকে সিগারেট আনতে বললে, একমাইল হেঁটে তাও এনে দিতে ও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করত না, বরং আমাকে খুশি করতে পেরে ও যেন তৃপ্ত হত। এককথায়, আমার জন্যে সব ত্যাগ করতে ও প্রস্তুত ছিল।

'দেখতে-দেখতে কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেল। আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। এতদিন আমি বড়ুয়ার এই আত্মনিবেদনে আত্মতুষ্টি অনুভব করতাম, কিন্তু আর যেন ওকে ভালো লাগে না। এই একঘেয়েমি, বৈচিত্র্যহীনতা অসহনীয় মনে হতে লাগল। ওর এই মেয়েলি স্বভাব আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠল। আমি যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। ওর সঙ্গ ত্যাগ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই ওকে কাছছাড়া করতে পারলাম না। বড়ুয়া নানা ছল-ছুতো করে আমার আলাদা থাকার ব্যবস্থা পণ্ড করে দিতে লাগল। আমি মনে-মনে রেগে উঠলাম। ওর সঙ্গে নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করতে লাগলাম। তাতে ওর মুখে ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠত—আর সেটা লক্ষ করে আমি উল্লাস বোধ করতাম। নিজের অজান্তেই আমি হিংস্র হয়ে উঠছিলাম। এসব সত্ত্বেও বড়ুয়া কিন্তু আমাকে ছাড়ল না, ছায়ার মতো আমার পাশে-পাশে থাকত।

'শেষ পর্যন্ত আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। ওর হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, ওকে আমি খুন করব। আমি মতলব আঁটতে লাগলাম। এমনভাবে কাজ হাসিল করতে হবে যাতে আমার ওপর সন্দেহ না আসে। শেষ পর্যন্ত সকলের চোখের সামনেই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিলাম—আমাকে সন্দেহ করার কোনও কারণই ছিল না।

'হাসপাতালে শেষ নিশ্বাসের আগে ও আমার দিকে চোখ মেলে তাকাল। সেই চোখে রাগ বা অভিযোগ ছিল না—ছিল ভর্ৎসনা। বিড়বিড় করে ও বলল, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না—তোমার পাশে ছায়ার মতো আমি থাকব।'

মিস্টার হাজারিকা একটু থামলেন। আমি ওঁর স্বীকারোক্তি শুনে যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছি।

'বড়ুয়া ওর কথা রেখেছে,' হাজারিকা আবার শুরু করলেন 'মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে ছায়ার মতো ও আমার পাশে-পাশে রয়েছে। দিনেরাতে সবসময় আমি ওর উপস্থিতি অনুভব করি। এখনও ও আমার পাশে বসে আছে,' হাজারিকা পাশের চেয়ারের দিকে ঘাড় ফেরালেন।

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিম-শিহরন বয়ে গেল। আমিও যন্ত্রের মতো ঘাড় ফেরালাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠলাম। আমার স্পষ্ট মনে হল, যেন কেউ চেয়ারে বসে আছে, একটা আবছা ছায়ামূর্তি—।

আমার মাথা ঘুরে উঠল। একটু ধাতস্থ হয়ে আবার চেয়ারের দিকে তাকালাম। এবার কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না।

মিস্টার হাজারিকা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখে বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'জানেন, ও আমার কানে ফিসফিস করে কথা বলে। তাই আজ আমি সাহস করে সব কথা আপনাকে খুলে বলতে ভরসা পাচ্ছি। কারণ, ও আমাকে বলেছে, আর মাত্র একটা মাস আমার আয়ু।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাজারিকা বললেন, 'মরেও আমি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব না।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার স্পষ্ট মনে হল, আর-একজন কেউ পাশের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাজারিকা হাঁটতে শুরু করলেন, আর আমি দ্বিতীয়বার ভয়ানক চমকে উঠলাম।

মাথার ওপর কড়া রোদ। মিস্টার হাজারিকা হাঁটছেন, তাঁর পাশে-পাশে তাঁর ছায়াও চলছে। কিন্তু...ছায়া একটা নয়, দুটো...।

মাসিক রহস্য পত্রিকা

জানুয়ারি, ১৯৭৩



সওয়াল

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

পাবলিক প্রসিকিউটার জনার্দন রায় এবার কেসটা সাম আপ করতে থাকেন : মি লর্ড, আসামির কাঠগড়ায় যে-ছোটখাটো মানুষটিকে দেখছেন, তিনি বড় সাধারণ নন। ইনি যখন যেখানে থেকেছেন, সেখানেই একটা অশুভ ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য যথারীতি প্রতিবারই ইনি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অপরাধী হিসেবে ইনি প্রথম স্তরের। কিন্তু অপরাধী যতই উচ্চস্তরের হোক না কেন, কোনও-না-কোনও সময় সে ছোটখাটো ভুলত্রুটি করে ফেলে। সেই ভুলত্রুটির ফাঁক দিয়েই তার অপরাধ ধরা পড়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবার আমরা অভিযুক্ত অনিলবরণ রায়ের প্রথম জীবন থেকে কার্যকলাপ আলোচনা করে দেখব।

...অনিলবাবু অল্প-বয়েসেই পিতৃমাতৃহারা হন। ওঁকে আশ্রয় দেন পিতৃবন্ধু জগন্নাথ দাস। ইনি যখন বি-এ ক্লাসে পড়তেন—সেসময় হঠাৎ জগন্নাথবাবু রহস্যজনকভাবে মারা যান। ডাক্তারের মতে, উনি হার্টফেল করেন। পুলিশ কিন্তু সন্দেহ করেছিল, তাঁকে স্লো পয়জনিং করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অভিযুক্ত অনিলবরণ রায়ই নিঃসন্তান আশ্রয়দাতা জগন্নাথ দাসকে স্লো পয়জনিং করে হত্যা করেন। অথচ কোনও অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে ডেডবডি পোস্টমর্টেম করা হল না।

এমনসময় আসামিপক্ষের উকিল গদাধর পতিতুণ্ডু উঠে দাঁড়ান : মি লর্ড, আমার বন্ধু জনার্দনবাবু কিন্তু লিমিট এক্সিড করে যাচ্ছেন। আদালত কক্ষে অনুমানের স্থান নেই। যে-মৃত্যুর সঙ্গে ওঁর নাম কোনও পক্ষই জড়ায়নি, তার দায়িত্ব ওঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে জনার্দনবাবু কিন্তু ওঁর ওপর খুবই অবিচার করছেন। হি পারহ্যাপস ওয়ান্টস টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য জুরি উইথ দিস আননেসেসারি ইনসিনুয়েশন।

জজ ওঁর অবজেকশন অ্যাকসেপ্ট করে বলেন, আপনি অনুমান বাদ দিয়ে ঘটনায় আসুন।

মি লর্ড,—বলে ব্যারিস্টার রায় আবার শুরু করেন,—কিন্তু বাজারে বড়লোক হিসেবে যতই নামডাক থাক, মৃত জগন্নাথ দাসের তেমন কোনও সম্পত্তি ছিল না। কাজেই অনিলবরণ রায়কে অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে হল। এবার উনি আশ্রয় পেলেন ওঁর দূরসম্পর্কের দিদি নীলিমা সেনের কাছে। কিন্তু নীলিমাদেবীর হঠাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিল। তারপরই উনি রহস্যজনকভাবে হার্টফেল করেন।

ব্যারিস্টার রায় আর কিছু বলার আগেই মিস্টার পতিতুণ্ডু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, নীলিমাদেবীর মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি আমি পুলিশ রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। নীলিমাদেবী ছিলেন উইক হার্টের মানুষ। উনি যাকে

ভালোবাসতেন, তার বিশ্বাসঘাতকতা ওঁর কাছে তীব্রতম বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে ওঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং উনি মারা যান।

জনার্দন রায় শ্রাগ করতে-করতে আবার বলতে শুরু করেন, এবারও অভিযুক্ত অনিলবরণ রায়কে সরাসরি জড়ানো যায়নি। তবু এই ঘটনার সময় উনি ওই ফ্যামিলিতে ছিলেন, এটা বোধহয় বলা দরকার।

...তারপর অনিলবাবু টাটা শু কোম্পানির ম্যানেজার চপল চক্রবর্তীর ছেলের প্রাইভেট টিউটর হয়ে এলেন। এখানেও চপলবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। পুলিশ অবশ্য রিপোর্ট দিল, আত্মহত্যার কেস।

মিস্টার পতিতুণ্ডু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মি লর্ড, আমি আর-একবার ইন্টারাপ্ট করছি।—তারপর ব্যারিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কথা অনুযায়ী কিন্তু চপলবাবুর স্ত্রীর কেসটাকে সুইসাইড বলে মেনে নেওয়ার কথা না। বরং, ওঁকে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। আপনি-আমি স্বামী হলে কী করতাম, বলুন!

ব্যারিস্টার রায় বলেন, হয়তো পারিবারিক কেলেঙ্কারি—।

পতিতুণ্ডু বলেন, এতে পারিবারিক কেলেঙ্কারি এল কোথায়? তবে চপলবাবু কিছু গোপন করার চেষ্টা অবশ্য করে থাকতে পারেন। কিন্তু, সেটা নিজেকে বাঁচাতে, ওঁকে নয়। এবার আপনি বলুন।—বলতে-বলতে মিস্টার পতিতুণ্ডু আসন গ্রহণ করেন।

ব্যারিস্টার রায় এবার বলতে থাকেন, তারপর উনি এসে উঠলেন ওঁর এক সহকর্মীর ওখানে। ভদ্রলোক পণ্ডিত মানুষ, রাজনীতিতে ঝোঁক। অনিলবাবুর সঙ্গে ওঁর বনল না, অনিলবাবু ওঁর বাসা ছাড়লেন। এরপরই ভদ্রলোক খুন হলেন।

মিস্টার পতিতুণ্ডু বলে ওঠেন, সেটা তো পলিটিক্যাল মার্ডার—প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনিলবাবুর সঙ্গে কোনও পলিটিক্যাল পার্টির যোগাযোগ আছে—আমার লার্নেড ফ্রেন্ড কি এমন কথা বলতে পারেন?

ব্যারিস্টার রায় এ-কথার কোনও সরাসরি জবাব না দিয়ে বলতে থাকেন, সবশেষে অভিযুক্ত অনিলবরণ রায় আশ্রয় পেলেন রায়বাহাদুর ক্ষৌণীশ সেনের কাছে। ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হলেন। এত ভালোবাসা, এত বিশ্বাস—কিন্তু এখানেও উনি স্বভূমিকা প্রকাশ করলেন। অবশ্য একেবারে অকারণে না। রায়বাহাদুর অভিযুক্ত শ্রীরায়কে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবেসে ফেলেন। তাই উইল করে ওঁর নিজের সম্পত্তি আসামিকে দিয়ে যান। অথচ রায়বাহাদুরের নিজের ভাই, ভাগ্নে, রয়েছে। শোনা যায়, রায়বাহাদুর এর আগে একবার উইল করে ওঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ্নে রজত আর ভাই বিকাশকে দেন। অনিলবাবুকে সন্তানতুল্য মনে করার পর উনি সেই উইল নাকচ করে ওঁকেই সব কিছু উইল করে দেন।

...অনিলবাবু এ-কথা জানতে পারেন। আর তখনই ওঁর মনে হয়, উনি হয়তো আবার উইল বদলাতে পারেন। সেই আশঙ্কায় উনি রায়বাহাদুরকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করেন। এখন আমি বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি যে, অভিযুক্ত মিস্টার রায়ই হত্যাকারী।

...এক নম্বর, প্রসিকিউশন সাক্ষীর কথা থেকে আমরা দেখেছি, উনি রায়বাহাদুরের হত্যার ঠিক পরেই ওঁকে (মিস্টার রায়কে) রায়বাহাদুরের ঘর থেকে বেরুতে দেখেছেন।

...দু-নম্বর, সাক্ষী ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্ট মিস্টার চ্যাটার্জি বলেছেন, মৃত রায়বাহাদুরের ঘরে যে-জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে, সেই ছাপের সঙ্গে ওঁর পায়ের জুতোর মাপ মিলে গেছে।

...তারপর তিন নম্বর, প্রসিকিউশন উইটনেস মিস্টার কারফরমার বলেছেন, রাত সাড়ে এগারোটার সময় মৃত রায়বাহাদুরের ঘরে অভিযুক্ত অনিলবরণ রায়ের গলা শোনা গেছে। ডাক্তারদের মতে, রায়বাহাদুরকে ঠিক ওই সময় অথবা দু-চারমিনিট আগে-পরে হত্যা করা হয়েছে।

...চতুর্থ নম্বর, সাক্ষী ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট শম্পা সেন বলেছেন, মৃত রায়বাহাদুরের জলের গ্লাসে যে-আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, সেই আঙুলের ছাপ অভিযুক্ত অনিলবাবুর।

...এখন এইসব সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে আমরা অনায়াসে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, অভিযুক্ত শ্রী অনিলবরণ রায়ের বিরুদ্ধে রায়বাহাদুর ক্ষৌণীশ সেনকে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

...এই প্রসঙ্গে আমি অনারেবল জাস্টিসকে বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্ট মিস্টার পেলের মন্তব্য ভেবে দেখতে বলছি—সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ক্যান্ট লাই, ডাইরেক্ট এভিডেন্স মে লাই।

জনার্দন রায় শেষ করেন।

এবার অ্যাডভোকেট গদাধর পতিতুণ্ডু আরম্ভ করেন, মি লর্ড, আমার লার্নেড ফ্রেন্ড এতক্ষণ ধরে ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন, এটা আমি প্রমাণ করে দেখাচ্ছি।

...প্রথমত, উনি আমার মক্কেলের অতীত জীবন আলোচনা করতে গিয়ে ওঁর বাস-করা বাড়ির প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে ওঁকে জড়ালেন। এটা আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ। কিন্তু তাই বলে, ওঁর উদ্দেশ্য কোনওমতেই নির্দোষ না। এইসব আগড়ম-বাগড়ম বলে উনি আপনাদের মন বিষাক্ত করে দিতে চাইলেন।

...তারপর উনি বলেছেন, উনি আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে মৃত ক্ষৌণীশ সেনকে হত্যার অভিযোগ প্রমাণ করেছেন। আমি ওঁর যুক্তিগুলো একে-একে খণ্ডন করছি। দেখবেন, ওঁর সব যুক্তিই ভিত্তিহীন ও অসার।

...এক নম্বর, উনি বলেছেন, আমার মক্কেলের নামে উইল করার পরেই নাকি রায়বাহাদুর খুন হয়েছেন। ঘটনা কিন্তু তা নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা এস্টেট ম্যানেজার রামলোচনবাবুর কথা উল্লেখ করতে পারি।

...রামলোচনবাবু বলেছেন, উইল অবশ্যই রায়বাহাদুর করেছিলেন। কিন্তু ওটা ড্রাফট উইল।

...রামলোচনবাবু আরও বলেছেন, অনিলবাবু এ-উইল করা নিয়ে আপত্তি করেছিলেন।

...আর-একটা কথা, 'একজিবিট নং ৬' এই ড্রাফট উইলটাকে কি মি লর্ড 'উইল' বলবেন?

...রামলোচনবাবুও উইল বলেননি। কেননা, এতে কোনও সাক্ষীর সিগনেচার নেই। এ-উইলটা ইনভ্যালিড। ক্ষৌণীশবাবু মরার দিন এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। আমার মক্কেল আইনের ভালো ছাত্র। তিনি এ-কথা ভালো করেই জানেন যে, উইটনেস-এর সিগনেচার না থাকলে উইল ভয়েড হয়ে যায়। ওঁর যদি সম্পত্তি পাওয়ার লোভেই হত্যা করার ইচ্ছে থাকত, তাহলে উইল এক্সিকিউটেড হওয়ার পরই রায়বাহাদুর নিহত হতেন, তার আগে না।

...দু-নম্বর, ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্ট বলেছেন, হত্যাকারীর জুতোর ছাপ রায়বাহাদুরের ঘরে পাওয়া গেছে। জুতোর ছাপ, কিন্তু পায়ের ছাপ নয়।

...কেউ যদি অন্য কাউকে কোনও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে চায়, তাহলে, তার জুতো পায়ে দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোই তো স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অন্য কেউ আমার মক্কেলের জুতো পায়ে দিয়ে থাকতে পারে।

...এখন দেখুন, জুতোটা হচ্ছে 'একজিবিট নং ৮'। ওটার মধ্যে পাওয়া গেছে কিছু তুলোর প্যাড। এখন আমার মক্কেলকে ওই জুতো পরিয়ে দেখা গেছে তুলোর প্যাড থাকলে উনি ওই জুতো পায়ে দিতে পারেন না। তার মানে, ওঁর পায়ের মাপ আর জুতোর মাপ এক। তাহলে এমন কেউ ওই জুতো পায়ে দিয়েছেন, যাঁর পায়ের মাপ জুতোর মাপের চেয়ে ছোট।

...তারপর মিস্টার কারফরমারের কথায় আসি। টেপরেকর্ডারে কেউ যদি কারও গলা ধরে রাখেন, তারপর কেউ যদি সেই টেপরেকর্ডার বাজান—তাহলে কি এটা মনে হবে না, ওই গলা যাঁর—তিনি কথা বলছেন? এখন, এ-বাড়িতে কার টেপরেকর্ডার আছে?

...রামলোচনবাবু একজনের নাম করেছেন। সেই টেপরেকর্ডারে আমার মক্কেলও গলা দিয়েছেন—এটাও আমরা জেনেছি।

...তারপর রায়বাহাদুরের গ্লাসে আমার মক্কেলের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তার কারণ গ্লাসটা ওঁরই।

...রায়বাহাদুরের খাস ভৃত্য বনমালী বলেছে, এ-গ্লাস সাহেবের না। আবার যদুনাথ ঠাকুর শনাক্ত করেছে, গ্লাসটা আমার মক্কেলেরই। তাহলে কি আমার মক্কেল নিজের গ্লাসে করে রায়বাহাদুরকে বিষ পৌঁছে দিয়েছে? হত্যাকারী কি এত মূর্খ হয়?

...তাহলে, এটা নিশ্চয়ই অন্য কেউ পৌঁছে দিয়েছে। রায়বাহাদুর আর আমার মক্কেলের গ্লাস দুটো একই ধরনের—হত্যাকারী এর সুযোগ নিয়েছে।

...এখন আসল হত্যাকারী কে—এটা বের করার দায়িত্ব মহামান্য কোর্ট অব জাস্টিসের। এ-ব্যাপারে আমি সামান্য আলোকপাত করছি।

...ড্রাফট উইলটা এক্সিকিউটেড না হলে কার বেশি সুবিধে? নিঃসন্দেহে রায়বাহাদুরের ভাগ্নে রজতবাবুর। কেননা, এই উইল এক্সিকিউটেড হলেই উনি সম্পত্তির মালিকানা হারাবেন। তারপর, ওঁর পায়ের মাপ আমার মক্কেলের পায়ের মাপের চেয়ে সামান্য ছোট। ওঁর টেপরেকর্ডার আছে।

...সবচেয়ে বড় কথা, উনি রায় অ্যান্ড কোং—ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিস্টস-এর সঙ্গে যুক্ত। তাই ওঁর পক্ষে পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করা খুবই সহজ। রায়বাহাদুরের হত্যার দু-দিন আগে উনি কিছুটা পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে এসেছেন—ওঁর পার্টনার মিস্টার দাস এমন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। কাজেই—।

মিস্টার পতিতুণ্ড শেষ করেন।

আধঘণ্টা পরে ফোরম্যান অব দ্য জুরির গলা শোনা যায় আমরা ইউন্যানিমাসলি বলছি, দ্য অ্যাকিউজড ইজ নট গিলটি।

সঙ্গে-সঙ্গে জজসাহেবের গলা শোনা যায়, দ্য অ্যাকিউজড ইজ অ্যাকুইটেড।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
জানুয়ারি, **১৯৭৩**



ঘটকী লাগালেন অনুকূল বর্মা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনুকূল বর্মা মানুষটি ছোট্টখাট্টো। একটু মোটার দিকেই ঝুঁকেছেন। বয়েস আন্দাজ করা শক্ত। পঞ্চাশ হতে পারে। পঁয়ষট্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। চোখ দুটো বড়ও নয়, ছোটও নয়। চোখের তারা কটা। কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। ঠিক ধূর্ত বলা চলে না। বরঞ্চ ধারালো বললেই খানিকটা সঠিক বলা হয়।

তাঁর মাথার মাঝখানের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। ছোট্ট একটা টাক পড়ি-পড়ি করেও এখনও পড়েনি। দুপাশের জুলপিতে কয়েকটা পাকা চুল চোখে পড়ে।

টেবিল থেকে অদ্ভুত গড়নের মোটা পাইপটা তুলে অনুকূল বর্মা ধরালেন। এই পাইপটাকে তিনি বলে থাকেন, তাঁর ফ্রেন্ড, ফিলসফার এবং গাইড।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সকালের ডাকে-আসা চিঠিগুলো তিনি দেখতে লাগলেন।

আজকের চিঠির সংখ্যা খুব বেশি নয়। দুটো বিয়ের, একটা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ। একটা টেলিফোন, একটা ইলেকট্রিকের বিল। একজন ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের দুঃস্থ অবস্থার কথা জানিয়ে কিছু অর্থ-সাহায্য চেয়েছে।

কিন্তু শেষ চিঠিটা পড়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠল। তাঁর কটা চোখের দৃষ্টি ধূর্তও হয়ে উঠল না, ধারালোও হয়ে উঠল না। তাঁর চাউনির মধ্যে শুধু ফুটে উঠল দারুণ একটা বিরক্তি।

চিঠিটা ইংরেজিতে টাইপ করা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে লিখছে তাঁর সেক্রেটারি —মালবিকা রায়।

চিঠিটার ভাবার্থ এই মিস্টার সাহা ছোট একটা ব্যাপারে অনুকূল বর্মাকে অ্যাপয়েন্ট করতে চান। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। সময় খুব কম। তাই নিজে আসতে পারলেন না। অনুকূল বর্মা যেন আজ বিকেল তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অতি অবশ্য ('উইদাউট ফেল' কথাগুলোর তলায় লালকালিতে দাগ দেওয়া) মিস্টার সাহার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করেন।

চিঠিটার মধ্যে এমন একটা ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছে, যেটা প্রায় ধৃষ্টতার সামিল। বিশেষ করে ওই কথাগুলোর মধ্যে—'অ্যাপয়েন্ট' আর 'উইদাউট ফেল'।

চিঠিটা টেবিলে রেখে স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে অনুকূল বর্মা নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগলেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার নাম তাঁর বিলক্ষণ জানা। শুধু তাঁর কেন, বাংলার বহু লোকের এবং বাংলার বাইরেও অনেকের। লোকটার গোটা-তিনেক কোলিয়ারি, একটা ফায়ার ব্রিকস-এর কারখানা, দুটো চালকল আর কয়েকটা রেসের ঘোড়া আছে। অর্থাৎ মানুষটা যে প্রায় কোটিপতি, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু যে সাদা বাজারেই তাঁর কারবার, তা নয়। লোকে বলে, কালোবাজারের কারবারেও তিনি কম যান না।

তাঁর সম্বন্ধে আরও নানা গুজব আর সন্দেহের কথা অনুকূল বর্মার কানে এসেছে।

সেই মানুষটার অনুকূল বর্মার সাহায্যের দরকার হলে কোনও 'ছোট ব্যাপারের' জন্য হওয়ার কথা নয়।

চিঠিতে এই 'ছোট ব্যাপারের' উল্লেখ থাকার জন্যই অনুকূল বর্মা সেটা ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন না। আরও খানিক পাইপ টেনে তিনি টেবিলের গায়ে আটকানো কলিংবেলের বোতাম টিপলেন।

পাশের ঘরের টাইপরাইটারের খটখট শব্দ থেমে গেল। হাতে শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল নিয়ে দরজা ঠেলে একটি মেয়ে ঘরে এল। পরনে তার লালপাড় শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

মেয়েটির বাবা-মা নেই। অনুকূল বর্মার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে। তাঁর কাছেই মানুষ। ইতিহাসে এম-এ পাশ করে শর্টহ্যান্ড আর টাইপরাইটিং শিখেছে। তারপর থেকেই অনুকূল বর্মার সে সেক্রেটারি।

বিয়ে সে করেনি। বিয়ের কথা বললে অনুকূল বর্মাকে সে হেসে বলে, 'জেঠু, এখনও মনের মতো কোনও ক্রিমিন্যালকে খুঁজে পাচ্ছি না।' মেয়েটির নাম মাধবী।

সে আসতে মৃদু হেসে অনুকূল বর্মা বললেন, 'মাধু-মা, এই চিঠিটা দেখেছিস?'

অবাক স্বরে মাধবী বলল, 'এখনও ওটাকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দাওনি, জেঠু?'

পাইপটা টেবিলে নামিয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'নারে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সেক্রেটারিকে ফোনে জানিয়ে দিস, বিকেল তিনটে পঁয়তাল্লিশে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আপিসে আমি দেখা করতে যাব।'

যেন আকাশ থেকে পড়ে মাধবী বলল, 'বলছ কী, জেঠু? এরকম একটা ইম্পার্টিনেন্ট লোকের সঙ্গে তার আপিসে গিয়ে দেখা করবে?'

'ইম্পার্টিনেন্ট বলে নয় রে,' পাইপটটা তুলে নিলেন অনুকূল বর্মা 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বড়-বড় কারবার করে। আমিও বড়-বড় কেস করি। কিন্তু কী কারণে একটা ছোট ব্যাপারের জন্যে আমাকে সে অ্যাপয়েন্ট করতে চায়, জানতে ইচ্ছে করছে।'

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বিরাট বাড়িটার একতলা আর দোতলা জুড়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অফিস। অনুকূল বর্মা সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু কী যেন ভেবে তিনি সেখানে পৌঁছলেন মিনিট পনেরো আগে। একতলার বেয়ারা জানাল, সাহাসাহেবের কামরা দোতলায়।

রিসেপশন রুম দোতলায়। ঘরটায় আগাগোড়া পুরু কার্পেট বিছানো। গদিমোড়া দামি-দামি সোফা-সেটি। এককোণে রিসেপশনিস্টের ছোট টেবিল আর চেয়ার।

রিসেপশনিস্টের মাথায় বাবুইপাখির বাসার মতো বেয়াড়ারকম বড় খোঁপা। ঠোঁটে টকটকে লিপস্টিক। চোখ আর ভুরু নিখুঁতভাবে আঁকা। তার ফিকে নীল, প্রায় স্বচ্ছ নাইলন শাড়ির ভেতর দিয়ে অতি-সংক্ষিপ্ত চোলি-ব্লাউজ আর বুকের নীচ থেকে নাভি পর্যন্ত ধবধবে শরীরের অনেকটা অংশ এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেখলে যে-কোনও শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষের বিব্রত হওয়ার কথা। মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী। সমস্ত শরীর থেকে উদ্ধত যৌবন যেন উপচে পড়ছে। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা উদ্ধত, সেটা তার মুখের ভাব। ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কেমন যেন একটা নিষ্ঠুরতা মেশানো। পায়ে উঁচু হিলের জুতো।

সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে অনুকূল বর্মার কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, 'ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

অনুকূল বর্মা নিজের কার্ড এগিয়ে দিলেন।

মেয়েটি ইন্টারকম টেলিফোন তুলে খুব সম্ভব বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গেই কথা বলল। তারপর আবার সমস্ত দেহ হিল্লোলিত করে অনুকূল বর্মার দিকে ফিরে বলল, 'ইউ আর ফিফটিন মিনিটস টু আর্লি। প্লিজ ওয়েট। আপনার কার্ডটা দিয়ে আসছি।'

পাশের ঘরের দরজা ঠেলে মেয়েটি ভেতরে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার উপরকার 'Don't Disturb' লেখা লাল একটা আলো জ্বলে উঠল।

অনুকূল বর্মা মৃদু হাসলেন। তারপর নরম একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসে তাঁর সেই অদ্ভুত গড়নের মোটা পাইপটা বের করে তামাক ভরতে লাগলেন।

কাঁটায়-কাঁটায় তিনটে পঁয়তাল্লিশে সেই দরজা খুলে সমস্ত দেহ দুলিয়ে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বেরিয়ে এল। মুখে তার চাপা হাসি। আর সামান্য যেন হাঁপাচ্ছে।

দরজার ওপরকার লাল বাতিটা নিভে গেল।

নিজের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর থেকে গাঢ় নীল রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট গোল কম্প্যাক্ট কেসের আয়নায় নিজের মুখ চট করে দেখে নিল সে। তারপর খুট করে কম্প্যাক্ট কেস বন্ধ করে ভ্যানিটি ব্যাগে ভরতে-ভরতে অনুকূল বর্মার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ইয়েস, নাও ইউ ক্যান গো ইন। মিস্টার সাহা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ফরসা। একটু নাদুসনুদুস গড়নের। খানিকটা বেঁটে মতো। বিরাট টেবিলটার ওপাশে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে কতকগুলো কাগজপত্র গোছাচ্ছিলেন।

অনুকূল বর্মাকে দেখে বললেন, 'আই অ্যাম সো সরি, মিস্টার বর্মা। আপনাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হল। আই অ্যাম এ ফ্রাইটফুলি বিজি ম্যান। হাজার ঝামেলা সামলাতে হয়। সিট ডাউন, সিট ডাউন।'

স্পষ্টভাবে মুখের দিকে না তাকিয়েও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মানুষের চেহারার সব কিছু খুঁটিনাটি লক্ষ করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা অনুকূল বর্মার আছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ঠোঁটের ডানপাশের ওপরকার অস্পষ্ট ছোট্ট লালচে ছোপটা তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল না!

মৃদু হাসলেন তিনি।

তারপর চেয়ারে বসে পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে গম্ভীর স্বরেই প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, মিস্টার সাহা?'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণও তখন সামনে থেকে কাগজপত্র সরিয়ে টেবিলের ওপাশে স্যুইভেল চেয়ারে বসে পড়েছেন।

তিনি বলে চললেন, 'দেখুন মিস্টার বর্মা, আমি মানুষটা খুব সিম্পল গোছের। কিন্তু বোকা নই! পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মাড়োয়ারি—নানা জাতের বিচ্ছু-বিচ্ছু লোক চরিয়ে আমাকে খেতে হয়। সবাই সবসময় ঠকাবার জন্যে যেন ওত পেতে আছে। কিন্তু আমাকে ঠকানো ভারী শক্ত মিস্টার বর্মা—ভারী শক্ত! এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আই অ্যাম ভেরি রিচ। পাঁচশো টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে পাঁচশো টাকা কেউ ঠকিয়ে নেবে—এটা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আই শ্যাল নট টলারেট!' উত্তেজিত হয়ে টেবিলের ওপর সজোরে তিনি ঘুষি মারলেন।

বাঁ-পায়ের ওপর ডান-পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আধবোজা চোখে সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে অনুকূল বর্মা বললেন, 'মাত্র পাঁচশো টাকার ব্যাপারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? কিন্তু জানেন বোধহয়, আমার ফি খুব চড়া। তাই ছোটখাটো কেসে আমাকে কেউ ডাকে না। লোকে আমাকে কনসাল্ট করে সাধারণত মার্ডার কেসে—।' বলতে-বলতে চট করে তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ।

অনুকূল বর্মা আবার সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে আধবোজা চোখে বলে চললেন, 'হ্যাঁ, মার্ডার কেসে, বড়-বড় ডাকাতির কেসে, লাখ-লাখ টাকার হীরে-জহরত চুরির কেসে।'

'জানি, মিস্টার বর্মা, জানি।' ততক্ষণে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। 'কিন্তু ওই যে বললাম, কেউ আমাকে একপয়সা ঠকায়, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তাই এই সামান্য পাঁচশো টাকার ব্যাপারে আপনাকে ডেকেছি। খরচের জন্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তোয়াক্কা করে না। ব্যাপারটা আপনাকে গোড়া থেকে বলি। এটা একটা কুকুর চুরির ব্যাপার—।'

'কুকুর চুরি!' বাস্তবিকই অবাক হয়ে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন অনুকূল বর্মা।

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কুকুর চুরি। শুনুন, ব্যাপারটা ঘটেছিল—।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ যে-ঘটনার কথা বললেন, সংক্ষেপে সেটা এই তাঁর স্ত্রীর ছোট একটা পমেরেনিয়ান কুকুর আছে। নাম জংলি। রোজ সন্ধেয় দেশপ্রিয় পার্কে সেটাকে বেড়াতে নিয়ে যায় তাঁদের বাড়ির কমলা নামে এক মাঝবয়েসি মেয়ে। কমলা ঠিক ঝি নয়—তাঁদের বাড়িতে থাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গিনী হিসেবে। মেয়েটি বিশেষ চালাক-চতুর না হলেও ভদ্রঘরের মেয়ে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্ত্রীর স্বাস্থ্য কোনওকালেই ভালো নয়। হালে তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটেছে। তাই তাঁর দিন-রাতের একজন সঙ্গিনীর দরকার। ব্যাপারটা ঘটে সাতদিন আগে। জংলিকে নিয়ে যথারীতি কমলা গেছে সেদিন সন্ধেয় দেশপ্রিয় পার্কে বেড়াতে। টেনিস-কোর্টের কাছে কমলার সঙ্গে দেখা হয় তার এক পরিচিতা মেয়ের। তারা দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানিক গল্প করছিল। চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা ছিল জংলি। বাড়ি ফেরার সময় স্ট্র্যাপে টান দিতে গিয়ে কমলা দেখে স্ট্র্যাপ কাটা। জংলি নিখোঁজ। কমলার হাউহাউ কান্না শুনে ভিড় জমে যায়। টেনিস-কোর্টের যে-মার্কার সেও ছুটে আসে। সবাই জংলিকে খোঁজে। কিন্তু কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। কাঁদতে-কাঁদতে কমলা বাড়ি ফিরে মিসেস সাহাকে সব কথা জানায়। কিন্তু তার আগেই মিসেস সাহা কুকুর-চুরির খবর পেয়েছিলেন টেলিফোনে। অজানা মেয়েলি গলায় কে একজন টেলিফোনে জানায় এলিয়ট রোডের হোটেল 'নেপচুনে' মিস্টার হার্বার্টের নামে পাঁচ টাকার নোটে পাঁচশো টাকা দিনদুয়েকের মধ্যে না পাঠালে কিংবা পুলিশে খবর দিলে জংলির বদলে বাড়িতে পৌঁছবে জংলির মৃতদেহ। মিসেস সাহা সঙ্গে-সঙ্গে করকরে নতুন পাঁচ টাকার নোটে পাঁচশো টাকা খামে ভরে সেই রাতেই কমলাকে দিয়ে বালিগঞ্জের পোস্ট আফিসে সেটা পোস্ট করান। তাঁদের বাড়িতে সবসময়েই প্রচুর ডাকটিকিট মজুত থাকে। তাই কোনও অসুবিধে হয়নি। পরের দিন রাতে দরজা আঁচড়ানোর শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখা যায় জংলি হাজির।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'জংলিকে কিনে দিয়েছিলাম মাত্র দুশো টাকায়! পাছে থানা-পুলিশ করি সেই ভয়ে আমার স্ত্রী এ-ঘটনার কথা আগে আমায় জানাননি। পরে জানতে পেরে আমি খুব রাগারাগি করি। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তো ঝগড়া করে জেতা যায় না! তাই পাঁচশোটা টাকা জলে গেল ভেবে ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়েই ফেলেছিলাম। হয়তো বেবাক ভুলেই যেতাম, যদি না গত পরশু হরিনারায়ণ সান্যালের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা হত। সান্যাল অনেকগুলো চা-বাগানের মালিক। আমার অনেকদিনের বন্ধু। আমি থাকি ল্যান্সডাউন টেরেসে, সান্যাল কেয়াতলায় প্রকাণ্ড বাড়ি করেছে। তার বেলাতেও হুবহু একই ঘটনা ঘটে। তার স্ত্রীকেও পাঁচশো টাকা খেসারত দিয়ে তাঁর পমেরেনিয়ান কুকুর উদ্ধার করতে হয়েছে। তফাতের মধ্যে এই—আমার স্ত্রীর কুকুর চুরি যায় দেশপ্রিয় পার্কে, তার স্ত্রীরটা যায় ট্যাঙ্গুলার পার্কে। মনে হল, ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়াতে চলেছে। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। জংলির ব্যাপারে কিছুতেই আমার স্ত্রী পুলিশে খবর দিতে দেননি। তাঁর ধারণা, পুলিশে খবর দিলে তাঁর জংলির নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটবে। তিনি জানেন, আপনি পুলিশের লোক নন। তবুও আপনাকে ডেকেছি বলে তিনি খুশি হননি।'

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার আমার দেখা করা দরকার। তিনি হয়তো আরও কিছু নতুন খবর দিতে পারবেন। ভবিষ্যতে তাঁর জংলি আর কোনও বিপদে পড়বে না

—আমার মুখ থেকে সে-কথা শুনলে তিনি হয়তো খানিকটা স্বস্তি পাবেন। তাঁকে ফোনে জানিয়ে দিন আধঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ির ড্রইংরুম দামি-দামি আসবাবপত্রে ঠাসা। যেন একটু বাড়াবাড়ি ধরনের সাজানো। দেখে মনে হয়, মার্জিত রুচিকে টেক্কা দিয়েছে নিজেদের ঐশ্বর্য জাহির করার প্রচেষ্টা।

মিসেস সাহার চেহারাটা রুগণ শুকনো গোছের। রুজ-পাউডারের প্রলেপও তাঁর মুখের ক্লান্তির ছাপ চাপা দিতে পারেনি। চোখের কোল বসা। চাউনি দেখলেই মনে হয়, মানুষটা খিটখিটে গোছের। সবুজ নরম একটা সোফার কোণ ঘেঁষে তিনি বসেছিলেন। তাঁর পিঠে আর চারপাশে নানা রঙের কুশন। কোলে লোমওলা ছোট একটা কুকুর।

অনুকূল বর্মা ঘরে ঢুকতেই কুকুরটা চক্ষের নিমেষে তাঁর কোল থেকে একলাফে নেমে ঘেউঘেউ করতে-করতে এগিয়ে এল।

'এই জংলু, জংলু—চলে আয় মানিক আমার, মা'র কোলে ফিরে আয়। এই কমলা, হাঁ করে দেখছ কী! জংলুকে তুলে নিতে পারছ না! আমার কাছে এনে দাও।' শেষের দিকে কথাগুলো তিনি প্রায় খিঁচিয়ে বললেন।

কমলা নামে মেয়েটির দোহারা চেহারা—মুখটা ভালোমানুষ-ভালোমানুষ, খানিকটা যেন বোকাসোকা ধরনের। দেখলেই মনে হয়, মিসেস সাহাকে সে যমের মতো ভয় করে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে মিসেস সাহার কোলের ওপর সে ছেড়ে দিল।

একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসে অমায়িক হেসে অনুকূল বর্মা বললেন, 'বাঃ, এ তো দেখছি ডগ-শো'তে প্রাইজ পাওয়ার মতো কুকুর! জংলি নামটাও খুব সুন্দর দিয়েছেন, মিসেস সাহা। বাঙালি বাড়িতে কুকুরের বিলিতি নাম আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না।'

জংলির প্রশংসা শুনে স্পষ্টই প্রসন্ন হয়ে উঠলেন মিসেস সাহা।

অনুকূল বর্মা বললেন, 'আপনার স্বামীর কাছে মোটামুটি ঘটনাটা শুনেছি। কিন্তু স্বামীরা হাজার কাজের ঝামেলায় থাকেন। অনেক খুঁটিনাটি কথা মনে থাকে না। তাই আপনার কাছে এলুম আর-একবার শুনতে। যত তুচ্ছই মনে হোক, কোনও কথা বাদ দেবেন না।'

কুকুর চুরির কাহিনি কমলার মুখে আবার শুনলেন অনুকূল বর্মা। টেলিফোনের কথা শুনলেন মিসেস সাহার মুখে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মিসেস সাহা জানালেন, টেলিফোনের স্বর একেবারে তাঁর অচেনা—তবে সেটা যে কোনও বাঙালি মেয়ের গলা, তাতে সন্দেহ নেই।

কমলা আর মিসেস সাহার কাছ থেকে নতুন কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে খানিকটা হতাশই হলেন অনুকূল বর্মা।

এমনসময় দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বাজল।

চমকে উঠে কমলা বলল, 'আপনার টনিক খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, বউদি। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে অনুকূল বর্মা প্রশ্ন করলেন, 'কমলা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়? ওর কাছ থেকেই আপনার জংলু যখন চুরি গিয়েছিল, তখন ওর সম্বন্ধে ভালো করে খবর নেওয়া দরকার।'

হেসে মিসেস সাহা বললেন, 'না, না, ওকে সন্দেহ করার কিছু নেই। আমার কাছে বছরখানেক আছে। তার আগে ছিল মিত্তিরদের বাড়িতে পাঁচ বছর। মিত্তিরগিন্নির শাশুড়ির খুব সেবা-যত্ন করেছে। মিত্তিরগিন্নি নিজে আমাকে বলেছে, মানুষটার স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো। খুব বিশ্বাসী। তা ছাড়া, জংলুকে সত্যিই খুব ভালোবাসে। জংলুও ওকে পছন্দ করে খুব। একমাত্র দোষ, ভয়ানক বোকা। মাথায় একেবারে গোবর ভরা।'

এমনসময় একটা ট্রেতে কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস জল, একটা খালি পেয়ালা-পিরিচ, একটা চামচ আর পেটমোটা একটা বেঁটে শিশি নিয়ে কমলা ঘরে এল।

সেই শিশি থেকে লালচে রঙের দু-চামচ টনিক পেয়ালায় ঢেলে সামান্য জল মিশিয়ে ঢক করে খেয়ে মিসেস সাহা মুখ বিকৃত করলেন। তারপর সাদা ন্যাপকিনে মুখ মুছে অনুকূল বর্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জংলু চুরি যাওয়ার পর থেকে মুখে কিছু রোচে না। এই টনিকটা খেতে খুব ভালো। কিন্তু আজকাল এটাও কেমন যেন বিস্বাদ লাগে।'

অনুকূল বর্মা সেই বেঁটে শিশিটা তুলে নিয়ে দেখলেন সেটা বিখ্যাত স্যান্ডোজ কোম্পানির Santevini নামের টনিক।

শিশিটা খাবার ট্রেতে রেখে তিনি বললেন, 'এটা তো বিখ্যাত টনিক, মিসেস সাহা। বিস্বাদ হওয়ার তো কথা নয়।'

মিসেস সাহা বললেন, 'আমার স্বামীও তাই বলেন। তিনি এটা নিজে কিনে আনেন চৌরঙ্গির ফ্র্যাঙ্ক রস থেকে। তবে আজকাল কোনও জিনিসে বিশ্বাস নেই। সব কিছুতেই ভেজাল।'

দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা আপনমনেই যেন অনুকূল বর্মা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, মিসেস সাহা। সব কিছুতেই ভেজাল—।'

তখন তাঁর মনে পড়ছিল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ঠোঁটের ডানপাশের ওপরকার অস্পষ্ট লালচে ছোট্ট ছোপটার কথা।

কমলা মেয়েটিকে বোকাসোকা ভালোমানুষ বলে মনে হলেও তার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খবরাখবর নেওয়া দরকার বলে অনুকূল বর্মার মনে হল। ল্যান্সডাউন টেরেস থেকে দেশপ্রিয় পার্ক খুব কাছেই। হাঁটতে-হাঁটতে সেখানে গিয়ে টেনিস-ক্লাবের মার্কারদের সঙ্গে তিনি কথা বললেন।

মার্কাররা সংখ্যায় আটজন। তাদের অনেকেই কমলাকে সন্ধের দিকে একটা পমেরেনিয়ান কুকুর নিয়ে বেড়াতে দেখেছে। দিন-সাতেক আগেকার সেই কুকুর চুরির কথা যার স্পষ্ট মনে পড়ল, সে-লোকটার নাম আর্নেস্ট—বাঙালি ক্রিশ্চান, বয়েস প্রায় চল্লিশ। তার নিজেরও কুকুর আছে। কুকুর চুরির পর কমলাকে কান্নাকাটি করতে দেখে স্বভাবতই কমলার প্রতি তার সমবেদনা জাগে। সমস্ত পার্ক তোলপাড় করে সে খোঁজে। কিন্তু কুকুরটার হদিশ পায় না। বলল, 'সমস্ত ইন্সিডেন্টটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে বইকি। আই অ্যাম অলসো এ ডগ-লাভার, স্যার!'

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে অনুকূল বর্মা গেলেন গড়িয়াহাটায় মিত্তিরদের বাড়ি।

মিস্টার মিত্রকে কমলার কথা জিগ্যেস করতে তিনি বললেন, 'কমলাকে আমরা সবাই খুব ভালো করে জানি। পাঁচ বছর ধরে মা'র কী সেবা-যত্নই না করেছে! ভারী বিশ্বাসী আর ভালোমানুষ গোছের। কুকুর খুব ভালোবাসত। মা'র একটা পমেরেনিয়ান ছিল। নাম ঝুমড়ু। বলতে গেলে, সেটা তো চব্বিশ ঘণ্টা কমলার পেছন-পেছন ঘুরত। মা মারা যাওয়ার আগে বলে যান, কুকুরটা কমলাকে যেন আমরা দিয়ে দিই। তাই দেওয়া হয়েছিল। বছরখানেক আগে কমলার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কাছে খবরাখবর নেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার স্ত্রী। আমার স্ত্রী তো কমলা সম্বন্ধে খুবই ভালো সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। মাঝে কমলা একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মা যে-কুকুরটা কমলাকে দিয়েছিলেন, সেটা নাকি মারা যায়। কুকুরটার জন্যে আমার স্ত্রীর কাছে সে খুব কান্নাকাটি করেছিল। তখনও সে কোনও কাজ জোটাতে পারেনি। নিজের এক রুগণ বোনের দেখাশোনা করত।'

মিত্তিরদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে অনুকূল বর্মা সোজা চলে এলেন এলিয়ট রোডের 'নেপচুন' হোটেলে। সন্ধে তখন সাড়ে সাতটা। এটা মোটামুটি ফিরিঙ্গি পাড়া। কয়েকটা ছোট 'বার', 'নেপচুন' জাতীয় নানা ছোটখাটো হোটেল, আর বোর্ডিং-হাউস আছে।

সেখানে ঢুকতেই রসুন-পেঁয়াজ দিয়ে মাংস রান্নার কড়া একটা গন্ধ অনুকূল বর্মার নাকে এল। সামনের ঘরটা ছোট। কম পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক বালব টিমটিম করে জ্বলছে। ডান দিকের কোণে ছোট একটা

টেবিল-চেয়ার। তার পাশের দেওয়ালে একটা কাঠের বোর্ডে নানা খাম-পোস্টকার্ড আটকানো। দেখলেই বোঝা যায়, এখানকার বাসিন্দাদের চিঠিপত্র—তারা নিজেরাই সেগুলো সংগ্রহ করে নেয়।

ঘরে কেউ ছিল না। অনুকূল বর্মা সেই চিঠির বোর্ডের কাছে গিয়ে খানিক তাকিয়ে রইলেন, তারপর কলিংবেল টিপলেন।

পাশের দরজা দিয়ে এক রোগা রোদে-পোড়া চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার পরনের সাদা ট্রাউজার বিশেষ পরিষ্কার নয়। শার্টটার অবস্থাও তথৈবচ। সবুজ টাইটা পোকায় কাটা, নোংরা।

ইংরেজিতে সে বলল, 'সরি, একটু কাজে ভেতরে যেতে হয়েছিল। আপনার ঘরের দরকার?'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'না, এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর খোঁজে। নাম মিস্টার হার্বার্ট। তিনি আছেন?'

'না মিস্টার, এখানে হার্বার্ট নামে কেউ এখন নেই।'

চিঠির বোর্ডটা দেখিয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'আপনার হোটেলে যারা থাকে না, মাঝে-মাঝে তাদের নামেও এখানে চিঠি আসে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেকসময় আসে।'

'সেইসব চিঠিপত্র নিয়ে কী করেন?'

'ওই চিঠির বোর্ডে আটকে রাখি। এখন না থাকলেও পরে সেই নামের লোক আসতে পারে। বহুবার সেরকম ঘটনা ঘটেছে। দিন-সাতেকের মধ্যে সে-নামের লোক না এলে চিঠি যারা পাঠায় তাদের নামে পোস্টে ফেরত পাঠাই।'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'আমার বন্ধু হার্বার্টের নামে দিনকয়েক আগে এখানকার ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সে-চিঠিটা বোর্ডে দেখছি না।'

'নিশ্চয়ই, সেটা আপনার নামে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আজকালের মধ্যেই ফেরত পাবেন।—আমার হোটেলের ঘর-টর দেখবেন না, স্যার? ব্যবস্থা ফার্স্ট ক্লাস। রান্নাবান্না খুব ভালো। মোগলাই ডিশ থেকে ইউরোপিয়ান ফুড—যা চাইবেন পাবেন। আমাদের রেটও খুব সস্তা। আশা করি, দরকার হলে এখানে আসবেন, আপনার বন্ধু-বান্ধবদেরও রেকমেন্ড করবেন।'

'অফ কোর্স! অফ কোর্স!' বলতে-বলতে অনুকূল বর্মা 'নেপচুন' হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। সন্ধে তখন সোয়া আটটা।

এলিয়ট রোডের এক ডাক্তারখানার বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা ছিল সেখান থেকে টেলিফোন করা যায়। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অনুকূল বর্মা সেই ডাক্তারখানায় ঢুকে হরিনারায়ণ সান্যালের বাড়ির টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টরি থেকে বের করে ডায়াল করলেন।

মেয়েলি গলায় উত্তর এল 'হ্যালো, আমি মিসেস সান্যাল কথা বলছি!'

'আমার নাম অনুকূল বর্মা। একটা কুকুর চুরির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখা করার পক্ষে এখন হয়তো একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। কাল কোনও সময়ে—।'

বাধা দিয়ে মিসেস সান্যাল বললেন, 'মোটেই না—মোটেই না। আমার স্বামী ক্যালকাটা ক্লাবে পার্টিতে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না। স্বচ্ছন্দে এখনই আসতে পারেন। এমনিতেই আমার ঘুম হয় না। আপনি কি সেই বিখ্যাত অনুকূল—।'

বাধা দিয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'হ্যাঁ, ডিটেকটিভ! ন'টার মধ্যে পৌঁছচ্ছি।'

ডাক্তারখানা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে তিনি বললেন, 'বালিগঞ্জ—কেয়াতলা।'

হরিনারায়ণ সান্যাল আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার ড্রইংরুম মোটামুটি একইরকম সাজানো। মিসেস সান্যালের পমেরেনিয়ানটাও মিসেস সাহার কুকুরের মতো হুবহু একইরকম দেখতে। তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গেও কমলার চেহারার অনেক মিল। মিল নেই শুধু বীরেন্দ্রকৃষ্ণর স্ত্রীর সঙ্গে মিসেস সান্যালের চেহারার আর বেশভূষার।

মিসেস সান্যালের চেহারা যাকে বলে গোলগাল ধরনের। বব করে চুল ছাঁটা। পরনে কমলা রঙের বেল-বটম আর হাতকাটা টি-শার্ট। ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক আর সিগারেট। অনর্গল তিনি কথা, বলে যান, যেন তুবড়ি ফুটছে।

'—বাস্তবিকই সব দোষ এই চপলার। আমার প্যানজিকে নিয়ে ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে বেড়ানোর কথা। আর উনি কিনা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মোহিত হয়ে ভালুক-নাচ দেখছিলেন। বলুন, মিস্টার বর্মা, ওর কি এখন ভালুক-নাচ দেখার বয়েস আছে?'

তারপরের ঘটনাগুলো হুবহু এক। এমনকি মেয়েলি গলায় টেলিফোনে পাঁচ টাকার নোটে পাঁচশো টাকার দাবি, নইলে প্যানজির মৃতদেহ পাঠানোর ভয় দেখানো পর্যন্ত। তফাত শুধু হোটেলের নাম-ঠিকানায় আর লোকের নামে। মিসেস সান্যালকে বলা হয়েছিল রাসেল স্ট্রিটের 'কাফে ডি ফ্যানটাসি'তে উইলিয়াম জোনস-এর নামে ডাকযোগে টাকা পাঠাতে।

'প্যানজি ফিরে আসার পরের দিন সকালেই নিজে ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম ''কাফে ডি ফ্যানটাসি''তে। ফ্যানটাসিই বটে! একেবারে ওঁচা একটা থার্ড ক্লাস হোটেল। দেখি, সামনের ঘরটার দেওয়ালে চিঠির বোর্ডে আমার হাতে ঠিকানা লেখা সেই খামটা আটকানো রয়েছে। ঘরে তখন কেউ ছিল না। চক্ষের নিমেষে খামটা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে আসি। এই ড্রইংরুমে খামটা খুলে দেখি—ওহ মাই গড—!'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'দেখলেন, নোটের বদলে কতকগুলো সাদা কাগজ!'

সিগারেট টানতে ভুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে মিসেস সান্যাল বললেন, 'কী করে গেস করলেন, মিস্টার বর্মা?'

'এটা তো খুব সহজ কথা, মিসেস সান্যাল। চোর তো আর বোকা নয়! প্যানজিকে ফেরত পাঠানোর আগে টাকাগুলো হাতিয়ে নেওয়া তার পক্ষে তো খুবই স্বাভাবিক। তারপর সেই খামে সাদা কাগজ ভরে যথাস্থানে রেখে আসাও তার পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ নয়।'

'—সব কথা জানতে পারার পর আমার স্বামীর সে কী রাগ, যদি দেখতেন মিস্টার বর্মা! যাকে বলে একেবারে ফায়ার! তাঁকে আগে আমি কিছু জানাইনি। জানতুম, জানালে নিশ্চয়ই তিনি পুলিশের কাছে ছুটতেন আর আমার প্যানজির ডেডবডি দোরগোড়ায় পড়ে থাকত! পুরুষরা ওই এক জাত, মিস্টার বর্মা। তাদের মাথায় শুধু টাকার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁকে কী করে বোঝাব, প্যানজি আমার কাছে আমার ছেলের চেয়েও বেশি—।'

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় অনুকূল বর্মার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। মনে হল, তিনিও যে একজন পুরুষ, সে-কথা খুব সম্ভব উত্তেজনার মাথায় মিসেস সান্যালের খেয়াল ছিল না।

অনুকূল বর্মা বাড়ি ফিরেই অমিয় সেনকে ফোন করলেন। ধনী পরিবারের ছেলে অমিয় সেন—তাঁর বিশেষ বন্ধু বিখ্যাত অ্যাটর্নি শিবনাথবাবুর সে ভাগ্নে। আর্টিস্ট মহলে তার খুব নাম-ডাক। একবার নাগপুরে একটা জটিল কেসের তদন্ত করার সময় অমিয়র সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। তারপর থেকে বয়েসের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

'হ্যালো, অমিয় সেন বলছি—।'

'আমি অনুকূল বর্মা। কী করছিলেন?'

'কিছুই করছিলাম না। ভাবছিলাম, গাড়িটা নিয়ে একপাক ঘুরে আসি।'

'কুড ইউ ডু মি এ ফেভার, মিস্টার সেন?'

'একশোবার। বলুন, কী করতে হবে?'

'এখনি একবার ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে পারেন? আপনার পৌঁছতে অবশ্য সাড়ে দশটা হবে।'

'ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বেয়ারা-বাবুর্চি থেকে ম্যানেজার—সবাই আমাকে চেনে—।'

'খুব ভালো কথা। সেখানে হরিনারায়ণ সান্যাল আজ পার্টি দিচ্ছেন। খুব সম্ভব বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহাও থাকবেন। তাঁদের চেনেন?'

'খুব চিনি। আমার লাস্ট এগজিবিশন থেকে তাঁরা ছবি কিনেছিলেন। এখনও চেক পাইনি—।'

'সেটাই তো বড়লোকের লক্ষণ! আমার কাজটা খুব কঠিন নয়। একটু গসিপ করা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের একজন দারুণ চেহারার আলটা-স্মার্ট রিসেপশনিস্ট আছে। একটু খবর বের করা—সেই রিসেপশনিস্টের প্রতি তিনি কতট্রা স্যুইট! সে-ভদ্রমহিলাও সেখানে থাকতে পারেন। কিছু হুইস্কি পেটে পড়ার পর আর বল-রুমের মিউজিক জমে ওঠার সময় ন্যাচারেলি লোকের মুখ খুলে যায়। খুব একটা রেখে-ঢেকে তখন তারা কথা বলে না।'

'এ তো খুব সহজ কাজ। ইন ফ্যাক্ট ভুলেই গিয়েছিলাম—সান্যালসায়েব আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। এক্ষুনি বেরোচ্ছি।'

টেলিফোনের রিসিভার নামাতেই মাধবী ঘরে এসে বলল, 'জেঠু, খাবার দেব?'

অনুকূল বর্মা মৃদু হেসে বললেন, 'এখন খাবারের চেয়ে আমার জরুরি দরকার একজন ঘটকীর!'

'এত রাতে ঘটকী?' অনুকূল বর্মার কাছে মানুষ হয়ে খুব সহজে মাধবী অবাক হয় না। তবু অবাক না হয়ে সে পারল না 'কোনও পাত্রের খবর চাও? নাকি পাত্রীর?'

পাইপ ধরাতে-ধরাতে অনুকূল বর্মা আবার মৃদু হেসে বললেন, 'খুব সম্ভব পাত্র। ঠিক জানি না। তবে সে মানুষ নয়। একটা কুকুর—পমেরেনিয়ান। মাধু-মা, পঞ্চাকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে তার জগাপিসিকে নিয়ে আসতে। সে খুব তুখোড় ঘটকী, পঞ্চা যাকে গেজেট বলে। বোলো, ট্যাক্সিতে তাকে বাড়ি ফেরত পাঠাব। ফি দেব পঁচিশ টাকা।'

পঞ্চা বহু বছর রয়েছে অনুকূল বর্মার কাছে। মাধবীর নানা সম্বন্ধ নিয়ে প্রায়ই তার জগাপিসি এ-বাড়িতে আসে।

রাত পৌনে এগারোটার সময় পঞ্চা তার জগাপিসিকে ট্যাক্সি করে এনে হাজির করল। মানুষটা আধবুড়ি। পরনে থান কাপড়। হাতে একটা পুঁটলি। সবসময়েই জর্দা-পান চিবোয়। খরখর করে হাঁটে। মুখে যেন খই ফুটছে।

ঘরে ঢুকে সে বলল, 'পেন্নাম হই, বড়বাবু। কার জন্যে পাত্তর গো?' তারপর মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মুখ টিপে হেসে অনুকূল বর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাকি কনে চাই—ছিমছাম সুন্দরী কনে? তা বাপু আপনার কী আর বয়েস! এ-বয়েসের ঢের মিনসেকে বিয়ে করতে দেখেছি—।'

লজ্জা পেয়ে পঞ্চা ধমকে উঠল, 'জগাপিসি, তোমার জিভে কিছু আটকায় না? বড়বাবুর সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, জানো না?'

জগাপিসি খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই থাম, পঞ্চা। বড়বাবুর সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, তোর চেয়ে ঢের ভালো করেই জানি। বড়বাবুকে কি আর মিনসে বলছি? মিনসে বলছি অন্য মিনসেদের! বড়বাবু তো মহাদেবতুল্য মানুষ। কত মেয়ে তো ওনার পাদোদক পেলে নিজেদের ধন্যি মনে করবে। তা যা বলছিলাম, বড়বাবু—আমার সন্ধানে সব বয়েসের এমন সব মেয়ে আছে, যাদের হুরিও বলতে পারেন, পরিও বলতে পারেন। একেবারে ডানাকাটা পরি! আর কী রং—জল খেলে জল দেখা যায়—।'

পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে অনুকূল বর্মা তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিলেন, 'সেসব কথা পরে হবে, ঠাকরুণ। আপাতত আমার একটা জরুরি খবর দরকার। তুমি তো দিনরাত টইটই করে ঘুরে বেড়াও। কারুর হাঁড়ির খবর জানতে তোমার বাকি নেই। আমার একটা সাদা ছোট লোমওলা কুকুরের খোঁজ দরকার। সেইসঙ্গে তার মালিকের। মালিক মেয়ে—বয়েস বোধহয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শরীরও খারাপ। বড় একটা বাড়ি থেকে বেরোয় না। দেশপ্রিয় পার্ক কিংবা তেকোণা পার্কের কাছাকাছি কোথাও থাকে। খুব সম্ভব কোনও বস্তিতে, নয়তো খুব সস্তা ভাড়ার একটা-দুটো ঘর নিয়ে। মাঝে-মাঝে ওই দুটো

পার্কের কোনওটায় কুকুর নিয়ে সে বেড়াতে আসে—খুব সম্ভব সকালে। তার সঙ্গে যেসব মেয়ে দেখা করতে আসে, তাদের সঙ্গেও থাকে সাদা ছোট লোমওলা কুকুর। তারা দেখা করতে আসে সন্ধের দিকে। কাল বিকেলের মধ্যে খবরটা দিতে পারলে আরও দশ টাকা দেব। তোমার রাহাখরচের জন্যে এখন এই পঁচিশ টাকা রাখো। পঞ্চু তোমাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে আসবে। খবরটা জোগাড় করতে পারবে তো? আর-একটা কথা—কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে খবরটা আমি জানতে চেয়েছি।'

করকরে পঁচিশ টাকা পেয়ে এবং আরও দশ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনায় পঞ্চার জগাপিসির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'খুব পারব, বড়বাবু, খুব পারব। যেখান থেকে পারি মাগিকে খুঁজে বার করব—।'

পঞ্চা ধমকে উঠল, 'এই পিসি, ভালো করে কথা বলতে কবে শিখবে?'

তার জগাপিসিও খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই থাম তো, পঞ্চা!'

পরের দিন সকাল দশটায় অনুকুল বর্মা যথারীতি তাঁর মোটা পাইপটা ধরিয়ে ডাকের চিঠিগুলো দেখছিলেন। পাশের ঘরে মাধবী যথারীতি খটখট করে টাইপ করছিল। এমনসময় তাঁর টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

পাইপ নামিয়ে রিসিভার তুলে অনুকূল বর্মা বললেন, 'হ্যালো—!'

'আমি অমিয় বলছি। কাল রাতে ফিরতে অনেক দেরি হল। একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছি। আপনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। হ্যারির, মানে হরিনারায়ণ সান্যালের পার্টিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা আর তাঁর রূপসী রিসেপশনিস্ট মিস লিলি সিনহাও ছিলেন। উঃ, ভদ্রমহিলা যা একটা ব্লাউজ পরেছিলেন! মনে হয়, আধ-গজ কাপড় থেকে ও-ধরনের খানচারেক ব্লাউজ অনায়াসে বানানো যায়! হ্যারি স্কচের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিলেন। আপনার খবরটা বের করতে খুব একটা গসিপ করতে হয়নি। লিলির ওপর সত্যিই তিনি স্যুইট, অতিমাত্রায় স্যুইট। একজন বলল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্ত্রী খুবই অসুস্থ। বেশিদিন তিনি নাকি বাঁচবেন না। তাঁর মৃত্যুর শুভক্ষণের অপেক্ষায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নাকি দিন গুনছেন। তারপরেই—দেখা হলে আরও নানা ডিটেলস বলব—।'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'ডিটেলস-এর দরকার নেই। এতেই হবে। থ্যাঙ্কস।'

দুপুরে অনুকূল বর্মা বেরিয়ে নিজের কয়েকটা দরকারি কাজ সারলেন। ফিরতি পথে চৌরঙ্গির ফ্র্যাঙ্ক রস থেকে কিনলেন স্যান্ডোজ কোম্পানির একশিশি Santevini টনিক।

তিনটে নাগাদ বাড়ি পৌঁছতে মাধবী তাঁকে বলল, 'জেঠু, পঞ্চার জগাপিসি বাস্তবিকই অসাধ্য-সাধন করেছে! সেই ভদ্রমহিলার নাম উৎপলা। থাকেন মহানির্বাণ রোডের কাছে একটা বস্তিমতো জায়গায়। একটা সাদা পমেরেনিয়ান তাঁর আছে। আর যা-যা বলেছিলে সবই মিলে গেছে। পঞ্চার জগাপিসি আমার জন্যে কার্তিকের মতো নানা পাত্রের কথা বলে জ্বালিয়ে মারছিল। তাকে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। এই নাও, সেই ভদ্রমহিলার নাম-ঠিকানা।'

অনুকূল বর্মার হাতে একটুকরো কাগজ সে এগিয়ে দিল।

মৃদু হেসে অনুকূল বর্মা বললেন, 'জানতাম, পঞ্চার জগাপিসির অসাধ্য কিছু নেই!'

তারপর চেয়ারে বসে ফোনের রিসিভার তুলে তিনি ডায়াল করলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে।

উত্তর এল, 'হ্যালো, মিসেস সাহা কথা বলছি।'

'নমস্কার। আমি অনুকূল বর্মা। আপনার স্বামী কখন ফিরবেন?'

'বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায়। কেন?'

'আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট ডিসকাশন আছে। চারটে নাগাদ গেলে অসুবিধে হবে?'

'কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু কী ব্যাপার, মিস্টার বর্মা? জংলু সম্বন্ধে?'

'জংলু সম্বন্ধে ততটা নয়—কারণ, আপনার জংলুর আর কোনও বিপদ ঘটবে না, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এটা আপনার ওই টনিকটা সম্বন্ধে। খুব সম্ভব ওটা ভেজাল। আমি ইতিমধ্যে খানিক খোঁজখবর নিয়েছি। আমার দুটো অনুরোধ আছে। এক নম্বর, ছোট একটা কাগজে আপনার নাম সই করে, আপনার ঠিকানা আর আজকের তারিখ দিয়ে সেটা ওই টনিকের শিশির গায়ে সাঁটিয়ে রাখবেন। ওই শিশি থেকে আর টনিক খাবেন না। আপনাকে আমি তাজা আর-একশিশি টনিক দেব। দু-নম্বর, কমলাকে আজ বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দেবেন। জংলুকে আজ আর বাড়ি থেকে বেরুতে দেবেন না। আপনার কাছেই রাখবেন। —রাজি?'

'রাজি। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিস্টার বর্মা—।'

'দুর্ভাবনা করার কিছু নেই, মিসেস সাহা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনুকূল বর্মা ফোন কেটে দিলেন।

কাঁটায়-কাঁটায় বিকেল চারটেয় অনুকূল বর্মা ল্যান্সডাউন টেরেসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে পৌঁছলেন। সকালে কেনা নতুন টনিকটা মিসেস সাহাকে দিয়ে পুরোনো টনিকের শিশিটা নিয়ে নিজের পোর্টফোলিওতে ভরলেন। ওষুধের দোকানের মালিকের সঙ্গে জাল ওষুধ বিক্রি করা নিয়ে তাঁর একটা কাল্পনিক বচসার কথা খুব ফলাও করে বললেন। তারপর মিসেস সাহাকে জংলুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সেই চিরকুট দেখে মহানির্বাণ রোডের বস্তিমতো জায়গাটার একতলা বাড়িটার সামনে যখন পৌঁছলেন, তখন সাড়ে পাঁচটা।

তিনি কড়া নাড়তেই ঘরের মধ্যে একটা কুকুরের উত্তেজিত ডাক শোনা গেল। দরজা খুলল কমলা। তারপর অনুকূল বর্মাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে এক-পা পিছিয়ে গেল। চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'হা ভগবান!' তার কথাগুলো শোনাল আর্তনাদের মতো।

ঘরের মধ্যে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চারদিকে তাকালেন অনুকূল বর্মা। চারদিকেই দারিদ্র্যের চিহ্ন। আসবাবপত্র বলতে কেরোসিন কাঠের ছোট একটা টেবিল, হাতল-ভাঙা একটা চেয়ার আর সরু একটা তক্তপোশ। তক্তপোশের বিছানাটা ময়লা। সেখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাঝবয়েসি একটা ভারী রোগা মেয়ে। চুলগুলো রুক্ষ, চোখের তলায় কালি, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে রং। দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোনও কঠিন রোগে সে ভুগছে।

অনুকূল বর্মাকে দেখে তার কোলের কাছ থেকে একলাফে নেমে উত্তেজিত গলায় ডাকতে-ডাকতে তেড়ে এল সাদা লোমওলা একটা কুকুর—হুবহু মিসেস সান্যাল আর মিসেস সাহার কুকুরের মতো দেখতে। বুঝতে দেরি হয় না, এটাও জাতে পমেরেনিয়ান।'

কুকুরটাকে কমলা কোলে তুলে নিল। হাতল-ভাঙা চেয়ারটায় অনুকূল বর্মা বসলেন।

ভাঙা গলায় কমলা বলল, 'সব কিছু আপনি তাহলে জানেন, মিস্টার বর্মা?'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'সব কিছু বলতে পারি না, তবে প্রায় সব কিছু বলতে পারো। উনিই তোমার দিদি উৎপলা?'

তক্তপোশের দিকে তিনি তাকালেন। তারপর কমলার কোলের কুকুরের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আর ইনিই সেই ঝুমড়ু, মিস্টার মিত্রের মায়ের কুকুর? যিনি সমস্ত রহস্যের নায়ক? রহস্যটার সমাধান তাহলে হয়ে গেল! আমার কাজও ফুরোল!'

উত্তেজনায় কমলার চোখদুটো তখন প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়। ভাঙা গলায় আবার সে বলল, 'আপনি তো সব কথাই জানেন দেখছি, মিস্টার বর্মা।'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'জানি বলার চেয়ে ঠিক-ঠিক অনুমান করতে পেরেছি বলাই ভালো। এই কুকুর চুরির প্ল্যান তোমার মাথাতেই প্রথম আসে। ঝুমড়ুর সাহায্যে সব কিছু তুমি অর্গানাইজ করেছিলে। মিসেস সাহার জংলুকে নিয়ে সেদিন সন্ধেয় বেড়াতে বেরিয়ে তুমি সোজা চলে আসো তোমার দিদির কাছে। তারপর

জংলুকে এখানে রেখে ঝুমড়ুকে নিয়ে যাও দেশপ্রিয় পার্কে—রোজ যেমন সেখানে সন্ধের দিকে যাও জংলুকে নিয়ে বেড়াতে। টেনিস-ক্লাবের মার্কার আর্নেস্ট তোমাকে দ্যাখে একটা পমেরেনিয়ান কুকুর নিয়ে বেড়াতে। পার্কে যারা রোজ আসে, কুকুরের সঙ্গে তোমাকে বেড়াতে তাদের আরও অনেকেই লক্ষ করে। কুকুর নিয়ে তোমাকে বেড়াতে দেখা নতুন কিছু নয়। কারণ, কুকুর নিয়ে রোজই তুমি ওখানে বেড়াতে যাও। পমেরেনিয়ান কুকুরদের দেখতে একইরকম। বাইরের লোকের পক্ষে চেনা অসম্ভব—কে জংলু, কে প্যানজি, কে ঝুমড়ু। তারপর একটি মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে তুমি আলাপ জুড়ে দাও। কথা বলতে-বলতে একসময় ব্লেড দিয়ে তুমি কেটে দাও ঝুমড়ুর চামড়ার ফিতেটা। ঝুমড়ু খুব ইন্টেলিজেন্ট। তার ওপর তোমার ট্রেনিং পেয়েছে। একদৌড়ে সে ফিরে আসে তোমার দিদির কাছে। তার মিনিটকয়েক পরে তুমি হইচই জুড়ে দাও কুকুর চুরি গেছে বলে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে মিসেস সান্যালের কুকুর প্যানজির বেলায়। তোমার বোন চপলার কাছ থেকে প্যানজি চুরি যায় ট্যাঙ্গুলার পার্কে। আসলে কিন্তু প্রথমে চপলা এখানে আসে প্যানজিকে নিয়ে আর ট্যাঙ্গুলার পার্কে যায় ঝুমড়ুকে নিয়ে—।'

'বাধা দিয়ে কমলা বলে উঠল, 'কিন্তু চপলা যে আমার বোন, সে-কথা জানলেন কী করে?'

মৃদু হেসে অনুকূল বর্মা বললেন, 'সব কিছু জানাই তো আমার পেশা! চেহারার আদল আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। তা ছাড়া, আরও একটা আদল আছে—সেটা নামের। লক্ষ্মীর এক নাম কমলা, আর-এক নাম চপলা। তারপর উৎপলার যখন খবর পেলাম, তখন বুঝতে দেরি হল না—কমলা, চপলা, উৎপলা তিন বোনের নাম!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমলা বলল, 'আপনার সব কথাই অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি, মিস্টার বর্মা। আমি চোর। ধরা পড়ে গেছি। আমার বলার কিছু নেই।'

তক্তপোশে শুয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল উৎপলা।

পকেট থেকে নিজের সেই অদ্ভুত গড়নের মোটা পাইপটা বের করে তামাক ঠাসতে-ঠাসতে অনুকূল বর্মা প্রশ্ন করলেন, 'স্মোক করতে পারি?'

তাঁর প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না।

পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অনুকূল বর্মা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার স্বপক্ষে সত্যিই কি বলার কিছু নেই, কমলা?'

হঠাৎ মুখ-চোখ আরক্ত হয়ে উঠল কমলার। তার স্বরের মধ্যে ফুটে উঠল বেপরোয়া ভাব। সে বলে চলল, 'আছে, মিস্টার বর্মা, আছে। আমিও লোক চিনতে পারি, মিস্টার বর্মা। আমার বুঝতে ভুল হয়নি—আপনার হৃদয় দরাজ, আসলে আপনি ভারী দয়ালু মানুষ। আমাদের সব কথা আপনাকে বলছি।

'আমার দিদির খুব অসুখ। বড়-বড় অনেক ডাক্তার-সার্জেন দেখিয়েছি। কারুর ফি বত্রিশ, কারুর চৌষট্টি। তাঁদের দামি-দামি ওষুধের নানা প্রেসক্রিপশন। তা ছাড়া, ফল-ডিম-দুধ—এসবের খরচও কম নয়। দিদির, চপলার, আমার যা-কিছু পুঁজি ছিল, সোনা-দানা ছিল—ডাক্তারে আর ওষুধে সব প্রায় শেষ হতে চলেছে। আপনাদের বিখ্যাত সার্জেন লাহিড়ী বলেছেন, মস্তবড় একটা অপারেশান না করলেই নয়। ইউটাস আর কী-কী যেন কেটে বাদ দিতে হবে। নইলে ক্যান্সার। সব কিছুর খরচ অন্তত হাজার-দুয়েক টাকা। অত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করি? হঠাৎ ঝুমড়ুর বুদ্ধি দেখে সমস্ত প্ল্যানটা আমার মাথায় আসে। সাধারণ লোকের চোখে সব পমেরেনিয়ানই দেখতে একরকম। আর কাছে-পিঠে কত বড়লোক বউদেরই তো পমেরেনিয়ান আছে! কাজ শুরু করার আগে মিত্তিরগিন্নিকে আমি বলে এসেছিলাম, ঝুমড়ু মারা গেছে।

'বড়লোকদের এই সব নিষ্কর্মা বউরা কুকুর পোষে আর আমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গিনী হিসেবে চাকরি দেয়। বলে কম্প্যানিয়ন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে-ব্যবহার করে তা ঝিদেরও বেহদ্দ। কথায়-কথায় দাঁত খিঁচোয়, গালাগালি দেয়। মনে হয়, তারা কুকুর পুষে যেরকম আনন্দ পায়, আমাদের গালিগালাজ করে তার চেয়ে কম আনন্দ পায় না। তাদের বড়লোক স্বামীরা যে সবসময় সাধু উপায়ে টাকা কামায় না, নানা

ছোটখাটো ঘটনায়, নানা কাটা-কাটা কথায় সে-কথা আমার জানতে বাকি নেই। আর তাদের নিষ্কর্মা, দাম্ভিক, খামখেয়ালি, অপদার্থ, নিষ্ঠুর বউরা সেই টাকা দু-হাতে ওড়ায়—হাজার-হাজার টাকা ওড়ায়, মিস্টার বর্মা! নিজের চোখে দেখেছি। তাদের সেই টাকার মোটা থলি থেকে শ' পাঁচেক টাকা গেলে তাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। তাই ঝুমড়ুর সাহায্যে খুব একটা সদুপায়ে না হোক, কিছু টাকা জোগাড় করাটা কোনওরকম নৈতিক অপরাধ বলে আমার মনে হয়নি। আমার আরও দুই খুড়তুতো বোন আছে। দিদিকে তারাও খুব ভালোবাসে। আমাদের মতো তারাও বড়লোকের বউদের কম্প্যানিয়ন। ঝুমড়ুর সাহায্যে তারাও কিছু টাকা জোগাড় করেছে। আমাদের ফান্ডে দিদির অপারেশানের জন্যে এখন সবসুদ্ধু জমেছে মোট আড়াই হাজার। আপনাদের ওই বিখ্যাত সার্জেন লাহিড়ীর স্ত্রীর কাছ থেকেও আমরা পাঁচশো টাকা আদায় করেছি!'

বলতে-বলতে কমলার মুখে বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠল।

পাইপ থেকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন অনুকূল বর্মা। তাঁর ঠোঁটের মৃদু হাসি সেই ধোঁয়ায় আড়াল পড়ল।

তিনি বললেন, 'তারপর?'

কমলা বলে চলল, 'তারপর আর বিশেষ কিছু বলার নেই, মিস্টার বর্মা। এক বোন কুকুর চুরি করার পর অন্য যে-কোনও বোন টেলিফোন করত। বড়লোকের বউরা প্রতিবারেই টাকা-ভরা খাম দিত আমাদেরই পোস্ট করতে। খাম খুলে নোট বের করে তার বদলে সাদা কাগজ ভরে আমরা পোস্ট করে দিতাম!'

কমলা থামল। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। এমনকী ঝুমড়ু পর্যন্ত।

তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় কমলা বলল, 'আমাকে হয়তো আপনার সঙ্গে এখুনি থানায় যেতে হবে, তাই না, মিস্টার বর্মা? শুধু বিশ্বাস করবেন, মিস্টার বর্মা, টাকার লোভে চুরি করিনি। দিদির চিকিৎসার জন্যেই চুরি করেছিলাম।'

অনুকূল বর্মার পাইপ নিভে গিয়েছিল। সেটাকে আর না ধরিয়ে তিনি পকেটে ভরলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'এখনই তার দরকার নেই। হয়তো কখনওই তার দরকার হবে না। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে, আজ থেকে কুকুর চুরি বন্ধ।'

উৎপলা আর কমলা সাগ্রহে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই।'

'আর মিসেস সাহার পাঁচশো টাকা আমার ফেরত চাই।'

তক্তপোশের তলা থেকে পুরোনো একটা ট্রাঙ্ক টেনে তার ভেতর থেকে একটা মোটা খাম বের করে কমলা অনুকূল বর্মার হাতে দিল। নোটগুলো গুনে তিনি নিজের পোর্টফোলিওতে ভরলেন। তাঁর হাতে সেই টনিকের শিশিটা ঠেকল।

পোর্টফোলিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'আশা করছি, তোমার নামে চুরির অভিযোগ আনার সাহস বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার হবে না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

উৎপলা আর কমলা পরস্পরের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখের কোণে তখন জল চিকচিক করছে।

শুধু একলাফে খাটে উঠে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে ঝুমড়ু ঘেউঘেউ করে উঠল।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস-ঘরে অনুকূল বর্মার সঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার কথা হচ্ছিল। বাইরের দরজার ওপর 'Don't Disturb' লেখা বাতিটা জ্বলছিল তখন।

নিজের পোর্টফোলিও খুলে অনুকূল বর্মা পাঁচ টাকার নোটের পাঁচশো টাকার গোছাটা বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, মিস্টার সাহা, আপনার স্ত্রীর সেই পাঁচশো টাকা।'

একমুখ হেসে নোটগুলো বাঁ-পকেটে ভরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'এর মধ্যেই কাজ হাসিল করেছেন? মাই গুডনেস! লোকে তাহলে ঠিকই বলে : মিস্টার বর্মা নেভার ফেলস! কিন্তু ক্রিমিন্যাল কে? ক্রিমিন্যালকে আমার চাই!'

অনুকূল বর্মা বললেন, 'ক্রিমিন্যাল কে আমি জানি। আমার হাতে এমন প্রমাণ আছে, যাতে তাকে সহজেই অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু, মিস্টার সাহা, আমার অ্যাডভাইস, সে-চেষ্টা করবেন না।'

খেঁকিয়ে উঠলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, 'হোয়াট রাবিশ! কেন সে-চেষ্টা করব না?'

'কারণ, তাহলে আমাকে আরও একটা সিরিয়াস কেস নিয়ে কাজ করতে হবে। সে-কেসটা হচ্ছে অ্যাটেমটেড মার্ডারের কেস,' বলতে-বলতে অনুকূল বর্মা সেই টনিকের শিশিটা তাঁর পোর্টফোলিও থেকে বের করে টেবিলে রাখলেন 'এই টনিকটা আপনার স্ত্রী খাচ্ছিলেন। আপনি কিনে দিয়েছিলেন। শিশির গায়ের আটকানো কাগজে আপনার স্ত্রীর সই আর তাঁর নিজের হাতে লেখা ঠিকানা আর তারিখ আছে! আর মজা কী জানেন, মিস্টার সাহা, আমি নিজে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখেছি, টনিকের মধ্যে আছে আর্সেনিক বিষ।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মুখ তখন খড়ির মতো সাদা হয়ে গেছে। গলার স্বর শুকনো। বাঁ-পকেট থেকে সেই পাঁচশো টাকার নোটের তাড়াটা বের করে অনুকূল বর্মার দিকে ঠেলে দিলেন। তারপর বুকপকেট থেকে আর-এক তাড়া নোট বের করে কাঁপা-কাঁপা হাতে সেটা অনুকূল বর্মার দিকে এগিয়ে তিনি বললেন, 'এতে হাজার টাকা আছে। আপনার ফি বাবদ এটা রাখুন। ক্রিমিন্যালকে আমার দরকার নেই, আমার স্ত্রীর টাকাগুলোরও দরকার নেই।'

অমায়িক হেসে নোটের দুটো তাড়া আর টনিকের শিশিটা নিজের পোর্টফোলিওতে ভরে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে অনুকূল বর্মা বললেন, 'থ্যাঙ্কস!'

ব্যস্ত হয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু ওই শিশিটা?'

'শিশিটা আমার কাছে রইল। এর ফলে এক মহিলা মার্ডার হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবেন। আর এই দেড় হাজার টাকা খরচ হবে একটি দুঃস্থ মহিলার চিকিৎসার ব্যাপারে। আর ভালো কথা, মিস্টার সাহা, সাবধানে থাকবেন। দেখবেন, আপিসের মধ্যে আপনার ঠোঁটে যেন না আর লিপস্টিকের দাগ পড়ে!'

অনুকূল বর্মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা 'Don't Disturb' লেখা লাল বাতিটা নেভাতে ভুলে গেলেন।

পরের দিন সকালে অনুকূল বর্মা কমলার নামে দেড় হাজার টাকার একটা চেক লিখছিলেন। এমনসময় টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠল।

রিসিভার তুলে তিনি বললেন, 'হ্যালো—!'

'আমি অমিয় সেন বলছি। কী কাণ্ড! লেটেস্ট স্ক্যান্ডাল জানেন? গতকাল বিকেলে আপিস-ঘরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর সেই রূপসী রিসেপশনিস্টকে চড় মেরেছিলেন—স্ল্যাপড হার রিয়েলি ভেরি হার্ড! দারুণ হইচই! মিস লিলি সিনহা এখন হরিনারায়ণ—মানে মিস্টার হ্যারির প্রাইভেট সেক্রেটারি! আপনি কী কলকাঠি নাড়লেন, মিস্টার বর্মা?'

'ডিটেলস শুনতে হলে এখানে আসতে হবে। আর শোনবার ফি হিসেবে একটা কুকুরের খুব ভালো স্কেচ করে দিতে হবে। কুকুরটার নাম ঝুমড়ু।'

'আপনার সব কথাই একটা হেঁয়ালি, মিস্টার বর্মা। আমি এক্ষুনি আসছি—।'

মাসিক রোমাঞ্চ
আগস্ট, ১৯৭৩



জঙ্গলের অভিজ্ঞতা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শিকার মানুষের একটি আদিম বুনো প্রবৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একান্তই বাঁচার প্রয়োজনে বন্য পশুকে বধ করা দরকার হয়েছিল। একদিকে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়না, অপর দিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কা সব সময় অরণ্যবাসী মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। তখনকার দিনে মানুষ গুহার আশ্রয় পেলেও বাঘ, সিংহ কিংবা অন্য কোনও হিংস্র মাংসভুক জানোয়ার গুহার ভেতর প্রবেশাধিকার পেলে পরিত্রাণ ছিল না।

সে-যুগকে পেছনে ফেলে মানুষ এগিয়ে এল সভ্যতার সামনে। পাহাড় ও জঙ্গলের ভীতিপ্রদ আবেষ্টনী ছেড়ে মানুষ সভ্যতার আওতায় গড়ে তুলল গ্রাম, শহর। বাঁচার ধারায় চলল নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে পাওয়ার জন্যে চলল বিবিধ আয়োজন। চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমপরিবর্তিত জীবনধারায় বাঁচার জন্যে সংগ্রাম বহুদিকে থেকেই গেল। আহার-সংস্থানের জন্যে জঙ্গলে ঘোরার প্রয়োজন কেটে গেল বটে, কিন্তু বাঁচার দ্বন্দ্বে মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা এবং ভিন্ন প্রকারের হিংসা এমনভাবেই এল যে, মানুষ জানোয়ারকে মারা ছাড়াও শত্রুদমনের জন্যে নিত্যনতুন ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আবিষ্কার করতে লাগল।

আজ যে-যুগে আমরা এসে পৌঁছেছি, সেখানে শিকার এসে দাঁড়াল শৌখিনতার পর্যায়ে। দল বেঁধে হাতি চড়ে শিকারের শৌখিনতাকে মানুষ হত্যার বিলাস করে তুলল, তার সঙ্গে গোপনে যোগ দিল Poachers-এর দল। তাদের অস্ত্রাঘাতে মরতে আরম্ভ করল এমন সব জানোয়ার, যাদের চামড়া ফ্যাশানমত্তা শৌখিন মেয়েদের গলাবন্ধের স্থান নিল অথবা ড্রইংরুমে পদদলিত করার জন্যে চামড়া শোভাবৃদ্ধির কাজে লাগতে লাগল। দু-দিক থেকেই ফ্যাশানের আশ্রয় নেওয়ায় মানুষ হিংস্র পশুকেও নৃশংসতায় হার মানিয়ে দিল। ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে জঙ্গলবাসী পশুদের বাঁচাবার জন্যে অনেকেই সচেষ্ট হলেন, হওয়া প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু চেষ্টা কতটা সাফল্য লাভ করেছে, তা এখনও জানা যায়নি।

উপস্থিত শিকারের কথায় আমার বক্তব্যের ঘটনাগুলি আমাকে জড়িয়েই। শিকারি আমি নিজে, সুতরাং আমার বুনো প্রবৃত্তিকে কোনও অছিলায় আড়াল দেওয়ার চেষ্টা ফলপ্রদ হবে বলে মনে করি না। তবে এই প্রবৃত্তির সূত্র খুঁজলে দেখা যাবে, আদিম যুগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের হিংস্র আচরণে যে-তফাত আছে, তা বহুক্ষেত্রে সাজিয়ে সত্যকে আড়াল দেওয়া। এইখানে আমার সমর্থনে যেটুকু দৃষ্টান্ত আদিম মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিল ঘটে, তা বলতে পারলে অন্তত সান্ত্বনা থাকে যে, আমি প্রয়োজনীয়তার খাতিরে হিংস্র

জন্তু বধ করে অন্যায় কিছু করিনি। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে আমার শিকারের শৌখিনতাকে সাত্ত্বিক ধর্মাবলম্বীরা নিন্দনীয় ভাবতে পারেন। এতবড় ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার চেষ্টা আমি করব না। তথাপি বলব, ক্ষেত্র বিশেষে হিংসা-প্রবৃত্তিই মানুষের উপকারে লেগেছে। নরভুক বাঘ মেরে জঙ্গল-ঘেঁষা গ্রামের মানুষকে আতঙ্কের কবল থেকে শিকারি নিষ্কৃতি দিয়েছে। গ্রাম্য জীবনধারায় পল্লীবাসী সহজ চলাফেরার সুবিধা পেয়েছে। তা ছাড়া, এমন বাঘের সংস্পর্শে শিকারি এসেছে, যারা আহার সম্বন্ধে বিশেষ রুচির অনুগত। গোয়ালঘর থেকে পুষ্ট গাভিন গোরুকে মারতে পারলে, তারা প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক আহার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতে চায় না। কয়েকটি ঘটনা থেকে জানতে পারা যাবে যে, শিকারি কীরকম বিপদ সঙ্গে নিয়ে সাহস দেখিয়ে বাহবা পেতে চায়।

অনেকের ধারণা যে, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এমনই শক্তিশালী যে, বাঘ, সিংহ, হাতি, ভালুক, গণ্ডার অথবা মহিষ কিংবা বাইসন এক গুলিতেই মরে, সুতরাং শিকারে বধ্য জীব যতই ভয়ঙ্কর হোক, যতই শক্তিশালী হোক, মানুষের আবিষ্কৃত আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পাশবিক শক্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না। আনা তো চলেই না, বরং শিকারির তুলনায় শিকারকে নিরীহ বলতেও বাধে না। কথাটা হয়তো ঠিক। তবে যেখানে গুলি লাগলে জানোয়ার দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় না, সেই জায়গায় লক্ষ্যভেদ করতে হলে দীর্ঘকালের অভ্যাস দরকার, কারণ, মারের মারাত্মক স্থান নিতান্তই ক্ষুদ্রাকার। একটি পূর্ণকায় হাতির মারণস্থলের মাপ নিলে বার হবে, তার কর্ণগহ্বরই শ্রেষ্ঠ স্থান, মানে কয়েক ইঞ্চির ঘেরাও মাত্র। দ্বিতীয়, দুই চোখের ওপরের মধ্যস্থল। যতটা কাছ থেকে Vital Spot-এ নির্ভুল লক্ষ্যভেদের ওপর নির্ভর করা যায়, তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতি নিকট থেকেই সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ, গুলি ঠিক জায়গায় লাগাতে না পারলে শিকারিকেই শিকার হয়ে যেতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাগমারীর প্রশ্নে আরও একটা কথা আছে, যার সঙ্গে ধৈর্য ও আত্মসংযমের যোগ অবিচ্ছেদ্য। ভয়ে হোক, উত্তেজনায় হোক, যে-কোনও কারণে লক্ষ্যভেদের সময়ে অতি সামান্য হাত কেঁপে গেলেই, বন্দুকের নল থেকে বার হওয়া গুলি যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই এবং যেখানে গুলির মারে সামান্য ক্ষতের বেশি কিছু হবে না, সেখানে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ জানোয়ার আততায়ীকে নিকটে পেলে কীভাবে আপ্যায়ন জানাবে, তা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ অবস্থায় বহু শিকারি অসাবধানতাবশত মৃত্যুকে বরণ করেছেন। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে যে, অতি শক্তিশালী অস্ত্র সহায় থাকলেও শিকারির বিপদ থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে বিপদ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় বিশদ বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা সংক্ষেপে বললেই হবে।

প্রথমেই বন্দুকের ব্যবহারে সতর্কতা সম্বন্ধে বলি। অনেকদিন আগের কথা। দীর্ঘকাল বন্দুক ব্যবহার না করার পর কিছু মোটা টাকা হাতে আসায় কয়েকটি High Velocity Rifle কিনে ফেললাম, তার সঙ্গে সাধারণ দোনলা Shot Gun ছাড়াও Pistol এবং Revolver-ও ছিল। বহুদিন আগে রংপুরে বন্যবরাহ ইত্যাদি মারায় ছেলেবেলা থেকেই রাইফেল চালনায় অভ্যস্ত ছিলাম। অনেকদিন পরে শিকারের অস্ত্রগুলি আবার হাতে আসায় জঙ্গলের ডাক অনুভব করতে লাগলাম। শিকারের নেশায় যারা উত্তেজনা জোগায়, তাদেরকে আমরা বলি খোবুরী, অর্থাৎ যারা খবর দেয় কোথায় বাঘ, লেপার্ড বা বুনো শুয়োর পাওয়া যাবে। খবর এল, মাদ্রাজের কাছেই পঁচিশ-তিরিশ মাইলের মধ্যে একটি গ্রামে দুটি লেপার্ড বেজায় উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। একদিন দু-দিন অন্তর কুকুর অথবা ছাগল, ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আহারের সুব্যবস্থায় রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মাদ্রাজে তখন আমি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিকারে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার (চিত্রশিল্পী) তখন মাদ্রাজে আর্ট কলেজে আমার কাছে শিখতে এসেছিলেন। আমি যে শিক্ষাপীঠে শিক্ষাদানের কর্তব্য নিয়েছিলাম, সেখানে গুরুকুল-পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টায়

একেবারে অসফল হইনি। এই কারণে বিদ্যাপীঠে হাজিরা দেওয়ার পর ক্লাসের শেষে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দাঁড়াত বন্ধুর মতো। সুবিধাটি কাজে লাগালেন কালীকিঙ্কর। জানালেন, 'আমিও যাব আপনার সঙ্গে শিকার করতে।' বন্দুকের অভাব ছিল না, কিন্তু বন্দুক চালনায় কালীকিঙ্করের অজ্ঞতা ছিল বিশ্বাসযোগ্য। কাজেই ভয় পেলাম, তার হাতে ভরা বন্দুক দিতে। কালীকিঙ্কর দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি বন্দুক না পাওয়ায় কসাই-এর মাংস-কাটা ছুরি হাতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট হলেন। ছুরিটি অতি বৃহৎ নেপালি কুকরির মতো। অস্ত্রটি নতুন এবং বেজায় চকচকে। বিঘ্নকারী ডালপালা কাটার জন্যে অস্ত্রটি সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যার আগেই ঘরোয়া মোটরগাড়ি করে একেবারে খোবুরীর দেওয়া ঠিকানায় এসে পৌঁছনো গেল। চারধারে অনেক ছোটখাটো পাহাড়, বড় রকমের টিলা ছাড়া আর কিছু নয়। এরই মাঝখানে একটি নোংরা ছোট্ট ডোবা, ডোবার চারপাশে ঘন বাঁশঝাড়, আশশেওড়ার ঝোপ এবং আরও কত কী অজানা গাছের ভিড়। জায়গাটা লাগল ভালো। মনে হল, খবরটা মিথ্যা নয়। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা এগিয়ে এল, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, বিভিন্ন গাছের এ-ডালে ও-ডালে খটখট করে কোনও অবাঞ্ছনীয় কীটের কর্মব্যস্ততার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল। কালীকিঙ্কর আমার পাশেই বসে ছিলেন। দেখি, তিনি সেই উজ্জ্বল ধারালো অস্ত্রটি নিয়ে ওলটপালট করে কী দেখছেন।

ইস্পাতের উজ্জ্বলতার যে-ছটা এদিক-ওদিক ছড়াচ্ছিল, তা বিনা ক্লেশে ডোবার ওপার থেকেও দেখা যায়। কালীকিঙ্করের কানের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বারণ করলাম, 'নড়াচড়া কোরো না। চিতা কাছে এলেও পালাবে।' কিছুক্ষণের জন্যে তিনি অস্ত্রটি নামিয়ে রাখলেও, স্থির হয়ে বসে থাকা কালীর ধাতে সয় না। তিনি থেকে-থেকে পিঠের দিকটা আচমকা চুলকাতে আরম্ভ করেছিলেন। শুধু কি চুলকানো? চুলকানি পাওয়ার একটা Signal-ও সঙ্গে থাকল। হাত নাড়ার আগেই বেশ জোরেই 'উঃ' শব্দের পর চুলকানির দ্বারা আরাম সংগ্রহ হতে লাগল। বুঝলাম, কালী শিকারের সব কিছু পণ্ড করে দেবেন।



শিকারে সহ্যশক্তি ও সংযম একটি প্রধান সহায়। এবং কালীকিঙ্কর সহ্য ও সংযম, কোনওটিকেই মানতে রাজি নন। এখানে বক্তৃতা দ্বারা চরিত্রশুদ্ধির চেষ্টা বৃথা। রাগ এসে গিয়েছিল, তার প্রকাশ হল সাবধানতার বাণী দিয়ে। বললাম, 'উঃ, আঃ, এসব চলবে না।' কালী বোধহয় আদেশটি মানলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার শব্দ শুনলাম, 'উঃ।' নিশ্চিত হলাম, শিকার নিশ্চয়ই কাছে এসেছিল, কালীই তাকে তাড়ালেন। হতাশ হয়ে মাটিতে চাপড় মেরে তাঁকে বললাম, 'কী করছ, কালী?' কালী এবার করুণ স্বরে আমারই মতো চুপিচুপি বললেন, 'স্যার, আমার জামার তলা দিয়ে একটা বড় এবং শক্ত পোকা ঢুকে গিয়েছে। সে কিলবিল করে চলছে, আর থেকে-থেকে কামড়াচ্ছে!' এতটা বলার পরই সে আবার বলে উঠল, 'উঃ!'

এতক্ষণ ব্যাঙের কোলাহল শুনিনি, এইবার দাদুরির ডাকে বাঘের বদলে কবিতা এল তেড়ে সব কিছু মোলায়েম করে দেওয়ার জন্যে। শিকারের আশা ছেড়ে মাটিতে পাতা শতরঞ্চির ওপর কোনওপ্রকারে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়লাম। কালী স্বেচ্ছায় পাহারায় বসে রইলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বাঘ যদি দাদার কাছে আসে, তাহলে এককোপেই ওই বৃহৎ ছুরির দ্বারা তার মুণ্ডচ্ছেদ করে দেবেন।

বাঘ, লেপার্ড, বনবিড়াল, এমনকী একটা নেউল পর্যন্ত আসেনি। সকালবেলা শিকারের সব আকর্ষণ বর্জন করে ওঠা গেল। Ready Trigger-এ ভরা Rifle পাশেই গাছের ডালে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল। যত রাগ গিয়ে পড়ল ওই বন্দুকটার ওপর। বন্দুক তুলে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে 'দুৎ তোর' বলে মাটিতে বন্দুকের বাঁটটা দিলাম ঠুকে। তারপরেই শুনলাম কানের পাশেই কামান দাগার বিকট আওয়াজ। ৫০০ বোরের High Velocity Rifle থেকে গুলি বেরিয়ে গেল ঠিক আমার কানের পাশ দিয়ে। Ready Trigger-এ আমার আঙুল লাগানোই ছিল, বন্দুকের বাঁট জোরে মাটিতে ঠুকে যাওয়ায় আমার অজ্ঞাতেই Trigger-এ টান পড়েছিল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলেও কখনও Ready Trigger-এ হাত রাখব না। অস্ত্রও যে শিকারীর কাছে মারাত্মক বিপদ হতে পারে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়।

অস্ত্র সম্বন্ধেই আর-একটা ঘটনা শুনেছি। বন্দুকের নল দীর্ঘকাল পরিষ্কার না হওয়ায় নলের ভিতর এমনভাবেই মরচে পড়েছিল যে, সেগুলোকে ছোটখাটো লোহার দানা বলা যায়। এই বন্দুক নিয়েই শিকারির বাঘ মেরে সাহস দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বন্দুকের নল ফেটে শিকারীর দুটি চোখ ও কপালের খুলি উড়িয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকের কপাল ভালো যে, যন্ত্রণা ভোগের জন্য তিনি বেশিক্ষণ বাঁচেননি।

নতুন জায়গায় এলাম। এখানে ঘোর ঘটা করে পিকনিকের অছিলায় মেয়ে-পুরুষ মিলে শিকারে আসা হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এইখানে পাঁঠা বাঁধলে পনেরো মিনিটের মধ্যে লেপার্ড এসে পাঁঠাকে নিয়ে যাবে এবং লেপার্ড এমনই জলদি কাজ সারবে যে, আপনি গুলি চালাবারও সময় পাবেন না। তাই বলি, এখানে পাঁঠা বাঁধার আগে ওখানে একটা পাঁঠার মাথার সাইজের পাথর রাখি, আমি 'মারুন' বললেই গুলি চালাবেন—এক সেকেন্ড যেন দেরি না হয়।' তাগমারীর দম্ভে আমার ছিল নির্ভরশীল দাবি। কাজেই এই সামান্য শর্তকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। বললাম, 'রাখো পাথরের নুড়ি, চেঁচাও "মারুন" বলে, দেখবে, তোমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার গুলি চলে গেছে।' তাই শর্তানুসারে গুলি চলল, কিন্তু পাথরে-লাগা গুলি পিছলে গিয়ে পড়ল একটি চাষাব পায়ের সামনে। সে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠাতে আমরা সকলে সেইদিকে গেলাম। লোকটা বেশ দূরেই ছিল। আমাদের ভাগ্য ভালো গুলি তার গায়ে লাগেনি। সে তেড়ে এল একটা কড়া অভিযোগ জানাবার জন্যে। সোজা কথায় সে বলতে চেয়েছিল, 'আর-একটু হলেই যে মরেছিলাম!' আমার ক্রটি স্বীকার করার ওপরেও নালিশ থামানোর জন্যে কিছু ঘুষ দিতে হল। এইরূপটি ঘটত না, যদি আমি পাথরের ওপাশে কী আছে দেখে নিতাম।

এবারেও শিকারের জায়গা অন্ধ্রপ্রদেশেই স্থির হল, মানুষখেকো বাঘের খবরে। নরখাদকের সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। এই কারণেই জানতাম না যে, সাধারণ বাঘ ও নরমাংসভুক বাঘের আচরণে অনেক গরমিল থাকতে পারে। মানুষখেকো বাঘের চলাফেরা, শিকার ধরার প্রথা সবই সাধারণ বাঘের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তফাত। একে তার ভয়ডর অনেক কম, তার ওপর বেজায় চালাক। যাই হোক, শিকারের নেশায় তখন রং লেগে গিয়েছিল, ভয় বা বিপদের সম্বন্ধে খবর নেওয়ার ধৈর্য ছিল না।

এখানে পাহাড়ি পথে বাঘের পদচিহ্ন খোবুরীর দেওয়া ঠিকানা অনুসারে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি। দেখলাম, যে-জীব পদচিহ্ন রেখে গেছে, সে একটি বিরাট বাঘ। ছোটখাটো কুলোর মতো সামনের দুটো থাবা। নরম ধুলোর ওপর টাটকা দাগ দেখে কিছুমাত্র ভুল রইল না যে, জানোয়ারটি সুস্থ শরীরে ঘোরাফেরা করে না। ডানদিককার পায়ের থাবার পুরোপুরি চিহ্ন মাটিতে পড়েনি। অন্যত্র শিকারের অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরেছিলাম, বাঘ কোন দিক থেকে আসবে। ছাউনি-দেওয়া গোরুর গাড়িতে এসেছিলাম, সঙ্গে একটি ছোট্ট মোষের

বাচ্চাও ছিল। জন্তুটিকে Live Bait হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছিল। যেখানে ছোট্ট মোষটা বাঁধা হল, তার কাছাকাছি মাচান বাঁধার উপযুক্ত কোনও গাছ পাওয়া গেল না এবং মাটিতে গর্ত করে বসার জন্যে কোনও আয়োজনও সঙ্গে করে আনিনি। গত্যন্তরে ঠিক করলাম, গোরুর গাড়ির তলায় বসব। সামনে বিরাট চাকা। এত কাছ থেকে গুলি চালালে বাঘ এক গুলিতেই মরবে, তবু সাবধানতার জন্যে তিন ইঞ্চি ম্যাগনাম এল. জি. বন্দুকের নলে ভরে নিলাম। যদি গুলি খেয়েও বাঘ লাফ মারে, তাহলে চাকার কাছে এসে পৌঁছবার আগেই তিন ইঞ্চি ম্যাগনাম এল. জি. তার দফা শেষ করে দেবে। বেলা থাকতেই এদিকে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আর-একটি ছাত্র। গাড়োয়ানও সঙ্গে এনেছিল তার একটি দেহরক্ষী। কারণ, শর্ত ছিল, আমাদের শিকারের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গাড়োয়ান তার দুটো বলদ নিয়ে ফিরে চলে যাবে। এ-জঙ্গলে কোনও মানুষ একলা চলাফেরা করে না, এমনকী দিনেরবেলাতেও নয়। তাই তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল। আমার সঙ্গে যে-ছাত্রটি এসেছিল, তার মধ্যে শিকারের বাতিক কে এনেছিল জানি না, কিন্তু বন্দুক কাছে থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই মাটিতে বসতে রাজি হল না, ছাউনি-ঢাকা গাড়ির ওপর উঠে পড়ল। গাড়ির সমভাবে ওঠানামার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, দু-দিকেই বাঁশের ঠেকা দেওয়া হয়েছিল। আমি যে-চাকার তলায় বসেছিলাম, সে-জায়গাটি পাহাড়ি রাস্তার একটি মোড়ের কাছে। তার মানে, রাস্তাটি আমার বসার জায়গা থেকে মোড় ফেরার পথে আমি যেখানে বসে আছি তার ওপর দিকে উঠে গেছে। আরও সোজা করে বলতে গেলে দাঁড়ায়—যেখানে আমার ছাত্রটি ছাউনি দেওয়া গাড়ির ওপর বসেছিল, সে-জায়গাটি ওপর দিকে যাওয়ার পথ থেকে সামান্য উঁচু। এখান থেকে গাড়ির ওপরে বসে মোড়ের দিক থেকে ওপরে ওঠার পথে রাস্তার কিনারায় অনেক ঝোপঝাপ থাকা সত্ত্বেও সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়, এবং ছেলেটি দেখেওছিল। দেখার বর্ণনা দিচ্ছি। গাড়ির ছাউনিকে ছোটখাটো ডালপালা দিয়ে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ক্যামোফ্লেজ (Camouflage) কাজে আসেনি। বিকালে লাগানো সবুজ পাতা কড়া রৌদ্রে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, একটু নড়াচড়াতেই খড়খড়ে আওয়াজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আওয়াজের কথা গোড়ার দিকে ভাবিনি; কারণ, ঠিক ছিল, আমরা দুজনেই চাকার আড়ালে পিঠোপিঠি বিপরীতদিকে মুখ রেখে বসব। কিন্তু ছাত্র শিকারি আবেষ্টনীতে যা দেখল, তাতে মাটিতে বসা তার পোষাল না। তিনি গুরুভক্তি দেখালেন, 'যা শত্রু পরে-পরে' ভেবে।



ইতিমধ্যে জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। চতুর্দিকে কোনও শব্দ নেই। একটি পাখিও উড়ছে না। বাঘের জঙ্গলে আড়ালহীন জায়গায় মাটিতে বসলে এইরকম সময়ে কেমন একটা আতঙ্ক নিজের অজ্ঞাতেই কাছে আসতে থাকে। আমার মনের যখন এইরকম অবস্থা, তখন দেখলাম ছাউনির ওপরটা বেশ কাঁপছে, আর আমার ছাত্র 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ শুরু করে দিয়েছে। কালীকিঙ্করকে যেভাবে ধমক দিয়েছিলাম, এবারেও সেইভাবে আস্তে ধমক দিয়ে বললাম, 'আওয়াজ কোরো না, বাঘ আসার সময় হয়ে

গেছে।' ধমক কাজে এল। বেশ কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। কিন্তু বদভ্যাস যাবে কোথায়! আবার 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ। এবার মাত্রাও যেমন বেশি, তেমনি ছাউনির দোলাও বেড়ে উঠল। মনে হল, 'উঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দের সঙ্গে ছেলেটি বলছে, 'বঃ-বঃ-বঃ-বাঘ!' সন্দেহ রইল না যে, ছেলেটিকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে এবং ভুল বকছে। এখন করি কী? সে যেভাবে গোঙানির আওয়াজ শুরু করল, তাতে বাঘ যে এদিকে আর আসবে না, তাতে সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ বাদে গোঙানির শব্দ থেমে গেল, তার সঙ্গে ছাউনিতে বাঁধা ডালও গেল মাটিতে পড়ে, যা সরু পচা দড়ি দিয়ে কোনওপ্রকারে ছাউনির চাঁচারিতে বাঁধা হয়েছিল। 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দের সঙ্গে দেহের যে-কাঁপুনি এসেছিল, তারই ঝাঁকুনিতে ডালটা বেশ সশব্দেই মাটিতে পড়ল। ওপরে উঠে সান্ত্বনা দিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ সারাবার চেষ্টা বৃথা ভেবে, ওই বাঁধা মোষটার দিকে তাকিয়েই বসে রইলাম। সময় এগিয়ে চলল গভীর রাতের দিকে, রাতও এগিয়ে চলল। এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার ঝিমুনোর সময় মাথা গিয়েছিল চাকায় ঠুকে। চমকে উঠে বসেছি, অভ্যাসমতো বন্দুকের দিকে হাতও চলে গিয়েছিল। বাঘ আসেনি।

শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল, চাকার তলা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে রাগকে শাসন করে রুগিকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, সে চমৎকার সুস্থ শরীরে বসে আছে চোখ দুটো বড়-বড় করে মোড়ের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে। প্রথম কথাতেই জিগ্যেস করলাম, 'জ্বর কি খুব বেশি হয়েছিল?' বললে, 'না, স্যার, বাঘ।' বলেই দেখিয়ে দিল কোন জায়গায় বাঘকে সে আসতে দেখেছে। জায়গাটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন থাকায় বন্দুক নিয়ে মোড়ের দিকে চললাম, ছাত্রটিও আমার সঙ্গ নিল। সে এইটুকু ব্যবধানেও একলা থাকতে চায় না। মোড় ঘুরে দেখলাম, সত্যিই আমার চেনা বাঘের থাবা পড়েছে রাস্তার ওপরে এবং এসে থেমেছে ঠিক আমার গাড়ির চাকার পেছনে। বাঘ এইখানেই বসেছিল এবং ল্যাজের নড়াচড়ায় খানিকটা জায়গা প্রায় ঝাঁট দেওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। বসার ভঙ্গি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, আক্রমণের জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু আমার ছাত্রটি আমাকে বাঁচিয়ে দিল। 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ এবং ছাউনি থেকে ডাল যদি সশব্দে ছিঁড়ে মাটিতে না পড়ত, তাহলে বাঘ কত সহজে হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিতে পারত—তা অনুমান করা চলে। কারণ, পেছন থেকে থাবার একটি থাপ্পড়েই আমার মাথা ধড় থেকে বিচ্যুত হত। আত্মরক্ষার কোনওরকম উপায়ই পেতাম না। এখানে আমার সাহসের কোনও পরিচয়ই নেই। নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞতা এবং দৈবকৃপায় যদি ছাত্রটি রীতিমতো ভয় না পেত, তাহলে আজকে সত্য ঘটনার বিবৃতি দেওয়ার সুবিধে পেতাম না।

পরের ঘটনা কর্নুলের জঙ্গলে। বাঘ মারতে এসেছিলাম। বাঘের বসতি এখানেও কম নেই। যে-বাঘের খবর পেয়ে এখানে এসেছিলাম, শুনলাম, সে নাকি মন্ত্রপূত। এ-পর্যন্ত বহুবার তার ওপর গুলি চলেছে, কিন্তু কেউই তাকে মারতে পারেনি। ওই বাঘকে বিজলিবাতির আলো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সে নাকি সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে অদৃশ্য করে দেয়।

বর্ণনাটি তেমন উৎসাহপূর্ণ বলে মনে হল না, তথাপি মন্ত্রকে মারার অস্ত্র আমার কাছে ছিল। একটি গোরু মারার খবর পেয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। গোরুটি একটি শুকনো নালার তলায় পড়েছিল। চারধার একেবারে ফাঁকা। কিছু দূরে কয়েকটি বাঁশের ঝোপ থাকলেও তার ভেতরে বসে নালার তলায় লক্ষ্যভেদ অসম্ভব। বাঘ এলেও তাকে দেখা যাবে না। লক্ষ্যভেদে সুবিধের জন্যে শিকারের একটি নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে বসলাম। আমরা ছিলাম দলে সাত-আটজন। গোরুর গলায় কোনওরকমে আলগোছে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে টেনে পাড়ের ওপর তুলতে আমরা হিমশিম খেয়ে গেলাম। গলায় দড়ি পরাবার প্রথায় দুটি ডালের সাহায্যে মাথা তোলা হয়েছিল এবং এবারেও সেইভাবে মাথা তুলে গলার ফাঁস আলগোছে খোলা হল, যাতে মানুষের ছোঁয়া গোরুর ওপর না লাগে। বাঘকে সন্দিগ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না। তবু এইটুকু সাবধানতা কোনও কাজে আসবে বলে মনে হল না। কারণ, মরা গোরু যে চলে না বাঘও জানে এবং সেই মরা গোরু খালের ওপর উঠে আসায় যে সন্দেহের কারণ হয়েছিল—তা বাঘ কাছে এলেই জানতে পারবে।

তবে পথ চলতে বাঘ মানুষের গন্ধ প্রায়ই পেয়ে থাকে। কাজেই এ-বিষয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এখন কাছাকাছি বসার জন্যে কৃত্রিম বাঁশের ঝোপ যদি করা যায়, তবেই শিকারে বসা চলে।

শিকারে বহু ক্ষেত্রে মনকে দৃঢ় করায় অনভ্যস্ত ছিলাম না। লোকগুলিকে বললাম, 'বেশ দূরে গিয়ে যতগুলো পারিস বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।' ডালপালাসমেত অনেকগুলো গোটা-গোটা বাঁশ যথাসময়ে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু মাটিতে গর্ত করার জন্যে শাবল, কোদাল আনলেও সেগুলো কাজে লাগানো গেল না। এখানে মাটির বালাই নেই, সবই নুড়ি। কয়েক ইঞ্চি গর্ত করার চেষ্টা করলেই শাবলের মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে, সুতরাং বাঁশগুলো একের ওপর আরেকটা ঠেকা দিয়ে সাজানো ছাড়া আর কোনও পথ পাওয়া গেল না। ব্যাপারটি দাঁড়াল, বাঘ যদি গুলি খেয়ে লাফ মারে, তাহলে বাঁশের কেল্লার মধ্যেই আমার গোর হয়ে যাবে। মাঝখানে ফাঁক রাখায় কোনওরকমে বসলাম। চলতি নিয়মানুসারে আমাকে ভেতরে বসিয়ে সঙ্গের লোকগুলো কথা বলতে-বলতে গ্রামের দিকে চলে গেল।

এখানেও এত কাছ থেকে Rifle-এর ব্যবহার অর্থহীন, তাই দোনলা Shot Gun নিয়ে বসেছিলাম। মাথার ওপর একটি ডালে মোটরগাড়ির Spot Light লাগিয়ে Switch রাখলাম আমার হাতে। বাঘ ঠিকই এল, কিন্তু যখন সুইচ টিপলাম, তখন আলো পড়ল আমার মুখের সামনে; কারণ ওপরের Spot Lightটা কীভাবে বেঁকে গিয়েছিল। বাঘ আমাকে দেখল জ্যোতির্ময় রূপে আর বাঘ নিজে রইল অন্ধকারে ডুবে। জন্তুটিকে দেখবার সুযোগও পেলাম না। এরপরই সে একটি হুঙ্কার দিয়ে স্থানটি পরিত্যাগ করল। আলো দেখে ভড়কানো অভ্যাস না থাকলে বাঘ ওইভাবে পালাত না।

সারারাত বসেই থাকলাম। ভোরের দিকে কয়েকটা ভালুক এসে ঠিক আমার পেছনেই উইয়ের ঢিপিতে জোরে শোষণকার্য শুরু করে দিল। উইয়ের গর্তে মনোমতো আহার পাওয়ায় আনন্দের উচ্ছ্বাসে এমনভাবেই রুখে উঠল যে, শোষণকালীন যে-যার নিজের অংশে ভাগ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে হুড়োমুড়ি পড়ে গেল। আমার পাশেই ভাগ-বাটরার গোল বাধায় হুড়োমুড়ির ধাক্কা এসে পড়তে লাগল আড়াল দেওয়া বাঁশের ওপর। বাঁশগুলি একটার ওপর আরেকটা ঠেসান দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। অনবরত ধাক্কা লাগায় বাঁশের ঘরেও দোলা শুরু হয়ে গেল। বেশিক্ষণ এইভাবে দোলা চললে ভালুক আমাকে ছেড়ে দিত না। কপাল ভালো যে, আহারের আকর্ষণ ওদের এমনভাবেই অন্যমনস্ক করে রেখেছিল যে, আমি ওদের অত কাছে থাকা সত্ত্বেও খোঁজ নেওয়ার অবসর পায়নি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ভালুকের দল চলে গেল। তখন প্রায় সকাল হয়ে গেছে। লোকদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম, কারণ বাইরে থেকে ঠিক জায়গার বাঁধন না খুললে সবক'টি বাঁশ আমার ওপরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাক, এবারেও বাঁচলাম।

অন্য ঘটনায় ফিরে আসি। মাচানেই বসেছিলাম, তবে মাচান বাঁধা হয়েছিল বাবলাগাছের সরু ডালে, মাটি থেকে আট-ন' ফুটের বেশি হবে না। বাঘ উলটো পথে এসে আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করতে চাইলে আপত্তি করার অবসর দেবে না। তবে মরা গোরুটার সামনেই ছিল কাঁটাঝোপ, বড় মোটা পেরেকের মতো কাঁটায় ভরা ঝোপ, বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোরু আর আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কাঁটাঝোপের ত্রিসীমানায় বাঘ আসতে চায় না, তাই সামনে থেকে আক্রমণের কোনও ভয় ছিল না।

চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ সামনে হাড়-ভাঙার শব্দ শুনলাম। বুঝলাম, বাঘ এসেছে। ক্ষিপ্র গুলি চালানোয় অভ্যস্ত থাকায় বাঘকে খেতে দিয়ে, রয়ে-সয়ে অঙ্ক কষে টিপ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে Electric Torch টিপে দিলাম। দেখলাম, বাঘ আহারে বসেছিল আমারই দিকে মুখ করে। গুলি চলার সঙ্গে-সঙ্গে আহত জানোয়ার সোজা লাফিয়ে উঠল প্রায় আট-দশ ফুট ওপরে। তারপরই শূন্য থেকে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। ভাবলাম, গুলি কাজ করেছে; কিন্তু ভাবা কাজে এল না। বাঘ আবার লাফ দিল এবং কাঁটাবন পার হয়ে আমার মাচানের ওপর এসে পড়ল। দুটো থাবাই তখন আমার পায়ের সামনে। সমস্ত মুখের গহ্বর দেখতে পাচ্ছিলাম। হয়তো তার হুঙ্কারের সঙ্গে কিছু লালাও আমার মুখে এসে পড়েছিল।

আমি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। বন্দুকের নল ঘোরাবার উপায় ছিল না। বাঘ কিন্তু মাচানে বেশিক্ষণ ঝুলতে পারল না, কাঁটাবনের ওপরেই আছাড় খেল। তারপর সেখান থেকে লাফের পর লাফ মেরে দূরে চলে গেল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মনে হল, কোনও শক্ত জিনিসের সঙ্গে তার জোরে মাথা ঠুকে গিয়েছে। এরপর পরিচিত গোঙানির শব্দ শুনলাম। নিশ্চিন্ত হলাম, বাঘ এখন চলৎশক্তিহীন, মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝড় উঠল বিকট শব্দ করে। কয়েকটি জোর ঝাঁকুনিতে আমি যে-মাচানে বসেছিলাম, তার একটি ডাল দোফালা হয়ে গেল। প্রতিটি দমকা হাওয়ায় নাগরদোলার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে লাগলাম। একবার মাচানসমেত প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছি। এই অবস্থায় Ready Trigger সহ ভরা বন্দুক তলায় পড়ে গেল। বন্দুকটি আমায় নয়, আমার সঙ্গে যে-শিকারি এসেছিলেন তাঁর। ডাল দোফালা হওয়ার সঙ্গে শিকারি মাটিতে না পড়লেও আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। নলের মুখ ছিল ঠিক আমার নীচেই। বন্দুকের পতনকালীন একটি কাঁটা Triggeré-এ লাগলেই আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হত, তবে সান্ত্বনা থাকত এইটুকু যে, বাঘ মেরে মরেছি। এমন কৃতিত্বকে কি বাজে বলা চলে?



শিকারে বিপদ কি কেবল বাঘ-ভালুকের সংস্পর্শে আসাতেই শেষ? সময়মতো সাবধান হতে পারলে ওদের কাছ থেকে পার আছে, কিন্তু সাপের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেষি হলে পরিত্রাণ নেই। বিশেষ করে রাজগোক্ষুর, কালকেউটে, করায়ত বা চিতি বোরা। মানুষ তাদের শান্তিভঙ্গ করলে আর রক্ষা নেই। রাজগোক্ষুর বা কালকেউটের কথা ছেড়ে দিই, ওদের অনেকসময় বড় আকৃতির জন্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিতি বোরা বা করায়তের বাচ্চা কয়েকটা নুড়ি পেলেই তার তলায় বেমালুম আত্মগোপন করে ফেলে।

এবারকার কাহিনি এই বিষাক্ত জীবদের নিয়ে। লেপার্ড শিকারে এসেছিলাম, সঙ্গে ছিলেন একজন নবদীক্ষিত শিকারি, ইতিপূর্বে কখনও তিনি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকেননি। আমি এদিকে আসছি শুনে বন্ধুবর একেবারে সাহেবি মল্লবেশে শিকারের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। দেহে জড়িয়ে থাকল গাঢ় সবুজ রঙের বুশশার্ট, নিম্নাঙ্গে হাফপ্যান্ট, তারও তলায় দেখা গেল ব্যান্ডেজের প্রথায় বাঁধা পট্টি। পট্টির তলায় জবরদস্ত মোটা চামড়ার বুট। প্রতি পদক্ষেপেই জুতোর মচমচ শব্দ যেন জঙ্গলের জানোয়ারদের জানিয়ে দিতে চায়, 'তফাত যাও, তফাত যাও।' শিকারির আগমন-বার্তা এইভাবে প্রচার হওয়ায় লেপার্ড আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। প্রথম দর্শনেই তার আকার আন্দাজে বুঝেছিলাম যে, তার প্রাপ্তবয়স্ক হতে এখনও অনেকদিন সময় আছে। শিশু বয়েসে হয়তো মা পরিত্যাগ করায় তার নিজের সাবধানতা সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে চালাক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আমরা ওর পিছু নেওয়ায় চোখে চোখ পড়লেই একটু পালিয়ে কাছেই যে-কোনও ঝোপ পেলেই তার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। এই পালাবার ব্যাপারে বুঝলাম, বন্ধুর জুতোই যত সব গণ্ডগোল বাধিয়েছে।

সারা সকাল ঘুরতে-ঘুরতে দুপুর পার হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কেউই লেপার্ডকে জুতসইভাবে বন্দুকের সামনে পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পা থেকে কেডস দুটো ফেলে দিয়ে বাবু হয়ে ছায়ার তলায় একটি বড় পাথরের ওপর দুজনে বসে পড়লাম। বসার সুবিধে পাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, কিন্তু সহজলব্ধ আরামটি বুট ও পট্টির বাঁধন থাকায় বন্ধুবর ভোগে লাগাতে পারলেন না। গত্যন্তরে পা ঝুলিয়েই বসতে হল। পায়ের চারধারে ডিমের আকারের ছোট-বড় পাথরের নুড়ি। কোনও কাজ না থাকায় বন্ধুবর ঝোলানো পা-টাকে ঠকঠক শব্দ করে আমরা যে-পাথরে বসেছিলাম সেইটায় ঠুকতে লাগলেন। তা ছাড়া, বুটের ঠোক্করে পায়ের তলার নুড়িগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল। বেশিক্ষণ এই অস্থিরতার আরাম বন্ধুবরকে ভোগ করতে হয়নি। আমি তাঁর পায়ের দিকে তাকাতে দেখি, ফুটখানেক লম্বা একটি সাপ বন্ধুর পায়ের দোলার সঙ্গে একটু দূরে মাথা তুলে দুলছে। হাঁ-করা মুখ। ছোট্ট হলে কী হয়, মুখের তুলনায় দাঁত দুটি বেজায় বড়। বন্ধু নিশ্চয়ই এ-দৃশ্যটি দেখেননি। সাপের নজর বুটের দিকে থাকায়, আমি ধীরে-ধীরে একটি বড় নুড়ি তুলে নিলাম, তারপর বেশ জোরেই নুড়িটি সাপের মাথা লক্ষ করে ছুঁড়লাম। কাজ হল, বিষধরের মাথা থেঁতলে গেল।

ইচ্ছে করেই 'সাপ-সাপ' করে চিৎকার করিনি। যদি এরূপ সাবধানতার বাণী ভদ্রলোক শুনতেন, তাহলে তাড়াহুড়োয় দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই সাপ ছোবল মারায় কোনও অসুবিধে বোধ করত না। যে-সাপটি মারা পড়ল, সেটি করায়ত। এই জাতীয় সাপের প্রেম অতি সাঙ্ঘাতিক, সহজে এদের কেউ কখনও বেজোড় হতে দেখেনি। বন্ধুকে বললাম, 'এখান থেকে উঠে পড়ো, আমার মনে হয়, জোড়ের সাপ তোমারই পায়ের তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে।' মরা সাপ এবং বাঁচা সাপের অস্তিত্ব অত নিকটে থাকায় আমার বন্ধুর মুখশ্রী ভয়ে কীরকম হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, তিনি কর্ণ ও নাসিকা মর্দনের পর তাঁর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে ও আমাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন এই বলে যে, 'জীবনে আর কখনও শিকারে আসব না।'

এরপরেও বহু প্রকারের বিপদের কথা বলার ইচ্ছে ছিল। হয়তো ভবিষ্যতে কোনওদিন সুবিধে পেলে বলবও।*

* এই রচনার তিনটি স্কেচ লেখকের আঁকা।

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৩



হাতের রেখায় খুন

কবিতা সিংহ

দার্জিলিঙে তখন সিজন চলছে।

অনুপম হঠাৎ বলে বসল, চল অসিত, দার্জিলিং যাওয়া যাক।

আমি বললাম, হোটেলে জায়গা পাবি?

অনুপম আমার হাতটা ধরে বলল, দেখি হাতটা। —তারপর খুব নিরীক্ষণ করে দেখছে এইভাবে খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে দেখে বলল, যা হোক একটা জুটে যাবে, দেখিস!

অতএব বাক্স-বিছানা বেঁধে দার্জিলিং।

বলতে ভুলেছি, অনুপম ভাগ্য-গণনা করে। আর ভাগ্য-গণনার সূত্রে বহুরকম মানুষের সঙ্গে তার চেনা-জানা, আলাপ-পরিচয়। দুর্বল মুহূর্তে বহু মানুষ তাদের মনের কথা অকপটে বলে ফেলে অনুপমকে, গোপন বাসনা জানিয়ে ফেলে।

আর সত্যি কথা বলতে কী, যদিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু অনুপমকে আমি দারুণ বিশ্বাস করি। যারা তাকে হাত দেখায় তাদের মতে, অনুপম নাকি দারুণ ভবিষ্যৎ-গণনা করতে পারে।

দার্জিলিং গিয়ে যখন কোনও হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল না, তখন অনুপমকে ক্লান্ত, শ্রান্ত গলায় কথা শোনাতে ছাড়লাম না। বললাম, কী, খুব যে হাত দেখে বলেছিলি, একটা কিছু জুটে যাবে!

যাঃ, সে তো ঠাট্টা করেছিলাম।

কিন্তু সত্যি বলতে, এখন কোথায় যাই? যেমনি খিদে পেয়েছে, তেমনি ঘুম!

হোটেলের গেটের বাইরে সুটকেস আর বেডিং রেখে আমরা দুজন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলাম। একজন সুট-পরা ভদ্রলোক অনুপমকে দেখে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে! অনুপম না?

অনুপম লাফিয়ে উঠে বলল, অনিল না? অনিল চৌধুরী!

হোটেলে জায়গা পাসনি তো, বেশ হয়েছে। থাক ঠান্ডায় বসে। সারারাত বাইরে বসে জমে শক্ত হয়ে যা।

অনুপম এবার নিজের মেজাজ ফিরে পেয়েছে। হেসে বলল, তুই এখানে আছিস? তা হলে আর হোটেল খুঁজবই বা কেন? নে চল, তোর আস্তানায় উঠি।

পথে যেতে-যেতে অনিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল অনুপম। পদস্থ সরকারি কর্মচারী, দার্জিলিঙে পোস্টেড।

অনুপমের কলেজ-জীবনের বন্ধু। মনে হল, এককালে খুব দহরম-মহরম ছিল দুজনের। অনুপমকে দেখে দারুণ খুশি হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

ফাউ আমাকে দেখেও অখুশি হননি।

আমার দিকে ফিরে অনুপম গর্বভরে বলল, দেখলি, হাত দেখতে জানি, কি জানি না? জায়গা জুটে গেল কি না বল?

আমি বাধ্য হয়ে বললাম, জানিস বাবা, জানিস। হল!

আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন অনিল চৌধুরী। এবার সরব হয়ে বললেন, ধ্যেৎ, ও কিছু জানে না। কলেজ-লাইফে আমরা ছিলাম ওর জ্যোতিষবিদ্যাচর্চার গিনিপিগ। আমাদের হাত দেখে যত সব হাবিজাবি বলত। আমার সম্বন্ধেও অনেক বাজে কথা বলেছে, একটাও মেলেনি।

অনুপম উত্তেজিত হয়ে বলল, এই, মেলেনি? বল, আমি বলিনি তুই রাজকার্য করবি?

হ্যাঁ।

তোর অনেক টাকা হবে, পিতৃকুলের বিষয় পাবি অনেক!

তা অবশ্য পেয়েছি!

বলিনি, তোর বিদেশযাত্রা হবে?

হ্যাঁ, তাও হয়েছে অবশ্য!

তবে?

অনিল চৌধুরী এবার সলজ্জভাবে বললেন, যাঃ, সেসব কি আর বলা যায়, আরও যেসব বলেছিলি! অসিতবাবুর সামনে...প্রথম আলাপেই বলতে কীরকম যেন সঙ্কোচ হচ্ছে!

সঙ্কোচের কিছু নেই, ও আমার প্রাণের বন্ধু, তুই যেমন ছিলি কলেজ-লাইফে। ওর কাছে আমি কিছুই গোপন করি না।

অনিল চৌধুরী এবার একটু অপ্রস্তুতের মতো হাসলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ। সুন্দর সাজানো দাঁত। এমন সাজানো, হাসলে ভারী সুন্দর দেখায়।

না, মানে, আমার লাভ-লাইফ, ম্যারেড-লাইফ সম্বন্ধে তুই যা বলেছিলি!

কেন? মেলেনি বলতে চাও? —অনুপম কটমট করে অনিল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ছদ্মরাগে ফেটে পড়ে বলল, নাঃ, ধোওয়া তুলসী পাতা তুমি! বুকে হাত দিয়ে বলো, স্ত্রীঘটিত কোনও প্যাঁচে পড়োনি তুমি? বিলেতে, কলকাতায় চাকরির জায়গায়?

সে অমন অনেকেই পড়ে, কিন্তু আমার স্ত্রী!

হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী! বলো! বলো!

বলতে আর হল না। সামনেই চমৎকার গেট। বাগান, মরশুমি ফুলে সাজানো মস্ত বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। একেবারে গেটের কাছে উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি, তিনিই অনিল চৌধুরীর স্ত্রী।

স্ত্রীকে দেখে মুহূর্তেই মুখের চেহারা বদলে গেল অনিল চৌধুরীর। মুখের রেখাগুলো কেমন ভালোবাসায়, শান্তিতে, নির্ভরতায় নরম হয়ে গেল।

মিনতি, অনুপম রায় আর অসিত মিত্র, আমার বন্ধু, হোটেলে জায়গা পাননি। খুব শিক্ষা হয়েছে, তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম।

গেট খুলে হেসে মিনতি বললেন, বেশ করেছ। আসুন, ভিতরে আসুন!

তাঁর মুখখানিতে লাবণ্যের আলো মাখানো। ভারী কোমল চেহারা। হাতির দাঁতের মতো ফরসা গায়ের রং। দাঁতগুলি ঝকঝকে, সাজানো। পাতলা দুটি ঠোঁটে হালকা গোলাপির ছোঁয়া। দেখলে প্রথমটা মনে হয়, ঠোঁটে রং দিয়েছেন। পরে সদ্যস্নাতা মিনতিকেও দেখেছি। অমনি পাতলা রঙিন ঠোঁট, গোলাপি গাল। ঠোঁটের গালের স্বাভাবিক রং অম্লান রয়েছে।

চাপা গলায় অনিল চৌধুরী অনুপমকে বললেন, ইউ আর রং, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। শি ইজ নট এ ফেয়ারি, বাট অ্যান অ্যাঞ্জেল!

অ্যাঞ্জেল তো বটেই। পরনে হালকা হলুদ রঙের শালের শাড়ি। শাড়ির ওপর গরম কোট। কোটের ওপর পশমের চাদর। লম্বা বিনুনি, কোমর ছাড়িয়ে আরও নীচে নেমেছে। পায়ে গোলাপি নাইলনের মোজা আর মখমলের নেপালি চটি।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের আরও ভালো লাগল। চমৎকার সাজানো ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, এমনকী গেস্টরুম দুটিও সুন্দর সাজানো। যেন মিনতি চৌধুরী জানতেন, আজ সন্ধ্যায়, অবেলায় আমরা এসে পড়ব।

আমরা মিনতির প্রশংসায় সরব না হয়ে পারলাম না। দুজনে মিলে একটি গেস্টরুমেই আশ্রয় নিলাম। আর-একটি খোলা হলেও সেটিতে গেলাম না।

রাতে মিনতির রান্না করা পোলাও আর মুরগির মাংস খেয়ে উদগার তুলতে-তুলতে আমরা তিনজন পুরুষ ড্রয়িংরুমে বসলাম। মিনতি আর এলেন না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আপনাদের স্ট্যাগ পা. চলুক, আমি শুতে যাচ্ছি।

মিনতি চলে যেতেই অনিল চৌধুরী বললেন, ব্রান্ডি চলবে?

খাওয়ার পর সত্যিই বেশ শীত করছিল। অনুপম বলল, হোক না একটু মেডিকেটেড ডোজ।

অনিল চৌধুরী উঠে বেয়ারাকে ব্রান্ডি দিতে বলতে গেলেন। সেই ফাঁকে নিচু গলায় আমি অনুপমকে প্রশ্ন করলাম, ওর বউ সম্বন্ধে ওকে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলি?

কী আবার বলব? বলেছিলাম, তোমার বউ হবে মার্ডারেস, খুনি!

আমি চমকে উঠে বললাম, কী বলছিস তুই!

ঠিকই বলছি, অনিলের হাতে ভীষণ স্ট্রং সাইন আছে। কোষ্ঠীতেও। ও-চিহ্ন বদলাবার নয়।

কিন্তু তুই মিনতি চৌধুরীর হাত দেখেছিস?

দেখেছি।

কখন?

যখন খাবার পরিবেশন করছিলেন। হাত পেতে হাতে চিনি ঢালছিলেন, দেখেছি।

কী দেখেছিস?

শি ইজ এ মার্ডারেস, খুনি!

যাঃ! আমি বিশ্বাস করি না।

আমি করি। তবে চিহ্নটা ম্লান হয়ে এসেছে। হয়তো ও খুন করেছে অলরেডি!

আমি আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, অনিল চৌধুরী ঢুকলেন, সঙ্গে বেয়ারা। আর ট্রেতে তিন গ্লাস সত্যিই মেডিকেটেড ডোজে ব্রান্ডি।

ব্রান্ডিতে চুমুক দিতে-দিতে সোফায় ডুবে গিয়ে অনিল চৌধুরী বললেন, মন খারাপ করিস না, অনুপম। সব গণনা তো আর মেলে না। বল, এতক্ষণ দেখলি তো মিনতিকে, বল কত ভালো বউ পেয়েছি আমি! তোর গণনা-টননা মিলল না আর। বুঝলি!

অনুপম চুপচাপ ব্রান্ডিতে চুমুক দিতে-দিতে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

অনিল চৌধুরী চাপা গলায় বলল, জানিস, এই একটি মেয়ে, মিনতি, আমার সমস্ত জীবনটাকে কীভাবে বদলে দিয়েছে?

ক্লান্ত গলায় অনুপম বলল, বউয়ের প্রশস্তি করার আর সময় পেলি না, অনিল! তার চেয়ে বরং এখন জমিয়ে একটা ভূতের গল্প কর।

আরে তাই-ই করছি। সত্যি, ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজকাল করি। জানিস, মিনতির জীবনের সঙ্গে একটা অদ্ভুত অলৌকিক রহস্য জড়িয়ে আছে। সেই রহস্যের ঘটনাটাই শাপে বর হয়ে

আমাদের দুজনের জীবন বদলে দিয়েছে, জানিস! ঘটনাটা শুনলে বুঝবি মিনতি কত ভালো। যেসব অতীন্দ্রিয় লোকের খবর আমরা জানি না, সেখান থেকেও মিনতির জন্যে সাহায্য আসে।

অনুপম এবার সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঠিক আছে। নাউ আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড, বল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অনিল চৌধুরী বললেন, মিনতি ছিল বাপ-মা হারা গরিব একটি মেয়ে। মামারবাড়ি মানুষ। আমি তখন রৌরকেলায় পোস্টেড। সোল গভর্নমেন্টে একটা মোটামুটি চাকরি করি। আমি যে-ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার পাশের ফ্ল্যাটের একটি মেয়ের সঙ্গে তখন আমার পুরোদমে প্রেম চলছে। আমার প্রথম স্ত্রী রুচি ঘটনাটা স্বচক্ষে দ্যাখে। মানে, আমার আর অতসীর প্রেম। মাঝরাতে নিজের বিছানা থেকে উঠে আমি পড়াশোনার ছুতো করে পাশের ঘরে যেতাম, অতসী দুটো ফ্ল্যাটের মাঝের দরজা খুলে আমার কাছে চলে আসত।

ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর রুচির কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। শপথ করি, আর অমনটা হবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি। আবার একদিন, অতসীর সঙ্গে...সেইদিন রাতেই রুচি শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে। তবে সে মরার সময় আমাকে জড়ায়নি।

ব্রান্ডিতে চুমুক দিয়ে অনিল চৌধুরী বললেন, অসিতবাবু, আপনি হয়তো আমাকে খুব ঘেন্না করছেন। তা করুন, ভাবতে আমার নিজেরই অবাক লাগছে যে, সেই লোকটি কি সত্যিই আমি? এই আমি? একদিন যে-নোংরা কাজ আমি করেছি, আজ সেই কথাগুলো কেবল মুখে আনতেই আমার নিজেকে এত অশুচি মনে হচ্ছে, কী বলব! জানবেন, এ সবই ওই মিনতির জন্যে, ও সত্যিই দেবী!

অনুপম বলল, তারপর?

যে-অতসীর জন্যে এত কাণ্ড, সেই অতসী কিন্তু কিছুতেই আমায় বিয়ে করতে রাজি হল না। আমি যখন স্ত্রী-বিয়োগ-যন্ত্রণা আর অতসীর জন্যে তীব্র পরকীয়া আকর্ষণ অনুভব করছি, তখন অতসী আর-এক আমেরিকা ফেরত ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না।

মাস-ছয়েকের মধ্যে মা-বাবা-বউদিরা আবার পেড়াপেড়ি শুরু করলেন বিয়ে করতে হবে। আমারও অনিচ্ছা ছিল না। তা ছাড়া, অতসীকেও তো দেখিয়ে দেওয়া হবে যে, দাগী আর খুঁতো হওয়া সত্ত্বেও আমারও বিয়ে হচ্ছে।

এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কেবল পাত্রীই বিবেচ্য। কোনও দাবিদাওয়া নেই। প্রকৃত সুন্দরী কন্যা চাই।

একরাশ ফটো থেকে তিন-চারটে ফটো বাছলেন মা। খোঁজখবর নেওয়া হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যাকে সবচেয়ে পছন্দ হল মায়ের, আরও খবর নিতে-নিতে জানা গেল, সে—অর্থাৎ মিনতি—রুচিরই মামাতো বোন। গরিব মামার গলগ্রহ, শরীর-ভরা রূপ ছাড়া বেচারির আর কিছুই নেই। মামা আবার পয়সা রোজগারের জন্যে মিনতিকে অফিসপাড়ার থিয়েটারে নামাত। ভালো অভিনেত্রী বলে সুনাম হয়েছিল খুব। কিন্তু ওর গাম্ভীর্যের রক্ষাকবচ ভেদ করে কেউ ওর দিকে এগোতে সাহস করত না।

আমি তো মিনতিকে দেখেই মুগ্ধ। বিয়ের কথা যখন চলছে, হাতে মাত্র মাসখানেক সময়, তখন রৌরকেলায় ফিরে বিয়ের জন্যে ছুটি আর টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম অতসী সেই ইঞ্জিনিয়ার ছোকরার কাছে ঘা খেয়েছে। আবার মধ্যরাত্রে আমাদের সেই পুরোনো অভিসার শুরু হল। অতসী আবদার করল, বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। আমি অতসীর আকর্ষণে তখন এমন মুগ্ধ যে, কলকাতায় ফিরে এলাম মাকে-বাবাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্যে।

ফিরে এসে শুনলাম, কনের বাড়িতে নাকি আমার নামে যা-তা বদনাম দিয়ে চিঠি এসেছে। আমার নাকি চরিত্র খারাপ। অতসী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম আছে। এইসব চিঠি পড়ে কনের দরিদ্র মামা পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে দিতে চান। কিন্তু বিয়ে ভাঙতে চায় না স্বয়ং মেয়ে।

আরও শুনলাম, মেয়েটি নাকি বলেছে, আমিই তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী। আমার সঙ্গে নাকি তার গাঁটছড়া বাঁধাই আছে। তা ছাড়া, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি তার সঙ্গে সত্যিই একদিন দেখা করলাম। মনে আছে, ভিক্টোরিয়ায়। দুপুরবেলা।

অনিল চৌধুরী পাশের বোতল থেকে আর-একটু মেডিকেটেড ডোজ নিজের গ্লাসে ঢেলে নিলেন। বেয়ারা করিডোরের আলো নিভিয়ে দিল। অনিল চৌধুরীর পাশে শুধু একটি শেড দেওয়া দাঁড়ানো আলো জ্বলছে, আর বিদ্যুতের রুম-হিটারের লাল কয়েলের আগুন ছাড়া ঘরে আবছা অন্ধকার। অনিল চৌধুরী দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাঁর পেছনের দরজার পরদা ঈষৎ তুলে দাঁড়ালেন একজন বয়স্কা মহিলা। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। চওড়া শতরঞ্জ-পাড় ধনেখালি শাড়ি ঘরোয়া করে পরা। চিবুকে আঁচিল। মাথায় ঘোমটা টানা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে আস্তে পেছনে সরে গেলেন মহিলা। এঁকে খাবার টেবিলে তো দেখিনি! কে ইনি? বোধহয় ছোঁয়াছুঁয়ি করেন না। তাই টেবিলে খাননি। অনিলের মা-ই হবেন হয়তো। আমরা আবার অনিলের কথায় মনোযোগ দিলাম।

অনিল বলছিলেন, মিনতির মামা বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু মিনতি চলে তার মায়ের কথায়। আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, শুনেছি আপনার মা নেই?

মিনতি অদ্ভুত হেসে বলেছিল, তার মা না থেকেও আছেন। তার বিপদে-আপদে নাকি তার মা ঠিক আসেন। তার সমস্যার সমাধান করে দেন তিনি। সেই মা নাকি তাকে বলেছেন, আমি নাকি তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী।

আমাকে রৌরকেলার পোস্টাল ছাপ লাগানো উড়োচিঠিটাও দেখাল মিনতি। বলাই বাহুল্য, হাতের লেখাটা অতসীর। তার মধ্যে ঘৃণিত অভিযোগ করা হয়েছে। শুধু পরকীয়াই নয়, আমি নাকি আমার স্ত্রী রুচিকেও হত্যা করেছি। এই কথাটাই অতসীকে চিনিয়ে দিল। বুঝলাম, অতসী আমার কতদূর ক্ষতি করতে পারে। মিনতি হেসে বলেছিল, মামা বলছিলেন, চিঠিটা পুলিশের হাতে তুলে দিতে। আমি মামাকে বারণ করলাম। বললাম, ভদ্রলোক বিপদে পড়ে যাবেন শুধু-শুধু। আমি বিশ্বাস করি না যে, রুচিকে উনি খুন করেছেন। আমি এত সব শোনার পর মিনতিকে বিয়ে না করে আর পারলাম না।

বিয়ের পর মিনতিকে নিয়ে রৌরকেলায় ফিরে গেলাম। শুনলাম, অতসী রাগে দুঃখে তার মাসির বাড়ি জব্বলপুরে চলে গেছে। আসলে সেখানেও সে শিকার ধরতেই গিয়েছিল। মাসির এক কচি পাইলট দেওরকে। এবং যথানিয়মে আবার সেখান থেকেও আনসাকসেসফুল হয়ে ফিরে এল।

এবারও মাঝের দরজা খুলে রাতে চলে আসতে আরম্ভ করল অতসী।

আমি দু-চারদিন নিজেকে সামলালেও, আর পারলাম না শেষের দিকে।

অতসী সম্বন্ধে যে কী ভয়ানক দুর্বলতা ছিল আমার!

মিনতির ঘুম ছিল খুব গভীর। ভাগ্যিস গভীর ঘুম ছিল। না হলে পাশের ঘরে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে আমাদের কথোপকথন, নড়াচড়া, সে ঠিক রুচির মতোই টের পেয়ে যেত।

একদিন মিনতি বলল, অতসীর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। ভারী ভালো মেয়ে অতসী। উড়োচিঠি নিয়েও খুব আলোচনা হয়েছে দুজনের। মিনতির দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কোনও শত্রুই এইসব মিথ্যে বদনাম রটিয়েছে। এমন মিষ্টি মেয়ে অতসী, সে কি এসব খারাপ কাজ করতে পারে? অতসীর সঙ্গে ওর এত ভাব হয়েছে যে, ওর মায়ের ছবি, বাপের বাড়ির অ্যালবাম, সব দেখিয়ে দিয়েছে অতসীকে। সেদিন রাতেই আমি আর অতসী প্রথম মিনতির মাকে দেখি। আমরা কথা বলছি, বাইরের ঘরে অন্ধকারে। মহিলার আবছায়া মূর্তিটা ঘরে এসে দাঁড়াল। চোখ দুটো, বিশ্বাস কর অনুপম, ধকধক করে জ্বলছে।

আমি আর্তস্বরে 'কে? কে?' বলে চিৎকার করে উঠলাম। অতসী ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। মহিলাও অদৃশ্য হলেন। আমি ঘরে এসে দেখলাম, মিনতি বিছানায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে আর বিরক্ত না করে

বাথরুম, রান্নাঘর, বক্সরুম চারিদিক খুঁজলাম। নাঃ, সেরকম চেহারার কেন, কোনওরকম মহিলাই সারা ফ্ল্যাটের কোথাও নেই। আমার গা-ছমছম করে উঠল। ফিরে গিয়ে মিনতিকে ডাকলাম।

ধড়মড় করে ঘুম-চোখে উঠে বসল মিনতি। ওর পবিত্র মুখখানি দেখে আমি যেন মরমে মরে গেলাম।

লজ্জায় অপমানে নিজেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে বললাম, মিনতি, তোমার মা কেমন দেখতে ছিলেন?

মিনতি উঠে ওদের ফ্যামিলি অ্যালবামটা পেড়ে নিয়ে এসে ওর মায়ের ছবি দেখাল।

আমি চমকে উঠলাম। অবিকল ওই মহিলাকে দেখেছি আমরা। আমি আর অতসী।

মিনতি বিহ্বল স্বরে আমাকে বলল, জানো, আজ রাতে মা স্বপ্নে এসেছিলেন। বললেন, রুচিকে যে মেরেছে, আমি তাকে ছাড়ব না। আমিও তাকে মারব। মা বললেন, রুচির অতৃপ্ত আত্মা নাকি আমাদের এই বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বাস কর, অনুপম, আমি আত্মা অলৌকিক এসব কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। ভয়ে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরদিন রাতে অতসীর চিৎকারে আমাদের দু-বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে যায়। অতসীকে পাওয়া গেল দু-বাড়ির মাঝের দরজার কাছে।

বোধহয় সে রাতের অভিসারে আসছিল। তার ঘাড় ভাঙা। দু-চোখে বিস্ফারিত ভয়।

হাসপাতালে খুব অল্প সময়ের জন্যে অতসীর জ্ঞান হয়। তখন সে শুধু মিনতির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বউদি, তোমার মা। তোমার মা।

মিনতির এত নরম মন যে, ওই অতসীর জন্যেও কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কতদিন।

তারপর আমরা বদলি হলাম কলকাতায়। কলকাতায় এসে চাকরি বদল করে এই দার্জিলিঙে। এই যে দেখছিস বড় চাকরি, এই পরিবর্তিত জীবন, এসবই ভাই, ওই বউ-ভাগ্যে!

অনুপম বলল, আচ্ছা অনিল, বউদির মায়ের চেহারা ঠিক কেমন ছিল বল তো?

কাঁচা-পাকা চুল, চিবুকে আঁচিল, অনেকটা মিনতির মুখের ছায়া আছে। যখন দেখা যায়, তখন পরনে থাকে শতরঞ্জ-পাড় শাড়ি সাধারণভাবে পরা। অতসীর মৃত্যুর পর একবছর চলে গেছে, এখনও ক্বচিৎ-কখনও তাঁকে দেখা যায়। আমাদের এই দার্জিলিঙের বাড়িতেও দেখেছি।

অনুপম লাফিয়ে উঠে বলল, মিনতির মায়ের কোনও ছবি দেখাতে পারিস আমায়?

কেন পারব না, এই তো।

কফি-টেবিলের তলার তাকে গোছকরা অ্যালবাম থেকে একটা পুরোনো অ্যালবাম বেছে নিয়ে তার একটা পাতা খুলে ধরলেন অনিল চৌধুরী।

এই তো!

আমি আর অনুপম ঝুঁকে পড়ে দেখে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

বোঝা গেল, একটু আগেই আমরা দুজনে এঁকে দেখেছি।

হঠাৎ অনুপম অনিল চৌধুরীকে বলল, বউদির কোষ্ঠী আছে?

না!

এক্ষুনি হাত দেখতে পারি?

দেখিস, তাড়া কীসের?

না, দেখলে এখুনি দেখতে চাই, আর একটি শর্তে। বউদির হাত আমি একা দেখব। তুমি বা অসিত কেউ থাকতে পারবে না সে-ঘরে!

অনিল চৌধুরী খুব কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আজ থাক না!

না।

অনুপমের শরীরে যেন কীসের ভর হয়েছে। সে বলল, ব্যাপারটা জরুরি, তোকে পরে বলব অনিল। বুঝছিস না, ভালো হোক খারাপ হোক, মেয়ের মায়ায় বদ্ধ হয়ে একটি আত্মার এভাবে বারবার দেখা দেওয়াও তো ঠিক নয়। তোদের ক্ষতি হতে পারে।

অনিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, বেশ, তোর শর্ত মেনে নিচ্ছি, আমি ওপরে যাচ্ছি। মিনতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার সব কৌতূহল মেটাবে কাল সকালে।

আমিও উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। অনুপম আমাকে জোর করে বসাল।

থাক না, যাচ্ছিস কোথায়? অনিল ওপরে উঠে গেছে। ও তো আর দেখতে আসছে না, তুই আছিস কি নেই?

অল্পক্ষণ পরে মিনতি চৌধুরী এলেন। সাদা শাড়ির ওপর সাদা শাল জড়ানো। চুল এলো করা। মুখে ঘন করে ক্রিম মেখেছেন। চোখে ঘুমের ছোঁয়া।

আপনি হাত দেখতে পারেন, অনুপমবাবু! —চোখ-দুটি হেসে উঠল মিনতির।

অনুপম বলল, পারি, কিন্তু এখন আপনার হাত দেখব না, আপনার মায়ের ছবি দেখব।

অবাক হয়ে মিনতি চৌধুরী সামনের অ্যালবামটা খুলে ওঁর মায়ের ছবি দেখালেন।

অনুপম ভালো করে ছবিটা দেখে বলল, এটা আপনার মায়ের ছবি নয়।

মিনতি এবার চমকে সাদা হয়ে গেলেন।

মানে?

আপনার সঙ্গে আপনার মায়ের মুখের সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আপনার হাতের যেখানে কাটা দাগ, আপনার মায়ের ঠিক সেখানে কাটা দাগ থাকে কী করে?

আমি এবার চোখ নামিয়ে দেখলাম, আশ্চর্য! মিনতি চৌধুরীর কনুই-এর কাছে যে-দাগটা জ্বলজ্বল করছে, সেটা ওঁর মায়ের ছবির কনুইতেও আছে।

আঠা দিয়ে সাঁটা ছবিটা চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলল অনুপম।

এই অ্যালবামের সব ছবি কর্নার লাগিয়ে বসানো। শুধু এই একটি ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা কেন, মিসেস চৌধুরী? এইজন্যে কী? আপনার ভাগ্য খুব ভালো যে, অনিল এটা খেয়াল করেনি। এ-ছবি আর এই অ্যালবামে রাখা উচিত নয়। ছবির উলটো পিঠে আবছা অক্ষরের যেটুকু ছেঁড়া-ছেঁড়া কাগজের আঁশ থেকে উদ্ধার করা গেল, তাতে লেখা, স্নেহময়ীর রূপসজ্জায় মিনতি রায়।

অনুপম বলল, আপনি যে এককালে অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করতেন, মিসেস চৌধুরী, সে আমি শুনেছি অনিলের কাছে। যে জন্যে মায়ের রূপসজ্জা সে-কাজ তো হয়ে গেছে, এখন আর কেন? তা ছাড়া, আপনার মা মারা গেছেন আপনার অল্পবয়েসে। তখন কি তাঁর পাকা চুল আর বয়স্ক চেহারা হয়েছিল?

মিনতি চৌধুরী মুখ নামিয়ে নিলেন।

না, শুধু ছবিটা নয়—ওই শাড়ি, পরচুলা, আঁচিলটা পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলতে হবে। আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। কবে অনিল দেখে ফেলবে, সব বুঝতে পারবে, তার ঠিক আছে?

অনুপম আর আমি দেখলাম, মিনতি চৌধুরীর চোখ ছেপে জল পড়ছে।

অনুপম বলল, আপনাকে দেখবার আগেই আমি জানি, আপনি কাউকে হত্যা করেছেন। সে অতসী, তাই না?

মিনতি মাথা নোয়াল।

মায়ের গল্পটা বানালেন কেন?

চাপা গলায় মিনতি বললেন, উপায় ছিল না। মামা আমাকে ক্রমাগত কুপথে ঠেলছিলেন। আমার তখন একটা বিয়ে করে সরে যাওয়া জরুরি ছিল।

আপনি রৌরকেলায় গিয়ে সব বুঝতে পেরেছিলেন?

পারব না? —মিনতি চৌধুরী অদ্ভুত হাসলেন আমার ঘুম ছিল পাতলা, অবশ্য অভিনয় করতাম যেন গাঢ় ঘুমে অজ্ঞান হয়ে আছি। আমি সব দেখেছি। সব শুনেছি। আর রাগে, ঘৃণায় শুধু জ্বলেছি আর জ্বলেছি।

অতসীকে মারলেন কী করে?

ওকে মায়ের ওই ছবি দেখিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে মায়ের দেখা দেওয়ার কথা গল্প করেছিলাম। একদিন দেখাও দিয়েছিলাম ওই বেশে। আর শেষদিন, চুলের মুঠি ধরে ওকে আছড়ে ফেলে দিই।

কথাটা শুনে অনুপমের কোনওরকম ভাব-বৈকল্য দেখলাম না। কিন্তু আমার সারাটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

অনুপম এবার মিনতি চৌধুরীর হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখে বলল, সত্যি বলছি, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সাধ্বী, কল্যাণী। কৃতী সন্তানের জননী হবেন আপনি। পুরোনো সব কথা ভুলে যান—সব প্রেত আর ছায়ামূর্তির কথা। অনিল জিগ্যেস করলে বলবেন, আপনার মায়ের ছবি অ্যালবাম থেকে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। ছদ্মবেশ আর পরচুলার প্যাকেটটা আজ রাতেই আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলব। যান, শুতে যান এবার। আমি আর আপনাকে মিসেস চৌধুরী বলব না। বউদি বলব।

এতক্ষণে মিষ্টি একটি হাসি ফুটল মিনতি চৌধুরীর মুখে। রাহুমুক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, প্যাকেটটা গেস্টরুমের দেরাজের নীচের তলায় রাখা আছে। আজকের রূপসজ্জার পর তাড়াহুড়োয় বেশি দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি।

তারপর আমাদের নমস্কার করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রাইম
পুজো সংখ্যা, **১৯৭৩**



যযাতির পরাজয়

মায়া বসু

নিখিল বঙ্গ ওয়েট লিফটিং, বডিবিল্ডিং, হাইজাম্প, দেহসৌষ্ঠব ও পেশি প্রদর্শন ইত্যাদি নানা ধরনের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকারী শ্রীমান অতনু সেন প্রচুর হাততালি ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রশংসাধ্বনির মধ্যে তার রুপোর মেডেল, কাপ ইত্যাদি তৃতীয় পুরস্কারগুলি নিয়ে ভিড়-ভরতি জিমনাসিয়াম থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যায়াম প্রতিযোগিতা শেষ হতে তখনও অনেক দেরি। আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকা ওর উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই ও আর ওখানে থাকতে পারল না। অতনুর সমস্ত মনটা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ও বেদনায় ভরে উঠেছিল। বারবার মনে পড়ছিল বাবা আর মায়ের কথা।

আজ যদি অতনুর বাবা বেঁচে থাকতেন, আজ যদি ওর স্নেহমমতাময়ী মা বেঁচে থাকতেন, অতনুকে তাঁরা হৃদয়ভরা স্নেহ-যত্ন-সেবা-উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে আরও শক্তিমান ও উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারতেন, তা হলে আজ এই নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তাঁদের একমাত্র সন্তান অতনুকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে তৃতীয় পুরস্কার হাতে নিয়ে মন খারাপ করে প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসতে হত না। অনায়াসেই আজ অতনু এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারত। প্রথম পুরস্কারটা অতনুরই প্রাপ্য হত।

আর সবচেয়ে বড় কথা 'দেহসৌষ্ঠব' প্রতিযোগিতায় যে-ছেলেটি প্রথম হয়ে 'বঙ্গশ্রী' হয়েছে, সেই প্রথম পুরস্কারটা ও-ই পেতে পারত। কেননা, অতনু আরও বেশি সুদর্শন, সুদেহী ও স্বাস্থ্যবান।

মা-বাবা, দুজনে মারা যাওয়ার পর থেকেই তার দুর্ভাগ্যের আর দুর্দশার শুরু।

দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে অযত্নে, অবহেলায় কোনওক্রমে আশ্রিত হয়ে থেকে, উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিনের অভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে, নিত্য নিয়মিত দেহচর্চা করে প্রতিযোগিতায় 'প্রথম স্থান' অধিকার করার কল্পনাটা শুধু অভাবনীয় নয়, অচিন্ত্যনীয়ও বটে।

সত্যি কথা বলতে কী, শরীর ঠিক রাখার মতো এমন কী খাবার তার জোটে? পেস্তা বাদাম-ছোলা-দুধ-ডিম-মাছ-মাংস দূরে থাক, দু-বেলা পেট ভরে ভাতও তার যথাসময়ে যথানিয়মে জোটে না।

ঘাড়ে পড়া দূর-সম্পর্কের ভাইপোকে কোন জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমাই-বা সুচক্ষে দেখে থাকেন?

বিশেষ করে, অতনুর জন্য যদি তার বাবা কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স রেখে যেতে পারতেন, তা হলেও বা এক কথা ছিল।

বিষণ্ণ মনে ম্লান মুখে হাঁটছিল অতনু, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় তার নাম ধরে ডেকে উঠল, অতনু—অতনু সেন, একটু দাঁড়াও।

আত্মচিন্তায় নিমগ্ন অন্যমনস্ক অতনু সচকিতভাবে পথের একপাশে থমকে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিছন ফিরে আহ্বানকারীর দিকে তাকিয়ে ও বেশ একটু অবাক হয়ে গেল।

সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি!

দামি সুটে-বুটে-টাইয়ে আপাদমস্তক টিপটপ। শুধু বয়েসই হয়নি তাঁর, জরা ভদ্রলোকের দেহটিকে পরিপূর্ণভাবে করায়ত্ত করে নিয়েছে। জিমনাসিয়াম থেকে এতটুকু রাস্তা অতনুর পিছন-পিছন হেঁটে আসতেই বুড়োমানুষটি হাঁপিয়ে উঠেছেন।

অতনুর মনে পড়ল, তাদের জিমন্যাস্টিক ক্লাবেও এই বুড়োমানুষটিকে ও অনেকবার দেখেছে।

হয়তো ছেলেদের দেহচর্চা-ব্যায়ামচর্চা দেখতে উনি ভালোবাসেন, এই কথাটাই বেশি করে মনে হল অতনুর।

মুখচেনা হলেও, ব্যায়ামের আখড়ায় ওঁকে দেখলেও, একজন বয়স্ক ও সম্পূর্ণ অপরিচিত বৃদ্ধের মুখ থেকে অতি পরিচিতের মতো তার নাম ধরে ডাকাডাকিতে বেশ একটু বিব্রত ও লজ্জিতভাবে অতনু সাড়া দিল, আপনি কি আমায় ডাকছিলেন?

হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি। একটু দাঁড়াও। ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি।

বুড়োমানুষটি এবার মন্থর পদক্ষেপে অতনুর কাছাকাছি এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে ঘাড়, চোখ-মুখ, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

অতনু বিস্মিতভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে খর্বাকৃতি, কুৎসিত, পাকানো দড়ির মতো চেহারার বুড়ো লোকটির নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখের দিকে, অসম্ভব কোঁচকানো-তোবড়ানো মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বুড়ো লোকটি তেমনই ফ্যাঁসফেঁসে ভাঙা জড়ানো গলায় বললেন, অতনু, আমি সমানে তোমাকে লক্ষ করে বসেছিলাম। তুমি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়ে কাপ-মেডেল নিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আমিও তোমাকে ফলো করেছিলাম। কিন্তু কী জানো, যৌবন আর জরা এ-দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তুমি যতটা এগিয়ে গিয়েছ, আমি ততটাই পিছিয়ে পড়েছিলাম।

আমাকে কি আপনার কোনও দরকার আছে?

অতনুর বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, দরকার না থাকলে কি তোমার পেছন-পেছন আমি এমনভাবে ছুটে আসি? তোমাকে আমার ভীষণ দরকার, অতনু সেন।

আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। মাঝে-মাঝে আপনাকে আমাদের ব্যায়ামের আখড়ায় দেখেছি—চুপচাপ বসে আছেন। আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?

বিস্মিত অতনুর সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে রুগ্ন, জীর্ণ, প্রাচীন মানুষটির মুখে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসির আভাস ফুটে উঠল।

সেইসঙ্গে ওঁর ঘোলাটে ঝাপসা চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য দপ করে জ্বলে উঠল। অতনুর খুব কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আমাকে চেনার প্রয়োজন তোমার নেই, অতনু। আমার মতো অনেকেই তোমাদের মতো তরুণদের ব্যায়ামচর্চা দেখতে ওখানে প্রায়ই গিয়ে থাকেন। আমি কিন্তু আমার একটা মস্তবড় প্রয়োজনেই তোমাকে চিনে নিয়েছি। শুধু চিনেই নিইনি, সবক'টি ছেলের মধ্যে তোমাকেই বেছে নিয়েছি, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার উপকরণ হিসেবে। কিন্তু যাক এখন ওসব কথা। তোমার মনটা ভালো নেই বলে আমার মনে হচ্ছে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছ বলে তুমি মনে-মনে খুবই দুঃখ পেয়েছ, এ-কথা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু অতনু, তোমার খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যদি বিচারক হতাম, তাহলে এই ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে তুমিই প্রথম হতে। প্রতিযোগিতায় যারা নাম দিয়েছিল, সকলের ভেতর তুমিই সবচেয়ে সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সুদেহী।

এই অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির আন্তরিকতায়, সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তায় অভিভূত অতনুর চোখের পাতা ভিজে উঠল। কয়েকমিনিট নিজের আবেগ দমন করার জন্য ও কোনও কথা বলতে পারল না।

বুড়োমানুষটি তীক্ষ্ন চোখে ওর ভাবান্তর লক্ষ করতে-করতে আবার বলতে লাগলেন, আমি তোমাকে চিনি, অতনু। পৃথিবীতে আপনজন বলতে তোমার কেউ নেই। তুমি মহেশপুর থেকে এখানে এসে তোমার দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করছ। লেখাপড়া আর শরীরচর্চা ছাড়া আর কোনওদিকেই তোমার মন নেই। তোমার ওই জ্যাঠামশায়ের স্ত্রীটি তোমাকে মোটেই পছন্দ করেন না, সে-খবরও আমি রাখি। তোমার মা-বাবা মারা গেছেন মহেশপুরেই। তোমার সম্পর্কে এসব কথা জানার পর, তোমার মতো দরিদ্র অথচ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ছেলের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছি।

অতনু ক্রমশই বিহ্বল হয়ে পড়ছিল! বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করল, কিন্তু...কেন আপনি—।

এখানে এই রাস্তার দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার একেবারেই ইচ্ছে করছে না। দেখতেই তো পাচ্ছ আমার শরীরের অবস্থা! বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও আমার শরীর অবশ হয়ে আসে। তুমি বরং আমার সঙ্গে এসো।

অত্যন্ত দামি পোশাক পরা ক্ষীণ, খর্বকায়, কুৎসিত চেহারার মানুষটির কথাবার্তায় কী ছিল, অতনু প্রতিবাদ করতে পারল না। সম্মোহিতের মতোই ওঁর পিছন-পিছন চলতে লাগল। অন্ধকার গাছতলায় একখানা খুব দামি নতুন গাড়ি পার্ক করা ছিল। বুড়ো অতনুর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে পার্ক স্ট্রিটের একটা বিখ্যাত হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

বুড়োমানুষটি বলতে লাগলেন, সত্যি কথা বলতে কী, তোমার আর আমার জীবনে একদিক দিয়ে আশ্চর্য রকম বিপরীত মিল আছে। আর সেই কারণটার জন্যেই আমি তোমার ওপর ভয়ঙ্কর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তুমি বি-এ পরীক্ষা দিয়েছ। প্রতিযোগিতাও শেষ হয়ে গেছে। এইবার আমি আমার একটা অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করার সুযোগ পাব।

আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবে। বোঝাব বলেই হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে। দুজনে বসে একটু চা খেতে-খেতে সব কথা খুলে বলব। না, না, লজ্জা পাচ্ছ কেন, অতনু? তোমার মতো একজন স্বাস্থ্যবান ইয়াংম্যানের খিদে পাওয়াটা মোটেই লজ্জার ব্যাপার নয়। ওই যে হোটেল এসে গেছে।

হোটেলে ঢুকে যেন দিশেহারা হয়ে গেল অতনু। সে একেবারে গ্রামের ছেলে। বছর দুয়েক মাত্র কলকাতায় এসেছে। বয়কে ডেকে বুড়ো যে-সমস্ত দামি-দামি খাবারের অর্ডার দিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র প্রাইমারি স্কুলমাস্টারের ছেলে অতনু সে-সমস্ত খাবার খাওয়া দূরে থাক, নামও শোনেনি কখনও।

সমস্ত খাবারগুলো শুধু অতনুর জন্য। নিজের জন্য দু-চামচ স্যুপ ছাড়া উনি আর কিছুই নিলেন না।

অতনু প্রথমে সংকুচিতভাবে 'না, না—এত খেতে পারব না,' ইত্যাদি দু-চারবার প্রতিবাদ জানালেও খেতে শুরু করল। আর শুরু করার পর সেসব কথা ভুলে গেল। সুস্বাদু আহার্যগুলো দেখতে-দেখতে ওর প্লেট থেকে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি স্যুপ খেতে-খেতে অতনুর খাওয়া দেখছিলেন। অতনু লক্ষ করল, বৃদ্ধের মুখের রেখাগুলো কী বিশ্রীভাবে কোঁচকানো। মাথার চুল একেবারে সাদা। চোখের চামড়া ঝুলে পড়ে চোখ দুটোকে খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে ওঁর দৃষ্টি ঠিক যেন সাপের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। নকল দাঁতের পাটির ওপর, শুকনো কালো ঠোঁটের ওপর, লোভীর মতন উনি ওঁর জিভ বুলোচ্ছেন। আর অতনুর খাওয়া দেখছেন।

অতনু ওঁর স্যুপের বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি তো কিছুই খেলেন না?

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়েস কত? উনিশ-কুড়ি নয় কি? আর আমার সত্তর পেরিয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও লোভ থাকলেও কিছু খেতে পারি না। তোমার এখন খাওয়ার বয়েস। তুমি ভালো করে খাও।

লজ্জা-সঙ্কোচ কমে গিয়ে অতনু স্বাভাবিক সহজ হয়ে উঠছিল। এবার সরলভাবে জিগ্যেস করল, আপনি আমাকে কী বলবেন বলছিলেন?

হ্যাঁ, এইবার বলব। তার আগে আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম হয়তো তুমি শুনে থাকবে। ডক্টর নবকিশোর সরখেল।

আপনিই তাহলে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর নবকিশোর সরখেল!—সুগভীর বিস্ময়ে অতনু যেন কয়েক মুহূর্ত আর কোনও কথা খুঁজে পেল না।

বিখ্যাত কি না জানি না, তবে একেবারে অখ্যাত নই।—এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল বৃদ্ধের রেখাসংকুল মুখে : কিন্তু এই খ্যাতি-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি আয়ত্ত করতে গিয়ে আমার সমস্ত জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে। তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হওনি, তারও অনেক বছর আগে আমি বিজ্ঞান-কলেজে গবেষক ছিলাম। তারপর বহু দেশ ঘুরেছি। মিশর, পারস্য, আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়া—আরও নানা দেশ। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছি, যা তুমি আর্টসের ছাত্র, কিছুই বুঝতে পারবে না। তবে তুমি এইটুকু জেনে রেখো, আমার সমস্ত জীবনটা বিজ্ঞান-সাধনাতেই কেটেছে।

একসঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বৃদ্ধ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একটু জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে আবার বলতে লাগলেন, তোমাকে আগেই বলেছি, তোমার আর আমার জীবনে কতকগুলো অদ্ভুত বিপরীত মিল আছে। সংসারে আপন বলতে তোমার কেউ নেই। টাকাপয়সার অভাবে তুমি কষ্ট পাচ্ছ। আমার অবস্থা একেবারে উলটো। অবশ্য, আপনজন বলতে এই পৃথিবীতে আমারও কেউ কোথাও নেই। আমি একা মানুষ। অথচ প্রচুর টাকাকড়ি-গাড়ি-বাড়ি-অগাধ সম্পত্তির মালিক আমি। আমার অবর্তমানে আমার এই বিষয়-সম্পত্তি কাকে যে দিয়ে যাব, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। তুমি হয়তো বলতে পারো, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি, হাসপাতাল এগুলো তো আছে, কিন্তু অতনু, আমার সারা জীবনের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের এই অর্থসম্পদ আমি ওখানে দিতে চাই না। আমি দত্তক নিতে চাই।

দত্তক? মানে পোষ্যপুত্র?—অতনু বুঝেও যেন ওঁর কথা বুঝতে পারল না কিন্তু এ-কথা আমাকে বলছেন কেন? ইচ্ছে করলেই আপনি এ জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। অনাথ আশ্রমে খোঁজ নিতে পারেন। অথবা হাসপাতালের শিশু-বিভাগে—।

তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, অতনু।—ডক্টর সরখেল হেসে উঠলেন : এই বাহাত্তর বছর বয়েসে আমি একটা কচি বাচ্চা পুষ্যি নিয়ে তাকে মানুষ করব, এমন সময় আমার কোথায়! আর ক'দিনই-বা বাঁচব? তোমাকে দেখার পর আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে, যদি তোমার অমত না থাকে তাহলে তোমাকেই আমি পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করব। আপত্তি করার মতো কোনও অভিভাবকও তোমার নেই, এ-কথা জেনেই তোমার কাছে এই প্রস্তাব করছি। আমার গাড়ি-বাড়ি-ব্যাঙ্কের অগাধ টাকাপয়সার মালিক হবে একমাত্র তুমি।

আবেগে, উত্তেজনায় ডক্টর সরখেলের কণ্ঠস্বর আরও বিকৃত ও জড়ানো হয়ে উঠেছিল। কথা শেষ করেই উনি অতনুর বাঁ-হাতখানা মিনতিভরে জড়িয়ে ধরলেন।

অতনুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

সে কি জেগে? না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে?

ভিখিরি থেকে এ যে রাজা হওয়া! বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর নবকিশোর সরখেল তাকে দত্তক নেবেন! এতবড় একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা তার জীবনে সম্ভব হবে?

এই চিন্তাধারার সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ আরও একটা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মতো ওর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে ঝলসে উঠল।

শহরের আদবকায়দা, জটিল জীবনধারায় ও অভ্যস্ত নয়। অনেক কুটিল ষড়যন্ত্র, অনেক শয়তানের ফাঁদ পাতা আছে এই কলকাতা শহরে। নির্বোধ গ্রাম্য অতনু শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা ভয়ঙ্কর ফাঁদের জটিল জালে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে না কি?

ডক্টর নবকিশোর সরখেলের মতো স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ইচ্ছে করলেই তো অতনুর চেয়ে শতগুণে ভালো অনেক ছেলেকেই পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন? কিন্তু তাঁর অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে উনি সহায়-সম্বলহীন অনাথ অতনুকেই বা মনোনীত করলেন কেন?

আমি জানি, তুমি কী ভাবছ।

তীক্ষ্ন সর্পচক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে অতনুকে বিদ্ধ করলেন ডক্টর সরখেল। ওর মনের প্রতিটি কথা তিনি যেন পড়ে ফেলেছিলেন।

অতনু, ইচ্ছে করলেই আমি অনেক বড়লোকের ছেলেকেই, ভালো জুয়েল রত্নকেই সন্তান হিসেবে পেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কী খুঁজেছিও অনেক। কিন্তু তোমার মতো পবিত্র, সরল-স্বভাব, অসহায় কোনও লোককেই আমি পাইনি। তোমার সুন্দর চেহারা, অদ্ভুত স্বাস্থ্য, বয়েস—সব মিলিয়ে আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক-ঠিক মিলে গেছে। আমাকে যে বাবার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, যে আমার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে, যার সন্তান আমার বংশধারা বজায় রাখবে, তাকে বেছে নেওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। যাক। তোমাকে আমি তিনদিন সময় দিচ্ছি এ-বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে। যদি আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকে, তাহলে তুমি আজকের, আমার সঙ্গে তোমার এই দেখা-সাক্ষাতের ঘটনাটা, কথাবার্তা সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ো। আর আমার একান্ত অনুরোধ, আমার এই প্রস্তাবের কথা তুমি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির কাছে প্রকাশ কোরো না। আর যদি আমার প্রস্তাবে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে তুমি আমার এই কার্ডটা রাখো। তিনদিন ভালো-মন্দ, তোমার বর্তমান-ভবিষ্যত, সবকিছু চিন্তা করে এই ঠিকানায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

ডক্টর সরখেলের ইশারায় বয় বিল নিয়ে এসে দাঁড়াল। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে তিনি তাঁর পেট-মোটা মানিব্যাগ থেকে খানকয়েক দশটাকার নোট তার টের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বিভ্রান্ত বিচলিত অতনুও উঠে পড়ল।

তিনদিনও পুরো কাটল না।

এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে অতনু যেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। তার জীবনের এই অতি বিচিত্র অবিশ্বাস্য ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করতে-করতে, দুর্নিবার লোভ-উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লড়াই করতে-করতে ও সহজেই পরাজিত হয়ে পড়ল।

তারপর দুটো দিন কোনওক্রমে কাটিয়ে ডক্টর সরখেলের দেওয়া সেই কার্ডখানার ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে ডায়মন্ড হারবার রোডের অতি নির্জন, বিরাট, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, নিস্তব্ধ, অতি সুদৃশ্য বাড়িটার গেটের কাছে এসে উপস্থিত হল।

বাড়িটা ভালো করে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেল অতনু।

আগাগোড়া মার্বেল পাথরের আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। টেনিস লন, পাথরের মূর্তি, দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, বটল পাম, হিমালয়ান ফার্ন, ফোয়ারা, আউটহাউস, গ্যারাজ—যেখানে যেটি প্রয়োজন, সব কিছু দিয়ে বাড়িটা সাজানো।

এমন একটি অপূর্ব রম্য প্রাসাদের মতো বাড়িতে ডক্টর সরখেল একা বাস করেন! আর সে? মধু মিস্ত্রি লেনের একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘুপসি ঘর—ছেঁড়া ময়লা তোশক-বালিশ-চাদর!

সহসা মাটি ফুঁড়ে উঠে আসার মতো একটা গুণ্ডা চেহারার শেয়ালমুখো লোক তার সামনে এসে দাঁড়াল। ও কোনও কথা বলার আগেই বলে উঠল, আসুন, আপনিই তো অতনু সেন। ডক্টর সরখেল আপনার

জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

অতনুকে দেখে ডক্টর সরখেল মোটেই বিস্মিত হলেন না। তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন, ওকে আসতেই হবে। সাদরে ওকে নিয়ে তাঁর নিজের সুদৃশ্য বিলাসবহুল ঘরে বসালেন। নানারকম সুখাদ্য খাওয়ালেন। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বিরাট বাড়িটা দেখালেন। আলমারি খুলে তাঁর প্রচুর বিত্তের নমুনা—কোম্পানির কাগজ, শেয়ার, থাকে-থাকে সাজানো নোট ইত্যাদি অনেক কিছু দেখালেন। আর অনেক কিছু বোঝালেনও।

তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে বললেন, এইবার বুঝতে পেরেছ তো, আমি কেন দত্তক নিতে চাই? আমার এই সম্পত্তি আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পরহস্তগত হয়ে যাবে, আমি তা চাই না।

আমি রাজি—আমি রাজি।—অতনুর অবস্থা তখন একটা পরাজিত বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো। জালে-পড়া মাছের মতো।

কোনও আপত্তি কোনওরকম দ্বিধা নেই তো তোমার?

না-না—একেবারেই না।—অতনু নেশাচ্ছন্নের মতো জবাব দিল।

আমি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দেব। আমার সবকিছু তুমি পাবে। আমার নাম, উপাধি। তুমি শুধু ভোগ করে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর জিনিস তুমি ইচ্ছেমতো ভোগ করবে। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক, দামী সুরা—যা মন চায়, তুমি প্রাণপণে ভোগ করবে। ভোগ উপভোগই হবে তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সারাজীবন আমি যা ভুল করেছি, তুমি সে-ভুল সংশোধন করবে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে।

ডক্টর সরখেলের চোখ দুটো তীব্র উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল।

বৃদ্ধের এই উত্তেজনা দেখে বিস্মিত হল অতনু।

তুমি কি আমার এখানে আসার কথা বাড়ির কাউকে বলে এসেছ?

আজ্ঞে না। আপনি বারণ করেছিলেন, আর তা ছাড়া কাকেই বা বলে আসব, বলুন?

বেশ করেছ। এবার আমার সঙ্গে এসো। তুমি দেখেছ, এ-বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভার, বাটলার আর কেয়ারটেকার সবাই বাইরের ওই আউটহাউসে থাকে। আমি টেলিফোনে ডাকলে তবেই তারা আমার এখানে আসবে। তারা প্রচুর টাকা মাইনে পায়। ঠিক সময়ে আসে, যে যার কাজ করে চলে যায়। তোমাকে এসব কথা বলছি, কেননা, আমার অবর্তমানে তুমিই ওদের কর্তা হবে। মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তুমি ওদের মালিক হয়ে যাবে।

মাত্র কয়েকঘণ্টা মানে?—রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে অতনু ওঁকে প্রশ্ন করল।

আমি আর দেরি করতে চাই না। এসো আমার ল্যাবরেটারিতে। দেখে যাও, আমি সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে রেখেছি। এমনকী উইলও, যে-উইলে তুমি আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হবে। লেখাপড়ার কাজটা শুধু বাকি আছে। সে-কাজ আমি কালকের মধ্যেই শেষ করে ফেলব।

আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাওয়ার মতো বিমূঢ়, বিহ্বল অবস্থায় অতনু ডক্টর সরখেলের সঙ্গে ওঁর ল্যাবরেটারিতে ঢুকল, চারিদিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে গেল ও। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য নানারকম যন্ত্রপাতি, টেস্টটিউব ইত্যাদি দিয়ে বিরাট ঘরখানা সুষ্ঠুভাবে সাজানো।

কিন্তু ঘরখানা কী ঠান্ডা!

হঠাৎ অতনুর মনে হল, ও যেন একটা লাশকাটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এক সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এই মুহূর্তে এই ল্যাবরেটারি থেকে, ডক্টর সরখেলের সান্নিধ্য থেকে, এই বাড়ি থেকে পালিয়ে না গেলে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কতকগুলো কাচের শিশি-বোতল, ওষুধপত্র, নিয়ে ডক্টর সরখেল পিছন ফিরে কী যেন নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, তুমি কি ভয় পেয়েছ, অতনু? পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ?

অন্যমনস্ক অতনু ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল।

লোকটা কি অন্তর্যামী? অতনুর মনের কথা কেমন করে জানতে পারল? আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিন্তু ওই বুড়োমানুষটাকে ও ভয় করবে কেন? তার মতো একটা কুড়ি বছরের শক্তিমান যুবকের হাতের এক ঠেলাতেই ওই রুগ্ন জরাগ্রস্ত বুড়ো উলটে পড়ে মরে যাবে।

তাড়াতাড়ি ও বলে উঠল, ভয় পাব কেন? আর পালাবই বা কেন? আপনি তো আমাকে ডেকেও আনেননি, জোর করে ধরেও রাখেননি। আমি আপনার কাছে নিজের থেকেই এসেছি।

স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে অতনু একখানা চেয়ারে বসে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

ডক্টর সরখেল এবার ওর মুখোমুখি চেয়ারখানায় বসে পড়লেন। তাঁর হাতে ধরা দুটি কাচের গ্লাস। নীল রঙের তরল পদার্থ ভরা। অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা ভাঙা গলায় তিনি বললেন, অতনু, আমার দত্তক পুত্র হতে যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহলে এসো, আমরা দুজনে দুজনের স্বাস্থ্য পান করি।

এটা কি কোনও ওষুধ?—অতনু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল।

না, না, ভয় পেয়ো না। এটা কোনও খারাপ জিনিস নয়। আমার সারা জীবনের সাধনার ফলও বলতে পারো। এই ওষুধটি স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর অসাধারণ ক্রিয়া করে। নার্ভ-সেল ও মেরুদণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশে এর অতি চমৎকার। এই ওষুধ আবিষ্কার করে নানা জীবজন্তুর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে আমি সফল হয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, অতনু, তোমার কোনও ক্ষতি আমি করব না।

একটি গ্লাস তুলে তিনি নিজে চুমুক দিলেন, অন্যটি একেবারে অতনুর মুখের কাছে তুলে ধরলেন। বাধ্য হয়েই—কতকটা নিরুপায় হয়েই—অতনু সেই তরল পদার্থে ঠোঁট ছোঁয়াল। চুমুক দিল। অপূর্ব স্বাদ।

একবার—দুবার—তিনবার।

অতনু বুঝতে পারল, ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বুঝতে পারল, তার পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত সমস্ত শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। শুধু শরীরের মধ্যেই নয়, অতনু তার মস্তিষ্কের মধ্যেও যেন এক উন্মত্ত রক্তস্রোতের তাণ্ডব অনুভব করল। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অবিশ্বাস্য একটা কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে, এ-কথাও টের পেল ও। ক্রমশ এক আচ্ছন্নকারী সর্বনাশা মাদকতা যেন ওকে ধীরে-ধীরে অচেতন করে দিতে লাগল।

অতনু ঠোঁট ফাঁক করল, প্রাণপণ চেষ্টায় কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওর জিভ অসাড়। শুধু জিভটাই বা কেন? অবশ অসাড় ওর সুগঠিত শক্তিমান শরীরের ওপর ওর আর কোনও কর্তৃত্বই ছিল না। ও শুধু ফ্যালফ্যাল করে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ডক্টর সরখেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

যতটুকু অনুভব শক্তি তখনও ছিল, তাতেই ও চেয়ে-চেয়ে দেখল, ডক্টর সরখেলের চোখে সেই ক্রুর বিষধর সাপের হিমশীতল দৃষ্টি। শাণিত ছুরিকার মতো নির্মম অনুসন্ধিৎসু চোখে তিনি যেন অতনুর সর্বশরীর চিরে-চিরে কেটে কী যেন লক্ষ করছেন।

শুকনো কালো ঠোটের ওপর জিভ বুলিয়ে খসখসে কর্কশ গলায় উনি আত্মগতভাবে বললেন, চমৎকার।

একটু থেমে, অতনুর শরীরের অবস্থা আরও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে যেন একটা খরগোশ অথবা গিনিপিগের ওপর কোনও এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন, এমনভাবে উনি আবার বললেন, খুব চমৎকার! অতনু, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি—একমাত্র তুমিই আমার সমস্ত কিছুর একছত্র অধীশ্বর হয়ে সবকিছু ভোগ করবে।

অতনুর মাথার ভেতর তখন উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের অশান্ত গর্জন। অতি ক্ষীণ, অবশিষ্ট চেতনাটুকুও হারিয়ে ও যেন এখনই সম্পূর্ণভাবে অচেতন হয়ে পড়বে, এমনই ওর অবস্থা। ও যেন ধীরে-ধীরে সব ভুলে যাচ্ছে। ওর নামধাম, পরিচয়, ওর সত্তা। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

লোলচর্ম, শীর্ণদেহ, বিকৃতদর্শন, খর্বকায়, কুটিল, সর্পচক্ষু ডক্টর সরখেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তোমার এখন বিশ্রামের দরকার, এসো আমার সঙ্গে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

নেশাচ্ছন্ন, আত্মরক্ষায় অক্ষম অতনুর হাত ধরে তিনি ল্যাবরেটারি থেকে নিয়ে এলেন তাঁর শোওয়ার ঘরের মধ্যে। ওষুধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় প্রায় চেতনাহীন দেহটাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

সারাটা দিন কীভাবে কেটে গেছে, অতনুর কোনও হুঁশ ছিল না। রাতের দিকে মাঝে-মাঝে সচেতন হচ্ছিল অতনু। এক বিচিত্র দুর্বোধ্য অনুভূতি ওর সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন অতনু সেন নয়, অন্য কেউ। মনে হচ্ছিল, এতদিন ধরে ও দেহচর্চা করেনি, শুধু বিজ্ঞানচর্চাই করে এসেছে। ওকে যেন বেশ কয়েকটা জরুরি এক্সপেরিমেন্টের কাজ করতে হবে। আবার মনে হল, ও যেন কোথায় বেড়াতে গেছে। কোনও এক সবুজ উপত্যকায়। সেখানে শ্বেতমর্মরের এক বিরাট রহস্যময় প্রাসাদে ও ঢুকে পড়েছে পথ ভুলে। বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

পাগলের মতো ও সেই প্রাসাদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করল। বন্ধ দরজায় আঘাত করতে লাগল।

কিন্তু দরজা খুলল না। ভয়ে আতঙ্কে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আবার দেখল, একটা শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ থেকে স্লাইড ছাড়িয়ে ও দেখছে। একটা কাচের আধারে নীল তরল পদার্থ। চারিদিকে ধুলো-ময়লা, মাটির পুরোনো পাত্র, সীসের পাত্র, আবার অন্ধকার—ঘন গাঢ় অন্ধকার। আবার মস্তিষ্কের কোষে বিদ্যুৎচমক।

অতনু এক বিরাট সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ফাইল, কাগজপত্র। ও লেকচার দিচ্ছে।

গ্রহ-নক্ষত্র, নানারকম জীবজন্তু, ছুরি, সাপ—নানারকম ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখতে-দেখতে একসময় অতনুর আচ্ছন্ন, ঘোর ভাবটা তরল হয়ে এল।

অতিকষ্টে ভারী চোখের পাতা খুলল অতনু।

সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তীব্র ব্যথা। সমস্ত শরীরের চামড়াগুলো কেমন যেন ঢিলে-ঢিলে ঝলঝলে। ঘরটা প্রায়ান্ধকার। সব কিছুই অচেনা অপরিচিত। সব কিছুই যেন অস্পষ্ট....ঝাপসা-ঝাপসা.....!

কিন্তু সেই জটিল অবস্থার মধ্যেও অতনু বুঝতে পারল, ও সেই মধু মিস্ত্রি লেনের একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরখানার মধ্যে নোংরা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে নেই।

ওর চারিদিকে দামি নেটের মশারি টাঙানো। ডানলোপিলোর নরম গদির ওপর নরম বালিশ-বিছানায় ও শুয়ে আছে!

কিন্তু ওর শরীরটা—দিব্যকান্তিময় সতেজ শ্যামল সুদীর্ঘ দেবদারুর মতো দেহটা এমন দুর্বল, বিশ্রীরকমের টলমলে মনে হচ্ছে কেন!

গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া চোপসানো বেলুনের মতো শরীরটাকে কোনওমতে টেনে হিঁচড়ে ও বিছানার ওপর উঠে বসল। ভোরের আলো আসছে জানলা দিয়ে। একটা নড়বড়ে রোগজীর্ণ দুর্বল মানুষের মতো ও মশারিটা সরিয়ে খাট থেকে নেমেই ভীষণভাবে চমকে উঠল।

কী সুন্দর! কী বিলাসবহুল আরামদায়ক একটা মস্তবড় শয়নকক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও! দামি-দামি আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো এমন ঘর ও জীবনেও চোখে দেখেনি, থাকা-শোওয়া তো দূরের কথা!

তবে কি সত্যি-সত্যিই ডক্টর সরখেল দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে অতনুকে তাঁর বাড়িতেই রেখেছেন? তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের, গাড়ি-বাড়ি সবকিছুর মালিক কি তবে অতনুই?

কিন্তু তিনি কোথায়?

ডক্টর সরখেল, আপনি কোথায়? ডক্টর সরখেল—।

যতটা শক্তি শরীরে অবশিষ্ট ছিল, সবটুকু কণ্ঠস্বরে উজাড় করে দিয়ে অতনু চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু ওর সেই কণ্ঠস্বর নিজের কানে প্রতিধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ে, আতঙ্কে অতনুর যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল।

এ কার কণ্ঠস্বর! এ কার কণ্ঠস্বর শুনছে অতনু!

জিহ্বার জড়তায়, ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে কর্কশ উচ্চারণে, দন্তহীন গালের গহ্বর থেকে এ কার কথা বেরিয়ে এল?

আমি কে? আমি কে—?

বিভ্রান্ত, ভূতগ্রস্তের মতো অতনু শ্লথ কম্পিত পায়ে ঘরের দামি ড্রেসিংটেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। আয়নার ভেতর ফুটে-ওঠা প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ও বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত, জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল।

ওর আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত যাকে ও দেখতে পেল, সে সত্তর পার হওয়া লোলচর্ম, বার্ধক্য-কবলিত, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ-শীর্ণ, খর্বকায় ডক্টর নবকিশোর সরখেল ছাড়া আর কেউ নয়।

একি স্বপ্ন! না সত্যি!

পাগলের মতো অতনু নিজের মাথার পাকা চুলগুলো টানতে লাগল। ঝুলে পড়া শিথিল চামড়ায় হাত বুলোল। হাঁ করে দন্তহীন মাড়ি, তোবড়ানো গাল, শুকনো কালো ঠোঁট দেখল।

না। সেই সুদর্শন ব্যায়ামবীর কুড়ি বছরের শক্তিমান তরুণ যুবক অতনু নয়। ও এখন কুৎসিত, বীভৎস-দর্শন, খর্বকায়, জরাগ্রস্ত। ও এখন ডক্টর নবকিশোর সরখেল।

থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে অতনু হতাশায়, নৈরাশ্যে, অবসাদে, বিছানার ওপর বসে পড়ল।

এতক্ষণে অতনু সব বুঝতে পারল।

এক উন্মাদ শক্তিশালী দানবের নিষ্ঠুর পৈশাচিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অতনু ওর অনবদ্য তারুণ্য থেকে, উচ্ছল প্রাণচঞ্চল যৌবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

অতনুর সমস্ত জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ করার অপরিসীম ক্ষমতা, এমনকী ওর অপরূপ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘ যুবক-শরীরটাকে পর্যন্ত ওই শয়তান নরপিশাচ ডক্টর সরখেল নিয়ে নিয়েছে।

আর তার বদলে সেই কুৎসিত, জরাগ্রস্ত, স্থবির বৃদ্ধের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছে অতনুর আত্মা!

এই মর্মান্তিক উপলব্ধির মরণাধিক যন্ত্রণায় পাগলের মতো কাঁদতে লাগল অতনু। শয়তান! একটা রাক্ষস! দানব! কী শয়তানি মতলব নিয়েই না অতনুর কাছে গিয়েছিল! অতনুর অপরূপ ব্যায়ামপুষ্ট, কুড়ি বছরের যুবক-শরীর নিয়ে এখন থেকে ওই লোকটা সমাজে বিচরণ করবে। লোকে জানবে, ডক্টর নবকিশোর সরখেলের দত্তক পুত্র অতনু সরখেল তাঁরই উইলের বলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হয়েছে। দু-হাতে টাকা খরচ করবে, ইচ্ছেমতো ভোগ করবে—যেমনটি বলেছিল ও অতনুকে। কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহও করবে না যে, অতনুর ছদ্মবেশে আসলে ওই লোকটাই ডক্টর সরখেল।

ক্রমশ এই চিন্তা অতনুর মস্তিষ্কে আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রাণপণে ও দরজায় আঘাত করতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই ষণ্ডামার্কা শেয়ালমুখো ধূর্ত চেহারার লোকটা দরজা একটু ফাঁক করে নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল, ডক্টর সরখেল, আমাকে কি আপনি ডাকছিলেন?

অতনুর কানের কাছে যেন বিস্ফোরণ ঘটাল লোকটা।

আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ল অতনু, আমি ডক্টর সরখেল নই। আমি অতনু সেন। তিন নম্বর মধু মিস্ত্রি লেনের অহিভূষণ সেনের ভাইপো আমি। ডক্টর সরখেল কোথায়? তারই জন্যে আমার শরীরের আজ এই অবস্থা। আমি পুলিশে খবর দেব—আমি সব্বাইকে বলে দেব তার এই শয়তানির কথা! আমি সেই শয়তান, চোর, ভণ্ড, বিজ্ঞানীটার মুখোশ খুলে দেব—পুলিশের কাছে সব খুলে বলব।

আপনার মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, ডক্টর সরখেল।

শেয়ালমুখো ষণ্ডামার্কা গুণ্ডাটা ধূর্ত শেয়ালের হাসি হাসল অতনুর দিকে তাকিয়ে, পুলিশের চেয়েও আপনার এখন পাগলের ডাক্তারের প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি সেই ডাক্তারবাবুকেই ডাকতে চললাম, ডক্টর সরখেল।

বাইরে থেকে দরজাটাকে ভালো করে লক করে দিয়ে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা উন্মাদ মানুষের মতোই এবার অতনু তার বার্ধক্য-জীর্ণ, জরাগ্রস্ত শরীরটা নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরের ভেতরকার যাবতীয় শৌখিন জিনিসপত্র ছুড়ে-ছুড়ে ফেলতে লাগল। দামি-দামি পোশাকগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগল। তারপর একসময় ক্লান্তিতে, অবসাদে ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

কেন অতনু লোভ করতে গিয়েছিল?

শুধু লোভের বশেই ও আজ এই সাংঘাতিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনও উপায়ই নেই। ডক্টর সরখেল এক নম্বরের শয়তান। আর ওই শেয়ালমুখো ষণ্ডাটা তার অনুচর। দুজনের শলাপরামর্শের আজ অতনুর এই অবস্থা।

এইবার নিশ্চয় ওরা দুজনে মিলে অতনুকে বহু দূরদেশে কোনও পাগলাগারদে পাঠাবে। তারপর অতনুর শরীর আর ডক্টর সরখেলের শয়তানবুদ্ধি পরিপূর্ণ ব্রেন নিয়ে শয়তানটা এই শহরে, তার এই বাড়িতেই মনের সাধ মিটিয়ে ভোগ-সুখ করে যাবে। ওর সারা জীবনের অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করবে।

আর অতনু?

কুড়ি বছরের তরুণ মন নিয়ে আর বাহাত্তর বছরের জরা-ব্যাধিগ্রস্ত দেহ নিয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক ডক্টর নবকিশোর সরখেল সেজে, তার পরিচয়ে, বাদবাকি জীবনটা কাটবে পাগলাগারদের বন্দি হিসেবে। কেউ বিশ্বাস করবে না ওর কোনও কথা। ওদের দেহের অবিশ্বাস্য এই পরিবর্তনের কথা।

তাহলে ও এখন কী করবে? ভাগ্যের হাতেই অসহায় নিশ্চেষ্টর মতো আত্মসমর্পণ করবে?

কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কী!

অতনু প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর সবকিছু হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লাগল, যদি কোনও সূত্র মেলে। কোনও ওষুধ, কোনও ফরমুলা। ড্রয়ারগুলো হাঁটকাতে লাগল। রাশি-রাশি কাগজপত্র। কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অতনুর সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। ড্রেসিংটেবিলের একটা ড্রয়ারে কতকগুলো ওষুধের শিশি পাওয়া গেল। কিন্তু সেগুলো অতনুর কোনও কাজে লাগবে না। ডক্টর সরখেল এত বোকা নন যে, অতনুর আগের চেহারা ফিরে পাওয়ার মতো কোনও ওষুধ এ-ঘরে রেখে চলে যাবেন।

হঠাৎ একশিশি বড়ি ওর নজরে পড়ল। পয়জন! লেবেলের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে। মারাত্মক ধরনের ঘুমের ওষুধ। ডক্টর সরখেলের বোধহয় রাত্রে ভালো ঘুম হত না। শোওয়ার আগে মাত্র একটা বড়ি খাওয়ার নির্দেশ আছে।

কাঁপা হাতে অতনু ঘুমের ওষুধের শিশিটা তুলে নিল। নাঃ, আর কিছুই ভাববার নেই। ওর নিয়তি ওকে ক্রমশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অমোঘ পরিণতির দিকে।

বেঁচে থেকে লাভ কিছু আছে কি?

এই বাড়ি-গাড়ি, টাকাপয়সা কিছুই তার নয়। ডক্টর সরখেল অর্থাৎ তারই উইলের বলে ওই শয়তানটাই এখন ওর দেহ নিয়ে সবকিছু ভোগ করবে। ওই ষণ্ডামার্কা শেয়ালমুখো ডক্টর সরখেলের অনুচরটা এখনই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এ-ঘরে আসবে। তারপর অতনুকে পাগল প্রমাণিত করে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে কোনও অ্যাসাইলামে বন্দি করে রাখতে ওদের মাত্র কয়েকঘণ্টা লাগবে।

যা কিছু করার তার আগেই করতে হবে।

হতে পারে ডক্টর সরখেল একজন মস্তবড় বিজ্ঞানী। আর অতনু সামান্য আর্টসের গ্র্যাজুয়েট। তবু অতনু মনে-প্রাণে অনুভব করতে পারছে, তার চেতনা, অনুভবশক্তি এখনও পরিষ্কার আছে। অতনু যদি ওর এই জীর্ণ দেহটার মৃত্যু ঘটায়, তাহলে কি ডক্টর সরখেলের কোনও ক্ষতিই হবে না?

নিশ্চয় হবে। কেননা, এখন ডক্টর সরখেল আর অতনুর দেহ-মন-প্রাণ একসূত্রে বাঁধা। তার নির্মম পরিণতিও এখন অতনুর হাতের মুঠোর মধ্যে—এই বিষের শিশিটার মধ্যে।

দৃঢ় সঙ্কল্পে মরিয়া অতনু টেবিলে এসে বসল। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে তার চরম অভিজ্ঞতার কাহিনি লিখতে লাগল।

...জানি, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, তবু মৃত্যুর মুহূর্তে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলে যাচ্ছি, আমি যা লিখছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। সত্যি। সত্যি।

বিশ্বাস করুন, আমি বিকৃতমস্তিষ্ক কি অপ্রকৃতিস্থ মানুষ নই। আমি পাগলও হইনি। আমার বোধশক্তি, অনুভূতি এতটুকুও লোপ পায়নি। যে-অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা আমি এই কয়েকঘণ্টা ভোগ করেছি, পৃথিবীর কোনও মানুষই তা কল্পনা করতে পারবে না। আমি যদি পাগল হতাম, তবে এই অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করতে পারতাম না। আর এই অচেনা, অপরিচিত, পরিবেশে অন্যের চেয়ার-টেবিলে বসে এই অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অকল্পনীয় কাহিনি লিখতেও পারতাম না।

সম্পূর্ণ অপরিচিত বিজ্ঞানী ডক্টর নবকিশোর সরখেলের শোওয়ার ঘরের মধ্যে আমি শ্রী অতনু সেন বন্দি হয়ে বসে আছি। মাত্র চারদিন আগে আমি নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান গ্রহণ করে তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছিলাম। তা ছাড়াও, সুদর্শন শক্তিমান শরীরের জন্যেও আমাকে বিশেষ একটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। আমার বয়স কুড়ি। আমি ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট।

আমার যৌবনদীপ্ত স্বাস্থ্যবান শরীরটা ডক্টর নবকিশোর সরখেল তার বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কী একটা ওষুধের সাহায্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তার জরাগ্রস্ত, বার্ধক্যে জীর্ণ শরীরটার মধ্যে আমি অতনু সেন, আমার আত্মা, সত্তা, চেতনা, অনুভব-শক্তি নিয়ে বন্দি হয়ে আছি, তারই শয়তানিতে। আর সেই শয়তানটা আমার সুস্থ, সুন্দর, কুড়ি বছরের যুবক-শরীরটা চুরি করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন তার অধিকারে প্রচুর অর্থসম্পদ। সেই সম্পদের বিনিময়ে সে পৃথিবীর সবকিছু সুন্দর বস্তুকে করায়ত্ত করে ভোগ করবে।

আর আমি! একটা স্থবির, জরাগ্রস্ত, কুৎসিত চেহারার বুড়োর শরীরের মধ্যে আমার কুড়ি বছরের তরুণ মনকে বন্দি রেখে তিলে-তিলে মরে যাব। ওই শয়তানটা আমার রূপ, যৌবনশক্তি, পৌরুষ নিয়ে বহুকাল বেঁচে থাকবে। তারপর যখন ও অশক্ত, স্থবির হয়ে পড়বে, তখন আবার সেই সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক ওষুধটার সাহায্যে আমার মতো কোনও সরল, নির্বোধ তরুণকে এইভাবে ফাঁদে ফেলে তার যৌবন ও শক্তিমান দেহটাকে চুরি করবে, নিজের জরাজীর্ণ দেহটাকে বদলে নেবে।

এতবড় একটা পাপিষ্ঠ, শয়তান-নরপিশাচ বিজ্ঞানীর মুখোশ খুলে দিয়ে আমি আত্মহত্যা করছি। আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী, আমার চেহারা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই ডক্টর নবকিশোর সরখেল।

আর আমি লিখতে পারছি না। ক্লান্তিতে, অবসাদে আমার হাত অসাড় হয়ে আসছে। আমি সব ক'টি বড়ি খেলাম....এইবার বিছানায় শুতে যাচ্ছি...।

অতনু সেন

এই চিঠিখানা বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর নবকিশোর সরখেলের শোওয়ার ঘরের টেবিলে পাওয়া গিয়েছিল। পাওয়া যেত না, যদি এটা ডক্টর সরখেলের কোনও অনুচরের হাতে পড়ত। রাশিয়া থেকে একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম আসায় বাধ্য হয়ে তাঁর শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজা ধাক্কাধাক্কি করে (বাইরে থেকেও লক করা ছিল) খোলা হয়, পিওনের সামনেই। ডক্টর সরখেলকে মৃত দেখে তৎক্ষণাৎ সে পুলিশে টেলিফোন করে। লোকজন এসে পড়ে। সেইজন্যই এই চিঠিখানা পুলিশ অফিসারের হাতে পড়ে।

চিঠির বক্তব্যের মাথামুন্ডু তিনি কিছুই বুঝতে না পেরে পুলিশ কমিশনারকে সব জানান। তিনি এই মৃত্যু-রহস্য ভেদ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজেও বিশেষ কৌতূহলী হয়ে সক্রিয় সহযোগিতাও করেছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং আশ্চর্যের আরও একটা ব্যাপার তখনও তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কুড়ি বছরের অতি সুশ্রী, সুদেহী, ব্যায়ামবীর শ্রীমান অতনু সেনকে মৃত অবস্থায় ডক্টর সরখেলের ল্যাবরেটারির মধ্যেই আবিষ্কার করা হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওর মৃত্যু হয়েছিল।

সবচেয়ে অলৌকিক এবং রহস্যময় ব্যাপার, ঠিক যে-সময় ডক্টর নবকিশোর সরখেল তাঁর শয়নকক্ষে বিষ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন, পোস্টমর্টেম করার পর জানা যায় যে, অতনু সেনও ঠিক সেইসময়ে হার্টফেল করে মারা যায়। ওর মতো অমন অসীম শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান যুবক, জীবনে যে নাকি কখনও কোনও রোগে ভোগেনি, কেমন করে বিনা কারণে তার হার্টের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল, ডাক্তাররা কিছুতেই তা ধরতে পারেননি।

সুতরাং, এই রহস্যময় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা এক ঘন গাঢ় কুয়াশাময় অন্ধকারের মধ্যেই চিরদিনের জন্য অজানা হয়ে রইল সকলের কাছে।

শেষ সংকেত
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৩



কাচের ছবি

বিধায়ক ভট্টাচার্য

আচার্য রাজমোহন সান্যাল পঞ্চাশের পরই কলকাতা ছেড়ে তাঁর মাতৃভূমি কৃষ্ণনগরে একখানি ছোট বাড়ি, নতুন মরিস গাড়ি, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা, স্ত্রী ও একটি কন্যা নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের মধ্যে যে-প্রশান্তি ও স্তব্ধতা থাকা দরকার, সবই তাঁর মধ্যে ছিল। বিশেষ কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে কলকাতার মন্দিরে যেতে হত, কিন্তু সেও বছরে তিনবার কি চারবার। বাকি দিনগুলি নিজের জমিতে ফুল-ফল ও সবজি লাগিয়ে, পুকুরে মাছের চাষ করে বেশ কেটে যেত। কৃষ্ণনগর শহর থেকে একটু বাইরে এই বাড়িখানি রুচিতে ও পরিচ্ছন্নতায় সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করত। রাজমোহনবাবুকে কেউ কোনওদিন রাগতে দেখেনি, সবসময় একটা মিষ্টি হাসি, জ্ঞানগর্ভ বাণী এবং মৃদু রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য ছিল তাঁর কথা বলার বৈশিষ্ট্য।

সেদিন থানায় ইন্সপেক্টর মণ্ডল অফিসেই রাত্রিযাপন করছিলেন। কারণ, গৃহিণীর সঙ্গে বচসা হওয়াতে তিনি এমনই বিরক্ত হয়ে গেলেন—যাতে আর এক ছাদের নীচে বাস করতেই তাঁর ইচ্ছে হল না। অবশ্য স্বামী বাড়ি থেকে যাওয়ার পর দারোগা-গিন্নি মুচকি হেসে দাসীকে বলেছিলেন, একদিন আপিসে মশার কামড় খেতে দে না।

কিন্তু ঘুম কি আসে? শুয়ে, বসে, জল খেয়ে, সিগারেট টেনে, যখন তিনি আর-একবার ঘুমের চেষ্টা করতে মনস্থ করলেন—তখন পুব আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। হাতঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর—পৌনে ছ'টা। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠাতে রিসিভার তুললেন দারোগাবাবু।

কে?

আমি আচার্য রাজমোহন সান্যালের বাড়ি থেকে বলছি।—ভীতিবিহ্বল একটি নারীকণ্ঠ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী বলুন তো!

উনি খুন হয়েছেন। গ্যারেজে ওঁর ডেডবডি—।

কী! খুন হয়েছেন? গ্যারেজে?

হ্যাঁ। আপনি একবার আসুন না দয়া করে!

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

একজন অফিসার এবং চারজন কনস্টেবল নিয়ে ইন্সপেক্টর মণ্ডল তৎক্ষণাৎ গাড়িতে উঠে বসলেন।

ভারী পরিচ্ছন্ন বাড়ি —দূর থেকেই চোখ টানে। কোলাপসিবল গেটটা খোলাই ছিল। পুলিশের গাড়ি ঢুকে একপাশে দাঁড়াল। পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন চারদিক। মণ্ডল বললেন, আগে গ্যারেজটায় চলো তো!

গ্যারেজের দরজা খোলা। ভেতরে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে আচার্য সান্যালের। তিনি কাত হয়ে পড়ে আছেন। বুকে গুলি লেগেছে, রক্তটা শুকিয়ে উঠেছে।

গাড়ি ছিল তো গ্যারেজে?

নিশ্চয় ছিল।—সহকারী অফিসার জবাব দিলেন।

গ্যারেজ খোলা ছিল, মেন গেটটাও খোলা ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মার্ডার যে করেছে, সে একজন গাড়িচোর।

মনে হচ্ছে তাই।

বাড়ির ভেতরে কে আছে দ্যাখো তো!—মণ্ডল বললেন।

বেশি ডাকাডাকি করতে হল না। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে নেমে এল ওপর থেকে।

আপনি কে আচার্যের?—প্রশ্ন করলেন মণ্ডল।

আমি তাঁর সেবা করতাম। রান্নাবান্না, ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম—।

কেন? মিসেস সান্যাল আর তাঁর মেয়ে—?

ওঁরা দুজনেই দেওঘরে আছেন। এই সর্বনাশের খবর পেয়ে কী যে করবেন—।—বলতে বলতে মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চুপ করুন, চুপ করুন। আমাকে কাজ করতে দিন। —ইন্সপেক্টর বললেন, আচ্ছা, আচার্য যে খুন হয়েছেন, সেটা আপনি কখন জানতে পারলেন?

গ্যারেজের পাশের ঘরে কয়লা নিতে এসে। আচার্য প্রতিদিন সাড়ে পাঁচটায় এক পেয়ালা কফি খেয়ে বেড়াতে বেরোতেন। কাজেই আমি পাঁচটায় উঠে কয়লা নিতে গিয়ে দেখতে পাই—গ্যারেজের দরজা খোলা। অবাক হয়ে আর-একটু উঁকি দিয়ে দেখলাম—আমাদের গাড়িটা নেই। ভাবলাম, আচার্য তবে কি কফি না খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন? তখন—আরও এগিয়ে গিয়ে ওঁর ডেডবডি দেখতে পেলাম।—আবার কাঁদতে আরম্ভ করল মেয়েটি : আমি কী করব এখন—কী করে আমি মুখ দেখাব মামণিকে?

চুপ করুন, চুপ করুন। মিত্র, এক কাজ করো, বডিটাকে পোস্টমর্টেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। আমি ওপর থেকে আসছি। চলুন, আপনি আমাকে আপনাদের গাড়ির একটা ডেসক্রিপশান দেবেন। নম্বর, লাইসেন্স সব ওপরেই আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলুন, আমাকে দেবেন।

কেন যে আচার্যের ঘুমটা ভেঙে গেল, জেগে উঠে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে এ-কথা ঠিক, কী একটি শব্দ তাঁর কানে গেছে। তিনি ঘড়ির দিকে চাইলেন রাত্রি চারটে বেজে পনেরো মিনিট। আচার্য জানলার কাছে গিয়ে নীচে গ্যারেজের দিকে চাইলেন। হ্যাঁ, অন্ধকারে একটা ছায়া চলাচল করছে, মাঝে-মাঝে হাতের টর্চটাও জ্বলে উঠছে।

আচার্যের চোখে-মুখে কৌতুকের আলো ফুটে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি একটা ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন। বাগানে নেমে গ্যারেজের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি লোক টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে গাড়িটা দেখছে।

এটা হচ্ছে কী?—আচার্য শান্ত গলায় বললেন।

কে?—বিদ্যুদবেগে ফিরে দাঁড়াল যুবক।

বলি, এতরাত্রে গাড়ি চুরি করতে ঢুকেছ কেন? যাও, চলে যাও!—এই বলে দু-পা এগোলেন আচার্য।

চাপা গর্জন করে উঠল যুবক, এগিয়ে এসো না—গুলি করব। —এই বলে ট্রাউজারের পকেট থেকে বিদ্যুদবেগে সে একটি রিভলভার বের করে তুলে ধরল।

আচার্য হাসলেন। বললেন, মূর্খ, ওটা কি টয় রিভলভার যে, নিয়ে খেলা করছ? যাও, বাড়ি যাও। রেখে দাও, রিভলভার রাখো।

এই বলে যুবকটির দিকে দু-পা এগোতেই, তার হাতের অস্ত্রের মুখে আগুন জ্বলে উঠল। একটা চাপা আর্তনাদ করে আচার্য রাজমোহন সান্যাল গ্যারেজের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

যুবকটি কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মৃতদেহের দিকে। তারপর দু-হাত দিয়ে দেহটা ঠেলে সরিয়ে দিল গাড়ির পথ থেকে।....দরজা খুলে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিল, আলো জ্বেলে দেখে নিল—ট্যাঙ্ক-ভরা তেল আছে...বেরিয়ে গেল কোলাপসিবল গেট দিয়ে।

সমস্ত পরীক্ষা করে বেলা সাতটায় যখন আচার্যের বাড়ি থেকে বেরোলেন ইন্সপেক্টর মণ্ডল, তখন তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে-মনে বললেন, এ কী আশ্চর্য মার্ডার রে বাবা! লোকটা একটা কোনও টেস রেখে যায়নি! কোনওখানে কিছু নেই! আজকাল কলকাতায় যে একশ্রেণীর গাড়িচোর বেরিয়েছে, ডেফিনিটলি এ তাদেরই কারও কাজ। কিন্তু—।

কিন্তুটা হচ্ছে কলকাতা থেকে এত দূরে, এই কৃষ্ণনগরে—আচার্য সান্যালের নতুন মরিস এইটের ওপর তারা কবে থেকে লক্ষ রেখেছিল? দেখা যাক।

আচার্যের মরিস গাড়িটার অ্যাক্সিলারেটারে একটু চাপ দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল বিরল। কাজটা অতি সহজেই হাসিল হয়েছে। মূর্খটা যদি নীচে না নামত, তা হলে অনর্থক এই মার্ডারটা হত না। সামনে ফাঁকা শান্তিপুর-ক্যালকাটা রোড। হাতঘড়িটা দেখল বিরল : চারটে বেজে আটত্রিশ মিনিট। ভালো দাম পাওয়া যাবে গাড়িটার। পার্টসগুলো সব নতুন, ফ্রেশ!...আর-একটু জোরে গেলে ক্ষতি কী? খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভাবল বিরল, যাক, কিছুদিনের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বাবা!

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কি?—পিছনের সিট থেকে একটি শান্ত ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —এই দেখো! সাবধান, সাবধান, হেডলাইট জ্বেলে একটা লরি আসছে। স্টিয়ারিংটা একটু বাঁয়ে কাটাও! চার ইঞ্চি ফলস আছে কিনা! আর-একটু কাটাও!...হ্যাঁ, সেভড!

কোথায় শুনেছে এই কণ্ঠস্বর?—ভাবল বিরল। খুব পরিচিত গলা। কোথায় শুনেছে সে? অত্যন্ত চেনা গলা। কিন্তু—।

অত চিন্তা না করে গাড়িটাকে একপাশে রেখে একটু পেছনে চাও না হে! তাহলেই তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে যাবে।

কৌতূহল জয়ী হল। গাড়িটার বেগ কমিয়ে পেছনে চেয়ে দেখল বিরল। বলল, হ্যাঁ, খুব চেনা চেহারা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

একটু আগে। আচার্য রাজমোহন সান্যালের বাড়িতে।

হঠাৎ বিরলের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। সে বোকার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার গাড়িটা চালিয়ে দিল। একটু পরে গম্ভীর গলায় বলল, আপনি কী করে গাড়িতে উঠে পড়লেন?

খুব কি আশ্চর্য ঘটনা সেটা?

কিন্তু কী করে তা সম্ভব?—চিৎকার করে উঠল বিরল।—আমি যে নিজের হাতে—।

খুন করে এসেছ। সেটাও ঠিক।

সেটা ঠিক হলে, এটা কী?

এটাও ঠিক।

দেখুন, হেঁয়ালি রাখুন। তবে হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে এটা যেন বলবেন না যে, আপনি ভূত হয়ে এ-গাড়িতে চেপে চলেছেন। কারণ, ভূতকে আমার বড় ভয়!

যদি তাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী তোমার? 'তুমি' বলছি বলে যেন রাগ কোরো না, কেমন? সাবধান! আর-একটা লরি আসছে।

কোনওরকমে এ-গাড়িটাও পাশ কাটাল বিরল। বিচিত্র এক অনুভূতির স্রোত বইছে দেহ-মনে। থরথর করে কাঁপছে সব স্নায়ুতন্ত্রী। প্রথমেই তার মনে হল—এ-লোকটাকে আমি খুন করেছি, অথচ লোকটা আমার সঙ্গে মিষ্টি ভাষায় কথা বলছে! কী আশ্চর্য!

কিছুই আশ্চর্য নয়।—জবাব ভেসে এল : যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কী করব আর!

বিরল কোনও জবাব দিল না। নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগল।

আরও একটু তাড়াতাড়ি না চালালে তুমি বিপদে পড়বে। কারণ, এতক্ষণে মণ্ডল দারোগা সব তদন্ত শেষ করে থানায় ফিরেছে। এবং টেবিলে মাথা গুঁজে খুব চিন্তা করছে—তোমাকে কী করে ধরা যায়। শুনছ আমার কথা?

হুঁ।—সামনের পথে চোখ রেখে বলল বিরল, দেখুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!

কেন?

আমি আপনাকে খুন করেছি—।

কিছু না, কিছু না।—ফিসফিস করে হাসির আওয়াজ শোনা গেল : তুমি তো ইচ্ছে করে গুলি করোনি!

আজ্ঞে না।—উৎসাহিত হয়ে বলল বিরল, এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন তাহলে? কিন্তু আপনাকে এগোতে দেখে—।

হুঁ, হুঁ! আমিও তো তোমাকে মারতে যাচ্ছিলাম না হে! আমি এগোচ্ছিলাম তোমার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিতে। কিন্তু তুমি এত মূর্খ যে, কিছু না বুঝেই দুম করে গুলি করে বসলে।

ও!—একটু থেমে বলল বিরল, আমি সেটা বুঝতে পারিনি।

তা তো বটেই। জেনে-শুনে কি কেউ মানুষ খুন করে? এটুকু বুঝেছি বইকী!

নিঃশব্দ পথযাত্রা। শুধু গাড়ির চাকার আর রাস্তার মিলনের শব্দ। প্রথমে আচার্যকে দেখে যে-ভয়টা জেগেছিল, সেটা একটু-একটু করে কেটে যাচ্ছে। গাড়ি রানাঘাট ছাড়িয়ে গেল। বিরল আবার সিগারেট ধরাল। বলল, আপনি আমার সঙ্গে কোথায় চলেছেন?

আমি তো চলিনি, কিন্তু গাড়িটার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেও পারছিনা যে! এদিকে মন দিয়ো না। তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও। অন্তত, গাড়িটাকে একটা ভালো জায়গায়... কোথায় দেবে? মানিকতলাতেই ভালো, কী বলো? সেখানে তোমার জুয়াড়ি বন্ধু অ্যালবার্ট আছে।

সিগারেটটা প্রায় মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল আর কী!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিরল বলল, আপনি সব জানতে পারছেন? সব জানেন?

আনফরচুনেটলি—হ্যাঁ।

আমি কে বলুন তো? কী আমার পরিচয়?

আবার সেই ফ্যাঁসফ্যাঁস হাসি। ঠিক হাওয়ায় দু-খণ্ড কাঠ-ঘষার শব্দ যেন।

তোমার নাম বিরল। তুমি বিকাশবাবুর ছেলে। আহিরীতলায় বাড়ি তোমার। আরও শুনতে চাও? তোমার স্ত্রীর নাম মুক্তি। সে জানে, তুমি গাড়ি মেরামত করতে বেরিয়েছ নাইট ডিউটিতে। কিন্তু—।

থামুন, থামুন আপনি!—ধমক দিয়ে বলে উঠল বিরল, তার মানে, বলতে চান, আপনি সব জানেন?

সব, সব!—বললেন আচার্য সান্যাল।

ও! তাহলে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে আপনি আমার পিছু নিয়েছেন?

ঠিক উলটো। চেষ্টা করছি, তোমায় যদি রক্ষা করা যায়। কেন জানো? ইউ আর এ ফুল! এ বিগ ফুল! যে-বিদ্যা তোমার জানা নেই, তোমার গুরুরা আমার গাড়ির ওপর দিয়ে তোমাকে সেই বিদ্যায় প্রথম হাতেখড়ির সুযোগ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি নতুন গাড়ি কামাতে পারো, তাহলে দু-হাজার টাকা অবধি এককালীন তোমাকে তাঁরা দিতে পারেন।

ঠিক, ঠিক।—নিজের মনেই বলল বিরল। তারপর আবার নিঃশব্দে চালাতে লাগল। গাড়ি ব্যারাকপুর পার হচ্ছে...।

আরও কিছুক্ষণ পরে বিরল গাড়ি চালাতে-চালাতে পিছনে চাইল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

খুব ভোরে উঠে মুক্তি রান্নাঘরে ঢুকেছে। নাইট ডিউটি সেরে স্বামী বাড়ি ফিরে চান করবে, খাবে—তারপর শোবে। কাজেই খান-চার-ছয় পরোটা, আর একটু আলু ছেঁচকি করে রাখা দরকার। খেতে-খেতে চা করে দেবে।

হঠাৎ স্বামীকে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মুক্তি, কী হয়েছে তোমার?

কেন?

এত বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমার চেহারা! চোখ-মুখ বসে গেছে, সারা মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে! কী হয়েছে?

কিছু না তো!—জামা ছাড়তে-ছাড়তে মৃদু গলায় বলল বিরল।

কিছু না! তবে চেহারা এমন হল কেন?

কিছুই হয়নি। ও তোমার চোখের ভুল।

এই বলে বিরল যেই ওপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি বলে উঠল, মুখ-টুখ ধুয়ে নাও। আমার খাবার কিন্তু তৈরি।

খাব না।

কী?

বলছি, খাব না, খিদে নেই।

সে কী! রোজই খিদে থাকে—।

আজ নেই।—বলে বিরল ওপরে চলে গেল। এই ওপর-নীচে দুখানা ঘর নিয়ে বিরলের সংসার। সুন্দরী তরুণী বধূ মুক্তি। তাকে নিয়ে ভারী শান্তির সংসার তার। কোনওদিন কোনও কারণে ভুল-বোঝাবুঝি হয় না।

খাবার সামনে নিয়ে চুপ করে বসে রইল মুক্তি। আজ যেন স্বামীর ব্যবহারে কেমন বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে। নাইট ডিউটি করে আরও কতদিন তো বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু হাজার ক্লান্ত হয়ে ফিরলেও তো মুখ-হাত-পা ধুয়েছে, স্নান করেছে, খেয়েছে। এই ভাবটা তো আগে—।

জামা ছেড়ে, গেঞ্জিটা খুলে, ট্রাউজার খুলতে যাচ্ছে, এমনসময় দরজার দিকে চাইতেই বিরল দেখল, আচার্য সান্যাল চুপ করে দাঁড়িয়ে। দেখেই দপ করে জ্বলে উঠল সে।

আপনি যাননি এখনও?

যাওয়ার তো উপায় নেই। আগেই তো বলেছি। চব্বিশ ঘণ্টা আমি তোমার সঙ্গেই রয়েছি। যাক সে-কথা। আপাতত যে-কথাটা বলবার জন্যে এলাম—তুমি এখুনি ফ্যাক্টরিতে বেরিয়ে যাও।

কেন?

বেরিয়ে গেলেই তুমি বুঝতে পারবে।

আমার বুঝে দরকার নেই। শরীর ভেঙে আসছে আমার। একটু না ঘুমোলে আর আমি কিছুতেই চলতে পারব না।

পারতেই হবে।

না—না—না, আমি ঘুমোব। চলে যান আপনি।

মূর্খ, আমি তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে বলিনি। বলছি, তোমার সেফটির জন্যে। এখুনি বেরিয়ে গিয়ে মানিকতলা গ্যারেজ থেকে যদি গাড়িখানা সামাল না দাও, তাহলে গ্রেপ্তার হতে আর বিশেষ দেরি হবে না।

কিন্তু আমি যে ক্লান্ত।—অপরিসীম শ্রান্তি ফুটে উঠল বিরলের গলায় : আমি যে আর পারছি না। আমাকে ঘুমোতে দিন।

দরজা ঠেলে মুক্তি ঢুকে হাঁ করে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। একটু পরে বলল, ও কী! কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?

বিরল চেয়ে আছে স্ত্রীর দিকে।

হ্যাঁ গো, কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি একলা ঘরে?

কই?

কই মানে? এই তো কথা বলছিলে! এসো, খাবে এসো।

ওই ওকে খেতে দাও। আমার আর খাওয়ার দরকার নেই।

কাকে? কাকে খেতে দেব? কী বলছ তুমি?

বিরল দেখল, তখনও আচার্য সান্যাল চুপ করে চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে সে সামলে নিল নিজেকে। বলল, না, কিছু বলিনি। আমি বেরোচ্ছি।

বেরোচ্ছ মানে? এই যে বললে ঘুমোবে, বেরোবে না!

না, ফ্যাক্টরিতে না গেলে চলবে না। দরকার আছে। —এই বলে জামাটা গায়ে দিতে-দিতে আড়চোখে আচার্য সান্যালের দিকে চাইল। তাঁকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জ্বলে উঠল বিরল।

এখনও দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী? বললাম তো, যাচ্ছি।

ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এল মুক্তি। ঠিক যেন আচার্য সান্যালকে ভেদ করে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আজ কী হয়েছে তোমার? আমাকে বলছ 'এখনও দাঁড়িয়ে থাকার মানে?'

না, না, তোমাকে বলিনি!

তবে কাকে বলেছ? কে আছে আর এ-ঘরে?

দেখতে পাচ্ছ না?

না।

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না?

না, না! কী বলছ তুমি?

তবে আর দরকার নেই দেখে।—এই বলে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিরল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখল, আচার্যও তার সঙ্গে-সঙ্গে নামছেন।

পথে নেমে কিছুটা হেঁটে গিয়ে তবে বাসে উঠতে হয়। সিগারেট ধরিয়ে যখন বিরল চলেছে, তখন সে দেখল, সেই জনাকীর্ণ রাস্তায় নিঃশব্দে তার পাশে-পাশে চলেছেন আচার্য সান্যাল। যেতে-যেতে একসময় তিনি বললেন, বিরল!

আজ্ঞা করুন।

আমি ভেবে দেখলাম যে, গ্যারেজে এখন তোমার যাওয়া উচিত হবে না। কেননা, অলরেডি পুলিশ ওই রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

থমকে দাঁড়াল বিরল। ভয়-ভরা গলায় বলল, তাহলে?

তাহলে আবার কী! তোমাদের তো কোড আছে? ডেঞ্জার ইন্ডিকেশন 'লালবাতি', না?

হ্যাঁ।

ফোনে লালবাতির কথা বলে দিয়ে মানিকতলাকে সাবধান করে দাও যে, গাড়িটা যেন এখুনি বাইরে নিয়ে গিয়ে রান করাতে থাকে। ঘণ্টাখানেক কি দেড়েকের মধ্যে এই গোলমাল মিটে যাবে, তারপর ফিরিয়ে

আনলেই হবে। টেলিফোন করে দাও।

বেশ।—বলে কাছের একটা দোকানে ঢুকতে গেল বিরল টেলিফোন করবে বলে।

আর-একটা কথা।—বললেন আচার্য সান্যাল।

বলুন।—বলল বিরল।

উত্তেজনার ঝোঁকে এই রিভলভারটা তোমার ট্রাউজারের পকেটেই রয়ে গেছে। ওটাকে এক্ষুনি গঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো। অন্য কোথাও নয়, সোজা গঙ্গায়। বুঝেছ? হাজারী বলে তোমার দলের যে-লোকটা এটা তোমায় দিয়েছিল, এটা হারিয়ে গেলে সে রাগ করবে না, বরং ধরা পড়লেই করবে।

বিরল চুপ করে চেয়ে রইল সান্যালের দিকে। একটা উদগত কান্না যেন গলার কাছে এসে ফিরে যাচ্ছে। তবু ঢোক গিলে বলল, আচার্য! আমি আপনাকে হত্যা করেছি। হত্যাকারীর প্রতি এটা কী ধরনের ব্যবহার আপনার?

কী করব বলো, আমার অদৃষ্ট! যাও, যাও, দেরি কোরো না। আর শোনো, রিভলভারটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ি চলে যেয়ো। মুক্তি বসে-বসে কাঁদছে।

হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন আচার্য সান্যাল।

গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিরল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মতো—পরম অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিহত ব্যক্তির আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে হত্যাকারীর পিছনে তাকে রক্ষা করতে! ছি! ছি! ভাবল বিরল, অনর্থক লোকটিকে হত্যা করেছি! কোনও দরকার ছিল না। অতি নিরীহ মানুষ। চাইলে হয়তো গাড়িটা দিয়েও দিতে পারত। অতি নিরীহ, অতি ধার্মিক, অত্যন্ত ভালো ভদ্রলোক এই আচার্য সান্যাল। ছিঃ! এ কী করল সে?

ইন্সপেক্টর মণ্ডল টেলিফোন পেয়ে আবার গর্জন করে উঠলেন, অদ্ভুত! অদ্ভুত ঘটনা! ঠিক সময়ে ঠিক জায়গা থেকে কে যেন অতি সন্তর্পণে খুনের সমস্ত প্রমাণ মুছে দিয়ে যাচ্ছে! টেলিফোন থেকে যা বোঝা গেল, তাতে গাড়িটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে—ওই গ্যারেজেই। কিন্তু কোন যাদুমন্ত্রে সব সাবধান হয়ে গেল! বহু খুনের তদন্ত করেছেন, কিনারাও করেছেন তিনি। কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘটনা এর আগে তিনি দেখেননি। প্রতিটি ব্যাপারে মনে হচ্ছে, কে যেন পুলিশের ঠিক আগে-আগে চলেছে প্রমাণ সরাতে-সরাতে।

সিগারেটে গভীরভাবে গুটিকয়েক টান দিয়ে ইন্সপেক্টর মণ্ডল আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব মারলেন। এখন একটি মাত্র ভরসা—একটি সূত্র। দেখা যাক।

সন্ধ্যার মুখেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল বিরল। ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত মন, তবু ঘুম আসে না কেন? চোখ বুজে আসছে ঘুমের চাপে, তবু ঘুম আসছে না কেন? মোটরটা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পা. বলছে, এটাকে পার্ট-বাই-পার্ট বিক্রি করলে যা হবে, তার চাইতে একটু অপেক্ষা করে বাংলার বাইরে—ইত্যাদি। যাই হোক, ও-ব্যাপারে ঠিক বিরলের মন নেই আজকাল। সে সর্বদাই ভাবছে, আচার্য সান্যালের ব্যবহার। সে অবশ্য আগের দিন কৃষ্ণনগরে গিয়ে শুনেছিল যে, আচার্য অদ্ভুত ভদ্রলোক। সজ্ঞানে কারও কোনও অপকার করতে তিনি নারাজ। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুর পরেও মানুষ একইরকম থাকে কি? ঠিক একইরকম!

সত্যি কথা বলতে কী, আজ এই যে বিরল ধরা পড়ছে না, এ কার দয়ায়? কার অনুগ্রহ তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে? কার বিদেহী দুটি চোখ তার দিকে চেয়ে অশ্রান্ত পাহারা দিচ্ছে? তিনি হলেন আচার্য সান্যাল।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করল বিরল। মুখে বলে বোঝানো যাবে না—এমন একটা কষ্ট। তবু—তবু এ-লোকটা যদি চলে যেত, যদি না থাকত, কিংবা...হ্যাঁ, বিরল তার সুস্থ মস্তিষ্ক থেকেই চিন্তা করছে, কিংবা যদি আচার্য সান্যাল তাকে ধরিয়ে দিতেন, তবু সে স্বস্তি পেত।

আরও পরে রান্নাঘরে ফেলে আসা সিগারেটের টিনটা নিয়ে মুক্তি ঘরে ঢুকল। কাছে এসে দেখল, বিরল চুপ করে শুয়ে—কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে অপলক। এই দু-দিন পরে স্বামীর চেহারা যেন নতুন করে দেখল মুক্তি। কী অসম্ভব বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে! গালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে! এ কী কাণ্ড!

সিগারেটের টিন আর দেশলাইটা মাথার কাছে টিপয়ের ওপর রেখে স্বামীর কাছ ঘেঁষে বসল মুক্তি। আস্তে-আস্তে বাঁ-হাতখানি বিরলের মাথায় বোলাতে-বোলাতে বলল, দ্যাখো, তোমার কী হয়েছে, আমায় বলো! তুমি তো জানো, আমার কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তবে শুধু-শুধু কেন কষ্ট পাচ্ছ? কী হয়েছে, আমায় বলো!

একমুহূর্ত স্ত্রীর দিকে চেয়ে যেন একটু বিরক্ত হল বিরল। তবু যথাসম্ভব সে-বিরক্তি দমন করে বলল, কিছু না হলে তোমায় কি বানিয়ে বলব?

কিছু হয়নি?

না।

কিচ্ছু হয়নি?

না গো, না!

মুক্তি আর কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়ল। টেবিল-ল্যাম্পটার সুইচে বিরল হাত দিতেই খুট করে একটা শব্দ হয়ে ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। এতক্ষণ পরে বিছানার পাশে জানলাটা আলোকিত হয়ে উঠল। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায় ফিন ছুটছে বাইরের পৃথিবীতে। সেইদিকে চেয়ে রইল বিরল। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

ঘুমন্ত স্ত্রীর একখানি হাত জড়িয়ে ধরল বিরলকে। কোথায় কে যেন কী গান গাইছে! এই শান্ত, স্তব্ধ, মাধুরী-মণ্ডিতা বসুন্ধরা ওই একখণ্ড জানলার মধ্য দিয়ে আলোছায়ার বিচিত্র মায়াজাল সৃষ্টি করতে লাগল।

চুরি না করলে কী হয়? অর্থকষ্ট হয়! কিন্তু অশান্তি হয় না। এই পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী, কণ্ঠলগ্না হয়ে আছে—একে নিয়ে কি সৎভাবে জীবনযাপন করা যেত না? মোটর-মেকানিক হিসাবে যে-উপার্জন সে করে, তা তো সামান্য নয়!

মুক্তির মনেও সন্দেহ জেগেছে। আজ তিনদিনের আচরণে যে-বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে তার, স্ত্রীর চোখে তা ধরা পড়েছে। এই তিনদিন সে মুক্তির সঙ্গে ভালো করে কথা কয়নি পর্যন্ত।

মুখ ফিরিয়ে চাইল বিরল স্ত্রীর ঘুমন্ত মুখের দিকে। কী আশ্চর্য সুন্দরী দেখাচ্ছে ওকে!

হঠাৎ একটা অজানিত ভয়ে থরথর করে সর্বশরীর কেঁপে উঠল বিরলের। যদি কোনওরকমে এই হত্যারহস্যের সূত্র ধরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে? পুলিশ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে-ই হত্যাকারী, তবে?

বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় বসে একটা কোকিল ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে। দূরের আর-একটি গাছ থেকে সাড়া দিচ্ছে আর-একটি কোকিল। হঠাৎ সজোরে মুক্তিকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিল বিরল। ঘুম ভেঙে গেল মুক্তির। সে বুভুক্ষু স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিল!

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন—সে-উত্তেজনাও তো ক্ষণিক! তারও তো অবসান আছে! আবার ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তি। কিন্তু ঘুম আসছে না বিরলের। সে জানলার দিকে চেয়ে শুয়ে রইল। একটু পরেই তার মনে হল, জানলার বাইরে একখণ্ড কুয়াশা ভাসছে। ক্রমশ সেই ঘনীভূত কুয়াশা-খণ্ড জানলা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল, আচার্য সান্যাল দাঁড়িয়ে আছেন।

বিরক্ত হয়ে উঠল বিরল। বলল, গভীর রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর শোওয়ার ঘরে এভাবে না ঢুকলে আপনার রুচির প্রশংসা করতাম।

ঢুকব কেন? আমি তো এই ঘরেই আছি।

এই ঘরে আছেন মানে! সবসময়?

হ্যাঁ।

তার মানে কী? তার মানে আমি যখন—।

হ্যাঁ, আমি এই ঘরেই ছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে আচার্য সান্যালের মুখের দিকে চেয়ে রইল বিরল। লোকটাকে তিরস্কার করবে, না প্রশংসা করবে, ভেবেই পায় না সে। স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ নিকটবর্তিতার লীলা কোনও ভদ্রলোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে, এ তো সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না!...হ্যাঁ, বিরল চোর, বিরল আজ খুনি, তবুও সে এ-কথা চিন্তা করতে পারে না।

ভুল, বিরল, ভুল।—বললেন আচার্য, ও-কথা মনে করে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ কেন? আমার কোনও অস্তিত্ব নেই। এ যা দেখছ, তা অস্তিত্বের অন্ধ অনুকৃতি। তোমাদের মিলনের সময় জানলা দিয়ে বাতাস আসা যেমন বন্ধ করতে পারো না, নিজেদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন রোধ করতে পারো না, আমিও ঠিক তাই। আমিও আজ নিশ্বাসের মতো সহজ। আমি আজ ইচ্ছাগতি। মনখারাপ কোরো না। তোমাদের মিলনের ক্ষণে জানলা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়া ওই চাঁদের আলোকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছ, আমাকেও তেমনি স্বীকার করে নাও।

বিরল যেন কেমন হয়ে গেল। সে চুপ করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। একটু চুপচাপ।

কিন্তু তোমাকে যে এখুনি উঠতে হবে, বিরল!

কেন?

যেদিন আমাকে হত্যা করো, সেদিন কি খুব দামি কোনও কাপড়ের ট্রাউজার তোমার পরনে ছিল?

বিরল বোবা চাউনি মেলে চেয়ে রইল আচার্য সান্যালের দিকে।

বলো, বিরল, আমার কথার জবাব দাও!

হ্যাঁ, ছিল। খুব দামি কাপড়।

এ-কথা কি ঠিক যে, সুইজারল্যান্ডের সেই কাপড় আর ওই ট্রাউজারের ফ্রান্সের তৈরি বোতাম—কলকাতায় একমাত্র হোসেন আলি হাসান আলির দোকান ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না?

ঠিক, ঠিক!—উত্তেজনায় বিরল উঠে বসল বিছানায়। বলল, না, কোথাও পাওয়া যায় না। সেইজন্যেই হোসেন-হাসান প্রতিটি ট্রাউজার নিজেরা তৈরি করে দেয় এবং একটা নাম-ঠিকানা রাখে। প্রায় আশি টাকা পড়ে একটা ট্রাউজারে, জানেন?

তোমাকে এত করে সাবধান করলাম বিরল, এত করে!—কান্নার মতো শোনাল আচার্যের কণ্ঠস্বর : প্রথম দিন থেকে তোমার পেছনে-পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে-ঘুরে তোমাকে সাবধান করছি, তবুও এমন সাঙ্ঘাতিক ভুল তুমি কেন করলে?

কী হয়েছে?—মুখ শুকিয়ে গেল বিরলের।

গাড়িটা পুলিশ উদ্ধার করেছে। ড্রাইভারের সিটের দরজার কবজায় ট্রাউজারের একটুকরো কাপড় একটা বোতামসুদ্ধ ছিঁড়ে গিয়ে আটকে ছিল।

সে কী!

হ্যাঁ। উত্তেজনার মুখে গাড়ি থেকে নেমেছ, বোতামসুদ্ধ কাপড়টা সেখানে ছিঁড়ে রয়ে গেছে।

সর্বনাশ!—বলল বিরল।

অবশ্যই সর্বনাশ। তারপর সেই কাপড়ের খোঁজ নিয়ে হোসেন-হাসানের দোকান থেকে একাশিজন লোক—যারা ওই কাপড়ের ট্রাউজার বানিয়েছিল, তাদের ঠিকানা জোগাড় করে গতকাল সকাল থেকে কলকাতা শহর তছনছ করছে পুলিশ। আজ ভোররাত্রে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তারা তোমার এখানেও হানা দেবে।

এখন উপায়?—বিবর্ণ হয়ে গেছে বিরল।

উপায়? তুমি তো আমার কথা শুনবে না! আমি যা বলছি, তাতেই তুমি সন্দেহের ছায়া দেখছ। ওঠো! উঠে গিয়ে চুপিচুপি ওই ট্রাউজারটা নিয়ে নীচের তলার রান্নাঘরে ঢুকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফ্যালো!

পুড়িয়ে ফেলব! কিন্তু ওটা যে—।

জানি। আশি টাকার মায়া। কিন্তু ওই আশি টাকা বাঁচাতে গেলে আজ ভোর হওয়ার আগেই তুমি আশীবিষে জ্বলে মরবে! যাও, যাও—ওঠো!—আচার্য সান্যালের কণ্ঠে যেন আদেশের সুর বাজল, যাও, ওঠো বলছি! এক্ষুনি গিয়ে ট্রাউজারটা পুড়িয়ে ফেলে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করো।

ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে নামল বিরল। আলনা থেকে ট্রাউজারটা নিয়ে খুঁজে দেখল। সত্যি, তার প্রথম বোতামের ঘরের কাছে খানিকটা কাপড় আর একটা বোতাম নেই। শার্টের পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে ট্রাউজারটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে সে দরজায় হেলান দিয়ে ফিরে চাইল পশ্চাতে দণ্ডায়মান আচার্য সান্যালের মুখের দিকে। দেখল, সেই প্রশান্ত মুখখানি যেন করুণায় ছলছল করছে।

হু-হু করে উঠল বিরলের বুকের মধ্যে। সে ধীরে-ধীরে বলল, আচার্য সান্যাল!

আর-একটা কথা। এটাকে পুড়িয়ে রাত সাড়ে তিনটের মধ্যে তুমি এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। বউমা যেন পুলিশকে বলেন, তুমি বিদেশে মোটর সারাতে গেছ। বুঝলে?

আচার্য!—সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল বিরল।

কী বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলো।

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

কেন? ক্ষমা কীসের জন্যে?

আপনার মতো ভালোমানুষকে—দেবতাকে আমি খুন করেছি বলে। এমনিতেই আমি বিবেকের জ্বালায় জ্বলে মরছি, তার ওপর যদি আপনার ক্ষমা না পাই—।

না, না!—আচার্য যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, ক্ষমা! কী বলছ বিরল? তুমি জানো না, আমাকে হত্যা করে তুমি আমার কতবড় উপকার করেছ। ক্ষমার কথা বোলো না। না, না, ক্ষমা-টমা নয়, ক্ষমা-টমা নয়।

কেন নয়? আপনার জীবননাশ করেছি আমি।—বলতে-বলতে বিরলের চোখ ছলছল করতে লাগল : অন্যায় করেছি, আমি স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। হত্যাকারীকে জগতে কেউ ক্ষমা করে না, সবাই ঘৃণা করে তাকে। কিন্তু আপনি তা করেননি।

না, না, বিরল!—অদ্ভুত শান্ত শোনাল আচার্যের কণ্ঠ : পৃথিবীতে আমার চাইতে অসুখী কেউ ছিল না। বিশহাজার টাকার ইনশিয়োর করেছিলাম। এই টাকাটা পাওয়ার জন্যে আমার স্ত্রী একদিন...যাক সে-কথা। কৃষ্ণনগরে বাড়ি করার ব্যাপারে আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিদিন সেই পাওনাদারের তাগাদা শুনতে-শুনতে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। শুধু এই নয়, আরও আছে।

আরও আছে!

আরও আছে, বিরল, আরও আছে। তুমি ছেলেমানুষ, মানবচরিত্রের কতটুকুই বা জানো? যৌবনের উন্মত্ততায় কবে কোথায় কী করেছিলাম, আজ মনে নেই। হয়তো করেছিলাম, নয়তো করিনি—কিন্তু তার জন্যে এই প্রৌঢ় বয়েসে প্রায়শ্চিত্ত করছি। দেহের মধ্যে থেকে-থেকে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করি। যখন এই ব্যথা ওঠে, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এই যন্ত্রণার জ্বালায় আমি দু-তিনবার আত্মহত্যাও করতে গেছি। এক অবরুদ্ধ নিশ্বাস-রোধকর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে প্রাণ আমার মুক্তির জন্যে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেইসময় দুঃখত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিলে তুমি। দয়া করে গুলি করে আমাকে মৃত্যু-অমৃত দান করলে। তোমার ওপর রাগ করব আমি, যে আমাকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নবজীবন দান করল?

এই বলে একটু থেমে আচার্য সান্যাল আবার বলতে লাগলেন। এবার তাঁর কণ্ঠস্বর আরও শান্ত, আরও গভীর শোনাচ্ছে :

তাই উপকারীর উপকার করবার জন্যে আমার এই চেষ্টা।—দেখতে-দেখতে আচার্য সান্যালের দু-চোখ জলে ভরে এল : যাই হোক, তুমি আর দেরি কোরো না, বিরল! মনে রেখো, ঠিক চারটে দশ মিনিটে ওরা এখানে আসবে তোমার খোঁজে—সার্চ করবে তোমার বাড়ি-ঘর। তার আগে নিশ্চিহ্ন করে পুড়িয়ে ফ্যালো ওই সর্বনাশা টাউজার। তারপর পালিয়ে যাও বাড়ি থেকে। দিন-সাতেক পর ফিরে আসবে, তখন বিপদ অনেক কেটে যাবে।

কোথায় যাব?

কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?

না।

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে আচার্য বললেন, আচ্ছা, তবে ট্রাউজারটা পোড়ানোর পর আমার পেছনে-পেছনে যেয়ো। আমি তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসব। আর কথা নয়, এখন যাও। ওঠো, ওঠো, ট্রাউজার নিয়ে নীচে চলে যাও।

ধীরে-ধীরে ট্রাউজার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিরল। রান্নাঘরে ঢুকে বসল চুপ করে। কাঁচি দিয়ে টুকরো-টুকরো করে কাটল ট্রাউজারটাকে। তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করল। একটু-একটু করে পুড়তে লাগল ট্রাউজার।

নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠছে মনে। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে বলতে পারবে না বিরল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকে উঠে চেয়ে দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি। ভয়-ভরা অপলক চোখে চেয়ে আছে স্বামীর দিকে। তার চোখে ফুটে উঠেছে ভয়...সন্দেহ...অনুকম্পা একসঙ্গে।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল মুক্তি। বলল, এত রাতে এখানে কী করছ?

ওই যে একটু দরকার ছিল—মানে ট্রাউজারটা—।

কাছে এগিয়ে এসে বসল মুক্তি। ট্রাউজারটার দিকে চেয়ে বলল, এ তো সেই নতুন ট্রাউজারটা! এটা পোড়াচ্ছ কেন?

এটা—মানে—বড় বাজে কাট, তাই—।

বাজে কাট!

দুজনের চোখাচোখি হল। বিরল চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার আগুনে ফেলে দিল আর-একটা টুকরো।

একটু নিস্তব্ধতা...।

শোনো!—ডাকল মুক্তি।

বলো।—অন্য দিকে চেয়ে জবাব দিল বিরল।

চাও আমার দিকে—।

বিরল এবার চাইল স্ত্রীর দিকে। মুক্তি দেখল, স্বামীর দুটি বড়-বড় চোখ জলে পরিপূর্ণ। একটা উদগত কান্নাকে দমন করে মুক্তি চাপা আর্তনাদ করে উঠল, ওগো, এখনও আমাকে বলো, তোমার কী হয়েছে? কোথায় কী করে এসেছ তুমি? বলো, বলো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

ট্রাউজার পোড়াতে ভুলে গেল বিরল। সেও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মুক্তি সবলে তার মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কান্না-জড়ানো অস্ফুট কণ্ঠে বলল, বলো!

ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে, পুরো কাহিনী ব্যক্ত করতে লাগল বিরল। তার চোখের জলে স্ত্রীর বুকের কাপড় ভিজে উঠল। উঠুক। তবু, কী শান্তি! কী অপরূপ মুক্তি আছে মুক্তির বুকে!

পুলিশ এসে যখন স্ত্রীর বুক থেকে স্বামীকে কেড়ে নিয়ে অ্যারেস্ট করল, তখন সমস্ত ভয়... উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের চিহ্ন মুছে গেছে বিরলের মুখ থেকে। স্ত্রীর চোখের জলে ভিজে গেছে তার মাথার চুলগুলি।

অশ্রুধারায় স্নান করে শুচি-স্নাত হয়ে বিরল চলল নরহত্যা নামক অপরাধে বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যেতেই বিরল উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, আচার্য সান্যাল দাঁড়িয়ে আছেন। হাসিমুখে ডাকলেন, এসো বন্ধু!

এখনও অপেক্ষা করছেন আপনি?—বিরল বলল।

এত অপেক্ষা করেছি বলেই তো আজ পাওয়া পূর্ণ হল। এসো, পুরীর সমুদ্র দর্শন করে আসি।

তার মানে? আমার চাকরি-বাকরি নেই? আপনার সঙ্গে...।

বলতে-বলতে থেমে গেল। চেয়ে দেখল, তার দেহটা তখনও জেলের ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, চারপাশে লোকজন। সে বেঁচে আছে কিনা—বোধহয় সেই পরীক্ষাই চলছে।

কী পাগলামি!—খুব জোরে হেসে উঠল বিরল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ হল না দেখে আপনি থেমে গেল।

মাসিক রোমাঞ্চ

জানুয়ারি, ১৯৭৪



প্রলয়ের স্বপ্ন নিয়ে

উপেন মান্না

স্কাইস্ক্রেপার। আকাশছোঁয়া সব বড়-বড় বাড়ি। নীচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকালে অস্পষ্ট দেখায়। অতদূর দৃষ্টি পৌঁছয় না। ওপরতলা থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। নীচের যানবাহন কিছুই নজরে পড়ে না। কেমন যেন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন আলো-আঁধারির মতো দেখায়।

এইরকম একটি নব্বইতলা বাড়িতে বিজ্ঞান উন্নয়ন সংস্থার দপ্তর। প্রফেসর উপানন্দ বিশেষ একটা জরুরি সভার কাজ শেষ করে একসময় নেমে এলেন নীচে। সহকারী লিলি অপেক্ষা করছিল গাড়িতে। প্রফেসরকে দেখতে পেয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন করল, 'কিছু কি বুঝতে পারলেন, স্যার! আমরা কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারব?'

গাড়িতে উঠে প্রফেসর উপানন্দ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'না লিলি, কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। মূল উৎসই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই গুরুতর পরিস্থিতির উৎপত্তি জানতে না পারলে আমরা অগ্রসর হব কোন পথ ধরে, বলো?'

এরপর আর কী জবাব দেবে লিলি! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। গাড়ি ছুটল প্রফেসর উপানন্দের বাড়ির দিকে। মাইল-দুই চলে আসার পর লিলি পিছন ফিরে একবার তাকাল—পিছনে ফেলে আসা সেই আকাশচুম্বি সৌধের দিকে। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অব্যক্ত বিস্ময়-ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। লিলির কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে প্রফেসর উপানন্দ পিছনে তাকিয়েই হতবাক হয়ে গেলেন।

এতদিন ভারতের কোনও শহরই এ-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেনি, কিন্তু আজ এই প্রথম সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করল আমাদের এই সুন্দরী কলকাতা।

'উঃ, কী ভীষণ! আমি যে ভাবতেই পারছি না, স্যার! এতদিন কেবল শুনেছি মাত্র, স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু যা দেখছি, তা যে ভাবাই যায় না, স্যার!' আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে লিলি বলল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রফেসর যাত্রা করলেন বিজ্ঞান উন্নয়ন সংস্থার দপ্তরের দিকে। কয়েকটি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ওঁদের গাড়ি ওভারটেক করে ছুটছে অকুস্থলের দিকে।

কোথায় দপ্তর! কোথায় কী! প্রফেসর উপানন্দ নেমে এলেন গাড়ি থেকে। চারদিকে তখন জনতার জটলা। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, অ্যাম্বুলেন্স... সব কিছুই এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তাদের কাজ কী কেউ বলে দিচ্ছে না। কারণ, তাদের করবার কিছুই ছিল না।

লিলি ও প্রফেসর উপানন্দ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ফাঁকা জমিটার দিকে। এই একটু আগেই ফাঁকা জমিটার ওপর নব্বইতলা বাড়িটা ছিল। যার পঁচাশিতলায় ছিল বিজ্ঞান উন্নয়ন সংস্থার অফিস, প্রফেসর কিছুক্ষণ আগেই যেখানে জরুরি সভায় মিলিত হয়েছিলেন।

নব্বইতলা বাড়িটা সম্পূর্ণভাবে উড়ে গেছে। একটুকরো সিমেন্ট-বালি পর্যন্ত সেখানে পড়ে নেই। মনে হল, কেউ যেন বিরাট এক ইস্পাতের করাত দিয়ে তলা থেকে কেটে বাড়িটাকে আকাশপথে কোনও অজানা দেশে নিয়ে গেছে। একখণ্ড ফাঁকা জমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেখানে।

মুহূর্তের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। বড়-বড় বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা যে-যার প্রাণভয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটল। এতদিন সকলেই কাগজে পড়ে এসেছে যে, পৃথিবীর বড়-বড় শহরগুলি থেকে বড় বহুতল বাড়িগুলি চক্ষের পলকে কোথায় যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের ওপর আর একটি বাড়িও অবশিষ্ট ছিল না। মস্কো, প্যারিস, টোকিও, মেলবোর্ন, সিডনি, হামবুর্গ, জাকার্তা, ব্যাংকক কোথাও বাদ ছিল না। একমাত্র ভারতই ছিল ব্যতিক্রম, যেহেতু ভারতের কোনও শহরই এতদিন এভাবে কোনও বাড়ি হারায়নি।

কলকাতায় হঠাৎ এই অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ অথবা এক অলৌকিক উপায়ে নব্বইতলা বাড়িটি উধাও হয়ে যাওয়ায় সকলেরই একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সারা ভারতে ঘোষণা করা হল জরুরি অবস্থা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন প্রফেসরকে জানাল, সে তখন সামনের রেস্তোরাঁতে বসে কফি খাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কুয়াশার মতো ধোঁয়ার আবরণে বাড়িটা ঢাকা পড়ে গেল। অমন ধোঁয়া বা কুয়াশা তো হামেশাই লেগে থাকে, তাই তেমন গুরুত্ব দিয়ে সে ব্যাপারটা দেখেনি। কিন্তু সেই কুয়াশার আবরণ সরে যেতেই সে দেখতে পেল, অতবড় বাড়িটা আর নেই। কে যেন উধাও করে দিয়েছে। অথচ মজার কথা যে, কোনওরকম শব্দ না করেই বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তার হাত থেকে কফির কাপটা খসে পড়ল মাটিতে। সে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

এ যেন যুদ্ধের সময় যুদ্ধের খবর পড়া। দূরে যুদ্ধ হচ্ছে, অজস্র বোমা পড়ছে, লক্ষ-লক্ষ লোক হতাহত হচ্ছে। খবরের কাগজে সেসব খবর পড়তে-পড়তে আমরা কিছুটা আলোচনা করি এবং তারপরই ভুলে যাই। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন সত্যিকারের বোমা আমাদের সামনে পড়ে এবং আমরা রণক্ষেত্রের মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাই, তখন তার ভয়াবহ রূপ দেখে আমরা অবাক হই, থমকে যাই। আজকের ঘটনাটা ঠিক সেইরকমভাবেই সবাইকে স্তব্ধ করে দিল।

মুখে কারও কথা ছিল না। অতবড় প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখের নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার চিন্তাটাই ছিল বিস্ময়কর। কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা যায় কেউই বুঝতে পারছিল না। তবে এ-কথাটা সকলেই অনুভব করল যে, এক ভয়ানক বিপদ পৃথিবীর ওপর শাণিত খড়্গ নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রফেসর উপানন্দ চিন্তাকুটিল মুখে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, লিলিও অনুসরণ করল তাঁকে। গাড়ি ছুটল বাড়ির দিকে। সারাটা পথ আত্মস্থ হয়ে রইলেন তিনি। সহস্র চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল প্রফেসরের জন্য। বাড়িতে পৌঁছতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। লিলি গিয়ে টেলিফোনটা ধরেই রিসিভারটা এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়, স্যার! খুবই নাকি জরুরি।'

রিসিভার কানে লাগাতেই ওপার থেকে ভেসে এল ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, 'আমি কি প্রফেসর উপানন্দের সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, আপনি কে?'

'আমি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলছি।'

'বলুন, আমাকে হঠাৎ তলব করলেন কেন?'

'অবস্থা খুবই জটিল, প্রফেসর! কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় নব্বইতলা বাড়িটার বেমালুম অদৃশ্য হওয়ার খবর পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তামিলনাড়ু, বোম্বাই, কোচিন, নাগপুর ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি শহর থেকেই খবর

আসতে শুরু করেছে যে, সেখানকার বহুতল বাড়িগুলিও চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বেমালুম উধাও হয়ে যাচ্ছে। এমনকী দিল্লিরও কয়েকটি বাড়ি এইমাত্র মুছে গেল দিল্লির জমি থেকে। এতদিন আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম এই কথা ভেবে যে, ভারতে এমন অঘটন ঘটবে না। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আমাদের ভাবনার বিপরীত হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা কী করব, আমাদের কী করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র আপনিই এই ঘোরতর দুর্বিপাক থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারেন।'

'মাননীয়!' প্রফেসর উপানন্দ বললেন, 'আমার প্রতি আপনার এই আস্থা দেখে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিন্তু ঘটনাগুলো এতই জটিল যে, এ-বিষয়ে চট করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, এর উৎস যে কোথায় তা খুঁজে না পাওয়া অবধি কিছুই বলা যাবে না। আমি এই ভয়ঙ্কর রহস্যের মূলে পৌঁছনোর যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং যথাসময়ে আপনাকে জানাব—অবশ্যই যদি সফল হতে পারি।'

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে প্রফেসর উপানন্দ তাকালেন লিলির দিকে। লিলি বলল, 'কিছু কি অনুমান করছেন, স্যার?'

'অনুমান? না লিলি, তেমন কিছু নয়,' প্রফেসর উপানন্দ চিন্তাকুটিল মুখে বললেন, 'তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্র অথবা কোনও ব্যক্তি এই ঘটনায় লিপ্ত নয়। তাই যদি হত, তাহলে পৃথিবীতে প্রতিটি রাষ্ট্রই আক্রান্ত হত না। শুধু বাড়িগুলি নিশ্চিহ্ন হলে না হয় চিন্তার কিছু ছিল না, কিন্তু বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে সেই বাড়ির বাসিন্দারাও উধাও হয়ে যাচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকবে।'

এ-রহস্যের কিনারা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন এর একটা বিহিত করতে। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে চলে, আর একের-পর-এক আকাশচুম্বি সৌধরাজি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একসপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীতে এমন কোনও শহর রইল না, যেখানে চার-পাঁচতলার বেশি উঁচু বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। শেষ যে-শহর দুটিতে তখনও কয়েকটি আকাশচুম্বি বাড়ি অবশিষ্ট ছিল তাও আজ শেষ হয়ে গেল। সে-দুটি শহর হল জাপানের টোকিও আর কোরিয়ার সিওল।

বাড়িগুলির সঙ্গে কোটি-কোটি লোকও শেষ হয়ে গেল। আতঙ্কে ভরে উঠল চারিদিক। কখন যে কার মাথায় নেমে আসবে এই অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ, কেউ জানে না।

গবেষণাগারে বসে প্রফেসর উপানন্দ বর্তমান পরিস্থিতির চিন্তায় মগ্ন। কার দ্বারা এমন কাজ সম্ভব? যদি ধরে নেওয়া যায় মহাকাশ থেকে কেউ, যারা অন্য কোনও উন্নত গ্রহের জীব, এমন কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে, তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায় অযথা তারা এভাবে পৃথিবীবাসীদের উত্ত্যক্ত করবে কেন? বিশেষ করে, বেছে-বেছে আকাশচুম্বি বাড়িগুলি ধ্বংস করেই বা তাদের কী উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে! আর, যদি ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীতেই কেউ এমন কাজ করে যাচ্ছে, তবে এখানেও একটা প্রশ্ন উঁকি মারে বিজ্ঞান কি পৃথিবীতে এতদূর এগিয়ে গেছে? এবং এমন শক্তি কি কেউ অর্জন করেছে যা দিয়ে শত-শততলাবিশিষ্ট বাড়িগুলোকে একনিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া যায়? দুটোর কোনওটাই মনঃপূত হয় না প্রফেসরের। অথচ একটা কিছুকে কেন্দ্র না করে অনুসন্ধানে মনোনিবেশও করা যায় না।

মনটা হালকা করে নেওয়ার জন্য প্রফেসর উপানন্দ খবরের কাগজটা নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলেন। একটা খবর নজরে পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। খুবই সাধারণভাবে খবরটি পৃষ্ঠার এককোণে ছাপা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, 'এম-ভি-ফ্যান্টাস' নামক একটি পণ্যবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন জাহাজটিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ইলোইলো বন্দর থেকে মাল বোঝাই করে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলু বন্দরের দিকে পরিচালিত করেন, তখন মাঝপথে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পান। জাহাজ থেকে আনুমানিক পাঁচকিলোমিটার দূরে মহাশূন্য থেকে সমুদ্রের বুকে নেমে এসেছে একটি বিরাট কালো ছায়া। ভালো করে কিছু দেখবার আগেই সেই ছায়াটি মিলিয়ে যায় আকাশের গায়ে। জাহাজের ক্যাপ্টেন সঙ্গে-সঙ্গে ইলোইলো বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেতারে সংযোগ স্থাপন করে ঘটনাটি জানিয়ে দেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষ কয়েকটি দ্রুতগামী বিমানকে পাঠান ব্যাপারটি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। কিন্তু তারা এ-বিষয়ে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। বন্দর কর্তৃপক্ষের ধারণা, জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়তো কিছুই দেখেননি। সম্ভবত ব্যাপারটা তাঁর মনের ভুল।

প্রফেসর উপানন্দ আর একটি দিনও বিলম্ব না করে ইলোইলো যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। লিলিকে ডেকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে বললেন, সম্ভব হলে আজ রাত্রেই যেন একটা বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়।

কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করেই প্রফেসরের জন্য একটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রফেসর উপানন্দ ও সহকারী লিলি সেইরাত্রেই রওনা হয়ে গেলেন ইলোইলো অভিমুখে। প্রফেসর উপানন্দের স্থির বিশ্বাস, জাহাজের ক্যাপ্টেন ভুল দেখেননি। এখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ইলোইলো থেকে খবর সংগ্রহ করা, 'এম. ভি. ফ্যান্টাস'-এর ক্যাপ্টেন কোন পজিশনে সেই কালো ছায়াকে দেখেছিলেন।

ইলোইলো বন্দরে যাওয়ার আগে বিমানটি একবার রাজধানী ম্যানিলাতে নামল। ওঁরা প্লেন থেকে নেমে লাউঞ্জের দিকে অগ্রসর হলেন। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখলেন দূরের একটি বহুতল বাড়িকে ঘিরে যেন জমাট কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার কয়েকসেকেন্ড পরে কুয়াশা সরে যেতেই দেখা গেল বাড়িটি বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রফেসর উপানন্দ মাঝপথ থেকেই ফিরে এলেন প্লেনে। প্লেনটি উড়ে চলল ইলোইলোর দিকে। এখন আর একমিনিটও সময় নষ্ট করা চলে না। এরপর হয়তো ছোট-ছোট তিনতলা, চারতলা বাড়িগুলোও ওদের কবলে পড়বে!

বন্দর কর্তৃপক্ষ তেমন কোনও সংবাদ পরিবেশন করতে পারলেন না, তবে 'এম. ভি. ফ্যান্টাস'-এর ক্যাপ্টেন কোন জায়গা থেকে সেই কালো ছায়া দেখেছিলেন তার অবস্থানটুকু জানালেন। কর্তৃপক্ষ আরও বললেন যে, ফ্যান্টাসের ক্যাপ্টেন গুয়াম দ্বীপ পার হয়ে যখন হনলুলুর দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই সেই ছায়াটি দেখতে পান—২০ ডিগ্রি উঃ দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি।

লিলি বলল, 'আমাদের গুয়াম থেকে একটা লঞ্চে এগুতে হবে, স্যার! প্লেনে করে ঘুরলে আমাদের কাজ সফল হবে বলে মনে হয় না!'

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ লিলি,' প্রফেসর উপানন্দ বললেন, 'আমরা গুয়াম থেকে লঞ্চে করেই রওনা হব।'

গুয়ামে পৌঁছেই প্রফেসর উপানন্দ ও লিলি সোজা গিয়ে উঠলেন লঞ্চে। ইলোইলো কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই গুয়ামে সংবাদ পাঠিয়ে সব কিছু তৈরি রাখতে বলেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট নিশানা লক্ষ করে লঞ্চটি ছুটে চলল।

সাতদিন সাতরাত একটানা জল কেটে এগিয়ে চলল ক্ষুদ্রকায় লঞ্চটি। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখলেও প্রফেসর উপানন্দের তেমন কিছু নজরে পড়ল না। ম্যাপ নিয়ে দেখলেন নিজেদের অবস্থান। ওঁদের লঞ্চটি এখন এমন এক জায়গায় রয়েছে যেখান থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে কোনওদিকেই কোনও দ্বীপ বা স্থলভাগ নেই। প্রফেসর উপানন্দ লঞ্চটিকে সেখানেই রাখবার মনস্থ করলেন।

এমনসময় রেডিও অপারেটর এসে খবর দিল, 'এইমাত্র মেসেজ পেলাম, এইপথ দিয়েই ''ক্লিওপেট্রা'' আসছে। হাতে মাত্র দু-ঘণ্টার মতো সময় আছে। তার আগেই নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যেতে হবে।'

সকলের মুখ শুকিয়ে উঠল। 'ক্লিওপেট্রা' নামধারী যে-ঝড় এগিয়ে আসছে, তার কবলে পড়ে বড়-বড় জাহাজ এক নিমেষে ডুবে যায়। আর এটা তো সামান্য একটা লঞ্চ মাত্র!

'ক্লিওপেট্রা'-র কবলমুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে লঞ্চটি যতদূর সম্ভব তীব্রগতিতে উত্তরাভিমুখে ছুটল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হতে পারল না। নিক কালো এক ভয়ঙ্কর দৈত্য সারা আকাশ জুড়ে ছুটে আসতে লাগল, উত্তাল হয়ে উঠল জলরাশি। আর মিনিট-পনেরো সময় পেলে প্রফেসর উপানন্দের লঞ্চটি 'ক্লিওপেট্রা'-র আওতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যেতে পারত, কিন্তু তা আর হল না। ঝড়ের একাংশ এসে

আছড়ে পড়ল লঞ্চটির ওপর। সকলেই লাইফ-জ্যাকেট পরে প্রস্তুত হয়েছিল। লঞ্চটি ঝড়ের ধাক্কায় অকল্পনীয় গতিতে ছুটে গিয়েই উলটে গেল। লঞ্চের আরোহীরা ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। অবাক হয়ে সকলেই লক্ষ করল, যেখানে ওরা ছিটকে পড়েছে সমুদ্রের জল সেখানে শান্ত। 'ক্লিওপেটা' সরে যাচ্ছে দিকচক্রবালের দিকে। লঞ্চটি তখন জলের তলায় অকূল সমুদ্রে। এখন ওদের কে দেবে কূলের ঠিকানা!

লিলি হঠাৎ 'দ্বীপ!' বলে চিৎকার করে উঠল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে গিয়ে পড়ল। ওরা পৌঁছে গেছে একটা ছোট্ট দ্বীপের উপকূলে।

প্রফেসর উপানন্দ অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, লিলি! প্রশান্ত মহাসাগরের এ-অঞ্চলে তো কোনও দ্বীপ থাকার কথা নয়! আমরা কি তবে একটি অনাবিষ্কৃত দ্বীপকে আবিষ্কার করলাম?'

লিলির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ও জড়িত কণ্ঠে বলল, 'তাই তো দেখছি, স্যার!'

লঞ্চের চালক বলল, 'দ্বীপটি যে আমাদের জীবন রক্ষা করল শুধু সেই কথাটাই ভাবুন, স্যার। নয়তো এতক্ষণে সমুদ্রের নোনা জল খেয়েই প্রাণটা বেরিয়ে যেত। এখন চলুন, দ্বীপে গিয়ে উঠি, তারপর অন্য চিন্তা করা যাবে।'

চালকের কথায় সকলে বাস্তবে ফিরে এল। সকলেই দ্বীপটির দিকে এগিয়ে চলল।

দ্বীপটি খুবই ছোট। ওরা যেখান দিয়ে দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করবে সেখানটা ঘন জঙ্গলে ভরা। প্রফেসর উপানন্দ সবাইকে সমুদ্রতটে অপেক্ষা করতে বলে লিলিকে নিয়ে দ্বীপটিকে পর্যবেক্ষণ করতে অগ্রসর হলেন। কে জানে, কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে মানুষখেকো জংলি মানুষ! অথবা অজানা কোনও হিংস্র প্রাণী। জঙ্গল দু-হাত দিয়ে সরিয়ে পরিষ্কার করে কিছুটা এগোতেই নজরে পড়ল একটা পাহাড়। তার গা বেয়ে নেমে এসেছে সুস্বাদু জলের ঝরনাধারা।

তৃষ্ণা যেন বেড়ে উঠল ঝরনা দেখে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে আকণ্ঠ জলপান করে লিলি ও প্রফেসর উপানন্দ যেন নতুন প্রাণ পেলেন। লঞ্চের অন্যান্য লোকজনকে ডেকে এনে আপাতত ঝরনার ধারেই বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

ক্লান্ত লঞ্চ-চালক, রেডিও অপারেটর ও অন্যান্য কর্মীরা কয়েকমিনিটের মধ্যেই নাক ডাকাতে লাগল। প্রফেসর উপানন্দ পাহাড় বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগলেন। লিলিও তাঁর সঙ্গ নিল।

কয়েক ফুট উঠতেই ভেসে উঠল প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন নীল সমুদ্র। যে-দিকেই চোখ যায়, সে-দিকেই দৃষ্টি গিয়ে থামে দিকচক্রবালের সীমায়। হঠাৎ সামনের দিকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিরাটকায় একটি কালো ছায়া ভেসে উঠেছে অদূরে। ছায়াটি সমুদ্রের বুক থেকে সোজা উঠে গেছে মহাশূন্যের দিকে। দূরবিন চোখে লাগাতেই প্রফেসর উপানন্দ দেখলেন, ওই কালো ছায়ার মধ্যে দিয়ে টুকরো-টুকরো জিনিস ঠাসাঠাসি হয়ে নেমে আসছে মহাসমুদ্রের বুকে। জিনিসগুলি শেষ হওয়া মাত্রই ছায়াটা অস্পষ্ট হয়ে গেল।

লিলি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল প্রফেসর উপানন্দের দিকে। গম্ভীর মুখে প্রফেসর উপানন্দ বললেন, 'আমার অনুমান যদি সত্য হয়, লিলি, তবে জেনে রাখো, ওই ছায়া-ঘেরা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বহুতল বাড়িগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে নেমে আসছে। যে-বাড়িগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আমাদের সেই অদৃশ্য আততায়ী সেই বাড়িগুলিকে ভেঙেচুরে সমুদ্রের বুকে নিক্ষেপ করছে। সম্ভবত, মহাকাশের কোথাও তার ঘাঁটি থাকা সম্ভব। আমাদের খুঁজে পেতে হবে সেই ঘাঁটি। কিংবা আর-একটা সম্ভাবনার কথাও মনে আসছে। মহাকাশ থেকে এসব জঞ্জাল কেন ওরা সমুদ্রের বুকে নিক্ষেপ করতে যাবে! ওরা মহাশূন্যেই ছড়িয়ে দিতে পারে এইসব টুকরোগুলোকে! এমনও হতে পারে, পৃথিবীর বুকে বসেই কোনও বিজ্ঞানী এইভাবে তার জিঘাংসা চরিতার্থ করছে।'

কথা বলতে-বলতে ওঁরা আরও ওপর দিকে উঠছিলেন। লিলি কীসে পা জড়িয়ে পড়ে যেতে-যেতে প্রফেসর উপানন্দকে ধরে টাল সামলে নিল। নীচে নজর যেতেই প্রফেসরের মুখের রেখা কুঁচকে গেল। লিলি

হোঁচট খেয়েছে পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা অ্যালুমিনিয়ামের তারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। এই নামহীন, অনাবিষ্কৃত একটি দ্বীপে সভ্যজগতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে দেখে উভয়েই প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। বিশেষ করে, এই দ্বীপ থেকে উদ্ধারের উপায়ও বের করতে হবে। সুতরাং, ওই তার দেখে ওঁরা এগিয়ে চললেন। একসময় ওঁরা এসে পাহাড়ের অন্য পাশে পৌঁছলেন। এখানে আরও নতুন-নতুন চিহ্ন দেখা গেল। যেমন শুকনো খাবারের খালি টিন, সিগারেটের প্যাকেট ইত্যাদি। একটা আশার কথা যে, এই দ্বীপে তাহলে মানুষের যাতায়াত আছে—অথবা মানুষ এখনও এই দ্বীপে বাস করছে! যাই হোক, আরও কিছুটা এগোতেই প্রফেসর উপানন্দ ও লিলির চোখ কপালে উঠবার জোগাড়। এ তাঁরা কী দেখছেন! এ যে এক অকল্পনীয় দৃশ্য ফুটে উঠেছে তাঁদের সামনে!

দু-পা পিছিয়ে এলেন প্রফেসর উপানন্দ। লিলিকে বললেন, 'চুপ করে বোসো, কোনও শব্দ কোরো না।' প্রফেসর উপানন্দ গাছগাছালির ঘন ঝোপের আড়াল থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন সামনের দিকে।

পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরে একটি উন্মুক্ত স্থান। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, বিরাট-বিরাট কয়েকটি ট্রান্সফরমার বসানো আছে। আর আছে কতকগুলি রাডার জাতীয় কিছু—যা থেকে মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের স্ফূরণ ঘটছে। একটি মানুষ যন্ত্রগুলির সামনে ধীর পায়ে পায়চারি করছে। দূর থেকে দেখে লোকটিকে চেনার উপায় ছিল না। কোনদেশের লোক তাও ঠিক করা কষ্টসাধ্য ছিল। রুদ্ধশ্বাসে প্রফেসর উপানন্দ ও লিলি লোকটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

লোকটি পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর আপনমনেই সভ্যজগতকে কুৎসিত ভাষায় আপ্যায়িত করল। কথাগুলি লোকটি ইংরেজিতেই বলছিল। কিন্তু বলার ভঙ্গি দেখে ওকে ইংরেজ বলে মনে হল না।

প্রফেসর উপানন্দ অতি সন্তর্পণে প্রায় বুকে হেঁটেই লোকটির দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু লোকটি তখন ঢালু পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে। সুতরাং তার চেহারাটা ভালো করে দেখা গেল না। তবে একদিক দিয়ে সুবিধে হল। জায়গাটি ভালো করে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল।

দেখতে-দেখতে প্রফেসর উপানন্দের বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নির্জন দ্বীপে এইসব জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে কে তৈরি করল এইসব অকল্পনীয় জিনিস! একটা শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন নীচ থেকে সেই লোকটি উঠে আসছে এইদিকে।

প্রফেসর উপানন্দ সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে পড়লেন একটা ছোট্ট কুটিরে। সম্ভবত, এই কুটিরেই লোকটি থাকে। ভিতরেই ঢুকতেই দেখা গেল থরে-থরে সাজানো আছে টেলিভিশন সেট, সুইচবোর্ড এবং নানাধরনের কিবোর্ড। দেওয়ালে পৃথিবীর একটা বিরাট মানচিত্র শোভা পাচ্ছে।

লোকটি তখন উঠে এসেছে এবং ঘরের দিকেই হেঁটে আসছে। এই মুহূর্তেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে মোলাকাত করতে ইচ্ছে হল না প্রফেসরের। একটা কৌতূহল চেপে বসেছিল মনের মধ্যে লোকটির কার্যকলাপ গোপনে নিরীক্ষণ করতে হবে। সুতরাং, তাঁরা পাশের একটি ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরটি নানারকম টুকরো-টুকরো যন্ত্রপাতিতে ভরা। দেখে স্টোররুম বলেই মনে হয়।

ভদ্রলোক আপনমনে শিস দিতে-দিতে ঘরে এসে ঢুকল। কয়েকটি সুইচ নাড়াচাড়া করতেই সামনের পরদায় কয়েকটি জায়গার ছবি ভেসে উঠল। কপাটের ফাঁক দিয়ে প্রফেসর উপানন্দ ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। তবে তার মুখখানা এখনও ভালো করে দেখতে পাননি। কারণ, সে তখন স্টোররুমের দিকে পিছন ফিরে ছিল।

একটি ছবি ফুটে উঠল পরদার বুকে। মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একটি অতিকায় উপগ্রহ ছুটে যাচ্ছে। একটা সুইচ অন করা মাত্রই উপগ্রহ থেকে বলয়াকৃতি একটা কালো ছায়া বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল মহাশূন্যের পথে। লোকটি 'হাঃ-হাঃ' করে আকাশ-কাঁপানো অট্টহাসি হেসে আর-একটি সুইচে হাত দিতেই দেখা গেল, পাশের পরদায় ফুটে ওঠা একটি শহরের ছবিতে একটি বহুতল বাড়ি ঢেকে গেছে কুয়াশার আস্তরণে।

লোকটি আর-একটি সুইচে হাত রাখতেই উপগ্রহ থেকে সৃষ্টি হল এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত। আর মুহূর্তের মধ্যে সেই বহুতল সৌধ ওই বলয়ের কালো নলের মধ্যে দিয়ে, চুম্বকের আকর্ষণে যেমন একটি পিন ছুটে এসে আটকে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই শহর থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে উপগ্রহে এসে আটকে গেল। পরদায় দেখা গেল শত-শত মানুষের বিস্ময়-বিহ্বল আতঙ্কের ঢেউ! পরক্ষণেই আর-একটি পরদায় ভেসে উঠল নীল সমুদ্রের ছবি। উপগ্রহ থেকে নেমে এল তেমনি এক কালো বলয়াকৃতি ছায়া। আর সেই ছায়াকে অবলম্বন করে উপগ্রহ থেকে সমুদ্রের বুকে সবেগে নেমে এল সেই বহুতল বাড়ি, টুকরো-টুকরো হয়ে ভাঙাচোরা অবস্থায়।

এত সহজেই যে নাটের গুরুকে ধরা যাবে প্রফেসর উপানন্দ স্বপ্নেও ভাবেননি। স্টোররুম থেকে বেরিয়ে প্রফেসর উপানন্দ চিৎকার করে বললেন, 'বন্ধ করুন, বন্ধ করুন! আপনার এই অমানবিক খেলা বন্ধ করুন!'

ভদ্রলোক যেন বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। এই অনাবিষ্কৃত দ্বীপে অন্য কেউ যে আসতে পারে এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য ঘটনা! মুহূর্ত পরেই ত্বরিৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল ভদ্রলোক। প্রফেসর উপানন্দের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চমকে উঠল।

'ডক্টর অভিজিৎ! আমি মুগ্ধ!' প্রফেসর উপানন্দ সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সাধনা সফল হয়েছে। তুমি আজ অজেয়। কিন্তু মানুষকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছ কেন? যেখানে মানবসমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হবে তোমার সাধনা, তোমার শ্রম, সেখানে তুমি নির্বিচারে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে চলেছ! কেন?'

'স্যার! গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদেই আমি সব কিছু জয় করেছি,' ডক্টর অভিজিৎ বলল, 'কিন্তু স্যার! কার কল্যাণে নিয়োজিত হবে আমার এই শ্রম? আজ সমস্ত দুনিয়াব্যাপী অন্যায়-অনাচারের স্কাইস্ক্রেপার আকাশ ছুঁতে চলেছে। কোথাও সুবিচার নেই। হিংসা-দ্বেষে মানুষ আজ অন্ধ। মানুষ আজ মনুষ্যত্বহীন। সেই মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার কোনও যুক্তি নেই, স্যার! আজ আমি আপনার আদর্শেই বলীয়ান। পৃথিবীতে যখন আর কোনও পাপ বা অন্যায় থাকবে না, একমাত্র তখনই আমি বন্ধ করব আমার অভিযান। কিন্তু...কিন্তু...আপনি এ-দ্বীপের সন্ধান পেলেন কী করে, স্যার?'

'সব কথাই তোমাকে জানাব, অভিজিৎ,' প্রফেসর উপানন্দ সস্নেহে বললেন, 'তার আগে তুমি কথা দাও, তোমার অভিযান বন্ধ রাখবে।'

'অসম্ভব! আপনার এ-অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়, স্যার!' দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করল ডক্টর অভিজিৎ।

'তাহলে আমি বাধ্য হব তোমাকে নিরস্ত করতে।' বললেন প্রফেসর উপানন্দ।

'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠে ডক্টর অভিজিৎ বলল, 'প্রয়োজন হলে পরশুরাম হতে আটকাবে না, স্যার!'

'স্তব্ধ হও। তুমি একটা নীচ বিজ্ঞানী,' লিলি হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি অপমান করছ আমাকে! কিন্তু ভুলে গেছ যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার এক্তিয়ারে চলে এসেছ—দরকার হলে তুমিও রেহাই পাবে না।' রাগত চক্ষে অভিজিৎ চিৎকার করে বলল।

'তোমরা দুজনেই ছেলেমানুষ। চুপ করো তোমরা।' ধমক দিলেন প্রফেসর উপানন্দ। তারপর বললেন, 'অভিজিৎ, তোমার কথা আমাকে কিছু শোনাও—কীভাবে তুমি এই অসাধ্যসাধন করলে।'

'স্যার! সবই আপনার কৃপায়...' ডক্টর অভিজিৎ বলল, 'আমার ইতিহাস আপনাকে অন্য আর-একদিন শোনাব। আমার নিজস্ব একটা উপগ্রহ রয়েছে। সেই উপগ্রহটি ভ্যান অ্যালেন বলয় থেকে জোর করে কিছুটা চৌম্বকক্ষেত্র নিজের কন্ট্রোলে রাখে, আর সেই চৌম্বকক্ষেত্রটিকে উপগ্রহের মাধ্যমে সোজা নামিয়ে আনা হয় যে-বস্তুটিকে আকর্ষিত করা হবে সেই বস্তুটির ওপর। উপগ্রহ থেকে যে-চ্যানেল সৃষ্টি হল, তাকে মুহূর্তে বায়ুশূন্য করে ফেলা হল, আর তখুনি সেই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে এক অবিশ্বাস্য গতিতে সেই বস্তু উপগ্রহে গিয়ে উপনীত হল। এবং ওই একই উপায়ে উপগ্রহ থেকে ওগুলোকে সমুদ্রের বুকে ফেলে দেওয়া হয়। যা

কিছু করবার তা আমি এই কন্ট্রোল রুমে বসেই করে থাকি। আপনারা যেভাবেই এখানে এসে থাকুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাবেন না।'

'তার মানে?' লিলি বিরক্তির সুরে বলল।

'খুবই সোজা! পৃথিবীতে একতলা বাড়ি ছাড়া আর অন্য কোনও বাড়ি থাকবে না। আমি ধ্বংস করব মানুষের আকাশচুম্বি সৌধরাজি...আর তারই সঙ্গে ধ্বংস করব ছারপোকার মতো বংশবৃদ্ধির দৌরাত্ম্যকে। মানে, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হবে আমার হাতে। আশা করি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি আপনাদের?' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে থাকে ডক্টর অভিজিৎ।

'ধ্বংস করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে, অভিজিৎ?' গর্জে উঠলেন প্রফেসর উপানন্দ। বললেন, 'আমি কিছুতেই তা বরদাস্ত করব না।'

প্রফেসর উপানন্দ এগিয়ে গেলেন ডক্টর অভিজিতের দিকে। অভিজিৎ টেবিল থেকে একটা ইস্পাতের ফলা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এক পা-ও এগোবেন না, স্যার! কয়েকহাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ রয়েছে ইস্পাতের ফলায়।'

লিলি সেই মুহূর্তে রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ল অভিজিতের হাত লক্ষ করে। গুলির আঘাতে ইস্পাতের টুকরোটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল বোর্ডের ওপর। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। অভিজিৎ উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করে উঠল, 'কী সর্বনাশ! এ তুমি কী করলে, লিলি! আমার সারা জীবনের সাধনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে? উঃ! এ কী করলে তুমি?'

চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘরে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওঁরা দাঁড়ালেন নিরাপদ দূরত্বে। ডক্টর অভিজিৎ তখন দু-হাতে নিজের চুল ছিঁড়ছে আর বকে চলেছে প্রলাপ, 'ওঃ! সারাজীবনের সাধনা আমার নষ্ট হয়ে গেল!'

'শান্ত হও, অভিজিৎ।' স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর উপানন্দ, 'একটিমাত্র লোকের সাধনা নষ্ট হয়েছে মাত্র, তাতেই তুমি উদভ্রান্তের মতো প্রলাপ বকে চলেছ! কিন্তু তুমি কি একবারও ভেবেছ, অভিজিৎ, লক্ষ-লক্ষ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধনা—সব কিছুকে তুমি একলহমায় ধ্বংস করছিলে? লক্ষ-লক্ষ মানুষ কি তোমারই মতো চুল ছিঁড়ে প্রলাপ বকছে না? অন্যায়, অনাচার, দুরাচার, অত্যাচার এইভাবে কি তুমি রোধ করতে পারবে, অভিজিৎ? যারা শোষিত, অত্যাচারিত তারা তো নিজেরাই মেনে নিয়েছে শোষণ আর অত্যাচারকে। আর সেই নিয়েই বেঁচে রয়েছে তারা। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে ওই মানুষরাই তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই বলে তুমি সৎ-অসৎ সকলকেই নির্বিচারে নিশ্চিহ্ন করতে পারো না।'

ডক্টর অভিজিৎ দু-হাতে মাথা রেখে সর্বহারার মতো বসে রইল। প্রফেসর উপানন্দের কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না।

মাসিক গোয়েন্দা

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৪



অভিনেত্রী

অভিজিৎ দত্ত

এক

যেন সাদা পাল তুলে দিল হাওয়া। যেন নীচে পাগলাঝোরার কালো জলে বর্শার ফলার মতো জ্বলে উঠল জ্যোৎস্না। যেন পাইনের সারিবাঁধা মঞ্জরি ভয়ে কেঁপে উঠল।

স্পিডোমিটারের কাঁটা থরথর করে কাঁপছিল। ক্যামেরা অনর্গল প্যান করে চলেছে টুকরো-টুকরো দৃশ্য। স্পিডোমিটারের কাঁটা, পাহাড়ি রাস্তা, পাইনের মঞ্জরি, পাগলাঝোরার জল। চোখে গো-গো গগলস, ডিমছাঁদ মুখ, ফাঁপানো চুল বারবার হাওয়ার ঝাপটে মুখের ওপরে এসে পড়ছে—কবিতা বোস মুক্তোর মতো দাঁতে পাতলা ঠোঁট টিপে বলে, 'আস্তে চালাও। আমার ভয় করছে—।'

'ভয়?' উন্মাদের মতো হেসে ওঠে অনুপম। ক্যামেরা ট্র্যাক করে স্টিয়ারিং হুইল, অনুপমের হাসি, হাওয়ায় উড়ে-আসা ঝরা পাতা, পাহাড়ের বুকে শেষ বিকেলের রোদ।

'হ্যাঁ, বাবা, আমারও ভয় করছে,' মায়ের পাশে বসে ছোট্ট মেয়ে বান্টি, কপালে রিবন বাঁধা, ববছাঁট চুলের নীচে চোখের বাদামি তারাদুটো বিস্ফারিত, হলিডে-অন-আইস ফ্রকটা হাওয়ায় ফুলে উঠছে, উড়ে যেতে চাইছে।

'গাড়ি চালাতে গেলেই তোমার বাবা নিজেকে ওয়েস্টার্ন ফিল্মের হিরো ভাবে, কবিতা বোসের শাড়ির শিফন ঝালরের মতো ঝাপট দেয়, মুখের রেখায় এমন কিছু একটা যা ঘৃণা নয়, ভালোবাসাও নয়।

পিছন ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকায় অনুপম।

এবং ঠিক সেই তাকানোর মুহূর্তটাকে ফ্রিজ করে ক্যামেরা ফিরে যায় ফ্ল্যাশব্যাকে। সাত বছর আগের দৃশ্যে—ট্র্যাফিকের লাল আলোর নির্দেশে যখন গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তখন।

'কাংকোরিয়াসাহেব কিন্তু রাগ করতে পারেন,' অনুপম ড্রাইভারের সিট থেকে পিছন ফিরে বলছে, 'সিনহা এত বড় ডাইরেক্টর, বার্লিনে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় করাবে বলে কাংকোরিয়া পার্টি দিল, আর তুমি কিনা কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এলে? তুমি ভীষণ দুষ্টু, কবিতা।'

জবাবে সদ্যফোটা ফুলের মতো মিষ্টি হাসছে কবিতা বোস, অনুপমের গালে টোকা দিয়ে বলছে, 'আমি তো আর ফিল্মে নামব না।'

দুজনের বিয়ের দৃশ্য, কম্পোজিট শটে দুজনের দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গ আলাপ, বান্টির জন্মের পর বেবিকটের ওপর ঝুঁকে ওর মুখ দেখছে অনুপম, মায়ের কোল থেকে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বান্টি। হঠাৎ একটা কাচের জানলার ওপর দিয়ে দ্রুত ফ্লিক-প্যান, অুনপম-কবিতা-বান্টির মুখ বদলে যায়, ডায়ালগ কেমন যেন খাপছাড়া, কাটাকাটা, 'এই মাইনেয় সংসার চলে না,' কবিতা বলছে। বান্টির জন্মদিনে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে অনুপম, ওর হাতের কমদামি খেলনাটা একগাল হেসে হাতে তুলেছে বান্টি। দেখে উপেক্ষায় মুখ বাঁকায় কবিতা : 'রাতে বাড়ি ফিরতে এত দেরি হয় কেন?' অনুপম রুক্ষ গলায় বলছে, 'বান্টি বেচারা এতক্ষণ জেগে থেকে এইমাত্র ঘুমোল।' 'আমি তোমার কেনা বাঁদী নই,' আরও রুক্ষ গলায় কবিতা জবাব দেয়।

একটি প্রেমের মৃত্যু, মাঝে-মাঝে দু-তিনজনের এক-একটি গ্রুপ কম্পোজিশন, বান্টি এবং অনুপম, কবিতা ও প্রোডিউসার কাংকোরিয়া, কবিতা, ফিল্ম-প্রোডিউসার জালান এবং ন্যু-ওয়েভের উঠতি ডাইরেক্টর অরিজিৎ রায়। ক্যামেরা পিছোতে-পিছোতে হঠাৎ একটি দৃশ্যে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। বান্টি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। বিছানায় শুয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং করছে অনুপম। কবিতা হ্যান্ডব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে ঘরে ঢোকে, সাজপোশাক বিস্রস্ত, গলার স্বর ঈষৎ মাতাল : 'ফিরতে দেরি হল বলে রাগ করেছ নাকি?' অনুপম কথা বলছে না দেখে ড্রেসিং-টেবিলে বসে মেকআপ মোছে কবিতা : 'এখন থেকে আরও দেরি হবে। আমি জালানসাহেবের নতুন ফিল্মে নামছি। অরিজিৎ ডাইরেক্ট করবে।'

সিনেমা-পত্রিকার কয়েকটা পাতা ক্যামেরার সামনে দ্রুত সরে যায়। 'অভিনেত্রী কবিতা বোস আবার সিনেমায় নামছেন।' ডাইরেক্টর অরিজিৎ রায় ও ফিল্মস্টার কবিতা বোসের একটি অন্তরঙ্গ ছবি। 'কবিতা বোস কি ডিভোর্সের কথা ভাবছেন?' 'মিথ্যে গুজব, দু-সপ্তাহের জন্য সমস্ত শুটিং শিডিউল ক্যান্সেল করে কবিতা স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছেন।' ক্যাপশন ও বিবৃতিগুলো দ্রুত সরে যায়।

তারপর আবার ক্লোজ শট। সিক্সটি নাইন মডেলের অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এসেছে কবিতা, বলছে, 'পাগলের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো। তুইও নেমে আয়, বান্টি।'

অনুপমের চোখ জ্বলছে। পিছন থেকে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বান্টি : 'না, আমি বাপির সঙ্গে যাব,' ও আদুরে গলায় বলে।

বান্টির এই আচমকা গলা জড়িয়ে ধরার জন্য তৈরি ছিল না অনুপম। টুকরো ক্লোজ শটে দেখা গেল, চকিতে ওর পা-টা ব্রেক থেকে ফসকে যাওয়ায় গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। তাড়াতাড়ি ব্রেকে পা দিতে গেল অনুপম, ব্রেকের বদলে অ্যাক্সিলারেটরে পা লাগল।

দ্রুতগতি ক্যামেরা। রুক্ষ পাহাড় হঠাৎ যেন ম্যাজিকে খুলে ধরে এক অতল গহ্বর, টায়ার স্কিড করার কর্কশ শব্দ, অদৃশ্য কণ্ঠে দুর্বোধ্য চিৎকার, খাদের ভেতরে আগুন ছিটোয়, আলো জ্বলে ওঠে, শিখার আরক্ত উল্লাসে জ্বলতে-জ্বলতে পুড়তে-পুড়তে গাড়িটা গড়িয়ে পড়ছে খাদের নীচে। রাশি-রাশি কুণ্ডলিত ধোঁয়ার মাঝখানে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কবিতা।

হঠাৎ শটটা ফ্রিজ হয়ে গেল। খাদ, আলো, জ্বলন্ত গাড়ি, কুণ্ডলিত ধোঁয়া। খাদের দিকে প্রসারিত হাত বাড়িয়েছিল কবিতা। ফ্রিজ যখন সচল হল, দেখা গেল, সে হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে দর্শকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাট শট। 'অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, আমার কিছু করার ছিল না,' প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের বলছে কবিতা বসু, পরনে বৈধব্যের সাদা থান। পজিটিভ ছবি এই মুহূর্তে হঠাৎ নেগেটিভ হয়ে যায়। আর-একটা নেগেটিভ ছায়া সিনেমা-নায়িকার কাছে আসে। আবার যখন ছবি পজিটিভ প্রিন্টে ফিরে আসে, তখন দেখা যায়, সিনেমার শুটিং-এ তরুণ নায়কের পাশে প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করছে কবিতা। পার্টিতে তরুণ ডাইরেক্টর

অরিজিৎ রায়ের পাশে ককটেলে চুমুক দিচ্ছে নায়িকা। লোকেশন শুটিং-এ অরিজিতের কাছে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হিরোয়িন। সিনেমা তার আপন ভাষায় গল্প বলছে।

বেডরুমের দেওয়ালে বান্টির ছবিতে ধুলো জমেছে। বিছানায় গেঞ্জি ও শর্টস পরে আছে অরিজিৎ। আয়নার সামনে পোশাক খুলছে কবিতা। এবং তার পরনে যখন শুধু ব্রা ও পেটিকোট, তখন একটা সিগারেট ধরায় কবিতা। অরিজিতের ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি। আবহে ডেথ মার্চের বাজনা। দেওয়ালে বান্টির ছবি এবং আয়নার সামনে সিগারেট হাতে অন্তর্বাস পরা কবিতা নেগেটিভ হয়ে যায়। ছবি শেষ।

দুই

সম্মোহিতের মতো দেখছিল শোভন। 'অভিনেত্রী' ছবিটা বিতর্কের ঝড় তুলেছে নানা কারণে। কয়েক বছর আগে জোড়বাংলো ছাড়িয়ে তিন কিলোমিটার দূরে একটা প্রাইভেট গাড়ি স্কিড করে সোজা পড়ে গেল অতলান্ত খাদের গহ্বরে। গাড়িতে ছিলেন একজন নামজাদা ফিল্ম-স্টার, তার স্বামী ও সন্তান। গাড়ির আর সব যাত্রী সঙ্গে-সঙ্গেই মারা যায়। কিন্তু খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, চিত্রতারকা বেঁচে গেলেন। বিয়ের পর যিনি সিনেমার পরদা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, স্বামী ও সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি রুপোলি পরদায় ফিরে এলেন প্রেমিকার ভূমিকায়।

'অভিনেত্রী' ছবির সঙ্গে বাস্তবের এক সিনেমা অভিনেত্রীর জীবনের আশ্চর্য মিল। খসরু নোশান বাংলাদেশের তরুণ পরিচালক, টালিগঞ্জ ও ঢাকার এই যুক্ত প্রোডাকশনে ওঁকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রোডিউসাররা বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সিনেমা যে সাহিত্য থেকে আলাদা, তার নিজস্ব ভাষা আছে, আছে আত্মস্থ পরিণতি—খসরু নোশান প্রমাণ করেছেন। ছবিকে প্রয়োজনে ডিড্রামাটাইজ করেছেন, ফর্মকে দুমড়ে কনটেন্টের উপযোগী করেছেন। 'পিকচারাইজড ড্রামা' নয়, আলো-ছায়া লং শট, মিড শট, নেগেটিভ, ফ্রিজ-ট্র্যাকিং শটে চলচ্চিত্র তার আপন ভাষায় কথা বলেছে। সংলাপ এখানে গৌণ, আবহসঙ্গীত পরিমিত ও নিরলঙ্কার।

ছবিটা ওই দেশে ঠিক পপুলার হয়নি। যারা ছবির পরদায় গল্প এবং গান শুনতে অভ্যস্ত, দর্শক নামের সেই সুবোধ বালক এ-ছবি দেখে খুশি নয়।

ছবিটা ম্যানহাইম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে। জুরির বিচারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন 'অভিনেত্রী'র নায়িকা রঞ্জনা। 'গ্রাঁ প্রি' না পেলেও পরিচালক খসরু নোশান বিদেশি দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরেই তিনি পেয়েছেন বাংলাদেশের অ্যাকাডেমি পুরস্কার এবং আগামী চার-পাঁচটা ভালো ফিল্ম পরিচালনার কনট্রাক্ট।

রঞ্জনার সঙ্গে ইংগমার বার্গম্যানের 'সাইলেন্স' ফিল্মের নায়িকা ইনগ্রিড থূলিনের তুলনা করেছিলেন ফেস্টিভ্যাল জুরির সদস্য ক্লদ লেলুশ। এদেশের কোটেশনবিদ সমালোচকদের কৃপায় কথাটা চাউর হয়ে গেছে। অচিরে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন রঞ্জনা এবং বুদ্ধিমান পরিবেশক কলকাতার তিনটে সিনেমা হলে ছবিটা নতুন করে রিলিজ করেছেন।

সম্মোহিতের মতো ছবি দেখেছে শোভন। ওই ছবিতে রঞ্জনার অভিনয়ে যেন তৃতীয়মাত্রিক গতি—কোনও কথা না বলে শুধু মুখের রেখায়, চোখের তারার চকিত কাঁপনে, প্রসারিত হাতের ব্যঞ্জনায় কিংবা আয়নায় বিবস্ত্র ছায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ফুটিয়ে তুলেছে ভালোবাসা, অভিমান, অসহায়তা, বাঁচার তীব্র পিপাসা।

ছন্দপতনের মতো যখন পরদায় 'জনগণমন' বেজে উঠল, তখনও শোভন সিটে বসেছিল। 'ট্যাশ ছবি' তার সুন্দরী স্ত্রী রীনা হল থেকে বেরোবার মুখে বলছিল, 'ফিল্ম-স্টাররা ভালোবাসতে জানে না। ওইরকম বস্তাপচা থিম নিয়ে সত্তরের দশকে কেউ ফিল্ম করতে পারে? ক্লদ লেলুশ কেন যে রঞ্জনার অ্যাক্টিং দেখে গদগদ হয়ে উঠলেন—।'

'আঃ, থামো, রীনা,' শোভন মুখে বলে। রীনার পেনসিলটানা ভুরুতে কাঁপন লাগে, চেরিলাল ঠোঁটদুটো কপাট বন্ধ করে, চোখের পাতায় তিরতির করে একফোঁটা জল। কভেন্যান্টেড অফিসারের চৌকস, সুন্দরী,

ডলপুতুলের মতো বউ স্বামীর সঙ্গে সিনে-ক্লাবের ছবি দেখে সিনেমা নিয়ে দু-চারটে বুকনি ঝাড়তে শিখেছে। ফেদেরিকো ফেলিনির 'ই ভিতেল্লোনি'র পুরুষ-মক্ষিকারা কেন প্রকাশ্য রাস্তায় ম্যাম্বো নাচ নাচে, 'জ্যাবরিসকি পয়েন্ট' ফিল্মে আন্তোনিওনি কেন ওয়ার্ডরোবের রঙিন বা ফ্রিজের জ্যাম-রুটির গলানো রং পরদায় ছড়িয়ে দেন, লুই বুনুয়েলের 'নাজারিন'-এ ড্রামের আওয়াজ কোন লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেয়, ত্রুফো-র 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'-এ জনতা ও সমুদ্র কেন একই সঙ্গে একটি বাচ্চা ছেলেকে তাড়া করে, তাই নিয়ে ডলপুতুলদের স্বামীরা তর্ক করেন। এবং, যেহেতু ইবসেনের নাটক দেখে এদেশি ডলপুতুলরা ইদানীং দাবি করছে, তারা পুতুল নয়, মানুষ—পুরুষদের আলোচনায় তারাও ফুটকুড়ি কাটে—গ্লবার রচা, জাঁ লুক গদার, পোলানস্কি, সিনে ভেরিৎ, আভাঁ গার্দ ফিল্ম, 'অশনিসংকেত'-এ ববিতার বোট-নেক ব্লাউজ দেখিয়ে সত্যজিৎ কীরকম গুবলেট করেছেন, ঋত্বিকের তিতাসের কতটা ফিল্ম, কতটা সাইথোপিয়া, মৃণাল সেন ব্রেশট বোঝেন, না বোঝেন না—এইসব ভারিক্কি ব্যাপারে তারা হামেশাই নাক গলায়।

আজ সামান্য একটা বাংলা ফিল্মের ব্যাপারে একটা উলটো-পালটা কথা বলেছে বলে শোভন ওকে ধমক দেবে—কল্পনাই করতে পারেনি রীনা। না হয় ফিল্মের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো একটু বেশিই বোঝে শোভন, না হয় বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা নিতে স্টেটসে যাওয়ার আগে লোকটা চার-পাঁচ বছর ফিল্ম লাইনেই ছিল—তা বলে রীনাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়ার অধিকার ওকে কে দিয়েছে?

রেস্তোরাঁয় কফি-কাটলেট কিছু মুখে দিল না রীনা, ট্যাক্সিতে উলটোদিকের জানলার দিকে তাকিয়ে ঘাড় ব্যথা করে ফেলল, বাড়ি ফিরে 'মাথা ধরেছে' বলে দুটো অ্যাসপিরিন এবং দুটো সোনারিল ট্যাবলেট খেল, 'শরীর ভালো নেই' জানিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

যেন দেখেও দেখল না শোভন। তার শোওয়ার ঘরে নীল আলো। হাওয়া ঠান্ডা নয়, আবার গরমও নয়—অর্থাৎ এয়ারকন্ডিশনার আছে। দেওয়ালের গাঢ় সবুজ ও লেমন-ইয়েলো রং চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগায়, মেঝের মোজেইক তার জীবনের মতোই মসৃণ।

অথচ এই ঘর, সিল্কের ট্যাপেস্ট্রি, ছড়ানো-ছিটোনো কিউরিও, ডানলোপিলোর ওপরে হাঁটু মুড়ে শোওয়া ডলপুতুল—ওই সবই তার অসহ্য লাগছে। এই সাজানো সংসারে যদি আগুন লাগে, যদি ডিনামাইটের বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে উড়ে যায় ডলপুতুল, নবদম্পতির দেওয়ালজোড়া ফটো, মেঝের মোজেইক, মসৃণ জীবন—।

কিন্তু না, সেসব কিছুই হয় না। টেবিল ল্যাম্পের সামনে একটা চিঠি পড়ে শোভন সেন নামের এক দুঃখী মানুষ।

> *শোভন, আমার আগের চিঠিগুলোর মতো এইটারও জবাব পাব না জানি। তবু লিখছি। 'অভিনেত্রী' ফিল্মটা অনেকের ভালো লেগেছে। তুমি দেখবে না—আমি জানি। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছি। তুমি এড়িয়ে যাও। পরশু এয়ার টার্মিনাসের রেস্তোরাঁয় একঘণ্টা বসে থাকব, দুটো ফ্লাইটের মধ্যে এইটুকু অবসর। যদি আসো, দেখা হবে—।*

'দেখা হবে—'...লাইটারের আগুনে মেয়েলি হাতে লেখা অক্ষরগুলো পুড়ছিল।

তিন

লাইটস। আর্কল্যাম্পের তীব্র আলো জ্বলে ওঠে। সাইলেন্স প্লিজ, স্টুডিয়োর দর্শকদের সামনে লাল নিষেধ। সাউন্ড...ক্যামেরা রেডি, কনটিনিউটি...ও. কে. স্টার্ট!

'ভুলিনি,' ঝোলা পাঞ্জাবির নীচে নীরব পুরুষ...তার দিকে অপলক চেয়ে আছে স্থিরযৌবনা রমণী, 'স্মৃতি কখনও শরৎ মেঘ কখনও শ্রাবণধারা...।'

শোভন সেন স্বপ্ন দ্যাখে। ক্যামেরার চোখ ঘুরছে, একটা হাত কর্ড্যুরয় ট্রাউজারের পকেটে, ভিউফাইন্ডারের জানলায় চোখ—দৃশ্যটা সিনেমার পরদায় কেমন দেখাবে অনুমানে জানতে চাইছে ডাইরেক্টর শোভন সেন।

স্বপ্ন স্বপ্নই, জীবন নয়...জীবনে শোভন কোনও ছবি ডাইরেক্ট করার সুযোগ পায়নি।

মুখে রুপোর চামচ নয়, স্টেইনলেস স্টিলের চামচ নিয়েই জন্মেছে শোভন। ওর বাবা নামজাদা মার্কেন্টাইল ফার্মের ওপরতলার অফিসার। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় বাবার আদর একটু বেশিমাত্রায় পেয়েছে সে। কলেজে পড়ার সময় সে সিনে-ক্লাবের মেম্বার হয়েছে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। এবং সেখানেই কোকেনের চেয়ে তীব্র ও আফিমের চেয়ে মিষ্টি একটা নেশা তার স্নায়ুতে প্রথম ঢুকে পড়েছিল। জন ফোর্ডের 'গ্রেপস অফ রথ' দেখে সে দু-রাত্রি ঘুমোতে পারেনি, 'লা দোলচে ভিতা'র মার্চেল্লোর মতো সে ফ্রা এঞ্জেলিকো-র ছবির সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, 'লোলা মন্তাজ' তাকে ভালোবাসতে শেখায়, বার্গমান শেখায় ঘৃণা ও যন্ত্রণা। শার্সির গায়ে হাওয়ার তাণ্ডব তাকে আবহসঙ্গীতের সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়, বাসের জানলা থেকে চলমান ভিখিরির মুখ দেখে সিনেমার সম্ভাব্য দৃশ্য মনে উঁকি দেয়।

ভিনদেশে জন্মালে শোভন সেন কস্মিনকালে ফেলিনি, ভাইদা বা কুরোসোয়া হতে পারত কি না কে বলতে পারে! কিন্তু এদেশে জন্মে তার পক্ষে যেটা সম্ভব...হ্যাঁ, সিনে-ক্লাব থেকে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োর রাস্তা খুব বেশি দূর নয়...বিনা পয়সায় ফাইফরমাশ খাটতে-খাটতে ক্যামেরা, কনটিনিউটি, এডিটিং-এর টুকরো-টুকরো কাজ শিখে নামি ডাইরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া। এম. এ. পাশ সিনেমা-পাগল এক যুবকের পক্ষে সেটাও বুঝি সম্ভব। অবশ্য ডাইরেক্টর দেবেশ রায় তাকে সত্যিই স্নেহের চোখে দেখতেন, 'ছেলেটার ট্যালেন্ট আছে। যদি কোনওদিন ডাইরেকশানের চান্স পায়...' উনি অনেকের কাছে নাকি বলতেন।

এবং ওই সবই সম্ভব হয়েছে, কেননা শোভন সেনের জীবিকার ভাবনা ছিল না। ছেলেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা নিতে স্টেটসে পাঠাতে চেয়েছিলেন ওর বাবা। তার বদলে শোভন টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো চত্বরে ঘোরাফেরা করে সময় নষ্ট করছে। বিরক্ত হলেও উনি ছেলের পকেট খরচার রেস্ত জোগাতে কার্পণ্য দেখাননি।

রঞ্জনার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োয়, শুটিং-এর অবসরে। ত্রিকোণ প্রেমের বস্তাপচা গল্প নিয়ে নতুন ফিল্ম করছেন ডাইরেক্টর দেবেশ রায়। ভূমিকায় যথারীতি লালমূলো হিরো, খুকি-নায়িকা, গুপীগায়েন-ক্লাউন, নতুন বলতে শুধু উপনায়িকার ভূমিকায় রঞ্জনা। ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা মারা যাওয়ার পরে অ্যামেচার থিয়েটারে ভাড়া করা হিরোয়িন সেজে শো পিছু চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কামাত। এইরকম একটা অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাবের থিয়েটার দেখতে গিয়ে বুড়ো দেবেশ রায়ের মনে হল, মেয়েটা অ্যাক্টিং জানে, সিনেমায় চান্স পেলে—।

দেবেশ রায় পাসোলিনি বা পোলানস্কি নন। কিন্তু লোকটা সহৃদয়। রঞ্জনাদের পরিবারের অবস্থা, বিধবা মা, অনাথ ভাইকে বাঁচাবার জন্য সতেরো বছরের মেয়ের প্রাণপাত চেষ্টা, ওইসব ওঁর চোখ এড়ায়নি। ফিল্মলাইনের নেকড়ে ও হায়নাদের মাঝখানে দেবেশ রায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর ইউনিটে মেয়েরা সম্মান ও ইজ্জৎ নিয়ে কাজ করতে পারে।

থিয়েটারে অভিনয় করেছে রঞ্জনা, কিন্তু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন ডায়ালগগুলো ওর গলায় জড়িয়ে যাচ্ছিল। দেবেশ রায় ধমক দিয়েছিলেন। শুটিং-এর অবসরে ওকে আশ্বাস দিয়েছে শোভন : 'এরকম হয়। জানেন, অ্যানা ম্যাগনানি যখন প্রথম সিনে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান, উনিও কথা খুঁজে পাননি। অথচ ''মামা রোমা'' কিংবা ''রোজ ট্যাটু'' দেখলে কে বলবে, ম্যাগনানি অভিনয় জানেন না?'

কৃতজ্ঞ চোখে শোভনের দিকে তাকিয়েছে রঞ্জনা। একদিন শুটিং-এর পরে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে শোভন। তালতলার ডক্টর লেনের ভাঙাচোরা বাড়ির দোতলা—এখানে কোনও ফিল্ম-স্টার থাকে, যেন কল্পনাই করা যায় না।

'উনি অসময়ে চলে গেলেন', মেয়েকে সিনেমায় নামতে দিয়েছেন বলে ওর মা যেন দারুণ কুণ্ঠিত 'প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকায় কতদিন চলে, বলো? আগে মেয়ে থিয়েটারে পার্ট করতে চাইলে

মানা করতাম। এখন নিজে উপাযাচক হয়ে দেবেশবাবুকে বলতে হল, সিনেমায় যদি একটা চান্স দেন...,' ভদ্রমহিলা বুকের ভেতরে দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেন। এসব বলেছে রঞ্জনা।

তারপর আরও অনেকবার ওদের ফ্ল্যাটে গেছে শোভন। উপনায়িকা থেকে যখন নায়িকার ভূমিকায় প্রমোশন পেল রঞ্জনা, ডাক্তার লেনের ভাঙাচোরা ঘর ছেড়ে ম্যান্ডেভিল গার্ডেনে নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিল—তখনও। আউটডোর শুটিং-এর লোকেশনে বাঁকা নদীর জল ছুঁয়ে, ভাঙা মন্দিরের ধারে ওদের দেখা যেত—কথার জাল বুনছে শোভন, রঞ্জনা হাসিমুখে শুনছে। ইউনিটের সবাই জানত, ওদের আলাপ-পরিচয় এখন ভালোবাসার বুড়ি ছুঁয়েছে।

পরপর তিনটে ফিল্ম হিট হওয়ার পরে রঞ্জনার জনপ্রিয়তা দারুণ বেড়েছিল। দেবেশ রায়ের একটা বাংলা ফিল্মের হিন্দি রিমেক করতে চাইলেন বোম্বের প্রোডিউসার সোহনলাল কানওয়ার। এই চান্সে রঞ্জনাকে হিন্দি ফিল্মের সোনার কেল্লায় ঢোকার সুযোগ করে দিলেন দেবেশবাবু। হিরো পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা মারাঠি জোয়ান, হিরোয়িনের ব্যাপারে কানওয়ার নিজেই বলেছেন, মানসী ছাড়া অন্য কাউকে তিনি চান্স দেবেন না। মানসী সান্যাল বাংলা ফিল্মের হিরোয়িন, আগে হিন্দিতেও কাজ করেছে—বাংলা ফিল্মের এক নামজাদা হিরোর সঙ্গে ওর ফস্টিনস্টি এখন নাকি প্রায় বিয়ের পর্যায়ে এসেও অজ্ঞাত কারণে আটকে আছে। মানসী বছর-দুই আগে কানওয়ারসাহেবের প্রোডাকশনে কাজ করেছে। ওঁর পছন্দের কারণ বোঝা যায়। অগত্যা নাকের বদলে নরুন পেয়েছে রঞ্জনা, নায়িকার বদলে উপনায়িকার পার্ট!

দেবেশদার ইউনিটের সঙ্গে বোম্বেতে যাওয়ার কথা ছিল শোভনের। কিন্তু ততদিনে ফিল্ম লাইনের সম্বন্ধে ওর মোহ ভেঙেছে। ও রঞ্জনাকে একান্ত করে পেতে চায়, কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের মামুলি চাকরিটা কোনও জীবিকা নয় এবং রঞ্জনাদের পরিবারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অভিনেত্রীর জীবন ছাড়া আর কোনও রাস্তা রঞ্জনার সামনে খোলা নেই। জীবনে প্রথম দারুণ একটা সাহসের কাজ করল শোভন। ফিল্ম লাইনে ঢোকার পর থেকে পারতপক্ষে সে বাবাকে এড়িয়ে চলত, এবার সে তার ব্যক্তিগত সমস্যাটা বাবাকে খুলে বলল।

বাবারা বোকা হয়, অনেকের মতো শোভনেরও ধারণা ছিল। কিন্তু শোভনের বাবা প্রিয়নাথবাবু নির্বোধ নন—ছেলের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি নেই—তাঁর প্রস্তাব, ওদের দুজনকেই ফিল্ম লাইন ছাড়তে হবে। তারপর স্টেটসে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে যাবে শোভন—রঞ্জনা সঙ্গে যেতে পারে। রঞ্জনাদের পরিবারের দেখাশুনো ততদিন প্রিয়নাথবাবুই করবেন।

আসলে ছেলের সুমতির জন্য মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। ছেলে ওর ইচ্ছেমতো পাত্রীকেই বিয়ে করুক, কিন্তু এই সুযোগে ওকে ফিল্ম লাইন ছাড়িয়ে ওর ভাঙা কেরিয়ারটা গড়ে দিতে পারলে প্রিয়নাথের জীবনের কাজ ফুরোবে।

অভিনেত্রী হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে রঞ্জনা, কিন্তু ফিল্ম লাইন ছাড়বার কথা শুনে সে 'না' বলেনি। এই লাইনে শোভনের কোনও উন্নতি হবে না, রঞ্জনাও যেন বুঝতে পেরেছিল। ওর চোখেও ওর কেরিয়ারের প্রশ্নটা সবচেয়ে বড়। মেয়ের সৌভাগ্যের কথা শুনে রঞ্জনার মায়ের বিষণ্ণ মুখেও হাসি ফুটেছে। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে মেয়েকে সিনেমা লাইনে ঢোকাতে হয়েছে বলে তাঁর মনের কোণে যে-কাঁটাটা বিঁধে ছিল, সেটা বুঝি তুলে ফেলতে পারবে শোভন।

বিয়ের উদ্যোগ, পাসপোর্ট-ভিসা-জব ভাউচারের তত্ত্ব-তল্লাশ—বোম্বে যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করল শোভন। হিন্দি ফিল্মের কনট্র্যাক্টটাই নাকচ করতে চেয়েছিল রঞ্জনা, দেবেশ রায়ের উপরোধে শেষ পর্যন্ত ওকে একাই বোম্বে যেতে হল।

'বিশ্রী লাগছে,' এয়ারপোর্টের লবিতে রঞ্জনা মুখ কালো করে বলেছিল, 'দু-হপ্তার বেশি একদিনও আমি ওখানে থাকব না, দেবেশদা যতই রাগ করুন—।'

দু-হপ্তা নয়, মাত্র পাঁচদিন পরে কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের ফিল্ম ম্যাগাজিন, কেচ্ছাপুরাণ ওরফে ইয়েলো ম্যাগাজিন, এমনকী দৈনিক সংবাদপত্রেও ছাপা হল সেই মুখরোচক সংবাদ!

দৈনিক সংবাদপত্রে এফ. এন. আই.-র রিপোর্টারের বয়ান একটু সংযত—তিনি ঘটনাটার ওপরে তত রং চড়াননি।

> *কাল বোম্বের তাজ হোটেলে ফিল্ম-ম্যাগনেট সোহনলাল কানওয়ারের মৃতদেহ এক রহস্যজনক পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। সংবাদে প্রকাশ, রাত্রি প্রায় একটার সময় তাজ হোটেলে শ্রীকানওয়ারের ঘর থেকে ফোন পেয়ে হোটেলের ম্যানেজার ওই ঘরে গিয়ে দেখেন, কানওয়ারের মৃতদেহের পাশে বসে আছেন তাঁর সর্বশেষ নির্মাণরত ফিল্ম 'স্বয়ংবর'-এর উপনায়িকা শ্রীমতী রঞ্জনা রায়। হোটেলের জনৈক ওয়েটার সাক্ষ্য দেয়, সে মধ্যরাতের কিছু আগে রঞ্জনাকে শ্রীকানওয়ারের ঘরে ঢুকতে দেখে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রীমতী রঞ্জনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পোস্টমর্টেমের পর মৃতদেহ শেষকৃত্যের জন্য তাঁর আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হবে। শ্রীকানওয়ারের বয়স আটচল্লিশ। তিনি বিপত্নীক, এক পুত্র ও দুই কন্যার জনক। তাঁর প্রযোজিত 'কলঙ্কিনী' ফিল্মটি ১৯৭০-এ 'ফিল্ম জার্নালিস্টস' অ্যাওয়ার্ড পায়।*

'প্রোডিউসার ফলস ডেড ইন ফিল্ম হিরোয়িনস ল্যাপ', 'সেক্স এসকেপেড অফ বেঙ্গলি হিরোয়িন এন্ডস ইন ডেথ', 'কেচ্ছাপুরাণের নায়িকা রঞ্জনাদেবী', 'বাঙালি চিত্রতারকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে অবাঙালি সিনেমা-প্রযোজক', 'স্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যাকাণ্ড?'—সিনেমা-পত্রিকার ক্যাপশানগুলো আরও বিচিত্র।

সেই মুহূর্তে ছাপার অক্ষরে এই কালো ক্যাপশানগুলো কাঁটার মতো যার বুকে বিঁধেছে সে শোভন। আত্মীয়েরা ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে, বন্ধুরা সান্ত্বনা দিতে গিয়েও আঘাত হেনেছে, 'হাজার হোক ফিল্ম অ্যাকটেস—তুই ওইসব নিয়ে দুঃখ করিস না, শোভন...।'

শুধু একজন এমন একটা ক্রাইসিসের মুহূর্তে শক্ত হয়ে রইলেন। এমন একটা ভাব দেখালেন যেন খবরের কাগজের এসব আজেবাজে স্ক্যান্ডাল তাঁর চোখেই পড়েনি, যেন কিছুই হয়নি। প্রিয়নাথবাবু ছেলেকে ডেকে বললেন, 'স্টেটসে একজন বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম, পাসপোর্টের ব্যাপারেও বন্ধুরা তদ্বির-তদারক করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা-জব ভাউচার সব পেয়ে যাবি।'

জীবনে বোধহয় প্রথম নিচু হয়ে বাবার পায়ের ধুলো নিয়েছিল শোভন। একটা দারুণ লজ্জা নিয়ে, হেরে যাওয়ার দারুণ গ্লানি নিয়ে দিন কাটানোর দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে ওকে মুক্তি দিলেন প্রিয়নাথ।

'বাবা, আমার ফিলাডেলফিয়ার ঠিকানাটা তুমি কাউকে বোলো না,' বি. ও. এ.সি.-র প্লেনে ওঠার আগে সে প্রিয়নাথকে বলেছে। বুদ্ধিমান প্রিয়নাথ নির্বিকার মুখে ঘাড় নেড়েছেন।

সেদিনই পুলিশের হেফাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে রঞ্জনা। ইউ. পি. আই.-র সংবাদদাতা সব রহস্যের সহজ সমাধান জানিয়েছে :

> *পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যায়, স্বর্গত সোহনলাল কানওয়ার ইতিপূর্বে করোনারি থ্রম্বোসিসে ভুগেছেন, মৃত্যুর আগে তিনি প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন। সম্ভবত, অ্যালকোহল ও উত্তেজনার প্রভাবে তাঁর দ্বিতীয়বার করোনারি অ্যাটাক হয়। চিত্রতারকা রঞ্জনা রায় স্বীকার করেছে, সোহনলাল ওকে তাঁর নিজস্ব প্রোডাকশনে ভবিষ্যতে নায়িকার ভূমিকা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় বিপত্নীক প্রৌঢ় ফিল্ম-প্রোডিউসারের ব্যভিচারের প্রস্তাবে ও সম্মতি দেয় এবং সেদিন রাত বারোটার পর তাজ হোটেলে সোহনলালের স্যুটে যায়। রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন সোহনলাল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ওই অবস্থায় ভয় পেয়ে রঞ্জনা হোটেলের রুম সার্ভিসে ফোন করে ডাক্তার ডাকতে বলে। চিত্রতারকা রঞ্জনা রায়ের বয়ান সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় তাকে পুলিশি হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—।*

ইউ. পি. আই.-র সংবাদদাতা যে-কথা জানায়নি, তা হল—যেদিন পুলিশি হেফাজত থেকে ছাড়া পেল রঞ্জনা, ঠিক সেদিনই ম্যান্ডেভিল গার্ডেনের ফ্ল্যাটের সামনে অনেক মানুষের ভিড় জমেছিল। কড়িকাঠ থেকে শাড়ির ফাঁসে ঝুলছিল থানপরা এক বিধবার একহারা শরীর—লজ্জাহীনা মেয়ের মুখ দেখার লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়েছেন রঞ্জনার হতভাগিনী মা উমা দেবী।

'স্বয়ংবর' ফিল্ম এবং কানওয়ার প্রোডাকশনস পাততাড়ি গুটোল। দেবেশ রায় ইউনিটসমেত কলকাতায় ফিরে এলেন। রঞ্জনার ব্যবহারে ভদ্রলোক মর্মাহত হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আর-কোনও ফিল্মে তিনি রঞ্জনাকে নেবেন না—একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন দেবেশবাবু।

কিন্তু স্ক্যান্ডাল শুধু কলঙ্কের কালি ছিটোয় না, ম্যাগাজিনে-ম্যাগাজিনে পাবলিসিটির ডঙ্কা বাজায়। বাংলা ফিল্মের উঠতি হিরোয়িন রঞ্জনা রায়—যার নাম বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লিতে কেউ শোনেনি—স্ক্যান্ডালের কল্যাণে ওর ফটো, লাইফ-হিস্ট্রি, ওর শরীরের মাপ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তাবৎ সিনেমা-দর্শকের নজরে এল। এবং মাসখানেক না যেতেই দেখা গেল, ও গোটা পাঁচেক হিন্দি ফিল্মে চান্স পেয়েছে। বেশিরভাগই ভ্যাম্প কিংবা সহনায়িকার ভূমিকায়।

রঞ্জনা অভিনয় জানত, ছবিগুলো রিলিজ হতে ওর অ্যাক্টিং দেখে বেশ কিছু প্রোডিউসারের টনক নড়ল। —এবার আর সাইড-রোল নয়, সরাসরি হিরোয়িনের রোলে ওকে চান্স দেওয়া হল।

পরবর্তী পাঁচবছর রঞ্জনার একটানা সাফল্যের ইতিহাস। হিন্দি সিনেমায় ওর সাফল্যের নজির টলিউডেও ঢেউ তুলেছে। বাংলা ফিল্মের নায়িকার ভূমিকায় ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রোডিউসারদের মধ্যে রীতিমতো কম্পিটিশন বেধেছে।

সাফল্য আরও সাফল্যের জন্ম দেয়, হিন্দি ফিল্মের জনপ্রিয় নায়িকা হয়েও অভিনয় ভোলেনি রঞ্জনা—বাংলা ও হিন্দি দু-ধরনের ছবিতেই ও সমান পপুলার। 'আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া—' রঞ্জনার কোনও বাংলা ফিল্মের সুবর্ণজয়ন্তী হবে শুনে দেবেশবাবু নাকি বলেছিলেন।

এবং এইসব—মহরত, সিলভার-গোল্ডেন-প্ল্যাটিন্যাম জুবিলি, ফিল্মফেয়ার-ফেস্টিভ্যাল নাইট, সিনেমা-জার্নালের চকচকে রগরগে বিজ্ঞাপন—নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে লোকেশনে রঞ্জনা, শাড়িপরা-স্ল্যাকসপরা-বিকিনিপরা রঞ্জনা, ড্রয়িংরুমে-রান্নাঘরে-বাথটাবে রঞ্জনা—ওইসব যার রক্তে জ্বালা ধরিয়েছে, সে শোভন। ফিলাডেলফিয়ায় বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা নিয়েছে শোভন। 'তুমি কোনও মেয়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারোনি'—তার বন্ধুরা অভিযোগ জানাত। ওরা জানত না, একটি মেয়ে তার বিশ্বাস ভেঙে তার ব্যক্তিত্বের ভিতে চিড় খাইয়েছে—সে সুপুরুষ, সে যুবক, সে প্রেমিক—কিন্তু তাকে ছেড়ে আঠেরো বছরের রঞ্জনা মাত্র পাঁচদিনের পরিচয়ে সোহনলাল কানওয়ার নামের এক প্রৌঢ় কামুকের কাছে ধরা দিয়েছিল—শুধুই কি টাকার লোভে সাফল্যের মরীচিকা খুঁজে?

অবশ্য বেশিরভাগ লোক তাই বলে। যেমন 'স্বয়ংবরা'র হিরোয়িন মানসী সান্যাল। রঞ্জনার কেলেঙ্কারির পরে যখন কানওয়ার প্রোডাকশনস পাততাড়ি গুটোল, মানসী দস্তুরমতো কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়ে ফিল্ম-লাইন ছাড়ল।

'আর-একবার প্রমাণ হল, ফিল্ম-লাইন লোভ, লালসা ও নারীলোলুপতার লীলাভূমি,' ভদ্রমহিলা নাকি বলেছিলেন, 'আমি এই লাইন ছেড়ে দিতে চাই। হ্যাঁ, প্রসূনকুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে আগামী মাসেই—হানিমুনে আমরা কন্টিনেন্টে যাব—।'

কিন্তু একটা প্রশ্ন শোভনকে বিষকাঁটার মতো বেঁধে। শুধুই কি টাকার লোভ, নাকি যুবক হলেও শোভনের মধ্যে এমন কিছুর অভাব ছিল—অভাব ছিল সেই কঠিন পৌরুষের, যা রমণীকে ধরে রাখে?

স্টেটস থেকে ফিরতেই ছেলের চাকরি ও বিয়ের ব্যবস্থা প্রায়ই একইসঙ্গে করেছেন শোভনের বাবা প্রিয়নাথবাবু। রীনা তার বাবার একমাত্র মেয়ে, বড়লোকের একমাত্র ওয়ারিশ, কনভেন্টে পড়েছে, ডলপুতুলের মতো সুন্দরী। শোভন বড় চাকরি করে, চেহারায় জেল্লা আছে, কথাবার্তা-চালচলন দারুণ স্মার্ট, একটু আঁতেল-আঁতেল মুড দেখায়, বিশেষত সিনেমা প্রসঙ্গে কথা উঠলে। শোভনকে নিয়ে ডলপুতুলের বেশ একটু গর্ব আছে। অথচ রীনাকে সন্দেহ করে শোভন। ওর কোনও বন্ধুর সঙ্গে রীনা হেসে কথা বললেও ওর বুকের ভেতরে সেই পুরোনো বিষকাঁটাটা যেন মোচড় দেয়। রীনাও কি কোনওদিন রঞ্জনার মতো হতে পারে না!

স্টেটসের ঠিকানাটা কেমন করে জোগাড় করেছিল রঞ্জনা? অনেকগুলো চিঠি এসেছে শোভনের কাছে—লাইটারের আগুনে এয়ার লেটারগুলো পোড়াতে অদ্ভুত একটা আনন্দ পেত শোভন—চিঠিতে কী লিখেছে রঞ্জনা নামের সেই নষ্টচরিত্র মেয়ে, যে শোভনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, শোভন কখনও পড়ে দেখেনি। একসময় চিঠি আসা বন্ধ হয়েছে। বিয়ের সময় বুঝি কার মুখে খবর পেয়ে দামি উপহার পাঠিয়েছিল রঞ্জনা—গিফট পার্সেলটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে শোভন।

তারপর এই চিঠি—মাঝরাতে এসে ছটফট করে শোভন—যে-অতীতকে সে ভুলতে চায়, সেই অতীত তাকে বারবার পায়ে-পায়ে জড়িয়ে ধরে কেন?

পাঁচ

এয়ার টার্মিনাসের রেস্তোরাঁয় ভিড় নেই। প্লাইউডের পা.শনের আড়ালে বসে আছে রঞ্জনা। এই ক'বছরে আর-একটু স্প্লিম হয়েছে, আর-একটু সুন্দরী। শিম্পাতা-রং শাড়ি, বুফাবাঁধা চুল, চোখে গগলস—এক হিসেবে ভালোই, রঞ্জনার চোখে চোখ মেলে তাকাতে হবে না শোভনকে।

''অভিনেত্রী'' ফিল্মটা দেখলাম,' যেন কিছুই হয়নি—কফির পেয়ালায় চামচ নাড়ছে শোভন : 'কনগ্র্যাচুলেশনস। ক্লদ লেলুশ তোমার অ্যাক্টিং সম্বন্ধে যা বলেছেন, এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি—।'

'এখানকার পাবলিকের ছবিটা ভালো লাগেনি,' ছোট্ট রুমালে মুখ মোছে রঞ্জনা, গালে লালচে আভা জাগে।

'ঋত্বিকবাবু সাধে বলেছেন, শালার পাবলিক—,' যেন অনেকদিন আগের শোভন, যে সিনেমা নিয়ে তর্কের ঝড় তুলত, হাসি-ঠাট্টা কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে আসর জমিয়ে রাখত।

'না, শোভন, পাবলিকের দোষ নেই,' গগলস খুলে শোভনের চোখের দিকে তাকায় রঞ্জনা, শোভন চোখ নামিয়ে নেয় : 'একটা মেয়ে—সে তার কেরিয়ারের জন্যে স্বামীকে যন্ত্রণা দিল। স্বামীর মৃত্যুটা যদিও অ্যাক্সিডেন্ট, তবু এ-মৃত্যুর দায়িত্ব সে কি অস্বীকার করতে পারে? স্বামী-সন্তানের মৃত্যুর পর তার নিজের বাঁচার প্রয়োজনটাই বড় হয়ে উঠল। সে ফিল্মে প্রেমিকার অভিনয় করে, তার মরা মেয়ের ছবিতে ধুলো জমে, সে নতুন প্রেমিকের সঙ্গে ফূর্তিতে মাতে—এই মেয়েটার জীবনযন্ত্রণা দু-চারজন আঁতেলের ভালো লাগতে পারে—কিন্তু পাবলিক তাকে সহ্য করতে পারবে কেন?'

'অথচ এটাই স্বাভাবিক। একজন অভিনেত্রীর হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা, ঘর বাঁধা, ঘর ভাঙা কোনওটাই জীবন নয়, জীবনের ছায়া। কেননা, রুপোলি পরদার বুকে সে কখনও প্রেমিকা, কখনও ঘরনী, কখনও সতী-সাধ্বী, কখনও অসতী, তার অভিনয় পরদা ছাপিয়ে জীবনকে ছুঁয়ে যায়—সে প্রেমিকের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে, সন্তানের সঙ্গে অভিনয় করে—আমরা ছায়া দেখে ভাবি, এটাই অভিনেত্রীর জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম বা বঞ্চনা কোনওটাই বাস্তব নয়, ফ্ল্যাশব্যাক, মিড শট, লং শট, ফ্রিজ, আলোছায়ার মন্তাজ—তার বেশি কিছু খুঁজতে গেলে—' একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে হঠাৎ থেমে যায় শোভন, তারপর : 'কিছু মনে কোরো না, আমি ''অভিনেত্রী'' ফিল্মের কথা বলছিলাম—।'

'না, শোভন, তুমি আমার কথা বলছিলে,' এখনও ভুবনভোলানো হাসি হাসতে পারে রঞ্জনা—নিপুণ অভিনেত্রী, কোনও কিছুই বুঝি ওর স্নায়ুতে দাগ কাটে না : 'অথচ এমন তো হতে পারে, যে-ঘটনাটাকে বাস্তব ভেবে তুমি দুঃখ পেয়েছ, সেটাও ঘটনা নয়, ঘটনার ছায়া, শুধুই অভিনয়—।'

'আমি—আমি শুধু একটা কথা তোমাকে বলতে পারি, রঞ্জনা—অভিনয়-জীবন ছেড়ে দিলে তুমি ভুল করতে—হ্যাঁ, সেদিন যদি ঝোঁকের মাথায় তুমি আমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে, ইনগ্রিড থুলিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো এই অভিনয় দর্শক স্ক্রিনে দেখতে পেত না—।'

'তাতে আমার কী এসে যায়?' রঞ্জনার চোখের কোণে চিকচিক করছে—হ্যাঁ, জলের ফোঁটা—সত্যিকার ভালো অভিনেত্রী দুঃখ বোঝাতে চোখের কোণে গ্লিসারিন লাগায় না।

'শুধু প্রতিভা দিয়ে দর্শককে জয় করতে নিশ্চয়ই সময় লাগত। কিন্তু তার বদলে যে-রাস্তা তুমি বেছে নিয়েছিলে, রঞ্জনা—সোহনলাল কানওয়ারের ফিল্মে চান্স পাবে বলে রঞ্জনা রায়ের মতো আর্টিস্ট—।'

'না,' জলের গ্লাসটা এত শক্ত মুঠোয় ধরেছে রঞ্জনা, কাচ যেন এখনই গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে 'সোহনলাল আমার দিকে লোভের হাত বাড়ালে আমি তাকে খুন করতাম—।'

খুন! যেন হঠাৎ চমকে ওঠে শোভন। 'স্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যা?' ইয়েলো ম্যাগাজিনের একটা কালো ক্যাপশন ওর মনে পড়ে। যদি তাই হয়—যদি ছল-ছুতোয় রঞ্জনাকে কাছে ডেকে থাকে সোহনলাল, যদি মন্দিরের মতো শরীরে দাগ রাখতে চায়, সেই কুৎসিত স্বভাবের মাঝবয়েসি লোকটা—রঞ্জনা কি তাকে খুন করতে পারে না? তারপর বিপদ বুঝে হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন—সেটাও কি স্বাভাবিক নয়?

এবং স্বেচ্ছায় মোহনলাল কানওয়ার নামের এক কামুক মাঝবয়েসি ফিল্ম-প্রোডিউসারের কাছে ধরা দিয়েছে উঠতি ফিল্ম-স্টার রঞ্জনা—এই স্টেটমেন্ট দিয়ে মার্ডার চার্জের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি সম্ভব নয়? বাকি থাকে পোস্টমর্টেম—কিন্তু সোহনলালের আগে একবার করোনারি হয়েছিল—হয়তো ধস্তাধস্তির সময় তার সেকেন্ড অ্যাটাক হয়—হয়তো হঠাৎ চোট লেগে হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায়—হয়তো—হয়তো—হয়তো—কিছুই বলা সম্ভব নয়, কেননা অভিনয় দিয়ে সত্যকে মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে জানে রঞ্জনা।

'সোহনলালের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার জড়িয়ে পড়ার কোনও যুক্তি তোমাকে বোঝাতে পারব না, শোভন। ধরো, এমন একজনের জন্যে—যার সঙ্গে আমার মাত্র মাসখানেকের পরিচয়—তাকে বাঁচাব বলে—অথচ দেখো, সে কেমন মাথা উঁচু করে সিনেমা-লাইনের লোভ, লালসা, নোংরামি নিয়ে বড়-বড় কথা বলে অ্যাক্টিং ছেড়ে দিল। আসলে ওর বয়েস বাড়ছিল, বাজার পড়ে আসছিল—সোহনলাল ছাড়া আর কোনও প্রোডিউসার হিন্দি ফিল্মে ওকে চান্স দিত না—ওর লাভারেরও বয়স হয়েছিল, কিন্তু তখনও টলিউডের ম্যাটিনি-আইডল, কমবয়েসি মেয়েদের সঙ্গে পার্ট করছে, মানসীর সঙ্গে বিয়ের এনগেজমেন্টটা ভেঙে ফেলতে পারলে—।'

'মানসী? তুমি মানসীর কথা বলছ?' এতক্ষণে কথার খেই ধরতে পারে শোভন। প্রায় দুই দশক ধরে বাংলা ও হিন্দি ফিল্মের পরদায় যাকে দেখা গেছে, যার সঙ্গে রঞ্জনার প্রথম পরিচয় 'স্বয়ংবরা' ফিল্মের সেটে—সেদিনের সেই ঘটনায় তার কী ভূমিকা থাকতে পারে?

'মানসীকে তোমার মনে পড়ে, শোভন? দু-গালে বয়সের ভাঁজ, কপালের কোঁচকানো দাগগুলো হেভি মেকআপে ঢাকা পড়ত। ডায়েটিং স্লিমিং রু ম্যাসর বডিশেপারের কোনও কারসাজি না মেনে শরীরে চর্বির ঢল নামছিল। ও সবসময় কর্সেট পরে থাকত। ওর পরপর তিনটে ফিল্ম ফ্লপ করেছে। সোহনলাল জেদ না ধরলে দেবেশদা ওকে কিছুতেই হিরোয়িন করতেন না—।'

'প্রসূনকুমার শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে করেছিল,' শোভন ভাবলেশহীন মুখে বলে, 'লোকে বলে, অনিচ্ছায়, দায়ে পড়ে, ওকে এড়াতে না পেরে—।'

'প্রসূন যদি জানত—,' প্লাইউডের পার্টিশন, সিলিং-এর ফ্যান প্যান করে অভিনেত্রীর চোখদুটো এখন গ্লাস-টপ টেবিলে আটকে আছে : 'সেদিন রাতে আমার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। যখন কানওয়ারের রুমে ঢুকলাম, সব শেষ—।'

'সব শেষ,' বিমূঢ় শোভনের দিকে তাকিয়ে অভিনেত্রীর আঁখিপল্লব কেঁপে ওঠে : ''সব শেষ—'' ভাঙা গলায় বলছিল মানসী। কল্পনা করো, ওর মুখে মেকআপ নেই, চোখের কোণে কালি, গালের ঝুলে পড়া মাংস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পাতলা একটা নাইটগাউন, ভেতরে ব্রা-করসেট-গাউন কিছু নেই। ওর ভাঙা বুক, ভারী কোমর ঝকঝকে আলোয় আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে। বিছানার ওপরে শুধু একটা আন্ডারওয়্যার পরে শুয়ে আছে সোহনলাল—লোকটার মুখ নীল, ঠোঁটের কোণে ফেনা, বুকটা নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে না। ''ও মরে গেছে''—আমার হাতদুটো ধরে হিস্টিরিয়ার রুগির মতো কাঁপছিল মানসী—''দ্যাখো রঞ্জনা, লোকটা মরল, আমাকেও মেরে গেল—''।'

'তাহলে?' শোভনের হাতদুটো টেবিলে রাখা, আঙুলগুলো তবুও একটু-একটু : কাঁপছে 'তাহলে মানসীই কানওয়ারকে খুন করেছিল?'

'না। বছর-কয়েক আগে মানসীকে নিজের প্রোডাকশনে চান্স দিয়েছিল কানওয়ার। তখন থেকেই ওদের মাখামাখি। ''স্বয়ংবরা''র শুটিং-এর সময় পুরোনো সম্পর্কটা ওরা ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল। আকণ্ঠ মদ গিলেছিল কানওয়ার। ওর হার্টের অসুখ ছিল, হয়তো এক্সসাইটমেন্টের ধকল সইতে পারেনি। এবার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো। কানওয়ারের স্যুটে ওকে ঢুকতে দেখেছে হোটেলের ফ্লোর-ওয়েটার। এখন কানওয়ারের এই অপঘাত মৃত্যু নিয়ে ঝামেলা বাধবে, সবাই জানবে, মাঝরাতে প্রোডিউসারের ঘরে গিয়েছিল মানসী।

'পাপ কখনও ঢাকা থাকে না, থাকা উচিত নয়—তুমি হয়তো বলবে। কিন্তু তখন—''সব শেষ''—হাউহাউ করে পাগলের মতো কাঁদছে মানসী। বলছে, ''এমনিতেই প্রসূন বিয়েটা নাকচ করার চান্স খুঁজছে, ও যখন জানবে—'' ওর গালের ঝোলা মাংস, বসা চোখ, থলথলে শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আমি—আমি সহ্য করতে পারিনি, শোভন। সোফার ওপরে ওর কমলা রঙের শাড়িটা লুটোচ্ছিল। শাড়িটা পরে নিয়ে আমার ছাড়া কাপড়টা ওকে পরতে বললাম, তারপর বাথরুমের দরজা খুলে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ও নীচে নেমে গেল। আমি টেলিফোন তুলে রুম-সার্ভিসে ডায়াল করলাম—।'

'পাপ না করে তুমি পাপী সাজলে?' দুটো হাত মুঠো করে আছে শোভন, বন্ধ হাতের তালু থেকে টেবিলে ঘাম গড়িয়ে পড়ে : 'আমার কথা, তোমার মায়ের কথা, তোমার একবারও মনে এল না?'

'এসেছিল,' রঞ্জনার গালে জলের বিন্দুগুলো রুপো-রং সুতোর মতো আঁকাবাঁকা : 'পাবলিক আমাকে ভুল বুঝবে, আমি জানতাম। মানসীকে বাঁচাতে গিয়ে আমি মিথ্যে বদনামের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কেননা আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে যারা চেনে—মা, তুমি, আমার ভাই রাজা, তোমরা আমার অভিনয় ধরে ফেলবে। কিন্তু না—মা আত্মহত্যা করলেন, রাজা বাড়ি থেকে পালিয়ে রেলের ওয়ার্কশপে চাকরি নিয়েছে, ও আমার মুখ পর্যন্ত দেখতে চায় না। আর তুমি—আমার অভিনয় এত ভালো হয়েছিল, তোমরা সবাই ভুল বুঝলে,' ভ্যানিটি ব্যাগের ক্লাস্প খুলে হাতড়াচ্ছে রঞ্জনা। একসময় রুমালটা চোখের কোণে এসে লাগে। জল মুছে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অভিনেত্রীর চোখ : 'নিজের জীবন নিয়ে এমন অভিনয় কে কবে করেছে বলো তো? ইনগ্রিড থুলিন? অ্যানা ম্যাগনানি? ওরা কি অভিনয় করে মাকে, ভাইকে, ভালোবাসার মানুষকে ভুল বোঝাতে পেরেছে?'

'এলে যদি, এতদিন পরে কেন এলে?' অনেক, অনেকক্ষণ পরে শোভন কথা বলে। বোম্বের প্লেন আসছে—যাত্রীদের মাইকে ডাকা হচ্ছে। মাইকের স্বর ছাপিয়ে উঠল শোভনের ভাঙা গলার আর্তস্বর, 'কেন এতদিন পরে আমার ভুল ভেঙে দিলে?'

গো-গো সানগ্লাস চোখে এঁটে নেয় রঞ্জনা। কালো কাচের বুকে শোভনের রুক্ষ মুখের ছায়া ভাসে : 'তোমার জন্যে,'—মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো একবার ঝিলিক দেয়—'একটি মেয়ে তোমার ভালোবাসাকে অসম্মান করেছে ভেবে তুমি সব মেয়েকে সন্দেহ করবে, হয়তো তোমার স্ত্রীকেও—তোমার সুখের ঘরের চাবি আমি ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, শোভন।'

লং শটে রানওয়ে, যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, প্লেনের প্রপেলার ঘুরছে।

মিড শটে হেঁটে যাচ্ছে রঞ্জনা, হাওয়ায় উড়ছে শিমপাতা রং শাড়ির আঁচল। দুঃখ ওর একার, কালো কাচের আড়ালে ভেজা চোখের মতো ঢাকা থাকে। অভিনয় বুফাঁ-বাঁধা চুলের মতো, তন্বী শরীরের মতো, শাড়ির আঁচলের মতো—হাওয়ায় দোলে, চোখের সামনে আসে, কখনও বা দূরে সরে যায়।

সবার পিছনে ফ্রিজে জমা ছবির মতো শোভন—'আমি সুখি নই, সুখি নই, সুখি নই'—ওর শুকনো ঠোঁটদুটো না নড়েও বারবার বলছে।

ডিসেম্বর, ১৯৭৪



নিয়তি পুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত প্রায় পৌনে বারোটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে! সেইজন্যেই রাস্তাঘাট এর মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। লাস্ট বাস থেকে নামবার সময়ই আমার পা-টা মচকে গেল।

বেশি রাত্রির বাস এমনিতেই ঝড়ের বেগে ছোটে। কোথাও বেশিক্ষণ থামতেই চায় না। যাত্রী খুব কম। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছে আমিই একমাত্র নামব। দরজার কাছে হাতল ধরে দাঁড়ানো মাত্র কন্ডাক্টর গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিয়ে দিল। চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হল।

হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেতাম। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছি। কিন্তু বাঁ-পায়ের গোড়ালির কাছে বেশ চোট লেগেছে। একটু হাঁটতে গিয়েই দেখলাম, রীতিমতন ব্যথা।

এইসময় একটা রিকশা পেলে ভালো হত। অন্যদিন অনেক রিকশা থাকে এখানে। আজ বৃষ্টির জন্যে রাস্তা ফাঁকা, তাই রিকশাও নেই। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টির মধ্যে এখন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে যেতে হবে।

দু-একটা রিকশা ফুটপাথের ওপর তুলে রেখে তাদের চালকরা ঘুমোচ্ছে। ডেকে তুললে অনেকসময় ওরা যেতে চায় না। মেজাজ দেখায়। কী করব দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, এইসময় পেছনে ঠুং-ঠুং শব্দ কানে এল। একটা ফাঁকা রিকশা। বুড়ো মতন একজন লোক সেটা চালাচ্ছে। মাথার ওপরে একটুকরো প্লাস্টিক টুপির মতন পরে আছে। সে নিজেই আমাকে জিগ্যেস করল, বাবু যাবেন?

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! কোনও দরাদরি না করে উঠে বসলাম। মেজাজটা আবার একটু প্রসন্ন হতে একটা সিগারেট ধরালাম।

বড়রাস্তা থেকে আমার বাড়ি মিনিট-সাতেকের পথ। সেখানে পৌঁছোবার পর আমি নেমে পড়ে রিকশাওয়ালাকে একটা টাকা দিলাম।

সে বেশ খুশিই হয়েছে মনে হল। অনেকখানি ঝুঁকে সেলাম করল। তারপর যখন আবার সোজা হল, তার মুখখানা দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলাম।

কেন চমকালাম তা নিজেই জানি না। খুব সাধারণ চেহারার একজন বুড়ো। মুখে অল্প-অল্প দাড়ি। খুব একটা খারাপ দেখতেও নয়। তবু চমকে ওঠার কারণ কী! কিছু বুঝতে পারলাম না। শুধু বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগল।

ভেতরে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়েও মনের মধ্যে খচখচানিটা রয়েছে। লোকটার মুখে-চোখে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু হঠাৎ ওকে দেখেই আমার গা-টা কেঁপে উঠেছিল কেন?

জামাকাপড় ছেড়ে, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর মনে পড়ল। এই রিকশাওয়ালাটার সঙ্গে আর-একটা লোকের দারুণ মিল আছে!

বছর-দেড়েক আগে সমস্তিপুর থেকে ফিরছিলাম একবার। একাই। স্টেশানের হকারদের কাছ থেকে দুটো ডিমসেদ্ধ আর তিনপাতা আলুর দম খেয়েছিলাম। ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমার অসম্ভব পেটব্যথা শুরু হল। তিনবার বমি করলাম। কিছুতেই পেটব্যথা কমে না। বাথরুমের বাইরে দরজার কাছে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম একবার—মনে হল, আমার কলেরা হয়েছে, আমি এক্ষুনি মরে যাব।

হয়তো মরেই যেতাম। সেইসময় ভিড় ঠেলেঠুলে একজন বিহারি ভদ্রলোক এসে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে? দেখি, জিভ দেখি আপনার—।

ভদ্রলোক ডাক্তার। সঙ্গে তাঁর ওষুধের বাক্স। তিনি আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন এক জায়গায়। তারপর এমন সেবা করতে লাগলেন যে, অনেক নিকট আত্মীয়ও সেরকম পারে না।

তাঁর ওষুধে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার পেটব্যথা কমে গেল। আর-একটা ওষুধে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পাইনি। ঘুম ভাঙার পর আর দেখতে পাইনি তাঁকে। অন্য লোকজনের মুখে শুনলাম, তিনি বারাউনি নেমে গেছেন। দারুণ আপশোস হয়েছিল। আমার সেই উপকারী বন্ধুর নামটাও জানতে পারিনি। মুখটা অবশ্য স্পষ্ট মনে আছে। মধ্যবয়স্ক লোক। মুখে অল্প-অল্প দাড়ি। অবিকল আজকের রিকশাওয়ালার মতন। এ কখনও হয়? মানুষে-মানুষে এত মিল থাকে! যমজ ভাই হলে অনেকসময় হতেও পারে। কিন্তু একজন ডাক্তার, আর-একজন রিকশাওয়ালা? সেই ডাক্তারই কোনওরকম ভাগ্য-বিপর্যয়ে রিকশাওয়ালা হয়েছে? তাহলে তো আমার উচিত ব্যাপারটার খোঁজ করা। কিংবা যদি সেই ডাক্তারের ভাই-ও হয়—!

পরদিন পায়ে এমন ব্যথা হল যে, বাড়ি থেকে বেরুতেই পারলাম না। আমার ছোট ভাই-ই ডাক্তার! সে আমার হাঁটাচলা একদম বন্ধ করে দিল। সাতদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েই সেই রিকশাওয়ালার খোঁজ করেছিলাম। পেলাম না। অন্য দু-একজন রিকশাওয়ালাকে তার কথা জিগ্যেস করেও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশ্য এত সামান্য বর্ণনায় কোনও মানুষকে খুঁজে বের করাও যায় না। মধ্যবয়স্ক এবং মুখে সামান্য দাড়িওয়ালা আরও দু-তিনজন বিহারি রিকশাওয়ালা আছে। কিন্তু কেউই সেই লোকটি নয়। হতে পারে সেই রিকশাওয়ালা অন্য পাড়ার। সেদিনই শুধু এদিকে এসে পড়েছিল।

তবু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। আমার দু-দুবার বিপদের সময় ঠিক একইরকম চেহারার দুজন লোক আমাকে সাহায্য করার জন্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল! এ কেমন করে হয়!

বন্ধুবান্ধবদের বললাম ঘটনাটা। তারা হেসেই উড়িয়ে দিল। কয়েকজন নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল। মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে আমি রিকশাওয়ালার মুখ ভালো করে দেখতে পাইনি। আমার অচেতন মনে নাকি সেই সময়েই ট্রেনের সেই ডাক্তারটির কথা ঘুরছিল। সেইজন্যেই নাকি আমি রিকশাওয়ালার মুখখানা সেই ডাক্তারের মতন কল্পনা করে নিয়েছি! কী জানি, হতেও পারে!

এর ঠিক বছর-দেড়েক বাদে আর-একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে। আমার সঙ্গে অনেক কাগজপত্র। খুব মন দিয়ে আমি কয়েকটা চিঠিপত্র পড়ছিলাম এবং যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলো ফেলে দিচ্ছিলাম জানলা দিয়ে। একসময় দেখলাম, ঠিক আমার জানলার পাশেই একটা ট্যাক্সি জোরে-জোরে হর্ন দিচ্ছে এবং পেছনের সিট থেকে একজন লোক হাত-পা নেড়ে আমাকে কী যেন বলতে চাইছে। লোকটির মুখে খুব একটা ব্যস্ত ভাব। আমি আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললাম, রোখকে! রোখকে!

পাশাপাশি দুটো ট্যাক্সিই দাঁড়িয়ে গেল। অন্য ট্যাক্সির একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনার চিঠিপত্র যে সব উড়ে যাচ্ছে! আমি দুটো কুড়িয়ে এনেছি—।

আমি অবহেলার সঙ্গে বললাম, ওগুলো তো আমি ফেলে দিয়েছি! কেন মিছিমিছি আপনি তুলতে গেলেন?

পরক্ষণেই মনে হল, যাই হোক, ভদ্রলোক এরকম কষ্ট করেছেন যখন, ওঁকে একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত অন্তত!

কিন্তু ধন্যবাদ জানাবার আগেই দুটি ব্যাপারে আমাকে চমকে উঠতে হল। আমার ট্যাক্সিটা থেমে পড়ায় পেছনের গাড়িটা ওভারটেক করে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা মিনিবাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। এত জোর অ্যাকসিডেন্ট যে, আওয়াজে প্রথমে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো হল এবং সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ করলাম, আমার পাশের ট্যাক্সির ভদ্রলোকের মুখখানা অবিকল সেই ট্রেনের ডাক্তার কিংবা মাঝরাত্তিরের রিকশাওয়ালার মতন।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। এখন ঠিক বিকেল—এখন তো চোখের ভুল হওয়ার কথা নয়!

সামনের অ্যাকসিডেন্ট দেখতে বহু লোক ছুটে যাচ্ছে। গাড়িটার ক্ষতিই হয়েছে বেশি, পেছনের দুজন যাত্রীর অবস্থা সঙ্গিন। দৃঢ় ধারণা হল, আমার ট্যাক্সিটা যদি হঠাৎ এভাবে না থামত, তাহলে এটা নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট করত এবং এতক্ষণে আমার ছিন্নভিন্ন শরীর পড়ে থাকত রাস্তায়। এই ভদ্রলোকই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

আমি অন্য ট্যাক্সির জানলার ধারে গিয়ে বললাম, আপনি আমার আজ যে কী উপকার করলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না! কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব!

ভদ্রলোক সামনের অ্যাকসিডেন্টটা দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ফিসফিস করে বললেন, ওরেঃ বাবা! কী সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট! কেউ মারা গেছে নিশ্চয়ই!

এই সুযোগে আমি ভদ্রলোককে ভালো করে দেখে নিলাম। মধ্যবয়স্ক, মুখে অল্প দাড়ি। খুব লম্বা কিংবা বেঁটে নন। সব কিছু সেই ট্রেনের ডাক্তারটির মতন একরকম।

আমি বললাম, আপনি এখানে একটু নামবেন?

উনি বললেন, আমার বিশেষ জরুরি কাজ ছিল—।

—কিন্তু এখন তো যেতে পারবেন না। রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে।

—তাই তো, কী যে করি!

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উনি নেমে পড়লেন। আমি বললাম, আজ আপনিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

উনি লজ্জিতভাবে বললেন, না, না, আমি আবার কী করলাম! আপনার চিঠিগুলো উড়ে-উড়ে পড়ছিল। যদি কাজের জিনিস হয়, আপনি হয়তো লক্ষ করেননি।

—কিন্তু আপনি ওইজন্যে আমার ট্যাক্সিটা না থামালে আমিই ওই অ্যাকসিডেন্টে পড়তাম নির্ঘাত।

—কলকাতার রাস্তায় কখন যে কার অ্যাকসিডেন্ট হবে, তা বলা যায় না!

সামনের গাড়ি থেকে তখন একটা মৃতদেহ নামানো হচ্ছে। ভদ্রলোক মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ইস, এইসব দৃশ্য আমি একদম দেখতে পারি না।

আমি বললাম, চলুন, কোনও দোকানে বসে একটু চা খাই।

উনি বললেন, আমার বড় জরুরি কাজ ছিল—কিন্তু কী আর হবে।

আমার অনুরোধে ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। আমি তখন কৌতূহলে ছটফট করছি। ভদ্রলোককে বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে। যদিও অনেক বিহারি পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন।

নিজের নামটা বলে, ওঁকে নাম জিগ্যেস করলাম।

উনি বললেন, আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র হালদার।

খাঁটি বাংলা নাম। তবু চেহারার এত অসম্ভব মিল কী করে হয়? রিকশাওয়ালাকে আমি ভালো করে না দেখলেও ট্রেনের সেই ডাক্তারের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। হুবহু এইরকম।

—আপনি কি ডাক্তার?

—না তো!

—আপনি কি সমস্তিপুরের দিকে কখনও গিয়েছিলেন?

—সমস্তিপুর? না, যাইনি তো কখনও!

ভদ্রলোক রীতিমতন অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, এ-কথা জিগ্যেস করলেন কেন?

—ঠিক অবিকল আপনার মতন চেহারার একজন লোককে আমি আগে দেখেছি। একজন নয়। দুজন!

কৃষ্ণচন্দ্র হালদার হাসতে আরম্ভ করলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, সে কী মশাই! ঠিক আমার মতন চেহারা? তা হয় নাকি!

—আপনার কোনও ভাই-টাই—।

—আমার তো কোনও ভাই নেই!

কিছুতেই কিছু মিলছে না। অথচ আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, ঠিক এইরকম চেহারার দুজন লোককে আমি আগে দেখেছি। প্রত্যেকবারই আমার কোনও বিপদের সময়।

কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। টেনের সেই ডাক্তারটিকে আমি কিছুই শোধ দিতে পারিনি। এই ভদ্রলোকও আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। এঁকে কিছুটা অন্তত খাতির করা উচিত।

—কী খাবেন, বলুন?

ভদ্রলোক কিছুই খেতে চান না। শুধু এককাপ চা। তা হয় না। আমি শেষ পর্যন্ত দু-প্লেট স্যান্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার দিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, উঃ, এইরকম সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট...এখনও আমার শরীরটা কাঁপছে।

—এ-অ্যাকসিডেন্টে আমার মরার কথা ছিল।

—বলবেন না, মশাই, ও-কথা বলবেন না। আমি এইসব দৃশ্য একদম সইতে পারি না।

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। তাতে একটি মাত্র সিগারেট।

সেটাই বাড়িয়ে দিলাম ভদ্রলোকের দিকে। তিনি নিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, একটা রয়েছে যে! আপনার?

—আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

—দাঁড়ান, আমি সিগারেট কিনে আনছি।

—না, না, আপনি বসুন, আমি আনাচ্ছি।

—আমার নিজেরই কেনা দরকার। অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গেছে।

—বেয়ারাকে পাঠালেই তো—।

ভদ্রলোক সে-কথা শুনলেন না। নিজেই সিগারেট কিনতে বেরিয়ে গেলেন। আমি আমার হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। ভাগ্যিস, বাজে চিঠিগুলো জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম!

বেয়ারা এসে চা আর স্যান্ডউইচ রেখে গেল। ভদ্রলোক তো সিগারেট কিনে ফিরলেন না! দোকানের পাশেই তো সিগারেটের দোকান! হয়তো টাকার খুচরো পাচ্ছেন না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ভদ্রলোক এলেন না। এত দেরি হওয়ার তো কোনও কথাই নয়। উঠে গিয়ে দরজার বাইরে উঁকি দিলাম। সিগারেটের দোকানের সামনে সেই ভদ্রলোক নেই।

সেখানে এগিয়ে জিগ্যেস করলাম, মুখে দাড়িওয়ালা একজন লোক এখানে এসেছিলেন একটু আগে?

দোকানদার বলল, না তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভদ্রলোককে আর পাওয়া গেল না। সেই দু-প্লেট স্যান্ডউইচ আর চা আমাকে একলাই শেষ করতে হল।

ভদ্রলোক চলে গেলেন কেন? হয়তো খুব জরুরি কোনও কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। জরুরি কাজের কথা তো বলছিলেনই। কাছেই আর-একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়েছেন।

কিন্তু আমাকে একবার বলেও গেলেন না?

মনের মধ্যে খটকাটা রয়েই গেল!

ক্রাইম

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৫



খুনি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শুভঙ্করকে যদি খুনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে কিছু তথ্যগত ত্রুটি থেকে যাবে। কারণ, বস্তুত শুভঙ্কর এখনও কাউকে খুন করেনি। কিন্তু তাকে যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানে তারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে, শুভঙ্করের মধ্যে, যাকে কিলার ইনস্টিংট বলে, তা আছে। সবচেয়ে বেশি জানে সে নিজে।

শুভঙ্করের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ডান হাতে ঘড়ি বাঁধে। ঘড়িটা খুব শক্ত করে বাঁধে না। ঢিলে চেন-এ বাঁধা ঘড়িটা ঢলঢল করে। হাত নাড়লে ছপাৎ করে চেন-এর শব্দ হয়। বাঁ-হাতে স্টেনলেস স্টিলের একটা বালা, যেমন শিখদের হাতে থাকে। সে লম্বা চুল আর জুলপি রাখে, গোঁফ রাখে না। বিশাল তার কাঁধ, অসম্ভব পেশিবহুল হাত। জামার বুকের ওপরের তিনটে বোতাম সে কখনও আটকায় না। ফলে তার রোমশ এবং ফরসা বুক দেখা যায়। খুব চাপা প্যান্ট পরে। ফলে উরু ফুলে থাকে প্যান্টের ওপরে। শক্ত আর ভারী জুতো পরতে সে ভালোবাসে। অনেকটা লম্বাও শুভঙ্কর। ফরসা, বলিষ্ঠ, আক্রমণাত্মক চেহারা।

চরিত্র অবশ্য খুবই সরল—হাসির ব্যাপার ঘটলে হাসতে-হাসতে বেহেড হয়ে যায়। ফুটবল বা ক্রিকেটের মাঠে দর্শক হয়ে গিয়েও সে তুলকালাম চেঁচায় হা-হা করে। অল্পেই ভীষণ উত্তেজিত হয়, আবার অল্পেই ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রচণ্ড আড্ডা মারতে ভালোবাসে। খাওয়া তার প্রচণ্ড প্রিয় বিষয়। যখন খায় তখন মনে হয় জিঘাংসাবশে খাচ্ছে। সেসময়ে কারও দিকে তাকায় না, কথা বলে না, অন্যমনস্ক হয় না। ঘুমও তার অসম্ভব প্রিয়। যখন ঘুমোয় তখন অতলে তলিয়ে যায়। ছুটির দিন হলে, কাজ না থাকলে, একঘেয়েমি লাগলে সে সোজা গিয়ে বিছানা নেয়। ঠিক একমিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড সিনেমাও দেখে সে। সপ্তাহে তিনটে-চারটে। বেশিরভাগ নাইট-শো। আর তার প্রিয় হচ্ছে মহিলাবৃন্দ। কোনও বিশেষ মহিলার প্রতি নয়, কিংবা কেবল সুন্দরীদের প্রতিই নয়, সাধারণভাবে যে-কোনও মেয়েই তার জীবনপথে রাস্তা পার হয় তার প্রতিই সে মনোযোগী। অবশ্য এ-কথাও সত্য যে, মহিলাদের মধ্যে কাউকেই সে কখনও তেমন করে পায়নি। বার-দুই দুজন মহিলা তাকে কারণ-বশত চড় মেরেছিল বলেও শোনা যায়। আবার প্রেম নিবেদন করেছে, এমনতর মহিলাও আছেন।

হোসেন নামে এক বন্ধু আছে শুভঙ্করের। অবশ্য বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হোসেনের বয়েস শুভঙ্করের চেয়ে অনেক বেশি। হোসেনের চুল এবং দাড়ি যথেষ্ট পাকা, চলন-বলন ধীরস্থির। রোগা এবং আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মানুষ সে। কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাথে তার একটা বইয়ের দোকান

আছে, আর আছে একটা ছোটমতো বই-বাঁধাইয়ের কারবার। পাজামা আর শার্ট পরে শীত-গ্রীষ্ম, খালাসিটোলায় দিশি খায়, মাথার টাক ঢাকতে একটা মুসলমানী এবং মাড়োয়ারির মাঝামাঝি কায়দার কালো টুপি পরে। লোকে বলে, সে আসলে কায়েতের ছেলে, দেশের গ্রামে এক নষ্টচরিত্র ঘটনা ঘটার পর থেকে নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতার জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তা হোসেন বেশ ভালো জ্যোতিষী। পুরোনো পুঁথিপত্র ঘেঁটে সে বিস্তর জ্যোতিষ শিখেছে। তার সংগ্রহে অন্তত পঞ্চাশখানা দুর্লভ জ্যোতিষশাস্ত্রঘটিত বই আছে। সে সকলের হাত আর কোষ্ঠী বিচার করে।

শুভঙ্কর তার দোকান থেকে কয়েকবার বই কিনেছিল। খুব সহজেই শুভঙ্করের বন্ধু হয়ে যায় অচেনা লোক, তুই-তোকারির সম্পর্কে এসে যায়। হোসেনও সেরকমভাবেই বন্ধু হয়েছিল।

সেই হোসেনই একদিন তার হাত দেখে বলে, দ্যাখ শুভ, তোর সব ভালো, কিন্তু তোর মধ্যে খুনির ইনস্টিংট আছে।

কী করে বুঝলি?—বলে শুভঙ্করও নিজের হাত দেখতে থাকে।

রেখা তো আছেই। তার ওপর তোর দুটো হাতের বুড়ো আঙুলের আকার দেখেও বোঝা যায়।

খুন করব নাকি রে?

করবি।

যাঃ!

মাইরি। সাবধানে থাকিস।

কথাটা উড়িয়ে দেয়নি শুভঙ্কর। ছিটেফোঁটা সত্য ওর মধ্যে আছে। সে নিজেও ছেলেবেলা থেকে টের পায় যে, কাউকে-কাউকে তার প্রায়ই খুন করতে ইচ্ছে হয়।

হোসেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, অবশ্য ভেবেচিন্তে খুন করা নয়। কোল্ড ব্লাডেড বা প্রি-মেডিটেটেডও নয়। দুম করে রাগের বশে করে ফেলতে পারিস। রাগ করতে সাবধান।

রাগটা অবশ্য শুভঙ্করের কিছু বেশি। রাগলে সে পাগলের মতো চেঁচায়। রাগলে সে নাচে। রেগে গেলে পৃথিবীটাই তার কাছে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

হোসেন তাকে খালাসিটোলায় নিয়ে গিয়ে দিশি মদের মজা শেখাল। সে ভারী মজা! প্রথম ঝাঁঝ আর স্বাদ পার হয়ে মদের হৃদয়ে পৌঁছে যেতে পারলে এক কেরিকেটেড জগৎ—কথাটা হোসেনই তাকে বলেছিল।

তুই যে বলিস আমি খুন করব, সে কি সত্যি?—শুভঙ্কর একদা দিশি মদে তার ভেলা ভাসিয়ে কেঁদে বলেছিল, সকলের সামনে।

পাশে একটা ভিতু ঠেলাওলা বসে ছিল। কথাটা কানে যেতে সে উঠে অন্যপাশে সরে বসে।

হোসেন গম্ভীরভাবে বলে, সত্যি।

করবই?

করবিই।

শুনে শুভঙ্কর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তবে শালা—।

হোসেন হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলে, আজ থাক।

না, আজই। করব যখন, এখনই করে ফেলি।

পরে করিস।

শুভঙ্কর বায়না করতে থাকে, না, আজই!

হোসেন বিরক্ত হয়ে বলে, মজাটা নষ্ট করিস না। এতগুলো লোক তেষ্টা মেটাতে এসেছে, এখানে ব্লাডশেড করলে সবাইকে তেষ্টা নিয়েই পালিয়ে যেতে হবে।

না, এখানেই। একটা খুন, মাত্র একটা!—শুভঙ্কর প্রায় কেঁদে ফেলে।

হোসেন গম্ভীর হয়ে বলে, কী দিয়ে করবি? ছোরা-টোরা আছে?

না তো!

তবে? বসে যা। ভালো করে খা, ফেজটা কেটে যাবে।

গেলও।

শুধু হোসেন নয়, আরও কয়েকজন বলেছে। যেমন কুমকুম নামে একটি মেয়ে একবার বলেছিল, আপনার যা চেহারা, ঠিক গুণ্ডার মতো।

নাকি?

সত্যি, আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি, আপনি টগরকে গলা টিপে মেরে ফেলেছেন।

সত্যি?

বিশ্বাস করুন। স্বপ্ন যদিও, কিন্তু স্বপ্ন তো লোকে এমনি-এমনি দ্যাখে না? কিছু একটু সত্যি থাকেই।

টগরকে খুন করার অবশ্য কোনও কারণ নেই। টগর শুভঙ্করদের বাড়ির পুরোনো চাকর। তার বয়স আশির ওপরে। সে চোখে ভালো দ্যাখে না। কানে শোনে না, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এ-বাড়িতে চাকরের কাজ করার পর সে ঝিম মেরে গেছে। ভুল বকে, ভুল করে, ভুল শোনে। এমনিই একদিন মরে-টরে যাবে। ভীমরতি খুব হয়েছে এখন। তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে শুভঙ্কর। বাড়ির সবাই বাসে। শুভঙ্করের মা তাকে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খাওয়ায়। তবু শুভঙ্কর ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখে। একটু ভয় হয়। নিজের দু-হাতের বুড়ো আঙুল নিয়ে চিন্তা করে, হাতের রেখা নিয়ে ভাবিত হয়। তার ভিতরে অবিশ্বস্ত খুনি কি সত্যিই লুকিয়ে আছে?

শুভঙ্কর সম্প্রতি একটা বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে। এ-গ্রেড কোম্পানির জুনিয়র অফিসার। প্রচুর টাকা কামায়। চাকরিটা অবশ্য ধরা-করা করে হয়েছিল। তার এক বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী জ্যাঠামশাই আছেন। আত্মীয় নন, ডাকের জ্যাঠামশাই। তিনি অনেককে চাকরি দিয়েছেন, শুভঙ্করকেও। শুভঙ্কর প্রচুর টাকা মাইনে পায়, কিছু করার নেই অত টাকা দিয়ে। সে ওড়ায়।

মাসের প্রথম দিকে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গিয়ে হাল্লা-চিল্লা আর খানা-দানা করে। মেয়েছেলেদের নাচ দেখে। একদিন একটা বড় রেস্তরাঁর বেয়ারা টিপস নিয়ে তাকে সেলাম দেয়নি। শুভঙ্কর এত রেগে গিয়েছিল যে বলার নয়।

সোজা উঠে গিয়ে সে বেয়ারাটার ঘাড় ধরে টেবিলের সামনে হিঁচড়ে নিয়ে এল, মাথার টুপি ফেলে দিল ঝাপড় মেরে। মাথাটা নুইয়ে ধরে প্রচণ্ড ঘুষি তুলেছিল। বন্ধুরা ধরে ফ্যালে।

সেই ঘটনার সাক্ষী সুদেব পরে নেশা কেটে গেলে ওই একই কথা বলে, তোর ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর ক্রুয়েলটি আছে।

সেই রেস্তরাঁর গোলমালটা অবশ্য অনেক দূর গড়ায়। সব বড় রেস্তরাঁতেই ভাড়া-করা কিছু মস্তান থাকে, মাতালদের সামলায়। শুভঙ্করের সেই কাণ্ডের পর তারা এসে তাকে দলবলসুদ্ধ প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

অপমানটা শুভঙ্কর ভোলেনি। বলে, কেন?

রেস্তরাঁর বেয়ারাটা আর-একটু হলে খুন হয়ে যেত।

যাঃ!

সত্যি। তোকে পুরো খুনির মতো দেখাচ্ছিল।

দুর!—শুভঙ্কর উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

সুদেব সিরিয়াসভাবে বলে, উড়িয়ে দিয়ো না বাপ, আর-একটু হলে খুনটা হয়েও যেতে পারত।

কীভাবে?—শুভঙ্কর অবাক হয়ে বলে, কী ভাবে হত? একটা ঘুষি খেয়ে লোকটা মরে যেত নাকি?

ঘুষি নয়, চাঁদু—তোমার হাতে খাওয়ার ছুরিটা ছিল যে।

ছিল?

আলবাত। সেটা নিয়েই তো তুই উঠে গেলি। লোকটাকে ধরে ছুরিসুদ্ধ হাত ওপরে তুলেছিলি মারবার জন্যে।

শুভঙ্কর শিউরে ওঠে। খুব বেঁচে গেছে সে। সে নিজের হাতের বুড়ো আঙুল দুটোর দিকে চেয়ে থাকে। আঙুল দুটোর মাথা মোটা, চওড়া—অন্য আঙুলগুলোর সঙ্গে সে-দুটোর অনেক পার্থক্য।

সানি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে লেক-এ বসেছিল শুভঙ্কর। সন্ধেবেলা। এই সময়টায় শুভঙ্করের অবসরপ্রাপ্ত বাবাও আরও কয়েকজন বুড়োমানুষের সঙ্গে লেক-এর ধার ধরে হাঁটাহাঁটি করেন। এখন হেমন্তকাল। তাই কিছু হিম পড়ে। বুড়োমানুষদের পক্ষে ঠান্ডাটা ভালো নয়। উপরন্তু লেক-এর গাছ-গাছালি থেকে বিশ্রামরত পাখিরা আচমকা গায়ে-মাথায় পুরীষ বর্ষণ করে। তাই শুভঙ্করের বাবা একটা ছাতা নিয়ে যান। সেইটে মাথায় ধরে হাঁটলে, ঠান্ডাও লাগে না, পাখিদের অবিমৃষ্যকারিতা থেকেও আত্মরক্ষা চলে।

সানিকে নিয়ে লেক-এ বসে প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা বলার সময়ে সে হঠাৎ বাবাকে দেখল। ছাতা মাথায় কয়েকজন বুড়োর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখে সতর্ক হওয়ার কিছু নেই। ছানি-কাটা চোখে এখন আর অতটা দৃষ্টিশক্তি নেই। তার ওপর শুভঙ্কর সানিকে নিয়ে একটু অন্ধকার ঘেঁষে বসেছে। বাবা বুঝতে পারবেন না।

শুভঙ্কর সানির কানে-কানে বলল, সানি, ওই তোমার হবু শ্বশুর যাচ্ছে।

কই, কোথায়?—বলে সানি কৌতূহল দেখায়।

এরকম অনেক মেয়েকেই বলে শুভঙ্কর। শেষ পর্যন্ত তার বাবা যে কার শ্বশুর হবেন সে-বিষয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা আছে।

ওই যে, ছাতা মাথায়।

অনেককে দেখছি—চার-পাঁচজন। ওরা সবাই কি শ্বশুরশিপের জন্যে অ্যাপ্লিক্যান্ট নাকি?

যাঃ!—লজ্জা পেয়ে শুভঙ্কর বলে, ওই যে রোগা মতো—সামনের জনের পরে যে যাচ্ছে।

তোমার বাবা?—সানি এই বলে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দেখবার চেষ্টা করে। ঠিক এসময়ে কতগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া ওপাশ থেকে বুড়োদের উদ্দেশ করে সুর করে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর...।

বুড়ো মানুষরা এই আওয়াজ শুনে দ্রুত হাঁটেন। একজন ম্লান স্বরে অন্যজনকে বলেন, নাতিরা কী বলছে শুনছেন?

অন্যজন, অর্থাৎ শুভঙ্করের বাবা, উত্তর দেন, ওরা বুঝবে কী? বয়েস হলে বুঝবে ছাতার কেন দরকার হয়।

কিন্তু অপমানটা সহ্য করতে পারেনি শুভঙ্কর। বিশেষত যখন সানি সঙ্গে রয়েছে এবং সবই শুনতে পাচ্ছে।

ছোঁড়াদের আওয়াজ শুনে সানি হেসে ফেলে কী বলছে শুনেছ? মা গো! পারেও দুষ্টু ছেলেরা বুড়োদের খেপাতে।

শুভঙ্কর সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারে যে, তার ভিতরে সত্যিই খুনি ইনস্টিংট আছে।

এই শালা!—বলে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল সে।

ডান হাতে ঘড়ি, বাঁ হাতে বালা, লম্বা, ঝাঁকড়া চুল মাথায়। তার চেহারাটা তখন সাংঘাতিক দেখাচ্ছিল। সে প্রায় ছেলেগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সব ছেলেই কিছু ষণ্ডাগুণ্ডা নয়। এই ছেলেগুলো ভিতু টাইপের ছিল। শুভঙ্করের চেঁচানি শুনে পালাল তারা।

বাবাকে অপমান! অ্যা, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা!

ছেলেগুলো দৌড়ঝাঁপ করে পালিয়ে গেল। সন্ধেবেলাটা খাট্টা হয়ে গেল একেবারে।

সানি পরে বলল, শুভ, তোমাকে বিয়ে করতে ভয় হয়।

কেন?

তুমি বড় হুট করে রেগে যাও যে!

এরকম অপমান দেখলে রাগব না? বাঃ!

সানি গম্ভীর হয়ে বলে, অত রাগবার মতো কিছু বলেনি তো ছেলেগুলো। রাস্তা-ঘাটে এর চেয়ে অনেক খারাপ আর অপমানকর কথাবার্তা আমাদের কানে আসে।

শুভঙ্কর কিন্তু লজ্জিত হয়েছিল, বলল, হুঁ।

ছেলেগুলো ভালো।—সানি বলে, অন্যরকম ছেলে হলে তোমাকে ছেড়ে দিত না। শুভ, যখন সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকে, তখন ওরকম বেহেড হতে নেই। মারপিট লাগলে আমি কী করতাম?

হুঁ!—শুভঙ্কর চিন্তান্বিত হয়ে বলে।

এটুকুতেই যদি এত রাগ হয়, তো সত্যিকারের তেমন কিছু হলে তো তুমি খুনও করতে পারো।

শুভঙ্করের বুকটা চমকে ওঠে। সেই যন্ত্রণা। হোসেন তাকে বলেই দিয়েছে, সে একদিন খুন করবে। কথাটা কি অমোঘ?

ঘটনাটা ঘটল এভাবে।

একটা মেঘলা ছুটির দিনে দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে শুভঙ্কর আর বন্ধুবান্ধবীরা ডায়মন্ডহারবারে পিকনিক করতে গেল। দুটো গাড়ির মধ্যে একটা হচ্ছে দামি শেভ্রলে, তার মালিক জয়ন্ত। জয়ন্তর সঙ্গে শুভঙ্করের খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক নয়। জয়ন্তকে শুভঙ্কর সহ্য করতে পারে না। ও বড়লোক, ভালো ছাত্র, ভালো স্পোর্টসম্যান, মেয়েরা জয়ন্তকে সামনে পেলে আর কারও দিকে তাকায় না। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু স্বাভাবিক জন্মগত গুণ জয়ন্তর আছে। তার স্বভাব চমৎকার। সবসময়ে হেসে কথা বলে, কথায় ভরা থাকে সহৃদয়তা, ক্ষমা, দয়া ও মমতা।

এ-ছেলেকে কি সহ্য করা শুভঙ্করের পক্ষে সম্ভব? তাই জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলার সময় সবসময়েই শুভঙ্করের কথাবার্তায় একটা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এসে যায়। যেমন, জয়ন্ত যখন গাড়িটা মনোযোগ দিয়ে চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে, তখন পিছন থেকে শুভঙ্কর বলল, জয়, তোর গাড়ির ইঞ্জিনে একটা শব্দ হচ্ছে কেন রে?

কীসের শব্দ?

গোলমেলে শব্দ।

আমি পাচ্ছি না।—জয়ন্ত বলে।

আমি পাচ্ছি।—শুভঙ্কর বলে।

মানময়ী নামে যে অসাধারণ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে জয়ন্তর প্রেম, সে সামনের সিটে ওর পাশে বসে ছিল। সে হঠাৎ একটু কৌতুকের চোখে সানগ্লাসটা খুলে পিছু ফিরে শুভঙ্করের দিকে চেয়ে বলে, আপনি কি গাড়ির এক্সপার্ট?

শুভঙ্করের ভয়ঙ্কর রাগ হল। না, সে গাড়ি চালাতেও জানে না। সে মাথা নাড়ল।

মানময়ী হেসে বলল, কোনও ভয় নেই, শুভঙ্করবাবু। গাড়ির কোনও ডিফেক্ট নেই। আমিও তো গাড়ি চালাই, তাই জানি।

পিকনিকের জায়গায় গিয়েও নানারকম ঝামেলা হচ্ছিল। যেমন, শুভঙ্কর ভালো সাঁতারু নয়, আর জয়ন্ত দুর্দান্ত সাঁতার দেয়। জলে নেমে জয়ন্তর সঙ্গে কমপিট করতে গিয়ে সে নাকানি-চোবানি খেল। অকারণেই প্রায় তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল।

মেয়েরা সঙ্গে আছে বলে মদের ব্যবস্থা ছিল না। এককেট সফট ড্রিংকস আনা হয়েছে।

শুভঙ্কর ঠাট্টা করে বলে, জয়ন্তটা মেয়েছেলে হয়ে গেছে। এই কোক কিংবা লেমনেড তো মেয়েদের ড্রিংকস।

আবার মানময়ী ঠাট্টা করে বলে, আপনি খুব মস্ত পুরুষ নাকি! ড্রিংক করলেই পুরুষ হয়?

না, না, তা বলিনি।

যান না, গাঁয়ের দিকে গেলে চোলাই পেয়ে যাবেন।

ঝগড়া নয়, কিন্তু সকলের সামনেই একটা অপমান।

জয়ন্ত দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। শুভঙ্কর গান জানে না। কিন্তু মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে জয়ন্তকে ঘিরে আছে। তার মধ্যে সানি বা কুমকুমও রয়েছে। শুভঙ্কর বুঝতে পারে, তার চেহারা বা গুণাবলী জোর মার খেয়ে যাচ্ছে জয়ন্তর কাছে। তাই সে একসময়ে দলছুট হয়ে গেল অভিমানে। এক-একা গঙ্গার ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে বেড়াতে লাগল। শীতের নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে নৌকোয়। একটা হালকা মেঘ দূরে ঘুড়ির মতো স্থির হয়ে আছে আকাশে। ওপারে বনরাজিনীলা। কিন্তু প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করে না। ভেতরে-ভেতরে একটা অসম্ভব ফাটো-ফাটো প্রতিশোধস্পৃহা।

যখন সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, পাতা শতরঞ্চিও তোলা হয়ে গেছে, তখনও জয়ন্ত আর তিনটে ছেলে ঘাসে বসে তাস খেলছিল। তাগাদা দিতেই তারা বলে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আর পাঁচমিনিট, এই ডিলটা শেষ হলেই—।

সকলেই বিরক্ত। সন্ধে হয়ে আসছে। প্রচণ্ড শীত। ওরা তার মধ্যে একটা ডিল শেষ করে আর-একটা শুরু করে দিল।

শুভঙ্করের রাগটা ছিলই। সে ধমক দিয়ে বলল, দু-মিনিটের মধ্যে না উঠলে সব হাঁটকে-মাটকে দেব।

খেলোয়াড়দের একজন বলে, তাই নাকি? দে না। জিওগ্রাফি পালটে যাবে। বারো টাকা হারছি, ইয়ার্কি নয়।

জয়ন্তও বলে, তোরা অন্য গাড়িটায় চলে যা। আমরা পরে যাব।

কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শুভঙ্কর মনে করল যে, এটা তাকে ইচ্ছাকৃত অপমান। আবছাভাবে তার নিজের কিলার ইনস্টিংটের কথা মনে হল। রাগে অন্ধ হয়ে গেল বোধ-বুদ্ধি।

সে লাফিয়ে পড়ে দুই লাথিতে ছিটকে দিল সকলের হাতের তাস। জড়ামড়ির মধ্যে একটা নির্ভুল লাথি কষাল জয়ন্তর পেটে। সবাই অবাক। তারপরই লাফিয়ে উঠে সবাই তাকে ধরতে চাইছিল।

শুভঙ্কর এক ঝটকা মেরে ছুটে গেল। মস্ত একটা ডেগের মধ্যে বঁটি, ছুরি, হাতা-খুন্তি সব ভরা হয়েছে—ডেগটা তোলা হয়েছে গাড়ির ক্যারিয়ারে। শুভঙ্কর গিয়ে সেটার ভেতর থেকে মাংসকাটা ছুরিটা টেনে নিয়ে এল।

সবাই বাধা দিচ্ছে, জয়ন্ত লাথি খেয়েও উঠে দাঁড়িয়েছে অবাক হয়ে। শুভঙ্কর সকলের হাত ছাড়িয়ে তার দিকেই ছুটে গেল।

কিছুই হয়নি।

হোসেনের কথাটা ফলেনি আজও।

কী করে ফলবে? ছুরি হাতে যখন ছুটে যাচ্ছিল শুভঙ্কর, তখনও নিশ্চিত সে জানত, আজই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটবে। যা কখনও ঘটেনি, কিন্তু ঘটার অপেক্ষায় আছে।

সে তাই নিশ্চিত সেই পরিণতির দিকে বইয়ে দিয়েছিল নিজেকে। দৌড়ে গিয়ে সে জয়ন্তর সামনে একটা হাত তুলে কী একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠেছিল।

জয়ন্ত তার ব্যথাতুর মুখখানায় সামান্য হাসি হেসে বলল, দুর শালা, ওভাবে লাথি মারতে আছে! খুব লেগেছে রে!

মানুষ এরকম নরম সহৃদয়ভাবে তার আক্রমণকারীর সঙ্গে কথা বললে মারা যায়?

সবাই শ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজে যখন রক্তপাত এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছে তখন জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে শুভঙ্করের কাঁধ ধরে বলল, আমাকে একটু ধরে-ধরে নিয়ে যা।

শুভঙ্কর হতভম্ব হয়ে বুঝল, সে পারেনি। জোর বেঁচে গেছে।

হোসেন বলে, খুব সাবধান, শুভ। তুই একদিন খুন করবি।

শুভঙ্কর বলে, যাঃ!

হোসেন বলে, করবিই।

শুভঙ্কর বড় ম্লান হয়ে যায়। আবার ভাবে, আমার মধ্যে যে-অচেনা লোকটা আছে, যে-খুনি, তাকে একবার পেলে হত।

শুভঙ্কর বলে, করব। শুভঙ্করকে।

ক্রাইম
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৫



চুরি

সমরজিৎ কর

এমন ঘটনাও যে কখনও ঘটতে পারে এ যেন ভাবা যায় না।
একেবারে কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

সেদিন কলকাতার আকাশে যেন সমুদ্রের বান ডেকেছিল। সকাল থেকে সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। সারা শহরের পথ যেন এক-একটি ঢল নামা নদীর মতো। পথে কোনও লোক ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে কেই-বা আর ঘরের বাইরে পা দিতে চায়, বলুন?

রাত নামার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল যেন কোন অচিন দেশ। একটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সর্বত্র।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সদাশিব বসু তাঁর পড়ার ঘরে বসে গভীর মনে পড়াশুনো করছিলেন। আর মাঝে-মাঝে তাঁর সামনে বিছানো একটি ম্যাপের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। দক্ষিণ মেরুর ম্যাপ। দিন-পনেরো আগে আন্তর্জাতিক যে-বিশেষজ্ঞ দলটি দক্ষিণ মেরু থেকে ফিরে এল, সদাশিবও ওই দলের একজন সদস্য ছিলেন। ওঁরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন দক্ষিণ মেরুর বায়ার্ড অঞ্চলের বরফের পাহাড়ের নীচে। অদ্ভুত সে-পাহাড়। প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। আর তার নীচে প্রায় একশো ফুট চওড়া একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে বয়ে চলেছে গরম জলের স্রোত।

সদাশিবের চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল প্রথম। তারপর সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন সবাই। আর অবাক হয়েছিলেন। এমন একটি পরিবেশে, যেখানে শুধু বরফ আর বরফ, শূন্যের একশো ডিগ্রি নীচে যে-বরফের তাপমাত্রা, সেখানেই এই গরম জলের উৎসটি কীভাবে এল, এ যেন কারও মাথার মধ্যেই ঢুকছিল না।

তাহলে এ-অঞ্চলের আশেপাশে, বরফের নীচে কি কোনও আগ্নেয়গিরি আছে, যে-আগ্নেয়গিরি এখনও জীবন্ত! যার গহ্বরের মধ্যে পুড়ে চলেছে লাভার স্তূপ আর সমুদ্রের জল! সেই জলই এইভাবে বেরিয়ে আসছে!

না, যথেষ্ট সন্ধান করেও বিশেষজ্ঞ দলটি সেখানকার আশেপাশে তেমন কোনও আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাননি।

বলতে কী, ব্যাপারটা সদাশিবের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে যেন গুলিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় ফেরার পর গত পনেরো দিন একনাগাড়ে এ-বিষয়টি নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি। বইপত্র, দক্ষিণ মেরুর ম্যাপ এবং

কাগজের ওপর আঁক কষা—এদের মধ্যেই ডুবে রয়েছেন।

রাত তখন এগারোটা।

আর-একবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল।

এমন সময় গোকুল এসে বলল, 'বাবু, কে এক উটকো সাহেব এয়েছেন। বলছেন, খুব জরুরি কাজ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'এত রাতে সাহেব?' কতকটা আত্মগতভাবেই যেন কথা বললেন সদাশিব। আচমকা এমন সময়ে এমন একটি খবর শুনে কে না বিরক্ত হয়, বলুন?

বললেন, 'এত রাতে সাহেব? বললি না কেন, আমি এখন ব্যস্ত। এত রাতে কারও সঙ্গে দেখা করি না?'

গোকুল ভয়ে-ভয়ে বলল, 'বলেছি তো। উনি শুনতে চান না। তেনার সঙ্গে আর-একজন সাহেব এয়েছেন। নাম জিগ্যেস করলাম। বললেন না।'

কী আর করা। এত রাতে দুজন যখন দেখা করতে এসেছেন, না দেখা করে উপায় বা কী?

সদাশিববাবু বললেন, 'যা, নিয়ে আয়।' খানিকটা বিরক্তই হলেন যেন। কিন্তু তখনও কি তিনি জানতেন, কী দারুণ কাণ্ড ঘটতে পারে এরপর?

একটু পরেই গোকুলের কথা শোনা গেল, 'এই যে, ইদিকে আসুন আপনারা। বাবু পড়ার ঘরে রয়েছেন।'

আর তারপর পড়ার ঘরে যাঁরা ঢুকলেন, তাঁদের দেখে সদাশিববাবু তো রীতিমতো থ।

'কী ব্যাপার? ডক্টর মেনন, ডক্টর সুখারিয়া, আপনারা হঠাৎ এমন সময়? বোম্বাই থেকে কখন এলেন আপনারা? কাল বিকেলেই তো ট্রম্বেতে বসে কথা বললাম আপনাদের সঙ্গে! কলকাতায় আসবেন, কই, তখন তো বলেননি? বসুন, বসুন।'

ওঁদের দেখে যেন লাফিয়ে উঠলেন সদাশিববাবু।

কিন্তু ওঁরা নির্বাক। সারা মুখে থমথমে ভাব। সদাশিববাবুর কথায় পুতুলের মতো চেয়ার টেনে বসলেন শুধু। বলতে কী, তখনও ওঁরা হাঁপাচ্ছেন।

ওঁদের অবস্থা দেখে সদাশিববাবুও প্রথমে খানিকটা ভড়কে গেলেন। তবে চিরদিনই তিনি শক্ত মানুষ। নানান ঝক্কি মাথায় করে কাজ করা তাঁর অভ্যেস। তাঁর এই পঞ্চাশ বছর বয়েসের মধ্যে বিপদেও পড়েছেন কয়েকবার। তাই পরিস্থিতি সামলে নিতে তাঁর কয়েক সেকেন্ড লাগল।

তবু ডক্টর মেনন এবং ডক্টর সুখারিয়ার মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। নইলে তাঁরা অমন পুতুলের মতো বসে পড়বেন কেন? কারণ, মেনন এবং সুখারিয়ার মতো তরুণ এবং বেপরোয়া বিজ্ঞানী খুব কমই দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কী, গত তিন বছর ধরে আরব সাগরের নীচে নেমে যেসব ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর গবেষণা তাঁরা করেছেন, সে যেন ভাবা যায় না। গতকাল ট্রম্বেতে তা নিয়ে কত কথা হল। বিশেষ করে সমুদ্রের নীচে থেকে তেল আবিষ্কার করতে গিয়ে মেনন তো একবার ডুবেই মরছিলেন আর কী।

আবহাওয়াটা একটু হালকা করার জন্যই বুঝি সদাশিববাবু বললেন, 'কী খাবেন বলুন, চা না কফি?'

মেনন বললেন, 'ওসব এখন থাক, ডক্টর বাসু। আজ দুপুরে একটি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। আমাদের হাতে সময় কম। দয়া করে এই কাগজটা একটু দেখুন।'

বলেই মেনন ছোট্ট একটুকরো কাগজ সদাশিববাবুর সামনে মেলে ধরলেন।

একটি ম্যাপ। ম্যাপের একপাশে আঁকা কাম্বে উপসাগর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূল। আর-একপাশে আরব সাগরের কিছু অংশ। আরব সাগরের মাঝে ছোটখাটো কয়েকটা দ্বীপ। আর কচ্ছ থেকে পশ্চিমে প্রায় একশো মাইল দূরে কয়েকটি কালো ফুটকি।

সদাশিববাবু সেই ফুটকিগুলির ওপর চোখ বোলাতে গিয়েই এক জায়গায় এসে যেন চমকে উঠলেন।

'কেমন হল? কাল যখন এই ম্যাপটি আমায় দেখিয়েছিলেন, তখন তিনটি ফুটকির ওপর সাদা কালি দিয়ে ঢ্যারা কেটে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তো দেখছি আরও একটি ফুটকির ওপর ঢ্যারা কাটা হয়েছে। এর মানে?'

'মানে? মানে পরিষ্কার। আরও একটি কুয়ো শুকিয়ে গেল।' বললেন মেনন।

'এ যে রীতিমতো ভুতুড়ে কাণ্ড দেখছি! এত কষ্ট করে, এত টাকা খরচ করে আরব সাগরের নীচে আমরা নলকূপ বসালাম তেল পাব বলে। এর মধ্যে তিনটে কুয়োর কাজ পণ্ড হল। এখন দেখছি আবার একটা খতম। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মশায়।'

ডক্টর সুখারিয়া এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। সদাশিববাবুর কথা শুনে এবার তিনি যেন ফেটে পড়লেন, 'বুঝতে কি আমরাই পারছি? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, এবার সবাই আমরা ডুবব। আমাদের মান-সম্মান তো গেলই, সেইসঙ্গে কয়েকশো কোটি টাকা একবারে বরবাদ।'

বোঝা গেল, সুখারিয়া এসব দেখে রীতিমতো বসে পড়েছেন যেন।

বসে পড়ারই কথা। নিজের পরিকল্পনামতো তিনিই তো ওই গভীর নলকূপগুলি সমুদ্রের নীচে বসিয়েছিলেন। তখন কত আশাই না করেছিলেন তিনি! দেশে এখন আকাল চলছে। খরচ করতে-করতে কয়লা কমে যাচ্ছে। পেট্রল নেই। যেটুকু আছে, তাতে কতদিন আর চলবে! বিদেশ থেকে চড়া দামে তেল কেনা যেন এক সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্য ভালো। আরব সাগরের নীচে মাটির গভীরে পাওয়া গেল প্রচুর তেলের সন্ধান। সবাই ভেবেছিল, যাক, এ-যাত্রা তাহলে বাঁচা গেল। কয়েকটা কুয়োও খুঁড়লেন বিজ্ঞানীরা। সেই সব কুয়ো থেকে তেল তোলা হতে লাগল। চলছিল মন্দ না। কিন্তু তারপর কী যে হল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল গবগব করে তেল বের হতে-হতে একটা কুয়ো চুপ মেরে গেল। তা থেকে কোনও তেলই আর বেরোল না। সবাই ভাবলেন, হয়তো সেখানকার তেল সব তোলা হয়ে গেছে। কিন্তু না! প্রথমে একটা, পরে আরও দুটো। এবার আরও একটা। পরপর চারটে কুয়ো একেবারে বন্ধ। ক্ষতি কম হল এতে?

এসব কথা ভাবতে গিয়েই তো সুখারিয়ার মাথা প্রায় খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা।

সদাশিব চিরদিনই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ডক্টর সুখারিয়ার কথা শুনে তিনি যে মোটেই বিচলিত হননি, বোঝা গেল। আসলে ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তিনি বুঝতে পারছেন না।

ডক্টর মেনন বললেন, 'আপনি একজন বিচক্ষণ মানুষ। আমাদের মনে হয়েছে, এ-ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন, ডক্টর বাসু।'

সদাশিব বললেন, 'কী বলতে চান আপনি?'

মেনন আর-একটুকরো কাগজ সদাশিবের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কাগজটার ওপর কয়েক সেকেন্ড চোখ বুলিয়ে সদাশিব বললেন, 'এ তো দেখছি একটা ভূমিকম্পের চার্ট। গত কয়েক মাসে কতবার ভূমিকম্প হয়েছে সেসব কথাই তো লেখা আছে এর ওপর?'

'ঠিক। আপনি ঠিকই দেখেছেন, ডক্টর বাসু। এবার একটু ভালো করে লক্ষ করুন। শেষবারে যে-ভূমিকম্প হয়েছে তার তারিখটা একবার ভালো করে দেখুন তো!' মেনন কথা বললেন।

সদাশিব কাগজটিকে আর-একবার ভালো করে দেখে বললেন, 'এ তো আজকের তারিখ দেখছি!'

'আপনি ঠিকই দেখেছেন। আজ, ঠিক বিকেল তিনটে তখন। আমাদের যন্ত্রে ওই কম্পন ধরা পড়ল। আর কী বলব আপনাকে, তার মিনিট-পনেরো পরেই এল সেই দুঃসংবাদ। ঠিক সোয়া তিনটের সময় আমরা খবর পেয়েছি, ওই যে ফুটকিটির ওপর ঢ্যারা দেখে আপনি চমকে উঠেছেন—মানে আরও একটি কুয়ো—সেটা থেকে নাকি তেল ওঠা বন্ধ হয়েছে।'

'ভূমিকম্প! তারপর তেল ওঠা বন্ধ! কীসব বলছেন আপনি, ডক্টর মেনন?'

'এখন আপনাকে নতুন কিছুই বলব না, ডক্টর বাসু। আমাদের ধারণা, কেউ একটা গোলমাল করছে। হয়তো আমাদেরই ভুল সেটা। দয়া করে এই চিঠিটা পড়ুন।' বলেই মেনন আর-একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলেন সদাশিবের দিকে।

এবার সদাশিববাবুরই তালগোল পাকানোর মতো অবস্থা। চিঠির ওপর একপলক চোখ বুলিয়েই তিনি দারুণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তাহলে গোলমালটা বুঝলেন তো?' কথা বললেন সুখারিয়া।

'আমাকে কখন যেতে হবে?' সদাশিব কথা বললেন যেন একমাসের দুর্বল রোগীর মতো।

'এখনই।' বললেন মেনন, 'মেজর ইয়াসিন গাড়ি নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'চলুন।'

মাত্র পাঁচ মিনিট। হুট করে যখন-তখন বিদেশে যাওয়াটা সদাশিববাবুর কাছে জল-ভাত। ভৃত্য গোকুলও তা জানে।

সদাশিবের সংসারে গোকুল ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বিয়েও করেননি। বলতে গেলে গোকুলই তাঁর কর্তা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। গোকুল একটি ছোট্ট ব্যাগে টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল। এ-সময়ে সদাশিব কথা বলেন কম। তবে আজ যেন পুরোপুরি তিনি বোবা হয়ে গেছেন।

এরপর দমদম বিমানবন্দর। ছোট্ট একটা মিলিটারি জেট প্লেন সেখানে অপেক্ষা করছিল। মেজর ইয়াসিনের সঙ্গে পুতুলের মতো গিয়ে উঠলেন প্লেনে—সদাশিব প্রথমে। পরে সুখারিয়া এবং মেনন। প্লেন ছাড়ল ঠিক রাত বারোটায়।

প্লেন ছাড়ার পর ইয়াসিন বললেন, 'আপনাকে এখনও বলা হয়নি, ডক্টর বাসু। আমরা এখন পাঞ্জিম চলেছি। রাত দুটো নাগাদ পৌঁছব সেখানে।'

এ-পর্যন্ত কারও পেটে কিছু পড়েনি। একজন সেবক এসে সবাইকে খাবার দিয়ে গেল।

খাওয়ার পর মেননের দেওয়া কাগজগুলি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সদাশিব। মাঝে-মাঝে কীসব আঁক কষতে লাগলেন। সেইসঙ্গে মেননের দেওয়া ম্যাপটির ওপর চলল নানা ধরনের ছক আঁকার কাজ। সুখারিয়া, মেনন এবং মেজর ইয়াসিন চুপ করে বসে দেখতে লাগলেন শুধু।

হ্যাঁ, ঠিক রাত দুটোয় প্লেন এসে নামল পাঞ্জিমের বিমানবন্দরে। আর তারপরই শুরু হয়ে গেল রীতিমতো তোড়জোড়।

বিমানবন্দরে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন কমোডোর সারথি। অভ্যর্থনা কী বলব? 'কেমন আছেন?' বলতে হয়, তাই বললেন। মুখখানি তাঁরও যেন ফ্যাকাসে মেরে গেছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

'আসুন আমার সঙ্গে।' বলেই কমোডোর সারথি হনহন করে একটি ঢাকা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ি ছুটল জাহাজঘাটের দিকে।

তারপর জাহাজঘাট থেকে মোটরলঞ্চে মাঝদরিয়ায় দাঁড় করানো জাহাজ ঈগলে।

না। এতটুকু অবসর নেই। এরপর শুরু হল দারুণ ব্যস্ততা।

সদাশিব শুধু একবার বললেন, 'এ যে দেখছি একেবারে যুদ্ধ করার মতো অবস্থা?'

'দরকার হলে আমাদের তা-ও করতে হবে, ডক্টর বাসু।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কমোডোর সারথি।

আর সত্যিই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এরপর!

মাথার ওপর তারা ছড়ানো আকাশ। নীচে অন্ধকার পিচের মতো সমুদ্র। আরব সাগরের বুক চিরে ঈগল রওনা হল সোজা উত্তর-পশ্চিম বরাবর। পশ্চিম থেকে জাহাজে উঠল আরও প্রায় পঞ্চাশজন লোক। কয়েকজন ডুবুরি।

ডক্টর মেননকে একপাশে ডেকে জিগ্যেস করলেন সদাশিববাবু, 'কোথায় যাচ্ছি তাহলে আমরা?'

ডক্টর মেনন বললেন, 'দাঁড়ান, একটু পরেই আপনাকে সব বলব, ডক্টর বাসু। এ-জাহাজেরও কান আছে, একটু বেফাঁস হলেই সব পণ্ড। তার আগে ডেভিডের সঙ্গে আপনার একবার কথা বলা দরকার।'

'ডেভিড? সে আবার কে?' সদাশিব এবার অবাক হলেন।

'একজন নাবিক।' আস্তে করে কথা বললেন ডক্টর মেনন।

কিছুক্ষণ পর ছোট একটি কেবিনে এসে বসলেন মেনন, সুখারিয়া, কমোডোর সারথি এবং আর-একজন।

মেনন পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এই হল ডেভিড, গোয়ায় বাড়ি।'

চমকে উঠলেন সদাশিব। এ কি মানুষ, না দানব? বয়েস কত হবে? বছর চল্লিশ? যেন একটা পাহাড়। তবে চোখ-মুখ দেখে মনে হল, এ-পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ই বয়ে গেছে।

মেনন বললেন, 'বলো ডেভিড, ঠিক কী ঘটেছিল গতকাল, পরিষ্কার করে বলো দিকিনি।'

ডেভিড সঙ্গে-সঙ্গে কলের পুতুলের মতো কথা বলতে লাগল, 'কী বলব, স্যার! দুঃখ, আমি একা বেঁচে আছি।' বলেই অতবড় পাহাড়-মানুষটি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

মেনন তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'একটু শান্ত হও, ডেভিডভাই, ডক্টর বাসু এসেছেন। তাঁকে পরিষ্কার করে বলো সব। কী করে কাজ করব আমরা?'

'বলছি, হুজুর। তবে শুনুন।' ডেভিড বলতে লাগল, 'কী বলব আপনাদের, স্যার। মাছ। শুধু মাছ। আমি হলুম গিয়ে মাঝির ছেলে। আমার বাপ-ঠাকুদ্দা সবাই মাঝি। বলতে পারেন, ডাঙার থেকে সারা জীবনটা জলেই কাটিয়ে দিলাম বেশি। কিন্তু একসঙ্গে অত মাছ জীবনে কখনও দেখিনি। গতকাল, তা ধরুন, কত আর বেলা হবে তখন? এগারোটা। আমাদের মাছ ধরার খুদে জাহাজটা সেই মাছের ঝাঁক ঘিরে ধরল। হ্যাঁ, ওখানটায়।'

বলেই ডেভিড টেবিলের ওপর বিছানো ম্যাপটির ওপর হাত রাখল এক জায়গায়।

সদাশিববাবু জায়গাটি দেখে নিলেন।

'দেখলেন তো, সাহেব? এইখানে রাজ্যের স্যামন, শার্ক, কতরকমের মাছের তখন জটলা। ফুর্তিতে আমাদের কী লাফানি। ভাবলাম, এবার ব্যবসাটা জমবে ভালো। অত মাছ বোম্বাই নিয়ে যাওয়ার পর টাকার ফোয়ারা ঝরবে। এইখানটায়—আমাদের সাধের জাহাজের ক্যাপ্টেন হল গিয়ে আমার বাবা, তার কথামতো মাল্লারা জাল ফেলতে লাগল। আর সেই জাল বয়ে নিয়ে আমরা তিন ভাই—আমি, জোসেফ আর বব—লোকলস্কর নিয়ে বিরাট সেই মাছের ঝাঁকটি ঘিরে ফেললাম। এসব করতে প্রায় ঘণ্টা-দুই লেগেছিল বোধহয়। তারপর ঠিক জালে টান দিয়েছি, অমনি বিশ্বাস করুন, স্যার, বাপের বয়েসে আরব সাগরে অতবড় ঢেউ আর কখনও দেখিনি। হ্যাঁ, সবকিছু নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। মনে হল, বাপের জাহাজটা কে যেন আকাশপানে ছুড়ে দিয়েছে। আর আমরা তিন ভাই মাল্লাদের নিয়ে তিনটে লঞ্চসমেত ছিটকে ছড়িয়ে পড়লাম। না, তখন কোনও কিছু দেখব কি, নিজের প্রাণ বাঁচাই আগে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল জানি না। শুধু এটুকু মনে পড়ে, জাহাজটা টুপ করে সবাইকে নিয়ে দরিয়ার জলে ডুবে গেল। ভাইদেরও আশপাশে আর দেখতে পেলাম না। আর আমি? আমার লঞ্চের মাস্তুল বুকে জড়িয়ে আরবের জলে আমি ভাসছি।'

কমোডোর বললেন, 'আর বেশি কথা নয়। এখন তুমি বিশ্রাম করো, ডেভিড।'

ডেভিডকে নিয়ে একজন নাবিক পাশের কেবিনে চলে গেল।

সুখারিয়া বললেন, 'লোকটার মাথা খারাপই হয়ে গেল। বিরাট বড়লোকের ছেলে। কিন্তু কী হাল হয়েছে, দেখুন।'

কমোডোর বললেন, 'লোকটার ভাগ্য ভালো। ওই সময় একটি হেলিকপ্টার নিয়ে সমুদ্রের ওই অঞ্চলে টহল দিতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন ভাসছে সাগরের জলে। অমনি হেলিকপ্টারকে নীচে নামিয়ে দেখলাম ডেভিড। ওকে উদ্ধার করে আমরা আমাদের এক গুপ্ত ঘাঁটিতে নিয়ে আসি। তবে হ্যাঁ, শক্ত বটে লোকটা। আধঘণ্টার মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরল। আর ওর মুখেই ঘটনাটা শুনে আমরা চমকে

উঠলাম।...সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা বাঙ্গালোরে জানিয়ে দিলাম। জানি না কেন, তার আধঘণ্টা পর পশ্চিম থেকে আমাদের বড়কর্তা জানালেন : ডেভিডকে নিয়ে একটি জেটে করে এখনই চলে আসুন। একটা মারাত্মক রকমের কিছু ঘটেছে বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ডেভিডকে নিয়ে পশ্চিমে চলে এলাম।'

সদাশিব বসুর এবার তালগোল পাকানোর মতো অবস্থা। এতক্ষণ ধরে কী যে আবোল-তাবোল ঘটছে, তিনি বুঝতে পারছেন যেন।

মেনন বললেন, 'এর পরের খবর আপনার বাড়িতে যে-চিঠিটি পড়তে দিয়েছিলাম তার মধ্যেই ছিল সব, তাই না, ডক্টর বাসু?'

সদাশিব ঘাড় নাড়লেন। তাঁর মনে পড়ল, চিঠিতে বলা হয়েছে, আরব সাগরে একটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটেছে। এখনই আপনার সাহায্য চাই। চিঠি লিখেছেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের একেবারে খোদ কর্তা। কিন্তু তাতে করে একবারও কি তাঁর মনে হয়েছিল, কী দারুণ ঝক্কি মাথায় নিয়ে তিনি মেনন আর সুখারিয়ার সঙ্গে এতটা পথ চলে এসেছেন?

একটু থেমে সদাশিববাবু বললেন, 'আপনি যে-ম্যাপটি দেখিয়েছেন, ডক্টর মেনন, আর তার সঙ্গে কতকগুলি সংকেত, সেসব দেখে খানিকটা গোলমালে পড়েছি, বলতে পারেন। বিশেষ করে, এখনও কিন্তু আপনি আমাকে কিছু বলেননি, কী করতে হবে আমাকে।'

'এক্ষুনি বলছি, ডক্টর বাসু।'

বলেই ডক্টর মেনন একটি সাদা কাগজের ওপর ছক টানলেন কয়েকটা : 'শুনুন তাহলে। আরব সাগরের নাড়ি-নক্ষত্র আপনার জানা। বাকি কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আর তিন ঘণ্টা পর থেকেই অনেক কিছু আমরা জানতে পারব। আমরা আজ ম্যাপের ওই চার নম্বর ঢ্যারা কাটা ফুটকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনি শুধু ওই জায়গাটার নীচে সাগরের স্রোতটি কখন কোন দিকে চলছে এবং কীভাবে তাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি—এসব জানিয়ে আমাদের একটু সাহায্য করবেন।'

মেমনের কথা শুনে সদাশিববাবুর চোখ তো একেবারে ছানাবড়া। তিনি আঁতকে উঠে বললেন, 'বলেন কী, মশায়? ওখানে যে একটি ডুবোপাহাড় আছে। আর ওই পাহাড়ের তিন মাইলের মধ্যে যাওয়ার কথা মানে তো প্রাণ নিয়ে খেলা!'

'জানি, আমাদের নৌ-বিভাগের দুখানি সাবমেরিন এরই মধ্যে খতম হয়ে গেছে। আপনারা আসার কিছুক্ষণ আগে আমরা খবর পেয়েছি।' বললেন কমোডোর সারথি।

'ঠিক কথা, এটাই হওয়া উচিত। কারণ, ডুবো ওই পাহাড়ের চারপাশে বনবন করে ঘুরছে একটা বিরাট ঘূর্ণি। তাকে ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকা তো রীতিমতো শক্ত কাজ।' বললেন সদাশিববাবু।

'কিন্তু এতবড় একটা ঝক্কি নেওয়ার মানে কী, বলুন তো?'

'আপনি তিন ঘণ্টা শুধু অপেক্ষা করুন, স্যার। ব্যাপারটা আর-একটু পরিষ্কার হোক আমাদের কাছে, তখন বলব।'

সারারাত কারও ঘুম হয়নি। ধকল গেছে অনেক। কমোডোর সৈনিক মানুষ। এসবে তাঁর অভ্যাস আছে। কিন্তু ওই ভদ্রলোকদের তো একটু বিশ্রাম দরকার। তাই বললেন, 'এখন রাত প্রায় চারটে। আপনারা বিশ্রাম করে নিন কিছুক্ষণ। পরে কথা হবে।'

চার ঘণ্টা নয়। প্রায় আট ঘণ্টা পর আসল খবর এল ঈগল-এর রেডিও-যন্ত্রে। একে-একে খবর এল এইরকম : চার নম্বর দ্বীপের ডগাটি এবার স্পষ্ট দেখা গেছে। রেডারে ধরা পড়ছে, ওই দ্বীপের ডগা কে যেন উড়িয়ে দিয়েছে। আর তার আশপাশে যেসব বেগুনি রঙের আলোর ঝাঁকের কথা ডুবে-যাওয়া সাবমেরিন থেকে জানানো হয়েছিল, তারা ওই ডগার ওপর ভিড় করেছে। এখন মনে হচ্ছে অনেক আলো। আর শুধু বেগুনি নয়। লাল, হলুদ, এমনকী সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলোও দেখা যাচ্ছে।

এসব খবর শুনে মেনন এবং সুখারিয়া লাফিয়ে উঠলেন। মেনন বললেন, 'তাহলে বুঝুন, কমোডোর? কাল সন্ধেয় বাঙ্গালোরে বসে যখন ওইসব আলোর কথা শুনলাম, আমি অবাক হয়েছিলাম, মশায়। প্রাণিবিজ্ঞানী কবীর বলেছিলেন, ওরা নাকি এক ধরনের মাছের ঝাঁক! অমন আলো ওদের শরীর থেকে বেরোয়। সাধারণত ঘূর্ণির আবরণে ঢাকা ওই ধরনের জায়গায় ওরা নাকি ভিড় করে ডিম পাড়ার সময়। কথাটা শুনে তখন আমার যেন খটকা লেগেছিল।'

সুখারিয়া এবার কথা বললেন, 'আলো-ফালো আমি বুঝি না, মশায়। দুটি জিনিস আমি দেখতে চাই। আমি জানি, আমি দেখতে পাব। আমার মনে হয়, এর আগেও ওই ধরনের ভূমিকম্প ঘটেছে তিনবার। তবে এবারকার এই জাহাজডুবির মতো কেলেঙ্কারি না ঘটায় কারও চোখে তেমন পড়েনি। তা ছাড়া, এবারকার কাঁপুনিটাও যেন জোরে হয়েছিল। আগের তিনটি কম্পনের পর যখন আমাদের তিনটি তেলের কুয়ো শুকিয়ে গেল, ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ করার জন্যে আমি দলবল নিয়ে সমুদ্রের নীচে নেমেছিলাম। গিয়ে কেমন সন্দেহ হল আমার। আমরা কি তাহলে ভুল করেছি? তিনটি কুয়োর নল যেখানে সাগরের নীচে মাটির কাছে গিয়ে মিশেছে সেখানে মাটির বুকে সরু একফালি করে ফাটল। মনে হল, চিড় ধরেছে সেখানে। আর সেসব চিড় সোজা চলে গেছে পশ্চিম দিক বরাবর। তা মাইল-পঞ্চাশ তো হবেই! আমরা আর এগোতে পারিনি। কারণ এক-একটা চিড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই দেখলাম ছোট-ছোট দু-তিনটি ডুবোপাহাড়। আর সেই পাহাড় ঘিরে বনবন করে ঘুরছে বড়-বড় এক-একটি ঘূর্ণি। মশায়, কার সাধ্য তার মধ্যে ঢোকে।'

অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী সদাশিববাবু সারা জীবন সমুদ্র নিয়েই গবেষণা করেছেন। বলতে কী, এ-তল্লাটের সাগরের নীচের গলিঘুঁজি তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু এমন ধরনের ঘটনা আগে তো কখনও শোনেননি।

সুখারিয়াকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'ডক্টর সুখারিয়া, তাহলে বলুন, চার নম্বর কুয়োর কাছেও এবার একটি চিড় দেখা যাবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়, ডক্টর বাসু।' সুখারিয়ার চটপট উত্তর।

'তাহলে এ-কথাও বলবেন, সেই চিড় ওই আলোওয়ালা ডুবোপাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে?'

'তাই তো মনে হয় আমার।'

'আলোর রহস্য তাহলে কী হবে?'

এবার জবাব দিলেন ডক্টর মেনন, 'ওরা মাছ নয়। তবে একটা জিনিস হতে পারে। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, আরব সাগরের নীচে কোনও আগ্নেয়গিরি নেই। এবার এতসব দেখে মনে হচ্ছে, আছে। সূর্যের মতো ওই আলো জ্বলন্ত লাভা নয় তো? কিংবা কিছু-কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যাদের গা থেকে আলো বের হয়, যাকে আমরা বলি প্রতিপ্রভা। হয়তো তেমন সব পদার্থ ঘূর্ণির টানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সেইসঙ্গে দিচ্ছে নানারকম রঙের আলো?'

মিলিটারি মানুষ কমোডোর সারথি এতক্ষণ চুপ করে বসে বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব শুনছিলেন। কিন্তু এবার যেন তাঁরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

'থামুন তো মশায়, আপনারা। জানি আপনারা বিজ্ঞানী। আপনাদের বুদ্ধি অনেক। তার তোড়ে যে আমার মাথা গুলিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা!'

বলেই কমোডোর একটা ছোট্ট কাগজ মেলে ধরলেন টেবিলের ওপর। কাগজের ওপর কয়েকটি ছক।

মেননের কথা শুনে সদাশিব খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। লোকটা বলে কী! পাগল না মাথা খারাপ! আরব সাগরের নীচে আগ্নেয়গিরি আসবে কী করে! তারপর সেই আলোর চটকদার গল্প! এ-ও হয় নাকি? ডুবোজাহাজে চড়ে কতবার তিনি আরব সাগরের গভীরে গিয়ে ডুব দিয়েছেন। এমন কিছু কখনও তো তাঁর চোখে পড়েনি?

আর সেই ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটতে-না-কাটতেই যেন বোমা ফাটালেন কমোডোর সারথি।

কী বলতে চান তিনি?

'হ্যাঁ, এই তো। ভালো করে দেখুন একবার।' সারথি বলতে লাগলেন, 'স্যার, গতকালের ঘটনার পর সমুদ্রের গভীরে গিয়ে বেতার তরঙ্গ ছুড়ে জায়গাটার হদিশ করেছেন আমার নৌ-বিভাগের অফিসাররা। ওঁরা জানিয়েছেন, যে-সমস্ত বেতার সংকেত ওই ভেঙে পড়া দ্বীপটির দিকে পাঠানো হচ্ছে—তাদের অনেকেই আর ফিরে আসছে না। যা আসছে, তাদের সবটুকু এলোপাথাড়ি অবস্থায় আসছে। এতে সন্দেহ হচ্ছে, কারা যেন সেখানে শক্তিশালী বেতার-যন্ত্র নিয়ে বসে আছে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের সংকেত নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'বলেন কী, কমোডোর?' আঁতকে উঠলেন সুখারিয়া : 'তাহলে কি—?'

সুখরিয়ার কথা শেষ না হতেই নতুন খবর এল আবার। নতুন যে-দলটি দ্বীপটির কাছে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল, এইমাত্র তারা খবর পাঠাল—অদ্ভুত কতকগুলি প্রাণীর মতো কী যেন সেই দ্বীপের চারপাশের ঘূর্ণি ভেদ করে কোথায় চলে গেল। অনুসন্ধানকারীরা ধাওয়া করেছিল ওদের ধরার জন্য। কিন্তু ধরতে পারেনি। এবং আরও একটা খবর : সেই আলোগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। তবে টর্পেডোর সাহায্যে একটি প্রাণীকে ঘায়েল করা গেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রীতিমতো তোড়জোড়।

কমোডোর সারথি বললেন, 'তাহলে আর দেরি করা নয়। চলুন, এখুনি আমরা রওনা হই।'

যুদ্ধজাহাজ ঈগলের ওপর জেট প্লেন প্রস্তুত ছিল। তাতে গিয়ে উঠলেন সদাশিব, সুখারিয়া, মেনন এবং কমোডোর। আর চার নম্বর সেই ফুটকির কাছে পৌঁছলেন তাঁরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

কমোডোর বললেন, 'ভয় পাবেন না আপনারা। আমরা প্যারাশ্যুটে সমুদ্রে নামব। সেখানে একটি ডুবোজাহাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

বিশেষ ধরনের প্যারাশ্যুটে ওঁরা সমুদ্রে নামলেন। কাছেই ভাসছিল ডুবোজাহাজ। ওঁরা গিয়ে তাতে উঠলেন।

সমস্ত কিছুই এরপর চলতে লাগল দ্রুত লয়ে।

ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেন রামন বললেন, 'অবাক কাণ্ড। কী সাংঘাতিক সেই প্রাণী আর কী জোরেই না তারা ছুটে পালাল! অমন প্রাণী আমরা কখনও দেখিনি। তবে একটিকে ঘায়েল করেছি আমরা। হয়তো তার দেহ ডুবোপাহাড়ের কাছেই পাওয়া যাবে।'

ডুবোজাহাজে করে তাঁরা ছুটলেন সেই দ্বীপের কাছে।

কিন্তু কোথায় ঘূর্ণি? সাধারণ সমুদ্রের স্রোত ছাড়া আর কিছুই তো চোখে পড়ল না!

ডুবোজাহাজের উজ্জ্বল আলো ফেলে তাঁরা তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন জায়গাটা। হ্যাঁ। ওই তো পাহাড়! পাহাড়ের ওপরটা ন্যাড়া কেন? মনে হল, কে যেন তার ডগাটা খাবলে তুলে নিয়েছে। আরে, আরে! এ কী! বড়-বড় লোহার চাঁই এল কোত্থেকে এখানে?

এমন সময় চিৎকার করে উঠলেন রামন, 'ওই তো সেই প্রাণী!'

সঙ্গে-সঙ্গে ডুবোজাহাজ নিয়ে ছুটে গেলেন তাঁরা সেই প্রাণীটির কাছে।

'প্রাণীর মতোই বটে!' বললেন সদাশিববাবু।

'দেখুন, দেখুন! এখানকার মাটির ওপর কেমন একটা চিড় বলে মনে হচ্ছে না?' এবার সুখারিয়ার কণ্ঠে চিৎকার।

'তাই তো!'

মেনন বললেন, 'প্রাণীটিকে শেকল দিয়ে বেঁধে নিন। তারপর চলুন পাহাড়টার ডগায়।'

তাঁর কথামতো প্রাণীটিকে বেঁধে নেওয়া হল। কিন্তু পাহাড়ের ডগায় এসে সবাই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

কী ব্যাপার! এতবড় গর্ত এর ভেতরে! আর সেই পাহাড়ের গোড়ার চিড়-ধরা অংশটা গর্তের মধ্যে এসে মিশেছে কেন?

এবার ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

সদাশিববাবু খানিকটা চুপ মেরে থেকে বললেন, 'ডুবোজাহাজটাকে একবার চিড়ের কাছে নিয়ে চলুন তো।'

তাই করা হল।

এবার ডুবুরির পোশাক পরে নিয়ে মেনন এবং সুখারিয়াকে নিয়ে ডুবোজাহাজের বাইরে গিয়ে চিড় খাওয়া জায়গাটা পরীক্ষা করতে গিয়েই পরিষ্কার হল সব কিছু।

একটা নল। পুরু পলিথিনের নল। হ্যাঁ। ওই চিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। এসে ঢুকেছে পাহাড়ের গহ্বরে।

সবাই যেন হাঁ হয়ে গেছেন। ওঁরা ফিরে এসে ডুবোজাহাজে উঠলেন।

কিন্তু ওই প্রাণীটা?

প্রাণী কোথায়? প্রাণীর মতো কিম্ভূত কিছু হয়তো দেখতে। আসলে সেটা শক্ত ইস্পাতের চাদরে তৈরি বিশেষ ধরনের একটি ডুবোজাহাজ। জাহাজটিকে পলিথিনের চাদর মুড়ে বিচিত্র রং করা হয়েছে।

ঘণ্টা-তিনেক পরিশ্রম করার পর ডুবোজাহাজটিকে নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন একটি জাহাজে। খবর দেওয়াই ছিল। খবরমতো নৌ-বিভাগের একটি জাহাজ সেখানে এসে হাজিরই ছিল। টর্পেডোর ঘায়ে ডুবোজাহাজটির হাল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

জাহাজে সেই ডুবোজাহাজটি তোলার পর তার ভেতর থেকেই যেন বেরোল কেঁচো খুড়তে সাপ।

মেটা! এ যে বিরাট শিল্পপতি মেটার দেহ! মরে পড়ে আছে!

হ্যাঁ, বিখ্যাত তরুণ শিল্পপতি শিবশঙ্কর মেটার মৃতদেহই তাঁরা আবিষ্কার করলেন। আর তাঁর পকেট থেকে যে-একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, তার মধ্যেই সন্ধান মিলল আসল রহস্যের। সেই কাগজের লেখাগুলি ধরে অনুসন্ধান চালানোর পর সমস্ত কিছুই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

তাহলে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াল?

'চুরি। পুকুরচুরি নয়, মশায়। একেবারে যাকে বলে খনি চুরি।' বললেন সদাশিব, 'বুঝলেন না কী করেছে এই মেটা? বড়-বড় ডুবোপাহাড়ের মধ্যে গর্ত করেছে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সেই গর্তকে সে ব্যবহার করতে চায় ট্যাঙ্ক হিসেবে। সেই বিস্ফোরণের জন্যেই আপনারা ভূমিকম্পন অনুভব করেছিলেন। আর ওই যে চিড়? দেখলেনই তো ওর নীচে আছে পলিথিনের মোটা-মোটা নল। ওই নল গিয়ে মিশেছে আমাদের সমুদ্রের নীচের তেলের খনির মধ্যে। ঠিক সেখানে, যেখানে তেল তোলার জন্যে আমরা কুয়ো খুঁড়েছি। আর পলিথিনের নল দিয়ে খনির তেল চুরি করে সে চাইছিল ডুবোপাহাড়গুলির মধ্যে জমিয়ে রাখতে। তারপর কত বড় ব্যবসা, বুঝুন একবার!'

'কিন্তু ওই আলোর সারি?' কথা বললেন ডক্টর মেনন।

'ভাঁওতা, মশাই, ভাঁওতা। ওই সব দেখিয়েই তো শিবশঙ্কর আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু জলের ঘূর্ণি?'

'এ-রহস্য বের করতে আমাদের সময় লাগবে। ওরা এমন কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে ওইরকম ঘূর্ণি সৃষ্টি করে বাইরের শত্রুকে বাধা দেওয়া যায়। মুশকিল হল, শিবশঙ্করকে আমরা পেলাম বটে, কিন্তু তার শাগরেদরা তো পালিয়ে গেল। কারা তারা? কী তাদের পরিচয়? এটা খুঁজে বের করাই হবে এখন আমাদের কাজ।

সদাশিববাবুর কথা শুনে সবাই চুপ।

কমোডোর সারথি শুধু বললেন, 'সমুদ্রের তলা থেকে এমন বিপদও আসতে পারে! আমি ভাবতে পারছি না, মশায়।'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না শিবশঙ্করের সঙ্গীরা কেন পালিয়ে গেল?' সুখারিয়ার প্রশ্ন।

সদাশিব বললেন, 'শিবশঙ্করের পকেট থেকে পাওয়া কাগজটি পড়লেই বোঝা যাবে।' বলেই কাগজটি পড়তে লাগলেন তিনি :

জলের ঘূর্ণির যন্ত্রটা বিগড়ে গেল। কেন বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে ভারতীয় নৌ-সেনাবিভাগ পেছনে লেগেছে। এখন এখান থেকে পালানোই উচিত।

ক্রাইম
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৫



লাইটার নেভে না

শংকর দাশগুপ্ত

এক

এক নির্জন স্টেশনে এসে থামল গভীর রাতের ট্রেন। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে নামল এক যুবক। প্ল্যাটফর্মে সে পা ছোঁয়াতেই কোথায় কোন ঘণ্টা-ঘড়িতে যেন ক'টা বাজল। কোটের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখল যুবক। এবার দেশলাই খুঁজতে গিয়ে কোটের পকেট, প্যান্টের পকেট খুঁজল। না, নেই। দেশলাই আনতে ভুল হয়ে গেছে তার। সে প্ল্যাটফর্মে তাকাল। নির্জন চারপাশ শীত আর কুয়াশায় ঝিমঝিম। একটা লোক, সে দেখল পরনে ওভারকোট, মাথায় একই রঙের হ্যাট, শুধু একটা বেশ লম্বা লোক প্ল্যাটফর্মের ডানদিকে একটা ফারগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

ম্যাচিজ প্লিজ?—ঠোঁটে সিগারেট নিয়েই সে বলল লোকটাকে।

ভুরু পর্যন্ত দীর্ঘ টুপিতে ঢাকা, ওভারকোটের কলার ওঠানো, লোকটা পকেট থেকে দেশলাই নয়, অন্ধকার ঝকমকিয়ে একটা গ্যাস-লাইটার বের করল।

আর তখনই স্টেশন থেকে একটু দূরে যে-টানেল এতক্ষণ অন্ধকার আর কুয়াশায় ঢাকা ছিল সেখানে তীব্র এক আলো আর গুমগুম শব্দ শুনতে পেল সে। কোনও মেল ট্রেন আসছে।

—হিয়ার ইজ দ্য লাইট।

খুব শান্ত গম্ভীর গলায় ফিরে তাকাল সে। তাকিয়েই অসম্ভব চমকে তার ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল।

ওই দীর্ঘদেহী, ওভারকোট যার পরনে, এতক্ষণ মুখ যার ঢাকা ছিল ভুরু পর্যন্ত নেমে আসা দীর্ঘ কালো টুপিতে, এখন লাইটারের আলোতে তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

অবিকল আর-একজন সে। অ-বি-ক-ল!

টানেল কাঁপিয়ে গুমগুম শব্দে মেল ট্রেন এগিয়ে আসছে।

—হা-য়, এলভিস!—সেই লোকটা অথবা আর-এক এলভিস তার নাম ধরে ফিসফিস করে ডেকে ওঠে এবার, মুখে রহস্যময় হাসি।

সে দারুণ ভয়ে সরে আসে।

গুমগুম...গুমগুম...শব্দে কেঁপে ওঠে নির্জন পাহাড়ি স্টেশন। সে ছুটতে থাকে।

—এলভিস, ডোন্ট রান অ্যাওয়ে!—চাপা গলায় নিষেধ করে লোকটা : স্টপ! স্টপ, এলভিস!

লোকটা ওভারকোটে ঢাকা দীর্ঘ ডান হাতটা ছুটন্ত এলভিসের দিকে প্রসারিত করে। হাতে জ্বলন্ত লাইটার...।

ঠিক এইসময় বাবা লাইব্রেরি রুমে ঢুকেছিলেন।

কাহিনির উত্তেজনায় আর বাবার ভয়ে চমকে তাড়াতাড়ি বইটা বিশাল বুককেসে ঢুকিয়ে ফেলেছিল সোমনাথ।

ঘরে ঢুকে বাবা গম্ভীর মুখে শুধু একবার তাকিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ।

তখন কৈশোর শেষ হয়ে গিয়েছিল সোমনাথের। যা লুকোনো, যা নিভৃত, তার প্রতি কৌতূহলের আকর্ষণ তার তখন প্রবল। বাবার ছিল বিশাল লাইব্রেরি রুম। দেশবিদেশের নানা ধরনের সাহিত্য-ঠাসা দেওয়াল-জোড়া বিশাল বুককেস। সেখানে পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, ডস্টয়ভস্কি, শেক্সপিয়র আর বঙ্কিমচন্দ্র। সেখানে জিম করবেটের রোমহর্ষক শিকার কাহিনির পাশে গাছমছম জেমস হ্যাডলি চেজ, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের খুব কাছে ওয়েস্টল্যান্ড।

সেই নানা ধরনের কালেকশন থেকে একদিন বিকেলে একটা বই টেনে নিয়েছিল সোমনাথ। 'মিডনাইট এক্সপ্রেস'। কার লেখা ঠিক মনে নেই সোমনাথের। দেখাও হয়নি তাড়াতাড়িতে।

আশ্চর্য কৌতূহলে পাতার-পর-পাতা সরে যাচ্ছিল সোমনাথের চোখের সামনে থেকে।

আর ঠিক সেই জায়গাটায়...।

সেই নির্জন পাহাড়ি স্টেশনের কুয়াশায় নিষেধ...।

—স্টপ! স্টপ, এলভিস!

সেই ওভারকোট ঢাকা প্রসারিত হাত...।

হাতে জ্বলন্ত লাইটার...।

পরে বইটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সোমনাথ। পায়নি। ওই বিশাল বুককেস কোথায় গ্রাস করেছে সেই ছোট্ট পেপারব্যাক। 'মিডনাইট এক্সপ্রেস'।

অথবা হয়তো অন্য কারও বই। বাবা এনেছিলেন পড়তে।

অথবা...।

বইটা আর পড়া হয়নি সোমনাথের।

অথচ ভুলতেও পারেনি সোমনাথ।

সেই নির্জন প্ল্যাটফর্ম। দীর্ঘদেহী সেই রহস্যময় লোক। ঠোঁট থেকে খসে-পড়া সিগারেট। টানেল কাঁপিয়ে ছুটে আসা গভীর রাতের মেল ট্রেন। গুমগুম। গুমগুম। গুমগুম। আর সেই শীতার্ত গম্ভীর গলায়—স্টপ! স্টপ, এলভিস...!

দুই

তখন ক্রমশ মুনমুনের সুন্দর শরীর থেকে গাঢ় ঘিয়ে রঙের নাইটিটা খুলে নিচ্ছিল সোমনাথ, এমন সময় টেলিফান বেজে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোমনাথ সাদা ধবধবে টেলিফোনটার দিকে। চোখ খুলে তাকাল মুনমুন। ভুরু কুঁচকে, বিরক্তির গলায় বলল, না।

—হসপিটালে রুম নাম্বার সেভেনের পেশেন্টের কন্ডিশন খুব অ্যালার্মিং।

নগ্ন দু-হাতে সোমনাথের গলা জড়িয়ে ধরল মুনমুন। আর্তির গলায় বলল, প্লিজ, নট নাউ।

মুনমুনকে একটু দেখল সোমনাথ। এতক্ষণ ধরে মুনমুনের সুন্দর শরীরকে সে একটু-একটু করে জাগিয়েছে। টানটান বাঁধা সেতারের মতো শরীর এখন মুনমুনের। অথচ টেলিফোন তখনও একইভাবে বেজে চলেছে। অথচ মুনমুনের ক্রিম-ঘষা মুখ, সুন্দর চোখ, প্লাক করা ভুরু নেশায় ঝিমঝিম।

মুনমুন সোমনাথের নাইট ড্রেসের বোতামে আঙুল ছোঁয়ায় এবার। একটা বোতাম খুলেও ফ্যালে।

সোমনাথ উঠে পড়ে। আর দেরি করলে...।

—আহঃ!—অস্ফুট শব্দ করে মুনমুন।

—ডক্টর মুখার্জি হিয়ার, এত রাত্তিরে?

—সোমনাথ, আমি মলয়।

—কী ব্যাপার, এত রাত্তিরে?

—আমার বাবা—।

—কী হয়েছে?

—অবস্থা খুব খারাপ। অসম্ভব ব্রিদিং ডিফিকালটি, হার্ট বোধহয়—।

—আমি তো লাস্ট উইকে চেকআপ করে এসেছিলাম। ই. সি. জি. রিপোর্টও তো—।

—হঠাৎ ডেটোরিয়েট করেছে। প্লিজ, তুই একবার—।

বিছানার দিকে তাকায় সোমনাথ। নিজেই কখন নাইটিটা খুলে ফেলেছে মুনমুন। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে পাশ ফিরে শুয়ে আছে ও। খোলা ববড হেয়ার বালিশে, ওর মুখে ছড়িয়ে আছে। হাতের ফাঁকে মুনমুনের একলা একটা স্তন চোখে পড়ে। গত সপ্তাহে পরপর সাত দিন নাইট ডিউটি গেছে সোমনাথের। সাত দিন পর আজ প্রথম...।

—সোমনাথ!—ওপার থেকে ডেকে ওঠে মলয়, প্লিজ, তুই একবার আয়।

—আমার গাড়িটা কাল থেকে...।—সোমনাথ দ্যাখে মুনমুন পাশ ফিরে সোজা হয়ে শুয়েছে এবার। পা দিয়ে পায়ের পাতা জড়ানো, চোখ বোজা, গভীর নাভি মুনমুনের, ফরসা ধবধবে ঊরু, একটু আনত উন্মুখ দুই স্তন।

—এখন এলে তোকে আমি ফিরে আসার লাস্ট ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে পারব—কান্নার মতো শোনায় মলয়ের গলা : আমার জন্যে এইটুকু কর, প্লিজ।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।—কী একটু ভেবে বলে সোমনাথ।

—আসছিস তবে, সোমনাথ?—মলয়ের গলা কেঁপে ওঠে।

—আসছি।

—তুমি যাচ্ছ?—নাইটির স্ট্র্যাপ বাঁধতে-বাঁধতে বিছানায় উঠে বসে মুনমুন।

—হুঁ।—অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয় সোমনাথ।

—তুমি সত্যি যাচ্ছ?—এবার ঝাঁজ উঠে আসে মুনমুনের গলায়।

—আমাকে যেতে হবে মুনমুন।—কোটের ওপর মাফলারটা জড়িয়ে নিতে-নিতে বলে সোমনাথ।

—কার জন্যে। রুম নাম্বার সেভেনের পেশেন্ট?

—না।

—তবে?

—হসপিটালের কোনও পেশেন্ট নয়।

—কে?

—মলয়ের বাবা।

—কে মলয়?

—আমার বন্ধু। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ ওর বাবার...এনি মোমেন্ট।

—তো কী হয়েছে?

মুনমুনের প্রশ্নে ফিরে তাকায় সোমনাথ।

—তা বলে এত রাতে যেতে হবে?—আবার প্রশ্ন করে মুনমুন।

—হবে।—জোর দিয়ে উত্তর দেয় সোমনাথ।

—কেন?

যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়ায় সোমনাথ, তারপর বলে, আমার বাবা,...আমার বাবাও ডাক্তারের নেগলিজেন্সে হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন, মুনমুন।

তিন

আজ কয়েকদিন ধরে কেন যেন ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে সোমনাথের।

এই এখন—এই রাতের ফাঁকা নির্জন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বসে মলয়ের বাড়ি যেতে-যেতে হঠাৎ সেই পলাশপুরের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। এখন এই উত্তর তিরিশের দিনগুলোতে একা থাকলেই এরকম হয় সোমনাথের।

ছেলেবেলায় পাখি বড় প্রিয় ছিল তার। পাখি দেখলেই নাম জেনে নিত সে। ছেলেবেলার অমল সেই বয়েসে সোমনাথ ক্রমে-ক্রমে শিখছিল লোভ, কামনা, হিংসা আর ঘৃণা কাকে বলে। পাখি-ভালোবাসা সোমনাথই একবার বন্ধুদের সঙ্গে রুমনি নদীতীরে গুলতি দিয়ে বালিহাঁস মেরেছিল কেন সে নিজেই বোঝেনি। অথচ সেই হাঁসের মাংস শালবনের চড়ুইভাতিতে সে ছুঁয়েও দেখেনি।

—সোমনাথ?—কে যেন বুকের ভেতর ডেকে ওঠে তার।

—উঁ?—আনমনা উত্তর দেয় সোমনাথ।

—মনে পড়ে?

—পড়ে।

দ্রুত ছুটে যায় রাতের ট্রেন। তাকে নামতে হবে সাতটা স্টেশন পরে। ছোট শালবনে ঘেরা 'মৌ-বাতাসী' স্টেশনে।

বাতাসী...বাতাসী যেন কার নাম ছিল? সেই যৌবনে...।

মনে পড়ে না। আজ আর মনে পড়ে না।

সেই প্রখর শরীর, কষ্টিপাথরের মতো খুদে-খুদে তৈরি করা স্তন, স্ফুরিত ঠোঁট, সুন্দর চিবুক, নিটোল স্তন, গভীর নাভি, প্রখর জঙ্ঘা...পলাশপুরের বাড়ির চিলেকোঠায়, মাদুরে চুলের তেলের ঝিমঝিম গন্ধ, মাদুরের পাশে পড়ে থাকা ডুরে শাড়ি...দুপুর কেটে যায়...দুপুরের-পর-দুপুর...।

—সোমদাদাবাবু গো, আমি যে...।

—কী?

—তুমার...।

—বল, কী হয়েছে, বাতাসী?

—তুমার ছেইলার...।

কোন স্টেশন পার হয়ে গেল? অন্ধকারে চোখে পড়ে না। স্টেশনের নামের ওপর স্তিমিত লণ্ঠনের আলো শুধু দপদপ করে ওঠে। তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তখন ফাইনাল ইয়ার চলছে মেডিকেলে।

একদিন দুপুরে হঠাৎ ফোন এল।

—কে, সোম?

—হ্যাঁ।

—আমি তোর ছোটকাকু।

—কী ব্যাপার?

—এক্ষুনি তুই চলে আয়, আর...।

—কেন? কী হয়েছে?

—তোর বাবার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ, একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে।

—আচ্ছা দেখছি। বিকেলে একটা ইম্পরট্যান্ট কেস—।

—আসছিস তো আজই?

—দেখছি চেষ্টা করে।

যায়নি সোমনাথ। বাবা বাঁচেননি। সেই শেষ। সেদিন বিকেলেই। ঘেমে ওঠে সোমনাথ। গলা থেকে মাফলারটা খোলে। এই শীতেও কানের পাশ দিয়ে ঘামের একটা রেখা তিরতির করে বেয়ে নামছে। ট্রেনটা থেমে আছে কেন? সোমনাথ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দু-পাশে কাটা ধানখেত। ধু-ধু করছে। দূরে সেই টাওয়ারটার আলো চোখে পড়ে সোমনাথের। তার মানে আর দেরি নেই। পরের স্টেশন মৌ-বাতাসী।

বাতাসী...বাতাসী...বাতাসী...উত্তুরে হাওয়া হাহাকারের মতো বয়ে যায়।

শিরশির করে ওঠে সোমনাথ। সে কি শীতে?

টেন নড়ে ওঠে। প্রায় মধ্যরাতের ট্রেন।

মধ্যরাতের ট্রেন! মনে হতেই মাথার ভেতর ঘুমিয়ে থাকা একটা চিন্তা জেগে ওঠে।

একটা পেপারব্যাক। কী যেন নামটা? কী যেন?

সেই রাতের ঘণ্টা-ঘড়ি...দীর্ঘদেহী সেই ওভারকোট পরা রহস্যময় লোক...কী যেন নামটা... সেই টানেল কাঁপিয়ে ছুটে আসা ট্রেন...ঠোঁট থেকে খসে-পড়া সিগারেট...সেই...কী যেন নামটা?

চার

মৌ-বাতাসী।

লণ্ঠনের আলোর নীচে নামটা আবছা হলেও চোখে পড়ে।

ধীরে-ধীরে থামে ট্রেনটা।

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সোমনাথ। সিঁড়িতে পা রাখে।

প্ল্যাটফর্মে পা ছুঁতেই ঢং...ঢং...ঢং...।

কেঁপে ওঠে সোমনাথ! ঠিক এরকমই ছিল ঘটনাটা। কীসের ঘটনা যেন! সেই যে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে পা ছোঁয়াতেই ঘণ্টা-ঘড়ি...ঢং-ঢং-ঢং...ওই তো এখনও বাজছে!

তারপর...তারপর যেন কী—!

একটা সিগারেট খেলে হয়। মনে মনে ভেবে কোটের পকেট খুঁজে একটা সিগারেট বের করল সোমনাথ। ঠোঁটে রাখল।

দেশলাই? এবার তো দেশলাই খুঁজতে হবে। খুঁজল সোমনাথ কোট আর প্যান্টের পকেট...।

এসবই তো ঠিক ছিল, এরকমই তো কথা ছিল। মনে-মনে ভাবে সোমনাথ। এই ঠোঁটে সিগারেট, দেশলাই খুঁজে-না-পাওয়া...তারপর যেন কী? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা গাছের নীচে...ওই তো...সোমনাথ দেখতে পায় জনহীন কুয়াশাঘন স্টেশনটার ডানদিকের কোণে একটা শালগাছের নীচে...হ্যাঁ, ঠিক এরকমই তো কথা ছিল...মনে পড়ে সোমনাথের...কথা ছিল, আমি ওর কাছে গিয়ে..ওই ওভারকোট, মাথায় হ্যাট, দীর্ঘদেহী ওই লোকটার কাছে গিয়ে...।

—দেশলাই আছে?—সম্মোহিতের মতো প্রশ্ন করে সোমনাথ, ঠোঁটে সিগারেট।

ভুরু পর্যন্ত দীর্ঘ টুপিতে ঢাকা, ওভারকোটের কলার ওঠানো, লোকটা পকেট থেকে দেশলাই নয়, অন্ধকার ঝকমকিয়ে গ্যাস-লাইটার বের করে। সোমনাথ এ-সবই জানে, সবই জানে সোমনাথ—এবং এ-ও জানে তক্ষুনি...ওই তো, ঠিক যেমন কথা ছিল। ওই তো এতক্ষণের অন্ধকার আর কুয়াশায় ঢাকা টানেল কাঁপিয়ে ছুটে আসছে তীব্র আলো আর গুমগুম-গুমগুম শব্দ...।

—এই যে আগুন!—গম্ভীর শান্ত গলার ডাকে ফিরে তাকায় সোমনাথ। আর তাকিয়েই দারুণ চমকে তার ঠোঁট থেকে খসে পড়ে সিগারেট। ওভারকোটের কলার আর নামানো টুপির মাঝখানে লাইটারের আলোয় সে

দেখতে পায় তারই মুখ।

অবিকল আর-এক সোমনাথ! অ-বি-ক-ল!

—কী সোমনাথ? কেমন আছ?—সেই লোকটা অথবা আর-এক সোমনাথ তার নাম ধরে ফিসফিস করে ডেকে ওঠে। মুখে রহস্যময় হাসি।

দারুণ ভয়ে সরে আসে সোমনাথ। গুমগুম-গুমগুম শব্দে কেঁপে ওঠে নির্জন ছোট স্টেশন।

ছুটতে থাকে সোমনাথ।

—সোমনাথ, পালিয়ো না!—চাপা গলায় নিষেধ করে লোকটা,—থামো, থামো, সোমনাথ।

ওভারকোটে ঢাকা দীর্ঘ হাত সে প্রসারিত করে ছুটন্ত সোমনাথের দিকে। হাতে জ্বলন্ত লাইটার।

ছুটতে-ছুটতে ছুটতে-ছুটতে সোমনাথ একসময় মাঠের মাঝখানে বন্ধ একটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ে। দরজা খুলে যায়। কয়েকটা প্যাকিং বাক্সে হোঁচট খায় সোমনাথ। অসম্ভব হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ে।

একটু পরে হঠাৎ সোমনাথের চোখে পড়ে শূন্যে ভেসে আসছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি আর জটিল একটি মুখ।

ভয়ে শ্বাসরোধ হয়ে আসে সোমনাথের। হাতের আড়াল করে ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করে।

একটা বৃদ্ধ লোক, হাতের পাতায় কারুকাজ করা চিনেমাটির প্লেট, তার ওপর জ্বলন্ত একটা মোমবাতি। শুধু মুখে মোমবাতির আলো এসে পড়েছে, লোকটার আর-সব অন্ধকার।

—আপনি?—সোমনাথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে সেই বৃদ্ধ।

—আমি, মানে—।—হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে সোমনাথ, লাস্ট ট্রেনে ফিরে যাব, বাইরে বড় শীত, একটু-একটু বৃষ্টিও পড়ছে, তাই...।

—লাস্ট ট্রেন!—লোকটা ভুরু কোঁচকায়, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে কী যেন শোনে মনোযোগ দিয়ে।—ওই তো লাস্ট ট্রেন চলে যাচ্ছে।—লোকটা না তাকিয়েই বলে।

সোমনাথ সত্যিই শুনতে পায়, চলে-যাওয়া ট্রেনের শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—তবে আজকের রাতটা—।—তখনও হাঁপায় সোমনাথ।—আপনার যদি আপত্তি না থাকে...।

—ঠিক আছে, থাকুন।—লোকটা ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

—যদি কিছু মনে না করেন...।—সোমনাথ বলে, ওই মোমবাতিটা—।

লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়। মোমবাতিটার দিকে তাকায় একবার।

—একটাই আছে।—সেদিকে তাকিয়েই বলে। তারপর তাকায় সোমনাথের দিকে, দু-এক মুহূর্ত বলে, আচ্ছা, রাখুন আপনার কাছে।

—অনেক ধন্যবাদ, হাত বাড়িয়ে মোমবাতিটা নিতে-নিতে বলে সোমনাথ।

লোকটা কিছু বলে না। শুধু একটু হাসে।

পাঁচ

মোমবাতির আলোয় সিগারেট ধরাচ্ছিল সোমনাথ, এমন সময় মোমবাতি নিভে গেল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সেই ওভারকোট পরা দীর্ঘদেহী লোকটা।

চমকে সরে গেল সোমনাথ।

লোকটা সোমনাথের খুব কাছে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে। মোমবাতি নিভে আছে। লোকটা মোমবাতিটার দিকে একবার তাকায়। তারপর গ্যাস-লাইটারটা জ্বেলে প্যাকিং বাক্সের ওপর রাখে।

—এটা নিভবে না।—লাইটারটার দিকে চেয়ে আশ্চর্য গলায় বলে।

সোমনাথ দ্যাখে অবিকল আর-একজন সোমনাথ তার মুখোমুখি বসে আছে। অবিকল সে, কিন্তু ওর মুখ আশ্চর্য শান্ত, পাখি-ভালোবাসা সোমনাথের সেই ছেলেবেলার মুখের মতো রেখাহীন, আবিলতাহীন, নিষ্পাপ মুখ।

—মনে পড়ে?—ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করে সে সোমনাথকে।

—কী?—ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর বের হয়ে আসে সোমনাথের গলা থেকে।

—সেই নিহত বালিহাঁস...।

কোনও উত্তর দেয় না সোমনাথ।

—বাতাসী? বাতাসীকে মনে পড়ে?—ফিসফিস করে প্রশ্ন করে সে।

কেঁপে ওঠে সোমনাথ।

—কেউ জানে না, কেউ না...।—ফিসফিস করে সে বলেই চলে, দোলে তার দীর্ঘ দেহ সাপের মতো।—তখন তোমার মেডিকেলের সেকেন্ড ইয়ার। তোমার স্বল্প জ্ঞানের ভুল-ভাল ওষুধে যখন নষ্ট করতে পারলে না বাতাসীর গর্ভের ভ্রূণ, তখন খুব সহজ উপায়...পটাশিয়াম সায়ানাইড...।

চমকে উঠল সোমনাথ। কেউ জানে না। কেউ তো জানে না বাতাসী হঠাৎ কেন তীব্র যন্ত্রণায় নীল হয়ে...।

—আহা, তখন বড় খিদে। নতুন মা হলে এরকম খিদে হয়—তুমি তাকে মাংসের চপ এনে দিয়েছিলে আর তাতে মাখানো ছিল...হাত দিয়ে মুখ ঢাকছ কেন, সোমনাথ, ভয়ে-দুঃখে যে নয়, তা তো আমি জানি। তা না হলে তোমার বাবা লোকটা যখন অসহ্য শ্বাসকষ্টে, যন্ত্রণায়...তখন কি তুমি মুনমুনের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারে নৌকোর ভেতর—তোমাকে তো জানানো হয়েছিল, সোমনাথ। তোমার ছোটকাকা তো—ওই যে বললাম, দুঃখ তোমার নেই।

—নাঃ!—অস্ফুট যন্ত্রণায় মুখ তুলে তাকায় সোমনাথ।—না! নাঃ!

আর অবিকল আর-এক সোমনাথ তার চুলে হাত রাখে। চুল থেকে মুখে খেলা করে আঙুল। সোমনাথের দু-চোখ, ঠোঁট, চিবুক ছুঁয়ে-ছুঁয়ে খেলা করে আর-এক সোমনাথের আঙুল।

—নিহত বালিহাঁস...।—ফিসফিস করে বলে সে, বাতাসীর নীল শরীর...।—দশটা আঙুল খেলা করে তার। বাবার শ্বাসকষ্টে লাল দুই চোখ...।—ফিসফিস করে বলতে-বলতে সে ঝুঁকে পড়ে সোমনাথের ওপর, —মনে পড়ে না...দুঃখ হয় না...। মোমবাতি নিভে যায় সোমনাথ, লাইটার নেভে না। লাইটার জ্বলে, জ্বালায়...ঘৃণা করো না নিজেকে, সোমনাথ?

অবশেষে সোমনাথের চোখ, ঠোঁট, চিবুক ছুঁয়ে খেলা করতে-করতে তার দু-হাতের দশটা আঙুল ক্রমশ নেমে আসে সোমনাথের গলায়...।

ছয়

পরদিন সকালে একদল রাখাল বালক তাদের ডাংগুলির গুলিটা খুঁজতে-খুঁজতে মাঠের মধ্যে এক ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢোকে। গুলিটা খুঁজতে গিয়ে তাদের চোখে পড়ে আশ্চর্য এক দৃশ্য। সভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তারা দ্যাখে...।

একটা লোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্যাকিং বাক্সগুলোর পাশে। আর আশ্চর্য, লোকটার নিজের হাতের দশটা আঙুল নখসুদ্ধ বিঁধে আছে নিজেরই গলায়।

ক্রাইম
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৫



রিরংসার জাল

দ্বৈপায়ন

ঘুমের ঘোরেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন শামসুদ্দীন আহমদ শাহ। ঘুমটা ভেঙে যেতে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলেন। নিজেকে দুর্বল মনে হল তাঁর। শীতের রাত্রে ঘামে শরীর ভিজে গেছে। স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

বিস্ফারিত দুই চোখ। কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে গেছে। নীল রঙের ক'টা মাছি উড়ছে। অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত নারীদেহটা হিমশীতল। দেখতে-দেখতে ক'টা মাছি তাঁর দিকে উড়ে এল। তবে কি...চিৎকার করে উঠলেন।

মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল তাঁর। শান্ত অথচ দৃঢ়।—ধর্ম আপনাকে মুসলমান করেছে, কিন্তু রাজা গণেশের রক্তধারা কি মুছে ফেলতে পেরেছেন দেহ থেকে?

—কে তুমি?—চিৎকার করে উঠেছিলেন রাজা গণেশের বংশধর জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ।

—জাঁহাপনা।—খোজা রহিমের কণ্ঠস্বর।

—কে?—চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন শামসুদ্দীন।

—আমি রহিম, জাঁহা-পনা।

শয্যার ওপর উঠে বসলেন শামসুদ্দীন। সেজ-বাতির আলোয় কক্ষ আলোকিত। রহিমকে দেখলেন। বললেন, রহিম, কাফের জানানাটাকে কে খতম করেছে বলতে পারিস?

—গুনাহ যদি না নেন, বলতে পারি।—একটু চিন্তা করে বলল খোজা রহিম।

—কে?—খোজাটার দিকে চাইলেন শামসুদ্দীন।

—আপনি, জাঁহাপনা।

—রহিম!—চিৎকার করে উঠলেন শামসুদ্দীন।

—চিৎকার করবেন না, জাঁহাপনা। কোতল করার ভয় দেখাবেন না। খোজা আর মুর্দায় কোনও ফারাক নেই। নিয়ে যান, বাইরে পাহারা দিচ্ছি আমি।

খোজা রহিম চলে গেল। সাদী খান আওরতটাকে এনেছিল। তাঁরই গোলাম। হিন্দু আওরত। খুবসুরত। যৌবনের ঢল দেহের কানায়-কানায়। কিন্তু হিন্দু রক্তটা গোলমাল করে দিল। ছেড়ে দিলেন। ভুল করলেন।

দেহটাকে ছিঁড়ে খেয়ে খতম করে গেছে কোনও কুত্তার দল।

—জানানাটাকে ভোগ করেছ তুমিই প্রথম। আমি খতম করেছি। কাফেরটাকে শেষ করতে হবে তোমাকেই।

—তুমি কী করবে? দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে?—সাদী খানের কণ্ঠস্বরটা অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে উঠল।

—মসনদের ভাবী সুলতান তুমি।—বলল নাসির খান।—আমি তোমার গোলাম।

—গোলাম আমরা নবাবের। খোজাটাকে খতম করতে হবে আগে।

—কী করে তা সম্ভব?

—অসম্ভব সম্ভব হবে। আজ শেষ রাতেই একটা বাঁদি শেষ হবে আমার হাতে। তুমি হারেমে ঢুকবে তার পোশাক পরে। কাল শেষ হবে একটা খোজা। তারপর...।

—যদি ধরা পড়ি?—কেঁপে উঠল নাসির খানের কণ্ঠস্বর।

—ভয় নেই। বেগম সহায়।

কিছু বলতে যাচ্ছিল নাসির খান, বলা হল না। বাইরে লঘু পদশব্দ। আত্মগোপন করল নাসির খান। ভাগীরথীর তীরের জীর্ণ পরিত্যক্ত গৃহের দরজায় আওয়াজ উঠল। সঙ্কেতধ্বনি শেষে দরজা খুলে দিল সাদী খান।

—বেগমসাহেবা আমাকে পাঠিয়েছেন।—বলল নারী কণ্ঠস্বর।

—এসো।—হাত ধরল সাদী খান। আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

—বড় অন্ধকার, বাতি জ্বালান।—কেঁপে উঠল কণ্ঠস্বর।

—হুকুম নেই। তোমার উমর কত?

—বেগমসাহেবা বলেছেন—আঃ।—একটু ছটফটিয়ে উঠল নারীদেহটা।

—তুমি কী সুন্দরী! উমর কত তোমার?

—আঠারা সাল...আঃ, এ কী করছেন, বেগমসাহেবা বলে...না-না ছিঃ।—বাধা দিতে চাইল বাঁদিটা।

—কেন, ভয় কী...! কোনও মরদ কি কোনওদিন তোমাকে...আমি জানি, দু-মাস আগে জাঁহাপনার কাছে একরাত ছিলে তুমি। বাঃ! সুন্দর!—পুরুষকণ্ঠ গাঢ় শোনাল, তোমাকে দেখা না গেলেও বুঝতে পারছি তুমি সুন্দরী।

—কিন্তু বেগমসাহেবা...না, শুনুন...আমার পোশাক সব...।

—ভয় নেই, পাবে। আমি নিজের হাতে তোমায় পোশাক পরিয়ে দেব।

—কাফের মেয়েটাকে কে খুন করেছে বলতে পারেন? আঃ...।

—থাক, ও-কথা থাক এখন। বেগমসাহেবার চেয়েও তোমার দেহটা খাসা। তোমাকে আমি...।

একদিনে দুটো নারীর মৃতদেহ। কাফের মেয়েটাকে চেনা গিয়েছিল। দ্বিতীয়টার মুখটা ক্ষত-বিক্ষত। চেনার কোনও উপায় নেই। দ্বিতীয় রাতশেষে নারী নয়, একটা পুরুষের দেহ। এবার শুধু মুখ নয়, সমস্ত দেহটা একটা মাংসপিণ্ড। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রাসাদ ঘিরে। শীতের সন্ধ্যা। ধোঁয়ার মতো কুয়াশা নেমেছে আশমানের গা বেয়ে। পাইকের দল সদা সতর্ক। শুরু হয়েছে রাতের পাহারা।

জানানা মহলের প্রবেশদ্বারে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন শামসুদ্দীন আহমদ শাহ্। একটা ধূসর রঙের বিল্লি তীরগতিতে ছুটে এল ভেতর থেকে। শিউরে উঠলেন তিনি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করলেন। ফিরে চললেন আবার।

একটা আর্তনাদ ভেসে এল বাতাসে। নারীকণ্ঠ। শামসুদ্দীনের পাগলি ধাই। না, আজ আর জানানা মহলে যাবেন না। বেগমরা আজও প্রতীক্ষায় থাক। প্রধানা বেগম, যাকে তাঁর পাইকের দল লুঠে এনেছিল একদিন,

খবর যদি মিথ্যা না হয়—সাদী খানের সঙ্গে একদিন আশনাই ছিল তার। কী যেন নামটা? মনে করতে পারলেন না। একটু শরাব চাই।

—কে?—চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

—আমি রহমান।

—কী করছিস এখানে তুই?

—একটা বাঁদি জাঁহাপনার খোঁজে গিয়েছিল। তাকে খুঁজছিলাম।

—কেন, বাঁদিকে খুঁজছিলি কেন?

—আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতেই পালিয়ে গেল কোথায়। খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

খোজা রহমানের কথা শুনে গম্ভীর হতে গিয়েও পারলেন না শামসুদ্দীন। হেসে উঠলেন হো-হো করে। শুনতে পেলেন না রহমানের শেষ কথাগুলো, লেকিন জাঁহাপনা, বড় শক্ত তার দেহটা।

শরাবের নেশায় রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল। ভোরে পাখির ডাক শুনতে পাননি সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ। সূর্যের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। স্বপ্ন দেখছিলেন। মনটা তাজা। মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, রহমান!

সাড়া নেই। ছুটে এল না কেউ। প্রৌঢ় মানুষটা তাঁর বড় সহায়। খোজার ভালোবাসা তাঁর প্রতি। তীক্ষ্ন বুদ্ধি, সামলে দেয়। আবার ডাকলেন, রহমান!

কেউ সাড়া দিল না। বিস্মিত হলেন। উঠলেন। দুরন্ত ভয়ে শিউরে উঠল তাঁর সব দেহ। একটা ছোট পাহাড়ের মতো খোজা রহমানের বিশাল দেহটা কক্ষের দ্বারপথ জুড়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে চারিদিক। মৃতের একহাতে তরবারি, অন্য হাতের শক্ত মুঠিতে ধরা একটা ওড়নার কিছুটা অংশ।

—সাচ বলছি, আমি তোমাকে পেয়ার করি।—প্রধানা বেগমের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। আয়ত দুই সুন্দর আঁখি ছলছল : আমি সাচ বলছি তোমাকে।

—কেন আমাকে পেয়ার করবে?—সাবধানী শামসুদ্দীন : আমি তোমাকে লুঠ করে এনেছি।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সুন্দর ওষ্ঠে। ঘন হল নবাবের বুকের কাছে। অস্ফুট স্বরে বলল, তাতে কী!

—বটে!—বেগমের মুখটা তুলে ধরলেন শামসুদ্দীন। তাজা জওয়ানি-ভরা দেহ। তিন সালের নবাবি। বেগম এসেছে সাল পুরা হয়নি। দেখতে-দেখতে নেশা লাগল চোখে। নিশ্বাস ঘন হল। বুঝল বেগম। ঠোঁটে মোহিনী হাসি। একটানে খুলে ফেলল বুকের কাঁচুলি। শঙ্খধবল দু-হাতে বুক ঢাকল বেগম। যেন বাধা দিতে চায়। বাধা মানল না দুরন্ত পুরুষ। দেখতে-দেখতে যুবতী-দেহটা বসনমুক্ত। ঝড়ের তাণ্ডবে প্রকৃতি থরথর।

রাত বাড়ছে বাইরে। পরিশ্রান্ত নবাব। ঘুম-ঘুম। ঘুমের ঢল নামছে দু-চোখ জুড়ে। সেজবাতির শিখা কাঁপছে থরথর।

রাত্রি গভীর। বাইরে মৃদু পদশব্দ। কে যেন এগিয়ে আসছে। নিভে গেল বাতিটা।

—কে-কে?—চিৎকার করে উঠলেন শামসুদ্দীন। পাশে রাখা তলোয়ারটা টেনে নিলেন মুহূর্তে।

—আমি, আমি।—ঝাঁপিয়ে পড়ল বেগম।

—তুমি?—কণ্ঠে বিস্ময় নবাবের।

—আলোটা জ্বেলে দিতে উঠেছিলাম।

—লেকিন...।—স্খলিত কণ্ঠস্বর নবাবের।

—কোনও ভয় নেই, তুমি ঘুমোও। আমি জেগে আছি।—শামসুদ্দীনের দেহটাকে নিজের নগ্ন বুকে পাকে-পাকে জড়িয়ে নিল বেগম। খোজা রহমানের বিশাল দেহটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আজানের ধ্বনি ভেসে এল দূরের মসজিদ থেকে।

কে যেন পাশে রাখা তলোয়ারটা টেনে নিল। ঘুমের মধ্যেই চোখ মেললেন শামসুদ্দীন। একটা বাঁদির মুখ। নিভে গেল ঘরের বাতি।

—কে?—ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল বেগম।

ধপ করে একটা আওয়াজ হল। একটু আর্তনাদ। উষ্ণ স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল শামসুদ্দীনের। হাত রাখলেন বেগমের গায়ে। দেহটা চটচট করছে। মুখটা...মুখটা কোথায় গেল!

আলো জ্বলে উঠল। একটা হিংস্র মুখ। ভয়ঙ্কর। সাদী খান! ঝলসে উঠল একখানা তলোয়ার। পাগলি ধাই কোথাও হাসছে। একটু যন্ত্রণাবোধ। আঃ, না...স্থির হয়ে গেল শামসুদ্দীন আহমদ শাহের দেহটা।

—দোস্ত!—মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল মৃত্যুপুরীতে।

—বলো!

—জানানাটাকে...।

বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা দেখছ এর পরেও...।

দেখল নাসির খান। শিউরে উঠল। বন্ধ করল দুই চোখ। নগ্ন দেহ দুটো বীভৎস-ভয়ঙ্কর।

রাজা গণেশের শেষ বংশধর। গণেশ, মহেন্দ্রদেব, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু), শামসুদ্দীন আহমদ শাহ। দুই ক্রীতদাস সাদী খান আর নাসির খান। শামসুদ্দীনকে হত্যা করে শেষ করে দিল রাজা গণেশের বংশের রাজত্ব (৮৪০ হিজরি)।

পরবর্তী নবাব নাসির খান—নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। সাদী খানকে হত্যা করে নতুন সুলতান হয়ে বসল বাংলার মসনদে। শামসুদ্দীনের সমাধি আজও রয়েছে পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদে। সমাধির গঠন শহিদের সমাধির অনুরূপ।

মাসিক ক্রিমিনাল

জুন, ১৯৭৬



ললনা ছলনাময়ী

সুদীপ সাহা

সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে এককাপ চা নিয়ে বসেছে বৃকোদর—হাতে তার ধূমায়িত চারমিনার, সামনে খোলা স্টেটসম্যানের পার্সোন্যাল কলম, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। খুবই বিরক্ত হল বৃকোদর। এই সাতসকালে আবার কে ডাকে!

ফোনটা নামিয়ে রেখে আবার স্টেটসম্যানের পার্সোন্যাল কলমে চোখ রাখল বৃকোদর, আর বিড়বিড় করতে লাগল। কী এমন কথা যে, ফোনে বলা যায় না—এখন ছোটো সেই লালবাজার! হ্যাঁ, হোমিসাইডের বড়কর্তা বর্মনখুড়ো ফোন করেছিলেন। কী এক বিশেষ প্রয়োজন, ফোনে খুলে বলা সম্ভব নয়—আজ সকালেই যেতে হবে বৃকোদরকে। তা সে ঘণ্টাদুয়েক সময় চেয়েছে। পার্সোন্যাল কলমটাই খুঁটিয়ে পড়তে মিনিট চল্লিশ লাগবে, তারপর তৈরি হওয়া—সেটা অবশ্য মিনিট দুইয়ের ব্যাপার—বাসের জন্য লাইন দেওয়া, ইত্যাদি।

'এই যে বৃকোদর, এসে গেছ!' বর্মনখুড়ো চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন 'আরে, বসতে হবে না—চলো, চলো।'

'কোথায় আবার যাব?' বৃকোদর বিরক্তভাবে জিগ্যেস করল, 'একে তো সাতসকালে টেনে আনলেন, তা-ও আবার চা খাওয়ানো নেই, কিছু নেই—আসতে-না আসতেই চলো!'

'আরে, হ্যাঁ—চা খাওয়াব বলেই তো নিয়ে যাচ্ছি—তুমি ওঠো তো!'

অগত্যা বৃকোদর উঠল। বর্মনখুড়ো বাইরে এসে পুলিশ জিপের বদলে ট্যাক্সিতে উঠলেন। তারপর একটা বড় সাইজের চুরুট ধরিয়ে মুখে পুরে বসে রইলেন।

ধর্মতলা চলে গেল, কোনও কথা নেই—লিন্ডসে চলে গেল, কোনও কথা নেই। অবশেষে অধৈর্য হয়ে বৃকোদর বলে ফেলল, 'খুড়ো, চা-টা কি আমরা দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছে খাব?'

'অ্যাঁ...ও! তাই তো, তোমাকে তো আবার চা খাওয়াতে হবে—এই, এই ট্যাক্সি, ওয়াপস চলো।'

দক্ষিণ কলকাতায় নয়, মধ্য কলকাতারই একটা নামকরা দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসেছিলেন বর্মনখুড়ো—সদাশিব বর্মন, ক্যালকাটা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের বড়কর্তা। সামনে বসে পা দোলাচ্ছিল বৃকোদর সামন্ত, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর—বর্মনখুড়োর স্নেহধন্য। এবার মুখটা ছুঁচলো করে বলল, 'নোট জালের ব্যাপার তো আপনার আওতায় নয়—আপনি হঠাৎ নোট জাল নিয়ে চিন্তিত হলেন কেন?'

'কী করে বুঝলে, বৃকোদর?' কথা ফুটল বর্মনখুড়োর মুখে।

'সেই যে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে চেঞ্জ ফেরত নিয়েছেন, আর টাকাগুলো পকেটে পোরেননি—কয়েক মুহূর্ত পরপরই উলটে-পালটে ওগুলো দেখে যাচ্ছেন—ব্যাপারটা কী?'

'সেইজন্যেই তো তোমাকে এখানে নিয়ে আসা। ব্যাপার এমনই যে, ফোনে বলা যায় না, লালবাজারে বসে বলা যায় না। আমার ভাইপো তরুণকে কাল অ্যারেস্ট করেছে ক্যালকাটা পুলিশ, নোট জাল করার অপরাধে—।'

'তাতে কী, পুলিশের লোকের ভাইপো বলে কি সে নোট জাল করতে পারে না?'

'আঃ, বৃকোদর!' বর্মনখুড়ো কাতরভাবে বললেন, 'আমি চাই, তুমি ব্যাপারটা তলিয়ে দ্যাখো। আর তরুণের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আমি দিচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'হেঁ, হেঁ, বর্মনখুড়ো,' বৃকোদর একগাল হেসে বলল, 'অ্যাডভান্সটা আপনি দেবেন, না জেলে গিয়ে তরুণবাবুর সঙ্গে কথা বলব?'

কটমট করে তাকিয়ে বৃকোদরের অর্ধেক ফি আগাম করলেন বর্মনখুড়ো।

বেয়ারা চা দিয়ে গেছিল। বৃকোদর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে সোজা চলে গেল কাউন্টারে এবং ফোনটা তুলে নিল।

'হ্যালো, দৈনিক বার্তাবহ?...আমি বৃকোদর সামন্ত বলছি...একটা নোট জাল করার কেসে আপনাদের পত্রিকাকে আমি কভার করছি, ঠিক আছে তো?...হ্যাঁ, তাহলে কাগজপত্র তৈরি করুন, আধঘণ্টা পর আসছি...আচ্ছা, ঠিক আছে—ধন্যবাদ।'

'কী ব্যাপার, চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল।' বৃকোদর ফিরতে বর্মনখুড়ো বললেন, 'কাকে ফোন করতে গেছলে?'

'কাজ শুরু করে এলাম, খুড়ো। টাকা তো আগাম পেয়ে গেছি!' বৃকোদর বলল।

বর্মনখুড়ো লালবাজারে ফিরে গেলেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর বৃকোদর আবার লালবাজার পৌঁছল 'দৈনিক বার্তাবহ'-র রিপোর্টার হিসেবে—অবশ্য এবার আর বর্মনখুড়োর কাছে নয়। তরুণ বর্মনের জবানবন্দি ইত্যাদি দেখে বৃকোদর বাড়ি ফিরল—আর তারপরই বেরোল সেই বিখ্যাত লাল খেরোর খাতা। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বেরোল জাল নোটের কেস। গত ২১ জুন বেরিয়েছে স্টেটসম্যানে—তারই সারমর্মটুকু লিখে রেখেছে বৃকোদর :

(১) বম্বের বিজয় কাজোলকার—বয়স ছত্রিশ, পেশা ব্যবসা (অর্ডার সাপ্লায়ার), ২০ জুন সকালে মেসার্স রামচন্দ্র আগরওয়ালের থেকে কিছু যন্ত্রপাতি কিনে পাঁচ হাজার টাকা পেমেন্ট করে—সবই জাল নোটে। বিজয় বলেছে, ওই টাকা সে পেয়েছে দিল্লির এক পার্টির কাছ থেকে। কিন্তু সেই পার্টি পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে-নোটের নম্বর দিয়েছে (প্রমাণসহ), তার সঙ্গে বিজয়ের দেওয়া নোটের নম্বর মেলেনি।

(২) পাটনার শঙ্কর তেওয়ারি টিভি সেট কিনে জাল নোটে পেমেন্ট করেছে এবং পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

এরপর বৃকোদর কলম খুলল, লিখল :

(৩) কলকাতার তরুণ বর্মন সদ্য দিল্লি থেকে ফিরে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গেছিল—আটশো টাকা—সবই জাল নোটে। তরুণের বক্তব্য, বেশ কিছু টাকা নিয়ে সে সস্ত্রীক দিল্লি বেড়াতে গেছিল—যা টাকা ফিরেছিল, সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়েই এই বিপত্তি। দিল্লিতে সে ছিল 'হোটেল মিডল্যান্ড'-এ।

লাল খেরোর খাতা বন্ধ হল। পকেট থেকে বেরোল নাসিরুদ্দিন বিড়ি। বাড়িতে সে মাঝে-মধ্যে বিড়িই খায়। বিড়ি ধরিয়ে সে গেল স্টাডিরুমে। টেনে নিল র‍্যাক থেকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেমস ওয়েরিং-এর লেখা 'ফ্রডস'। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল বৃকোদরের। ওয়েরিং সাহেব লিখেছেন, জাল নোটের কারবারিরা কখনওই এমন জায়গায় নোট চালাবে না, যেখানে তাদের বারবার ফিরতে হবে।

'হুম—,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃকোদর। বিড়বিড় করে বলল, 'অন্তত বিজয় কাজোলকার তাহলে মিথ্যে বলেনি। কারণ, মাল কিনতে রামচন্দ্র আগরওয়ালের কাছে তাকে বারবার যেতেই হবে। সে যদি জাল নোটের কারবারি হত, এ-ভুল তাহলে করত না। তাহলে মিথ্যে কথা কে বলল? দিল্লির পার্টি? কিন্তু সে তো আবার কী যেন প্রমাণ দিয়েছে! দু-নম্বর কেসে শঙ্কর ভগবান তো কিছুই বলেননি। ব্যাপার বোঝা মুশকিল। আর তরুণ বর্মন পেশায় এঞ্জিনিয়ার—কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধরে। কাজেই জাল নোটের কারবারি সে হলে অন্তত ব্যাঙ্কে চালান করতে যেত না সেই নোট। তাহলে গোলমালটা কোথায়—বলি গোলমালটা কোথায়! ধুত্তেরি, এত অভিমানী প্রেয়সী আর দেখিনি—চুমু দিতে একটু দেরি হলেই ঘুমিয়ে পড়বে!' বিড়ি নিভে গেছিল—শেষ কথাটা তারই উদ্দেশে।

'সেন্সর করো, সেন্সর করো।' বলতে-বলতে ঢুকলেন বর্মনখুড়ো, 'কতদূর এগোলে? বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছি হে, বৃকোদর। কাজে মন বসাতে পারছি না, তাই চলে এলাম।'

'এক কাজ করুন, খুড়ো,' বৃকোদর বলল, 'কয়েকদিন ছুটি নিয়ে ফেলুন—আমার এখানে এসে থাকবেন। তাহলে ধৈর্যচ্যুতি হবে না মনে হচ্ছে।'

'সত্যি বলছ, বৃকোদর?' বর্মনখুড়োকে খুব উৎসাহিত দেখাল : 'তাহলে কাল সকাল থেকেই চলে আসছি, ঠিক আছে তো?'

'আসুন, তবে তার আগে একটা কাজ করে আসুন। বম্বে পুলিশের কাছে খোঁজ নিন, গত ২০ জুন যে-বিজয় কাজোলকর জাল নোটের ব্যাপারে ধরা পড়েছে, দিল্লিতে তার গতিবিধি সম্বন্ধে কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে কি না। আর পাটনায় ওই একই কেসে যে-শঙ্কর তেওয়ারি ধরা পড়েছে—তার ব্যাপারে খোঁজ নিন, সেও দিল্লি গেছিল কি না।'

'ওরে বাবা—অনেকদূর এগিয়েছ মনে হচ্ছে! একেবারে পাটনা হয়ে বম্বে? কী-কী নাম বললে যেন—বিজয় তেওয়ারি আর শঙ্কর কাজু না কী যেন!'

'হ্যাঁ, বিজয় শঙ্কর জগাখিচুড়ি। লিখে নিন, লিখে নিন।'

'তাই দাও, বাবা—আর নাম পেলে না!'

বর্মনখুড়ো চলে গেলেন। পরমুহূর্তেই বৃকোদর বেরিয়ে গিয়ে পোস্টঅফিস থেকে দুটো টেলিগ্রাম করে এল।

সন্ধেবেলা বাড়ির কলিংবেলের লাইনে লাগানো সুইচটা অফ করে দিল বৃকোদর। এই ব্যবস্থাটা সে রেখেছে, যাতে তাকে কেউ বিরক্ত করতে না পারে সেই জন্য। তারপর স্টাডিতে এসে শুরু হল অবিরাম পায়চারি, তৎসহ তাম্রকূটসেবন।

পরদিন সকাল ন'টায় বর্মনখুড়ো সত্যি-সত্যি এসে হাজির হলেন বৃকোদরের বাড়ি এবং চমকে গেলেন। কারণ চায়ের পেয়ালা হাতে যে বসেছিল, সে আর-একজন সদাশিব বর্মন—এমনকী বাঁ-গালের আঁচিলটা পর্যন্ত বাদ পড়েনি। বর্মনখুড়ো অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'হঠাৎ আমার ছদ্মবেশ কেন, বৃকোদর? অবশ্য বাড়িতে তুমি আর মৈনুল ছাড়া আর কেউ নেই বলেই তোমাকে বৃকোদর বলে ডাকলাম—না হলে মনে হচ্ছে, আমি আয়নায় মুখ দেখছি। হ্যাঁ—মৈনুল—এককাপ চা।'

'কেন এই ছদ্মবেশ, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।' বৃকোদর উইগটা খুলতে-খুলতে বলল, 'মৈনুল ঢাকাই পরোটা করছে, খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, খুড়ো। প্রথম অ্যাভেলেবল ফ্লাইটে দিল্লির দুটো টিকিট কেটে আনুন—আমরা দিল্লি যাচ্ছি।'

'হঠাৎ দিল্লি কেন? কতদূর কী হল কিছুই বুঝছি না—একেবারে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছ?'

'মনে হচ্ছে, ঘটনার চাবিকাঠি সেখানেই। আর হ্যাঁ, টিকিট দুটো অবশ্যই অন্য নামে কাটবেন।'

পালাম থেকে ট্যাক্সিতে হোটেল মিডল্যান্ডের পথে যাওয়ার সময় বৃকোদর তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বলছিল, বর্মনখুড়ো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন 'খুড়ো, আপনি বিজয় কাজোলকর ও শঙ্কর তেওয়ারির দিল্লিতে গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ আনার আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, এরা সকলেই হোটেল মিডল্যান্ডে

উঠেছিল। তরুণের মতোই এরাও যে নিরপরাধ, সেটা মনে করার কিছু কারণ অবশ্যই আমার আছে। কাজেই আমার সন্দেহ হল, হোটেল মিডল্যান্ডই ঘটনার উৎস। সেটা যাচাই করার জন্যে আপনি হোটেল মিডল্যান্ডে চেক ইন করছেন এখনই—আর আমি চলে যাচ্ছি আমার বন্ধু সুরথের বাড়ি—ওকে টেলিগ্রাম করাই আছে। ওর ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি একঘণ্টার ভেতর ওখানে চলে আসুন। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সারবেন এবং ওখানেই থেকে যাবেন। আপনার বদলে আমি ফিরব হোটেল মিডল্যান্ডে। কাল সকাল দশটায় দেখা হবে আবার সুরথের বাড়িতে। এই যে এসে গেছে মনে হচ্ছে! যান, নেমে পড়ুন।'

সফদারজঙ্গ এনক্লেভে সুরথের বাড়িতে হুল্লোড় বয়ে গেল। প্রায় সাত বছর পর দুই বন্ধুতে দেখা। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর পারস্পরিক খবর আদান-প্রদান চলছিল, বর্মনখুড়ো এসে গেলেন। বৃকোদর হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'এ কী খুড়ো, আপনাকে বললাম ঘণ্টাখানেক পর আসতে, আর পঁয়ত্রিশ মিনিট মাত্র হল, আপনি চলে এলেন!'

'আর বোলো না হে, বৃকোদর! তোমার কথামতো তো পেশা লিখেছি ব্যবসা। একটা নতুন কলম দেখলাম, দিল্লিতে আসার উদ্দেশ্য—সেখানে লিখেছি, দিল্লিতে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা। ব্যস, রিসেপশনিস্ট মেয়েটি মুহুর্মুহু ফোন করছে, ড্রিঙ্কস লাগবে আপনার? ...এনি আদার টাইপ অফ এন্টারটেইনমেন্ট?—শেষে বিরক্ত হয়ে কেটে পড়লুম।'

'খুড়ো, টোপ গিলেছে মনে হয়—আপনার ওই উদ্দেশ্যটা খুব জাঁকালো হয়েছে।...কই রে সুরথ, খাওয়ার বন্দোবস্ত কর, আবার ফিরতে হবে।'

বর্মনখুড়োর ছদ্মবেশে বৃকোদর ফিরল হোটেলে। এখন তার নাম সুরজিৎ হালদার—এই নামেই সদাশিব বর্মন চেক ইন করেছেন। রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা শুধু সুবেশা সুরূপাই নন, তাঁর গলাটিও সুরেলা। রিনরিনে গলায় সুর তুলে তিনি বললেন, 'হাই মিস্টার হালদার, হোয়ার হ্যাড য়ু বিন সো লং—আফটার অল ইটস আ ন্যু সিটি টু য়ু!'

'থ্যাঙ্ক য়ু মিস...।'

'লোলিটা কাপুর—য়ু ক্যান কল মি লোলা।'

'থ্যাঙ্ক য়ু লোলা—ডেহলি ইজ নট দ্যাট ন্যু টু মি।'

'ইজ ইট! মিস্টার হালদার—উই আর অলওয়েজ অ্যাট য়োর সার্ভিস—হোয়েনেভার য়ু নিড সামথিং, জাস্ট লেট আস নো।'

'আই উইল—আই উইল লেট য়ু নো।'

হোটেলের ঘরে ঢুকল বৃকোদর। একজনের পক্ষে বেশ বড় ঘর। এককোণে সোফাসেট ও সেন্টার টেবিল। কিছু দূরে রাখা টিভি সেট। ঘরের আর-একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। খাটের পাশে ছোট টেবিলে রাখা ফোন। মাথার কাছে রাখা মোরাদাবাদী কুঁজোয় জল। ঘরের প্রবেশ-দরজা পুব দেওয়ালে, তার কোলে করিডোর, এবং করিডোরের অপর পাশে অন্য কোনও ঘর নেই। দক্ষিণদিকে বিশাল জানলায় ভারী নীল রঙের পরদা লাগানো। পরদা তুললে ফুট ত্রিশেক নীচে দিল্লির সুসজ্জিত পথঘাটে আলোর মালা দেখা যায়। প্রবেশ-দরজার ঠিক মুখোমুখি ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে একটা ওয়ার্ডরোব। তার পাশে দেওয়ালে ঢোকানো একটা অ্যাকোয়ারিয়ামে লাল-নীল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওয়ার্ডরোবটা খুলল বৃকোদর—বর্মনখুড়ো মালপত্র রাখার অন্য জায়গা না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ওয়ার্ডরোবে রেখেছেন তাঁর সুটকেস। ওয়ার্ডরোবটা ভালো করে নজর করল বৃকোদর—তারপর কপাল বাজাতে শুরু করল। তারপর তার চোখ গেল প্রবেশ-দরজায়—ভারী নীল পরদা সেখানে অনুপস্থিত। দরজার ওপরের দিকে একটা ছ'ফুট বাই পাঁচ ফুট কাটা জায়গায় কাচ বসানো, সম্ভবত ভেতর থেকে বাইরের অতিথিকে দেখার জন্য। দরজাটা খুলল বৃকোদর। দরজার ঠিক সামনেই করিডোরের উলটো দেওয়ালে ভেতরে ঢোকানো একটা শো-কেসে রাখা ঐতিহাসিক স্ফিঙ্কসের মডেল। প্রতিটি দরজার সামনেই

একটি করে শো-কেস এবং সব ক'টিতেই নানারকম প্রাচীন ভাস্কর্যের মডেল। ঘরে ঢোকার সময় বৃকোদরের মনে হল, স্ফিঙ্কসের চোখ যেন একটু বেশি জ্বলছে।

বিছানায় শুয়ে সবে একটা চারমিনার ধরিয়েছে বৃকোদর, এমন সময় ফোন বাজল।

'লোলা হিয়ার, মিস্টার হালদার—ফিলিং লোনলি?'

'সি লোলা, আই লাইক টু হ্যাভ সামথিং টুনাইট অ্যান্ড দ্যাট ইজ আনইন্টারাপ্টেড স্লিপ।'

'সরি মিস্টার হালদার, হ্যাভ সুইট ড্রিমস। নাইট....।'

সত্যিই ঘুমোল না কিন্তু বৃকোদর। রাত্রি প্রায় দুটো পর্যন্ত অবিরাম মস্তিষ্কচালনা করে অবেশেষে তার মুখে হাসি ফুটল। তারপর বেরোল সেই লাল খেরোর লম্বাটে খাতা। লম্বাটে, কারণ গোটা একপাতাতে কেস সম্বন্ধে যাবতীয় না লিখতে পারলে, বৃকোদরের মন খুঁতখুঁত করে। হিজিবিজি জঘন্য হাতের লেখায় কী যেন সে লিখতে লাগল।

বৃকোদর উঠল সকাল ছ'টা নাগাদ। হোটেলের চারপাশে খুব যত্নে সাজানো বাগান। সেই বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে বৃকোদর লক্ষ করল, তার ঘরটা হোটেলের যে-উইং-এ, সেটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, বাইরে থেকে দক্ষিণ দেওয়ালটা এত চওড়া দেখাচ্ছে কেন? ঘরের ভেতর যা চওড়া, তার চেয়ে অন্তত ফুট-ছয়েক বেশি। পিছনে তো কোনও ঘর নেই! তাহলে?

বৃকোদর এবার হোটেলের পিছনদিকে বিরাট সুইমিং পুলে পৌঁছল। পুলের একদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইভিং বোর্ড রয়েছে। তার ঠিক পাশ দিয়ে একটা দরজা এবং ছোট্ট একটি ঘর। বৃকোদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় সেটা খুলে গেল। অবাক হয়ে বৃকোদর দেখল, লোলা দাঁড়িয়ে আছে, আর দরজা থেকে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলায়।

বৃকোদর উৎফুল্ল সুরে বলল, 'হাই লোলা, হাউ নাইস টু সি আ বিউটি ইন দ্য মর্ন—হোয়াট আর য়ু ডুইং হিয়ার?'

'ও! মিস্টার হালদার!' দরজাটা বন্ধ করতে-করতে লোলা বলল, 'আই স্টে হিয়ার—দিস ইজ আওয়ার স্টাফ কোয়ার্টার।'

কালবিলম্ব না করে লোলা চলে গেল। বৃকোদর কপাল বাজিয়ে ভাবতে লাগল, মাটির নীচে স্টাফ কোয়ার্টার!

ঠিক দশটার সময় সুরথের বাড়ি হাজির হল বৃকোদর।

বর্মনখুড়ো চুরুট ধরিয়ে বসেছিলেন, বৃকোদরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হে, সন্দেহ তোমার সত্যি না কি?'

'খুড়ো, অনুসন্ধান-পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এখন বাকি শুধু অপারেশান-পর্ব। তারও লে-আউট হয়ে গেছে, যথাসময়ে জানিয়ে দেব। আপনার সুটকেস থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে এসেছি। সুরথ-সুরথ! ব্যাঙ্ক থেকে হাজার-পাঁচেক টাকা তুলে আন...সব দশ টাকার নোটে—যাতে অ্যাটাচিটা বেশ ভরতি দেখায়, বুঝেছিস?'

'যে-সুদটা লোকসান যাবে, সেটা তুই দিয়ে দিস তাহলে!' হাসতে-হাসতে সুরথ বলল।

তারপর খুব নিচু স্বরে বৃকোদর তার আবিষ্কার এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলতে শুরু করল।

বিকেলের দিকে বৃকোদর কনট প্লেসের সেই বিখ্যাত কফি হাউসের ভেতরের কেবিনে এককোণে বসেছিল। একটা খবরের কাগজ সামনে খোলা ছিল। বৃকোদর তাতে বড়-বড় করে বি. এস. কথাটা লিখল। কিছু পরে একজন ওয়েটার অর্ডার নিতে এসে বৃকোদরের কোলে একটা মোটা খাম ফেলে দিয়ে গেল।

বৃকোদর বেরিয়ে পড়ল পকেটে পয়সা ঘোরাতে-ঘোরাতে। 'ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি' কাজটা করে দিয়েছে বলে তার এখন খুব ভালো লাগছে। কলকাতা থেকে বৃকোদর দ্বিতীয় টেলিগ্রামটা এদেরই করেছিল, হোটেল মিডল্যান্ডের মালিক সম্পর্কে খোঁজখবর জোগাড় করতে বলে। অপারেশান-পর্বের আগে আর একটা কাজই বাকি রইল বর্মনখুড়োকে নিয়ে দিল্লি পুলিশকে ব্যাপারটা ইনফর্ম করা এবং অপারেশান শেষ হওয়ার

সঙ্গে-সঙ্গেই পুলিশের অকুস্থলে উপস্থিতির ব্যবস্থাটা করে রাখা। সুরথের বাড়ি থেকে বর্মনখুড়োকে তুলে নিয়ে সে-কাজটুকুও সেরে ফেলল বৃকোদর। এরপর অপারেশান-পর্ব।

হোটেল মিডল্যান্ডের রিসেপশনে খুব মৃদু স্বরে পাশ্চাত্য বাজনা বাজছিল। নরম আলোর ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছিল সেই বাজনা। কাউন্টারের পিছনে বসে লোলা ঘড়ির টিকটিক শুনতে-শুনতে ভাবছিল, মিস্টার হালদার সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না কেন? কোনও বড় অ্যাসাইনমেন্ট হল নাকি! ভদ্রলোককে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, টোপ গিলবে কি না। ঠিক আটটা বাজল—বাইরে যেন একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ হল! ওই তো মিস্টার হালদার আসছেন!

'হাই মিস্টার হালদার, ডু য়ু এনজয় আওয়ার অ্যাঙ্কসাইটি? আফটার অল য়ু আর আওয়ার গেস্ট। ডিড য়ু ফেস এনি ডিফিকালটি? হোয়ার হ্যাড য়ু বিন সো লং, ম্যান?'

'ইয়া, আই ফেসড সাম টাবল টুডে, বাট আই ক্যান ফেস আ লট অফ টাবল ফর সাচ অ্যাচিভমেন্টস।'

বলতে-বলতে অ্যাটাচিটা খুলে ধরলেন মিস্টার হালদার ওরফে বর্মনখুড়ো। মনে-মনে ভাবছিলেন, মেয়েটা নিজেই থরে-থরে সাজানো টাকাগুলো দেখানোর সুযোগ করে দিল। যেভাবেই হোক, এগুলো দেখাতেই হত।

লোলা উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'য়ু ডিড আ গ্রেট জব, ম্যান—নাউ হ্যাভ সাম রেস্ট—বাই-ই।'

মিস্টার হালদার ঘরে গেলেন, অ্যাটাচিটা রাখলেন ওয়ার্ডরোবের ভেতরে। একটা চুরুট ধরিয়ে সবে টিভিটা খুলেছেন, এমন সময় চতুর্দিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সম্ভবত লোডশেডিং। রিসেপশনে আচমকা অন্ধকারের সুযোগে সাঁত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আর-এক মিস্টার হালদার ওরফে বৃকোদর সামন্ত। নিজের ঘরের সামনে এসে স্ফিঙ্কসের চোখের সামনে কাচে সে আটকে দিল একটা স্টিকার। ক্যাঁচ করে শব্দ তুলে ঘরে ঢুকেই সে সটান ওয়ার্ডরোবের সামনে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'খুড়ো, আমি ওয়ার্ডরোবের ভেতর ঢুকছি। আপনি প্ল্যানমাফিক পুলিশ নিয়ে সুইমিং পুলে ডাইভিং বোর্ডের সিঁড়ির পাশের দরজাটায় পৌঁছে যান। তাড়াতাড়ি...কারেন্ট এল বলে—পাঁচ মিনিট শেষ হতে চলল।'

আলো জ্বলে গেছিল। মিস্টার হালদার ওরফে বর্মনখুড়ো চুরুট মুখে রিসেপশন দিয়ে বের হওয়ার সময় বলে গেলেন, 'লোলা, আই শ্যাল বি লেট টু নাইট—সি য়ু টুমরো মর্নিং।'

ওয়ার্ডরোবের ভেতরে বসে দরদর করে ঘামছিল বৃকোদর। তার মাথায় তখন খালি চিন্তা, মালিককে অ্যারেস্ট করা গেছে কি না।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিল বৃকোদর, তার হিসেব নেই। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ওয়ার্ডরোবটা

নীচে নামতে শুরু করল। বৃকোদরের মুখে হাসি ফুটল। বেশ কিছুক্ষণ নামার পর আবার ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ওয়ার্ডরোব। আবছা আলোয় বৃকোদর দেখল, একটা ব্যাগ হাতে কে যেন এগিয়ে আসছে। পকেটে হিমশীতল নলের স্পর্শ অনুভব করতে-করতে হেসে ফেলল বৃকোদর—।

'হাই, লোলা!'

লোলা হকচকিয়ে গেল, পরমুহূর্তেই ব্যাগটা ফেলে দৌড় লাগাল।

হাসতে-হাসতে বৃকোদর ব্যাগটা খুলতে লাগল। কারণ, সে জানে, লোলার জন্য দরজায় অপেক্ষা করছেন বর্মনখুড়ো, দিল্লি পুলিশের সঙ্গে। লোলা নীচে নামার পর ওঁরা গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে দরজায় পৌঁছেছেন।

সুরথের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে বৃকোদর বলছিল, 'স্ফিঙ্কসের চোখে বসানো ছিল ভিউয়ার, যার সাহায্যে দরজায় কাচ বসানো জায়গা দিয়ে সোজা দেখা যেত ওয়ার্ডরোব—বন্ধ ও খোলা দু-অবস্থাতেই। ঘরে আর-কোনও নিরাপদ জায়গা না থাকায় লোকে ওয়ার্ডরোবেই টাকা-পয়সা রাখত, আর সেটুকু ওরা নজর করত ভিউয়ার দিয়ে। প্রতি ঘরের সামনেই একটা করে ভিউয়ার লাগানো ছিল। টাকা-পয়সা রেখে বাইরে বেরোলেই ওরা ওয়ার্ডরোব কাম লিফটকে নামিয়ে নিত আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রান্সফার রুমে। ট্রান্সফার রুম

—কারণ, ওখানেই আসল টাকা বের করে নকল টাকা ভরে দেওয়া হত। আর ঘরের মালিকরা নিজেদের অজান্তে বাজারে ছড়িয়ে দিত জাল নোট। এভাবেই এদের শিকার হয়েছে বিজয় কাজোলকার, শঙ্কর তেওয়ারি এবং আপনার ভাইপো শ্রীতরুণ। আনন্দের কথা যে, হোটেলের মালিক ধরা পড়েছে...জাল নোট তৈরির যন্ত্রপাতি উদ্ধারের কাজ এখন দিল্লি পুলিশের। ক্যালকাটা পুলিশের হোমিসাইডের বড়কর্তার একটা কাজ অবশ্য বাকি আছে এখনও : পাওনাদারের বাকি টাকাটা মেটানো—অধমের দিনকাল বড় টানাটানিতে যাচ্ছে, স্যার।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একগাল হাসলেন বর্মনখুড়ো।

মাসিক রোমাঞ্চ

অক্টোবর, ১৯৭৭



এক মুঠো হিরে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সবসুদ্ধ পঞ্চাশটি আসন। খুব ছোট হল। এমন জায়গায় যে হল আছে, বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই।

মঞ্চও খুব বড় নয়। দামি মেরুন রঙের ভারী পরদা। সপ্তাহে মাত্র দুদিন অনুষ্ঠান হয়। শনিবার আর রবিবার।

অনুষ্ঠান বলতে শুধু নাচ। রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত। প্রথমে মিস লাইটের নাচ। উগ্র বাজনার তালে-তালে হাত-পা ছুড়ে নাচ। এ-নাচ দেখতে সকলে আসে না। এটা অনেকটা মুখবন্ধ গোছের। আসল নাচ হয় রাত এগারোটায়। রাত এগারোটা থেকে সারা রাত।

মিস তুফানীর নাচ।

মন মাতাল করা দেহ। কোমল স্বচ্ছ আবরণ। পাতলা একটা ওড়না আর রঙিন ঘাগরা।

নাচের সঙ্গে-সঙ্গে তুফানী আবরণ ছুড়ে-ছুড়ে ফেলে। প্রথমে ওড়না। তারপর নাচতে-নাচতে অদ্ভুত কায়দায় ঘাগরার ফাঁস খুলে দেয়। রেশমের ঘাগরা পায়ের তলায় জড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

তুফানীর শরীরে তখন আবরণ বলতে দুটি। পাতলা কাঁচুলি, আর কটিপ্রান্ত ঢাকা ছোট জাঙিয়া।

এইবার বাজনা আর নাচ দুই-ই উদ্দাম হয়ে ওঠে।

সামনে বসা পুরুষগুলোর শালীনতা, সম্ভ্রমবোধ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিস্ফারিত চোখ মেলে তারা নারীদেহের অপূর্ব সুষমা পান করে।

ধীরে-ধীরে আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

ম্লান থেকে ম্লানতর।

এই সময় তুফানী নাচতে-নাচতে বক্ষাবরণ খুলে ফেলে। নিটোল দুটি স্তন উন্মুক্ত হয়। যৌবনের পশরা। দৃঢ় অথচ পীবর।

তারপর আলো আরও কমতে থাকে।

ঠিক অন্ধকার হওয়ার আগের মুহূর্তে তুফানীর কটিবাসও খসে পড়ে। যৌবনের অবারিত সৌন্দর্য এক মুহূর্তের জন্য পুরুষদের চোখে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

একটি আসনের মূল্য দুশো টাকা।

কিন্তু এ-দামে আসন পাওয়া যায় না। আসনের দাম পাঁচশো-ছশো টাকা পর্যন্ত ওঠে। এ-শহরের ধনীর দুলালেরা একটা টিকিটের জন্য জীবন পণ না করলেও, নিজেদের সঞ্চিত অর্থ অঞ্জলি দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে।

তুফানীর কৌলীন্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে অনেকরকম কথা বলে। যারা প্রচার করে তারা তুফানীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা বলে তুফানী জাতে ইরানি। অর্থাৎ ইরানের মেয়ে, আগে যাকে পারস্য বলত।

হয়তো নির্ভেজাল নয়। দু-পুরুষ আগে ভারতে এসে রক্তের পবিত্রতা হারিয়েছে। রক্তে কিছু ভারতীয় শোণিতের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তুফানী কোথায় থাকে, কোন হোটেলে—কেউ জানে না। জানার অনেকেই অনেক চেষ্টা করেছে। এর জন্য টাকা খরচ করতেও রাজি ছিল।

কিন্তু কোনও সূত্র থেকেই সন্ধান পায়নি।

এটুকু জানতে পেরেছে, নাচের শেষে তুফানী হোটেল থেকে বের হয় না। কখন যে বের হয়, জানা যায় না।

লোকেরা তো আর অনন্তকাল হোটেলের সামনে অপেক্ষা করতে পারে না। তবু অনেকে কিছুক্ষণ থাকে। নিজেদের মোটরের সামনে পায়চারি করে। যদি তুফানীকে দেখতে পায়।

কিন্তু না, কোনওদিন দেখেনি। ভগ্ন-মনোরথ হয়ে চলে গেছে।

দু-একজন হোটেলের ম্যানেজার ডি-মেলো সায়েবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার চেষ্টা করেছে।

ডি-মেলো খুব মেজাজি লোক। কথায়-কথায় উচ্চহাস্য করে।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। তুফানীর কোনও খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেনি।

শনিবারের বিকেল। হল জমজমাট। তখনও পরদা ওঠেনি। বিভিন্ন বর্ণের পানীয়ের গ্লাস লোকের হাতে। হলে ধোঁয়ার একটা আবরণ। প্রথমে মিস লাইটের নাচ।

সে-নাচ সম্বন্ধে লোকের বিশেষ আগ্রহ নেই।

লাইট চীনা মেয়ে। তার নাচও নিতান্ত মামুলি। তার কৃশ দেহ পুরুষের চিত্তে উন্মাদনা জাগায় না। তা ছাড়া লাইটের নাচ নিতান্তই স্তিমিতগতি।

পরদা কেঁপে উঠতেই হলের গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই মঞ্চের দিকে চোখ রাখল। লাইট সামনে এসে দাঁড়াল।

পরনে টকটকে লাল পোশাক। হাতে ফুলের স্তবক।

নাচ শুরু করার আগেই ফুলের স্তবক চুম্বন করে সেটা হলঘরে ছুড়ে ফেলে দিল।

সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য লোকেদের মধ্যে খুব একটা আগ্রহ বা ব্যস্ততা দেখা গেল না। ফুলের স্তবক যার কাছে পড়ল, সে সেটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

অর্কেস্ট্রার পটভূমিকায় লাইটের নাচ শুরু হল।

কোমর দুলিয়ে একঘেয়ে নাচ।

লাইটের নাচ এত নিরুত্তেজক, এত ঠান্ডা বলেই বোধহয় তুলনায় তুফানীর নাচ এতটা চাঞ্চল্যকর মনে হয়।

লাইটের নাচ শেষ হতে সবাই সোজা হয়ে বসল। ভাবটা যেন, এবারে বাঘের খেলা শুরু হবে।

কিন্তু হঠাৎ বিপর্যয়। সারা হলঘর অন্ধকারে ডুবে গেল।

লোডশেডিং? কিন্তু তা তো হওয়ার নয়! হোটেলে জেনারেটার আছে। কোনওদিন কোনও কারণেই অন্ধকারের রাজত্ব নামতে দেবে না।

কয়েকজন লোক ম্যানেজারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কী ব্যাপার জানার জন্য।

বাকি সবাই গোল হয়ে জটলা করতে লাগল।

এরকম একটা নাচের আসর মাটি হলেই সর্বনাশ। শুধু যে টাকাই যাবে তাই নয়, ফুর্তিও বরবাদ হয়ে যাবে। টিকিটের দাম ম্যানেজার হয়তো ফেরত দিতে পারে, কিন্তু মেজাজ একেবারে মাটি।

তুফানী ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে বসে নিজের উন্মুক্ত বুকের ওপর সেন্ট স্প্রে করছিল। হঠাৎ বাতি নিভে গেল।

তুফানী দ্রুত হাতে পোশাকে নিজের শরীর ঢেকে নিল।

নিশ্চয় ট্রান্সফরমারে কোনও গোলমাল হয়েছে।

হোটেলেই ইলেকট্রিশিয়ান আছে, কিন্তু তারা মেরামতির কাজে হাত দিতে পারবে না। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিকে খবর দিতে হবে।

বিরক্তিকর।

দরজায় ঠুকঠুক শব্দ।

তুফানী বুঝতে পারল, ম্যানেজার এসে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ বলবে, কিংবা হয়তো মোমবাতির ব্যবস্থা করবে।

এ-কামরা তার খুবই চেনা। বহুদিন ধরে ব্যবহার করছে।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

খোলার সঙ্গে-সঙ্গে দুটি কঠিন হাত সাঁড়াশির মতন এগিয়ে এসে তুফানীর মুখ চেপে ধরল।

তুফানী একটু শব্দও করতে পারল না।

একটু পরে তার মুখ থেকে হাত সরে গেল। নাকের ওপর একটা রুমাল এসে পড়ল।

উগ্র ঝাঁজালো একটা গন্ধে তুফানীর শরীর ঘিসঘিস করে উঠল।

তার দুটো চোখ বন্ধ হয়ে এল। ধীরে-ধীরে সে অচেতন হয়ে পড়ল।

আগন্তুক অবলীলাক্রমে তুফানীর দেহটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল।

পিছন দিকে একটা সরু পথ আছে। এই পথ দিয়ে হোটেলের বয়, বাটলাররা যাওয়া-আসা করে। শো-র শেষে তুফানীও এই পথ দিয়ে যায়।

হোটেলের মোটর তার জন্য অপেক্ষা করে। দ্রুত পায়ে সে মোটরে গিয়ে ওঠে। সেইজন্যই দর্শনলাভেচ্ছু লোকেরা তাকে দেখতে পায় না।

একটা কালো মোটর অপেক্ষা করছিল।

আগন্তুক অচেতন তুফানীকে নিয়ে সেই মোটরে উঠল। পিছনের সিটে তুফানীকে শুইয়ে দিয়ে, নিজে স্টিয়ারিং ধরল। সুদক্ষ হাতে শহরের যানবাহনের পাশ কাটিয়ে নক্ষত্রবেগে মোটর ছোটাল।

তিনতলায় তুফানীর ফ্ল্যাট। এ-ফ্ল্যাটে সে একলা থেকে। রান্নাবান্নার কোনও ঝামেলা নেই। মোড়ের হোটেল থেকে দু-বেলা খাবার আসে। শুধু ঝাড়পোঁছ করার জন্য একজন ঝি আছে। ঠিকে ঝি, দু-বেলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়।

আগন্তুক তুফানীকে পাঁজাকোলা করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলার দরজা খুলে একজন মহিলা বের হয়ে এল।

কে?

আগন্তুক চাপা গলায় বলল, মিস তুফানী নাচতে-নাচতে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিচ্ছি।

মহিলা কয়েক পা এগিয়ে এল।

আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?

আগন্তুক মাথা নাড়ল।

দরকার হবে না। আমি নিজে ডাক্তার।

তিনতলায় তুফানীর ফ্ল্যাটের সামনে তাকে শুইয়ে রেখে আগন্তুক নিজের প্যান্টের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল।

পরপর গোটাতিনেক চাবি চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল।

আগন্তুক ভিতরে ঢুকে বাতি জ্বালাল, তারপর আবার তুফানীকে তুলে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিল।

দরজা বন্ধ করে আগন্তুক চারদিকে নজর বোলাল।

তুফানী যেমন রোজগার করে, ফ্ল্যাট অবশ্য সেই অনুপাতে সাজানো নয়।

বাইরের ঘরে সোফা গোটাতিনেক। বেশ পুরোনো। মনে হয়, কেনা নয়, ভাড়া করা। শোওয়ার ঘরে একটা সিঙ্গল খাট। একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলনা। কোণের দিকে ড্রেসিংটেবিল। খাটের কাছে ছোট একটা টিপয়ের ওপর লাল রঙের ফোন।

আগন্তুক ধীরপায়ে কোণের দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছুরি বের করে নিচু হয়ে ফোনের তার কেটে দিল।

তারপর আবার খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

তুফানী অচেতন। আরও আধঘণ্টার আগে তার জ্ঞান ফিরবে এমন আশা কম।

তুফানীর দেহে গোলাপি সিল্কের একটা আবরণ সরে গেছে। ব্রাও অটুট নেই। আনার সময় সম্ভবত ছিঁড়ে গেছে। দুগ্ধ ধবল একটি স্তন অবারিত। তার মাথায় গোলাপি মুকুট। সুডৌল ঊরু। ক্ষীণকটি। নিঃসন্দেহে সুগঠিত দেহ।

এ-দেহ মানুষের প্রথম রিপুকে উদ্দীপিত করে।

এই দেহই তুফানীর জীবিকার মূলধন।

আগন্তুক এদিক-ওদিক সন্ধান করতে-করতে বালিশের তলায় চাবির রিং পেয়ে গেল। তারপর ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলল।

শাড়ির পর শাড়ি। নাইটি। কিছু সিল্কের পাজামা। তারপর ব্লাউজ আর অন্তর্বাস। মনে হল তুফানীর উপার্জনের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় তার সাজপোশাকে।

কিংবা এসব হোটেল কর্তৃপক্ষের উপহারও হতে পারে।

তুফানীর জন্য হোটেলের আয় বড় কম নয়।

দ্রুত হাতে আগন্তুক শাড়ি-ব্লাউজ সরিয়ে ওয়ার্ডরোবের ভিতরে কী অনুসন্ধান করল। মুখ দেখে মনে হল, পেল না।

ওয়ার্ডরোব বন্ধ করে বাইরের ঘরে চলে এল। হাত দিয়ে টিপে-টিপে সোফাগুলো পরীক্ষা করল, হতাশ হয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

ছোট একটা খাওয়ার টেবিল। দু-দিকে দুটো চেয়ার। দেওয়াল-সেলফে কিছু কাপ-ডিশ।

রান্নার বালাই নেই বলেই বোধহয় রান্নাঘর পরিষ্কার।

হঠাৎ খুট করে শব্দ হতেই আগন্তুক চমকে উঠল। আওয়াজটা যেন শোওয়ার ঘর থেকেই আসছে।

তবে কি তুফানীর জ্ঞান ফিরে এসেছে?

আগন্তুক শোওয়ার ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। তুফানী উপুড় হয়ে ফোন ডায়াল করার চেষ্টা করছে। গাউন মেঝেতে লুটোচ্ছে।

পরনে শুধু চিতাবাঘের ছাপের জাঙিয়া।

বৃথাই চেষ্টা করছ। ফোনের লাইন কাটা।

আগন্তুকের কণ্ঠে তুফানী চমকে মুখ ফেরাল। হাত দিয়ে গাউন খোঁজার চেষ্টা করল, পেল না।

আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে গাউনটা কুড়িয়ে নিয়ে তুফানীর দিকে ছুড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট-দশেক পরে যখন ফিরে এল, দেখল তুফানী গাউন জড়িয়ে ভদ্রভাবে বসেছে।
আগন্তুককে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কে আপনি?
আগন্তুক হাসল।
নাম বললেই চিনতে পারবে এমন নামি লোক নই।
কী চান আপনি আমার কাছে?
কী চাই তুমিই বলো?
সকলে যা চায়। আমার দেহ। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওভাবে আমি নাচি বটে, কিন্তু আমি সাধারণ অর্থে গণিকা নই।
তাহলে তুমি এভাবে নিজের নগ্ন দেহ সকলের সামনে তুলে ধরো কেন?
তুফানী দু-হাতে মুখ ঢাকল। তার স্পন্দমান দেহ দেখে মনে হল, সে কাঁদছে।
আগন্তুক অসহিষ্ণুভাবে নিজের হাতঘড়ির দিকে দেখল।
আমার সময় অত্যন্ত কম। যা বলার বলে ফ্যালো।
আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?
কথাটা তুমি কী বলো, তার ওপর নির্ভর করছে।
বলছি।
তাড়াতাড়ি বলো।
তুফানী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।
আগন্তুকের মনে হল, তুফানী অযথা সময় কাটানোর চেষ্টা করছে। সে ভাবছে, দেরি হলে হোটেলের লোক তার ফ্ল্যাটে এসে উদ্ধার করবে তাকে।
আগন্তুক তাড়া দিল।
বলো, বলো, আমার হাতে বেশি সময় নেই।
আমার এক ভাই আছে, তাকে আমি দার্জিলিঙে রেখে পড়াচ্ছি। যা উপায় করি, তার বেশিরভাগই তাকে পাঠিয়ে দিতে হয়।
কিন্তু উপার্জনের জন্য আর-কোনও ভদ্র জীবিকা খুঁজে পেলে না?
বিশ্বাস করুন, অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পাইনি। খুব সামান্য লেখাপড়া জানি। কোনও অফিসে কেউ নিল না। ছেলেবেলায় নাচ শিখেছিলাম, ভগবান সুঠাম দেহ দিয়েছিলেন। তাই কপাল ঠুকে এ-লাইনে এসে পড়লাম। এরপরও কি আপনি আমার দেহ উপভোগ করতে চান?
কোনও সময়েই তোমার দেহ ভোগ করার ইচ্ছে আমার ছিল না।
তবে?
তোমার কাছে আমি একটি জিনিস চাই।
কী?
আমার কিছু মূল্যবান হিরের প্রয়োজন। তাই দিতে হবে।
তুফানী চোখ কপালে তুলল।
হিরে! হিরে আমি কোথায় পাব?
কোথায় পাবে সেটা আমার বলার কথা নয়। আমার কাছে খবর, তোমার এই ফ্ল্যাটেই কিছু হিরে আছে।
কী বলছেন!
হ্যাঁ, যে-হিরে তিন দিন আগে প্লেনে এসেছে।
আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।
না পারলে আমি নাচার।

বেশ, আমার ফ্ল্যাট আপনি সার্চ করুন।

তা তো করবই, কিন্তু তুমি বলে দিলে আমার খাটুনি বাঁচত। অযথা আমাকে তোমার বিছানাপত্র, বালিশ, ছুরি দিয়ে ফালা-ফালা করতে হত না।

কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই আমার ফ্ল্যাট সার্চ করার আপনার কি অধিকার আছে?

আইনত কোনও অধিকার নেই। দুর্বৃত্ত আইন মানে না। আমার শক্তিই আমার আইন।

বেশ, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

তোমার তো বলবার কিছু থাকতেই পারে না। কারণ তুমি নিজে বেআইনি কাজে লিপ্ত। চোরাকারবারে অংশীদার। চিরকালই চোরের ধন বাটপাড়ের ভোগে লাগে।

তুফানী একটি কথাও বলল না। একটা পায়ের ওপর আর-একটা পা রেখে চুপচাপ বসে রইল।

পকেট থেকে ছুরিটা বের করে আগন্তুক বাইরের ঘরে চলে এল। সোফার ওপর ছুরিটা বসানোর সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল।

এ ছাড়া তার উপায়ও ছিল না।

পিছন থেকে তুফানী তাকে জাপটে ধরেছে। সে একেবারে নগ্ন। জাঙিয়াও খুলে ফেলেছে। আগন্তুকের পিঠে যৌবনের তাপ স্পর্শ করাতে-করাতে বলল, ওভাবে আমার সোফাগুলোকে আমি নষ্ট করতে দেব না। তুমি বিশ্বাস করো, যা খুঁজছ তা আমার কাছে নেই।

নিজেকে সামলাতে আগন্তুকের দু-এক মুহূর্ত লাগল। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে তুফানীকে ঠেলে দিল।

তুফানী ছিটকে ঘরের এককোণে গিয়ে পড়ল। ঠিক দরজার পাশে।

সেই মুহূর্তে কলিং বেল বেজে উঠল।

'ডং-ডং'।

আগন্তুক ওঠার আগেই তুফানী তড়িৎগতিতে উঠে দরজা খুলে দিল।

তখনও সে সম্পূর্ণ নগ্ন।

ঘরের মধ্যে দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক চেহারা প্রবেশ করল। পরনে লাল গেঞ্জি, ফুলপ্যান্ট। মাথায় কদমছাঁট চুল। একটা চোখ কানা।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, কী ব্যাপার?

ততক্ষণে তুফানী পরদার আড়ালে নিজের দেহ লুকিয়েছে।

কাঁদো-কাঁদো গলায় সে বলল, ইয়াকুব, এই লোকটা অযথা আমার ওপর হামলা করছে। হোটেল থেকে অজ্ঞান করিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। বলছে, আমার কাছে যেসব হিরে আছে, তা চায়।

ইয়াকুব বিরক্ত দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে বলল, ব্যাটা পুলিশের চর নাকি?

জানি না।

কীরে, কে তুই, তোর মতলবটা কী?

আগন্তুকও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে খোলা ছুরি।

ইয়াকুব যে তাকে আক্রমণ করবে সেটা বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। সে-ও নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করল। কিন্তু সময় পেল না!

ইয়াকুব বিদ্যুৎবেগে পা ছুড়ল আগন্তুকের দিকে।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

লাথি আগন্তুকের চোয়ালে লেগে ক্ষতের সৃষ্টি করল। দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আগন্তুক হাতের ছুরিটা ছুড়ল।

ইয়াকুব মাথা নিচু করে ফেলতে ছুরিটা দেওয়ালে লেগে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

এবার ইয়াকুব আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে জাপটাজাপটি, মুখোমুখি।

একসময়ে দেখা গেল আগন্তুক মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছে।

যন্ত্রণায় উঁ-আঁ করে অচেতন হয়ে পড়ল।

তুফানী, তুফানী।

তুফানী ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে গাউন জড়িয়ে নিয়েছে।

কী, বলো?

আমি ভালো বুঝছি না। আমাদের আস্তানা বদল করতে হবে। তুমি পোশাক পরে নাও।

তুফানী পাশের ঘরে চলে গেল।

মিনিট-পনেরোর মধ্যে তুফানী ফিরে এল। একেবারে সুসজ্জিত বেশে।

ইয়াকুব, চলো।

ইয়াকুব মাথা নাড়ল।

দাঁড়াও, মালগুলো সঙ্গে নিয়ে যাই।

ইয়াকুব দেওয়ালের কাছে গিয়ে পাখার একটা সুইচ টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে যান্ত্রিক একটা শব্দ। মনে হল, পিছনের দেওয়াল যেন অল্প সরে যাচ্ছে।

ইয়াকুব দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটো নামিয়ে ফেলল।

চৌকো একটা গর্ত।

আগন্তুক অচেতন হওয়ার ভান করে শুয়েছিল, কিছু মোটেই জ্ঞান হারায়নি।

ইয়াকুব আর তুফানী দুজনের মন যখন অন্যদিকে ব্যস্ত, তখন পকেট থেকে ছোট একটা রিভলভার বের করে ইয়াকুবের ঊরু লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল।

ঠিক ঊরুর মাঝখানে গুলি বিঁধল।

ও গড!—বলে ইয়াকুব মেঝের ওপর বসে পড়ল।

আগন্তুক আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করল না। লাফিয়ে উঠে পরদা টেনে নামাল। তারপর সেই পরদা দিয়ে ইয়াকুবের দুটি হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। জানলার পরদা ছিঁড়ে ইয়াকুবের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এত সব করার সময়ে আগন্তুকের নজর কিন্তু ছিল তুফানীর ওপর।

সব ব্যাপারটা দেখে তুফানী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপরই সামলে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল শোওয়ার ঘরে।

ইয়াকুবকে বাঁধার কাজ শেষ করে আগন্তুক দরজার একপাশে লুকিয়ে রইল। একটু পরেই তুফানী ঘরে ঢুকল। হাতে লোহার রড। বোধহয় পরদা থেকে খুলে নিয়েছে।

কিন্তু ঘরে পা দিয়েই আগন্তুককে না দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

তারপর ইয়াকুবের দিকে এগিয়ে গেল।

আগন্তুক পিছন থেকে সজোরে তাকে জাপটে ধরল।

আচমকা আক্রমণে তুফানীর হাত থেকে লোহার রডটা ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

তুলোর মতন নরম শরীর। যৌবন-পুষ্পিত দেহ।

দু-এক মুহূর্তের জন্য আগন্তুক মানসিক ভারসাম্য হারাল।

কিন্তু যখন তার মনে হল, তুফানী ইচ্ছে করেই যেন তার যৌবন-পশরার স্পর্শের সুযোগ দিচ্ছে, তখনই সে সাবধান হয়ে গেল। টানতে-টানতে তাকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। মুখে হাতচাপা দিয়ে। বিছানার চাদর দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। বালিশের একটা ঢাকা মুখের মধ্যে পুরে দিল। তারপর বিছানার ওপর শুইয়ে রাখল।

বাইরের ঘরে এসে দেয়ালের গর্তের মধ্যে দেখল।

কাঠের একটা ড্রয়ার। ড্রয়ারটা খুলতেই আগন্তুকের চোখ ঝলসে গেল। পাশাপাশি গোটাদশেক হিরে। ঔজ্জ্বল্যে আর আয়তনে অপূর্ব। এর যে কত দাম হতে পারে আগন্তুক আন্দাজ করতে পারল না।

একবার ইয়াকুবের দিকে চোখ ফেরাল। সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

হিরেগুলো কাগজে মুড়ে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর বাইরে এসে দরজায় চাবি দিয়ে দিল।

নামার সময় আবার দোতলার সেই মহিলার সঙ্গে দেখা।

আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল, ওপরে ইয়াকুব এসেছে বুঝি?

কী করে বুঝলেন?

আওয়াজ শুনে। ও এলেই হাঙ্গামা শুরু করে।

আগন্তুক হাসল। নামতে-নামতে বলল, মাতালের কাণ্ড তো!

আগন্তুক মোড়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ঢুকল।

ডাক্তারকে নিজের কার্ড দেখিয়ে বলল, একটা ফোন করব। কত লাগবে?

কার্ড দেখে ডাক্তার বিগলিত।

কী আবার দেবেন? কিছু নয়। যতগুলো ইচ্ছে ফোন করুন।

আগন্তুক ফোন তুলল।

লালবাজার? ডি সি অবনী লাহিড়ীকে দিন।

ফোনের ওপার থেকে অবনীর কণ্ঠ ভেসে এল, লাহিড়ী বলছি।

আমি পারিজাত বক্সি।

হ্যাঁ, বলুন।

আপনি একবার মতিলাল রায় লেনে আসতে পারেন? মোড়ে আমি অপেক্ষা করছি।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জিপ এসে হাজির। ভিতরে অবনী লাহিড়ী।

পারিজাত বক্সি জিপে উঠে বসলেন। যেতে-যেতে অবনী লাহিড়ী সব ঘটনা শুনলেন।

শুনে বললেন, আপনি তো কাজের কাজ করেছেন, স্যার। আমরা দলটাকে ধরতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছি।

সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি পারিজাত বক্সি আর অবনী লাহিড়ী উঠলেন।

পিছনে-পিছনে দুজন পুলিশ।

পারিজাত বক্সি চাবি দিয়ে দরজা খুলতে-খুলতে বললেন, দুজনকে দুটো ঘরে বেঁধে রেখেছি। বাইরের ঘরে ইয়াকুব আর শোওয়ার ঘরে তুফানী। ওই দেখুন না।

দরজা খুলেই পারিজাত বক্সি চমকে উঠলেন। পরদার কাপড় পড়ে আছে, ইয়াকুব নেই।

তিনি ছুটে পাশের ঘরে গেলেন। একই ব্যাপার। তুফানীও উধাও।

আশ্চর্য কাণ্ড! দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, কী করে এরা পালাল? বাইরে যাওয়ার আর তো কোনও পথ নেই।

অবনী লাহিড়ী মুচকি হাসলেন। তাঁর হাসিতে ব্যঙ্গের রেশ।

কী হল?

পারিজাত বক্সি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যেভাবে দুজনকে বাঁধা হয়েছিল, তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

পারিজাত বক্সি ছুটে রান্নাঘরে গেলেন। এর আগে রান্নাঘরে লক্ষ করেননি। একেবারে কোণের দিকে কাঠের একটা সিঁড়ি। ছাদে ওঠার।

পারিজাত বক্সি সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলেন। ছাদে উঠতেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।

একেবারে পাশাপাশি বাড়ি। একটা শিশুও বোধহয় এক ছাদ থেকে আর-এক ছাদে যেতে পারে। এই ছাদ দিয়ে কেউ এসে ওদের উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

পারিজাত বক্সি অবনী লাহিড়ীকে সেই কথাই বললেন।

অবনী লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, হিরেগুলো কই?

পারিজাত বক্সি পকেট থেকে কাগজের মোড়ক খুলে দেখালেন।

ম্লান চাঁদের আলোয় হিরেগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল।

অবনী লাহিড়ী বললেন, আমি অবশ্য জহুরি নই, কিন্তু তাহলেও মনে হচ্ছে হিরেগুলো খুব দামি। কোনও জুয়েলারকে দিয়ে যাচাই করে নিলেই ঠিক বোঝা যাবে। যাক, পাখি তো পালিয়েছে। আমরা ঘরদোর একবার সার্চ করে দেখি।

পারিজাত বক্সি সোফায় চুপচাপ বসে রইলেন। ব্যথাটা এবার চিনচিন করে উঠছে। উত্তেজনার মধ্যে এতক্ষণ টের পাননি।

অবনী লাহিড়ী পুলিশ নিয়ে ঘরগুলো তন্নতন্ন করে সার্চ করলেন। সেরকম কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া। বোঝা গেল, টাকাপয়সা যা ছিল, সবই সঙ্গে নিয়ে গেছে।

পারিজাত বক্সি ভাবতে লাগলেন।

যে-হোটেলে তুফানী নাচত, তার ম্যানেজারের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখতে হবে। যদি তুফানী সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়।

লালবাজারে হিরেগুলো জমা দিয়ে পারিজাত বক্সি বাড়ি চলে গেলেন।

পরের দিন সকালেই তিনি হোটেলে গিয়ে হাজির।

ম্যানেজার প্রাতরাশ সেরে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, পারিজাত বক্সি সামনে গেলেন।

মিস তুফানীর ব্যাপারে এসেছি।

ম্যানেজার অতিমাত্রায় উৎফুল্ল।

তুফানীর কোনও খবর পেয়েছেন?

না।

তুফানীর কেউ খোঁজ করতে এসেছিল?

হ্যাঁ, ওর মামাতো ভাই ইয়াকুব এসেছিল। আমরা তো কিছু বলতেই পারলাম না।

ইয়াকুব মানে, লম্বা চেহারার কানা ভদ্রলোক?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তিনিই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। তাই আমি এসেছি। ব্যাপারটা সব খুলে বলুন তো।

ম্যানেজার যা বললেন, কিছুই পারিজাত বক্সির অজানা নয়। বিশেষ করে তিনিই যখন সব কাণ্ডটার নায়ক।

কাল হোটেলের যা লোকসান হয়েছে! সব দর্শককে গুনে-গুনে টাকা ফেরত দিতে হল। তারপর মিস তুফানীকে না পাওয়া পর্যন্ত, সব শো বন্ধ।

কার ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

কার কথা বলব? এ-শহরের ধনী যুবকদের মধ্যে অনেকেই আমার কাছে আসত মিস তুফানীকে রানি করে রাখার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু মিস তুফানী ও-ধরনের নাচত বটে, কিন্তু এদিকে খুব চরিত্রবতী ছিল! আমাকে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছিল, এ-ধরনের প্রস্তাব যেন তার কাছে না করি।

তুফানীকে জোগাড় করলেন কোথা থেকে?

ওই ইয়াকুব এনেছিল।

তুফানী কতদিন আছে এখানে?

তা বছর-দুয়েক হবে। আপনি একবার জোর তল্লাশি চালান, স্যার। ওকে না পেলে, আমার হোটেল একেবারে কানা হয়ে যাবে।

ইয়াকুবের ঠিকানা জানেন?

দুজনের একই ঠিকানা। তিনের দুই মতিলাল রায় লেন।

ধন্যবাদ। দেখি, কতদূর কী করতে পারি।

পারিজাত বক্সি বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন। হোটেল থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন লালবাজারে।

অবনী লাহিড়ীর কামরায় ঢুকে বললেন, আমাকে একবার স্মাগলারদের অ্যালবামটা দেখান তো।

অবনী লাহিড়ী অ্যালবাম এনে দিলেন।

কীরকম চেহারার লোক খুঁজছেন বলুন তো?

বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা, কদমছাঁট চুল, একটা চোখ কানা।

কোন চোখ?

একটু ভেবে পারিজাত বক্সি বললেন, বাঁ-চোখ।

বুঝেছি। গোমেজ। দুর্দান্ত স্মাগলার। আপনি যে বললেন, ইয়াকুব?

পারিজাত বক্সি হাসলেন : এইসব মহাপ্রভুদের তো শতনাম থাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আচমকা মার খেয়ে ইয়াকুব 'ও গড' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ইয়া আল্লা' বলেনি। তাহলে ইয়াকুবই হয়তো গোমেজ।

অ্যালবামের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে পারিজাত বক্সি থেমে গেলেন। একটা ফটোর ওপর হাত রেখে বললেন, এই যে, এই লোকটি।

অবনী লাহিড়ী ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

এই তো গোমেজ। সোনার বার চোরাচালান করার জন্যে সাত বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়েছিল। আমার ধারণা ছিল, এখন এ-দেশ ছেড়ে বাইরে চলে গেছে।

কোথায় আর গেছে! এ-দেশে বহাল তবিয়তেই রয়েছে। পুরোনো ব্যবসাও করছে।

এই সময় একজন সাব-ইনস্পেক্টর এসে সেলাম করে একটা কাগজ অবনী লাহিড়ীর হাতে দিল।

অবনী লাহিড়ী কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পারিজাত বক্সিকে বললেন, জহুরির ভ্যালুয়েশান রিপোর্ট এসে গেছে। ওই দশটা হিরের দাম লাখ-দেড়েক টাকার ওপর।

পারিজাত বক্সি সে-কথায় বিশেষ কর্ণপাত করলেন না। বললেন, সে তো হল, কিন্তু গোমেজ মহাপ্রভুকে ধরার কী বন্দোবস্ত করা যায়?

ওর একটা পুরোনো আস্তানার কথা আমার জানা আছে।

সে-আস্তানায় নিশ্চয় যাবে না। আমার মনে হয়, মতিলাল রায় লেনের বাড়িটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করুন। ও-বাড়িতে ওদের আরও কিছু থাকতে পারে। সেজন্যে হয়তো ফিরে আসবে।

ঠিক আছে, একজন পুলিশ আর একজন সাব-ইনস্পেক্টর মোতায়েন করে দিচ্ছি।

পারিজাত বক্সি চলে এলেন।

দিন-পনেরো পর খুব ভোরে ফোন বেজে উঠল।

পারিজাত বক্সি তখনও বিছানায়। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিলেন।

মিস্টার বক্সি?

কথা বলছি।

আমি অবনী লাহিড়ী। একটা খবর আছে।

কী?

দিন-দুই হল মতিলাল রায় লেনের বাড়ির সামনে একটা অল্পবয়েসি ভিখারি বেহালা বাজিয়ে গান করছে বিকেলবেলা। তার সঙ্গে ওড়না ঢাকা একটি মেয়েছেলেও আছে।

মেয়েছেলেও আছে!

পারিজাত বক্সি এবার বিছানার ওপর উঠে বসলেন।

তারপর?

তারপর ওই ফ্ল্যাটের দোতলার একটি মহিলা নেমে এসে তাদের পাউরুটি, পয়সা এসব দিচ্ছে।

খুব ভালো খবর। আমি একটু পরেই যাচ্ছি আপনার কাছে।

দুপুরবেলা পারিজাত বক্সি সেই দোতলার ফ্ল্যাটের বেল টিপলেন।

মহিলাটি দরজা খুলেই দু-পা পিছিয়ে গেল।

সামনে পারিজাত বক্সি। হাতে উদ্যত রিভলভার।

একটু আওয়াজ করলেই খতম করে দেব। এসো আমার সঙ্গে।

মহিলা নীচে দাঁড়ানো পুলিশের গাড়িতে এসে উঠল।

পুলিশের গাড়ি থেকে একটি মহিলা নেমে পারিজাত বক্সির পিছন-পিছন ওপরে উঠল।

বিকাল হতেই অন্ধকার নামল। একে শীতের কুয়াশা, তার ওপর কাছাকাছি কোনও বাতিও নেই।

অন্ধকার ভেদ করে বেহালার করুণ সুর শোনা গেল। অব্যক্ত একটা কান্না যেন গুমরে-গুমরে উঠছে।

বেহালার শব্দ বাড়ির সামনে আসতেই পারিজাত বক্সি মহিলাকে ইশারা করলেন।

এই মহিলাটি দোতলার ফ্ল্যাটের মহিলার পোশাক পরে তৈরিই ছিল। ধীরে-ধীরে নেমে গেল। তার হাতে আস্ত একটা পাউরুটি।

পাউরুটিটা বেহালাবাদকের ঝুলিতে ফেলে দিতেই লোকটা ফিসফিস করে বলল, আজ পুলিশের পাহারা আছে নাকি?

মহিলা মাথা নাড়ল : না, নেই।

নর্তকী নীচেই রইল। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের কাছে গেল। চাবির গোছা বের করে পারিজাত বক্সির আঁটা তালা খুলে ফেলল। তারপর সোজা শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

খাটের সঙ্গে লাগানো বেডসুইচটা বারদুয়েক টিপতেই খাটের পাশের কাঠ সরে গেল। লোকটা তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুটো সোনার বিস্কুট বের করে আলখাল্লার ভিতরের পকেটে রেখে দিল।

গোমেজ, মাথার ওপর হাত তোলো।

গোমেজ চমকে মুখ ফেরাল।

একেবারে পিছনে পারিজাত বক্সি। হাতে রিভলভার।

গোমেজের দুটো চোখ বাঘের চোখের মতন জ্বলে উঠল। কিন্তু সে নিরুপায়।

পারিজাত বক্সি ছাড়াও আরও দুজন অফিসার তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে রয়েছে।

আবার পারিজাত বক্সির বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।

পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আগেরবার পা জখম করেছিলাম, এবার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ব।

মাথা নিচু করে গোমেজ ওরফে ইয়াকুব সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

তার আগেই তুফানীকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়েছে।

অবনী লাহিড়ী নিজের হাত প্রসারিত করে পারিজাত বক্সির একটা হাত আঁকড়ে ধরলেন।

আপনার ঋণ শোধ করব কী করে?

পারিজাত বক্সি হাসলেন।

শোধ করতে তো আমি বলছি না। একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে দিন। আচ্ছা, আজ চলি। ইয়াকুবকে ভালোভাবে গার্ড করে নিয়ে যাবেন। পথে আত্মহত্যার চেষ্টা না করে।

পারিজাত বক্সির ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল। তিনি গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন।

অপরাধ

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৭



শুশুক-মানুষের রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক

গোয়ার মারগাঁও থেকে বিমানবাহিনীর একটি ডাকোটা বিমান আমাদের পাঁচজন সাংবাদিকের একটি দল নিয়ে যখন আকাশে উড়ল, তখন বিকেল চারটে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কোরাডিভি দ্বীপে। ভারত সরকারের সমুদ্রবিজ্ঞান দফতরের একটি গষেণাগার রয়েছে সেখানে। সেটি আমাদের দেখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকার আশা করেন, সব দেখেশুনে ফিরে গিয়ে আমরা নিজেদের কাগজে চমৎকার রিপোর্ট লিখব। কোরাডিভি জাহাজে অথবা স্টিমারেও পৌঁছনো যায়। কিন্তু তাতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। এখানে বিমানবাহিনীর একটি বিমানঘাঁটি আছে। তাই ওইভাবে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হয়েছে। পৌঁছতে মোটে দু-ঘণ্টা লাগবে। আরব সাগরের সৌন্দর্য নাকি বিমান থেকে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না...।

সত্যি তাই। আমাদের বিমানটি নাক বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে ঠিক ছ'টায় দ্বীপের বিমানঘাঁটিতে মাটি ছুঁল। সেখানে একদফা বিমানবাহিনীর আতিথ্যে কফি পান করে এবার আমরা একটা স্টেশন ওয়াগনে উঠলুম।

কোরাডিভি আসলে একটি প্রবালদ্বীপ। শেষ-বেলায় চারদিকে তাকিয়ে বুঝলুম, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসামান্য। মাটি অসমতল। কোথাও-কোথাও ন্যাড়া টিলা মাথা তুলে আছে গাছপালার মধ্যে। গ্রীষ্মকালে সাড়ে ছ'টায় বঙ্গদেশে যখন গোধূলিকাল, এখানে তখনও দেখছি সূর্য অস্ত যায়নি।

আমরা তিন কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানেই সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণাগার। যিনি আমাদের অভ্যর্থনা করে গাড়িতে তুলেছেন, তাঁর নাম ডক্টর রাজগোপাল। স্বয়ং ডিরেক্টর।

ডক্টর গোপাল বললেন, আজ রাতের মতো আপনাদের কষ্ট দেব না। বিশ্রাম করুন। আগামী সকালে প্রোগ্রাম অনুসারে দেখাশোনার ব্যবস্থা করব।

একটা টিলার গায়ে গবেষণাগার। তার পিছনে পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচেই সমুদ্র। অর্থাৎ আরব সাগর। সর্দার শোভন সিং নামে এক সাংবাদিক বললেন, পশ্চিমদিকটা খাড়াই। পূর্ব এবং দক্ষিণে কিন্তু চমৎকার বিচ আছে। দু-দিকেই এক কিলোমিটার করে চওড়া। বালির ওপর গাড়ি চালিয়ে ছোটা যায়। আমি বছর-তিন আগে একবার এসেছিলুম। প্রচুর নারকেল গাছ আছে ওদিকে। ট্যুরিস্ট লজ আছে। দুটো প্রাইভেট হোটেল আছে।

তবে কোনও বসতি নেই। সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি থাকার দরুন স্থায়ীভাবে কাকেও বাস করতে দেওয়া হয় না। যারা বাইরে থেকে এখানে বেড়াতে আসে, তাদের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

জিগ্যেস করলুম, পাশাপাশি আর-সব দ্বীপে নিশ্চয় বসতি আছে?

জবাব দিলেন ডক্টর রাজগোপাল, আছে। তবে বেশিরভাগই কেরল এলাকার জেলে। কিছু আরবও মাঝে-মাঝে এসে কিছু সময় থেকে যায়। তারা শাঁখ আর কড়ির ব্যবসা করে। কোনও-কোনও দ্বীপে স্থায়ী বাসিন্দাও কাছে। স্কুল-ডাকঘর-হাসপাতালও আছে।

কথা বলতে-বলতে আমরা পৌঁছলুম দক্ষিণে রাস্তার ওপারে আরেকটা টিলার ওপর অবস্থিত রেস্টহাউসে। দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। একটা ছোট্ট হ্রদও রয়েছে পিছনে। ততক্ষণে সূর্য ডুবেছে। কিন্তু যথেষ্ট আলো আছে। বাড়িটার নীচে দক্ষিণে ঢালু হয়ে নেমেছে টিলা। তার নীচে খানিকটা সমতল জমি সবুজ ঘাসে ভরা। হ্রদের জল সেই জমিকে ছুঁয়ে আছে। হ্রদের ধারে কোথাও শর জাতীয় ঝোপঝাড় এবং ঝোপের পাশে একটা পাথরের ওপর বসে কে যেন তন্ময় হয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছি। মাথায় টাক আছে। টাকে সূর্যাস্তের লালচে ছটা পড়েছে। সে ছিপে খ্যাঁচ মেরে একটা মাছ টেনে তুলল এবং আমাদের দিকে ঘুরল। তখন দেখলুম, লোকটার মুখে দাড়িও আছে। সাদা ঝকমকে দাড়ি। খাড়া নাক। কোনও আমেরিকান হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এ-দ্বীপে বিদেশিদের নাকি আসা বারণ...।

কিন্তু ওই বাদামি রঙের বিদঘুটে জ্যাকেট এবং ধূসর পাতলুন, পাথরের ওপর সযত্নে রাখা টুপি ও ছড়ি, এমনকী মাছ ধরতে বসেও যার গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝোলে, সে পৃথিবীতে একজনই।

তারপর দেখলুম, মাছটা কিটব্যাগে রেখে বুড়ো টাক-দাড়িওলা লোকটা পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল। হাওয়া বাঁচিয়ে চুরুট ধরানোর ভঙ্গিটি তো আমার চোখস্থ হয়ে আছে। এই সময় সে আচমকা ঘাসের ওপর থেকে কী একটা তুলে নিল। একটা অদ্ভুত ছোট জাল—দু-দিকে দুটো দু-হাত, আড়াই হাত লম্বা সরু কাঠিতে আটকানো। জালটা নিয়ে সে ঝোপের দিকে পা টিপে-টিপে এগোল। হুঁ, প্রজাপতি ধরতে যাচ্ছে।

ব্যস। সবাইকে হতবাক করে আমি সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ি টাট্টুর মতো দৌড়লুম। নীচে লনে পৌঁছে দেখি বাঁ-দিকে পাঁচিল। পাঁচিলটা ফুটতিনেক উঁচু মোটে। সেই পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপারে পড়লুম। পেছনে দোতলায় হতবাক লোকগুলো এতক্ষণ পরে চেঁচাতে শুরু করেছে, মিস্টার চৌধুরী! মিস্টার চৌধুরী! হল কী? ব্যাপারটা কী?

কে যেন ভাঙা বাংলায় বিকট ডাক ছাড়ছে, জয়োন্তোবাবু! জয়োন্তোবাবু! কী হোয়েসে—কী হোয়েসে?

ততক্ষণে ঢালু জমি দিয়ে প্রায় গড়াতে-গড়াতে ঘাসের জমিটায় পড়েছি এবং পড়া মানে একেবারে চিৎপাত। ব্যথা অবশ্য পেলুম না। কিন্তু উঠতে দেরি হল।

ঝোপের কাছে লোকটা প্রজাপতি ধরার তালে এত তন্ময়, যেন পেছনে কী ঘটছে—তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। ধীরে-সুস্থে প্রজাপতিটা একটা সচ্ছিদ্র ছিপি-আঁটা মোটা কাচের জারে ভরে সে জালটা ভাঁজ করল। কিটব্যাগে ভরল। আলো অনেকটা কমে গেছে ততক্ষণে।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। এবার রীতিমতো অপমানিত বোধ করছি। অভিমানের বাষ্পে মন গুমোট। কোথায় আশা করেছিলুম—'হ্যালো ডার্লিং' বলে একটি চিৎকার, কোথায় এই নির্বিকার অমনোযোগ।

নাকি আমার সত্যি ভুল হচ্ছে? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটু ঘুরে টিলার ওপর রেস্টহাউসের দোতলার বারান্দা থেকে লোকেরা দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে। বুদ্ধির দোষে কী হাস্যকর কাণ্ড না করে ফেললুম! এরপর ওরা হাসাহাসি করবে আমাকে নিয়ে। বলবে, এই হল কিনা বাঙালি বুদ্ধু।

আর চুপ করে না থেকে বললুম, মহাশয় কি অন্ধ এবং বধির?

নির্বিকার বৃদ্ধ লোকটি ছিপ গোটাতে-গোটাতে চাপা গলায় বলে উঠলেন, ওদের গিয়ে বলো, ভুল করে চেনা লোক ভেবেছিলে। ঘণ্টাখানেক পরে যে-কোনও ছলে পূর্বদিকের বিচে ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁয় যাবে।

খুব সাবধান, একা যাবে। কেউ যেন জানতে না পারে। এই রাস্তা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—ছেলেমানুষি কোরো না। চলে যাও এখান থেকে। ওদের এ-কথাও বোলো না যে ভুল করে আমাকেই ভেবেছিলে।

হতভম্ব হয়ে টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলুম। রেস্টহাউসের পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখি এদিক থেকে অন্তত ছ'ফুট উঁচু। ওপরের বারান্দা থেকে ডক্টর রাজগোপাল বললেন, পশ্চিমদিকে ঘুরে গেট দিয়ে আসুন...।

ক্লান্ত শরীরে রেস্টহাউসের দোতলায় উঠতেই ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রশ্ন ছুড়ে মারতে থাকলেন ওঁরা। কাঁচুমাচু হেসে বললুম, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ভেবেছিলুম। কিন্তু তিনি না। চোখের ভুল।

বোম্বের 'ডেকান টাইমস' এর রিপোর্টার রবি ভার্মা হাসতে-হাসতে বলল, চেনা লোক দেখে মানুষ যে পাগলা টাট্টুর মতো পাহাড় ডিঙিয়ে ছোটে, এ-দৃশ্য কখনও দেখিনি। হরিবল।

মাদ্রাজের 'প্যাটিয়ট'-এর রাঘবন বলল, জয়ন্তবাবুর হবু শ্বশুর নন তো ভদ্রলোক?

খুব হাসাহাসি চলতে থাকল। আমি আমতা-আমতা করে নানারকম কৈফিয়ত দিতে থাকলুম।

একটু পরে আমাদের ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শেষ ঘরটায় আমার এবং রবি ভার্মার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার কফি এবং স্ন্যাকসের প্যাকেট এল। রাত সাড়ে আটটায় নীচের ডাইনিং হলে ডিনার পরিবেশন করা হবে। বিছানায় বসে সিগারেট ধরিয়ে ব্যাপারটা ভাবতে ব্যস্ত হলুম। ভার্মা অন্ধকারে সমুদ্রশোভা দেখতে বারান্দায় চলে গেল।

অচেনা জায়গা। পুবের বিচে কোথায় সেই মুক্তাঙ্গন রেস্তোরাঁ কে জানে? অথচ রহস্যময় বুড়ো আমাকে সেখানে যেতে বলল। একবার ভাবলুম, চুলোয় যাক। আমি যা করতে এসেছি, তাই নিয়ে থাকি। আবার ভাবলুম, রথ দেখতে এসে কলা বেচে পয়সা উসুল করার মতো তেমন কোনও চমকপ্রদ খবর পেয়ে যেতেও তো পারি! তাতে 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার প্রচার বেড়ে যেতে পারে। আমার বেতনবৃদ্ধি হতে পারে।

কিন্তু তার চেয়ে আদত কথা, বুড়োর সঙ্গে যেন আমার রক্তের সম্পর্ক। তা না হলে দেখামাত্র অমন করে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কি কেউ দৌড়ে যায়?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডাকে আমি এভারেস্ট ডিঙিয়ে যেতেও পারি।

কিন্তু উনি দেখছি সর্ব ঘটে বিরাজমান। ভাবতেও পারিনি, এই কোরাডিভিতে ওঁকে দেখতে পাব। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, চিররহস্যময় এবং রহস্যসন্ধানী বৃদ্ধ এই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে আত্মগোপন করে রয়েছেন। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হয়...।

দুই

ক'জন সাংবাদিক এক জায়গায় জড়ো হলে যা হয়। রাজনীতির হাঁড়ির খবর নিয়ে তর্কাতর্কি, হুল্লোড়, এবং কখনও খিস্তি, কখনও বিপুল অট্টহাসি। দিল্লির 'দৈনিক আর্যাবর্ত'-এর ব্রজলাল শর্মা খুব জমিয়ে তুলতে পারেন। আড্ডাটা তাঁর ঘরেই বসেছে। তখন সাড়ে সাতটা বাজে। আর দেরি করা যায় না। এক ফাঁকে বেরিয়ে এলুম।

লনে একজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হল। শশব্যস্তে বলল, সঙ্গে যাব, স্যার?

বললুম, না। একটু ঘুরে আসি।

—সঙ্গে টর্চ আছে তো, স্যার? একটু সাবধানে দেখে-শুনে ঘুরবেন।

—কেন বলুন তো?

—অন্য কিছু না। সাপটাপ থাকতে পারে।

হাসতে-হাসতে বললুম, বাঘ-ভাল্লুক নয় তো?

—না, স্যার। বাঘ-ভাল্লুক এখানে কোথায়!

গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লুম। গবেষণাগার ডাইনে রেখে হ্রদের ধারে গিয়ে সোজা পুবে এগোলুম। রাস্তাটা সংকীর্ণ হলেও সুন্দর পিচ-বাঁধানো এবং পরিষ্কার। দু-ধারে একটু দূরে-দূরে লাইটপোস্ট রয়েছে। কাজেই একটুও অন্ধকার নেই।

কিন্তু অজানা জায়গার নির্জন রাস্তায় হাঁটলে গা-ছমছম করবেই। আমার ডাইনে হ্রদটা যেখানে শেষ হল, সেখানে রাস্তাটা একটু বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। সামনে সমুদ্র। দু-ধারে ন্যাড়া পাঁচিলের মতো পাথরের পাহাড়। সমুদ্রের ধারে গিয়ে রাস্তাটা ঘুরে উত্তরে চলে গেছে বিমানঘাঁটির দিকে।

আমি রাস্তা থেকে বালির বিচে নামলুম। বিচে আলো রয়েছে। উঁচু লাইটপোস্ট আছে এখানে-ওখানে। এবার দু-চারজন করে লোক দেখা যাচ্ছিল। কেউ বালিতে বসে আছে, কেউ বেঞ্চে বসেছে। চাপা গলায় কথা বলছে। সামনে ট্যুরিস্ট লজ ও হোটেলের আলো দেখা গেল। আমার বাঁ-দিকে নারকেল গাছের জটলা, ডাইনে সমুদ্র। সেখানে দেখলুম, নারকেল গাছের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বিশাল কয়েকটা ডোরাকাটা ছাতা এবং তার তলায় লোকেরা বসে আছে। এটাই তাহলে ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁ। হালকা নিচু বেতের চেয়ারে বসে নানা বয়সের পুরুষ ও মহিলা আড্ডা দিচ্ছে।

সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে খুঁজছি, ডানপাশ থেকে চাপা গলায় আওয়াজ এল হ্যালো ডার্লিং।

আহা, এই সেই স্নেহভরা মিঠে ডাক। এই সেই প্রাণমাতানো আপনকরা সম্ভাষণ। ঘুরে দেখি, উনি ফাঁকায় একটি টেবিলের পাশে বসে আছেন। শুধু মুন্ডুটা টেবিলের ওপর দেখা যাচ্ছে। গিয়ে সামনাসামনি বসে পড়লুম।

—তুমি রাগ না করে চলে এসেছ, খুব খুশি হয়েছি, ডার্লিং। এখন চুপচাপ বসো। কফি খেয়ে ক্লান্তি দূর করো।

—আর কফি নয়। চা খাব।

একটু তফাতে একটা গ্যারেজের মতো ঘরে চা ও কফি বানানো হচ্ছে। ঘরটা যে গাড়ি, তা চাকা দেখে মালুম হল। ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁ আর কী। ইশারা করতেই একজন বয় এসে সেলাম দিল। কর্নেল চায়ের অর্ডার দিলেন। সে চলে গেল।

তখন বললুম, আপনি কি কারও ভয়ে এখানে এসে লুকিয়ে আছেন?

বুড়ো হাসলেন : তা যা বলেছ! সেইরকমই অবস্থা।

—শুট। ঝাড়ুন, কী মালকড়ি আছে।

হাত তুলে কর্নেল বললেন, সবুর বৎস, সবুর। চা খেয়ে আগে ক্লান্তি দূর করো।

—কবে এসেছেন এখানে? উঠেছেন কোথায়?

—গতকাল সকালে। উঠেছি ওই সি-ভিউ হোটেলে।

—আমরা আসব জানতেন কি? মানে—আমি আসছি কি না, জানতেন?

—অবশ্যই।

বয় ট্রে রেখে গেল। কর্নেল পট থেকে চা ঢালতে-ঢালতে বললেন, দেখছ, কত কুইক সার্ভিস করে এরা? পৃথিবীর কোথাও এরকম সার্ভিস পাবে না, জয়ন্ত। গতকাল থেকে লক্ষ করছি। এর মালিক ভদ্রলোক মাদ্রাজি। অতি অমায়িক সজ্জন মানুষ।

এরপর চা খেতে-খেতে আমাদের এইসব কথাবার্তা হল।

—এবার বলুন, এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী আপনার?

—তোমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি।

—চালাকি রাখুন। সাংবাদিকদের ওপর গোয়েন্দাগিরি! সরকারের আর কাজ নেই? তার ওপর কি না সেজন্যে বেছে-বেছে এক বেসরকারি বুড়ো ঘুঘুকে পাঠিয়েছেন! বিশ্বাসই করি না।

—ডার্লিং, আস্তে। সমুদ্রবায়ু খুব জোরালো।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—বললুম তো।

—অসম্ভব। আপনি এক কিলোমিটার দূরে বসে গোয়েন্দাগিরি করছেন? ভ্যাট!

—শোনো জয়ন্ত, দিল্লিতে সাংবাদিকদের লিস্টে তোমার নাম আমিই ঢুকিয়েছি। দিস ইজ সিরিয়াস। হাতে সময় ছিল না তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার। ট্রাঙ্ককল করাটা ভালো মনে করিনি। ভেবেছিলুম, যে-কোনওভাবে যোগাযোগ করে ফেলব এখানে এসে। সেই উদ্দেশ্যে রেস্টহাউসের পেছনের হ্রদে মাছ ধরতে গিয়েছিলুম। তুমি যে বোকার মতো অমন করে দৌড়ে যাবে ভাবতে পারিনি!

—ভাবা উচিত ছিল আপনার।

—প্লিজ জয়ন্ত! এবার থেকে এটা ভেবে নিয়েই কাজ করব।

—যাকগে, বলুন কী ব্যাপার?

—তোমার সাহায্য আমার খুবই দরকার। যা বলছি মন দিয়ে শোনো।

—শুনছি তো। বলুন!

—তোমাকে কেউ ফলো করেনি, আর ইউ শিয়োর?

—না। সারা রাস্তা ভয়ে-ভয়ে এসেছি। আলোও ছিল। বারবার পেছনে ঘুরেছি, কাকেও দেখিনি।

—খাসা! এবার শোনো—তোমাদের দলে কোনও বিদেশি এজেন্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। এখানে সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার একটি মূল্যবান আবিষ্কারের ফরমুলা তার হাতে পাচার হতে পারে। কোনও এক সূত্রে সরকার এটা আঁচ করেছেন। এখন...।

—কী কাণ্ড! তাহলে সাংবাদিকদের অত ঘটা করে না নিয়ে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত! এত রিস্ক নেওয়ার কী দরকার ছিল সরকারের?

—প্লিজ, জয়ন্ত, ধৈর্য ধরে শোনো। সরকার এ-ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে চান বলেই গোপন সূত্রে খবর জেনেও প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেননি। অর্থাৎ সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার কোন লোকটি ওই চক্রে জড়িত, তা আবিষ্কার করাই উদ্দেশ্য। এটা একটা ফাঁদ বলতে পারো।

—বুঝলুম। তা আপনি বুড়ো বয়েসে এতে নাক গলালেন কেন? খুন-খারাপি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন, এসব স্পাই রিং-এর ব্যাপার। এ তো মারাত্মক!

—ডার্লিং, এই দ্বীপে এক বিরল প্রজাপতি আছে শুনেছিলুম।

—বেশ তো। প্রজাপতি ধরতে আপনার অসুবিধে ছিল নাকি? এই তো, কত সব ট্যুরিস্ট এসেছে মেনল্যান্ড থেকে। তেমনিভাবে এলেও পারতেন।

—জয়ন্ত, জয়ন্ত, প্লিজ। উত্তেজিত হয়ো না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ অনুরোধে এ-কাজ না নিয়ে পারিনি।

—ভালো। আপনি দেশের সেবায় নেমেছেন। কিন্তু...।

—তুমি কি ভয় পাচ্ছ, ডার্লিং?

—ভয়? আপনি বললে কী না পারি? বলুন না, সাগরে ঝাঁপ দেব?

—হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ, বেশ। এবার শোনো, তুমি বাকি চারজন সাংবাদিকের ওপর নজর রাখবে। আর...।

—এতক্ষণে হয়তো ফরমুলা পাচার হয়ে গেছে! কী আপনার বুদ্ধি!

—সম্ভবত হয়নি। কারণ ওখানে নজর রাখার লোক আছে। গবেষণাগারেরই লোক। সে সরকারি গোয়েন্দা। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক এ-ব্যাপারে লিপ্ত সেটা জানা তোমার পক্ষে যতটা সোজা, তার পক্ষে নয়। তুমি তাদের সঙ্গেই রয়েছ এবং তোমার চোখ এড়িয়ে কিছু করা কঠিন। তা ছাড়া, এখনও ফরমুলা পাচার হয়নি, বলার কারণ আছে। পরে জানতে পারবে।

—কিন্তু ফরমুলাটা কীসের?

—তুমি মলিকিউলার বায়োলজি, অর্থাৎ আণবিক জীববিদ্যা কিংবা আধুনিক প্রজননবিদ্যার খবরাখবর কি রাখো? তাহলে বলতে পারি।

—অত অশিক্ষিত ভাববেন না, মাই ডিয়ার ওল্ডম্যান।

—আধুনিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ-কোষ নিয়ে ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের হেরফের ঘটিয়ে নতুন সজীব পদার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। ডি এন এ-র কথা তো জানো। জিনের হেরফের ঘটাতে ওই জিনিসটি মোক্ষম। খোদার ওপর খোদকারি। সংক্ষেপে বলছি। আমাদের প্রজননবিদরা সামুদ্রিক প্রাণী শুশুকের দেহে ওইভাবে জিনের হেরফের ঘটিয়ে তাকে বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত করতে পেরেছেন। সমুদ্রের তলায় গিয়ে তারা অনায়াসে শত্রুর জাহাজের তলা ফাঁসিয়ে আসতে পারবে। এমনকী, শত্রুর জাহাজের অবস্থিতি, অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, পরিকল্পনা—সবকিছুর হদিশ করে আসতে পারবে। শত্রুদের সন্দেহই হবে না। অর্থাৎ, সেই শুশুক একইসঙ্গে কম্পিউটারের এবং মানুষের কাজ করতে পারবে। বুঝলে তো এবার? কিন্তু সাবধান—এ-খবর তোমার 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় ছাপবার জন্যে নয়। ছাপলে সরকার অস্বীকার করবেন এবং তোমাদেরও ঝামেলা বাড়বে।

—ফরমুলাটার আবিষ্কারক কে?

—ডক্টর রাজগোপাল।

এরপর কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, তোমায় আর আটকে রাখব না, জয়ন্ত। তুমি এসো। আমি হোটেলে গিয়ে কতকগুলি কাজ সেরে নিই। দুঃখিত যে, তোমায় এগিয়ে দিতে পারছি না। কিন্তু তুমি খুব সতর্ক হয়ে ফিরে যাও। বাই দা বাই, সঙ্গে কি তোমার সেই খুদে যন্ত্রটি আছে?

—আছে। ভাববেন না।—বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

খুদে যন্ত্রটি একটি পয়েন্ট বত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার। ক'বছর আগে কলকাতার ডক এলাকায় একটা চোরাচালান চক্রের খবর দিয়ে কাস্টমসকে সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ রাজ্য সরকার আমাকে এই অস্ত্রটির লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। সেবার ওই চক্রের মধ্যে নাক গলাতে গিয়ে একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে যাই।

বিচ থেকে রাস্তায় পৌঁছে এবার কিন্তু বুক কেঁপে উঠল। চারদিকে কড়া নজর রেখে হাঁটতে থাকলুম। কিন্তু ফেরার পথেও কোনও লোক দেখলুম না।

অবশ্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। কর্নেলের উপভোগ্য সঙ্গলাভের জন্যে তীব্র ইচ্ছে দমন করাটা আমার পক্ষে ভারী কঠিন। নিরন্তর সদালাপী এবং কৌতুকপরায়ণ ওই বৃদ্ধের সংসর্গে কী জাদু আছে, সে আমিই জানি।

হ্রদের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালুম। কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আবছা আলোয়। সে এদিকে ঘুরলে দেখি, 'দৈনিক পাঞ্জাব নিউজ' এর সর্দার শোভন সিং। আমায় দেখে সর্দারজি বললেন, হ্যাল্লো।

আমিও সন্দিগ্ধভাবে বললুম, হ্যাল্লো।

সর্দারজি বললেন, ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, জয়ন্তবাবু?

—হ্যাঁ, সর্দারজি।

—আমিও ঘুরতে বেরিয়েছি। হল্লা আমার ভালো লাগে না।

তিন

'ডেকান টাইমস'-এর রবি ভার্মা আমার অনেকদিনের পরিচিত এবং বন্ধু মানুষ। 'প্যাট্রিয়ট'-এর রাঘবনের সঙ্গে বেশিদিনের আলাপ নয়। কিন্তু সে-ও এখন আমার বন্ধু হয়ে উঠেছে। এরা দুজনেই আমার প্রায় সমবয়েসি। 'আর্যাবর্ত'-এর ব্রজলাল শর্মার সঙ্গে এবারই পথে আলাপ। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। নাদুসনুদুস গড়ন, ভুঁড়ি আছে এবং তুখোড় রসিক লোক। জমিয়ে তুলতে ওস্তাদ। 'দৈনিক পাঞ্জাব নিউজ' এর সর্দারজি পাকা প্রৌঢ়। একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কম কথা বলেন। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিশাল আকারের সর্দারজিকে নিয়ে আড়ালে ঠাট্টা-তামাসা চলে। ওঁর সঙ্গে গতবছর বোম্বাইয়ে আলাপ হয়েছিল।

মাঝে-মাঝে কলকাতা যান। 'সত্যসেবক' পত্রিকা অফিসে ফোন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওঁর প্রতি আমার যেভাবেই হোক প্রচুর শ্রদ্ধা জন্মেছে।

হ্রদের ধারে নির্জনে দাঁড়িয়ে উনি কী করছিলেন? একটু সন্দেহ দানা বেঁধেছিল মনে। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই শব্দটুকুর প্রশ্রয় না দিয়ে পারিনি। দুজনে পাশাপাশি দু-চারটে ছোট বাক্যে দ্বীপের ভালোমন্দ নিয়ে মতামত দিতে-দিতে আমরা রেস্টহাউসে ফিরেছিলুম। তখনও শর্মার ঘরে তুখোড় আড্ডা চলেছে। আমাদের দেখে শর্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে। জোড়া লাশের খোঁজ মিলেছে।

এতে খুব হাসাহাসি পড়ে গেল। এইসময় নীচের ডাইনিং হলে ডিনার খাওয়ার ডাক এল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে সাড়ে নটা বেজে গেল। তারপর শর্মা প্রস্তাব দিলেন : এবার কিছুক্ষণ নৈশভ্রমণ না করলে নির্ঘাত পেটের গোলমাল হবে। অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।

ভার্মা বলল, শিয়োর। পঞ্চপাণ্ডব মিলে দ্বীপটা জয় করে ফেলি। চলুন।

রাঘবন চাপা গলায় বলল, কিন্তু দ্রৌপদী কোথায়? একজন দ্রৌপদী চাই।

শর্মা বললেন, মাই গুডনেস! সর্দারজি কেমন কটমট করে তাকাচ্ছেন।

সর্দারজি হেসে ফেললেন। বললেন, কিন্তু দোস্ত, দুঃখের বিষয় এ-দ্বীপে শুনেছি একজনও স্ত্রীলোক নেই।

বলতে যাচ্ছিলুম, আছে। কিন্তু সংযত হলুম! ট্যুরিস্টদের দলে বিচে কয়েকজন স্ত্রীলোক দেখেছি।

পাঁচজনে বেরিয়ে পড়লুম। গেটে যেতেই দেখা হল ডক্টর রাজগোপালের সঙ্গে। রাস্তায় ওঁর গাড়ি। সবিনয়ে জানালেন, খুবই লজ্জিত এবং দুঃখিত যে, ডিনার টেবিলে উপস্থিত থাকতে পারেননি। একটা কাজে আটকে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আমরা সেজন্যে যে কিছু মনে করিনি, পঞ্চমুখে বাক্যসহযোগে সে-বিষয়ে ওঁকে আশ্বস্ত করলুম। তারপর উনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভার্মা বলল, ডক্টর রাজগোপালের কোয়ার্টার কোনটা?

সর্দারজি বললেন, ল্যাবরেটরির ওপরতলায়।

শর্মা বললেন, সর্দারজির সবতাতেই চোখ। এ রিয়্যাল অবজার্ভার।

কথা বলতে-বলতে আমরা দক্ষিণে সেই হ্রদের ধারে পৌঁছলুম। সর্দারজি জলের ধারে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর উঠে বসলেন। ওই পাথরে বসেই কর্নেল মাছ ধরছিলেন।

শর্মা আর রাঘবন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পূর্বে এগিয়ে গেলেন। আমি আর ভার্মা ঘাসের ওপর বসলুম। সর্দারজির কাছ থেকে আমাদের দূরত্ব দশ গজের বেশি নয়। তাঁর সামনে দক্ষিণে হ্রদ, বাঁ-দিকে উঁচু শর এবং নলখাগড়ার ঝোপ, ডানদিকে হ্রদের কিনারা বরাবর আস্তে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে একটা টিলা—প্রচুর ঝোপঝাড়ে ভরা।

হঠাৎ জলে একটা শব্দ হল। ভার্মা ও আমি মুখ তুলেছি, আবার শব্দ হল। জলে কিছু একটা পড়ল। ঢিল নয়, পাথরের চাঙড় পড়ার মতো চবাং করে শব্দ। তারপর আবিষ্কার করলুম, রাশভারি সর্দারজি পাথরের ওপর বসে কী ছুড়ে মারছেন জলে।

ভার্মা হাসতে-হাসতে বলল, ও কী, সর্দারজি! ব্যাঙ মারছেন নাকি?

সর্দারজি একবারে ঘুরে হেসে বললেন, স্রেফ খেয়াল!

কখন রাস্তার ধার থেকে নুড়ির মতো পাথর কুড়িয়ে নিয়েছেন—সম্ভবত আসার সময়, এবং জলে ছুড়ে খেলা করছেন—এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার মানে হয় না। অনেক প্রবীণকে অনেক হাস্যকর কাজ করতে দেখা যায়।

সর্দারজি ফের আপনমনে জলে নুড়ি ফেলতে থাকলেন। এবার নুড়িগুলো ছোট বলেই মনে হল। আমরা ওদিকে আর মন দিলুম না। চাপা গলায় নানান গল্পগাছা করতে থাকলুম। ভার্মা পা ছড়িয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় কথা বলছিল। একটু পরে ঘড়ি দেখে সে উঠে বসল। বলল, চলো চৌধুরী, একটু পায়চারি করে আসি। পেটটা ফুলে উঠেছে।

ডাকলুম, সর্দারজি! হাঁটবেন নাকি কিছুক্ষণ?

সর্দারজি জবাব দিলেন, না ভাই। আপনারা হাঁটুন।

ভার্মা আর আমি হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তা ধরে পূর্বে এগোলুম। কিছুদূর গিয়েই দেখি, শর্মা আর রাঘবন ফিরে আসছে। চারজনে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আবার একদফা কথাবার্তা এবং হাসাহাসি হল। তারপর শর্মা বলল, চলো, রাত হয়েছে। ফেরা যাক।

চারজনে ফিরে এসে সেই ঘাসের জমির কাছে পৌঁছেছি, হঠাৎ বাঁয়ে সেই পাথরটার দিকে চোখ গেল। সর্দারজি জলে নেমেছিলেন—তখনই দু-হাতে পাথরটা ভর করে উঠে বসলেন। চপ্পল দুটো পাথরের ওপর রাখা আছে।

শর্মা বললেন, সর্দারজি! আসুন, শুয়ে পড়া যাক।

সর্দারজি উঠে পায়ে চপ্পল গলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, চলুন।

জলে নেমেছিলেন—এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ-স্বভাব অনেকেরই থাকে। জল দেখে পা ধুয়ে নেওয়ার বাতিকও দেখেছি অনেকের।

আমরা রেস্টহাউসে ফিরে এলুম। রাঘবন ও শর্মা এক ঘরে, আমি এবং ভার্মা তার পাশে শেষদিকের ঘরে, আর সর্দারজি একা একটা ঘরে শুতে গেলেন—রাঘবন ও শর্মার ঘরের ওপাশের ঘরটায়।

ভার্মা বলল, আলো না নেভালে আমার ঘুম হয় না, জয়ন্ত।

বললুম, আমারও।

আলো নিভিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু নতুন জায়গায় ঘুম আসে না। চোখ বুজে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে রাত একটা বেজে গেল। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটা সময় বলে দিল। ভার্মার নাক ডাকছে সমানে।

সবে একটু তন্দ্রামতো এসেছে, কী একটা শব্দে সেটা কেটে গেল। চোখ খুলে দেখি, ভার্মা উঠে বসেছে। বাইরের আলোর সামান্য ছটা ঘরে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সম্ভবত। আবছাভাবে তার আউটলাইন নজরে পড়ছে।

আমি শ্বাসপ্রশ্বাস ঘুমন্ত মানুষের মতো তালে-তালে নিচ্ছি। কর্নেলের সঙ্গে এ-দ্বীপে দেখা না হলে তো তখুনি কথা বলে উঠতুম, কী হল, ভার্মা?

ভার্মা পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগোল, তারপর সাবধানে দরজা খুলে বেরুল এবং বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার তখন উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। তাহলে কি ভার্মাই সেই বিদেশি গুপ্তচক্রের এজেন্ট? এভাবে কোথায় গেল সে? ঘড়ি দেখলুম। রাত একটা উনষাট।

দীর্ঘ দু-মিনিট পরে ভার্মা যেমন গিয়েছিল, তেমনি পা টিপে-টিপে ফিরে এল। শুয়ে পড়ল। উত্তেজনায় বাকি রাতটা আর ঘুমই এল না। দেখতে-দেখতে ভোরের আলোয় ঘর ভরে গেল। তখন আবার সেই তন্দ্রার ঘোরটা ফিরে এল। তারপর কখন সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভাঙল বাইরে কী একটা চাপা গোলমাল শুনে। তাকিয়ে দেখি ঘরে রোদ ঢুকেছে। বিছানায় ভার্মা নেই। বাইরে কারা ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে। চাপা উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে কারা। নীচের সিঁড়িতে বারবার কারা উঠছে এবং নেমে যাচ্ছে—সেইসব জুতোর শব্দ। লক্ষণটা ভালো নয়। উঠে বসলুম তক্ষুনি।

দরজায় গিয়ে পরদা তুলে দেখি বারান্দায় ভার্মা, শর্মা এবং রাঘবন কথা বলছে। তাদের মুখে উত্তেজনার ছাপ। বললুম, কী ব্যাপার, মিস্টার শর্মা?

শর্মা গম্ভীর মুখে বললেন, সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে, জয়ন্তবাবু। সর্দারজি ইজ ডেড।

চমকে উঠলুম।—সর্দারজি মারা গেছেন! সে কী?

—বোধহয় হার্ট অ্যাটাকে।—শর্মা বললেন, রাতে দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন—মানে বেরুতে যাচ্ছিলেন, তখনই পড়ে যান সম্ভবত। বডি অর্ধেক ঘরে অর্ধেক বাইরে পড়ে রয়েছে। দেখে আসুন না।

সর্দারজির ঘরের সামনে কর্মীদের ভিড়। গিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সর্দারজি। মুখটা কাত হয়ে আছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেধে আছে। আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

চার

সামরিক হাসপাতালে সর্দারজির মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল, তখন বেলা সাড়ে আটটা। ডাক্তার ভদ্রলোক সমর বিভাগের। নাম মেজর টি. আর. আনতুলে। তিনি এসে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন, হ্যাঁ—হার্ট অ্যাটাকই বটে, তবু আইনত লাশের পোস্টমর্টেম করতে হবে। তাই লাশ সামরিক হাসপাতালের মর্গে গেল।

দ্বীপে ছোট্ট একটা পুলিশ বিট আছে। সেটা বিচের ওদিকে। নেহাত ট্যুরিস্টদের রক্ষণাবেক্ষণে। অফিসার-ইন-চার্জ এসে রুটিনমাফিক সর্দারজির কিটব্যাগ হাতড়ে অনেক প্রেসক্রিপশান, হার্টের রোগের ওষুধ, রিপোর্টিং নোটবুক ইত্যাদি পরীক্ষা করেছেন।

ডক্টর রাজগোপাল রেডিও-মেসেজ পাঠিয়েছেন 'ডেলি পাঞ্জাব নিউজ' পত্রিকার অফিসে। স্বরাষ্ট্র দফতরকেও খবর জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দফতরকে অনুরোধ করেছেন, এই ট্যুর প্রোগ্রাম উদ্যোক্তা বিজ্ঞান ও গবেষণা দফতরকে খবরটা পৌঁছে দিতে। শর্মার কাছে এসব জানতে পারলুম।

তারপর একফাঁকে অধৈর্য হয়ে বেরিয়ে পড়লুম বিচের দিকে। হাঁটতে-হাঁটতেই গেলুম। সি-ভিউ হোটেলের বোর্ডারদের তালিকা দেখে দোতলায় কর্নেলের ঘরের দরজায় বোতাম টিপলে সাড়া এল, এসো, জয়ন্ত।

বুড়ো ম্যাজিক জানেন সম্ভবত। ঢুকে দেখি, টেবিলে একগাদা ফটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। পাশের সোফায় বসে বললুম, আমিই বেল বাজিয়েছি, বুঝলেন কীভাবে?

—তোমার বোতাম টেপার ভঙ্গি আমার সুপরিচিত। তা ছাড়া, রেস্টহাউসে অমন একটা ঘটনার পর তোমার দৌড়ে আসাটা অনিবার্য ছিল। যাকগে, সংক্ষেপে বলো।

সর্দারজির নির্জনে হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা, দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে পাথরে বসে জলে নুড়ি ছুড়ে খেলা, জলে নামা, তারপর ভার্মার এত রাতে চুপিচুপি বেরুনো—সবটা উত্তেজিতভাবে বর্ণনা করলুম।

শোনার পর কর্নেল বললেন, হুম। আশা করি, এসব যা লক্ষ করেছ, আর কাকেও বলোনি?

—মোটেও না।

—তোমার কি মনে হচ্ছে, সর্দারজির হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর ব্যাপারটা গোলমেলে?

—নিশ্চয় গোলমেলে।

—কিন্তু ওঁর তো হার্টের অসুখ ছিল।

—ছিল। তবু অত রাতে ভার্মার অমন করে চুপিচুপি বেরুনো।

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, ওতে কিছু প্রমাণ হয় না। যাকগে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। আপাতত তুমি আমার অতিথি। তোমার যথাবিহিত সৎকার করা আমার কর্তব্য। নিশ্চয় পেটপুরে ব্রেকফাস্ট খেতে পারোনি। তোমার মুখ দেখেই টের পাচ্ছি।

...বলে মৃদু হেসে কর্নেল ফোন তুললেন। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ছবিগুলো গোছাতে ব্যস্ত হলেন। কৌতূহলী হয়ে একটা ছবি তুলে নিলুম। নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কর্নেল ছবি ড্রয়ারে খামের মধ্যে রেখে বললেন, এখনই যে-কোনও মুহূর্তে ডক্টর রাজগোপাল আসার কথা। তোমাকে আমার এখানে দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তোমার-আমার সম্পর্কটা ওঁর কাছে এবার স্পষ্ট হওয়া ভালো।

—ভালো।

একটু পরে ব্রেকফাস্ট এল। খেতে-খেতে দরজার ঘণ্টা বাজল। কর্নেল উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। হ্যাঁ, ডক্টর রাজগোপালই। এবং আমাকে দেখে সত্যি অবাক চোখে তাকালেন।

তখন কর্নেল সহাস্যে আমার এবং তাঁর সম্পর্কও ব্যাখ্যা করে দিলেন। ডক্টর রাজগোপাল অন্তরঙ্গভাবে আমার একটা হাত নিয়ে বললেন, তাহলে তো খুবই সুখের কথা। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে আশ্বস্ত বোধ

করছি।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত আমার দক্ষিণহস্তই বলতে পারেন। অতএব নির্দ্বিধায় আমরা ওর সামনে খোলাখুলি কথা বলতে পারি।

ডক্টর রাজগোপাল পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে বললেন, নকশাটা এনেছি। আপনাকে বুঝিয়ে দিই।

নিচু টেবিলে কাগজটা ছড়িয়ে রেখে ডক্টর রাজগোপাল বোঝাতে শুরু করলেন।

—ল্যাবরেটরির দুটো ব্লক। এ আর বি। বি-এর ওপরতলায় আমার কোয়ার্টার। বেডরুমের পাশের এই ছোট ঘরটা দেখছেন, এটাই সেই লিফট। কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাবে না। ঘরটা চমৎকার সাজানো। এখানে টেবিল, টেবিলে বোতাম টিপলে সামনের চেয়ারে বসা লোকেরা কিছু টের পাবে না। লিফটটা নিঃশব্দে নেমে যাবে একশো ফুট নীচে। এই দেখুন, দরজার বাইরে প্যাসেজ এবং প্যাসেজটা রাস্তার তলা দিয়ে হ্রদের তলায় গিয়ে পৌঁছেছে। প্যাসেজের শেষে একটা ঘর দেখছেন। এটাই সেই গোপন ল্যাবরেটরি। শুশুক-মানুষের ফরমুলা এখানে এই আলমারিতে রয়েছে। এ-দেওয়ালটা কাচের। ওপাশে হ্রদের জল। দৈবাৎ কাচের দেওয়াল ফেটে গেলে জলে সব ডুবে যাবে—প্যাসেজ এবং বি ব্লকের তলার ঘর অব্দি জল ঢুকে পড়বে। এই কাচের দেওয়ালে যন্ত্র ফিট করা রয়েছে। ওপাশে শুশুক-মানুষগুলো দেখা যাবে। দেওয়ালের যন্ত্রে বোতাম টিপে ওদের সঙ্গে সংকেতে যোগাযোগ করা যায়। হ্রদের কোনও তথ্য আনতে বললে তক্ষুনি ওরা চলে যায় এবং যথাসময়ে এসে দেওয়ালের ও-পিঠের নির্দিষ্ট বোতামটি টেপে। এপাশের কম্পিউটারে ডেটাগুলো সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়ে তথ্যটি আমরা পেয়ে যাই।

শোনার পর কর্নেল বললেন, হ্রদটার সঙ্গে তো সমুদ্রের যোগ আছে?

—আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। একটা খাঁড়ি এসে ঢুকেছে হ্রদে। দু-ধারে উচু প্রবাল-পাঁচিল।

—জল লোনা দেখেই সেটা টের পেয়েছিলুম।

আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। এবার বললুম, তা হলে তো দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে সেই দিয়াগো গার্সিয়ার মার্কিন ঘাঁটির খবর আনাও সম্ভব।

ডক্টর রাজগোপাল সগর্বে বললেন, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তা সম্ভব করেছেন। ওই ঘাঁটির তাবৎ তথ্য আমরা নিয়মিত পাচ্ছি। শুশুক-মানুষরা এনে দিচ্ছে। এবং এজন্যেই এত সতর্কতা। আমেরিকা ব্যাপারটা টের পেলে আমাদের এই ল্যাবরেটরি ধ্বংস করতে এজেন্ট পাঠাবেই। তবে আপাতত সেরকম কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। শুধু শুশুক-মানুষের গবেষণার খবর বিশেষ একটি দেশ কীভাবে পেয়ে গেছে, জানি না। ওরা আমাদের ফরমুলাটা হাতাতে চায়।

বললুম, আপনি নিশ্চয় সাংবাদিকদের ওই পাতাল ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতেন না?

হাসলেন ডক্টর রাজগোপাল।—না। মোটামুটি ওপরের গবেষণাঘরে সব দেখিয়ে একটা আভাস দিতুম, এইমাত্র। আমার আবিষ্কারের মূল কথাটা গোপন রেখে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সাফল্য সম্পর্কে বিবরণ দেওয়াই সরকারের প্রোগ্রাম। অবশ্য ব্যাপারটা হাইলি টেকনিকাল।

কর্নেল বললেন, যাকগে। নকশাটা আমার কাছে রইল। এবার বলুন, গতরাতে কী ঘটেছে?

ডক্টর রাজগোপাল গম্ভীর মুখে বললেন, ফোনে একটুখানি আভাস দিয়েছিলুম আপনাকে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত।

কর্নেল সোফায় শরীর এলিয়ে চুরুট ধরালেন। চোখ বুজে বললেন, হ্যাঁ। বলুন।

—তখন রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ কেন কে জানে, ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলুম। আপনি তো জানেন, এখানে ফ্যামিলি রাখার নিয়ম নেই। একা থাকি। তো ঘুম ভাঙার পর পশ্চিমের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। ওদিকে সমুদ্র। কয়েকটা আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছিল। জেলে নৌকো মনে হল। কিন্তু একটু পরেই একটা নৌকো থেকে জোরালো একঝলক আলো একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ছড়িয়ে তারপর নিভে গেল।

সংকেত দেখাচ্ছে নিশ্চয়। দ্রুত দক্ষিণের জানলায় গেলুম। ওদিকে হ্রদের পশ্চিমপাড়ের পাহাড়। পাহাড় না বলে টিলা বলাই উচিত। ঝোপে ভরতি।

—হ্যাঁ। দেখেছি। একদৌড়ে ওঠা যায়।

—অবাক হয়ে দেখলুম, টিলার ওপর থেকেও ঠিক ওইরকম আলো একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সঞ্চালিত হল। তারপর নিভে গেল। আলোটা কিন্তু সমুদ্রের দিকে নয়। রেস্টহাউসের দিকে। একটা কিছু অনুমান করে পুবের জানলায় গেলুম। আশ্চর্য, রেস্টহাউসের দোতলার বারান্দা থেকে কে টর্চ জ্বেলে ঠিক অমনি দুবার আলো ফেলল।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ভার্মা। নিশ্চয় ভার্মা।

ডক্টর রাজগোপাল আমার দিকে ঘুরে বললেন, ভার্মা! তার মানে?

কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন, ভার্মাই যে আলোর সংকেত করল, তুমি কি দেখেছ জয়ন্ত?

অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, না। তা দেখিনি। তবে ঠিক ওই সময় সে...।

হাত তুলে কর্নেল বললেন, তা না দেখলে ওই সময় সে কী করতে বেরিয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ও-কথা থাক। ডক্টর রাজগোপাল কি নৌবাহিনীর কাছে ব্যাপারটা জানিয়েছেন?

ডক্টর রাজগোপাল বললেন, তখনই জানিয়েছিলুম। স্টিমবোট নিয়ে ওরা ওত পেতেছিল ওদিকটায়। এখনও অব্দি কোনও খবর নেই।

কর্নেল বললেন, ওটা চোরাচালানিদের সংকেত হতেও পারে। রেস্টহাউসের কোনও কর্মী যে চোরাচালান চক্রে জড়িত নয়, কে বলতে পারে?

ডক্টর গোপাল বললেন, হ্যাঁ। তা-ও ঠিক। একবার তো ধরা পড়েছিল একজন। এখনও সে জেল খাটছে।

পাঁচ

রেস্টহাউসে ফিরে দেখি ততক্ষণে কড়া পাহারা বসে গেছে। সমুদ্রবিজ্ঞান ভবন ঘিরে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। রেস্টহাউসের গেটে পরিচয়পত্র দেখিয়ে তবে ঢুকতে পেলুম। ওপরে বারান্দায় ভার্মা, রাঘবন এবং শর্মার সঙ্গে দেখা হল। তিনজনেই গম্ভীর মুখে কীসব আলোচনা করছিল। আমাকে দেখে শর্মা বললেন, খুব তালে আছ, ব্রাদার। লম্বাচওড়া একখানা ডেসপ্যাচ ঝেড়ে এলে তোমার কাগজের জন্যে। তাই না?

মুচকি হেসে মাথা দোলালুম। রাঘবন বলল, আর আমাদের বরাত দ্যাখো! বেরুতে দিচ্ছে না।

ভার্মা বলল, জয়ন্ত খুব স্বার্থপর। যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে গেল না।

অবাক হয়ে বললুম, বেরুতে দিচ্ছে না মানে?

শর্মা বললেন, চারদিকে তাকিয়ে টের পাচ্ছ না?

ভার্মা উত্তেজিতভাবে বলল, খুব অপমানজনক ব্যাপার কিন্তু। সাংবাদিকদের হয়রান করার ঠেলাটা কী জানে না। ফিরে গিয়ে যা কাণ্ড করব।

বললুম, কিন্তু হঠাৎ এমন কী ঘটল যে...।

বাধা দিয়ে রাঘবন বলল, সর্দারজির পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নাকি কী গোলমেলে ব্যাপার আছে। মার্ডার বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। স্টমাকে বিষ পাওয়া গেছে।

শর্মা বললেন, হাতি পাওয়া গেছে। ছাড়ো তো।

ভার্মা বলল, খামোকা হয়রানি। কখন বোম্বে থেকে ফরেনসিক এক্সপার্ট টিম আসবে, ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের অফিসাররা আসবে, আমাদের জেরা করবে—তারপর আমাদের মুক্তি।

শর্মা রসিকতা করলেন।—মুক্তি না হাজত, কে বলতে পারে, ব্রাদার? জয়ন্ত, তুমি বোকার মতো ফিরে এলে কেন, বলো তো? দিব্যি কেটে পড়তে পারতে।

আমরা শর্মার ঘরে গিয়ে বসলুম। একটু পরে লাঞ্চের ডাক এল। নীচে ডাইনিং হলে গিয়ে খেয়ে এলুম। তারপর শর্মার ঘরে আবার কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। আমার ঘুম পাচ্ছিল। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

ভার্মা আমাকে ওঠাল যখন, তখন বিকেল সাড়ে চারটে। সে চাপা গলায় বলল, উঠে বসো, জয়ন্ত। কাঠগড়ায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হও। এক্সপার্ট ব্যাটারা এসে গেছে।

সেই সময় চায়ের ট্রে আনল একজন বেয়ারা। এতক্ষণে ডক্টর রাজগোপালও এলেন। ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের নিশ্চয় খুব অস্বস্তি এবং অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। সে-জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। ক্ষমা চাইছি। এমন পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত ছিল। যাই হোক, রুটিন তদন্ত হয়ে গেলেই আপনাদের ফেরার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে সেটা আজ রাতে সম্ভব নয়। আগামীকাল সকাল সাতটায় বিমানবাহিনীর প্লেনে আপনারা ফিরতে পারবেন।

ভার্মা বলল, খুব ভালো খবর। কিন্তু ডক্টর রাজগোপাল, আমাদের কাগজে ডেসপ্যাচ পাঠাতে দেওয়া হচ্ছে না। দিস ইজ সিরিয়াস।

ডক্টর রাজগোপাল বললেন, প্লিজ। বলেছি, অপ্রত্যাশিত অবস্থা। ক্ষমা করবেন—উপায় নেই।

আমি বললুম, আপনাদের ল্যাবরেটরি দেখাবার প্রোগ্রাম?

—দুঃখিত, মিস্টার চৌধুরী। সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়েছে। যেজন্যে আপনাদের আনা হল, বর্তমান অবস্থায় সেটা আর কার্যকর করা যাচ্ছে না। সরকারের কঠোর নির্দেশ।

উনি শর্মাদের ঘরে গেলেন। ভার্মা এবং আমি চা খেতে-খেতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলুম। হঠাৎ ভার্মা উঠে দক্ষিণের জানলায় গিয়ে বলল, দেখে যাও, জয়ন্ত। হ্রদে লঞ্চ ঢুকিয়েছে। আরে! ডুবুরি নামিয়েছে যে! ব্যাপার কী?

জানলার কাছে গিয়ে দেখি, নৌবাহিনীর লঞ্চ হ্রদের মাঝখানে ভেসে রয়েছে এবং সত্যি ডুবুরি নেমেছে। কতকটা অনুমান করতে পারছি, অনেকটাই পারছি না। নিশ্চয় জলের তলার সেই গোপন ল্যাবরেটরিতে কোনও গণ্ডগোল বেধেছে।

একটু পরে আমাদের ডাক এল নীচে।

রেস্টহাউসের ড্রয়িংরুমে আমাদের চারজন সাংবাদিককে বসতে বলা হল। বুঝলুম, অফিসের মধ্যে কাদের জেরা করা হচ্ছে। মিনিট-দশেক পরে প্রথম ডাক এল শর্মার। পাঁচ মিনিট পরে রাঘবনের। কিন্তু ওরা কেউ বেরুল না।

এর পর আমার ডাক এল। ভেতরে গিয়ে দেখি, বিরাট টেবিলের ওপাশে গোমড়ামুখো চারজন লোক বসে রয়েছেন। সবাই সিভিলিয়ান পোশাক পরা। এবং তাঁদের মধ্যিখানে বসে আছেন আমার বৃদ্ধ বন্ধু ও প্রখ্যাত ঘুঘু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

প্রশ্ন প্রত্যেকেই করলেন। আমি এখানে এসে যা-যা দেখেছি, সব বললুম। তারপর আমাকে পেছনের দিকে একটা সোফায় বসতে বলা হল। সেখানে শর্মা আর রাঘবন বসে আছে। অন্য পাশে কয়েকটা চেয়ার। সেখানে রেস্টহাউসের কয়েকজন কর্মী বসে আছে। শর্মা মুচকি হাসলেন। আমিও হাসলুম।

এবার ভার্মা এল। তার নামধাম পরিচয়পত্র ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যথারীতি চুকে গেল। তারপর কর্নেল বললেন, মিস্টার ভার্মা, আপনি গত রাতে আন্দাজ দুটোর সময় কি বাইরে বেরিয়েছিলেন?

ভার্মা চমকে উঠল। তারপর একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। বেরিয়েছিলুম।

—কেন বেরিয়েছিলেন, তার সদুত্তর নিশ্চয় পাব আশা করছি।

—পাবেন। আমার বিছানা থেকে পশ্চিমের জানলার বাইরে দেওয়ালের খানিকটা অংশ দেখা যায়। নতুন জায়গায় ঘুম ডিস্টার্বড হয়। রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে তাকাতেই দেওয়ালের ওই জায়গায় দেখলুম, আলো পড়ল এবং নিভে গেল। আমি একজন সাংবাদিক। সব ব্যাপারে আমার কৌতূহল আছে। গাড়ির শব্দ

নেই—অথচ অমন জোরালো আলো পড়ার কারণ কী? তাই বেরিয়ে গেলুম। কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বাইরে তেমন কিছু দেখলুম না। তখন ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

—তখন বারান্দা নিশ্চয় অন্ধকার ছিল না?

—ছিল। তাই একটু অবাকও হয়েছিলুম।

—সর্দারজির ঘরের দিকে তাকিয়েছিলেন কি?

—না। তবে...।

—তবে?

—ওদিকে দরজা খোলার শব্দ—মানে আবছা শব্দ শুনেছিলুম, মনে পড়ছে। তবে অতটা খেয়াল করিনি। ভীষণ জোরে বাতাস বইছিল। আর হ্যাঁ, শুয়ে পড়ার পর বাইরে সিঁড়িতে কে নেমে গেল মনে হচ্ছিল।

—আপনি সমুদ্রবিজ্ঞান ভবনে কীসব কাজকর্ম হচ্ছে, জানেন নিশ্চয়?

—জানি না। অনুমান করি, নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু হচ্ছে। তা না হলে আমাদের আনা হল কেন?

—আপনার অনুমান সম্পর্কে কিছু জানাবেন কি?

ভার্মা একটু চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, শুনেছি, শুশুকের ওপর কী সব পরীক্ষা করে ডক্টর রাজগোপাল সফল হয়েছেন। জাস্ট শোনা কথা।

—কোথায় শুনলেন?

—কিছুদিন আগে বোম্বাই সমুদ্রবিজ্ঞান ভবনে গিয়েছিলুম। সেখানেই ডক্টর কার্নিকার কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন। অবশ্য উনিও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

—সর্দারজির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

—মাত্র গতকাল। মারগাঁও বিমানঘাঁটিতে। তবে ওঁর নাম শুনেছিলুম আগে।

কর্নেল একটা ছবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এঁকে চেনেন নাকি দেখুন তো?

ভার্মা বলল, না। কে ইনি?

সে-কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। আপনি প্লিজ আপনার বন্ধুদের কাছে গিয়ে বসুন।

ভার্মা গম্ভীর মুখে আমাদের কাছে এসে বসে পড়ল। ওখানে ডাক পড়ল আবার কার। একটু পরে দেখলুম, এক বেঁটে ভদ্রলোক, কালো কুচকুচে, প্রকাণ্ড শরীর—হাসিমুখে ঢুকে নমস্কার করে বসলেন।

কর্নেল বললেন, আপনার নাম ডক্টর সত্যকাম আচার্য? অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি গতকাল এখানে ছিলেন না শুনলুম।

—হ্যাঁ। বোম্বে গিয়েছিলুম পরশু বিকেলে। ফিরেছি একটু আগে। তারপর...।

—কিন্তু আমার যদি চোখের ভুল না হয়, তাহলে বলব, গতকাল সন্ধ্যায় আপনি সি-বিচে ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁয় বসে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

মিস্টার আচার্য লাফিয়ে উঠে বললেন, অসম্ভব। আপনি ভুলই দেখেছেন।

কর্নেল টেবিলে রাখা খাম থেকে একটা ছবি বের করে বললেন, তাহলে এ-ছবি কার?

মিস্টার আচার্যের চেহারা আরও কালো হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন, আমার একটা বিচিত্র ধরনের ক্যামেরা আছে। অন্ধকার বা আলোর ধার ধারে না। এর ইলেকট্রনিক সিস্টেম অদ্ভুত। দরকার মতো অদৃশ্য আলো কোনও জিনিসের ওপর ফেলে তার ছবি তোলা যায়। গতকাল আমি আপনার কাছাকাছি বসেছিলুম, মিস্টার আচার্য।

ভদ্রলোক একটি কথাও বললেন না। কর্নেলের ডানপাশের ভদ্রলোক টেবিলের একটা বোতাম টিপলেন। একজন পুলিশ অফিসার ঢুকলেন।

—ডক্টর আচার্য, আপনাকে আমরা গ্রেফতার করলুম। আপনার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ, আপনি বিজ্ঞানভবনের ল্যাবরেটরি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে একটি দেশকে আমাদের মূল্যবান একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফরমুলা পাচারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। 'দৈনিক পাঞ্জাব নিউজ'-এর সাংবাদিক সর্দার শোভন সিংকে বেআইনিভাবে বোম্বেতে আটকে রেখে একজন জাল সাংবাদিক পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জাল সাংবাদিক আর কেউ নয়—কুখ্যাত অপরাধী সুন্দরলাল।

এবার ডক্টর আচার্য বিকট হেসে উঠলেন। বললেন, কিস্যু প্রমাণ করতে পারবেন না।

কর্নেল বললেন, প্রমাণ জেলে-বস্তির ডুবুরি রঘুরাম। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হ্রদের তলায় ল্যাবরেটরির দেওয়ালে ডিনামাইট বেঁধে রেখে এসেছিল সে—আপনার নির্দেশে। সর্দারজি-বেশী সুন্দরলালের ওপর দায়িত্ব ছিল, সে হ্রদের ধারে পাথরের তলা থেকে তারদুটো খুঁজে বের করবে এবং সুযোগমতো নেগেটিভ-পজিটিভ জুড়ে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে। কিন্তু আমি মাছ ধরতে গিয়ে তারদুটো দেখতে পেয়েছিলুম। তারদুটো অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখার ফলে সুন্দরলাল গত রাত্রে খুঁজে পায়নি। এই খবর সে আপনাকে পাঠায় রেস্টহাউসের বেয়ারা সুলতানের মারফত। সুলতান কবুল করেছে সে-কথা। যখন আপনি খবর পেলেন, তার ঠিক জায়গায় নেই—তখনই টের পেলেন, যেভাবে হোক, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। সুলতানের হাতে বিষবড়ি পাঠালেন। সুন্দরলাল ইদানীং হার্টের অসুখে ভুগছিল। সুলতান সুন্দরলালের জলের গেলাসে বিষবড়িটি ফেলে দিয়েছিল। আরও বলব? ডুবুরি রঘুরামকেও আপনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভাগ্যক্রমে গভীর সমুদ্রে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল। আরও জানতে চান?

সি-ভিউ হোটেলে ফেরার পথে কর্নেল বললেন, তোমার বন্ধুরা চলে যাক, জয়ন্ত। তুমি এই বুড়োকে সঙ্গ দাও। আমরা দুজনে এই দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করি। হ্রদের জলে প্রচুর মাছ। মাছ ধরি। কী? রাজি তো?

বললুম, আপনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বললেও রাজি।

অপরাধ

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৭



একটি সঙ্কেতের ইতিহাস

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পিয়ারীলাল নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। রাত এখন ঠিক সাড়ে দশটা। বর্ষার রাত বলেই রাস্তায় বড় একটা লোকজনের আনাগোনাও নেই। শুধু জলমাখা রাস্তা বেয়ে মাঝে-মাঝে দানবের মতো ছুটে যাচ্ছে দু-একটা ট্যাক্সি।

পিয়ারীলাল এরকম রাতই পছন্দ করে। কাজের পক্ষে এরকম রাতই ভালো। লোকজনের চোখে যত কম পড়া যায় ততই মঙ্গল। পিয়ারীলালের প্রফেশনের নীতিও তাই।

পিয়ারীলাল প্রফেশনাল কিলার—অর্থাৎ, পেশাদার খুনি। টাকার বিনিময়েই এ-কাজ করে সে। কিন্তু এখানেও তার একটু বিশেষত্বের উল্লেখ করতে হয়। সে নিরীহ মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। তার কারবার অপরাধীর সঙ্গে। অর্থাৎ, এমন অপরাধী—যে পুলিশ বা দেশের আইন ফাঁকি দিয়ে বেহালতবিয়তে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম কোনও ক্রিমিনালকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পিয়ারীলাল দ্বিধা করে না—তাও অবশ্য সেই টাকার বিনিময়ে এবং কেউ কাজে লাগালে।

আজ রাতে পিয়ারীলাল এরকম একটা কাজ সমাধা করে তার মক্কেলের, অর্থাৎ, নিয়োগকর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অর্ধেক টাকা আজ পাওয়ার কথা—অর্ধেকটা অবশ্য আগেই ও নিয়েছে।

পিয়ারীলালকে মক্কেল জানিয়েছিল, সে নিজেই তাকে টাকাটা পৌঁছে দেবে—কিন্তু রাজি হয়নি ও। এটাও পিয়ারীলালের প্রফেশনের একটা গোপনীয়তা। নিজের ডেরার খবর কখনও ও কাউকে জানতে দেয় না। একটা নিরাপদ ব্যবস্থা ছাড়া এটা আর অন্য কিছু না। কাউকে বিশ্বাস করে না ও—এ-ধরনের কাজে বিশ্বাস করাও চলে না। তবে অন্য কারও চেয়ে পিয়ারীলাল অতিমাত্রায় সাবধানী। তাই সে মক্কেল মিশিরলালজিকে জানিয়ে দেয়, ও নিজেই রাত সাড়ে দশটার পর তাঁরই বাড়িতে হাজির হবে। দরজা যেন খোলাই থাকে।

পিয়ারীলাল এবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

দশটা পঁয়ত্রিশ। এবার যাওয়া যেতে পারে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোপন অস্ত্রটা একবার অনুভব করে নিল পিয়ারী-লাল। বলা তো যায় না—এটাই ওর বন্ধু। একটা ছোট্ট ক্যালিবারের লুগার। সাক্ষাৎ কালনাগিনী।

এটা ওর একদিকে ব্যবসা আর অন্যদিকে আত্মরক্ষারও হাতিয়ার। তেমন-তেমন বিপদে এটাই ওর বিপদত্রাতার ভূমিকা নেয়।

বৃষ্টি এখন নেই। পিয়ারীলাল বাড়িটার সামনে গিয়ে সামনের দরজায় হাত দিতেই সেটা খুলে গেল। চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে ঢুকে গেল পিয়ারীলাল।

মস্ত বড় বাড়ি। মালিক বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিশিরলালজি। লোকে তাকে ওই নামেই একডাকে চেনে।

বাড়িতে ঢুকতেই পিয়ারীলালের নজরে পড়ে বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা ঘরে আলোর শিখা। ওর মনে পড়ল, আগের দিনও ওই ঘরেই ও এসেছিল।

পিয়ারীলাল তাই এগিয়ে গেল। ঘরে এসে পৌঁছতেই ওর চোখে পড়ল, একটা সোফায় বসে আছেন স্বয়ং মিশিরলালজি।

চমৎকার মেদবিহীন চাবুকের মতো চেহারা—দেহে সাহেবি পোশাক। চুরুটের গন্ধে ঘরটা ভরপুর।

পিয়ারীলাল সামনে এসে দাঁড়াতেই মিশিরলালজি বলে উঠলেন, 'এসো, পিয়ারীলাল। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তবে সময়টা বড় বেয়াড়া বেছে নিয়েছ।'

ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসতে-বসতে পিয়ারীলাল বলে, 'যে-কাজের যেমন দস্তুর, মিশিরলালজি।'

'কথাটা মন্দ বলোনি।'

'তাহলে কাজের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।' পিয়ারীলাল বলে এবার।

'ব্যস্ত কেন? একটু গলা ভিজিয়ে নিতে আপত্তি আছে নাকি তোমার, পিয়ারী?' মিশিরলালজি উঠে দাঁড়ালেন।

'না, ইচ্ছে নেই।' একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জবাব দিল পিয়ারীলাল।

'তোমার সন্দেহ হচ্ছে, পাছে কাজের সাক্ষীকে সরিয়ে দিই? না? মদে বিষ মেশানো আছে ভাবছ?' হো-হো করে হেসে উঠলেন মিশিরলালজি।

'যেমন মনে করেন,' সতর্ক ভঙ্গিতে বলে পিয়ারীলাল, 'আমার কাজটাই আমাকে এরকম করে তুলেছে। নিজের মনকেও তাই মাঝে-মাঝে অবিশ্বাস করে ফেলি।'

'তুমি মজার মানুষ, পিয়ারীলাল। এরকম মানুষ আমার জীবনে আমি কখনও দেখিনি।' মিশিরলাল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন এবার।

পিয়ারীলালকে ইতস্তত করতে দেখে মিশিরলালজি আবার বলে উঠলেন, 'কী পিয়ারীলাল, সিগারেটে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি ভাবছ নাকি? তুমি হাসালে।'

পিয়ারীলাল আর দ্বিধা করল না, একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজে নিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিল।

ভকভক করে নাক-মুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা ঘুরিয়ে দেখল ও। তারপর বলে, 'বিলিতি ব্র্যান্ড দেখছি। কোথায় পান এগুলো?'

'কলকাতার বুকে পয়সা ছড়ালে, জানোই তো, বাঘের দুধও মেলে। এই ব্র্যান্ড আমার নেশা—অবশ্য চুরুটও তাই।' মিশিরলালজি বললেন।

পিয়ারীলাল এবার ঘড়ির দিকে তাকাল : 'মিশিরলালজি, অনেক রাত হল। এবার কাজটা শেষ করুন।'

'ও, হ্যাঁ।' মিশিরলালজি অ্যাটাচি খুলে এক বান্ডিল নোট বের করে টেবিলে এগিয়ে দিলেন 'পাঁচ হাজারই আছে।'

পিয়ারীলাল বান্ডিলটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'চলি, মিশিরলালজি। সিগারেটের প্যাকেটটাও নিচ্ছি, বেড়ে মাল।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, পিয়ারীলাল।' দয়ার অবতার বলেই মনে হল মিশিরলালজিকে : 'আবার দরকার হলে এসো।'

'গুড বাই।'

'গুড বাই।'

পিয়ারীলাল বেরিয়ে যেতেই ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিশিরলালজি, মুখে একটা রহস্যময় হাসি।

এবার কাজ করে বেজায় খুশি পিয়ারীলাল। টাকাটাও কাজে লাগবে। অনেকদিন একটু দেশভ্রমণের শখ, এবার সেটা প্রাণভরে মিটিয়ে নেওয়া যাবে।

পকেট থেকে মিশিরলালজির কাছ থেকে আনা বিলিতি সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল এবার পিয়ারীলাল।

নাঃ, সিগারেটটা সত্যিই ভালো। মিশিরজির টেস্ট আছে বলতে হয়।

আরাম করে একটা জোরালো টান মারল পিয়ারীলাল।

হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল পিয়ারীলালের। ঘুরে পড়তে-পড়তে ও নিজেকে সামলে নিল।

এ কী! এরকম কেন হল? নিশ্বাস নিতেও দারুণ কষ্ট হচ্ছে। দম আটকে আসছে যেন!

পিয়ারীলাল উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। অসম্ভব মাথা ঘুরছে। বুকের মাঝখানে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।

দারুণ ঘাবড়ে গেল ও।

ওই সিগারেটটা! ওটাতেই কিছু ছিল নিশ্চয়ই! মিশিরলালেরই শয়তানি সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন কী করা উচিত, ভেবে পেল না পিয়ারীলাল। দু-চোখে অন্ধকার নেমে আসছে বুঝতে পারছে ও।

তাহলে কি ও মরে যাচ্ছে? গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল পিয়ারীলালের। মিশিরলাল ওকে এমনভাবে শেষ করল!

হাত-পা-শরীর সব যে ঠান্ডা হয়ে আসছে! যে-লোক এতদিন অম্লানবদনে মানুষ খুন করেছে, মৃত্যু আসছে বুঝতে পেরে তার ছেলেমানুষের মতো কান্না এসে গেল।

'কে আছ, বাঁচাও!' বলতে গেল পিয়ারীলাল।

কিন্তু এ কী, গলা দিয়ে যে স্বরও বেরোল না তার! সত্যিই ও মরে যাচ্ছে?

সিগারেটের প্যাকেটটা নজরে পড়ল পিয়ারীলালের। কোনওরকমে হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নিল ও। এখনও সাতটা সিগারেট আছে।

ও মরে যায় যাক, শয়তান মিশিরলালকেও শেষ করতে হবে। যে-কোনও একটা সঙ্কেত কি পুলিশের জন্য রেখে যেতে পারবে না?

প্রায় অসাড় হাতে প্যাকেটটা খুলে মেঝেয় সিগারেটগুলো ঢেলে ফেলল পিয়ারীলাল।

পুলিশ এল তিনদিন পরে।

এলাকার কয়েকজনই খবরটা দেয়। দরজা ভেঙে পুলিশ যখন ঘরে ঢুকল, পিয়ারীলালের দেহে তখন পচন ধরেছে।

পুলিশ দেখল, দেহের পাশে সিগারেট সাজিয়ে লেখা ইংরাজি বর্ণমালার দুটো অক্ষর—'এম' আর 'এল'।

সিগারেটের প্যাকেটটাও পাশেই পড়েছিল। পুলিশ সেটাও তুলে নিল। পোড়া সিগারেটের ক'টা টুকরোও।

ময়না তদন্তে জানা গেল, পিয়ারীলালের মৃত্যু হয়েছে মারাত্মক কোনও বিষে। সিগারেটগুলো পরীক্ষা করে কিছুই পেল না পুলিশ। বিষপ্রয়োগ কেমন করে হল, আবিষ্কার করাও সম্ভবপর হবে বলে মনে হল না। তবে পুলিশ সার্জনের মতে মারাত্মক বিষ ফুসফুসে ঢুকেছিল—আর তার সম্ভাবনা কোনও কিছু শ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করেই।

তাহলে সিগারেটই দায়ী? গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর প্রশান্ত লাহিড়ীর সন্দেহ তাই-ই। হত্যাকারী চমৎকার সুযোগ নেয়। অনেক সিগারেটের মধ্যে মাত্র একটাতেই বিষ ছিল। পিয়ারীলাল সেটা খাওয়ামাত্রই মৃত্যুবরণ করেছে। একটা টুকরোতে বিষের সন্ধান মিলল।

কিন্তু হত্যাকারী কে হতে পারে? পিয়ারীলালের মতো মানুষের শত্রুর সংখ্যা সম্ভবতই অগণিত।

তবে একটা সূত্রই হাতে আছে! ইংরেজি এম ও এল।

মৃত্যু নিকটবর্তী দেখে পিয়ারীলাল অবশ্যই হত্যাকারীর নামটা সঙ্কেতের মধ্যে দিয়ে জানাতে চাইছিল। এ ছাড়া এ-রহস্যের অন্য ব্যাখ্যা চলে না।

অবশ্য সূত্র হিসেবে সিগারেটের প্যাকেটটাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়—কারণ ওরকম দামি সিগারেট পিয়ারীলালের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। সিগারেটের ওই প্যাকেট কেউ পিয়ারীলালকে দিয়েছে এবং সেটা অল্প ক'দিনের মধ্যেই।

এবার এই সিগারেটের প্যাকেট কোথায় পাওয়া যায়, সেই পথেই অনুসন্ধান চালাবেন ঠিক করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। রহস্যটা তাঁকে ভেদ করতেই হবে, একটা জেদ চেপে গেল লাহিড়ীর।

অনুসন্ধান অবশ্য সহজ নয়। কলকাতায় যারা চোরাই মালের ব্যবসা চালায়, তাদের কাছেই খোঁজ শুরু করতে হবে। ইনফরমারেরাই পারবে। লাহিড়ী লোভের জাল ছড়ালেন।

অচিরেই ফল মিলল। মধ্য কলকাতার একটা দোকানে ওই বিদেশি সিগারেটের ব্র্যান্ড প্রচুর দামে বিক্রি হয়। লাহিড়ী নিজেই এবার মাঠে নামলেন।

মধ্য কলকাতার সেই দোকানে ছদ্মবেশে একদিন পৌঁছলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। দামি স্যুট পরনে। দেখলেই বোঝা যায়, পয়সাওয়ালা কোনও কাপ্তেন।

দোকানে লোকজন তেমন নেই। প্রশান্ত লাহিড়ী এটা-ওটা কিছু কিনে সেই প্যাকেটটা বের করলেন 'পাঁচ প্যাকেট চাই। হবে?'

দোকানদার একবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এসবের কারবার আমরা করি না।'

লাহিড়ী বলে উঠলেন, 'খবর নিয়েই এসেছি। যা দাম চান দেব।'

লোকটা নিচু গলায় বলে, 'কার কাছে খবর পেলেন, মিশিরলালজি?'

প্রশান্ত লাহিড়ীর পক্ষে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে দশ সেকেন্ডের বেশি লাগেনি—মিশিরলাল! এম আর এল। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি মাথা নোয়ালেন : 'ঠিক। উনিই।'

'পাঁচ প্যাকেটের দাম পঞ্চাশ টাকা পড়বে।' লোকটা বলে।

'তাই দেব। আনুন।'

লোকটা কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতেই নিজ মূর্তি ধরলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

'তোমরা নিষিদ্ধ বস্তুর কারবার চালাচ্ছ? তোমাদের গ্রেপ্তার করছি।'

লোকটা প্রায় ককিয়ে ওঠে, 'স্যার, আপনি? কিন্তু স্যার, কোনও অপরাধ আমরা করিনি, স্যার। জাহাজের একজন—।'

'ছেড়ে দেব এক শর্তে।' লাহিড়ী বললেন।

'বলুন, স্যার। আমরা যে-কোনও সাহায্য করব।'

'মিশিরলালজি কে?'

'চেনেন না স্যার? মস্ত কারবার। সোল অ্যাভিনিউতে বাড়ি। একখানা গাড়ি আছে—লাল রং! গাড়ির নম্বর ৭৮৪২।'

'চমৎকার। ভয় নেই। তবে মিশিরলাল যেন এ-ঘটনা জানতে না পারে, সাবধান।' খুশি-মনে বেরিয়ে এলেন লাহিড়ী।

মিশিরলাল! এম আর এল তো তার নামেরই আদ্যক্ষর। তবে কি সে-ই হত্যাকারী?

খুব সাবধানে এগোতে হবে।

মারাত্মক একটা প্রমাণই হাতে আছে। পিয়ারীলালের দেহের পাশে পড়ে থাকা সেই সিগারেট প্যাকেটের ওপর আঙুলের ছাপ। দু-রকম ছাপ পেয়েছে পুলিশ—একটা অবশ্য পিয়ারীলালের। অন্যটা কার? মিশিরলালের?

যাচাই করার জন্য মিশিরলালের হাতের ছাপ চাই।

সেই দোকানে নজর রাখল পুলিশ। আটঘাট বেঁধেই এগোতে হবে।

সাত দিনের মাথায় দেখা মিলল, লাল গাড়ি আর তার মালিক মিশিরলালজির। দোকানের মধ্যেই গোপনে ছিল পুলিশের লোক।

সওদা করে মিশিরলাল বেরিয়ে যেতেই পুলিশ হাতের ছাপ তুলল কাউন্টারের ওপর থেকে।

বিশেষজ্ঞরা ছাপ দুটো মেলাতেই নিঃসন্দেহ হলেন। দুটো ছাপই অবিকল এক—অর্থাৎ, মিশিরলালের।

প্রশান্ত লাহিড়ী এবার সোজা হাজির হলেন মিশিরলালজির বাড়িতে। করলেন সোজাসুজি আক্রমণ 'পিয়ারীলালের হত্যাপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

মিশিরলাল শক্ত ধাতের লোক। তিনি বলে উঠলেন, 'কে পিয়ারীলাল? জীবনে নাম শুনিনি।'

'নাম শোনেননি, তবু আপনার দেওয়া সিগারেট খেয়েই মৃত্যু হল তার। ভারি আশ্চর্যের কথা, মিশিরলালজি। সিগারেটের প্যাকেটটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে ভাবেননি। তা ছাড়া, পিয়ারীলালকেও ধন্যবাদ, সে সঙ্কেতে আপনার নাম চিনিয়ে দিয়েছে।' প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, 'প্যাকেটে আপনার আঙুলের ছাপ অস্বীকার করবেন কেমন করে?'

ফাঁসির দড়িটা যেন এবার চোখের সামনে দেখতে পেয়ে গলায় হাত বোলাতে চাইলেন মিশিরলালজি।

মাসিক রোমাঞ্চ

আগস্ট, ১৯৭৮



ঘটনা

বনফুল

আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি।

তখনও মড়া কাটা চলছে। হাত, পা, পেট, বুক হয়ে গেছে। গলা এবং মাথা বাকি। আমাদের নিয়ম ছিল, কোনও অংশ ব্যবচ্ছেদ করবার পূর্বে সেই অংশটির অস্থিগুলির সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞানার্জন করতে হত। না করতে পারলে সেই অংশটি ব্যবচ্ছেদ করবার অনুমতি কর্তৃপক্ষরা দিতেন না। অস্থি-বিষয়ক একটা পরীক্ষা দিতে হত—তাতে পাশ করলে তবে পার্ট পাওয়া যেত। গ্রে-র অ্যানাটমি খুলে গলার কয়েকটা হাড় এবং মড়ার মাথা নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই তাই পড়তে বসেছিলাম সেদিন। ডাক্তার বসাক বড় কড়া পরীক্ষক, তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। মড়ার মাথাটাও দিন-দুই পরে মুন্না ডোমকে ফেরত দিতে হবে। কলেজের সম্পত্তি। বকশিশের লোভে লুকিয়ে আমাকে দিয়েছিল। মাথায় এমন অনেক পাতলা কাগজের মতো হাড় আছে, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঠিক পাঠোপযোগী করা দুঃসাধ্য, সেসব হাড় তাই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। আমরা অনেকেই তা কিনতে পারতাম না। কলেজে প্রফেসরের পড়াবার জন্য অবশ্য একাধিক সেট থাকত মুন্না ডোমের জিম্মায়। আমরা তাকে বকশিশ দিয়ে সেইসব হাড় একদিন কিংবা দু-দিনের কড়ারে মেসে নিয়ে এসে পড়তাম। মড়ার মাথাটা মুন্নাই দিয়েছিল। বেশি বড় নয়, ছোট্ট মাথাটি।

সেদিন পড়া আরম্ভ করবার আগেই কেন জানি না—রেণুকে মনে পড়ল। প্রায় বছর-ছয়েক পূর্বে রেণু মেয়েটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। রেণুর বাবা যোগেনবাবু কী একটা আপিসে চাকরি করতেন। কোথা থেকে যেন বদলি হয়ে এসে আমাদের প্রতিবেশী হয়েছিলেন অল্প কিছুদিনের জন্যে। তখন আমরা পাটনায় থাকি—আমি সবে তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছি। বয়স মাত্র পনেরো বছর। কিন্তু সেই বয়সেই বেশ মনে আছে, রেণুর প্রেমে পড়েছিলাম। রেণুর বয়সও তখন দশ-এগারোর বেশি নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, রেণুও আমার প্রেমে পড়েছিল। কারণও ছিল একটু। যোগেনবাবু আমাদের স্বজাতি এবং পালটি ঘর ছিলেন, আমার সঙ্গে নাকি রেণুর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বাবার কাছে। তাই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল। একটু রোগা কালো ছিপছিপে ধরনের চেহারা ছিল রেণুর। ভাসা-ভাসা বড়-বড় চোখ দুটি। জানলার গরাদ ধরে সে প্রায়ই আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকত, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই পালিয়ে যেত। বিয়ের প্রস্তাব অবশ্য বেশিদূর এগোয়নি—বাবা আমল দেননি বিশেষ। উপার্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেবেন না, এই তাঁর মত ছিল। কিছুদিন পরে যোগেনবাবু বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। রেণুর সঙ্গে

প্রত্যক্ষ আর-কোনও সম্পর্ক রইল না। রেণুকে কিন্তু অনেকদিন ভুলতে পারিনি আমি। তার রোগা মুখের বড় চোখদুটো অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে ছিল—পরে অবশ্য ভুলে গেছি। সেদিন পড়তে বসার আগে এবং অনেকদিন পর অকারণে রেণুকে মনে পড়ল আবার। কেন জানি না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। বেশিক্ষণ কিন্তু নয়। মিনিট-দুই পরেই তোয়ালে-কাঁধে শিবুদা প্রবেশ করলেন। ঘর্মাক্ত কলেবর। ডনবৈঠক সেরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমি স্লাইডটা পরীক্ষা করে দেখলাম হে। প্রচুর গনোককাস। ও-ব্যাটাকে আর রাখা চলবে না—' বলেই বেরিয়ে গেলেন। সেদিন সকালে আমাদের মেসের ঠাকুরটা শিবুদার হাতে মার খেয়েছিল খুব। আমরা সকালে স্নান করতে গেছি নীচের কলতলায়—শিবুদা দেখি ঠাকুরটাকে ঠ্যাঙাচ্ছেন।

কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'গনোরিয়া হয়েছে ব্যাটার।'

মাধববাবু (শিবুদার সহপাঠী—তিনিও স্নান করছিলেন) বললেন, 'গনোরিয়া হয়েছে, আগে সেটা প্রমাণ করো। আগে থাকতেই মারছ কেন ব্রাহ্মণকে—?'

'গলগল করে পুঁজ বেরুচ্ছে—আর অন্য কী হবে? আচ্ছা, একটা স্লাইড নিচ্ছি আমি—।'

শিবুদা একটা স্লাইডে পুঁজ মাখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফলটা আমাকেও জানিয়ে গেলেন। ঠাকুরটা যে দুশ্চরিত্র তাতে আর সন্দেহ রইল না।

বাজে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে পড়া শুরু করলাম। অনেক পড়তে হবে। রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত পড়লাম। তবু সবটা শেষ হল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে অ্যানাটমি বন্ধ করে মড়ার মাথাটা শেলফের ওপর তুলে রেখে শুয়ে পড়তে হল। মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে শুলাম যে, ভোরে উঠে বাকিটা পড়ে ফেলতে পারব। আশা কিন্তু অতিশয় ক্ষীণ। কারণ, আমি কোনওদিনই ভোরে উঠতে পারি না। আমার রুমমেট জিতেন রোজ আমাকে আটটার সময় টেনে তোলে। জিতেনও বাড়ি গেছে, সুতরাং ভোরে ওঠার আশা কম। তবু শুয়ে পড়লাম।

সেদিন কিন্তু খুব আশ্চর্য কাণ্ড হল—রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং-টং করে দুটো বাজল স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি—কিছুতেই ঘুম আসে না। একবার মনে হল, ঘুম যখন আসছে না, তখন উঠে পড়তে আরম্ভ করি—কিন্তু কুঁড়েমি করে উঠতেও ইচ্ছে করছে না—উঠি-উঠি করে চোখ বুজেই পড়ে আছি বিছানায়। এমন সময় গাড়িবারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ পেলাম। মনে হল, কে যেন আমার ঘরের দিকে আসছে। আমার ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটি কুঁজোয় গ্লাস-ঢাকা জল থাকত। শিবুদা পাশের ঘর থেকে মাঝে-মাঝে জল খেতে আসতেন। আমরা থাকতাম দোতলায়। রাত্রে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ থাকত খালি—আমাদের সকলের ঘরের দরজা খোলা থাকত। মনে করলাম, শিবুদাই আসছেন বোধহয় জল খেতে। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করছি, এইবার কুঁজোর ভকভক শব্দটা শুনতে পাব। কোনও শব্দ হল না। পায়ের শব্দটা যেন আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে গেল। কে এসেছে, দেখবার জন্যে উঠে বসলাম। দেখি, কলেজ স্কোয়ার থেকে একঝলক আলো এসে আমার দরজার সামনে পড়েছে, আর সেই আলোয় শ্বেতবসনা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম না যদিও, কিন্তু সে যে মেয়ে তাতে সন্দেহ ছিল না। মনে হল, নির্নিমেষে আমারই দিকে চেয়ে আছে যেন।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'কে?'

কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকে অপর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার ঘরের সামনা-সামনি দুটো দরজা ছিল—একটা গাড়িবারান্দার দিকে, আর-একটা বাথরুমের দিকে। মনে হল, মেয়েটি বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ঠাকুরটা তার প্রণয়িনীকে ডেকে আনেনি তো! তৎক্ষণাৎ আলো জ্বেলে অনুসরণ করলাম।

বাথরুমে কেউ নেই। সিঁড়ির দরজা খিল লাগানো। তেতলার ছাদে উঠে গেলাম, সেখানেও কেউ নেই। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম, কোথাও কারও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিঁড়ির দরজা খুলে নীচে নেমে গেলাম। দেখি, ঠাকুরটা নিজের ঘরে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওঠালাম তবু তাকে।

'এই, কে এসেছিল এখন?'

'কই, কেউ তো না বাবু।'

চোখ মিটমিট করে বিস্মিত ঠাকুর চেয়ে রইল আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হল, সত্যিই সে কিছু জানে না।

আশ্চর্য! কোথা গেল মেয়েটা! স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম, অথচ—, নানারকম ভাবতে-ভাবতে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল মড়ার মাথাটা। শূন্য অক্ষি-কোটর দুটো যেন নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে। গা ছমছম করতে লাগল। শিবুদার ঘরে গিয়ে তাঁর লেপের তলায় ঢুকে পড়লাম। শিবুদা জিগ্যেস করলেন, 'কে, যতীন নাকি—?'

'হ্যাঁ। ও-ঘরে ভয় করছে একা—।'

শিবুদা 'হঃ' জাতীয় একটা শব্দ করে সরে শুলেন একটু।

ভোর হতে-না-হতেই মড়ার মাথাটা নিয়ে হাজির হলাম মুন্না ডোমের কাছে।

'এটার বদলে আর-একটা মাথা দে আমাকে।'

তার নিজস্ব বাঁকা বাংলায় মুন্না বললে, 'কেন বাবু, এ তো বেশ ভালো স্কাল আছে। আপনাদের জন্যে ভালো বানিয়ে রেখেছি—।'

'প্রফেসর যেটা থেকে পড়ান সেইটে দে আমাকে।'

'উ হোবে না, বাবু। নির্মলবাবুকে উঠো দিয়েছিলাম। সাহেব কী করে টের পেয়ে গেলেন। হামার পাঁচ টাকা জোরমানা করে দিলেন। একটা ফিমেল বডি থেকে তাই এ-মাথাটা আপনাদের জন্যে আলাদা বানিয়ে রেখেছি—।'

'ফিমেল বডি থেকে?'

'হাঁ, বাবু। মোটর অ্যাক্সিডেন্টের একটা বেওয়ারিশ বডি মর্গে এসেছিল, তাই থেকে বানিয়েছি—।'

চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

মুন্না বলতে লাগল, 'খুব মেহন্নতসে ভালো করে বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। মার্কিং তো খুব ভালো আছে, বাবু—।'

'না, এটা চাই না, আর-একটা দে—।'

দাঁত বের করে মুন্না বললে, 'আর-একঠো টাকা লাগবে, বাবু। খুব জরুরত, হুজুর—।'

সেলাম করলে একবার।

'আচ্ছা দেব। এটা বদলে দে তুই।'

মুন্না ডোম আর-একটা মাথা বের করে দিলে।

পরীক্ষায় যথাসময়ে পাশ হলাম—পার্ট পেলাম।

মাসখানেক পরে মায়ের চিঠি এল একটা।

নানা কথার পর মা লিখেছেন 'রেণুকে মনে আছে তোর? আহা, বেচারির কী শোচনীয় মৃত্যুই হয়েছে! কলকাতায় কোথায় নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তার। যোগেনবাবু তাঁর অফিসের একজন লোকের সঙ্গে তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কথা ছিল, যোগেনবাবুর এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠবে। সেখানেই তাকে বরপক্ষের লোকেরা দেখতে আসবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই পারেনি বেচারি। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল, মোটরে-মোটরে ধাক্কা লাগে। রেণু এবং সেই লোকটি দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশ তাদের নাকি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। রেণু সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়, অপর লোকটি

দশদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তারপর ক্রমশ ভালো হন। রেণু বেচারির সৎকার পর্যন্ত হয়নি—ডোমেরা নাকি ফেলেছে। যোগেনবাবু চিঠি লিখেছেন, তুই যদি একটু খোঁজ করিস—।'

চিঠিটা পেয়ে চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। রেণুর মুখখানা মনের ওপর ফুটে উঠল আবার।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৮



ক্রমশ আলোর দিকে

তুষার রায়

রেলওয়ে গুমটি, টেলিগ্রাফ পোস্ট বেয়ে চলে যাওয়া তারের রেখা, আর দু-পাঁচটা নিষ্পত্র গাছের আঁকিবুকি ডাল সব কেমন সিল্যুট দেখাচ্ছে। বিপরীতে, অর্থাৎ পশ্চিমে, নেমে যাচ্ছে উজ্জ্বল কমলা রঙের সূর্য। সারাটা দৃশ্যে কিছুটা সিঁদুরে আভা লেগে রয়েছে এখনও, কিন্তু একটু পরেই মরিচার মতো বাদামি হয়ে আসবে সবকিছু, তারপর ছায়া-ছায়া ভোর-ভোর সন্ধ্যা এসে অনেক ডিটেল খেয়ে নেবে দৃশ্যবস্তুর। আজ ছ'দিন ধরে দৃশ্য ও আলোর এ-বর্ণনা দেখেছে সুবিনয়। তাই আজ বেলা দুটো থেকে বসে দৃশ্যটার কম্পোজিশন স্কেচ করে নিয়ে তেল রং চাপাচ্ছে নিবিষ্ট মনে।

ছবিটা জমেছে মন্দ না। বেশ খুশি-খুশি মনে চারমিনারে শেষ টান দিয়ে ফের কাজে মন দিল সে।

গোটা আট-দশ মালবোঝাই ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে গুমটিতে। গেট বন্ধ। চারটে পঞ্চান্নর মেল ট্রেনটা পাস করে গেলে গেট খুলবে। দূরে বাঁকের ও-ধারে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে শুধু। গেটটা খুলে অনায়াসে গাড়িগুলোকে পার করিয়ে নিতে পারত। কিন্তু রেলওয়ে গেটম্যান জবরদস্ত ডিউটি করে। গোঁফে চাড়া দিয়ে লোকটা বিচিত্র উপেক্ষার চোখে ট্রাকগুলোর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

হাতের কাজ বন্ধ করে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুবিনয়। লোকটা বিচিত্র। একটু আগে ওর কাছে জল চেয়েছিল সুবিনয়। লোকটা খাটিয়ায় বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিল। আরও দুটি লোক বসেছিল খাটিয়ায়। গুমটিম্যান লোকটি বেশ মাতব্বরি সবজান্তা গলায় দিল্লির হালচাল রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলছিল। ভাবভঙ্গি এমন ছিল যেন জ্ঞান দিচ্ছে।

জল চাইতে, কথায় বাধা পেয়ে তীক্ষ্ন চোখে সুবিনয়ের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, বাঁ-হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইশারা করেছিল লোকটা।

খাটিয়ায় বসা সেই দুজন শ্রোতার একজন অধৈর্যভাবে জিগ্যেস করেছিল, ওকর বাদ কা ভৈল?

গুমটিম্যান হাতের কলকেটা আর-একজনের হাতে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, আরে, রামরতনোয়া তো পিসিডেন কা ডারাইভর, ওকর কা পরওয়া। অর্থাৎ, কোন এক রামরতন তো প্রেসিডেন্টের ড্রাইভার, তার আবার কাকে পরোয়া। লোক দুটো তাই শুনে হতভম্বের মতো তাকিয়েছিল, লোকটা—মানে গুমটিম্যান—তখন চোখ টিপেছিল বিচিত্র এক ইশারায়।

না, আলো কমে আসছে দ্রুত, রঙের টোন বোঝা যাচ্ছে না। কাজ বন্ধ করে রেলওয়ে গুমটির দিকে তাকাল সুবিনয়। গুমটিম্যান বন্ধ গেটে হেলান দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে আসা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ওর কথার শব্দ শোনা যায় এখান থেকে, হ্যাঁ এক বাঙালিবাবু। ফটো খিচলছে। এ-কথাগুলো শুনে সুবিনয় বুঝতে পারল যে, তার কথাই ওকে বলছে গেটম্যান।

সুবিনয় দেখতে পেল গেটম্যানের আঙুল-নির্দেশে তাকে দেখছে সেই ড্রাইভারগোছের লোকটা। পাঞ্জাবি ধরনের ঢোলা সালওয়ার-কামিজ পরা দীর্ঘদেহী লোকটার চোখ দুটো বেশ বড়-বড় আর জ্বলজ্বলে। বিকেল বেশ ঘন হয়ে এলেও এসব বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল সুবিনয় তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে। কেমন যেন চেনা-চেনা চেহারা লোকটার। কোথাও যেন দেখেছে কখনও ওকে বলে মনে হল সুবিনয়ের। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে টিউবগুলো গুছিয়ে বাক্সটা বন্ধ করল। বসে কাজ করার মতো ছোট ফোলডিং ইজেলটা ভাঁজ করে নিয়ে একহাতে বাক্স ও ইজেল এবং অন্যহাতে ক্যানভাসটা ঝুলিয়ে নিল সুবিনয়। ট্রেনটা ততক্ষণে চলে এসেছে। আস্তে আসছে এঞ্জিনটা, অত্যধিক শব্দ করতে-করতে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে চিমনি দিয়ে।

রেললাইনের পাশে যে-উঁচুমতো জায়গাটায় বসে কাজ করছিল সুবিনয়, সেখান থেকে নীচে নামবার একটা ধাপ কাটা-কাটা পায়ে-চলা পথ আছে।

সন্তর্পণে সুবিনয় নামার জন্য তৈরি হল। ট্রেনটা গুমটির কাছাকাছি চলে এসেছে, গেটম্যান হাতে একটা সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে নাড়ছে।

পশ্চিম আকাশে ম্যাড়মেড়ে হয়ে এসেছে ক্ষণপূর্বের উজ্জ্বল আগুন রং। এসব দেখে চোখ নামাতেই সে দেখতে পেল, সেই ড্রাইভারগোছের লোকটা কখন যেন নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, সুবিনয়ের থেকে আট-দশ ফুট নীচে সেই ধাপ-কাটা পথটার গোড়ায়, যেখান দিয়ে সুবিনয় নামবে।

ট্রেনটা ঘসঝস-ঘসঝস শব্দ আর চাকার ধাতব ঝঞ্ঝনা তুলে পাস করে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। কোক কয়লার তীব্র ধোঁয়াশে গন্ধের মধ্যে থেকে সুবিনয় দেখতে পেল, লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকেই দেখছে।

তখনও সুবিনয় চিনতে পারেনি লোকটাকে। ট্রেনটা পার হয়ে গেল। সুবিনয় এবার ধাপ বেয়ে নামতে লাগল সন্তর্পণে। হঠাৎ লোকটা বিশ্রী কেমন ধাতব খনখনে শব্দে হেসে উঠল। হাসছে তাকে দেখেই।

এইবার অকস্মাৎ ঝপ করে মনে পড়ে গেল, সেই হাসির বিশ্রী শব্দ আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে লোকটাকে চিনতে পারল। কাছাকাছি থেকে সেই বাঁ-গালে কাটার দাগটাও দেখতে পেয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে সুবিনয়ের সারা শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে এল। আর রক্ষা নেই আজ! সেই কথামতো বিশুয়া আজ ফিরে এসেছে। বেলঘরিয়ার সেই কুখ্যাত বিশুয়া—বিশ্বনাথ মাস্তান। তারকাটা ও ওয়াগন ব্রেকার পার্টি-লিডার, কুখ্যাত সেই বিশ্বনাথ। তখন একডাকে সারাটা মহল্লা চিনত ওকে। সে প্রায় বছর-আটেক আগেকার কথা। একদিন রাতে তারকাটার সময়ে সদলে ওদেরকে ধরিয়ে দিয়েছিল ওখানকার ভিজিলেন্স পার্টি। স্থানীয় সেই ভিজিলেন্স পার্টির সেক্রেটারি ছিল সুবিনয়।

দ্রুত সেই চলচ্ছবি যেন মুহূর্তে মানসপটে ভেসে উঠল সুবিনয়ের। পুলিশ এসে পড়ার আগে ওদের দলবলকে আটকে রাখতে একটা ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল যেন। বিশ্বনাথের বেপোরোয়া ভোজালি চালানোয় ডিফেন্স পার্টির একটি ছেলে সাংঘাতিক জখম হয়।

কিন্তু কাউকে সেদিন পালাতে দেয়নি সুবিনয়রা। অতঃপর পুলিশবাহিনী এসে পড়ে সদলবলে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করে।

কোর্টে কেস ওঠার পর আদালতে একদিন জেলভ্যানে ওঠার সময়ে বিশ্বনাথ শাসিয়েছিল সুবিনয়কে। বলেছিল, শালা ফাঁসি তো আর হবে না, কোনওদিন তো বেরুব আবার, তখন দেখা হবে, দোস্ত, পুরো বদলা নেব। কেউ আটকাতে পারবে না, আবার দেখা হবে।

ট্রেন চলে গেছে। মলিন হয়ে এসেছে বিকেলের আলো। আর শিমুলতলার আগের স্টপ লাহাবনীর মতো অখ্যাত জায়গায় এমন পরিবেশে আজ হঠাৎ অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল প্রায় আট বছর পরে।

কই নামুন, একটু বাতচিৎ হোক, হ্যাঃ হ্যাঃ। —কথা শেষ করে সেই বিশ্রী হাসির আওয়াজ তুলে কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়াল বিশ্বনাথ।

বড়-বড় চোখ যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছে। কথাবার্তার ধরনে মনে হয় ও মদ খেয়ে আছে। ফাঁকা জায়গা, ওধারে দাঁড়ানো ট্রাকগুলোতে ওরই স্যাঙাত লোকজন। কী করবে, কী বলবে কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে ফাঁকা শ্বাস নিল সুবিনয়।

আসল ভয়ের একটা অনুভূতি আছে। আগে কোনওদিন সেটার স্বাদ পায়নি সে। কিন্তু আজ এই ফাঁকা নির্জন জায়গায় ওই লোকটার সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে সারা শরীরে সেই চিনচিনে ঝিমঝিমে ভাবটাকে অনুভব করল সুবিনয়। বিশুয়া বা বিশ্বনাথ আজ প্রতিশোধ নেবে। কোনওরকমের প্রতিরোধের চিন্তাই এখানে অর্থহীন। ট্রাকগুলোতে ওরই সব দোস্ত স্যাঙাত। ওঃ, আর ফিরে যাওয়া হবে না। মিনতির সঙ্গে দেখা হবে না আর। বিয়ের পর কথামতো দুজনে সাজাতে পারবে না ফ্ল্যাট। কেবল ল্যান্ডস্কেপ ছবির প্রদর্শনীর যে-পরিকল্পনা ছিল অ্যাকাডেমিতে, তা-ও হয়ে উঠবে না। গুড়িয়ে উঠতে লাগল এইসব চিন্তা সুবিনয়ের মাথায়। এতদিন সংগ্রাম করে আজ সে নামি এক পাবলিসিটি ফার্মের চিফ আর্টিস্ট হতে পেরেছে। মিনতি...মিনতির সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল যেন মানসপটে, বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল সুবিনয়ের। আর হ্যাঁ, মরিয়া হয়ে উঠল সে হঠাৎ। দেওয়ালের সামনে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো বেড়ালের মতো মরিয়াপনায় ফুঁসে উঠে সুবিনয় তার হাতের ক্যানভাসটা পাশে রেখে দিল, কিন্তু ঢালু জায়গা বলে ক্যানভাসটা গড়িয়ে চলল নীচের দিকে।

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—ভয় পাচ্ছেন কেন?—খ্যাকখ্যাক হাসির সঙ্গে বিশুয়া বলল এ-কথা।

সুবিনয় খর গলায় বলল, তুমি অপরাধ করেছিলে, তার সাজা পেয়েছ। আমি যদি না-ও থাকতাম সেদিন, তাহলেও তুমি রেহাই পেতে না। কারণ, পুলিশ তোমাকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল।—এ-কথা বলে সুবিনয় নেমে আসবে, না ফের ওপরে উঠে যাবে ভেবে পেল না।

ফস করে একটা সিগারেট ধরাচ্ছে বিশুয়া বা বিশ্বনাথ, দেশলাই-কাঠির আলোয় তার গালে সেই কাটা দাগটা ভয়ঙ্কর দেখাল। গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিশুয়া বলল, আপনি নেমে আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে, কোনও ভয় নেই।

'কোনও ভয় নেই' কথাটায় সুবিনয়ের মনে হল যে, ওকে নামাবার জন্য বুঝি স্তোক দিচ্ছে বিশুয়া। চারপাশের কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। আকাশের আলো মরে এসেছে, সব কেমন আবছা-আবছা দেখায়, তার মধ্যেই সুবিনয় দেখতে পেল, জনা-পাঁচেক লোক এসে দাঁড়িয়েছে রেললাইনের কাছে—একজনের হাতে একটা লম্বা মতো জিনিস। একজন হিন্দিতে বিশুয়াকে জিগ্যেস করল, চাক্কা বদল দেই?—নহি নহি, বিশুয়া তাকে বলল—ওকর পম্প খুলদে জরা। তারপর বিশুয়া সুবিনয়ের উদ্দেশে বলল—আরে, নেমে আসুন না, মশায়। কতদিন পরে দেখা হল।

সুবিনয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কী করা দরকার। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কি লাভ আছে কিছু? ওরা এদিক দিয়ে উঠে এলেই ধরা পড়ে যাবে। পিছন দিক দিয়ে পালানো যাবে না, সেখানে দুর্ভেদ্য কাঁটাঝোপ। নামতে হবেই। এবং...।

সুবিনয় সিদ্ধান্তে এল, সে গিয়ে বিশুয়ার মুখোমুখি দাঁড়াবে। যা খুশি ওরা করুক, তবে সে-ও হাত গুটিয়ে মার খাবে না। আর ওপরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নীচে নেমে যাওয়া অনেক কাজের হবে, অন্তত ফাঁকা দেখে পালানোও যেতে পারে কোনওদিকে।

খুব তীক্ষ্ন চোখ ওদের ওপর রেখে সন্তর্পণে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে নামতে লাগল সুবিনয়। ক্যানভাসটা গড়িয়ে নীচে নামতে-নামতে একটা আশশ্যাওড়ার ঝোপে আটকেছিল, কাঁচা রঙে হয়তো দাগ হয়ে গেছে

ভেবে আপশোস হল সুবিনয়ের। বিশুয়া চড়াই বেয়ে একটু উঠে ক্যানভাসটা নামিয়ে আনল। তারপর দু-হাত দিয়ে খুলে ধরে সেটা দেখতে লাগল। কিন্তু আবছা অন্ধকারে ঠাহর না পেতে সে বলে উঠল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আলোতে দেখা হবে আপনার আঁকা ছবি।

গেটম্যান গেট খুলে দিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু ট্রাকগুলো একটাও নড়েনি। বোধহয় বিশুয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে সব। সুবিনয় অতঃপর নেমে এল। বগলে সেই মুড়ে নেওয়া ইজেল ও অ্যাটাচি কেসের মতো বাক্সটা। দু-চার পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বিশুয়া, ওকে নামবার জায়গা দিয়ে।

এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি, না?

বিশুয়ার এ-কথায় থমকে গেল সুবিনয়। সে কোনও জবাব না দিয়ে নেমে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

এখানে কোথায় উঠেছেন?—বিশুয়া জিগ্যেস করল।

সুবিনয় বলল, এখানে নয়, শিমুলতলায় এসেছি আজ দিন-পাঁচেক হল, এখানের দৃশ্য ভালো লেগে যাওয়ায় দুদিন ধরে এখানে এসে-এসে ছবিটা আঁকছি।

আশ্চর্য, সুবিনয় বিশুয়ার প্রশ্ন করার ধরনে কেমন সহৃদয়তার মতো অনুভব করল।

ওর কথার জবাবে অতএব বিশুয়াও বলল, এই লাইনে এখন আমার পাঁচটা ট্রাক পি ডব্লিউ ডি-র মাল বইছে। আপনার প্রতি আমার কোনও শত্রুতার মনোভাব নেই। আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি, বাবু। যাক, আপনি আজ চলুন আমার ডেরায়! মুরগি-টুরগি রান্না হচ্ছে, আর তার সঙ্গে...,—বলে কথা শেষ না করে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় বিশ্বনাথ।

মাসিক গোয়েন্দা

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৮



আঁধারে সাপ চলে

বিমল সাহা

সাধারণত ছোটগল্পের কোনও ভূমিকা থাকে না। সে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু এ-কাহিনি কোনও তথাকথিত নিয়ন্ত্রিত আঙ্গিকে বাঁধা গল্প নয়। তাই সামান্য দু-একটা কথা বলার দরকার। বছর-দুই আগে দিল্লিতে মামাতো বোনের বাড়িতে বিনতা প্যাটেলের সঙ্গে আলাপ হয়। এটি তারই জীবনের ঘটনা। কিছু তার মুখে শোনা, কিছু তার ইংরেজিতে লেখা ডায়েরির মর্মানুসরণ। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার ভূমিকা এই কাহিনিতে অনেকটা অনুলেখকের। —লেখক

৪ ডিসেম্বর

এ আমি কী ভাবছি? না, না, এ হতে পারে না। তাড়াতাড়ি চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিলাম। আমি তো ঘুমিয়ে নেই। তাহলে এ আমি কী ভাবছি? ভাবছি, না দেখছি? স্পষ্ট যেন আমার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

অলকাও এখন কলকাতায়, ওর স্বামী ওখানে বড় ডাক্তার। ওদের বিয়েতে বছর-দুয়েক আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। দে আর হ্যাপিলি ম্যারেড। তবে এ আমি কী ভাবছি! আমার মনে হঠাৎ ওদের কথাই বা ভাসছে কেন? ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি উঠে রেডিয়োটা চালিয়ে দিলাম। আবার বন্ধ করলাম। স্টিরিয়োটা চালু করলাম। গমগম করে উঠল ঘর জ্যাজ-এর ঝমঝম আওয়াজে। নিজেও একটু টিউনের সাথে নাচলাম। ধুস! তবুও ছবিটা মন থেকে মুছছে না।

এক প্রচণ্ড অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল বিনতা প্যাটেলকে। আসল কথা, হঠাৎ একটা ফ্ল্যাশ, অর্থাৎ, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যে-ঘটনা ওর মানসিক পরদায় ছায়া ফেলেছিল, তাই ওকে অস্থির করে তুলছিল।

আশ্চর্য! ডক্টর ভর্মা ইজিচেয়ারে শুয়ে নিজের ঘরে কাগজ পড়ছেন, পাশেই বসে অলকা। হালকা নাইটগাউন পরা। চুলগুলো এলোমেলো। হঠাৎ একটানে ডক্টরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে কী যেন বলতে লাগল। এমনসময়ে ঘরে এল সুন্দর, ফিটফাট চেহারার এক ভদ্রলোক। এসেই অলকার হাত ধরে কাছে টেনে তার স্বামীর সামনেই সজোরে আলিঙ্গন করল। ডক্টর উঠে কী যেন বলতে গেলেন। হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন উপুড় হয়ে। তারপরই মেঝে ভেসে গেল লাল রক্তে। খুন! খুন!

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এলেন। বললেন, কী হয়েছে বিনী?

কিছু না মা, স্বপ্ন দেখছিলাম।

মা তো অবাক। দিনেরবেলায় জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে মেয়ে! বললেন, কীরে, আজ স্কুলে যাবি না? তুই তো একদিন না গেলেই তোর টিচার-ব্রাদাররা দল বেঁধে এসে হাজির হবে!

ঠিক বলেছ, মা। ক'টা বাজে?

৫ ডিসেম্বর

এ-ব্যাপারটা কাল স্কুলে কাউকে কিছুই বলিনি। শুনলে একদল হাসবে। আবার লতিকা, জহিরা, সুমনারা শুনলে বলবে, আমার বোধহয় মেন্টাল ডিজঅর্ডার হতে চলেছে।

কী যে করি! আজও ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বিশেষ করে অলকার ঘরে আসা ওই আগন্তুক লোকটার কথা। তার চোখ-মুখ-চাউনি এত তীব্রভাবে মনে পড়ছে যে, আমি যদি শিল্পী হতাম তবে এক্ষুনি তার ছবি এঁকে ফেলতে পারতাম।

চওড়া কপাল, ফরসা সুন্দর রং, উজ্জ্বল চোখ, কেবল ডান গালে জুলপির নীচে বেশ বড় একটা জড়ুল। ওই লোকটি কে? ওই কি খুন করল অলকার স্বামীকে? অলকাই বা ও-লোকটার কাছে অত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কেন?

এ তো মহা জ্বালা! অলকা এখন কত দূরে। হয়তো সব ব্যাপারটাই একটা মিথ্যে কল্পনা। সত্যিই তো, মানুষ তার নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেই, এ-ধরনের হ্যালিউসিনেশন দ্যাখে। তবে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

৬ ডিসেম্বর

কতদিন অলকাদের খবর রাখি না। কী করব, ওদের একটা টেলিগ্রাম করে দিই—'কেমন আছ তোমরা?' সে-ই ভালো।

আজ এখানে প্রচণ্ড শীত। তারই ভিতর আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রেটার কৈলাস এলাকায় বোধহয় আমিই এত সকালে উঠেছি। চারদিক কেমন ধোঁয়াটে। সূর্যের আলোর কোনও আভাসই নেই। এ-সময়টা কলকাতাকে মনে হয় সুইজারল্যান্ড। ইউনেস্কোর ট্রেনিং-এ তিনমাস ছিলাম সুইজারল্যান্ডে। তখন ওখানে গ্রীষ্মকাল। ঠিক যেন কলকাতার ডিসেম্বর।

এই সুযোগে অলকার খোঁজ নিতে কলকাতায় গেলে কেমন হয়?

মা শুনলে বলবে, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কী করব! আমি যে খেতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না। মনের ভিতর একটা যন্ত্রণার ঢেউ উথাল-পাথাল। অকারণে গা-শিরশির ভয়! বিশেষ করে ওই আগন্তুকের চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজই অলকাকে টেলিগ্রাম করব।

৯ ডিসেম্বর

'আমরা সবাই ভালো আছি। তুই একবার এখানে আয়।'

একইসঙ্গে উদ্বেগের অবসান আর কলকাতা দেখার নিমন্ত্রণ। টেলিগ্রামে অলকার জবাব পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। অলকা কোনওদিনই আমার 'মোস্ট ইন্টিমেট ফ্রেন্ড' ছিল না, তবে অনেকের মধ্যেই একজন বিশিষ্টা। দু-বছর পরে তার খবর পেয়ে আনন্দ হওয়ার চেয়ে আমার ওই উদ্বেগটা যে কেটে গেল, তাতেই আনন্দ হচ্ছে বেশি। আজই স্কুলে দু-একজনকে সব বলেছি। তারা তো হেসেই আকুল। বলল, তুই তো বেশি মিস্টিক, সুপারন্যাচারাল বই পড়িস, তাই যত সব বাজে ভাবনা এসে ভিড় করে।

বাথরুমে ঢুকে কোনওদিন যা করিনি, আজ তাই করলাম। আনন্দে শাওয়ারের নীচে দু-একবার 'শেক' নাচলাম। অকারণেই সাবানটা নিয়ে খানিকটা লোফালুফি করলাম। আর দু-দিন পরেই স্কুল ছুটি হচ্ছে। আজই টেলিগ্রাম করে দেব : 'কলকাতায় যাচ্ছি!'

মনের সমস্ত মেঘ কেটে গেছে মনে হয়েছিল বিনতার। কিন্তু আশ্চর্য, কলকাতায় যাওয়ার আগের দিন থেকে আবার সেই কল্পনায় দেখা লোকটার চেহারা মনের পরদায় ভেসে উঠল। মনে পড়তে লাগল অলকার লোকটাকে জড়িয়ে ধরার

দৃশ্য। ওর ডাক্তার স্বামী মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘরের মেঝে!

বুকের ভেতরটা মাঝে-মাঝে ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। একটা করুণ নিশ্বাস কেঁদে-কেঁদে গলে যাচ্ছে বর্ষার মতো। আর তারই সাথে ভয়, ভয়, ভয়, ভয়। কীসের ভয়? মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে বিনতা। কন্টিনেন্ট-ঘোরা মেয়ে! একলা-একলা কত দেশ ঘুরেছে সে। আজ এ কী এক বিশ্রী ভয়ের চাবুক তাকে এমন করে মারছে?

না। কলকাতায় তাকে যেতেই হবে। রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আর পেছুলে চলবে না। কাল বিকেল পাঁচটায় গাড়িতে উঠলে পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবে। অলকা আসবে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে।

অতএব আর কোনও ভাবনা নয়। কালই বিনতা রওনা হবে কলকাতা।

১৩ ডিসেম্বর

আমার সিটটা জানলার ধার ঘেঁষে। পাশের পর-পর দুটো সিটেই এসে বসলেন দুজন গুজরাটি ভদ্রমহিলা। কে একজন বলল, ফিল্ম স্টার সঞ্জীবকুমারের আত্মীয়। মনে-মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! কারণ রাজধানী এক্সপ্রেসে এই এক মজা। পাশে হয়তো কালো হোঁতকা কোনও দুর্গন্ধওয়ালা জাঁদরেল লোক এসে বসলেও করার কিছু নেই! ঠিক আমার পেছনের সারিটায় মাত্র একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক। গাড়ি চলতে শুরু করল, সুন্দর স্বাগত সম্ভাষণ দিয়ে লাইট মিউজিক বাজতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা সার্ভ করল। দু-একটা ম্যাগাজিন কিনে সামনে রেখে দিলাম। তারপর সামনের খাওয়ার ট্রে-টা টেনে তার ওপর রেখে ডায়েরির পাতা লিখছি, হঠাৎ বেশ একটু গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে পেছন থেকে আওয়াজ এল। অনুরোধ 'আপনার ''ফেমিনা''টা একটু পেতে পারি?' পেছন দিকে একবার না তাকিয়েই বাঁ-হাতে 'ফেমিনা'টা ভদ্রলোককে দিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ কেটে গেছে। ডিনার এসে গেল। রাজধানীর খাবার চমৎকার! খিদেও পেয়েছিল। খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে হাত মুছে মনে পড়ল 'ফেমিনা'টার কথা। পেছন ফিরে দেখি, আমার পেছনের রো-টার ঠিক পেছনের সিটে 'ফেমিনা'টা পেটের ওপর উলটে রেখে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু, এ কী! এ যে অবিশ্বাস্য! সেই কপাল, সেই চোখ, সেই মুখ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই—তো...গালের ডান দিকে জুলপির নীচে বেশ বড় একটা জড়ুল! নাইটগাউন-পরা অলকাকে ইনিই তো জড়িয়ে ধরেছিলেন। ডক্টর ভর্মাকে তো এই লোকটাই খুন করেছিল!

ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ধুত্তোর! ওটা একটা বাজে কল্পনা। অলকা টেলিগ্রামে জানিয়েছে, সবাই ভালো আছে। ডক্টর ভর্মার কিছু হয়ে থাকলে ও কি আমাকে এভাবে নিমন্ত্রণ জানাত!

১৪ ডিসেম্বর

ভদ্রলোককে আজ আবার দেখলাম। বেশ ফিটফাট। চমৎকার চেহারা। আলাপ করতে সাহস হল না। কী জানি কী ব্যাপার। আর কিছুক্ষণ পরই হাওড়া স্টেশন। অলকার সাথে দেখা হলেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাওড়া স্টেশন। লোকে লোকারণ্য। হাতের ব্যাগটা নিয়ে সোজা বিনতা এসে দাঁড়াল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমের সামনে। সে-ভদ্রলোককে আর ও লক্ষ করেনি। কোনদিকে গেছে কে জানে! দূরে বিনতা দৃষ্টি মেলে দিল। কই, অলকা তো আসছে না। ঠিকানাটা অবশ্য মনে আছে। না এলে নিজেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে যাবে। না, ওই তো অলকাই আসছে। বিনতা এগিয়ে গেল। অলকাও ছুটতে-ছুটতে এল।

বড্ড দেরি হয়ে গেছে।—অলকা এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

না, তোর দেরি হয়নি। রাজধানী এক্সপ্রেস একটু আর্লি এসেছে।—তারপর অলকাকে দেখতে-দেখতে বলল, বেশ সুন্দর হয়েছিস। গায়ে সামান্য একটু ফ্যাটও হয়েছে। ডক্টর ভর্মা কেমন আছেন?

ভালো আছে। খু-উ-ব ভালো আছে।—টেনে-টেনে বলল অলকা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিনতা।

চল, তাড়াতাড়ি চল। আমাদের নতুন বাড়ি দেখবি।

নতুন বাড়ি? কেন, তোরা এখন কনভেন্ট রোডে থাকিস না?

মাস-ছয়েক হল ছেড়ে দিয়েছি। এই ফ্ল্যাটটা নিউ আলিপুরের কাছে। ফার্স্ট ক্লাস জায়গা। চারদিক খোলামেলা। প্রচুর আলো-বাতাস। ফ্ল্যাটটা কিনেই নিয়েছি।

তুই আমার টেলিগ্রাম কী করে পেলি? সেটা তো পুরোনো ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম।—বিনতা অবাক হয়।

ওই বাড়ির লোকেরা রি-ডায়রেক্ট করে এ-ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ডক্টর ভর্মা এখন কোন হাসপাতালে অ্যাটাচড? আমার চোখটা একটু দেখাব।

ডক্টর ভর্মার সঙ্গে তোর দেখা হবে না। কারণ, উনি ক'দিনের ট্যুরে বাইরে গেছেন। তুই তো থাকবি সাতদিন।

ডক্টর ভর্মা নেই! বিনতার মনে কে যেন সপাং করে একটা চাবুক মারল। বাড়ি পালটেছে এরা! নতুন জায়গা, নতুন ফ্ল্যাট। ব্যাপারটা কী? আবার সেই পুরোনো চলচ্চিত্র পর-পর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডক্টর ভর্মা ইজিচেয়ারে শুয়ে। অলকা দাঁড়িয়ে। প্রবেশ করল সেই অচেনা ভদ্রলোক। ডক্টর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। রক্তে ভেসে গেল গোটা মেঝে। খুন! খুন! গলা পর্যন্ত আওয়াজটা উঠেই আবার নীচে নেমে গেল স্বর। কীরকম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল অলকার গাড়ির মধ্যে। চেতনা ফিরে এল অলকার বাড়িতে।

গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি বলে তোকে আর ডিসটার্ব করিনি। শরীর খারাপ নাকি?—কাছে এসে অলকা বিনতার কপালে, গালে, হাত রাখল।

না, সেরকম কিছু না।

চল, আমরা স্নান, খাওয়া-দাওয়া, সেরে একটু বিশ্রাম নিই। পরে বিকেলে বেরোব কলকাতা দেখাতে।—অলকা উঠে পড়ে স্নানের জোগাড় করতে গেল।

১৫ ডিসেম্বর

আজ বিকেলে বেরোনোর মুখেই দেখা হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। আবার সেই মুখ, চোখ, নাক আর ডান গালের জুলপির নীচে জড়ুল। একেবারে সামনা-সামনি। এ কী করে হয়! মনের ভিতর হঠাৎ দেখা দৃশ্যটি এমনভাবে মিলে যাচ্ছে!

কী রে! দাঁড়িয়ে পড়লি যে! ভদ্রলোককে চিনিস নাকি?—হাসতে-হাসতে অলকা বলল।

আমি ওঁকে চিনেছি। রাজধানী এক্সপ্রেসে আপনার কাছ থেকেই তো আমি 'ফেমিনা'টা নিলাম। এইবার চিনতে পারছেন তো?

ও! তোমরা বুঝি একই ট্রেনে এসেছ? কিন্তু আমি তো হাওড়া স্টেশনে বিনতাকে আনতে গিয়েছিলাম। তোমাকে তো দেখলাম না!—অলকার গলার স্বরে অভিমান যেন। ব্যাপার কী? তবে কি ওরা আমার মনে ছবি দেখার মতো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত?

এইবার আমি বললাম, অলকা, তুই এঁকে চিনিস নাকি?

কেন চিনবে না! আমি তো ওদের সামনের ফ্ল্যাটেই থাকি। ডক্টর ভর্মার অনুপস্থিতিতে আমিই তো অলকার ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড। কী বলো, অলকা?—ভদ্রলোকের সেই হাসি! সেই চাউনি! সেই—!

আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রেখো।—বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল অলকা। আর এটাও লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক অলকাকে নাম ধরে ডাকল, কোনওরকম 'মিসেস' সম্বোধন যোগ না করেই। অলকাও ওকে 'তুমি' বলল। ডক্টর ভর্মা জেনেশুনে চুপ করে আছেন!

১৬ ডিসেম্বর : দুপুর

আজ সকালে চায়ের টেবিলে অলকাকে হঠাৎ সব বলে ফেললাম। মনের ভিতর হঠাৎ কীভাবে স্বপ্নের মতো ঘটনাটা দেখেছিলাম। আমার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কথা, সবই বললাম। অলকা তো শুনে হেসেই অস্থির।

বলল, তোর সন্দেহ কাটানোর জন্যে ডক্টরকে কালই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। দেখবি, আমার স্বামী তোর মতো সুন্দরীকে দেখলে হয়তো আমাকে ভুলে যাবে! বিয়ের আগে বা পরে ডক্টরের জন্যে আমার এত উদ্বেগ কোনওদিনই হয়নি।

বা-ব্বা! বাঁচলাম। ডক্টর ভর্মাকে একবার দেখলেই আমার সব ভাবনা মিথ্যে হয়ে যাবে। আমিও নিরুদ্বেগ মন নিয়ে দিল্লি ফিরে যাব। সত্যি কথা বলতে গেলে, এইজন্যেই তো কলকাতায় আসা।

ভদ্রলোকের নাম মণিকুন্তল সেন। বাঙালি। ওকেও আজ ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে অলকা। তবে অবশ্য কথা দিয়েছে, আমার এইসব বাজে ভাবনার কথা কিছু বলবে না। দেখা যাক।

১৬ ডিসেম্বর : রাত আটটা

এই অংশটি অনেক পরে ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল

ডাইনিং হলে ঢুকতে যাওয়ার আগে অপরিচিত গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়ালাম। মাঝের ঘরের ঝোলানো পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি মণিকুন্তল সেন আর অলকা পাশাপাশি চেয়ারে বসে। টেবিলের ওপর আমাদের তিনজনের প্লেট, কাঁটা-চামচ, খাবার সাজানো। শুধু আমি গিয়ে বসলেই 'ডিনার' শুরু করা যাবে। মণিকুন্তলবাবু অলকার কাঁধে হাত রেখে বলছে, তুমি ভয় পেয়েছ নাকি? এসব কখনও হয়? আমাকে তোমার বন্ধু জীবনে দেখেনি, সে কী করে আমার মুখ দেখল স্বপ্নে?

না, না, স্বপ্ন নয়।—অলকার স্বরে আতঙ্ক। বলল, বিনতা জেগে-জেগেই চোখের সামনে দেখেছে ডক্টর ভর্মার খুনের দৃশ্য। আমি তো সত্যিই সেদিন নাইটগাউন পরে তোমাকে জড়িয়ে ছিলাম। তোমার চেহারা, এমনকী তোমার ডান গালে জুলপির নীচে জড়ুলটার কথাও বলেছে! আমার ভীষণ ভয় করছে। শেষকালে ধরা পড়ে ফাঁসি হবে না তো?—বলতে-বলতে অলকা নিবিড় হয়ে গেল মণিকুন্তলের কাছে।

তোমারও দেখছি মাথা খারাপ হল! আমি যে খুন করেছি, তা প্রমাণ করতে হবে না? কোন পাগলে এসে কী বলল, তাই বুঝি আইন অমনিই মেনে নেয়? তার ওপর এ-কেস তো পুলিশ সুইসাইড কেস ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্লোজ করেছে। তবে, তোমার বন্ধুকে যাতে আর ফিরতে না হয়, তার ব্যবস্থাও আজ করব। এই দ্যাখো।—বলেই মণিকুন্তল সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটি দেখাল।

আর একমুহূর্তও নয়। পা থেকে মাথা অবধি গা-শিরশির করে উঠল। কপাল, চোখ-মুখ ঘেমে নেয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে কিছু টাকা আর দু-একটা জরুরি জিনিস নিয়ে ওদের শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। ওই তো টেলিফোন। পাশেই টেলিফোন গাইড। টেলিফোনের রিসিভার তুললাম লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করার জন্যে। এ কী! কোনরকম 'রিঙিং টোন'ই তো বাজছে না! তবে? নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, টেলিফোনের তার কাটা। তবে? এখন কী করব? কী করে ঘরের বাইরে যাব? ফ্ল্যাট থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই তো পথ!

স্পষ্ট বুঝতে পারছি অলকা-মণিকুন্তল দুজনে মিলে সমস্ত প্ল্যানই তৈরি করে ফেলেছে। ওরা কোনও দায়িত্ব নিতে চায় না। ডক্টর ভর্মার খুনের একমাত্র মানসিক সাক্ষীকে চিরতরেই ওরা সরিয়ে দেবে। তারপর আমার লাশ গুম করে দিলেই সব শেষ! আসার সময়ে বাড়ির কাউকে অলকার ঠিকানাও দিয়ে আসিনি। না, না, যে করেই হোক, পালাতে হবে।

বিনতা! বি...ন...তা!—অলকা ডাকছে।

পাগলের মতো ঘরের মধ্যেই ছুটোছুটি করতে লাগলাম। ডাইনিং হলে ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ বারান্দার এককোণে লাইটের মেন সুইচটা নজরে পড়ল। ভগবানের নাম নিয়ে দিলাম সুইচটা অফ করে! সঙ্গে-সঙ্গে গোটা বাড়ি অন্ধকার। ভালুক-অন্ধকার। পা টিপে-টিপে মেন দরজার কাছে এসে গোদরেজের ল্যাচটা আস্তে-আস্তে খুলেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম সদর রাস্তায়। কানে বাজতে লাগল অলকা-মণিকুন্তলের ছুটোছুটি আর আমার নাম ধরে ডাকাডাকি!

এরপরের ঘটনা জলের মতো সহজ গতিতে এগিয়ে গেছে। লালবাজারে বিনতা প্যাটেলের পরিচিতি আর সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ নথিভুক্ত হল। পুলিশি তদন্তে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল, মণিকুন্তল সেনই ডক্টর ভর্মার হত্যাকারী! আর সেই নৃশংস ব্যাপারে সাহায্য করেছে নিহত ডক্টরেরই সহধর্মিণী অলকা ভর্মা।

কিন্তু এই ঘটনার আসল জিজ্ঞাসা হল, তবে কি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের বাইরেও মানসিক জগতের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া রয়েছে? চেতনের গভীরে অবচেতনের আঁধারে কোনও-কোনও ইচ্ছা মানুষের মনকে ছোবল মারে বিষাক্ত সাপের মতো। সেই ইচ্ছাই হয়তো তার মানসিক পটে চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছায়া হয়ে অজানা জগতের এক নতুন ইশারা দেয়।

মাসিক গোয়েন্দা
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৮



করোটির অপচ্ছায়া

নিরঞ্জন সিংহ

বাসের সামনের দিকের একটা সিটে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন ডক্টর প্রশান্ত সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উনি। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। সুপুরুষ চেহারা, ফরসা রং। এখনও বিয়ে করেননি। অধ্যাপনা ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে সময় কাটান। মধ্য আমেরিকার প্রাচীন মায়া সভ্যতার রহস্য নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন।

বাস লোকভরতি হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিল। বাসের ঝাঁকুনিতে ডক্টর সেনের তন্ময়তা কেটে গেল। মেরিডা থেকে বাস যাবে চিচেনইৎজা। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো রাজ্যের যুকটান উপদ্বীপের রাজধানী হচ্ছে মেরিডা। মেরিডা শহরকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে রয়েছে মায়া সভ্যতার নানা নিদর্শন। মেরিডা থেকে সকাল-সকাল বেরিয়ে এক-একটা জায়গা একদিনে দেখে আবার সন্ধ্যা নাগাদ মেরিডায় ফিরে আসা যায়। আজ দু-সপ্তাহেরও বেশি মেরিডা শহরের নামকরা হোটেল প্লাজাতে এসে উঠেছেন ডক্টর সেন। এর মধ্যে উনি উশমল, লাবনা, শায়লী, কাবা, ইজমাল, জীবিলসুলতুন জায়গাগুলো দেখে নিয়েছেন। যত দেখছেন ততই ওঁর বিস্ময় বাড়ছে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে এত দূরের রাস্তা পাড়ি দিয়ে মায়া সভ্যতার দেশ দেখতে এসেছেন সে-উদ্দেশ্য তাঁর এখনও পূর্ণ হয়নি। প্রত্যেক জায়গার গাইড ও স্থানীয় লোকদের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন, ওদের টাকার লোভ দেখিয়েছেন, কিন্তু ওঁকে আসল জায়গার সন্ধান দিতে পারেনি কেউ। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন ডক্টর সেন, ঠিক এইসময় জীবিলসুলতুনের একজন বুড়ো গাইড ওঁকে একটা ভাসা-ভাসা খবর দিল। ও বলল, 'আপনি একবার চিচেনইৎজায় গিয়ে খোঁজ করুন। আপনি যা খুঁজছেন তা পেয়ে যেতেও পারেন।'

'চিচেনইৎজার কোথায় কার কাছে খোঁজ করব?' প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন।

'তা বলতে পারি না, তবে বছর-দশেক আগে একটা গুজব আমার কানে এসেছিল যে, দুজন বিদেশি পর্যটক নাকি ললটানে ঢুকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। জিনিসটা তারা উদ্ধার করতে পারে না, কোনওরকমে মরতে-মরতে তারা বেঁচে যায়। আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিচেনইৎজায় গেলে সবকিছুর সন্ধান পাবেন।' বলল সেই বুড়ো গাইড।

আজ চলেছেন তিনি চিচেনইৎজার উদ্দেশে। মেরিডা থেকে দূরত্ব প্রায় দুশো কিলোমিটার। বাসে সময় লাগে ঘণ্টা-তিনেক মতো। চিচেনইৎজা মেরিডার পুবদিকে উশমল ছাড়িয়ে যেতে হবে। শহর ও শহরতলি

ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে বাস।

বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ বাস চিচেনইৎজা পৌঁছে গেল। মায়া অভিধান অনুযায়ী 'চি' শব্দের অর্থ হচ্ছে মুখ, 'চেন' শব্দের অর্থ কুয়ো বা জলাধার, 'ইৎজা' মায়াদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর নাম।

বাস থেকে নামলেন ডক্টর সেন। বড়রাস্তার দু-ধারে ছড়িয়ে রয়েছে ভগ্নস্তূপ। এদের আকৃতিতে নালন্দার অনুকৃতি, দাক্ষিণাত্যের গোপুরমের সাদৃশ্য, মিশরের পিরামিডের অনুরূপতা। এদের শিলাচিত্রে রয়েছে আশীরিয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মিল।

বীরমন্দিরের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরের চাতালে উঠে গেলেন ডক্টর সেন। ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে সামনের বিরাট উঁচু পিরামিড। পিছনে অজস্র ছোট-ছোট থাম। মনে হয়, আগে দালান ছিল। এখানে ষোলোটি বিরাট অট্টালিকার মধ্যে কুকুলকানের দুর্গ দূর থেকে চোখে পড়ে। দুর্গের চারদিকে খাড়া সিঁড়ি। পশ্চিম দিকে উৎসর্গ কুয়ো। ডক্টর সেন নেমে এলেন। শার্দূল মন্দির দেখলেন। দেওয়ালে পাথরের ওপর খোদাই করা আশীরিয় মূর্তির মতো দাড়িওয়ালা মূর্তি। এর পশ্চিমে বিরাট প্রাঙ্গণ। টেম্পল অফ থ্রি লিন্টেলস-এর চারকোণে দেবতা 'চাক'-এর মুখোশ কুঁদে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে বিরাট ধর্মযাজিকা-নিকেতন। এখানেও বিরাট প্রাঙ্গণ। চারধারে বসে দর্শকরা খেলা দেখতে পারে, নাচ-গান শুনতে পারে। বড়রাস্তার ওপারে রয়েছে আরও সব পুরোনো নিদর্শন। একটা চারকোনা বেদির ওপর চোঙার মতো বিরাট উঁচু একটা প্রাসাদ। এটা হচ্ছে নভোবীক্ষণাগার। মেঠো রাস্তার ডান দিকে রয়েছে প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। এর চারদিকে সব স্তূপ এখনও খুঁড়ে বের করা হয়নি। নভোবীক্ষণাগারের উত্তর-পূর্ব কোণে নৈসর্গিক কুয়ো। এখানে প্রাকৃতিক কোনও কারণে ওপরের মাটির আস্তরণ উঠে যাওয়ায় জলের সন্ধান মেলে বলে অনেক বিশ্বাস করেন। এই জলের উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চিচেনইৎজার সভ্যতা।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। কিছু খেতে হবে, তারপর আসল কাজের খোঁজখবর করতে হবে। প্রয়োজন হলে দু-একদিন এখানে থাকতে হবে। এখানে হোটেল আছে। বড়রাস্তার ধারে কিছু দোকানপাট আছে। সেইদিকে পা বাড়ালেন ডক্টর সেন। দোকানে বিভিন্ন খাওয়ার জিনিস পাওয়া যায়—শরবত, ফল, চা-বিস্কুট, এমনকী ভাত-মাংসও।

ডক্টর সেন একটা দোকানে ঢুকলেন। দোকানদার এগিয়ে আসতে ভাত আর মাংসের অর্ডার দিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে দোকানদারকে ডাকলেন। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এক ডলার বকশিশ দিলেন। দোকানদার খুশি হয়ে দাঁত বের করে হাসল। ডক্টর সেন বললেন, 'তোমার দোকানে খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম। আমার একটা উপকার করবে?'

দোকানদারকে অল্প কথায় সব বুঝিয়ে বললেন।

দোকানদার সব মন দিয়ে শুনল, তারপর বলল, 'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না, স্যার।'

'কী অসুবিধে তোমার? যদি টাকাপয়সা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি। যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাকে সাহায্য করো। বহু দূর-দেশ থেকে আমি ছুটে এসেছি।'

ডক্টর সেনের কথায় দোকানদারের মন বোধহয় একটু নরম হল। ও বলল, 'স্যার, আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি। বছর-দশেক আগে দুজন আমেরিকান টুরিস্ট একজন গাইডকে নিয়ে ললটানে ঢুকেছিল গোপনে। ললটানের কথা সবাই শুনেছে, কিন্তু আসলে সেটা কোথায় ও কী করে সেখানে যেতে হয় তা পুরোহিতরা ছাড়া কেউ জানে না। যত টাকাপয়সাই দিন পুরোহিতরা কক্ষনও কাউকে সেখানে নিয়ে যায় না। গাইডটা কী করে যে ললটানের সন্ধান পেয়েছিল তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। যা হোক, ওরা কোনওরকমে মরতে-মরতে ফিরে আসে। তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে পড়ে। তখন পুরোহিতরা গাইডটাকে শাস্তি দেয়। লোকটা পাগল হয়ে যায়। লোকটা এখনও বেঁচে আছে, মাঝে-মাঝে যখন কিছুদিনের জন্যে সুস্থ হয়ে ওঠে,

তখন গাইডের কাজ করে। অসুস্থ হয়ে পড়লে আর ওকে দেখা যায় না। তবে গাইডের কাজ করলেও ভুলেও ও আর কোনও টুরিস্টকে ললটানে নিয়ে যায়নি।'

'লোকটার ঠিকানা জানো তুমি?' জিগ্যেস করলেন ডক্টর সেন।

'ঠিকানা জানি, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না, স্যার। কারণ, ললটানে ও আর কোনও টুরিস্টকে নিয়ে যাবে না। ওর ওপর পুরোহিতের অভিশাপ আছে। দ্বিতীয়বার ললটানে ঢুকলে ওর অবধারিত মৃত্যু।'

'তা হোক, তবু তুমি একবার চেষ্টা করো যাতে আমি লোকটার সঙ্গে দেখা করতে পারি। আমি এখানকার হোটেলে কয়েকদিন থাকব।'

'নিশ্চয় চেষ্টা করব। তবে আপনি কি পুরোহিত মারুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন?'

'তুমি কি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারো?'

'পারি—পুরোহিতের বাড়ি খানিকটা দূরে। আমি একটি ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি, ও আপনাকে পুরোহিতের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটির সঙ্গে চললেন ডক্টর সেন। মিনিট-কুড়ি হাঁটার পর ছেলেটি রাস্তা থেকে দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। ডক্টর সেন এগিয়ে চললেন। নানা চিন্তা ওঁর মাথায় ভিড় করতে লাগল। এককালে প্রাসাদ থাকলেও এখন বাড়িটার জরাজীর্ণ অবস্থা।

বাইরের দরজা খোলাই ছিল। ডক্টর সেন দরজার কড়া নাড়লেন। একজন বয়স্ক মানুষ প্রায় নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। মুখে চাপদাড়ি। মাথার চুল আর দাড়ি-গোঁফ অর্ধেক পেকে গেছে। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় এখনও যথেষ্ট সবল। ইনিই পুরোহিত মারু তা বুঝতে অসুবিধে হল না ডক্টর সেনের। পুরোহিত মারু অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর সেনের মুখের দিকে। এতক্ষণে ডক্টর সেন মনে-মনে যেন একটু ভয় পেলেন। কী সাংঘাতিক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! মনে হচ্ছে যেন ভিতরটা অবধি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন। ডক্টর সেনও সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের পরিচয় দেওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন।

পুরোহিত মারুর কথায় যেন বাস্তবে ফিরে এলেন উনি।

'কে তুমি? আমার কাছে কেন এসেছ?' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন পুরোহিত মারু।

ডক্টর সেন পরিচয় দিলেন। বললেন, 'আমি বড় আশা নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ছুটে এসেছি একটা জিনিস সম্বন্ধে জানতে। আপনি যদি দয়া করেন তাহলে আমার আশা পূর্ণ হবে।'

'ললটানের হদিশ আমার জানা নেই। এ ছাড়া তোমার আর কিছু জানবার আছে?'

ডক্টর সেন এবার চমকে উঠলেন। না বলতে ওঁর মনের খবর কী করে জানলেন পুরোহিত মারু! তবে ভারতবর্ষের মানুষ বলে এরকম অলৌকিক কাণ্ডে দিশেহারা হয়ে পড়লেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমি ভালোভাবে জানি, আপনি ললটানের খবর জানেন। আমি জানি, বছর-দশেক আগে দুজন আমেরিকান টুরিস্ট ললটানে ঢুকেছিল।'

পুরোহিত মারুর দু-চোখ যেন হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল 'এ-কথা তুমি জানলে কী করে?'

'যে করেই হোক আমি জেনেছি। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। ওদের মধ্যে একজন ললটানের ভেতরের ছবি তোলার চেষ্টা করেন। ন'টা ছবির মধ্যে আটটা ছবিই নষ্ট হয়ে যায়। একটা ছবি প্রিন্ট করে দেখা যায়, যেন একটা উজ্জ্বল আলোর ছবি উঠেছে। আলোটা কীসের তা ওঁরা বুঝতে পারেননি, তবে তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন, অমূল্য কোনও গুপ্ত রহস্য মায়ারা এক শক্তিশালী ফোর্সফিল্ডের আড়ালে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ফোর্সফিল্ডের শক্তির উৎস কী বা তার আসল প্রকৃতিই বা কী, তা ওঁরা বুঝে উঠতে পারেননি।'

ডক্টর সেনের কথা শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত মারু বিড়বিড় করে আপনমনে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠলেন।

'আমি জানি, আমি যা খুঁজতে এতদূর এসেছি তার হদিশ একমাত্র আপনিই দিতে পারেন। বিশ্বাস করুন, আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমি ইতিহাসের অধ্যাপক। গত পনেরো বছর ধরে আমি গবেষণা করছি মায়া সভ্যতার রহস্যময়তা নিয়ে। আমার বিশ্বাস, সব রহস্যের চাবিকাঠি লুকোনো আছে ললটানের ফোর্সফিল্ডের আড়ালে। আমার মন বলছে, আমেরিকান টুরিস্টরা দশ বছর আগে যে-জিনিসের ছবি তুলেছিলেন, সেই জিনিসটা খুঁজে পেলে সব রহস্যের সমাধান হবে। আপনি দয়া করে আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

ডক্টর সেন কথা শেষ করে পুরোহিত মারুর মুখের দিকে তাকালেন।

পুরোহিত মারু বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

ডক্টর সেন খুশি হলেন। ওঁর মনে হল উনি শক্ত বরফ হয়তো গলাতে পেরেছেন। অনেকগুলো বারান্দা পেরিয়ে পুরোহিত মারুর সঙ্গে একটা আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকলেন তিনি। ঘরটায় কোনও জানলা নেই। ঢোকার জন্য একটিমাত্র দরজা। ঘরে ঢুকে পুরোহিত মারু সেই দরজাটাও বন্ধ করে দিলেন। ঘরটা ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বেশ কিছুক্ষণের জন্য যেন অন্ধ হয়ে গেলেন ডক্টর সেন। পুরোহিত মারু ততক্ষণে একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা তাকের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মোমবাতির আলো অন্ধকার দূর করার বদলে যেন অন্ধকারকে বাড়িয়ে তুলল। ডক্টর সেনের সারা শরীরটা এক অজানা আতঙ্কে যেন শিরশির করে উঠল। পুরোহিত মারুর ছায়াটা দুলতে লাগল বিপরীত দিকের দেওয়ালে। এতক্ষণে ডক্টর সেনের চোখ সয়ে এল।

ঘরটা মাঝারি ধরনের। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে অদ্ভুত সব জিনিসপত্র। আসলে সেগুলো যে কী তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না ডক্টর সেন। আলো-আঁধারিতে জিনিসগুলো অতিপ্রাকৃত চেহারা ধারণ করেছিল।

'সামনের আসনে বোসো।' গম্ভীর স্বরে প্রায় আদেশ করলেন পুরোহিত মারু।

ভয়ে-ভয়ে সামনের পাতা আসনটার ওপর বসে পড়লেন ডক্টর সেন।

'তোমার যা বলার তা বলেছ। আমি স্বীকার করছি, তুমি অনেক খবর রাখো। পনেরো বছর ধরে মায়া সভ্যতার রহস্য জানবার চেষ্টা করছ। প-নেরো বছর। অনেক সময়, তাই না? আমি বুঝতে পারছি, মায়াদের আসল রহস্য তুমি ধরতে পেরেছ। আমরা যে দূর কোনও নক্ষত্রলোক থেকে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার বহু লক্ষ বছর আগে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেছি, তা-ও তুমি বুঝতে পেরেছ। কিন্তু অধ্যাপক, আমি তোমার এবং পৃথিবীর মানুষদের ভালোর জন্যে বলছি, তুমি ললটানের ফোর্সফিল্ডের আড়ালে সুরক্ষিত গোপন রহস্য সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চেয়ো না। ও-সম্বন্ধে সব কথা এই মুহূর্ত থেকে ভুলে যাও। আমি জানি, কী সাংঘাতিক জিনিস ওটা। ওটার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফোর্সফিল্ডটা ধীরে-ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর ওই ভয়াবহ জিনিসটি তোমার হাতেই পড়ুক, আর অন্য যে-কোনও মানুষের হাতেই পড়ুক, ও ওর কাজ শুরু করে দেবে। ওকে প্রতিহত করার শক্তি এই মহাবিশ্বে কারও নেই। এমনকী আমাদেরও না। পৃথিবীতে ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি বলে আমরা পুরুষানুক্রমে ওটাকে পাহারা দিয়ে চলেছি যাতে পৃথিবীর মানুষ এর সন্ধান না পায়। কিন্তু তোমাদের কৌতূহল এতই তীব্র যে, নিজেদের ধ্বংস তোমরা নিজেরাই টেনে আনছ। তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আবার বলছি, এই মুহূর্ত থেকে ললটানের রহস্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ায় চেষ্টা করো, তা নইলে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটবে।' পুরোহিত মারুর শেষ কথা ক'টি যেন ভয়াবহ অভিশাপের মতো উচ্চারিত হল।

ডক্টর সেন এতক্ষণে একটু হাসলেন 'বুঝেছি, আপনি ভয় দেখিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। জেনে রাখুন, কোনওরকম কুসংস্কারকে আমি প্রশ্রয় দিই না। আপনার গল্পটা শুনতে ভালোই তবে বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

পুরোহিত মারুর সমস্ত দেহটা যেন কেঁপে উঠল। ছায়াটা দুলে উঠল। প্রচণ্ড রাগ চাপবার চেষ্টা করাতে ওঁর মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে

উঠলেন, 'সবকিছু তোমার মন থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে, অধ্যাপক। কিন্তু তা আমি দেব না। হয়তো তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে। আমার নিষেধ যখন তুমি শুনবে না, তখন যা হওয়ার তাই হোক। আমি বাধা দেব না।'

'তাহলে আমাকে কি আপনি ললটানে নিয়ে যাবেন?' খুশি হয়ে জানতে চাইলেন ডক্টর সেন।

'না, আমি তোমাকে ললটানে নিয়ে যাব না। তবে সত্যিই যদি তোমার কাল পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে ললটানের হদিশ তুমি পেয়ে যাবে। অশুভ শক্তি যদি কার্যকরী হয়ে ওঠে তা হলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।' বলে একটু বিষণ্ণভাবে হাসলেন পুরোহিত মারু। তারপর উঠে দরজা খুলে দিলেন।

ডক্টর সেন বাইরে এসে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যের আলো। অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে এসে ডক্টর সেন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চোখ সইয়ে নিয়ে পুরোহিত মারুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন তিনি।

রাত প্রায় ন'টা বাজে। চিচেনইৎজার একমাত্র বড় হোটেল, সিটি হোটেলের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন ডক্টর সেন। এয়ার কন্ডিশনড ঘরের মধ্যে বসে থেকেও উনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। একবোতল ঠান্ডা বিয়ার শেষ করে আর-একবোতলের অর্ডার দিয়েছেন। ঘরের জোরালো আলোটা নেভানো। টেবিলে ছড়ানো রয়েছে একগোছা কাগজ।

ললটান হচ্ছে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ। শহরের নীচে অদ্ভুত সব সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল মায়ারা। কেন তা কেউ জানে না। দু-একটা ছোটখাটো ললটান আবিষ্কার হলেও আসল ও গভীর ললটানগুলোর সন্ধান মানুষ এখনও পায়নি। বছর-দশেক আগে দুজন আমেরিকান টুরিস্ট একটা ললটানে ঢোকেন। মাইকেল ডিওবরেনোভিস হচ্ছেন একজন নৃতত্ত্ববিদ আর ভ্যালেন্টাইন হচ্ছেন সমুদ্র-পুরাতত্ত্ববিদ। তখনই জানা যায় যে, মিশরের পিরামিডের মধ্যে যেরকম ফোর্সফিল্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে এই ললটানের ভিতরে ঠিক সেই একই রকমের ফোর্সফিল্ডের অস্তিত্ব রয়েছে। কোনও মূল্যবান জিনিস সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ফোর্সফিল্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই ললটানের ফোর্সফিল্ডের আড়ালে মায়ারা মহামূল্যবান কিছু লুকিয়ে রেখেছে, এ-কথা অনুমান করা মোটেও শক্ত নয়। ডক্টর সেনের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। এবার যে করেই হোক এ-রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে।

কিন্তু লোকটা এখনও কোনও খবর নিয়ে আসছে না কেন? তবে কি গাইডটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে? নাকি দোকানদার কোনও খবর পাঠায়নি? দোকানদারের সঙ্গে কি আর-একবার দেখা করবেন? নিজের মনেই ভাবছিলেন ডক্টর সেন। ঠিক এমন সময় হোটেলের বেয়ারা এসে জানাল আলফোঁ নামে একটি লোক ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ডক্টর সেন খুশি হলেন। বললেন, 'ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

বেয়ারা চলে গেল। একটু বাদে দরজায় শব্দ হতেই ডক্টর সেন বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে একজন স্থানীয় যুবক ঘরে ঢুকল। তামাটে রং। সাধারণ পোশাক। এরই নাম আলফোঁ। ওর দু-চোখে একটা ধূর্ততার ছাপ।

আলফোঁকে দেখে খুব একটা খুশি হতে পারলেন না ডক্টর সেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ভদ্রতা দেখিয়ে বসতে বললেন ওকে।

একগাল হেসে লোকটা সোফার এককোণে বসল। একটু যেন সঙ্কুচিত ভাব।

'আশা করি কোনও ভালো খবর এনেছ?' প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন।

'আপনি ললটানে যাওয়ার জন্যে গাইড খুঁজছেন?' আলফোঁ উলটে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'আমি আপনাকে ললটানে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ললটানের হদিশ আমি জানি না। তবে আমি একজনের খোঁজ দিতে পারি, যে আপনাকে ললটানে নিয়ে যেতে পারে।'

'কে সে?'

'আমার কাকা পিজারো। দোকানদারের মুখে আপনি নিশ্চয় তার কথা শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তোমার কাকা কি এখন সুস্থ আছেন?'

'আপাতত সুস্থ। খুবই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে ও। তাই আপনার কথা দোকানদারের মুখে শুনে আমি কাকার সঙ্গে কথা বলে আপনার কাছে আসছি।'

'কাকা রাজি হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। তবে আপনাকে একটু বেশি পয়সা খরচ করতে হবে। আশা করি তাতে আপনার আপত্তি নেই।'

'কত?'

'কাকাকে দুশো ডলার দিতে হবে, আর কাকাকে রাজি করানোর মজুরি হিসেবে আমার দাবি একশো ডলার।' বলে আবার দাঁত বের করে হাসল আলফোঁ।

ডক্টর সেন আলফোঁর মুখের দিকে তাকালেন। লোকটার খাঁই খুব কম না, তবে সত্যি যদি পিজারো ওঁকে আসল ললটানে নিয়ে যেতে পারে তাহলে টাকা খরচ করতে উনি পিছপা নন। কিন্তু আলফোঁর কথা উনি যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। টুরিস্ট প্লেসে টুরিস্টদের নানা কায়দায় ঠকানো এখানকার লোকদের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য মনে-মনে ভাবছিলেন কী করা যায়। ওঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আলফোঁ একটু দমে গেল।

ডক্টর সেন একটু হাসলেন : 'টাকার অঙ্কটা যথেষ্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার কাকা যদি সত্যি-সত্যি আসল ললটানে নিয়ে যেতে পারেন, তা হলে নিশ্চয় আমি তোমার দাবি মেনে নেব।'

'আপনার সন্দেহের কোনও কারণ নেই, স্যার। আমার কাকাই মিস্টার ডিওবরেনোভিস ও মিস্টার ভ্যালেন্টাইনকে আজ থেকে দশ বছর আগে আসল ললটানে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনওরকমে বেঁচে ফিরে আসে। তার মূল্য কাকাকে দিতে হয়েছে অনেকরকমভাবে। যে-ঝুঁকি কাকা নেবে, দুশো ডলার তার তুলনায় কিছুই না। টাকার ওর খুবই দরকার আর সেইজন্যে টাকার লোভ দেখিয়ে আমি ওকে রাজি করিয়েছি। অবশ্য যাওয়া-না-যাওয়া আপনার ইচ্ছা।'

ডক্টর সেন বুঝলেন, পিজারোই হচ্ছে আসল লোক, যে ওঁকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। তুমি কাকাকে নিয়ে এসো।'

আলফোঁ সোফা ছেড়ে উঠল : 'ঠিক আছে, আগামীকাল রাত বারোটা নাগাদ আপনি নভোবীক্ষণাগারের সামনে অপেক্ষা করবেন, আমি কাকাকে নিয়ে যাব। গভীর রাতে গোপনে আপনাদের ললটানে যেতে হবে। কাকার রাজি হওয়ার এটা আর-একটা শর্ত।'

'বারোটা, নভোবীক্ষণাগারের সামনে? ঠিক আছে।'

'আমার মজুরিটা কাল রাতেই পাব আশা করি।' বলে আবার দাঁত বের করে হাসল আলফোঁ।

'নিশ্চয় পাবে, তাহলে পাকা কথা রইল।'

অনেক রাত হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সুটকেসটা খুলে কয়েকটা ছোটখাটো যন্ত্রপাতি বের করে পরীক্ষা করে দেখে আবার সুটকেসে পুরে রাখলেন ডক্টর সেন। এগুলো ললটানে ঢুকলে কাজে লাগবে। একটা শক্তিশালী ফোর্সফিল্ডকে নিউটলাইজ করার ক্ষমতা এই যন্ত্রের আছে। ফোর্সফিল্ড খুঁজে বের করা, তার বৈশিষ্ট্য ও শক্তি মাপার যন্ত্রও রয়েছে ওঁর সঙ্গে। এগুলো তিনি এখানে আসার পথে নিউইয়র্ক থেকে জোগাড় করেন। সুটকেস বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন ডক্টর সেন। মনটা খুশি, কিন্তু শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম এল না। পুরোহিত মারুর হেঁয়ালি ভরা কথাগুলো পাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। পুরোহিত মারুর উদ্দেশ্য কী? কেন তিনি ওঁকে এভাবে ভয় দেখালেন?

সারদিন হোটেলেই কাটালেন ডক্টর সেন। সন্ধ্যা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে দোকানদারটার সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন। দোকানদার ওঁকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। ডক্টর সেন একগ্লাস শরবতের অর্ডার দিয়ে এককোণে বসলেন। দোকানদার শরবতের গ্লাস ডক্টর সেনের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আলফোঁ আপনার সঙ্গে দেখা করেছে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' বললেন ডক্টর সেন।

'না, না, ধন্যবাদের কী আছে? তবে সাবধানে যাবেন। ললটান খুব ভয়ঙ্কর জায়গা বলে আমরা মনে করি।'

'সাবধানেই যাব।' বললেন ডক্টর সেন।

এমনসময় একটা লোক হাঁফাতে-হাঁফাতে দোকানে ঢুকতেই দোকানদার লোকটার দিকে এগিয়ে গেল : 'কী ব্যাপার, মাজুলা?'

'শাপরা, ভয়ানক ব্যাপার—পুরোহিত মারু মারা গেছেন। ওঁর মৃতদেহ প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দিরের চত্বরে পড়ে রয়েছে।'

'সে কী?' শাপরা, অর্থাৎ, দোকানদার চমকে উঠল।

'কীভাবে মারা গেছেন উনি?' প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন।

মাজুলা বলে লোকটি ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা জানি না, তবে মনে হচ্ছে আগুনে পুড়ে। সারা মুখটা ঝলসে গেছে। পুলিশ মৃতদেহ এইমাত্র মেরিডায় পাঠিয়ে দিল ময়না-তদন্তের জন্যে। ওরা বলছে, মৃত্যুটা অস্বাভাবিক।'

'আগুনে পুড়ে'—কথাটা দুবার অন্যমনস্কভাবে উচ্চারণ করলেন ডক্টর সেন। তারপর মাজুলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দিরে আগুন এল কোথা থেকে?'

'ওখানে কোথাও আগুন খুঁজে পায়নি পুলিশ। পুলিশের ধারণা, অন্য কোথাও ওঁকে হত্যা করে মুখটা আগুনে ঝলসে প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দিরের চত্বরে ফেলে রেখে গেছে। ওদিকটায় লোক-চলাচল খুব কম কিনা।'

'অসম্ভব!' বলে উঠল শাপরা, 'এ-তল্লাটে কেউ পুরোহিত মারুকে খুন করার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাববে না। আসলে ওঁকে খুন করার ক্ষমতা কারও নেই। আমার মনে হচ্ছে, পুরোহিত মারু নিজেই কোনও দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছেন।'

ডক্টর সেন শাপরার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে-ধীরে দোকান ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। এরকম বীভৎস দুর্ঘটনা কী করে ঘটল? ডক্টর সেন ভাবতে লাগলেন। পুরোহিত মারুর কথাগুলো পাক খেতে লাগল ওঁর মাথার মধ্যে। অশুভ শক্তি জেগে উঠবে। কিন্তু পুরোহিত মারুর মৃত্যুর রহস্য কী? সত্যিই কি কোনও অমঙ্গলের সূচনা এটা? পুরোহিত মারু বলেছিলেন, কাল পূর্ণ হলে ললটানে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন ডক্টর সেন। এ-কথার অর্থ কী? ললটানে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক তো উনি সত্যি-সত্যি খুঁজে পেয়েছেন। তাহলে? মনে-মনে একটা ভয় যেন বাসা বাঁধছে।

রাত এগারোটা নাগাদ একটা ব্যাগে যন্ত্রপাতিগুলো পুরে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন ডক্টর সেন। সঙ্গে একটা শক্তিশালী টর্চ নিতে ভুললেন না।

রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ নির্জন। খুশি হলেন ডক্টর সেন। বড়রাস্তা ধরে নভোবীক্ষণাগারের দিকে এগিয়ে চললেন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বড়রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে নেমে পড়লেন। এদিকটা আবছা অন্ধকার। ম্লান চাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদও ডুবে যাবে। দিনেরবেলায় দেখা আর রাতের অন্ধকারে দেখা এক জিনিস নয়। আবছা আলোয় ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন একটা অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নভোবীক্ষণাগারটিকে একটা ভয়ঙ্কর পিশাচ বলে মনে হচ্ছে। এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছে আলফোঁ। ঘড়ি দেখলেন। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। ডক্টর সেন এদিক-ওদিক

তাকালেন। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। উনি একটু চিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ ওঁর সামনে দুটো ছায়ামূর্তি দেখা গেল। ওরা যেন মাটি ফুঁড়ে ওঁর সামনে হাজির হল। ডক্টর সেন চমকে উঠলেন।

'আপনি এসে গেছেন?' আলফোঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন উনি। কোনওরকমে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

ডক্টর সেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে পিজারোর মুখের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো চমকে উঠলেন। পিজারোর বাঁ-গালটা পুড়ে চামড়া কুঁচকে গেছে। জায়গায়-জায়গায় ছোট-ছোট মাংসের দলা ঝুলছে। বাঁ-চোখটা গর্ত থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে এসে ঝুলছে। এরকম বীভৎস মুখ জীবনে ডক্টর সেন দেখেননি। পিজারো ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোনওরকমে হ্যান্ডশেক করলেন ডক্টর সেন।

আলফোঁ দাঁত বের করে হেসে বলল, 'তাহলে আপনারা রওনা হয়ে পড়ুন, আর আমার মজুরিটা?' বলে হাত পাতল ও। ডক্টর সেন কাঁধের ব্যাগ থেকে একশো ডলার বের করে ওর হাতে দিলেন।

ডক্টর সেন নিঃশব্দে পিজারোকে অনুসরণ করতে লাগলেন। ক'টা রাতজাগা পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উঠল। বীভৎসভাবে ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখি। ডক্টর সেন মনে-মনে ভয় পেয়ে গেলেন। কোথায় চলেছেন উনি এই গভীর রাতে? ভৌতিক পরিবেশে বীভৎস সঙ্গীর পিছনে-পিছনে? সত্যিই কি ওঁর উদ্দেশ্য সফল হবে? নাকি শুধুই পণ্ডশ্রম? ডান দিকে প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দির, বাঁ-দিকে নৈসর্গিক কুয়ো। পিজারো খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে প্রধান পুরোহিতের সমাধি-মন্দিরের দিকে। এখানেই পুরোহিত মারুর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। গভীর রাতে ওঁরাও এগিয়ে চলেছেন সেই একই জায়গায়। ডক্টর সেনের মনে হল, উনি একটা মারাত্মক ভুল করছেন। এভাবে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে এত রাতে বেরোনো কখনওই উচিত হয়নি। তাহলে কি ফিরে যাবেন? এখনও হয়তো সময় আছে।

একটা ভ্যাপসা গন্ধ যেন বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। পিজারো মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালছে। ডক্টর সেন ওকে অনুসরণ করে চলেছেন। একটা কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল পিজারো। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর টর্চের আলো ফেলল কবরটার ওপর। আলো ফেলেই প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'পাথরটা সরাল কে?'

ডক্টর সেন পিজারোর পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, সামনের কবরটার ওপর যে-ছোট পাথর চাপা দেওয়া ছিল সেটা একপাশে সরানো রয়েছে। একটা গর্তের মুখ দেখা যাচ্ছে। পিজারো গর্তের ভিতর আলো ফেলে কী যেন দেখার চেষ্টা করল, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'পুরোহিত মারু তা হলে ললটানে ঢুকেছিলেন, ওঁর মৃত্যুর কারণটা এবার বুঝতে পারছি।'

ডক্টর সেন বলে উঠলেন, 'এ-কথা আপনার মনে হল কেন?'

পিজারো টর্চের আলোটা নিজের মুখে ফেলে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'আমার মুখের দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। সেবার মরতে-মরতে কোনওরকমে বেঁচে গেছি। কিন্তু পুরোহিত মারু ললটান থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে আসতে পারলেও মৃত্যুকে এড়াতে পারেননি। হাঃ-হাঃ। পুরোহিত মারুর অভিশাপ আর কাজে লাগবে না। ললটানে ঢোকার আর কোনও বাধাই রইল না আমার।' কথা শেষ করে পিজারো গর্তে নেমে পড়ল। ডক্টর সেনও নেমে পড়লেন। কিন্তু কোথায় কবর? এ তো একটা সুড়ঙ্গের মুখ! ললটান। নিঃশব্দে এগোতে লাগলেন দুজনে। কখনও ঢালু, কখনও চড়াই, কখনও ডাইনে বাঁক, কখনও বাঁয়ে বাঁক। পিজারো টর্চ জ্বেলেই রেখেছে।

ওঁরা কতক্ষণ চলেছেন তার হিসেব ছিল না। একসময় পিজারো বলল, 'সামনের বাঁকটা ঘুরলেই ললটানের আসল জায়গা বা কেন্দ্র। এখানে সুড়ঙ্গটা বিরাট বড়। মাথার ওপরকার ছাদ অনেকখানি উঠে গেছে। দু-দিকে যথেষ্ট চওড়া। আরও চারটে ছোট সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে এখানে।'

বাঁকটা ঘুরতেই পিজারোর কথা যাচাই করে নিতে পারলেন ডক্টর সেন। উত্তেজনায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি পিজারোর হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতে লাগলেন।

'আর এক পা এগোবেন না, ডক্টর। এক পা-ও না, তাহলে আর ফিরে যেতে হবে না।' চেঁচিয়ে উঠল পিজারো।

ডক্টর সেন ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন। না, কোনও মিটার রিডিং আসছে না। তাহলে কি ফোর্সফিল্ড নেই এখানে? ফোর্সফিল্ড না থাকলে পুরোহিত মারুর মৃত্যু ঘটল কী করে? তবে কি ওঁর যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল?

ডক্টর সেন একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলেন পায়ের কাছ থেকে, তারপর ছুড়ে মারলেন সামনের দিকে। পাথরটা ধপ করে ললটানের কেন্দ্রে গিয়ে পড়ল।

'এখানেই কি নিয়ে এসেছিলেন মিস্টার ভ্যালেন্টাইনদের?' পিজারোকে প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন।

'হ্যাঁ, এই সেই জায়গা। আমি আর মিস্টার ডিওবরেনোভিস একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই ছিটকে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, কেউ যেন আগুনের গোলা দিয়ে আমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তে আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কী করে এখান থেকে বেরিয়েছিলাম জানি না। খুব সম্ভব মিস্টার ভ্যালেন্টাইন আমাদের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। মেডিকেল সেন্টারে দু-দিন পরে আমার জ্ঞান ফিরে আসে।'

'কিন্তু এখন এখানে আর কোনও বিপদ নেই এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি।' বললেন ডক্টর সেন।

'কী বলছেন আপনি? নিশ্চয় এখানে বিপদ আছে। এইসব ললটানের মধ্যে পুরোহিতরা মন্ত্রের জোরে পিশাচদের বন্দি করে রাখে। ওদের ঘাঁটাঘাঁটি করা কখনও উচিত নয়। চলুন, ডক্টর, এবার ফিরে চলুন। ললটান দেখতে চেয়েছিলেন, আমি দেখিয়ে দিয়েছি।' পিজারোর কথা শেষ হওয়ার আগেই ডক্টর সেন চারিদিকে টর্চের আলো ফেললেন। মুহূর্তে উনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। একদিকের কোণে একটা মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে। টর্চের আলো পড়ে খুলিটা যেন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। ডক্টর সেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। টর্চের আলোটা একটুও নড়ছে না। এতক্ষণে পিজারোর নজর পড়ল সেই জ্বলন্ত খুলিটার ওপর। ও আবার চিৎকার করে উঠল, 'আপনাকে অনুরোধ করছি, ডক্টর, আপনি ওটার দিকে আর এক পা এগোবেন না। ফিরে আসুন। আমি এখান থেকেই ফিরে যেতে চাই।'

পিজারোর কথাগুলো সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল। পিজারোর কথা যেন ডক্টর সেনের কানেই ঢুকল না। তিনি সম্মোহিতের মতো এগিয়ে যেতে লাগলেন খুলিটার দিকে। নিচু হয়ে খুলিটায় হাত দিলেন, কিছুই ঘটল না। হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন খুলিটা। অবাক হলেন। খুলিটা হাড়ের নয়, কোনও মৃত মানুষের নয়। কৃত্রিম খুলি। স্ফটিকের তৈরি। তবে হুবহু মানুষের মাথার খুলি। খুলির ওপরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব লেখা। পিজারো বোধহয় এতটা সহ্য করতে পারছিল না। ললটানে টাকার লোভে ঢুকলেও কুসংস্কার এড়ানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তার ওপর রয়েছে পূর্ব অভিজ্ঞতার তিক্ততা। পিজারো আবার চিৎকার করে উঠল, 'ডক্টর, আপনাকে আবার বলছি, ওই মন্ত্রপূত মড়ার খুলি আপনি ফেলে দিন।'

'ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়, মিস্টার পিজারো। মনে হচ্ছে, যে-জিনিসের খোঁজে আমি এতদূর ছুটে এসেছি তা আমি পেয়েছি। এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।' বলে খুলিটাকে ব্যাগে ঢোকানোর জন্য তৈরি হলেন ডক্টর সেন। কিন্তু পিজারোর চোখে চোখ পড়তে উনি থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে পিজারোর চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মতো ধকধক করে জ্বলছে যেন। ডক্টর সেন ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিজারো ডক্টর সেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডক্টর সেন একটু হকচকিয়ে গেলেন। ওঁর হাত থেকে খুলিটা ছিটকে পড়ল একটি কোণে, যেখানে একটু আগে খুলিটা ছিল। ডক্টর সেন এগিয়ে গেলেন পিজারোকে টেনে তোলার জন্য। টর্চের আলো পিজারোর মাথার দিকে পড়তেই চমকে উঠলেন ডক্টর সেন। ভয়ে আতঙ্কে ওঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে।

খুলিটা যেখানে ছিল তার পাশে পড়ে ছিল একটা বড় পাথরের টুকরো। পিজারোর মাথাটা সেই পাথরে লেগে একেবারে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। রক্ত আর ঘিলুতে মাখামাখি পাথরটা। মনে হচ্ছে, কেউ যেন পিজারোর মাথাটা ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে ঠুকে দিয়েছে পাথরে। পিজারোর হাতটা তুলে ধরলেন। পিজারো বেঁচে নেই। কী

ভয়ঙ্কর মৃত্যু! অথচ ঘটে গেল কত দ্রুত! ডক্টর সেন পিজারোর হাতটা মাটিতে নামিয়ে দিলেন। খুলিটা কুড়িয়ে ব্যাগে পুরলেন।

কীভাবে যে তিনি পিজারোর মৃতদেহটা কাঁধে করে সুড়ঙ্গের মুখে ফিরে এসেছিলেন তা ওঁর মনে নেই। সুড়ঙ্গের মুখে সেই নকল কবরটার মধ্যে এসে উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন উনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেডে শুয়ে। পুলিশ এল। পুলিশকে সব সত্যি কথা বললে খুলিটা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। তাই একটা মনগড়া কাহিনি বললেন। পুলিশ ললটানের ভিতর পরীক্ষা করে দেখল। ডক্টর সেন ছাড়া পেয়ে গেলেন। খুবই অবাক হলেন তিনি। এরকম একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরও তিনি বেকসুর খালাস পেলেন কী করে তা কিছুতেই ওঁর মাথায় ঢুকল না।

ললটানে ঢোকার দশদিন বাদে পুলিশ আর কাস্টমসের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্লেনে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ডক্টর সেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেন ছাড়ল। একটু ধাতস্থ হয়ে সামনে-পিছনের যাত্রীদের দিকে চোখ বুলোতে গিয়ে একটু চমকে উঠলেন উনি। দু-সার পিছনে কোণের দিকে বসে একটা লোক ওঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কে লোকটা?

লোকটা নিউইয়র্কের আগে নামল না। ডক্টর সেন খুব চিন্তায় পড়লেন। প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্ট হোটেলে উঠলেন। রাত প্রায় আটটা। কাল সকালে কলকাতার প্লেন ছাড়বে। রাতটুকুর জন্য আর শহরে ঢুকতে ওঁর সাহস হল না। বিরাট চোদ্দোতলা হোটেল। ঘরে ঢুকে দরজা ভালো করে বন্ধ করে সুটকেস খুলে খুলিটা বের করে টেবিলে রাখলেন। এতক্ষণে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে পারবেন ওটা। পুলিশ আর অন্তত ওটা ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এখন তিনি মেক্সিকো পুলিশের আওতার বাইরে। আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটাতে পারলে তিনি কলকাতার পথে রওনা দেবেন। সুটকেস থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে আর-একবার অক্ষরগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এবারও অন্যান্যবারের মতো হতাশ হলেন। দুর্বোধ্য অক্ষর, অজানা ভাষা। এ-ভাষার পাঠোদ্ধার ওঁর পক্ষে সহজ হবে বলে মনে হল না। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সেন, এমনসময় দরজায় কে যেন নক করল। তাড়াতাড়ি খুলিটা সুটকেসে পুরে ঢাকাটা ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। হয়তো হোটেলের কোনও বেয়ারা-টেয়ারা হবে। দরজা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তিনি। আলফোঁ। মুখে নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ নিয়েছে। সেইজন্য ওকে দেখে খুব চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু ও এখানে কেন?

'ছদ্মবেশ ধরে আমার পিছু নিয়েছ কেন? আমি তোমার ও পিজারোর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।'

আলফোঁ দাঁত বের করে কুৎসিতভাবে হেসে উঠে পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলভার বের করে দু-হাতে লোফালুফি করল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে ডক্টর সেনের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'ডক্টর, সব পাওনা মেটাননি, তাই আপনার পেছনে-পেছনে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ছুটে আসতে হল। আপনার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া বাকি আছে।'

'কী বলতে চাও তুমি?' ডক্টর সেন এবার সত্যি-সত্যি ভয় পেলেন।

'ডক্টর, মেরিডা পুলিশ ও কাস্টমসকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। ওই হীরের খুলি আমার চাই। কোথায় রেখেছেন খুলিটা? বের করুন।' আলফোঁ তাড়া লাগাল।

'তুমি ভুল করছ, আলফোঁ,' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ডক্টর সেন কথা শুরু করলেন, 'তুমি যেটাকে হীরের খুলি বলে মনে করছ আসলে ওটা হীরের তৈরি নয়। ওটা স্ফটিকের।'

আলফোঁ লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে টেবিলের কাছে গেল। সুটকেসের ঢাকনা খুলে টপ করে খুলিটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দু-চোখে ওর লালসা। অনেকক্ষণ খুলিটা দেখে ওটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'বিশ্বাস করো, আলফোঁ, ওটা বিক্রি করতে পারলেও খুব বেশি টাকা তুমি পাবে না। কিন্তু ওটা আমার গবেষণার কাজে লাগবে। সেইজন্যেই ওটাকে আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি। ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না। চাও তো আমি তোমাকে আরও কিছু টাকা দিচ্ছি।'

আলফোঁ আবার কুৎসিতভাবে হেসে উঠে বলল, 'চুরি করা জিনিস নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফল প্রকাশ করতে আপনাকেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে, ডক্টর। তার থেকে এই ভালো হল না কি? যাক, ও নিয়ে আর মন খারাপ না করে বরং আসুন, এখন একটু রিল্যাক্স করা যাক।' বলে টেলিফোন তুলে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল আলফোঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেয়ারা পানীয় দিয়ে যেতেই আলফোঁ দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। একটা গ্লাস ডক্টর সেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গ্লাসটা তুলে প্রায় ঢকঢক করে সবটা গলায় ঢেলে দিল। খুলিটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার গ্লাসে বেশ অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে নিল। সেটুকু গলায় ঢালতে খুব বেশি সময় নিল না ও। তারপর আলফোঁ সোফা ছেড়ে উঠল। ডান হাতে রিভলভারটা তুলে নিতে ভুলল না। খুলিটা নেওয়ার জন্য ও টেবিলের দিকে এগিয়ে চলল। আলফোঁর পা টলছে।

'মন খারাপ করবেন না, ডক্টর। চলি তাহলে।' বলে নিচু হয়ে খুলিটায় হাত দিল আলফোঁ। ওর কথা জড়ানো। যথেষ্ট নেশা হয়েছে। ডক্টর সেন আর থাকতে পারলেন না। কোনও কিছু না ভেবেই পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে আলফোঁকে ধাক্কা দিলেন। আলফোঁ টাল সামলাতে না পেরে পা হড়কে গিয়ে ধাক্কা খেল পাশের কাচের জানলায়। ঝনঝন করে কাচগুলো ভেঙে পড়ল আর জানলা গলে আলফোঁর দেহটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। ডক্টর সেন নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। খুলিটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। কিন্তু আলফোঁ নেই। আলফোঁর মস্ত দেহটা তখন দশতলার ওপর থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে নীচের সিমেন্টের চাতালের বুক লক্ষ করে। একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল, তারপর সব শেষ।

নিরাপদে কলকাতায় ফিরলেন ডক্টর সেন। আজ থেকে প্রায় বছর আষ্টেক আগে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পঞ্চপর্ণী হাউসিং স্কিমের দশতলা বাড়ির আটতলায় ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি। একটি চাকর আছে, নাম মদন। রান্নাবান্না থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ মদনই করে। ডক্টর সেন কয়েকদিন একনাগাড়ে পড়ে রইলেন খুলিটা নিয়ে। নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। গাদা-গাদা রেফারেন্স বই ঘাঁটতে লাগলেন। লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় বই নিয়ে এসে অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করতে লাগলেন। খাতায় নোট করতে লাগলেন পাতার পর পাতা। কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছুই হল না। যে-তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রইলেন। মায়া ভাষার অক্ষরের সঙ্গে কিছু-কিছু মিল থাকলেও মানে বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠল ডক্টর সেনের কাছে। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারলেন তিনি, ভাষাটা হয়তো মায়াদের আদি ভাষা।

কিন্তু কীভাবে তিনি এগোবেন? যতরকমভাবে সম্ভব তা সবই করে দেখেছেন, কিন্তু মূক ভাষাকে মুখর করে তুলতে পারেননি। প্রায় হতাশ হয়ে পড়ছেন তিনি। তীরে এসে তরী ডুবল। এত কষ্ট আর ঝামেলা করে যে-অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, তা কি কোনও কাজেই লাগবে না?

সেদিন গভীর রাতে খুলিটা হাতে করে এইসব কথা ভাবছিলেন ডক্টর সেন। এমনসময় ওঁর মনে হল, খুলিটার চোখের গর্ত দুটোর মধ্যে একটা হালকা সবুজ আলো ধোঁয়ার মতো ভাসছে।

চমকে উঠলেন ডক্টর সেন। মনে হল চোখের ভুল। দুর্বল শরীরে হ্যালুসিনেশান দেখছেন। চোখদুটো রগড়ে আবার ভালো করে তাকালেন খুলিটার দিকে—না, কিছুই নেই। মনে-মনে আশ্বস্ত হলেন ডক্টর সেন। তখুনি হঠাৎ ওঁর বন্ধু জয়ন্ত রায়ের কথা মনে পড়ল। জয়ন্ত ওঁর কলেজের বন্ধু। ও এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার প্রোগ্রামার। হ্যাঁ, জয়ন্ত হয়তো ওঁকে সাহায্য করতে পারে। বহু প্রাচীন অজানা ভাষার পাঠোদ্ধার করেছে জয়ন্ত কমপিউটারের সাহায্যে। জয়ন্ত থাকে সাউথ দিল্লির গ্রিন পার্কে। জয়ন্ত ওর এক কোলিগকে বিয়ে করেছে। মৃদুলা সুন্দরী ও আধুনিকা।

পরদিন সন্ধ্যার ফ্লাইটে দিল্লি রওনা হলেন ডক্টর সেন। দুপুরের দিকে জয়ন্তকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রিন পার্কে জয়ন্তর ফ্ল্যাটে প্রায় ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেলেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকতে-না-ঢুকতে উচ্ছ্বসিত হয়ে মৃদুলা এগিয়ে এল : 'আপনি নাকি মায়া সভ্যতার দেশ থেকে রহস্যময় কী একটা জিনিস নিয়ে এসেছেন? আমি কিন্তু ওটা আগে দেখব।' ছোট্ট মেয়ের মতো আবদার ধরল মৃদুলা।

জয়ন্ত একটু কৃত্রিম ধমকের সুরে মৃদুলাকে বললেন, 'আঃ মৃদুলা, প্রশান্তকে আগে একটু বিশ্রাম করতে দাও।'

মৃদুলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, 'জিনিসটা না দেখে আমি কিছুতেই প্রশান্তবাবুকে বিশ্রাম করতে দেব না।'

'আরে তোমাকে দেখাব বলেই তো ওটা নিয়ে ছুটে এলাম।' কথাটা বলেই একটু ঘাবড়ে গেলেন ডক্টর সেন। আসলে উনি বলতে চেয়েছিলেন 'তোমাদের দেখাব বলেই', অথচ বলার সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্য কথা। সত্যি, ওঁর যথেষ্ট বিশ্রামের দরকার। ব্রেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

জয়ন্ত একবার ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

মৃদুলা হেসে বলল, 'আপনি ততক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি রান্নাঘর থেকে একটু ঘুরে আসি।' বলেই ও চলে গেল।

জয়ন্ত বললেন, 'তোর ব্যাপারটা এবার খুলে বল তো।'

ডক্টর সেন বললেন, 'খুব সংক্ষেপে বলছি। মৃদুলাকে এসব কথা যেন বলিস না। হাজার হলেও বাঙালি মেয়ে—কুসংস্কার তো এড়াতে পারবে না। হয়তো ভয় পেয়ে যাবে।' বলে পুরো ব্যাপারটা জয়ন্তকে বললেন ডক্টর সেন।

'নে, জিনিসটা বের কর দেখি একবার,' বললেন জয়ন্ত। ডক্টর সেন সুটকেস থেকে খুলিটা বের করে টেবিলে রাখলেন। আর ঠিক তখুনি মৃদুলা একটা ট্রেতে করে তিনকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর খুলিটা দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর খুলিটার ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে ট্রে-টা টেবিলে রাখল।

'কীসব লেখা রয়েছে মনে হচ্ছে খুলিটার ওপরে!' বলল মৃদুলা।

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই জয়ন্তর কাছে এসেছি—কমপিউটারের সাহায্যে যদি ও এগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারে,' বললেন ডক্টর সেন।

মৃদুলার দু-চোখে এক অস্বাভাবিক মুগ্ধতা। ও খুলিটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ ও ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ডক্টর সেন তাড়াতাড়ি খুলিটা ধরে ফেললেন। মৃদুলার মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা দুজনেই চমকে উঠলেন। মৃদুলার দু-চোখ নেশাচ্ছন্ন মানুষের মতো ঢুলুঢুলু। মৃদুলার মাথাটাও যেন অল্প-অল্প দুলছে সাপের মতো।

জয়ন্ত চিৎকার করে উঠলেন, 'মৃদুলা—মৃদুলা!'

জয়ন্তর চিৎকারে মৃদুলা ভালোভাবে চোখ মেলে তাকাল। ওর নেশাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল, তারপর ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ যেন লজ্জা পেল মৃদুলা। দু-চোখ নামাল ও। ডক্টর সেন রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। মৃদুলা এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে কেন?

জয়ন্ত একবার মৃদুলার মুখের দিকে, একবার ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন।

ডক্টর সেন মৃদুলাকে জিগ্যেস করলেন, 'হঠাৎ কী হল তোমার? ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?'

'না, না, ভয় না,' স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল মৃদুলা।

'তাহলে হঠাৎ খুলিটা ফেলে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লে কেন?' এবার প্রশ্ন করলেন জয়ন্ত।

'খুলিটার চোখের গর্তে চোখ পড়তেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। মনে হল, আমি শূন্যে ভেসে চলেছি। স্বপ্নে যেমন মানুষ ডানায় ভর করে অনেকসময় উড়ে বেড়ায়, আমার ঠিক সেইরকম অনুভূতি হচ্ছিল। হঠাৎ চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। তারপর মনে হল, কালো ভেলভেটের মতো অন্ধকারের বুকে হীরের চুমকি বসানো। হীরেগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তারপরই সেই ভেলভেটের পরদাটা কেউ যেন একটানে সরিয়ে নিল। ফুটে উঠল স্নিগ্ধ হালকা সবুজ আলো। কীসের আলো তা বলতে পারব না। একটা সুন্দর জায়গায় এসে নামলাম। চারদিকে ফুলের গাছ, বিচিত্র ফুল ফুটে রয়েছে গাছে, তাদের রঙের কী বাহার! গাছে-গাছে নাম-না-জানা অসংখ্য পাখি। যেমন তাদের পাখার রঙের বাহার তেমনি তাদের গলার মিষ্টি আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, যেন কোন অদৃশ্য শিল্পী এদের ঐকতান নিয়ন্ত্রিত করছে। একটা বিরাট হ্রদ। নীল জল। ছোট-ছোট ঢেউ। এখানে এলে কারও আর ফিরে যেতে মন চাইবে না।' মৃদুলা একটু থামল।

জয়ন্ত বললেন, 'থামলে কেন, তারপর?'

'তারপর,—' বলে আবার একটু থামল মৃদুলা।

ডক্টর সেন বুঝতে পারলেন, তারপর মৃদুলা এমন কিছু দেখেছে যা বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছে।

'বলো—বলো,' তাড়া লাগালেন জয়ন্ত।

ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুলা বলে উঠল, 'একটা অদ্ভুত সুন্দর ছেলেকে দেখতে পেলাম। ছেলেটি যেন আকাশ থেকে ভেসে এসে নামল বাগানটায়। সঙ্গে-সঙ্গে বাগানটা রুক্ষ বালিময় মরুভূমিতে পরিণত হল। এমনসময় তোমার ডাক কানে যেতেই স্বপ্নটা ভেঙে গেল।'

দুজনে হাঁ করে মৃদুলার কথা শুনছিলেন। কথা শেষ হতে জয়ন্ত বলে উঠলেন, 'এ স্বপ্ন নয়, জেগে-জেগে কেউ কি স্বপ্ন দ্যাখে? ওটা তোমার মনের একটা কারসাজি। হ্যালুসিনেশান বলতে পারো।'

'জয়ন্ত, যে করেই হোক, এ-ভাষার পাঠোদ্ধার তোকে করে দিতেই হবে।' ডক্টর সেন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

জয়ন্ত একটু অবাক হয়ে ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকালেন : 'এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? বলেছি তো আমি চেষ্টা করব।' বলে জয়ন্ত খুলিটা তুলে নিয়ে বেশ ভালো করে দেখতে লাগলেন। যে-ই এটা তৈরি করে থাক, আশ্চর্য তার দক্ষতা। এমন নিখুঁত খুলি, দেখে সত্যি বলে মনে হয়। লেখাগুলো ছোট-ছোট কিন্তু আশ্চর্যরকম পরিষ্কার। চোখের গর্তে কৌতূহলী হয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন জয়ন্ত—কিন্তু না, কিছুই ঘটল না ওঁর।

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে গেলেন সবাই। মৃদুলা ডক্টর সেনের সঙ্গে ওঁর ঘর পর্যন্ত গেল : 'টেবিলে খাওয়ার জল ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

ডক্টর সেনের মনে হল মৃদুলা শুধু সময় নষ্টের খেলা খেলছে। আরও বেশ কয়েকবার তিনি এখানে থেকে গেছেন। কিন্তু কই, আগে কখনও তো মৃদুলা এরকম ব্যবহার করেনি? কী উদ্দেশ্য মৃদুলার? মৃদুলার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। ব্যাচেলার হলেও নারীর এ-মুখভঙ্গির কথা কোনও পুরুষকে কখনও ব্যাখ্যা করে দিতে হয় না। এ আমন্ত্রণের একটাই অর্থ।

মৃদুলা আরও সরে এল ডক্টর সেনের কাছে। ওর গরম নিশ্বাস ডক্টর সেনের গায়ে লাগছে। সুরুচির বাধা আর কতক্ষণ থাকবে? ডক্টর সেন সাংঘাতিক ভয় পেলেন। জীবনে এরকম ভয় আর কখনও পেয়েছেন বলে মনে পড়ল না ওঁর। দু-হাতে মৃদুলার দু-কাঁধ প্রায় খামচে ধরলেন।

মৃদুলা এতটুকু শব্দ না করে ডক্টর সেনের বুকে মুখ ঘষল।

ডক্টর সেন মৃদুলাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

মৃদুলা মুখ তুলে তাকাল ডক্টর সেনের মুখের দিকে।

ডক্টর সেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠলেন, 'এখন যাও, মৃদুলা। জয়ন্ত কিছু ভাবতে পারে।'

এ-কথার কী অর্থ বুঝল মৃদুলা কে জানে। কাঁধ থেকে ডক্টর সেনের হাত সরিয়ে দিয়ে একটু হেসে দ্রুত চলে গেল ও। ডক্টর সেন তখন হাঁফাচ্ছেন।

বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর ঘরের আলোটা জ্বেলে খুলিটা নিয়ে বসলেন। অনেক রাত পর্যন্ত অকারণে ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর ওটাকে টেবিলের ওপর রেখেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একসময় ওঁর ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন কত হবে কে জানে! বাইরের রাস্তার আবছা আলো ঘরে ঢুকেছে জানলা দিয়ে। কিন্তু অন্য কিছু ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন তিনি। পাশে শুয়ে মৃদুলা।

বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই মৃদুলা ওঁর হাত চেপে ধরল। মৃদুলার বুক উত্তেজনায় ওঠানামা করছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

ডক্টর সেন মৃদুলার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। ঠিক তখুনি ওঁর দৃষ্টি পড়ল টেবিলে রাখা খুলিটার ওপর। আবছা আলোয় ওটা স্পষ্ট। খুলির মুখটা ওঁর দিকেই ঘোরানো। চোখের গর্ত দুটোর মধ্যে আবার সেই সবুজ আলোর আভাস। ঘুরছে সে-আলো।

সম্মোহিতের মতো বিছানায় শুয়ে পড়লেন ডক্টর সেন। মৃদুলার শরীর ছাড়া আর সবকিছু মুছে গেল ওঁর মন থেকে।

পরদিন জয়ন্ত ডক্টর সেনকে সঙ্গে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। খুলির লেখাগুলোর ছবি তুলে নেওয়া হল প্রথমে। তারপর সারাদিন ধরে বিভিন্ন উপায়ে প্রোগ্রামিং করলেন জয়ন্ত। কিন্তু কমপিউটার, পাঠোদ্ধার করা দূরে থাক, সামান্যতম সূত্রটুকুও দিতে পারল না।

'তাহলে?' খুব হতাশ কণ্ঠে বলে উঠলেন ডক্টর সেন।

'মিউজিয়ামে দিয়ে দে ওটাকে। পৃথিবীর মানুষ ভবিষ্যতে যদি কোনওদিন এই ভাষা পড়তে পারে তো পড়বে। আপাতত আমাদের কাজ শেষ।'

বাসায় ফিরতেই মৃদুলা জিগ্যেস করল, 'কিছু জানা গেল?'

জয়ন্ত বললেন, 'না, কিছু না।'

মৃদুলা বলল, 'যাক গে, ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন তো, আমি খেতে দিই। তুমিও চট করে হাতমুখ ধুয়ে নাও।' বলে মৃদুলা রান্নাঘরে চলে গেল।

ডক্টর সেন মৃদুলার দিকে একবার তাকালেন। মৃদুলা আজ স্বাভাবিক। কাল রাতের ঘটনা যেন ওর মনেই নেই। সত্যি, আশ্চর্য এই মেয়েদের চরিত্র। ডক্টর সেনও অবশ্য ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাইছেন। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী?

আজও রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব হল। জয়ন্ত বললেন, 'প্রশান্ত, তোকে আবার বলছি, খুলির দিকে মন না দিয়ে কোনও সুন্দরীর দিকে মন দে, তাতে কাজের কাজ হবে।'

ডক্টর সেন একটু হাসলেন।

মৃদুলা বলল, 'হাসলে চলবে না। এবার আপনাকে কথা দিতে হবে যে, কলকাতায় ফিরে গিয়েই বিয়ের চিঠি পাঠাবেন।'

ডক্টর সেন মৃদুলার কথা শুনে চট করে মৃদুলার মুখের দিকে তাকালেন। না, সেখানে কাল রাতের ঘটনার কোনও ছাপই নেই। মৃদুলা খুব স্বাভাবিক। তবে কি কাল রাতে সত্যি-সত্যি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন ডক্টর সেন? হ্যালুসিনেশান? কিন্তু না, না, তা কখনও হতে পারে না। এখনও যে ডক্টর সেন মৃদুলার নরম শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছেন!

ডক্টর সেন ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। বেশ রাত হয়েছে। গ্রিন পার্ক এখন নিস্তব্ধ। ডক্টর সেন ভাবতে লাগলেন, যে-রহস্য লুকিয়ে রেখে গেছে দূর নক্ষত্রবাসীরা, তা আর কোনওদিন জানা যাবে না।

অথচ এই রহস্যময় খুলিটাকে কেন্দ্র করে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

জানলা থেকে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন তিনি। মনে হল, ঘরের মধ্যে যেন একটা স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে। চমকে উঠে খুলিটার দিকে তাকালেন। যা ভেবেছিলেন তাই। খুলির চোখের গর্ত দুটোয় সেই সবুজ আলো। আলো দুটো স্থির নয়। অসম্ভব বেগে তা যেন ঘুরছে। স্পাইরাল গ্যালাক্সির মতো দেখাচ্ছে আলো দুটোকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর সেন। ওঁর সারা শরীর ভয়ে আতঙ্কে ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল। নিশ্চয় আবার অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে চলেছে। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল ডক্টর সেনের, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওই আলো থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলেন ঘুরন্ত সবুজ আলোর দিকে। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন মনে নেই ওঁর। হয়তো এক মুহূর্ত্ নয়তো অনন্তকাল।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন ডক্টর সেন অন্য মানুষ। মাথার চুল উসকোখুসকো। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। বাইরের থেকে ভিতরের পরিবর্তন আরও মারাত্মক। এক রাতে ওঁর বয়েস যেন বেড়ে গেছে অনেক। যে-রহস্য ভেদ করার জন্য দিনের পর দিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সে-রহস্য আজ আর তাঁর কাছে অজানা নয়। কাল রাতে সব জেনেছেন। জেনেছেন? না, কেউ ওঁকে জানিয়েছেন। এ-রহস্য হয়তো না জানাই ছিল ভালো।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে ডক্টর সেনকে দেখে মৃদুলা ও জয়ন্ত দুজনেই চমকে উঠলেন।

'রাতে নিশ্চয় আপনার ভালো ঘুম হয়নি।' বলল মৃদুলা।

'সত্যি, প্রশান্ত। জিনিসটা নিয়ে তুই কিন্তু বড্ড ভাবছিস। একরাতের মধ্যে কী চেহারা হয়েছে, আয়নায় দেখেছিস একবার?'

'দেখেছি।' আস্তে-আস্তে জবাব দিলেন ডক্টর সেন।

'আজই আমি খুলিটা দিল্লি মিউজিয়ামে দিয়ে দেব। তোর কোনও কথা আমি শুনব না।'

ডক্টর সেন একটু ম্লান বিষণ্ণ হাসি হাসলেন : 'তার আর দরকার হবে না। ওটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আমার শেষ হয়েছে।'

কফি খেতে-খেতে ডক্টর সেন বললেন, 'জয়ন্ত, আমি তোর সঙ্গে একটু বেরোব।'

'চল,' বললেন জয়ন্ত।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ডক্টর সেনকে ডাকলেন জয়ন্ত। গাড়িতে উঠে জয়ন্তর পাশে বসে ডক্টর সেন বললেন, 'জয়ন্ত, আজ তোর অফিসে যাওয়া হবে না। আমি কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় কথা বলতে চাই।'

গাড়ি ঘুরিয়ে কুতুবমিনারের দিকে চলতে শুরু করলেন জয়ন্ত। কুতুবের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। গাড়ি রেখে ডক্টর সেনকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন জয়ন্ত।

রেস্টুরেন্টটা একদম ফাঁকা। দু-কাপ কফির অর্ডার দিয়ে এককোণে গিয়ে বসলেন দুজনে।

'বল কী হয়েছে?' জয়ন্ত ডক্টর সেনের মুখোমুখি বসে জানতে চাইলেন।

'একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি, জয়ন্ত। মারাত্মক ভুল। পুরোহিত মারুর কথা আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল। ললটান রহস্যের কথা আমার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি।'

'কী বলতে চাইছিস খুলে বল। আমি তোর কথার মাথামুন্ডু কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছি না।' বললেন জয়ন্ত।

বেয়ারা দু-কাপ কফি দিয়ে গেল। জয়ন্ত একটা কাপ ডক্টর সেনের দিকে এগিয়ে দিলেন।

ডক্টর সেন গত রাতের কথা বললেন, 'জয়ন্ত, যে-ভাষার পাঠোদ্ধার করার জন্যে আমি এতদিন উদগীব হয়েছিলাম, তা গত রাতে কেউ যেন আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, মানুষের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ, অথচ তার অহংকার কত পর্বতপ্রমাণ। সব জিনিস আমি তোকে ব্যাখ্যা করে হয়তো বোঝাতে

পারব না। কিন্তু খুলির চোখের গর্ত দুটোর সেই অলৌকিক ঘুরন্ত সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে যে-জিনিস আমি উপলব্ধি করেছি, সেইটুকুই শুধু আমি তোকে বলতে পারি।'

কফি শেষ করে কাপটা সরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললেন, 'তাই বল।'

'সুদূর নক্ষত্রলোকবাসীরা যখন অন্য কোনও গ্রহে অভিযানে বেরোত তখন সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আর-একটা মারাত্মক, ভয়ঙ্কর ও অপ্রতিরোধ্য ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেত। নতুন গ্রহে গিয়ে ওরা সাধারণ অস্ত্রের সাহায্যে গ্রহবাসীদের যদি পরাজিত করতে না পারত, যদি বুঝতে পারত যে, গ্রহবাসীদের হাতে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন ওরা সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে উন্মুক্ত করে দিত। দূর নক্ষত্রলোকবাসীরা বুঝতে পারত এবার সময় হয়েছে। ওরা আহ্বান জানাত ভয়ঙ্কর পিশাচকে। যে-পিশাচ ওই গ্রহের একটি নবজাতকের ভিতর আশ্রয় নিয়ে শুরু করবে চরম ধ্বংসলীলা। যা কিছু ওই গ্রহবাসীদের প্রিয় জিনিস তা ধ্বংস হতে শুরু করবে। এই নবজাতকের সৃষ্টির কাজ চলে ওই স্ফটিক করোটির মাধ্যমে। ওই মন্ত্রপূত করোটির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে দূর নক্ষত্রলোকবাসীদের। এ-অস্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতম জ্ঞান নেই, জয়ন্ত। মায়ারা যখন পৃথিবীতে আসে তখন ওই ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এ-ব্রহ্মাস্ত্র পৃথিবীবাসীদের ওপর প্রয়োগ করার কোনও প্রয়োজন পড়েনি।

কারণ, ওরা যখন এই পৃথিবীতে এসেছিল তখন এখানে কোনও বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল না। জন্তু-জানোয়ারকে শায়েস্তা করার জন্যে ওদের সাধারণ অস্ত্র প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। ওরা আসার বহু-বহু বছর পরে এখানে মানুষের জন্ম হল। গুহাজীবন থেকে খুবই অল্প সময়ে তারা সভ্য হয়ে উঠল। মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। যাত্রা করল সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অন্য নক্ষত্রলোকে। আবিষ্কার করল মায়াদের আসল রহস্য।

'মায়াদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবার বিপজ্জনক হয়ে উঠল। মায়া পুরোহিতরা জানতেন এই ব্রহ্মাস্ত্রের কথা, জানতেন কোথায় তাকে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। পুরোহিত মারু যখন জানতে পারলেন যে, পৃথিবীর মানুষ মায়াদের আসল রহস্য জেনে গেছে, তখন ওই ব্রহ্মাস্ত্রের ফোর্সফিল্ড নষ্ট করে ওদের আদি গ্রহে সংকেত পাঠালেন। মুহূর্তে যোগাযোগ ঘটে গেল স্ফটিক করোটি আর আদি গ্রহের পিশাচসিদ্ধদের মধ্যে। এইবার সেই মহা ভয়ঙ্কর পিশাচ নেমে আসবে তার আধারের মধ্যে। তারপর শুরু হবে ধ্বংসলীলা। জয়ন্ত, আমি এখন সেই পিশাচসিদ্ধদের হাতের পুতুল। শুধু আমি নই। আমি ও মৃদুলা দুজনেই। দূর মহাবিশ্বের ভয়ঙ্কর পিশাচের আধার তৈরির ভার পড়েছে আমার আর মৃদুলার ওপর।'

জয়ন্ত হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন : 'প্রশান্ত, আমার মনে হচ্ছে, তুই আজই কোনও সাইকিয়াটিস্টের কাছে চলে যা, আর বিশ্রাম নে।'

'জয়ন্ত, বোস। আমার মানসিক অবস্থা একটুও বিচলিত নয়! যা বলছি খুব ঠান্ডা মাথায় বলছি। আরও একটু তোর শোনা দরকার, তাহলে আমার একটা কথাও অবিশ্বাস করতে পারবি না।'

তারপর ডক্টর সেন আগের রাতের সব ঘটনা জয়ন্তকে খুলে বললেন।

জয়ন্ত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'প্রশান্ত, তোকে আমি বিশ্বাস করতাম! তুই আমার এরকম সর্বনাশ করলি!'

'জয়ন্ত, তুই বিশ্বাস কর, আমি এক ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির পাল্লায় পড়েছি। এর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।'

জয়ন্তর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় : 'তুই চুলোয় যা—তাতে এখন আমার আর এতটুকু দুঃখ নেই! তবে মৃদুলাও রেহাই পাবে না।' বলেই ঝড়ের মতো রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন জয়ন্ত।

জয়ন্তর গাড়ি পলকে কুতুবের চত্বর ছাড়িয়ে বড়রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ডক্টর সেন গাড়ির পিছনে-পিছনে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু যা ঘটার তা ততক্ষণে ঘটে গেল। গুরগাঁও-এর দিক থেকে একটা বিশাল লরি দৈত্যের মতো ছুটে আসছিল। উত্তেজিত জয়ন্ত নিশ্চয় সময়মতো সাবধান হতে পারেননি। জয়ন্তর গাড়িটা

লরির সামনে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা একটা দেশলাই-এর বাক্সের মতো ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার বাইরে। দুমড়ে-মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল মুহূর্তে।

জয়ন্তর মৃত্যুর পর ডক্টর সেনকে বাধ্য হয়ে বেশ কিছু দিন দিল্লিতেই থেকে যেতে হল। মৃদুলা আঘাত পেলেও একেবারে ভেঙে পড়ল না। মৃদুলা যে মা হতে চলেছে সে-বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহই নেই। ডক্টর সেন বুঝতে পারলেন, রক্ষা পাওয়ার আর কোনও পথ নেই। এবার শুধু অপেক্ষা করা। মৃদুলা ভিতরের কথা কিছুই জানে না। ও খুশি। কিন্তু ও যদি জানত কী ভয়ঙ্কর জিনিস ও গর্ভে ধারণ করেছে তাহলে আত্মহত্যা করত। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নরকের দূত এসে আশ্রয় নেবে সেখানে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কি ধ্বংস করা যায় না ওটাকে?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডক্টর সেন। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? হোক আর না হোক, চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে, তা নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও।

রাতে মৃদুলার খাওয়ার জলে গোপনে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলেন ডক্টর সেন। তাঁর হাত কাঁপছিল—কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। মৃদুলাকে সব জানানো কখনওই সম্ভব নয়। এরপর যা-যা করণীয় তা করে ফেললেন তিনি।

ভোরের দিকে অজ্ঞান মৃদুলাকে নার্সিংহোমে এনে তুললেন। বললেন, মৃদুলা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানকে অবাঞ্ছিত বলে ভাবতে শুরু করেছে ও। সার্জেনের সঙ্গে গোপনে কিছু কথাবার্তা হল। বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে গর্ভপাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মৃদুলাকে অপারেশান টেবিলে তোলা হল। ডক্টর সেন উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন অপারেশান থিয়েটারের সামনে। হঠাৎ অপারেশান থিয়েটারের মধ্যে একটা হইচই শুরু হল। একজন নার্স ছুটে বেরিয়ে গেল অপারেশান থিয়েটার থেকে। ডক্টর সেন ভয়ে-ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। বীভৎস দৃশ্য। সার্জেন মেঝেয় চিত হয়ে পড়ে রয়েছেন। অপারেশান থিয়েটারে টাঙানো শক্তিশালী একটা আলো ভারী শেডসুদ্ধ ছিঁড়ে পড়েছে সার্জেনের মাথায়। মাথাটা থেঁতলে গেছে। বালবের কাচের টুকরোগুলো ভেঙে-ভেঙে চোখে-মুখে ঢুকে গেছে। ডক্টর সেন বুঝলেন, সার্জেনকে বাঁচানোর ক্ষমতা এই পৃথিবীতে আর কারও নেই।

কিন্তু মৃদুলা? ও কেমন আছে? না, ওর কিছুই হয়নি। অপারেশান টেবিলে শান্তভাবে শুয়ে আছে।

মৃদুলার জ্ঞান ফিরতেই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ডক্টর সেন।

ক'দিন ধরে কী একটা চিন্তা করে চলেছেন ডক্টর সেন। অবশেষে ঠিক করলেন মৃদুলাকে নিয়ে সিমলায় বেড়াতে যাবেন। মৃদুলা এককথায় রাজি।

সিমলায় এসে মৃদুলা খুব খুশি। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। তবে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করলে আজকাল হাঁফ ধরে যায়। ডক্টর সেনের মাথায় এখন একটাই চিন্তা। মৃদুলা কিছুক্ষণ ধরে একটানা বকবক করে যায়, উনি শুধু হুঁ-হাঁ বলে সায় দেন।

ডক্টর সেন বললেন, 'ডান দিকের এই চাতালটায় বোসো। একটু জিরিয়ে নাও।'

'ও বাব্বা! নীচে কী বিরাটা খাদ! ওখানে বসলে আমার মাথা ঘুরবে। তার চেয়ে বরং এই দিকটায় বসি।'

'কোনও ভয় নেই। চলো, আমিও বসছি। এদিকটায় নোংরা।' ডক্টর সেন মৃদুলার পিঠে হাত দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মৃদুলা ধপ করে বসে পড়ল। ও হাঁফাচ্ছিল। সামলে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

এই সুবর্ণ সুযোগ। এ-সুযোগ নষ্ট করবেন না ডক্টর সেন। মৃদুলার জীবনের বিনিময়ে যদি পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করা যায় তার চেষ্টা ওঁকে করতেই হবে। মৃদুলাকে খুন করার জন্য যদি ওঁকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয় তার জন্য ওঁর একটুও দুঃখ নেই। মৃদুলার পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলেন ডক্টর সেন। মৃদুলা খুশি হয়ে হাসল একটু। ডক্টর সেন বললেন, 'নীচের দিকে দেখো, মৃদুলা।' ডক্টর সেন মৃদুলার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দু-হাত দিয়ে মৃদুলার পিঠে ধাক্কা দেওয়ার জন্য শরীরটা এগিয়ে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মৃদুলা ডক্টর সেনের কথায় হঠাৎ খানিকটা ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। মৃদুলার পিঠে ধাক্কা

না দিয়ে শূন্যে ধাক্কা দিলেন ডক্টর সেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়লেন নীচের গভীর খাদে। মৃদুলা আর্ত চিৎকার করে উঠল।

ডক্টর সেনকে উদ্ধার করা হল পাইন গাছের মাথা থেকে। না, মারা যাননি। নার্সিংহোমে মাসখানেক থাকার পর ধীরে-ধীরে খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। শারীরিক সুস্থ হলেও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল ওঁর। ডাক্তাররা বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। সবসময় বিড়বিড় করে অসংলগ্ন কথা বলেন। মৃদুলা ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারেন না।

মৃদুলা আজকাল একদম সহ্য করতে পারে না ডক্টর সেনকে। মাঝে-মাঝে চিৎকার করে ওঠে, 'কেন, কেন তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?'

'মৃদুলা, সে কি এসেছে?'

'না, কেউ আসেনি।' চিৎকার করে ওঠে মৃদুলা।

'আসবে, সে আসবে। করোটির ঘুরন্ত সবুজ আলো আমাকে জানিয়েছে...অশুভ মুহূর্ত আগতপ্রায়। অশুভ শক্তি জেগে উঠেছে। সে অপেক্ষা করছে নবজাতকের। মানুষের প্রিয় সবকিছু নরকের আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে দেবে সেই নরকের পিশাচ।'

'কী পাগলের মতো বকছ! চুপ করো। মাথাটা একেবারেই গেছে?' ধমক দিয়ে ওঠে মৃদুলা।

'মানুষের প্রিয় সবকিছু ধ্বংস হবে। মৃদুলা—মৃদুলা, তাহলে হয়তো একটা পথ আছে—ওই অপ্রতিরোধ্য মহাপিশাচকে ধ্বংস করার হয়তো একটা পথ আছে...।'

'চুপ করো। তোমার পাগলামি শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। দয়া করে চুপ করো।' মৃদুলা চিৎকার করে ওঠে।

'পাগলামি নয়, মৃদুলা, সত্যি বলছি বিশ্বাস করো। আমার মন বলছে, একটা পথ আছে। ওকে আমরা ভালোবাসব। গভীরভাবে ভালোবাসব। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা অনুরোধ করব ওকে ভালোবাসতে। মানুষের প্রিয় হয়ে উঠলে ও নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। মৃদুলা—পৃথিবীর সবাইকে...।'

সে-রাত্রেই ডক্টর সেন মারা গেলেন। দশদিন বাদে নার্সিংহোমে মৃদুলার একটি ছেলে হল। জন্মমুহূর্তে ছেলেটি চিৎকার করল না। ডাক্তাররা অবাক হলেন। ছেলেটা সুস্থ ও স্বাভাবিক। গণ্ডগোল দেখা দিল কয়েকদিন বাদে। একজন প্রসূতি অভিযোগ করল যে, তাকে অন্য কারও ছেলে দেওয়া হয়েছে। এ-ছেলে তার নয়। নার্স টিকিট নম্বর দেখল।

ভদ্রমহিলা বললেন, অন্য কারও ছেলের গলায় ওঁর ছেলের টিকিটটা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নার্স একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, টিকিট ওলটপালট হয়নি।

সব প্রসূতিই প্রায় একই অভিযোগ করতে লাগল। এমনকী মৃদুলাও দুবার অভিযোগ করল যে, অন্য কারও ছেলে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তার-নার্সরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন, কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হল না।

করোটির চোখের গর্তে আবার সবুজ আলোর আভা। ঘুরছে—প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে সেই ধোঁয়ার মতো আলো। সবকিছু ঠিকভাবে ঘটেছে—ওদের নির্দেশ মতো। আধারে এসে আশ্রয় নিয়েছে মহাপিশাচ। মুহূর্তে-মুহূর্তে সে অন্যরূপ ধারণ করতে পারে। মানুষ চেষ্টা করলেও আর তাকে চিহ্নিত করতে পারবে না। এবার শুরু হবে ওর কাজ। প্রচণ্ড শব্দ করে স্ফটিক-করোটিটা ফেটে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। মন্ত্রপূত করোটির কাজ শেষ।

অপরাধ

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৮



অদৃশ্য আততায়ী

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

একেবারে আকস্মিকভাবে লোকটা গায়ের ওপর এসে পড়ল।

অনেক কষ্টে টাল সামলে কেটি বিশ্রী একটা শব্দ উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখ তুলে দেখল, লোকটা নেই।

লোকটা উধাও হয়ে গেছে মন্ত্রের মতো! কেটি যতদূর চোখ যায় বুলিয়ে নিল মুহূর্তের মধ্যে।

না, লোকটা নেই।

ফিরতে যাচ্ছিল, পায়ের কাছে দলা পাকানো একখণ্ড কাগজ দেখে থমকে দাঁড়াল। তুলে নিল কাগজটা। কাগজটা টানটান করে ফেলল। এই অস্পষ্ট সন্ধের আলোতেও লেখাগুলো আগুনের অক্ষরের মতো ফুটে উঠল চোখের সামনে।

'তোমাকে কেউ একজন খুন করতে চায়। সে তোমার সঙ্গে এই ট্রেনেই আছে। সাবধান।'

নিজেকে ঠিক করে নিতে কেটির সেকেন্ড কয়েক লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল।

ট্রেন বেশ খানিকটা লেট চলছে। এতক্ষণে বিলাসপুর এসে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেরকম মনে হচ্ছে, রাত দশটার আগে তার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সম্ভবত সিগন্যাল না পাওয়ায় এই ছোট্ট স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে—স্টেশনের নামটাও কেটি দেখেনি। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অধৈর্য হয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে।

সন্ধে এখন বেশ ঘন। প্ল্যাটফর্মে অনেকেই পায়চারি করছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। দূরে বাইরে যাওয়ার পথ।

ট্রেনটা ছেড়ে দেব!

কেটি একমুহূর্ত চিন্তা করল।

না, ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। যে-গুপ্ত আততায়ী ট্রেনে সমস্ত ক্ষণ তার ওপর নজর রেখেছে, সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে—এ-কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। ট্রেনের মধ্যে তবু যেটুকু নিরাপত্তা আছে, এখানে তা-ও নেই, এখানে সবটুকুই অচেনা। তা ছাড়া, ট্রেন ছেড়ে দেওয়াটা সুবিধের হলে সেরকম স্পষ্ট নির্দেশ থাকত। তেমন করে কিছু বলা হয়নি। তার মানে, এই ট্রেনেই সকাল পর্যন্ত কেটিকে তার গুপ্তঘাতকের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে।

যে-কাজে কেটি নেমেছে, তাতে মৃত্যুর ভয় প্রতি পদক্ষেপে, সে-ভয় করলে আজ দশ বছরের ওপর তার পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হত না। তবু, এই মুহূর্তে, কেটির কপাল ঘেমে উঠল, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি। লোকটা কালকের গোটা রাত তাকে মারবার সুযোগ পেয়েছে—কিন্তু মারেনি। কেন? সুযোগ পায়নি? নাকি নাগপুর বা অন্য কোনও মাঝপথ থেকে উঠেছে ট্রেনে?

প্রশ্নগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কেটি। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল নিজের ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভড কম্পার্টমেন্টের দিকে। যতদূর সম্ভব অবিচলিতভাবে নিজের সিটে ফিরে এল।

কম্পার্টমেন্টে এখন কেউ নেই। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে ওঠার সময় এখানে যাত্রী ছিল সবসুদ্ধ পাঁচজন—কেটিকে নিয়ে। বাকি চারজনের নাম সে পড়ে নিয়েছিল স্টেশনেই। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আগরওয়ালা, কর্নেল সিনহা এবং কুলকার্নি। গত রাতটা ওরা পাঁচজনেই এখানে ছিল। দুপুরে নাগপুরে তিনজন নেমে গেছে, আছে কেবল কুলকার্নি। এখন অবশ্য কুলকার্নিও কম্পার্টমেন্টে নেই—কন্ডাকটিং গার্ডকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কেটি ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। চারিদিক একবার দেখে নিয়ে গ্যাস লাইটারের আগুন ছুঁইয়ে দিল কাগজের টুকরোটাতে। এসব ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না।

সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে হল কেটির। মিছিমিছি ভয় পাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। বরং চিরকুটটায় যা লেখা ছিল তাই করতে হবে, সাবধানে থাকতে হবে। আজকের রাতটায় আর ঘুম হবে না। বাঁ-হাতটা পিছনে নিয়ে গিয়ে সুচারু নিতম্বের ওপর ছোট্ট অটোমেটিকটায় একবার ছুঁইয়ে নিল। এমন চমৎকার করে প্যাডের সঙ্গে সেট করা আছে যে, বাইরে থেকে সেটাকে চেনবার কোনও উপায় নেই। এই অস্ত্রটা সঙ্গে থাকতে কেটি কাউকে ভয় করে না।

অবশ্য এর চেয়ে বড় একটা অস্ত্র সবসময়ই তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে, সেটা কেটি নিজে। কথাটা মনে হতে একটা বাঁকা হাসি ওর মুখে খেলে গেল। কুড়ি বছরের পর থেকে বয়েসটাকে সে স্টিলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছে। বয়স কত হল, এখন নিজেই ঠিক মনে করতে পারে না কেটি। কিন্তু কুড়ি বছরের সেই লাস্য, সেই মাদকতা, এখনও সে নিপুণভাবে ছড়িয়ে রেখেছে দেহে। এখনও পর্যন্ত এমন কোনও পুরুষ দেখেনি কেটি, যে তার চোখে-মুখের, সমগ্র দেহের, হিল্লোলিত আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটির চোখেও সে প্রথম পরিচয়ে মুহূর্তের জন্যে আগুনের টুকরো ঝলসে উঠতে দেখেছিল। 'তিনি' বলেছিলেন, 'তোমার শরীরে বোধহয় একইঞ্চিও সরলরেখা নেই, কী বলো? ফাইন! তুমি আমাদের কাজে লাগবে।'

কাজে কেটি লেগেছিল। প্রথমে ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো কাজ। তারপর এখনকার মতো বিরাট ব্যাপার—অত্যন্ত চতুর লোক ছাড়া যে-কাজে কাউকে নির্ভর করা যায় না।

তার মানে 'তিনি' ওকে বিশ্বাস করেন, ওর ওপর নির্ভর করেন।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এবারে কেটি একটু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেছিল, বলেছিল, 'আমি তো অনায়াসে প্লেনে যেতে পারি। কাস্টমস ধরতে পারে এমন কিছু তো নেই আমার সঙ্গে!'

'তিনি' দু-সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'প্লেনে গেলে সময় যে অনেক কম লাগে, সেটা বাচ্চাছেলেও বোঝে। তুমি আর কিছু বলবে?'

কেটি চুপ করে চলে আসছিল, তিনি বলেছিলেন, 'শোনো, একটা কথা মনে করিয়ে দিই। এখানে প্রশ্ন করাটা রীতি বহির্ভূত। যাও!'

কথাগুলো মনে পড়তে কেটির মাথা ঝুঁকে পড়ছিল, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা নড়ে উঠল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কন্ডাকটিং গার্ড উঠে পড়ল ট্রেনে। কেটির দিকে একপলক তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল নিজের জায়গায়।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়বার শেষ মুহূর্তে দরজায় প্রায় আছড়ে পড়ল কুলকার্নি।

একপলক তাকিয়েই চমকে উঠল কেটি।

কুলকার্নি হাঁপাচ্ছে। ওর চুলগুলো এলোমেলো। ঘর্মাক্ত মুখে কিছু চুল লেপটে রয়েছে। জামার হাতায়—।

হ্যাঁ, কেটি এখন মুখ ঘুরিয়েও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ছোট-ছোট দু-একটা রক্তের ছোপ।

কুলকার্নি ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য হাতটা আড়াল করেছিল, তবুও।

কেটির সামনে দিয়েই কুলকার্নি এগিয়ে গেল। ব্রিফকেস খুলে কিছু বার করল, শান্ত পায়ে চলে গেল টয়লেটে।

কেটির বুকের ভেতরটা ধকধক করছিল।

আশ্চর্য! এই লোকটার সঙ্গে সে একটা রাত কাটিয়েছে ট্রেনে। আরও একটা রাত তাকে কাটাতে হবে। অথচ এর সম্বন্ধে একবারও কিছু চিন্তা করেনি। অথচ লোকটা কী অদ্ভুত!

সমস্ত রাস্তা একটিও কথা বলেনি কারও সঙ্গে।

কেটি দু-একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে—একবারও লোকটা তার প্রতি মনোযোগ দেয়নি। নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠেনি পর্যন্ত—একখানা মোটা বই খুলে রেখেছে চোখের সামনে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সমস্ত সময়টা কাটিয়েছে ওই বই নিয়ে, আর ক্রমাগত স্মোক করেছে। খাওয়ার সময় একবার শুধু উঠে গিয়েছিল ডাইনিং কারে। ওই পর্যন্তই। রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখেছিল কেটি, লোকটা বাঙ্ক পর্যন্ত ব্যবহার করেনি।'

কিন্তু কেন, কেন?

বই পড়াটা কি তাহলে ভান? ও কি কেটির ওপরই নজর রাখছে সর্বক্ষণ!

সন্দেহটা মাথায় আসতে ভয়ের বদলে একটু স্বস্তি পেল কেটি।

কুলকার্নিই যদি সেই অজানা ঘাতক হয়, তবে ভয়ের কিছু নেই। একসঙ্গে আরও এতখানি পথ—কম্পার্টমেন্টে অন্য কোনও যাত্রী নেই, এইরকম ছোট্ট একটা বিপদ কাটিয়ে ওঠার মতো বুদ্ধি ওর আছে। এখনও এতখানি বয়স নিশ্চয়ই হয়নি।

আর-একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, কুলকার্নি ফিরে এল।

শার্ট পালটে এসেছে, চেহারাও ফিটফাট—কে বলবে একটু আগে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্ম থেকে উঠে এসেছে!

ইচ্ছে করেই লাইটারটা জ্বালল না কেটি, কয়েকবার খুটখাট শব্দ করে রেখে দিল। সোজাসুজি তাকাল লোকটার দিকে, ইংরেজিতে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার লাইটারটা কাজ করছে না।'

'শিয়োর!' কুলকার্নি নিজের সুদৃশ্য লাইটার এগিয়ে দিয়েছিল ওকে।

সাধারণত এসব ক্ষেত্রে লাইটার জ্বেলে এগিয়ে ধরাটাই রীতি, কিন্তু কেটি তাতে বিচলিত হয়নি। সিগারেট জ্বেলে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল ওটা। আরও অনেকবার সিগারেট ধরাতে হবে, সুযোগ অনেক পাওয়া যাবে।

কুলকার্নি আগের মতোই পা ছড়িয়ে সেই মোটা বইখানা নিয়ে বসেছে। টুকরো কথা দিয়ে এখনও নতুন করে শুরু করা যায়, কিন্তু থাক। নিজেকে অত সস্তা করে লাভ নেই—সমস্ত রাতটা পড়ে আছে।

বাঙ্কে ফেলে রাখা চকচকে মলাটের হালকা উপন্যাসটা টেনে আনল কেটি। এটা চোখের সামনে রেখে দিলে অন্যমনস্ক ভাবটা চট করে নজরে পড়ে না।

কুলকার্নি লোকটাকে যত সহজ মনে করা গিয়েছিল, তা ও নয়। কিন্তু ভয় সেটা নয়। আসল কথা, চিরকুট লিখে যার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—ও সেই লোক তো!

যদি না হয়, তাহলেও পরিশ্রম ব্যর্থ হচ্ছে এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। লোকটার চেহারা অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ। তেমন পরিস্থিতি হলে যাতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায়, সে-ব্যবস্থাও ওকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে।

গাড়ির গতি শ্লথ হচ্ছিল। কী স্টেশন আসছে কে জানে।

বাইরে কিছু কলরব শোনা যাচ্ছে। কিছু ফেরিওলার হাঁকডাক। গার্ড দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলকার্নি তেমনি গভীর মনোযোগী।

গাড়ি ছাড়ল। গার্ড এখন নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

কেটি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মে লোক বেশি নেই, অন্তত শেষের দিকে।

আবছা আলোয় টুপি-পরা একটা লোকের দিকে চোখ পড়ল। স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মতো।

হঠাৎ এদিকে তাকিয়ে লোকটির শরীর নড়ে উঠল। কেটি দেখতে পাচ্ছিল, সে দৌড়তে আরম্ভ করেছে—গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াবার আগেই উঠে পড়েছে পিছনের একটা কম্পার্টমেন্টে।

কেটির মাথার মধ্যে একটা শিরা দপদপ করছিল।

ফিরে তাকাল কুলকার্নির দিকে।

নীরব, নিস্পন্দ। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই ওর চেহারায়।

ব্যাপারটা যত সহজে চুকে যাবে ভেবেছিল তা হবে না, কেটি বুঝতে পারছিল।

ধীরে-ধীরে সে ফিরে আসছিল নিজের জায়গায়।

গার্ড এসে দাঁড়াল সামনে, 'খেতে যাবেন, না পাঠিয়ে দিতে বলব?'

'না, আমি যাচ্ছি।'

একটু ইতস্তত করেই বলে ফেলল কেটি। কুলকার্নি গিয়ে খেয়ে আসে, ও লক্ষ করেছে।

গার্ড কুলকার্নির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'একটু পরে।' কুলকার্নির ভরাট স্বর ওর কানে এল।

আধঘণ্টাখানেক বই মুখে করে কাটাল কেটি। নাঃ, কুলকার্নি উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

এমনি করে বসেও থাকা যায় না। কেটি বই রেখে ডাইনিংয়ের দিকে এগোল।

ঘুরে আসতে বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট। কিন্তু এসে কেটি কুলকার্নিকে দেখতে পেল না। অথচ কুলকার্নিকে দরকার ছিল, প্ল্যাটফর্মের সেই লোকটা—যদিও কেটি কনফার্মড নয়, কিন্তু ডাইনিংয়ে সে কেটির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল।

আশ্চর্য! কোথায় গেল লোকটা! খাওয়ার ঘরে গেলে নিশ্চয়ই দেখা হত। তাহলে? টয়লেটে?

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—।

কেটি হালকা পায়ে উঠে গিয়ে টয়লেটটা দেখে এল। না, কেউ নেই সেখানে। ফেরবার জন্য সামনে ঘুরেই চমকে উঠেছে কেটি! আলোকিত করিডোর দিয়ে কে হঠাৎ মিলিয়ে গেল না?

কেটি চোখ মুছল। ওর হাসি পেল। মনের ভুল ছাড়া আর কী!

কেটি অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। উপায় নেই, কিছু করতে হলে এখনই করা দরকার। সুটকেস থেকে নাইটি বের করে ফেলল। মন থেকে ভয় দূর করে টয়লেটের দিকে এগোল।

ইচ্ছে করেই নিজেকে খানিকটা অসংবৃত করে তুলল কেটি। কোনও রিস্ক নেওয়া যায় না।

আয়নায় নিজের শরীরের অনেকখানি ও দেখতে পাচ্ছে। স্বচ্ছ নাইটিতে তার শরীরের বাঁকগুলো এখন অনেকখানি দৃশ্যমান। লোভনীয়।

সামান্য প্রসাধন সেরে ফিরে এল কেটি।

কুলকার্নি ফিরল তারও অন্তত পনেরো মিনিট পরে।

এবার আর সুযোগ নষ্ট করল না কেটি। অব্যর্থ একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'আপনি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি?' কুলকার্নি নিজের সিটের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কেন?'

'ভাবলাম, আপনি অন্য কোনও কম্পার্টমেন্টে গেছেন—কোনও বন্ধুবান্ধবের কাছে।'

'তাতে কী হল?'

'আমি ভরসা পাচ্ছিলাম, অন্তত একজন এখানে আমার সঙ্গে আছে।'

কুলকার্নির মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। কিন্তু সেটা মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে, বলল, 'না, আমি এখানেই থাকব।'

'ধন্যবাদ।' কেটি দেরি না করে বলল, 'আমরা অনেকক্ষণ একসঙ্গে এসেছি, পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কী বলুন?'

কুলকার্নি হাসল, বলল, 'বোধহয় না। আমি জে. ডি কুলকার্নি।'

'সরস্বতী ভোরা!' কেটি রিজার্ভেশন লিস্টে নিজের যে-নাম ঝোলানো ছিল, অবলীলাক্রমে সেটা বলে ফেলল, 'আপনি অনেকক্ষণ থেকে একটা বই পড়ছেন। কোনও উপন্যাস?'

'না, আমি উপন্যাসের ভক্ত নই।'

'তাহলে কী ওটা?'

'এটা পৃথিবীর নানারকম পাখি সম্বন্ধে লেখা।'

'ও, পাখি—' কেটি একটা আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল 'কী দারুণ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?'

কুলকার্নি আবার হাসল 'আসুন।'

সমস্ত কিছু নির্ভুলভাবে এগোচ্ছে। কেটি মনে-মনে হাসল।

একেবারে গা ঘেঁষে বসল কেটি। কুলকার্নির যদি বিন্দুমাত্র ঘ্রাণশক্তি থাকে, তাহলে এখন ও কেটির শরীর থেকে সেই মদির পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছে।

একটা পাখির ছবি দেখে কেটি আরও ঘন হয়ে বসল : 'এটা কী পাখি?'

'ব্লু থ্রোট। ইউরোপের পাহাড়ি অঞ্চলে থাকে।'

'আর এটা?' কেটি অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল, ওর চওড়া-গলা নাইটি এখন প্রায় নাভিদেশ পর্যন্ত দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

'মেরু অঞ্চলের পাখি, টার্ন।'

'ইস, এটা'—বলবার সময় কেটির সমস্ত চুল ঝুঁকে পড়েছে সামনে, ওর আঙুলগুলো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে কুলকার্নির বাহু।

বই ফেলে কুলকার্নি তাকাল কেটির দিকে। ওর চোখের দৃষ্টি এখন ঘন।

কেটির পিঠের ওপর হাত রাখল।

কেটি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। ওর চোখে আমন্ত্রণের দৃষ্টি।

কুলকার্নির হাত একবার খামচে ধরল কেটির পিঠ। গভীরভাবে টেনে নিয়ে এল ওর মুখটা নিজের কাছে।

কেটির মুখে এখন কুলকার্নির নিশ্বাস পড়ছে। কেটি চোখ বুজে ফেলেছে।

কিন্তু অকস্মাৎ ওকে সরিয়ে দিল কুলকার্নি। ওর নরম গাল টিপে বলল, 'মিস ভোরা!'

কেটি বিস্মিত এবং আহত মুখে তাকাল ওর দিকে।

'কিছু মনে করবেন না। আমি মেয়েদের খুব ভালোবাসি, বিশেষ করে আপনার মতো সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্য আমার কাছে একটা বিরাট আনন্দ, কিন্তু—' কুলকার্নি সহজ ভঙ্গিতে বলছিল, 'আপাতত আমার মাথার ওপর একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব নিয়ে আমি সেটা ভুলে যেতে ভালোবাসি না।'

কেটির বুকের ভেতরে কীসের শব্দ। বলল, 'কীসের দায়িত্ব?'

'দুঃখিত, আপনাকে আমি সেটা বলতে পারছি না।'

'আমার চেয়েও সেটা বড়?'

'এই মুহূর্তে।'

'ও।' কেটি সোজা হয়ে বসল : 'ঠিক আছে। আমাকে মাপ করবেন।'

'মাপ করার প্রশ্ন ওঠে না—' কুলকার্নি বলল, 'ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে—আজ রাতের মতো আমি অসহায়।'

শয়তান। মনে-মনে ফুঁসে উঠল কেটি। এখন আর কোনও সংশয় নেই।

আবার দেখা হবে!

কেটি সরে এল। আর দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তুমি বা আমি—দুজনের একজনকে আজ রাতের মধ্যে সরে যেতেই হবে।

গার্ড কোথায় একবার দেখা দরকার।

কেটি উঠে পড়ল। করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

গার্ড বসে-বসে ঝিমোচ্ছে। মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছে পিছনে। চমৎকার সুখ-নিদ্রা উপভোগ করছে।

এদিকেও একটা টয়লেট আছে। কেটি সেদিকে পা বাড়াল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাক উঁচু করে গন্ধ নিল। কোথা থেকে আসছে গন্ধটা! কেমন বিশ্রী আঁশটে গন্ধ একটা!

গন্ধের ব্যাপারে কেটির নাক খুব তীক্ষ্ণ। একটু এগিয়ে র‍্যাক মতো একটা জায়গা। মাল-টাল থাকে বোধহয়। হ্যাঁ, এখান থেকেই গন্ধটা আসছে।

কিন্তু সেখানে কিছু নেই। বিরাট একটা বস্তা মুখ-বাঁধা অবস্থায় রয়েছে শুধু।

কী আছে ওখানে?

কেটি নিজেকে সামলাতে পারল না, এগিয়ে গেল। বস্তার মুখটা খুলতে লাগল লঘু হাতে। দড়িটা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে—।

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছে ওর গলা থেকে!

ওর হাত-পা কাঁপছিল। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছিল।

একটা নিস্প্রাণ দেহের মুণ্ডটা ঝুলে পড়েছে। চোখের মণি দুটো বেরিয়ে এসেছে। নাকের কাছে জমাট-বাঁধা রক্ত।

টলতে-টলতে ফিরতে যাচ্ছিল, গার্ড এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

'কী ব্যাপার, ম্যাডাম?'

'একটা ডেডবডি।'

'ডেডবডি!' গার্ড একবার উঁকি দিল, তারপরই হঠাৎ ভারী এবং চাপা গলায় বলল, 'তাই তো!'

'রাস্তা ছাড়ুন, আমার খারাপ লাগছে।'

'রাস্তা এখন একটাই—' গার্ডের হাতে একটা রিভলভারের নল চকচক করছে, 'এদিকে আসুন।'

'ওদিকে তো টয়লেট।'

'আমি জানি।'

'ওদিকে আমি কেন যাব?'

'আমার হাতে যে-অস্ত্রটা দেখছ, কেটি, এতে সাইলেন্সার ফিট করা আছে। মিছিমিছি কথা বাড়িয়ো না।'

কেটি! লোকটা তার নাম জানে। তাহলে—।

এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিল কেটি। পিঠে রিভলবারের ঠেকানো নল সে এখন অনুভব করতে পারছে। আশ্চর্য, এই লোকটা তাহলে—!

'শয়তান!' কেটি ফিসফিস করল, 'তুমি তাহলে গার্ড নও?'

'মোটেই না। গার্ড ওইখানে শুয়ে রয়েছে।'

'তুমি?'

'সে-কথা জেনে কী হবে? তোমার আয়ু তো মাত্র আর সেকেন্ড-কয়েক।'

'শোনো—।'

'খবরদার, সামনে ফিরো না। তাতে তোমার আয়ু বাড়বে না।'

'কিন্তু, আমাকে তুমি মারবে কেন?'

'কারণটা আমারও জানা নেই। কিন্তু মরতে তোমাকে হবেই। তুমি তৈরি হও।'

'শোনো, প্লিজ, একবার আমাকে কয়েকটা কথা বলতে দাও।'

'কোনও কথা নয়, তুমি তৈরি হও। তৈরি?'

'প্লিজ—।'

'এক, দুই—।'

ভয়ে কেটির সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠেছিল। কোনও কথা ওর কানে যাচ্ছিল না। আতঙ্কে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত কোনও সংবেদন ছিল না শরীরে। সংবিৎ ফিরতে সে অবাক হল। সে এখনও বেঁচে আছে! পিছনে কীসের শব্দ!

মাথা ঘুরিয়ে কেটি বিস্মিত হয়ে গেল। লোকটাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুলকার্নি। লোকটার রিভলভার ছিটকে পড়ে আছে দূরে।

'শুনুন,' কুলকার্নি হাঁপাচ্ছিল : 'আপনাকে মিস ভোরা বলব, না কেটি, সেটা পরের প্রশ্ন। অনুগ্রহ করে আপনার অস্ত্রটা হাতে তুলে নিন। যতদূর জানি, আপনার লক্ষ্য বেশ ভালোই। লোকটাকে আপনি লক্ষ করুন, বাকি কাজ আমি করছি।'

কেটি নিমেষে অটোমেটিক হাতে তুলে নিল।

কুলকার্নি ক্ষিপ্র গতিতে পকেট থেকে শক্ত কর্ড বার করে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। মুখে একটা রুমাল গুঁজে মুখটাও বন্ধ করে দিল।

সমস্ত কাজ মিনিট-দুয়েকের মধ্যে সেরে বলল, 'ব্যস, আপনার এবার ছুটি।'

'লোকটা ওইভাবে থাকবে?'

'কক্ষনও না।' কুলকার্নি অবলীলাক্রমে ওকে কাঁধে ফেলে বলল, 'আসল গার্ডকে যেখানে পাঠিয়েছে, সেটাই ওর সবচেয়ে ভালো জায়গা। আপনি ওর রিভলভারটা বাইরে ফেলে দিন। এসব জিনিস ধারেকাছে না থাকাই ভালো।'

কাজ সেরে ফিরে এসে কুলকার্নি বলল, 'আমার দায়িত্বের ব্যাপারটা এখন বোধহয় বিশ্বাস করা চলে!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি খুব সতর্ক মেয়ে—' কুলকার্নি পকেট থেকে একটা কার্ড বার করল : 'নাইন নট সেভন, ডব্লু ওয়াই এক্স বোম্বে।'

'ধন্যবাদ।'

'এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন। বাকি রাতটাও আমি এইভাবেই পাখির ছবি দেখে কাটিয়ে দেব।'

কেটির কপাল ভিজে উঠেছিল। এতক্ষণ পরে ওর ক্লান্ত লাগছিল। বাঙ্কের দিকে এগিয়ে বলল, 'অনেক—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'এটা অবশ্য সবটা আমার প্রাপ্য নয়। ঠিক আছে, গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

কেটি নরম গদিতে নিজেকে ছেড়ে দিল।

হাওড়া স্টেশনে নেমে কুলকার্নি বলল, 'একমিনিট। আমাদের কম্পার্টমেন্টের বন্ধু দুটির একটা ব্যবস্থা করি, না হলে পরে ঝামেলা হতে পারে।'

'প্ল্যাটফর্মেও আমাদের লোক আছে?'

'আছে।'

কথা বলে একমিনিটের মধ্যে ফিরে এল কুলকার্নি।

বাইরে গাড়ির নম্বর দেখে কাছে এসে কেটি বলল, 'এবার আপনার দায়িত্ব শেষ, আপনি যেতে পারেন।'

'আমার ওপর কিন্তু সেরকম অর্ডার নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'বেশ তো, চলুন।'

গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই মধ্য কলকাতার একটি ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হল। ঢুকেই রিসেপশনে যে-মেয়েটি ছিল, তাকে কেটি তার কার্ড দেখাল।

মেয়েটি বলল, 'উনি আপনার জন্যে ওয়েট করছেন, চলে যান।' কিন্তু কুলকার্নিকে দেখে সে ভুরু কোঁচকাল, 'ইনি?'

'স্পেশাল অর্ডার আছে।'

মেয়েটি কোনও কথা না বলে ওদের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

ঘরটা ছিমছাম। এয়ারকন্ডিশনড। যে-লোকটি টেবিলে মাথা নিচু করে বসেছিল, পায়ের শব্দে সে মাথা তুলেছে।

'হ্যালো কেটি, সাকসেসফুল?'

'ইয়েস স্যার।' কেটি নিতম্বের পিছন থেকে পাকানো একটা কাগজ বার করে দিল।

কুলকার্নির দিকে চেয়ে লোকটির চোয়াল ভারী হয়ে উঠেছিল, কেটিই বলল, 'নাইন নট সেভন। আমাকে রেসকিউ করেছেন।'

একটু গম্ভীর হয়ে লোকটি বলল, 'থ্যাঙ্কস। কেটি, তুমি যেতে পারো।'

কেটি চলে যাওয়ার পর লোকটা সোজাসুজি তাকাল কুলকার্নির দিকে। বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

'অর্ডার ছিল।'

'অর্ডার কী ছিল, আমি জানি। কেটি ছাড়া আর কেউ আমাদের কলকাতার অফিস চিনুক, আমাদের বসের ইচ্ছে নয়। দেন, হু আর ইউ?'

কুলকার্নি চুপ।

'আমি জানতে চাই, তুমি আমাদের শত্রু রোবস্টনের লোক, না টিকটিকি?'

কুলকার্নি এবারও চুপ।

'চুপ করে থেকে লাভ নেই। আমার যে-হাতটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, সেখানে একটা তাজা অটোমেটিক ধরা রয়েছে। আমার কথার উত্তর দাও, হু আর ইউ?'

কুলকার্নির মুখে কয়েকটা রেখা শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আমার নাম মোহন চৌধুরী, লোকে আমায় ম্যাক বলে চেনে।'

'ও, দ্যাট ডিভাইন রোগ।' লোকটা দাঁতে-দাঁতে ঘষল : 'তাহলে তুমি টিকটিকি!'

'তোমাদের ভাষায়।'

'স্টপ ইট। নাইন নট সেভন কোথায়?'

'তাকে সন্ধে ছ'টা-সাতটা নাগাদ একটা ছোট্ট স্টেশনে বেশ যত্নে রেখে এসেছি।'

'বাট হোয়াই?'

'তোমাদের আড্ডার সন্ধান জানা আমার উদ্দেশ্য ছিল।'

'সেই লোকটাকে জেরা করতে পারতে, এভাবে মৃত্যুর গুহায় মরতে এলে কেন?'

'তাকে জেরা করে যে লাভ নেই, সে তুমিও জানো।'

'রোবস্টনের লোক কোথায়?'

'সে গার্ডকে খুন করে তার পোশাকে কেটিকে মারবার অপেক্ষায় ছিল, এখন বোধহয় সে লালবাজারে।'

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ওয়েল, তোমার বুদ্ধির এবং সাহসের প্রশংসা করতে আমি বাধ্য। কিন্তু এত কথা জানার পর তোমায় আর বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বোধহয়, কী বলো?'

ম্যাক নিজের কর্তব্য ঠিক করছিল। ওর একটা পা ধীরে-ধীরে পৌঁছেছিল টেবিলের পায়ার কাছে। লোকটাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য হঠাৎ প্যান্টের পকেটের দিকে হাত বাড়াল।

'ব্যস, ব্যস—' লোকটা ভুরু তুলে হাসল : 'তোমার প্যান্টের পকেটে যে একটা ছোটখাট কিছু থাকতে পারে, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আর কয়েক সেকেন্ড যদি বাঁচতে চাও, হাতটা—।'

ম্যাকের পায়ের ধাক্কায় টেবিলটা আছড়ে পড়েছে সেই মুহূর্তে।

লোকটার হাত থেকে গুলিও ছুটেছে সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি করবার আগেই ম্যাকের ডান পা সেটিকে ছিটকে দিয়েছে মেঝেয়। এবং কলিংবেলে হাত পৌঁছবার চেষ্টা করে লোকটা বুঝেছে, সেটা একটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা পড়েছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার হাতদুটো ম্যাক বেঁধে ফেলেছে কর্ড দিয়ে।

যে মুহূর্তে উঠে হাঁপাচ্ছে, দরজা খোলার শব্দ।

উদ্যত রাইফেল হাতে একে-একে চারজন কনস্টেবল সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটির বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ম্যাক বলল, 'তোমার আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। লোকে বলে, কোয়ার্টার সেকেন্ডের মধ্যেই আমি মুভ করতে পারি। তা ছাড়া—।'

ম্যাক রুমাল খুঁজল। না পেয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল, লাইটার দিয়ে সেটিতে অগ্নিসংযোগ করে বলল, 'তা ছাড়া, এত কাজ করে পুলিশকে আমি ফলো করতে বলব না, এটাই বা তুমি ভাবলে কী করে?'

লোকটা গজরাতে-গজরাতে বলল, 'কেটি তোমার সঙ্গে ছিল।'

ম্যাক হাসল : 'আফটার অল সে একটা মেয়েমানুষ। আমি তার সামনেই পুলিশকে বলে এসেছিলাম আমাদের ফলো করতে এবং বাড়ি ঘিরে ফেলতে। গুলির শব্দ শোনামাত্র যেন ওরা ভেতরে ঢোকে। আই শ্যুড বি ওবলাইজড—গুলিটা আমাকে খরচ করতে হয়নি।'

শুভেন্দু এসে গিয়েছিল। ম্যাক বলল, 'দেন, শুভ, ইটস অল ইয়োর বিজনেস। তুই আমায় খবর এনে দিয়েছিলি। তখন আমি বলেছিলাম, এই গুপ্তচক্রের সন্ধান তোকে দেব। আশা করি, এরপর বোম্বাইয়ের ঘাঁটি বার করবার ব্যাপারে মহারাষ্ট্র পুলিশের সহযোগিতাই তোর পক্ষে যথেষ্ট হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ। এবার তোর ছুটি।'

'বাঁচালি।' ম্যাক বলল, 'শুধু একটা আপশোস থেকে গেল।'

'কী?'

'আমি একটা বুদ্ধু—' ম্যাক শুভেন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'যে-মেয়েটার সঙ্গে দুটো রাত কাটালাম, আই মিন কেটি—দ্যাট ডেম মেকস আ ফাইন কম্প্যানি—সুযোগটা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।'

শুভেন্দু চিৎকার করে কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। প্রচণ্ড একটা গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'অ্যারেস্ট হিম।'

কাকে অবশ্য ঠিক বোঝা গেল না।

মাসিক রোমাঞ্চ

জানুয়ারি, ১৯৭৯



তারাপদ সাহার জীবন-রহস্য

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম, ঘরের টেবিলের ওপর একটা খাম পড়ে রয়েছে। আমার নামে চিঠি। এসেছে সেদিনের ডাকে। খামের ওপর প্রেরকের নাম নেই। পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প দেখলাম, আসানসোল। কিন্তু আসানসোলে আমার কোনও আত্মীয় বা বন্ধু আছে বলে তো মনে পড়ছে না। একটু অবাক হয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম।

বিশ্রী তাড়াহুড়ো করে লেখা একটা দীর্ঘ পত্র। চিঠির তলায় প্রেরকের নাম দেখে এবার কৌতূহলটা আরও বাড়ল। তারাপদ সাহা। আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু। থাকে বেহালার শীলপাড়া অঞ্চলে। কিন্তু ও হঠাৎ আসানসোল গেল কবে? আগে কিছু জানায়নি তো! অথচ আমায় না বলে ও কিছু করে না। প্রতি সপ্তাহে আমাদের দেখা হয়। এখন বিয়ে করে এক ছেলের বাপ হলে কী হবে, ছেলেবেলা থেকেই আমার ওপর ওর প্রচণ্ড বিশ্বাস।

তারাপদর চিঠির হাতের লেখাটাও বড় বিশ্রী ভাঙাচোরা মনে হল। কোনও ব্যাপারে ও কি খুব উদ্বিগ্ন? বিস্ময় না বাড়িয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। শুরু থেকেই চিঠির ভাষা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ধোঁয়াটে—।

প্রিয় সন্তোষ,

এ-চিঠি তোর কাছে পৌঁছবে কি না জানি না, তবু লিখতে হচ্ছে। যদিও জানি না, এখনও পর্যন্ত তুই আমার নাগালে সত্যিই আছিস কি না, এবং যদি থাকিস, এ-চিঠি পাওয়ার পর আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবি কি না, তবু লিখতে হচ্ছে। কিন্তু তুই তো জানিস, চিঠি লেখার অভ্যেস আমার কোনওদিনই নেই, সেইসঙ্গে বর্তমানে নিজের মানসিক অবস্থাও আয়ত্তাধীন নয়—তাই লেখার ভাষাটা একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস কর, একবিন্দু বানিয়ে কোনও কথা আমি লিখছি না এবং গত এক সপ্তাহে কেন, বলতে পারি গত এক বছরের মধ্যে সামান্য মাত্র অসুখ অথবা বিভ্রম আমার হয়নি। আর তুই তো জানিসই, ধরমদাস সুগার মিলের আমি একজন সুদক্ষ সুপারভাইজার—সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত আমার কাজ। মালিক থেকে শুরু করে সামান্য বেয়ারা পর্যন্ত কেউ কোনওদিন আমার ভুল বের করতে

পারেনি। আর নেশা-ভাং দূরে থাক, সারাদিনের মধ্যে একটা সিগারেট কিংবা এককাপ চা পর্যন্ত আমি ছুঁই না।

তবু আমার জীবনে ঘটনাটা ঘটেছে। তারপর থেকেই আর নিজের সম্পর্কে আস্থা নেই আমার। এক দুঃসহ ভীতি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোথায় কে জানে। আপাতত টেন থেমেছে আসানসোল স্টেশনে। হঠাৎ মনে পড়ল তোর কথা।

অন্তত একজনকেও আমার এই অদ্ভুত জীবন-ঘটনাটা জানানো দরকার। একটা পেনসিল আর কাগজ জোগাড় করে লিখতে বসে গেছি। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে আমি শুধু সেইটুকুই বলতে পারি, বাকিটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোর ওপর। ঘটনার সময় গতকাল বিকেলবেলা।

অন্যান্য দিনের থেকে একটু আগেই ফ্যাক্টরি থেকে ফিরছিলাম। তখন সবেমাত্র সন্ধের ঘোর নামতে শুরু করেছে। ক'দিন যাবৎ মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছিল। শীলপাড়া স্ট্যান্ডে বাস থেকে নামতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। একটা মুদিখানার চালার নীচে দাঁড়ালাম। সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি—সঙ্গে শিলাপাত! এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল। বৃষ্টিটা একসময় থামতে বাড়ির পথে হাঁটলাম। তুই তো জানিস, বাসস্ট্যান্ড থেকে আমার বাড়িটা বেশ কিছুটা ভেতরে—অন্তত দশ মিনিট হাঁটাপথ। বোসেদের পুকুর, তারপর একটা মাঠ, সেটা পার হলে আমার একতলা পাকা বাড়ি। পুকুরটার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড় এল। এমন দুরন্ত ঘূর্ণিঝড় আমি জীবনে কখনও দেখিনি। শোঁ-শোঁ বাতাসের বেগ, সেইসঙ্গে ধুলো। চোখদুটো যেন অন্ধ হয়ে গেল। আশপাশে দাঁড়াবার কোনও জায়গা নেই। এই সময়ে বাতাসের মধ্যে ছুটতেও ভয় হল। যদি টিন জাতীয় কিছু উড়ে এসে আঘাত করে। তাই চোখদুটো দু-হাতে চেপে ধরে পুকুরের ধারে মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঝড় চলল প্রায় আধঘণ্টা। প্রতি মুহূর্তেই বাতাসের ভয়ঙ্কর গর্জনে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তারপর ঝড়টা একসময় থেমে গেল। প্রকৃতি শান্ত। মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে সন্ধের ছায়া নামতে শুরু করেছে। সারা শরীরের ধুলো ঝেড়ে হাঁটতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে। পশ্চিম আকাশে এক আশ্চর্য রামধনু! এমন সুন্দর এবং অদ্ভুত রামধনু আজ পর্যন্ত কখনও আমি চোখে দেখিনি। আকাশটাও বেশ ঝলমল করছে। একটু আগে আকাশে যে-মেঘ জমেছিল, ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি মাঠটায় পা দিলাম। আশ্চর্য! মাঠটা খটখটে শুকনো! আজ সকালেও অফিস যাওয়ার পথে মাঠটা কাদায় ভরতি ছিল। সারাদিন মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি হয়েছে। তাহলে মাঠের কাদা শুকোল কখন? মাঠের ঘাসগুলোও কি কেউ বেলাবেলি এসে কেটে নিয়ে গেল নাকি? মাঠটাও যেন বড় বেশি ন্যাড়া-ন্যাড়া মনে হচ্ছে।

অন্ধকার ক্রমেই ঘন হতে শুরু করেছে। একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও। পরিবেশটা আজ যেন বড় বেশি থমথমে। পথের আলোগুলোও জ্বলেনি। হয়তো বা লোডশেডিং। আচ্ছা, মাঠের পুব কোণে ওই সাদা রঙের তিনতলা বাড়িটা তো আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তা আর আশ্চর্য কী—সাতসকালেই কারখানায় ছুটি, বাড়ি ফিরি রাত্রে—নিজের বাড়িটাকেই যে এখনও চিনে রাখতে পেরেছি—এটাই আশ্চর্য।

কিন্তু সত্যিই কি নিজের বাড়িটাকেও ভালো করে মনে রাখতে পেরেছি? এই তো, বাড়ির কাছাকাছিই এসে পড়েছি। কিন্তু বাড়িটা অমন পুরোনো, জীর্ণ মনে হচ্ছে কেন? মাত্র দু-বছর হল এ-পাড়ায় জমি কিনে বাড়ি তুলেছি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি...বাড়িটার দরজার পাশে একটা অশ্বত্থের চারা...কয়েক জায়গার সিমেন্ট খসে পড়েছে...আসলে সবকিছুতেই ভেজাল। আমার বাড়ির মালমশলাও যে খাঁটি ছিল, তা-ই বা ভাবি কী করে? নিজের মূর্খামিকে নিজেই কিছুটা অভিসম্পাত করি। এবার থেকে কারখানা আর ওভারটাইম ছাড়াও অন্য সব ব্যাপারেও কিছুটা নজর দিতে হবে। হঠাৎ একদিন কারখানা-ফেরত নিজের বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট গুলিয়ে ফেলছি—লোকে শুনলে আমায় পাগল ছাড়া আর কী ভাবতে পারে?

খট...খট...খট!

বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লাম। এঃ, দরজাটা একেবারেই ভেঙে পড়ার অবস্থা, অথচ, আজ পর্যন্ত কখনও খেয়াল হয়নি।

ক্যাঁ-চ...দরজাটা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ে। ভারী মিষ্টি, ঢলঢলে মুখখানা, দু-চোখে যেন কালো সাগরের ঢেউ। কে মেয়েটি? কোনওদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। আমার লতায়-পাতায় জড়ানো কোনও চঞ্চলা শ্যালিকা নয় তো!

কাকে চাই?

চমক ভাঙল। মুখে হাসি টেনে বললাম, তুমি কে আগে শুনি?

মেয়েটির ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হল। আমার কথায় স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, আপনি কি বাপির কাছে এসেছেন?

আমার এবার সত্যিই হাসি পেল। নিজের বাড়িতে ঢোকার জন্যে এমন কৈফিয়ত কেউ কোনওদিন দিয়েছে! ততক্ষণে মেয়েটি ভেতরে চলে গেছে। দরজার একটা পাল্লা খোলা। সামনের ছোট্ট উঠোনটা কেমন যেন পিছল আর ক্ষয়া-ক্ষয়া মনে হল। অথচ উঠোনের সিমেন্টিং মাত্র মাসকয়েক আগে করেছি আমি। মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। একমাথা টাক, থলথলে চেহারা, খালি গা, পরনে লুঙ্গি। লোকটির মুখটা আমার খুব চেনা-চেনা লাগছে, অথচ কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। দেখলাম, ভদ্রলোকও কিছুটা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকই বা কে? বাড়িতে তো আমার স্ত্রী বিমলা আর পাঁচ বছরের ছেলে অজু ছাড়া অন্য কেউ থাকার কথা নয়। তবে কি বিমলারই কোনও আত্মীয়-পরিজন?

ভদ্রলোক বললেন, কাকে খুঁজছেন আপনি?

এবার রাগ হল। সারাদিন কারখানায় ডিউটি করে ক্লান্ত। ফেরার পথে ওই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তার ওপর নিজের বাড়ি ঢোকার সময় এইসব ঝামেলা! বললাম, আমি এ-বাড়ির মালিক। আপনি কে চিনলাম না।

ভদ্রলোক আমার কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন মনে হল। চোখদুটো গোল-গোল করে বললেন, কী বলছেন আপনি! নিশ্চয়ই বাড়ি ভুল করেছেন। এটা ১৯এ, সুবর্ণপল্লী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। এবার কিছুটা বিরক্তভাবেই বলি, আপনাকে বোঝাতে হবে না। এ-বাড়ি আমারই তৈরি। মাত্র দু-বছর হল...।

ভুল করছেন।—ভদ্রলোক আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ-বাড়ি অন্তত চল্লিশ বছরের পুরোনো। বাড়ির অবস্থা দেখছেন না?

আমি কিছুক্ষণ হাঁ করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপর বাড়ির দিকে তাকাই। তাই তো, এ-বাড়ি মাত্র দু-বছর হল তৈরি হয়েছে, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে! কিন্তু...।

ভদ্রলোক এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে দেখছেন।

কিন্তু সত্যিই কে পাগল—ওই লোকটা না আমি?

মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠল। বললাম, ঘরে বিমলা আছে? তাকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক প্রথমে চমকে উঠলেন। তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রী বিমলা।—ক্লান্তকণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলাম।

ঠিক এইসময়ে ভেতর থেকে ডাক এল, অজু, একবার শুনে যা তো।

মহিলার কণ্ঠটি বড় চেনা-চেনা। যদিও জরাগ্রস্ত কাঁপা গলা।

যাই মা! আপনি দাঁড়ান।—ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তকে একঝলক দৃষ্টি হেনে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু এ কী শুনলাম! অজু আমার ছেলের নাম—আজ সকালেও যে পাঁচ বছরের ছেলেকে ঘরে রেখে আদর করে অফিস বেরিয়েছি।

এসব কী ঘটছে আজ চোখের সামনে! আমি জেগে আছি তো? নিজের হাতেই চিমটি কাটলাম এই তো, ব্যথা পাচ্ছি।

দরজাটা খোলা। সামনে ফাঁকা উঠোন। এই সুযোগ। ভেতরে ঢুকে দেখতেই হবে কী এর রহস্য। বিমলা কি কোনওভাবে রসিকতা করছে? কিন্তু রসিকতায় কি দু-বছরের নতুন বাড়িকে চল্লিশ বছরের পুরোনো ভগ্নপ্রায় করে ফেলা যায়?

বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম। উঠোন পেরিয়ে বাঁ-দিকের ঘরটাই আমার। চারিদিকে চুন-বালি খসে পড়েছে, দৈন্যদশার চূড়ান্ত!

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

এ কি সত্যিই আমার ঘর! আসবাবপত্তর অনেকগুলোই নেই। কয়েকটি নতুন আসবাব রয়েছে দেখলাম। আমার যে-জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলোও রাতারাতি জীর্ণ, বর্ণহীন হয়ে গেছে। গত বছর পুজোর সময় বিমলা আর অজুকে নিয়ে স্টুডিয়োতে যে-ফটোটা তুলেছিলাম, সেটা দেওয়ালের একই জায়গায় রয়েছে। কিন্তু বিশ্রী হয়ে গেছে ফটোর ফ্রেম আর রং। কাচটাও ঝাপসা। মাঝখানে কাচে এক জায়গায় চিড় ধরে গেছে। যেন সেই কোন আদ্যিকালে তোলা।

কিন্তু এসব ব্যাপার কী করে ঘটতে পারে? এ যেন বহুকাল বাদে নিজের বাড়িতে এসে ঢোকা। কথাটা ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটু আগে ভদ্রলোকের সেই কথাটা—এ-বাড়ি নাকি চল্লিশ বছর আগে তৈরি। কথাটা তখন আমার কাছে নেহাতই দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তা মস্তিষ্কের কোষে-কোষে প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। তাহলে কি আমি আর বর্তমানে নেই? এটা আমার চল্লিশ বছরের ভবিষ্যৎ! ম্যাজিকের মতো বর্তমানটা উবে গিয়ে হঠাৎ চল্লিশ বছরের আগামী ভবিষ্যতের মধ্যে ঢুকে পড়েছি! কিন্তু কই, আমার তো কোনও শারীরিক পরিবর্তন হয়নি! এই তো, মাথার চুল কুচকুচে কালো, দাঁত নড়েনি, এমনকী ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার সময়ে যে-নীল শার্ট-প্যান্টটা পরেছিলাম, এখনও তা আমার পরনে। ব্যাপারটা কি নিছকই ভৌতিক? নাঃ, সেসব কোনও লক্ষণের সঙ্গে তো মিলছে না! হঠাৎ একটা শব্দ মনের মধ্যে ভেসে এল—টাইম ডায়লেশান। সময়-লম্ফন। কথাটা কার মুখ থেকে যেন শুনেছিলাম। সময়-ঝড় নাকি প্রকৃতিতে কখনও-কখনও ঘটে। মানুষকে সে ছিটকে ফেলে দেয়—অতীত বা ভবিষ্যতের কোনও মুহূর্তে। বিজ্ঞান আজও যার হদিশ পায়নি। কিন্তু টাইম ওয়ার্প বা সময়-বাঁক আশ্চর্য হলেও নাকি আজগুবি নয়। পৃথিবীর অনেকগুলো অনাবিষ্কৃত রহস্যের এটিও একটি।

ভাবতে-ভাবতে শরীরটা আমার কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ব্যাপার যদি আমার জীবনে সত্য হয়, তবে এ-বাড়ির বাসিন্দাদের আমি চিনেছি। হৃষ্টপুষ্ট চেহারার বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের যে টাক-মাথা, লুঙ্গিপরা মানুষটার সঙ্গে কথা বললাম, ও আমার ছেলে অজু...হ্যাঁ, সেই নামেই তো ভেতর থেকে ডাকল...যাকে আজ সকালেও কোলে তুলে আদর করে ফ্যাক্টরিতে বেরিয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার বয়স তো বাড়েনি! তার মানে, আমার ছেলে আমার থেকে এখন প্রায় পনেরো বছরের বড়। আমার স্ত্রী বিমলা—এই হিসেবে তারও বয়স হওয়া উচিত প্রায় পঁয়ষট্টি।

মাথার মধ্যে কতকগুলো নাগরদোলা বনবন করে ঘুরে চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর-একটা কথা। ডায়েরি লেখা আমার প্রতিদিনের অভ্যেস। গতকাল রাতেও লিখেছি। ওটা থাকে আমার টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে। টেবিলটা এখনও রয়েছে। ড্রয়ারটা খুললাম। ওই তো ডায়েরিটা। কী ভীষণ পুরোনো আর জরাজীর্ণ দেখাচ্ছে! মলাটের রংটাও মলিন হয়ে গেছে। ভেতরের কাগজগুলো লালচে, আলগা হয়ে যাওয়া। কিন্তু ডায়েরির সালটা পড়া যাচ্ছে—১৯৭৮। দ্রুত ডায়েরির পাতাগুলো উলটে চললাম। এই তো ৫ জুলাই। আমার প্রতিটি কথা লেখা রয়েছে এবং সে-কথাগুলো না পড়েও আমি মুখস্থ বলে দিতে পারি—কারণ, এগুলি আমি লিখেছি মাত্র গতকালই। কিন্তু তারপর থেকেই ডায়েরির সব পাতা ফাঁকা, একটা অক্ষরও লেখা নেই কোথাও—অর্থাৎ, ৫ জুলাই ১৯৭৮-এর পর থেকে এ-ডায়েরিতে আর কিছু লেখা হয়নি।

পেছনে পায়ের আওয়াজে চকিতে ডায়েরিটা নিজের পকেটে লুকিয়ে ফেলে মুখ তুললাম। সেই ভদ্রলোক—যাকে আমি নিজের ছেলে ভাবার পাগলামিকে মনে স্থান দিতে পারি কি না জানি না—ঘরে ঢুকছেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আপনার মতলবটা কী বলতে পারেন? বাড়ির সামনে আপনাকে দাঁড়াতে বললাম, আর আপনি চেনা নেই, শোনা নেই, একেবারে ঘরে ঢুকে ড্রয়ার ঘাঁটতে শুরু করেছেন। জানেন, আপনাকে পুলিশে দিতে পারি।

হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার। অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো আমার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে যেন শিথিল করে দিচ্ছে। আমি কি সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেছি!

বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।—সেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, হাবভাবে আপনাকে যদি পাগল বলে না চিনতাম, এতক্ষণে পিটিয়ে ছাতু করে তারপর পুলিশের হাতে তুলে দিতাম।

হ্যাঁ, কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, আমি হঠাৎ পাগলই হয়ে গেছি। মাথা নিচু করে পায়ে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ এক নারীকণ্ঠ শুনলাম একটু দাঁড়ান।

মাথা তুলে দেখলাম, সামনে এক বৃদ্ধা রমণী। বয়স ষাটের ওপর তো বটেই। মাথার সমস্ত চুল সাদা, শরীরের চামড়া কুঁচকে ঝুলে গেছে, পরনে বিধবার সাদা থান। আমি রমণীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম—ওই চোখ-মুখের গড়ন আমার খুব পরিচিত।

বৃদ্ধাও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন অপলক দৃষ্টিতে। কী যেন দেখছেন আমার মধ্যে। আমরা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলাম আমি কি বিমলার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

আমি স্পষ্ট দেখলাম, বৃদ্ধা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলেন। প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আপনি কে?

আমি তারাপদ।

হঠাৎ সেই বৃদ্ধা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝেতে। তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন।

সেই ভদ্রলোক এবার আমার সামনে এসে চিৎকার করে উঠলেন, আপনি কি সত্যিই পাগল, না বদমাইশ? কী চান আপনি?

আমি প্রাণপণে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বললাম, আমি তারাপদ সাহা—এ-বাড়ির মালিক—তোমরা বিশ্বাস করো।

ভদ্রলোক ধরেই নিয়েছেন আমি একটি আস্ত পাগল, তবু আমার কথার জবাব দিয়ে বললেন, এ-বাড়ির আদি মালিক তারাপদ সাহা আমার বাবা, আর যিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন, উনি আমার মা। আমার বাবা মারা গেছেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে—যখন আমার বয়েস মাত্র পাঁচ বছর।

মারা গেছে! তারাপদ সাহা মারা গেছে চল্লিশ বছর আগে! আর ওরা তারাপদ সাহার ছেলে-বউ। তাহলে আমি কে? তারাপদ সাহা?....না, না—যার ছেলের বয়স পঁয়তাল্লিশ আর স্ত্রী পঁয়ষট্টি—সে কী করে বন্দি থাকতে পারে তিরিশ বছর বয়েসে...মিথ্যে—সব মিথ্যে।...কিন্তু তাহলে সত্য কোনটা—আমি, না এরা...পাগল হয়ে গেছি...হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি....হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—।

দমকা হাসিতে শরীরটা আমার থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সামনে অন্ধকার মাঠ। পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা। একটুও আলো নেই কোথাও...আমি দিগ্বিদিকহারা হয়ে ছুটে চললাম।

ভূতের মতো কে যেন আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আমি পালাচ্ছি এক নিদারুণ আতঙ্কে—কিন্তু কোথায়, কত দূরে জানি না।

পুকুরটা পেরিয়ে আসতেই সেই প্রচণ্ড ঝড়টা আবার ঘুরে এল। পথের একটা ইটে হোঁচট খেয়ে সশব্দে উপুড় হয়ে পড়লাম। তারপর সব অন্ধকার।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জানি না...যখন জ্ঞান ফিরল তখন চারদিকে ফুটফুটে আলো। ভোর হয়েছে।

মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ভার। প্রথমটা কিছু মনে পড়ল না। তারপর ধীরে-ধীরে মস্তিষ্কের মধ্যেকার ধোঁয়ার কুণ্ডলী পরিষ্কার হতে শুরু করল। গত রাতের সমস্ত কথাগুলোই মনে পড়ল একে-একে। সবটাই কি স্বপ্ন? ওই তো শীলপাড়ার রাস্তা চলে গেছে। মানুষ চলাচলও শুরু হয়েছে। একটা চেনা সাইকেল রিকশা সিটের ওপর কয়েকটা সবজির বস্তা নিয়ে হাটের দিকে চলে গেল। তাহলে বোধহয় স্বপ্নই দেখেছি। কিংবা গত কয়েকদিনের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীরটা খারাপ হয়েছিল। অসুস্থ শরীরে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই টেনে বের করলাম সেই ডায়েরিটা—যার সাল ১৯৭৮, কিন্তু দেখে মনে হয় কোন আদ্যিকালের পুরোনো। পাতা উলটোলাম—ঠিকই তো, ৫ জুলাইয়ের পর আর একটা পাতাতেও কিছু লেখা নেই...হঠাৎ আবার গত রাতের সেই ভয়টা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে বলল, তারাপদ, পালাও...পালিয়ে যাও...এ স্বপ্ন নয়!

কিন্তু চোখের সামনে তো এখন সবই স্বাভাবিক। মানুষজন, রিকশা, পথ...আর-একবার আমি আমার ঘরে ফিরে যেতে পারি না?

না! কে যেন ধমকে উঠল বুকের মধ্যে। চেতনাটা আবার অবশ হয়ে আসছিল। ভেতর থেকে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

তারপর কখন কীভাবে ট্রেনে উঠে পড়েছি জানি না। কেন এই ট্রেনে উঠেছি, তাও বলতে পারব না। আসানসোল স্টেশনে ট্রেন এসে থামতে যেন ঘোর ভাঙল। মনে পড়ল তোর কথা। একটা পেনসিল আর কয়েক টুকরো কাগজ জোগাড় করে তোকে লিখতে বসেছি আমার এই আশ্চর্য জীবন-রহস্য। এর কোনও হদিশ আমার জানা নেই। তুই একে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিলেও বোধহয় খুব একটা দোষের হবে না। কিন্তু আমি যে তাও পারছি না, সন্তোষ! অথচ আমার সামনে আজকের স্বাভাবিক পৃথিবী। সামান্যতম ব্যতিক্রমও নেই কোথাও। স্টেশনের ক্যালেন্ডারে তারিখ দেখেছি। আজ ৭ জুলাই, ১৯৭৮—তবু শীলপাড়ায় সুবর্ণপল্লীতে আমার নিজের বাড়ির কথা ভাবলেই মনটা আমার শিউরে উঠছে—আমার পঁচিশ বছরের যুবতী স্ত্রীকে একটা বেলা কাটতেই আমি পঁয়ষট্টি বছরের বিধবা বুড়ির রূপে দেখেছি। পাঁচ বছরের ছেলেকে দেখেছি পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় হিসেবে...এই অত্যাশ্চর্য গাঁজাখুরি যত হাস্যকরই হোক, আমি যে ভুলতে পারছি না!

হায়! এখন কী করব আমি!

৭ই জুলাই, ১৯৭৮

ইতি—তোর তারাপদ

চিঠিটা পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসেছিলাম। এমন আশ্চর্য চিঠি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ পেয়েছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমার মনে হল, এ-চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন এক-একটা ঘুণপোকা হয়ে আমার সমস্ত শরীর আর মনে দাঁত বসাতে শুরু করেছে।

সেইদিনই ছুটলাম তারাপদর বাড়ির দিকে।

বাস থেকে যখন শীলপাড়ায় নামলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পুব আকাশে আবির রঙের ছড়াছড়ি। সুবর্ণপল্লীর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে অজান্তেই বুকের ভেতরটা ছমছম করে উঠল। তারাপদর বাড়িতে কী দেখব কে জানে! সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ধমকে উঠলাম, বিংশ শতাব্দীতে এসব গাঁজাখুরি বিশ্বাস কোনও সভ্য মানুষ করতে পারে না। মন থেকে অশুভ চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। ওই তো সামনে বোসেদের পুকুর। সেটার পাশ দিয়ে গেলেই একটা খোলা মাঠ। কই, কোনওদিকেই তো কোনও সাদা রঙের তিনতলা বাড়ি চোখে পড়ছে না!

মাঠটা পার হতেই সামনে তারাপদর বাড়ি। মাত্র দু-বছর আগে তৈরি করেছে তারাপদ। তারপর কতবার এসেছি এ-বাড়িতে। নতুন বাড়িটা এখনও ঝকঝক করছে। কই, কোনওরকম জীর্ণ দশা তো চোখে পড়ছে না!

কড়া নাড়তেই বাড়ির দরজাটা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে তারাপদর স্ত্রী বিমলা। আগেও যেমন দেখেছি—বছর পঁচিশ বয়সের এক মধ্যবিত্ত ঘরের বউ। মাথায় ছোঁয়ানো ঘোমটা। নতুনত্বের মধ্যে চেহারাটা খুব শুকনো আর দু-চোখের কোণে কালি দেখলাম।

সন্তোষ ঠাকুরপো!

আমায় দেখে বিমলা পথ ছেড়ে দিল। আমি ভেতরে ঢুকলাম।

তারাপদ বাড়ি ফিরেছে?

কথাটা জিগ্যেস করার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম, বিমলার মুখটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে। আর্দ্র গলায় বিমলা বলল, দু-দিন হয়ে গেল, সন্তোষ ঠাকুরপো, উনি বাড়ি ফেরেননি।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, তার মানে?

ছ তারিখ সকালবেলা অন্যদিনের মতোই ফ্যাক্টরিতে বেরিয়েছেন, তারপর আর খবর নেই। আজ ন' তারিখ।

খোঁজখবর করেছিলেন?

বাড়িতে আমার পাঁচ বছরের অজু ছাড়া আর কেউ নেই। তবু দাদাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। দাদা থানা, হাসপাতাল, সব জায়গায় খোঁজ করেছে, কিন্তু ওঁর কোনও খবর পায়নি। তুমি কি কোনও খবর পেয়েছ, সন্তোষ ঠাকুরপো?

বিমলার এ-প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি? যা জানি, তা বললে সে-কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কখন একসময় যেন পাঁচ বছরের ছেলে অজু এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের আঁচল ধরে।

আমার বুকটা হঠাৎ কনকন করে উঠল।

বাইরের দরজায় আবার কড়া নড়ে উঠল। এবার আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম।

খাকি পোশাক পরা দুজন পুলিশের লোক।

আমরা লোকাল থানা থেকে আসছি। আমি সাব-ইন্সপেক্টর লাহিড়ী। এটা কি ১৯এ, সুবর্ণপল্লী, তারাপদ সাহার বাড়ি?

হ্যাঁ, কী খবর আছে, আমায় বলতে পারেন।

ইতিমধ্যে দেখলাম, অজুকে সঙ্গে নিয়ে বিমলাও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা অত্যন্ত দুঃখের খবর আছে—, একটু ইতস্তত করে সাব-ইন্সপেক্টর লাহিড়ী বললেন, গতকাল রাত প্রায় দশটা নাগাদ আসানসোল থেকে আরও দূরে রূপনারায়ণপুর স্টেশনের কাছে একটা ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। প্রায় দুশো লোক মারা গেছে এবং প্রচুর হতাহত হয়েছে। মাত্র কিছু লোককে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে আছেন কলকাতার ১৯এ, সুবর্ণপল্লী নিবাসী শ্রীতারাপদ সাহা।

না, না, এ হতে পারে না—!

ডুকরে কেঁদে উঠল বিমলা—অজুকে আঁকড়ে ধরে ওর কী ফুঁপিয়ে কান্না!

আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সাব-ইন্সপেক্টর লাহিড়ী বললেন, খবরটা দিতে আমার খুব খারাপ লাগছে, অথচ...।

তারাপদর সঙ্গে কিছু ছিল না?—একসময় প্রশ্নটা করি।

বিশেষ কিছু না। পকেটে রুমাল, চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা...আর এই ডায়েরিটা।

বলতে-বলতে সাব-ইন্সপেক্টর লাহিড়ী একটা ডায়েরি আমার হাতে তুলে দিলেন।

ছোঁ মেরে তুলে নিলাম ডায়েরিটা। প্রতিটি পাতা উলটেপালটে দেখতে লাগলাম। হ্যাঁ, এটাই তো—এ-বছরের শুরুতে তারাপদকে আমি উপহার দিয়েছিলাম। নিয়মিত ডায়েরি লেখা ওর বহুদিনের অভ্যেস।

কিন্তু ডায়েরিটা এত পুরোনো জীর্ণ তো হওয়ার কথা নয়, যেন বহুকাল আগের ব্যবহৃত কোনও জিনিস। ভেতরের পাতাগুলোও লালচে হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ডায়েরিটা সম্পর্কে তারাপদর চিঠির অংশগুলো। চটপট পাতা উলটে চললাম...সত্যিই তো, ডায়েরির শেষ লেখা ৫ জুলাই, ১৯৭৮। তারপর সব ফাঁকা।

সাব-ইন্সপেক্টর কত কিছু বলে চলেছেন, ভেতর থেকে বিমলার কান্না ভেসে আসছে। কিন্তু আমি এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত অনুভূতি আর দৃষ্টি গ্রাস করে রয়েছে তারাপদর ওই আশ্চর্য ডায়েরি, যা সে চল্লিশ বছর ভবিষ্যৎ থেকে আহরণ করে এনেছে।

কিন্তু এসব ঘটনার আসল কারণ যে ৬ জুলাই সন্ধেবেলায় তারাপদ সাহার আকস্মিক উন্মত্ততা, তা কি কেউ বলবে? তখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়, তারাপদ বাড়ি না ফিরলেও ঘরের ড্রয়ার থেকে ডায়েরিটা মৃত্যুকালে তার পকেটে গেল কীভাবে, আর ডায়েরিটা যে রাতারাতি অমন বিশ্রী মলিন হয়ে গেল, তারই বা কারণ কী? জানি না, এর কী উত্তর আছে।

হয়তো সত্যিকারের উত্তর পাওয়া যাবে আজ থেকে চল্লিশ বছর পরে। এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় যখন ১৯এ, সুবর্ণপল্লীর জীর্ণ বাড়ির ভগ্ন দরজার কড়াটা হঠাৎ নড়ে উঠবে—খট...খট...খট!!

মাসিক রোমাঞ্চ

জুন-জুলাই, ১৯৭৯



ছায়াসঙ্গিনী

প্রণব রায়

প্রণব রায়ের এই গল্পটির একটু ইতিহাস আছে। মৃত্যুর মাস-পাঁচেক আগে, উনিশশো পঁচাত্তরের মার্চে, একদিন সকালে একটি নতুন টেপরেকর্ডার মেশিন নিয়ে হাজির হই তাঁর সামনে। অনুরোধ জানাই, 'আপনার গলা টেপ করব—একটা কিছু বলুন।'

সেদিনই রেকর্ডিং হবে, এমন একখানি গান রচনায় তিনি তখন খুবই ব্যস্ত। তবু কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলে তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হেসে কৌতুকের সুরে বললেন, 'আজ্ঞা করুন, কী বলতে হবে?'

বললাম, 'একটা গল্প।'

আশ্চর্য হলেন তিনি 'গল্প! সে যে অনেক সময় নেবে, বাবা। গান বলো, কবিতা বলো, দু-চার লাইন চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু গল্প তো ভাবতে হবে, সাজাতে হবে—।'

'সে-সময় আপনাকে আমি দেব না।' হাতঘড়িতে তাকিয়ে বললাম, 'এখন দশটা তিন। আমি চাই দশটা পনেরোর মধ্যে টেপ শেষ করে চলে যেতে। নীচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি—।'

ঠোঁটের কোণে একটু হেসে মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'নে, মেশিন চালু কর।'

মেশিন চালু হল। সেইসঙ্গে শুরু হল তাঁর গল্প বলাও। ঠিক যেন বই দেখে পড়ে যাচ্ছেন, এমনিভাবে গড়গড় করে তিনি চার মিনিট সাতাশ সেকেন্ডে শেষ করলেন তাঁর গল্প। গল্পাংশের জন্যে নয়, রচনাটি তাঁর বলার ভঙ্গি এবং সাবলীলতার জন্যে আমাদের কাছে একটি স্মরণীয় সম্পদ। বর্তমান সংখ্যায় টেপ-মেশিন থেকে আমরা হুবহু সেই রচনাটির অনুলিখন মুদ্রিত করলাম।

সম্পাদক, মাসিক রোমাঞ্চ

ছুটতে-ছুটতে ট্রেনখানার দম ফুরিয়ে গেল হঠাৎ।

জানলা দিয়ে দেখলাম, কোনও স্টেশন নয়, একটা আঘাটায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। উঁচু-নিচু জংলা মাঠ, ঝোপঝাড়, খানিক দূরে জঙ্গল। একসময়ে এ-লাইনে আসা-যাওয়া ছিল তাই চিনতে পারলাম। জায়গাটার নাম শিয়ালমারি মাঠ। এর একদিকে কাঁকনদীঘি গ্রাম, অন্য দিকে নয়নপুর।

ট্রেন থামল তো থামলই। গার্ডসাহেবের কাছে জানা গেল, লাইন ক্লিয়ার নেই। কখন ক্লিয়ার হবে, তারও ঠিক নেই। অতএব ঘুমের চেষ্টা করাই ভালো। আমার কামরায় আমি একা। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

বাইরে শিয়ালমারি মাঠ নির্জন। চৈত্রের রাত নিথর নিঝুম।

তন্দ্রা আসব-আসব, এমনসময় খুট করে একটা শব্দ। চোখ খুলে দেখি, দরজা খুলে কামরায় উঠে আসছে—না, স্টেনগানধারী কোনও ছোকরা-ডাকাত নয়, অল্পবয়েসি একটি গ্রাম্য মেয়ে। জীবনে যাকে আর কখনও দেখতে পাব বলে স্বপ্নেও ভাবিনি।

মেয়েটি বললে, দেখছ কী? চিনতে পারছ না বুঝি?

আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, ঝুনু তুই!

যাক, তবু ভালো যে চিনতে পেরেছ!—খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুনু।

স্মৃতি যেন হাজার বাতির ঝাড়। এক নিমেষে অন্ধকার অতীতকে আলোকিত করে। কাঁকনদীঘি গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। প্রত্যেক বছর সেখানে যেতাম। সেখানে আমার সঙ্গিনী ছিল পড়শিদের মেয়ে ঝুনু। সঙ্গিনী না বলে ছায়াসঙ্গিনী বলাই ভালো। সবসময় ঝুনু আমার পাশে-পাশে।

দুজনে একইসঙ্গে যৌবনে পা দিলাম, ভালোও বাসলাম। কিন্তু ওই পর্যন্ত! নাটক এগোল না, যবনিকা পড়ে গেল। সে-বছর মামার বাড়ি গিয়ে শুনলাম, অন্য পাত্রে ঝুনুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের রাত্রেই ঝুনু নিখোঁজ।

সে আজ এগারো বছর আগের কথা।

অবাক হয়ে বললাম, শুনেছিলাম, মাতলা নদীতে তুই নাকি ডুবে মরেছিস!

মুচকি হেসে ঝুনু বললে, তোমায় ছেড়ে মরেও কি শান্তি আছে আমার? নাও, ওঠো—চলো—।

কোথায়?

আমার ঘরে, আমার কাছে।

বললাম, না। এগারো বছর আগে যা সম্ভব ছিল, আজ আর তা হয় না, ঝুনু।

কেন হয় না, অরুণদা?—আশ্চর্য মধুর গলায় ঝুনু বলতে লাগল, তুমিও সেই অরুণ, আমিও সেই ঝুনু! এগারো বছর অপেক্ষা করছি। আমার বুক-ভরা অপূর্ণ সাধ আজ তুমি মিটিয়ে দাও। চলো আমার ঘরে—বলো যাবে?

ঝুনুর চোখে চোখ রেখে এক অদ্ভুত মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হল, এ-মেয়ের হাত ধরে আজও চলে যাওয়া যায় স্বর্গ থেকে নরক অবধি। বললাম, যাব ঝুনু—যাব তোর সঙ্গে। বল, কোথায় তোর ঘর?

ওই জঙ্গলটার ঠিক পেছনে। এসো না, এসো।—খিলখিল করে হাসতে-হাসতে ঝুনু দরজা খুলে নেমে গেল।

কিন্তু তার জবাব শুনে হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল, শিয়ালমারি মাঠের ওই জঙ্গলের পেছনে কোনও বসতি নেই, রয়েছে প্রকাণ্ড একটা শ্মশান! শ্মশানের কোলে মাতলা নদী।

বাইরে থেকে ঝুনুর ডাক শোনা গেল, এসো, অরুণদা, নেমে এসো—।

আবার সেই অদ্ভুত মোহ আমায় পেয়ে বসল। একটা দুর্বার আকর্ষণ আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল দরজা অবধি।

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল কামরার সব ক'টা বাতি। দূরে কোথায় কেঁদে উঠল একটা কুকুর। নামবার জন্যে আমি পাদানিতে পা রাখলাম, আর সেই মুহূর্তে—ঠিক সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল কামরাটা। চলছে—ট্রেন আবার চলছে!

নামা আর হল না। শিয়ালমারি মাঠে দাঁড়িয়ে ঝুনু তখনও ডাকছে, এসো—এসো—আমার কাছে এসো—।

কিন্তু মরা চাঁদের আলোয় কাকে দেখলাম আমি? সে কি ঝুনুর মুখ? না একটা কঙ্কালের মুখ?

ভালো করে দেখার আগেই আমাকে নিয়ে ট্রেন চলে গেল অনেকটা দূরে।



ছায়ার সঙ্গে

শেখর বসু

ট্রেনের বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কুপের দরজা লক করে দিলাম। নীচের বার্থে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু। ওপরের বার্থে আমি শোব। শোওয়ার কথা ভাবতেই রাজ্যের ক্লান্তি ভেঙে পড়ল সারা শরীরে।

কাল সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ডাক্তার বলেছিল, জেগে থাকবেন, সেবা-শুশ্রূষা করা দরকার। কিন্তু ওকে সেবা-শুশ্রূষা না বলে, পাহারাদারিই বলা উচিত। বিকারের ঘোরে নবেন্দু তিন-চারবার দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। কোনওরকমে আটকেছিলাম। শেষকালে ভেতর থেকে তালা দিতে হয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে নবেন্দু কথা বলছিল অনর্গল। কী বলছিল বুঝতে পারিনি, তবে এটা বুঝতে পেরেছিলাম, স্বপ্নে ও ওর খুব ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে গল্প করছিল।

আজ সারা দিনটা ও ভালোই ছিল, তবে আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ডাক্তার বলেছে, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ভয়ের কারণটা কেন দেখা দিয়েছিল? ডাক্তার শুধু এইটুকু বলেছে, কোনও একটা ব্যাপারে ও খুব শকড হয়েছে। কী সেটা!

এখন যা ভাবছি, কালকেও ঠিক তাই ভেবেছি—একবার নয়, অসংখ্যবার। তবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাইনি। অবশ্য দুশ্চিন্তার ভার কমেছে অনেকখানি। নবেন্দু এখন আগের চাইতে ভালো আছে। আর, এই রাতটা কাটলেই আমি দায়মুক্ত হয়ে যাব। সকালবেলায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে ট্রেনটা। তারপর ট্যাক্সি—আধঘণ্টার মধ্যে আমি ওর বাড়ি পৌঁছে যাব।

ঘড়ি দেখলাম। এগারোটা দশ। ট্রেনের মধ্যে এগারোটা দশ কম না বেশি রাত্তির! ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। চলন্ত ট্রেনে রাত বোধহয় আলাদা কোনও নিয়মে বাড়ে। হুড়মুড় করে ট্রেন ছুটছে, জানলার বাইরে চাঁদনি রাতের মাঠ, গাছ আর জঙ্গল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে-দুলতে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু। ওর স্বাভাবিক ঘুমন্ত মুখটা একবার দেখে নিয়ে আমি আপার বার্থে উঠে পড়লাম। বড় আলোটা নিবিয়ে ছোট নীল আলোটা জ্বাললাম, তারপর শুয়ে পড়লাম টানটান হয়ে।

একটানা বসে-বসে কোমর-পিঠে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে। মাথাটা ভার-ভার। সারা শরীর ঠেলে বিরাট-বিরাট দুটো হাই উঠে এল। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার সমস্ত চিহ্ন আমার শরীরে, কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই।

যা-যা ভাবব না বলে একটু আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি, ঠিক সেই-সেই চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত। চিন্তা তাড়াবার জন্যে আমি পাশ ফিরে শুলাম।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, কিন্তু খটখট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল একসময়। আচমকা ঘুম ভাঙার জন্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না প্রথমে। এমনকী, আমি যে বাড়িতে নয়, ট্রেনে ঘুমোচ্ছি—এটা বুঝতেই লেগে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই একসঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কথা। আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। মৃদু নীলচে আলোয় দেখলাম, নবেন্দু হাতড়ে-হাতড়ে কুপের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। শব্দ উঠছে খট-খট-খটাস।

হাত বাড়িয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দিলাম। আলো জ্বলতেই নবেন্দু ঘুরে তাকাল। কিন্তু দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন ঘোর লাগা। আগের রাতেও ওর ঠিক এইরকম চাউনি দেখেছিলাম। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নবেন্দু, নব— !'

নবেন্দু চাইল আমার দিকে, কিন্তু ও আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না।

'বাইরে যাবি? বাথরুম?'

নবেন্দু আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল আগের মতো। চেষ্টার মধ্যে কোনও স্বাভাবিকতা ছিল না—দরজার ওপরের লকটা ও এলোপাতাড়িভাবে টানাটানি করছিল।

কাছে গিয়ে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, 'কী রে!'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে ও চমকে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। দৃষ্টি আগের মতোই আচ্ছন্ন। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙার একটু পরে চোখের সামনে এইরকম ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। আর, সেইজন্যেই বোধহয় ওর দুটো কাঁধ খামচে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বললাম, 'কী রে! কী হল তোর?'

ঝাঁকুনি খেতে-খেতে নবেন্দুর ঘোলাটে মণির ওপর চোখের পাতা নেমে এল—তারপর ওর মাথাটা এলিয়ে পড়ল আস্তে-আস্তে।

আমি ওকে ধরে-ধরে বেঞ্চের ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম। ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুঁকে আছে। ওর হাত আমার হাতের মধ্যে। কী করব এবার!

ট্রেন আগের মতোই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। জানলার বাইরে আগের মতোই দৃশ্য, তবে চাঁদের আলোর রং পালটে গেছে। ঘড়িটা খুলে রেখেছি আপার বার্থে। এখন কত রাত কে জানে! জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে, মাথার ওপর ফুল স্পিডে পাখা খোলা, কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। নবেন্দুর হাতও ভেজা-ভেজা, ও বোধহয় আমার চাইতেও বেশি ঘেমেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকার পরে বললাম, 'নবেন্দু, জল খাবি? জল?'

একই কথা আবার বললাম, তবে এবার বেশ জোরে, আর ওর হাতটা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে। নবেন্দু যেন বহুদূর থেকে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

আমি ওয়াটার বটল থেকে একগ্লাস জল ভরে ওর হাতে দিলাম। নবেন্দু চোঁ-চোঁ করে পুরো গ্লাসের জলটা খেয়ে নিল। ওকে জল খেতে দেখে আমি বেশ আশ্বস্ত হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কফি খাবি?'

নবেন্দু এবার স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

ফ্লাস্ক থেকে দু-কাপ কফি ঢাললাম। এককাপ ওকে দিয়ে আর-এককাপ নিজে নিলাম। শান্ত, গম্ভীর মুখে কাপে কয়েকটা চুমুক দেওয়ার পরে নবেন্দু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। তারপর ও কেমন যেন চমকে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'আরে, তুই! তুই কবে এলি?'

ওর দৃষ্টি দেখে আমার বেশ অস্বস্তি হতে শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বললাম, 'একেই বলে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে...। আরে বাবা, দু-দিন ধরে তোর সেবা-শুশ্রূষা করলাম, তুই আমার সঙ্গে বেশ কয়েকটা কথাও বলেছিস, আর এখন কিনা জিগ্যেস করছিস, তুই কবে এলি!'

কথাগুলো শুনে নবেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল অনেকগুলো! ওর চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, ও পেছনের কথা ভাবছে।

আমি ওকে খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'আমার বাড়িতে তোর অফিসের সেনগুপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—নবেন্দু ভীষণ অসুস্থ, শীগগির চলে আসুন। আমি এসে দেখলাম, তুই জ্বরে পড়েছিস। একটু সুস্থ হতেই ডাক্তারের পরামর্শে তোকে তোর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। এবার মনে পড়েছে?'

মনে হল না, নবেন্দু সব কথা মনে করতে পেরেছে। ও শুধু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'বাড়ি যাচ্ছি? কেন?'

'কেন আবার, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঠিকঠাক করে নিবি। তা ছাড়া, বাড়িতেও তো যাসনি বহুকাল, তা প্রায় বছরতিনেক হবে। একা-একা এভাবে পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকতে ভালো লাগে?'

'একা? একা কোথায়! আমি তো একা থাকি না।' নবেন্দু কেমন যেন অস্বাভাবিক চোখ-মুখ করে প্রতিবাদ করল।

আমি একটা বদ রসিকতা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর চোখ-মুখের চেহারা দেখে সাহস পেলাম না। মিনমিন করে বললাম, 'একা না? তুই কি লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ে করেছিস?'

নবেন্দুর অস্বাভাবিক মুখে হাসির রেখা খেলে গেল 'না, বিয়ে করিনি, তবে ও সবসময় আমার সঙ্গে থাকে, সবসময়। এই তো একটু আগেই ও আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল, বন্ধ জায়গায় ওর থাকতে ভালো লাগে না।'

আমি অবাক হয়ে নবেন্দুর দিকে তাকালাম। ওর প্রত্যেকটি কথাই আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে ঠেকল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে নবেন্দু বলল, 'সিগারেট আছে?'

আমি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। ও একটা সিগারেট ধরাল, আমিও ধরালাম। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নবেন্দু বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দিবি? চোখে লাগছে।'

বড় আলোটা নিবিয়ে দিলাম। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু ওটা থাকা না-থাকা সমান। কাচের ঘেরাটোপটা শুধু নীল হয়ে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো খাপছাড়াভাবে এসে পড়েছে বেঞ্চ আর মেঝের ওপর। ট্রেনের নির্দিষ্ট তালের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও নেই। এখন কত রাত কে জানে!

অস্বস্তিকর রকমের চুপচাপ হয়ে বসে আছি আমরা দুজনেই। সিগারেটের দুটো জ্বলন্ত বিন্দু মাঝে-মধ্যে জোরালো হয়ে উঠছে। ঘুম, ক্লান্তির কোনও চিহ্ন নেই আমার শরীরে। বারবার মনে হচ্ছিল, বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার সামনে এক্ষুনি পড়তে হবে আমাকে।

নবেন্দু হঠাৎ চাপা গলায় কী যেন বলল। বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, 'কী বলছিস?'

ও কোনও উত্তর দিল না। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ও হেসে উঠল, কারও রসিকতা শুনে হেসে ফেলার মতো হাসি। আমি চমকে উঠে বললাম, 'হাসছিস কেন?'

নবেন্দু এবারও কোনও জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে ও আবার নিচু গলায় কী যেন বলল। আমি প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারলাম না। কেন জানি না, আমার মনে হল, ও আমি নয়, আর কারও সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু আমি ছাড়া তো এই কুপেতে আর কেউ নেই! আর, এটা মনে হতেই আমার গা-শিরশির করে উঠল। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'নবেন্দু, কী বলছিস কী? তোর ব্যাপারটা কী বল তো? শরীর খারাপ লাগছে?'

নবেন্দু হেসে উঠল। মনে হল, এ-হাসিটা আমার কথা শুনে। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। একটু থেমে ও থমথমে গলায় বলল, 'তোর কাছে পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট লাগছে, তাই না? অবশ্য লাগাটাই স্বাভাবিক। তবে, আমার কাছে নয়। আমার কাছে তুই যতটা সত্যি, ও-ও ততটা। কে বিশ্বাস করল, না-করল—আমার কিছু এসে যায় না। তুই যদি শুনতে চাস, আমি বলতে পারি।'

আমি শুনতে চাই, কিন্তু 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পরে নবেন্দু বলল, 'পাহাড়ে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লাগত। অসম্ভব নির্জন জায়গা, তারপর আমার কোয়ার্টার্স এমনই জায়গায়, যার আশেপাশে আর কোনও বাড়িঘর নেই। অফিসের কাজকর্মের অবস্থাও সেইরকম, সারা সপ্তাহে দু-ঘণ্টা কাজ করলেই যথেষ্ট। প্রায়ই মনে হত, চাকরি-বাকরি ছেড়ে চলে আসি, এভাবে থাকলে বোধহয় পাগল হয়ে যাব। কিন্তু নির্জনতার একটা অদ্ভুত টান আছে। কীরকম নির্জনতা জানিস—?'

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোর তখনকার একটা চিঠির কথা আমার মনে আছে। রাত্রে গরম কফিতে চিনি মেশাবার পরে চমকে উঠতিস প্রথম-প্রথম। এত নির্জন এলাকা যে, কফিতে চিনি গুলবার শব্দ পর্যন্ত উঠত।'

নবেন্দু ওর চিঠি নিয়ে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এইসময় একটা বই এসে গেল আমার হাতে। বইটার নাম ''ডকটিন অব দ্য মিস্টিকস''। অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং বই। ওই নির্জন পাহাড়ের পরিবেশে বইটা আমার ওপর দারুণ প্রভাব ফেলল। আমি লক্ষ্ণৌ থেকে এই ধরনের আরও বই আনালাম। তারপর দিনরাত ডুবে থাকলাম বইগুলোর মধ্যে। একটা বইতে অশরীরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিচিত্র সব সাধনপদ্ধতির উল্লেখ আছে। আমি সেগুলোর চর্চা আরম্ভ করে দিলাম। প্রথমেই মনঃসংযোগ। মনঃসংযোগ করার অদ্ভুত একটা কায়দা আছে—কীরকম জানিস—?'

কেন জানি না আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় আলোটা জ্বালব?'

'না।' নবেন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল। তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'সাধনার অনেকগুলো স্টেজ আছে। মনে হল, এখন আমি অনেকখানি তৈরি, এবার আমার পরীক্ষা করা দরকার।'

'কী পরীক্ষা?' আমার গলার স্বর আমার কাছেই কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত ঠেকল।

নবেন্দু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা।'

আমার হঠাৎ মনে হল, গলার ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। একটু কফি খেতে পারলে হত! ফ্লাস্কটা ব্র্যাকেটে দুলছে, কিন্তু উঠে গিয়ে নামিয়ে আনতে পারলাম না। আমার শরীরের ওপর আমার যেন পুরোপুরি দখল নেই। চাঁদের ওপর দিয়ে বোধহয় মেঘ ভেসে যাচ্ছে, আবছা আলোছায়া দুলছে কুপের ভেতর। হুড়মুড় করে ছুটে-যাওয়া ট্রেনটা থেকে-থেকে কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি তাই...নাকি...!

নবেন্দু খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মাঝরাত, কেউ কোথাও নেই, চারদিক অসম্ভব নির্জন। আমি মনঃসংযোগ করে পরীক্ষায় বসলাম। একটু পরেই জানলা কাঁপিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে ঘরের মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল। বুঝলাম, কেউ এসেছে। কিন্তু কে সে? জিগ্যেস করলাম, কোনও উত্তর পেলাম না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে তার উপস্থিতি আমাকে টের পাইয়ে দিচ্ছিল।'

জোর করে হেসে বললাম, 'কী উলটোপালটা বকছিস?'

নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, 'একটুও উলটোপালটা নয়, যা বলছি সত্যি কথা বলছি।'

আবছা অন্ধকারের মধ্যে নবেন্দুর চোখের মণি দুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলছিল। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

নবেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অশরীরিণী ওই মেয়েটিকে আমি কিন্তু ডাকিনি, ও নিজে থেকে এসেছিল। এসেছিল আমার ক্ষতি করতে, কিন্তু করেনি। পরদিন এল, তার পরের দিনও এল। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ও আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না। সবসময় থাকে আমার মনে। এখনও আছে।'

'নবেন্দু!' আমি কেমন যেন ভয়-পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম।

ও অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল, 'এই তো আমার পাশেই বসে আছে, আলাপ কর না, ভালো লাগবে।'

নবেন্দু বেঞ্চের একধারে বসে আছে। ওর আর আমার মধ্যে একহাত শূন্য জায়গা। আমি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ নেই সেখানে। শূন্য জায়গায় আবছা অন্ধকার। কেউ নেই জেনেও আমি কেমন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওই শূন্য স্থানটা। এমনসময় জানলা দিয়ে একতাল অন্ধকার লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। আঁতকে উঠলাম। অন্ধকারটা কুপের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে আমার আর নবেন্দুর ভেতরের ফাঁকা জায়গায় জমাট হয়ে গেল। আমি প্রাণপণ ভাববার চেষ্টা করলাম, চাঁদের ওপর দিয়ে নির্ঘাত কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু নবেন্দু নিচু গলায় কার সঙ্গে গল্প করছে?

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৯



ছায়ামানবী

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

প্রত্যেকের মুখ থমথমে। চোখে ত্রাস, কথায় সংশয়। আমি এক অদ্ভুত পরিবেশে উপস্থিত হয়েছি। কাঙড়া আসার আগে ঘুরেছি অনেক জায়গায়, এমন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িনি।

চতুর্দিকে সুন্দরের আগমন, সবুজে-সবুজে ছেয়ে গেছে। ফলে-ফুলে কী শোভা! বিধাতা রঙে-রূপে কী বাহারে ছবি এঁকেছেন না দেখলে চক্ষু সার্থক হয় না। কিন্তু কী দেখতে এসে কী শুনছি! এ যেন 'শীতল বলিয়া ও-চঁ সেবিনু/ভানুর কিরণ দেখি...।'

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশের কালো মেঘ কেটেছে, মানুষের মনের মেঘ তো কাটল না। ছেলে-বুড়ো—সবারই মনের। বাতাসে ঠান্ডা আমেজ, মানুষের নিশ্বাসে মধ্যাহ্ন সাহারার শুষ্ক উত্তাপ।

একটা মহাভয় পিছু-পিছু ঘুরছে সকলের। একজনের সন্দেহ অন্যজনের ওপর। বোধহয়, ওই-ই খুনের সাক্ষী, নয়তো ও নিজেই খুনি। বরুণা সত্যি-সত্যিই খুন হয়েছে, না আত্মঘাতী হয়েছে—এ নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। তবু সকলেরই ওই মনোভাব।

বরুণার মৃত্যুর ধরনটা কেমন-কেমন। শিব মন্দিরের পিছন দিকে ঢালু জায়গায়—খটখটে শুকনো কুণ্ডের ধারে ওর মৃতদেহটা পড়ে ছিল। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। শরীরটা নীল হয়ে গেছে স্রেফ। পাশে ক'টা লাড্ডু পাওয়া গেছে। খানিকটা ঘুগনি—ব্রজেশ্বরীর প্রসাদ হলেও হতে পারে।

একটা অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। প্রসাদের ঘুগনিতে বিষ! ঘুগনির কাছে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে দুটো পাখি। একটা কুকুরকে নিয়ে আসা হল পরীক্ষা করে দেখার জন্য। কুকুরটা ঘুগনির মধ্যে যে মৃত্যু লুকিয়ে আছে, নিশ্বাস টেনে বুঝতে পেরে, মুখ ঠেকানো দূরের কথা—বিশ হাত পিছিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে মুখে তুলে ভেউ-ভেউ করে মরণ-কান্না জুড়ে দিল।

ঘুগনিতে মরণ-বিষ কি বরুণা নিজে হাতে মিশিয়ে খেয়েছে, না কেউ মিশিয়ে খাইয়েছে? কত তল্লাশি চলেছে, হদিশ মিলছে না। দিন-সাতেক কেটে গেছে, তবুও না।

কেউ আর প্রাণভয়ে দেবীর প্রসাদ মুখে পুরছে না। মাথায় ঠেকিয়ে কপালে ঠেকিয়ে জল-ভরা কুণ্ডে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, দেবীর প্রসাদের বদনাম-ভীতি দেবী দূর করছেন না কেন নিজে! তিনি কি কেবল ছ-সাততলা পাথুরে মন্দিরের গর্ভে একটি শিলা-ই! শ্বেতচন্দনে চোখ-কান আঁকা বলে কি দেখতে-শুনতে পান না?

মুঘল আমলে মন্দির ধ্বংস হয়েছে কতবার। আবার গড়ে তোলা হয়েছে। শেষ ধ্বংসের প্রায় শ'চারেক বছর পর রাজা সংসারচাঁদ মহারাজা রণজিৎ সিংহের সাহায্যে গড়ে তুলেছিলেন আবার নতুন মন্দির। চোখ জুড়োনো মন্দির। মন্দিরের পেছনে ছোট্ট মন্দিরে শ্বেত পাথরের অষ্টভুজার মূর্তিটিও নয়ন-ভোলানো শিল্প। এসব পবিত্র পরিবেশের বাতাসেও খুনের বিভীষিকা, খুনের ত্রাস ভেসে বেড়াচ্ছে। পুজোর সময়—আরতির প্রদীপশিখায় ভক্তদের মন বসে না কারও। আকাশভাঙা দুশ্চিন্তা দাপাদাপি করে মাথায়। প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ নিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে কখন!

পাণ্ডাদের মুখে শুনেছি, একান্নপীঠের মধ্যে পড়ে না এ-জায়গাটা। না পড়লেও এটা নাকি গুপ্তপীঠ। সে যাই হোক, বরুণার মৃত্যু নিয়ে যে একটা গোপন রহস্য এই সবুজ-পাহাড়ের মাটিতে কোথায় কোন মানুষের মধ্যে লুকোচুরি খেলে চলেছে—কেউ জানতে না পারলেও, মোটামুটি আঁচ করে নিচ্ছে এক-একটা দল। তাদের সন্দেহ এক-একজনের ওপর।

খুনির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কাজ চলছে তলায়-তলায়! যে-যার ধারণা অনুযায়ী লোককে খুনি ভেবে নিয়ে রাতের গভীরে দল বেঁধে চলেছে। মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারবে। ধড় থেকে নামিয়ে দেবে মাথাটা তরোয়ালের ঘায়ে, বর্শায় হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে নির্দয়ভাবে।

দেশের প্রায় প্রত্যেকেই বরুণাকে ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে। বরুণা সব ঘরেরই মেয়ে যেন। ব্যথা বুকে চেপে হাসতে জানে। নিজের জমা দুঃখ উজাড় করে দিয়ে কারও মনের কোণে দুঃখ দিতে চায়নি কখনও।

স্বামী মারা যেতে জলভরা চোখে হেসে বলল, যাঁর জিনিস তিনি নিয়েছেন, উনি আমার নন, তাই রইলেন না। পুণ্যাত্মা মানুষ অভাগীর সংস্পর্শে থাকবেন কেন, বলো তোমরা?

একবছরের ছেলেটা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে। বরুণা ছেলের গাল টিপে দিয়ে জাতবেরাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল, এর জন্যে থাকতে হবে আমায়। চোখ দুটো ঠিক ওনার। একে বড্ড ভালোবাসতেন উনি।

মাস-ছয়েক যেতে-না-যেতে ছেলেটাও চলে গেল। বরুণার দু-চোখে জলের ধারা নামছে হু-হু করে। ঠোঁটে কিন্তু জ্বলজ্বলে হাসির রেখা। বলল তাদের, যারা সান্ত্বনা দিতে এসেছিল—শুনেছি, দেবীর অতি প্রিয় যারা, পৃথিবীর কোনও পাপ স্পর্শ করার আগেই দেবী তাদের কোলে তুলে নেন। ও-ছেলে তো আমার নয়—দেবীর। যাঁর ছেলে, তাঁর কাছে গেছে। আমার কীসের দুঃখ, কীসের শোক?—জোরে কেঁদে উঠেছে বরুণা।

শাশুড়ি ভেবেছে, পর-পর দুটো শোক পেয়ে বউটা পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়। শোক কি তারও হয়নি? বরুণার মতন শাশুড়ি নিঃসঙ্গ নয়। আরও দুটো ছেলে আছে—তাদের দুজনের দুই বউ, আর আছে বড়জনের দুটি ছেলে, ছোটজনের একটি মেয়ে। বরুণা পোড়াকপালী কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? আত্মহত্যা না করে বসে।

শাশুড়ি নিজের শোকতাপ বুকে চেপে বউকে রেখেছে চোখে-চোখে।

কেন শাশুড়ির এত নজর তার ওপর—বরুণা যে বোঝেনি, তা নয়। বুঝেছে ভালোরকম। একগাল হেসে বলেছে, মা, আপনি পুজোপাঠও ছাড়ছেন দেখছি আমার জন্যে। আমি জানি, আত্মহত্যা মহাপাপ। ওদিকে আমার মন কখনও আসবে না। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি।

এই প্রকৃতির মেয়ে বরুণা আত্মঘাতী হতেই পারে না। বলল বরুণার ভায়েরা। অবস্থার চাপে গরিব বনলেও, এখন আমিরি না থাকলেও, এককালের ক্ষত্রিয় রাজারাজড়াদের রক্তের ধারাটা তো দেহের শিরায়-শিরায় বয়ে যাচ্ছে। বোনের মৃত্যুতে ভায়েদের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তারা হিংস্র বাঘের মতন খুন করার উদ্দেশ্যে দিনে-রাতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বরুণা সবার উপকার বই তো অপকার করেনি কারও! কার রান্না চড়েনি বাড়িতে গিন্নির অসুখের জন্যে, নিজে উপযাচক হয়ে রান্না করে দিয়ে এসেছে। কারও অসুখ, দেখার কেউ নেই—সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক—মনে কোনও কুণ্ঠা-সংকোচ না রেখে সেবা-শুশ্রূষায় মগ্ন হয়ে গেছে নিজে থেকে। এমন মেয়েকে—মানুষ নয়—কোনও পিশাচ না হলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় কেউ বিষ খাইয়ে!

ভায়েরা সন্দেহ করেছে ত্রিপুরকে। যদিও জানে ত্রিপুরের মতন অত সৎ ছেলে এ-তল্লাটে দ্বিতীয় কেউ নেই আর। যার যায় তার অত বুদ্ধি-বিচার আসে না। বিনা কারণেই দোষী সাব্যস্ত করে বসে যাকে-তাকে।

এ-ক্ষেত্রেও ঘটল তাই।

সকলে জানে, পিতৃমাতৃহারা ত্রিপুর ত্রিপুরামালিনীর, অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীদেবীর, দোরধরা। ব্রজেশ্বরীর কাছে মানত করেই মা-বাবা পেয়েছেন ওকে। এমন সৌম্যদর্শন—যেন দেবদূত—দেবীর মানসপুত্র বলে বুঝে উঠতে ভুল হয় না কোনও।

কতবার একা ঘরে ব্যামোয় ছটফট করছে ত্রিপুর, গেছে বরুণা। সেবা করে সারিয়েও তুলেছে। কে জানে মানুষের মতিভ্রম হতে কতক্ষণ। কথায় বলে, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। বিশ্বামিত্র ঋষি যদি মেনকাকে দেখে বিবেক-বুদ্ধি, নিজের সাধনা ভুলে যেতে পারেন, তাহলে বরুণাকে দিনের পর দিন কাছে পেয়ে ত্রিপুরের পক্ষে আকৃষ্ট হয়ে পড়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ওর কোনও অসৎ প্রস্তাবে বরুণার মতন মেয়ের রাজি হওয়া অসম্ভব। প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় ক্রোধে অন্ধ ত্রিপুর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাই বরুণাকে।

রাতের অন্ধকারে বরুণার ভায়েদের দলবল ত্রিপুরের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ত্রিপুরকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য যতবার ত্রিপুরের ঘরে প্রবেশ করতে গেছে ওরা, ততবার একটা ধাক্কা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে সবাই।

একটা ঠান্ডা স্রোত ওদের সবার ওপর আছড়ে পড়ে সকলের শক্তি অসাড় করে দিয়েছে নিমেষে। বিস্ময়ে দেখেছে ওরা, চৌকাঠের ওপারে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বরুণা। রক্ত-মাংসের শরীর বলে ভ্রম হয়।

বরুণা যখন আগলাচ্ছে ত্রিপুরকে, তখন ত্রিপুর নির্দোষ। নিজেদের ডেরায় ফিরে গেছে ওরা এক-এক করে।

মাথা থেকে তবু খুনির চিন্তাধারা গেল না কারও। নজর পড়ল আর-একজনের ওপর। সুরথ।

সুরথের মা থেকেও নেই। পঙ্গু, বারোমাস শয্যাগত। বউ দজ্জাল। স্বামীর ঘরে আসবে না, স্বামীকে তার ঘরে যেতে হবে। স্বামীর অসুখ-বিসুখে খবর গেলে, বলে পাঠায় বউ, তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই, সে আবার পরের সেবা করতে যাবে! বরের স্পর্ধা তো কম নয়! বলিহারি আক্কেল! বউকে দাসী-বাঁদী ভাবে, এ কেমনতরো পুরুষ! অমন হীন মনের পুরুষের মুখ দেখতে চায় না সে।

সুরথ ডাকেনি বরুণাকে। না ডাকলেও অসুখ শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি বরুণা। ছুটে গেছে। সব থেকেও সব নেই যার, তার কাছে সব হয়ে উঠেছে সেবা-শুশ্রূষায়।

হতে পারে বরুণাকে একেবারে নিজের করে রাখতে চেয়েছে সুরথ। চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে বলেছে ত্রিপুরকে। ত্রিপুরের ত্রিসীমানা মাড়াতে নিষেধ করেছে। বরুণা শোনবার মেয়ে নয়। কোনও কথা গ্রাহ্য করেনি। হয়তো বা বলেছে, তোমার ছোট মনের জন্যে বরং তোমায় আমি ত্যাগ করব, ত্রিপুরকে নয়।

সুরথের খুনিরক্ত নির্ঘাত দু-চোখের কোনায় জমাট হয়েছে। সে যখন পেল না বরুণাকে, তখন ত্রিপুরের হতেও দেবে না কোনওমতেই। জানে, বরুণা দেবীভক্ত। ওকে সরিয়ে দিতে মস্ত সুবিধে। দেবীর প্রসাদে বিষ মিশিয়ে ওকে দেওয়া। নির্দ্বিধায় খেয়ে ফেলবে ও। তারপর বাঞ্ছিত ফল পেয়ে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে সুরথ। এ গোপন ব্যাপার জানতে পারবে না কেউ কখনও। একটা কানামাছিও না।

যেই মতলব মাথায় আসা, অমনই তড়িঘড়ি কাজ সেরে ফেলা। সুরথকে না শেষ করে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না বরুণার ভায়েরা।

ত্রিপুরের মতন ওরা আক্রমণ করল সুরথেরও বাড়ি। একই দৃশ্যের, একই ঘটনার, পুনরাবৃত্তি ঘটল ওখানেও।

ঠান্ডা স্রোতে ডুবে গিয়ে সকলের শক্তি অসাড়। আর সুরথের ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বরুণা।

সুরথও তাহলে নির্দোষ! তবে প্রকৃত দোষী কে? বরুণাই ধরিয়ে দিক না। ভায়েরা প্রতিরাতে একজোট হয়ে বসেছে। বরুণার চিন্তা করেছে একমনে। মনে-মনে অনুরোধ করেছে বরুণাকে সবাই, আমাদের মুখ চেয়ে প্রকৃত লোকটাকে তুমি ধরিয়ে দাও!

বাঁকমন বরুণা মারা যাওয়ার পর থেকে কেঁদেকেটে সারা। এমন পরোপকারী মানুষকেও মেরে ফ্যালে কেউ! এ-কাজ যে করেছে, তার নরকেও স্থান হবে না। ব্রজেশ্বরীর কাছে রোজ এসে প্রার্থনা করে, মানত করে : ধরিয়ে দাও তুমি। বুক চিরে রক্ত দেব তোমায়।

বরুণার ভায়েদের সঙ্গে আসামী খুঁজে-খুঁজে বেড়ায়। ওদের দলের সঙ্গে গেছে ত্রিপুরের প্রাণ ছিনিয়ে নিতে। গেছে সুরথের বুকের রক্তে স্নান করতে।

সকলের খুব সহানুভূতি ওর ওপরে। এ-মানুষটা না পাগল হয়ে যায়!

প্রতিরাতে আসে বাঁকমন ওই জায়গায়—যেখানে বরুণা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

দুটো হাঁটুর মধ্যিখানে মাথা গুঁজে হাউহাউ করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে কীসব বলে। কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না।

আশ্চর্য! আজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আজ দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হল। বরুণার মৃত্যুর পর কেটেছে সাতদিন। আজ আবার এসেছে মৃত্যুর সেই দিন।

ওখানে আজ লোকে লোকারণ্য। জোরে-জোরে চিৎকার করে কীসব বলছে বাঁকমন। কৌতূহলী মন নিয়ে গেলুম আমি।

আমি এখানে নবাগত।

দেখিনি বরুণাকে। দেখলুম, বাঁকমনের পেছনে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। পাশের লোকটি কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, বরুণা।

আমি নিস্পৃহের মতন দেখছি, আর শুনে যাচ্ছি বাঁকমনের অদ্ভুত কথা। বাঁকমন যেন ভর-হওয়া মানুষ। ওর নিজস্ব সত্তা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। কে যেন ওকে দিয়ে জোর করে স্বীকারোক্তি করাচ্ছে।

ও বলছে, আমি প্রসাদে বিষ মিশিয়ে হাতে দিয়েছি বরুণার। ওকে আমিই মেরে ফেলেছি, যখন বুঝেছি, ও কখনওই আমার ঘরণী হবে না। আমি চাইনি ও ত্রিপুরের হোক, কি সুরথের হোক...।

শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর বাঁকমন। ভীষণ ছটফট করছে। বেহুঁশ হয়ে পড়ল। অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের নারীমূর্তি। বরুণা।

জ্ঞান ফেরাতে অনেক চেষ্টা করেও সফল হল না কেউ। বাঁকমনের দেহ ঠান্ডা হয়ে উঠেছে, কঠিন হয়ে উঠেছে।

মাসিক ক্রিমিনাল,
পুজো সংখ্যা, ১৯৭৯



একালের রাজা শিবি

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্য সংস্কৃত বইয়ে হরেন কৌশিক রাজা শিবির কাহিনি পড়েছিলেন। পরিণত বয়েসে তাঁকে চাক্ষুষ করলেন।

চাকরিসূত্রে হরেনবাবুকে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধতে হয়েছিল। সাউথ এন্ড পার্কের প্রায়-অন্ধকার একটা একতলার ফ্ল্যাট। দু-দিনেই স্ত্রী সবিতা আর ছেলেমেয়ে দুটো অস্থির হয়ে উঠল 'হ্যাঁগো! এমন বুক-চাপা খাঁচায় মানুষ থাকতে পারে!'

অতঃপর হরেনবাবুর এক নতুন ডিউটি জুটল। ভাগ্যিস মিসা বা এমার্জেন্সি নেই, তাই রোজ সকাল-সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তেন। বাড়িতে যা-হয় কিছু জলপান সেরেই সবিতা আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে চলে আসতেন লেকের ধারে। তিনি আর সবিতা ফাঁকা জায়গায় বসতেন, আর ছেলেমেয়ে দুটো ছুটোছুটি করে খেলত।

ক'দিন পরেই তাঁদের নজর পড়ল চাকাওলা চেয়ারে-বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর চাকরের ওপর। এত গরমেও বৃদ্ধের গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। চোখে কালো গগলস, হাতে অদ্ভুত ধরনের একজোড়া দস্তানা পরা—আমাদের দেশে যেটা অস্বাভাবিক।

হরেনবাবুরা ভাবলেন, ভদ্রলোকের হয়তো কোনও চর্মরোগ আছে, আলো-হাওয়ার স্পর্শে যা বাড়তে পারে।

ঘড়ি ধরে ঠিক একই সময়ে পাথরে খোদা চাকরটা চেয়ার ঠেলতে-ঠেলতে ঢাকুরের রাস্তা দিয়ে আসত, একই জায়গায় থামত, বৃদ্ধ তাঁর হাতের থলি থেকে কাঁপতে-কাঁপতে কীসের টুকরো যেন বের করতেন, হয়তো পাঁউরুটিরই হবে, তারপর ফোকলা মুখ দিয়ে অবোধ্য স্বরে কী যেন বলতেন, আর কোথা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক এসে তাঁর চেয়ার ঘিরে ফেলত। কর্কশ আওয়াজ তুলত, ঠুকরে-ঠুকরে গিলতে থাকত সেই টুকরোগুলো।

বৃদ্ধ একদিন লক্ষ করলেন হরেনবাবুদের। তিনি হাসলেন ছেলেমেয়েদের লক্ষ করে। কথা বলবার বিস্তর চেষ্টা করলেন, কিন্তু বেরিয়ে এল সেই দুর্বোধ্য আওয়াজ। সবিতা মমতা-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আহা! বেচারা।'

এর বেশ কিছুদিন পরে সস্ত্রীক হরেনবাবু এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধের দিকে, আলাপ করতে। তিনি বুঝলেন, কোথায় কী যেন একটা গণ্ডগোল আছে। স্ত্রীকে তিনি বৃদ্ধের কাছে যেতে বাধা দিলেন, কিন্তু সবিতা হেসেই উড়িয়ে দিল স্বামীর নিষেধ। তারপর এগিয়ে গেল।

চাকরটা অভ্যর্থনা জানাতে কোনওরকম ঔৎসুক্য দেখাল না। বৃদ্ধ শুধু মৃদু হাসলেন, কাগজের থলিটা তুলে দিলেন সবিতার হাতে, তারপর ইশারায় জানালেন, ছুটে আসা কাকগুলোকে খাওয়াতে। একমুঠো খাবারের টুকরো বের করে নিয়ে, সবিতা ছুড়ে দিল কাকগুলোর দিকে। টুকরোগুলো সবুজ থকথকে চর্বির মতন। হাত দিয়ে ছুঁতেই সবিতার গা-টা কেমন ঘিনঘিন করে উঠেছিল। বৃদ্ধের দিকে সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই, তিনি দস্তানা আঁটা হাতদুটো নাড়তে-নাড়তে আনন্দে খলখল করে হেসে উঠলেন। চাকরটা অকস্মাৎ চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে ঢাকুরের পথে অদৃশ্য হল।

এর পরেও দিনকয়েক হরেনবাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবিতা কাকেদের ভোজনপর্বে বৃদ্ধকে সাহায্য করল। সে লক্ষ করল কি না কে জানে, কিন্তু হরেনবাবুর মনে হতে লাগল বৃদ্ধ যেন দিন-দিন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। নিছক জরা, না কোনও বিচিত্র রোগ?

একদিন বৃদ্ধের গা থেকে কম্বলটা খসে পড়তেই তিনি লক্ষ করলেন, বৃদ্ধের একখানা পা নেই। দরদী কণ্ঠে চুকচুক করে উঠল সবিতা, 'আহা! হয়তো কেটে বাদ দিতে হয়েছে।' কোনও মন্তব্য করলেন না হরেনবাবু, তবে ক'দিন পরে দেখা গেল বৃদ্ধের দ্বিতীয় পা-খানাও অদৃশ্য হয়েছে।

এর পর থেকে তাঁরা আর বৃদ্ধের কাছাকাছি যাননি। দূর থেকেই লক্ষ করতেন, কী এক অজানা পচন রোগে বেচারা যেন গলে-গলে যাচ্ছেন। অজগর সাপের মতন মৃত্যুও কি এমনিভাবেই তিলে-তিলে গ্রাস করে? চেয়ার ঠেলে চাকরটা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পরও একটা তীব্র দুর্গন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে রাখত।

পরদিন রাত্রে ঘুমোতে-ঘুমোতে সবিতা হঠাৎ গোঙাতে শুরু করল। বিছানার চাদর হাতড়াতে-হাতড়াতে এদিক-ওদিক ওলটপালট খেতে লাগল। হরেনবাবু স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। জড়িত কণ্ঠে সবিতা বারকয়েক 'হাত, পা' উচ্চারণ করল, যেন একটা জটিল প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজছে।

হঠাৎই ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে সে কাঁদতে-কাঁদতে উঠে বসল। হরেনবাবু তাকে বুকে টেনে নিলেন, জানতে চাইলেন, কী হয়েছে তার।

কোনও জবাব দিল না সবিতা। একটু পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বৃদ্ধ যথাসময়েই এলেন। সবিতা ভূতে পাওয়ার মতনই এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। হরেনবাবুর কোনও বাধাই মানল না। কাছ থেকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল বৃদ্ধকে। আগের চেয়ে আরও অনেক ছোট হয়ে গেছেন তিনি—প্রায় অর্ধেক। দু-হাতে ব্যান্ডেজ। কম্বলের বদলে দেহটা আজ শালে ঢাকা। চোখ দুটো কোটরের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য। হঠাৎ ফাটা বাঁশের মতো চেরা গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'ওদের খেতে দিয়ো, খেতে দিয়ো।'

সেই প্রথম সবিতা বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনল। চাকরটা প্রায় ধমকে উঠল সবিতাকে, 'যান, যান, সরে যান এখান থেকে। ওঁকে বিরক্ত করবেন না। খুব অসুখ ওঁর।'

সবিতা ছুটে পালিয়ে এল হরেনবাবুর কাছে। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, চাকরটাই আজ কাগজের ব্যাগ থেকে সেই সবুজ রঙের টুকরোগুলো বের করে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর রুদ্ধশ্বাসে ছুটে-আসা কাকের দল কা-কা করতে-করতে টপাটপ গিলছে সেগুলো।

এর পর থেকে সবিতার যেন মাথার গোলমাল শুরু হল।

হরেনবাবু স্ত্রীকে ডাক্তার-বাড়ি নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা করে ডাক্তার কতকগুলো বড়ি দিয়ে বললেন, 'ওঁর বিশ্রামের একান্ত দরকার।'

একফালি বারান্দার কোণে সবিতা একখানা চেয়ারে বসে থাকে দিন-রাত, নখ দিয়ে কী যেন খোঁটে। কারও সঙ্গে কথা বলে না, ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেয় না। দেখেশুনে হরেনবাবু ঠিক করলেন, স্ত্রীকে কোনও নামকরা মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নিয়ে যাবেন।

রবিবার ছেলেমেয়েকে নিয়ে হরেনবাবু লেকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল না যে সবিতা যায়, কিন্তু জেদ করে সে স্বামীর সঙ্গে চলল।

ঘাসে-ভরা মাঠটায় ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলতে লাগল। সবিতা হরেনবাবুর পাশে বেঞ্চে বসল, দৃষ্টি কিন্তু তার ঠায় আটকে রইল ঢাকুরে থেকে আসার সেই পথটার দিকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হরেনবাবু হাতের বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একসময় মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সবিতা কোনসময় নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ঢাকুরের পথটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকছে।

হাতঘড়িটা দেখলেন হরেনবাবু। বৃদ্ধের আসার সময় হয়ে গেছে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল, চাকরটা একলা আসছে। আজ আর বৃদ্ধ নেই, চাকাওলা চেয়ারও নেই। চাকরটার হাতে শুধু একটা ছাতা আর আগেকার চেয়ে অনেক বড় একটা থলি।

কী যে ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে, হরেনবাবু সেটা অনুধাবন করতে পারলেন। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলার আগেই সবিতা তাঁর দিকে ফিরে ভয়ে, আতঙ্কে বিকট চিৎকার করে উঠল।

চাকরটা হাতের থলিটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ল নরম, সবুজ, মাংসের টুকরো-টুকরো পিণ্ড। কোথায় ছিল কাকগুলো, কা-কা করতে-করতে ছুটে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৭৯



অংশীদার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গণেশ আমার ব্যবসার পার্টনার। জ্যাঠামশাই তখন ঠিকই বলেছিলেন, দ্যাখো, জগন্নাথ, বেকার থাকা তবু মন্দের ভালো, কিন্তু পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে যেয়ো না, মরবে। বাঙালির পার্টনারশিপ টেঁকে না। বাঙালির স্বভাব অতি সাংঘাতিক। দুজন বাঙালি যদি নৌকো চেপে সমুদ্র পাড়ি দিতে যায়, তো একজন যখন ঘুমোবে আর-একজন তখন নৌকোর তলা ফুটো করবে। ভরাডুবি হবে জেনেও এই কাজ করবে।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনিনি। না শুনে আমার আজ এই হাল।

হেলেন অ্যান্ড ক্রসবি কোম্পানির ফুটপাথে চোপসানো বেলুনের মতো দাঁড়িয়ে আছি। হাতে সাত হাজার টাকার বিল। নাচতে-নাচতে এলুম, টাকাটা আদায় হলে লিলিকে বলেছিলুম কাশ্মীরে গিয়ে ফূর্তি করব। অ্যাকাউটেন্ট বললেন, 'কতবার টাকা নেবেন মশাই? তিনদিন আগে আপনার পার্টনার এসে টাকা নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে মানে? এই তো বিল আমার কাছে, টাকা আমার পার্টনারের কাছে? অলৌকিক ব্যাপার!'

'অলৌকিক-ফলৌকিক বুঝি না মশাই, এই দেখুন ফাইল, এই দেখুন আপনাদের কোম্পানির স্ট্যাম্প মারা রিসিটেড বিল, আমাদের চালান।'

চোখ ছানাবড়া। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খাচ্ছি। টাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, লোকের স্রোত বইছে। হাইহিল জুতো পরে মাথায় ফুলেল ছাতা মেলে হেলেদুলে এক মেমসাহেব চলেছে। কোনও কিছুই মনে ধরছে না। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে বলত—জগন্নাথটা উল্লুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'হারামজাদা!'

পাশ দিয়ে চাপ-চাপ দাড়িওলা একটা গুণ্ডামতো লোক যাচ্ছিল। ততটা খেয়াল করিনি। লোকটি ঝপাত করে থেমে পড়ল 'আমাকে বললেন?'

'আজ্ঞে না, আপনাকে এসব বলব কেন?' মনে-মনে খুব ভয় পেয়ে গেছি।

'তবে কাকে বললেন?'

'আজ্ঞে, আমার পার্টনার গণেশকে।'

'কেন? উলটে গেছে?'

'আজ্ঞে না, নিজে সোজা আছে, আমাকে উলটে দিয়েছে।'

'সিগারেট আছে?' লোকটি একটা সিগারেট চাইল। সিগারেট আর নস্যি একা ভোগ করার উপায় নেই। ভাগীদার জুটবেই। সিগারেট ধরিয়ে লোকটি বললে, 'শালা!'

'কে, আমি?'

'না, না, আপনি কেন শালা হতে যাবেন? আমার রিয়েল শালা, বউয়ের ভাই পঞ্চানন।'

'শালা তো শালা হবেই।' স্বস্তির গলায় বললুম।

'আরে না মশাই, না, এ-শালা হল সেই শালা।' ভীষণ রেগে গেছে লোকটি। একটানে সিগারেটের আধখানাই পড়পড় করে পুড়ে গেল।

'মানে, সেই ইতর শালা!'

'ইতর! চামার শালা।'

'কী করেছেন পঞ্চাননবাবু?' ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলুম।

'আর বাবু বলে সম্মান করতে হবে না। বলুন, পঞ্চাশালা।'

'আপনার শ্যালক হলেও, আমার তো নয়। কী করে বলি, বলুন?'

'আরে মশাই, ও হল সব শালার শালা!'

'কী করেছেন তিনি?'

'তিনি আমার স্ত্রীর নেকলেস নিয়ে হাওয়া মেরেছেন।'

'ছিনতাই?'

'না, না, ছিনতাই নয়, চোরের ওপর বাটপাড়ি। নেকলেসটা হাতসাফাই করে ওর হাতে দিয়েছিলুম ঝেড়ে দেওয়ার জন্যে। পৃথিবীটা শালা পালটে গেছে। কারোর মধ্যে একটুকু সততা নেই, অনেস্টি নেই। বিশ্বাসের দাম দিতে জানে না। বিশ্বাসঘাতকের দল!'

'স্ত্রীর গয়না হাতসাফাই করাটা খুব ভালো কাজ নয়, ইয়েবাবু।'

'ইয়েবাবু নয়, পলটুবাবু।'

'হ্যাঁ, পলটুবাবু। ওটা খুব নোংরা কাজ, নীচ কাজ।'

'আপনাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না! কী বাবু?'

'জগন্নাথবাবু।'

'হ্যাঁ, জগন্নাথবাবু। ওসব জ্ঞানের কথা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগেই মানায়। স্ত্রীলোকে গয়না পায় স্বামীর দৌলতে। আমি আমার বউকে বিয়ে করেছিলুম বলেই আমার শ্বশুরমশাই ধার-দেনা করে দশ ভরি গয়না দিয়েছিলেন। বিয়ে না করলে মেয়েকে গয়না দিতেন! গবেট!'

'কে গবেট?'

'আপনি, আবার কে? যাক, আলাপ যখন হয়েই গেল, তখন চলুন, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক। আগেই বলে রাখছি, তিনটের পর আমি শুধু চা খেতে পারব না। মোগলাই-টোগলাই চাই। পকেটে সেরকম মালকড়ি আছে তো?'

বেশ মজার লোক। নিজের দুঃখে এতক্ষণ খুব কাবু-কাবু লাগছিল। এই লোকটিকে পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। দুঃখ ভাগ করে নিতে পারলে, সেই প্রবাদের মতো, একের বোঝা দশের লাঠি।

কাঠের কেবিন। ঘ্যানঘ্যান করে একটা কেবিন-ফ্যান ঘুরছে। চারটে পায়া থাকলেই যদি টেবিল হয়, তাহলে সেইরকম একটা টেবিলের দু-পাশে দুটো চেয়ার। চটচটে একটা মরিচ আর একটা নুনদানি। আবার একটা পরদাও ঝুলছে। মেয়েছেলে-ফেয়েছেলে নিয়ে কেউ এলে, ওই ময়লা-ময়লা পরদাটা ঝড়াং করে টেনে দিলেই আড়াল তৈরি হবে। পাশের কেবিনটার পরদা টানা রয়েছে। মাঝে-মাঝে চুড়ির কিনিকিনি শোনা যাচ্ছে।

বয় এসে দাঁড়াতেই আমাকে আর অর্ডার দিতে হল না। পলটুবাবুই হুকুম জারি করলেন, দুটো মোগলাই, একটায় ডবল ডিম আর মাংসের কিমা, বেশি পেঁয়াজ আর আদা-কুচি। বয় চলে গেল। পলটুবাবু বললেন, 'আপনারটা লাইটই থাক। বলা যায় না, পেটে সহ্য হবে কি হবে না।'

পলটুবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন। অল্প একটু জল খেয়ে বললেন, 'চোখের সামনে দিয়ে সিলভার অ্যারো বেরিয়ে গেল, কিচ্ছু করতে পারলুম না। ইস, ইস! শালা আমাকে হেল্পলেস করে দিলে!'

'সিলভার অ্যারো? সেটা আবার কী?'

'আরে ঘোড়া, মশাই, ঘোড়া। ব্যাঙ্গালোর রেসে শনিবার দৌড়চ্ছে। ভেবেছিলুম, টিপলটোটে খেলে একটা নেকলেস দুটো করে আনব। শালা পথ মেরে দিলে। সেই বউই ভালো, যে-বউতে শালা নেই।'

'আপনি রেস খেলেন? রেসে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।'

'তা হয়। আমিও হয়েছি। তবে জেদ চেপে গেছে। ঘোড়ার লাগাম আমি ধরবই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কী অমন জন্তু, মশাই! মেয়েছেলে নাকি? সারা জীবন ছলনা করে যাবে। মানুষ বলবে, দেবা ন জানন্তি কুত মনুষ্যাঃ। ওই তো চারটে পা, একটা ল্যাজ, পিঠে একটা জকি। কতকাল ছলনা করবে? আমি শেষ রাতে স্বপ্ন পেয়েছি—সিলভার অ্যারো, সিলভার অ্যারো।'

মোগলাই এসে গেল। পলটুবাবু ছুরি আর কাঁটা নিয়ে ডিশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা বড় মাপের টুকরো মুখে পুরে বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, বিপদে-আপদে। আপনার কেসটা কী?'

'আমার কেস, ওই বাঙালির পার্টনারশিপ। একটা ব্যবসা করেছিলুম। গণেশ আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। বেটা খুব বেগোড়বাই করছে। টাকা-ফাকা সরাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই চোখ রাঙায়। ভয় দেখায়। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি।'

'মালটাকে হাটান না, হাপিস করে দিন।'

'হাপিস মানে?'

'গুম করে দিন। লোকটা ছিল, লোকটা আর নেই।'

'মার্ডার?'

'মার্ডার-ফার্ডার জানি না। মাল চৌপাট।'

'কীভাবে?'

'ও অনেক রাস্তা আছে। আমার গুরু জানে।'

'রেসের গুরু?'

পলটুবাবু ছুরি দিয়ে প্লেটের গায়ে ট্যাং-ট্যাং করে শব্দ করলেন। বয় এসে দাঁড়াল।

'পেঁয়াজ আনো।'

বয় চলে যেতেই পলটুবাবু বললেন, 'গুরু আমার নাম্বার ওয়ান, আইন জানে, ক্যারাটে, কুংফু জানে, ভালো ডাক্তারের মতো ছুরি চালাতে জানে। কীরকম চোট দিয়েছে?'

'এই মাত্র সাত হাজার।'

'সাত হাজার? কোনও মানে হয়? সাতবার একুশটা ঘোড়া ছোটানো যেত! মালটাকে জোটালেন কোত্থেকে?'

'জুটে গেল! এখন আর নামতে চাইছে না। ব্যবসা থেকে আমাকেই আউট করে দেবে দেখছি। কোর্টকাছারি কে করবে? আইন দিয়ে হাটাতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা। কারবার লাটে উঠে যাবে।'

পলটুবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কোর্টকাছারি ছাড়াও অন্য রাস্তা আছে। ধোলাই।'

'কে ধোলাই দেবে? আমার ক্ষমতা নেই।'

'কাপড় ধোলাই করার যেমন লোক আছে, মানুষ ধোলাই করারও তেমনি লোক আছে।'

'তাতে তো আর টাকা ফিরবে না, জোচ্চুরিও বন্ধ হবে না।'

'তাহলে মালকে পগার পার করে দিতে হবে।'
'মার্ডার?'
'মার্ডার আবার কী? আজকাল মার্ডার বলে কিছু নেই, যাকে পারো ধরো আর মারো।'
'না মশাই, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই—সাত হাজার গেছে, আরও হয়তো যাবে। যায় যাক।'
'যায় যাক বলে কোনও শব্দ আমার ডিকশনারিতে নেই। ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। গণেশের পেট আমি ফাঁসাবই। ছুরি দিয়ে নয়, দৈব দিয়ে।'
'মাদুলি-ফাদুলি?'
'বাণ মেরে। বাণ মেরে শুকিয়ে দেব। দিন-দিন মরা কাঠের মতো চেহারা হয়ে যাবে।'
'ধ্যুস, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই!'
'বিশ্বাস নেই?' পলটুবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'হিন্দুর ছেলে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস নেই! কী আমার সায়েব রে!'
'নেই তা কী করব?'
'এখুনি বিশ্বাস হবে। এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, আপনি তো তুচ্ছ, আপনার বাবারও বিশ্বাস হবে।'
রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমরা রাস্তায়। অফিস-ভাঙা ভিড় বাসে-ট্রামে। পলটুবাবু বললেন, 'একটা সিগারেট ছাড়ুন। খুব খাইয়েছেন, মশাই। পৃথিবীতে সাধুও যেমন আছে, শয়তানও তেমনি আছে! মিলেমিশে এই জগৎ। আপনার মনটা বেশ ভালোই।'
সিগারেট ধরিয়ে ভুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।
'নিন, চলুন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দু-শালাকেই যমের বাড়ি পাঠাব। পঞ্চা আর গণশা। নেকলেস, আর সাত হাজার। হজম করতে দেব না।'
'কোথায় যাবেন?'
'সিরিটি।'
'সেটা আবার কোথায়?'
'কাছেই। বাসে ঘণ্টা-দেড়েক লাগবে।'
'সিরিটি যাব কেন?'
'সেখানে আমার গুরুর আশ্রম। মহাশ্মশানের পাশে। তান্ত্রিক। মন্ত্র পড়ে একটা জবাফুল মাটিতে ফেলে দেবেন, আকাশ থেকে হুড়মুড় করে প্লেন ভেঙে পড়বে, ব্রিজ থেকে ট্রেন ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, শোওয়ার ঘরে খাটের তলায় দপ করে আগুন লাফিয়ে উঠবে, সিলিং থেকে ফ্যান খসে পড়বে মাথার ওপর, আলমারির তলা থেকে সাপ বেরোবে ফোঁস করে। যখন যেখানে যা দরকার, ঠিক তাই ঘটে যাবে। চলুন, চলুন, আর দেরি না।'
গণেশের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছিল। ধরে এনে ব্যবসায় ভেড়ালুম। তিন বছর না যেতেই বিয়ে করে বসল। বাঙালির ছেলে বিয়ে করে সায়েবদের মতো হনিমুনে গেল—কুলু, মানালি, কত কী! তখন কি জানতুম ছাই, আমারই ট্যাঙ্ক ফুটো করে বাবুর লপচপানি। আদুরে বউকে নিয়ে দেড় মাস আদিখ্যেতা। দেখাই যাক না, কী হয়। গণেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তা না হলে সারা জীবন জোচ্চুরি করে যাবে। আজ আমার সঙ্গে, কাল রামের সঙ্গে, পরশু হরির সঙ্গে।
ভাবতে-ভাবতেই বাস এসে পড়ল। পলটু 'উঠুন, উঠুন' করে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিলেন।
সিরিটি জায়গাটা আদি গঙ্গার ধারে। কলকাতার এত কাছে এমন একটা অদ্ভুত জায়গা আছে, আমার জানাই ছিল না। পলটুবাবুর গুরুদেবের আশ্রম একেবারে নদীর ধারে। ঢালু জমি আশ্রমের পেছন দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে মজা নদীর দিকে। সেখানেই শ্মশান। আধপোড়া মৃতদেহ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। গোটাকতক শেয়াল সেই বীভৎস জায়গায় খ্যা-খ্যা করছে। কালো-কালো কুকুর ঘুরছে।

জ্বলজ্বলে চোখ। চারপাশে পচা গন্ধ। বিশাল একটা বটগাছ। তলাটা অন্ধকার। বাঁধানো বেদি। মাঝে-মাঝে কালপেঁচা ডেকে উঠছে। একটা দুটো করে বাদুড় ডাল থেকে খসে পড়ে সুইস-সুইস শব্দে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

একটা একতলা কোঠাবাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে আশ্রম বলে মনে হওয়ার কথা নয়। সামনেই উঁচু রোয়াক। পথ পাশ দিয়ে ঘুরে গা-ছমছম করা বটতলার অন্ধকার পেরিয়ে পেছনে আদিগঙ্গার ঢালে গিয়ে পড়েছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন মা ছিন্নমস্তা। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এক হাতে নিজের মুণ্ড, কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত উঠে মুখে ঢুকছে। নিজের রক্ত মা নিজেই পান করছেন।

পলটুবাবুর সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হল। ভেতরে উঠোন। উঠোন ঘিরে উঁচু দালান। টকটকে লাল রঙের মেঝে। সারি-সারি বড়-ছোট ঘর। একটি মেয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। শ্যামবর্ণা, কিন্তু ভারী মিষ্টি চেহারা। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'উনি এখন বিশ্রাম করছেন একটু। আজ অমাবস্যা। সারারাত পুজো আছে তো।'

পলটুবাবু বললেন, 'তা থাক। আমাদের খুব জরুরি দরকর। বেশি দেরি করলে গুরুজির পাওয়ারের বাইরে চলে যাবে। গুরুজি—গুরুজি! আমরা এসে গেছি।'

পলটুবাবুর দাপট কম নয়। গটগট করে দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'চলে আসুন না। ভয় পাচ্ছেন কেন?'

প্রথম যে-ঘরটা, সেটা বোধহয় ঠাকুরঘর। বেশ বড়। ধূপধুনো, ফুল-বেলপাতা সব মিলেমিশে কেমন একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে। একপাশে উঁচু বেদিতে তারা মূর্তি। বিশাল একটা প্রদীপ জ্বলছে থিরথির করে। সামনে আসন পাতা। চারপাশে ছড়ানো পূজার জিনিস।

ঘর পেরিয়ে ঘর।

'গুরুজি! গুরুজি!'

ভেতর থেকে ভেসে এল গম্ভীর গলা : 'অসময়ে কেন?'

'বিপদে পড়ে গেছি, গুরুজি।'

লাল টকটকে চেলি পরে গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ একটি খাটে শুয়ে আছেন। খোলা গা। লাল পইতে। মুখটি বেশ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল।

'তোর তো পদে-পদেই বিপদ। সঙ্গে আবার কাকে নিয়ে এলি?'

'আমার এক বন্ধু। দুজনেই বিপদে পড়েছি।'

'কী বিপদ?'

মেঝেতে দুজনে বসে পড়লুম। পলটুবাবুই সব বললেন। নেকলেস হাতিয়ে শ্যালক বেপাত্তা। সাত হাজার মেরে আমার পার্টনার হাওয়া।

গুরুজি সব শুনে বললেন, 'আমার কী করার আছে? আমি আমার সাধনভজন নিয়ে একপাশে পড়ে আছি। তোদের এসব ছ্যাঁচড়া ব্যাপারে আমি কী করব?'

'গুরুজি, সেবার আপনি জগাইকে সাত মাস হাসপাতালে ফেলে রেখেছিলেন।'

'কোন জগাই?'

'ওই যে আমার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। আমাকে একদিন ধরে খুব ধোলাই দিয়েছিল।'

'বারবার ওসব কাজ হয় না রে, পলটু। তা ছাড়া, এই কিছুদিন আগে আমি একটা বড় কাজ করেছি। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই।'

'কী বড় কাজ গুরুজি?'

'একটা বিমান দুর্ঘটনা, আর-একটা ট্রেন দুর্ঘটনা। আমার বহুত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন মাস-তিনেক আমাকে ক্রিয়াকলাপ করতে হবে।'

'ও দুটো কাজ কেন করলেন, গুরুজি?'

'প্রয়োজন ছিল।'

পলটু ঘষটে-ঘষটে গুরুজির খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরল : 'সামান্য কাজ, গুরুজি। এ তো আপনার কাছে ছুঁচো মারা।'

'একটা নেকলেস আর সাত হাজার টাকার জন্যে জ্বলজ্যান্ত দুটো লোককে মেরে ফেলব, শুয়োর?'

'পাপের শাস্তি, গুরুজি। গীতাতেই তো আছে, বিনাশায় চ দুষ্কৃতকারিণাং।'

'তোরা কী এমন সুকৃতি করেছিস?'

'আমি না হয় বদ, গুরুজি, কিন্তু আমার বন্ধু! পার্টনার মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে।'

'তাতে তোর কী রে, শালা?'

'পরের দুঃখে আমার মন যে কাঁদে।'

'আহা! আমার শ্রীচৈতন্য রে!'

পলটুবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। পা ধরে ঝুলোঝুলি। আমি একবার ফিসফিস করে বললুম, 'ছেড়ে দিন না, মশাই। যা হওয়ার তা হবে। নিজেরা বোকা বনেছি, বোকাই থাকি। পরের অনিষ্ট করে কার কী লাভ হবে।'

'কী যে বলেন? অন্যায় যে সহে, অন্যায় যে করে তব ঘৃণা তারে যেন...।'

'সে তো ঈশ্বরের ঘৃণা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ঘৃণা, সেই শাস্তিই তো গুরুদেব নামিয়ে আনবেন।'

গুরুজি এতক্ষণ শুয়ে-শুয়েই কথা বলছিলেন। এইবার ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন। পা দুটো খাট থেকে নেমে এসে ঝুলতে লাগল ড্যাং-ড্যাং করে। বেশ গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা। গুরুজি হঠাৎ ডাকতে শুরু করলেন, 'মায়া—মায়া!'

সেই মেয়েটি ঘরে এল। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে হয়ে যেত। বউকে খাওয়াবার মতো পয়সাকড়ির অভাবে আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে আছি। এই তো সবে লিলি বলে একটা মেয়েকে নাড়াচাড়া করে দেখছি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে লিলি বাতিল।

গুরুজি বললেন, 'একটা বড় বাটি করে একবাটি জল আন তো, মা।'

মায়া চলে গেল। আমার চোখও পেছন-পেছন চলল। নাঃ, গুরুজির চেলা বনে বাকি জীবনটা পদসেবা করেই কাটিয়ে দিই।

মায়া আবার এল। চ্যাটালো একটি কাঁসিতে টলটলে জল। মেঝেতে গুরুজির পায়ের কাছে সামনে ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখল। সেইসময় কিছু-কিছু জিনিস দেখে আমি প্রায় মরে যাওয়ার মতো হলুম। শরীর নয় তো, মরণ-ফাঁদ!

গুরুজি সেই জলের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পলটু, তোমার নেকলেস তোমার বাড়িতেই আছে, তোমার বউয়ের কাছে। আর তোমার? কী নাম তোমার?'

'জগন্নাথ।'

'জগন্নাথ। বেশ। তোমার সাঙাতকেও আমি আমার জল-দর্পণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখটা গোল। নাক থ্যাবড়া। চোখ দুটো মার্বেলের মতো। জোড়া ভুরু। ডান ঠোঁটের ওপর কাটা দাগ। কী, মিলছে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। ঠিক-ঠিক মিলছে।'

'মিলতেই হবে। কী নাম বলেছিলে?'

'গণেশ।'

গুরুজি স্তব্ধ হয়ে চোখ বড়-বড় করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী আশ্চর্য! আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গুরুজির চমক ভাঙল : 'ছ' থেকে সাত মাসের মধ্যে গণেশের ফাঁসি হবে।'

কথা ক'টা বলেই খুব ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন : 'তারা, তারা! তোরা এখন যা। যাওয়ার আগে মাকে প্রণাম করে যা।'

ঠাকুরঘরে মায়া হাঁটু মুড়ে বসে পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। মনে-মনে বললুম, আমার যদি একটা সংসার থাকত। এইরকম একটা শ্যামলী বউ। লিলি? যেমন নাম তেমনি ছিরি। হান্টারওয়ালি। বব চুল। ঠোঁটে লাল রং। মুখে মেকআপ। কটা সুন্দরী!

টেলিফোন বেজেই চলেছে। কেউ ধরে না কেন? বাড়িসুদ্ধ সব একসঙ্গে সুইসাইড করেছে নাকি? অবশেষে কেউ একজন ধরেছে। মেয়েলি গলা।

'হ্যালো!'

'গণেশ আছে?'

'কে আপনি?'

'আমি যেই হই না, গণেশ আছে কি নেই?'

'নেই। কলকাতার বাইরে গেছে।'

'অত পাঁয়তাড়া না করে এই কথাটাই তো আগে বললে হত।'

ফোনটা দুম করে নামিয়ে রাখলুম। বেটা কলকাতাতেই আছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেস ঠোকার আগে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই। এমনি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ভালো। নয়তো উকিলে খাবে হকের পয়সা। আমি নিজেই একবার যাব। আজই যাব। ওকে না পাই ওর বউকে বলে আসব।

ট্রাম থেকে নামতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি এল। ট্রামরাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিলুম। রাস্তাটা নেহাত কম চওড়া নয়। দু-পাশে খাড়া-খাড়া বাড়ি। দু-একটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান। এমন কিছু জোর বৃষ্টি নয়। পিটির-পিটির। সময়টা দুপুর-দুপুর। রাস্তাটা তাই নির্জন। পেছনে একটা মোটর সাইকেল আসছে ঝড়ের বেগে। ওই শব্দটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। ছেলেবেলার আতঙ্ক আর কি! একবার ধাক্কা খেয়েছিলুম। যতটা সম্ভব রাস্তার বাঁ-ধারে সরে গেছি। ভীষণ শব্দ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর দু-পাশে খাড়া-খাড়া বাড়ি। শব্দটা সেই কারণেই আরও জোর মনে হচ্ছে।

সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কী ঘটছে বোঝার আগেই ছিটকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়লুম। মোটর সাইকেলটা বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে সোজা হয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কোমরে ভীষণ লেগেছে। পড়বার সময় বাঁ-দিকে লাট খেয়েছিলুম, বাঁ-হাতটা মনে হয় ভেঙেই গেছে। হাঁটু দুটো অক্ষত নেই। কপালটাও কেটেছে নিশ্চয়। আচ্ছা জানোয়ার তো! কোনওরকমে উঠে বসতে পেরেছি। উঠে দাঁড়াতে পারব কি! সামনের বাড়ির দোতলার জানলায় একটি মহিলার মুখ। কী লজ্জার কথা! মেয়েদের সামনে বেইজ্জত। উঠে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। বাড়িটার দেওয়াল ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালুম। পা কাঁপছে। মাথা ঘুরছে। কোমর সোজা হচ্ছে না। উলটো দিকেই একটা লাল রক। একটু বসতে পারলে ভালো হত। আবার যেন মোটরসাইকেলের আওয়াজ আসছে কানে। সর্বনাশ! আবার ফিরে আসছে নাকি? খুব দ্রুত আসছে। এবার মারলে আর বাঁচব না। বাঁচার একমাত্র রাস্তা কোনওরকমে রকে গিয়ে ওঠা। ঝড়ের বেগে যমদূত এগিয়ে আসছে। ওই তো রক। না, আর হল না। শূন্যে উড়ে গেলুম যেন! শরীরের সমস্ত হাড়গোড় খুলে গেল। মোটরসাইকেলের তীব্র শব্দ। কোথাও সশব্দে জানালা বন্ধ হল। মেয়েলি চিৎকার।

একটা শিশি ঝুলছে। স্বচ্ছ একটা নল হাতে এসে ঢুকেছে। নাকে আর-একটা নল। শরীরটা সিসের মতো ভারী। কে যেন বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।'

খুটখুট জুতোর শব্দ। চোখে ঝাপসা দেখলেও দেখতে পাচ্ছি, একটা মুখ, মাথায় সাদা টুপি। সাদা অ্যাপ্রন। নীলপাড় শাড়ি। তিনটি মাত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারলুম। মার্ডার, পুলিশ, গণেশ। তারপর আমি কীরকম এক আলোর স্রোতে ভেসে গেলুম। যেতে-যেতে দেখলুম, একটা ফাঁসিকাঠ। গোল দড়ির ফাঁস,

গণেশ। একপাশে গুরুজি লাল চেলি পরে, আর-একপাশে আমি। আমার হাতে পুলিশের ব্যাটনের মতো গোল করে পাকানো, শীল অ্যান্ড সরকার কোম্পানির পার্টনারশিপ ডিড।

এইসব কথা আমি কী করে লিখলুম জানি না। আমি যদি লিখে থাকি, তাহলে আমি মরিনি। কারণ, মরা মানুষ আর যাই পারুক, লিখতে পারে না। আর আমি না মরলে, গণেশের ফাঁসি হয় না। ফাঁসি না হলে, দৈব মিথ্যে হয়ে যায়। তাহলে কী যে হয়েছে, কে জানে!

মাসিক রোমা
পুজো সংখ্যা, ১৯৮০



এক গুরুতর মামলায় গোয়েন্দা দে এবং গোয়েন্দা দাঁ

হিমানীশ গোস্বামী

গোয়েন্দা দাঁ ফোন করলেন গোয়েন্দা দে-কে। বললেন, মশাই, খুব জরুরি দরকার, এক্ষুনি একবার আপনাকে আসতে হবে।

গোয়েন্দা দে বললেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার জানেন, এই এক্ষুনি আমি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আশ্চর্য নয় কি? এক্ষুনি আপনি একবার আসতে পারেন আমার এখানে? একজন মক্কেল এসেছেন, অসাধারণ এক সমস্যা নিয়ে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, খুন, জখম, রাহাজানি, কিডন্যাপিং?

গোয়েন্দা দে বললেন, এখনও সেসব কিছু হয়নি—তবে সবই হওয়ার পথে। হ্যাঁ মশাই, ঠিকই বলছি—সবই হওয়ার পথে। আপনি একবার চলে আসুন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, অসম্ভব!

গোয়েন্দা দে বললেন, কেন অসম্ভব? আপনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব...।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আধ মাইলও নয়। হাঁটাপথে দশ মিনিট লাগতে পারে বড়জোর। রিকশায় তিন মিনিট। সবই জানি মশাই, সবই জানি—কিন্তু আমার পা চলছে না। সেই বাত না কী হয়ে গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা। দু-ঘণ্টায় ছ'টা অ্যাসপিরিন খেয়েছি, কিন্তু কিচ্ছু হচ্ছে না। আপনার সেই হোমিওপ্যাথির কীসব ওষুধ একবার দিয়েছিলেন না? সেবারে সেরে গিয়েছিল—সেই ওষুধ পাঠিয়ে দিন কাউকে দিয়ে, তারপর বিকেলের দিকে ভালো থাকলে যাব।

গোয়েন্দা দে বললেন, সে কী মশাই, আবার ওই বিশ্রী অসুখটা বাধিয়েছেন?—কথাটা বলে তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে হাসলেন। বললেন, গতবার যখন আপনার পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হয়েছিল, তখন আপনাকে যখন ওষুধ দিয়েছিলাম, আপনি কী বলেছিলেন মনে আছে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, মনে নেই আবার? বলেছিলাম ওসব বুজরুকিতে আমার বিশ্বাস নেই।

গোয়েন্দা দে বললেন, তারপর আপনি ওষুধ খেয়েছিলেন অনিচ্ছার সঙ্গেই। খাওয়ার ছ' ঘণ্টা পর ব্যথা কমে গেলে আপনি কী বলেছিলেন, মনে আছে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, মনে নেই আবার? বলেছিলাম, ও-ওষুধ না খেলেও যে সারত না, তার প্রমাণ পাওয়া দরকার।

গোয়েন্দা দে বললেন, তাহলে এবারে সেই চেষ্টাই করুন না কেন? ওষুধ না খেয়ে দেখুন না কী হয়!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, দোহাই দাদা, ওসব করবেন না। কবে কী বলেছিলাম, তা কি মনে করে রাখতে আছে? আচ্ছা, ওই যে মক্কেলের কথা বলেছিলেন, আর খুন রাহাজানি-টাহাজানির কথা বলছিলেন, সে-সম্পর্কে আর তো কিছুই বললেন না!

গোয়েন্দা দে বললেন, মক্কেল খুবই শাঁসালো। এবারে অবশ্য একটু দূরেই যেতে হচ্ছে আমাদের। পরশু বিকেলে প্লেন, একেবারে বোম্বাই। সেখানে তাজ হোটেল। তারপর দু-পাঁচদিন এদিক-সেদিক ঘুরে ফের আবার কলকাতায়। আর খরচ তাদের, এ ছাড়া দক্ষিণা নগদে সতেরো হাজার!

সতেরো হাজার শুনে গোয়েন্দা দাঁ ঢোক গিললেন। বললেন, স-তে-রো!

গোয়েন্দা দে বললেন, স-তে-রো।

গোয়েন্দা দাঁ জিগ্যেস করলেন, হা-জা-র?

গোয়েন্দা দে বললেন, হা-জা-র! ঘাবড়াবেন না—আধুনিক ভারতবর্ষে বহু বড়মানুষের দেখা পাবেন, যাঁদের কাছে এই টাকা একেবারে নস্যি!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, শুনেই যে আমার পায়ের ব্যথা কমতে শুরু করেছে! যাক, আপনি ওষুধ নিয়ে আসছেন তো?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আসছি বিকেলের দিকে—তবে ওষুধ এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দিনে চারবার দশ ফোঁটা করে জলের সঙ্গে খাবেন।

বিকেলবেলা গোয়েন্দা দে ঢুকলেন শিস দিতে-দিতে। গোয়েন্দা দাঁ-কে দেখে বললেন, আছেন কেমন বলুন?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, চমৎকার! না মশাই, ওষুধের গুণ আছে। একটু আগেই ছাদে উঠেছিলাম।

কেন ছাদে কেন?

ঘুড়ি ওড়াতে, আবার কেন?

গোয়েন্দা দে বললেন, বয়েস কত চলছে আপনার?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, চুয়াত্তর। এ-বয়েস কি ঘুড়ি ওড়াবার পক্ষে খুবই বেশি?

গোয়েন্দা দে বললেন, তা ঠিক নয়—তবে হাত-পা ভাঙার পক্ষে বয়েসটা তেমন জুতসই নয়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আমি আজ ছ'টা ঘুড়ি কেটেছি, আমার গেছে কেবল দু'খানা। এবার ব্যাপার কী বলুন।

গোয়েন্দা দে বললেন, একটা ব্যাপার করে ফেলেছি, মশাই, হয়তো অপরাধের মধ্যেই পড়ে সেটা। তবে কিনা, ব্যাপারটি অতি সামান্য—মানে কাজটি সামান্য, অথচ মুনাফা বেশি—সেজন্যে লোভ সামলাতে পারা গেল না। নিয়ে নিলাম কেসটা।

কেসটা কী, খুন-টুন?

গোয়েন্দা দে বললেন, এখনও খুন হয়নি—তবে মনে হয়, হবে একটা-দুটো। বিখ্যাত স্মাগলার গগনবিহারীর নাম শুনেছেন তো?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, গগনবিহারীর নাম শুনব না? সমস্ত ভারতবর্ষে তার অন্তত দুশো চেলা ছড়িয়ে রয়েছে, যার আয় মাসে কোটি টাকার ওপর, যার ব্যবসা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, চিন সীমান্ত জুড়ে। হেন জিনিস নেই যা ও স্মাগল করতে পারে না।

গোয়েন্দা দে বললেন, আমি অবশ্য অতটা জানতাম না। তবে এটা জানি, ওর দল মাসে দু-পাঁচটা প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে দেয়। গগনবিহারী লোকটি এক হিসেবে দারুণ নিষ্ঠুর। ক্ষমা কী তা সে জানে না। ছোট বয়েস থেকে পিতৃমাতৃহীন। বোম্বাইয়ের রাস্তায় তাকে কুড়িয়ে পেয়ে এক অনাথ-আশ্রমে কে ভরতি করে দেয়। বয়েস তখন তার দুই। তারপর ওই অনাথ-আশ্রম থেকেই তার চরিত্রের বিকাশ হতে থাকে। সেখানে সে একটা কুকুরকে বেঁধে একটা ছুরি দিয়ে তাকে কাটে, কেটে জীবন্ত অবস্থাতেই তার চামড়া ছাড়ায়। তখন তার বয়েস এগারো। ওই বয়েসেই সে আশ্রমের কাছে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সাংঘাতিক!

গোয়েন্দা দে বললেন, সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! যাই হোক, তার এই মধুর চরিত্রের জন্যে অনাথ-আশ্রমে তাকে নিয়ে হয় সমস্যা। সে জাগ্রত অবস্থায় কিছু-না-কিছু অন্যায় করতই। শাস্তিও পেত খুব। দু-হাত দু-পা বেঁধে দশ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে পর্যন্ত রাখা হয়েছে তাকে। তাকে দু-দিন পর্যন্ত না খাইয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু চরিত্র তার সংশোধন হয়নি। অবশ্য সে অনাথ-আশ্রমে বেশিদিন আর থাকেনি। তার বয়েস যখন বারো, তখন সে হঠাৎ একদিন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি দেখছি তার সব কথাই বেশ বিশদভাবে জানেন!

গোয়েন্দা দে বললেন, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পূর্বতন একজন অফিসার ঘোষালকে আজ ফোন করেছিলাম। ঘোষালকে মনে আছে আপনার? সেই যে বছর চল্লিশেক আগে বোম্বাইয়ের মালাবার হিলসের সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার নেকলেস চুরির ব্যাপারে যিনি আমাদের তলব করেছিলেন। মনে আছে? থাকবেই তো। অতি সজ্জন ব্যক্তি। আজ তাঁকে ফোন করাতে, তিনি এসব কথা জানালেন। আরও কিছু জানাতেন, কিন্তু মাঝখান থেকে ফোনটা কেটে গেল, আর জোড়া লাগানো গেল না। যাই হোক, শিগগিরই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ব্যাপারটা কী, মানে মামলাটা কী?

গোয়েন্দা দে একটু ইতস্তত করে বললেন, ব্যাপারটা আপনাকে বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছি। মানে, আপনি ভাববেন, আমার এই অধঃপতন কেন হল?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, কী বললেন—আপনার অধঃপতন হয়েছে নাকি?

গোয়েন্দা দে বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে! কিন্তু উপায় ছিল না। শুনুন তা হলে সবটা। আপনি জানেন, গগনবিহারী চোরাচালানকারীদের সর্দার। ভারতের সমস্ত চোরাই কারবার—বিশেষ করে ক্যামেরা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার এ-সমস্তের অন্তত ত্রিশভাগ তার তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। তার চক্র সমস্ত সীমান্তে সক্রিয়। তাকে চোরাইচালানের সম্রাট বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সম্প্রতি গগনবিহারীর গগনে মেঘের সঞ্চার হয়েছে। আর-একজন ওই একই গগনে উদয় হয়েছেন, তাঁর নাম রামখেল! নাম রামখেল হলেও লোকটি নাকি ধর্মে মুসলমান। তবে এসব ব্যবসায়ে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান-ইহুদি সবাই সমান। এখন গগনবিহারীর সঙ্গে রামখেলের প্রচণ্ড বিরোধ চলছে। কয়েক মাস আগে লক্ষ্ণৌয়ের কাছে একটা গুপ্ত গুদামে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছিল প্রায় দেড়কোটি টাকার চোরাই মাল। এই মাল গগনবিহারীর। গগনবিহারীর দৃঢ় ধারণা, পুলিশকে এর খবর জানিয়ে দিয়েছে রামখেলই। সেই থেকে দু-দলের মধ্যে নানারকম সংঘর্ষ চলছে। আসল নেতারা যে-যার বহাল তবিয়তে রয়েছে। তাদের গায়ে কেউ আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারে না, কিন্তু তাদের লোকজনের মধ্যে চলছে দারুণ রেষারেষি। বলা হয়, একটি বিমান দুর্ঘটনার মূলেও নাকি রামখেলের হাত ছিল। ওই বিমানে গগনবিহারীর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কলকাতা থেকে ওই বিমানটি যখন ওড়ে, তখন ওই বিমানটির একটি আসন খালিই যায়। সেদিন বিমানবন্দরের পথে ভি-আই-পি রোডে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। তখন ভোরবেলা, যখন গগনবিহারীর ট্যাক্সি বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটা গাড়ি সেই গাড়িকে ওভারটেক করে পিস্তল দেখিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বাধ্য করে। তারপর গগনবিহারীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা কী আছে ছিনতাই

করতে এলে গগনবিহারী তার পকেট থেকে 'সব টাকাই দিচ্ছি' বলে একটা পিস্তল বের করে পরপর দুটি গুলি করে। রাস্তায় পড়ে থাকে দুই যুবকের মৃতদেহ। দুটি যুবক জানত না, কার সঙ্গে চালাকি খেলতে গিয়েছিল। যাই হোক, এরপর পুলিশের আগমন ঘটে এবং গগনবিহারী পুলিশের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করতে থাকে। কিন্তু পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে দেড় ঘণ্টা আটকে দেয়। তারপর গগনবিহারীকে খুব বাহবা দিয়ে যখন ছেড়ে দেয়। তখন নেপালের বিমান নেপালের পথে আকাশে উড়ে গেছে।

তারপর এল সংবাদ। আটত্রিশজন যাত্রীসমেত বিমানটি ভেঙে পড়েছে। কোনও মালপত্রের ভেতর টাইম বোমা ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেল। গগনবিহারী মনে করল, তাকেই মারবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সে বেঁচে গেলেও এবং তার স্নায়ুর জোর বেশি হলেও তার মনের কোণে ভয় এসে বাসা বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ঠিক করল, রামখেলকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে তার জীবন নিরাপদ নয়। সে অবশ্য রামখেলের সঙ্গে দেখা করতে পারত। দেখা করে একটা মিটমাট করতে পারত, কিন্তু গগনবিহারীর চরিত্র মোটেই সেরকম নয়। সে স্থির করেই ফেলল, মারতে হবে রামখেলকে।

এবারে বলি রামখেলের কথা। রামখেলও ধোওয়া তুলসীপাতা নয়। খুনোখুনি সে-ও করেছে অনেক। রাজকোটের পুলিশ অফিসার সারোগীকে সে নিজের হাতে খুন করেছে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের মুখার্জিকে বোম্বাইয়ের শহরতলিতে গাড়িচাপা দিয়ে সে-ই মেরেছে। গোলাপ দেশমানেকে জলে ডুবিয়ে সে মেরেছে। তার কারণ গোলাপ দেশমানে পুলিশ অফিসার হয়েও তার দেওয়া জাপানি একটা টেলিভিশন সেট উপহার নিতে রাজি হয়নি। সঙ্গে অবশ্য একলক্ষ টাকার একটা তোড়াও ছিল, কিন্তু গোলাপ দেশমানে ছিল আদর্শবাদী যুবক। সে ভেবেছিল, সে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কিন্তু বেচারা পারল না। মোট কথা, রামখেল অন্তত একডজন ভালো-ভালো অফিসার হত্যার জন্যে দায়ী। এ ছাড়া, গোষ্ঠী-সংঘর্ষে সে যে কত লোককে মেরেছে, তার হিসেব করা সম্ভব নয়।

গগনবিহারী রামখেলকে মারবার চেষ্টা করেছে দু-বার। দু-বারই সে ব্যর্থ হয়। তারপর তার কাছে এসে পড়ে নেপাল থেকে একজন সায়েব। জাতে সে মার্কিন। তার ধান্দা হচ্ছে, দেশে-দেশে কুখ্যাত গুণ্ডাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করে দেওয়া। ছদ্মবেশ ধারণে, চলনে-বলনে এই মার্কিন সায়েব অসাধারণ চতুর। বয়েস চল্লিশও হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে সে নাম কিনেছে খুব। এর আসল নাম কেউ জানে না, তবে সম্প্রতি এর নাম শিলিঞ্জার। মার্কিন দস্যু ডিলিনজারের সঙ্গে নামের মিল আছে। এর সুবিধে হল, সায়েব বলে সর্বত্রই তার অবারিত দ্বার। আমরা স্বাধীন হয়েছি অনেক বছর—কিন্তু এখনও সায়েব দেখলে আমাদের মনে দারুণ গদগদ ভক্তি জাগে। সে-সায়েব প্রচণ্ড অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষিত বলে পরিচিত, তাঁদেরও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সায়েব দেখলেই একেবারে যেন ক্রীতদাস হয়ে পড়েন। এ এক অদ্ভুত সমস্যা আমাদের দেশে। এরই সুবিধে নিয়ে শিলিঞ্জার এ-দেশে দারুণ সুবিধে করে নিয়েছে। সে থাকে নেপালে। এখন বোম্বাইতে রয়েছে। পরশু তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে চারলক্ষ টাকা, একেবারে নগদে। সেই টাকা পেয়ে সে রামখেলকে খতম করে দেবে, এই তার প্রতিশ্রুতি।

গোয়েন্দা দাঁ প্রশ্ন করলেন, সব টাকাই কি নগদে দিতে হবে?

হ্যাঁ।

আর সব টাকা একসঙ্গে দিতে হবে, মানে, কাজ করবার আগেই শিলিঞ্জার যদি টাকা নেয়—শেষপর্যন্ত সে যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করে, কিংবা ব্যর্থ হয়?

কথাটা ঠিক। এখানে গগনবিহারী একটা মারাত্মক অবিবেচনার কাজ করেছে। কোনও কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এরকম প্রস্তাব করলে গগনবিহারী হা-হা করে হেসেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু যেহেতু শিলিঞ্জার একজন সায়েব —সে খুনে হোক, মিথ্যেবাদী হোক, কিচ্ছু এসে যায় না। চামড়ার রং সাদা যে তার!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এখন আমাদের এই নাটকে কোন চরিত্র?

গোয়েন্দা দে বললেন, আমরা হচ্ছি, ওই চারলক্ষ টাকার বাহক।

মানে?

মানে নগদ চারলক্ষ টাকা, একশো টাকার নোটে একটি সুটকেসে ভরে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে বোম্বাই। তারপর হোটেলে পৌঁছে গেলেই গগনবিহারীর লোক এসে ওই সুটকেস নিয়ে নেবে। ব্যস, ছুটি আমাদের!

এই কাজটা গগনবিহারী নিজেও তো করতে পারত?

পারত। কিন্তু সে কোনওরকম প্রমাণ রাখতে চায় না। তা ছাড়া, গগনবিহারীর সন্দেহ, সম্প্রতি কারা তার ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখছে। সম্ভবত কোনও প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা, কিংবা পুলিশ। গগনবিহারী এমনভাবে কাজটা করতে চায় যে, তার ওপর যত সন্দেহই হোক না কেন, কেউ যেন কিছু প্রমাণ করতে না পারে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, না, মশাই।

গোয়েন্দা দে বললেন, মানে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, মানে অতি সহজ। এরকম কোনও কাজে আমায় জড়াবেন না। কী দরকার বলুন, সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে এরকম অন্যায় একটা কাজে নিজেদের জড়ানো। হত্যার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করছি, এটা ভাবতেও তো খারাপ লাগবে, লাগবে না?

গোয়েন্দা দে বললেন, দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সব নির্ভর করে। এটা ঠিকই, আমরা একজনকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করছি। কথাটা অন্যায় বলেননি কিছু। কিন্তু কাকে হত্যার জন্যে, সেটা ভেবে দেখেছেন কি? একজন এক নম্বরের খুনে, বদমায়েশ এবং সমাজ-শত্রুকে। রামখেলের মতো লোক এ-দেশে যত কমবে, তত এ-দেশের মঙ্গল।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ঠিক কথা। কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু আমরা বিচার করবার কে? আমরা ফাঁসির হুকুম দেওয়ার কর্তা হলাম কবে থেকে? হোক না রামখেল দারুণ পাপী, হত্যাকারী, বদমায়েশ। স্বীকার করলাম, তার মতো খারাপ লোক দুনিয়ার আর নেই। কিন্তু তাকে সরালেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? রামখেলের জায়গায় এসে যাবে লক্ষ্মণখেল, নয়তো রহিমখেল। খেলোয়াড়ের অভাব হবে কখনও? সমাজটাকে বদলাতে যদি দু-দশটা খুন করতে হয়, তা হলে আমি নিজের হাতে তা করতে রাজি, কিন্তু এ তো সম্পূর্ণ স্বার্থপরের মতো, নিজের আখের গোছানোর জন্যে একটা অন্যায় খুনকে আশকারা দেওয়া!

গোয়েন্দা দে বললেন, খুন তো আপনাকে নিজের হাতে করতে হচ্ছে না। আমাদের কাজ হচ্ছে, একটা সুটকেসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। এর মধ্যে খুনের ব্যাপার আছে বা অতগুলো টাকা আছে তা আমাদের জানার কথাই নয়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, না জানা থাকলে একরকম কথা, কিন্তু জানবার পর ব্যাপারটা তো আর অতখানি নিষ্পাপ থাকছে না! না মশাই, ওসব ঝুট-ঝামেলায় আমাকে আর জড়াবেন না। আমি ওতে নেই। বয়েস হয়েছে—এখন ওসব পাপ কাজ করতে আর মন সায় দেয় না।

গোয়েন্দা দে এ-কথায় গুম হয়ে গেলেন। বললেন, আপনি যা বলছেন, তাতে আমারও এখন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে। সত্যি, কথাটা ভাবিনি এর আগে। বুঝলেন দাদা, চারদিকে অন্যায়, অবিচার, খুন-জখম এসব দেখে-দেখে বোধ হয় শুভবুদ্ধিও লোপ পেয়ে গেছে। আমি সত্যিই দুঃখিত দাঁ মশাই, সত্যিই দুঃখিত। তবে একটা কথা আছে। কথাটা আরে কিছু না—আমি সব কথা না ভেবেই রাজি হয়েছি, কথা দিয়েছি। এখন সমস্তই পাকা। এমনকী, অগ্রিমও নিয়েছি অনেকগুলো টাকা। এই অবস্থায় পিছোই-ই বা কেমন করে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সেটাও ঠিক। মক্কেলকে কথা দিয়ে তারপর ব্যাক আউট করা ঠিক হবে না। তবে একটা কাজ তো অনায়াসেই করা যায়—ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে দিলেই হয়। অর্থাৎ, আমরা সুটকেসটা পৌঁছে দেব ঠিকই—টাকাও নেব—এবং তারপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সুটকেস সমেত

শিলিঙ্গারকে ক্যাঁক করে ধরলেই চমৎকার! আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে গগনবিহারীর, শিলিঙ্গারের সঙ্গে নয়। অতএব শিলিঙ্গার যদি ধরা পড়ে, তা হলে আমাদের দায়িত্ব থাকছে না।

গোয়েন্দা দে বললেন, কিন্তু শিলিঙ্গারকে ধরবার জন্যে অজুহাত কী? তার কাছে এক সুটকেস টাকা পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু কাছে এক সুটকেস টাকা রাখা কি অপরাধ? তা ছাড়া, শিলিঙ্গার যথেষ্ট ঘুঘু লোক। শেষ পর্যন্ত সে পুলিশের জাল কেটে বেরোবেই। তারপর খোঁজখবর করতে-করতে যদি বুঝতে পারে এর মূলে আমরাই, তা হলে আমরা কি নিরাপদে থাকতে পারব? না, দাঁ মশাই, আপনার কথাটা তেমন কাজের নয়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, তা হলে অন্য একটা উপায় বের করতে হবে।

কিন্তু কোনও উপায় তাঁরা বের করতে পারলেন না। তারপর দুজনে বসে তিনবার দাবা খেললেন। ন'টা বাজল। গোয়েন্দা দে বললেন, আজ উঠি। আপনি ভাবুন। যদি কার সকালের মধ্যে কিছু ভেবে বের করতে পারেন, তা হলে ফোন করুন। আর তা না হলে অগত্যা আমাদের বোম্বাইতেই যেতে হবে। মক্কেলকে খুশি তো করতে হবে!

গোয়েন্দা দাঁর রাত্রে প্রায় ঘুমই হল না। অনেকরকম দুঃস্বপ্ন তিনি দেখে ফেললেন। সকালে উঠে তিনি বিরস বদনে চা পান করতে-করতে ভাবলেন, উপায় কী—অধঃপতনের পথেই যেতে হবে। গোয়েন্দা দে-র ওপর তাঁর খুব রাগ হয়েছিল প্রথমে। পরে তাঁর ভেবে মনে হল, গোয়েন্দা দে-র খুব দোষ নেই। ক্লায়েন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্ট। অর্থাৎ, মক্কেল হচ্ছে মক্কেল। মক্কেলের চরিত্র সাধু না হলে গোয়েন্দা কাজ নেবে না, এরকম নিয়ম হলে কোনওদিনই কি গোয়েন্দাগিরি করা সম্ভব হত? গোয়েন্দা দাঁ মনে-মনে হিসেব করে দেখলেন, তাঁরা যেসব মামলা হাতে নিয়েছেন, তার শতকরা নব্বুইভাগ ক্ষেত্রেই মক্কেলদের চরিত্রে কিছু-না-কিছু দোষ পাওয়া যায়। অতএব এই মামলার আর-একধাপ এগোনো কিংবা আর-একধাপ নীচের দিকে নামা। গত বছরের জানুয়ারিতে যে সুবিমলবাবুর দু-লাখ টাকা গায়েব হওয়ার মামলা হাতে নিয়েছিলেন, সেই সুবিমলবাবুই বা এমনকী সাধুপুরুষ? দু-লাখ টাকা আলমারি থেকে উধাও হয়েছিল। কিন্তু ওই দু-লাখ টাকা তিনি জমালেন কেমন করে? সুবিমলবাবুর যে ভেজাল তেলের কারবার আছে, সেটাও তো তিনি জানতেন। সেই ভেজাল তেলে যে বেশ কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেটাও তো ধরে নিতে হয়। কেউ হয়তো মারাই গেছেন। একহিসেবে সুবিমলবাবুও তো তা হলে সমাজবিরোধী। হয়তো হত্যাকারীও!

গোয়েন্দা দাঁ ডায়াল ঘুরিয়ে টেলিফোন করলেন গোয়েন্দা দে-কে। তিনি বললেন, রাজি!

গোয়েন্দা দে খুশি হয়ে বললেন, আমি আগেই জানতাম।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, কী আগেই জানতেন?

গোয়েন্দা দে বললেন, আপনি রাজি হবেন। আপনার পায়ের ব্যথা কেমন?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, চমৎকার। একেবারে সেরে গেছে।

গোয়েন্দা দে বললেন, ওষুধটা আরও তিনদিন চালিয়ে যান। এখন বোম্বাইতে কাজ অনেক না হলেও কিছু চলাফেরা করতে হবে। সঙ্গে ওষুধটা রাখবেন। নমস্কার।

গোয়েন্দা দাঁ যখন রিকশা করে ছোট একটা সুটকেস সঙ্গে করে গোয়েন্দা দে-র বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখনও বোম্বাইয়ের বিমান ছাড়তে চারঘণ্টা বাকি। কিন্তু গোয়েন্দা দাঁ যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর হঠাৎ মনে হল, কেউ বোধহয় তাঁকে অনুসরণ করছে। এটা তিনি বহুবারই লক্ষ করেছেন, কেউ তাঁকে অনুসরণ করলে তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। একটা অস্বস্তিকর ভাব দেখা দেয়। এটার কারণ কী তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর এক বন্ধু বলেন, এ হল গিয়ে সেই ই-এস-পি-র ব্যাপার, যাতে কেবল অতীন্দ্রিয়তার কথা বলে সান্ত্বনাই পাওয়া যায়, বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। তাঁর হঠাৎ মনে হল, এই কাজটিতে বিপদ আছে। বিপদ—বিপদ—বিপদ! তাঁর মনের মধ্যে কিছু ভয়ও ঢুকে গেল।

এরকম তাঁর আগেও হয়েছে কয়েকবার। সর্বদা নয়—কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তিনি বুঝতে পারেন, একটা কিছু অশুভ ঘটতে যাচ্ছে। রিকশা চলতে-চলতে হঠাৎ তিনি একটু পিছনে তাকালেন। দেখলেন, একজন লোক সাইকেল চালিয়ে তাঁর পিছন-পিছন আসছে। লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে সাঁত করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নিলেও তার সাইকেল কিন্তু ঠিকই চলতে লাগল। গোয়েন্দা দাঁ শঙ্কিত হলেন। তাঁর বুকের মধ্যেটা কীরকম ধড়ফড় করতে লাগে। তাঁর গোড়ালির ব্যথাটাও মনে হল আবার শুরু হয়েছে। তিনি কোনওমতে গোয়েন্দা দে-র বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রিকশাওলাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিতেই সেই সাইকেলওলা তাঁর পাশ দিয়েই প্রায় বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল। গোয়েন্দা দাঁ গোয়েন্দা দে-র দরজার বেশ টিপলেন।

ভেতরে ঢুকে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বসার ঘরে বিরাট টেবিলের ওপর লাল রঙের একটা বেশ মজবুত বাক্স। সেটার গায়ে দুটো বড় তালা। তা ছাড়া, বেশ শক্ত ধরনের একটা শেকল দিয়ে সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তাতে আবার বড় তালা লাগানো। গোয়েন্দা দে গোয়েন্দা দাঁ-কে দেখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, একটু আগেই এসে গিয়েছেন, ভালোই হয়েছে। দেখেছেন, বাক্সটি এমনভাবে সুরক্ষিত যে চাবি, ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে খুলতে হলে বোমা দরকার।

গোয়েন্দা দাঁ উদ্বিগ্নভাবে বললেন, কিন্তু হাজার গজ দূর থেকেই যে-কোনও গেঁয়ো মানুষও বলতে পারবে, একটা মাল বটে। সেটা ঠিক হয়নি।

গোয়েন্দা দে বললেন, তা যা বলেছেন। কিন্তু উপায় কী বলুন আর?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, কেন নীল রং কিংবা হালকা ছাই রঙা কোনও বাক্স কি বাজারে ছিল না?

গোয়েন্দা দে বললেন, লালটা বড্ড টকটকে। ঠিক বলেছেন। এটা আমার ভাবা উচিত ছিল।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, কী জন্যে জানি না, আমার মনে হচ্ছে, একটা বিপদ আমাদের সামনে আসছে।

গোয়েন্দা দে তাঁর পকেট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করলেন। বললেন, এতে ছ'টা গুলি পোরা আছে।

গোয়েন্দা দাঁ তাঁর পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে বললেন, গুলি এতেও আছে, কিন্তু পঁচিশ বছর আগেকার—এর বারুদ অক্ষত আছে কি না কে জানে। হয়তো ভিজে হাওয়ার দাপটে এর পদার্থ বলে কিছু আর নেই।

গোয়েন্দা দে বললেন, পিস্তল আছে এটাই যথেষ্ট।

ঠিক এইসময় হঠাৎ জানলা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল।

গোয়েন্দা দে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে দেখলেন। বললেন, একটা বছর বারোর ছোকরা হাফপ্যান্ট পরে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে।

গোয়েন্দা দাঁ কোনও উত্তর না দিয়ে বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরে বললেন, ব্যাপার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। পিছনে টিকটিকি লেগেছে। আমাদের ওপরে কেউ তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখছে।

গোয়েন্দা দে শিস দিয়ে গেয়ে উঠলেন, একটা নতুন হিন্দি ছবির গানের প্রথম লাইন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি দেখছি সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন!

গোয়েন্দা দে তার উত্তর না দিয়ে শিস দিয়ে উঠলেন। গোয়েন্দা দাঁ তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বোম্বাই বিমানবন্দরে নেমে বাইরে এসেই ট্যাক্সির সারি দেখে অবাক হয়ে গেলেন গোয়েন্দা দাঁ। প্রায় পনেরো বছর পর তিনি বোম্বাইয়ে এলেন। গোয়েন্দা দে বললেন, অবাক হয়েছেন দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, এই শহরে পঁচিশ হাজারের ওপর ট্যাক্সি রয়েছে, কলকাতায় ট্যাক্সির সংখ্যা কুল্যে পাঁচ হাজারও হবে না।

এইসময় একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়াতেই গোয়েন্দা দে তাতে উঠতে যাবেন, কিন্তু তাঁকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই একজন বদখত চেহারার লোক জোর করে সেটাতে উঠে পড়ে ড্রাইভারকে বলল, জলদি চালাও,

আন্ধেরি!

সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গেল। গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এ তো অদ্ভুত! কলকাতায় অন্তত এত অভদ্রতা নেই, আপনি যাই বলুন।

দ্বিতীয় ট্যাক্সিতে অবশ্য নিরাপদেই ওঠা গেল। 'তাজ', সংক্ষেপে জানালেন গোয়েন্দা দে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল খার, বান্দ্রা হাইওয়ে ধরে। কিছুক্ষণ পর মহালক্ষ্মীর কাছে এসে হঠাৎ গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়ল।

জায়গাটা খুব নির্জন নয়। অনেক লোকজন এসে গেল—সন্ধে তখন আটটা। গাড়িটা গিয়ে সজোরে ধাক্কা লাগাল একটা বাড়ির গায়ে। প্রচণ্ড আওয়াজ হল। গোয়েন্দা দাঁ এবং গোয়েন্দা দে দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

দুজনেরই জ্ঞান হল প্রায় একইসময়ে, হাসপাতালে। তখনই তাঁরা জানতে পারলেন, ড্রাইভারও আহত হয়ে ওই হাসপাতালেই অন্য ওয়ার্ডে রয়েছে। তার অবস্থা খুব ভালো নয়। সে নাকি প্রলাপ বকছিল—মাথায় তার চোট লেগেছিল, এখন তাকে ঘুমের ওষুধে রাখা হয়েছে। গোয়েন্দা দাঁ দুম করে খাট থেকে নেমে ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের জিনিসপত্র?

ডাক্তার বললেন, জিনিসপত্র? সে তো আমরা কিছু জানি না। হাসপাতালে ওই সময় যিনি ইমার্জেন্সি ডিউটিতে ছিলেন, তিনি বলতে পারবেন।

সঙ্গে-সঙ্গে গোয়েন্দা দে বললেন, চলুন, তা হলে ডিউটি অফিসারের কাছেই যাই।

ডাক্তার বললেন, আপনারা করছেন কী! আপনাদের দারুণ শক লেগেছে—এখন বিশ্রাম দরকার।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, মশাই, এখন বেশ আছি। আমাদের জিনিসপত্র আগে দরকার, নইলে সর্বনাশ।

ডিউটি অফিসার সচদেব খাতা খুলে দেখে বললেন, আপনাদের দুটো সুটকেস, দুটো পিস্তল, একটা হাতব্যাগ পাওয়া গেছে। তা ছাড়া দুটো ওয়ালেটও পাওয়া গেছে, তাতে নগদ তিন হাজার টাকা ছিল, আর ছিল ফিরতি বিমান টিকিট কলকাতার। কিছু ট্র্যাভেলার্স চেক।

গোয়েন্দা দে বললেন, আর-একটা ট্রাঙ্ক? ট্রাঙ্কের কথা লেখা নেই?

ডাক্তার সচদেব বললেন, নাঃ, আর বড় কিছুর কথা নেই। ছোটখাটো—বলপয়েন্ট পেন, একটা ছোট পেনসিল-কাটা ছুরি, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম—এই সব।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আমাদের জিনিসগুলো কি পেতে পারি?

ডাক্তার সচদেব একটু হেসে বললেন, নিশ্চয়ই পেতে পারেন। আপনারা থানায় যান, সেখানে আপনাদের পরিচয় দিলেই সব পেয়ে যাবেন।

থানার অফিসার বললেন, আপনাদের খুব কষ্ট গেছে কাল। আপনারা এমনভাবে নেতিয়ে পড়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল আর বুঝি বাঁচবেন না। কিন্তু আজ সকালে আপনাদের বেশ তাজাই দেখা যাচ্ছে।

গোয়েন্দো দে বললেন, আমাদের জিনিসগুলি যদি দিতেন তো ভালো হত।

অফ কোর্স!—থানার অফিসার বললেন, সব জিনিসই আমরা যত্নে রেখে দিয়েছি।

লাল রঙের বড় ট্রাঙ্ক একটা কি পেয়েছেন?

না। লাল রঙের বড় ট্রাঙ্ক? ছিল নাকি?

ছিল, ট্যাক্সির পেছনে।

কিন্তু আমরা তো থানায় ট্যাক্সি এনে তার পেছনটাও খুলেছিলাম। সেখানে একটা টায়ার ছিল, এক বোতল কেরোসিন ছিল, আর ছিল এক বোতল দেশি মদ। এ ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। ঠিক বলছেন, আপনাদের লাল রঙের একটা ট্রাঙ্ক ছিল?

গোয়েন্দা দাঁ অবসন্ন বোধ করছেন। এবার বোধহয় ভেঙে পড়বেন একেবারে।

পুলিশ অফিসার বললেন, ইস, আগে জানলে সুবিধে হত—আজ সকাল পর্যন্ত ট্যাক্সিটা এখানেই রাখা ছিল। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে ট্যাক্সিওলা এসে সেটাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঘাবড়াবেন না, তার ট্যাক্সির নম্বর আমাদের কাছে আছে। খুঁজে বের করতে ঘণ্টা-দুইয়ের বেশি লাগবে না। তবে গাড়ি রাস্তায় থাকলে কিছু দেরি হতে পারে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ট্যাক্সির ড্রাইভারের কিছু হয়নি?

পুলিশ অফিসার বললেন, ওকেও তো একই হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। ক্রমাগত ভুল বকছিল—মাথায় চোট লেগে। তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সকালে এসে বলল, সে ভালো হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে ট্যাক্সিটা ফেরত চায়। তা আমরা কোনও কথা না ভেবেই ট্যাক্সিটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। ওর বিরুদ্ধে তো কোনওরকম কেস ছিল না। একটা কেস ছিল, অসতর্কভাবে গাড়ি চালানো। তা নিয়ে একটা মামলা করা যেত অবশ্যই, কিন্তু সে পুলিশ ফান্ডে একশো টাকা চাঁদা দেওয়ায় মামলা করা হয়নি। তা, আপনারা কি তাকে সন্দেহ করছেন?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সন্দেহ? ও তো আর চুরি করেনি। ও নিজেই তো হাসপাতালে ছিল। চুরি করবার সুযোগই তো তার ছিল না।

গোয়েন্দা দে মনে-মনে কী যেন বিড়বিড় করে বললেন, কিন্তু কিছু শোনা গেল না। তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে বললেন, না মশাই, ট্যাক্সি ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করতে চাই না, তবে আমাদের একটা লাল রঙের ট্রাঙ্ক খোয়া গেছে, এটা রেকর্ড করাতে চাই। লাল রঙের মোটামুটি ভারী ট্রাঙ্ক। একদিকে ত্রিশ ইঞ্চি, অন্য দিকে কুড়ি, আর পনেরো ইঞ্চি উঁচু। ভারী লোহার চাদরে তৈরি—তার গায়ে দুটো তালা। তার ওপর শক্ত শেকল দিয়ে জড়িয়ে একটা বড় তালা আটকানো। শনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না।

পুলিশ অফিসার বললেন, তাতে কী ছিল?

গোয়েন্দা দে অম্লানবদনে বললেন, ডজন দুয়েক পুরনো পঞ্জিকা, কেজি-পাঁচেক খবরের কাগজ।

দামি কিছু ছিল না?

নাঃ, দামি কিছু ছিল না। তবে পুরোনো পঞ্জিকার দাম ভালোই পাওয়া দায়, যার দরকার তার কাছ থেকে।

থানার অফিসার সব লিখে নিলেন। তারপর গোয়েন্দা দে এবং গোয়েন্দা দাঁ-র জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে একটা রসিদে সই করিয়ে নিলেন। রাস্তার বেরিয়ে গোয়েন্দা দে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললেন, জুহু।

জুহুর কাছে ট্যাক্সি চলছে। হঠাৎ গোয়েন্দা দে একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে হোটেলে ঢুকেই বেরিয়ে এলেন। বললেন, আসুন, দাঁ মশাই, এটাতেই জায়গা আছে। দৈনিক দেড়শো টাকা—থাকা-খাওয়া সব। সমুদ্রের ভিউও মোটামুটি ভালো।

গোয়েন্দা দাঁ সুড়সুড় করে ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এলেন।

হোটেলের চমৎকার ডবল-রুমে ঢুকে গোয়েন্দা দে কাচের জানলা খুলে দিলেন। প্রচণ্ড জোর হাওয়া ঘরে ঢুকে একেবারে যেন উড়িয়ে নিতে চাইল।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এসবের অর্থ কী? এখন আমরা করব কী? পুলিশকে মিথ্যে কথা বলারই বা কী দরকার ছিল? চারলাখ টাকা কম নয়।

চারলাখ টাকা অনেক। ঠিক বলেছেন—বলে গোয়েন্দা দে একটা সিগারেট ধরলেন। তারপর বললেন, তবে কিনা, ধরুন, এককোটি টাকার তুলনায় এটা নস্যি। সবই আপেক্ষিক। গগনবিহারীর কাছে এ-টাকা হয়তো এক সপ্তাহের আয়—আমাদের কাছে এটা একটা বিরাট ব্যাপার!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, কিন্তু পুলিশকে মিথ্যে কথা বলাটা কি ঠিক হল?

গোয়েন্দা দে বললেন, দাড়ি কামানোটা দরকার, কী বলেন? তারপর চান-টান করে একেবারে ফ্রেশ হয়ে হোটেল থেকে সমুদ্র দেখতে হবে!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি আমাকে সব কথা বলছেন না, বুঝতে পারছি। বেশ, তাই হোক। আমি এতে নেই। আমি আজই সন্ধের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাব।

গোয়েন্দা দে বললেন, কেন? বিমানের টিকিটই তো রয়েছে। আজই বিমানে ফিরে যেতে পারেন। আমি আটকাব না।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, তবু আপনি সব কথা ভেঙে বলবেন না?

গোয়েন্দা দে বললেন, একটু ধৈর্য ধরুন। গুছিয়ে সব বলতে হবে তো! পরশু সন্ধেবেলা সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্টে একবার যেতে হবে। তার আগে যথাসম্ভব ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে। আর হ্যাঁ, দু-জায়গায় ফোন করতে হবে। ঘোষালকেও ফোন করে তার কুশল সংবাদ নিতে হবে। এবার আর তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না মনে হচ্ছে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে কেন? আমরা কী অপরাধ করেছি, মশাই, যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে? তা ছাড়া, তাজে আমাদের বুকিং ছিল, সেখানে না গিয়ে এত দূরে এই জুহুতেই বা কেন আমরা থাকব?

গোয়েন্দা দে বললেন, আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি একে-একে। প্রথম কথা, আমাদের ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। তবে তাতে একটা রিস্ক আছে। ধরুন, আপনার বুকের মধ্যে দিয়ে তিনটে গরম গুলি সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল, সেটা তো ভালো নয়। কিংবা ধরুন, আমার পায়ে গুলি লাগল...।

গোয়েন্দা দাঁ এ-কথায় খ্যাঁক করে উঠে বললেন, কেন, আপনার পায়ে গুলি লাগবে, আর কেনই বা আমার বুকে গুলি লাগবে?

গোয়েন্দা দে বললেন, ওটা কথার কথা। যাই হোক, আমি আপনার অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি। তাজে বুকিং ছিল তাতে কী হয়েছে? একটু পরে ফোন করে সেটাকে ক্যানসেল করব। আর জুহুতে কেন থাকব? তা হলে শুনুন, আমার জুহু জায়গাটা চমৎকার লাগে, আর আমার মনে হয়, আপনারও ভালো লাগবে। এবারে আপনি চান-টান করে নিন, আমি গোটাকয়েক টেলিফোন করে নিই। আর-একটা কথা, আপনার ওষুধ খাওয়া হয়নি অনেকটা সময়। তাড়াতাড়ি এক ডোজ খেয়ে নিন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হল চমৎকার। দু-রকম মাছ ছিল, এ ছাড়া কড়া করে ভাজা পমফ্রেট মাছ, সঙ্গে লেবুর টুকরো। পমফ্রেট মাছ খেতে হলে ভাজা খাওয়াই প্রশস্ত, ভাবলেন গোয়েন্দা দাঁ। চমৎকার—বোম্বাইয়ের হাওয়ায় বেশ খিদে হয় তো! একটু বেশিই খাওয়া হয়ে যায় দুজনের। কিন্তু এখন তো আর কোনও কাজ নেই, তাই বেশি খেলে ক্ষতিও নেই তেমন।

খাওয়ার পর দুজনেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল বিকেল প্রায় চারটেয়। সার্ভিসে টেলিফোন করে তাঁরা আনালেন চমৎকার দার্জিলিং চা আর চিজ স্যান্ডউইচ।

পায়ের অবস্থা কেমন?—গোয়েন্দা দে জিগ্যেস করলেন।

চমৎকার!

আর-একটু অন্ধকার হলে আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসব। এই সমুদ্র-সৈকত অতি চমৎকার।

সন্ধেবেলা দুজনে বেরোলেন। জুহু সমুদ্র-সৈকত তখন জমজমাট। ডাব, চিনাবাদাম, ভেলপুরি বিক্রির ধুম লেগে গেছে। আইসক্রিম, ঠান্ডা শরবত এসবেরও চলছে বেচাকেনা। কিন্তু মানুষজনের একটা দিকে ভ্রুক্ষেপ একেবারেই নেই। আইসক্রিমের ঠোঙা, ডাবের খোলা এসব নির্বিচারে ফেলা হচ্ছে সমুদ্রের বালিতে। সমুদ্র অবশ্য এতে রাগ করে না, কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাঁরা বেড়াতে আসেন, সেই সব নরনারীর শতকরা নব্বুইজনই মনে করেন জায়গাটা নোংরা এবং শতকরা আটানব্বুইজনই নোংরা করতে সাহায্যও করেন।

চমৎকার কাটল সন্ধেটা। গোয়েন্দা দে ক্রমাগত এটা-সেটা কিনে খেয়েছেন, দাঁ-কে খাইয়েছেন। কিন্তু দাঁ-র মনে অস্বস্তি। তাঁর মনের মধ্যে কী যেন সর্বদাই খচখচ করছে।

বিপদ! হ্যাঁ, বিপদই হবে তাঁদের। তাঁর মন বলছিল, বিপদ হবে। বিপদ হয়েওছে। কিন্তু এর ওপর দিয়েই কি কেটে যাবে ফাঁড়া? আরও সাংঘাতিক কিছু কি হবে না?

গোয়েন্দা দাঁ চিন্তিত হয়েই রইলেন।

একটা দিন কেটে গেল এইভাবে। বিশেষ কোনও ঘটনাই ঘটল না। তাঁরা দুজন বেয়ারাকে দিয়ে দোকান থেকে দাবার সেট আনিয়ে খেলেছেন কয়েকবার।

প্লাস্টিকের সেট। কলকাতায় যার দাম ছ' টাকা, এখানে তারই দাম নিয়েছে পনেরো টাকা। গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আসলে দাম একই, বেয়ারাকে দিয়ে কেনানোতে দাম বেশিই পড়ে।

গোয়েন্দা দাঁ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কথাটা শুনে। বলেছেন, তা একটাকা বেশি নিক না, নিক না ছ' টাকা বেশি! তাই বলে একেবারে ন' টাকা বেশি, এ যে সাংঘাতিক!

খুব খাওয়া-দাওয়াও হচ্ছে। প্রত্যেকবারই পমফ্রেট মাছ ভাজা বিশেষ করে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা।

এইভাবে তৃতীয় দিন এল। সকালবেলা গোয়েন্দা দে বললেন, আজ সন্ধে আটটার সময় সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্টে যাব। তার আগে একবার তাজে যেতে হবে।

কেন, তাজ কেন?

চাবি সংগ্রহ করতে হবে না?

চাবি? কীসের চাবি?

কেন, টাকা ভরতি ট্রাঙ্কের?

কিন্তু সে-টাঙ্ক এখন কোথায়?

সে-ট্রাঙ্ক আসছে সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্ট মারফত। আর সেই ট্রাঙ্কের চাবি ইতিমধ্যেই ডাকে এসে গেছে।

গোয়েন্দা দাঁ হাঁ করে রইলেন। বললেন, তার মানে?

গোয়েন্দা দে বললেন, তার মানে অতি সহজ। আপনার সঙ্গে দেখা করার আগেই আমি দুটো কাজ করেছিলাম। একটা ট্রাঙ্কে টাকা ভরে সেটাকে সুজিতদের হাতে জমা করে দিয়েছিলাম। সুজিত হচ্ছে আমার বন্ধু অমলানন্দর ছেলে। বড় ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি রয়েছে তাদের। খুবই বিশ্বাসযোগ্য ওরা। তার ওপর সেটাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনশিয়োরও করিয়েছিলাম। খরচ সবসমেত পড়েছে যৎসামান্য—দুশো পঞ্চাশের কিছু ওপর। এইভাবে শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দিয়েছি। তারা ভেবেছে, টাকা ভরতি রয়েছে আমাদের সঙ্গের ট্রাঙ্কে। ওর ওপরই তাদের ছিল নজর। আসল মাল যে লরিতে করে বিনা পাহারায় আসছে, সেটা তারা জানত না।

আর ওই লাল ট্রাঙ্কটা?

সেটা?—গোয়েন্দা দে হাসলেন। বললেন, ওর মধ্যে রয়েছে একগাদা পুরোনো পঞ্জিকা আর কেজি-পাঁচেক পুরোনো খবরের কাগজ! আমি পুলিশকে মিথ্যে বলিনি।

এরপর কী করবেন?—গোয়েন্দা দাঁ হতবুদ্ধি হয়েই প্রশ্ন করলেন।

আর কী করব? গগনবিহারীর লোক আমারই একটা চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করবে সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্ট অফিসের সামনে। তার কাছ থেকে গগনবিহারীর রসিদ নিয়ে তার হাতে দিয়ে দেব ট্রাঙ্কটা। আর কী—তারপর কাজ শেষ! কাল ভোরের প্লেনে কলকাতা! না, কলকাতা নয়—ভুল বলেছি, দিল্লি। দিল্লিতে আমার শ্যালকের ওখানে তিন সপ্তাহ থাকব। আপনিও থাকবেন, আর তার মধ্যেই নিশ্চয় খবর পেয়ে যাব রামখেলের মৃত্যুর। শিলিঙ্গার যে-কাজে হাত দেয়, তা সে করেই। অতএব ওই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত! এখন আমরা কলকাতায় গেলে বিপদ-টিপদ হতে পারে, কেন না, রামখেল লোকটি সুবিধের নয়। সে ব্যাপারটি জেনে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কেন না, কলকাতা থেকেই তার চর আমাদের পেছনে

লেগেছিল। তারপর বোম্বাই বিমানবন্দর থেকে তাজে যাওয়ার পথে কার-অ্যাক্সিডেন্টটাও।...সে অনেক কথা, কাল ভোরবেলা বিমানে বসে বাকিটা বলা যাবে।

বিমান চলেছে মেঘের মধ্যে দিয়ে।

গোয়েন্দা দে বললেন, দিল্লিতে থাকবার জন্যে গগনবিহারীর লোককে বলে আরও পাঁচ হাজারের ব্যবস্থা করেছি।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, চমৎকার করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে প্রথম থেকে সব কথা বলেননি কেন?

গোয়েন্দা দে বললেন, কারণ ড্রাইভার রামখেলেরই লোক। বোম্বাই বিমানবন্দরে দেখলেন না, যে-ট্যাক্সিটা আমরা প্রথমে নিতে যাচ্ছিলাম, সেটা কেমন কৌশলে রামখেলের লোক সরিয়ে দিল? এর কারণ, রামখেল আগেই খবর পেয়েছিল—কেমন করে আমার জানা নেই—যে, তাকে হত্যার জন্যে গগনবিহারী চেষ্টা করছে এবং আমাদের ওপর সে-ভার দেওয়া হয়েছে। সবসময় গগনবিহারীর ওপর তার লোক নজর রাখছে, এটাই সম্ভব। কোনওরকমে খবরটা তারা পেয়ে যাওয়াতে রামখেল আমাদের খতম করে দিতেই চেয়েছিল। আমার ধারণা, যেখানে ট্যাক্সিটার দুর্ঘটনা ঘটানো হয়, সেখানে তার লোকও প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য লোকজন এসে পড়ায় তারা মারতে সাহস পায়নি। আমার মনে হয়, ড্রাইভারের হুকুমেই তারা আমাদের হয়তো খতম করত। কিন্তু ড্রাইভার দুর্ঘটনা ঘটাতে গিয়ে নিজেই আহত হয়ে পড়ে, ফলে সে আর তখন আদেশ দিতে পারেনি। গাড়ি থেকে লাল বাক্সটা বের করে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। তারা জানে, আমাদের মারা খুব কঠিন হবে না। কেন না, তাজে আমাদের বুকিং রয়েছে, সেটা নিশ্চয় তারা জানে। আমরা হাসপাতাল থেকে অত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব সেটাও তারা আন্দাজ করতে পারেনি। আর শেষ পর্যন্ত আমরা যে তাজে উঠবই না, সেটাও তাদের হিসেবের বাইরে ছিল। অতএব, এ পর্যন্ত আমরা নিরাপদ।

গোয়েন্দা দাঁ জিগ্যেস করলেন, আপনি তা হলে আমার সঙ্গে কথা বলার আগেই সেনগুপ্ত ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে নোটের ট্রাঙ্কটিকে বোম্বাইয়ে পাঠিয়েছিলেন?

না, তা করিনি। আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরই অবশ্য তা করেছিলাম। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির রসিদটাও তাজের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম চাবির সঙ্গে, পোস্ট অফিসের মারফত ইনশিয়োর করে। তারপর আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

অর্থাৎ, আপনি ধরেই নিয়েছিলেন, আমি রাজি হব?

না। আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি রাজি না হতেও পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আমাকে একাই করতে হত। নয়তো তারক ধরকে ডাকতে হত।

তারক ধর? মানে যে-ছোকরা ডিটেকটিভির ড পর্যন্ত জানে না?

উপায় কী বলুন! আপনি রাজি না হলে একজনকে তো সঙ্গে নিতেই হত!

যেমন কিনা,—গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি গগনবিহারীর কথায় রাজি না হলে, অন্য কেউ এই টাকাটা পৌঁছে দিত। তাই না?

ঠিক বলেছেন।—গোয়েন্দা দে বললেন।

আচ্ছা, আর-একটা কথার উত্তর দেবেন?—গোয়েন্দা দাঁ প্রশ্ন করলেন।

ছুড়ুন প্রশ্নটি, দেখি, উত্তর আমার জানা আছে কি না।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আচ্ছা মশাই, যদি শিলিঞ্জার সফল না হয়—মানে, রামখেলের খেল খতম করতে সে যদি সমর্থ না হয়, তা হলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

গোয়েন্দা দে বললেন, অবস্থা একটু জটিল হবে নিশ্চয়। তা ছাড়া, এখন আমাদের বয়েস...আপনার চুয়াত্তর চলছে, আমার বাহাত্তর। দু-দিন আগে আর পরে, এই তো—সেজন্যে অত চিন্তা করি না আমি। তবে শিলিঞ্জারের ওপর বিশ্বাস রাখুন—ও ঠিক একটা ব্যবস্থা করবে।



বাঁকা পথে

অমিত চট্টোপাধ্যায়

'তাকিয়ো না, তাকিয়ো না, চাঁদু। চোখ ঠিকরে যাবে। এই এক, এই দুই, এই তিন... টেক্কা...' হাতের তাস ফেলে দিয়ে সুশীল ঘোষ হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর টেবিলের ওপর থেকে বাজির টাকাগুলো চেঁছে তুলে নিয়ে পকেটে ভরল।

ওর এই গলা-ফাটানো হাসি এর আগে আর কোনওদিন এত বিশ্রী লাগেনি বিভাস রায়ের। বরং এ-যাবৎ তারিফই করে এসেছে। রেল অফিসে দুজনেই চাকরি করে, যদিও ডিপার্টমেন্ট আলাদা—তবু বারান্দা পার হওয়ার সময় বা অফিস-ক্যান্টিনে সুশীলের এরকম দরাজ গলার হাসি হরদমই শুনে থাকে সে। আর ভালোও লাগে। কারণ সে-হাসিতে খোলা মনের আর সহজ হৃদ্যতার আমেজ পায় বিভাস। আজ অবশ্য পেল না। কী করেই বা পাবে! সুশীলের পাল্লায় পড়ে সে তাস খেলতে বসেছিল, ধীরে-ধীরে সারা মাসের মাইনেটা ওর পকেটেই ঢুকে গেছে।

ফাঁকা মাঠের মতন শূন্য টেবিল। অন্য খেলুড়েদেরও কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বিভাস মহা অনর্থটাকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য টেনে-টেনে হাসতে লাগল। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'আরে, টাকা তো শান্টিং ইঞ্জিন—আসবে-যাবে, আসবে-যাবে। মাইনে পাওয়ার দিন তো আবার সামনের মাসেও আসবে।'

ডেসপ্যাচের অনাদি জোয়ারদার একটা বিড়ি ধরিয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'দোষ্টা আমাদেরই। ভাই-ব্রাদারের মধ্যে খেলা। অত মোটা-মোটা টাকা বাজি না রাখাই উচিত ছিল।'

তাস ভাঁজতে-ভাঁজতে সুশীল বলল, 'নইলে রক্তে এই সুড়সুড়িটুকু লাগবে কেন? আর মাধুর্য তো সেইটুকুই।'

'কিন্তু মধুর লাগছে কই? ক্যাশ নশো টাকা আমারই গেছে...।'

'কেটে পড়বে নাকি তাহলে?'

অনাদি জোয়ারদার বাঁকা সুরে বলল, 'কেটে পড়ার কথা বলছি না, সুশীল। আমরা সব আইবুড়ো কার্তিক, এ-চোট সইবে। কিন্তু বিভাস হালফিল বিয়ে করেছে, ঘরে নতুন বউ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে...।'

বিভাসের আত্মসম্মানে বোধ করি ঘা লাগল। তাই আরক্ত মুখে প্রতিবাদ করল, 'বসে থাকবে ঠিকই, তবে আমার মাইনের টাকার জন্যে নয়, আমার পথ চেয়ে। অতএব কাটলুম আমি। এদিকেও এগারোটা বাজে।'

উঠে পড়ে সে সুশীলের আলনা থেকে হাওয়াই শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে গলাল। বিদায় নেওয়ার জন্য ফিরে তাকিয়ে দেখল, ততক্ষণে সবাই হাতের তাসে তন্ময় হয়ে গেছে। অগত্যা বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে সুশীল উঁচু গলায় বলল, 'শ্রীমতীকে আমার শুভেচ্ছা জানিও হে।'

বিভাস ফিরে তাকিয়ে নীরস কণ্ঠে বলল, 'যদি অবসর পাই।'

'পাবে, পাবে...সুন্দরী বউয়ের মিষ্টি একটু সোহাগ...হা-হা-হা...' নিজের রসিকতায় হেসে উঠল সুশীল 'আচ্ছা, কাল আবার অফিসে দেখা হবে।'

বিভাস দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। সুশীলের মুখের দিকে আর তাকাতে প্রবৃত্তি হল না তার। পথে এসে পড়তেই রাজ্যের দুর্ভাবনা তার কাঁধে চেপে বসল। অতঃ কিম? সারা মাসের মাইনে খুইয়ে শূন্য পকেটে বাড়ি ফেরার কী কৈফিয়ত দেবে সে? হালকাভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে? অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে? বলবে, পকেট থেকে কোথাও পড়ে গেল, না কেউ মেরেই দিলে, ঠিক...। না, শ্রীমতী জানে, তার স্বামী এতটা ন্যালাখ্যাপা নয়। স্বামীর মিথ্যে কৈফিয়তটা শুনে ধীরে-ধীরে মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে উঠবে, চোখ ফেটে বেরিয়ে আসবে ফোঁটা-ফোঁটা জল। স্বামীর মাইনের প্রতিটি পয়সা যে তার গায়ের এক-এক ফোঁটা রক্ত! বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সে একখানা শাড়িও কেনেনি, কোনও সিনেমা-থিয়েটার দেখেনি। তিলে-তিলে শুধু সঞ্চয় করেছে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। সেক্ষেত্রে এত বড় নির্জলা মিথ্যে বিভাস শ্রীমতীকে বলবে কী করে? আপনমনে কৈফিয়তগুলো দু-চারবার উচ্চারণ করে দেখল, কিন্তু কোনওটাই নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার যোগ্য বলে মনে হল না। শ্রীমতী বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার মিথ্যেটুকু ধরে ফেলতে এতটুকুও দেরি হবে না। নিজেকে বিভাস বোকা বলে প্রতিপন্ন করবে। ফলে স্ত্রীর শ্রদ্ধা, সহানুভূতি চিরদিনের মতো সে হারাবে।

ভাবতে-ভাবতে বিভাস এক প্রায়ান্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়ল। পাড়াটার সুনাম নেই। খুন, জখম, ছিনতাই প্রায়ই ঘটে থাকে।

চলতে-চলতে আচমকা থেমে পড়ল বিভাস। ঠিক হয়েছে। শ্রীমতীকে সে বলবে, এই জায়গায় আসতেই, অন্ধকারের ভেতর থেকে এক দুর্বৃত্ত ছোরা হাতে তাকে আক্রমণ করে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়েছে। এরকম রাহাজানি যখন এ-পাড়ায় হামেশাই ঘটে থাকে, তখন শ্রীমতীর বিশ্বাস না করবার কোনও কারণ নেই।

বুক ঠেলে একটা স্বস্তির শ্বাস বেরিয়ে এল বিভাসের। ডান দিকে না বেঁকে, সে দ্রুত পায়ে আরও খানিকটা সোজা পথে এগিয়ে গেল। এবার পথের দু-পাশে দেখা গেল উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি সারি-সারি একতলা বাড়ি। এখনও অবশ্য অধিকৃত হয়নি—তাই জায়গাটা বেশ ফাঁকা আর গাঢ় অন্ধকার। সেখানে পৌঁছে বিভাস কাঁটা-ঝোপে নিজের হাত-পাগুলো ছড়া-ছড়া করে নিল, সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মাখল, জামার কলার, হাতা সব ফালা-ফালা করে ছিঁড়ল। ধস্তাধস্তির রূপসজ্জা। তবু ভয়ে তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। হাজার হোক, আনাড়ি তো! মেক-আপে কোথাও গলদ থেকে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা না হাস্যকর হয়ে ওঠে। যাই হোক, শেষপর্যন্ত মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সে আবার ফিরল। রাস্তার ধারের একটা পানের দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের আপাদমস্তকের ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিটা বারকয়েক বুলিয়ে নিল। মনে-মনে খুশিই হল সে। না, শ্রীমতী কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না।

আর দুটো মোড় পার হলেই তার বাড়ির রাস্তা। এই দূরত্বটুকু দ্রুত পায়ে পার হয়েই সে অকস্মাৎ গতি শ্লথ, মন্থর করে দিল। যেন অতি শ্রান্ত, ক্লান্ত—কোনওক্রমে পা—দুটো টেনে-টেনে নিয়ে চলেছে।

সদর দরজার সামনে পৌঁছে সে হাঁফাতে-হাঁফাতে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলল শ্রীমতীই। স্বামীকে দেখে খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওঃ! তুমি!' কিন্তু সে-কণ্ঠ তার পরক্ষণে আর্তনাদে রূপান্তরিত হল, বিভাস যখন টলতে-টলতে একরকম ঠিকরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে পড়ল।

পক্ষীমাতার মতন দু-ডানা বাড়িয়ে শ্রীমতী যেন তাকে যেন বুকের মাঝে টেনে নিল। উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'কী হয়েছে, ওগো, কী হয়েছে তোমার? ও রকম করছ কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠের অভিনয়ে বিভাস বলে উঠল, 'মাস্তানের পাল্লায় পড়েছিলুম, শ্রীমতী। হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলুম। এই সময় অন্ধকার কানাগলি থেকে একটা অল্পবয়েসি ছেলে ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

শিউরে উঠল শ্রীমতী। তাকে ধরে রেখেই অস্ফুট আর্তনাদে বলে উঠল, 'সর্বনাশ! কোথাও লাগেনি তো তোমার? ছোরা-টোরা বসাতে পারেনি তো...।'

'নাঃ! প্রাণে বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। কিন্তু...' ভগ্ন কণ্ঠে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল বিভাস, 'কিন্তু আমার সব টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে...সারা মাসের মাইনে...' ধপ করে একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল সে।

তার অবস্থা দেখে শ্রীমতীর চোখে জল এসে গেল। দেখতে ছিপছিপে হলেও দেহে তার শক্তি বড় কম ছিল না। স্বামীকে টেনে তুলতে-তুলতে সহজ কণ্ঠেই বলল, 'যা যাওয়ার তা গেছে। তুমি এখন বাথরুমে গিয়ে জামাপ্যান্ট ছেড়ে চান করে নাও তো!'

'না, না, না, একটু বসতে দাও। মাথায় আমার আগুন জ্বলে যাচ্ছে, শ্রীমতী। অতগুলো টাকা! সারা মাস আমাদের চলবে কী করে?'

'টাকার জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। প্রাণে যে বেঁচে এসেছ...' জোর করে বিভাসকে তুলে বাথরুমে নিয়ে যেতে-যেতে শ্রীমতী বলল, 'আমাদের পাড়াটাও হয়েছে তেমনি। যত চোর-ডাকাতের আড্ডা। পুলিশ তো ভুলেও এ-রাস্তা মাড়ায় না।'

বিভাস কোঁত পাড়তে-পাড়তে বলল, 'ঘটনার সময়টিতে ওদের টিকি দেখা যায় না, শ্রীমতী। ওরা আসে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর।' বাথরুমে ঢুকে গেল সে।

গ্যাস জ্বেলে দুধটা চট করে গরম করে ফেলল শ্রীমতী। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বিভাস বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই দুধটা স্বামীর সামনে ধরে দিয়ে সে বলল, 'দুধটা খেয়ে নাও। আজ রাত্তিরে আর কিছু দেব না। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়োগে, আমি কাটাগুলোয় মলম লাগিয়ে দিই...।'

'কিছু করতে হবে না। সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়াল বিভাস। যেন নিজেকে সম্বোধন করেই বিড়বিড় করে বলল, 'আমি শুধু ভাবছি, সারা মাস চালাব কী করে! কার কাছে গিয়ে হাত পাতব!'

শ্রীমতী মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দু-চার টাকা করে যা বাঁচিয়েছি, তাতে এ-মাসটা চলে যাবে। তুমি বরং শুয়ে পড়বার আগে থানায় একটা ফোন করে দাও।'

বিভাস একেবারে আঁতকে উঠল : 'থানায়!'

'হ্যাঁ, থানা।' রুষ্ট কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, 'ছোরা নিয়ে তোমার ওপর চড়াও হল, অতগুলো টাকা ছিনিয়ে নিল, আর মুখ বুজে থাকবে? পুলিশকে কিছু জানাবে না?'

'লাভ নেই, শ্রীমতী, কিছু লাভ নেই। চেনোই তো আমাদের দেশের পুলিশকে। তা ছাড়া যে চড়াও হয়েছিল, অন্ধকারে তাকে তো আমি দেখতেই পাইনি। শনাক্তই বা করব কী করে?'

জেদের সুরে শ্রীমতী বলল, 'তাতে কিছু যায়-আসে না। পুলিশে জানানো উচিত বলেই জানাবে। তুমি কি চাও, জামাই-আদরে মাস্তানদের হাতে টাকাগুলো তুলে দিই?'

বিভাস কোনও জবাব দিল না। নীরবে দুধের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

স্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শ্রীমতী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি যদি না চাও, তাহলে আমিই ফোন করে দিই।'

সশব্দে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিভাস উষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'না, না। টেলিফোন তুমিও করবে না, আমিও করব না। অপরাধীকে তো পুলিশ ধরতে পারবেই না, মাঝখান থেকে ছুটোছুটি করতে-করতে আমার প্রাণ যাবে।'

শ্রীমতী সহজ কণ্ঠেই বলল, 'এখনও মেজাজ তোমার বিগড়ে আছে। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়োগে। আমি হাতের কাজ মিটিয়ে যাচ্ছি। তখন এ নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে।'

শোওয়ার ঘরে এসে বিভাস ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার সামনে দাঁড়াতেই শিউরে উঠল। মুখের পরতে-পরতে অপরাধ-কুণ্ঠিতের ছবি। স্ত্রীর সঙ্গে এ কী জঘন্য প্রতারণা! তবু এই প্রতারণাকেই সত্যের মুখোশ পরিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু শ্রীমতী যদি সত্যিই পুলিশে ফোন করে, তাহলে? পুলিশের জেরার মুখে প্রকৃত ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে বাকি থাকবে না। তার চেয়ে শ্রীমতীর বদলে সে-ই পুলিশে ফোন করবে। মিথ্যের জাল বুনে সত্যিটুকু হয়তো তাদের কাছে সে গোপন করে রাখতে পারবে। কিন্তু শ্রীমতীর ওই বুদ্ধিদীপ্ত দু-চোখ হয়তো তার অন্তরের গহনতম প্রদেশে পৌঁছে সত্যটুকু টেনে আনবে বাইরের আলোয়।

শুতে পারল না বিভাস। অস্থির চরণে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

হাতের কাজ মিটিয়ে শ্রীমতী সবেমাত্র ওপরে যাবে বলে সিঁড়ির গোড়ার এসেছে, স্বামীকে নামতে দেখে জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাবে? পুলিশে ফোন করতে নাকি?'

ঘাড় নেড়ে বিভাস সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, না করাটা ভুল হবে।'

বসবার ঘরে ঢুকে সে রিসিভারটা তুলে নিল। একটু ইতস্তত করে টালিগঞ্জ থানাতেই ফোন করল। ফোন ধরলেন ও. সি. স্বয়ং। খবর শুনে তিনি একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। কতক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটেছে, আততায়ীর চেহারার সঠিক বর্ণনা দিতে পারেন কি না, পকেটে কত টাকা ছিল ইত্যাদি।

একটার পর একটা কাল্পনিক জবাব দিতে-দিতে বিভাসের একসময় মনে হতে লাগল, হয়তো ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছিল সে দুর্বৃত্তের হাতে, মাইনের টাকাটা জুয়া খেলে সে হারেনি, প্রকৃতই ছিনতাই হয়েছে তার কাছ থেকে।

মনে দেখা দিল একটা নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল ভাব। এই সময় ও. সি. জীবনলাল ধর বেশ কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এখুনি একবার থানায় চলে আসতে পারেন, মিস্টার রায়? মনে হয় কালপ্রিটকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি।'

'কাকে? কালপ্রিট...মানে আমার টাকা যে...।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে। যেখানে আপনার টাকাটা খোয়া গেছে, তার কাছাকাছি জায়গা থেকেই আমরা মাস্তানটাকে পাকড়াও করেছি। কাজেই আপনার আসাটা বিশেষ দরকার।'

বিভাস যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। কোনও সাড়াশব্দ দিতে পারল না।

'কই, কথা বলছেন না কেন, মিস্টার রায়?'

জড়িত কণ্ঠে এবার বিভাস কোনওরকমে উত্তর দিল, 'আচ্ছা...আমি যাচ্ছি...যাচ্ছি।'

না গিয়েই বা ও কী করে পরিত্রাণ পাবে?

'ঠিক আছে', ও. সি. বললেন, 'আপনি তৈরি হয়ে থাকুন। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়ি গিয়ে আপনাকে তুলে নিয়ে আসছে।'

শিথিল হাতে বিভাস রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। ঘুরতেই দেখল, শ্রীমতী বড়-বড় দুই চোখের সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বিভাসের বুকের ভেতর টিপটিপ করছিল। একেই ইংরিজিতে বোধহয় বলে গরম চাটু থেকে আগুনে। ঢোক গিলে সে বলল, 'ও. সি. বললেন, ছিনতাইকারীকে ওঁরা বোধ হয় গ্রেপ্তার করতে পেরেছেন। এখুনি আমায় থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠাচ্ছেন।'

'দেখলে তো!' আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল শ্রীমতী : 'আর তুমি কিছুতেই ফোন করতে চাইছিলে না।'

হেসে বিভাস বলল, 'অত সহজ নয়, শ্রীমতী। সন্দেহজনক অনেককেই তো পুলিশ হাজতে পোরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধোপে টিকবে কি না...।'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, টিকবে। আমি বলছি।' কণ্ঠে জোর দিয়ে শ্রীমতী বলে উঠল, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও দিকিনি।'

কার কবিতায় যেন বিভাস পড়েছিল, 'খেঁদি আর সে খেঁদি নেই, মিস রমলা রায়।' টালিগঞ্জ থানার সামনে এসে জিপ থেকে নামতেই তার সেই লাইনটা মনে পড়ে গেল। রং-চং হওয়ার পর পোড়ো বাড়ির চেহারায় রূপের চটক লেগেছে। তবু ভেতরে পা দেওয়ার সময় বিভাসের মনে হল, সে বুঝি অভিযোগকারী নয়, আসামী।

তার পদার্পণে পাহারাদার থেকে বড়বাবু সকলের ভেতরই একটা সাড়া পড়ে গেল। ও. সি. জীবন ধর সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাকে 'আসুন, আসুন, মিস্টার রায়। বাধ্য হয়েই রাতদুপুরে আপনাকে টেনে আনতে হল।'

ঠোঁটের ডগায় জোর করে একটু ক্ষীণ হাসি টেনে এনে বিভাস টেবিলের অপরদিকের চেয়ারখানার বসে পড়ল, ভদ্রতা জানাতে বলল, 'আপনাদের কৃতিত্বের কথা ভেবে আমার নিজের কোনও অসুবিধের কথা মনেই আসছে না...।'

'অনেকটা কাকতালীয় ব্যাপার, মিস্টার রায়।' হাসলেন জীবন ধর : 'যে-জায়গায় আপনার ওপর আক্রমণ হয়েছিল, প্রায় সেই জায়গা থেকেই ক্রিমিনালটাকে গ্রেপ্তার করেছি। দুজনে যে একই লোক সে-বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহই নেই। তবু আপনি একবার তাকে চোখে দেখুন, যদি শনাক্ত করতে পারেন।'

কিছু বলতে গিয়েও বিভাস পারল না। ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপল।

হাজতঘরের এক কোণে অল্পবয়েসি একটি যুবক বসে-বসে ঝিমোচ্ছিল। দরজা থেকে প্রহরারত কনস্টেবল হেঁকে উঠল, 'খাড়া হো যাইয়ে, ছোকরে।'

ছোকরা চোখ মেলে একবার তাকাল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। বিভাসকে সঙ্গে নিয়ে ও. সি. জীবন ধর ভারী-ভারী পা পেলে ঘরে ঢুকলেন, যুবকটির দিকে আঙুল বাগিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে আপনার আসামী, বঙ্কিম। বয়েস অল্প বটে, কিন্তু এর মধ্যেই বেশ হাত পাকিয়েছে।'

বঙ্কিম মুখে-চোখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলেও, সে যে ভেতরে-ভেতরে বেশ ভয় পেয়েছে, সেটা একেবারে গোপন করতে পারেনি।

জীবন ধর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'উঠে দাঁড়াও হে, ছোকরা। হ্যাঁ, সোজা হয়ে। এঁকে নিশ্চয় ভালোভাবেই চেনো?'

বঙ্কিম ঠোঁট উলটে বলল, 'জীবনে ওঁকে আমি কোনওদিন দেখিইনি।'

লজ্জায় বিভাস তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

জীবন ধর জিগ্যেস করলেন, 'কী, চিনতে পারলেন মিস্টার রায়?'

বিভাস চট করে একবার বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে নিল। ও. সি.-কে এড়িয়ে যাওয়ার সুরে বলল, 'আমি তো ফোনেই আপনাকে বলেছি, জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার ছিল। ভালোভাবে ঠাহর করতে পারিনি।'

জীবন ধর বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তার জন্যে আপনাকে এতটুকুও আপশোস করতে হবে না, মিস্টার রায়। আরও অনেক-অনেক প্রমাণই আমাদের হাতে আছে, তাই না হে বঙ্কিমচন্দ্র?'

নাক দিয়ে একটা জান্তব শব্দ করে উঠল বঙ্কিম।

এবার প্রকরণে চলে গেলেন ও. সি.। বিভাসকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার পকেটে ঠিক কত টাকা ছিল, মিস্টার রায়?'

জবাব দিতে দেরি হল না বিভাসের : 'সতেরোশো ছিয়াশি টাকা।'

নিজের পকেটে হাত ভরিয়ে জীবন ধর বড় সাইজের একখানা লেফাফা বার করে আনলেন। তার মুখটা খুলতে-খুলতে বললেন, 'গ্রেপ্তারের পর আমরা উদ্ধার করেছি সতেরোশো বাহাত্তর। গুণে দেখুন আপনি। ছিনতাই করবার পর বাকি টাকাটা মাস্তানসাহেব হয় খরচা করেছেন, না হয় কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে। ধরা পড়বার সময় ব্যাটাচ্ছেলে খরগোশের মতন ছুটছিল তো। সেটাও তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত প্রমাণ—ছুটে পালাবার চেষ্টাটা।'

বিভাস খামের টাকা গুনে-গুনে দেখল—সতেরোশো বাহাত্তরই আছে। কিন্তু অতঃপর কী করবে ভেবে পেল না সে।

জীবন ধর তাকে হাজতঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বঙ্কিম না শুনতে পায়, এমনই চাপা গলায় বললেন, 'দেখুন মিস্টার রায়, কাজটা আমার বেআইনি তা জানি, তবু আপনাকে অনুরোধটা না করে পারছি না।'

'অনুরোধ?' রীতিমতো বিস্মিত হল বিভাস।

'হ্যাঁ। ওই বঙ্কিম ছোকরার কথা বলছি। আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমি ওকে সেই ইজের-পরা অবস্থা থেকেই দেখে আসছি। বড়জোর পনেরো-ষোলো বছর বয়েস। মানছি, এই বয়েসে আর পাঁচটা মাস্তানের মতো অনেক বদরোগই ওর হয়েছে। তবে হাতেকলমে এই প্রথম ও এ-কাজ করল, বুঝলেন না?'

বিভাস নির্বোধের মতন তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আজ্ঞে না, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মুখখানা কালো করে জীবন ধর বলে উঠলেন, 'আমি পাঠশালার পণ্ডিত নই মশাই যে, মাথায় মুগুর মেরে বুদ্ধির খোঁটা পুঁতে দেব। ও যে ধোয়া তুলসীপাতাটি, আমি তা বলছি না। তবে কিনা এ-বয়েসে শোধরাবার সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে হয়তো সম্পূর্ণ শুধরে যাবে। তবে সে-সুযোগ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই আছে।'

আরও যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল বিভাসের। অস্ফুট কণ্ঠে সে টেনে-টেনে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'ওকে বাঁচাতে হলে আজ রাত্তিরের ঘটনাটা আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। আপনার টাকার প্রায় সবটাই যখন উদ্ধার হয়েছে, তখন ওটা নিয়ে বাড়ি চলে যান। পুলিশের খাতায় আর ডায়েরি লেখাবেন না। আমি বঙ্কিমকে রীতিমতো ধাতানি দিয়ে দু-এক ঘণ্টা পরে খালাস করে দেবো।'

বিভাস তখনও সহজ হতে পারেনি। অনুযোগের সুরে বলল, 'কিন্তু ইংরিজিতে বলে, ''মেকারস' মাস্ট নট বি ব্রেকারস'', 'এভাবে আপনি যদি আইন ভাঙেন...।'

'কী হবে ওকে জেলে পচিয়ে?' ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠলেন জীবন ধর : 'ঘানি টেনে ক'জন শোধরায়, মশায়? চাকরিজীবনে অনেক তো দেখলুম। তবে এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মত। আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে ডায়েরি লেখাতে পারেন। সে-অধিকার আপনার আছে।'

সমস্ত দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ঘুচে গিয়ে বিভাসের বুকের ভেতরটা আচম্বিতে এমন হালকা হয়ে গেল যে, আর-একটু হলেই সে হেসে ফেলেছিল আর কী। ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'না, না, কক্ষনও না। ছেলেটির কোনওরকম ক্ষতি হয়, আমি তা মোটেই চাই না। তা ছাড়া বলেইছি তো, ও-ই যে নিয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। আপনি যা ভালো মনে করবেন, তাই হবে।'

'ধন্যবাদ মিস্টার রায়। নিশ্চিন্ত করলেন আমায়।' কৃতিত্বের হাসি হাসলেন জীবন ধর। পকেট থেকে প্রকাণ্ড খামখানা বার করে বিভাসের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'নিন, আপনার টাকাটা ধরুন।'

কম্পিত হাতে বিভাস টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরল। আনন্দে সর্বাঙ্গ তখন তার থরথর করে কাঁপছে। কোনওরকমে বিদায় নিয়ে সে গিয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ পুলিশের গাড়িতে চেপে বসল। বাড়িতে পৌঁছে সে ঘরে ঢুকেই শ্রীমতীকে বুকে টেনে নিয়ে এমন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল যে, ফুলশয্যার রাতের পর আর কখনও তা করেনি।

সকালে উঠে কিন্তু বিভাসের মনের এ-প্রফুল্ল ভাব রইল না। বঙ্কিমের মুখখানা বিঁধে থাকা কাঁটার মতনই নিরন্তর তাকে পীড়া দিতে লাগল। শ্রীমতী বারেবারেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে গো? শরীর কি ভালো নেই?'

বারেবারেই সে আমতা-আমতা করে এড়িয়ে গেল এবং পাছে ধরা পড়ে যায়, তাই নাকে-মুখে চারটি গুঁজেই অফিসে রওনা হয়ে পড়ল।

সেই গলিপথটা পার হওয়ার সময় নতুন করে যেন ধাক্কা খেল বিভাস। নেহাত অল্পবয়েসেই বঙ্কিম ছেলেটি অসৎ পথে গেছে বটে, কিন্তু টাকাটা তো আসলে তার—তা সে যেমন করেই উপার্জন করে থাকুক না কেন। বিভাস নিজেকে ক্ষমা করবে কী করে? হয়তো গরিবের সংসারের হাজাররকম তাগিদ মেটাতেই সে এ-কাজটা করেছিল। হয়তো বাড়িভাড়া না দিলেই নয়, হয়তো রেশন আনতে হবে, কী বাপ-মা-ভাই-বোন কারও জন্যে ডাক্তার ডাকতে হবে।

মনে-মনে শিউরে উঠল বিভাস। বঙ্কিমকে দুর্বৃত্ত ভাবার কী অধিকার আছে তার? আদালত তো তাকে দণ্ড দেয়নি। জেল-হাজতও খাটেনি সে। তবে?

নিজের টেবিলের কাছে এসে শ্রান্ত দেহে সে চেয়ারে বসে পড়ল।

নিত্যকার মতন জল দিতে এসে পুরোনো বেয়ারা রামতরুই তার মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে, রায়বাবু? শরীর খুব খারাপ?'

'রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি তো, তাই...' ইচ্ছে না থাকলেও ফাইলপত্রগুলো টেনে নিল বিভাস। কিন্তু একেবারে মন দিতে পারল না। কানে যেন অনবরত বঙ্কিমের কণ্ঠটা ভেসে আসতে লাগল, 'সংসারে সাধু সাজবার কোনও দাম নেই। শেষপর্যন্ত সেই তো হাতে বেড়ি, কোমরে দড়ি...।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল বিভাসের। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে টালিগঞ্জ থানার নম্বরটা ডায়াল করল।

ওপার থেকে ক্রমাগত কোঁ-কোঁ শব্দ আসতে লাগল। মনে হচ্ছে এনগেজড। রিসিভারটা সবেমাত্র নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে, এই সময় সুশীল ঢুকল। নিজের চেয়ারের দিকে যাচ্ছিল সে। কপালে, গালে স্টিকিং প্লাস্টারের পটি লাগানো। ঠোঁটদুটো ফুলো-ফুলো।

বিস্মিত বিভাস জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে সুশীল? কপালে, গালে তাপ্পি কেন?'

'আর বোলো না, ব্রাদার। কাল যা রাত্তির গেছে!' তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল সুশীল 'তুমি চলে যাওয়ার পরে-পরেই আমাদের খেলা ভেঙে গেল। শুতে যাব, দেখি প্যাকেট খালি। অপরাধের ভেতরে রে ভাই সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর থেকে এক মাস্তান ছেলে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে...।'

বিস্ফারিত চোখে বিভাস একরকম চিৎকারই করে উঠল, 'সত্যি বলছ তুমি? যা বললে, তা...।'

'মিথ্যে বলে আর লাভটা কী? কাল তোমার কাছ থেকে যা জিতেছিলুম, তার পাই-পয়সাটি পর্যন্ত...।'

'পুলিশে জানাওনি?'

'দুর, দুর! কাকে ধরবে পুলিশ! শহরে কি ওই একটিই উঠতি গুণ্ডা? তার চেয়ে ব্রাদার, পকেটে থাকে তো দশ-বিশটা টাকা ধার দাও তো। দিন-দুয়েক পরেই শোধ দিয়ে দেব'খন।'

বিভাস স্মিত হাসি হেসে বলল, 'আপত্তি ছিল না ভাই। তবে জানোই তো, আমি আবার বিবাহিত।'

পুলিশে ফোন আর সে করল না।

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৮০



কালরাত্রি

মনোজ সেন

চিত্তপ্রসাদবাবু নিবিষ্টচিত্তে যথারীতি দাবা খেলছিলেন আমাদের ক্লাবে। আমরা সবাই তাঁর ভ্রকুটি অগ্রাহ্য করে চারদিকে ঘিরে বসে পড়লুম। বললুম, 'অনেকদিন আপনার জীবনের কাহিনি শুনিনি আমরা, রায়মশাই, আজ একটা শোনাতেই হবে।'

চিত্তপ্রসাদ বিরক্ত মুখে বললেন, 'উঃ, জ্বালিয়ে মারলেন আপনারা। আপনাদের এই ক্লাবে আসা দেখছি বন্ধ করতে হবে। যা হোক, গল্প শুনতে চাইছেন যখন, শোনাব। কিন্তু এই শেষ।'

আমরা সমবেতভাবে মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, তা কী করে হয়? তবে এইটে শোনার পর আর মাসখানেক কিছু শুনতে চাইব না, কথা দিচ্ছি আমরা।'

চিত্তপ্রসাদ বললেন, 'বেশ। মাসখানেক পরে আমাকে আর ইহজগতে দেখতে পাবেন কি না আপনারা কে জানে। এখন গল্প যে শুনতে চাইছেন, কীসের গল্প শুনতে চান, বলুন। আমার জীবনে অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তো বড় কম হয়নি। কাজেই, কী ধরনের গল্প শুনতে চান, জানালে সুবিধে হয়।'

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা রায়মশাই, আপনি তো বিখ্যাত উকিল, আবার আইনসভার সদস্যও ছিলেন। মানে, আপনি আইনের স্রষ্টা এবং ব্যাখ্যাতা, দুই-ই। আপনি জেনেশুনে, ইচ্ছে করে, কোনওদিন আইন ভেঙেছেন?'

চিত্তপ্রসাদ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আইন আমি অনেকবারই ভেঙেছি। সেজন্যে জেলও খেটেছি। তবে সে-আইন ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর, আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আইন। আপনি বোধহয় সেরকম আইনের কথা বলছেন না। আপনি জানতে চাইছেন, আমি এমন কোনও অপরাধ করেছি কি না, যা সর্বদেশে সর্বকালের সামাজিক আইনের বিরোধী, তাই না? হ্যাঁ, করেছি। আমার চোখের সামনে ঘটা একটা হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপ করেছি এবং হত্যাকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। এই কাজ কোনও দেশের আইন সহ্য করে না, তা সে-দেশ স্বাধীন বা পরাধীন যা-ই হোক না কেন।'

আমরা বিস্ফারিত চোখে সমস্বরে বললুম, 'কী সর্বনাশ! এরকম কাণ্ড করতে গেলেন কেন?'

চিত্তপ্রসাদ দাবার বোর্ড সরিয়ে রেখে বললেন, 'করেছিলুম। সে-কাহিনিই তাহলে শুনুন। তবে সেটা একটা এতই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে, আপনারা হয়তো সব শুনে বলবেন, বুড়োর ডবল ভীমরতি হয়েছে। তা, যা খুশি

আপনারা বলতে পারেন, আমার কিছুই যায়-আসে না। আগে এসব অভিজ্ঞতার গল্প বলতে ভয় পেতুম, আজ আর পাইনে। জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে সমালোচনা, প্রশংসা সবই আমার কাছে তুল্য-মূল্য।

'উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো চল্লিশের মধ্যে আমি অজস্রবার জেল খেটেছিলুম। এই একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলুম, ধরে নিয়ে তিন মাস ঠুকে দিলে। আবার বেরিয়ে এসে বিলিতি কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করলুম, দু-মাসের জন্যে ঢুকিয়ে দিলে। এইরকম চলছিল। এরই মধ্যে আমার ওকালতিও চলছিল, নামও হচ্ছিল।

'এইসময়, বোধহয় ঊনচল্লিশ কি চল্লিশ সাল হবে, হঠাৎ একদিন আমার কাছে আমার বন্ধু চন্দ্রশেখরের জরুরি তলব নিয়ে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। চন্দ্রশেখর ছিল বর্তমান মালদা জেলার বকুলপুর গ্রামের জমিদার, আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। তার আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারিনে। কাজেই, একদিন বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে বকুলপুর রওনা দিলুম।

'এখানে বসন্ত সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলে রাখা ভালো। কারণ, এই গল্পে তার ভূমিকাই প্রধান বলা চলে।

'বসন্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আলিপুর সোল জেলে। আমি তখন সেখানে রাজবন্দি, বসন্ত আমার দেখাশুনো করত। শ্যামপুকুরের আদিত্য সিংহের বাড়ির লক্ষ টাকা দামের গৃহদেবতার মূর্তি চুরির জন্যে তার লম্বা সাজা হয়েছিল।

'তা, সে-সময় আমরা মনে করতুম, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হলে স্বরাজ আসতে পারে না। কাজেই দেশোদ্ধারের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের, বিশেষত পণ্ডিত মানুষের, চরিত্র সংশোধন করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতুম আমরা। আর এই কাজের আদর্শ জায়গা তো জেল। আমাদের লেকচার শুনতে-শুনতে অনেক চোর বোধহয় চুরি করা ছেড়ে দিয়েছিল এই ভয়ে যে, ধরা পড়ে জেলে গেলে আবার না ওই লেকচার শুনতে হয়।

'বসন্তকে এমনি লেকচার দিতে গিয়ে আমার খটকা লাগল। দেখি, লোকটা সাধারণ অপরাধী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। লক্ষ করলুম, সে পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলে না, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে, আর অবসর সময়ে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে খিস্তি-খেউড় না করে চুপ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে কীসব ভাবে—তখন তাকে দেখলে রীতিমতো সম্ভ্রম হয়। এমন লোককে উচিত, অনুচিত বা নীতি-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কী? উলটে আমিই মাঝে-মাঝে লেকচার শুনে ফেলতে লাগলুম।

'এরকম মানুষটা হঠাৎ চুরি করতে গেল কেন? একদিন বসন্তের আড়ালে আর-এক কয়েদি কার্তিককে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলুম। কার্তিকও চোর ছিল, কিন্তু সে দেখতুম বসন্তকে শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। কার্তিক বলল, "বসন্তদাদা চুরি করতেই পারে না, রায়বাবু। তাকে শ্যামপুকুরের সিঙ্গিরা অন্যায় করে ফাঁসিয়েছে।"

'আমি জিগ্যেস করলুম, "কেন? সিঙ্গিদের সঙ্গে তোর বসন্তদাদার শত্রুতা কীসের?"

'সে বলল, "শত্রুতা নয়, রায়মশাই, গেরোর ফের। ব্যাপারটা বলি, শোনো। বসন্তদাদা সিঙ্গিদের বাড়ি চাকরের কাজ করত। খোদ বড়বাবুর খাস চাকর ছিল তিনি। একদিন হঠাৎ সিঙ্গিদের মন্দির থেকে মা দুর্গার সোনার মূর্তি আর তার যত হিরে-জহরতের গয়না গায়েব হয়ে গেল। চুরিটা হয়েছিল দুপুররাত্রে, কিন্তু ভোর হতে-না-হতেই এক দরোয়ান মন্দিরের দরজা খোলা দেখে মহা হইচই জুড়ে দিলে। তারপর তো হুলুস্থুল ব্যাপার। পুলিশ এসে তার ওপর তাণ্ডব জুড়ে দিলে। আর দেবে না-ই বা কেন? বড়বাবু যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলেছিল, সেটি তো বড় কম টাকা নয়।

"আর সবার সঙ্গে পুলিশ এসে বসন্তদাদাকেও ধরলে। জেরার পর জেরা। বসন্তদাদা সত্যি কথাই বলে, আমি চুরি করিনি। সে-ঘরে বড়বাবুও ছিল। তিনি দরোয়ানকে বললেন, বসন্তকে আমি চিনি, ও কখনও মিথ্যে কথা বলে না। বলে, হঠাৎ কী খেয়াল হল, বড়বাবু বসন্তদাদাকে জিগ্যেস করে বসল, আচ্ছা, তুমি যে চুরি করোনি, তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কে চুরি করেছে, তুমি জানো?

''ব্যস, বসন্তদাদা চুপ। আর কথা কয় না। পুলিশে, বড়বাবুতে কত চেষ্টা, কাকুতি-মিনতি, ভয় দেখানো—বসন্তাদাদা কোনও কথাই বলে না। তখন বড়বাবুই আবার জিগ্যেস করল, চোরাই মাল কোথায় আছে, তুমি জানো? বসন্তদাদা বললে, জানি। বড়বাবু জিগ্যেস করল, কোথায়? বসন্তদাদা বললে, ছোটরানিমার সিন্দুকে বেনারসী শাড়ির তলায়।

''মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় বড়বাবু এত আশ্চর্য হত না, রায়বাবু। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খবর গেল। আর চোরাই মাল যেখানে বসন্তদাদা বলেছিল, সেখানেই পাওয়া গেল।

''রাগে-দুঃখে-অপমানে বড়বাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। আর সেই সবটুকুর ঝালটা গিয়ে পড়ল বসন্তদাদার ওপরে। বড়বাবু বসন্তদাদার গলা টিপে ধরে বলল, তোমাকে বলতেই হবে কে চুরি করে ওখানে মালটা রেখেছে। ছোটখোকার মহলে তুমি কোনওদিন যাওনি, ছোটরানির ঘরে ঢোকা তো দূরস্থান। তুমি কী করে জানলে যে, মালটা ওখানে আছে? বসন্তদাদা কিছুতেই বলবে না। তখন বড়বাবু হান্টার দিয়ে বসন্তদাদাকে পিটতে শুরু করল। যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন বসন্তদাদা বলেই ফেলল, চুরি করেছে ছোটবাবু। মদে, জুয়ায়, মেয়েমানুষে এত দেনা যে, এমন একটা কিছু না করলে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। বড়বাবু জিগ্যেস করল, তুমি কী করে জানলে, নিজের চোখে দেখেছ? বসন্তাদাদা বলল, হ্যাঁ।

''ছোটবাবুকে ডেকে আনা হল। ছোটবাবু বলল, সব বাজে কথা। যদি আমি চুরি করেই থাকি, ও নিজের চোখে দেখল কী করে? কারণ, বসন্ত তো সেদিন রাত্রে দাদার শ্বশুরবাড়িতে কী কাজে সন্ধেবেলা গিয়ে পরদিন সকালে ফেরে। তাহলে সে মিথ্যে কথা বলছে। আসলে সে-রাত্রে বসন্তই গোপনে ফিরে এসে চুরি করে মাল সিন্দুকে রেখে আবার ফিরে গিয়েছিল।

''কথাটা মন্দ নয়। বড়বাবু বসন্তদাদাকে জিগ্যেস করল, তুমি সে-রাত্রে বেলেঘাটায় ছিলে? বসন্তদাদা বলল, ছিলুম। বড়বাবু বলল, তাহলে তুমি দেখলে কী করে? বসন্তদাদা বলল, আমি মাঝে-মাঝে দেখতে পাই।

''আচ্ছা, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে, রায়মশাই? পুলিশ ছোটবাবুর কথাই মেনে নিল। তারা বলল, বসন্তদাদা তাদের জেরায় নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে। বলে, তাকে চালান করে দিলে। বড়বাবুও তাদের কষে পেট ভরে খাইয়ে দিল। পরিবারের সম্মানটা তো বাঁচল! একটা বসন্ত গেলে পাঁচটা বসন্ত পাওয়া যাবে, কিন্তু ইজ্জত একবার খোয়ালে তাকে ফিরে পাওয়া বড় শক্ত, না কি বলেন রায়বাবু?''

'আমি বললুম, ''দ্যাখ কার্ত্তিক, লালবাজারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো এমন কিছু মধুর নয়, কিন্তু তবুও আমি বলব পুলিশ বোধহয় খুব অন্যায় করেনি এ-ক্ষেত্রে। তোর বসন্তদাদা বেলেঘাটায় বসে শ্যামপুকুরের চুরি দেখতে পায়, এ-কথা আমাকে স্বয়ং ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসে বললেও আমিও বিশ্বাস করতুম না।''

'কার্ত্তিক হাত নেড়ে বলল, ''তা বিশ্বেস করবে কেন? আপনারা তো লেখাপড়া শিখেছ, ইংরিজিতে কাগজ পড়ো, ফটফট করে বক্তৃতে দাও যার কোনও মাথামুন্ডু হয় না। আপনারা বিশ্বেস করবে কেন? বসন্তদাদার তো ভর হয়। তখন বসন্তদাদা অনেক কিছু দেখতে পায়। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবে, রায়বাবু, বসন্তদাদার পরিবার তান্ত্রিকের পরিবার। তাঁদের কত যুগের সাধনা। আজ তো আর সেসবের কোনও মূল্য নেই। পেটের দায়ে বসন্তদাদা চাকরের কাজ করে। চোর বলে জেল খাটে।'' বলে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ত্তিক।

'তাতে অবশ্য কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করিনি আমি। আজকালকার দিন হলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, হয়তো কৌতূহলী হয়ে উঠতুম। কিন্তু আজকের মতো সে-যুগে তো আমরা এই একস্ট্রা সেনসরি পারসেপশান বা ক্লেয়ারভয়েন্স বা টেলিপ্যাথি ইত্যাদির নাম শুনিনি। তখন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক আমরা এসব তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-প্রেত, ভর হওয়া ইত্যাদি সমস্তই বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতুম। পাত্তাই দিতুম না।

'আর বসন্তও কোনওদিন আমাকে তার কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার গল্পও করেনি বা তার পরিচয় দেওয়ারও চেষ্টা করেনি। কেবল একদিন ছাড়া। সে-কথায় পরে আসছি।

'চন্দ্রশেখরের যেদিন টেলিগ্রাম এল, তার কিছুদিন আগেই আমি আর বসন্ত একসঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমি তখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা ঘরভাড়া করে থাকি। বসন্তও এসে আমার সঙ্গে জুটে গেল। আমি ব্যাচেলার লোক, বসন্তের মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলুম।

'সে-যুগে বকুলপুর যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিছুটা টেনে, কিছুটা বাসে আর শেষটুকু গরুর গাড়িতে করে যেতে হত। বসন্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ায় বেশ সুবিধেই হয়েছিল। এতটা দীর্ঘ পথ, সঙ্গে একজন সঙ্গী থাকলে পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়, বিশেষ করে যদি বসন্তের মতো সঙ্গী হয়, যে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ হয়েই আছে।

'চন্দ্রশেখর আমাকে নেওয়ার জন্য স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। সে কিন্তু দেখলুম, বসন্তকে দেখে যেন একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে। বুঝলুম, বাসে আর গরুর গাড়িতে যেতে-যেতে তার আমাকে কিছু বলবার ছিল, বসন্ত সঙ্গে থাকায় ব্যাপারটায় একটু অসুবিধে হয়ে গেল। সারাটা রাস্তাই দেখলুম, চন্দ্রশেখর কেমন যেন একটু গম্ভীর আর সন্ত্রস্ত হয়ে রইল।

'চন্দ্রশেখর আজ বেঁচে নেই, থাকলে দেখতে পেতেন, তার মতো দিলখোলা আমুদে ফুর্তিবাজ মানুষ খুব কম দেখা যায়। তার চেহারাটা ছিল ছোটখাটো, কিন্তু অন্তরটা ছিল মস্ত বড়। আজকের মতো সে-যুগে ক্লাস স্ট্রাগল বা ক্লাস হেটেড ব্যাপারটা খুব চালু হয়নি, তাই জমিদার হলেও তাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতুম।

'এহেন একটা মানুষকে গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে একটু অস্বস্তি হয়ই। আমি আর ওকে সারা রাস্তা ঘাঁটালুম না।

'যখন বকুলপুর এসে পৌঁছলুম, তখন প্রায় মাঝরাত। গ্রামের রাস্তা স্বভাবতই অন্ধকারে জনমানবহীন। কিন্তু আপনারা শহুরে লোক বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মাঝরাত্রেও গ্রামের রাস্তার কতগুলো শব্দ আছে, যারা তার সঙ্গে পরিচিত তাদের কানে সেই শব্দ ধরা পড়ে। আমি গ্রামের ছেলে, আমারও হঠাৎ মনে হল, কী অদ্ভুত শব্দহীন গ্রাম! মনে হয় যেন এখানে কোনও জীবিত প্রাণী বাস করে না। লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম, চন্দ্রশেখরের মুখ বিবর্ণ, বোধহয় খানিকটা আতঙ্কিত।

'হঠাৎ সেই নির্জনতা ভেঙে গাড়ির সঙ্গে আসা চারজন পাইক সমস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে আরম্ভ করল। ''ওহে পঞ্চানন, ঠিক আছ তো হে?'' বা ''মামু হে, কথা কও না কেন?'' প্রভৃতি চিৎকার, যার অর্থ স্পষ্টতই এরা সবাই ভয় পেয়েছে।

'গাড়ি যখন প্রকাণ্ড জমিদারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, দেখি, সামনের চত্বরে একগাদা হ্যাজাক জ্বালিয়ে একদল পাইক বসে আছে। আমরা ঢোকামাত্র তারা আলো নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে আমাদের মালপত্র নামাতে শুরু করল।

'বাড়ির ভেতরেও দেখি বারান্দায়, সিঁড়িতে আলো জ্বলছে। ওপরে উঠতে-উঠতে চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, ''তোমার সঙ্গের লোকটি কি তোমার চাকর?''

'আমার তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। বললুম, ''না, চাকর নয়, ভ্যালে বলতে পারো।'

'চন্দ্রশেখর হাসল না। বলল, ''ও কি নীচে আমাদের চাকরদের মহালে শুতে পারে?''

'আমি বললুম, ''পারে।''

''বেশ।'' বলে চন্দ্রশেখর একজন পাইককে বলল, ''এঁর সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, তাকে তোমাদের মহালে নিয়ে যাবে।''

'বসন্ত আমার ব্যাগটা নিয়ে পিছনেই আসছিল। চন্দ্রশেখরের কথা শুনে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, ''না, আমি রায়বাবুর ঘরের বাইরেই শোব। আমার কেমন যেন গোলমাল লাগছে।''

'চন্দ্রশেখর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে বলল, ''না। ঘরের বাইরে শোওয়া চলবে না। ওই মহালেই শুতে হবে তোমায়।''

'বসন্ত ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তর্কাতর্কি থামানোর জন্যে বললুম, ''ঘরের বাইরে শুলে তোমার আপত্তি। ভেতরে শুতে পারে?''

'চন্দ্রশেখর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, ''পারে, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে।''

'আমি বললুম, ''আমার আবার আপত্তি কীসের? এসব ব্যাপারে আমার কোনওই প্রেজুডিস নেই, তুমি তো জানো।''

'চন্দ্রশেখর বলল, ''বেশ। তাহলে সেই ভালো।'' তারপর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, ''সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে শোবে। ভোর হওয়ার আগে দোর খুলবে না, কেউ ডাকলেও না, এমনকী আমি ডাকলেও না।''

'এইবার আমার ঘুম ছুটে গেল। বললুম, ''তার মানে? এসব রহস্যের মানে কী? আর জানলা না খুলে আমি ঘুমুতেই পারি না।''

'চন্দ্রশেখর ম্লান হেসে বলল, ''রহস্যটা কাল শুনো। আর জানলা খুললে তোমারই অসুবিধে হবে, কারণ তোমার জানলার নীচেই পাইকরা আগুন জ্বেলে বসে বাকি রাতটুকু গল্পগুজব করবে। তুমি ঘুমুতে পারবে না।''

'আমি প্রতিবাদ করে বললুম, ''আমার জানলার নীচে পাইক? কেন? এসব তো আগে কখনও দেখিনি। বলি, ব্যাপারটা কী?''

'চন্দ্রশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলল, ''কাল শুনো।''

'বসন্ত ঘরের কোনায় দাঁড়িয়েছিল। আমি ওকে জিগ্যেস করলুম, ''কিছু বুঝলে? ডাকাতি-ফাকাতির ব্যাপার নাকি?''

'বসন্ত ঘাড় নাড়ল। বলল, ''না রায়বাবু, ডাকাতির ব্যাপার নয়। ব্যাপার অনেক খারাপ। এই গ্রামে কালরাত্রি নেমেছে, আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।''

'কালরাত্রি নেমেছে, তার আবার গন্ধ! বুঝলুম, এতটা রাস্তার ধকল আর এতসব রহস্য একসঙ্গে হজম করা আমার দুঃসাধ্য। অতএব আমি আর বাক্যব্যয় না করে লম্বা হলুম।

'রাত্রে ঘুম বড় মন্দ হল না। ভোরবেলা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি চন্দ্রশেখর একটা চেয়ারে বসে আছে, তার সামনে টেবিলে দু-কাপ চা। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, ''এসো, চিত্তপ্রসাদ, চা তৈরি।''

'আমি বললুম, ''তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হে জমিদারনন্দন, তুমি কি স্রেফ আমাকে চা খাওয়াবে বলেই এই সাতসকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আছ?''

'চন্দ্রশেখর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়ল। বলল, ''না, তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে বসে আছি। বেলা বাড়লে কথা বলার সুযোগ নাও পেতে পারি।''

'আমি একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসে বললুম, ''ব্যাপারটা কী বলো তো? গোলমাল যে একটা পেকেছে, সেটা তো বুঝতেই পারছি। তুমি আমাকে ডেকেছ কি বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, না উকিল হিসেবে কনসালটেন্সির জন্যে?''

'চন্দ্রশেখর বলল, ''দুই-ই। ব্যাপারটা কী তোমাকে তা পুরোপুরি বোঝাতে পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটা এতদূর অবিশ্বাস্য যে, আমার তোমাকে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে।''

'আমি বললুম, ''দ্যাখো চন্দ্রশেখর, ধানাই-পানাই কোরো না। আমি উকিল, আমাকে নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা খুলে বলো। ভণিতা যদি করো তো বলো, উঠে চলে যাই।''

'চন্দ্রশেখর হাত নেড়ে বলল, ''না, ভণিতা করব না।'' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে জিগ্যেস করল, ''ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে, তুমি জানো?''

'এমন একটা অদ্ভুত আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে আমি একদম প্রস্তুত ছিলুম না। থতমত খেয়ে বললুম, ''হ্যাঁ, জানি, দক্ষিণ আমেরিকার একরকম রক্তচোষা বাদুড়।''

'চন্দ্রশেখর ফ্যাকাসে মুখে বলল, ''হ্যাঁ, তাই বটে, তবে পুরোটা নয়। যে-কোনও রক্তচোষা জীবকেই ভ্যাম্পায়ার বলা হয়। জাপানি উপকথায় একরকম ভ্যাম্পায়ার ক্যাট বা রক্তচোষা বেড়ালের কথা আছে, তেমনি য়ুরোপে রক্তচোষা মানুষরা শুধুই ভ্যাম্পায়ার, যেমন কাউন্ট ড্রাকুলা।''

'আমি বললুম, ''সেসব উপকথা বা আষাঢ়ে গল্প। তা, আমাকে এতটা পথ ডেকে এনেছ কি তোমার ভ্যাম্পায়ার কথামৃত শোনাবার জন্যে নাকি?''

'চন্দ্রশেখর মাথা নেড়ে বলল, ''চিত্তপ্রসাদ, এতদিন আমিও তোমার মতো ভাবতুম যে, ভ্যাম্পায়ার একটা কুসংস্কার বা আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আজ আর তা ভাবিনে। আমাদের এই বকুলপুর গ্রামে এমন একটা কিছুর আবির্ভাব হয়েছে, যেটাকে ভ্যাম্পায়ার ছাড়া আর অন্য কোনও বিশেষণেই অভিহিত করা চলে না।''

'আমি চন্দ্রশেখরের কথা শুনে হাসতে শুরু করেছিলুম, কিন্তু সে একটা উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল, ''তোমার খুব হাসি পাচ্ছে, না? তুমি থাকো কলকাতায়। সেখানে সন্ধে হলে হাজার আলোর রোশনাই, ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি, সিনেমা আর থিয়েটারে মাঝরাত পর্যন্ত সরগরম। আর ওই সামনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। ওখানে শুধুই অন্ধকার, পদে-পদে ভয়। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা, অসুখ-বিসুখ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপ—মৃত্যু যেন সবসময় ওত পেতে বসেই আছে। এখানে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে খরচ হয়। আমার বাবা, ঠাকুরদা, তাঁদের গ্রামের দিকে তাকাননি, তোমাদের কলকাতা তাঁদের টেনে নিয়ে চলে গেছল। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। আমার সামান্য ক্ষমতায় আমার গ্রামের জন্যে কিছু করব, এই আশায় রয়ে গেছি এইখানেই। দেখেছি, এখানকার প্রায় সব সমস্যাই, মানুষের, বিশেষত কলকাতার মানুষেরই সৃষ্টি। এখানে থেকে অবিচলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেলে হয়তো একদিন এই সবেরই সমাধান সম্ভব হবে। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ, আজ যে-সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তা তোমাদের আলোকোজ্জ্বল কলকাতায় আসতে পারে না, এই অন্ধকার গ্রামই তার আশ্রয়। আর এই সমস্যার মোকাবিলা করা বোধহয় আমার সাধ্যের বাইরে।''

'আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললুম, ''তুমি যে রীতিমতো সিরিয়াস হয়ে উঠলে হে। এত লেখাপড়া শিখে শেষপর্যন্ত এরকম একটা কুসংস্কারে বিশ্বাস আরম্ভ করলে? কী হয়েছে কী? গ্রামের কিছু লোক রক্তহীনতায় মারা গেছে আর গণকঠাকুর গুনে নিয়ে বলেছেন, গ্রামে রক্তচোষা এসেছে, এই তো? ওটা যে অ্যানিমিয়া...।''

'চন্দ্রশেখর প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, ''থামো চিত্তপ্রসাদ, এবার তুমি আমাকে হাসালে। একটা সুস্থ জোয়ান লোক রাত্রিবেলা ঘরের বাইরে বেরোল আর তার পরদিন তার রক্তহীন ছিবড়ে হয়ে যাওয়া দেহটা পাওয়া গেল গ্রামের বাইরে ধানখেতের পাশে—এটা অ্যানিমিয়া, না? আর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠিক গুনে-গুনে একুশ দিন পর-পর—এটাও কি অ্যানিমিয়ার লক্ষণ?''

'আমি বললুম, ''তুমি কি নিজের চোখে এ-ঘটনা একটাও দেখেছ, না সবই তোমার শোনা কথা?''

'চন্দ্রশেখর বলল, ''শেষ ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে ষোলো দিন আগে আমারই বাড়িতে। আমার ধাই-মাকে তোমার মনে পড়ে? তাঁর মৃত্যু ঘটে এমনিভাবেই, আমাদের পেছনের উঠোনে।''

'এইবার আমাকে সামলে নিতে হল। বললুম, ''কী সর্বনাশ! বলো কী? একেবারে তোমার বাড়ির ভেতরে? ব্যাপারটা আমাকে একটু বিশদভাবে বলবে?''

'দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রশেখর বলল, ''আর কী বলব! রাত্রিবেলা ধাই-মা যখন শুতে যান, তখন তিনি দিব্যি সুস্থ। আমাকে একটা পান খাওয়ালেন, সুমিত্রাকে একটা দিলেন। কোনও গোলমাল নেই। সকালবেলা উঠোনের ওপর তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করল আমাদের রাঁধুনি ঠাকরুন। সেই একইরকম মৃত্যু। গলার ওপর দুটি রক্তের ফোঁটা, যেন কিছু দাঁত ফুটিয়েছে আর শরীরের সমস্ত রক্ত জল।''

'আমি জিগ্যেস করলুম, ''তার মানে? রক্ত বের করে নেওয়া হয়নি?''

'চন্দ্রশেখর মাথা নাড়ল। বলল, ''না। মানে, ব্যাপারটা কীরকম জানো? অনেকটা অ্যানিমিয়ার মতোই। যেন রক্তের সমস্ত লাল কণিকাগুলো কোনও অজ্ঞাত কারণে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেটা হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ফলে অ্যানিমিয়ার যেসব লক্ষণ, যেমন হাত-পা ফোলা, পেট ফুলে ওঠা, সেসব কিছু নেই। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ অক্সিজেনের অভাবে অ্যাজফিক্সিয়া।'

''এরকম হওয়ার কারণ?''

''জানি না। গলার দাগদুটি দেখে মনে হয়, এই গ্রামে কোনও একটি নিশাচর জীবের আবির্ভাব হয়েছে, যে গলায় কামড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এমন একটা বিষ ঢুকে যায় যা সঙ্গে-সঙ্গে রক্তের লাল কণিকাগুলোকে মেরে ফ্যালে। ফলে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।''

''কী বিষ?''

''তা-ও জানি না। কোনও কেমিক্যাল বিষ হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ, সে-ক্ষেত্রে একজন দুর্বৃত্ত বা হত্যাকারী বা ক্রিমিনাল থাকার সম্ভাবনা। আবার সেইসঙ্গে এই অপরাধের একটা উদ্দেশ্যও থাকা দরকার। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলো এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে, কোনও একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তাই মনে হয়, বিষ্টা জৈববিষ—যেমন সাপের বা কাঁকড়াবিছের বিষ এবং নিহত লোকেদের এমনই বিষধর কোনও প্রাণীর কামড়েই মৃত্যু হয়েছে।

''আর-একটা সম্ভাবনা হল, ভ্যাম্পায়ার জাতীয় কোনও প্রাণী এদের রক্ত চুষে খেয়ে তাদের শরীরের ভেতরে কোনও অজ্ঞাত একটা তরল পদার্থ ঢুকিয়ে রেখে যায়। কিন্তু সেখানে একটা অসুবিধে আছে।''

''কী অসুবিধে?''

''দ্যাখো, আমাদের এখানে প্রথমে কিন্তু মানুষ মরতে শুরু করেনি। সব রিপোর্ট তো পাইনি, তবে প্রথম মারা যায় একটা গোরু। আমাদের পাশের গ্রাম যদুতলির এক গাড়িওলা অন্তা কাহার বলে একজনের গোরু ছিল সেটা। তারপর মরে আর-একটা গোরু, ওই যদুতলিরই আর-একজন গোয়ালার। এখন, গোরু মরা গাঁয়ের মানুষের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। গোরু তাদের একটা সম্পদ। কাজেই হইচই পড়ে যায়। আমার কানেও কথাটা আসে। আমি তখন ভেবেছিলুম, গোমড়ক লেগেছে বুঝি। তাই এ-গাঁয়ের লোকেদের ডেকে সাবধান করে দিই। কিন্তু তারপর অদ্ভুত-অদ্ভুত সব খবর কানে আসতে লাগল। শুনলুম, ওরা নাকি এক গোবদ্যি ধরে এনেছে। সে বলেছে অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, গোরুগুলো মরেছে রক্তচোষার কামড়ে।

''তোমারই মতো আমি ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এর পরের আঘাতটাই এল যদুতলির পণ্ডিতমশাই নগেন ভট্টাচার্যি মশায়ের বাড়িতে। পণ্ডিতমশায়ের গোরু মঙ্গলা একইরকমভাবে মারা যায়। পণ্ডিতমশায়ের কাছে যা শুনলুম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। গোবদ্যির কথা শুনে তিনি মঙ্গলাকে গোয়ালঘর থেকে বের করে এনে বাড়ির ভেতরের উঠোনে বেঁধে রেখেছিলেন আর নিজে শুতেন বারান্দার ওপর। যেদিন মঙ্গলা মরে, সেদিন তিনি অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে আলোটা নিয়ে বাড়ির পেছনে কুয়োতলায় গিয়েছিলেন হাত-পা ধুতে। সেখান থেকে মঙ্গলাকে দেখা যায় না। হঠাৎ তিনি একটা ধপ করে আওয়াজ শোনেন এবং তারপরেই তাঁর মনে হয়, কিছু একটা রাংচিতার বেড়া ভেঙে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বাইরে চলে গেল। তিনি দৌড়ে এসে দেখেন, মঙ্গলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আস্তে-আস্তে, তাঁর চোখের সামনে, গড়িয়ে মাটির ওপর পড়ে যায়।

''এখন, এর থেকে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, রক্তচোষাই হোক বা যা-ই হোক, যে-জীবটি বেড়া ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে মঙ্গলার রক্ত চুষে খায়নি। কারণ, একটা গোরুর শরীরে কত সের রক্ত থাকে আমি জানি না, কিন্তু দুনিয়ায় বোধহয় এমন কোনও শক্তি নেই যা সেই পরিমাণ রক্ত এক মুহূর্তের মধ্যে চুষে খেয়ে সেই পরিমাণ তরল পদার্থ শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ, মঙ্গলার মৃত্যু হয়েছে কোনও বিষে। দুই, জীবটি সাপ জাতীয় কোনও প্রাণী নয়, কারণ, বেড়ার মধ্যে যে-গর্ত হয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে

কোনও বড় জানোয়ারই বেরিয়ে যেতে পারে, কোনও সরীসৃপ নয়। আর ধপ করে শব্দটাও তাই প্রমাণ করে।''

'আমি জিগ্যেস করলুম, ''তোমাদের পণ্ডিতমশায় লোক কেমন?''

''অতিশয় সজ্জন। গাঁজা-ভাঙ তিনি খান না, কদাচ মিথ্যে কথা বলেন না, শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া, আমি নিজে মঙ্গলাকে দেখেছি, ভাঙা বেড়াটা দেখেছি। বীভৎস ব্যাপার।''

''অন্যান্য মৃত্যুগুলো দেখোনি?''

''দেখেছি। তবে সবগুলো নয়।''

''তাদের সম্পর্কে কিছু বলো।''

''দ্যাখো, পণ্ডিতমশায়ের ব্যাপারটার পর যদুতলির চণ্ডীমণ্ডপে আমি একটা মিটিং ডেকেছিলুম। ওখানে একটা নাইট ওয়াচের জন্যে ভলান্টিয়ার পার্টি তৈরি করেছিলুম। প্রত্যেক গোয়ালের সামনে যাতে সারারাত আগুন জ্বলে আর কেউ-না-কেউ জেগে পাহারা দেয়, তারও বন্দোবস্ত করেছিলুম। ফলে হিতে বিপরীত হল। অন্যদিকের গ্রাম পাখনায় গোরু মরতে আরম্ভ করল। পাখনার লোকেরা যখন ভলান্টিয়ার পার্টি বানাল, তখন মানুষ মরতে শুরু করল।''

''কীরকম?''

''প্রথমে তো ভলান্টিয়ার পার্টির লোকই মরতে আরম্ভ করল। কেউ একটু একা হয়ে গেছে বা একটু অন্ধকারের দিকে চলে গেছে বা গাছতলায় বসে ঢুলুনি এসেছে, ব্যস, মরণ-ছোবল তাকে একেবারে বৈতরণী পার করে দিয়েছে। এই সময়েই আমরা আবিষ্কার করলুম, এই ছোবলটা আসে প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ দিনের মধ্যে।

''ফলে, ভলান্টিয়ার পার্টি বন্ধ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক তাদের গোরু-ছাগল নিয়ে সন্ধে হতে-না-হতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে আগল আটকে দিতে লাগল। কিন্তু সারা রাতে একবারও ঘরের বাইরে বেরোবে না, এ তো হয় না। যে বের হয়, সে-ই মরে।

''কিন্তু তারপরে যা শুরু হল, তা আরও অবিশ্বাস্য।''

''কী?'' আমি জিগ্যেস করলুম।

'চন্দ্রশেখর আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, ''নিশির ডাক।''

'আমি আকাশ ফাটিয়ে অট্টহাস্য হেসে উঠতে যাচ্ছিলুম। চন্দ্রশেখর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ''হেসো না, চিত্তপ্রসাদ, হেসো না। তিনটে গাঁয়ের লোক যখন পেটখারাপ হলেও ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ করল, তখন যার মরণ ঘনিয়ে এসেছে, তাকে একটা অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ নাম ধরে ডেকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। আর এখনও সেইরকমই চলেছে। সেই ডাক নাকি অপ্রতিরোধ্য। যাকে ডাকে, তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে নাকি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যায়।''

''যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার আত্মীয়স্বজন তাকে অনুসরণ করে না কেন?''

''দ্যাখো, যারা আতঙ্কে অর্ধমৃত হয়ে আছে, তাদের কাছ থেকে তুমি এরকম বীরত্ব আশা করতে পারো না, পারো কি? আর অনুসরণ করেই বা কী হবে? গ্রামের পথ নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। সেই অন্ধকার কি হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো ভেদ করতে পারে?''

''ওই নিশির ডাক কি তুমি শুনেছ?''

'চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ''না, শুনিনি।''

'এরপর আর কথা এগোল না। ভেতর-বাড়ির থেকে ডাক এল চান করতে যাওয়ার, চন্দ্রশেখরের কাছারি যাওয়ার সময় হল।

আমার কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচখচ করতে লাগল। চন্দ্র যা বলেছে সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানিনে, কিন্তু সে সত্যি ভেবেই বলেছে। তবে, সেটাও বড় কথা নয়। আমার সন্দেহ হল, সে কিছু কথা

গোপন করে যাচ্ছে, আমাকে প্রাণ খুলে সবটা বলছে না। অর্থাৎ, রহস্যটা যে কেবল বাস্তব তাই নয়, ওপর থেকে যা মনে হয়, তার চেয়েও গুরুতর।

'চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেলে, আমি গ্রামটা ঘুরতে বের হলুম। বকুলপুর গ্রাম আমার বহুদিনের পরিচিত। ছোটবেলায় অনেকবার এখানে এসেছি, বড় হয়েও বেশ ক'বার। শেষবার এসেছিলুম চন্দ্রশেখরের বিয়েতে বছর-তিনেক আগে বরযাত্রী যাব বলে। তবে যাওয়া হয়নি, সন্ধেবেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। তাই নিয়ে মহা হাঙ্গামা হয়েছিল। তা সে অন্য কথা।

'চন্দ্রশেখরের বিয়ে হয়েছিল মালদা জেলারই গঙ্গাযমুনা গ্রামের জমিদার ঘনশ্যাম রায়ের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার পরে পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। লোকটি যেন কেমন অদ্ভুত বলে তখন আমার মনে হয়েছিল। কখনও সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না, চেপে-চেপে প্রতিটি কথা বিচার করে-করে বলেন। আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিল, লোকটি অত্যন্ত ঘুঘু।

'তবে চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সুমিত্রা অবশ্য তার বাপের মতো নয় বলেই শুনেছি। সে জমিদারবাড়ির বউ, অসূর্যম্পশ্যা, কিন্তু তার গৃহিনীপনার গল্প আমাদের কানে এসেছিল। আর কানে এসেছিল তার অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা। তাকে নিয়ে আর তার জমিদারিটি নিয়ে কত সুখেই না থাকতে পারত চন্দ্রশেখর। তা নয়, কোত্থেকে কী এক ভয়াবহ প্রাণী এসে সব ছারখার করে দিলে। এইসব ভাবতে-ভাবতে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, চন্দ্রশেখর আমার বন্ধু—কেবল বন্ধু বলব না, আমার অনেক বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আমার সেই বন্ধুর এই দুঃসময়ে, সেটা সত্যি বা কাল্পনিক যাই হোক না কেন, তার পাশে আমি দাঁড়াব, তাকে উদ্ধার করব।

'এমন সময় হঠাৎ শুনি, কে আমার নাম ধরে ডাকছে, "চিত্তবাবু, ও চিত্তবাবু!" তাকিয়ে দেখি, বকুলপুরের বর্ধিষ্ণু চাষি সন্ন্যাসী কৈবর্তর ছেলে বিষ্ণুপদ কৈবর্ত। বিষ্ণুপদ কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল। বেশিদূর সেটা চালাতে পারেনি বটে, তবে নিজের গ্রামের প্রতি অশ্রদ্ধাটা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছিল। হেদোর কাছে একটা ওষুধের দোকানে চাকরি করত আর গোয়াবাগানে একটা মেসে থাকত। মানিকতলার বাজারে তার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে আমার দেখা হত।

'বিষ্ণুপদ বলল, "এ কী চিত্তবাবু, আপনি এখানে কী করছেন?"

'আমি বললুম, "আমি তো এখানে আসতেই পারি, বিষ্ণুপদ, এখানে আমার বন্ধুর বাড়ি। বরং তুমি এখানে কী করছ, বলো তো? তোমার সঙ্গে তো যখনই দেখা হয়, তুমি বলো, গ্রামে নাকি ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব। তা, তুমি কি আবার ছোটলোকদের দলেই ভিড়লে নাকি?"

'বিষ্ণুপদ মাথা নিচু করে বলল, "ওসব কথা বাদ দিন, চিত্তবাবু। বাবা মারা গেছেন, এত জমিজমা ফেলে কোথায় থাকব? কলকাতায় পড়ে থাকলে তো পাঁচভূতে লুটে নেবে।"

'আমি দুঃখিত হয়ে বললুম, "সন্ন্যাসীদা মারা গেছেন নাকি? কবে? কী হয়েছিল?"

'বিষ্ণুপদ বলল, "বাবা মারা গেছেন মাস-ছয়েক হল। আর কী হয়েছিল? কেন, জমিদারবাবু আপনাকে কিছু বলেননি?"

'আমি বললুম, "রক্তচোষা?"

'বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, লোকে তাই বলে বটে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে।"

"তুমি কী বিশ্বাস করো?"

"আমার ধারণা, এটা একটা কোনও নতুন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ, যা জীবজন্তু বা মানুষকে রক্তশূন্য করে ফ্যালে। আর এই রোগটা এমন একটা জীবাণু থেকে হয়, যা কোনও মানুষ বা জন্তুর শরীরে ঢুকলে কুড়ি-বাইশ দিন সময় নেয় তৈরি হয়ে নেওয়ার জন্যে। যেমন ধরুন ম্যালেরিয়া।"

"ম্যালেরিয়া? না বিষ্ণুপদ, তোমার উপমাটা ঠিক হল না। তবে তুমি যে কী বলতে চাইছ, তা বুঝতে পারছি। তার মানে, ও-গাঁয়ের পণ্ডিতমশাই যা দেখেছেন বা এই তিনটে গাঁয়ের লোক যে নিশির ডাক-টাকের

কথা বলছে, সেগুলো তুমি মনে করো মিথ্যে।''

''ঠিক মিথ্যে নয়, বলব কুসংস্কার। আর এসবের জন্যেই তো আমি গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকি।''

'আমাদের কথাবার্তা হতে দেখে ইতিমধ্যে চারপাশে কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখরের খাজাঞ্চি নিমাই পাটোয়ারীর ছোটভাই গোবিন্দও ছিলেন। গোবিন্দ লেখাপড়া বেশি করেননি, কিন্তু সৎ সজ্জন লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপদর কথা শুনে হঠাৎ চটে উঠলেন। বললেন, ''তোমার ওখানে গিয়েই থাকা উচিত, বিষ্ণু। তোমার মতো অপদার্থ গাধার এ-গাঁয়ে ঢোকাই উচিত নয়।''

'আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ''কী হল, গোবিন্দদা? এত চটে উঠলেন কেন?''

'গোবিন্দ হাত নেড়ে বললেন, ''চটব না! যেখানে আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে উনি বলছেন কিনা, এটা আমাদের কুসংস্কার? এমন লোককে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে করে কি না তুমিই বলো, চিত্তপ্রসাদ।''

'আমি বললুম, ''আপনি এ-নিশির ডাক শুনেছেন?''

'গোবিন্দর মুখের ভাবটা কেমন একরকম হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে একবার ভয়ে-ভয়ে চারদিকে চেয়ে বললেন, ''হ্যাঁ, শুনেছি।''

''কীরকম শুনলেন?''

'ফ্যাকাসে মুখে গোবিন্দ বললেন, ''কীরকম? কীরকম আবার! অনেকটা এই মেয়েছেলের গলার মতো। আমাদের পাশের বাড়ির জগন্নাথকে ডাকলে, তখন শুনেছি। জগন্নাথ নেই, মরে গেছে।''

'গোবিন্দর কথা শুনে আমার এইবার আর হাসি পেল না। গোবিন্দর কথা বলার মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিকতা ছিল যে, তার কথা অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ''আপনি তো ভুলও শুনে থাকতে পারেন!'' কিন্তু তার আগেই ভিড়ের ভেতর থেকে অতুল মণ্ডল বলল, ''হ্যাঁ গোবিন্দদা, মেয়েছেলের গলাই বটে। যেদিন বাঁদর কামড়ালে, সেদিন আমি শুনেছিলুম। ইস! তখন যদি ছুটে বেরোতুম!''

'আমি বললুম, ''বাঁদর কামড়ালে মানে? কাকে বাঁদর কামড়াল? কী হয়েছিল?''

'অতুল মণ্ডল মাথা নেড়ে বলল, ''বাঁদর কাউকে কামড়ায়নি গো। তিনিই বাঁদরকে কামড়াল। সেই গতবার তো জমিদারবাবুর ধাই-মা মারা গেল, তার আগের বার। সেদিন ছিল ঝড়বৃষ্টির রাত, আর তাঁর আসবারও সময় হয়েছিল। তাই গাঁ-সুদ্ধ লোক দু-দিন ধরে জেগে বসেছিল। আর নিশির ডাক শুরু হয়েছে তো, তাই সবাই চিৎকার করছিল, কোনও-কোনও বাড়িতে খানিক অন্তর-অন্তর শাঁখ বাজছিল আর বৃষ্টিও নেমেছিল বটে। নিশি ডাকলেও শোনা যেত কি না সন্দেহ।

''তা, আমার বাড়ির পাশে একটা ঝুপসি বটগাছ আছে। কিছুদিন হল সেখানে একদল বাঁদর আশ্রয় নিয়েছিল। সে-রাতে যখন বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, হঠাৎ শুনি গাছের ওপর একটা ঝুটোপাটির আওয়াজ। আর তারপরেই ধপ! মনে হল যেন একটা ভারী কিছু ওপর থেকে পড়ল। তারপরে আবার একটা ধপ! আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের গলায় চিৎকার। মানে ব্যথা পেলে তারা যেমন ককিয়ে ওঠে, তেমনি। আমি শুনে ছুটে বেরুতে যাচ্ছিলুম, আমার পরিবার আমার কাছা চেপে ধরলে, বেরুতেই দিলে না।''

'আমি জিগ্যেস করলুম, ''তারপর?''

'অতুল বলল, ''তারপর আর কী! পরদিন সকালে গাছতলায় গিয়ে দেখি একটা গোদা বাঁদর মরে পড়ে আছে আর বটগাছ খালি। ভোর হতে-না-হতেই পুরো দলটা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।''

'শুনতে-শুনতে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল পাকিয়ে যেতে লাগল। এতগুলো শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক একসঙ্গে জোট পাকিয়ে অনবরত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে? কার স্বার্থে? আমাকে বোকা বানিয়ে মজা পাওয়া এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর পেছনে কোনও একটা সত্য লুকিয়ে আছে। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় পড়ে হয়তো তার এমন একটা হাস্যকর রূপ তৈরি হয়েছে।

সেই সত্যটা কী? এতগুলো প্রাণ গেছে, সেটা তো রসিকতা নয়। তা ছাড়া কাল শুতে যাওয়ার আগে বসন্ত একটা কথা বলেছিল, তার মানেই বা কী?

'আমি হঠাৎ গোবিন্দার দিকে ফিরে বললুম, ''আচ্ছা, গোবিন্দদা, কালরাত্রি কী?''

'গোবিন্দ গম্ভীর মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ''হুঁ, তুমিও শুনেছ কথাটা!'' পণ্ডিতমশাই বললেন, ''কালরাত্রি মানে যে-রাত্রে মানুষের ঘরে মৃত্যু নেমে আসে। যে-রাত ভীষণ বিপদের রাত। আমাদের গাঁয়ে সেই কালরাত্রি নেমেছে, চিত্তপ্রসাদ, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। একে-একে আমরা সবাই যাব। তবে হ্যাঁ, মৃত্যুটা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি আসে। বেশি কষ্ট পেতে হয় না। সেটাই যা বাঁচোয়া।''

'আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, ''কালরাত্রি নেমেছে আর আপনারা সবাই মহানন্দে তার ছোবলের মুখে গলা বাড়িয়ে দেবেন? বাঁচবার চেষ্টা করবেন না? সবাই একসঙ্গে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করবেন না?''

'গোবিন্দ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন, ''কোনও লাভ নেই চিত্তপ্রসাদ। চেষ্টা কি আমরা করিনি? কিন্তু দৈব বড়ই প্রবল হে—তার সঙ্গে লড়াই করার সাধ্য আমাদের নেই।''

'আমি বললুম, ''দৈবকে হারানো যায় না, আমি তা বিশ্বাস করি না, গোবিন্দদা। একটু চেষ্টা, একটু মনের জোর থাকা চাই। আর সাধ্য? টাকাপয়সা? আমি কলকাতায় গিয়ে আপনাদের এই বিপদের কথা বলে আন্দোলন করব, দেখবেন সমস্ত দেশের মানুষ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। টাকাপয়সা যা দরকার আমি তার ব্যবস্থা করব। আর চন্দ্রশেখর তো আছেই।''

'আমি চন্দ্রশেখরের নাম করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। স্তম্ভিত হয়ে দেখি, চন্দ্রশেখরের নাম শুনেই সেই ভিড়ের প্রায় প্রত্যেকটি লোক মুখ বিকৃত করল। আমি তো অবাক! এতদিন আমার ধারণা ছিল বকুলপুর গ্রামের প্রত্যেকটি লোক চন্দ্রশেখরকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। কিন্তু, এ কী হল? আমি এত আশ্চর্য হয়েছিলুম যে, বোধহয় আমার মুখ দেখে সেটা সবাই বুঝতে পেরেছিল।

'গোবিন্দ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামলানোর জন্যে বললেন, ''হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো বটেই। জমিদারবাবু আছেন, তুমি আছ, দেশের আর-পাঁচজন আছেন। দ্যাখো, যদি কিছু করে উঠতে পারো।''

'আমি ততক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠেছি। আর এও বুঝেছি যে, গোলমালটা অনেক গভীরে পৌঁছেছে। কাজেই সাবধানে বললুম, ''নিশ্চয়ই করব, গোবিন্দদা। আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই করব। আজ সন্ধেবেলা আপনারা আসুন না চন্দ্রশেখরের বাড়িতে, একটা আলোচনা করা যাবে।''

'গোবিন্দ বললেন, ''আলোচনা? আলোচনা তো অনেক হল, চিত্তপ্রসাদ, তাতে আর লাভ কী হবে? এর আগে পরামর্শ করে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে সুরাহা তো কিছু হয়নি, উলটে কতগুলো প্রাণ বেঘোরে গেছে। তার চেয়ে এখন আমরা যেমনভাবে চালাচ্ছি, তেমনিভাবেই চলুক। তাঁর আসবার তো সময় হয়ে এসেছে। এখন সন্ধে হলেই যে যার ঘরে দোর দিয়ে সারারাত জেগে, শাঁখ আর কাঁসর বাজাবে, চিৎকার করবে যাতে বাইরের কোনও শব্দ শোনা না যায়, আর কেউ যেন বাইরে না থাকে। তা হলেই হবে। আর নতুন করে কোনও পরামর্শের কোনও দরকার দেখি না, চিত্তপ্রসাদ। যদি তুমি নিজের বিবেচনায় কিছু করতে পারো তো করো।'' বলে গোবিন্দ আস্তে-আস্তে চলে গেলেন। ভিড়ের লোকজনও যে যার মতো চলে গেল। দেখি হতবাক আমি আর বিষ্ণুপদ কেবল দাঁড়িয়ে আছি।

'বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, ''দেখলেন তো, চিত্তবাবু, এই আমাদের গাঁয়ের লোক।''

'আমি চটকা ভেঙে বললুম, ''গাঁয়ের লোককে দোষ দিয়ো না, বিষ্ণুপদ। ওরা যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এতে তো কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ওদের সহানুভূতি দেখাতে না পারো, ঠাট্টা কোরো না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লাগছে। এরা চন্দ্রশেখরের ওপর অসন্তুষ্ট কেন? কী করেছে সে?''

'বিষ্ণুপদ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ''আপনি ওদের ওপর সহানুভূতি দেখাতে বললেন, না? কোত্থেকে সহানুভূতি আসবে বলতে পারেন? এমন একটা অকৃতজ্ঞ জাত! যে-জমিদারবাবু নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এখানে পড়ে থেকে এদের জন্যে এত কিছু করলেন, আজকে এরা তাঁকেই....'' বলতে-বলতে বিষ্ণুপদ থেমে গেল।

'আমি বললুম, ''থেমো না, বিষ্ণুপদ। কী হয়েছে বলো। এরা চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করছে? ভাবছে, এই মৃত্যুগুলোর পেছনে চন্দ্রশেখরের হাত আছে?''

'বিষ্ণুপদ নীরবে ওপরে-নীচে ঘাড় নাড়ল।

'আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, ''কিন্তু কেন? তার অপরাধ?''

'বিকৃত মুখ করে বিষ্ণুপদ বলল, ''অপরাধ? প্রথমত, তিনি যেসব নাইটওয়াচ বসিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই মারা গেছে। দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি প্রায় প্রত্যেক রাত্রে গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় বন্দুক হাতে টহল দিয়ে বেড়ান, কিন্তু যেদিন মৃত্যুগুলো ঘটে, সেদিন আর তাঁকে দেখা যায় না।

''আচ্ছা, আপনিই বলুন, এসব কি কোনও যুক্তি? আরে, ওদের কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে জমিদারবাবুকে তো সন্দেহ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।''

'আমি জিগ্যেস করলুম, ''ওদের কী কথা?''

'বিষ্ণুপদ তিক্ত হাসি হেসে বলল, ''জানেন না? সেই যে তিনি, মানে যিনি কামড়ে থাকেন, তাঁকে তো দু-তিনজন দেখেছে। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আর যার মিলই থাকুক, জমিদারবাবুর নেই।''

'আমি উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। বললুম, ''বলো কি, বিষ্ণুপদ? তাকে কেউ দেখেছে? বর্ণনাটা কীরকম?''

''ওঃ, সে ভারী মজার। বর্ণনাটা মোটে কোনও গোটা মানুষেরই না। মানে, আধখানা মানুষের আর আধখানা গিরগিটির। মানে, একটা গিরগিটি যদি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যেমন দেখাবে, তেমনি। এমনকী, একটা মোটা ল্যাজও আছে।'' বলে বিষ্ণুপদ হাসতে লাগল।

'আমিও হেসে ফেললুম। বললুম, ''তবু লোকে চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করে? কী ভাবছে তারা, এটা ওর ছদ্মবেশ?''

''হ্যাঁ, তাই বটে।''

''কারা-কারা দেখেছে?''

''এ-গাঁয়ের দুজন, শ্যামচরণ আর নীলু। আর পাখনার একজন, চৌকিদার গুপীচরণ।''

''তাদের সকলের বর্ণনাই এক?''

''হ্যাঁ, প্রায় এক।''

'যখন বাড়ি ফিরলুম তখন বেশ বেলা হয়েছে। দেখি, বৈঠকখানা ঘরে আমাদের খাওয়ার জায়গা করছে বসন্ত। আমাকে আসতে দেখে বসন্ত বলল, ''এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, রায়বাবু? জমিদারবাবু অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজছেন। আপনি চান করে আসুন, আমি কাছারিবাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।''

'আমি স্নান সেরে খাওয়ার জায়গায় এসে দেখি, চন্দ্রশেখর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নিচু করে আসনে বসে আছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে বলল, ''এসো, চিত্তপ্রসাদ। কোথায় গিয়েছিলে?''

'আমি ওর পাশে বসে বললুম, ''এই, গ্রামটা একটু ঘুরতে গিয়েছিলুম।''

'চন্দ্রশেখর একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, ''কিছু শুনলে?''

'আমি চুপ করে রইলুম।

'চন্দ্রশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''শুনেছ, না? এবার বুঝেছ, কেন আমি তোমাকে ডেকে এনেছি? তুমি আইনজ্ঞ, বুদ্ধিমান, আর আমার বন্ধু। এ-বিপদ থেকে তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো। আমার প্রজাদের জীবন আমি রক্ষা করতে পারিনি। আমার সংসার ভেঙে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, চিত্তপ্রসাদ।''

'আমি জিগ্যেস করলুম, ''সংসার ভেঙে যাচ্ছে কেন?''

''ওই যে-প্রজারা আমার নামে যে-সন্দেহ করে, তা সুমিত্রার কানে পৌঁছেছে। তারপর থেকে সে আর এ-বাড়িতে থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে একঘরে থাকতে চায় না। তার ওপর, বাড়ির ভেতরে ধাই-মা মারা যাওয়ার পর, সে তো প্রায় নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছে। আমি বেশি কাছে গেলেই ভয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আর মুখে শুধু ওই এক কথা, আমাকে বাপের বাড়ি রেখে এসো, আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না। তুমি বলো, চিত্তপ্রসাদ, আমি কী করতে পারি?'

''ঘনশ্যাম রায়কে খবর দিয়েছ?'' আমি জিগ্যেস করলুম।

''হ্যাঁ, শ্বশুরমশায়কে খবর দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত লোক, চট করে চলে আসা তো সহজ নয় তাঁর পক্ষে। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। আর যতই সময় এগিয়ে আসছে, সুমিত্রা ততই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ছে।''

'আমি বললুম, ''তা তুমি সুমিত্রাকে নিয়ে বাইরে কোনও জায়গা থেকে কিছুদিন ঘুরে এসো না। সুমিত্রার সন্দেহও কাটবে, তুমিও একটু বিশ্রাম পাবে।''

'মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, ''না চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। আমি যে এ-কথাটা চিন্তা করিনি, তা নয়। কিন্তু মনে করো, আমার যেমন দুর্ভাগ্য, হয়তো বাইরে গেলুম, আর সেবারেই কিছু হল না। তখন কী হবে? আমি কি আর কোনওদিন এ-গাঁয়ে ঢুকতে পারব? ঢুকলে সবাই আমাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে না?''

'আমি বললুম, ''হ্যাঁ, তা বটে। তাহলে তুমি ঘনশ্যাম রায়কে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠাও।''

''তাও পাঠিয়েছি। আশা করছি, কাল-পরশুর ভেতরেই উত্তর পাব।''

''কিন্তু চন্দ্রশেখর, সুমিত্রা যদি আর না ফিরে আসে?''

'চন্দ্রশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, ''ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তুমি দেখো। এ-রহস্যের জাল ছিঁড়ে গেলে ও নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কিন্তু কত দিনে?''

'এ-প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। কাজেই চুপ করে রইলুম।

'রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার সময় বসন্ত বলল, ''রায়বাবু, গন্ধটা বাড়ছে, টের পাচ্ছেন?''

'আমি মাথা নেড়ে বললুম, ''কোন গন্ধটা বসন্ত? আমার নাকে তো নানারকম গন্ধ আসছে।''

'বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, ''কালরাত্রির গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ।''

'আমি শুয়ে পড়ে বললুম, ''মৃত্যুর গন্ধ যে কেমন, তা তো আমার জানা নেই, বসন্ত। কাজেই সেটা বাড়ছে না কমছে, তা বলব কী করে?''

'বসন্ত আমার কথার খোঁচাটা বুঝল কি না কে জানে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আমার যখন প্রায় ঘুম এসে গেছে, তখন হঠাৎ আমাকে ডেকে বলল, ''রায়বাবু, আমার চোখটা একটু দেখবেন।''

'আমি একটু চটেই গেলুম। বললুম, ''কী পাগলামো হচ্ছে, বসন্ত! শুয়ে পড়ো।'' আর বলতে-বলতেই ওর দিকে চোখ পড়ায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। দেখি, ওর চোখদুটোর মধ্যে মণি নেই, পুরোটাই সাদা। কোনওরকমে বললুম, ''কী করছ, বসন্ত? এমন চোখ কপালে তুলে বসে আছ কেন?''

'বসন্ত চোখ বন্ধ করে মৃদু হাসল। বলল, ''চোখ কপালে তুলিনি, রায়বাবু। মণিদুটো দেখতে পাননি, না? যাক, ভালোই হয়েছে।''

''ভালো হয়েছে মানে? কী ভালো হয়েছে? মণি না দেখতে পাওয়ার মধ্যে ভালোটা কোথায়?''

''আছে, রায়বাবু। একে আমরা বলি চক্ষুক্ষীর। এটা চোখের ওপর এলে, তখন চোখ আর দেখতে পায় না, দেখতে পায় বোধহয় মন। কীভাবে হয় জানি না, তখন অনেক কিছু দেখতে পাই, যা সাদা চোখে কখনও দেখা যায় না। সবসময় তো এটা আসে না, কখনও-সখনও কালেভদ্রে আসে। যখন আসে, তখন পৃথিবীটার রূপই পালটে যায়। মনে-মনে বড্ড চাইছিলুম, এটা যেন আসে। প্রার্থনা করছিলুম, যদি কোনও পুণ্যফল আমার থাকে, তাহলে এই ভীষণ বিপদের দিনে যেন এটা পাই।''

'আমি আবার লম্বা হয়ে বললুম, ''দ্যাখো বসন্ত, সারাদিন ধরে নানারকম ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর সব কথা শুনতে হয়েছে, তার ওপর তুমি এলে তোমার চক্ষুক্ষীর না চক্ষুস্থির, কীসব নিয়ে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ঘুমোতে দাও। কাল আবার সকালবেলা বেরোতে হবে মোটা ল্যাজওলা আধখানা মানুষ আর আধখানা গিরগিটির সন্ধানে। কী যে সব হচ্ছে, কে জানে। বুঝতে পারছি না যে, আমি কি একটা পাগলাগারদের মধ্যে এসে পড়লুম, না সবাই আসলে সুস্থ, কেবল আমিই পাগল হয়ে গেছি।''

'বসন্ত বলল, ''পাগল কেউই হয়নি, রায়বাবু। কেবল একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমরা রোজ যা চোখে দেখি বা কানে শুনি, তার বাইরেও অনেক কিছু হয় বা আছে, যা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।''

'আমি বললুম, ''হুঁ! শেক্সপিয়ারও এরকমই কী একটা কথা যেন বলেছিলেন বটে।''

'পরদিন ভোরবেলা উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি, চন্দ্রশেখর বসে আছে। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমি স্তম্ভিত। কী এক প্রচণ্ড অন্তর্গূঢ় বেদনায় সে-মুখ বিকৃত হয়ে রয়েছে। আমি জিগ্যেস করলুম, ''কী হয়েছে?''

'চন্দ্রশেখর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, ''সুমিত্রা আমাকে আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছে গতকাল। যেভাবেই হোক, আজ রাত্রের মধ্যে ও চলে যাবেই। আমি যতক্ষণ ব্যবস্থা না করছি, ততক্ষণ সে অন্নজল স্পর্শ করবে না বলে দিয়েছে।''

'আমি বললুম, ''বলো কী! এ তো মহা বিপদ দেখছি। ঘনশ্যামবাবুর কাছ থেকে কোনও খবর পেলে?'

'মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, ''নাঃ। আজ আসবে হয়তো।''

''তবে তুমি ভেতরে গিয়ে বউঠানকে বলো যেন আজকের দিনটা অপেক্ষা করেন, তারপরে কাল না হয় অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।''

''কী ব্যবস্থা নেবে তুমি? ধাই-মা মারা গেছেন আজ সতেরো দিন হল। আর-একটা মৃত্যু আসছে আর দিন তিন-চারেকের মধ্যে। গাঁয়ের লোক রাত্রে বেরোনো বন্ধ করেছে। পাইকদের বা বেহারাদের কাউকে বললেও কেউ এখন বেরোবে না। কেটে ফেললেও না।''

''দিনে-দিনে যাবে, দিনে-দিনে চলে আসবে। কী আছে তাতে?''

''আরে, তুমি শুধু তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছ। তাদের তো পরিবার রয়েছে। তারা তো তাদের কথা ভাবছে।''

''হুঁ! সে-কথা ঠিক। তাহলে কী করবে?''

''তাই তো বুঝতে পারছি না। সুমিত্রা আমাকে যা-ই সন্দেহ করুক না কেন, তার জন্যে যদি নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে ভয়ের চোটে একটা ভালোমন্দ করে বসে, তাহলে আমি কোথায় যাব, বলতে পারো?''

'আমি বললুম, ''সত্যি তো! এ তো মহা অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি। তা এমন কেউ নেই, যার পরিবার-টরিবার নেই?''

'চন্দ্রশেখর চিন্তিত মুখে বলল, ''আছে। তার গোরুর গাড়িও আছে। আমাদের রামকেষ্ট গাড়োয়ান। কিন্তু সে-ব্যাটা বদ্ধ মাতাল। অন্তত দুটো পাইক ছাড়া সুমিত্রাকে তার হাতে ছাড়ি কী করে? দু-দিনের পথ।''

''তুমি সঙ্গে যাও না!''

''না, চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। বললুম না, সময় হয়ে এসেছে।''

'আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁক করে উঠল। বললুম, ''তুমি এখন কিছুতেই যেতে পারো না?''

'দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, ''না, অন্তত এই ক'টা দিন নয়।''

'কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল আমার। কোথায় একটা গোলমাল লাগছে, মনটা স্থির করে কিছুতেই একটা পরিষ্কার মীমাংসায় আসতে পারছি না। চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেলে অন্যমনস্কভাবে আমি বের হলুম শ্যামচরণ আর নীলুর খোঁজে।

'নীলুর একটা মুদির দোকান ছিল। তাকে সেখানে গিয়ে ধরলুম। জিগ্যেস করলুম, ''তুমি নাকি কীসব দেখেছ? কী দেখেছ?''

'নীলু বা নীলকণ্ঠ আধবুড়ো মানুষ। আমার কথা শুনে কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, ''না, না, আমি কিছু দেখিনি, রায়বাবু। বুড়ো লোক আমি, অন্ধকারে কত ছায়া দেখি। সেসব কি ধরতে আছে?''

'আমি বললুম, ''আমাকে ভাঁওতা দিয়ো না, নীলকণ্ঠ। কী দেখেছ, বলো!''

'কিছুতেই বলবে না। শেষটা হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। ওর পাশে রাখা হিসেব লেখার স্লেট আর পেনসিলটা তুলে নিয়ে বিজ্ঞান বইয়ে যে ডাইনোসোর-এর ছবি আঁকা থাকে সেরকম একটা মোটামুটি স্কেচ এঁকে ওকে দেখালুম। মুহূর্তের মধ্যে নীলকণ্ঠের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। ফিসফিস করে আমাকে জিগ্যেস করল, ''তবে তুমিও দেখেছ, রায়দাদা?''

'আমি কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ''হ্যাঁ, দেখেছি। তবে অনেক দূর থেকে তো, কতটা উঁচু বুঝতে পারিনি। তুমি বলতে পারো?'

'নীলকণ্ঠ বলল, ''আমি তো খুব কাছ থেকে দেখিনি। আর এক লহমার জন্যে তো! তবে মনে হয়, এক মানুষ কী তারচেয়ে একটু বেশি উঁচু হবে।''

'স্লেটটা ধার নিয়ে গেলুম শ্যামচরণের কাছে। সে মাঠে কাজ করছিল। আমার ছবি দেখে সে আমার শিল্পপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। আর তারও মত দেখলুম, সেটা এক-মানুষ সমান উঁচু হবে। আর চক্ষের পলকে ছুটে বেরিয়ে যায়। শরীরটা যতই ভারী দেখাক না কেন, অবিশ্বাস্য তার গতিবেগ।

'শ্যামচরণের কাছ থেকে ফিরে আসতে-আসতে দেখলুম, মনটা কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কি দুঃস্বপ্ন? এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, নীলকণ্ঠ আর শ্যামচরণ আলাদা-আলাদা সময়ে সাদা চোখে, অবশ্য আবছায়া অন্ধকারে, একটা অতিকায় সরীসৃপের অবয়ব দেখেছে। তারা মিথ্যে কথা বলছে না, কারণ, আমার মতো ঘাঘু উকিলকে এরকম পর্বতপ্রমাণ ধাপ্পা দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। তা ছাড়া, এতে এদের কোনও স্বার্থও থাকতে পারে না।

'তাহলে এরকম একটা জীব দিন কুড়ি-বাইশ কোথায় লুকিয়ে থাকে? চারদিকে যে-জঙ্গল আছে, সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক গভীর বা সেখানে একদম কোনও লোকজন চলাচল করে না, এমন নয়। আর জঙ্গলের দিকে যারা থাকে তারা তো তেমন মরেনি—বরং বেশি মারা গেছে তারা, যারা গ্রামের ভেতরের দিকে থাকে। অতএব, ধরে নিতে হয়, সেই প্রাণীটি গ্রামের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে থাকে।

'কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে থাকে কোথায়? কেউ কি তাকে লুকিয়ে রাখে? আর দিন কুড়ি-বাইশ অন্তর-অন্তর সে ক্ষুধার্ত হলে তাকে ছেড়ে দেয়? তাহলে নিশির ডাক? সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে, কেউ সেই সরীসৃপটি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়, তাকে শিকার ধরতে সাহায্য করে। সে কে? আর, এরকম একটা অতিকায় সরীসৃপ লুকিয়ে রাখার মতো জায়গাই বা কোথায়? জমিদারবাড়ি?

'অসম্ভব নয়। ও-বাড়ির তো মাত্র একটা অংশে চন্দ্রশেখর থাকে। আর বেশিরভাগ অংশই তো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। ওদিকে কি কিছু আছে?

'দুপুরবেলা খেতে বসে চন্দ্রশেখরকে আমার গবেষণার কথা বললুম। চন্দ্রশেখর স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার সব কথা শুনল। কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করল না। খাওয়া শেষ হলে অন্দরের ভেতরে গিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে এল এক হাতে একটা রাইফেল আর অন্য হাতে একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল, ''চলো, অন্য মহালগুলো একটু খুঁজে দেখি।''

'আমি বললুম, ''চলো।'' বসন্ত কাছেই ছিল। সেও জুটে গেল। কেবল জুটে গেল নয়, আঠার মতো আমার সঙ্গে সেঁটে গেল বলা যায়।

'কিন্তু কোনও লাভ হল না। কিছুই পাওয়া গেল না। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলুম।

'বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতেই একজন পাইক একটা টেলিগ্রাম দিল চন্দ্রশেখরের হাতে। সেটা পড়ে চন্দ্রশেখরের মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'আমি ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলুম, "কী হল?"

'ভগ্ন কণ্ঠে চন্দ্রশেখর বলল, "শ্বশুরমশায়ের তার। উনি আসছেন, তবে আরও সাতদিন বাদে।"

'সেদিন সন্ধেবেলা চন্দ্রশেখর আমাকে ওর অন্দরমহলের বসবার ঘরে ডেকে পাঠাল।

'ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মাঝখানে চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখটা লাল টকটক করছে। আর এককোণে পেছন ফিরে ঘোমটা টানা একটি মেয়ে—বুঝলুম সুমিত্রা। আর এ-ও বুঝতে পারলুম, দাম্পত্য কলহে কিছুতেই জিততে না পেরে চন্দ্রশেখর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে সাহায্যের জন্যে।

'চন্দ্রশেখর আমাকে দেখে চাপা গলায় বলল, "তোমার বউঠানকে একটু বুঝিয়ে বলো তো, চিত্তপ্রসাদ, যে আজ রাত্রে তার পক্ষে এ-গ্রাম ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনওমতেই সম্ভব নয়।"

'ঘোমটার আড়াল থেকে সরোষ প্রশ্ন এল, "কেন সম্ভব নয়? সম্ভব করলেই সম্ভব!"

'সরোষ প্রশ্ন বললুম বটে, কিন্তু কী গলা! মনে হল যেন একটা সেতার বেজে উঠল। এমন একটা আশ্চর্য মিষ্টি সুরেলা গলা আজ পর্যন্ত আর শুনিনি।

'আবার সেতার বেজে উঠল, "কারও সাহায্যেরও দরকার হত না। পা'টা যদি না মচকাত, তাহলে আমি একাই হেঁটে চলে যেতাম।"

'চন্দ্রশেখর বলল, "তোমার পা মচকায়নি, হাড় ফেটে গেছে। এ-অবস্থায় গোরুর গাড়ি করে এই অন্ধকারে কখনও কি কারও যাওয়া সম্ভব? মেয়েমানুষের কথা বাদ দাও, কোনও পুরুষমানুষই কি এরকম অবস্থায় যেতে পারে? কেন তুমি এরকম করছ? তুমি আমাকে বিশ্বাস না করো, ঘরে খিল দিয়ে থাকো, বাইরে দশটা পাইক বসিয়ে দিচ্ছি।"

"না, না, না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, তোমার পাইকদের বিশ্বাস করি না, কাউকে না। ধাই-মা মারা গেছেন, এবার আমার পালা। এমনভাবে পড়ে-পড়ে আমি মরতে পারব না। আমি চলে যাব, আজই চলে যাব।'

'চন্দ্রশেখর আমার দিকে ফিরে বলল, "আতঙ্কের এমন ভয়ঙ্কর রূপ এর আগে কখনও দেখেছ, চিত্তপ্রসাদ?" 'আমি কিন্তু তখন অন্য কিছু দেখছিলুম। মনে-মনে একটা কুৎসিত ছবি এঁকে ফেলছিলুম। আমি মোটামুটি শিক্ষিত লোক, ভদ্রসন্তান, একটা আদর্শের অনুগামী। যে-আদর্শের একটা প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা, কিন্তু সেই আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত কলুষিত চিন্তা অবচেতনের ক্লেদাক্ত গহ্বর থেকে সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। সুমিত্রার গলা শুনে আমার মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি ভাবলুম, সুমিত্রা শুনেছি অপরূপ সুন্দরী। এমন কণ্ঠস্বর যার, সে অসাধারণ না হয়ে যায় না। তার ওপর তার পা ভাঙা—অতএব প্রায় চলচ্ছক্তিহীন বলা চলে। একটা মাতাল গাড়োয়ানের গাড়িতে একে নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ একটা পুরুষমানুষের জীবনে দুবার আসে না। চন্দ্রশেখর জাহান্নামে যাক, এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করব না এমন নির্বোধ বন্ধু আমি নই।

'আমি বললুম, "ঠিক আছে, বউঠান যখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তখন আমিই না হয় ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

'চন্দ্রশেখর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুমি যাবে? বেশ, তাই হোক। তবে সঙ্গে বসন্তকে নিয়ে যাও।"

'আমার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললুম, "কেন, বসন্ত কেন? তুমি কি মনে করো, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি না?"

'চন্দ্রশেখর স্থির গলায় বলল, 'না, তা নয়। যদি তোমাদের কেউ আক্রমণ করে, তাহলে অন্তত একজন পালিয়ে গিয়ে খবর দিতে পারবে। সুমিত্রা বা রামকেষ্টর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আর তুমি যদি বিপদের মোকাবিলা করতে থাকো, তাহলে বসন্ত পালিয়ে তো যেতে পারবে।"

'আমি আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সুমিত্রার গলা শুনতে পেলুম আবার, ''আপনি আপত্তি করবেন না, চিত্তঠাকুরপো। চলুক না আপনার বসন্ত আমাদের সঙ্গে। অসুবিধে কিচ্ছু হবে না, দেখবেন।''

'সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা দ্রুত খেলে গেল। এক, যদি বসন্তকে নিয়ে গোলমাল পাকাই, হয়তো যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। দুই, যদি বসন্ত যায়ও, ওকে তাপ্পি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া অসুবিধে হবে না। তিন, বসন্ত যদি গোলমাল করে, ওকে না হয় খুনই করে ফেলা যাবে। পরে এসে বলব, রক্তচোষা মেরেছে।

'কাজেই বললুম, ''ঠিক আছে, বসন্ত চলুক আমাদের সঙ্গে।''

'চন্দ্রশেখর বলল, ''বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আর অস্ত্রশস্ত্র কিছু সঙ্গে আছে, না একটা বন্দুক দিয়ে দেব সঙ্গে?''

'আমি বললুম, ''আমি তৈরিই আছি। আর অস্ত্রের দরকার কী? তোমার মতো অত ভয় আমার নেই। তা ছাড়া, আমি বন্দুক চালাতেই জানি না।''

'চন্দ্রশেখর বলল, ''না, অস্ত্র ছাড়া আমি তোমাদের কিছুতেই যেতে দেব না। তুমি না নাও, বসন্ত নিক। ওকে ডাকো, দেখি অন্তত সড়কি চালাতে জানে কি না।''

'বসন্ত ঘরে ঢুকেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেল। চন্দ্রশেখর একটু বিস্মিত হয়েই জিগ্যেস করল, ''কী হল, বসন্ত?''

'বসন্ত একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, ''গন্ধটা বড্ড বেশি!''

'চন্দ্রশেখর আবার কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললুম, ''তোমার ওই ন্যাকামো বন্ধ করো তো, বসন্ত! জমিদারবাবু যা প্রশ্ন করছেন, তার জবাব দাও। গন্ধ-গন্ধ করে মাথা খারাপ করে দিল একেবারে।''

'আমার রূঢ়তায় বসন্ত চমকে উঠল। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ''কী প্রশ্ন?'' বলতে-বলতে দেখি ওর চোখের ওপর একটা অস্বচ্ছ ঘন তরল আবরণ নেমে এসে মণিদুটোকে আড়াল করে দিচ্ছে। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, ওকে চিৎকার করে গালাগালি করতে ইচ্ছে হল।

'কিন্তু আমি কিছু করার আগেই চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, ''তুমি কি বন্দুক চালাতে জানো, বসন্ত?''

'বসন্ত মাথা নেড়ে বলল, ''না।''

''সড়কি চালাতে পারো? বা বর্শা?''

''হ্যাঁ, পারি। সড়কির খেলায় আমি গুরু যাদবচন্দ্র পালের শিষ্য।'' বলে দু-হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাল বসন্ত।

'চন্দ্রশেখর একটা দেওয়াল-আলমারির ভেতর থেকে একটা রুপো-বাঁধানো লাঠি বের করে নিয়ে এল। সেটার মাথাটা খুলতেই ভেতর থেকে প্রায় একহাত লম্বা একটা চকচকে ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। সেই প্রাণঘাতী অস্ত্রটাকে বসন্তের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, ''এটা ব্যবহার করতে পারবে? এটা আমার ঠাকুরদাদার গুপ্তি—তাঁর বংশের মর্যাদা রেখেছে অনেকবার।''

'বসন্ত গুপ্তিটা ভক্তিভরে নাড়াচাড়া করে বলল, ''হ্যাঁ, এ-অস্ত্র ব্যবহার করতে পারব। কিন্তু কেন? কোথায় ব্যবহার করতে হবে?''

'এবার আমি কথা বললুম, ''বউঠাকুরানি আজ এখুনি বাপের বাড়ি যাবেন। গোরুর গাড়িতে যাবেন, সঙ্গে আমি থাকব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।''

'বসন্ত দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল। বলল, ''না, আপনার যাওয়া হতে পারে না, রায়বাবু। গন্ধটা আজ বড্ড বেশি, আর আপনার ভেতরে...সে-কথা থাক। আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না।''

'বসন্তের কথায় রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমি চিৎকার করে বললুম, ''তুমি আমায় যেতে দেবে না? কোথাকার লাটসাহেব তুমি? তুমি না যাও, ওই গুপ্তি নিয়ে আমি একাই যাব। ওটা দাও

আমাকে।''

'বসন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে অস্ত্রটা আমার হাতে দিয়ে দিল, কিন্তু আমি সেটা ভালো করে ধরার আগেই চন্দ্রশেখর আমার হাত থেকে টেনে নিল সেটা। বলল, ''না, না, চিত্তপ্রসাদ, এ-জিনিস চালানো বড় সহজ নয়। কায়দা জানা না থাকলে নিজেই আহত হয়ে পড়বে—এমনকী কোনও গুরুতর বিপদ কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।'' তারপর বসন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, ''যাও না, বসন্ত, আমি বউঠাকুরানিকে কথা দিয়েছি যে, তাঁকে আজ বাপের বাড়ি রওনা করিয়ে দেবই।''

'বসন্ত ঘাড় নিচু করে বলল, ''না জমিদারবাবু, সেটা অসম্ভব।''

'তখন ঘরের কোণ থেকে আবার সেই শততন্ত্রী বীণা বেজে উঠল, ''কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই, বসন্ত। তুমি না নিয়ে গেলে আমি যাব কী করে?''

'ঘরে যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি রয়েছেন, সেটা এতক্ষণ বসন্ত বুঝতে পারেনি। সুমিত্রার গলা শুনে পূর্ববৎ ঘাড় নিচু করেই একটু অস্বস্তিভরা গলায় বলল, ''আমাকে ক্ষমা করবেন, মা, আমি বুঝতে পারিনি আপনি ঘরেই আছেন। তবে ছেলের বেয়াদবি মাপ করবেন। আমি কিছুতেই যাব না, রায়বাবুকেও যেতে দেবো না। মানে, আমি জীবিত থাকতে উনি যেতে পারবেন না।''

'শুনে আমি বলতে গেলুম যে, জীবিত তুমি থাকবে না, কিন্তু তার আগে সুমিত্রা বলে উঠল, ''আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না, বসন্ত?'' বলতে-বলতে এসে বসন্তের সামনে দাঁড়াল।

'বসন্ত যথারীতি চোখ নিচু করে বলল, ''না বউঠাকরুন, আমাকে মাপ করতে হবে। আজ গন্ধটা বড্ড বেশি।''

'তখন সুমিত্রা একটা অদ্ভুত কাজ করল। এমন কাজ যা সে-যুগে কোনও জমিদারবাড়ির বউয়ের পক্ষে করা শুধু অদ্ভুত নয়, অসম্ভব ছিল। বসন্তের সামনে সে মুখের ঘোমটা সরিয়ে পিঠের ওপর ফেলে দিল। বলল, ''আমার মুখের দিকে তাকাও, বসন্ত। বলো, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে না?''

'আমি আর চন্দ্রশেখর স্তম্ভিত বিস্ময়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইলুম। সে কী আশ্চর্য রূপ! একজন সীতার জন্যে যে লঙ্কা ধ্বংস হতে পারে, একজন হেলেনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হতে পারে ট্রয়, বা একজন দ্রৌপদীর জন্যে নির্বংশ হতে পারে কুরুরাজবংশ, তাতে আজ আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই রূপ আমার সর্বাঙ্গে বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দিল। ইচ্ছে হল, এই দেবভোগ্য সৌন্দর্যে অধিকার শুধু আমার, চন্দ্রশেখর আর বসন্ত দুজনকেই গলা টিপে মেরে একে বুকে নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যাব, কেউ বাধা দিতে এলে শেষ করে দেব তাকেও।

'আমার এই চিন্তার মধ্যেই সুমিত্রা আবার বীণার ঝঙ্কার তুলল, ''তাকাও, বসন্ত, আমার দিকে তাকাও।''

'নতনেত্র বসন্ত আস্তে-আস্তে মুখ তুলে ঘোলাটে চোখ রাখল সুমিত্রার মুখে। এক মুহূর্ত। তারপরেই মাতালের মতো তীক্ষ্ন তীব্র চিৎকার করে উঠল, ''কে তুমি? কে তোমাকে এখানে এনেছে?''

'চন্দ্রশেখর এক-পা এগিয়ে বিস্ময়-কম্পিত গলায় বলল, ''উনিই বউঠাকুরানি, বসন্ত। উনিই বাপের বাড়ি যাবেন।''

''বাপের বাড়ি! কোথায় বাপের বাড়ি!''

''ওঁর বাপের বাড়ি গঙ্গাযমুনা গ্রামে। এখান থেকে দু-দিনের রাস্তা।''

''গঙ্গাযমুনা গ্রামে? দু-দিনের রাস্তা?'' হা-হা করে হেসে উঠল বসন্ত : ''ওর বাপের বাড়ি নরকে, জমিদারবাবু, পৃথিবীর পেটের মধ্যে, পাতালে—যেখানে গনগন করে আগুন জ্বলছে। এই পিশাচীরা উঠে আসে সেখান থেকে। এরা যা কিছু ছোঁয় তাই অপবিত্র হয়, যার দিকে তাকায় সেই অপবিত্র হয়ে যায়। এদের বেশাতি লালসার, এদের তৃপ্তি মৃত্যু আর ধ্বংসে। এদের গলার মধ্যে বিষ জমে ওঠে, সেই বিষ ঢেলে একটা প্রাণ না নিলে এরা নিজেরাই সেই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে। তোর তো সেই বিষ ঢালার সময় হয়ে

এল, না শয়তানি? এই বাড়ির মধ্যে পাইক-পেয়াদায় আটকা পড়ে, ঠ্যাং ভেঙে অসুবিধে হচ্ছে, নয়? তাই ভেবেছিস, বাইরে গিয়ে একজনের ওপর বিষ ঢালবি। তাই এত আকুলিবিকুলি, এত ছটফটানি?''

'আমি বসন্তের কথা শুনে রাগে দিশেহারা হয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছিলুম ওকে মারব বলে, চন্দ্রশেখর আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল। নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সুমিত্রার পায়ের দিকটা দেখাল। যেখানে একটু আগে দেখেছিলুম একজোড়া রাঙা পদ্মের মতো পা, সেখানে...কী দেখলুম!

'বসন্ত তখনও বলে চলেছে, ''আর তা হতে দিচ্ছিনে। আমি তোকে কিছুতেই বেরুতে দেব না। তুই নিজের বিষে জ্বলে-পুড়ে মরবি, তাই আমি দেখব।''

'সুমিত্রার গলা শুনলুম, ''আমি মরব না রে...মরবি তুই। মর, তুই মর।''

'বলতে-বলতেই ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হল। আমি যে-বিভীষিকা দুটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিলুম তারা ঢেকে গেল কতগুলো ছেঁড়া শাড়ি-জামা আর ভাঙা গয়নায়। তারপর একসঙ্গে দুটো শব্দ শুনলুম, একটা বসন্তের ক্ষীণ হাহাকার আর একটা খ্যাক করে আওয়াজ। মুখ তুলে দেখলুম, সেই ভয়ঙ্কর আকৃতি, যেটা একটু আগে ছিল পরমা রূপসী সুমিত্রা, তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব না, কারণ, তাহলে আপনারা বলবেন, বুড়ো বয়েসে আমার কেবল ভীমরতিই ধরেনি, আমি গাঁজাও ধরেছি। কাজেই সেটা থাক। সেই ভীষণাকার একটা শরীর মৃত্যু-যন্ত্রণায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। তার গলায় চন্দ্রশেখরের হাতের গুপ্তিটা আমূল গাঁথা। আমি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম আর দেখতে লাগলুম সেই অতিকায় দংষ্ট্রাকরাল বীভৎস মুখটা আকাশের দিকে উঁচু হয়ে খাবি খেতে-খেতে আস্তে-আস্তে স্থির হয়ে নেতিয়ে পড়ল। শেষ সংক্ষোভে শরীরটা বারকয়েক ঝাঁকুনি খেল। তারপর সব স্তব্ধ।

'তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ ছিল না। আবার আমাদের চোখের সামনে সেই নারকীয় দুঃস্বপ্নের একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বোধহয় পাঁচ মিনিট। তারপরেই দেখি বসন্তের রক্তহীন মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে আর-একটি নিরাবরণ শরীর। মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত হলেও সেই অসাধারণ রূপের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে, সেই রূপ দেখে এবার আমার মনের মধ্যে যে-ভাব জেগে উঠল তা আতঙ্কের। মনে হল, এক্ষুনি পালিয়ে যাই। যদি ওটা আবার বেঁচে ওঠে, যদি গলায় বেঁধা গুপ্তিটা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

'চন্দ্রশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে তখনও আতঙ্ক, অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিস্ময় মেশানো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহ দুটির দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আমার সংবিৎ ফিরে এল। আমার আইনজীবীর মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রার গলা থেকে গুপ্তিটা টেনে বের করে একটা চাদর দিয়ে দেহটা ঢেকে দিলুম। তারপর চন্দ্রশেখরের কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করলুম। সঙ্গে-সঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল।

'চন্দ্রশেখরের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন সে দীর্ঘকাল কোনও দুরারোগ্য অসুখের পর সদ্য সুস্থ হয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল, ''ব্যাপারটা যে এরকমই কিছু সে-সন্দেহ আমার বেশ অনেকদিনই হয়েছিল। মৃত্যুগুলো যে-রাত্রে ঘটত সেই রাত্রিগুলোর কোনও স্মৃতিই আমার থাকত না। সেই রাত্রিগুলোর দু-একদিন আগে থেকেই সুমিত্রা কেমন অদ্ভুতভাবে ছটফট করে বেড়াত। ওর গায়ে আমি কতগুলো কাটা এবং আঁচড়ের দাগ দেখেছি, যেগুলোর কোনও উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও দিতে পারেনি। আর, যেদিন বাঁদরটা মারা পড়ল সেদিন ওর পায়ের হাড় ভাঙার কোনও কারণই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বাথরুমে পড়লে ওরকম হতে পারে না। তারপর যখন ধাই-মা মারা গেলেন তখন আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম। অন্তত এটুকু বুঝেছিলুম যে, আমার বিয়ের পর থেকেই এখানে যে-কাণ্ড শুরু হয়েছে তার শেকড়টা রয়েছে আমারই বাড়িতে। তবে ব্যাপারটা যে এমন ভয়ঙ্কর, তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আর কিছু করতেও পারছিলুম না। কেমন যেন সম্মোহনের মধ্যে ছিলুম। তবে আমার অবচেতন মন বোধহয় তৈরি হচ্ছিল। তাই আজ চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখেই আমার হাত গুপ্তিটা ছুড়ল লক্ষ্যস্থলে, কিন্তু তাকে

আমার বোধশক্তি চালায়নি, চালিয়েছে আমার মগ্নচৈতন্য; আসলে আমার চিন্তা করার শক্তিই বোধহয় চলে গিয়েছিল।''

'কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিগ্যেস করল, ''এবার আমরা কী করব, চিত্তপ্রসাদ? পুলিশে খবর দেব?''

'আমি ততক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছি। বললুম, ''না। পুলিশে খবর দিলে তারা এসে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। আমরা যা দেখেছি তার শতাংশের একাংশও বিশ্বাস করবে না—করতে পারেও না। তুমি মানুষের কল্যাণ করে খুনি বলে পরিচিত হবে। এ আমি হতে দিতে পারি না—কেবল তোমার বন্ধু বলে নয়, একজন মানুষ বলে।''

''তবে আমরা কী করব?''

''তুমি এখুনি গাঁয়ের লোককে খবর দাও। বলো, এবার রক্তচোষার শিকার দুজন—বউঠাকুরানি, আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বসন্ত। বসন্তের মৃতদেহ দেখলে সবাই নিশ্চিন্ত হবে। সুমিত্রাকে তুমি স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে দাও আর ঘোমটা আর কাপড় দিয়ে যতটা সম্ভব মুখটা ঢেকে দাও। সবাইকে বলে দাও, যত শীঘ্র সম্ভব দাহ শেষ করে যেন চলে আসে। কেউ কোনও সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না। মৃত্যুভয় তার পরেও থাকবে। থাকুক। যখন অপঘাত মৃত্যুগুলো বন্ধ হবে, তখন আতঙ্কটা আস্তে-আস্তে কেটে যাবে।''

'''তুমি আমার কাছে থাকবে তো?''

'''হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অন্তত যতদিন ঘনশ্যামবাবু না আসছেন।''

'ঘনশ্যাম এসে নাক কুঁচকে বললেন, ''রক্তচোষা মেরেছে? আমি এসবে বিশ্বাস করি না। তোমরা ওকে খুন করেছ। আমি পুলিশে যাব, আমার মেয়েকে খুন করার জন্যে তোমাদের হাঁড়ির হাল করে ছাড়ব। ওই ফচকে উকিল সামনে ধরে তুমি পার পাবে না, চন্দ্রশেখর।''

'আমি বললুম, ''ঘনশ্যামবাবু, আপনি অনেক মামলা-মোকদ্দমা লড়েছেন, আমি জানি। অতএব এ-কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে খুনের মামলা বড় বিষম বস্তু, তাতে অনেক কিছু নিয়েই টান পড়ে। সে-টানাপোড়েন সইতে পারবেন তো?''

'ঘনশ্যাম রায় আমার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে বললেন, ''আমার কী নিয়ে টান পড়বে, উকিলমহাশয়?''

'''আপনার স্ত্রী তো বেঁচে আছেন? ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে তিনি নিঃসন্তান? সুমিত্রা আপনার মেয়ে নয়?''

'''তাতে কী হল? আমার মেয়ে না হলেই তাকে খুন করতে হবে?''

'''আপনার কুলপুরোহিত শুনেছি দুবার আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন। এ-ও শুনেছি, শিশুহত্যা করতে গিয়েছিলেন তাই। কথাটা সত্যি নাকি?''

'''তাতে কী প্রমাণ হয়?''

'''কিছুই না, কিছুই না। তবে শুনেছি, সুমিত্রার এগারো বছর হওয়ার সময় থেকে আর তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আপনার গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের ঘরে অনেকগুলো মৃত্যু হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে এখানকার অপঘাত মৃত্যুগুলোর অনেক মিল! তারা নাকি শপথ করেছে যে, এ-মৃত্যুগুলোর জন্যে যে বা যা কিছুই দায়ী হোক না কেন, জান দিয়েও তারা তাকে শেষ করে ছাড়বে। এখন কেউ যদি তাদের গিয়ে এখানকার মৃত্যুগুলোর কথা বলে, তাহলে তারা কী ভাববে বলুন তো?''

'ঘনশ্যাম গুম হয়ে গেলেন। বললেন, ''কী ভাববে?''

'''ভাববে, আপনি জেনেশুনে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তারা ভাববে, আপনি ইচ্ছাকৃত নরহত্যাকারী, তাদের আত্মীয়-পরিজন-পরিবারের সর্বনাশের মূল কারণ। তখন তাদের বিচারে আপনার কী শাস্তি হবে, তা ভেবে দেখেছেন?''

'''তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?''

'''হ্যাঁ। আপনি অতি জঘন্য অপরাধী। আপনাকে ভয় দেখানোর নীতিগত অধিকার আমার আছে। আপনার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা আপনার ওই মুসলমান প্রজারাই। আপনি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন এসেছেন চন্দ্রশেখরের হাঁড়ির হাল করতে।''

'''তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে?''

'''ঘনশ্যামবাবু, আমি ফচকে উকিল হতে পারি, কিন্তু নির্বোধ নই। আপনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি এবং আপনি যে এরকমই একটা কাণ্ড করবেন, তা আগেভাগে বুঝে নিয়ে, সুমিত্রার মৃত্যুর পরদিনই আমি আপনার গ্রামে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে সব খবরই নিয়ে এসেছি। আর খানিকটা ছেড়েছি আন্দাজে। তবে আমার ভুল হয়নি।''

'দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনশ্যাম বললেন, ''না, তা হয়নি। ঠিক আছে। যা করেছ, বেশ করেছ। আমি তাহলে এখন চলি।''

'আমি বললুম, ''দাঁড়ান। সুমিত্রা আপনার নিজের মেয়ে নয় তাতে সন্দেহ নেই। কার মেয়ে সে?''

'ঘনশ্যাম বললেন, ''আমি তার পরিচয় জানি না। আজ থেকে বছর-কুড়ি আগে একদিন একটা ভবঘুরে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে তার ভেলকি দেখাতে। অতি অদ্ভুত ছিল তার খেলা। কিন্তু তার খেলার চেয়েও যেটা আমায় সবচেয়ে অবাক করেছিল, তা হচ্ছে তার খেলার চুবড়ির পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ানো একটি প্রায় সদ্যোজাত শিশু। অবাক করেছিল, কারণ, লোকটি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত। এত কদাকার যে তাকে দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে আর মেয়েটি ছিল তেমনি সুন্দর, ফুটফুটে। আমার নিজের সন্তান ছিল না। তাই লোকটিকে ডেকে বাচ্চাটা কিনে নিতে চাইলুম। পঞ্চাশ টাকায় রফা হয়েছিল।

'''পরে বাচ্চাটার স্বরূপ বুঝতে পারি। তাকে দুবার মারতেও গিয়েছিলুম। কিন্তু কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, শেষ মুহূর্তে আর পারিনি।''

'চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে জিগ্যেস করল, ''তাহলে আপনি তার বিয়ে দিলেন কেন? আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি। আমার এমন সর্বনাশটা করলেন কেন?''

'ঘনশ্যাম কাষ্ঠ হেসে বললেন, ''ভেবেছিলুম, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি ভুল করেছিলুম। তা সে যাকগে। সব তো চুকে-বুকে গেছে। এখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।''

'চন্দ্রশেখর ক্লান্ত গলায় বলল, ''হবে কি? বসন্ত যা বলে গেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে তো এরা আবার উঠে আসবে। আর আপনার মতো লোক যদি পায়, তবে তাকে আশ্রয় করে আবার এরা নিয়ে আসবে কালরাত্রি। তবে বসন্তের মতো লোকও নিশ্চয়ই থাকবে, যারা কেবল চোখ দিয়েই দেখবে না, মন দিয়েও দেখবে। সেটাই যা ভরসা। তা না হলে এই সুন্দর পৃথিবীটা তো কবেই বিষের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যেত।'''

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮০



হত্যারহস্য

কণা বসুমিশ্র

সুখেনের মৃত্যুর খবর দিতে এসেছিল যে-যুবকটি, সে-ই গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। থানার ও. সি. সন্তোষবাবু লোকটির এজাহার নথিভুক্ত করলেন। দু-তিনজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সেই গ্রামে।

ছোট স্টিমার স্টেশন গোমেরীঘাট। স্টিমারের মাল ওঠানামার জন্য জলের ওপর ভাসে স্টিমারের সঙ্গেই চেন দিয়ে বাঁধা একটি ফ্ল্যাট। একজন সুখানী সেই ফ্ল্যাটের মালের চার্জে থাকে। কয়েকজন খালাসি থাকে। একজন সারেঙ ফ্ল্যাটের দিক নির্ণয় করে।

এই গোমেরীঘাটের পাশে মুদির দোকানের মালিক ছিল সুখেন। মোটামুটি শিক্ষিত বেকার যুবক। চাকরি জোটাতে না পেরে চলে এসেছিল গৌহাটি ছেড়ে।

গ্রামের শেষপ্রান্তে একটি মাঠের মধ্যে ছিল তার দোকান। কাছাকাছি সব চাষি, গরিব মানুষের বাস। চা-বাগানের মালবাবু, গুদামবাবুর টিনের ঘর। যাঁরা দু-চারদিনের জন্য ছুটি কাটাতে যান।

সুখেনের চালাঘরের পাশে এসে ও. সি. দেখলেন রীতিমতো ভিড়। টিনের দরজাটা খোলাই ছিল। কিন্তু গাঁওবুড়া, মানে মোড়ল, দরজা আগলে রেখেছে।

বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে সুখেনের মৃতদেহ। ও ডানপাশ ফিরে শুয়েছিল। সেই অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ওর। সুখেন বিষ খেয়েছে। ও আত্মহত্যা করেছে, এটাই গ্রামের লোকের ধারণা।

ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট তৈরি করলেন ও. সি.।

প্রথম রিপোর্ট দিয়েছিল যে-যুবকটি, সেই এজাহারকারী আবার এসে উপুড় হয়ে পড়ল সন্তোষবাবুর পায়ের ওপর। সুখেন ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। বন্ধুর মৃত্যু সে সহ্য করতে পারছে না। সে বারবারই বলতে লাগল, 'হুজুর, আপনার তদন্ত যেন জোরদার হয়।'

ধ্মকে ওঠেন সন্তোষবাবু : 'ধৈর্য ধরো। আমি যা জানতে চাই তার জবাব দাও। তোমরা বলছ, ওর অনেক টাকা ধার হয়েছিল। তা ওর পাওনাদারদের নাম-ঠিকানাগুলো বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, বাবু।' সুখেনের বন্ধু রাজেন কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'এই গাঁয়েরই লোক। ওই তো, গাঁওবুড়ার কাছেই সে অনেক টাকা ধার করেছিল।'

ও. সি. তাকালেন মোড়লের দিকে। খুঁটিয়ে দেখলেন ওর আপাদমস্তক।

গাঁওবুড়ার বয়স হয়েছে। একমাথা পাকা চুল। মুখ-ভরতি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ওর চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল। জলে ভরা।

গাঁওবুড়া বলল, 'আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম, বাবু। সুখেন আমার ঘরের ছেলের মতো ছিল।' কথা বলতে-বলতে গলা ধরে এল গাঁওবুড়ার।

এই বুড়োমানুষটির দিকে তাকিয়ে সন্তোষবাবুরও খুব মায়া হল।

'কে-কে আছেন আপনার ঘরে?' উনি প্রশ্ন করলেন।

'আমার বউ আছে, মেয়ে আছে, বাবু।'

'কতদিন থেকে সুখেনের সঙ্গে পরিচয়?'

'যতদিন থেকে সে এখানে দোকান করেছে। মানে তিন বছর।'

'খুব যাতায়াত ছিল বুঝি?'

'তা তো ছিল।'

'কাল রাতে আপনার বাসায় গিয়েছিল?'

'না। ও রোজই যেত। তবে গত কয়েকদিন থেকে মোটেই যায়নি। কাল রাত্তিরে আমার ঘরে খেতে ডাকি। তাও আসেনি।'

ডায়েরিতে নোট করলেন ও. সি.।

'আপনি টাকার জন্যে ওকে তাগাদা দিতেন?'

'তা বাবু, মাঝে-মাঝে দিতাম। গরিব মানুষ। খেত-খামার করে খাই। টাকার তো দরকার, হুজুর। তা সুখেন—' লোকটি থামল।

ও. সি. তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালেন : 'বলুন।'

গাঁওবুড়া বলল, 'কয়েকদিন ধরে সুখেন টাকার জন্যে বোধহয় খুব ঘুরছে। এই সোমবার সকালে সে সব টাকা শোধ করবে বলেছিল।'

'মানে আজ? আজই তো সেই সোমবার।'

গাঁওবুড়া মাথা নাড়ল।

সুখেনের দোকানঘর তছনছ করলেন সন্তোষবাবু। টাকাপয়সার কোনও হদিশ মিলল না। তবে কি আত্মহত্যাই করল সুখেন? কিন্তু সন্তোষবাবুর ধারণা কেউ তাকে খুনই করেছে।

এজাহারকারীকে জিগ্যেস করলেন সন্তোষবাবু, 'কাল কত রাত্তিরে সুখেন ফিরেছিল জানো?'

'সঠিক বলতে পারব না, বাবু। তবে মনে হয়, অনেক রাত্তিরে।'

'তুমি কি কাল রাত্তিরে ওর কাছে এসেছিলে?'

'না, বাবু। ভোরবেলা এসেছিলাম।'

'তবে কী করে জানলে অনেক রাত্তিরে ও ফিরেছে?'

'ফ্ল্যাটের ওই খালাসি বলছিল, সুখেন তাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। তাড়ি খেয়ে ফিরেছে অনেক রাত্তিরে।'

'খালাসিকে ডাকো।'

হঠাৎ সন্তোষবাবুর নজরে পড়ল সুখেনের চাবিটার দিকে। চাবিটা পড়ে রয়েছে চৌকির তলায় একটা অন্ধকার কোণে। আশ্চর্য! এতক্ষণ টর্চ জ্বেলে সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ক্যাশবাক্সের চাবিটা পাননি সন্তোষবাবু। চাবি-বন্ধ ক্যাশবাক্সটা সুখেনের মাথার কাছেই রয়েছে।

সন্তোষবাবু বাক্সটা খুললেন। একটা নোটের বান্ডিল। উনি গুনে দেখলেন, পুরোপুরি দু-হাজার টাকা।

তবে কি যে ওকে খুন করেছে, সে টাকাটার কথা জানে না? অথবা, ক্যাশবাক্স ভাঙার কথা তার মনে হয়নি কেন? চাবিটা খুঁজে পাওয়াও কি তার পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল?

জাহাজের খালাসিরাও নাকি তাকে ভালোবাসত খুব। গ্রামের মানুষেরা সবাই। তার কোনও শত্রু ছিল না। অথচ সে খুন হল। টাকার লোভেও খুন করল না খুনি। তবে সুখেন খুন হল কেন?

ফ্ল্যাটের খালাসি এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ও. সি.-র সামনে।

'কাল কত রাত্তিরে সুখেন তোমার কাছ থেকে ফিরেছে?'

'রাত গোটা দুয়েক।'

'খুব তাড়ি খেয়েছিল?'

'খুব না।'

'সেই তাড়ির বোতলটা আছে?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'নিয়ে এসো।'

বোতলের তলায় সামান্য কিছু তলানি পড়েছিল। পরীক্ষার জন্য ওটা সঙ্গে নিয়ে নিলেন সন্তোষবাবু।

ময়না তদন্ত হল সুখেনের লাশটির। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। তাড়িতেও কিছু পাওয়া যায়নি। তার স্টমাকে ফলিডল পাওয়া গেছে। কে তাকে ফলিডল খাওয়াল? কেন খাওয়াল? সে যদি নিজে খেয়ে থাকে, তো কেন খেল? সেই ফলিডলের শিশিটাই বা কোথায়? হত্যাকারী বোকা সন্দেহ নেই। সন্তোষবাবুর মনে হল।

তদন্ত করতে-করতে পরিশ্রান্ত হলেন ও. সি.। ঘটনার কোনও সূত্রই ধরতে পারলেন না। সুখেনের ধারে-কাছে কোথাও কোনও ফলিডলের শিশি ছিল না। অথচ সে ফলিডল খেল।

স্টিমারের ফ্ল্যাটটা সার্চ করা হয়েছে। খালাসি, সারেঙ কেউই পুলিশের জেরার হাত থেকে রেহাই পায়নি। কোনও সূত্র ধরতে পারছেন না ও. সি.।

হঠাৎই একদিন ও. সি. এলেন গাঁওবুড়ার বাড়িতে। যদিও এর আগেও এসেছিলেন, কিন্তু গাঁওবুড়ার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। সে থাকে মঙ্গলদই। শিক্ষিতা যুবতী। মঙ্গলদই মহকুমার কোনও একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সপ্তাহের শেষে গাঁয়ে আসে।

রোববার খুব ভোরে গাঁওবুড়ার দরজায় টোকা মারলেন ও. সি.।

গাঁওবুড়ার মেয়ে লপং-এর চোখ-মুখের ভাব সন্তোষবাবুকে চিন্তিত করল। লপং-এর মধ্যে কেমন একটা মনমরা ভাব। বেশ কয়েকদিন না ঘুমিয়ে চোখদুটো বসে গেছে। ও. সি.-কে দেখেই লপংও যেন চমকে উঠল, ভয়-পাওয়া চোখে বলল, 'আমাকেও দরকার আপনার?'

'সুখেনকে তুমি ভালোবাসতে?'

বিব্রত বোধ করল লপং।

'আমার কথার জবাব দাও।' সন্তোষবাবু সহানুভূতির সুরেই বললেন কথাটা।

লপং-এর ঠোঁট কেঁপে উঠল। দু-চোখে জলের ধারা বয়ে চলল। জবাবটা গাঁওবুড়াই দিল।

'সুখেন লপংকে শাদি করবে বলেছিল, হুজুর।'

'এ-খবরটা তুমি দাওনি কেন?' সন্তোষবাবু ধমকালেন গাঁওবুড়াকে।

গাঁওবুড়া মাথা চুলকে বলল, 'এই খবরের সঙ্গে ওর মৃত্যু-রহস্যের কী যোগ আছে, বাবু?'

সন্তোষবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। উনি রিপোর্ট লিখে চললেন।

'সুখেনের সঙ্গে তোমার কতদিন ধরে ঘনিষ্ঠতা চলছিল?' সন্তোষবাবু পুলিশি চোখে তাকালেন।

গাঁওবুড়াই জবাব দিতে যাচ্ছিল, ও. সি. চোখের ইশারায় তাকে থামতে বললেন।

লপং-এর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ও. সি.-র হঠাৎ নজরে পড়ল বন্ধুকে। যে গত একমাস ধরে বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোকে কাতর, এই মুহূর্তে উনি আবিষ্কার করলেন, তার চোখে বাজপাখির ছায়া।

এই কাহিনি যখন ঘটেছিল, তখনও ট্রেনিং দেওয়া কুকুরের মাধ্যমে অপরাধীকে সব্যস্ত করার রেওয়াজ হয়নি।

ও. সি.-র চোখদুটো বারবার ঘুরতে লাগল সুখেনের বন্ধুটির ওপরে।

'এ-বাড়িতে তোমার কতদিন আসা-যাওয়া?' ও. সি.-র প্রশ্ন ঘুরে গেল সুখেনের বন্ধুর দিকে। থতমত খেল যুবকটি, আমতা-আমতা করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল। ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লপং তাড়াতাড়ি বলল, 'সুখেনের ও বন্ধু। সুখেনের সঙ্গেই এ-বাড়িতে আসত।'

ও. সি. তির্যক চোখে তাকালেন লপং-এর দিকে। তারপর ফের প্রশ্ন করলেন সুখেনের বন্ধুকে, 'কতদিন থেকে সুখেনের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য চলছিল, বলো।'

'সুখেনের সঙ্গে?' এবার যেন ওরা দুজনেই চমকে গেল—লপং আর সুখেনের বন্ধুটি।

লপং কী বলতে যাচ্ছিল, ও. সি. হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন। তারপর ফের প্রশ্নটা করলেন রাজেনকে। রাজেনের মুখটা অ্যানিমিক রুগির মতো ফ্যাকাসে দেখাল। ও ভয় পাওয়া চোখদুটো লুকোতে গিয়েও পারল না। ধরা-পড়া গলায় বলল, 'তেমন কিছু না।'

'উত্তরটা ঠিকমতো হল না।' ও. সি.-র কড়া গলা। লপং ভেতরে যাচ্ছিল। ও. সি. কড়া গলায় বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়াও।'

'আপনার জন্যে চা করতে যাই, স্যার।'

'না, না, চায়ের দরকার নেই। তুমি এইখানেই বোসো। তোমার আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি।'

'আচ্ছা, রাজেন!' সন্তোষবাবু তাকান সুখেনের বন্ধুর দিকে : 'পুলিশের চোখে তুমি কিন্তু ধুলো দিতে চেষ্টা কোরো না। যা বলবে সত্যি বলবে।'

রাজেন মাথা নাড়ল।

সন্তোষবাবু বললেন, 'লপং-এর সঙ্গে তুমি কতদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছ?'

'লপং-এর সঙ্গে?' গাঁওবুড়া যেন আকাশ থেকে পড়ল। সুখেনের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে মুহূর্তে চোখাচোখি হল লপং-এর।

রাজেন রাগী চোখে তাকাল। বলল, 'এসব কি আপনার তদন্তের মধ্যে পড়ে?'

'নিশ্চয়ই।' সন্তোষবাবু আড়চোখে তাকালেন লপং-এর দিকে। লপং-এর চোখদুটো মৃত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। রুক্ষ গলায় সন্তোষবাবু বললেন, 'রাজেন, আমি কিন্তু আমার কথার উত্তর পাইনি।'

'যদি না বলি, তাহলে আপনি কী করতে পারেন?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে সন্তোষবাবু রিপোর্ট লেখায় মন দিলেন।

'লপং, তুমি এবারে বলো তো, তোমাকে কেন্দ্র করে সুখেন ও রাজেনের মধ্যে কতদিন থেকে তিক্ত সম্পর্ক চলছিল?'

রাজেন ধূর্ত শেয়ালের মতো তাকাল সন্তোষবাবুর দিকে। বলল, 'কোনওদিনই না। সুখেনের সঙ্গে আমার তিক্ত সম্পর্ক ছিল না।'

সন্তোষবাবু ধমকে বললেন, 'তুমি থামো। প্রশ্নটা আমি লপংকে করেছি।'

লপং-এর চোখদুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল। ঠোঁট কাঁপতে থাকল। ও. সি. একটা সিগারেট ধরিয়ে ফের প্রশ্ন করলেন রাজেনকে, 'ঘটনার দিন রাত্রে তুমিই বন্ধুকে মদ বলে ফলিডল খাইয়েছিলে।'

'তার প্রমাণ?' রাজেনের গলার স্বর খাদে নেমে গেল।

সন্তোষবাবু বললেন, 'সুখেনের স্টমাকে ফলিডল পাওয়া গেছে। ময়না তদন্তে তাই বলছে।'

'কে তাকে ফলিডল খাওয়াল?' রাজেন স্মার্ট হতে চাইল।

ও. সি. গোয়েন্দার ভঙ্গিতে পায়চারি করতে-করতে বললেন, 'নদীর ধারে তুমি যে-ফলিডলের শিশিটা ফেলে রেখে এসেছিলে, তাতে আঙুলের ছাপ রয়েছে।'

ভয়ার্ত চোখে রাজেন তাকাল : 'আমার আঙুলের ছাপ পেলেন কোথায় আপনি? আর ওটা যে আমার আঙুলেরই ছাপ তার প্রমাণ কী?'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ও. সি. এবারে গাঁওবুড়াকে বললেন, 'সুখেন যখন টাকা ধার নেয়, তখন সাক্ষি হিসাবে রাজেনের আঙুলের টিপসই ছিল তোমার খাতায়।'

ও. সি. তাঁর হাতের পোর্টফোলিও থেকে লাল খেরোর খাতাখানা বের করলেন, যেটা তিনি ঘটনার দিনই গাঁওবুড়ার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। উনি পকেট থেকে বের করলেন আর-একখানা ফটো, ফটোটা বোতলের গায়ের আঙুলের ছাপ।

রাজেন তবু গর্জে উঠল, 'শুধু একটা আঙুলের ছাপ দিয়েই আপনি, মশাই, বাহাদুরি দেখাচ্ছেন?'

ও. সি. ঠোঁট ভেঙে হাসলেন, 'তোমার বাকি আঙুলের ফটোগুলোও নেওয়া হবে। তার চেয়েও বড় প্রমাণ লপংকে লেখা, এই দ্যাখো, তোমার সেই চিঠি, যেটা পোস্ট অফিসে মার গিয়েছিল। এই চিঠিই কি তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নয়?'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল হলদে ছোপধরা একটা পুরোনো খামের দিকে।

লপং তখন মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। ও. সি. বললেন, 'ছিঃ লপং, সুখেনকে বিয়ে না হয় না-ই করতে, কিন্তু রাজেনের এতবড় একটা জঘন্য কাজে তুমি কী করে মত দিয়েছিলে ভাবা যায় না!'

রাজেনের গলার স্বর নরম হয়ে এল। বলল, 'আমাদের দুজনকে হাজতের একই ঘরে রাখুন, ,বাবু।'

'বটে! বটে!' ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন ও. সি. ওদের দুজনের দিকে।

গাঁওবুড়া মেয়েকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ক্রাইম
এপ্রিল, ১৯৮১



অন্দরমহল

সমরেশ বসু

অশোক ঠাকুর বসেছিল বাইরের বৈঠকখানা বাড়িতে ওর নিজের ঘরে। বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। রবিবার ছাড়া কোনওদিনই সকালবেলায় আড্ডা জমে না। বন্ধুবান্ধবরা অধিকাংশই চাকুরিজীবী। অথবা অন্য কোনও পেশায় আছে। যারা বেকার, তারাও নানা ফিকিরে থাকে। ফলে, যাকে বলে উইক ডেজ, সেই দিনগুলোতে সকালবেলা ওর ঘর ফাঁকাই থাকে। অবশ্য অষাকান্ত, ফটিক যার ডাকনাম, সে ছিল।

ফটিকেরও আর বেশিদিন সকালবেলার আড্ডায় উপস্থিত থাকা চলবে না। সি. এ. করবার পরে এখন ওর বেকার বসে থাকার কথা না। কিন্তু মনের মতো একটা ফার্ম বা সেরকম ভালো সি. এ. কাম ল-ইয়ার জুটছে না, যার 'আর্টিকল' হিসেবে কাজে যোগ দিতে পারে। অথচ ফটিক আরও একটা বিষয়ে ভালোরকম অনুশীলন করেছে, যা দিয়ে ও জীবিকার কথা ভাবে না। তা হল ক্যারাটে। দেখতে ও তেমন একটা বলশালী না। যাকে বলে শরীরে গোছা-গোছা মাংসপেশি নেই। কিন্তু শক্ত পেটানো লম্বা শরীর।

তুলনায় অশোক ছোটখাটো মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, শৌখিন তরুণ। ক্ষীণজীবী না, স্বাস্থ্য বেশ উজ্জ্বল। চোখে-মুখে একটা গভীরতা আছে। ও একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। ফটিক একটা ইংরেজি পত্রিকার শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে গভীর মনোনিবেশে শব্দের ধাঁধা মেলাবার চেষ্টা করছে।

অশোকের ঘর চুপচাপ থাকলেও ওর বড়দার ঘরে এখনও ধ্রুপদ-ধামারের চর্চা চলেছে চড়া স্বরের ঝংকারে। মেজদার ঘরে জ্যোতিষচর্চার প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে নানান গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে।

কলকাতার উপকণ্ঠে, এই ঠাকুরবাড়িকে এখন লোকেরা পাগলের বাড়ি বলে। তিন ভাইয়ের কেউ বিয়ে করেনি। করবার কোনও লক্ষণও নেই। বড় ছেলে গানের চর্চায় চুল পাকিয়ে ফেলেছে। মেজও জ্যোতিষে চুল পাকাতে বসেছে। কনিষ্ঠতম অশোক মেতে আছে অপরাধতত্ত্ব নিয়ে। বয়েস হল প্রায় ত্রিশ। ইতিমধ্যেই কিছু দুরূহ অপরাধের রহস্য উদ্ধার করে কলকাতার পুলিশের উচ্চমহলে ও যথেষ্ট সুনাম করেছে।

অশোক হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। বড়দা, মেজদার ঘরের গানের চিৎকার, জ্যোতিষের চড়া স্বরে বিতর্কের মধ্যেও, অস্পষ্ট মৃদু আড়ষ্ট খসখস শব্দটা ওর কানে এসেছে। ফটিকের দিকে তাকিয়ে দেখল, ও শব্দের ধাঁধায় নিমগ্ন। বাইরের চওড়া রকের ওপর খসখস শব্দটা কানে আসার মতো না। কিন্তু অশোকের

মন আর দৃষ্টি বইয়ের দিকে থাকলেও ওর শ্রবণেন্দ্রিয় হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। বলল, 'ভদ্রলোক ঠিক করতে পারছেন না, ঠিক জায়গায় এসেছেন কি না।'

ফটিক অবাক চোখে মুখ তুলে তাকাল : 'কার কথা বলছিস?'

'এখনও দেখতে পাচ্ছিনে, পায়ের শব্দটা শুনেছি।' অশোক হেসে বলল, 'বড়দা-মেজদার ঘরের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেছেন। ভাবছেন, কোথায় এসে উঠলাম। কোনদিকে যাবেন ঠিক করতে পারছেন না।'

ফটিক ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে দেখল : 'টের পেলি কী করে, কেউ এসেছে কি না?'

'সুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া পুরোনো জুতোর শব্দ পেয়েছি।' অশোক বলল, 'ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে, তবে বোধহয় শহুরে মানুষ নন। সন্দেহ হচ্ছে, ভদ্রলোক আমার কাছেই এসেছেন। একটু বাইরে গিয়ে দ্যাখ তো।'

ফটিকের চোখে সংশয়। তবু উঠে বাইরে গেল। দেখল, সত্যি এক ভদ্রলোক রকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি। জুতোজোড়া সত্যি পুরোনো। হাতে একটি ছাতা। বয়েস অনুমান ষাটের কাছাকাছি। চোখে-মুখে সংশয় ও বিভ্রান্তি। তাকিয়ে দেখছেন সব ঘরের দিকেই। কিছুই যেন স্থির করতে পারছেন না।

ফটিক এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

ভদ্রলোক ফটিককে দেখে তেমন আমল দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। বললেন, 'খুঁজছি তো অশোক ঠাকুরকে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ভুল বাড়িতে এসে পড়েছি। লোকে যে কীসব আজেবাজে বাড়ি দেখিয়ে দেয়। এখানে তো শুনছি গান-বাজনা আর কীসব চিৎকার-চেঁচামেচি।' কথাগুলো বলে ভদ্রলোক ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

ফটিক মনে-মনে হেসে বলল, 'আজেবাজে বাড়ি দেখিয়ে দেয়নি, এটাই অশোক ঠাকুরের বাড়ি।'

'অ্যাঁ?' ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন : 'সত্যি? তা উনি কি গানবাজনা করেন নাকি?'

ফটিক বলল, 'না। উনি বই পড়ছেন। গান করছেন ওঁর বড়দা। আর মেজদা জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করছেন।'

'তাই বলুন।' ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন : 'আমি ভাবলাম, কোথায় এসে উঠলাম! তা অশোকবাবু কি বাড়ির ভেতরে আছেন?'

ফটিক বলল, 'উনি ওই ঘরে বসে বই পড়ছেন। আসুন।'

'আপনি?' ভদ্রলোকের মনে তখনও সংশয়।

ফটিক বলল, 'আমি অশোকবাবুর বন্ধু।'

'আশ্চর্য, আর আমি মন্দিরের পাশে ওই ঘরটাকে ভাবছিলাম খালি ঘর।' ভদ্রলোক কোঁচা তুলে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মুছলেন। ফটিকের পিছনে-পিছনে এগিয়ে গেলেন।

ফটিক বলল না, অশোক আগেই ভদ্রলোকের আসাটা টের পেয়েছে। ভদ্রলোক অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাদুরের ওপর শতরঞ্চি পাতা। গোটাকয়েক তাকিয়া এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। আর কয়েকটা ছাইদানি। কিছু বইপত্র, ম্যাগাজিন এলোমেলা এখানে-সেখানে। অশোক তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বই পড়ছিল। সোজা হয়ে বসে, কপালে দু-হাত ছুঁইয়ে ডাকল, 'আসুন।'

ভদ্রলোক জুতোজোড়া বাইরে খুলে ছাতা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

অশোক বলল, 'বসুন। আমার নাম অশোক ঠাকুর।'

'আশ্চর্য, আপনার বয়েস এত কম ভাবতে পারিনি।' ভদ্রলোক বিস্ময়ে নমস্কার করতেই ভুলে গেলেন। অশোককে দেখতে-দেখতে ছাতা পাশে রেখে বসলেন।

অশোক হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে, অনেক দূর থেকে আসছেন।'

'তা আসছি।' ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'প্রথম ট্রেন ধরে এসেছি।'

অশোক বলল, 'বুঝেছি। পাড়াগাঁর রাস্তা, বেশ খানিকটা হেঁটে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরতে হয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?' ভদ্রলোক আরও অবাক হলেন।

অশোক বলল, 'আপনার জুতো-ছাতা-জামাকাপড় সব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তা কোথা থেকে আসছেন? মনে হচ্ছে, রাস্তায় বৃষ্টিও হয়েছে। কাদা মাড়াতে হয়েছে।'

ভদ্রলোক নিজের জামাকাপড় দেখলেন। ছাতাটা দেখলেন। বাইরে রাখা জুতোজোড়ার দিকে লক্ষ করলেন। অবাক হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আসছি পাটুলি থেকে। হুগলির পাটুলি নয়, বর্ধমানের পাটুলি। আমার নাম ব্রজনাথ রায়। আসলে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। নবাবি আমলে পাওয়া রায় উপাধি। আদি বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ, একশো বছর আগে। তারপরে পাটুলি। লোকে আমাদের এখনও জমিদার বলে। তবে তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। তিন শরিকে ভাগাভাগি, জমিজমা যা আছে, কোনওরকমে চলে যায়। তবে ছেলেরা চাকরি-ব্যবসাও করে। আমার দুই দাদা মারা গেছেন। রায়বাড়িতে বড় বলতে এখন আমিই আছি। বড় শরিক বলতে আমার ভাইপো নীতীশ রায় ছিল—।'

'তিন সপ্তাহ আগে খুন হয়েছে।' অশোক বইটা একপাশে রাখল 'কিন্তু গ্রামের নাম পাটুলি, না পাটলি?'

ব্রজনাথ থমকে গেলেন এক মুহূর্ত। অশোকের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, খবরের কাগজে নীতীশের খুনের ঘটনা পড়েছেন। হ্যাঁ, পাটলিই আসল নাম, তবে আমাদের মুখে পাটুলি। স্টেশনে পাটলি বলেই লেখা আছে। গ্রামটা কিন্তু স্টেশন থেকে বেশ দূরে, গঙ্গার ধারের কাছাকাছি। নীতীশের খুনের জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

'নীতীশবাবু তো রাজনীতি করতেন। তাঁর দলের লোকেরা বলেছে, এটা পলিটিকাল মার্ডার।' অশোক বলল, 'খবরের কাগজে তাই বলেছে। কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি।'

ব্রজনাথবাবু বললেন, 'সবই জানেন দেখছি। কিন্তু আমি তো বাবা—আপনাকে আর কী বলব, ছেলেমানুষ, বাবা-ই বলি, আমি বড় বিপদে পড়েছি। বিপদ না বলে, জঘন্য অপবাদ আমার নামে দেওয়া হচ্ছে...আমি নাকি নীতীশকে লোক লাগিয়ে খুন করেছি। পুলিশের মতিগতিও সুবিধের নয়। তারাও সেইরকমই সন্দেহ করছে। আমাকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। আর বুঝুন, থানা কি এখানে? সেই পূর্বস্থলীতে।'

'কারা বলছে আপনি খুন করিয়েছেন, আর কেনই বা বলছে?' অশোকের দৃষ্টি ব্রজনাথের চোখের দিকে।

ব্রজনাথ বললেন, 'কারা আবার? নীতীশের ভাই-বোন কেউ নেই। বিয়ে করেনি। আমাদের আর-এক শরিক কথাটা রটাচ্ছে, তার সঙ্গে গাঁয়ের মাতব্বররাও আছে। নীতীশকে খুন করিয়ে, আমি নাকি ওর যাবতীয় জমিজমা, সম্পত্তির মালিক হতে চাই। যেন হাতের মোয়া। আসলে, নীতীশের সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল। বাক্যালাপ ছিল না। এখন এই অপবাদের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান।'

'নীতীশবাবুর সঙ্গে আপনার ঝগড়া কী নিয়ে? বাক্যালাপই বা ছিল না কেন?'

'সে বাবা অনেক ব্যাপার।' ব্রজনাথ বললেন, 'প্রথম কথা, তার রাজনীতি করা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না। জমিজমা, ধান-চাল নিয়ে তার পার্টিবাজি আর দান-ধ্যান আমার সহ্য হত না। এমনকী, নীতীশ আমার জমির ধান পর্যন্ত নিজের দলের লোকদের দিয়ে কাটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমি তো রাজনীতি করিনে, আমার জমিতে তোর হাত দেওয়ার কারণ কী? তা ছাড়া বন্দুক!'

'বন্দুক?' অশোক ভুরু কুঁচকে তাকাল।

ব্রজনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, বন্দুক একটা আছে। সেটা নীতীশের কাছেই থাকত। আমি জানতাম, ও বাজে লোকদের মাঝে-মাঝে বন্দুকটা ভাড়া দিত, কেউ জানতে পারত না। তা নিয়েও ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল। বন্দুকটা যাদের ভাড়া দিত, তারা কেউ ভালো লোক ছিল না। নেহাত ডাকাতি করার জন্যেই বন্দুক ভাড়া দেওয়া হত।'

'তার মানে, নীতীশবাবু রাজনীতি করতেন, অথচ বন্দুক ভাড়া দিতেন ডাকাতদের?'

'তাই বলতে হবে। রাজনীতি যারা করে, তারা কি ডাকাতি করে না?'

'কিন্তু দলের লোককে ভাড়া দেবেন কেন? তাদের তো এমনিতেই দিতে পারতেন।'

'তা পারত, কিন্তু দিত না। আমি জানি, ও টাকা নিয়ে বন্দুক ভাড়া দিত। এটা আমি পুলিশকে জানাব বলে ওকে ভয় দেখাতাম। সত্যি কি আর জানাতাম? ব্যাপারটা তো খারাপ। তা ছাড়া ওর যা সম্পত্তি, জমিজমা, সেসব নিয়ে ও একলা ভোগ করবে কেন? আমাদের দেবে না কেন? চোখের সামনে দেখছিস, আমরা কষ্টে আছি, অথচ তুই কতগুলো উড়নচণ্ডে বদমাইশকে ধান, টাকা দিয়ে পুষছিস। লোকেরা সবাই জানত, ওসব নিয়ে ওর সঙ্গে আমার মন-কষাকষি ছিল। তা বলে ওকে আমি খুন করাব কেন? আমার লাভটা কী?'

'লাভ, নীতীশবাবুর জমি-সম্পত্তি।' অশোক হাসল : 'নীতীশবাবু বাপের এক ছেলে। বিয়ে করেননি। উইল-টুইলও কিছু করেননি বোধহয়?'

'না—করলে এতদিনে জানা যেত।'

'তাহলে নীতীশের সম্পত্তির ওয়ারিশ তো আপনারাই। আপনাদের দুই শরিকের ওয়ারিশন, তাই না?' অশোক ঘাড় কাত করে তাকাল।

ব্রজনাথ বললেন, 'ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে। আর সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। প্রমাণপত্র কিছু নেই, অথচ আমার নামে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, নীতীশকে আমিই খুন করিয়েছি। মতলবের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমরা দুই শরিক মিলে ওকে খুন করতে পারি। অন্য শরিকের কথা জানিনে। আপনাকে বলতে এসেছি, আমি খুন করাইনি। বরং নীতীশকে মনে-মনে ভালোবাসতাম। শত হলেও, ওর বাবার পরে, আমিই তো অভিভাবক। আমি ওর ছোটকাকা। দাদাদের আর কেউ বেঁচে নেই। ওকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছি—আর কেউ নয়, আমিই চেষ্টা করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমার ওপর রাগ-ঝাল থাকলেও নীতীশ বুঝত, ছোটকাকা ওর ভালোই চায়। এমনকী, আমার বড় মেয়েকে বলেওছিল, আমার সম্বন্ধ করা মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে ওর আছে।'

'শুনুন ব্রজনাথবাবু, আপনি যা বলছেন, তাতে আপনার ওপর সন্দেহ ঘোচে না।' অশোক গম্ভীর স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আপনাকে যুক্তির ঊর্ধ্বে বিশ্বাস করা ছাড়া, আর কিছুতেই আপনার বা অন্য শরিকের মতলবকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। হয়তো প্রমাণ করা যাবে না, সেটা আলাদা কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্য শরিককে বাদ দিয়ে, আপনাকেই কেন এ-অপবাদ দেওয়া হচ্ছে?'

ব্রজনাথ অসহায়ভাবে দু-হাত তুলে বললেন, 'সেটারই কোনও কারণ আমি বুঝতে পারছি না। এটা অন্য শরিকের চাল হতে পারে। পুলিশ তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, এসব ফালতু। পুলিশ কোথাও কিছু করতে না পেরে এখন আমাদের নিয়ে পড়েছে। আমি কাটোয়ায় গেছলাম আমার এক উকিল-বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। কেননা, এ তো সাপ নিয়ে খেলা হচ্ছে। পুলিশ আসল খুনিকে ধরতে না পেরে, এখন হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই নিয়ে টানাটানি করছে। আমার উকিল-বন্ধুর পরামর্শে আপনার কাছে এসেছি।'

'কী বলেছেন আপনার উকিল-বন্ধু?' অশোকের চোখে ভ্রুকুটি সন্দেহ।

ব্রজনাথ বললেন, 'উকিল-বন্ধুর পরামর্শ হল, পুলিশ যাই বলুক, আমাকে খুনি হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু এ-অপবাদ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে খুনিকে ধরাবার জন্যে আমারই কিছু করা উচিত। তাই সে আপনার কাছে আমাকে আসতে বলল।'

বলতে-বলতে ব্রজনাথ হঠাৎ হাতজোড় করে ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'আমি জানি, আপনিও হয়তো আমাকে সন্দেহ করছেন। তবু আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। দেখুন বাবা, এতকাল মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি, লোকের মুখে মন্দ অপবাদ কখনও শুনিনি। বংশের গৌরব বলে একটা কথা আছে। জমি-বাড়ি বেচে হোক বা যেভাবেই হোক, আপনার টাকা আমি জোগাব—আপনি বাবা এ-খুনের একটা কিনারা করুন। শুনেছি, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আপনি সেইরকম। আপনি এই খুনের তদন্তের ভার নিন। আমাকেই

যদি খুনি হিসেবে প্রমাণ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই, ফাঁসি যাব। তবু আসল রহস্য ফাঁস হোক। ভাইপো খুনের দায়ের এ-অপবাদ থেকে হয় আমাকে রেহাই দিন, না হয় শাস্তি দিন।'

অশোক ব্রজনাথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিক তাকিয়েছিল ওর দিকেই। ফটিক অবাক হয়েছে, অথচ ওর চোখেও সন্দেহ। অশোক খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। গম্ভীর মুখ, চোখে অন্যমনস্কতা। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। অন্য ঘরে গান আর জ্যোতিষচর্চায় ভাটা পড়েছে।

অশোক মুখ ফিরিয়ে ব্রজনাথের দিকে তাকাল। এখন ওর চোখে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা, কিন্তু ভ্রূকুটি সন্দেহের ছায়া নেই। জিগ্যেস করল, 'নীতীশবাবুকে তো কুপিয়ে মারা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, গলায় ধারালো দা বা কুড়ুল, এরকম কিছু দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে।' ব্রজনাথ বললেন, 'বাড়ির সামনের অংশে, বাগানে বসেছিল। প্রায়ই চেয়ার পেতে সন্ধেবেলা ওখানে বসত। ওর বন্ধুরাও আসত সেই সময়ে। রাত্রি অবধি আড্ডা হত। নীতীশ তো আবার গ্রামের ইস্কুলে পড়াত। লেখাপড়ায় তো খারাপ ছিল না! বর্ধমান ইউনিভারসিটি থেকে এম. এ. পাশ করেছিল।'

'ঘটনা কখন ঘটে?'

'ওই সন্ধেবেলাতেই। সেদিকে আমরা এমনিতেই যাইনে। ওর বাবার আমলের চাকর, বুড়ো পীতু কয়েকটা চেয়ার এনে দিত। আর একটা টেবিল আর হ্যারিকেন। বন্ধুরা আসতে-আসতে সন্ধে উতরে যেত। আড্ডা চলত অনেকক্ষণ। শুনেছি—।' ব্রজনাথ থেমে গেলেন।

অশোক কোনও কথা বলল না, ব্রজনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্রজনাথ একটু গলাখাঁকারি দিলেন : 'কোনওদিন চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি রাত্রে নাকি ওরা মদ খেত। কিন্তু খুনের দিন মদের বোতল-টোতল কিছুই ছিল না। বন্ধুরা আসবার আগেই যা ঘটবার ঘটে গেছল।'

অশোক বলল, 'তার মানে খুনি ওত পেতেছিল, তাই না? বাগানে চেয়ার নিয়ে নীতীশ বসবার পরেই, ওর বন্ধুরা আসবার আগে, খুনি তার কাজ করেছিল।'

'ঠিক তাই।' ব্রজনাথ বললেন, 'কারণ, বন্ধুরা আসার আগে, পীতু হ্যারিকেন নিয়ে এসে নীতীশকে গলা কাটা অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করেছিল।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'গলা কাটা মানে কী? একেবারে বলি নাকি?'

'না-না, ধড়-মুন্ডু আলাদা হয়নি। চোয়ালের নীচে, গলার ধার দিয়ে কোপ মেরেছিল।'

ব্রজনাথের মুখে যন্ত্রণার ছাপ, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল : 'মাথার পেছনদিকেও একটা কোপ লেগেছিল। কিন্তু গলার কোপেই মারা যায়। নীতীশ চেয়ারেই বসেছিল, উঠতেও পারেনি, পড়েও যায়নি।'

'হুঁ, পীতুই তাহলে প্রথম দেখেছিল। পুলিশ কখন আসে?'

'পুলিশ খবর পেয়ে আসতে-আসতে পরের দিন ভোরবেলা।'

'নীতীশ তখনও সেইভাবেই পড়ে ছিল?'

'হ্যাঁ, কেউ ছোঁয়নি। তবে সারা রাত লোকজন ভিড় করেছিল।'

'যারা সন্ধেবেলায় আসত, তারা এসেছিল?'

'হ্যাঁ, সকলেই এসেছিল। তারাই থানায় গিয়ে খবর দেয়। তাদের ধারণা, নীতীশকে ওদের বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকেরা মেরেছে। তা নিয়ে পোস্টারও পড়েছে।'

'পুলিশ কী বলছে?'

'তারা তদন্ত করেই চলেছে।' ব্রজনাথ অসহায়ভাবে হাত তুলে বললেন, 'কিন্তু কোনও কূলকিনারা আর করতে পারছে না। কাউকে অ্যারেস্টও করেনি। নীতীশের অ্যান্টিপার্টির লোকদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, থানায় ডেকে নিয়ে গেছে। কয়েকজনকে কয়েকদিন আটকেও রেখেছে। কিন্তু কেস দিতে পারেনি। এখন আমাদের নিয়ে পড়েছে। কী বিপদ বলুন তো! বিশেষ করে আমাকেই তাদের সন্দেহ বেশি, কারণ, নীতীশের সঙ্গে আমার মন-কষাকষি ছিল, বাক্যালাপ ছিল না। আর ও মরলে আমার লাভ। কী বলব, বলুন।'

অশোক আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'আপনার কাকে সন্দেহ হয়?'

'আমার?' ব্রজনাথ একটুও না ভেবে বললেন, 'আমি নীতীশের দলের লোকদেরও বিশ্বাস করি না। তাদের মধ্যে কার মনে কী ছিল, কে বলতে পারে? বিশেষ করে ও যাদের বন্দুক ভাড়া দিত, তাদের সঙ্গে কোনওরকম বিবাদ হতে পারে। আবার ওর অ্যান্টিপার্টির লোকেরাও মারতে পারে। তার একটা কারণ আছে। বেলেরহাটের একজনকে তার কিছুদিন আগে গুলি করে মারা হয়েছিল। সে ছিল নীতীশদের অ্যান্টিপার্টির লোক। এটা তার বদলা হতে পারে।'

'সেই গুলি করে খুন করার ব্যাপারে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'করেছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছে, কেসও হয়েছে।'

'তাদের কাছে কি বন্দুক পাওয়া গেছল?'

'শুনেছি কোনও বন্দুক পাওয়া যায়নি। তবে তাদের বাড়ি তল্লাশি করে একটা পাইপগান আর কয়েকটা বোমা পাওয়া গেছল।'

'বেলেরহাটের লোকটিকে কি পাইপগান দিয়ে গুলি করা হয়েছিল?'

'তা তো বলতে পারিনে, বাবা।' ব্রজনাথ মাথা নাড়ালেন 'শুনেছি, তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। আর কয়েকজন সাক্ষিও দিয়েছে।'

'নীতীশের খুনের কোনও সাক্ষী পাওয়া যায়নি?'

'না। সাক্ষীর মধ্যে একমাত্র পীতু, যে ওই অবস্থায় নীতীশকে দেখেছিল।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিক বলল, 'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশের ভূমিকাটা কী? খুনিকে কভার করছে?'

'কভার করলেও, তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা কেস দাঁড় করাতে অসুবিধেটা কী?' অশোক ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে না পারার কোনও কারণ তো দেখিনে? ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিই বা চুপ করে আছে কেন?'

ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি বললেন, 'না বাবা, তা বলা চলবে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেন। শুনছি, ওপর থেকে পুলিশকে চাপও দেওয়া হচ্ছে। সেই চাপ এখন আমার ওপর। বোঝো ঠ্যালা!'

'নীতীশবাবুর বন্দুক কোথায়?'

'এখন থানায় নিয়ে গেছে।'

অশোক বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে জিগ্যেস করল, 'আপনার ভাইপোর চরিত্র কেমন ছিল? মানে—।'

'মেয়েমানুষের ব্যাপার?' ব্রজনাথ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'কোনও দোষ ছিল না। এমনকী, ওর শত্রুও বলতে পারবে না, নীতীশের চরিত্রের ওসব দোষ ছিল। মদ খাওয়ার কথা শুনেছি, দেখিনি। ও বাবা, সে-কথা যদি বলেন মাঝে-মধ্যে আমিও তো একটু-আধটু খেয়ে থাকি।'

অশোক হেসে উঠল : 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মিছে কথা কেন বলব, বাবা?' ব্রজনাথ সরলভাবেই বললেন, 'ঝাঁপানের সময়, অথবা দোল-দুর্গোৎসবে, কালীপুজোয় খাই বইকী। সবাই জানে, এ আর অস্বীকার করার কী আছে!'

'হুঁ, থানা বললেন পূর্বস্থলী?'

'হ্যাঁ।'

'সদর থেকে অনেক দূর। আপনাদের গ্রাম থেকেও থানা বেশ দূরেই, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা হবে মাইল-দশেক।'

'তা এখন আপনি কী চান?'

'বললাম তো বাবা, আপনি কী টাকা চান বলুন, আমি দেব। এ-খুনের একটা কিনারা করুন। আমার উকিল-বন্ধু বলেছে, আপনি বাবা হাত দিলে এর রহস্য ফাঁস হবেই। আমাকে অপবাদের হাত থেকে বাঁচান। আসল খুনিকে ধরিয়ে দিন। আমি আজ কিছু টাকা নিয়ে এসেছি।' ব্রজনাথ পাঞ্জাবি তুলে কোমরের কষিতে হাত দিলেন।

অশোক বলল, 'এখন টাকা রাখুন। আপনি আজ বাড়ি যান। আজ হল মঙ্গলবার, হাতে পাঁজি করেই এসেছেন। আগামী শুক্রবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কোথায়?' ব্রজনাথ অবাক চোখে তাকালেন।

'আপনার গ্রামে, আপনার বাড়িতে।'

'বলছেন বাবা?' ব্রজনাথ হাতজোড় করলেন : 'আমার পরম ভাগ্য।'

'কিন্তু গ্রামে গিয়ে কাউকেই কিছু বলবেন না। এমনকী, আপনার বাড়ির লোক বা শরিকদের কাউকে কিছু বলবেন না। আমরা দুই বন্ধু যাব, আপনার আত্মীয় সেজে। কেবল আপনার গিন্নিকে বলবেন। তা নইলে অসুবিধে হবে। আপনার ছেলেমেয়েরা—।'

'কেউ নেই, বাবা। বড় ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। শনিবার রাত্রে যায়, সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আসে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ছেলে ক্লাস টেনে পড়ে। আমি বউকে শিখিয়ে রাখব, আপনাদের বাবা-বাছা করে ঘরে তুলে নেব।'

অশোক হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আপনি এখন আসুন।'

ব্রজনাথ তবু একটু দ্বিধা করলেন : 'কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম—।'

'থাক, পরে হবে। একটা কথা বলে যান। নীতীশবাবুকে যে-অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছিল, সেটা কি পাওয়া গেছে?'

'না। সেইজন্যেই তো বোঝা যাচ্ছে না, দা দিয়ে না কুড়ুল দিয়ে মেরেছে।'

'ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি?'

'আমরা কিছু পাইনি। পুলিশ আমাদের কিছুই বলেনি, বলতেও চায় না। গ্রামের পুলিশ যে কী চিজ, তা বাবা আপনাদের শহরের লোককে বোঝাতে পারব না।'

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্রজনাথও ছাতা হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

শুক্রবার ঘোর দুপুরে অশোক ফটিককে নিয়ে পাটলিতে এল সাইকেল রিকশায়। আসবার পথে ও বর্ধমানের ডি. এম.-এর সঙ্গে দেখা করেছিল। যুবক জেলাশাসকটি মানুষ ভালো। অশোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি। পরশু রাত্রে তাঁর বাংলোতে খাইয়েছেন। পূর্বস্থলী থানার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। সাহায্য করার নির্দেশও পাঠিয়েছেন।

অশোক থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। অফিসার ইনচার্জের বক্তব্য শুনেছে। তাঁর বক্তব্য, এই বিরাট অঞ্চলের থানার মোটামুটি সব অপরাধীকে তিনি চেনেন। রাজনৈতিক দলাদলির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন। কিন্তু তিনি সত্যি লজ্জিত আর মর্মাহত, নীতীশের খুনিকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। নীতীশের শত্রু ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম হাই হার্টেড মার্ডারার শত্রু তার কেউ ছিল বলে এখনও জানা যায়নি। বরং, বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকেরাও নীতীশকে সেরকম শত্রু মনে করত না। কারণ, নীতীশ খুন-খারাপি করবার মতো রাজনীতি করত না। তার বন্দুক ভাড়া দেওয়ার কথা অবশ্য থানা কোনওদিন শোনেনি। শুনলে অনেক আগেই বন্দুক সিজ করে নিত। অনেক ভেবে, চিন্তা করেই, এখন সন্দেহটা নীতীশের সম্পত্তির দাবিদারদের ওপর এসে পড়ছে।

অশোক অফিসার ইনচার্জকে জানিয়ে এসেছে, ওর পাটলিতে যাওয়ার ঘটনা যেন গোপন থাকে। লোক পাঠিয়ে খবর দিলেই যেন উনি সদলবলে হাজির হন।

অশোক রিকশাওয়ালার সঙ্গে গোটা পথ কথা বলতে-বলতে এসেছে। রিকশাওয়ালাটি রুগ্ন। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে। বয়েস অবিশ্যি চল্লিশের কম না। রুগ্ন বলতে, নেশা-ভাং করে শরীরটি জখম করেছে। লেখাপড়া শেখেনি। জমিজমা নেই। রিকশা টেনেই যা আয় হয়। নীতীশের খুনের ব্যাপারে তার স্পষ্ট জবাব, 'ওসব হল বাবু, নিজেদের দলের ব্যাপার। ছোট মুখে বড় কথা কী বলব, বলুন। পুলিশ জানে না, এ কখনও হয়? চেনাশোনা লোক ছাড়া নীতীশদাকে কেউ মারতে পারে না। বাইরের লোক এসে মেরে যায়নি। এই তো, বছরখানেক আগে এক খুনি আসামি থানার হাজত থেকে পালাল। আজ অবধি পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। অথচ, লোকের কাছে শুনুন, সে নাকি আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

রিকশা রায়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বিরাট দোতলা বাড়ি। কালের থাবায় জীর্ণ। ভাঙনের নানা চিহ্ন স্থানে-স্থানে। শ্যাওলার রং হয়েছে যেন ভুতুড়ে বাড়ির মতো। সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। কাছেপিঠে লোকজন কেউ নেই। একেবারে নিঝুম। তার মধ্যেই হঠাৎ একটি মেয়ে-গলার খিলখিল হাসি শোনা গেল। সেটাও একরকম ভুতুড়ে। গায়ে কাঁটা দেয়। আর হাসতে-হাসতেই একটি আঠারো-কুড়ি বছরের যুবতীকে বাড়ির দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তার পিছনে আর-একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক তাড়া করে আসছিল। অশোকদের দেখে দুজনেই থমকে গেল।

মেয়েটির পরনে ময়লা শাড়ি আর জামা। শরীর ভরা উদ্ধত যৌবন। মুখশ্রী খারাপ নয়, বড়-বড় চোখে একটা চটক আছে। মাথার চুল ঝাঁকড়া, আর ঘাড় অবধি ছাঁটা। চোখের দৃষ্টি বুনো, আর লাল। রিকশাওয়ালা বলল, 'বোবা। মাথায় ছিটও আছে। নীতীশদার চাকর পীতু গয়েনের নাতনি।'

মেয়েটা তার বুনো অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে অশোকদের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক রিকশার ভাড়া মেটাতে-মেটাতে বলল, 'ব্রজনাথবাবুর দরজাটা কোন দিকে হবে?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'সামনের অংশটা নীতীশদার। ডানদিকে যে-বাগান দেখছেন, ওখানেই খুন হয়েছিলেন। আপনারা বাড়ির বাঁ-দিকে গিয়ে বেড়ার সীমানা দেখতে পাবেন। ওটাই ছোট কাকার অংশ।'

অশোক আর ফটিক কয়েক পা এগোতেই বোবা মেয়েটা বাড়ির সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে দুজনকে বারে-বারে দেখতে লাগল, আর শাড়ির আঁচলটাকে দাঁত দিয়ে চিবোতে লাগল।

অশোক আর ফটিক বাঁ-দিকে গেল। বেশ খানিকটা জমি ঘিরে কঞ্চির বেড়া। ভিতরে নানারকম ফুলগাছ লাগানো হয়েছে। তৈরি বাগান, গোলাপ গাছে গোলাপও ফুটেছে।

ব্রজনাথ বেরিয়ে এলেন। খালি গা, পরনে ধুতি। হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসো বাবা, এসো। অনেককাল বাদে, চিনতেই পারা যায় না।'

অশোকের ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হল। মনে হল, বাড়িটার নানা দরজা-জানলায় অনেক চোখ। ও ঝপ করে ব্রজনাথকে প্রণাম করে বলল, 'কাটোয়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম, সেই কবে আপনাকে কলকাতায় দেখেছি, একবার ঘুরে যাই।'

'বেশ করেছ বাবা, খুব ভালো করেছ।' ব্রজনাথ অশোকের হাত ধরে বললেন, 'এভাবে না এলে কি আত্মীয়তা থাকে? চলো, ভেতরে চলো। বাড়ির খবর সব ভালো?'

অশোক ব্রজনাথের সঙ্গে চলতে-চলতে বলল, 'ওই একরকম। আপনাদের খবর সব ভালো?'

'না, বাবা। আমরা বড় অশান্তিতে আছি। এসো, সব বলব।' ব্রজনাথ অশোক আর ফটিককে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। দোতলায় উঠে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ব্রজনাথের মধ্যবয়েসি স্ত্রী এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন, 'বসুন। এখানে কেউ কোনও কথা শুনতে পাবে না। ছেলেকে বলব, আপনি আমার দূরসম্পর্কের বোনের ছেলে। বড় ছেলে কাল রাত্রে ফিরলে তাকেও তাই বলা হবে। এখন একটু জিরোন।'

'তা জিরোব, তবে বোনের ছেলেকে বা তার বন্ধুকে ''আপনি'' বলবেন না।' অশোক হেসে বলল।

ব্রজনাথের প্রৌঢ়া স্ত্রী ঘোমটা টেনে হেসে জিভ কাটলেন : 'তাও তো বটে। তাহলে বাবা, দুজনের নাম ধরেই ডাকব।'

সকালবেলার মধ্যেই মোটামুটি জানাজানি হয়ে গেল, অশোক আর ফটিক কে। একদিন-দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। অশোক ব্রজনাথের দূরসম্পর্কের শালির ছেলে। ফটিক তার বন্ধু। ব্রজনাথের ছোট ছেলে বরুণ ক্লাস টেনে পড়ে। সে প্রথমে খুবই অবাক হয়েছিল। জীবনে সে মাসতুতো ভাইয়ের কথা শোনেনি—তাকে একেবারে সশরীরে দেখে অবাক হওয়ারই কথা। অশোক তা বুঝতে পেরে নিজেই বরুণকে আপন করে নিয়েছে। অল্পবয়সের একটা ধর্ম, নতুনের এবং স্নেহ-ভালোবাসার কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করে। অশোক বরুণের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে রাত্রেই। সকালবেলাই বরুণকে নিয়ে, ফটিককে সঙ্গে করে গ্রামে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রায়বাড়ি ছাড়াও একাধিক পুরোনো পাকা বাড়ি, আর কিছু মন্দির আছে গ্রামে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-তিলি-গোপ-ছুতার-বাগদি-বাউরি নানা জাতির বাস। মুসলমানও কম নেই। গঙ্গার ধারে জেলেপাড়া, কাছেই একটা ছোট বাজার। গ্রামের মধ্যে দোকানপাটও কিছু আছে। এমনকী তেলেভাজা, চায়ের দোকানও। এসব ছেড়ে দিলে, পাটলি বর্ধিষ্ণু হয়েও গণ্ডগ্রাম।

অশোক গ্রামের চারদিকে ঘুরে বেড়াল। তেলেভাজার দোকানে তেলেভাজা খেল। সকলের সঙ্গে বসে চায়ের দোকানে চা খেল। চোখ আর কান সজাগ রাখল। দোকান, মন্দির, পুরোনো পাকা বাড়ির দেওয়ালে আর গাছের গায়ে পোস্টার দেখল, 'নীতীশ রায়ের হত্যাকারীর শাস্তি চাই।'...'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করুন।'—ইত্যাদি-ইত্যাদি।

বরুণের দৌলতে নীতীশের দলের একজনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। বরুণের মাসতুতো দাদা হিসাবে কিছু কথাবার্তার মধ্যে নীতীশের খুনের কথা উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বিরোধী দলের লোকরাই নীতীশকে খুন করেছে।

বরুণের সঙ্গে নীতীশের বিরোধী দলের লোকদের সঙ্গেও পরিচয় আছে। গ্রাম সম্পর্কে সকলেই দাদা। বাজারের কাছে একটা খড়ের চাল মাটির দেওয়াল ঘরে তাদের অফিসও রয়েছে। তাদের দু-চারজনের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। তারা নীতীশকে 'নীতীশদা' বলে। খুনের কথা উঠতেই তাদের সাফ জবাব, নীতীশদা অনেককে টাকাপয়সা ধার দিত। বন্ধকি কারবার ছিল। বন্দুক ভাড়া দিত। তাদেরই কেউ নীতীশদাকে খুন করেছে।

বরুণকে বাদ দিয়ে গ্রাম বেড়াতে-বেড়াতে দু-চারজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ব্রজনাথের আত্মীয় শুনেই তাদের ঠোঁটে কুলুপ। একজনই মাত্র মুখ খুলেছিলেন 'দলাদলি বাজে কথা। শরিকরাই সম্পত্তির লোভে ছেলেটাকে খুন করেছে।'

অশোক দেখল, এভাবে বালির স্তূপে সোনার দানা খোঁজা অসম্ভব। দুপুরে খাওয়ার পরে, ফটিককে বলল, 'আমি একবার নীতীশের খুনের জায়গাটা দেখতে যাব। তুই কাছেপিঠে থাকিস।'

বেলা আড়াইটার সময়, গ্রাম একেবারে নিঝুম। দুপুরটা যেন সত্যি ভূতে ঢ্যালা মারার মতো খাঁ-খাঁ করছে। অশোক নিতান্ত ঘুরতে-ঘুরতে নীতীশের সীমানার দিকে চলে গেল। সামনের বড় অংশটাই নীতীশের, বাইরে বাঁ-দিকে বাগান। বরুণ আগেই দেখিয়ে দিয়েছিল, বাগানের কোন জায়গায় নীতীশ খুন হয়েছিল।

সামনে বড় জোড়া থামওয়ালা বারান্দার মাঝখানে ভিতরে ঢোকবার দরজা। কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভিতরে নিশ্চয় পীতু আর তার পরিবার আছে। অশোক শুনেছে, পীতু, পীতুর ছেলে-বউ আর তাদের বোবা নাতনি ফুড়কি আছে। পীতুর ছেলের বয়েস পঞ্চাশের ওপর। নাম হীরালাল। তার বউ খাঁদনই বলতে গেলে নীতীশের সংসার দ্যাখে। পীতু বাকি সব দেখাশোনা করে। পীতু জাতিতে ছুতার। তার জল চলে না। সেইজন্য খাঁদন নীতীশের রান্না করত। বোবা ফুড়কি কোনও কাজের না। একে বোবা, তায় নাকি মাথাটাও খারাপ আছে। পাগলের মতো হাসে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বাপ-মা-দাদুর কথা শোনে না। হীরালালের ছেলেও আছে। সে এখানে থাকে না। হীরালাল প্রধানত নীতীশের চাষবাস দেখাশোনা করে। জনমজুর জোগাড় করা, কাজ করানো, মজুর দেওয়া তারই কাজ। পীতু নীতীশের খাস চাকর। বলতে গেলে, এখন সে

কিছুই করে না। নীতীশের শোয়া-বসা, হাতের কাছে জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়া, এইসব সামান্য কাজ ছিল তার। বুড়ো বড় মদ খায়। নীতীশও তা জানত। কিন্তু কিছু বলত না।

অশোক বাড়ির সামনে একবার দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। সামনের দিকে কিছুটা অন্ধকার মতো। ঢোকবার মুখে দু-পাশে ঘর, মাঝখানটা অন্ধকার। ভিতরের উঠোনের অংশবিশেষ দেখা যায়। ফাঁকা উঠোনটা রোদে পুড়ছে। পায়রারা বকবকম করছে। কিন্তু কোথা থেকে একটা কান্নার চাপা স্বর ভেসে আসছে। কোনও মেয়ের স্বর। অথবা দূরের কোনও গাছে গৃধিনী ডাকছে? অশোক এরকম গৃধিনীর ডাক শুনেছে। শুনলে মনে হয়, কোনও মেয়ে সরু গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।

অশোক বাড়িটার সামনের দিক ছাড়িয়ে বাঁ-দিকে বাগানে গেল। বড়-বড় আম-জাম-কাঁঠাল গাছ। ছায়ানিবিড়, ঠান্ডা। পাখি ডাকছে। একটা জায়গা দেখলেই বোঝা যায়, সেখানে ঘাস যেন কম। অন্যত্র যেমন ঘাস আর চোরকাঁটা লম্বা, সেখানে সেরকম না। তার মানে এখানেই নীতীশের আড্ডা বসত। চেয়ার-টেবিল বসে, সকলের পায়ের চাপে, ঘাস এখানে বাড়তে পারেনি। বড় একটা অর্জুন গাছ রয়েছে। গাছের তলায় এখনও চেয়ারের পায়ার দাগ। অর্জুন গাছে কি লাল আঠা বেরোয়? গাছটার গায়ে কাটাকুটি দাগ। কাছে গিয়ে অশোক থমকে দাঁড়াল।

অর্জুন গাছের ছাল খসে যাওয়া, ফরসা মানুষের পেশল পাকানো গায়ের মতো দেখাচ্ছে। সেখানে দু-তিন জায়গায় রক্তের ছিটে লেগে আছে। নীতীশ কি এই গাছের কাছেই চেয়ারে বসেছিল? ও গাছটার আরও কাছে এগিয়ে গেল। প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে গাছের গায়ে এক জায়গায় ওর চোখ স্থির হয়ে গেল। পাতলা ছালের ওপরে রক্তাক্ত হাতের দাগ। হাতের রক্ত মুছেছিল কেউ। খুনি? কিন্তু হাতের দাগ দেখে মনে হচ্ছে, তেমন শক্ত মোটা থাবা নয়। অস্পষ্টই, কিন্তু আঙুলের ছাপ সরু।

অশোক নীচের দিকে তাকাল। পায়ের ছাপ নেই। তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিও হয়নি। পায়ের ছাপ থাকবার কথা না। তারপরেই চিকচিক করে উঠল ভাঙা কাচের লাল চুড়ির একটা টুকরো। কাকতালীয় ব্যাপার। কাচের চুড়ির টুকরো যেখানে-সেখানেই পড়ে থাকতে পারে। তবু ও নিচু হয়ে টুকরোটা তুলে নিতে গেল। আর তখনই হাত-দুয়েক দূরে চোখে পড়ল, আরও একটা লাল কাচের চুড়ির টুকরো। সেটাও তুলতে গিয়ে ও একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাসের গায়ে কুড়ুলের ছোট একটা কোপের দাগ। সেই দাগে শুকনো রক্তের ছিটে লেগে আছে।

অশোক মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু খুনি ওদিকে কোথায় যাবে? ওদিক গেলে তো বাড়ির দিকে যেতে হয়। নীতীশের বাড়ির বাগানের দিকের অংশ। পাশ দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে যাওয়া যায়। অথবা পশ্চিমে গিয়ে, বাড়ির শেষ প্রান্তে পুকুরের ধার দিয়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সীমানার বাইরেও চলে যাওয়া যায়।

হঠাৎ 'আঁউ-আঁউ' শব্দে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। অশোক মুখ তুলে নীতীশের বাড়ির বাগানের দিকের অংশে তাকাল। একটা খোলা জানলা দিয়ে যেন শব্দটা আসছে। অশোক দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। শুনতে পেল, ঠাস-ঠাস ছপটির ঘা। আর 'আঁউ-আঁউ' চিৎকার। তার মধ্যেই গোঙানো পুরুষের গলা শোনা গেল, 'ওকে এখন আর মেরে কী হবে? যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।'

মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল : 'কোথায় হয়ে গেছে? যে-জন্যে এত ব্যাপার তার কী হবে? হারামজাদির পেটে বাচ্চা, দুদিন বাদেই লোকের চোখে পড়বে। বাবুর সঙ্গে শোওয়ার সময় মনে ছিল না? ও কি ভেবেছিল—বাবু ওকে বে করবে? রাক্ষুসি সর্বনাশী সব খেয়ে এখন গলার কাঁটা হয়ে বসেছে।'

গোঙানো পুরুষের গলা শোনা গেল, 'বউ, ওই করে তুই ছুঁড়িকে তাড়িয়ে সর্বনাশ করলি। ছুঁড়ি কি মানুষ? ওর কি জ্ঞানগম্যি আছে? তোর লাঞ্ছনায় ছুঁড়ি মাথা ঠিক রাখতে পারে না—আবার কী একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে।'

আবার হঠাৎ 'আঁউ-আঁউ' শব্দ, কিন্তু স্বরের সংকেতটা আলাদা। অশোক দেখল, ফুড়কির মুখ জানলায়। অশোককে দেখছে। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি স্ত্রীলোকের মুখ জানলায় দেখা দিল। চোখদুটো জ্বলছে।

অশোককে দেখেই আতঙ্ক ফুটে উঠল। অশোক তাড়াতাড়ি সরে এসে বাগানের অন্য দিকে চলে গেল। দূরে রাস্তার সামনে ফটিককে চোখে পড়ল।

অশোক আবার অর্জুন গাছের কাছে এগিয়ে গেল। পীতু এসে তার সামনে দাঁড়াল। খালি গা, নেংটির মতো ধুতি গোটানো। নিশ্বাসের গন্ধেই টের পাওয়া যাচ্ছে, মদ খেয়েছে। চোখ লাল। বলল, 'আপনি তো ছোটবাবুর শালির ছেলে, কলকাতা থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' অশোক বলল, 'নীতীশবাবুর খুনের কথা শুনে জায়গাটা দেখতে এসেছি।'

পীতু তেমন মাতাল না। একটু আগেই তার গোঙানো স্বরের কথা শোনা গিয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ বাবু, এই অর্জুন গাছের নীচেই আমার নীতু ভাই বসেছিল। আমি তার টেবুল পেতে দিয়েছি। ভাই এসে বসেছে। হ্যারিকেনটা জ্বেলে আনতে গেছি। এসে দেখি—।' পীতুর দন্তহীন চোপসানো ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। গলার স্বর ডুবে গেল।

'কে এমন কাজ করতে পারে?' অশোক জিগ্যেস করল।

পীতু চোখ মুছে ভাঙা গলায় বলল, 'ভগমান জানেন, বাবু। আমার নীতু ভাইয়ের তেমন শত্তুর তো ছিল না।'

'শত্রু তো নিশ্চয় ছিল, নইলে অমন করে কেউ খুন করে?'

'তা বটে।' পীতু বলল, 'চোখে ভালো দেখতেও পাইনে। সবে তখন সন্ধে হয়েছে। বাতি আনতে আর আমার কতক্ষণ লেগেছে? গেছি, চিমনি মুছেছি, সলতেটো সাফ করেছি। আমার ছেলের বউ দেশলাই জ্বালিয়ে সলতেয় দিল। বাতি নিয়ে আসতে-আসতেই—আঃ। কী বলব, একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাইনি।'

অশোক কথা শুনতে-শুনতে আড়চোখে দেখল, বাগানের দিকের জানলায় ফুড়কি আর খাঁদনের মুখ দেখা যাচ্ছে। তারা এদিকেই তাকিয়ে আছে। অশোকের কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা। খাঁদন আর পীতুর কথাগুলো কানে বাজছে। ফুড়কির পেটে বাচ্চা। কোন বাবুর সঙ্গে শুয়েছিল? নীতীশ ছাড়া বাবু কে? সে রাক্ষুসি সর্বনাশী কেন? খাঁদনের লাঞ্ছনায় ফুড়কি মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার মানে কী? নীতীশ ফুড়কিকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। অথচ গর্ভবতী করেও কথা রাখেনি। বরং এমন কিছু বলেছিল, একটা সামান্য বোবা মেয়ে অতি হিংস্র আর ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছিল। সংকেতটা যেন সেদিকেই ঝিলিক দিচ্ছে। আর তাই যদি হয়, তবে বাকি রহস্য বাড়ির মধ্যেই আছে। অশোক পকেটে হাত দিয়ে ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো অনুভব করল। অর্জুন গাছের পাতলা ছালের ওপর সরু আঙুলের আবছা রক্তাক্ত দাগ। কুড়ুলের কোপ ঘাসে, শুকনো রক্তের ছিটে ঘাসের গায়ে। অশোক রায়বাড়ির দিকে তাকাল। হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির সামনের দিকে গেল। পীতু পিছনে-পিছনে।

অশোক পিছন ফিরে ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিক পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। অশোক জোড়া থাম দেওয়া বারান্দায় উঠল। জিগ্যেস করল, 'পুলিশ বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল?'

'তা ঢুকেছিল বইকী।' পীতুর গলা এখন অনেকটা পরিষ্কার : 'বাড়ির ভেতরে ঢুকে কী আর দেখবে? খুন যারা করেছে, তারা তো আর বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি।'

অশোক বাড়ির ভিতরে ঢোকার দরজার দিকে গেল। পীতু জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, বাবু?'

'বাড়ির ভেতরটা একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।' অশোক ভিতরে পা দিল।

পীতুর স্বর বদলে গেল। শক্ত গলায় বলল, 'তা হয় না, বাবু। পরের বাড়িতে তুমি কেন ঢুকবে?'

'এমনি। পাড়াগাঁয়ের বাড়ি কোনওদিন দেখিনি তো।' অশোক ভিতরে গেল।

পীতু রেগে গিয়ে বলল, 'এ কেমন কথা, অ্যাঁ?'

'এটাই ঠিক কথা।' ফটিক সামনে এসে বলল, 'তুমি এখানেই আমার কাছে দাঁড়াও।'

অশোক ভিতরে ঢুকতেই খাঁদন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অশোক জিগ্যেস করল, 'নীতীশবাবু কোন ঘরে থাকতেন?'

খাঁদন ভ্রুকুটি চোখে তাকিয়ে ওপরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'উপরের ঘরে থাকত। কেন?'

'সিঁড়িটা কোন দিকে?' অশোক আশেপাশে তাকিয়ে বাঁ-দিকে দালানের কোণে সিঁড়ি দেখতে পেল। কোনও কথা না বলে সোজা সেদিকে গেল।

খাঁদন চিৎকার করে উঠল, 'এ কেমন কথা? আমি এখুনি লোকজন ডাকব।'

'ডাকো।' অশোক তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরের রেলিং-দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, বাড়ির সীমানা ভাগের উঁচু লম্বা পাঁচিল। সব ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল টানা। অশোক দেখল, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে তিনতলার ছাদে। সেদিকে তাকাতেই তিন ধাপ সিঁড়ির ওপরে, সেই লাল ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো। অশোক উঠে গিয়ে তুলে নিল। সিঁড়ির ধুলোয় পায়ের ছাপ। ছোট মাপের, একটু লম্বা। তার পাশে মোটা থ্যাবড়া পায়ের দাগও রয়েছে।

অশোক ওপরে উঠল। ছাদের দরজায় খিল লাগানো। অশোক খিল খুলে ফেলল। ছাদে উঠে দেখল, সেখানেও সীমানার পাঁচিল তোলা। দরজার কাছেই কাচের চুড়ির তিন-চার টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। অশোক আশেপাশে চোখ ফেরাল। চিলেকোঠার শিকল খুলে ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই চোখে পড়ল, ছোট হাতলের চওড়া কুড়ুল। ধারালো কুড়ুলের গায়ে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গিয়েছে। রক্ত-লাগা জামা-শাড়ি কোণে জড়ো করা। ব্রজনাথের কথা মনে পড়ল : 'ভাইপোর আমার মেয়েমানুষের দোষ ছিল না। সেদিক থেকে তার চরিত্রের কেউ দোষ দিতে পারবে না।'

হয়তো কথাটা সত্যি। তবে, বোবা ফুড়কির উদ্ধত যৌবন নিশ্চিন্তে ভোগ করা মানেই চরিত্র খারাপ না। হয়তো ফুড়কিকে নীতীশ ভালোবেসেছিল। অথবা শুধু ভোগ করতে গিয়েই কথা দিয়েছিল, ওকে বিয়ে করবে। গর্ভবতী হওয়ার পরে খাঁদনের লাঞ্ছনায় ফুড়কি মাথার ঠিক রাখতে পারেনি।

পায়ের শব্দে অশোক ঝটিতি পিছন ফিরে তাকাল। ফুড়কি। হাতে কেউটে সাপের মতো ধারালো কাস্তে। লাল চোখ জ্বলজ্বল জ্বলছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু! ফুড়কি কাস্তে তুলে, অশোকের মাথা লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অশোক চকিতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ফুড়কি কাস্তে-হাতে মুখ থুবড়ে পড়ল। অশোক জুতোসুদ্ধ ফুড়কির কাস্তে-ধরা হাতটা চেপে ধরে, অন্য পা দিয়ে পিঠে একটা জোরে লাথি মারল। ফুড়কি 'আঁউ-আঁউ' শব্দে চিৎকার করে উঠল। অশোক ওর মুঠি থেকে কাস্তেটা ছিনিয়ে নিল। ফুড়কি লাফিয়ে ওঠবার আগেই অশোক একলাফে চিলেকোঠার বাইরে। ঝটিতি চিলেকোঠার দরজা টেনে, শিকল তুলে দিল। নীচে নেমে এল দ্রুত। খাঁদন আর পীতুর চিৎকারে তখন রায়বাড়ির মহিলা-পুরুষ ছাড়াও পাড়ার কিছু লোকজন এসে ভিড় করেছে।

ব্রজনাথ এগিয়ে এলেন। চোখে-মুখে উদ্বেগ। অশোক বলল, 'কাউকে তাড়াতাড়ি পূর্বস্থলী থানায় পাঠান। আমার নাম করে বলবেন, খবর পেয়েই যেন চলে আসেন। খুনি ধরা পড়েছে। সে এখন চিলেকোঠায় বন্দিনী।'

'বন্দিনী?' অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল।

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, ফুড়কি। তবে ওর দোষ কতটা, সেটা আইন বিচার করবে। নীতীশবাবুর বাচ্চা ওর পেটে রয়েছে।'

সকলে হতবাক। খাঁদন মাটিতে লুটিয়ে কান্না জুড়ে দিল : 'এ কী সব্বনেশে লোক গো, কোথা থেকে এল? এ কখনও মানুষ নয়, দানো, দানো।'

পীতু ইতিমধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। ওপর থেকে ফুড়কির আর্তনাদ এখন গৃধিনীর কান্নার মতো মৃদুতর হয়ে ভেসে আসছে। নীতীশের নীতীশের

গোয়েন্দা-রহস্য
পুজো সংখ্যা, ১৯৮১



ছোট্ট পাখি চন্দনা

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

লম্বা বারান্দার এক কোনায় খাঁচায় ঝোলানো চন্দনা পাখিটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার চারদিক দেখে নিল। তারপর গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'এই টুকটুক।'

পড়ার টেবিলে বসে থেকে বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে ভুরু কোঁচকাল রুনা। পাখিটা তো ভীষণ বদমাশ! মনে-মনে ভাবল রুনা। গত চারদিন ধরে পাখিটা খালি পাশের বাড়ির টুকটুকের নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে। অথচ আজ চারদিন হল টুকটুকের সঙ্গে রুনার আড়ি হয়ে গেছে। রুনার একমাত্র খেলার সাথী ওই টুকটুক। টুকটুকের সঙ্গে আড়ি হয়ে যাওয়াতে রুনা এখন একদম একলা। এখন ওর নেই কোনও অরণ্যদেব পড়ার সাথী অথবা পুতুল খেলার। ওর খেলার মাঝে-মধ্যে এমন খারাপ লাগে যে, ও লুকিয়ে-লুকিয়ে কেঁদেই ফেলে।

রুনা একবার ভেবেছিল, নিজে যেচে গিয়েই টুকটুকের সঙ্গে ভাবটা করে নেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল যে, টুকটুক ওর সবচেয়ে প্রিয় পুতুল চিনের রাজপুত্রের একটা হাত ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়েছে। রুনার বাবা অনেক কষ্টে ফেভিকল দিয়ে পুতুলের হাতটা জুড়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তবুও রুনা যখনই পুতুলটার দিকে তাকায় ঠিক তখনই ওর মনে হয় যন্ত্রণাকাতর মুখে চিনের রাজপুত্র ওকে যেন কিছু বলতে চাইছে। ইস, কী সুন্দর দেখতে ছিল পুতুলটা! রুনার ছোটমাসি পুতুলটা দিল্লির একটা মেলা থেকে কিনে এনে রুনাকে দিয়েছিলেন। চোখদুটো সামান্য জ্বালা করে উঠল রুনার। দু-হাতে চোখ কচলে নিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রাখল। হঠাৎ ওর চোখের সামনে বইয়ের পাতায় সারিবদ্ধ পিঁপড়ের লাইনের মতো কালো অক্ষরগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে চিনের রাজপুত্রের সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল।

'কী ভাবছ, রুনা?' রাজপুত্রের ঠোঁটদুটো সামান্য নড়ে উঠল।

'তোমার কথা।' বইয়ের পাতায় ঝুঁকে পড়ল রুনা।

'আমার কথা।' বিষণ্ণ হাসি হাসল রাজপুত্র : 'তোমার বন্ধু খুব নিষ্ঠুর, রুনা।'

'না, ও আমার বন্ধু নয়। কক্ষনও নয়।' দু-হাত দিয়ে টেবিল-ক্লথ খামচে ধরল রুনা।

'কিন্তু ও একদিন তোমার বন্ধু ছিল।' রাজপুত্রের চোখের পাতাদুটো তিরতির করে কেঁপে উঠল।

'আগে ছিল। তোমার হাত ভেঙে দেওয়ার পর ওর সঙ্গে আমার আড়ি হয়ে গেছে।'

'সত্যি?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাজপুত্রের সুন্দর মুখটা।

ঠিক তখুনি খাঁচায় ঝোলানো চন্দনা পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে ডেকে উঠল, 'এই টুকটুক।'

'উফ!' আতঙ্কে কানে হাত চাপল রাজপুত্র : 'পাখিটা নিশ্চয়ই টুকটুককে পছন্দ করে?'

'না।' আর্তনাদ করে উঠল রুনা : 'ও টুকটুককে মোটেই পছন্দ করে না।'

'কিন্তু ও যে টুকটুকের নাম ধরেই ডাকছে।' রাজপুত্র বিষাদ মাখা গলায় বলল, 'পাখিটা হয়তো টুকটুকের মতোই নিষ্ঠুর। সত্যিই খুব নিষ্ঠুর।' রুনার চোখের সামনে থেকে ধীরে-ধীরে রাজপুত্রের সুন্দর মুখটা অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল।

'শোনো, যেয়ো না।' আর্তনাদ করে উঠল রুনা।

'পাখিটা মোটেই আমাদের বন্ধু নয়।' ফিসফিস করে বলল রাজপুত্র, 'ও শুধুমাত্র টুকটুকের বন্ধু।' চোখ-ভরা টলটলে জল নিয়ে বইয়ের পাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল চিনের রাজপুত্র।

'টুক টু-উ-উক।' চন্দনাটা দু-বার ডানা ঝাপটাল।

ঝটিতি পড়ার টেবিল ছেড়ে বারান্দায় চলে এল রুনা। রান্নাঘর থেকে চমৎকার মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে। মা রান্নাঘরে। বাবা বাড়ি নেই, বাবার ছ'টা-দুটো ডিউটি। কাজের লোক সনাতন বাজারে। এই সুযোগ। রুনা মনে-মনে ভেবে নিয়েছে ও এখন কী করবে। বারান্দার রডে ঝোলানো খাঁচাটা খুলে নিয়ে ও একদৌড়ে নীচে নেমে এল। বাড়ির পিছন দিকে বেশ বড় গভীর পুকুর। পাখিটা হয়তো বুঝতে পেরেছিল কী ঘটতে চলেছে—ওটা তারস্বরে চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রুনা শক্ত হাতে খাঁচাটাকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে ধরল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে রুনা খাঁচাটাকে জল থেকে টেনে তুলে দেখল, চন্দনা পাখিটা খাঁচার এককোনায় ডানা বিছিয়ে মরে পড়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর চোখদুটো সম্পূর্ণ খোলা। আর সেই খোলা চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা আর প্রতিহিংসা একসঙ্গে ধিকধিক করে জ্বলছে। খাঁচা খুলে মরা পাখিটাকে বের করে নিল রুনা। তারপর ওটাকে ছুড়ে ফেলে দিল পুকুরের এককোনায় জমে থাকা খানিকটা কচুরিপানা আর জলজ উদ্ভিদের মাঝখানে।

এক নিশ্বাসে দৌড়ে ওপরে উঠে এল রুনা। খাঁচাটা ঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠল, 'মা, খাঁচার দরজা খোলা। পাখিটা উড়ে গেছে।'

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে দ্রুতপায়ে বারান্দায় দৌড়ে এলেন মা।

'কী আশ্চর্য! খাঁচার দরজা কে খুলল?'

'কী জানি। আমি হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম...।'

মা একবার সন্দেহের চোখে রুনার দিকে তাকিয়ে শূন্য খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'এ কী, খাঁচাটার গায়ে জল কেন?' মা চিন্তাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'আর তা ছাড়া খাবারের বাটিতেই বা খাবার নেই কেন! আমি সকালবেলাই বাটি ভরতি করে ছোলা দিয়েছি।' কথা শেষ করেই মা রুনার দিকে ঘুরে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই খাঁচার দরজা খুলেছিলে?'

'সত্যি বলছি, মা, আমি কিচ্ছু জানি না,' রুনার গলার স্বর সামান্য কেঁপে উঠল।

'আশ্চর্য! তাহলে পাখিটা গেল কোথায়!' মা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছলেন।

'আমার মনে হয়, পাখিটা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে, মা,' আস্তে করে কথা ক'টা বলল রুনা।

'জানি না বাপু কী হয়েছে,' মা ঘুরে দাঁড়ালেন : 'পাখিটা তোমার কাকা শখ করে কিনেছিলেন, তিনি এসে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।' রাগে গজগজ করতে-করতে মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

আকাশে ছেঁড়া মেঘের ভেলায় চড়ে মস্ত চাঁদ ভাসছে, লোহার জাফরি-কাটা জানলার ফাঁক দিয়ে রুপোলি চাঁদের স্বপ্নিল আলো ঘরের মেঝেয় সুন্দর নকশা তৈরি করেছে। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শুল রুনা, সামান্য বিড়বিড় করে কী যেন বলল, আর ঠিক তখুনি একটা অতি পরিচিত গলার স্বর ওর কানের কাছে বেজে উঠল, 'এই টুকটুক।'

ঝটিতি চোখ খুলল রুনা। প্রথমে ও ভাবল ও হয়তো স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি সামান্য ঘোরাতেই ও দেখল, জানলার গ্রিলে নখ আঁকড়ে বসে আছে চন্দনা পাখিটা। পাখিটা একবার শিস দিল। ওর ভেলভেট সবুজ দেহের ওপর চাঁদের আলো সুন্দরভাবে পিছলে যাচ্ছিল। ঘোর-লাগাভাবে হাত বাড়িয়ে পাখিটাকে ধরতে গেল রুনা, কিন্তু হাত বাড়াতেই ওটা উড়ে গিয়ে বারান্দার রেলিঙে বসল। ওটাকে ধরতেই হবে, মনে-মনে ভাবল রুনা। পাখিটা মোটেই মরেনি, ওটা শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞান ফিরতেই কচুরিপানার মধ্যে থেকে...মেঝেয় নামল রুনা। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল ও। সামান্য দৌড়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পাখিটাকে ধরতে গেল রুনা, পারল না। দু-হাতের ফাঁক দিয়ে মসৃণভাবে চন্দনাটা গলে গেল। সুন্দরভাবে ওটা উড়ে চলে গেছে পুকুরের ঠিক পাশেই বেঁটে আকন্দ গাছটার ডালে।

বেড়াল-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল রুনা।

শান্ত কালো পুকুরের জলে রুপোলি চাঁদ সাঁতার কাটছে। আকন্দ গাছের সরু একটা ডালে বসে চন্দনাটা দোল খাচ্ছে। এক-পা পাখিটার দিকে এগিয়ে গেল রুনা, পাখিটা বাতাসের বুকে ডানা মেলল। পুকুরের শান্ত জলের ওপর তিরতির করে ডানা কাঁপিয়ে ভেসে রইল চন্দনাটা। ঘাটের প্রথম ধাপিতে পা রাখল রুনা। ঠান্ডা জল ওর পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিল। আর-একটু, হাত বাড়ালেই বোধহয় পাখিটাকে ধরা যাবে, আর-একটু। ঠান্ডা জল রুনার হাঁটুকে আদর করল। ইস, আর-একটু। দু-হাত সামনের দিকে এগিয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল রুনা।

অপরাধ

ডিসেম্বর, ১৯৮১



কালো মেঘের ছায়া

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

বেলা গড়িয়ে এখন অপরাহ্ন।

ডাকবাংলোর দালানের খুঁটি ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনিন্দিতা। উদাস দৃষ্টি ছড়ানো সামনের পাহাড়গুলোর ওপর। পাহাড়গুলো বড় কাছে। প্রতিটা এবড়োখেবড়ো পাথর স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শালের জঙ্গল। কোথাও তারা ধাপে-ধাপে উঠে গেছে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত। চৈত্রের নতুন পাতায় সূর্যের ঝিকিমিকি।

পাহাড়গুলোকে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কোনও সমুদ্রের বিশাল ঢেউ বলে মনে হয়। যেন কোন মন্ত্রবলে সিংভূমের এই পাহাড়-বলয় উত্তাল তরঙ্গের মতোই থেমে রয়েছে মহাকালের ইঙ্গিতে। নিজের বুকে হাত বোলায় অনিন্দিতা। বুকের গভীরে উত্তাল হয়ে বয়ে চলা ঢেউগুলোও যেন পাহাড়ের মতো জমাট বেঁধে গেছে। দৈনন্দিন জীবনের অশান্তি, অপমান শাল গাছের মতোই ওর বুক চিরে মনের গভীরে শেকড় চালাবার চেষ্টা করবে। সামনের এই রুক্ষ পাহাড়, শালের জঙ্গল যেন ওরই জীবনের প্রতিচ্ছবি।

অনিন্দিতা আজকাল অনুভব করে যে, ও শেষ হয়ে গেছে। ওর বেঁচে থাকাটা অর্থহীন। জীবনের লক্ষ্য বা ঈপ্সিত জিনিস যখন হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষের তখন উচিত জীবন থেকে বিদায় নেওয়া। কিন্তু তাই বা ও পারছে কোথায়! কলকাতার কলেজ, ইউনিভার্সিটির সেই মুক্ত স্বাধীন জীবন, তার চপলতা, আনন্দ সবকিছুই —ওঁ প্রজাপতি ঋষি... মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই সেদিন হারিয়ে গেছে। বন্দি হয়েছে ও খাঁচায়। মুক্ত জীবন এখন ক্রীতদাসীর জীবন। সেদিনের সে বিভাস আর নেই। গঙ্গার ধার, লেক, বেলুড় এখন সব স্বপ্ন। বাস্তব হচ্ছে, দিলীপ বটব্যাল বলে এক ইতর বর্বর পশুর ক্রীতদাসী সে।

দিলীপ বটব্যাল জিওলজিস্ট। সকালবেলায় জিপে চড়ে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। প্রকৃতির বুকে কোথায় তামা আছে, তার সন্ধানে ব্যস্ত। অথচ এই ডাকবাংলোয় অনিন্দিতা বলে মেয়েটির বুকের কোটরে যে ভালোবাসার ছোট্ট পাখিটা মুক্তির জন্য ছটফট করছে, তার কোনও খবরই সে রাখে না। বরং নিষ্ঠুরভাবে খোঁচা মারতেই তার আনন্দ।

বাবা-মায়ের জবর-দস্তিতে আর দিলীপ বটব্যালের উপরোধ, অনুরোধের বেড়াজাল ভেঙে বিভাসকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল অনিন্দিতা। বিভাসকে বলেছিল সে, এ-বিয়ে আমি করব না। চলো, আমরা কোথাও পালাই।

সদ্য এম এ পাশ করা বিভাসের সে-হিম্মত তখন কোথায়! সংসারের অনেক-গুলো ক্ষুধার্ত মুখ, অনেকগুলো কর্তব্যকর্ম তখন তার দিকে মুখ ব্যাদান করে আছে। বাবার ইনভেস্টমেন্টের মূল্য চোকানো তখনও তার অনেক বাকি। বাধ্য হয়ে বিভাস বলেছিল, অপেক্ষা করো, না হয় বিয়ে করে ফ্যালো। অভাবের মাঝে এনে তোমার ভালোবাসাকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। আমায় তোমার ভুল বোঝার সুযোগ আছে। কিন্তু আমি নিরুপায়।

দুঃখ হলেও ঠিক রাগ করতে পারেনি ও বিভাসের ওপর। বিভাসকে বোঝার চেষ্টা করেছিল। প্রেম বড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্তব্য আরও বড়। অভাব নির্মম ঘাতক। তবে অপেক্ষা? না, তাও সম্ভব ছিল না। বাবার হার্টের রোগ। বেঁচে থাকাটা অনিশ্চিত। তাঁর হাতে সুযোগ্য দিলীপ বটব্যাল। সুতরাং...। দিলীপ বটব্যালও দেরি করেনি তার লোভের হাসিটা গোপন করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে—যদিদং হৃদয়ং তব...তদিদং...। অনিন্দিতা ভাবে, দিলীপ 'হৃদয়' শব্দটা বাদ দিয়ে 'দেহ' শব্দটা ব্যবহার করতে পারত স্বচ্ছন্দে। ভারতীয় মেয়েরা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অনিন্দিতাও করছিল। কিন্তু বিধি বাম। নইলে বিভাসের একদা মূল্যবান চিঠিগুলো পোড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবে কেন দিলীপের কাছে! অসময়ে দিলীপ বাড়ি এসে হাজির। বুঝতেও পারেনি অনিন্দিতা। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হাসতে-হাসতেই দিলীপ বলেছিল, নেভার মাইন্ড। দু-একজন বয়ফ্রেন্ড থাকবে না—এ হয় না। ওগুলো না পোড়ালেই ভালো করতে। তোমার অতীতের মালিক আমি নই। বর্তমানের। তোমার বন্ধুটিকে আমি চিনি।

অনিন্দিতা বুঝতে পেরেছিল, এটা প্রচণ্ড শ্লেষ। আর সেই শুরু। ও বুঝত, দিলীপ যতই বিভাসকে আপ্যায়ন করে ডেকে নিয়ে আসুক না কেন, তার একটাই অর্থ—ব্যঙ্গ করা অনিন্দিতাকে। মূর্খ বিভাসটা বুঝতেও পারে না দিলীপের চাল। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসলে বিভাসটা বোকা। সরল। দিলীপের নৃশংসতাটুকু চোখে পড়ে না। দিলীপ তার অসহায়তাটুকু তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে চায়। হার স্বীকার করেনি অনিন্দিতা। বিভাস আর দিলীপের কাছে ও স্বাভাবিক ব্যবহার করবার চেষ্টা করে গেছে বরাবর।

ডাকবাংলোর দারোয়ানের আদিবাসী বউটার ডাকে চমক ভাঙল অনিন্দিতার, মাইজি, গোসলমে পানি দে দিয়া।

কুয়ো থেকে ঠান্ডা জল তুলে বাথরুমের চৌবাচ্চাটা ভরতি করে দিয়েছে গুরুবারী। পাহাড়ের বাঁক দিয়ে কোলপথের ধুলো উড়িয়ে দিলীপের জিপ ফিরে আসার আগেই গা-হাত-পা ধুয়ে সেজেগুজে বসে থাকতে হবে অনিন্দিতাকে। নিত্যদিনের রুটিন। স্বামীর আদেশ। না, হুকুম জারি করে না দিলীপ। ঘুরিয়ে বলে হাসতে-হাসতে, বাড়ি ফিরে যদি তোমায় ফিটফাট না দেখি বড় খারাপ লাগে, অনি। বাড়ি একটা বাগান। সেই বাগানের দুর্মূল্য ফুল হচ্ছ তুমি। তোমায় যদি শুকনো দেখি, তাহলে কি ভালো লাগে? হাসে দিলীপ। হাসিটা তার মুখে সবসময়ে লেগে রয়েছে। মুখে উত্তর দেয় না অনিন্দিতা। অহেতুক বিরোধিতা করে না। মনে-মনে ব্যঙ্গ করে, আহা, রাতে বিছানায় সেই ফুলকে যদি না প্রতিদিন বিধ্বস্ত করে ফেলতে! ন্যাকামি! আসলে এটা অত্যাচার। দিলীপ বোঝাতে চায়, তুমি আমার ক্রীতদাসী। তোমাকে আমার মনোরঞ্জনের জন্য হাসিমুখে সবকিছু করে যেতে হবে। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। আর সেটাই ভালো করে প্রমাণ করার জন্য দিন-দশেক আগে জোর করে সিংভূমের এই জঙ্গলে ধরে আনলে। দিলীপের নাকি একা-একা ভালো লাগছে না। অনিন্দিতার জন্য মন কেমন করে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে।

আসল অসুবিধেটা কী, তা জানে অনিন্দিতা। পাছে তার অনুপস্থিতিতে দিনের পর দিন বিভাসের কাছাকাছি থাকে ও। আশ্চর্য, আসবার সময় বিভাসকে একটা খবরও দিয়ে আসতে পারা গেল না। যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনই ঝড়ের মতোই তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এল। সময় নেই। ছুটি নেই। অথচ এখানে এসে দু-দিন ঘরে বসে রইল নানা বাহানায়। আর ওকে ভালোবাসার ছলে নিংড়ে নিল।

গুরুবারী তাড়া দিল : মাইজি, সাহাবকে লৌটনে কে ওয়াক্ত হো গয়া।

মুখটা লাল হয়ে উঠল অনিন্দিতার। মেয়েটা পর্যন্ত ওর অবস্থা জেনে গেছে। সেদিন এই নিয়ে ও যখন কথা-কাটাকাটি করছিল, তখন কিছু শুনেছে কি না কে জানে! ভ্রূকুটি করে অনিন্দিতা ঘরে ঢুকল।

ডাকবাংলোর উঠোনে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে পাশাপাশি বসেছে অনিন্দিতা আর দিলীপ। বড় থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে বনের মাথার ওপর। সারা জঙ্গল আলোয় আলো। কেমন যেন স্বপ্নিল। হাওয়া উঠেছে—শালের জঙ্গলে, উঠোনের কৃষ্ণচূড়ায় তারই মাতন।

অনিন্দিতার কাঁধে হাত দিয়ে দিলীপ বলল, কেমন দেখছ? এ-দৃশ্য কি কলকাতায় পেতে?

অস্বীকার করতে পারল না ও। সত্যিই অপূর্ব। মনের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে মৃদু হাসল অনিন্দিতা।

তুমি তো আসতেই চাইছিলে না।—দিলীপের গলায় খুশির আমেজ। আমি নাকি তোমাকে সবসময় জোর-জবরদস্তি করি।—মৃদু অনুযোগ।

থাক না ওসব কথা!—সন্তর্পণে দিলীপের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল ও।

ভেবেছিলাম, তোমাকে খবরটা না দিয়ে বরং কাল চমকে দেব।

কী খবর?—সন্দিগ্ধভাবে তাকাল অনিন্দিতা।

কাল বিভাস আসছে। ওকে আমি লিখেছিলাম। খুশি?

খুশি? আমায় খুশি করার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? ওকে আসতে বারণ করে দাও।—চাপা গলায় গর্জে উঠল অনিন্দিতা, তোমার ভালোমানুষির মুখোশটা আমার সহ্য হয় না।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল দিলীপ : এই দ্যাখো! রেগে উঠলে। এখন কি আর বারণ করা যায়? আসুক না! তুমিও একটা সঙ্গী পাবে। আমারও ভালো লাগে লোকটাকে। কথা বলে সুখ পাওয়া যায়।

অনিন্দিতা দিলীপের মনটা বোঝবার চেষ্টা করল। কী শয়তানির প্যাঁচ কষছে, কে জানে। বিভাসকে নাকি ভালো লাগে ওর! ন্যাকামি! তাও যদি না সবকিছু জানত! চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অনিন্দিতা : আমায় এভাবে অপমান করার অধিকার তোমার নেই।

আচ্ছা, তুমি এমন আজেবাজে ভাবো কেন? কই, বিভাস তো কিছু মনে করে না!

ও একটা নিরেট বোকা। আর তুমি একটা আস্ত শয়তান। বিভাস এলে আমি এখানে থাকব না।—ঘরের দিকে পা বাড়াল অনিন্দিতা। গুরুবারী নেমে এসেছে উঠোনে। ওকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল ও।

ঘরের মধ্যে থেকে অনিন্দিতা শুনল কিছু অস্ফুট কথা। মৃদু হাসির গুঞ্জন তাড়া করে এল তাকে। ইতর, ছোটলোক! দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল অনিন্দিতা। চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা ওর মনে এল। ও যখন এখানে ছিল না—গুরুবারীর সঙ্গে দিলীপের...অসম্ভব কী? বউটা যা গায়ে পড়া!

নিরুপায় ক্রোধে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকল অনিন্দিতা। উঠোন থেকে গুরুবারীর চটুল হাসি তখনও ভেসে আসছে।

আদর করার ছলে লোকটা কোনও কথা শোনেনি। নির্লজ্জ দস্যুর মতো রাতভোর তাকে লুঠ করেছে। প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন, জৈব ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে অনিন্দিতা। রতি রভসের তুঙ্গ পর্যায়ও মনে-মনে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে ও। রমণ শেষে ছিবড়ের মতো ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে লোকটা। আর সারা রাত্রি জাগরণের জ্বালা নিয়ে প্রভাতের অপেক্ষা করেছে অনিন্দিতা।

বনের পাখিরা ডেকে উঠেছে একসময়। সূর্য উঠেছে। বিছানা ত্যাগ করে কুয়োতলায় বালতি-বালতি জল ঢেলে দেহের কলুষ মুক্ত করতে চেয়েছে ও।

জল তুলে দিতে-দিতে মুখ টিপে হাসল গুরুবারী : সাহাব সারে রাত পরেশান কিয়ে হ্যায় ক্যা!

চোখ বড় করে তাকাতে থমকে গেল গুরুবারী : নহী, আপকো বহুত থকা হুয়া মালুম হোতি হ্যায়।

জবাব না দিয়ে হনহন করে ঘরে ঢুকে যায় অনিন্দিতা। অসহ্য এক অপমানবোধ গ্রাস করে ওকে। গুরুবারী এত সাহস পায় কোথা থেকে? এত দুঃসাহস হয় কী করে?

জামাকাপড় ছেড়ে দালানে এসে দেখল, চায়ের কাপ আর রাইফেল নিয়ে বসেছে দিলীপ। রাইফেলটা দেখে এক অশুভ আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, ব্যাপারটা কী? সাতসকালে বন্দুক নিয়ে পড়েছ?

পরিষ্কার করে রাখছি। বিভাস এলে শিকারে বেরোব। একটা পাগলা হাতি বড় উপদ্রব করছে।

নীরবে চায়ের টেবিলে বসল অনিন্দিতা। মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক দানা বাঁধতে শুরু করল। কী পরিকল্পনা করছে লোকটা মনে-মনে? একটা কুটিল সন্দেহ ক্রমশ পাক খেতে থাকল মনের মধ্যে। কী চায় ও? গুরুবারী থাকা সত্ত্বেও ওকে টেনে নিয়ে এল কলকাতা থেকে। তারপর বিভাসকে আনছে আপ্যায়ন করে। এসবের উদ্দেশ্য কী? শুধু কি ওকে খুশি করার জন্যই এসব ব্যবস্থা? ওর ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, তোমার চালাকি ধরতে পেরেছি, শয়তান। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ক্রমশ একটা নির্লিপ্ততা এসে ওকে গ্রাস করতে থাকল। মরুকগে, যা হওয়ার হবে। বেঁচে থেকেই বা কী লাভ!

হাঁ করে কী দেখছ? বিভাসকে আনতে যেতে হবে না?

না। ওকে আনতে হবে না।

এটা তোমার রাগের কথা।—হাসল দিলীপ : আমি মানছি, ওকে আসতে বলার আগে তোমাকে জানাইনি। তোমাকে চমক দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

কপটতায় গা-হাত-পা রিরি করে ওঠে অনিন্দিতার। আদর্শ স্বামী! মুখে বলে, আমার শরীর ভালো নয়, যাব না।

বেশ, আমি একাই যাচ্ছি।—রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল দিলীপ।

না।—ছোঁ মেরে রাইফেলটা কেড়ে নেয় অনিন্দিতা : এটা নিয়ে কোথায় চললে? এটা রেখে যাও। এটা বিপজ্জনক।

বিস্মিত চোখে তাকাল দিলীপ, কী হল? ওটা দাও। বিপজ্জনক হলেও এটা সময় বিশেষে প্রাণরক্ষা করে।

কীসের বিপদ? পাগলা হাতির? গতকাল তো নিয়ে যাওনি?

আজ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

মিছে কথা।

ছিঃ অনিন্দিতা, ছিঃ। বেশ, আমি খালি হাতেই যাচ্ছি। কিন্তু যদি জিপ অ্যাক্সিডেন্ট হয়?

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল অনিন্দিতা। তারপর কিছু না বলে টেবিলের ওপর রাইফেলটা নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে গেল। শুনতে পেল গুরুবারী বলছে, সাহাব, ম্যায় চলুঙ্গি। গাঁওপর উতার জাউঙ্গি। লৌটনে কে সময় উঠা লেনা।

জানলা দিয়ে দেখল অনিন্দিতা, দুজনে বেরিয়ে গিয়ে জিপে বসল। না, গুরুবারী পিছনে। কে জানে, চোখের আড়াল হলেই হয়তো বেরিয়ে সামনের সিটে এসে বসবে। মাঝে তো জঙ্গলের রাস্তা।

বেলা যত বাড়ছিল, ততই উদ্বেগ বাড়ছিল অনিন্দিতার। এখনও ফেরেনি দিলীপরা। তবে কি সত্যিই জিপ অ্যাক্সিডেন্ট হল? ভালোমানুষের আড়ালে শয়তানটাকে চিনতে তার আর বাকি নেই। বেলা দুটো বাজতে ছটফট করে উঠল ও। সেরকম একটা কিছু হলে দিলীপের বিরুদ্ধেই সাক্ষি দেবে ও।

সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে জিপটা একসময় এসে থামল কম্পাউন্ডের ভেতর। ধূলি-ধূসরিত বেশে এক-এক করে নামল তিনজন। নির্লিপ্ত চোখে লক্ষ করল অনিন্দিতা।

ট্রেন লেট ছিল।—দিলীপ জনান্তিকে বলল।

কোনও জবাব দিল না অনিন্দিতা।

তোমায় এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন, অনি? শরীর খারাপ?

হ্যাঁ, শরীরটা ভালো নেই। একটু জিরিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। খেতে দেব। বেলা হয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে জিপে করে বেরোল অনিন্দিতা, দিলীপ আর বিভাস। ঝরনা আর নদী দেখবে। বিভাস উচ্ছ্বসিত। দিলীপ খুশি-খুশি। অনিন্দিতা শঙ্কাকুল।

ঝরনাটার ধারে জিপটা দাঁড়িয়েছিল। চৈত্রের শেষে ঝরনাটা শুকিয়ে এসেছে। তবু পাহাড়ের গা বেয়ে এক শীর্ণ জলধারা ঝরে পড়ছে। নদীখাত প্রায় শুকনো। একটা ক্ষীণ জলধারা তিরতির করে বয়ে চলেছে। চারপাশে শাল, মহুয়ার জঙ্গল। ঝরনার ধারে মুগ্ধ বিভাস। দলছুট দিলীপ কিছু দূরে পাথর পরীক্ষায় ব্যস্ত। জিপে বিরস মুখে অনিন্দিতা।

বিভাস একসময়ে ফিরল অনিন্দিতার দিকে : তোমার কী ব্যাপার বলো তো? কী হয়েছে?

কিছু না। কিন্তু তুমি কোন আক্কেলে হ্যাংলার মতো ছুটে এলে বলো তো? লজ্জা করে না তোমার?

বিবর্ণ হয়ে গেল বিভাস : এ তুমি কী বলছ, অনি!

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। যাকে সুযোগ পেয়েও ধরে রাখতে পারোনি, তার পেছনে এত ঘুরঘুর করা কেন?

বিভাসের মুখ থেকে কেউ যেন রক্ত শুষে নিচ্ছিল। দুর্বল কণ্ঠে বলল, আমি ব্যাপারটা এভাবে নিইনি। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে যোগাযোগ তো আমি রাখতে চাইনি। তোমার স্বামীই জবরদস্তি করেন। বেশ, কাল সকালেই আমি চলে যাব। কথা দিচ্ছি, তোমার ছায়া মাড়াব না আর কোনওদিন।—পা বাড়াল বিভাস।

শোনো!

বলো।

তুমি কি কিছুই বুঝতে পারোনি? কেন দিলীপ তোমায় এত ঘটা করে এখানে এই জঙ্গলের দেশে ডেকে এনেছে?

না।

তুমি আমার স্বামীকে চেনো না। উদারতার আড়ালে একটা শয়তান। ও উপভোগ করতে চায় তোমার, আমার অসহায়তা। ও ক্রুর, কুটিল এক মধ্যযুগীয় বাদশাহ। ও আমাকে ঘৃণা করে, তোমাকে ঘৃণা করে। খাঁচায় বদ্ধ বেড়ালকে ও ইঁদুর দুলিয়ে লোভ দেখাচ্ছে। যে-মুহূর্তে তুমি বা আমি কেউ ভুল করব—ও আমাদের গুঁড়িয়ে ফেলবে। ও নিশ্চয় কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছে। চলো, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই, বিভাস—যেখানে ও নাগাল পাবে না।

ছি, ছি! এসব কী বলছ অনি! এ বিশ্বাসঘাতকতা। এ আমি পারব না।

ঘৃণাভরা মুখ নিয়ে তাকাল অনিন্দিতা : জানি, তুমি একটা ক্লীব, নপুংসক, তুমি...তুমি...।—উত্তেজনায় কথা হারিয়ে ফেলল ও।

অনিন্দিতার প্রতিটি কথা চাবুকের মতো আঘাত করছিল বিভাসকে। তবু সংযতভাবেই সে বলল, তুমি ভুল করছ, অনি। দিলীপবাবু একজন প্রকৃত হৃদয়বান লোক। ভদ্রলোককে আমি যতই দেখি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাই।

না, তোমায় কিছু বলা বৃথা। তোমায় কিনে ফেলেছে শয়তানটা। দুঃখ হচ্ছে, যেদিন আমার কথা সত্যি বলে প্রমাণ হবে, সেদিন হয় তুমি না হয় আমি—কিংবা দুজনের কেউই—বোধহয় এ-পৃথিবীতে থাকব না।

অনিন্দিতার আশঙ্কা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বিভাস, কিন্তু বলা হল না। পিছন থেকে দিলীপের গলা পাওয়া গেল চলুন, ফেরা যাক। হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে জঙ্গলে। পাগলা হাতিটাও থাকতে পারে আশেপাশে।

বিভাসের শরীরে কীসের যেন একটা শিরশিরানির ভাব খেলে গেল। যেন কোনও অমঙ্গলের সূচনা। অনিন্দিতার দিকে তাকাল সে। মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে।—কিছু পেলেন নাকি?—দিলীপের হাতে একটুকরো পাথর দেখে এমনি প্রশ্ন করল বিভাস।

মনে হচ্ছে।—মিটিমিটি হাসল দিলীপ।

বিভাসের মনে হল, সেই হাসির ভেতর কেমন যেন রহস্যময়তা।

দুটো দিন অনিন্দিতা নির্বাক হয়ে কাটিয়ে দিল। বিভাস আর দিলীপ জিপে ঘুরে-ঘুরে দিনগুলো কাটাল। অনিন্দিতা সবকিছু জুগিয়ে দিল যন্ত্রের মতো। ও আর কোনও কিছুতে বাধা দেবে না বলে ঠিক করেছে। শুধু একলা থাকলে আন্দাজ করার চেষ্টা করে আঘাতটা কোন দিক থেকে আসবে।

তৃতীয় দিনের সন্ধেবেলায় উঠোনের চায়ের টেবিলে আবার মুখোমুখি হল তিনজন। দিলীপ বটব্যালের কোলের ওপর রাইফেল। চা ঢালছিল অনিন্দিতা।

বিভাস অনিন্দিতার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দিলীপকে বলল, কাল চলে যাব ভাবছি।

যাবেন, যাবেন, মশাই। অত ব্যস্ত হবার কী আছে? এদিককার সবকিছু আগে ভালো করে দেখে নিন।

কী আর দেখার রইল এই পাহাড় আর জঙ্গলে?

আছে, মশাই, আছে। হাতির পাল দেখেছেন? তাদের জলক্রীড়া দেখেছেন? পশুদের জল খেতে আসা দেখেছেন? দেখেননি।

সত্যি?—অবিশ্বাসীর দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে বিভাস।

সত্যি।

বেশ, আজ রাতে দেখাতে পারবেন?

কেন নয়? চলুন, খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া যাক জিপটা নিয়ে। ভালো কথা, রাইফেল চালাতে জানেন?

এন. সি. সি. ট্রেনিংয়ের সময় শিখেছিলাম। দেখি রাইফেলটা?

রাইফেলটা হাতে নিয়ে বিভাস সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় লক্ষ্য স্থির করল।

ফায়ার করুন।

না, থাক।—রাইফেলটা ফিরিয়ে দিল বিভাস : আমরা তো আর শিকার করতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া রক্তপাত আমার ভালো লাগে না।

কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়?

আপনি তো আছেন।

তাই বুঝি! পরের ওপর প্রাণ সঁপে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে রেডি হওয়া যাক। আমার আর-একটা রাইফেল আছে। ওটা ঠিক করি। আসুন ঘরে।

অনিন্দিতা এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিল চুপ করে। বিভাস আর দিলীপকে উঠতে দেখে হঠাৎ বলে উঠল, না। বিভাস, তুমি যাবে না।

কেন?—অবাক হয়ে দিলীপ প্রশ্ন করল।

এমনি।—দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল অনিন্দিতা।

এমন সুযোগ জীবনে আসবে না, অনি। তুমিও চলো না।

না, যাবে না। আমার ভয় করছে।

হা-হা করে হেসে উঠল দিলীপ।—থাক তাহলে। আপনার বান্ধবী ভয় পেয়েছে, বিভাসবাবু। আমি একাই যাব।

জ্বলে উঠল বিভাস : ছেলেমানুষি কোরো না, অনি। আমি অবশ্যই যাব। তোমার মেয়েলি ভয় নাই বা দেখালে।

জ্বলন্ত চোখে অনিন্দিতা তাকাল দিলীপের মুখের দিকে : তুমি প্ররোচনা দিচ্ছ।

আমি ছেলেমানুষ নই।—বিভাস বলল।

দিলীপ হাসল : এর পরেও আমায় দোষ দিও না, অনি।

তাহলে আমার কথা তোমরা শুনবে না?

না।—বিভাস বলল, তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ, অনি।

বেশ।—অনিন্দিতা উঠে গেল।

একজন ডাক্তার দেখান, দিলীপবাবু। ওর মাথায় কিছু গন্ডগোল হচ্ছে।

দিলীপ কথাটা এড়িয়ে বলল, আপনি না গেলেই ভালো করতেন।

দিলীপবাবু!—কঠোরভাবে কথাটা বলে বিভাস তাকাল।

দিলীপ চোখ নামিয়ে নিল।—সরি।

আমিও!—হাসবার চেষ্টা করল বিভাস।—কাল কিন্তু আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঠিক আছে।—অস্পষ্টভাবে দিলীপ বলল।

জিপটা একরকম অনিন্দিতার মুখের ওপর কালো ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ও যেন ভেঙে পড়ল। জীবনটা বড় অর্থহীন হয়ে পড়ল। ও সবকিছু সহ্য করতে রাজি আছে, কিন্তু উপেক্ষা নয়। বিশেষ করে বিভাসের ওপর রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। এমন করেই কি মানুষ মৃত্যুর দিকে ছুটে চলে? সে কি বুঝতে পারছে না দিলীপ বটব্যালের মিষ্টি হাসির অন্তরালে, উদারতার আড়ালে, কীসের শয়তানির চাল! পাহাড়, জঙ্গল, বুনো হাতির পাল, পাগলা হাতি, রাইফেল, জিপ—কীসের জন্য এতগুলো জিনিসের সমাবেশ? না, আর কিছু করার নেই অনিন্দিতার।

যতই নিরুদ্বেগ হওয়ার চেষ্টা করুক অনিন্দিতা—উৎকণ্ঠা যেন ওকে ঘিরে রইল। কখন জিপটা ফিরবে? জিপে কি দিলীপ একা থাকবে, না দুজনেই? নাকি ওর অনুমানই ভুল। মিথ্যে সন্দেহ করছে দিলীপকে?

ডাকবাংলোটা নিথর, নিস্পন্দ। গুরুবারী কোথায় কে জানে? জানবার প্রবৃত্তিও নেই অনিন্দিতার। মাঝে-মাঝে বিচিত্র সব শব্দ ভেসে আসছে। শরীরে ভয়ের শিরশিরানি। তা ছাপিয়েও অনিন্দিতার মনে এখন সন্দেহ, সংশয় আর উৎকণ্ঠার দোলা। একসময়ে চোখদুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু হঠাৎ উঠোনে কাদের কথাবার্তা, অস্ফুট আর্তনাদের শব্দে জেগে উঠল অনিন্দিতা। দেওয়ালের অয়েল ল্যাম্পটা কমিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল ও। উঠোনে দুটো ছায়ামূর্তি। জড়াজড়ি করে বিভাসের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কারা? একটু অপেক্ষা করে প্রবল উত্তেজনার মাথাতেও আশ্চর্য সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলে দালানে এল অনিন্দিতা। বিভাসের ঘর থেকে টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসছে—সঙ্গে সামান্য কাতরানির শব্দ।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল ও। বিভাসের দরজার গোড়ায় রাইফেলটা ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারল দুরুদুরু বক্ষে। কী দৃশ্য দেখবে কে জানে। গুরুবারীর গলা পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি বিভাস...? না, বিছানার ওপর দিলীপ শুয়ে। ফার্স্ট-এড বক্সটা খুলে ব্যান্ডেজ বার করে দিলীপের মাথায় বাঁধবার চেষ্টা করছে গুরুবারী। মাথাটা বোধহয় ঘুরে উঠল অনিন্দিতার। দেওয়াল ধরে টাল সামলিয়ে নিল।

ও বাবু কাঁহা?

গুরুবারীর কথা ক'টা কানে যেতেই অনিন্দিতার মনে হল, ও যেন একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণ ঘটবে ওর মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে রাইফেলটা হাতে নিয়ে ঝড়ের মতো ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল ও : দিলীপ, বিভাস কই? বলো, বিভাস কই?

গুরুবারী আতঙ্কে নীল। বিস্ফারিত চোখে দিলীপ বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বাধা দিল অনিন্দিতা। রাইফেলের নল বুকে ঠেকিয়ে তাকে শুইয়ে দিল, বলো শয়তান, বিভাস কোথায়?

দিলীপ বোধহয় সংবিত ফিরে পেল : বিশ্বাস করো, অনি, পাগলা হাতিটা এমনভাবে তেড়ে এল—পথ হারিয়ে ফেলেছে বোধহয়।

দাঁতে দাঁত চেপে অনিন্দিতা বলল, কোথাকার পথ? পৃথিবীর, তাই না? আমি জানি, তুমি খুন করেছ বিভাসকে। এটাই তুমি চাইছিলে। তোমার ভালোমানুষির অন্তরালে একটা খুনে লুকিয়ে আছে। আমি জানতাম, তুমি বলবে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। গুরুবারীর সঙ্গে পিরিতটাও তোমার অ্যাক্সিডেন্ট!—ব্যঙ্গ করে উঠল অনিন্দিতা।

অনি, বিশ্বাস করো, হাতিটাকে আমি গুলি করেছিলাম। আমি আহত, তোমার সামনে দাঁড়াবার সাহস...।

হয়নি...কারণ সে-গুলি ফসকে লাগল বিভাসের গায়ে। চমৎকার!—হো-হো করে উন্মাদের মতো হেসে উঠল অনিন্দিতা। তারপর হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য : বিভাস কী অপরাধ করেছিল, দিলীপ?—দম নিয়ে কান্নার সুরে বলল অনিন্দিতা।

হঠাৎ আতঙ্কে গুরুবারী আর দিলীপ দুজনেই চিৎকার করে উঠল। অনিন্দিতা রাইফেলটা মেঝেতে দাঁড় করিয়ে নলটা বুকে চেপে ধরেছে। ডানপায়ের বুড়ো আঙুল টিগারের ওপর।

পাগলের মতো ঝাঁপ দিতে গেল দিলীপ : অনি, না...।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির শব্দে ডাকবাংলোর গেটের কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বিধ্বস্ত বিভাস। একটা পা তার তখন উঠোনের ওপর।

মাসিক রোমাঞ্চ
জানুয়ারি, ১৯৮২



সাপ

শিশির বিশ্বাস

হিস—হিস।

একজন মানুষের মুখে শব্দটা শুনে প্রথম দিন প্রায় চমকে উঠেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, সুমন্তবাবুর ওটা মুদ্রাদোষ। উত্তেজিত হয়ে উঠলে জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে ওই অদ্ভুত শব্দটা বের করেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক দিন আগেই আলাপ হওয়া উচিত ছিল। বলতে গেলে উনিই আমার নিকটতম প্রতিবেশী। আমার বাড়ির ঠিক পুব দিকে মস্ত একটা বাগান। বাগানের একপাশে পুরোনো নোনা-ধরা ইটের একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। ওইরকম একটা পোড়ো বাড়িতে যে কোনও মানুষ বাস করতে পারে, ভাবতেই পারিনি। নতুন জায়গা যদিও, প্রায় মাস-দুই হল এসেছি। সেদিন সনাতন এসে জানাল, বাবু, সামনের বাড়িতে এক ভদ্রলোক থাকেন। প্রায় বারই হন না ঘর থেকে। সেদিন আমার সামনে পড়তেই কেমন ছুটে পালিয়ে গেলেন।

শুনে সত্যি অবাক হয়েছিলাম। তারপর তক্কে-তক্কে রইলাম। ভদ্রলোককে পেলেই যেচে আলাপ করব। কয়েকদিনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সফল হলাম।

ভদ্রলোক সত্যিই অসামাজিক। বয়েস হয়েছে। বোধহয় বেশ কয়েক দিন স্নান করেননি। সারা গায়ে খড়ি ফুটেছে। কেমন একটা ঝিমুনি ভাব। কথা বললেন খুব কম। প্রায় সারাক্ষণই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। অদ্ভুত পলকহীন দৃষ্টি। বেশ বিরক্ত হয়েই ফিরে এলাম।

এর দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন সকালে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় সুমন্তবাবু এসে হাজির। দেখে চমকে উঠলাম। ঝকঝকে উজ্জ্বল চেহারা। ক'দিনে বয়েস যেন অনেকখানি কমে গেছে। প্রথমে তো ভেবেছিলাম, ইনি বোধহয় অন্য কেউ। কিন্তু ভুল ভাঙল। উনি প্রথমেই সেদিনের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বললেন, সেদিনের জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে আমি একটু অসামাজিক। তার ওপর ক'দিন ধরে শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। তা, হ্যাঁ মশাই, আপনি এই বাড়িটা হঠাৎ কিনে নিলেন নাকি?

মাথা নেড়ে বললাম, না, তেমন কিছু নয়। মাস কয়েকের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। ছোটখাটো একটা ব্যবসা রয়েছে, সেই দরকারেই এখানে আসা।

ও তাই বলুন।—সুমন্তবাবুর গলার স্বর কতকটা যেন আশ্বস্ত হওয়ার মতো শোনাল, আমি ভাবলাম বুঝি কিনে নিয়েছেন বাড়িটা। তা যাই বলুন, আপনার সাঙ্গো-পাঙ্গগুলো কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। কেমন বিচ্ছিরি স্বভাবের।

সামান্য হেসে বললাম, কেন বলুন তো! ওদের তো নেহাত ভালোমানুষ বলেই জানি। ঝোপেঝাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। ওদের কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে আমি কলকাতায় চালান দিই। কলকাতার অনেকগুলো ল্যাবরেটরিতে সাপ জোগান দিতে হয় আমাকে।

হাঁ করে আমার কথা শুনছিলেন সুমন্তবাবু। উজ্জ্বল চোখদুটো ক্রমশ বড়-বড় হয়ে উঠছিল। হঠাৎ হো-হো করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, বলেন কী মশাই! সাপ ধরবেন, তার জন্যে এই ছোটনাগপুরে এসেছেন!

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, কেন, এসে কিছু ভুল করেছি নাকি? গ্রামে সাপ মিলবে না তো মিলবে কোথায় বলুন দেখি?

শুনে উনি হাসি থামিয়ে হাঁ করে খানিক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে কী জানেন, এখানে নেহাত ছোটখাটো সাপের দেখাই পাবেন বেশি। জাঁদরেল সাপের কথা যদি বলেন, তবে তা ওই শহরেই। আমি অনেকদিন ছিলাম কিনা! কী বলব মশাই, বিরাট-বিরাট সাপ সেসব—পাইথন, কিং কোব্রা, ভাইপার। তাদের অনেকে আবার জাতভাইদেরও ধরে খায়। শেষটায় থাকতে না পেরে পালিয়ে এলাম। এখন দিব্যি আছি এখানে।—বলতে-বলতে হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, আজ তবে আসি, স্যার।

আমায় কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই উনি দুম করে চলে গেলেন। প্রায় সেই মুহূর্তেই সনাতন ঘরে ঢুকে যে-সংবাদটা দিল, তাতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, সুমন্তবাবুর ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গেলাম।

সামান্য হাঁপানির টান থাকার জন্যে দু-বেলা ছাগলের দুধ না হলে চলে না আমার। এখানে এসেই তাই ভালো জাতের একটা পাটনাই দুধেল ছাগল কিনেছিলাম। সেই ছাগলটাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সনাতন গোড়ায় খবরটা দেয়নি আমাকে। ভেবেছিল, দড়ি ছিঁড়ে এদিক-ওদিক কোথাও গেছে। কিন্তু খোঁজাই সার হয়েছে।

ছাগলটাকে তারপর আর পাইনি। লোকজন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি নেহাত কম হয়নি। কিন্তু কোনও হদিশই করা গেল না। তাই সেদিন সকালেই সনাতনকে পাঠিয়েছিলাম মাইল-দশেক দূরে একটা হাটে—নতুন একটা দুধেল ছাগলের খোঁজে।

সনাতন বাড়ি নেই। দুপুরে তাই একাই বেরিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের গায়ে পাতলা জঙ্গল। সাপখোপে ভরতি। প্রায় রোজই সনাতনকে নিয়ে এখানে আসি। সনাতন ওস্তাদ সাপুড়ে। দিন কয়েক আগে বেশ বড় জাতের চন্দ্রবোড়া ধরেছে এখান থেকে।

জঙ্গলে আপনমনে ঘোরাঘুরি করছি, হঠাৎ পাশের একটা ঝোপের ভেতর থেকে হিস-হিস শব্দ কানে আসতেই সতর্ক হয়ে উঠলাম, সাপ!

মুহূর্তে পাশ ফিরেই কিন্তু একদম বোকা বনে গেলাম। ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে সুমন্তবাবু। জামায়, মাথার চুলে, দু-একটা শুকনো পাতা লেগে রয়েছে। বোঝা যায়, ঝোপের ভেতরেই ছিলেন এতক্ষণ। বেরিয়ে এসেছেন। আমায় তাকাতে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন : কী মশাই, সাপ খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি?

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, খুব বোকা বানিয়ে দিলেন, মশাই, যা হোক। কিন্তু ওই ঝোপের মধ্যে একা-একা করছিলেন কী? জায়গাটা তো সাপখোপের রাজ্যি।

হাসালেন মশাই! পঁচিশ বছর আছি এখানে। আমায় সাপের ভয় দেখাচ্ছেন! আপনাকে সেদিন বললাম না, সাপ দু-চারটে এদিকে পাবেন বটে, তবে তারা নেহাতই গাঁইয়া। মানুষের ধারে-কাছে মাড়ায় না। আমি তো কতদিন রাত্তিরে গরমের সময়, ওই যে বড় পাথরটা দেখছেন, ওটার ওপর শুয়ে থাকি। বেশ আরাম।

শুনে প্রায় আঁতকে উঠলাম : বলেন কী, মশাই! রাত্তিরে ওই পাথরটা তো সাপের আড্ডা বিশেষ। চারপাশে সাপের বিষ্ঠা কত দেখেছেন!—বলতে-বলতে একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, সুমন্তবাবু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। পলকহীন উজ্জ্বল দুই চোখের তারা মড়ার মতো স্থির। সেই অদ্ভুত দৃষ্টি হঠাৎ কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে। বোধহয় আর-একটু হলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল।

আমার হাতে ছিল বড় একটা ফ্লাস্ক ভরতি কার্বলিক অ্যাসিড। সনাতন নেই বলেই আজ ওটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। হাতটা অবশ হয়ে আসতে ফ্লাস্কটা সশব্দে হাত থেকে পড়ে ফেটে গেল। খানিকটা অ্যাসিড ছিটকে উঠল।

মুহূর্তে প্রায় যেন লাফিয়ে উঠলেন সুমন্তবাবু। কুঁকড়ে গেল দেহটা। কাপড়ে নাকটা চেপে ধরে বললেন, চলি, স্যার। বেশি সূর্যের আলো আমার মোটেই সহ্য হয় না। সেই কারণে বাইরে বেরোই না বিশেষ।

প্রায় ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এ ক'দিন সুমন্তবাবুকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটার পর সত্যিই বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাত্তিরে বিছানায় শুয়েও দুপুরের ব্যাপারটা মাথা থেকে নামাতে পারছিলাম না। পুরো ঘটনাটাই তখন আমার কাছে একটা হেঁয়ালির মতন।

রাত্তির তখন ক'টা হবে ঠিক খেয়াল নেই। সমানে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে বুঝি একটু তন্দ্রাভাব এসেছে, হঠাৎ একটা চাপা শব্দে সেটা কেটে গেল। একটু কান পাততেই শুনতে পেলাম, বাইরে নতুন আসা ছাগলটা ঘন-ঘন পা ঠুকছে। ছাগলটা সনাতন আজ বিকেলেই কিনে এনেছে। চট করে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। সন্তর্পণে জানলা দিয়ে তাকালাম। প্রথমটা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু একটু বাদেই নজরে পড়ল, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পলকহীন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

আর দেরি করলাম না। অন্ধকারেই হাতড়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বার করে গুলি চালালাম। সঙ্গে-সঙ্গে দপ করে নিভে গেল চোখদুটো। দুপদাপ একটা শব্দ। কিছুই আর দেখতে পাওয়া গেল না। সনাতনকে তুলে তৎক্ষণাৎ বাইরে এলাম। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। খোঁয়াড়ে বাঁধা ছাগলটা তখনও থরথর করে কাঁপছে। গায়ের লোম খাড়া। সন্দেহ হল, কোনও বুনো জানোয়ার এসেছিল। ছাগলটাকে ভেতরে নিয়ে এসে শুতে গেলাম।

দিনকয়েক পরের কথা। সেদিন সকালে সনাতন উত্তেজিতভাবে ডাকতে বাইরে এসে দেখি, সুমন্তবাবুর পোড়ো বাড়িটার ওপর অনেকগুলো শকুন উড়ছে। বেশ নিচু দিয়ে। গত সন্ধে থেকে একটা পচা গন্ধ নাকে আসছিল। ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। এদিকে ক'দিন ধরেই সুমন্তবাবুর দেখা নেই। অন্তত একটু খোঁজ নেওয়া উচিত। অতঃপর কিছু লোকজন নিয়ে পোড়ো বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

নীচতলায় শোওয়ার ঘর একটা। গন্ধটা সেখান থেকেই আসছে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। চৌকাঠে পা ফেলেই চমকে উঠলাম। ভেতরে একধারে মস্ত একটা সেকেলে খাট। খাটের পায়া, ঘরের কোণ বড়-বড় সাপের খোসায় ভরতি। ঘরটিতে যে কোনওদিন মানুষ বাস করেছে তার চিহ্নমাত্র নেই। মস্ত বড় একটা পাইথন সেই খাটের ওপর মরে পড়ে আছে। ঘাড়ের একটু নীচে গুলির দাগ।

পায়ে-পায়ে ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। আর তখনই নজরে পড়ল সাপের চোখদুটো। পলকহীন মরা চাউনি। জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দৃষ্টিটা খুব পরিচিত। মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

মাসিক রোমাঞ্চ

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৮২



সবজি-বাগানের গল্প

শঙ্খদীপ সেন

বাড়িওয়ালা আজ উকিলের চিঠি পাঠিয়েছেন। কী করব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দু-বছর আগে বললেও হয়তো আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারতাম এ-বাড়ি, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব না। এই দু-বছরে আমি ভাড়া বাড়িয়েছি ছ'বার, কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছেন না ভদ্রলোক। এবার বোধহয় উনি কোর্টে যাবেন, আমি আবার কোর্ট, পুলিশ—এসব একেবারেই পছন্দ করি না। কী দরকার, কী খুঁড়তে কী বেরিয়ে পড়বে। শেষপর্যন্ত সারাজীবন আপশোস করে মরতে হবে একটুখানি ভুলের জন্যে।

আজ ভদ্রলোক ভুলে গেছেন, কী অবস্থায় উনি আমায় বাড়ি গছিয়েছিলেন। বাড়িটা ছিল ভুতুড়ে, ভাড়াটে জুটত না, জুটলেও টিকত না সে-ভাড়াটে। আমি বাড়িটা নিয়েছিলাম খানিকটা ঝোঁকের মাথায়। আসলে পুরোনো জমিদার-বাড়ির ওপর এমনিতেই আমার একটু মোহ আছে। তার ওপর শহরের এত কাছে থাকার সুযোগ, তাও আবার নামমাত্র ভাড়ায়।

বাড়ির চেয়েও বাগানের ওপর ভদ্রলোকের লোভ বেশি। আমার সবজি-খামার দেখে উনি বেশ ঈর্ষাতুর হয়ে পড়েছেন। এমন লোভনীয় বাঁধা আয়ের পথ সামনে দেখতে পেলে অবশ্য ঈর্ষা হওয়ারই কথা। জনান্তিকে একটা কথা বলে রাখি যে-আমলে আমার বইয়ের চার-পাঁচটা মুদ্রণ দেখতে-দেখতে শেষ হয়ে যেত, তখনও আমি মাসে এত রোজগার করতে পারিনি। তারপর একদিন লেখা ছেড়ে বাগান নিয়ে মেতে উঠলাম। লেখা ছেড়ে দেওয়ার কারণও অবশ্য লুকিয়ে আছে এই বাগানেরই গভীরে।

এ-বাগানের মাটি আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি। তাই এত সহজে আমি আমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছি না। যখন এসেছিলাম, তখন এই সমস্ত জমি নিষ্ফলা হয়ে পড়ে থাকত। মহেশপ্রসাদ এ-বাগানের পেছনে কম খাটেনি, কিন্তু ওর সমস্ত পরিশ্রম বিফলে গেছে। তারপর যেদিন আমি বাগানের পেছনে লাগলাম (বরং বলা উচিত, লাগতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম সেদিন), তার কিছুদিন পর থেকেই বাগান আমায় দু-হাত ভরে সবজি উপহার দিয়ে আসছে।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি এই জমিটুকু কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি এমন লোভে পড়ে গেছেন, কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না এ-জমি। একটা কথা উনি জানেন না, ওঁর হাতে পড়লে আবার এ-জমি নিষ্ফলা হয়ে যাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। কারণ, বাগানে নতুন করে সার দেওয়ার

সময় হয়ে এল। তাই এই মুহূর্তে আমার ঠিক কী করা উচিত, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে জলদি একটা মীমাংসা করে ফেলা দরকার। কারণ, এমন চমৎকার সুযোগ আমি দ্বিতীয়বার পাব না।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। নিশ্চয়ই লোপার ফোন। কালও ঠিক এইসময় ও আমায় ফোন করেছিল। ও বোধহয় কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে আমার বাড়ি, গতকাল তো সেইরকমই আভাস দিল। লোপার একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে। হঠাৎ এক-একদিন ও কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে চলে আসে আমার কাছে। আমরা একসঙ্গে মিলে একটা গোটা নিরুদ্দিষ্ট দিন কাটাই। তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে কিছু রমণীয় স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে একসময় ও বাড়ি ফিরে যায়।

মহেশও ক'দিন থেকে ছুটি চাইছে—ওকে একটা দিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দেব ভাবছি।

কিন্তু লোপা কবে আসবে? আর কাউকে না জানাক, আমাকে নিশ্চয়ই ও আগে থাকতেই আভাস দেবে কবে আসছে! সেদিন রাতে ও আর বাড়ি ফিরবে না, শুরু হবে ওর নিরুদ্দিষ্ট জীবন। ঠিক যেমন করে শুরু করেছিল হরিশ সান্যাল আর লিলিয়ান পার্কার। আর কেউ না জানুক, আমি জানি ওরা এখন বেশ আরামেই আছে। লোপাও ভালো থাকবে, আমি নিশ্চিত।

শহর ছাড়িয়ে এক নিরিবিলি রাস্তার ধারে আমার বাড়ি। চারপাশে কয়েক ফার্লংয়ের মধ্যে আর কোনও বাড়ি চোখে পড়ে না। এককালে নাকি এটা কোনও এক জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল। তারপর ভুতুড়ে বাড়ি বলে একরকম পরিত্যক্ত হয়েই পড়ে ছিল অনেকদিন। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক এটা নামমাত্র দামে কিনে সারিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন, কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারেননি। তারপর বেশ কিছু ভাড়াটের হাতবদল হয়ে অবশেষে এটা আমার দখলে এসেছে (বলাই বাহুল্য, প্রায় বিনা ভাড়ায়!)। আমি তো এখানে দিব্যি আছি। কোনও গোলমাল নেই, উপদ্রব নেই, অথচ শহরের এত কাছে। মিনিট-সাতেক হাঁটলেই বড়রাস্তা, সেখান থেকে বাসে চেপে মাত্র আধঘণ্টায় শহর ছুঁয়ে ফিরে আসা যায়।

একা থাকি, লিখে যা আসে দিব্যি চলে যায়। কিন্তু সময় দিন-দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এভাবে আর বেশিদিন চলবে না। ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার তো ফুরিয়ে এল বলে!

হঠাৎ সশব্দে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। রিসিভারটা তুলে নিতেই গম্ভীর একটা যান্ত্রিক স্বর শুনতে পেলাম 'মিস্টার জয়দীপ সেনবর্মা?'

'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

'শুনুন, মিস্টার সেনবর্মা, আমি সোমনাথ সেলস এম্পোরিয়াম থেকে শর্মা কথা বলছি। গত সপ্তাহে আপনি আমার দোকানে যে-চেকটা দিয়েছিলেন, আপনার ব্যাঙ্ক সেটা ডিসঅনার করেছে। আপনি জেনে-শুনে...।'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার শর্মা। আসল ব্যাপারটা হল, গত শনিবার আমার অ্যাকাউন্টে একটা ড্রাফট জমা পড়েছে। সেটা ক্যাশ হতে অন্তত দুটো দিন তো সময় লাগবেই। আপনি এত তাড়াতাড়ি চেকটা ভাঙাবেন আমি বুঝতে পারিনি। তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখতাম।'

'আপনি আজ বিকেলে আসুন আমার দোকানে!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

হতভাগা হালদারবাবুটা পেমেন্ট নিয়ে এত ঘোরাল!

টেলিফোনটা আমি বসার ঘরে রেখেছি। ঘরটা প্রকাণ্ড। জমিদার-বাড়ির কিছু-কিছু নিদর্শন এখনও এ-ঘরে রয়ে গেছে। পশ্চিমদিকের দেওয়াল জুড়ে বেশ কিছু প্রাচীন অস্ত্রের সম্ভার : ঢাল, তলোয়ার, বর্শা—সবগুলোই লোহার তৈরি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পুরোনো ভারী এই অস্ত্রগুলোতে এককণাও মরচের স্পর্শ লাগেনি। দেওয়ালের ওপরদিকটা জুড়ে আছে একটা বিশাল দেওয়াল-ঘড়ি। রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে এটার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি শুনে এখনও আমার বুকের ভেতরটায় হঠাৎ এক-এক সময় কেমন যেন থমথম করে ওঠে। এইসব প্রাচীন আসবাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি ঘরটাকে সম্পূর্ণ আমার মনের মতো করে সাজিয়েছি। মেঝেতে কার্পেট, একটা সোফা-সেট, দেওয়ালের পূর্বদিকটা জুড়ে আছে একটা দেওয়াল-

আলমারি। আলমারিতে কিছু প্রাচীন মূর্তি আর আমার বাছাই করা কিছু বইয়ের সংগ্রহ। বইগুলো যে-আমলের, তখন আমার বইয়ের পাঁচ-ছ'টা মুদ্রণ হেসে-খেলে শেষ হয়ে যেত। আমার কাছে এখন এগুলোর মর্যাদা মূল্যবান প্রাচীন কিউরিয়োর সমান।

লেখার কাজে আমার বেশ কিছু বাতিক আছে। বেশি রাতে লিখতে পারি না, ক্লান্তিতে দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ভোরবেলা উঠে লিখতে বসলেই কেমন যেন অস্থির বোধ করি মনে-মনে, গুছিয়ে দু-লাইনও লিখতে পারি না। মনস্থির করে লেখা শুরু করতে-করতে বেলা গড়িয়ে যায়। সবাই যাকে বলে অফিস আওয়ার্স, আমার কাজের সময়ও মাত্র সেইটুকুই। তাই এ-সময়টাতে কেউ বিরক্ত করতে এলে স্বাভাবিক কারণেই অসম্ভব চটে যাই মনে-মনে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এ-লেখাটা আমায় শেষ করতে হবে। প্রকাশকের মুখের চেহারা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, এটাই হয়তো আমার শেষ বই। তাই এ-লেখার প্রতিটি লাইন এখন আমার কাছে মূল্যবান। সুচিন্তিত প্রয়াসের সঙ্গে আমি প্রত্যেকটি শব্দ বাছাই করে বাক্য গড়ছি। এ-বইটা বাজারে না চললে আমি একদম ডুবে যাব, আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না।

> *'...লোকটা উন্মত্তের মতো ছুটতে শুরু করেছে। গোধূলির নির্জন আঁধারের ছায়া নেমে এসেছে পাহাড়ি বনাঞ্চল ঘিরে। গুলিবিদ্ধ বাঁ-কাঁধটা ক্রমাগত জ্বলছে একটা...।'*

সদর দরজার বেল বেজে উঠল। মহেশপ্রসাদ। মহেশ আজ আসতে বেশ দেরি করে ফেলল। যাক, তবু একটু চা পাওয়া যাবে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। মহেশ নয়, অপরিচিত এক ভদ্রলোক। আমার জিজ্ঞাসু চাউনির উত্তরে তিনি জানালেন, 'আপনার মিটার রিডিংটা...।'

'আসুন।'

সদর দরজা পেরিয়ে একটা মস্ত উঠোন। উঠোন পার হয়ে বসার ঘরে ঢোকার মুখে মিটারটা দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। ভদ্রলোক এগিয়ে যেতে-যেতে আলাপ জমাবার সুরে বলে ওঠেন, 'অক্টোবর শেষ হতে চলল, তবু দেখুন, বৃষ্টি থামার নাম নেই। কোনও মানে হয়?'

শব্দটা কানে এসে যেতেই আমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠি, 'বাঁ-কাঁধটা ক্রমাগত জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো।'

'কী বললেন?'

'কিছু মনে করবেন না, আমার একটা বিশেষ জরুরি কাজ আছে।'

আহত দৃষ্টিতে চকিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক মিটারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বসার ঘর, তারপর আরও দুটো ঘর পেরিয়ে অবশেষে বাড়ির শেষপ্রান্তে আমার কাজের ঘর। চেয়ারে বসে দ্রুত হাতে কলমটা তুলে নিই।

কিছুক্ষণ পর মহেশ এল। বৃদ্ধ মহেশের ওপর আমার বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব আমি ন্যস্ত করেছি। বয়সের ভারে লোকটা ঈষৎ নুয়ে পড়েছে, তা ছাড়া কানেও বেশ কম শোনে। ধীর কিন্তু বিশ্বস্ত হাতে মহেশ আমার ঘর ঝাড়ে, কাপড় কাচে, রান্না করে রাখে। তারপর সন্ধ্য হওয়ার মুখে এই মন্থর লোকটাই হঠাৎ কেমন যেন করিৎকর্মা হয়ে ওঠে—চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে ত্রস্তপায়ে বিদায় নেয় আমার কাছ থেকে। তবু শেষপর্যন্ত একমাত্র মহেশই টিকে থাকতে পারল আমার কাছে, এই আতঙ্কময় ভৌতিক প্রাসাদে।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে মহেশ চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় আমার দিকে। চা-টা মন-মতো হলে আমার লেখার মেজাজ খুলে যায়। কিন্তু এ যেন পয়সা ছুড়ে হেড-টেল খেলার মতো, কোনওদিনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না কী পড়বে। কাপটা তুলে মুখে ছোঁয়াতেই মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে আমার।

'মহেশ, এটা কী হয়েছে?' আমি বিকৃত স্বরে হাঁক পাড়ি।

'আজ্ঞে মেঘলা ছিল, বেলা বুঝতে পারি নাই।' ওর দু-গাল জুড়ে প্রশস্ত হাসি নিঃশব্দে উপছে পড়ছে।

বললাম, 'চা-টা একবার গলায় ঢেলে দেখো।'

'আজ্ঞে?'

'নাঃ, মেজাজটাই নষ্ট হল!'

'কষ্ট? সেই বুকের কষ্টটা আবার?'

মহেশ ওর কাজ ফেলে উঠে আসে। অন্তত আধঘণ্টা ধরে ও এখন আমায় বিস্তারিত করে বোঝাতে থাকবে, কেমন করে আমি অযত্নে আর অবহেলায় মাত্র পঁয়ত্রিশেই শরীরটা নষ্ট করে ফেললাম।

'...লোকটার পিছু-পিছু ধাওয়া করে আসছে ক্লান্তিহীন এক অশ্বক্ষুরধ্বনি। বন্য প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে ওরা লোকটাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে চায়...।'

টেলিফোনটা বাজতে শুরু করেছে কিছুক্ষণ থেকে। আমি লিখে যেতে থাকি, '...ওদের নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের —ইতিহাসের...।'

আমি মরিয়া হয়ে শব্দ খুঁজে হয়রান হই মনে-মনে। টেলিফোনটা একটানা বেজে চলেছে। অবশেষে মহেশও অধৈর্য হয়ে হাঁক পাড়তে শুরু করে। বিরক্ত হয়ে আমি কলমটা ছুড়ে ফেলে দিই টেবিলে।

'কে, দীপ?'

'ও, লোপা তুমি! কী খবর বলো?...ভালো আছ তো? এক সপ্তাহ তোমার কোনও খবর নেই।'

'ওদের নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের সমস্ত নৃশংস আচরণকে লজ্জা দেবে।'—বাক্যটা মাথায় আসতেই আমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম।

'কী বললে, কী দেবে?'

'শোনো লোপা, আমি একটা মানসিক ভারসাম্যের খেলা খেলছি। একদিকে আমি একা, অন্যদিকে তোমরা সবাই। খেলাটায় আমায় জিততেই হবে।'

একটা উচ্চকিত সুরেলা হাসি আমার রিসিভার বেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল : 'তুমি একটা পাগল!...আমার জন্মদিনের কথা মনে আছে তো?'

'সে তো কাল!'

'গতবারের মতো এবারেও ভুলে যেয়ো না কিন্তু!'

'শোনো লোপা, আমার কাজের সময়টুকুতে তুমি কিন্তু ফোন করবে না কথা দিয়েছিলে।'

ক্ষণিকের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল আমার ঘরে।

'ঠিক আছে, আর কোনওদিন করব না।' লোপার উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর ম্রিয়মান হয়ে এসেছে।

'লোপা, তুমি কী করছিলে বলো!'

'দিন-দিন তুমি পালটে যাচ্ছ। ঠিক আছে, কাল তুমি আসতে না পারলে, এখনই আমায় জানিয়ে দাও।'

'শোনো লোপা, তোমার জন্মদিনে আমি নিশ্চয়ই যেতে চাই। কিন্তু আমাকে বইটাও শেষ করতে হবে। তুমি তো জানো, লেখাই আমার পেশা। এটা ঠিকমতো না চললে আমার খাবার জুটবে না।' গলার স্বরে একটা শুকনো গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুললাম আমি।

'তুমি...তুমি একটা—।' ওর চোখজোড়া বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি।

'লোপা!'

'আমি আর কোনওদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না!'

তার মানে, আমার কালকের দিনটাও গেল। কাল সারাটা দিন চলে যাবে ওর রাগ ভাঙাতে। লোপাটা চিরদিনই একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল। বয়স বাড়লেও ওর স্বভাব একটুও পালটাল না।

'...লোকটা এতক্ষণে বুঝতে পারছে, গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো। সুনিপুণ কৌশলে ফাঁদ পেতেছিল ওরা, কিন্তু সাহস আর বুদ্ধিমত্তার খেলায় কোনওদিনই কেউ ওকে হারাতে পারেনি। আজও তাই...।'

মহেশ আবার হাঁক পাড়তে শুরু করেছে। অর্থাৎ, ও এখন বাজারে যাবে। এবার আমি উঠে সদর দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত ও কিছুতেই নড়বে না, এ আমি ভালো করেই জানি।

আজ মঙ্গলবারের সকালটা সম্পূর্ণ নষ্ট হল। সাতবার টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিতে হল...দরজা খুলে দিতে উঠলাম অন্তত দশ-বারোবার। এ ছাড়াও আমার মহেশপ্রসাদ রয়েছে হাতের কাছেই। মহেশ কানে কম শোনে ঠিকই, সেজন্যে আমি ওকে খুব একটা দোষ দিই না। কিন্তু অতিরিক্ত কথা বলে ও সেই অভাবটুকু পূরণ করে নিতে চায়। সবকিছুর ফলশ্রুতি হিসাবে সারা সকালে আমার লেখা এগোল মাত্র একপৃষ্ঠা। আমি কোনওদিনই খুব একটা তাড়াতাড়ি লিখতে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সারাদিনে একপৃষ্ঠা! এ ভাবাই যায় না।

দুপুরে সোমনাথ সেলস এম্পোরিয়াম থেকে ঘুরে এলাম। বাড়ি ফিরে গুছিয়ে লিখতে বসতে-বসতে সন্ধ্যা হয়ে এল, মহেশ ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে ওর সারাদিনের কাজ সেরে।

'...পাহাড়ি অরণ্যে বৃষ্টির ঢল নেমেছে। চারদিকে জমাট আঁধার। লোকটা ক্রমশ ঘন অরণ্যে ঢুকে পড়তে থাকে। সেই দুরন্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি...।'

দরজায় বেল বেজে উঠল।

'...এতক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। অরণ্যের গভীরতা যতই বাড়ছে, অশ্বচালনাও ততই কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমশ...।'

দরজার বেলটা বেজে যেতে থাকে একঘেয়ে শব্দ তুলে।

'...একটা গাছতলায় বসে পড়ল লোকটা। এই অন্ধকারের আড়ালে ও একটু বিশ্রাম করে নিতে চায়। ওর বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে।'

অবিরাম শব্দে বেল বেজে চলেছে। আমি মরিয়া হয়ে লিখে যাই—।

'...চকিতে অন্ধকার ফুঁড়ে একটা আলোর বর্শা ঘুরে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। অর্থাৎ—।'

অর্থাৎ, হতচ্ছাড়া বেলটায় সাড়া দিতেই হল। দরজার ওপাশে আমার জন্যে একজোড়া বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হরিশ সান্যাল (অবশ্য ও নিজেকে পরিচয় দেয় হ্যারি স্যানিয়েল বলে) আর ওর সঙ্গে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওদের মোটরবাইকটা।

সান্যাল এককালে আমার কলেজের বন্ধু ছিল। বন্ধু বলাটা ভুল হল, আমি কোনওদিনই ওকে ঠিক সহ্য করতে পারতাম না। অল্পবয়সে ও নাকি একবার স্টেটসে ছিল কয়েক মাস। সেই কয়েক মাসের ছাপকে ও চিরজীবনের মতো সঙ্গী করে নিয়েছে। সবসময় নিজেকে ও একটা কেতাদুরস্ত মোড়কে মুড়ে রাখে। মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে ওর মতো কুশলী আমি দুটি দেখিনি। একটা উন্নাসিক নিস্পৃহতায় নিজেকে সবসময় আড়াল করে রেখেছে সবার থেকে। ফলে কারও সঙ্গেই ওর বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি।

মেয়েটিও আমার চেনা। কোথায় যেন একবার আলাপ হয়েছিল, সম্ভবত সান্যালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে, ওর গলার স্বরটা অসম্ভব রকমের সরু অথচ সুরেলা। ঠিক তারার পঞ্চমে সুর বেঁধে গান গাওয়ার মতো। বিরক্তিতে মাথা ধরে যায় অল্পক্ষণেই।

'জয়, কী খবর তোর?' সান্যাল হাত বাড়িয়ে দিল।

'আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?' মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে খানিকটা ঘনিষ্ঠ স্বরে জানতে চায়।

হ্যাঁ, করলেন।...প্রায় বলে ফেলেছিলাম। সামলে নিয়ে বলি, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ওরা দুজন হাত-ধরাধরি করে আমার দরজার এপাশে পা রাখে।

'দাঁড়া, একটু কফি করি।'

'হ্যাভেনট গট আ ড্রিঙ্ক, ওল্ড বয়?'

'হ্যারি, তুই তো জানিস, ড্রিঙ্কস-ফ্রিঙ্কস আমার পোষায় না। ব্র্যান্ডি আছে, চলবে?'

'নাইস ফর দ্য ওয়েদার।'

গত সপ্তাহে কিনেছিলাম এই মস্ত বোতলটা। ডাক্তারের পরামর্শমতো আমায় রোজ একটুখানি করে ব্র্যান্ডি খেতে হয় নিয়মমতো। দুটো গ্লাসে পানীয় ঢালতে-ঢালতে সান্যালকে বললাম, 'তোরা বোস, আমি একটু আসছি।'

'...অর্থাৎ শত্রু এসে পড়েছে নাগালের মধ্যে। আতঙ্কে হিম হয়ে লোকটা গাছের আড়ালে মিশে যেতে চাইল। কিন্তু লোকটাকে ওরা খুঁজে বার করবেই। তিনটি শক্তিশালী টর্চ অন্ধকারময় ওকে খুঁজে ফিরতে থাকে...।'

'জয়, শোন।'

আমি ততক্ষণে বসার ঘরের দরজা পেরিয়ে গেছিলাম, সান্যালের ডাকে ফিরে দাঁড়াতে হল।

'তুই কি দিন-রাতই লিখিস? আমাদের একা ফেলে...।'

'লেখা নয়, এমনি একটু ও-ঘরে যাচ্ছিলাম।'

'য়্যু মাস্ট হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক উইথ আস।'

সান্যাল ততক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে এসে আমায় ধরে টানতে শুরু করেছে। ওর মুখে বেশ গন্ধ। কিছুক্ষণ আগে সদর দরজাটা খুলে ধরতেই এ-গন্ধটা আমার নাকে এসে ধাক্কা মেরেছিল, মেয়েটির মুখ থেকেও একই গন্ধ ভেসে আসছিল। ওদের গলার স্বর, পদক্ষেপ, সবই তাই কেমন যেন শিথিল।

বাধ্য হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হল। এই মুহূর্তে ওর যখন গোঁ চেপেছে, তখন থামাতে যাওয়া বৃথা।

গ্লাসে পানীয় ঢালতে-ঢালতে আমি মেয়েটিকে বললাম, 'আপনার নাম তো ল্যুইসি?'

'লিলি, লিলিয়ান পার্কার। লিলি টু মাই ফ্রেন্ডস!' বিশৃঙ্খল স্বরে মেয়েটি বলে ওঠে।

আমি নিঃশব্দে ওর দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিই।

'আপনার লেখা এখন কেমন চলছে?'

'চলে যাচ্ছে একরকম।' আমি নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিলাম।

'সেই তো খ্যাপাটে মঙ্গলবাসীদের নিয়ে গল্প, তাই না জয়!'

কথা বলতে-বলতে এক চুমুকে মস্ত একঢোক পানীয় গিলে ফেলে সান্যাল। আমি বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ওর দিকে।

'লিলি তোকে কিছু বলেছে?'

'কী বলবে?'

'আমাদের কথা। বলেনি এখনও?'

প্রথম থেকেই ওদের ওপর আমার বিন্দু-বিন্দু বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিল। নিরুৎসাহের দৃষ্টি মেলে আমি চেয়ে থাকি ওদের দিকে। সান্যাল মস্ত একঢোক পানীয় আত্মসাৎ করে ফেলে এক চুমুকে, কম্পিত হাত বাড়িয়ে লিলিয়ানের বাঁ-হাতটি টেনে নেয় কোলের ওপর। ওদের কারও মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

'লিলির হাজব্যান্ড একটা ব্রুট, আ লাউসি বিস্ট!' হঠাৎ সোফায় গা এলিয়ে দেয় সান্যাল। চোখ বুজে নেশাগ্রস্তের মতো বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'লিলি, মাই ডার্লিং, আই লাভ য়্যু।'

'আমরা তাই পালাচ্ছি।' লিলিয়ানের নির্লজ্জ নিরাসক্ত জবাব ভেসে আসে।

হঠাৎ সচকিত হয়ে সোফায় উঠে বসল সান্যাল, 'ইয়েস, উই আর ইলোপিং, দিস ভেরি ডে। নোংরা জানোয়ারটা লিলির লাইফ হেল করে দিয়েছে।...আমরা অনেক দূরে চলে যাব—ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট ফিলদি বাস্টার্ড।' আবার সোফায় মাথা এলিয়ে দেয় সান্যাল, হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় লিলিয়ানকে। বিজড়িত স্বরে বলতে থাকে, 'লিলি, ডার্লিং! আই মাস্ট প্রেজেন্ট য়্যু আ হেলদি হিউম্যান লাইফ।'

ঘরে আমার অস্তিত্ব ভুলে যেতে ওদের সময় লাগে না।

এই হল ওদের হেলদি হিউম্যান লাইফ, চোখের সামনেই জীবন্ত দৃষ্টান্ত ভাসছে। বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এদিকে লেখাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঝুলে আছে।

'আমি একটু আসছি।' সোফা ছেড়ে আবার আমি উঠে পড়লাম।

'...লোকটা হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। এখানে বসে থাকলে লোকগুলো ওকে ধরে ফেলবেই। একরাশ অস্পষ্ট পদশব্দ ওকে ধাওয়া করে আসছে। ওদের কাছে রয়েছে শক্তিশালী টর্চ, পিস্তলে গুলি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। লোকটা আলো

আর গুলি এড়াতে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করে। পায়ের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে আসছে, লোকটাকে ওরা এইবার ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় লোকটার, ঝাঁকুনি দিয়ে ওর শরীরটা বেগে নীচে নেমে যেতে থাকে। খাদ। একটা আর্ত চিৎকার...।'

'য়্যু আর গোয়িন টু হেলপ আস, ওন্ট য়্যু?' লিলিয়ান সোফা ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরল হঠাৎ।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বিরক্তি চেপে আবার সোফায় এসে বসলাম।

'জয়, দিনের আলোয় আমরা কোথায় যাব? তাই তোর কাছে এসে পড়লাম। অন্ধকার নেমে গেলে আমরা কোনও দূরপাল্লার বাসে চেপে পালিয়ে যাব।'

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। ইচ্ছে হল, জানলার বাইরে আঙুল তুলে ওদের দেখিয়ে দিই, কিন্তু ওরা এখন দেখেও দেখবে না, আমি নিশ্চিত।

'তোর বাইকটা কী দোষ করল? ওটায় চেপেই তো পালাতে পারতিস!'

'দে উইল গেট আস, য়্যু ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড? লিলির হাজব্যান্ড পুলিশে খবর দেবেই—অ্যান্ড দে হ্যাভ গট রেডিয়ো লিঙ্ক বিটুইন দেম। ওরা আমার বাইকটাকে রাস্তাতেই ধরে ফেলবে। আই মিন দ্য রোড প্যাট্রল।' জড়িত স্বরে সান্যাল ঝিমোতে-ঝিমোতে আমায় জানাল।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, ও এখন পুরোপুরি স্বাভাবিক নেই—বেশ খানিকটা মত্ত, বেসামাল হয়ে পড়েছে।

'তুই ভুলে যাচ্ছিস, সান্যাল, এটা ইংরেজি ছবি নয়, ভারতবর্ষ!' তিক্ত গলায় আমি ওকে ধমক দিয়ে উঠি।

'আফটার অল, খোলা গাড়ি, সবাই দেখতে পাবে। তাই ভাবলাম...।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই সান্যালের প্রমত্ত দেহটা শ্লথভাবে এলিয়ে পড়ে সোফার আরামদায়ক গদিতে।

লিলিয়ান নির্জীব হাতে ওকে সামান্য ঠেলা দেয় : 'হ্যারি ডিয়ার, ঘুমিয়ে পোড়ো না। সব কথা ওকে খুলে বলো, সো দ্যাট হি ক্যান হেলপ আস।'

'কথা বলব? কী কথা?...আই লাভ য়্যু লিলি ডার্লিং, হোয়াই ডোন্ট য়্যু কাম ক্লোজ?'

সান্যালের সন্ধানী ডানহাতখানি লিলিয়ানের শিথিল শরীরময় কী যেন খুঁজে ফেরে।

'...একটা আর্ত চিৎকার ওর পাশ দিয়ে চকিতে নীচে নেমে গেল। হঠাৎ শরীরে কীসের স্পর্শ লাগতেই পড়তে-পড়তেও মুহূর্তে ওর হাত দু-খানি তৎপর হয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর পড়ন্ত শরীরখানি থমকে যায়। ওর শক্ত দুই মুঠিতে আটকে গেছে ততোধিক শক্ত কিছু পাহাড়ি চারাগাছ। পায়ের নীচে অতল খাদ, মাথার ওপর সীমাহীন কালো আকাশ, এভাবে ও কতক্ষণ ঝুলে থাকতে পারবে...?'

কিন্তু তারপর? এই মুহূর্তে আমি গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছি না। একটা অস্পষ্ট আক্রোশ আমাকে কুরে-কুরে খেতে থাকে।

এইসব তথাকথিত উঁচু মহলের মানুষগুলো এক জীব! অপরের স্ত্রীকে নিয়ে পালাবে, তাও রীতিমতো মত্ত হয়ে! ঘোর কেটে গেলে বোধহয় পালাবার কথাটাই ভুলে যাবে ওরা।

ওদের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে আমি ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যতের কথা, আজকের সারাদিনটির কথা।

সকালে লেখা শুরু করার মুখেই সেই মিটার-রিডার লোকটা এসে গোলমাল শুরু করল। তারপর একঘণ্টার মধ্যেই লোপার ফোন পেলাম দু-দুবার। কাজের সময় ফোন করার জন্য মাপ চেয়ে, ও আরও একবার ফোন করেছিল—তাও সেই কাজের সময়ের মধ্যেই। তারপর ধোপা আসতে মহেশপ্রসাদ তুমুল হইচই বাধিয়ে দিল, কাপড়ের হিসেবে নাকি কীসব গোলমাল হয়েছে। পুজোর চাঁদার আশায় হানা দিল চার-পাঁচটি দল। এইভাবে একের পর এক বিপত্তি আসতেই লাগল সারাটা সকাল। সবার ওপরে রয়েছে আমার মহেশপ্রসাদ, ওর অনুযোগ আর অভিযোগের শেষ নেই। সারা সকালে লিখলাম মাত্র একপৃষ্ঠা।

চোখের সামনে ঘুরছিল আমার প্রকাশকদের মুখগুলো। দেখা হলেই আজকাল ওরা হঠাৎ খুব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। (অথচ মাত্র ক'বছর আগেও আমার এই বাড়িতেই ওরা ছুটোছুটি করেছে নিয়মিত)। গতকাল বিকেলে গেছিলাম হালদারবাবুর (বর্তমানে আমার একমাত্র প্রকাশক) ওখানে। লোকটা কেমন করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দ্যাখে আজকাল আমায়। (অথচ নোংরা আর নিচু চরিত্রের এই লোকটাকে কোনওদিনই আমি সহ্য করতে পারতাম না।)

সন্ধ্যায় লেখা শুরু করলাম। মাত্র চার লাইন না লিখতেই এই হতভাগা...হতচ্ছাড়াগুলো এসে উপস্থিত হল।

বিশ্বাস ছিল, আমার এই শেষ লেখাটা ঠিক লেগে যাবে, আবার আমি ফিরে আসতে পারব লেখার জগতে। কিন্তু এভাবে চললে দেখছি লেখাটাই শেষ হবে না। এদিকে ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার তো প্রায় নিঃশেষ। এই লেখাটা সময়ের মধ্যে শেষ না হলে প্রকাশই করতে পারব না, টাকার তো প্রশ্নই নেই।

একটা বিজাতীয় আক্রোশ নিয়ে অমি ওদের দিকে চেয়েছিলাম। মাতাল দুটো পশুর মতো এ-ওর গায়ে ঢলে পড়েছে।

লিলিয়ান হঠাৎ সামান্য নড়েচড়ে বসে, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চায়।

'হ্যারি ডিয়ার, আমার ভয় করছে। ওই দেখো, ওই বর্শার ফলাটা কেমন যেন নড়ছে দেওয়ালে একটা সাপের মতো পাক খাচ্ছে এঁকেবেঁকে। ও গড, নো—।'

দেওয়ালে ঝোলানো স্থির বর্শার ফলাটার দিকে চাইতেই হঠাৎ একঝলক রক্ত উঠে যায় আমার মস্তিষ্কে, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। চকিত সঙ্কল্প মাথায় নিয়ে আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

বেল বেজে উঠতেই দরজা খুলে ধরলাম। আগন্তুক ইন্সপেক্টর সোম আমার চেনা লোক।

'আপনাকে একটুখানি বিরক্ত করতে এলাম।'

'আমার সৌভাগ্য। আসুন।'

বসার ঘরে সোফায় বসতে-বসতে ইন্সপেক্টর সোম জানতে চাইলেন, 'হরিশ সান্যালকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, আলাপ আছে সামান্য।'

'আচ্ছা, মাস-দেড়েক আগে উনি কি আপনার বাড়ি এসেছিলেন কোনওদিন?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। ওর সঙ্গে সেদিন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলাও ছিলেন।'

'ভদ্রমহিলা? তার নাম কি মিসেস লিলিয়ান পার্কার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'শুনুন, ব্যাপার হল, মিস্টার সান্যাল এই ভদ্রমহিলাকে ইলোপ করেছেন। মিস্টার পার্কারের অভিযোগের উত্তরে আমরা অনুসন্ধান করে একটি চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার করেছি। বাইকটি মিস্টার সান্যালের। আপনার বাড়ির কাছাকাছি বাসস্টপের পাশে এক ঝোপের আড়ালে ওটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ওটা চুরি যায় এবং তারপর দু-তিন হাত বদল হয়ে শেষপর্যন্ত গত সপ্তায় ওটা আমাদের দখলে এসেছে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে আপনি কী জানেন, আমায় খুলে বলুন।'

'আপনি হয়তো সান্যালের বদনামের কথা শুনে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, মাত্রাতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করতেন ভদ্রলোক।'

'সেদিনও প্রায় মত্ত অবস্থায় ওরা আমার বাড়ি এসে উঠেছিল। কথায়-কথায় ও আমার কাছে জানতে চাইল, এখানকার হাইওয়ে দিয়ে কোন-কোন বাস কোথায় যায়। প্রশ্নটায় সামান্য খটকা লাগলেও আমি ওটাকে মাতালের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিই। তারপর ঘণ্টাখানেক এলোমেলো গল্প করে ওরা চলে গেল। আমি লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায়, ওদের নিয়ে আর একদমই মাথা ঘামাইনি।'

ইন্সপেক্টর সোম চেনা লোক হলেও আমার বাড়ি উনি এই প্রথম এলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা নানান গল্পে মেতে উঠলাম। সোম আমায় জানালেন, মিস্টার পার্কার নাকি শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার খাতিরে পুলিশে

একটা খবর পাঠিয়েছিলেন। ফলে অনুসন্ধানের কাজটাও উনি নিয়মরক্ষার মতো করেই সারছেন। গল্প করতে-করতে হঠাৎ ওঁর চোখ পড়ে যায় দেওয়ালে ঝোলানো লোহার অস্ত্রগুলোর দিকে।

'আপনার অ্যান্টিক কালেকশানের ঝোঁক আছে দেখছি। ওগুলো কতদিনের পুরোনো?'

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেওয়ালে বর্শার ফলাটা কি হঠাৎ একটু নড়ে উঠল?

অপ্রতিভ বিজড়িত স্বরে আমি জানাই, 'একশো বছর।'

'অদ্ভুত তো! লোহার জিনিসগুলোতে এতটুকু মরচে ধরেনি।' কথা বলতে-বলতে ইন্সপেক্টর দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন 'আরে, এটা কী? এই বর্শার ফলাটা দেখুন। এটার ডগার বাঁ-দিকটায় একরাশ মরচে—কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। এর অর্থ কী?'

ইন্সপেক্টরের গলার স্বরে কি সন্দেহ? আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে...গলা শুকিয়ে আসছে। আমার দিকে চেয়ে উনি অমন করে কী দেখছেন? ঘরে এতসব জিনিস থাকতেও বেছে-বেছে ওই বর্শার ফলাটার দিকেই ওঁর নজর গেল! (অথচ ওখানেই তো আরও সাত-আটটা অস্ত্র রয়েছে!) ইন্সপেক্টর আমায় খেলাচ্ছেন না তো?

বর্শার ফলাটা যেন নড়ছে দেওয়ালে, সাপের মতো পাক খাচ্ছে এঁকেবেঁকে। আমি কি ভুল দেখছি? ঘোলাটে চোখ মেলে আচ্ছন্নের মতো ওটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি।

'সাবধান!' ইন্সপেক্টর সোম আমায় সজোরে ধাক্কা মারলেন।

আমার বাঁ-কাঁধ আর ইন্সপেক্টরের ডান কবজি আহত করে ফলাটা চকিতে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। চোখের সামনে ফিনকি দিয়ে একটা রক্তস্রোত ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। রক্ত-লাল এ-স্রোতটা আমার চেনা।

জ্ঞান ফিরে পেতে ইন্সপেক্টর জানালেন, অস্ত্রটা উনি হাতে নিয়ে দেখবেন বলে দেওয়াল থেকে খুলতে গেছিলেন, হঠাৎ কীভাবে ওটা হাত থেকে ছিটকে খসে পড়েছে।

তিনমাস কেটে গেছে, সেই লেখাটা আর শেষ হল না। অলস প্রহরগুলো এমন শ্লথভাবে কেটে যায়। নির্জীব বাঁ-হাতটা বয়ে আমি প্রাসাদময় ঘুরে বেড়াই সময়ে-অসময়ে। বসার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাই মহেশপ্রসাদ বাগানে কাজ করছে একমনে। মহেশের সবজি-বাগানের খুব শখ। আমার নিষ্ফলা জমি ওকে এতদিন একটানা ঠকিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন আর ওর কোনও ক্ষোভ নেই। বাগানের অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবান সবজিগুলো দেখে মনে হয়, ওগুলো সব জীবন্ত—মাটি থেকে জৈব রস টেনে নড়ে-চড়ে কেমন বেড়ে ওঠে ওরা।

বসার ঘরের দেওয়ালে লোহার অস্ত্রগুলোর মাঝখানে একটা ফ্যাকাশে লম্বাটে দাগ স্থির হয়ে আছে। মহেশ জানে না, আমার জমির নীচে শুয়ে একটা ভারী লোহার বর্শার ফলা। সার হিসাবে ওটার কোনওই মূল্য নেই, তবে রক্তসারের স্পর্শ পেয়ে ওটার চারদিক কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে, ফলার তীক্ষ্ন ডগাটার চারপাশে জমে উঠেছে একরাশ মরচে।

মাসিক রোমাঞ্চ

মে, ১৯৮২



অগ্নিশুদ্ধ

বিমল কর

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চায়ের স্টলে আলাপ। পর-পর দিন-তিনেক চোখাচুখি হওয়ার পর একদিন ভদ্রলোক বললেন, 'বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কোন বাড়িতে উঠেছেন?'

'সুষমা লজে। বিনোদবাবুর বাড়ি।'

'বুঝেছি। দত্তরায়ের বাড়ি। তেঁতুলগাছগুলোর কাছাকাছি, এল টাইপের বাড়ি, তাই তো?'

মাথা নাড়লাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম প্রমথ বকশি। এখানকার লোক আমায় হাবুলদা বলে ডাকে। হাবুল আমার ডাকনাম। আমি এখানকার লোকাল লোক।'

এক-একজন মানুষ আছে যাদের দেখলে শিষ্ট ভদ্রজন বলে মনে হয়। প্রমথবাবুকে আমার সেইরকম লেগেছিল। বয়েস পঞ্চাশের ওপরেই হবে। পঞ্চান্নর তলায়। ছিপছিপে গড়ন। মাথার চুল বারোআনাই সাদা হয়ে গিয়েছে। এতটা সাদা না হলে পঞ্চাশের কাছাকাছি ফেলা যেত ভদ্রলোককে। মুখে বয়েসের তেমন কোনও ছাপ নেই। চোখে অবশ্য দোতলা চশমা।

'একদিন আসুন না আমার বাড়ি,' প্রমথবাবু বললেন।

'যাব।'

'যাব নয়, আসুন।...আমি থাকি আশ্রমের দিকে। আমার বাড়ির কোনও নাম নেই। আগে লোকে বকশিবাড়ি বলত, এখন বলে হাবুলবাবু কো কোঠি। চলে আসুন, কোনও অসুবিধে হবে না। আশ্রমের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করবেন কাউকে, বলে দেবে। দেখবেন গেটের সামনে দুটো ইউকেলিপটাস গাছ আছে।'

আলাপ-পরিচয়ের প্রথম পর্ব সারা হয়ে গেলে আমরা দুজনে প্ল্যাটফর্মে খানিকটা পায়চারি করলাম। তখনই কথায়-কথায় জানালাম, আমি হাঁপানির রোগী। একসময় সেটা সেরে গিয়েছিল একরকম, বছর-দুই আগে আবার ভীষণ হয়ে দেখা দিল। তারপর মাঝে-মাঝেই ভোগাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেছিল, কিছুদিন শুকনো জায়গায় বেড়িয়ে আসুন। পুজোর এই সময়টা ভালো।

তাই বিজয়া দশমী পর্যন্ত বাড়িতে কলকাতায় কাটিয়ে এখানে এসেছি, কালীপুজোর আগে-আগে ফিরব। সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুজনই কলকাতায় তাদের ঠাকুমার সঙ্গে রয়েছে। মামারা দেখা-শোনা করছে সব।

প্রমথবাবু হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েকে রেখে এলেন? ওরাই তো বেড়াবে।'

বললাম, 'মেয়ে আসতে চেয়েছিল। ছেলে এল না। ছুটির পরই পরীক্ষা। তা ছাড়া মাকে একলা বাড়িতে রেখে আসি কেমন করে?'

'তা ঠিক,' প্রমথবাবু মাথা নাড়লেন।

আর খানিকটা পায়চারি সেরে প্রমথবাবু বিদায় নিলেন : 'কালই আসুন। আসছেন তো? তাহলে সন্ধের চা আমার ওখানেই খাবেন। স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।'

সম্মতি জানালাম।

পরের দিন শেষ বিকালে বকশিবাড়িতে গিয়ে হাজির। তখন বিকেল বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চারদিক ঝাপসা। অন্ধকার হয়ে আসছিল তাড়াতাড়ি।

সঙ্গে পূর্ণিমা ছিল।

বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পূর্ণিমা বলল, 'এ কেমন বাড়ি গো?'

বাড়িটা অদ্ভুত নয়, কিন্তু তার ছাঁদ আলাদা। গোলমতন দেখতে। মাথায় খড়ের ছাউনি। পুরোনো হয়ে কালচে দাগ ধরেছে খড়ে। ঝাপসা অন্ধকারে কালোই দেখাচ্ছিল। সামনে, পাশে বাগান। কুয়োটাও দেখা যাচ্ছিল একপাশে।

একটা লোককে দেখতে পেয়ে বললাম, 'বকশিবাবুকে বলো এক বাবু আর মা এসেছেন।'

লোকটা ভেতরে গিয়ে খবর দিতে-না-দিতেই প্রমথবাবু বেরিয়ে এলেন : 'আসুন, কৃষ্ণবাবু। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। আসুন, মিসেস রায়।'

পূর্ণিমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম প্রমথবাবুর।

উনি তামাশার গলায় বললেন, 'একজন কৃষ্ণ, অন্যজন পূর্ণিমা—! এ যে একেবারে উলটো ব্যাপার।'

আমি হেসে বললাম, 'আমি কেন কৃষ্ণ বুঝতেই পারছেন। আমার গায়ের রং আর ছাতার কাপড়ের রং প্রায় একইরকম।'

পূর্ণিমা কিছু বলল না, কিন্তু বুঝলাম—সে আড়চোখে আমায় দেখল।

প্রমথবাবু হেসে উঠলেন। জোরে নয়। বললেন, 'খানিকটা বাড়াবাড়ি হল। আসুন, বসবেন চলুন।'

গোল বাড়ির নকশাটা বেশ। মনে হয়, বাড়ির মাথার ওপর যেন মস্ত একটা শামিয়ানা চাপানো। মানে, ওইরকম দেখতে খানিকটা। বারান্দার সবটাই ঢাকা। রোদ আসার অবশ্য অসুবিধে হয় না। জল-বৃষ্টিও আসে নিশ্চয়। তবু মাঝামাঝি জায়গাটায় বোধহয় রোদ-জল আসতে পারে না। সেখানে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বেতের চেয়ার-টেবিল। আলো দেওয়ালের দিকে। খড়খড়ি আর কাচের পাল্লা দেওয়া তিনটে দরজা তিন ঘরের। বারান্দার একদিকে পাখির খাঁচা। অন্যদিকে একটা কুকুর বাঁধা আছে।

কুকুরটা বারদুয়েক নিচু গলায় ডেকে থেমে গেল। বোধহয় বুঝল, আমরা প্রমথবাবুর অতিথি। হাঁকডাকের দরকার নেই।

'বসুন, মিসেস রায়। আপনি বসুন, কৃষ্ণবাবু।'

আমরা বসলাম।

বাতি জ্বালিয়ে দিলেন প্রমথবাবু, বললেন, 'আলো জ্বালালাম। কিন্তু কতক্ষণ জ্বলবে বলতে পারছি না। আপনাদের কলকাতার চেয়েও খারাপ অবস্থা।'

কথাটা একরকম ঠিকই। এখানে ইলেকট্রিসিটি আসে আর যায়। কখন যে আসে, কখন যায়, বোঝাই যায় না। শুনেছি, জঙ্গল-টঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের তার এসেছে বলে ঝড়ে-জলে প্রায়ই তার গন্ডগোল হয়।

সঠিক জানি না।
'আপনি বসবেন না?'
'বসব।...ভেতরে একবার খবর দিয়ে আসি।'
আমি পূর্ণিমার দিকে তাকালাম। অর্থাৎ, সে কি ভেতরে গিয়ে প্রমথবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়?
পূর্ণিমা কিছু বলল না।
প্রমথবাবু চলে গেলেন।
পূর্ণিমা বলল, 'অনেক পুরোনো বাড়ি, তাই না?'
'পুরোনো তো নিশ্চয়।'
'কী করেন ভদ্রলোক?'
'তা জানি না।'
'অনেক গাছপালা রেখেছেন বাড়ির চারদিকে।'
'এতটা জায়গা, ভালোই তো।'
'ভদ্রলোককে অনেকটা আমাদের বিজয়দার মতন দেখতে।'
'বিজয়দার সঙ্গে মুখের মিল আছে খানিকটা। তুমি ঠিক ধরেছ।'
আমরা আরও দু-চারটে কথা বলছিলাম, প্রমথবাবু ফিরে এলেন।
'আমার স্ত্রী চায়ের ব্যবস্থা করে আসছেন,' প্রমথবাবু বললেন। বলে বসলেন একটা চেয়ারে। পূর্ণিমার দিকে তাকালেন, 'জায়গাটা কেমন লাগছে মিসেস রায়ের?'
পূর্ণিমা হাসির মুখ করল : 'ভালো।'
'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনলে পারতেন!'
'এল না।'
'শুনলাম কৃষ্ণবাবুর মুখে।'
সাধারণ দু-দশটা কথা বলতে-বলতে কখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার। শীত নয়, তবু শিরশিরে এক ঠান্ডা ভাব হয়েছিল। প্রমথবাবু বাড়িটার কথা বলছিলেন। তাঁর বাবা শখ করে করিয়েছিলেন। তখন এদিকে ঘরবাড়ি ছিল না এরকম, দু-একটা মাত্র। তা বাড়িটা পঞ্চাশ বছর হতে চলল।
এমনসময় সেই লোকটা এসে কিছু বলল। প্রমথবাবু ভেতরে চলে গেলেন। পূর্ণিমা নিচু গলায় বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ?'
'কী?'
'ভদ্রলোক আমায় যেন কেমন করে দেখছেন।'
আমার মজা লাগল : 'তোমায় বোধহয় পছন্দ হয়েছে।'
'যাঃ! বুড়ি হয়ে গেলাম।'
'ভদ্রলোকও তো প্রায় বুড়ো।'
পূর্ণিমা বলল, 'আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।'
'কেন?'
'কী জানি! ...তুমি আরও একটা জিনিস নজর করে দেখো, ভদ্রলোক মাঝে-মাঝেই কেমন শব্দ করে উঠছেন জিভের।'
অবাক হলাম : 'তাই নাকি?'
'আমার মনে হয়, উনি কোনও ব্যাপারে চঞ্চল হয়ে আছেন।'
হেসে ফেললাম। মেয়েদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি।
প্রমথবাবু আবার এলেন : 'উনি আসছেন।'

দরজার দিকে তাকালাম। উনি কোথায়! সেই লোকটাই আসছিল—হাতে ট্রে। ট্রের ওপর খাবারের প্লেট।

বেতের টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল লোকটা।

প্রমথবাবু বললেন, 'এসবই বাড়িতে তৈরি। নিমকি, মিষ্টি, আলুর চপ...।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'প্রমথবাবু, আমাদের কিন্তু শুধু চা খেতে আসার কথা ছিল। এ তো একেবারে...।'

'আরে না-না, দুটো নিমকি তো মাত্র। আপনারা বাড়িতে এসেছেন। কেউ তো আসে না।'

'ভুল করে,' আমি তামাশার গলায় বললাম, 'এমন সুখাদ্য...।'

কথা আমার শেষ হল না, দেখি মাঝ-দরজার সামনে এক মহিলা।

দেখামাত্র কেমন চমকে গেলাম। ভ্রম না অন্য কিছু? আশ্চর্য দৃশ্য! কালো পাতলা শাড়ি, কালো জামা পরা এক মহিলা। মাথার চুল ধবধবে সাদা। মেয়েদের তুলনায় অস্বাভাবিক লম্বা মাথায়। রোগা। বড় তীক্ষ্ন নাক-মুখ। চোখদুটো যেন সে তুলনায় নিষ্প্রভ।

পূর্ণিমার দিকে একবার তাকালাম। সে অবাক হয়ে মহিলাকে দেখছে।

প্রমথবাবু বললেন, 'এসো লতিকা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি কৃষ্ণবাবু, আর উনি কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী।'

আমরা দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলাম।

আমাদের নমস্কারের বদলে লতিকা হাত তুললেন না। ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলেন।

কালো পোশাক, সাদা চুল, অমন তীক্ষ্ন চেহারা—আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। প্রমথবাবু লতিকাকে বসতে বললেন। বসলেন মহিলা। বসে কয়েক পলক আমাদের দুজনকে দেখলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে খাবারের প্লেট তুলে দিলেন আমাদের।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। মহিলার মাথায় সিঁদুর নেই, কোনও অলঙ্কার নেই হাতে। গলাও পরিষ্কার।

পূর্ণিমা যেন আতঙ্ক বোধ করছিল।

'নিন, খান। বাড়ির তৈরি খাবার,' প্রমথবাবু বললেন।

আমি ক'টা কুচো নিমকি মুখে দিলাম। লতিকাকে বড় রহস্যময় মনে হচ্ছিল। উনি কোনও কথাও বলছেন না। বললাম, 'আপনাদের বাড়িটা বেশ দেখতে। নতুন ধরন। কতদিনের বাড়ি?'

'পঞ্চাশ বছর প্রায়,' প্রমথবাবু বললেন, 'বাবা করেছিলেন। শৌখিন মানুষ ছিলেন। যখন বাড়ি করেন তখন এদিকে কোনও বাড়ি ছিল না।'

'বাড়ির মাথা পাকা করেননি?'

'না। ...আমাদের বংশে দুটো জিনিস করতে নেই। বাড়ির মাথায় আমরা খড় ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারি না। অন্য কিছুই নয়।'

'অদ্ভুত তো!'

'হ্যাঁ। পাকা বাড়ির তলায় আমাদের থাকা বারণ।'

'থাকলে কী হয়?'

'বললে বিশ্বাস করবেন না।'

এমনসময় চা এল।

চা রেখে লোকটা চলে যাওয়ার পর লতিকা আমাদের সকলকে চা ঢেলে দিলেন, কিন্তু কথা বললেন না।

'কী হয়, শুনি,' আমি বললাম।

প্রমথবাবু মাথা নাড়লেন : 'কী হবে শুনে?'

'না, ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত তো, তাই বলছি।'

'অদ্ভুতের কতটুকু আপনি জানেন, কৃষ্ণবাবু! সংসারে অদ্ভুত অনেক কিছু হয়।'

'তা হয়। কিন্তু পাকা বাড়ি আর এই বাড়িতে কী হতে পারে?'

প্রমথবাবু কী যেন ভাবলেন, তারপর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার হাতদুটো দেখি।' বলে নিজের হাত বাড়ালেন।

লতিকা কালো শাড়ির তলা থেকে তাঁর একটা হাত বার করে দিলেন। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এমন হাত আমি দেখিনি জীবনে। হাড়, শিরা, উপশিরা একেবারে স্পষ্ট। তারচেয়েও বড় কথা, চামড়াটা একেবারে আগুনে ঝলসানো।

প্রমথবাবু বললেন, 'এই হয়।'

আমি কিছু বুঝলাম না। পূর্ণিমা আঁতকে উঠেছিল। তার আর গলায় উঠছিল না কোনও খাবার।

প্রমথবাবু বললেন, 'যদি শুনতে চান, বলতে পারি সংক্ষেপে।'

'বলুন।'

প্রমথবাবু সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমার বাবা যে শৌখিন ছিলেন, আপনাকে বলেছি। কিন্তু তিনি সংস্কার-বিশ্বাসী ছিলেন। আমি যখন সাবালক, তখন তিনি মারা যান। আমি সেসময় ফরেস্টে কাজ করতাম। ফরেস্ট অফিসার।

'বাবার অবর্তমানেই আমি বিয়ে করি। এই লতিকাকেই। লতিকা পাটনার মেয়ে।

'বিয়ের পর ও বেশিরভাগ সময় পাটনাতে ওর বাপের বাড়িতেই থাকত। আর আমি সরকারি কাজে আজ এখানে, কাল ওখানে। মাঝে-সাঝে লতিকাকে নিয়ে যেতাম। তবে সেসব কোয়ার্টারে স্থায়ীভাবে থাকা যায় না।

'বছর-তিনেক এইভাবে কাটল। শেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে ট্রান্সফার নিলাম। আপনি বোধহয় জানেন না, এই অঞ্চলে রিজার্ভ ফরেস্ট তদারকি করার জন্যে একটা অফিস রয়েছে সদরে। আমি সেখানে ট্রান্সফার নিয়ে এলাম।

'এই বাড়িটা তখন মেরামতের দরকার হয়ে পড়ল। আমি ঠিক করেছিলাম, নিজের বাড়িতেই স্ত্রী নিয়ে থাকব, আর আমি যাব মোটরবাইকে বা জিপে। মাইল-সাতেক তো পথ।

'বাড়িটা যখন মেরামতে হাত দিলাম, লতিকা তখন পাটনায়। ওর ইচ্ছে, আমি বাড়িটার মাথায় আজকালকার মতন ঢালাই করে নি। খড়ের বাড়ি ওর ভালো লাগে না। ওর কথাতেই বাড়ির মাথায় কড়ি-বরগা চাপালাম। ঢালাইয়ের অসুবিধে ছিল। পুরোনো কড়ি-বরগা দেওয়া বাড়ি আপনি নিশ্চয় দেখেছেন।

'মাস-তিনেক লাগল বাড়ি মেরামত আর ছাদ নতুন করে করতে। তারপর লতিকাকে নিয়ে এলাম। যেদিন ও এল সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল, আমি ভুল করেছি। বুঝিনি। গা করিনি। তিনদিনের মাথায় মাঝরাতে—আমরা যখন ঘুমোচ্ছি, কেমন করে যে ঘরে আগুন লাগল জানি না। কোনও কারণ ছিল না আগুন লাগার। সেই আগুনে লতিকা পুড়ল। তাকে আমি হাজার চেষ্টা করেও আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না। তবে প্রাণে বাঁচালাম। সত্যি বলতে কী, কৃষ্ণবাবু, ওর মুখটুকু বাদ দিলে শরীরের আর এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে না-ঝলসানোর দাগ আছে। পেটের কাছটা কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছিল। নয়তো ও মারা যেত।

'সাত-আটমাস পরে আবার ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে এলাম। কিন্তু ততদিনে এই বাড়ির মাথার ওপর আবার খড় চেপেছে। আপনি হয়তো বলবেন, এটা আমার কুসংস্কার। হয়তো তাই! তবু আমি আর পাকা ছাদের বাড়ির তলায় থাকতে রাজি নই।'

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। সিগারেট ধরালাম।

'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, আগুনটা লাগার কোনও কারণ ছিল না?'

'হ্যাঁ করি,' প্রমথবাবু বললেন, 'এখানে তখন ইলেকট্রিক ছিল না। আমরা কেরোসিনের বাতি ব্যবহার করতাম। ইলেকট্রিক লাইনের দোষে আগুন লাগবে—তা সম্ভব ছিল না। কোনও কেরোসিন-বাতি জ্বলছিল না আমাদের শোওয়ার ঘরে। আগুনটা কেমন করে লাগবে, বলুন?'

'সিগারেট বা...।'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'অন্য কেউ যদি লাগিয়ে দেয়?'

'অসম্ভব। আমার কোনও শত্রু নেই।'

আমার মুখে অন্য কোনও কথা আসছিল না।

প্রমথবাবু নিজেই একসময় বললেন, 'সেই আগুন লাগার পর থেকে লতিকা কথা বলতে পারে না। ইশারায় কথা বলে। খুব ধীরে একটু আওয়াজ করে। আপনারা ওর ইশারা বা ওই শব্দের অর্থ বুঝবেন না। আমরা বুঝি।'

লতিকা যে কেন চুপ করে আছেন, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রমথবাবু আবার বললেন, 'অবশ্য সেই আগুন লাগার পর থেকে ওর একটা সিক্সথ সেন্স দেখা দিয়েছে। ও অনেক কিছু যেন দেখতে পায়—যা আমরা পারি না। দেখবেন?' বলে ভদ্রলোক স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু যেন জিগ্যেস করলেন।

ভদ্রমহিলা চোখ বুজলেন অল্পের জন্যে। তারপর কেমন গোঙানির শব্দ করে হাতের ইশারা করে কিছু বললেন।

প্রমথবাবু পূ্র্ণিমার দিকে তাকালেন 'মিসেস রায়, একটা দুঃসংবাদ দি। আপনার ছেলে কলকাতার বাড়িতে হাত ভেঙে পড়ে আছে। আজ সকালেই ভেঙেছে। মারাত্মক কিছু নয়।'

পূর্ণিমা চমকে উঠল। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে।

লতিকা আবার কী বললেন। প্রমথবাবু শুনলেন কথাগুলো।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রমথবাবু বললেন, 'কলকাতায় আপনার শোওয়ার ঘরের মাথার দিকে যে-ছবিটা আছে সেটা কি আপনার প্রথমা স্ত্রীর?'

আমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। আমার প্রথমা স্ত্রী মাত্র ছ'মাস বেঁচেছিল। বছর-দুই পরে আমি পূর্ণিমাকে বিয়ে করি।

প্রমথবাবু হাসলেন যেন : 'অগ্নিশুদ্ধ বলে একটা কথা আছে। লতিকার বোধহয় আগুনে পুড়ে আত্মাশুদ্ধি হয়েছে। ও এসব পারে। ...যাক গে, আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

পরের দিন কলকাতার বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল, ছেলে হাত ভেঙেছে সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে।

ক্রাইম

পুজো সংখ্যা, ১৯৮২



যক্ষিণী

প্রসাদ সেন

'স্যার, একবার উঠবেন, স্যার।'

অনেকক্ষণ ধরেই কথাটা অস্পষ্ট দূরাগত ধ্বনির মতো কানে আসছিল সঞ্জয়ের। কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙছিল না তার। ঠিক ঘুমও নয়। যেন আবছা একটা চৈতন্যহীনতা। সেই অবস্থার মাঝেই স্বপ্ন দেখছিল সঞ্জয়। কী যে স্বপ্ন, সঠিক বুঝতে পারছিল না। প্রাচীন যুগের কোনও স্বল্পবাস উন্মুক্তবক্ষা এক নারীর স্বপ্ন। শুধু সেই রমণীর ডানহাতের দিকেই দৃষ্টি পড়ছিল সঞ্জয়ের। অনেক অলংকার সমৃদ্ধ সেই হাত নৃত্যের তালে-তালে যেন তাকে ডাকছে। এইসময় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ক্যাম্পের দ্বিতীয় প্রধান অ্যালবার্ট ডি'কোস্টার ডাক শুনতে পায় সে।

চোখ মেলে সঞ্জয় দেখল ডি'কোস্টার মুখ। অদ্ভুত উত্তেজনা নিয়ে সে তার প্রধান অফিসারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সঞ্জয় চোখ রগড়ে ক্যাম্পখাটে উঠে বসবার চেষ্টা করতে-করতে বলে, 'কী ব্যাপার, ডি'কোস্টা? আবার ভূকম্পন হচ্ছে না কি?'

'না, স্যার। এখন ভূকম্পন হচ্ছে না। আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু গতকালের হালকা ভূকম্পনের ফলে একটা ফাটল হয়েছে এখান থেকে আধমাইল দূরে। আজ সকালে ওদিকে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেয়েছি। আর সেই কারণেই আপনাকে বিরক্ত করছি।'

কুক এক মগ গরম কফি টেবিলে রেখে গেলে মগে চুমুক দিতে-দিতে সঞ্জয় বলে, 'কী দেখেছ তুমি? কোনও আশ্চর্য শিলাস্তর?'

'স্যার, ব্যাপারটা আমাদের ভূবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। বরং বলা যায় অ্যানথ্রোপলজির লোকেরা খুব উৎসাহিত হতে পারে। এরকম একটা ফাঁকা নির্জন জায়গায় বোধহয় কোনও নগর-টগর ছিল পুরোনো আমলের। খোঁড়াখুঁড়ি করলে হয়তো অনেক কিছু পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তুমি আবিষ্কার করলে কী?'

'একটা মূর্তি—না, ঠিক মূর্তিও দেখতে পাইনি, স্যার। ভূকম্পনের ফলে যে-ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, সেই জায়গায় একটা হাত উঠে আছে। একটা পাথরের হাত—।'

'হাত?' সঞ্জয় প্রায় চিৎকার করে ওঠে। তার চোখে ঘুমের রেশ যা ছিল মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে থাকে, 'ইউ মিন একটা হাত?'

'হ্যাঁ স্যার, একটা হাত। মনে হয় কোনও নারীমূর্তির অলংকারমণ্ডিত হাত। নৃত্যের ভঙ্গিমায়—।'

সঞ্জয়ের হঠাৎ মাথা ঘুরতে থাকে। শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি বোধ করতে থাকে। সে ধপ করে আবার ক্যাম্পখাটে বসে পড়ে বলে, 'ডি'কোস্টা, আমি একটু আগেই ঠিক ওই হাতের স্বপ্ন দেখেছি। নৃত্যের ভঙ্গিমায় অলংকারে মোড়া একটা হাত।'

'স্ট্রেঞ্জ!' ডি'কোস্টা আরও অবাক হয়ে বলে, 'আপনি সত্যি সেই হাতটা স্বপ্নে দেখেছেন?'

আবার উঠে দাঁড়ায় সঞ্জয়। বলল, 'একমিনিট দাঁড়াও। আমি তৈরি হয়ে নি। ওখানে জিপ যাবে তো? বেশ, চলো, দেখে আসি ব্যাপারটা।'

এবড়ো-খেবড়ো অসমতল পথে ফোর-হুইল-ড্রাইভ জিপ ওদের জায়গায় পৌঁছে দেয়। দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত ফাটলটার কাছে যায়। ডি'কোস্টা সাবধান করে, 'অত কাছে এগোবেন না, স্যার। ফাটলটা খুব ডেনজারাস মনে হচ্ছে। আরে! এই হাতটা দেখছি আরও অনেকটা উঠে এসেছে। একটু আগে শুধু হাতের পাতা থেকে কনুই পর্যন্ত দেখে গেছি। এখন দেখছি, কাঁধও দেখা যাচ্ছে। স্যার, কী হল আপনার? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

সঞ্জয় যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। ওর সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে কানের মধ্যে বাজছিল নূপুরের কিঙ্কিণি। সঞ্জয় কি ভুল দেখল? মনে হল, কাঁধ পর্যন্ত সমস্ত হাতটা আন্দোলিত হচ্ছে আর তাকে ডাকছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'ডি'কোস্টা, তুমি কি দেখেছ যে, হাতটা নড়ছে?'

'কই না তো? আপনি তাই দেখলেন নাকি? ও বোধহয় চোখের ভুল আপনার।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ভালো করে হাতটা দেখতে থাকে সে। পাথরের হাত আবার আন্দোলিত হয়। এবার সঞ্জয় স্পষ্ট শুনতে পায় নারীকণ্ঠ। ভাষা অজানা, কিন্তু সেই চিরন্তন কাছে ডাকার আহ্বান। এই আহ্বান বুঝতে কোনও ভাষাতত্ত্ববিদের প্রয়োজন হয় না—সঞ্জয়ের সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। ডি'কোস্টার কাঁধ খামচে ধরে বলে, 'শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। এখুনি—।'

বিস্মিত ডি'কোস্টা একরকম টানতে-টানতেই সঞ্জয়কে জিপে তোলে। অঞ্চলটা ছাড়িয়ে অনেকটা আসতে সঞ্জয় একটু সুস্থ বোধ করে। লজ্জিত হয়ে বলে, 'কেন এমন হল বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না-না। এতে মনে করবার কী আছে? বোধহয় আপনাকে আচমকা ঘুম থেকে তুলেছি বলে এমনটা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের হাতটা—।'

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। জিপটা সেকেন্ড গিয়ারে চলার জন্য গোঁ-গোঁ শব্দ করতে থাকে। ক্যাম্পে পৌঁছালে ডি'কোস্টা বলে, 'তাহলে স্যার, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে খবর দিতে হয়।'

'না। এখন থাক। আগে আমরাই একটু খোঁজ করে দেখি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কতগুলি রিপোর্ট লিখে সঞ্জয় ক্যুরিয়ারের হাতে পাঠিয়ে দিল। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। ঘুমও পাচ্ছে। ভেবেছিল, ডি'কোস্টার সঙ্গে কয়েকটা পাথরের নমুনা নিয়ে বসবে। কিন্তু ঘুমের তাগিদ বেশি করে অনুভব করতে তাঁবুর পরদাটা টেনে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে মাত্র চোখ বন্ধ করেছে—এসময় তার শরীর আবার ঝিমঝিম করে উঠল। একটা অদ্ভুত কাঁপুনি তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। মনে হল, তাঁবুটা যেন চরকির মতো ঘুরছে। সেই ঘূর্ণির মধ্যে সে দেখতে পেল নিজেকে। কিন্তু এ যেন অন্য কেউ, বেশবাস অন্যরকম। আড়াই হাজার বছর আগের এক রাজপ্রাসাদের গুপ্তকক্ষে সে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র মণি-মাণিক্য, সোনার স্তূপ সামনে। আর স্বল্পবাস উন্মুক্তবক্ষ একটি মেয়ে তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। সর্বগুণসম্পন্না এই মেয়েটিকে কর্ণসুবর্ণ দেশ থেকে উচ্চমূল্যে কিনে আনা হয়েছে যক্ষিণী করে এইসব ধনরত্ন পাহারা দেওয়ার জন্য। সে বেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তে এই গুপ্তকক্ষের লৌহকপাট বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মতো। আর এই মেয়েটি তিল-তিল করে অনাহারে, তৃষ্ণায়

ও বায়ুর অভাবে মারা যাবে। মৃত্যুর পর তার দেহ শিলীভূত হয়ে জন্ম-জন্ম পাহারা দেবে এইসব অমূল্য ধনরত্ন। জন্মান্তরে আবার ভোগ করবে সেই আড়াই হাজার বছর আগের সঞ্জয়।

মেয়েটি খুব কাঁদছিল। তার একমাত্র শিশুপুত্রকে সে ফেলে এসেছে। অনুনয় করছে সঞ্জয়কে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সঞ্জয়ের মুখে ফুটে উঠেছে ক্রুর হাসি। লাথি দিয়ে সে মেয়েটিকে সরিয়ে দিল ঘরের ভিতরে। দরজা বন্ধ করবার সময় সে শুনতে পেল মেয়েটির কান্না আর অভিশাপ। প্রেত হয়েও সে একদিন এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে। সঞ্জয় হা-হা করে হেসে ভালো করে লোহার দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার ওপার থেকে পুরু লোহার চাদর ভেদ করেও দুম-দুম শব্দ আসছে। মেয়েটি দরজা খুলবার জন্য প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছে। দুম-দুম শব্দটা বাড়ছে, বাড়ছে...।

সঞ্জয়ের ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিই কোথা থেকে দুম-দুম শব্দটা ভেসে আসছে। হয়তো পাথরের নমুনা সংগ্রহ করবার জন্য মৃদু ব্লাস্টিং করা হচ্ছে। কিন্তু পরদা সরিয়ে ডি'কোস্টাকে তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ডি'কোস্টা হাঁপাচ্ছে। কোথা থেকে যেন ছুটতে-ছুটতে আসছে সে।

'স্যার, আবার ভূকম্পন হচ্ছে ওই জায়গাটায়। দুম-দুম শব্দও হচ্ছে।'

উঠে বসে সঞ্জয় শক্ত গলায় প্রশ্ন করে, 'ওখানে কেন গিয়েছিলে আবার?'

'হঠাৎ খেয়াল হল, মূর্তিটা দেখে আসি। আর আশ্চর্য, স্যার, এবার মূর্তিটার অর্ধেকটা উঠে এসেছে। কী অদ্ভুত মূর্তি, না দেখলে বিশ্বাস হত না যে, পাথরের মূর্তির ওরকম চোখ থাকতে পারে।'

'ওখানে আর যাবে না তুমি। ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে দাও একবার। মূর্তিটা ভেঙে ফেলতে হবে আর ব্লাস্ট করে ও-অঞ্চলটা বসিয়ে দিতে হবে।'

'সে কী, স্যার! এরকম একটা প্রাচীন মূর্তি—অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে খবর না দিয়েই জায়গাটা ধ্বংস করে দেবেন?'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।' অসহায়ের মতো সঞ্জয় বলল, 'নইলে আমাদের সকলের বিপদ। মূর্তিটা যক্ষিণীর। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে অনেক ধনদৌলতসহ ওকে মেরে ফেলা হয়েছিল পাহারা দেওয়ার জন্যে।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। কিন্তু ডি'কোস্টার লোভে-ভরা চকচকে চোখের ভাষা বুঝতে ওর কষ্ট হয় না। ডি'কোস্টার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলে, 'আজ কাজ শুরু করতে-করতে সন্ধে হয়ে যাবে। আমি চাই, কাল ভোর থেকেই যেন কাজ শুরু হয়।'

সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের টেবিলল্যাম্প জ্বেলে রিপোর্ট লিখবার জন্য ডি'কোস্টার খোঁজ করতে গিয়ে সঞ্জয় শুনল, সে ক্যাম্পে নেই। সঞ্জয়ের মন একটা অশুভ আশঙ্কায় ভরে উঠল। জুতো পরে সে বাইরে আসবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে দেখল তার ড্রয়ারে রিভলভারটা নেই। বনজ হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের ক্যাম্পে একটা রিভলভার আর একটা বন্দুক থাকে। রিভলভারটা না পেয়ে সঞ্জয়ের মনে একটা সন্দেহ বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখল, যেখানে জিপটা থাকে, সেখানে ওটাও নেই। যাতে স্টার্ট হলে শব্দ না হয়, সেজন্য ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় ঢালু পথে অনেকটা নিয়ে গিয়ে তবে গাড়িটা চলেছে। একবার ভাবল, সে সবাইকে ডেকে জানায় ব্যাপারটা। কিন্তু তা না করে সেই ঢালু পথ ধরে সে দ্রুত হাঁটতে থাকল!

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা ছিল। আকাশের চাঁদের আলোর স্রোতে সঞ্জয়ের পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল না। এইটুকু পথ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে? চাঁদের আলোয় উঁচু হয়ে ওঠা পাথরের টুকরোগুলো আর তাদের ছায়া ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হাঁটতে-হাঁটতে সেই জায়গায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে। দেখতে পেল, জিপটা দাঁড়িয়ে আছে আর ডি'কোস্টা একটা বেলচা দিয়ে মূর্তিটার চারপাশ থেকে পাথরের টুকরো, গুঁড়ো বালি সরাচ্ছে। মূর্তিটা এবারে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই সেই যক্ষিণী মূর্তি, আড়াই হাজার বছর আগে কোনও এক সঞ্জয় তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিল। অত দূর থেকেও মূর্তিটার ঝকঝকে ঘৃণায় ভরা উজ্জ্বল

চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জয়। বুকের ভেতর আবার কাঁপুনি শুরু হতে সে চিৎকার করে বলল, 'ডি'কোস্টা, কী করছ ওখানে? চলে এসো, চলে এসো বলছি।'

একবার সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে ডি'কোস্টা আবার নিজের কাজ করে চলল। সঞ্জয় আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। আবার চিৎকার করে ডি'কোস্টাকে ফিরে আসতে বলল। কিন্তু পাথরের আর পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনির শব্দই শুধু সঞ্জয়ের কানে গেল। পায়ে-পায়ে আরও কাছে এগিয়ে গেল সে। সেই মুহূর্তে সঞ্জয় দেখতে পেল, যক্ষিণীর মূর্তিটা নড়ছে।......মূর্তিটাতে যেন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। চিৎকার করে সে ডাকল, 'ডি'কোস্টা, পালিয়ে এসো, নইলে তুমি মরবে।'

বেলচাটা ফেলে ডি'কোস্টা সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় সঞ্জয় দেখতে পেল তারই রিভলভারের নল উদ্ধত হয়ে আছে ডি'কোস্টার হাতে। পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে ডি'কোস্টা বলল, 'আর একদম এগোবেন না, ডক্টর সঞ্জয়। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, এখানে অজস্র ধনরত্ন লুকোনো আছে। এই দেখুন, তাল-তাল সোনা। হ্যাঁ, এগুলি আমি একাই ভোগ করব। কেউ এর অংশ পাবে না। আপনি চলে যান। আপনার বুকে আপনারই রিভলভারের গুলি বসাবার মতো টিপ আমার আছে। আজ রাত্রির মধ্যেই সকলকে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন। নইলে আপনার এবং দলের সকলের মৃতদেহ এখানেই পড়ে থাকবে।'

'ডি'কোস্টা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওগুলি যক্ষিণীর আগলানো ধন। ছুঁয়ো না। তোমার ভীষণ বিপদ হবে।'

পাহাড় কাঁপিয়ে হাসল ডি'কোস্টা। বলল, 'কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই। আপনি চলে যান—যান বলছি।'

কয়েক মুহূর্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঞ্জয়। আর তখনি দেখতে পায় যক্ষিণীর যেন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। পাথরের শরীরটা যেন দুলে উঠল। মূর্তিটা এগিয়ে আসতে চাইছে। আসছে...এগিয়ে আসছে। শেষবারের মতো চিৎকার করে বলল, 'ডি'কোস্টা, তাকিয়ে দ্যাখো। যক্ষিণী প্রাণ পেয়েছে। পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো।'

তখনই একটা কাঁপুনি অনুভব করল সঞ্জয়। মাটি কাঁপছে। আবার ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই কাঁপুনি ডি'কোস্টাও টের পেয়েছিল। প্রচণ্ড ভয়ার্তভাবে সে ছুটতে শুরু করেছে। ছুটতে-ছুটতে সঞ্জয়ের মনে হল, পিছনে যেন অনেককিছুই ভেঙে পড়ছে, বিরাট-বিরাট শব্দ করে পাথরের বুকে চিড় ধরে যাচ্ছে। দুম-দুম শব্দে গুঁড়িয়ে পড়ছে সবকিছু।

আর কিছুক্ষণ ছুটবার পর একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে সঞ্জয় পড়ে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরলে সঞ্জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, সে একটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. জৈন-এর মুখ তার দিকে ঝুঁকে আছে। ড. জৈন হেসে বললেন, 'যাক, তোমার জ্ঞান ফিরে আসাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি। বাব্বাঃ, যে-অবস্থায় তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে! সমস্ত জায়গাটা ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেছে। খুব বিপজ্জনক অবস্থায় থাকার ফলে ক্যাম্পও আপাতত গুটিয়ে আনা হয়েছে।'

'স্যার—।'

'থাক, কথা বোলো না। পরে সব শুনব।'

'স্যার, ডি'কোস্টার খবর কী?'

একটা নিশ্বাস ফেলে ড. জৈন বললেন, 'ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা জায়গায় এমন বড়-বড় ফালি আর বিরাট-বিরাট গর্ত হয়েছে, মনে হচ্ছে, ওখানেই ও হারিয়ে গেছে।'

'কোনও মূর্তি পেয়েছেন আপনারা?'

'মূর্তি? আরে না, ওসব জায়গায় এখন যাওয়াই দুষ্কর। শুধু দুঃখ হচ্ছে ডি'কোস্টার জন্যে। বেচারা খুব কাজের লোক ছিল।'

মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে সঞ্জয়। ভালোই হয়েছে হয়তো। ডি'কোস্টা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনওদিনই জানতে পারবে না ওখানে কত ঐশ্বর্য লুকোনো আছে।

উল্কা

পুজো, ১৯৮২



প্রসঙ্গ : প্রেম

ভাস্কর রাহা

সত্যি সুমন, তোমার মতো কালচার্ড আর এডুকেটেড পার্সনের মুখেই এমন কথা শোভা পায়।—কৃষ্ণা মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে।

কিন্তু সেই মুগ্ধতার উচ্ছ্বাস কোনও সাড়া জাগায় না সুমনের মনে। সে অত্যন্ত নিরাসক্ত গলায় জবাব দেয়, আমাদের মতো তথাকথিত কালচার্ডদের এটুকুই তো অহঙ্কার। আচরণে না হোক, সংলাপে আমরা পলিশড সবসময়।

না, না, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। —কৃষ্ণা যেন একটু আহত হল।—রিয়্যালি, তোমার প্রস্তাবটা অসাধারণ। আমরা তিনজন—আমি, তুমি আর শৈবাল—একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে একটা মীমাংসায় পৌঁছুব, কারও কোনও খেদ থাকবে না মনে, এর চেয়ে পারফেক্ট সাজেশান আর কী হতে পারে! —একটু থেমে, —অবশ্য আমার সিদ্ধান্তের কোনও হেরফের হবে না এতে।

কোনও পরিবর্তন হবে না বলতে কী বোঝাতে চাইছ তুমি?

আমি তোমার সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করব, এ-ব্যাপারে আমি কোয়াইট ডিটারমাইন্ড। তুমি তো তা জানোই।

হ্যাঁ, জানি। এটা তোমার এই মুহূর্তের অভিলাষ। কিন্তু তোমার মনের পরিবর্তন ঘটাতে আমি তো চেষ্টা করতে পারি।

তা তুমি করতে পারো, সেটাই তোমার পক্ষে শোভন। কিন্তু কোনও ফল হবে বলে আমি মনে করি না। —কৃষ্ণার গলায় বিশেষ আবেগ ফোটে,—আমি শৈবালকে ভালোবাসি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

তার মানে, আমি ধরে নিতে পারি,—সুমন খুব আস্তে-আস্তে উচ্চারণ করল, তুমি আর আমাকে ভালোবাস না, তাই না?

প্লিজ, ডোন্ট বি অ্যাবসার্ড। তোমাকে আমি এখনও ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। এবং তা তুমিও জানো।—কৃষ্ণা একটু গম্ভীর হল।—তবে এই ভালোবাসায় আমি আর আগের সেই উত্তাপ, সেই আবেগ খুঁজে পাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আই অ্যাম ম্যাডলি অ্যান্ড ডেলিরিয়াসলি অ্যান্ড ইররেসিস্টিবলি ইন লাভ উইথ শৈবাল।

ঠিক এই কথাগুলোই তুমি কতবার, কত জায়গায় আমার কানে-কানে কবিতার মতো আবেগ দিয়ে উচ্চারণ করেছ।—সুমন ম্লান হাসি হাসল।

বিশ্বাস করো, সেইসব মুহূর্তগুলো সেদিন আমার কাছে মিথ্যা ছিল না। অনেক আনন্দ, অনেক সুখ আর স্বপ্নের সেই স্মৃতিগুলো আস্তে-আস্তে কেমন যেন ধূসর হয়ে গেল আমার অজান্তে।—কৃষ্ণার গলার স্বরও কেমন ধরা-ধরা।

সুমন কৃষ্ণার দিকে তাকাল। আর সেইদিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন একটা অসহায় যন্ত্রণা অনুভব করল সে। কৃষ্ণার মনের দর্পণে তার ছায়া ঝাপসা হয়ে গেলেও সুমনের কাছে কৃষ্ণা আজও সুতীব্র এক আকর্ষণ। তার মনে পড়ল, কত সোনালি সন্ধ্যা ওরা একসঙ্গে দুজনে কাটিয়েছে। হাসি আর কথার জাল বুনে কত দুরন্ত দুপুরে তারা রচনা করেছে স্বপ্ন-কবিতা। সেই আকর্ষণ একটুও ম্লান হয়নি, এখনও তার সাহচর্যে সে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, হারিয়ে যাওয়া ঘন আশ্লেষের স্মৃতি তাকে উন্মন করে তোলে।

তুমি কি এখন কফি খাবে?—সুমন সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।

না, থাক। শৈবাল এলে একসঙ্গে খাব।

কলিংবেলটা বেজে উঠল ঠিক সময়। শৈবাল এসে পড়েছে। কৃষ্ণা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আর এক নিঃসীম শূন্যতা-বোধ নিয়ে সুমন ওর চলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণা ফিরে আসে, সঙ্গে শৈবাল।—তোমাদের দুজনকে ইনট্রোডিউজ করিয়ে দিই।—কৃষ্ণা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে,—এই শৈবাল চৌধুরী আর ইনি সুমন্ত সেন।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।—শৈবাল উচ্ছ্বসিতভাবে তার ডানহাতটা এগিয়ে দিল।

প্রসারিত সেই হাতটাকে জড়িয়ে ধরে সুমন অন্তরঙ্গভাবে বলল, আমার আনন্দও আপনার চেয়ে কিছু কম নয়।

প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর তারা সবাই আসন গ্রহণ করল। টেবিলে ততক্ষণে কফি পরিবেশন করে গেছে সুমনের গৃহভৃত্য।

সুমন্তকে আমি সুমন বলেই ডাকি।—কফির পেয়ালায় চিনি মেশাতে-মেশাতে কৃষ্ণা আলোচনার সূত্রপাত করে।

একসময় আমরা কত অন্তরঙ্গ ছিলাম, আপনি ভাবতে পারবেন না।—শৈবালকে উদ্দেশ করে বলল সুমন।

আমি সব শুনেছি। তাই আপনার সামনে কেমন অপ্রস্তুত বোধ করছি।

অপ্রস্তুত বোধ করার কী আছে!—সুমন হাসল,—আসলে এতদিন যাকে নিজের বলে মনে করে এসেছি, আজ আপনি তাকে পেতে চাইছেন—অথচ আমি তাকে ধরে রাখতে চাই। সমস্যার সৃষ্টি সেখানেই।

সমস্যা?—শৈবাল হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল,—আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনও সমস্যাই দেখতে পাচ্ছি না।

আমিও না।—কৃষ্ণা শৈবালের কথায় সায় দিল।—মিউচুয়ালি, পারস্পরিক সদিচ্ছা নিয়ে আমি আর সুমন আমাদের এনগেজমেন্ট রিং ফিরিয়ে নেব। তারপর শৈবালের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে আর কোনও প্রবলেম থাকবে না।

আমিও তাই মনে করি।—শৈবাল মাথা নাড়ে।

আমি কিন্তু তা মনে করি না।—সুমন সোজা হয়ে বসল,—ভদ্র আর সহানুভূতিশীল হতে আমি সবসময়েই রাজি। কিন্তু ক্লীব আত্মসমর্পণে আমার গভীর বিতৃষ্ণা আছে।

তাহলে কী করতে চান আপনি?—কিছুটা অপ্রসন্নভাবেই জিগ্যেস করে শৈবাল।

আমার একটা বিশেষ প্ল্যান আছে। আপনারা যদি রাজি থাকেন, তাহলে এই বিষয়ের একটা সুচারু মীমাংসা হতে পারে। শুনবেন আমার সেই প্ল্যানটা?

বেশ বলুন, কী বলতে চান আপনি।—শৈবাল রাজি হল।

ধন্যবাদ! আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি।—সুমন উঠে দাঁড়াল, আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল লিকার ক্যাবিনেটের সামনে। সেখান থেকে লাল রঙের পোর্ট ভরতি তিনটি ছোট্ট বোতল নিয়ে এল। বোতল তিনটে কফি-টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে সুমন নিজের চেয়ারে এসে বসল।

ওইগুলো কীসের বোতল?—কৃষ্ণা জিগ্যেস করল।

পোর্ট ওয়াইনের।—সুমন জবাব দিল, আজ সকালে আমি এগুলি তৈরি করে রেখেছি।

কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রিডিক্যুলাস মনে হচ্ছে।

আমার পরিকল্পনার এটা একটা অংশ বিশেষ।—সুমন বলতে থাকে, সামনের ওই তিনটি বোতলের একটি অপর দুটি থেকে একটু আলাদা। দুটির মধ্যে রয়েছে নির্ভেজাল পোর্ট, আর অন্যটির ভেতরকার পোর্টের মধ্যে মেশানো আছে বিষ। এমন পরিমাণ, যা পান করার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাবে। এখন আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমাদের একজন ওই বিষ মেশানো মদ পান করে অন্য দুটি জীবনকে সমস্যামুক্ত করে দেবে।

সুমন!—কৃষ্ণা চিৎকার করে ওঠে, মাঝে-মাঝে আমি তোমার মধ্যে একটা পারভার্টেড সেন্স অফ হিউমার দেখতে পাই। এটা তোমার কাটিয়ে ওঠা উচিত।

আমার কিন্তু মনে হয়, এটাই বর্তমানে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পথ। হয় সব পাওয়ার আনন্দ, নয়তো না-পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি। আমাদের মতো সিভিলাইজড সফিস্টিকেটেড মানুষরাই তো পারে এমন উপায় গ্রহণ করতে।

কৃষ্ণা আর শৈবাল তাকাল সুমনের দিকে। দুজনেই কেমন বোবা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে শৈবাল মুখ খুলল, দেখুন, আপনি তিনটি বোতল সাজিয়ে রেখেছেন। তার মানে আপনি কি সিরিয়াসলি মনে করেন কৃষ্ণা আপনার এই ফ্যান্টাস্টিক প্ল্যানে অংশ গ্রহণ করবে?

হ্যাঁ। এবং তার প্রয়োজন আছে। আমি যদি বিষ মেশানো মদ পান করি, আপনি কৃষ্ণাকে লাভ করবেন। আপনি যদি পান করেন, আমি আবার ফিরে পাব কৃষ্ণাকে। আর কৃষ্ণা যদি নিজে পান করে, তাহলে তাকে না-পাওয়ার দুঃখ আমাদের দুজনের সমানভাবেই রইল। আমার মনে হয়, কৃষ্ণা এতে রাজি হবে।

আমি রাজি।—অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষ্ণা বলে উঠল।

আমি এর মধ্যে নেই। আই অ্যাবসোলিউটলি ফরবিড ইট।—শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

উঠলে কেন, বসো।—শৈবালকে কৃষ্ণা শান্ত করে।

দেখুন শৈবালবাবু, আমার ইচ্ছেকে জোর করে কারও ওপর আমি চাপাতে চাই না।—সুমন বলে উঠল, আপনারা স্বেচ্ছায় রাজি না হলে আমার পরিকল্পনার সমাপ্তি এখানেই।

সত্যি শৈবাল, আমার জন্যে তুমি এই সামান্য ঝুঁকিটুকু নিতে পারো না?—কৃষ্ণার স্বরে অভিমান।

সামান্য ঝুঁকির কথা এটা নয়।—শৈবাল বলল, পরের ঘটনাগুলো ভেবে দেখেছ? মনে করো, আমরা সবাই মদ খেলাম এবং আমাদের মধ্যে একজন যথারীতি মারা গেল। তারপর? অন্য দুজনকে নিয়ে পুলিশ যে-কেলেঙ্কারি শুরু করবে, সেটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে।

এটা সত্যি। এই বিপদের কথা আমিও ভেবেছি।—সুমন জানাল,—এখানে বসে আমরা কেউ মদ পান করব না। এক-একটি বোতল নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে যাব। রাতে শোওয়ার সময় আমরা সেটা পান করব। পরদিন সন্ধ্যায় 'ব্লু-এঞ্জেল' রেস্তোঁরার লাউঞ্জে যারা বেঁচে থাকবে, সেই ভাগ্যবান দুজনে মিলিত হবে। ত্রিকোণ প্রেমের ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব নজির হয়ে থাকবে। জানি না, কাল সন্ধ্যায় কোন দুজনের দেখা হবে।

ভগবান করুন,—শৈবাল তিক্ত গলায় বলল, সেই দুজন যেন আমি আর আপনি না হই।

তার মানে আপনি রাজি হলেন?—সুমন জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, রাজি হলাম। কৃষ্ণার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা আমি হারিয়েছি।

আনন্দের আতিশয্যে কৃষ্ণা শৈবালকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল। সেই প্রেমের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, তাহলে আমাদের আলোচনা-সভা এখানেই শেষ হোক।

এক মিনিট।—কৃষ্ণার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে শৈবাল বলল, আপনি কি জানেন, কোন বোতলে বিষ মেশানো আছে?

না। তিনটে বোতলই একরকমের। আমি চোখ বন্ধ করে বিষ মিশিয়েছি। অবশ্য আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনি আর কৃষ্ণা ঠিক করুন, কোন বোতল দুটো আপনারা নেবেন। বাকি যে-বোতলটা থাকবে সেটা গ্রহণ করব আমি। রাজি?

চমৎকার প্রস্তাব।—কৃষ্ণা উচ্ছ্বসিত হল। কপট ক্রোধের সুরে শৈবালকে ধমকাল, সুমনকে এ-ব্যাপারে সন্দেহ করা তোমার ঠিক হবে না। হি অলওয়েজ বিহেভস লাইক এ সিভিলাইজড বিইং।

বোতল নিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সুমন। ঘড়ির কাঁটায় যখন রাত দশটা বাজল, সে উঠে আস্তে-আস্তে শোওয়ার ঘরে গিয়ে ডিভানের ওপর বসল। আবার অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর, এক চুমুকে বোতলের সবটুকু মদ পান করে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন। সন্ধ্যাবেলা 'ব্লু-এঞ্জেল' রেস্তোঁরার প্রশস্ত লাউঞ্জের এককোণায় একটা টেবিলে বিয়ারের বোতল সামনে নিয়ে বসে আছে সুমন। এমনসময় কৃষ্ণা এল। অতি ব্যস্ততার দরুণ তার পরিপূর্ণ বুকদুটো কাঁপছিল থরথর করে। মুখে-কপালে চিকচিক করছিল বিন্দু-বিন্দু ঘামের ফোঁটা। সুমনকে দেখতে পেয়ে তার চোখের কোনায় বিস্ময়ের রেখা ফুটল। কোনও কথা না বলে সে সুমনের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

মনে হচ্ছে, আমাকে দেখে তুমি মোটেই খুশি হওনি?—সুমন কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলল।

কী করে বুঝলে?—কৃষ্ণা তার বুড়ো আঙুলটা টেবিলে ঘষতে-ঘষতে জিগ্যেস করল।

তোমার চোখ-মুখের ভাষা বুঝতে আমার কষ্ট হয় না।

ওঃ,—কৃষ্ণা সুমনের দিকে না তাকিয়ে টেবিলের ওপর তার বুড়ো আঙুলটা ঘষতে থাকে। রেগে গেলে কৃষ্ণার এটা একটা মুদ্রাদোষ।

সত্যি সুমন,—এতক্ষণে কৃষ্ণা মুখ খুলল,—আমার সঙ্গে এই ছল-চাতুরিটা তুমি না করলেই পারতে। আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি দুটো বোতলে বিষ মিশিয়েছিলে। এবং কায়দা করে একটা তুমি নিজে আর অন্যটা আমাকে দিয়েছিল। ভেবেছিলে, এমনি করেই তুমি শৈবালের কাছ থেকে আমাকে চিরদিনের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখবে। দেয়ার ইজ সিম্পলি নো লিমিট টু ইয়োর ডুপ্লিসিটি।

তুমি আমার ওপর অবিচার করছ, কৃষ্ণা।—সুমন বলল, এ-কথা সত্যি যে, আমি সবটুকু সত্যি বলিনি। তবে কারও বিরুদ্ধেই আমার কোনও আক্রোশ ছিল না। সবারই একই পরিণতি ঘটাতে চেয়েছিলাম।

তার মানে? পরিষ্কার করে বলো।

আসলে আমি তিনটে বোতলেই বিষ মিশিয়েছিলাম।

তাহলে, তাহলে শৈবাল কোথায়?—কৃষ্ণা চিৎকার করে উঠল।

তাই তো! কোথায় সে?

আমি তাকে কোথাও দেখতে পাইনি।

আমিও না। আমরা দেখতেও পাব না, অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্যে তো বটেই।

তার মানে তুমি বলতে চাও, সে পালিয়ে গেছে। স্বীকার করা সত্ত্বেও, সে শেষপর্যন্ত মদ খায়নি।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

এতক্ষণে কৃষ্ণা সুমনের চোখের দিকে তাকাল, সোজাসুজি। টেবিলের ওপর ওর বুড়ো আঙুলের চলাফেরা থেমে গেল আস্তে-আস্তে। আর ওর মুখের আয়নায় সুমন আবার সেই

ভুলতে-না-পারা অনেক দুরন্ত দুপুরের ছবি, অনেক সোনালি-সন্ধ্যার আলো, আর ঘন আশ্লেষের আবেশ খুঁজে পেল।

মাসিক ক্রিমিনাল
পুজো সংখ্যা, ১৯৮৩



আমি ভালো নেই, তুমি?

কিন্নর রায়

মন ভালো নেই

এক আকাশ মেঘ, তবু গলে বিষ্টি পড়ে না। হাওয়ায় ঠান্ডা মিশে আছে। সস্তা মেসের চৌকিতে পাশ ফিরতে-ফিরতে রবি এসব দেখল। ঘরের ভেতর ঝুলঝাঁপ্পি অন্ধকার। কোথাও-কোথাও মিয়োনো আলো লেগে। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি টেনে দেখল আটটা কুড়ি। তার মানে অনেকটাই বেলা। আর তখনই কোথা থেকে যেন ভেসে এল, 'তুমি একলা ঘরে বসে-বসে কী সুর বাজালে।' প্রায় সকালেই কোনও-না-কোনও গানের লাইন এভাবে মাথায় ঢুকে সারাদিন বেজে যায়। বেজে যায়।

দক্ষিণ কলকাতার এই প্রাচীন দোতলা মেসের দোতলার বাঁ-দিকের ঘরে রবি ছাড়া আরও দুজন থাকে। ডাইনের ঘরে লাদাই করা পুরোনো ভাঙাচোরা চেয়ার, চৌকি, ট্রাঙ্ক। সেখানে অন্ধকার অনেক গাঢ়। রবির এ-ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশ, সি. এম. ডি. এ.-র ঘটঘটাং। বাস-ট্রাম, মানুষজন। এ-ঘরে রবি প্রায় বছর-পাঁচেক। সিট-রেন্ট পঁচাত্তর। খাওয়া-দাওয়া বাইরে। এত সস্তায় সিট পাওয়ার পিছনে রবি যে-কাগজের করেসপনডেন্ট, তার চিফ রিপোর্টারের কৃতিত্ব। পাকা চাকরির ব্যবস্থা না করলেও তুতিয়ে-পাতিয়ে একটা সিট—।

গানের দুটো লাইন রবির মাথার ভেতর। বিছানা ছাড়তে-ছাড়তে দেখতে পায় বোসদা আর ভটচায্যিবাবু আগেই উঠে পড়েছেন। একজন সরকারি আপিসের কেরানি। অন্যজন বিমা কোম্পানির এজেন্ট। সাইড ইনকাম লটারির টিকিট বিক্রি।

বোসদার সরকারি আপিস, সময়ের বালাই নেই। এগারোটার আগে বেরোন। ভদ্রলোকের ধারণা তিনি পলিটিকসের সবটা বোঝেন। খান তিন/চার ইংরেজি, বাংলা কাগজ পড়েন খুঁটিয়ে। রবি যে-বাংলা দৈনিকের করেসপনডেন্ট, তাকে উঠতে-বসতে গালাগালি। এসব গায়ে মাখলে চলবে না, এ ভেবে রবি হাসে। মাঝে-মাঝে মদ্যপান করেন বোসদা। মাসের প্রথম দশ দিনের দু-দিন কাগজে মুড়ে পাঁইট আনেন। বিলিতি। সাধারণত রাম। তারপর চান করে কাচা-কাপড় পরে চুলটুল আঁচড়ে গেলাস-বোতল নিয়ে বসেন। সিগারেট

পোড়ে। নীচের দোকান থেকে আনান কাটলেট। পঁয়তাল্লিশ পেরুনো বোসদাকে কখনও বাড়ি যেতে দেখেনি রবি।

ভটচায্যিবাবু বিমার লোক। চল্লিশের মধ্যে বয়েস। বয়েসের তুলনায় অনেকটা গম্ভীর। দিনরাত হিসেব কষেন। ঘন-ঘন সিগারেট খান। এন্টারটেইনমেন্ট বলতে সিনেমা দেখা—তাও উত্তম-সুচিত্রার পুরোনো বাংলা ছবি হলেই ভালো। মন ভালো থাকলে দরাজ-গলায় সেইসব ছবির গান গেয়ে যান। বর্ধমানে বাড়ি। এখনও বিয়ে করেননি।

রবি জানে, ভটচায্যিবাবুর পাইলস আছে। বাথরুম সারতে দেরি হয়। তাই এখনই চেষ্টা না করে একবার মোড়ের মাথা ঘুরে আসার কথা ভাবল।

রোজ সকালে এই এক টেনশন। নিজের কাগজ আর অন্য সব কাগজ মিলিয়ে দেখা। কোনও খবর বাদ গেল কি না। বিশেষ করে ওর এলাকার। কাগজে-কলমে রবি সাউথ সুবারবন করেসপনডেন্ট। মাস গেলে রোজগার সাকুল্যে চারশো। এক কলম ছাপা হলে দশ টাকা। রিটেনারশিপ দেড়শো। তাও ভাউচার পেতে-পেতে প্রতি মাসেই সাত/আট হয়ে যায়।

আকাশের মেঘ এখন একটু ফিকে। দরজা টেনে রবি রাস্তায়। মুখে পেস্ট লাগানো ব্রাশ। তার খবর করার এলাকা বলতে রবীন্দ্রসদনের পর থেকে সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ। চিড়িয়াখানার লিটিগনের বাচ্চা থেকে শুরু করে ক্যানিংয়ে নৌকোডুবি—যে-কোনও একটা ফসকালেই গেল। চিফ রিপোর্টার সুজয় সেনের গালাগালি।

এসপ্লানেড ইস্টের মিটিং-সমাবেশ, মিউজিয়ামে এ-মাসের প্রদর্শনী—এসবও কখনও-সখনও লিখতে হয় রবিকে। তখন খবরের আগে লেখা হয় নিজস্ব প্রতিনিধি। দক্ষিণ শহরতলির সংবাদদাতা লিখলে বাকি স্টাফ রিপোর্টাররা চেঁচিয়ে ডেস্ক ফাটায়।

রবি রাসবিহারীর মোড়ে প্লাস্টিক চাপা সরিয়ে সব কটা কাগজ একে-একে নাড়ল। নাহ, খবর মিস হয়নি। নিজের কাগজে চিফ মিনিস্টারের মিটিং-এর স্টোরি প্রথম পাতায় ডবল কলম। ভালো লাগল। মনে-মনে খবরের লম্বাই মাপে। প্রায় কলম-দেড়েক, তার মানে টাকা-পনেরো। ফুল নিশ্চয়ই দেখবে। ওর মা-ও। রবি জানে, ফুলদের বাড়ি এ-কাগজ কেনে। আর তখনই কোনও না-জানা কারণে তার মন খারাপ হয়ে যায়।

ঝুপ-ঝুপ বিষ্টি এল।

তাড়াতাড়ি প্লাস্টিক দিয়ে সব কাগজ ঢাকল রবি। হকারটি ওকে চেনে। তার ফলে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে না। বিষ্টি তেমন জোরে নয়, তবু হাঁটতে ভালো লাগছে না। একটু এগিয়ে সিগারেটের দোকান। এক প্যাকেট চার্মস নিল। একটা দেশলাই। দশ টাকার নোট, তবু ভাঙানো গেল না। কী যে খুচরোর আকাল এখন! এ নিয়ে অন্য কাগজে স্টোরিও বেরিয়েছে। দশ পয়সা দু-পয়সা গালিয়ে তৈরি হচ্ছে সব চেন। বাসে-বাসে দু-টাকা করে বিক্রি। রবির কাগজ ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। স্টোরিটা নিজের কাগজে দিতে পারলে কদর বাড়ত।

সিগারেট নেওয়া হল না। বিষ্টি এখন সহস্রমুখী ধারা। শব্দ ওঠে ঝমর ঝম। আজ জুনের বারো। আটই জুন বর্ষা আসার কথা। তার মানে ঠিক সময়েই মৌসুমী বাতাস। রবির মাথায় সকালের সেই সুর—'তুমি একলা ঘরে বসে-বসে'...। দ্রুত মেঘমল্লারে আলাপ জমায় কোনও ওস্তাদ, এমনই বিষ্টির পতনধ্বনি। তারপরই রোদ হাসে। আষাঢ়ের আকাশে রোদের কদম ফুল। রবি বুঝতে পারে না এই প্রকৃতি, এই নারী। দুজনকেই বসায় এক আসনে। এই আলো, এই অন্ধকার। এই হাসি, এই বিষাদ। মনখারাপ গাঢ় হয়।

কাদামাখা রাস্তা, গাড়ির চাকা ছেটকানো নোংরা জল-কাদা বাঁচিয়ে পা টিপে-টিপে মেসে আসে। সিঁড়ির কোণে, বাঁকে তখন আঁধার ঝুলে আছে। ঘরের দরজা হাঁ। ভটচায্যিবাবু গুন-গুন করছেন, 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন/ কবে যাব / কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।' রবি বুঝতে পারে, আজ ওঁর বাথরুম ক্লিয়ার। একটু আগে চান সেরেছেন। জুলফির নীচে, ঘাড়ে স্নানজলের বেয়ে আসা স্মারক। বোসদা নিজের চৌকিতে আধশোয়া। খালি গায়ে 'টেলিগ্রাফ' পড়ছেন। আড়চোখে রবিকে দেখে মুখ তুললেন।

তারপর বললেন, আরে দ্যাখো, দ্যাখো। পেজ লে আউট কাকে বলে! কী ছাপা! রবি চুপ। কথার মোড় ফেরায়—একটা সিগারেট দিন তো, বোসদা। মিত্যুন বোস নড়েন। ওঠেন। দেওয়ালে ঝোলানো জামার পকেট থেকে প্যাকেট এনে ছুড়ে দেন রবির দিকে। রবি সিগারেট নেয়। দেশলাইও জ্বালে। ঘরের বাতাস ধোঁয়ার গন্ধে একটু অন্যরকম। নিজের কোঁচকানো ময়লা বিছানার চাদর, তেলচিটে তোশক, বালিশ গুটিয়ে চৌকির ওপর ডাঁই করতে-করতে রবি বলে, বোসদার কি আজ রেইনি ডে?

বাইরে আবার বিষ্টি নামে। রবির মাথায় সেই পাগল-করা গানের সুরের পাক। প্রায় তিরিশ ছোঁয়া তার শরীর চৌকির ওপর থেবড়ে বসে। অনুকূল ভটচায্যি তখন গলা ছেড়ে গাইছে রিমঝিম বিষ্টি / মাটির কানে কানে কী আশা নিয়ে যায় ঝরে...।' ঘনায়মান অন্ধকার তিনটি বয়েস একসঙ্গে ঢাকে।

সাজানো বাগান

পুলক একসময় নকশাল করত। এখন বাগান করে। কলকাতার ইদানীং এ এক উটকো ফ্যাশান। 'গাছ লাগান শহর বাঁচান'—এই স্লোগান দেওয়ালে লেখা হয় ক (ই)-র রাইটার্স অভিযান বা সিটুর কলিকাতা জেলা সম্মেলনের পাশাপাশি।

রাসবিহারী মোড় ছাড়িয়ে ক্যাওড়াতলার দিকে যেতে ডান-হাতের ফুটপাতের লাগোয়া শিখ গুরুদ্বার। পাশের গুরুদ্বার পার্কে এখন পাতাল রেলের দৌলতে দিন-রাত্তির ঘট-ঘটাং। ঘটাং-ঘট। হুড়ুম-দুড়ুম। বক্সিং-রিং, বিকেলে বসা, বেড়ানো, মিষ্টি-মিষ্টি প্রেম করা—সব এখন চৌপাট। এর গা-লাগোয়া বড়সড় বাঁধানো ডাস্টবিন। তারপরই পুলকদের ফুটপাত-বাগান 'সবুজ-স্বপ্ন'। নাম রবির দেওয়া।

পুলক জানে, এই প্রথম বর্ষা মাটি তৈরির সময়। এখন জিনিয়া-কোচিয়া-গ্যালাডিয়া-গমফরেনার চারা তৈরি হচ্ছে। আর দোপাটির চারাও। জুলাইতে তৈরি হবে ছোট চন্দ্রমল্লিকার কাটিংস। অগাস্টে বড় চন্দ্রমল্লিকার। ছোট চন্দ্রমল্লিকা বলতে পমপম। বড় জাত—স্নোবল, সিমসন, কিউ কি বেরি, আর সি প্রিন্স।

আকাশে ঝুড়ি-ঝুড়ি মেঘ। পুলক নজর দিল বাঁদরের খাঁচায়। তিনটে বাঁদর। রড ধরে কিচিকিচি। পাশে পাখি আর ভাল্লুকের থাকার জায়গা। বাঁদরের খাঁচার পাশে দু-চারজন। বেলা বাড়লে ভিড় আরও বাড়বে। মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম দ্যাখে মদন। ভাল্লুক-বাঁদরের খাঁচা পুতান। পাখির দেখাশুনো বাচ্চু।

পুলক গাছে ডুবে থাকে। ফুটপাতের এ-বাগানে বড়সড় কৃষ্ণচূড়ার ডালে নানারকম মশলা আর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে অর্কিড বাঁধে। পুলক জানে, বড় চন্দ্রমল্লিকায় লাগে রেড়ির খোল। মাটি তৈরি তিন+এক+এক —এই ভাগে। তিন ভাগ মাটি, এক ভাগ গোবর, এক ভাগ পাতা, কিছুটা চুন। টবে চারা দিতে গেলে লাগে ওই ভাগের সঙ্গে দু-চামচ হাড়ের গুঁড়ো।

তিনটে ময়ূর আছে পাখির খাঁচায়। একটা ময়ূর, দুটো ময়ূরী। পুলক দেখল, আকাশে মেঘের ডিজাইন দেখে পাখা খুলেছে ময়ূর। আবছা আলো লেপটে আছে রংচঙে পাখনার গায়ে। টানা লম্বা তারের জাল ঘেরা জায়গায় ওড়া-উড়ি প্র্যাকটিস করে কয়েকটা পাখি। তাদের উড়ুক্কু ডানায় আঁধার-মাখা আলো বিঁধে যায়। মোটা লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে নাক বের করে ভাল্লুক। নাম শর্মিলা। কয়েকদিন আগেও পুলক ওকে ঘাড়ে-কাঁধে করে পাড়ায় ঘুরেছে। তার ঘাড়ে চড়া ভালুক দেখে তেড়ে এসেছে একপাল কুকুর। নেড়িদের কী ডাকাডাকি! বইতে লেখা 'ভালুক জানে বাসতে ভালো' কথাটা কতটা সত্যি জানা নেই, তবে পুলকের সঙ্গে তার অন্য সম্পর্ক। ইদানীং শর্মিলার—যার ডাকনাম শর্মি—নখ অনেক তীক্ষ্ণ ও বড়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, তাকে কাঁধে তুলে ঘোরা যায় না। বর্ষার মেঘ, বিষ্টির জল শর্মিকে অস্বস্তিতে ফেলে। বারবার খাঁচার কোণে সিমেন্টের গুহায় ঢুকে যায়। হাওয়ায় বনের গন্ধ ভাসে।

পুলক বাগানের মাটি তৈরি করে। ঘাস তুলে ফ্যালে। রবার গাছের ডালে কলম বাঁধে। গাছের ডালের ছাল গোল করে তুলে সারিডেক্স পাউডার ছড়িয়ে পাতা-মাটি-গোবর সারের মিলমিশ দিয়ে-দিয়ে বেঁধে ফেলা। তার ওপর পাতলা প্লাস্টিকের মোড়ক। ক'দিনের মধ্যেই কলম তৈরি হবে। এখান থেকে হাত-দশেকের

ভেতর অন্য ফুটপাত বাগান 'স্বর্গোদ্যান'-এ রাজহাঁস ডাকছে। এখানে আর জায়গা নেই। না হলে একজোড়া রাজহাঁসও রাখা যেত।

খুব দ্রুত নাচতে-নাচতে একদল মড়া নিয়ে গেল। ভিজে রাস্তায় খই খুঁটে খাওয়ার কাক নেই। বর্ষার জল-বাতাস মুহূর্তে খইদের সাদা চন্দন মাখা শ্বেত পুষ্প বানিয়ে ছাড়ল। হরিবোলের শব্দ সোজা যেতে-যেতে ঢুকে গেল বাঁয়ে। বিষ্টি জোরে নেমেছে, বড় কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে পুলক তার পড়ে যাওয়া দেখছে। বিষ্টির ফোঁটায়, হাওয়ায়, মানিপ্ল্যান্টের বড়সড় পাতা কাঁপছে। সাড়ে দশটার এস সতেরো ডিগডিগ করে চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে 'সবুজ-স্বপ্ন'র একটু আগে থামল। কোনও প্যাসেঞ্জার হাত দেখিয়েছে। আর বাসের পিছন থেকে ছাতা মাথায় বেরিয়ে এল পুতান।

বর্ষায় চেক-কাটা পাজামা বাঁ-হাতে মুঠো করে একটু ওপরে তুলে রেখেছে। আধময়লা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, হাওয়াই চপ্পল। পাজামার পিছনে পাঞ্জাবির একেবারে পায়ের কাছে অজস্র চপ্পল ছেটকানো কাদার ফোঁটা। গাছের পাতা-ঝরা জলে পুলকের দু-কাঁধ ভেজে। বিষ্টি বোধহয় আরও জোরে এল। পুতানের সামনে ছাতার চারপাশে বিষ্টির জরি, যেমনটি সরস্বতী ঠাকুরের সামনে। সিগারেটের ফালি দোকানের সামনে দাঁড়াল পুতান। সিগারেট নিল, ধরাল। বিষ্টি-ভেজা কলকাতার হাওয়ায় ধোঁয়া মিশিয়ে হেঁটে এল 'সবুজ-স্বপ্ন'-এ। গেট খুলে ভেতরে।

শর্মিকে সকালে কোনওরকমভাবে একবার খাবার দেওয়া হয়েছে। তবু পুতানের এসে দাঁড়ানো, গলার শব্দ, ছাতা দিয়ে গরাদে আওয়াজ করা—সব মিলিয়ে শর্মি চঞ্চল। ঘরের ভেতরে চারপায়ে পায়চারি চলে। কখনও গরাদ ধরে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠা। গলায় আদর-শব্দ। পুতান শর্মির গলার তলায় হাত রাখে। তার আঙুল লোমের ভেতর খেলে। কৃষ্ণচূড়ার ছায়া থেকে পুলক বলে, সিগারেটের কাউন্টারটা দিস। পুতান একহাতে ছাতা ও সিগারেট সামলায়। শর্মির শরীর থেকে আঙুল সরিয়ে এনে সিগারেটের হাত-বদল করে। টানে। তারপর এগিয়ে এসে পুলককে বাড়ায়।

তুই কি জানিস, 'স্বর্গোদ্যান'-এর ছেলেরা লটারি করছে! ফার্স্ট প্রাইজ ভারত টি. ভি., সেকেন্ড প্রাইজ বি. এস. এ. রানিং সাইকেল, থার্ড প্রাইজ টাইমপিস। এ ছাড়া একশোটা সান্ত্বনা পুরস্কার। একটা টিকিট তিরিশ পয়সা। আমাকেও একটা একশো পাতার বই গছাবে।

পুতানের কথায় পুলকের উত্তর নেই। সিগারেটে টান দিতে-দিতে বলে, ওসবে অনেক ফ্যাচাং। পাবলিক মানি মানেই বিলা কেস। এর থেকে ভালো একটা সিনেমা শো করা। নগদা-নগদি লাভ। পুরোনো ভালো হিট বই আনলে কথাই নেই। ধর না 'পথের পাঁচালি' বা 'জলসাঘর'। রবিকে ধরলে ও তাড়াতাড়ি করিয়ে দিতে পারবে। রিপোর্টার বলে কথা।

'পথের পাঁচালি' বা 'জলসাঘর' দারুণ ফিল্ম। কিন্তু কোনওদিনই হিট করেনি। এখন তবু ভিড় হয়। তারচেয়ে আনতে হলে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'লালপাথর', 'শাপমোচন'—এরকম বই আনলে পাবলিক অনেক বেশি নেবে। দ্যাখ সেটা ভেবে!

সত্তর/একাত্তরের সশস্ত্র সংগ্রামের পর দীর্ঘ জেলজীবন, পঁচাত্তরের এমারজেন্সি আর সাতাত্তরে হঠাৎ বেরিয়ে আসার পর গাঢ়ভাবে কিছু ভাবনা পুলকের মাথায় ধারাবাহিকভাবে খেলে না। তবুও এই বাগান—'সবুজ-স্বপ্ন', গাছেদের বেড়ে ওঠা, অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষা মাছেদের প্রাত্যহিক জীবন পুলককে ভুলিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখে। কিছু করছি না—এ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে আত্মগোপন করতে চায় বৃক্ষের বেড়ে-ওঠা, বাঁদরের কিচিকিচি, পাখিদের ওড়া-উড়িতে। তবুও কয়েকদিন আগে স্থানীয় একটি বড় বাড়ির ঝি-র হত্যা না আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে লোকাল থানা অফিসারের সঙ্গে তার গলাবাজি হয়।—যান, যান, লিডারি মারবেন না। আপনার মতো অনেক পাতি নকশালের পোঁদে হাত ভরে এখানে এসেছি—এ-কথা শোনার পর পুলক সামান্য দমে। থানার ঝুঁঝকো অন্ধকার, অফিসারের জন্তুময় মুখ, ধাড়ি কোনও

কনস্টেবলের গোঁফ-পাকানো তাকে সেই নিহত স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যখন যুবকদের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হচ্ছে। লক-আপে, জেলখানায় নরকের উল্লাস।

বাস্তব থেকে এই পালিয়ে-থাকার ফাঁকে পুলক কলকাতা ফিল্মোৎসবের 'তান্নির তান্নির' ও সথ্যুর 'বারা'—ছবি দুটি দ্যাখে। 'তান্নির তান্নির' দেখার পর এক আশ্চর্য বিপ্লবী শিহরন বয়ে যায়। সে বাড়িতে এসে লেনিনের 'কী করতে হবে' ঝাড়পোঁছ করে পড়তে বসে। তিনদিন পর আবার তার আশ্রয় হয় 'সবুজ-স্বপ্ন'-র বৃক্ষরা। গাছের নড়াচড়া, বাড়বাড়ন্ত, পাতা-পড়া ও গজিয়ে-ওঠা দেখতে-দেখতে সে রহস্যে ডোবে। মাটিতে চারা লাগায়।

বৃষ্টির লাগাম কেউ টেনে ধরেছে। আকাশ মেঘে মাখামাখি। পুতান ও পুলক বাগানের বাইরে ফুটপাত-লাগোয়া কাঠের বেঞ্চিতে বসে। পুতান এ পর্যায়ে দু-নম্বর সিগারেট ধরায়। বলে, প্রুডেনশিয়াল কাপে ইন্ডিয়া ভালোই খেলছে। মনে হয়, আরও ভালো খেলবে। জিতবেও।

ভারত জিতুক চায় নাই জিতুক, সদ্য তিরিশ পেরুনো পুলকের কাছে ব্যাপারটা তেমন কিছু জরুরি মনে হয় না। আসামে ব্যাপক গণহত্যা ও বামপন্থীদের ন্যাকড়াবাজি, পাঞ্জাবে আকালিদের যাবতীয় কাজকর্ম তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। সংকটের গভীরে টানে। পুলক বুঝতে পারে না, কী করা দরকার। স্বর্গোদ্যানের মতো লটারি না সিনেমা শো—কোনটাতে 'সবুজ-স্বপ্ন' কিছু পয়সার মুখ দেখতে পারে তা ভেবে ভোম মেরে বসে থাকে।

বেলা বাড়ে। বর্ষা-দিনের সময় বোঝা যায় না। দু-একটা এটা-সেটা কথা বলে পুতান বলে, চলি রে!

পুলকের ফেরার ইচ্ছে জাগে না। বাড়িতে বিধবা মাকে দেখে তার কোনও প্রাচীন বৃক্ষের কথাই মনে হয়। যার শেকড় জড়িয়ে-টড়িয়ে রেখেছে সংসার-পাট। ঘর-গেরস্থালি। পুলক আবার বাগানে ফেরে। পুরোনো ঢোলা প্যান্ট গুটিয়ে কৃষ্ণচূড়ার আশপাশে মাটির ওপর দু-চোখ রাখে। মায়া বাড়ে।

খবর এসেছে

সাবেককালের কাঠের সিঁড়ি। বেয়ে-বেয়ে উঠলেই বিজ্ঞাপনের লোকজন। লম্বা করিডর। ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এডিটরের ঘর ছাড়ালেই সাব-এডিটর, রিপোর্টারদের ঘর। সিঁড়িতে ছাতা বন্ধ করতে-করতে রবি দেখল, সিঁড়ি-লাগোয়া দেওয়ালে এ-কাগজের প্রাচীন কত্তা-ব্যক্তির অয়েল পেন্টিংয়ে পায়রার গু। সিঁড়ির কোণেও পায়রাদের অপকম্ম।

হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে নন্দ বেয়ারা। রবিকে দেখেই বলল, আপনার ছাতাটা দেবেন? মোড়ের মাথায় যাচ্ছি দুধ-চা আনতে। ক্যান্টিনে শুধু লিকার।

শীতের কাঁথা আর বর্ষার ছাতা দিতে মানা। জেনেও প্রায় নতুন ফোল্ডিং ছাতা নন্দকে দিয়ে বলল, আমার জন্যে এককাপ।

বেলা দেড়টা প্রায়। চিফ রিপোর্টার সুজয় সেন এখনও আসেননি। বদ্যিনাথদা টেলিফোন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পুলিশের খবর জোগাড় করছেন। সভা-সমিতি তৈরি করছে প্রদীপ। ডুমের আলোয় বর্ষার অন্ধকার মিশে কেমন ফ্যাকাশে ভাব। সাব-এডিটর টেবিলে চিফ সাব মাখন চৌধুরী টেলিপ্রিন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কপি ছিঁড়ছে। পি. টি. আই., ইউ. এন. আই. অনবরত খবর পাঠাচ্ছে—টক্কর-টক। টক্কর-টক।

দুপুরে খাওয়াটা ভালোই হয়েছে। শেষ পাতে আবার একটাকার দই। দু-চোখে ঘুমের আলতো সুড়সুড়ি। রবি নড়ে বসল চেয়ারে। অনেকদিন আগে অপরেশ লাহিড়ীর একটা গান শুনেছিল—'খবর এসেছে ঘর ভেঙেছে / দারুণ ঝড়ে তারের ভাষায় সংকেতে টক্কা টক্কা টরে। টক্কা টরে।' বহুদিন পর গানটা আবার মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আচমকা মাথার ভেতর বেজে উঠল সকালে শোনা সেই সুর : 'তুমি একলা ঘরে বসে-বসে কী সুর বাজালে'। আর অকারণেই তখন তার চোখে জল এল।

ঘুম আর হঠাৎ-কান্না তাড়াতে রবি টেলিফোন টানল। রিং করার চেষ্টা করল চিড়িয়াখানা, আলিপুর পুলিশ কন্ট্রোল। খবর নেই। খবর নেই।

নন্দ চা এনেছে। সুজয় সেন এসে গেছেন চেয়ারে। গরম চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সুজয় সেন বললেন, রবি, আজ কী স্টোরি দিচ্ছ?

এখনও কিছু হয়নি, সুজয়দা।

১০ তারিখ অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' রিলিজ করেছে। গ্লোবে ইংরেজি। বাকি সব হলে হিন্দি। ছবিটা দেখেছ?

সুজয় সেনের মুখে মেঘলা আলোর উঁকি। একটা সিগারেট জ্বেলে চেয়ারে আয়েশি হেলে বসা। শেষের চা-টুকু চোঁ করে মেরে দিয়ে রবি বলল, নাহ।

ছবিটা দেখো। ওটা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত নাও। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি, ইয়াং আর বয়স্ক ফিল্ম-মেকার, সাধারণ পাবলিক, ছাত্র থেকে শুরু করে সিনেমার ব্ল্যাকাররা পর্যন্ত তোমার স্টোরিতে আসবে। দরকার হলে দুটো-তিনটে ইনস্টলমেন্টে বের করব। রোদ্যাঁ নিয়ে যেমন দাঁড় করিয়েছিলে, 'গান্ধী' নিয়েও সেরকম...।

রবির মনে পড়ে গেল বিড়লা একাডেমিতে রোদ্যাঁ-প্রদর্শনীর কথা। সুজয়দা দিন-তিনেক ধরে তাকে গাড়ি অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিলেন। দু-দিন রবির রিপোর্ট ফার্স্ট পেজে গেছল, নামে। একদিন ছয়ের পাতায়, নিজস্ব প্রতিনিধি। কলকাতা তখন রোদ্যাঁ জ্বরে ভুগছে। অসামান্য সব মূর্তি। থিংকার, বার্ঘেস অফ কালে, আদম, ইভ, অরফিউস, ক্যাথিড্রাল, বালজাক। দেখা আর মুগ্ধ হওয়া।

কী, পারবে তো?—সুজয় সেন আবার প্রশ্ন ছোড়েন। রবি ঘাড় নাড়ে।

কই হে বদ্যিনাথ, কিছু আছে নাকি?

বদ্যিনাথ বলে, এখনও করতে পারিনি।

প্রদীপ, সভা-সমিতি প্রেসে দিয়ে দাও। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ব্যাপারটা যেন যায়। মহারাজরা বারবার বলেছেন।—এসব বলা শেষ করে সুজয় সেন টেলিফোন ঘোরান। রবি নন্দকে গত বছরের এসময়কার পুরোনো ফাইল আনতে বলে। বর্ষার একটা কিছু যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়।

দুটো বেজে গেল, এখনও কোনও খবর নেই। লোক্যাল স্টোরি কিছু দাও, সুজয়। এখন থেকে কম্পোজ না হলে পরে বিপদ হবে।—অচ্যুত সরকারের গলা শুনে রবি মুখ তোলে।

অ্যাকটিং নিউজ এডিটর। লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা। মুখের প্যাটার্নে আয়াতোল্লা খোমেইনি। ধুতি-পাঞ্জাবি-চটি। বিয়ে-থা করেননি। পঞ্চাশ পেরোনো অচ্যুত ঠিকুজির বয়েস অনুযায়ী এখনও সাতচল্লিশ। নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে আনন্দ পান। মাঝে-মাঝে 'এরিয়ানে খেলতুম' বলেও। পুজোর সময় বেয়ারাদের বকশিস দেওয়ার ব্যাপারটা 'আমি বিপ্লবী' বলে এড়িয়ে যান। ওরা পিছনে 'অমুকের বিপ্লবী'—এই মন্তব্য সহযোগে খিস্তি ঝাড়ে।

সাব-এডিটর আর রিপোর্টারদের টেবিলের মাঝে একটি বড় টেবিল। ভারত-চিন সীমান্তের ম্যাকমোহন লাইন। ওখানেই বসেন অচ্যুত সরকার। গোটা-দুয়েক বড়সড় বেড়াল এখন টেবিলের ওপর শোওয়া। একটি পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। সবই অচ্যুতের পোষ্য। একটু বাদে ওদের জন্যে পাঁউরুটি আর সন্দেশ আসবে। বেড়াল-কুকুরের প্রতি আশ্চর্য মমত্ব এ-মানুষটির।

অচ্যুত আশ্চর্য সব গল্প বলেন। তাঁর শ-স-ষ-এর উচ্চারণ চ-এর মতো। তার ফলে সুভাষচন্দ্র হন সুবাচচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বসু নাকি নিজে অচ্যুতের নাম দিয়েছিলেন সাকুরাই। অবিশ্যি চিফ সাব বীরেনদা বলেন, আমরা ওকে আড়ালে শকুনি বলি। ও তার থেকেই 'সাকুরাই'-এর সান্ত্বনা বানিয়ে নিয়েছে। নাইট ডিউটি থাকলে সাব-এডিটররা শুনতে পায় অচ্যুত সরকারের সেই আশ্চর্য গল্প—দু-হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে একমন ওজনের স্টেনগান নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের শেষ করে দেওয়া, আই-এন-এ-র হয়ে সাপ খেতে-খেতে বহু রাস্তা মার্চ করে পেরুনো। জুনিয়ার কোলিগরা এসব শুনে পিছনে হাসে। অনেকেই জানে, শনিবার অচ্যুত রেস খেলেন। মাঠে যাওয়ার সঙ্গতি নেই। পয়সা ধরেন বুকির কাছে।

মানুষের এইসব জীবনযাপনের মজা রবিকে ভাবিয়ে তোলে। পুরোনো ফাইল হাতড়াতে-হাতড়াতে তার মাথায় ঘুরপাক খায় কোন লাইন দিয়ে বর্ষার স্টোরি শুরু করবে। আর-এক রাউন্ড চা আসে। সুজয় সেন হাঁক মারেন, কই হে, তাড়াতাড়ি কপি ছাড়ো।

ফুলের কাছাকাছি

মেঘমাখা দুপুরে গ্লোবের সামনে ফুলের জন্য দাঁড়িয়ে রবি। ফুল স্কুল সেরে আসবে। নর্থেরই একটা স্কুলে পড়ায়। বাড়ির কাছে। শো শুরুর তিনমিনিট আগে ফুল এল। হালকা পিংক শাড়ি। ওই রঙের ব্লাউজ। কপালে উজ্জ্বল খয়েরি টিপ। এক হাতে বালা। অন্য হাতে ঘড়ি। সব মিলিয়ে কী যে লাবণ্য! টান করে বাঁধা দীর্ঘ বেণিতে দু-এক কুচি বিষ্টির ফোঁটা পোখরাজ হয়ে আছে। কানের ওপর একগোছা আলগা চুল বাতাসে নড়ল।

রবি দাড়ি কামায়নি। এই এক বিটকেল অভ্যেস। কিছুতেই কামাতে ইচ্ছে করে না। কুঁড়েমি—ফুল ঠিকই বলে। শিশির ধোওয়া তাজা ফুল দেখতে-দেখতে রবি তার ময়লা মতো গালে হাত রাখল।

কী, দাড়ি কামাওনি তো!—ফুলের নাকের পাটা আলতো ফুলে ওঠে। কপালের ডানদিকে একটা শিরা সামান্য উঁচু হয়েই মিশে যায় চামড়ায়। কপাল একটু কুঁচকে গেল। রবি বুঝতে পারে ফুল রাগ করছে।

একদম সময় পাইনি, জানো। সকালেও একটা অ্যাসাইনমেন্ট—।—মিথ্যে কথা শেষ হয় না। ফুলের ঠান্ডা-ঠান্ডা দীর্ঘ আঁখি রবির চোখ থামিয়ে দেয়।—চলো তো, ভেতরে ঢুকি। এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে—, বলতে-বলতে রবি আগে হাঁটে।

দাড়ি কাটতে তোমার কী যে আলসেমি! আসলে আমি যা ভালোবাসি, তা তুমি কখনওই—।

নিভু আলোয় কোনার দামি সিটে বসতে-বসতে রবি আর-একবার ফুলকে দেখে নেয়।—তোমাকে যা দেখতে লাগছে না!

থাক, খুব হয়েছে।—কপট গাম্ভীর্যে ফুল আলতো ঘাড় ঝাঁকায়। রবির বুকের ভেতর তারসানাই বেজে ওঠে।

সিনেমা হলে বসে ইদানীং এ এক আশ্চর্য খেলা। রবির পা ফুলের পা-কে নানাভাবে ছোঁয়। লেহন করে। ফুল আপত্তি করে না। রবি তার পা দিয়ে অনুভব করতে চায় কত সুন্দর গড়ন ওই পায়ের। রবির হাতের ওপর হাত রেখে ফুল বলে, তুমি না ভীষণ দুষ্টু।

রবি শব্দহীন হাসি হাসে।

'গান্ধী' দেখানোর জন্য ছুটি দিয়েছেন সুজয় সেন। অবিশ্যি সে-অর্থে অফিস না গেলেই রবির ছুটি। সমস্ত ছবি জুড়ে কিংসলের অসামান্য অভিনয়ে রবি মুগ্ধ। গান্ধী ক্রমশই মিথ হয়ে দাঁড়ান। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখানো হয়। রবীন্দ্রনাথ নেই। জওহরলাল, জিন্না, প্যাটেল, আবুল-কালাম-আজাদ আসেন। সুভাষচন্দ্রকে দেখা যায় না। বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা অ্যাটেনবরোর ছবিতে ঢুকতে পারেননি।

ফুলের পাড়ে সুড়সুড়ি থেমে যায়। কস্তুরবা মারা যাচ্ছেন। শয্যার পাশে গান্ধী। অসামান্য প্রকৃতি চারপাশে। আলোছায়ার নিখুঁত খেলা। চোখ দিয়ে জল গড়ায় মোহনদাস করমচাঁদের, রবি কেঁদে ফেলে। তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। সেই 'পথের পাঁচালি'র দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য, ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু, ঘটি গড়িয়ে জলে পড়ে যাওয়া। দিদির চুরি করা হার আবিষ্কার করে অপুর পুকুরে ছুড়ে ফেলা, তারপর পাশ সরে গিয়ে আবার যে-কে সেই—এসব দৃশ্য রবিকে কাঁদিয়েছে বারবার। কেন যেন তার মনে হল, কস্তুরবার এই চলে যাওয়া—এ-ছবির সেরা শট।

গান্ধীর মৃত্যু দিয়ে ছবি শেষ এবং শুরু। হলের বাইরে বেরিয়ে ফুল বলল, খুব খিদে পেয়েছে। রবি তখনও গান্ধীর কাছে ওমপুরির আর্মস সারেন্ডারের দৃশ্য ভাবছিল। শেষবেলার আকাশে আশ্চর্য রং। লাল রং করা মনুমেন্টের মাথায় আলো পড়ে আছে। ঝিরঝির বিষ্টি হয়েছে কিছু আগে। রাস্তা ভিজে। আলগোছে শাড়ি

একটু তুলে ফুল হাঁটে। তার ফরসা গোড়ালির ওপর সাদা সায়ার কুচি লুটোয়। ম্যাড্রাস টিফিনের দোতলায় উঠে আসে। কফি আর আলুবড়া খেতে-খেতে ফুল বলে, ছবিটা একটুও ভালো লাগেনি। স্রেফ তোমার জন্যে —। এর চেয়ে 'আন্ধা কানুন' ঢের ভালো ছিল।—গরম কফি চলকে ওঠে। রবি আশ্চর্য মুখে ফুলকে দ্যাখে। প্রকৃতি আর নারীর রহস্য কিছুতেই ধরা পড়ে না। ফুল চোখ টান-টান করে বলে ওঠে, কী এত দেখছ বলো তো?

এসপ্লানেড থেকে মিনিবাসে উঠতে-উঠতে রবি দ্যাখে কলকাতার আকাশে অন্ধকারের প্যারাশুট আস্তে-আস্তে খুলছে। সাদা আর হলুদ আলো বিঁধে যাচ্ছে তার গায়ে। ফুলকে উত্তর কলকাতায় ওর পাড়াতে নামিয়ে রবি ফেরে। আকাশ ভেঙে বিষ্টি নামে। বাস থেকে নেমে অফিসের দিকে হেঁটে আসতে-আসতে রবি টের পায়, রাস্তায় জল জমেছে। প্যান্ট গোটাতে হয়।

দোতলায় সাব এডিটর, রিপোর্টার রুমে থিকথিক ভিড়। অনবরত ছাপা খবর উগরে যাচ্ছে টেলিপ্রিন্টার। সুজয় সেন রবিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই তো রবি! কী খবর 'গান্ধী'র? দেখেছ?

রবি ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ।

ওপিনিয়ন ফর্ম করাও। নানা অ্যাঙ্গেলে ইন্টারভিউ করো। ব্যাপারটা নিয়ে লাগিয়ে দাও তো। আর শোনো, মিউজিয়ামের এডুকেশন অফিসার শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী ফোন করেছিলেন। এ-মাসের এগজিবিট অফ দি মান্থ নিয়ে বলতে চান। তুমি কাল অবশ্য যাবে বা ফোন করবে।

জোরে বিষ্টি এল। ঘড়িতে প্রায় রাত আটটা। রবি জিগ্যেস করল, সুজয়দা, অফিসের কোনও গাড়ি কি সাউথে ফিরবে?

এখনই নয়। ন'টা নাগাদ।

তাহলে আমায় যদি একটু নামিয়ে দেয়।

কোনও ব্যাপারই নয়। তুমি বরঞ্চ একটু ফোন ঘুরিয়ে লালবাজার, ফায়ার বিগ্রেডটা দ্যাখো। রিভার ট্রাফিকটাও একবার দেখে নিয়ো।

জল পড়লেই কলকাতার ফোনের তেরোটা বেজে যায়। কুঁ-কোঁ-কোঁ—অদ্ভুত সব শব্দ বেরিয়ে আসে। যন্ত্রণাবিশেষ। ধরা পড়ে না কোনও লাইনই। এদিকে লোডশেডিংয়ের জন্য বন্ধ মেশিন। পি. টি. আই., ইউ. এন. আই. কপি আনতে লোক পাঠাতে হয়। রবি ঢিল দিয়ে চেয়ারে বসে থাকে। আনমনে সিগারেট টানে। হাতের কাজ একটু ফাঁকা হলেই সুজয় সেন গলা তুলে বলেন, শোনো, 'গান্ধী'র ওপর প্রথম লেখাটা কালকেই চাই।

রবি কাঁচুমাচু হয় পরশু করুন : কাল সারা দিনটা একটু ঘুরি।

সুজয় সেন ঘাড় নাড়েন—ঠিক আছে।

অফিসের গাড়িতে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট দিয়ে যেতে-যেতে রবি দেখতে পায়, রাস্তার দু-পাশের যাবতীয় ঝকঝকে সাদা আলো আকাশের গলায় হিরের হার হয়ে ঝুলে আছে। গাড়ি বড় দ্রুত দৌড়য়। এসপ্লানেড পেরিয়ে যাওয়ার পর বিষ্টির চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না।

মেসে ঢোকার আগে মোড়ের পাঞ্জাবি দোকান থেকে দই আর রুটি খায় রবি। রোজ-রোজ তড়কা-রুটি সহ্য হয় না বর্ষায়।

মেসে লোডশেডিং। পুরোনো দিনের সিঁড়ির কোণে-কোণে বর্ষার গুমো গন্ধ। সিঁড়ির কাঠের রেলিংয়ে একটা প্রায় নিভে-আসা মোমবাতি। নীলচে আলো ক্ষয়ে যাওয়ার মুখে লালচে হয়ে এসেছে। অন্ধকারে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে দোতলায় ভেজানো দরজা খুলল। ঘরের ভেতর ভটচায্যিবাবু আর বোসদা অন্ধকারে মুখোমুখি। বোসদা আস্তে-আস্তে মদ ঢালছেন। বাইরে বাজের চিকুর হানা। বিদ্যুৎ-আলোয় রবি একঝলক দেখল, বোসদার মধ্যিখানে সিঁথি-কাটা পাট-করা চুল মুখের একফালি, ভটচায্যিদার গলা, কানের পাশ। বাতাসে হালকা রামের গন্ধ।

নিজেকে বিছানা চৌকিতে ঢেলে দিয়ে রবি বলল, বোসদা, কেমন জমেছে!

গেলাস বোধহয় ঠোঁটের আগায় লাগানো। জবাব দিতে তাই একটু দেরি।—জমল আর কোথায়, ভাই! ভটচাজ তো 'মুক্তি'র গান জানে না। আর 'দেবদাস'-এ সায়গলের গান—'কাহারে যে জড়াতে চায় দুটি বাহুর লতা'—তাও ওর জানা নেই। কী করে জমে! কই রিপোর্টার, একটা সিগারেট দাও তো।

প্যান্টের পকেটে দোমড়ানো প্যাকেট বের করে একটা দিল মিত্যুন বোসকে। আর দুটো আছে। অনুকূল ভটচায্যিকে একটা দিয়ে নিজেও ধরাল। বাথরুমের সিগারেট কাল সকালে ভটচায্যিদার কাছে পাওয়া যাবে, এই ভরসায়। বাইরে আবার ঝেঁপে বিষ্টি এল। ফুলের কথা ভেবে তখনই মন খারাপ। মনে পড়ল, কতদিন দেখা নেই কাকিমার সঙ্গে। বাবা, ছোটভাই—। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে-দিতে রবি শুনতে পেল ভটচায্যিদা গাইছেন, 'তুমি আসবে বলে সারা বেলায় দুয়ার খুলে আছি'। কত দিনের যে পুরোনো গান! রেডিয়োতে রবির কিশোর বয়েসে একটা নাটক হত। নাম—'কাচের খেলনা'। তাতেই ছিল এ-গান। একটি খোঁড়া মেয়ে, তার বিধবা মা, রাগী দাদা আর শিংওলা কাচের খেলনা ঘোড়া নিয়ে এ-নাটক।

মন আরও খারাপ হয়। বালিশে মুখ চেপে রবি ঘুম ডাকে।

উই আর ইন দি সেম বোট, ব্রাদার

শিস দিয়ে পুতানের মতো গান তোলার ক্ষমতা খুব কম ছেলেরই। আজ সকালে আকাশ আশ্চর্য নীল। রোদের সোনালি ডানা চারপাশে। 'সবুজ-স্বপ্ন'-এ বসে রবি, পুলক, পুতান, বাচ্চু সময় কাটায়। এখন সকাল আটটা। ভোরবেলা রবিকে ডেকে এনেছে পুলক। 'স্বর্গোদ্যান'-এর ছেলেরা লটারি করে টাকা তুলছে। 'সবুজ-স্বপ্ন' তাহলে কীভাবে এগোবে? রবি চার্মস ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর বলে, দরকার হলে আমরা কৌটো নিয়ে বেরোব।—পুতান একমনে শিস দিয়ে যায়—'উই আর ইন দি সেম বোট, ব্রাদার। উই আর ইন দি সেম বোট, ব্রাদার...।' ভূপেন হাজারিকার গাওয়া এই অসাধারণ গানের সুর রবির মাথায় ঢুকব-ঢুকব করে, আর তখনই ওর মনে পড়ে যায় আজ 'গান্ধী' সিরিজের প্রথম ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে। ভাবনা মাথার একপাশে সরিয়ে রবি বলে, ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। পুতানের পয়েন্টও ফেলে দেওয়ার নয়। একটা সিনেমা শো—।

সবটাই কিন্তু তুই ওপর-ওপর নিচ্ছিস।—বলতে-বলতে পুলক ততক্ষণে বাগানে নেমে পড়েছে। রবি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পুলক পাতাবাহারের ডাল বেঁধে দিচ্ছে। মানিপ্ল্যান্টের নতুন ডাল জড়িয়ে দিচ্ছে গাছের কাণ্ডে। পুতান তার শিস অব্যাহত রেখে এগিয়ে আসে শর্মির খাঁচার পাশে। পায়চারি করা ভালুক রডের ফাঁক দিয়ে নাক বের করে। কিছুটা মুখও। আদরের লালা ঝরে। পুতানের আঙুল শর্মির নাকের ওপরে সুড়সুড়ি দেয়।

তিনটে বাঁদরের ভেতর দুটো ছেলে। একটা মেয়ে। মেয়েটার নাম বেগম। একটা ছেলের নাম বাদশা। অন্যটা শাহজাদা। খাঁচার গরাদে অদ্ভুত কিচিমিচি। পুতানের শিস ওদের তুলে ধরে। গরাদ বায়। ঘুরে-ফিরে 'উই আর ইন দি সেম বোট, ব্রাদার' চালাতে-চালাতে পুতান খাঁচার কাছ থেকে সরে এসে অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে দাঁড়ায়। নতুন বাচ্চা দিয়েছে ব্ল্যাক মলি, সোর্ড টেল। হাতঘড়িতে ন'টা পনেরো। রবি উঠে পড়ে।—রবিবার বসব। একটা কংক্রিট ডিসিশান নিতে হবে। এভাবে হবে না।

পুলক পুরোনো দিনের কৃষক হয়ে ভিজে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে থাকে। মনে পড়ে, গোপীবল্লবভপুরের এবং খেতমজুরের সঙ্গে কোনও ভূমির ঘ্রাণ নেওয়ার এক আশ্চর্য স্বপ্ন। তখন মুক্তির দশকের ভাবনা। এখন পলাতক সৈনিক।

কয়েকদিন একটা গোলমাল কোত্থেকে যেন ঢুকে পড়েছে। নানান ভাবনার মধ্যেও পুলক টের পায়। সি. এম. ডি. এ.-র লোহা সিমেন্ট বালির টোপ। টালিগঞ্জের কিছু ছেলে বাচ্চুকে টার্গেট করে। কাঁচা পয়সার টান এমনই জিনিস। অচেনা মুখ যখন-তখন ঘুরে বেড়ায়। সে-মুখে হিংস্রতার আবরণ। একদিন বাগানের পাশে বোমা পড়ে। কেওড়াতলায় মদের ঠেক। নানান মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভে ছেঁড়া কাঁথা-কানির ভেতর লুকনো ব্লাডারের

মদ, মহীশূর রাজার বাগানে উটকো বাসিন্দা, গোয়ালঘর, তারপরও সি. এম. ডি. এ.-র সিমেন্ট-বালি-লোহা পয়সার হাতছানি হয়ে সবাইকে ডাকে। যদি কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়।

পুলক লক্ষ করে, তার বাগানের পাশে বোমা পড়ল। বাচ্চুকে অচেনা মুখ খোঁজে। হাওয়া সুবিধের নয়।

বাচ্চু ইদানীং কেমন আনমনা। পাখির দেখাশুনোয় ভাটা। সকাল-বিকেল বাগানে আসা অনিয়মিত। পুলক লক্ষ করে। নতুন করে কিছু বলতে তার ভালো লাগে না। পাছে কেউ 'জ্ঞানদা' বলে সেই ভয়েই সর্বদা সিঁটিয়ে থাকে। তবু দিনে-দিনে বিপদ বেড়ে যায়। বহু ঘা-খাওয়া পুলক কেন যেন বুঝতে পারে। কথায়-কথায় রবিকে জানালে তেমন আমল পাওয়া যায় না। রবির 'গান্ধী' নিয়ে লেখা তিনটে ইনস্টলমেন্টের দুটো দারুণ হাততালি পায়।

সুজয় সেন পার্সোনালি কংগ্র্যাচুলেট করলেন রবিকে। রবি মাথা নিচু করে থাকে। তারপর হঠাৎই বলে ওঠে, চাকরিটা পার্মানেন্ট করে দিন। না হলে বিয়ে করতে পারছি না। সুজয় সেন হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যান।

মুখোমুখি

আজ রবিবার। 'স্বর্গোদ্যান'-এর লটারি হল। রেজাল্ট বেরোবে একটু পরে। বহুদিন পর ফুল এসেছিল রাসবিহারীতে। রবি তখন কাঠের চেতলা ব্রিজের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই চেতলা বয়েজ স্কুল। সঙ্গে পুতান। এমনিই হাঁটতে-হাঁটতে চলে আসা। কেন যেন বাচ্চু আজকাল চট করে কোথাও যেতে চায় না। আকাশে মেঘের হুড়োহুড়ি। সিমেন্টের পাকা ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে ফুল আসছে। এখন ঠিক আকাশের ক্যানভাসে একটা রঙিন ম্যাগাজিন থেকে কাটা ছবি। বিজ্ঞাপনের মেয়েরা যেমন হয়। সানসিল্কের বিজ্ঞাপনে যেমনটি দেখায়, তেমনি একপিঠ খোলা চুল। ফুরফুরে, অথচ বেহিসেবি ওড়ে না। হালকা চাঁপা রঙের সিনথিটিক শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। কনুই অব্দি ওই রঙের ব্লাউজ। চোখে আবছা কাজল। লিপস্টিক নেই। ফুল নামছে। পায়ের শব্দ রবির বুকের স্পন্দনের সঙ্গে একসুরে বাজে।

কী ব্যাপার, খবর না দিয়েই...।

দেখতে এলাম কী রাজকার্য করো। সবার জন্যে সময় আছে—নেই কেবল আমার জন্যে।

রাস্তার ময়লা জমা জলে ফুলের নিটোল ছায়া। আকাশের পাখি ছায়া হয়ে জলবন্দি ফুলকে ছুঁয়ে গেল।

রবি বলল, চল পুতান, ওপারে যাই।

তোমার আজ অফিস নেই! সেই যে একসঙ্গে 'গান্ধী' দেখলুম, তারপর একটা খবরও নেই।

আমার খবর তো রোজই পাও।

ফুল বুঝতে না পেরে দাঁড়ায়।

রবি বলে, কেন, কাগজে পড়ো না আমার স্টোরি? ভালো না থাকলে আর খবর ছাপা হয় কীভাবে?

আকাশের মেঘ উঠে আসে ফুলের মুখে। পুতান বলে, আমি এগোই। তোরা আয়।

সিমলাই কাফেতে কিছু সময় কাটে। ফিশ রোল দাঁতে কাটতে-কাটতে ফুল হাসে। রবির দাড়ি-না-কামানো গালের জন্য বকুনি দেয়। ফুলকে বাসে তুলে দেয় রবি। যাওয়ার আগে ফুল বলে, 'গান্ধী' নিয়ে লেখাটা খুব জমেছে।

'সবুজ-স্বপ্ন'র দিকে আসতে-আসতে বোমার শব্দ শুনতে পায়। পরপর তিনটে। কোন অজানা মন্ত্রে নিভে যায় রাস্তার আলো। আশপাশের বাড়ির দোতলা থেকে আসা আলোয় রবি রণক্ষেত্র আবিষ্কার করে। দুদ্দাড় পায়ের শব্দ, এলোমেলো ছুটে যাওয়া পায়ের ছবি, হই-চিৎকার। রবি দেওয়ালে পিঠ রেখে সাবধানে এগোয়। আবার বোমা পড়ে। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী।

হঠাৎ হইহই চিৎকার, খিস্তি ছুটে আসে কালীঘাটের দিক থেকে কেওড়াতলায়। পরপর বোমা ফাটে। গুলির আওয়াজ শোনা যায়। একটা ভিড় চেতলার পাকা ব্রিজের ওপর ওঠে। ওখানে কোনও আলো নেই। সাত-আটটা টর্চ জ্বলে ওঠে। বাচ্চু আর নকার নাম ধরে ছোটে খিস্তির ফোয়ারা।

শুধু সি. এম. ডি. এ.-র বালি, সিমেন্ট, রড, শ্মশানের চোলাইয়ের হিস্যা নিয়ে নয়। এ-যুদ্ধ নকাকে নিয়েও। বেহালা থেকে দু-দুটো মার্ডার কেসের আসামি নকা এখন এখানে ওয়ান্টেড হয়ে আছে। অ্যাকশান করছে। কালীঘাটের এদিকের ছেলেরা নকাকে পেয়ে টালিগঞ্জ চেতলার ক্যাওড়াদের চমকাচ্ছে। গোটা ছবি রবির সামনে পরিষ্কার। এর ওপর একটা স্টোরি করলে কেমন হয়, ভেবে নিয়ে রবি এগোয়।

অজস্র মানুষ গোল করে কালীঘাটের দিকে চেতলা যাওয়ার পাকা ব্রিজের সীমানা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের আশেপাশে এদিককার দাদা-ভাইয়ারা। নকা অবিশ্যি স্পটে নেই। লুঙ্গি গুটিয়ে খালি পায়ে হাতে পেটো নিয়ে ঘুরছে বাচ্চু। রবির মন খারাপ হয়ে গেল। শেষমেশ এ-লড়াইয়ে বাচ্চুও!

পাকা পোলের পেটের ওপর থেকে টর্চ জ্বালানো-নেভানো আর মা-মাসি উদ্ধার চলেছে। হঠাৎ ভিড় একটু যেন ছিটকে গেল। চনমনে ভাব। সবাই প্রায় দৌড়চ্ছে। রবি দেখল, একটা ঢাউস পুলিশ ভ্যান গুরগুর করে আসছে। ব্রিজে উঠতে যা সময়। দমাদম দুটো মাল পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চারগুণ স্পিডে ব্যাক করল গাড়ি। পাবলিক আবার তামাশা দেখতে জোটে। ব্রিজের পেটের ওপর সেই টর্চের ঝলকানি। পায়ের কাছে পাবলিকের চক্রব্যূহ। মিনিট-পঁয়তাল্লিশ পর একটা ভ্যান, দুটো জিপে পুলিশ হাজির। ও-ব্রিজের মুখে নেমেই পাবলিককে তাড়ায় পুলিশ। হুড়মাড় দৌড়। রবি একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে। একটা ক্যামেরা থাকলে দারুণ স্পট স্টোরি হত। এই ভেবে আপশোস। পুলিশ তখন ব্রিজের ওপর উঠে পড়েছে। টর্চের ঝলকানি আর নেই। রবি তাড়াতাড়ি রাসবিহারী এসে বাস ধরে ধর্মতলা যায়। তারপর সেখান থেকে অফিস। সাড়ে আটটার ভেতর একটা ডবল কলম নামে। স্টোরির ভেতর নকার নাম থাকে। রবি জানে, এ-স্টোরি ফার্স্ট পেজেই যাবে। একেবারে এক্সক্লুসিভ স্পট রিপোর্টিং।

'স্বর্গোদ্যান'-এর লটারির রেজাল্ট শিকেয় তোলা যাবে।

ঘটনা-ঘটনা

সোমবার প্রথম পাতায় ডবল কলমে মারামারির খবর বেরোয়। সকাল আটটার ভেতরই রাসবিহারী, কালীঘাট, হাজরা অঞ্চলে রবির কাগজ আর পাওয়া যায় না। আর কোথায় যেন বিপদ ঘনিয়ে আসে। সোমবার সকালে 'সবুজ-স্বপ্ন'-এ একবার হাজিরা দেয় রবি। পুতান, পুলককে দেখে যায়। পুলক অনেক চুপচাপ। কোথায় যেন আসন্ন ত্রাসের ছায়া। বাগানের মাটি তৈরি করতে-করতে বলে, কাজটা ভালো করলি না, রবি। এ-রিপোর্টিং তুই না করলেও পারতিস।

কেমন যেন রাগ হয়ে যায়। রবি একটু গলা তুলেই বলে, গাছের সঙ্গে থেকে-থেকে তুইও একেবারে গাছ হয়ে যাচ্ছিস। এত বড় একটা অন্যায়, তাতে রি-অ্যাকট করব না!

কার কাছে রি-অ্যাকট করবি! পুলিশ, প্রশাসন, সাধারণ মানুষ—সবাইকেই তো দেখতে পাচ্ছিস! এতে নিজেরই বিপদ বাড়ানো। তখন ম্যাও কে ধরে!

শোন পুলক, জার্নালিজম করতে এসে আমরা শিখেছি পাবলিক আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের মধ্যে ব্রিজ হল নিউজ পেপার। সমস্ত সমস্যা—যতটা পারা যায়—কাগজে তুলে ধরার একটা নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে। —রবির গলায় হালকা ঝাঁজ।

পুলক আরও আস্তে বলে, অ্যান্টিসোশ্যালদের সম্বন্ধে তোর কোনও ধারণা নেই। যা খুশি লিখব মনে করলেই লেখা যায় না। এ-এলাকায় তোকে থাকতে হবে। ওদের চটিয়ে—।

তুই না এক সময় রাজনীতি করতিস! আদর্শের জন্যে যে-কোনও সময় গুলি খেতে তৈরি ছিলি! তোর মুখে এ-কথা মানায় না, পুলক।

আশ্চর্য বিষণ্ণ হয়ে যায় পুলকের মুখ। এই এক গোপন ঘা, যেখানে রবি খোঁচা দিল। সত্তর দশকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি করে এখনও বেঁচে থাকাটাই যেন অপরাধ। হয়তো রবি একেবারেই সে-অর্থে এ-কথা বলেনি। তবুও পুলকের গভীরে বাজে। সত্যিই তো, রাজনীতি করা পুলক এখন ওয়ার্থলেস। ডেড। অন্যায়ের

প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। আসলে এই স্পন্দনহীন বেঁচে থাকার প্রতি কী এক মায়ায় সে জড়িয়েছে। পাকে-পাকে আরও জড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতি এ কী অন্ধ মোহ!

এই তো সেদিন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড করিয়ে আনল পুলক। মেরুন রঙের পাতলা কার্ড তার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সময় কাউন্টারের ভদ্রমহিলা জিগ্যেস করছিলেন, সে কি, আপনি এতদিন কার্ড করাননি! ঊনসত্তরে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছেন।

রবি উঠে পড়ে। পুলকের চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বৃক্ষেরা শুষে নেয়। গাছ-ঘাস-লতাপাতার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায় পুলক। লজ্জায়।

অফিসে আসতে-আসতে রবির প্রায় তিনটে বাজে। চিফ রিপোর্টার হইহই করে তাকে কংগ্র্যাচুলেট করেন।—দারুণ খেয়ে গেছে তোমার স্টোরি। একেবারে এক্সক্লুসিভ। এর ফলো আপ দেবে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু লড়ে যাব। দেখা যাক, কী হয়!

রবির বুক ফুলে ওঠে। ডেস্কে বসতে-বসতে জল চায়।

রাসবিহারী মোড়ের সন্ধে ছটা। একটু আগে বিষ্টিতে থকথকে কাদা মোড়ের মাথায়। সি. এম. ডি. এ.-র গর্তে হাঁ-করা অন্ধকার। একটু এগোলেই ডান ফুটপাতে ফলের দোকান। ল্যাংড়া আম ক'দিন আগে উঠে গেছে। এখন ফজলির সময়। পাশাপাশি কলা, মুসাম্বি। তার গায়েই বোবাদের সান্ধ্যকালীন নিত্য মেলামেশা। হাত-পা নেড়ে মাইম-আড্ডা। জনা সাত-আট। সবই স্বাভাবিক।

তারপরই হঠাৎ কেওড়াতলার আশপাশে আলো নেভে। কয়েক জোড়া পা দ্রুত দৌড়ে এসে 'সবুজ-স্বপ্ন'-এর রেলিং টপকায়। পরপর বোমা ফাটে। ত্রাহি চিৎকার দিয়ে ওঠে বাঁদর, ময়ূর। খোলা নেপালার কোপ পড়ে ময়ূরের গায়ে। কেকা-ধ্বনি আর্তনাদে হারিয়ে যায়। ভালুকের খাঁচার ভেতর বোমা পড়ে। একটা...দুটো...তিনটে। ভীরু জানোয়ার কোনওরকমে সিমেন্টের ছোট গুহায় মুখ লুকোয়। তবু আগুনের ঝলকে পিঠের লোম পোড়ে।

লম্বা ভারী রড নেমে আসে অ্যাকোয়ারিয়ামের কাচে। জলভরতি কাচ ভাঙার অন্যরকম শব্দ শোনা যায়। আবার বোমা ফাটে। চিৎকার, গালাগালি। ওরা বাচ্চুকে চায়। সন্ধেবেলা একটু দূরে চা খাচ্ছিল পুলক ও পুতান। দৌড়ে আসে। ওদের জাপটে ধরে অন্ধকার। পুতান কোনওরকমে ছাড়ান পায়। তার জামা ছেঁড়ে। পুলককে চ্যাংদোলা করে তুলে বাগানের ভিজে মাটির ওপর শোয়ায়। তারপর একটার পর একটা ভোজালির কোপ। মাংস কাটা চপারের কোপ। রডের বাড়ি। পাইপগানের গুলি।

বিশাল কৃষ্ণচূড়ার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে থাকে পুলক। এলোমেলো ভোজালির কোপে কেটে যাওয়া দুটি হালকা পাতাবাহারের ডাল তার পিঠের ওপর, গলার পাশে, শুয়ে থাকে। অজস্র রক্তের নদী-নালা বয়। পুলকের শরীর বিষ্টি-ভেজা মাটির মতোই ঠান্ডা মেরে আসে।

সাতটা নাগাদ অফিসে ফোন পায় রবি। সুজয় সেন তখন তাকে চেম্বার অফ কমার্সের হ্যান্ড-আউট ধরিয়েছেন। প্রেস কনফারেন্সে কেউ যায়নি। এর থেকেই খবর করে দিতে হবে। নিউজ হলের চেহারা মোটামুটি একইরকম। সুজয়দা হঠাৎ বললেন, রবি, তোমার ফোন!

শোন, আমি পুতান বলছি। থানা থেকে ফোন করছি। তুই শিগগির চলে আয়। পারলে একটা ফটোগ্রাফার আনিস। বাগান লন্ডভন্ড হয়ে গেছে।

পুতানের স্বরে আতঙ্ক টের পায় রবি। ও কোনও উত্তর দেয় না।

ও-প্রান্ত থেকে টানা কথা ভেসেই আসে!—হ্যালো, শোন, পুলক সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড। বোধহয় বাঁচবে না। ওকে পি. জি.-তে নিয়ে গেছে।

রবির শিরদাঁড়ায় কীসের যেন কাঁপুনি। সকালে এত তর্ক। কথা-কাটাকাটি। এর মধ্যেই...।

তুই শিগগির চলে আয়।—পুতান কথার সঙ্গে-সঙ্গে ফোন নামিয়ে রাখে। তখনও রবির হাতে ধরা রিসিভার। রবি গোটা হলঘর দেখে নেয়। তারপর তার হাতের কালো দূরভাষটিকে দ্যাখে। আস্তে নামিয়ে

সুজয় সেনের কাছে আসে। বলে, সুজয়দা, এখনই গাড়ি চাই। একটা মার্ডার হয়েছে আমার এলাকায়। সঙ্গে মারামারি। স্পটে যাব।

সুজয় সেন নির্বিকারভাবে ফোন তোলেন। নীচে গাড়ি দেওয়ার নির্দেশ দেন কেয়ারটেকারকে। ফোটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের সুজিতকে ডাকেন। গোটা ব্যাপারটা ঠিক করতে মিনিট-দশেক। রবি তখন কাঁপছে উত্তেজনায়, অনুশোচনায়। কিছু রাগেও।

যাওয়ার আগে সুজয় সেন বলেন, শোনো, যতটা পারবে পুলিশকে কোট করার চেষ্টা করবে। কেন হঠাৎ এই ভায়োলেন্স এ-ব্যাপারে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি চাই। বি কুইক। আমি নাইটের চিফ সাবকে বলে রাখছি। এক স্লিপ, এক স্লিপ করে স্টোরি দেবে। কম্পোজ হবে। যাও।

গাড়িতে সুজিত ক্যামেরার ব্যাগ সমেত বসে। পিছনের সিটে নিজেকে ছেড়ে দিতে-দিতে রবি বলল, বানারসি, পি. জি. হয়ে যাব।

হাসপাতালের এমারজেন্সি মানেই নৈনিত্তর। ভাঙাচোরা, মৃত্যু, অ্যাক্সিডেন্ট, খুন-জখম।

বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুজিতকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। একটা ছোট্ট ভিড়। তার মাঝখানে আবছা নীল লোহার খাটে পুলক। রক্ত, স্যালাইন, অক্সিজেন একসঙ্গে। মাথা থেকে মুখের একটা চোখ ঢেকে সাদা ব্যান্ডেজ। সারা ঘরে ওষুধ, রক্ত, মৃত্যুর ঘ্রাণ। পুলকের চোখ বোজা। মাথার কাছে একজন সিস্টার, আপনমনে খাতায় কী লিখছেন। ঘড়ি দেখছেন। দ্রুতপায়ে চলে যাওয়া হাউস-স্টাফ, ডাক্তারবাবুরা। পুলকের মাথার কাছে একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। পায়ের কাছে একজন কনস্টেবল। একটু দূরে ওর বিধবা মা, ভাই।

পুলকের কোনও সাড়া নেই। রবি চুপ করে মিনিট-দুই দাঁড়িয়ে রইল। সাব-ইনস্পেক্টরটিকে জিগ্যেস করল, কোনও নাম বলেছে পুলক? স্টেটমেন্ট দিয়েছে?

সাদা ইউনিফর্ম ভুরু কোঁচকাল।

রবি নির্দ্বিধায় বুকপকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে দেখায়। কোঁচকানো ভুরুতে তখন বিস্ময় মাখানো খাতির।—নাহ। খাতা-পেনসিল নিয়ে তো রেডি হয়ে আছি। যদি কোনও স্টেটমেন্ট—।

সিস্টারকে একটু দূরে ডেকে এনে রবি জিগ্যেস করল, কী বুঝছেন?

ভালো না। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। তা ছাড়া ইনজুরিও ভাইটাল সমস্ত জায়গায়। মাথায়, ঘাড়ে, লোয়ার অ্যাবডোমেনে সিরিয়াস স্ট্যাবিং। পালস পাওয়া যাচ্ছিল না একটু আগে। এখন ভগবান ভরসা।

ভালোমানুষ চেহারার মোটাসোটা সিস্টারটি আবার নিজের জায়গায়। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত স্যালাইন পুলকে মিশে যাচ্ছে।

কে যেন বলল, আরও রক্ত লাগবে। রবি প্রায় দৌড়ে এসে একজন হাউস-স্টাফের হাত ধরে বলল, যেভাবেই হোক পুলককে বাঁচান।

এরপর গাড়ি থানায়। সারা রাস্তা সুজিতের সঙ্গে কোনও কথা হয় না। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যায় রবি।

পুতান ও. সি.-র ঘরে বসা। পাশে এই মামলার আই. ও.। লম্বা করিডর পেরিয়ে রবি ও. সি.-র ঘরে। টেবিলের ওপর দুটো টেবল ল্যাম্প। কাচের নীচে অনেকগুলো কালীর ফটো। রামকৃষ্ণ। মাথার পিছনে দেওয়ালে কালীঘাটের কালীর বিশাল ছবি। একটু মোটার দিকে চেহারার মানুষটি প্রবল ঘামছেন। রবি ওর পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল।

আই. ও. তার পান-খাওয়া দাঁতে ক্লাস সিক্সের ছেলের ভূগোল প্রশ্ন মুখস্থ বলার মতো গড়গড়িয়ে সবটা বলে গেল : ওর কথা অনুযায়ী পুলকদের সঙ্গে পুরোনো ঝগড়ার পরিণতি এ-ঘটনা। পুলক আগে নকশাল করত। ইদানীং বাগান-ক্লাব ইত্যাদিতে মন দিলেও যারা সি. এম. ডি. এ.-র মাল চুরি করে কেওড়াতলা চেতলা ব্রিজের নীচে চোলাই বেচে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বখরা নিয়ে ঝামেলা। ব্যস। তবুও পুলিশ

চেষ্টা করছে অপরাধীকে ধরতে। পুতানের স্টেটমেন্ট পুলিশ নোট করেছে। যাদের নাম পুতান বলেছে এফ. আই. আর.-এ সেসব নামও নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন তো পাকা ক্রিমিনাল। তবে পুতানকে পুলিশ আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। বড়বাবু নিজে ওকে প্রশ্ন করবেন।

ও. সি.-র ঘরে অল্প আলোয় রবি পুতানকে আর-একবার দেখল। বিপন্ন মুখ, ছেঁড়া জামা। মাথার চুল এলোমেলো। পুলিশের সামনে কেমন যেন নার্ভাস হয় সবাই। কিছু পয়েন্টস নোট ডাউন করল রবি। পুলককে মারার ব্যাপারে পুলিশের অতি সরলীকরণ ব্যাখ্যা রবিকে খুশি করেনি। ব্যাপারটার পিছনে আরও কিছু। অন্য কিছু। থানা থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে রবি আর-একবার অসহায় পুতানকে দেখে নিল।

ঘড়িতে আটটা কুড়ি। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল বানারসি। পিছনে পাতাল রেলের হাঁ। আলো। ঘটঘটাং-ঘট শব্দতান। প্রতাপাদিত্য রোড হয়ে গাড়ি রাসবিহারীতে। তারপর জ্যামে মিনিটখানেক। জীবন এখানে একই তরঙ্গে বাঁধা। গৌড়ীয় মঠের বারান্দার নীচে মানুষ। রেডিয়োর গান। অথচ এর সিকি মাইলের ভেতর একটা দাঙ্গা। একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু সরু সুতোয় ঝুলে আছে।

গাড়ি কেওড়াতলার দিকে, বাঁ-দিকে ঘুরল। গুরুদ্বার, গুরুদ্বার পার্ক, ডাস্টবিন তারপরই 'সবুজ-স্বপ্ন'। এখনও একটা আলগা ভিড়। পুলিশের ভ্যান উলটো ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সমস্ত বাগানের আশপাশ জুড়ে ত্রাস। শর্মি, বাঁদরেরা, পাখি, ময়ূর সব চুপ। চারপাশে লোডশেডিং। রবি এগোলো, ছত্রাখান অ্যাকোয়ারিয়াম। ভাঙা কাচ বর্শা-ফলক হয়ে মাথা উঁচু করে আছে। একদম তলায় জল। তার মধ্যে দু-একটা কেতরানো মাছ। মাথার মেরুন ঢাকনা উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে দূরে।

রবি ভেতরে ঢুকল রেলিংয়ের দরজা ঠেলে। ও-ফুট থেকে দৌড়ে এল একজন পুলিশ অফিসার—কী করতে চান, মশাই! ভেতরে যাচ্ছেন কেন?

রবির পিছন-পিছন সুজিতও। ক্যামেরার শাটার টিপছে।

বাইরে চলে আসুন।—পুলিশ অফিসারের কথা অগ্রাহ্য করে রবি প্রায় কৃষ্ণচূড়ার কাছাকাছি।

অন্ধকারে দোমড়ানো ঘাস, ঘাড়-মাজা ভাঙা দোপাটি চারা, কাটা পাতাবাহার, ভিজে মাটিতে ঘষ্টানির চিহ্ন। বুক হু-হু করে উঠল। নোট ডাউন করবে কী!

পুলিশ অফিসার বাগানের গেটের কাছে : কী ব্যাপার, বলুন তো!

রবি গম্ভীর গলায় তার কাগজের নাম বলল। সুজিতকে ডেকে আবার বলল, গোটা বাগানটার একটা ছবি নে।—পুলিশ অফিসারকে ধন্যবাদ দিল। তারপর প্রেস লাগানো গাড়িতে উঠে বানারসিকে বলল, পি. জি. হয়ে অফিস।

এমারজেন্সির সামনে থমকে থাকা কান্না রবিকে দেখে ভেঙে পড়ল। ঢেউ-ঢেউ। অক্সিজেনের নল, স্যালাইন, রক্তের ছুঁচ খোলা। সামান্য হাঁ-করা পুলক। ছুটি হয়ে গেছে।

অফিসে এসে ঠিক গোনা এগারো স্লিপের স্টোরি নামাল রবি। প্রথম পাতার অ্যাঙ্কার হবে। সঙ্গে একটা ডবল কলম ছবি।

পরদিন হইহই। রাসবিহারীতে, হাজরায়, কালীঘাটে রবির দৈনিক মারকাটারি। প্রায় সারাদিন একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে মর্গ, শ্মশান। পুতানকে সকালেই পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। এখন রবির মাথায় কেবল চিন্তা ইনভেস্টিগেশন।

সন্ধের দিকে 'সবুজ-স্বপ্ন'-এ হালকা ভিড়। শর্মির পিঠে ওষুধের পুলটিশ। ডানাকাটা ময়ূর এখনও ঝিমোয়। বাঁদরের কিচিকিচি বন্ধ। ওরা আজ প্রায় কেউই খাবার ছোঁয়নি। ফাঁকা বেঞ্চিতে একলা রবি। বৃক্ষেরা হাওয়ায় দোলে। লোহার রেলিঙের গায়ে পুলকের ফটো-ফ্রেমে সাদা মালা। রবির ভেতরটা কেঁদে ওঠে। উঠে আসে। এলোমেলো হাঁটতে-হাঁটতে ওষুধের দোকান থেকে সুজয়দাকে ফোন করে।—ফলো আপ পাঠাও। কী হল?

রবি চট করে জবাব দিতে পারল না। আস্তে বলল, তেমন কিছু নেই। তবে রাতের দিকে একবার যেতে পারি। সারাদিন খুব টানাপোড়েন গেছে। মর্গ, শ্মশান।

পারলে চলে এসো। আমি আছি ন'টা, সাড়ে ন'টা অব্দি।

ফোন নামিয়ে রাখলেন সুজয় সেন। শব্দ পাওয়া গেল।

আলগা পায়ে হেঁটে এল রবি। তারপর মেসে ফিরে এসে নিরুপদ্রব অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

একদিন হঠাৎ

দু-দিন হয়ে গেছে পুলকের খুনিরা কেউ অ্যারেস্টেড হয়নি। রবির কাগজের স্টোরি পড়ে পুরমন্ত্রী স্বয়ং এসেছিলেন। সঙ্গে পুলিশ কমিশনার। পূর্তমন্ত্রী। নতুন করে বাগান সাজিয়ে দেওয়ার কথা দিয়ে গেছেন মন্ত্রীরা। বলেছেন, পুলকের খুনিদের ধরে শাস্তি দেওয়া হবে।

রবি তখন পাড়ায় ছিল না। পরে খবর পেয়েছে। পাশে থাকলে মন্ত্রীদের ছবি দিয়ে একটা খবর হতে পারত। ভারত প্রুডেনশিয়াল কাপ জিতে নিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ একেবারে ল্যাজে-গোবরে। মোহনবাগান যেভাবে এগোচ্ছে তাতে লিগ পাওয়ার চান্স অনেকটাই—এসব ভাবনার কোনওটাই রবিকে সেভাবে চাঙ্গা করতে পারে না। পুলকের মৃত্যু, একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের পোকা, পয়সার লোভ, সুজয়দার পিঠ চাপড়ানি, আর ভবিষ্যতে যদি চাকরি হয়, এই আশা তাকে তাড়িয়ে ফেরে।

কেওড়াতলা শ্মশান, আদি গঙ্গার ধারে মদের ঠেক, মহীশূর রাজার বাগানের আনাচ-কানাচ, এ-মুড়ো সে-মুড়ো রবি নতুন খবরের সন্ধানে ঘোরে। পুলকের হত্যাকারীদের নাম সে জানে। অথচ লেখার উপায় থাকে না। সুজয়দা বলেন, কেচ্ছা হয়ে যাবে। যদি ওরা কাগজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে!

খুঁজতে-খুঁজতে রবি আবিষ্কার করে বেহালা থেকে আসা পলাতক নকাই শুধু নয়, তিন-চারজন আরও আছে—যারা পুলককে মেরেছে। ওরা নিয়মিত বুক ফুলিয়ে ঘোরে। সি. এম. ডি. এ.-র মালপত্র নিয়ে চোরাই ব্যবসা চালায়। চোলাই বিক্রি করে। নেশায় ভাসে। এদের মধ্যে দুজন একটি খুনের মামলায় সেশান ট্রায়ালে আছে। হাকিম এদের এলাকায় ঢুকতে মানা করেছেন। তবু ওরা ঘোরে।

লোকাল থানায় বলে কোনও ফল হয় না। একটা পলিটিক্যাল পার্টির ছোট অংশ এদের মদত করে।

পুলকের খুনিরা কেন ধরা পড়ে না, সে নিয়ে থানার ও. সি.-র সঙ্গে রবি দু-দিন কথা কাটাকাটি করে আসে। এ মামলার আই. ও.—ইনভেস্টিগেটিং অফিসার—দেশলাই কাঠি দিয়ে পানের কষ ছোবানো দাঁতের কোণ থেকে একটি ছোট সুপুরির কুচি অনেক কষ্টে বের করে বলে, কী করব, দাদা! রোজই যদি একটা না একটা ঝামেলা থাকে, তা হলে কী হবে, বলুন তো। জায়গাটা যে একেবারে ছোটখাটো চম্বল হয়ে উঠল! সি. এম. ডি. এ.-র সিমেন্ট, বালি, লোহা রোজ চুরি। হিস্যা নিয়ে মাঝে-মধ্যেই বঁটি, ক্ষুর, পাইপগানবাজি। এই তো সেদিন বাজারের সামনে ধুনকিকে বঁটি দিয়ে এক কোপ ঝাড়লে। দুটো ছেলে ছিল। পড়ল ধরা! রোজই হচ্ছে, মশাই। কত বলব! জঙ্গল, জঙ্গল হয়ে গেছে। থাকত ব্রিটিশ, পেঁদিয়ে বাবার নাম খগেন করে দিত।

আই. ও.-র কথায় রবির মেজাজের চিঁড়ে ভেজে না। বলে, আমি নাম বলেছি তো! আপনি ওদের ধরুন। না হলে লালবাজারে যাব।

নাম তো, মশাই, আমিও জানি। কিন্তু ধরব কাকে? এই তো পরশু খবর পেয়ে কালীঘাট বাজারের মাগিপাড়ায় রেড করলাম। এ-কেসের দু-মক্কেল নাকি ওখানে ছুপে আছে! কোথায় কী? মাঝখান থেকে মাঝরাতে মেয়েমানুষগুলোকে তোলার জন্যে আমার মা-মাসির নামে অজস্র খিস্তি শুনলাম। পুলিশের সমস্যা তো আপনারা দেখেন না, শুধু দোষই ধরেন! আমিও তো পুলকের খুনিদের ধরে মামলা তৈরি করতে চাই।

ভদ্রলোক কাঠি দিয়ে আবার সুপুরির কুচি খোঁজে।

মনে-মনে 'ধুত্তোর' বলে বেরিয়ে আসে রবি। ঠিক করে, অন্য অ্যাঙ্গেলে রিপোর্ট করে এলাকায় পুলিশি তল্লাশির ব্যবস্থা করবে।

সুজয় সেনকে ব্যাপারটা খুলে বলে রবি। কেওড়াতলা, টালিগঞ্জ রোড, চেতলার একটা অংশে যেসব কুকর্ম হয়, তার ওপর ডিটেলে কভারেজ করতে চাই, সুজয়দা।

সুজয় সেন কী যেন ভাবেন। তারপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলেন, ডান।

খুব ভালো করে মিশে, খবর নিয়ে, একটার পর একটা রিপোর্ট জমা দেয় রবি। ডিটেলে নাম দিয়ে-দিয়ে লেখে কারা এ-সমস্ত অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে। কোথায়-কোথায়, কখন চোলাই বিক্রি হয়। কীভাবে হিস্যা নিয়ে যায় লোকাল থানা। কোথায় তৈরি হয় চোলাই মদ। সি. এম. ডি. এ.-র বালি-সিমেন্ট-রড রাতের অন্ধকারে কোথায় সরে, কারা সরায়, কী দরে বেচা হয়, সমস্ত বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় তার রিপোর্টে।

এ-সিরিজের চারটে রিপোর্টই প্রথম পাতায় অ্যাঙ্কার হয়। রবির দৈনিক কাগজ সাউথে সকাল আটটার পর আর পাওয়া যায় না। মানুষজনের হাতে-হাতে ঘোরে। কাগজের দারুণ কাটতি।

এরই মধ্যে এক মেঘলা দুপুরে অফিসে ফোন পায় রবি। ফুল।

কী ব্যাপার? তুমি কি এখন পুলিশে কাজ নিয়েছ?

রবি শব্দহীন।—নাহ। মানে—।

উঁ? রেগুলার কী সব লিখছ? এরপর বিপদ হলে—।

কতদিন তোমাকে দেখি না!

থাক।

একদিন এসো না। আমি ভালো নেই। তুমি?

খুবই ভালো। খাচ্ছি-দাচ্ছি, ইস্কুল করাচ্ছি। ভাবনা কী?

দেখতে ইচ্ছে করছে।

অনেক হয়েছে। ছাড়ছি, ক্লাস আছে।

কবে আসবে?

তুমি এসো আমার স্কুলে।

ফুল ফোন ছাড়ে। রিসিভার হাতে রাখে রবি। এই কাজ, ব্যস্ততায় ডুবে থাকা। ফুলকে ফাঁকি দেওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও—সবটাই মনে হয় আশ্চর্য। রিসিভার রেখে দেয়।

বহুদিন পর বাড়ি ফিরে বোসদাকে রামের পাঁইট নিয়ে দেখতে পায়। গেলাসে ঢালতে-ঢালতে বোসদা বলেন, বেড়ে চালাচ্ছ, রিপোর্টার। সাউথে তোমার কাগজই তো হট কেক। যা ছাড়ছ না! আজই তো ভোররাতে শ্মশানের আশেপাশে গোটা এলাকা রেইড হয়েছে। লালবাজার থেকে লোকজন এসেছিল। লোকাল থানা খবর অব্দি পায়নি। ভোর না হতেই তোমার কাগজ খুঁজতে বাস্তুহারা বাজারে গেছলুম। ওখানেই শুনলুম। তুমি তো, বাওয়া, রাত্তিরে একখানি কাগজ হাতে পাকিয়ে ফেরো। ততক্ষণ কে ধৈর্য করে থাকবে, বাওয়া। আর এ-খবর তো আর অন্য কাগজে থাকবে না!

আজ অনেক সকালে রবি বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রসদনে গাইনোকলজিস্টদের এক কনফারেন্সে। সি. এম. ওপেন করবেন ঠিক ন'টায়। সময়ের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী একেবারে স্ট্যান্ডার্ড টাইম। এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছতে হয়েছিল। তারপর স্টোরি জমা দিয়ে ফুলের স্কুলে। ফুল নেই। তাই ওর বাড়ি। সারাটা দিন আড্ডা। আড্ডা। ফুলের মায়ের যত্ন। গোটা দিনটা স্বপ্ন-স্বপ্ন। তারপর সকাল-সকাল মেসে ফিরে আসা।

কী খবর দিলেন, বোসদা!—রবির তো প্রায় দু-হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে। রিপোটিং-এ তাহলে এখনও কাজ হয়! বদ্যিনাথদা পুলিশ অ্যারেস্টের খবর নিশ্চয়ই করে দেবেন।

সকালে উঠেই রবি ভোররাতের রেইডের খবর নেয়। পাকা মাল অনেকেই ধরা পড়েছে। ফসকে গেছে নকা। একবার ঘুরতে-ঘুরতে 'সবুজ-স্বপ্ন'-এ আসে রবি। বাচ্চু ফেরার। পুতান কোনওরকমে বাঁদর-পাখি-মাছ-ভালুককে সকাল-বিকেল খাবার দিয়ে যাচ্ছে। সে-খবর পাওয়া গেল সিগারেটের দোকান থেকে। 'সবুজ-

স্বপ্ন'র চারপাশ কেমন যেন থম মেরে আছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে মেসে ফিরে এল। তারপর অফিস। রেইড আর গ্রেপ্তারের খবরটা বদ্যিনাথদা করে দিয়েছেন। আছে প্রথম পাতাতেই।

ঢোকামাত্রই সুজয়দা বললেন, কংগ্র্যাচুলেশনস, রবি। হোল ম্যাটারকে তুমি নিউজ আইটেম করলে। গ্রেপ্তার আর ওই এলাকার গোলমাল নিয়ে অন্য একটা বাংলা আর দুটো ইংরেজি ফ্রন্টপেজ কভারেজ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এডিটর নিজে তোমার কলাম মাপের টাকা বাড়িয়ে দেবেন বলেছেন।

রবির মাথা নিচু। বুকের গভীরে বেজে ওঠে জয়জয়ন্তী।

একটা ফলো আপ স্টোরি পারলে দাও।

কলম নিয়ে রবি বসে। গ্রেপ্তার এবং তারপর এলাকার ছবি তুলতে চায় রিপোর্টাজে। ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামে।

তারপর আকাশের কত না অশ্রুজল! বকাবকি। বৃষ্টি থামল এগারোটা দশে। কলকাতার কোনও-কোনও অঞ্চল তখন জলবন্দি।

গাড়ি যখন হাজরায় রবিকে নামাল, তখন প্রায় বারোটা। অফিস ক্যানটিনে নাইট স্টাফদের সঙ্গে রুটি-তরকারি খেয়ে নিয়েছিল। কালিকা সিনেমার সামনে জল প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। রবি প্যান্ট গুটিয়ে জুতো খুলে নামল। একটু শীত-শীত করে উঠল সমস্ত শরীর। মিনিট-আড়াই এগোনোর পর জল নেই। তারপর সমস্ত সদানন্দ রোড জল—ন্যাকড়া মোছা স্লেট, রাস্তার নিয়ন আলোয় নকল জ্যোৎস্না। রবি জানে আরও পরে, তপন থিয়েটারের সামনে, এখনও পাতা ডোবা জলের আবরণ। তারপর তার বাড়িতে যাওয়ার গলির মুখে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। একবার, দুবার। প্রথমটা ভুল মনে হলেও দ্বিতীয়বার পিছন ফেরে রবি। থমকায়। এত রাতে কে ডাকে? মাল পেয়ে গেছি রে—, বলে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ওত-পাতা যুবক-মৃত্যু এগিয়ে আসে। তার হাতে খোলা ছুরি। পিছনেও মৃত্যুরা, তিনজন। ওদের একজনের হাতের ভারী লোহার রড আকাশে উঠেই রবির মাথায় নামে।

রবি পড়ে। তারপর তার শরীর কর্ষিত হয় ভোজালি, চপার এবং ক্ষুরে। ঘাতকেরা পালায় রাস্তার ওপারে রকের গা ঘেঁষে শোয়ানো চারটি সাইকেলে। তাদের চাকা-ছোঁয়া রাস্তার জমা জল এক ডিজাইন হয়ে মাথা তুলেই যায় মিলিয়ে। রবির রক্ত রাস্তার জল-কাদায় মেশে। পাড়া গার্ড-দেওয়া একটা কুকুর হঠাৎ রবিকে শুঁকে ভয়-মাখা ডাক ওঠে ডেকে।

ঘন বৃষ্টির পর লোডশেডিং। মন অকারণেই খারাপ হয়ে থাকে। মোমের কাঁপা আলোয় ফুল রবিকে লেখা চিঠির শেষ লাইনে লেখে—আমি ভালো নেই। তুমি?

অপরাধ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৩



চুক্তি

হিমাংশু সরকার

একটা বিরাট বড় বিদেশি গাড়ি এসে থামল একটা বড় জেলখানার দরজায়। গাড়ি থেকে নামলেন দুজন দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ প্রৌঢ়। বয়স তাঁদের পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। পরনে মূল্যবান পোশাক। হাতে ব্রিফকেস। জেল-ফটকে তাঁরা পরিচয়পত্র মেলে ধরতেই প্রহরী স্যালুট করে ছোট দরজাটা খুলে ধরল।

একজন ছুটল সুপারকে খবর দিতে, আর-একজন দৌড়ে গিয়ে অফিসে খবর দিল জেলারসাহেবকে। জেলারসাহেব দ্রুত বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসে অফিসে বসালেন। চা আনতে বললেন।

আসন গ্রহণ করে তাঁরা ব্রিফকেস থেকে ভারত সরকারের সিল দেওয়া কতকগুলো কাগজপত্র বের করে জেলার সাহেবের সামনে ধরলেন।

জেলারসাহেব সাগ্রহে কাগজগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তিনি কাগজ থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'এর সঙ্গে আপনাদের কী দরকার? লোকটা কনভিক্টেড আসামি নয়। বিচারাধীন।'

একজন প্রৌঢ় পাকা রাজনীতিবিদের মতো মিষ্টি হেসে বললেন, 'আলোচনাটা আমরা তার সঙ্গেই করব। ব্যাপারটা সিক্রেট।'

দ্বিতীয়জন বললেন, 'আলোচনা ফলপ্রসূ হলে আমরা আপনাদের আরও কিছু কাগজপত্র দেখাব।'

চা এল।

তার পিছন-পিছন ঢুকলেন সুপারসাহেব।

পরিচয় হওয়ার পর কাগজপত্র পরীক্ষা করলেন। জেলের আরদালিকে ডেকে বললেন, 'দীপক চোপরাকে ইন্টারভিউ রুমে নিয়ে এসো।'

প্রথম প্রৌঢ় বললেন, 'আমরা যখন কথা বলব, তখন সেখানে আর কেউ না থাকলেই ভালো। একজনকে, দয়া করে, দরজা থেকে পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরে পাহারায় রাখবেন, যেন কেউ দরজার কাছে আসতে না পারে।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। স্বয়ং সুপারসাহেব তাঁদের ইন্টারভিউ রুমের দিকে নিয়ে চললেন।

দীপক জেলের জিমনাশিয়ামে ব্যায়াম করছিল। আরদালি ওকে খবর দিতেই ও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার সঙ্গে? ইন্টারভিউ করবার মতো আমার কোনও বন্ধু বা আত্মীয় নেই। তোমার ভুল হয়নি তো?'

আরদালি বলল, 'আমরা যারা ভেতরে আছি, তাদের প্রত্যেকের এক অকৃত্রিম বন্ধু আছে। সেটা হল পুলিশ।'

'পুলিশ? পুলিশ এসেছে দেখা করতে?'

'তারই ভায়রাভাই। চলো। দেরি কোরো না।'

দীপক গামছা দিয়ে ঘর্মাক্ত শরীর মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল জিম থেকে।

ইন্টারভিউ রুমের দরজায় থমকে দাঁড়াল সে—সামনে বসা লোক দুজনকে দেখল। এরা পুলিশ তো বটেই। এবং আরও কিছু।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুজন তাকে মোলায়েম ভাষায় অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করার সময় দীপক খুব ভালো করে তাঁদের চোখের দিকে তাকাল। সে-চোখ দেখে কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়।

দীপক তাঁদের সামনে বসল।

দুজনেই দুটো আই-ডি কার্ড বের করে দীপকের সামনে ধরলেন। দীপক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কার্ড দুটো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'আমি আপনাদের দেখেই সেটা আন্দাজ করেছিলাম। সি. বি. আই. আমাকে ভেতরে পুরেছে কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগে, যেগুলো কোনওদিনই কোর্টে প্রমাণ হবে না। এবার আপনারা এসেছেন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইং থেকে। বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

প্রথম ব্যক্তি বললেন, 'আমার নাম হরপ্রসাদ শেঠি। আমার এই বন্ধুর নাম অর্জুন সিং।'

কথা শেষ করে তিনি ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইল বের করে খুললেন। দীপক দেখল, প্রথমেই আছে বারো বাই দশ ইঞ্চি একটা ছবি। ছবিটা তারই।

একটা পাতা উলটে শেঠি বললেন, 'তোমার নাম দীপক চোপরা?'

'কারেক্ট।'

'জন্ম....সালে? বাবার নাম রাজেশ চোপরা?'

'নির্ভুল।'

'তোমার ডান ঊরুতে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে?'

'আছে।'

'তুমি সৈন্যবাহিনীতে ছিলে?'

'ছিলাম।'

'সৈন্যবাহিনীতে তুমি ছিলে বেস্ট স্নাইপার শুটার?'

'একটা মেডেলও পেয়েছি।'

'এখন তুমি বিভিন্ন লোকের হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে রোজগার করো?'

'লোকে বিপদে পড়লে আমাকে ভাড়া করে। কিন্তু আমি বেআইনি কিছু করি না।'

'তুমি অবিবাহিত?'

'বলতে পারেন, আমাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয়নি। আমার বিষয়ে সমস্ত তথ্যই দেখছি আপনাদের কাছে আছে। এবার মূল কথাটা বলুন।'

'তোমাকে একটা কথা দিতে হবে। আমাদের মধ্যে যে-আলোচনা হবে, সেটা তুমি কোনওদিনই কাউকে প্রকাশ করতে পারবে না।'

'আমি প্রফেশনাল। আমাদের একটা এথিকস আছে। আপনি বলুন কী বলতে চান?'

'আমরা, মানে RAW, তোমার সাহায্য চায়।'

'আমার সাহায্য? আমাকে আপনারা জেলে বন্ধ করে রেখে সাহায্য চাইছেন! গ্রেট!'

'তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত চার্জ সি. বি. আই. উইথড্র করে নেবে। তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে। এবং খুব ভালোভাবে পুরস্কৃত করা হবে, যদি তুমি ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করো।'

'কী ধরনের সহযোগিতা?'

শেঠি এবার তাকালেন অর্জুন সিং-এর দিকে।

অর্জুন সিং একগাল ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ভারত, তোমার মাতৃভূমি, খুব বিপদে পড়েছে!'

'এটা কলেজের ক্লাসরুম নয়। আপনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলুন।'

অর্জুন সিং-এর চোয়াল দুটো মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'একটি শক্তিশালী বিদেশি রাষ্ট্র, যারা কিনা আমাদের বন্ধুরাষ্ট্ররূপে পরিচিত, এখানে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ বড় জাল বিছিয়েছে। আমাদের একটি শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের আঁতাত আছে। খুব দহরম-মহরম। এখান থেকে গোপন সংবাদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এরা চালান করছে সেই শত্রুরাষ্ট্রকে। এতে ভারতের কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারো। যে-করেই হোক এটা বন্ধ করতে হবে এবং এই গুপ্তচর চক্রটা ভেঙে দিতে হবে। RAW এবং সি. বি. আই. সে-কাজটা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যেসব তথ্য তাদের হাতে চলে গেছে, সেটার জন্যে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটেছে গতকাল। এই শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে যে-কোনওদিন আমাদের যুদ্ধ বাধতে পারে। কিন্তু গতকাল প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে একটা গোপন তথ্যের ফাইল চুরি গেছে।'

'বাঃ! চমৎকার। এই না হলে প্রতিরক্ষা দপ্তর!'

'কোনও একজন রাষ্ট্রদ্রোহী এ-কাজ করেছে। এ-দেশে অনেক লোক এবং অনেক বিরোধী নেতা আছে, যারা ওই শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং তার সমর্থক। যাই হোক, ফাইলটা চুরি যাওয়ায় ভারতের অপরিসীম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষত, যুদ্ধ যদি বাধে, তাহলে ভারতের পরাজয় নিশ্চিত।'

'একটা সিগারেট হবে?' কথার মাঝখানে দীপক বলল।

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, সিগারেট আছে।'

শেঠি একটা সিগারেট বের করে দীপককে দিলেন। আগুন জ্বেলে ধরলেন দীপকের জন্য। দীপক সিগারেট ধরিয়ে ঘন-ঘন টানতে লাগল।

অর্জুন সিং খানিকক্ষণ দীপককে দেখলেন, তারপর ধীর স্বরে বললেন, 'যে-করেই হোক, ফাইলটা আমাদের উদ্ধার করতে হবে।'

দীপক প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে? এভারেস্টের শৃঙ্গ না ভারত মহাসাগরের তলা থেকে?'

'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা আছে ওই রাষ্ট্রের দূতাবাসের ভেতর সেফ-ভল্টে। সেটাকে পাচার করার চেষ্টা হবে বা প্রতিটি জিনিসের মাইক্রোফিল্ম তৈরি করে সেটা পাচার করা হবে। তারপর ফাইলটা নষ্ট করে ফেলা হবে। এসব হওয়ার আগেই ফাইলটা উদ্ধার করতে হবে। এবং সি. বি. আই. ও RAW অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছে যে, এ-কাজ করতে পারে মাত্র একজন। সেই একজন হলে তুমি।'

'আমি কেন?'

'তুমি এ-ধরনের কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছ। তুমি প্রফেশনাল।'

'সি. বি. আই.-এর অফিসাররা কি প্রফেশনাল নয়? তাদের একজনকে পাঠাতে পারেন না?'

'সে-ক্ষেত্রে রিস্ক আছে। ধরা পড়লে, অফিসারের পরিচয় প্রকাশ পাবেই। তাহলে শুধু ওই রাষ্ট্র নয়, আরও অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে এবং একটা আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি হবে। বিশ্বের নজরে ভারত অনেক ছোট হয়ে যাবে। কারণ, তখন কথা উঠবে যে, ভারতই গুপ্তচর পাঠিয়েছিল ওই রাষ্ট্রদূত ভবনে।'

'আমি যদি ধরা পড়ি?'

'তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তুমি যদি এ-কাজ করতে রাজি হও, তাহলে তোমাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব, এই ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করার জন্যে। কিন্তু কাল সকালের সমস্ত কাগজে তোমার ছবিসমেত এই খবর ছাপানো হবে যে, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ। তোমাকে ধরে দিতে পারলে, পুরস্কার দেওয়া হবে। পৃথিবী জানবে যে, তুমি একজন সমাজবিরোধী। কাজেই ধরা পড়লে, ভারত সরকার তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করবে। এবং সারা জীবন তুমি জেলের ভেতর কাটাবে।'

দীপক বলল, 'সুন্দর। খুব ভালো। কিন্তু ধরুন, ওপরওয়ালা আমার প্রতি অসীম দয়ালু হয়ে উঠলেন এবং আমি ধরা পড়লাম না। তাহলে?'

'সেটাই আমরা চাইছি। আমাদের হাতে প্রমাণ আসবে। আমরা ওই রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে দেব। দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। এবং...।'

'আমার কী হবে?'

'তুমি পাবে বীরের সম্মান। যথেষ্ট আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে তোমায়। দেশের সমস্ত বড়-বড় পত্রিকায় তোমার ছবিসমেত এই কাহিনি ছাপা হবে। তোমার লাভ হবে। তুমি অনেক খদ্দের পাবে। এবার বলো, তুমি রাজি আছ কি না।'

দীপক আর-একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল। ঘন-ঘন টান দিতে লাগল। ওর এখন উভয়সঙ্কট। এ-প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া ওর সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। ও বলল, 'আমি এ-কাজ করতে রাজি আছি। পুরস্কারের অর্ধেক টাকা আমায় অ্যাডভান্স দিতে হবে।'

তাঁরা রাজি হলেন। দীপক গাড়িতে উঠে বসল। ও জানতেই পারল না, ওর জেল থেকে পালানোর কাহিনি সেদিনের সকালের কাগজেই বেরিয়ে গেছে।

শেঠ বদ্রীপ্রসাদ এক বিরাট পয়সাওয়ালা লোক। থাকেন ছোট শহরে, কারণ তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ছোট শহরের চারদিকে ছোট-ছোট গ্রাম। সেইসব গ্রামে তাঁর নিজের নামে এবং বেনামিতে আছে প্রচুর জমি। তাঁর অনেকরকমের ব্যবসা। কিন্তু তাঁর প্রধান ব্যবসা হল স্মাগলিং এবং সুদের ব্যবসা। সকলেই তাঁকে ভয় করে।

সেদিন সকালে তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত যে, তিনি খুব চিন্তিত। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে টেবিলের ওপর বিস্তৃত খবরের কাগজের ওপর। প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে একজন তরুণের ছবি। নীচে ছাপা হয়েছে এক দুঃসাহসিক কাহিনি। কী করে এই যুবক দীপক চোপরা একটি বিদেশি রাষ্ট্রের কুকীর্তি উদঘাটিত করেছে। কী করে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে চুরি যাওয়া একটি খুব মূল্যবান ফাইল উদ্ধার করেছে।

যুবক বুদ্ধিমান, সাহসী এবং নিখুঁত প্রফেশনাল। এগুলো বুঝতে শেঠজির কোনও অসুবিধে হয় না। তিনি এই ধরনের একজনকে খুঁজছিলেন। এই যুবকই পারে তাঁকে সাহায্য করতে। তাঁর মান-সম্মান রক্ষা করতে।

তাঁর পাপ-কাজের সঙ্গী, তাঁর ডানহাত রাজু। রাজুকে তিনি ডাকলেন। এবং বললেন, 'আজকের কাগজে এই ছবিটা দেখেছ?'

রাজু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কাহিনিটাও পড়েছি। আমি নিজেই আসছিলাম আপনাকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে।'

বদ্রীপ্রসাদ বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, লোকটা পারবে এ-কাজ করতে?'

'লোকটা প্রফেশনাল এবং একটা সাংঘাতিক কাজ করেছে।'

'কিন্তু লোকটা যে-ঠিকানা কাগজে দিয়েছে, সত্যিই সেটা ওর ঠিকানা তো? নামটাও আসল নাম কি না কে জানে?'

'তাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমাদের কাজ হলেই হল।'

'তাহলে তুমি চলে যাও বোম্বাই। যে-করে হোক, লোকটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসো। আমি ওকে আগে দেখতে চাই। যদি সন্তুষ্ট হই, তাহলে আমি নিজেই প্রস্তাব দেব।'

রাজু উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, 'আমার মনে হয়, আমাদের কাজ করার জন্যে এই লোকটাই উপযুক্ত। আমি ওকে নিয়ে আসব।'

শেঠজি বললেন, 'যে-করে হোক তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমার মান-ইজ্জত বাঁচাতে হবে।'

রাজু বলল, 'আমারও মান-ইজ্জত এতে জড়িত।'

একটু অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন শেঠজি।

রাজু বলল, 'আমি চিরদিন আপনার সঙ্গে থেকেছি, আপনার সমস্ত কথা শুনেছি, কারণ আপনি আমায় একটা কথা দিয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সেটা?'

শেঠজি খানিকক্ষণ রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিদ্যার কথা বলছ? হ্যাঁ, আমি সে-কথা ভুলিনি। তুমিই আমার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। এবার যাও।'

বোম্বাইয়ের একটা পাঁচতারা হোটেলে এসে উঠল রাজু। সারাদিন ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও দীপকের দেখা পেল না। শেষে হোটেলের রিসেপশান ডেস্কে গিয়ে খোঁজ করল। সেখানে জানতে পারল, দীপক চোপরা নামে কোনও লোক সেখানে ছিল না।

রাজু শেষে একটা বেয়ারাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে দীপকের ছবিটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল যে, লোকটা এ-হোটেলে আছে কি না। কারণ, কাগজে সে এই হোটেলের ঠিকানাই দিয়েছে।

বেয়ারা বলল, 'ওই লোকটা এ-হোটেলে ছিল। কিন্তু ওর নাম তো দীপক চোপরা নয়। ওর নাম তো কৃষ্ণস্বামী।'

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে গেল রাজুর। একটু ভেবে বলল, 'একে কোথায় পাব?'

'সেটা বলা মুশকিল। গতকাল এ-হোটেলে ছিল। এতবড় বোম্বাই শহরে কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যায়?'

রাজু আরও কতকগুলো বড়-বড় হোটেল ঘুরল। খাতায় ওই নাম পাওয়া গেল না। ছবিটা সকলেই চিনল, কিন্তু তাকে কোথাও দেখেছে বলে কেউ স্বীকার করল না। রাজু খানিকটা বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল।

কিন্তু রাজু আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করত। ঠিক করল, আরও দিন-তিনেক সে বোম্বাইয়ে থেকে জীবনটা ভোগ করবে।

বোম্বাইয়ে তাদের স্মাগলিংয়ের এজেন্ট ছিল। প্রকাশ মেহেরার সঙ্গে তার বেশ ভাব ছিল। সে মাঝে-মাঝে বোম্বাইয়ে এসে প্রকাশের সঙ্গে বোম্বাইয়ের রাতের জীবন উপভোগ করত।

আজও সে প্রকাশের কাছে এল। বলাই বাহুল্য, প্রকাশ খুশি হল তাকে দেখে। লম্বা গ্লাসে খানিকটা বিদেশি হুইস্কি দিয়ে প্রকাশ তাকে আপ্যায়ন করল।

দ্বিতীয়বার গ্লাসে হুইস্কি নিয়ে রাজু বলল, 'আজ, কাল এবং পরশু আমি এখানে আছি। তুমি প্রোগ্রাম ঠিক করো।'

'নো প্রবলেম। আজই চলো। একটা ভালো মায়ফিল বসছে আজ। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে বিখ্যাত বাঈজী সুর্মা বাঈ। খুব ভালো গায়। দিল খুশ করে দেবে।'

'জিনিস কেমন?'

'এ-ওয়ান। মাথা ঘুরে যাবে। অনেক রাজা-মহারাজার মাথা ঘুরিয়ে বোম্বাই এসেছে।'

'পাওয়া যাবে?'

'দাম দিলে সবই পাওয়া যায়।'

'তাহলে চলো। যাওয়া যাক।'

দুজনে উঠে পড়ল।

যারা নৈশ জীবন উপভোগ করতে অভ্যস্ত, তারা সুর্মা বাঈয়ের নাম জানত। তাদের কেউ-কেউ গান-বাজনা ভালোবাসে। তাদের অনেকেই আজ একে-একে সুর্মা বাঈ যে-বাড়িতে আসর বসাচ্ছে, সেখানে এসে

জমা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, খুব পয়সাওয়ালারাই এখানে আসতে পারে।

প্রকাশ মেহেরার প্রভাব-প্রতিপত্তি এ-অঞ্চলে কম নয়। সকলেই জানে, সে একজন পয়সাওয়ালা লোক।

রাজুকে নিয়ে সে আসরে আসতেই একটি মেয়ে তাদের দুজনকে কুর্নিশ করে বেশ ভালো জায়গায় বসিয়ে একটা ট্রেতে বোতল এবং গ্লাস সাজিয়ে তাদের সামনে রাখল। আসরে ইতিমধ্যে আরও দু-তিনজন এসে গেছেন।

একটু পরে আসর শুরু হল। আসরে প্রথমে এল একটি কমবয়েসি মেয়ে। যেন মুখপাত ধরিয়ে দেবে আসরের।

মেয়েটি মন্দ গাইল না।

তারপর ঢুকল সুর্মা বাঈ।

সমস্ত আসরটা ঝলমল করে উঠল। তার রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা। মাঝখানে অপরূপ ভঙ্গিতে বসল সে।

রাজু মদের গ্লাসটা হাতে তুলে নিল। চুমুক দিল ধীরে-ধীরে। দৃষ্টি নিবদ্ধ সুর্মা বাঈয়ের মুখের ওপর।

সুর্মা বাঈ সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে কুর্নিশ করতে-করতে রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

রাজু খুশি হয়ে একটা লম্বা চুমুক দিল গ্লাসে। আর তখনই তার চোখ পড়ল দরজার দিকে। লম্বা মূর্তিটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে।

রাজু যাকে সারা শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই দীপক নিজেই এসেছে।

সেই মেয়েটি দীপককে একটি আসনে এনে বসাল। দীপকের সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সুর্মা বাঈ। তারপর ওকে কুর্নিশ করে মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে গান ধরল।

গানের সঙ্গে-সঙ্গে অসামান্য নাচ।

রাজু একবার দীপককে দেখছে এবং একবার নাচ দেখার ভান করছে। তার সব নেশা উবে গেছে।

ঘরে ঢুকল আর-একজন সঙ্গীতপিপাসু। তারও শরীর মজবুত এবং সুগঠিত। কিন্তু তাকে দেখলেই মনে হয়, সে যেন কেমন বেমানান এ-আসরে।

রাজু দেখল, দীপক এই আগন্তুককে বারকয়েক ভালো করে দেখল। আবার দীপক যখন মুখ ফিরিয়ে নাচ দেখছে, তখন আগন্তুক দীপককে ভালো করে দেখতে লাগল।

রাজু আর বসল না। গানের মাঝখানেই সে উঠে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই প্রকাশ এসে তার পাশে দাঁড়াল। রাজু তাকে বলল যে, তার একটা জরুরি কাজ আছে, সেটা মনে ছিল না। প্রকাশ মজলিশে ফিরে যাক, সে প্রকাশের গাড়িটা শুধু রাতের জন্য ধার নিতে চায়।

প্রকাশ আপত্তি না করে ফিরে গেল। রাজু গাড়িতে এসে বসল। পরপর কয়েকটি গান গাইবে সুর্মা বাঈ। তারপর হয়তো দীপক বেরোবে। তাকে অনুসরণ করে তার ডেরায় গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে।

রাস্তা একেবারে ফাঁকা। জনপ্রাণী নেই। শুধু ওপরের ঘর থেকে সুর্মা বাঈয়ের গানের রেশ ভেসে আসছে।

গাড়িতে বসে রাজু অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই অবাক হয়ে দেখল, গান শেষ হওয়ার আগেই দীপক দ্রুত বেরিয়ে এল এবং কোনও দিকে না তাকিয়ে ও পকেটে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে ফুটপাথ ধরে হনহন করে হাঁটতে লাগল।

রাজু পায়ে হেঁটে তাকে অনুসরণ করবে না গাড়ি চালিয়ে পিছন-পিছন যাবে, সেটা ঠিক করতে পারল না। শেষে ইগনিশান কি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে থমকে গেল।

সেই সর্বশেষ আগন্তুকও বেরিয়ে এসেছে। গলি থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

রাজু দ্রুত মাথাটা নিচু করে নিল। পরমুহূর্তেই দেখল, লোকটা ফুটপাথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল—যেদিকে দীপক গেছে সেই দিকে।

দীপককে দেখা গেল অনেক দূরে।

দীপক হঠাৎ রাস্তা পার হয়ে গেল বিপরীত ফুটপাথে। আগন্তুকও সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পার হতে গেল এবং সে রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে শোনা গেল একটা পিস্তলের গর্জন।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তার ঠিক মাঝখানে এবং দীপক দ্রুত একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

হতভম্ব রাজু ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারল না। সম্ভবত নেশাটা তার ফিরে এসেছিল। সে বারকয়েক মাথাটা ঝাঁকাল। এবং বুঝতে পারল, তার পক্ষে সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। লোকজন জড়ো হওয়ার আগেই তাকে সরে পড়তে হবে।

সে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দিল। মৃতদেহের পাশ দিয়ে সে তিরবেগে চলে এল সেই গলির মুখে। গলিটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। অর্থাৎ, সেটা আবার আর-একটি রাজপথে গিয়ে মিশেছে। রাজু সেইদিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

দীপক রাজপথে বেরিয়ে এসেই একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি চলতে লাগল। দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে লাগল রাজু।

অনেক পথ ঘুরে ট্যাক্সিটা আবার একটা অন্ধকার গলির সামনে থামল।

দীপক ট্যাক্সি থেকে নেমে ধাঁ করে ঢুকে গেল গলির ভেতরে।

রাজু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গাড়ি থেকে নামল। পকেট থেকে পিস্তল বের করে সাবধানে গলিতে ঢুকে দেওয়াল ঘেঁষে হাঁটতে লাগল দীপকের সন্ধানে।

কিন্তু সে বোধহয় সেই চৈনিক প্রবাদটা জানত না, রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হয়।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা লৌহহস্ত তার গলাটা পিছন থেকে চেপে ধরল। সে পিস্তলটা তোলার আগেই তার কানের পাশে ঠেকল একটা ঠান্ডা পিস্তলের নল। কে যেন আদেশের সুরে তার কানে-কানে বলল, 'পিস্তলটা ফেলে দাও, রাজু।'

লোকটা যে দীপক সে-বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না। কিন্তু তার মুখে নিজের নাম শুনে সে অবাক হল। পিস্তলটা সে ফেলে দিল।

দীপক তাকে ছেড়ে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিলে বলল, 'এবার বলো, আমাকে তুমি খুঁজছ কেন? তুমি আবার কোন দেশের এজেন্ট?'

আবার রাজু অবাক হল। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বলল, 'তোমার সঙ্গে দরকার আছে। আমি কোনও দেশের এজেন্ট নই। আমি শেঠ বদ্রীপ্রসাদের এজেন্ট।'

'আমার সঙ্গে কী দরকার?'

'সেটা কি এই অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে বলব?'

'বেশ, চলো তোমার গাড়িতে। আমার সামনে-সামনে হাঁটতে শুরু করো। কিন্তু সাবধান। চালাকি করার চেষ্টা করলে, তুমিও ওই লোকটার মতো বলি হয়ে যাবে।'

রাজু কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল। গাড়ির কাছে এসে রাজু সামনের দরজা খুলে আসনে বসল। দীপক বসল পিছনের আসনে।

'এবার তোমার মিথ্যের ঝাঁপি খোলো।'

'মিথ্যে বলার আমার দরকার নেই। আমি তোমাকে খুঁজতেই বোম্বাই এসেছি।'

'কারণ?'

'বলছি। তার আগে বলো, ওই লোকটা কে? কেন ওকে তুমি খুন করলে?'

'শুনতে চাও? ও একটা বিদেশি রাষ্ট্রের এজেন্ট ছিল। আমি ওকে খুন না করলে, ও আমাকে খুন করত। আমি যে-রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে দিয়েছি, তারা এবার আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে।'

'কিন্তু তুমি আমায় চিনলে কী করে? কী করে জানলে, আমি তোমায় খুঁজছি?'

'হোটেলের বেয়ারা আমায় বলেছে। হোটেলের খাতা থেকে আমি তোমার নাম জেনেছি। আমি প্রফেশনাল, এটা আমার পক্ষে কোনও শক্ত কাজ নয়। এ-ক'দিন আমি তোমাকে চোখে-চোখে রেখেছিলাম। আমি আজ ওই গানের আসরে গেছিলাম তোমার জন্যেই।'

'তুমি কাগজে হোটেলের ঠিকানা দিয়েছ, অথচ হোটেলে থাকো না।'

'সোজাসুজি দেখা করার মধ্যে বিপদ আছে। শত্রু তাহলে সহজেই আমায় খুন করতে পারবে। এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, ওখানে এসে কেউ আমাকে খুঁজলেই আমি জানতে পারব। তখন আমিই তাকে খুঁজে নেব। আমি বদ্রীপ্রসাদের নাম জানি। এবার বলো, কী দরকার?'

রাজু বলল, 'শেঠজি তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করাতে চান। ভালো টাকা পাবে তুমি।'

'কী কাজ?'

'সেটা তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন।'

'বেশ, তাহলে তুমি তোমার নিজের গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। রাস্তায় আমি ঠিক জায়গায় তোমার গাড়িতে উঠে পড়ব। কিন্তু সাবধান। বৈঠকবাজির চেষ্টা করবে না।'

পরের দিন রাজুর সঙ্গে দীপক শেঠ বদ্রীপ্রসাদের সামনে হাজির হল।

বদ্রীপ্রসাদ অভিজ্ঞ লোক। এক্স-রে চোখ দিয়ে তিনি দীপককে দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন দীপকের চোখ। খুশি হলেন তিনি। শিকারি বেড়ালের চোখ দেখলে বোঝা যায়।

দীপককে তিনি যথাযোগ্য আপ্যায়ন করে বসালেন। তারপর বললেন, 'কাগজে তোমার বীরত্বের কাহিনি পড়েছি। আমার মনে হয়েছে, তুমি সত্যিকারের প্রফেশনাল।'

দীপক একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'কাজটা কী ধরনের সেটা জানা দরকার। আমার প্রশংসা না করে সেটাই বলুন।'

বদ্রীপ্রসাদ একটু আহত হলেন। এভাবে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। সকলে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে খুব মোলায়েম সুরে কথা বলে।

একটু থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তিনি আবার শুরু করলেন, 'কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

দীপক চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ডাকাত এখানে ঢুকল কী করে?'

'ডাকাতরা সবই পারে। এ-ডাকাতদলটা খুব দুর্ধর্ষ। তাদের কাছে সমস্ত রকমের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। এরা এসেছিল গভীর রাতে। আমরা জেগে ওঠার আগেই তারা ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।'

'অদ্ভুত!'

'হ্যাঁ! এই অঞ্চলে অনেক জায়গায় তারা ডাকাতি করেছে। এখানে তারা বেশ লাভবান হয়েছে। প্রচুর টাকা-গয়নাসমেত তিনটে দামি রাইফেল তারা নিয়ে গেছে।'

দীপক বলল, 'আপনি কি ওই টাকাকড়িগুলো আবার ফেরত পেতে চান?'

'না।'

'গয়নাগাটিগুলো?'

'না।'

'তাহলে? নিশ্চয় ওই বন্দুকগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে আমাকে ডেকে আনেননি, কারণ বন্দুকগুলোর দামের চেয়ে অনেক বেশি দাম আপনাকে দিতে হবে।'

'আমি টাকা-পয়সা, ধনদৌলত খুব ভালোবাসি। ওগুলো চলে যাওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু ওগুলো ফেরত আনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। আমি ওসব চাই না। আমি ফেরত পেতে চাই আমার একমাত্র মেয়েকে।'

'মেয়ে! আপনার মেয়ে! সে কোথায় আছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল দীপক।

'ডাকাতদল যাওয়ার সময় আমার একমাত্র মেয়ে বিদ্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আমি কথাটা গোপন রেখেছি আমার মান-ইজ্জতের জন্যে। সবাই জানে, সে বোম্বাইয়ে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে গেছে। আসলে সে এখন ওই ডাকাতদলের হাতে বন্দিনী। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

দীপক নীরবে সিগারেট টানতে-টানতে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'কাজটা করতে পারি, কিন্তু তার জন্যে একলাখ টাকা লাগবে।'

'তাই পাবে।'

'আর কী করতে হবে?'

'শুধু মেয়েকে নিয়ে এসো, ব্যস।'

দীপক আবার সিগারেট টানতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বলল, 'একটা কথা আপনার ভালো করে বোঝা দরকার, শেঠজি। আমি পেশাদার, প্রফেশনাল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পেশাদাররা কথার খেলাপ করে না, বা তারা কোনওদিনই খদ্দেরদের ঠকায় না। আমাদের কথার দাম মারাত্মক। আমরা চুক্তি করে কাজে নামি। প্রাণ গেলেও সে-চুক্তি ভাঙি না। কিন্তু চুক্তির বাইরে একটা কাজও আমরা করি না। কাজেই ওই কাজ—মানে আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কিছু যদি করতে হয়, তাহলে সেটা নিয়ে এখনই চুক্তি করুন। অবশ্য তার জন্যে আপনার খরচ লাগবে। কিন্তু একবার চুক্তি হয়ে গেলে, আর কোনও বাড়তি ফরমায়েশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

বদ্রীপ্রসাদ বললেন, 'না, মেয়েকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।'

'বেশ। চুক্তি কমপ্লিট হতে আর-একটু বাকি আছে।'

'কী?'

'দুটি ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।'

'সে-দুটো কী?'

'এক : কোনও অবস্থাতেই আপনি পুলিশের কাছে যেতে পারবেন না। তাহলে চুক্তি ভঙ্গ হবে এবং আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না।'

'পুলিশের কাছে যাওয়ার হলে আমি আগেই যেতাম। তাতে ব্যাপারটা জানাজানি হবে।'

'দ্বিতীয় শর্ত হল, পারিশ্রমিকের অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন দিতে হবে এবং আপনার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে।'

'তাই হবে। রাজু তোমাকে এখুনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে। আর কিছু?'

'না। শুধু যাওয়ার আগে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, চুক্তির বাইরে কোনও কাজ হবে না।'

শেঠ বদ্রীপ্রসাদ বললেন, 'যাওয়ার আগে তোমার বোধহয় দু-একটি কথা জানার আছে। এই দলের যে নেতা, তার নাম বিজয়। দলটা তাড়া খেয়ে-খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর পুলিশ আর এদের কোনও হদিশ পায়নি। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে আমি খবর পেয়েছি যে, দলটা বিহারের জদুগোড়ার গভীর জঙ্গলে শেলটার নিয়েছে। আমি পুলিশকে খবরটা দিতে পারতাম। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে, ওরা সারেন্ডার না করলে, গুলি বিনিময় হবে এবং আমার মেয়ে মারা যেতে পারে। আমি আমার মেয়েকে হারাতে চাই না।'

দীপক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই মূল্যবান সংবাদটা দেওয়ার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

রাজু পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে টাকার বাণ্ডিলগুলো তার হাতে দিয়ে বলল, 'বিদ্যাকে এনে দিতে পারলে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে পুরস্কার দেব।'

দীপক টাকা গুনতে-গুনতে বলল, 'একই ব্যাপারে দুজনের সঙ্গে চুক্তি করা চলে না।'

'এটা চুক্তি নয়। বকশিশ।'

দীপক হেসে বলল, 'তাহলে এ-ব্যাপারে তোমার স্বার্থও জড়িয়ে আছে।'

'আমার জীবন জড়িয়ে আছে।'

দীপক বেরিয়ে এল বাইরে। হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল। কিন্তু ওর মুখে হাসি নেই। ও তখন কাজের ছক তৈরি করছে। ওকে এক্ষুনি কাজ শুরু করতে হবে। এবং সেজন্য ওকে আগে যেতে হবে সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের আশেপাশে কোথাও।

মনে-মনে দীপক ভাবল, নিশ্চয় আশেপাশে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে।

দীপক খোঁজখবর নিয়ে জানল, ওই জঙ্গলের পাশেই একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সে ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে-হেঁটে চলল সেই গ্রামের দিকে।

গ্রামটা বর্ধিষ্ণু। দীপক এই গ্রামে এসে হাজির হল।

পায়ে হাঁটা আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। দীপক চলতে লাগল। হাতে একটা ছোট সুটকেস।

কিছুদূর আসার পর ও দেখল, রাস্তা প্রায় বন্ধ। রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। আর সেই গর্তে পড়েছে একটা গোরুর গাড়ির একটা চাকা। গোরুর গাড়িটা মালবোঝাই।

বিপরীত দিকে একটা মোটর গাড়ি। একনাগাড়ে হর্ন দিচ্ছে। আর একজন বৃদ্ধ এবং একজন তরুণী প্রাণপণ চেষ্টা করছে গোরুর গাড়ির চাকাটা গর্ত থেকে তুলতে। কিন্তু সে-চাকা তোলার জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন, তা তাদের ছিল না।

হঠাৎ গাড়ির সামনের আসন থেকে ড্রাইভার বেরিয়ে এসে বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে একটা অশ্লীল কথা বলল। বৃদ্ধ চোখ তুলে তাকাল। দীপক দেখল, সে-চোখে চাপা ক্রোধ।

ড্রাইভার আবার বলল, 'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, এখনও গাড়ি সরানো হল না। জমিদারবাবুর খুব অসুবিধা হচ্ছে। খুব রেগে গেছেন।'

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'চেষ্টা তো করছি। তুমি তো শুধু গাল পাড়ছ, একটু এগিয়ে এসে সাহায্য করতে পারছ না!'

ড্রাইভারের চোখে আগুন জ্বলে উঠল : 'কী, আমি তোকে সাহায্য করব? আমি কি কুলি, না তোর চাকর?' কথা শেষ করেই সে এক লাথি মারল বৃদ্ধের কোমরে। মেয়েটার তীক্ষ্ন চিৎকারের সঙ্গে বৃদ্ধ উঁচু রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ল।

দীপক এসব দেখছিল। সে একলাফে নীচে নেমে বৃদ্ধকে তুলে বসাল। বৃদ্ধের দু-চোখে জল। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

দীপক বৃদ্ধকে বলল, 'ওঠো। চলো, তোমাকে আমি সাহায্য করছি।'

তিনজন মিলে গাড়ির চাকাতে হাত দিল। গাড়িটা উঠে এল গর্ত থেকে। বৃদ্ধ গাড়িতে বসে গাড়িটা একধারে দাঁড় করাল।

জমিদারবাবুর গাড়ি এগিয়ে এল। গোরুর গাড়ির সমান্তরাল হতেই গাড়িটা থামল। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করে প্রৌঢ় জমিদার লোলুপ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

যুবতী রাগে কাঁপছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

জমিদারবাবু বললেন, 'বাব্বা, তোর বড্ড রাগ, লতা।'

বাবা এবং মেয়ে কেউ জবাব দিল না। বৃদ্ধের হাতের চাবুকটা শূন্যে পাক খেয়ে তীব্র বেগে পরপর নেমে এল দুটো গোরুর ওপর : 'এই হেট হেট হর র র র। হাঃ—হাঃ।'

গাড়িটা এগিয়ে চলল। মোটরটাও বেরিয়ে গেল তিরবেগে।

গোরুর গাড়িটা হাত-দশেক দূরে গিয়ে থামল। বৃদ্ধ নেমে এসে দীপকের হাতদুটো ধরে বলল, 'আপনাকে তখন ধন্যবাদ দিতে পারি নাই, বাবু। আপনি না থাকলে, ও-গাড়ি আজ উঠতনি। আমায় আরও চাবুক খেতে হত।'

দীপক বলল, 'ওটা এমন কোনও কাজ নয়। আমি পরদেশি। নয়তো ওই ড্রাইভার আর তার মালিককে এমন শায়েস্তা করতাম যে, সারা জীবন তারা ভুলত না।'

'আপনি পরদেশি মানে! কোথায় থাকেন আপনি?'

'বাড়ি আমার দূর বোম্বাইয়ে। এখানে এসেছি, এই জঙ্গলের আশেপাশে যদি কয়েকদিনের জন্যে থাকার জায়গা পাই।'

'থাকবেন? আপনি এ-গ্রামে থাকতে চান?'

দীপক একটু হেসে বলল, 'চিরকালের জন্যে নয়। আমি লেখক—গল্প লিখি। জঙ্গল নিয়ে একটা গল্প লিখছি। ঠিক এই ধরনের পাহাড় আর জঙ্গল আমার গল্পে আছে। কিছুদিনের জন্যে থাকতে পেলে, আমার গল্প লেখার সুবিধে হত।'

এবার মেয়েটা দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'বাপু, আমাদের ওখানেই তো বাবুজিকে থাকতে দিতে পারো। এমন লোক গ্রামে থাকা ভালো।'

বৃদ্ধ বলল, 'কিন্তু আমাদের ওখানে বাবুজির কষ্ট হতে পারে, মা। উনি শহরের শিক্ষিত লোক। আমরা চাষা মানুষ।'

দীপক তাড়াতাড়ি বলল, 'না, আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার বাবাও চাষি ছিলেন। আমিও চাষির ঘরের ছেলে।'

বৃদ্ধ উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'তাই নাকি? চাষির ঘরের ছেলে লেখাপড়া শিখে এতবড় হয়েছেন! বাঃ! খুব ভালো। খুব ভালো।'

দীপক বলল, 'আপনারা যদি আমাকে কিছুদিন থাকতে দেন, তাহলে আমি সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ হব।'

'বেশ, আপনার যদি কোনও অসুবিধা না হয়, তা হলে এই গরিবের বাড়ি থাকতে পারেন।'

দীপক বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। আমি গরিব চাষির ছেলে হলেও এখন আমার রোজগার খুব ভালো। এখন আমি অনেক পয়সা পাই গল্প বিক্রি করে। কাজেই আমি যদি আপনাদের সংসারে থাকি, তাহলে সংসারের একজন হিসেবে আমারও উচিত কিছু দায়-দায়িত্ব নেওয়া।'

বৃদ্ধ হাসল : 'পয়সার কথা বলছেন? ওটা কি না দিলেই নয়?'

দীপক বলল, 'আমি আপনার ছেলের মতো, আমার একটা কর্তব্য আছে।'

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ছেলে?'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল, 'যদি যেতে হয়, তাহলে আর দেরি করা ঠিক হবে না, বাপু।'

অতএব সকলে মিলে গাড়িতে উঠল। দীপক এবং বৃদ্ধ বসল সামনে। লতা গাড়ির ওপর খড়ের গাদায়।

গাড়ি গ্রামের পথ ধরে এগোতে লাগল।

গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার পিছনে দীপকের কতকগুলো উদ্দেশ্য ছিল। এক দলটা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। দুই : জঙ্গলটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। জঙ্গলের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া। তিন : দলটা কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। চার : সুযোগ বুঝে কাজ হাসিল করা।

দীপকের কথা গ্রামের চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দীপক গ্রামের সরল মানুষগুলোর ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হল। খুব সহজেই ও তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলল। ধীরে-ধীরে লতার সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। লতার পরিচর্যা এবং সেবা ওকে অভিভূত করল।

জীবনে কোনওদিন ও কোনও মেয়ের সেবা পায়নি। লতার সেবা এবং পরিচর্যার মধ্যে যে-আন্তরিকতা ছিল, তা ওকে মুগ্ধ করল।

হোলির দিন গ্রামের যুবকরা দল বেঁধে এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। গ্রামের যুবক-যুবতীরা রং নিয়ে খেলল। সকলের মনের রঙের সঙ্গে নিজের মনের রং ও মিশিয়ে দিল।

সন্ধেবেলা গানের আসর বসল। আবার সকলে জোর করে ওকে ধরে নাচের আসরে নিয়ে এল। সকলের সঙ্গে নাচ-গান করতে ওর ভালোই লাগল।

দিন-কয়েক পরে পাশের গ্রামে মেলা। লতার সঙ্গে ও মেলায় গেল। এবং কিছু-কিছু উপহার ওকে কিনে দিল।

কিন্তু দীপক শুধু এই সামাজিক জীবনে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। ও প্রতিদিন জঙ্গলে ঢুকত। কিছুদূর ঘুরে আসত। জঙ্গলে ঢোকার পথ, পাহাড়ের পথ ও চিনে রাখল।

লতা একদিন ওকে বলল, 'তুমি তো একদিন চলে যাবে।'

দীপক বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আবার ফিরব।'

'আবার ফিরবে? কী জন্যে?'

'তোমার জন্যে।'

লতা লজ্জায় মুখ নিচু করে নিল।

দীপক বলল, 'হ্যাঁ, লতা। আমার এই কাজটা হয়ে গেলে, আমি চলে যাব। তারপর আসব বরের বেশে, বারাত নিয়ে।'

লতা আনন্দে আর থাকতে না পেরে চঞ্চলা হরিণীর মতো দ্রুত ছুটে চলে গেল।

এইসময় একটা ঘটনা ঘটল। গ্রামে ডাকাত পড়ল। কে একজন ওকে বলল, বিজয় দল নিয়ে এসেছে। দীপক পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

দলটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।

তারা সোজা চলে গেল জমিদারবাড়ির দিকে। দীপক অন্ধকারে ছুটতে লাগল। যদি বিজয়কে দেখা যায়।

দলটা অতি দ্রুত জমিদারবাড়িতে তাদের কাজ সেরে চলে গেল। সাক্ষী রইল দীপক।

দীপক দেখল, তারা গ্রামের আর কারও বাড়িতে হানা দিল না। দরিদ্র কৃষকদের কোনও ক্ষতি করল না। দীপক শুনল যে, দলটা চলে যাওয়ার সময় প্রচুর টাকাপয়সা, কিছু খাদ্যশস্য এবং কয়েকটি বন্দুক নিয়ে গেছে।

তিনদিন পর খবর এল, পাশের গ্রামের এক জোতদারের বাড়ি থেকে তারা বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কোনও গ্রামবাসীর কিছু ক্ষতি করেনি। শুধু পাশের গ্রাম কেন, অনেক দূর-দূর গ্রাম থেকেও তাদের ডাকাতির খবর আসতে লাগল।

দীপক খুব ভোরে উঠে জঙ্গলটা দেখত। নজর রাখত, কেউ ঢুকছে-বেরোচ্ছে কি না। সেদিন ভালো করে আলো ফোটেনি। দীপক জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছিলে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, জঙ্গল থেকে লতা বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা কাগজের প্যাকেট।

দীপক অবাক হল। এত সকালে লতা জঙ্গলে গেছিল কেন? হাতের কাগজের প্যাকেটে কী আছে? লতার চালচলনে কেমন যেন একটা ভাব। সেটা বেশ সন্দেহজনক।

দীপক লতাকে এ-বিষয়ে কিছুই বলে না। কিন্তু দ্যাখে, লতা সেই কাগজের প্যাকেটটা নিয়ে যায় গোয়ালঘরে।

দীপক সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

দুপুরে লতা যায় সামনের নদীতে স্নান করতে। দীপক গোয়ালঘরে ঢুকে খুঁজতে থাকে প্যাকেটটা। এবং সেটা পেতে দেরি হয় না।

কিন্তু প্যাকেটটা খুলে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেতরে কয়েক বান্ডিল একশো টাকার নোট। দীপক প্যাকেটটা আবার যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে আসে।

দু-দিন ধরে ও লতাকে দেখতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য! ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ও তেমনই সাবলীল। উচ্ছল।

কিন্তু দীপক সবসময় লতার ওপর চোখ রাখে। তৃতীয় দিনে লতা যখন গোয়ালঘরে কাজ করছে, তখন ওর কাছে এল একজন চাষি। কিন্তু দীপকের অভিজ্ঞ চোখ বলল, এ-লোক আসলে চাষি নয়।

দীপক একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল, লোকটা একটা ঝোলা থেকে দশ বাই ছয় ইঞ্চি সাইজের খান ছয়-সাত বাক্স লতাকে দিল।

লতা সেগুলো তাড়াতাড়ি একটা টুকরিতে রেখে ওপরে ঘাসপাতা চাপা দিয়ে দিল।

লোকটা চলে যাওয়ার পর লতা নিজের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দীপক দুপুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। দুপুরে লতা স্নান করতে গেলে দীপক এসে ঢুকল গোয়ালঘরে। টুকরির ঘাসপাতা সরিয়ে একটা বাক্স বের করল। কিন্তু বাক্সটা খুলেই দীপক চমকে উঠল। ভেতরে রাইফেলের কার্তুজ।

দীপক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা। গোটা ব্যাপারটা ওর কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং ও ঠিক করল যে, লতাকে কাজে লাগাতে হবে।

পরের দিন খুব সকালে উঠে দীপক জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথের ধারে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরেই দেখা গেল লতা মাথায় করে ঝুড়িটা নিয়ে আসছে।

দীপক হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লতার সামনে দাঁড়াল।

লতা ভীষণভাবে চমকে উঠল এবং মাথা থেকে ঝুড়িটা পড়ে গেল। ছিটকে বেরিয়ে এল কয়েকটি বাক্স। দীপক কোনও কথা না বলে একটা বাক্স তুলে নিল। বাক্সটা খুলে ধরল লতার সামনে। লতার মুখ কাগজের মতো সাদা।

দীপক বলল, 'তাহলে তোমার আর-একটা রূপ আছে? তুমিই এই ডাকাতদলকে গোলাগুলি সাপ্লাই করো?'

লতা কোনও উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপক বলল, 'তুমি কি জানো যে, ডাকাতদলকে এসব সাপ্লাই করার অর্থ, তুমিও আইনের চোখে অপরাধী?'

লতা মৃদুস্বরে বলল, 'আমি জানি, কাজটা অন্যায়।'

'তাহলে কেন এ-কাজ তুমি করো?'

হঠাৎ লতা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'করি, কারণ আমায় করতে হয়।'

'করতে হয়! কেন? তুমি জানো না ওরা ডাকাত?'

'ওরা কী আমি জানি না। আমার একমাত্র ভাই—মানে বড় ভাই, ওই দলে আছে।'

দীপকের বিস্ময়ের শেষ নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'লতা, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। আমি তোমাকে বিয়ে করব। কাজেই আমার মনে হয়, তোমাকে সব খুলে বলা দরকার।'

ওরা পায়ে-পায়ে নদীর ধারে চলে এল। লতা বসল একটা পাথরে, নদীতে পা ডুবিয়ে।

দীপকও নদীতে নেমে গিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লতা, আমার সত্যিকারের পরিচয়টা তোমাকে দেওয়া দরকার। আমি লেখক নই।'

লতা ওকে আরও অবাক করে বলল, 'জানি।'

'জানো?'

'হ্যাঁ। তুমি কী তা আমি জানি না, তবে তুমি যে লেখক নও তা আমি জানি।'

'কী করে জানলে?'

'আমি তোমার বাক্সে বন্দুক দেখেছি।'

দীপক স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোমার কোনও সন্দেহ হয়নি? কাউকে বললে না, পুলিশের কাছে গেলে না?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি—তুমি যাই-ই হও, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

দীপক দু-হাতে লতাকে জড়িয়ে ধরল। লতা দীপকের বুকে মাথা রেখে বলল, 'তোমার কাছে বন্দুক কেন? তুমিও কি ডাকাত?'

দীপক বলল, 'না। কিন্তু আমি এসেছি ওই ডাকাতদলেরই খোঁজে।'

'কেন?'

'তবে প্রথম থেকে শোনো।'

দীপক সমস্ত কিছু খুলে বলল লতাকে। লতা চুপ করে সব শুনল।

দীপক বলল, 'ওই দলটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পুলিশ বুঝবে ওদের ব্যাপার। আমি এসেছি ওই মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ওকে বিজয় জোর করে ধরে এনেছে।'

'যদি জোর করে ধরে এনে থাকে তাহলে খুবই অন্যায় করেছে।'

'আমি তোমার সাহায্য চাই, লতা।'

'সাহায্য করব, কিন্তু তুমি কথা দাও আমার দাদা বা ওই দলটার কোনও ক্ষতি হবে না।'

'কথা দিচ্ছি, লতা।'

'বলো কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমাকে ওদের মধ্যে ঢুকতে হবে। তুমি তার ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি ওদের বোঝাবে যে, আমি একজন ভালো মার্কসম্যান—মানে বন্দুকবাজ। মিলিটারিতে ছিলাম। যে-কোনও কারণে আমি সরকারের ওপর, বড়লোকদের ওপর, খাপ্পা। আমি বদলা নিতে চাই। যারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত, আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে ঘুরছি। ওই দলে আমাকে নিলে আমি তাদের গেরিলা যুদ্ধ শেখাতে পারি।'

লতা বলল, 'পরিকল্পনাটা বেশ ভালো। ওদের বিশ্বাস করাতে হবে ব্যাপারটা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। কিন্তু দীপক, ব্যাপারটা খুব ভয়ের। বিপদ আছে এতে।'

দীপক হেসে বলল, 'সারা জীবন আমি বিপদ নিয়েই খেলা করেছি, লতা। ওটাই আমার পেশা। আমি মেয়েটাকে নিয়ে পালানোর সুযোগ চাই। ওদের আমি বিন্দুমাত্র ক্ষতি করব না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। মেয়েটাকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পারলে অনেক টাকা পাব এবং আমি আবার আসব। এবার আসব বারাত নিয়ে, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

লতা বলল, 'সে-দিন কি সত্যিই আসবে?'

'আসবে, লতা। তুমি শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। আমাকে সাহায্য করো, যেন আমি ওদের দলে ঢুকতে পারি।'

লতা বলল, 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

তিনদিন পর লতা খবর আনল যে, ওরা ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

দীপককে সঙ্গে করে নিয়ে চলল লতা। জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরে ওকে নিয়ে এল একটি নির্জন স্থানে।

মূল ঘাঁটি থেকে এ-জায়গা অনেক দূরে। তিনজন লোক ওদের ঘিরে ধরল। লতা ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের মধ্যে যার নাম রতনলাল সে-ই দীপকের সঙ্গে বেশিরভাগ কথাবার্তা বলল। সরকার এবং জমিদার শ্রেণির ওপর, বড়লোকদের ওপর, প্রতিশোধ নেওয়ার গল্পটা দীপক তৈরি রেখেছিল। নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য চল্লিশ গজ দূরের গাছের ডালে বসে থাকা একটা ছোট্ট পাখিকে গুলি করে নামাল। পকেট থেকে একটা লোহার টাকা বের করে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে সেটাকে গুলি করে অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রমাণ দিল।

রতনলাল এবং সহযোগীদের চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। ওরা জীবনে ঠিক এই ধরনের নিশানাবাজ দেখেনি।

রতনলাল বলল, 'তোমাকে আমরা কিছুদিন আন্ডার ট্রায়ালে রাখব। অস্ত্রবিদ্যাটা তুমি ভালোই জানো। সেটা আমাদের কাজে লাগবে। আমরা তোমার কাছে ট্রেনিং নেব। কিন্তু এখন তুমি মূল ঘাঁটিতে যেতে পারবে না। তুমি এখন মূল ঘাঁটি থেকে কিছু দূরে আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

দীপক বলল, 'আমি তোমাদের নেতা বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তাঁর সঙ্গে এখনই দেখা হবে না। তবে তোমার বিষয়ে তাঁকে জানানো হয়েছে। সময় হলে তিনি নিজেই তোমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

দীপক আর কৌতূহল দেখাল না।

ওরা দীপককে কতকগুলো বই পড়তে দিল। সেগুলো সমাজতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক এক্সপ্লয়টেশান সম্পর্কে।

দীপক সেগুলো পড়ে মাথামুন্ডু কিছুই বুঝল না। শুধু এই ভেবে অবাক হল যে, এরা এসব বই কেন পড়ে!

এইভাবে দিন-কয়েক কাটল। কিন্তু একটা বিরাট সত্য ওর কাছে উদঘাটিত হয়ে গেল।

একদিন রাতে বন্দুকের শব্দে ও উঠে বসল বিছানায়। দূরে বন্দুকের শব্দে আকাশ মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছে। জঙ্গলের একাংশে আগুন ধরে গেছে।

ওকে বলা হল যে, একদল কুখ্যাত ডাকাত ওদের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করেছে। ওদের যেতে হবে সাহায্য করার জন্য। ওর হাতে একটা পিস্তল দেওয়া হল।

দীপক বুঝে নিল যে, এটা দু-দল ডাকাতের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দীপক বুঝল, এই হই-হট্টগোলের মধ্যেই ওকে কাজ সারতে হবে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিদ্যার কাছে পৌঁছতে হবে এবং ওকে নিয়ে চম্পট দিতে হবে।

দীপক ওদের সঙ্গে মূল ঘাঁটির দিকে চলল। ডাকাতদের সঙ্গে ওদের গুলি বিনিময় হল। দীপকের গুলিতে কয়েকজন ডাকাত ভূতলশায়ী হল।

কিন্তু মূল ঘাঁটিতে পৌঁছে দীপক দেখল যে, ওরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দীপক একা খুঁজতে লাগল বিদ্যাকে।

হঠাৎ দীপক বিদ্যাকে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দেখতে পেল। বিদ্যা একা আশ্রয়ের জন্যে দৌড়চ্ছে। সে-পাহাড়ে পৌঁছতে গেলে দীপককে প্রায় একশো গজ লম্বা এবং চল্লিশ গজ চওড়া একটা ফাঁকা জমি পার হতে হবে।

দীপক চারদিক দেখে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু ফাঁকা জমিটার মাঝামাঝি আসতেই ও শুনতে পেল : 'হল্ট!'

দীপক কিছু বোঝার আগেই দেখা গেল, ওর ডানদিকের বিশ গজ দূরে ঝোপ থেকে দুজন লোক পিস্তল উঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছে। একজন ওকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল গুলি করার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা পিস্তল গর্জন করে উঠল। পিস্তলধারী ভূপাতিত হল, কিন্তু দ্বিতীয়জন বিদ্যুৎবেগে যেখান থেকে গুলি এসেছিল, সেইদিকে গুলি ছুড়ল। সেইটুকু সময়ই যথেষ্ট ছিল দীপকের পক্ষে। ও বিদ্যুৎবেগে হাত তুলে দ্বিতীয় লোকটাকে ফেলে দিল মাটিতে।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, কে তার জীবন রক্ষা করেছে। দেখল, কেউ একজন মাটিতে পড়ে আছে এবং বিদ্যা চেষ্টা করছে তাকে সাহায্য করতে—যেন সে দাঁড়াতে পারে।

দীপক এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ও শুনল যে, আহত ব্যক্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং বিজয়। ওদের দলপতি।

চারদিকে তখন দারুণ লড়াই চলছে। দীপক বলল, 'সবচেয়ে আগে কোনও একটা নিরাপদ জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া দরকার। গুলি লেগেছে আপনার বাঁ-দিকের ঊরুতে।'

দীপক এবং বিদ্যা কোনওরকম করে বিজয়কে নিয়ে এল একটা পাহাড়ের আড়ালে। সেখানে বিজয়ের ঊরুতে রুমাল দিয়ে পট্টি বাঁধল দীপক। তারপর ঘোষণা করল যে, ওরা দুজন দীপকের বন্দি।

বিজয়ের চোখে যুগপৎ ঘৃণা এবং বিস্ময় ফুটে উঠল। সে প্রশ্ন করল, 'বন্দি? তার মানে, তুমি পুলিশের লোক?'

দীপক হেসে বলল, 'ঠিক পুলিশের লোক নই। তবে সমাজবিরোধী এবং ডাকাতদের বন্দি করার অধিকার সকলেরই আছে।'

'ডাকাত? তোমার মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী আমি জীবনে দেখিনি। আমি তোমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছি। আর তুমি আমাকে ডাকাত বলছ?'

দীপক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'আমার প্রাণরক্ষা করেছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি ডাকাত নও?'

'না, আমি ডাকাত নই।'

'আমি নিজের চোখে সেদিন তোমাকে এবং তোমার দলকে জমিদারবাড়িতে ডাকাতি করতে দেখেছি।'

'আমি ডাকাতি করতে যাইনি—ট্যাক্স নিতে গেছিলাম।'

'ট্যাক্স? কীসের ট্যাক্স?'

'তুমি একটা ইডিয়ট, তাই এতদিনেও বুঝতে পারোনি। আমি একজন বিপ্লবী। আমরা সকলেই বিপ্লবী। আমাদের বিপ্লবী সরকার আছে। সেই বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার জন্যে, সরকারের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে, পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, অনেক টাকার দরকার। এটা নিশ্চয় তুমি জানো।'

'তোমার ওই যুক্তিতেই কি তুমি ডাকাতি কর?'

'একশোবার বলছি, আমি ডাকাতি করি না। ডাকাতরা কোনও শ্রেণি বিচার করে না। ডাকাতদের কোনও আদর্শ নেই। তারা পলিটিক্যাল নয়। আজ যারা আমাদের আক্রমণ করেছিল, তারাই প্রকৃত অর্থে ডাকাত। তারাই সমাজবিরোধী।'

দীপক বলল, 'তোমার এই গালভরা কথাগুলো শুনতে হয়তো ভালো, কিন্তু ব্যাপারটা তো সেই একই—ডাকাতি।'

'ওটা ডাকাতি নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও তুমি মানুষ খুন করেছ, কিন্তু তুমি কি নিজেকে খুনি মনে কর?'

'কিন্তু এটা কি যুদ্ধক্ষেত্র?'

'তুমি কি জীবনে কিছুই পড়াশোনা করোনি? যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি কাদের জন্যে যুদ্ধ কর? একটা জাতির জন্যে। কয়েক কোটি লোকের জন্যে। এটাও যুদ্ধ। এ-যুদ্ধ দুটো শ্রেণির মধ্যে। পৃথিবীতে দুটোমাত্র শ্রেণি। শোষক আর শোষিত। আমাদের যুদ্ধ শোষক-শ্রেণির বিরুদ্ধে। একে বলে ক্লাস স্ট্রাগল।'

বিজয় থামল। নিজের আহত ঊরুর ওপর হাত রেখে একটা যন্ত্রণার ঢেউ সামলে নিল।

দীপক কথা বলল না। চুপ করে শুনতে লাগল।

বিজয় আবার বলল, 'আমার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টাকার দরকার। যারা দরিদ্র শ্রেণিকে শোষণ করছে, এক্সপ্লয়েট করছে, যারা কালোবাজারি করছে, চোরাচালান করছে, তাদের কাছ থেকে আমার সরকার ট্যাক্স আদায় করে। ওরা নিজের জন্যে নিজেদের মতো সরকার তৈরি করেছে, সেই সরকার চালানোর জন্যে তারা গরিব মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে। গরিব মানুষদেরও অধিকার আছে নিজেদের মতো রাষ্ট্র তৈরি করার। নিজেদের সরকার তৈরি করে তারাও ওই ধনীদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবে।' বিজয় চুপ করল।

বিদ্যা প্রশ্ন করল, 'তুমি বলছ, তুমি পুলিশের লোক নও, তাহলে তুমি কে? কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'তোমার বাবা বদ্রীপ্রসাদ।'

'আমার বাবা!'

বিদ্যা এবং বিজয় পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। বিদ্যা আবার প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমার বাবা আমায় বলেছেন যে, তোমাদের বাড়ি ডাকাতির দিনে বিজয় তোমাকে কিডন্যাপ করে এনেছে।'

বিদ্যা চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'চেঁচিও না, বিদ্যা! আমি পেশাদার লোক। আমি এই করে খাই। আমাকে...।'

বাধা দিয়ে বিজয় বলল, 'দেখেছ! দ্যাখো। টাকার জোরে ওরা কী না করতে পারে! দিনকে রাত করতে ওদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না। তোমার মতো একটা বুদ্ধিমান লোককেও সে বোকা বানিয়েছে।'

'কীরকম? তুমি ওকে জোর করে ধরে আনোনি?'

'ওর মুখ থেকেই শোনো।'

বিদ্যা বলল, 'আমার বাবা চিরকাল মিথ্যার ব্যবসা করেছে। আমাকে কেউ জোর করে ধরে আনেনি। আমি আর বিজয় একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। ও ছিল দু-বছরের সিনিয়ার। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। এবং আমরা আইনসম্মতভাবে বিবাহিত। আমার বাবা এটা জানেন না। তিনি চান আমি তাঁর সমস্ত পাপ-কাজের সহচর মদ্যপ লম্পট রাজুকে বিয়ে করি। তাই আমি সেদিন নিজের ইচ্ছেয় বিজয়ের সঙ্গে চলে এসেছি। এবং জেনে রাখুন, সেদিন আমিই এদের ঢোকার জন্যে দরজা খুলে দিয়েছিলাম। আমিই সিন্দুকের চাবিটা ওদের দিয়েছিলাম। আমি একজন সাবালিকা। ন্যায়-অন্যায় বোধ আমার আছে। স্বামী নির্বাচনের অধিকার আমার আছে। পৃথিবীর কারও, এমনকী আপনার মতো একজন নিকৃষ্ট জীবেরও, অধিকার নেই আমাকে বাধা দেওয়ার।'

বিদ্যা দু-হাতে বিজয়ের মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে আবার বলল, 'মৃত্যু ছাড়া আমাদের কেউ আলাদাও করতে পারবে না।'

দীপক পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। মাথার মধ্যে সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লব, বিপ্লবী সরকার, শ্রেণি-সংঘর্ষ সম্পর্কে বিজয় অনেক কথাই বলল। এসব জিনিস কোনওদিনই ওর মাথায় ঢোকে না।

বিজয় প্রমাণ করতে চাইল যে, সে ডাকাত নয়। প্রচলিত অর্থে তো নয়ই।

দীপক ভাবল, বিজয় ডাকাত হলেই বা হবে কী? ও তো ডাকাত ধরতে আসেনি। কেউ ওকে ডাকাত ধরতে বলেনি। ডাকাত ধরার জন্য ও চুক্তিবদ্ধ নয়।

শেঠ বদ্রীপ্রসাদ ওকে বলেছে, বিদ্যাকে নিয়ে যেতে। বিদ্যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ও অগ্রিম পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। শেঠজি পরিষ্কার বলেছেন যে, ওকে আর কিছু করতে হবে না। শুধু বিদ্যাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বিজয় যদি সমাজবিরোধী হয়ে থাকে, ডাকাত বা খুনি হয়ে থাকে, কিংবা বিপ্লবী হওয়াটা বেআইনি হয়ে থাকে, তার জন্য আছে পুলিশ। তার জন্য আছে দেশের আইন। দেশের আইন তার বিচার করবে। একজন পেশাদার হিসাবে নিজের লাইনের বাইরে ওর পা বাড়ানো ঠিক হবে না।

কিন্তু ও কথা দিয়েছে শেঠজিকে। চুক্তি করেছে যে, বিদ্যাকে ও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। দীপক পেশাদার লোক। চুক্তিভঙ্গ করা ওর পক্ষে অসম্ভব। জীবন গেলেও ওকে কথা রাখতে হবে।

দীপক বিজয়কে বলল, 'তোমার ওই সব তত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি ঠিক করছ না ভুল করছ, তা আমি জানি না। আমি শুধু জানি যে, ওটা আমার ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি পেশাদার লোক। আমি আমার জীবিকার প্রতি অসৎ হতে পারি না। বিদ্যাকে আমি নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছি, অগ্রিম টাকা নিয়েছি।'

বিজয় বলল, 'তার মানে, তুমি আমাদের ধরে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে?'

'উপায় নেই।'

সারা রাত তারা জঙ্গলে কাটাল। পরের দিন সকালে লতা এল। লতা ওকে বলল যে, বিজয়ের দলকে পুলিশ তাড়া করেছে, ওরা পালিয়েছে।

দীপক লতাকে বলল খানদুয়েক ঘোড়া বিজয়দের পরিত্যক্ত শিবির থেকে নিয়ে আসতে। এবং একজন বিশ্বস্ত যুবককে সংগ্রহ করতে।

লতা একজন যুবক এবং দুটো ঘোড়া নিয়ে এল।

দীপক যুবককে তার দূত হিসেবে বদ্রীপ্রসাদের কাছে যেতে বলল। হাতে দিল প্রচুর টাকা। বদ্রীপ্রসাদ যেন তাঁর বাড়ির তিন মাইল দূরে ফাঁকা ধানখেতে মেয়েকে নিতে আসেন। এবং চুক্তি অনুযায়ী তিনি যেন পুলিশকে কোনওরকম খবর না দেন। তাহলে তিনি মেয়েকে ফেরত পাবেন না। বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা অবশ্যই আনতে হবে সঙ্গে করে।

যুবক চলে গেল বদ্রীপ্রসাদের কাছে।

দীপক একটা ঘোড়ায় বসল। অন্য ঘোড়ায় বসল বিদ্যা এবং বিজয়। সকলে চলল সেই বিস্তৃত ফাঁকা ধানখেতের দিকে।

পরের দৃশ্য ধানখেতের।

ধান কাটা হয়ে গেছে। ফাঁকা বিস্তৃত মাঠ দিগন্তের সঙ্গে মিশেছে।

একদিকে শেঠ বদ্রীপ্রসাদ তাঁর ডানহাত রাজু এবং কয়েকটি চেলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় দেড়শো গজ দূরে বিপরীত দিকে ঘোড়ার ওপর বসে আছে বিজয়।

ঠিক মাঝখানে দীপক এবং বিদ্যা। দীপক ডাকল শেঠ বদ্রীপ্রসাদকে। বদ্রীপ্রসাদ এগিয়ে এলেন।

দীপক বলল, 'শেঠজি, আপনি আমাকে আপনার মেয়েকে আনতে বলেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে করে এত লোক এনেছেন কেন?'

শেঠজি গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'আমি কী করব না করব, সেটা তোমাকে বলব না। তোমার সঙ্গে যা চুক্তি হয়েছিল, তুমি সেই অনুযায়ী কাজ করবে। চুক্তিতে এ-কথা বলা হয়নি যে, আমি মেয়েকে রিসিভ করার সময় সঙ্গে করে কাউকে আনতে পারব না।'

রাগে দীপকের চোখদুটো হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। সে অনেকক্ষণ বদ্রীপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেকে কোনওরকমে সংযত করে বলল, 'চুক্তি? বেশ, চুক্তি অনুযায়ী কাজই হবে। চুক্তির বাইরে একটা কাজও আমি করব না।'

বদ্রীপ্রসাদ বললেন, 'না। সে তোমায় করতে হবে না।'

'তাহলে বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি মেয়েকে নিয়ে যান।'

শেঠজি ফিরে রাজুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। রাজুর হাতে একটা ব্যাগ ছিল। সে এগিয়ে এসে ব্যাগটা দীপকের হাতে দিয়ে বলল, 'শেঠজির তরফ থেকে পঞ্চাশ হাজার, আমার তরফ থেকে দশ হাজার, মোট ষাট হাজার আছে। আমি কথা দিয়েছিলুম।'

দীপক টাকাটা ঘোড়ার পিঠে রেখে বলল, 'শেঠজি, চুক্তি ছিল আপনার মেয়েকে এনে দেব। আপনার মেয়েকে এনে দিয়েছি। চুক্তি শেষ—আমার দায়িত্ব শেষ। এবার আপনি ওকে রাখতে পারবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।'

দীপক কথা শেষ করে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

বিদ্যার হাত ধরলেন শেঠজি, 'চল।'

বিদ্যা এক ঝটকায় শেঠজির হাত ছাড়িয়ে, 'না,' বলেই ছুটল বিজয়ের দিকে।

শেঠজি দীপকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওকে থামাও! ওকে ধরো।'

দীপক বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'চুক্তিতে এমন কথা তো ছিল না যে দুবার ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'তার মানে? তুমি টাকা নাওনি ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে?'

'ফিরিয়ে এনেছি।'

'তুমি বিশ্বাসঘাতক!'

'চুক্তি অমান্য করিনি। বিশ্বাসঘাতক নই।'

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বদ্রীপ্রসাদ তাঁর দলকে আদেশ দিলেন, 'যাও, ধরো ওকে। কিছুতেই পালাতে দিয়ো না। ওদের কিছুক্ষণ আটকে রাখো, এখুনি পুলিশ এসে পড়বে।'

বদ্রীপ্রসাদের দল এগিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে অশ্বারূঢ় বিজয়ের হাতে আবির্ভূত হল একটা পিস্তল। ও আগুয়ান দলকে লক্ষ করে একটা গুলি ছুড়ল।

দীপক পিস্তল বের করে দলটার গতিরোধ করে দাঁড়াল।

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বদ্রীপ্রসাদ বললেন, 'একে বলে পেশাদার? যার টাকা নিয়েছ, তারই দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছ?'

'হ্যাঁ। এটাই প্রফেশনালের ধর্ম। তুমি আমায় ভাড়া করেছিলে, তখন আমি ওদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ওদের ধরে নিয়ে এসেছি। তোমার আদেশ পালন করেছি। আমার দায়িত্ব শেষ। এখন ওরা আমায় ভাড়া করেছে, যেন তোমার খপ্পর থেকে ওদের বাঁচাই। ওরা পুরো পারিশ্রমিক আমায় দিয়ে দিয়েছে। বিজয় আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তোমার মতো আমায় মিথ্যে কথা বলেনি। ধোঁকা দেয়নি। আমি প্রফেশনাল, আমি এখন ওদের কাছে চুক্তিবদ্ধ।'

'বটে! রাজু, ওম, চালাও গুলি। ওদের তিনজনকেই উড়িয়ে দাও।'

হঠাৎ সেই নির্জন প্রান্তর ঝলসে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে। চারদিক ছেয়ে গেল বারুদের গন্ধে। একদিকে বদ্রীপ্রসাদ আর তাঁর সশস্ত্র দল। আর-একদিকে দীপক, আহত বিজয় এবং বিদ্যা।

কিছুক্ষণের জন্য সেই নির্জন প্রান্তর হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র।

কিন্তু একজন সশস্ত্র বিপ্লবী এবং একজন পেশাদার বন্দুকবাজের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারে না। প্রথমে প্রাণ দিতে হয় রাজুকে। ক্ষিপ্ত বদ্রীপ্রসাদ দীপককে উদ্দেশ করে গুলি চালাতে যান। কিন্তু তার আগেই বিজয়ের একটা গুলি এসে লাগে বদ্রীপ্রসাদের বুকে।

বাকিরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়।

বিজয় নিজের ঘোড়ায় তুলে নেয় বিদ্যাকে। হাত তুলে দীপককে বিদায় জানায়।

দীপক বলল, 'বিদায়। যদি কেউ আবার আমায় পাঠায় তোমাকে ধরে নিতে যেতে, তাহলে তোমার খোঁজে আবার আসব।'

বিদ্যা বলে, 'তখন আমাদের আর ও-জঙ্গলে পাওয়া যাবে না। আমরা সেখানে ফিরছি না।'

বিজয় বলে, 'তুমিও তৈরি থাকো, দীপক। সেদিন বোধহয় এগিয়ে আসছে, যেদিন আমার আদালতে তোমার বিচার হবে।'

দীপক হেসে বলল, 'আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। কিন্তু দেশের আইন তোমার বিচার করবে। চলি।'

বিজয় আর বিদ্যা অজানা আস্তানার দিকে ছুটিয়ে দিল ওদের ঘোড়া। দীপক দেখল, ওরা দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার পর একটা পুলিশ জিপ ছুটেছে ওদের দিকে।

দীপক ফিরে চলল সেই গ্রামের দিকে, যেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছে লতা।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৩



ম্যাকবেথ

শেখর সেনগুপ্ত

কাঠমান্ডু হয়েছে সরস,
নিয়ে প্রচুর গাঁজা চরস।

না, নেপালের রাজধানীকে নিয়ে এটা কোনও ছড়াকারের ছড়া নয়। অনুত্তমের তুড়ি বাজানো নিরেট ভণিতা। আবেগটা বুকের কোণে লালিত হচ্ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎ ছড়াকারে বেরিয়ে এসেছিল। আঁখি ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'বাহ! তুমি কি প্রেমেন মিত্তিরের কবি-গোয়েন্দা পরাশর বর্মা হয়ে গেলে নাকি?'

অনুত্তম জিভ বের করে বলে, 'না, না, কদাচ নয়। কার সঙ্গে কার তুলনা! ব্যোমকেশ—পরাশর—ফেলু মিত্তিরের পাশে অনুত্তম চৌধুরী! হিমালয়ের মুখোমুখি অযোধ্যা পাহাড়! তবে কী জানো—।'

কথা শেষ না করে অনুত্তম সিগারেটে লম্বা টান দেয়। আঁখি, যার টানা-টানা চোখ তার মুখের ওপর, ফ্রেমে আটকানো বিলকুল রমণীয় ছবি, অনুত্তম ওর ঠোঁটের গড়ন দেখে তৃপ্ত হয়।

আঁখিসম প্রিয়াপ্রসঙ্গ নিয়ে সে মশগুল থাকতে পারে চিরাচরিত আচরিত জীবনের শর্তগুলি ভাঙতে-ভাঙতে। পরিচিত ও পরিজনরা প্রায়শই উসখুস করে, তোদের বিয়েটা কবে হচ্ছে? এমন মাখামাখি করছিস, চোখে দেখা যায় না মাইরি! ...বিয়ে? দরকার আছে? আঁখি যদি কখনও জননী হতে চায়, তখন বংশধরের পরিচয়ের সুরাহায় ব্যাপারটা চুকিয়ে নেওয়া যাবে। আপাতত সেই অনুষ্ঠানের মূল্য আমাদের কাছে কানাকড়ি। মনের মিল যতদিন আছে, দেহমিলনেও যুক্তিগ্রাহ্য কোনও বাধা নেই। বদনাম বাতাসে উড়ছে, উড়ুক, আঁখি-অনুত্তম তো জোড় বেঁধে বেড়িয়ে এল কাঠমান্ডু।

নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে অনুত্তম বলেছিল, 'তবে কী জানো, কাঠমান্ডুতে পা দিয়েই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, এখানকার মাটি কুয়াশা-কুয়াশা অস্পষ্ট হংকং-এর মতন। অর্থাৎ, বহুত ধান্দাবাজের দল ঘুরঘুর করছে এবং হিপি-হিপিনিদের আখড়াগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেও বলা যায়, এখানকার বাতাস কেবলই চরস-গাঁজা-চন্ডুতে ম-ম।'

আঁখি কৃত্রিম ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, 'সি আই ডি ইন্সপেক্টর তো, তাই সব জায়গাতেই কেবল ধান্দাবাজ আর চরস-চন্ডুর গন্ধ খুঁজে পাও।'

অনুত্তম নিজের কপাল চাপড়ে আবেগে বলেছিল, 'সত্যি, কী দুর্ভাগ্য! গোয়েন্দাজীবন কেবল যে কুসুমাস্তীর্ণ হল না তা নয়, হরেক রকম বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, সন্দেহ এবং তাড়াহুড়ো হিংস্রতায় আমার কবি-মনটাও খতম

হয়ে যাচ্ছে। না হলে, আঁখি, তুমি আমার পাশে, আর সামনে এমন অবারিত সৌন্দর্য! আহ—আহ...!'

অনুত্তমের ভরাট গলায় কিন্তু জাদু আছে। আঁখির মনে দোলা লাগে। সে তখন সত্যি হিমালয় ও তার সন্তানদের রূপমহিমা নিয়ে মনে-মনে বেশ উত্তেজিত। কপালের ওপর চূর্ণকুন্তল সরাল, মুক্তো-সেটিং আংটিসমেত পাতলা অনামিকা কিছুক্ষণ ঈষৎ কেঁপেছিল। কাঠমান্ডু তো আধা-আধুনিক—সেই হেতু যেমন-তেমন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পার্বত্য অধিত্যকায় হাঁটতে-হাঁটতে প্রাণ-স্পন্দনের নতুনতর হিল্লোল আঁখি অনুভব করেছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে, ঝরনার ধারে-ধারে রকমারি পাখির মেলা বসেছে—লালমুনিয়া, ভৃগুরাজ, তিতিরবট, মায় সারস অবধি সব বর্ণ-বিচিত্র পাখি। কোথাও-কোথাও ধস নামার চিহ্ন, পাহাড়িরা সেখানে গাছে-গাছে বেঁধে রেখেছে মোটা-মোটা লতা, ওই লতা কোমরে জড়িয়ে পেন্ডুলামের মতন দুলতে পারে মানুষ, আচমকা পাতালে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার ওই একটিমাত্র উপায়।

এইসব বলগাহীন নিসর্গ বৈচিত্র্য যার মনে নাড়া দেয়, ঝড়ও তোলে, তার নাম আঁখি। যদিও অনুত্তমকে অনেক রহস্যভেদে সে বেসরকারিভাবে নিশ্চিত সহায়তা করেছে, মনের দিক থেকে তাকে ঠিক নিরেট সন্দেহপরায়ণা বলা চলে না। মানুষের মনের জটিলতা এবং পারিপার্শ্বিক ধোঁয়াশা নিয়ে সে অন্তত এখানে ভাবতে রাজি ছিল না। কিন্তু রেহাই দিল না দোসর অনুত্তম। গম্ভীর পর্বতমালা বা সমুন্নত বৃক্ষরাজি দেখে-দেখে শিথিল হওয়ার পরিবর্তে কাঠমান্ডুর অপরাধ জগতের সন্ধানে সে বিলকুল টান-টান, একেবারে বেমানান।

সেই বেমানান কাণ্ডকারখানার সূত্র ধরেই দুজনে এখন এয়ারপোর্টে। দিল্লিগামী ফ্লাইটে উঠব-উঠব।

অনুত্তমের পরনে সাদা পলিয়েস্টারের বেলবটস, গায়ে টাওয়েলের টকটকে লাল রং গেঞ্জি, —পোশাকের চাকচিক্যে বয়সটাকে পাঁচবছর পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেন। পোশাকে আঁখি সম্পূর্ণ বাঙালি। কটকি তাঁতের শাড়ি, মাঝামাঝি সিঁথি এবং চুল ফুলে-ফেঁপে নাগফণার মতো এক মস্ত খোঁপা, ঠোঁটে হালকা রং, বাঁ-হাতে সরু রিস্টওয়াচ, চুড়ি-টুড়ির বালাই নেই।

আপাতভাবে তারা একজোড়া নিরীহ ভ্রমণলিপ্সু, যারা দিন-তিনেক কাঠমান্ডু এবং এর চারপাশ চষে বেড়িয়ে এখন ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু আঁখি অন্তত হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে, অনুত্তমের কঠিন থাবা থেকে এখানেও ধারালো নখ বেরিয়েছিল, এখনও বেরিয়ে আছে। যেমন হোটেল থেকে এই এয়ারপোর্টে আসাটাও কোনও ইচ্ছাসুখের প্রতিচ্ছবি নয়, স্রেফ একজনকে অনুসরণ করে আসা।

কাকে?

একজন মহিলাকে।

হুঁ, মহিলাই। তবে ভারতীয় বলে বিশ্বাস হয় না। মুখে-চোখে ও রঙে মঙ্গোলিয়ান টাইপ হলেও মাথায় যথেষ্ট লম্বা—আন্দাজ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আঁখিকে নিয়ে ইতি-উতি চক্কর কাটতে-কাটতে হঠাৎ অনুত্তমের নজর আটকে গিয়েছিল ওই হলুদ সুন্দরীর প্রতি। তখন রাত আটটার কম নয়। 'হোটেল আইস কিউ'তে ঢুকেছে অনুত্তম ও আঁখি। বিশাল চারতলা কাষ্ঠনির্মিত পাঁচতারা হোটেল, যেখানে পা রাখা মানেই অথই সমুদ্রে ঝুপ করে ডুব মারা। নরম রক্তবর্ণ কার্পেটে শরীরের সিকিভাগ মিলিয়ে গেল বুঝি। আলোগুলি রঙিন, কিন্তু এত কমজোরি যে, মনে হয় যেন ওদেরকে অহরহ পোকায় কাটছে।

অনুত্তম ঈষৎ ইতস্তত করছিল—ঠিক কোন তলায় গিয়ে বসা উচিত, তাই নিয়েই বুঝি ওর মস্তক ঘর্মাক্ত। একতলায় খানা পিনার গুরুভার, যার যেমন চাহিদা। চাইনিজ—স্প্যানিশ-পর্তুগিজ...কোল্ড অ্যান্ড হট; কোকাকোলা থেকে শুরু করে রাশিয়ান ভদকা অবধি। রহস্যময় আলোর তলায়-তলায় একটা করে টেবিলকে ঘিরে চারটে করে চেয়ার। ইচ্ছে হলে টেনে নাও পরদা, সঙ্গিনীর সঙ্গে গভীর নিভৃতে আলপচারী

হওয়ার মহৎ সুযোগ, যে-সুযোগ তখন আঁখির অভিপ্রেত হলেও অবস্থাটা যে তার 'ধরো ভাই লক্ষ্মণ'-এর মতন, অর্থাৎ অনুত্তম যেদিকে চালাবে, সে সেইদিকেই চলবে।

অনুত্তমের নজর ড্রাগন-আঁকা সিঁড়ির ওপর—সিঁড়ি ঘুরে-ঘুরে দোতলায়। সেখানে মজা আছে, এইসব নেপালি বনেদি হোটেলের যা-কিছু ম্যাজিক ওখানেই। ক্যাসিনোর রমরমা।

অনুত্তম কিছুটা অলস মন্থরতায় সিঁড়ির হাতলে আঙুল রাখে, ধাপে-ধাপে পা রেখে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। তদনুযায়ী আঁখিও। আঁখি একবার বলেছিল, 'তুমি খেলবে নাকি?'

অনুত্তম দেয়ালের কারুকার্য দেখতে-দেখতে উত্তর দিয়েছিল, 'খেলতে পারি অথবা খেলাতেও পারি।'

চারদিকে দারুণ হইহই-রইরই।

ক্যাসিনোর বর্ণময় চাকা ঘুরছে, 'হনুমানের লাঠি' মাঝে-মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে, মুদ্রাক্ষেপণ চলেছে, পয়সা যাচ্ছে, পয়সা কিছু আসছেও।

সকলেরই পকেট-ঠাসা হরেক দেশের কাগুজে নোট। প্রত্যেকে জীবনের এই সময়টাকে উদ্দাম ও স্মরণীয় করে রাখতে চাইছে। দেশে যে বড়সড় রাজনৈতিক ওলট-পালট হতে চলেছে—প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত থাপা মন্ত্রীসভা যে দুর্নীতির দায়ে টলমল, তার কোনও প্রতিচ্ছবি বা প্রতিক্রিয়া এখানে নেই।

আঁখি দেখছে, পুরুষ ও মেয়ে—প্রায় সকলেই ফোঁস-ফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। পোড়া তামাকের কটু গন্ধ। মিশ্র অনুভূতি।

অনুত্তম আঁখির কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে বলল, 'গন্ধটা কেমন?'

আঁখি : 'কীসের গন্ধ?'

অনুত্তম : 'এই এত তামাকের।'

আঁখি : 'যেমন হয়।'

অনুত্তম : 'উঁহু, যেমন হয়, তেমন নয়। একটু যেন অন্যরকম, অন্যরকম।'

আঁখি : 'মানে?'

তখন অনুত্তম সারণির কুলকুল ধ্বনির মতন আবার ছড়া কেটে উঠেছিল

কাঠমান্ডু হয়েছে সরস,
নিয়ে প্রচুর গাঁজা চরস।

আঁখি একবার অনুত্তমের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল। তারপরই কিন্তু হেসে উঠল এবং চকিতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করল, যেন ওই পরিবেশে সে তার শৈশবাবস্থায় ফিরে গেছে। সেই অসরল পথে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা, যখন কিনা সে স্বয়ং অপরাধ জগতের পাখি ছিল। সর্বজনস্বীকৃত সোসাইটি গার্লের মতন অনুত্তমের বুকপকেট হাতিয়ে একটা সিগারেট ধরাল এবং তারপর কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে এগিয়ে চলল ছায়াচ্ছন্ন জগতটার দিকে।

'ব্রেভো, ডার্লিং! ব্রেভো!' প্রায় নিঃশব্দে হাততালি দিল অনুত্তম।

কিন্তু এই আবিল পরিবেশে বিস্ময়ের ওখানেই শেষ নয়।

আঁখি ঘূর্ণায়মান বোর্ডে বাজি ধরবে বলে ব্যাঙ্কারের কাছে গুটিগুটি এগিয়ে যাওয়ার সময়ই লক্ষ করা গেল আর একটি নারীমূর্তিকে।

অনুত্তমের শরীরে একটা ঝাঁকি লাগে, তার দুই চোখে চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়। নারীমূর্তি তো অনেকগুলিই, কিন্তু ওই সুন্দরী দর্শনে বুঝি এমন কোনও স্পর্শকাতরতা আছে, যার প্রভাবকে অনুত্তম অস্বীকার করতে পারে না। অথবা, অনুত্তম যেহেতু বহুলাংশে স্মৃতিজীবী, স্বমহিমাতেই সে চিনবার চেষ্টা করে ওকে। সে শিস দিয়ে ওঠে।

নারী ভারতীয় নয়, নেপালিও নয়, কিন্তু শরীরে যে মঙ্গোলিয়ান রক্ত বইছে, সেটা মালুম হয় ওর চেরা-চেরা চোখ, চাপা নাক এবং হলুদ রং দেখলে। অসচরাচর হল ওর দৈর্ঘ্য, প্রায় বুঝি ছয় ফুট ছুঁই-ছুঁই। স্কার্টের

লাল ফিতে সরু কটির ওপর এবং মানানসই স্তনবতী।

আঁখি এবং সেই দীর্ঘাঙ্গিনী বোর্ডের দু-পাশে গিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যাশা, এখনই হয়তো দুজনে চাল দেবে এবং শ্রীমতীদের হাতের গুণে রাতের ক্যাসিনো আরও জমে উঠবে।

আঁখি চাল দিল ঠিকই।

কিন্তু অন্যজন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার ওইদিকে চেয়ে পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হাতির দাঁতের হোল্ডারে সিগারেট বসিয়ে মেজাজে অগ্নিসংযোগ করে।

অনুত্তম তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিদেশিনীর দিকে। কিন্তু সে ওর দেহটাকে জরিপ করছে না, চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে ওর ডানহাতে, যেখানে রয়েছে একখানা অসাধারণ গ্রন্থ—'ম্যাকবেথ'।

অনুত্তমের রক্তে চঞ্চলতা বাড়ে। তার সমগ্র একাগ্রতা দ্রুত আত্মমুখী হয় ওই এক লক্ষ্যে—ম্যাকবেথ। ভিড় যত বাড়ছে, জুয়ার আবেষ্টনী থেকে ততই দূরে সরে যেতে থাকে হলুদ রূপসী। সরতে-সরতে সিঁড়ির কাছাকাছি। আঁখির কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে অনুত্তম তার পিছু নেয়। আঁখি হকচকিয়ে যায়। প্রথম দানে মার খাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় সে মাত্র চাকতি ছুড়েছে, অনুত্তম তার চোখের সামনে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

আঁখি নড়ে না, পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে।

সেই অনুত্তম যখন ফিরে এসেছিল, তখন প্রায় মধ্যযাম। বাইরে হু-হু ঠান্ডা বাতাস। আঁখি বিছানায় টান-টান, সিলিং-এর কারুকর্ম দেখছিল। অনুত্তম ফিরে এলেও সে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। অনুত্তম মুচকি হেসে কোটটা খুলে রেখে আঁখির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'রাগে যে একেবারে বাক্যহীনা।'

'মূল্যহীন রাগ করি না।'

'না, না, তোমার অভিমানের অসীম মূল্য গো আমার কাছে।'

অনুত্তমের ঠোঁট নেমে আসবার আগেই আঁখি উঠে বসে, তীক্ষ্নস্বরে জিগ্যেস করে, 'কোথায় গিয়েছিলে মেয়েটার পিছু-পিছু?'

অনুত্তম দু-হাত দু-ধারে ডানার মতন বিস্তারিত করে বলে, 'হেথায়, হোথায়, তারপর একেবারে এই হোটেলে, যেথায় স্বয়ং সুন্দরী একটি ঘর নিয়ে আছেন।' অনুত্তম একটু থেমে অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'একটা জিনিস সম্পর্কে কনফার্মড হয়ে এলাম। ইন্টারপোলের এক ঝানু গোয়েন্দা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, হংকং-এর বিখ্যাত স্মাগলার গারভিন চু-র ''আদান-প্রদান'' কাজের মধ্যে অনেক অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। এদের মধ্যে একটি হল—তার লোকেরা তথাকথিত বুক-ওয়ার্ম এবং হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবী-বিখ্যাত সব সাহিত্য-গ্রন্থের মোড়ক। আদতে ওই মোড়কের অন্তরালে প্রতিটি পাতায় সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদ্ধতিতে সাঁটা আছে মহামূল্যবান স্মাগলিং বস্তুসমূহ।' একটানা বলে অনুত্তম থামল।

আঁখি ঠোঁট ওলটায় : 'তার সঙ্গে ওই মেয়েটার কী সম্পর্ক?'

অনুত্তম ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে : 'তোমার কি ধার কমে যাচ্ছে নাকি, আঁখি? খেয়াল করোনি, মহিলার হাতে ছিল শেকসপিয়ারের ড্রামা ''ম্যাকবেথ''? নেপালের ওইরকম একটা মার-মার কাট-কাট হোটেলে কেউ সাহিত্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে ঢুকছে, দৃশ্য হিসেবে এটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক। বরং, যদি হাতে কোনও অশ্লীল ছবি বা পত্রিকা থাকত, ব্যাপারটা মেনে নেওয়া সহজ হত। চিন্তা করে দ্যাখো—।'

আঁখির এখন আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, একটু নড়েচড়ে ওঠে সে : 'তাহলে ফলো করে কী টের পেলে?'

অনুত্তম বলল, 'টের পেলাম, শ্রীমতী আমাদের এই সাদামাটা হোটেলটারই সেকেন্ড ফ্লোরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ওঁর এক শাগরেদকে জানিয়ে দিলেন, কাল সকালের ফ্লাইটেই নাকি দিল্লি নামবেন।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'রিয়েলি।'

'তোমার কী করণীয়?'

'আমার করণীয় হল, ওঁরই সঙ্গে একই ফ্লাইটে দিল্লি অবধি ধাওয়া করা। তারপর এরোড্রোমেই ম্যাকবেথের চরিত্র বিশ্লেষণ।'

অনুত্তমের কথার ভঙ্গিমায় আঁখি সশব্দে হেসে ওঠে।

আঁখির বিশ্বাস ছিল, অনুত্তমের অনুমান নির্ভুল। ঠিক এরোড্রোমে নামামাত্র ওর ''ম্যাকবেথ'' বইখানায় টান মারবে। এবং সম্ভবত 'ম্যাকবেথ'-এর পাতায়-পাতায় পাওয়া যাবে তীব্র মাদকদ্রব্যের সঞ্চিত ভাণ্ডার। অদ্ভুত!

তবু বিমান আরোহিণী ওই সুন্দরীর দিকে সে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে ওই চকচকে ''ম্যাকবেথ''-এর দিকে। শেকসপিয়রের দুই উজ্জ্বল চক্ষু যেন উচ্চারণ করছে 'ফেয়ার ইজ ফাউল, ফাউল ইজ ফেয়ার...'

আঁখি মনে-মনে প্রার্থনা করে আহা, বইখানা যেন নির্দোষ হয়!

সেই প্রার্থনার জের টেনেই সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে আঁখি তাকে বলল, ''ম্যাকবেথ'', দ্য গ্রেট অ্যান্ড ফেবারিট শেকসপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি। মে আই প্লিজ হ্যাভ ইট ফর আ ফিউ মিনিটস?'

সঙ্গে-সঙ্গে চাবুকের মতন জবাব, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম। আই কান্ট নেভার পার্ট মাই বুক, ইভন ফর সেকেন্ডস। ইটস অলওয়েজ পার্ট অফ মাই বডি।'

গভীর হতাশায় আঁখি কাঁধ ঝাঁকায়। একটা কাঁচা খিস্তি ওর ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল প্রায়, যদিও স্পষ্টত সে ফিসফিসিয়ে ওঠে : 'তুমি মরবে!'

মাসিক ক্রিমিনাল

পুজো সংখ্যা, **১৯৮৩**



রুপোলি রক্ত

অনীশ দেব

ডক্টর পালিত বললেন, এই নিন, আপনি আয়না চেয়েছিলেন—।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। খুব খুশি হয়ে আয়নাটা হাতে নিলাম। এখানে আসার পর এই প্রথম নিজের মুখ দেখতে পাব। ডক্টর পালিতের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞভাবে হাসলাম। উনিও হাসলেন হয়তো। কারণ, গোধূলির আবছা আলোয় সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। আমি আয়নায় নজর দিলাম।

কার ছবি এটা? এই কি আমি? এরকমই কি দেখতে ছিলাম? সাদামাটা মাঝারি রঙের স্বাস্থ্যবান এক যুবকের মুখ। কী জানি! এই যুবককে কখনও আমি দেখিনি। নিজের যে-চেহারা আমার মনে আছে, তার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই!

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, আর আয়নার মুখটাও ঢেকে যাচ্ছে আঁধারে। আয়নায় ঘরের একমাত্র জানলাটা চোখে পড়ছে, কিন্তু ডক্টর পালিত কই! চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি উনি আমার মাথার কাছে জানলা আড়াল করে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা ছায়ায় ঢাকা, চোখ দুটো অন্ধকার কোটর। খসখস শব্দে হেসে বললেন, কী, নিজেকে চিনতে পারছেন না তো! এখানে যারা আসে তারা কেউই পারে না। আর যখন পারে তখন এখান থেকে তাদের ছুটি হয়ে যায়।

আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। ধাঁধার মতো সব জট পাকিয়ে গেল। এখানে কতদিন রয়েছি আমি? কতদিনই বা থাকতে হবে? বহুবার এ-কথা জিগ্যেস করেছি ডক্টর পালিতকে। উত্তরে পেয়েছি নিঃশব্দ হাসি।

দিন, আয়নাটা এবার দিন।—ডক্টর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা নিতে চাইলেন।

আমি এটা কাছে রাখতে চাই, ডক্টর।—অনুনয়ের সুর বেরিয়ে এল আমার ঠোঁট চিরে।

আবার সেই হাসি। তারপর বললেন, নিয়ম নেই যে। যদি আয়না ভেঙে অসাবধানে আপনার হাত-পা কেটে যায়! আমরা চাই না, আমাদের রুগিদের অযথা রক্তপাত হোক। জানেন তো, রক্তের এক-একটা ফোঁটার কত দাম!

আয়নাটা হাত থেকে নিয়ে নিলেন। আমাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে সুইচ টিপে ঘরের নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেলেন।

ঘরে আবার আমি একা। সন্ধে ঘন হয়ে গেছে। শরীর দুর্বল লাগছে। কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

ডক্টর পালিতের এই হাসপাতালটাই ভারী অদ্ভুত। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি, অথচ জনা-চারেকের বেশি রুগি আমার চোখে পড়েনি। আর ডাক্তারও ওই একজন—ডক্টর প্রিয়লাল পালিত। এ ছাড়া একজন নার্স আছেন—মিস তৃষ্ণা পান। মোট ছ'টি প্রাণী। অথচ প্রায় তিন বিঘে জমি জুড়ে বাগান, পুকুর, বাড়ি, আর পিছন দিকটায় ঘন জঙ্গল। জায়গাটা শহর থেকে কত দূরে কে জানে! শহরে কি মানসিক রোগের কোনও হাসপাতাল নেই যে, আমাদের মতো চারজন হতভাগ্যকে এখানে পাঠিয়েছে!

খাঁ-খাঁ হাসপাতালে মাঝে-মাঝে আমি ঘুরে বেড়াই। একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা চষে বেড়াই। কাউকে চোখে পড়ে না, কেউ বাধা দেয় না। কিন্তু আমি জানি, এদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোবার উপায় নেই।

এমনি করে হাঁটতে-হাঁটতেই অনেক দিন ডক্টর পালিতের দোতলার ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে গেছি। শিশি, বোতল, নানান কেমিক্যাল ও যন্ত্রপাতিতে ভরা প্রকাণ্ড ঘর। ওই ঘরে ঢুকলেই আমার মন চনমন করে ওঠে। তাকে সার-সার সাজানো বিষের শিশিগুলো দেখে নিশপিশ করে হাতের আঙুলগুলো। মড়ার খুলি আর কাটাচিহ্নের মতো আঁকা একজোড়া হাড়ের ছবি আমাকে চোখ ঠাউরে হাতছানি দিয়ে ডাকে : আয় রে আয়! আমার চোখে নেশা ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে। ওঃ, কতদিন! কতদিন যে ওসব জিনিসে হাত দিইনি! কিন্তু হাজার ইচ্ছে হলেও আমি ফাঁকা ঘরে ঢুকে তাকের দিকে হাত বাড়াইনি। কারণ, আমি জানি, ডক্টর পালিত অথবা মিস পান ঠিক আমার ওপরে নজর রাখছেন। একদিন আমাকে ওঁরা হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন। তবে কিছু বলেননি। ডক্টর পালিত আর মিস পান শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। অপমানে আমার গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল সেদিন।

নীল আলো কেমন যেন স্বপ্ন ডেকে আনে। ঘুম-ঘুম পায়। এখানে সবকিছুর রং সাদা। ঘরের দেওয়াল, জানলা, দরজা, বাগানের ফুল, এমনকী রুগিদের মুখগুলো পর্যন্ত ফ্যাকাসে সাদা। শুধু ডক্টর পালিত আর তৃষ্ণা পানের ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। ঘোর লাল। ঠিক লিপস্টিকের মতো।

এমনসময়ে মিস পান ঘরে খাবার নিয়ে ঢুকলেন। বিছানার পাশে টেবিলের ওপরে খাবার নামিয়ে রেখে বললেন, কেমন আছেন?

নরম গলায় বললাম, ভালো—।

আপনি ক'দিন ধরে ঠিকমতো খাচ্ছেন না। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন। নইলে সেরে উঠবেন কেমন করে?

আমি শুয়ে-শুয়েই আবছা আলোয় তৃষ্ণা পানকে দেখতে লাগলাম। শরীরে যৌবন মাথাচাড়া দিতে চায়। কিন্তু অন্ধকার চোখের দিকে চোখ পড়লেই শীত-শীত করে, লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

আপনাদের স্বাস্থ্য সবসময় তরতাজা থাকা দরকার—। তৃষ্ণা পান কথা বলতে-বলতে ঠোঁটের ওপরে জিভের ডগাটা বুলিয়ে নিলেন : অবশ্য এখন আপনার চেহারা খারাপ নেই।

হঠাৎই কোমল হাতটা বাড়িয়ে আমার বাহু স্পর্শ করলেন। আদরের চিমটি কাটলেন : সব রুগিদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে ভালো। আমাদের কথামতো চলেন, স্বাস্থ্যের যত্ন নেন।

আমি কী বলব ঠিক করে ওঠার আগেই মিস পান জুতো খটখটিয়ে চলে গেলেন। অতএব বিছানায় উঠে বসে টেবিলটা কাছে টেনে নিলাম। খুব খিদে পাচ্ছে। লক্ষ করে দেখেছি, ট্রিটমেন্ট রুম থেকে ফেরার পর থেকেই প্রচণ্ড খিদে পায়, অথচ খেতে ইচ্ছে করে না।

তিনদিন আগে ডক্টর প্রিয়লাল আমাকে ট্রিটমেন্ট রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরটা কাচের। সেখানে যে আমার কী ট্রিটমেন্ট হয়েছিল মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, যখন ফিরে এসেছি তখন শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, অবসাদ আর জড়তা। তারপর থেকেই আমার খাওয়া-দাওয়ার মাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন ডক্টর পালিত। ট্রিটমেন্ট রুম থেকে ফেরার পরে-পরেই বরাবর এই ব্যবস্থা করেন। ভালো করে খেয়ে-দেয়ে আমাকে আবার সুস্থ-সবল হতে হবে। ডাক্তারের আদেশ। অতএব খাওয়া শুরু করলাম।

হঠাৎই দরজায় একটা ছায়া নজরে পড়ল। চমকে মুখ তুলে তাকালাম। ছায়াটা ঘরে ঢুকে এল। চাপদাড়িওয়ালা অল্পবয়েসি ছেলে একটা। হাসপাতালে নতুন এসেছে। রোগাসোগা চেহারা। ছটফটে চোখ। মুখে কেমন একটা তেজ আছে। ও আর আমি ছাড়া যে-দুজন রুগি হাসপাতালে আছে, তারা বুড়ো। শুকিয়ে প্যাঁকাটির মতো হয়ে গেছে। ঘর ছেড়ে বেরোনোর ক্ষমতা নেই। স্রেফ বিছানায় শুয়ে-বসে থাকে। মিস পানকে ওদের কথা জিগ্যেস করলেই বলেন, ওঁদের আর কোনও রোগ নেই, ভালো হয়ে গেছেন।

তাহলে ওঁরা ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন না কেন?

কোথায় যাবেন? ওঁদের যে তিনকুলে আর কেউ নেই।—মিস পান সরু-সরু দাঁত দেখিয়ে হাসলেন : যাদের কেউ থাকে না, তারাই তো এখানে আসে। আমরাই তাদের সব।

আমি অধৈর্য হয়ে জানতে চেয়েছি, আমার অসুখ কবে সারবে?

সারবে। এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন? আর দু-চারজন মোটাসোটা রুগি আসুক, আপনাদের দুজনের অসুখ তখন তাড়াতাড়ি সারবে।

আমি জবাব শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। শুধু একবার মনে হয়েছিল, বুড়োদুটো বেঁচে আছে তো? ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে যখনই ওদের দেখেছি, মনে হয়েছে সাদা চাদরে ঢাকা রক্তহীন সাদা দুটো মানুষ।

পেটপুরে খাচ্ছেন দেখছি!—ঠাট্টার সুরে বলল দাড়িওয়ালা ছেলেটি। বিনা আমন্ত্রণেই বিছানার একধারে এসে বসল।

দেখা হলেই ছেলেটা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে। বলে, আপনি হলেন ওদের পোষা পাখি—জবাইয়ের মুরগির মতো। যত খেয়েদেয়ে মোটা হবেন, ততই ওদের ভালো।

আমি জবাব না দিয়ে একটা তরকারির বাটি ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, নিন, আমার এত খেতে ইচ্ছে করছে না।

ও যেন আঁতকে উঠল। তড়াক করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। তারপর বলল, মরে গেলেও আপনার হাত থেকে কোনও জিনিস খাচ্ছি না। এত জলদি আমার মরার সাধ নেই।

আমি অবাক হয়ে আর কিছু বলার আগেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বেশ আরাম লাগছে এখন।

পরদিন ডক্টর পালিত ও মিস পানের হাসির মানে খুঁজে পেলাম।

আমাকে ফাঁকা ল্যাবরেটরিতে বিষের শিশি ঘেরা জায়গায় দেখে কেন ওঁরা সেদিন অমন করে হেসেছিলেন, এখন বুঝতে পারছি। অপমানে তখন গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। এখন সে-জ্বালা শতগুণ হয়ে আমার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ভয় হচ্ছে, আমার এই ছটফটানি দেখে ওঁরা আমাকে আজই আবার ট্রিটমেন্ট রুমে না নিয়ে যান।

সকালবেলার দিকে হাসপাতালের ভেতরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একসময় হাজির হয়ে গেলাম ল্যাবরেটরিতে। যথারীতি সেখানে কেউ নেই। মনে কেমন একটা জেদ চেপে গেল। ঝট করে একটা বোতল টেনে নিলাম তাক থেকে। মারকিউরিক ক্লোরাইডের সলিউশন। বোতলের গায়ে মড়ার খুলি ও কাটাকুটি হাড়ের ছবি। বোতলটা গায়ের সাদা অ্যাপ্রনের আড়ালে লুকিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

তারপর ডক্টর পালিত ও মিস পান যেখান থেকে জল খান, সেই ওয়াটার ফিলটারের জলের মধ্যে বোতলের অর্ধেকটা ঢেলে দিয়েছি। বোতলটা লুকিয়ে ফেলেছি নিজের ঘরে। ব্যস, কাজ শেষ!

কিন্তু একটু পরেই মিস পান এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, একটু আসুন, একটা জিনিস দেখাব।

কী?—আমি হকচকিয়ে গেলাম। একটু ভয়ও পেলাম।

চলুন না, একটা মজা হবে।—নকল আহ্লাদে ওঁর গায়ের নরম ছোঁয়া ঘষে দিলেন আমার গায়ে।

সুতরাং ওঁর সঙ্গে গেলাম।

প্রিয়লাল পালিত ওয়াটার ফিলটারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখে হাসলেন : আসুন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তারপর ফিলটারের কল খুলে এক গেলাস জল ভরতি করলেন। এবং এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। কোনওরকমে বললাম, আমার জলতেষ্টা পায়নি।

মিস পান আমাকে অসম্ভব শক্তিতে পিছমোড়া করে চেপে ধরলেন। ওঃ, কী করে এত শক্তি এল এই তুলতুলে মেয়েটার শরীরে!

আর ডক্টর পালিত জলভরতি গেলাসটা আমার নাকের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন, দেখুন তো শুঁকে, মারকিউরিক ক্লোরাইডের গন্ধ পাওয়া যায় কি না!

বাধ্য হয়ে ঘ্রাণ নিলাম। হ্যাঁ, টের পাওয়া যাচ্ছে সহজেই। কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে সে-কথা জানালাম। তখন মিস পান আমাকে ছেড়ে দিলেন। ভয়ে আমার শরীর কাঁপছিল, ধরা পড়ে গেছি আমি। এখন ওঁরা কী করবেন আমাকে নিয়ে?

ডক্টর পালিত এক চুমুকে গেলাসের সবটুকু জল খেয়ে নিলেন।

বিষ! তীব্র বিষ! অথচ—।

আবার ফিলটারের কল খুলে গেলাস ভরতি করলেন। এবারে দিলেন মিস পানকে। উনিও গেলাস শেষ করলেন এক নিমেষে। দুজনেই হাসলেন আমাকে ব্যঙ্গ করে। তারপর আবার গেলাস ভরতি হল। আবার নিমেষে গেলাস শেষ। তারপর আবার। আবার!

এইভাবে আমাকে দেখিয়ে ওঁরা পালা করে ফিলটারের বিষাক্ত জল শেষ করার উৎসবে মেতে উঠলেন। সে কী হাসি ওঁদের! পেটে হাত চেপে, শরীর দুলিয়ে, আমার দিকে তাচ্ছিল্যের আঙুল তুলে সে কী হাসি! যেন নেশার ফোয়ারা ছুটছে।

দেখতে-দেখতে ফিলটারে জল শেষ! আশ্চর্য! যে-বিষে অন্তত পনেরোটা ধেড়ে মানুষের অক্কা পাওয়ার কথা, সেই বিষ হাসতে-হাসতে ওঁরা ছক্কা মেরে শেষ করলেন। অথচ এখনও ওঁরা অট্টহাসি হাসছেন। চোখের তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

আমি তাড়া-খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো দু-পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে ছুটে চলে এলাম নিজের ঘরে। বিছানায়। তারপর অসহ্য জ্বালায় শুধু ছটফট-ছটফট। এইজন্যেই ওঁদের ল্যাবরেটরিতে কোনও পাহারা নেই, কোনও ভয় নেই ওঁদের। এমনকী আমার কাছ থেকেও না।

সমস্ত ব্যাপারটা একটা জটিল ধাঁধার মতো ঠেকছিল, এমনসময় দাড়িওয়ালা ছেলেটা আমার ঘরে এল। ওকে এক গেলাস জল এগিয়ে দিলাম। ছেলেটা তীব্র ভাষায় আমার ওপরে মুখিয়ে উঠল। এক ধাক্কায় জলের গেলাস ছিটকে ফেলে দিল। আমার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। হাত বারবার মুঠো হয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকেই।

ছেলেটা বলল, কিছুই বোঝেন না, না? ন্যাকা! আপনি এখানে কী করে এসেছেন, তা জানেন? নাকি সবসময় ভুলে যাওয়ার ভান করেন! আপনার সব ফাইলপত্তর আমি দেখেছি। আপনি ইন্ডিয়া ড্রাগ কোম্পানির কেমিস্ট ছিলেন। তিন-তিনটে মানুষকে বিষ খাইয়ে খুন করেছেন আপনি! তারপর ধরা পড়েন। বহুদিন আপনাকে নানান মেন্টাল হসপিটালে রেখে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আপনার ওই এক রোগ! বিষ দেখলেই হাত নিশপিশ করে, যাকে হাতের কাছে পান, তাকেই একঢোক বিষ গিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, তাই না!

আমি বিছানায় পাথর হয়ে বসে রইলাম। ও যা বলছে সব সত্যি? নিশ্চয়ই সত্যি! নইলে সব কথাগুলোই আমার এত চেনা-জানা ঠেকছে কেন? শুধু আমার নিজের মুখটাই আমার কাছে অচেনা হয়ে গেছে। মনে

হচ্ছে, কেউ আমার মাথার ঢাকনা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো আচ্ছা করে নেড়েঘেঁটে দিয়ে আবার ঢাকনা বন্ধ করে দিয়েছে।

দাড়িওয়ালা ছেলেটা চলে গেল। আমার মাথার ভেতরে ওর কথাগুলোই বারবার বাজতে লাগল : তিন-তিনটে মানুষকে বিষ খাইয়ে খুন করেছেন আপনি! তিন-তিনটে মানুষকে...।

সন্ধেবেলা প্রিয়লাল পালিত আর মিস পান আমাকে দেখতে এলেন। ওঁদের মুখ-চোখ-ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক। সকালের ওই সাংঘাতিক ঘটনা যেন একেবারে ভুলে গেছেন। কিন্তু আমার অসহ্য জ্বালা যেন আবার শুরু হল।

বিভিন্ন প্রশ্ন করে ডক্টর পালিত আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখলেন। তারপর চোখ, জিভ পরীক্ষা করলেন, রক্তচাপ মাপলেন, পালস দেখলেন, গা-হাত-পাও দেখলেন টিপে-টিপে। তৃষ্ণা পান ঠায় দাঁড়িয়ে লোভী চোখে ডক্টরের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। পরীক্ষা-টরিক্ষা শেষ হয়ে গেলে আগ্রহ নিয়ে বললেন, কেমন দেখলেন, ডক্টর? কাল পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট রুমে নেওয়া যাবে?

যাবে।—গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন পালিত। তারপর দুজনেই চলে গেলেন।

আমার ভীষণ ভয় করছিল। আবার ওই ট্রিটমেন্ট রুম! ওখানে কী হয় জানি না। কেমন যেন এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে সেই সময়টুকু কেটে যায়। তারপর ঘরে বিছানায় যখন জ্ঞান ফেরে, তখন শুধু অবসাদ আর ক্লান্তি।

ডক্টর ও নার্স চলে যেতেই মারকিউরিক ক্লোরাইডের লুকোনো বোতলটা বের করলাম। কী করব এখন এই বিষ দিয়ে? দাড়িওয়ালা ছেলেটা খুব চালাক। আমার হাত থেকে কক্ষনও কিছু খায় না। আর বাকি ওই বুড়ো রুগি দুটো—ওদের বিষ দিলেই বা কী, আর না দিলেই বা কী! কী যে করি এই বোতলটা নিয়ে!

সাত-পাঁচ ভেবে শেষপর্যন্ত খোলা জানলার কাছে গেলাম। ছায়া-ছায়া অন্ধকার নেমে এসেছে বাইরের বাগানে, পেছনের ঘন জঙ্গলে। কোনও প্রাণীর একটানা গর্জন কানে এল। নেকড়ের চিৎকার। প্রায় রোজ রাতেই শোনা যায়। চোখ তুলে দেখি আকাশে আধখানা চাঁদ। চাঁদের আলো মাঝে-মাঝেই ঢেকে দিচ্ছে উড়ন্ত বাদুড় আর প্যাঁচার ডানা। লক্ষ করেছি, এই অঞ্চলে নিশাচর পাখিই বেশি চোখে পড়ে। কেন কে জানে!

আর অপেক্ষা না করে হাতের বোতলটা ছুড়ে দিলাম বাইরের অন্ধকার বাগানে। অনেকক্ষণ পরে শব্দটা ভেসে এল। কাচের বোতলটা ভেঙে চৌচির। যাক, আপদ গেছে! ওটা রেখেও তো কোনও লাভ ছিল না। যদি অবশ্য নিজেকেই না...।

আমার মাথার মধ্যে সবকিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। দুচোখ বুজলেই সার-সার শিশি-বোতলের স্বপ্ন দেখি। সব ক'টার ওপরেই মড়ার মাথার খুলি আঁকা। খুলির কালো চোখের কোটর দুটো ধকধক করে জ্বলছে। আমার হাতের আঙুলগুলো লাউডগা সাপের মতো হিলহিল করে আকুলিবিকুলি করে। বুকের ভেতরে দুপদাপ শব্দ হয়। সেই তিনজনের কথা মনে পড়ে—যাদের আমি বিষে নীল করে দিয়েছি। কিন্তু তিনের পর? চার নম্বরকে খুঁজে পেলাম কই! আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? ওই দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে যদি...।

কী ভেবে ঘর ছেড়ে বেরোলাম। দাড়িওয়ালা ছেলেটির ঘরে গিয়ে একবার দেখলে হয় কী করছে। অবশ্য এই সময়টাতে ও রোজ তাস খেলে। একা-একা। বলে, এখানে যতক্ষণ পারবেন জেগে থাকবেন। চোখের পাতা এক করলেই বিপদ। ওই ডাক্তার আর নার্সকে বিশ্বাস নেই—।

কিন্তু ওর ঘরে গিয়ে ভারি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ছেলেটা নির্জীবভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। দুচোখ মেলে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। এরকম ক্লান্ত অসহায় ওকে কখনও দেখিনি। আমি বিছানার খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম। ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল। প্রথমে ভয় পাওয়া চোখে আমার হাতের দিকে তাকাল। তারপর হাত খালি দেখে আশ্বস্ত হল। গলায় হাত বুলিয়ে বারকয়েক ঢোক গিলল।

আমি জিগ্যেস করলাম, এরকম অসময়ে শুয়ে আছেন যে?

ছেলেটা চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, আমাকে আজ ট্রিটমেন্ট রুমে নিয়ে গিয়েছিল।

এমনসময় বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে এল প্যাঁচার কান্না, শেয়ালের একটানা চিৎকার, নেকড়ের পালের ক্রুদ্ধ গর্জন।

তারপর?—আমি রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলাম।

ওই ডাক্তার আর নার্সটা মানুষ নয়! ওরা ভ্যাম্পায়ার। এই দেখুন—।

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই থুতনিটা সামান্য উঁচু করল ছেলেটি। হাত দিয়ে দাড়ি সরাল। ঘরে অল্প পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছিল। ওর গলার খুব কাছে চোখ নিয়ে দেখলাম এক ইঞ্চি তফাতে দুটো ছোট ক্ষতচিহ্ন—মাপে মসুর ডালের দানার মতো। জায়গাটা দু-আঙুলে টিপে ধরে রগড়াল ছেলেটা। সঙ্গে-সঙ্গে কালচে ঘন তরলের ফোঁটা দেখা গেল ক্ষতমুখে। ছেলেটা আঙুলের ডগায় সেই তরল মুছে নিল, আমাকে দেখাল।

দেখুন—রক্ত!

তারপর ফ্যাকাসে মুখে ক্লিষ্ট হেসে জানতে চাইল, আমার তো গলায়, আপনার কোথা থেকে রক্ত নিয়েছে?

অজান্তেই আমার হাত চলে গেল ঘাড়ে। জায়গাটা খুঁজে পেলাম। এখনও ব্যথা। আমি জানি ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ অথবা দাঁতের দাগজোড়া ওখানেই আছে। সত্যিই কি প্রিয়লাল পালিত আর তৃষ্ণা পান ভ্যাম্পায়ার? ছেলেটা কি ঠিক বলছে? অবশ্য হতেও পারে। এই জায়গাটা নির্জন। শুধুমাত্র সংসার থেকে জবাব-দেওয়া রুগিরাই এখানকার বাসিন্দা। খোঁজখবর করার কেউ নেই, সন্দেহ করার কেউ নেই। তার ওপর ডক্টর আর নার্সের অন্ধকার চোখ, ঝকঝকে দাঁত, ওই বিষাক্ত জলপানের ঘটনা...নাঃ, আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ছেলেটিকে সকালের ঘটনা জানালাম। বললাম, বিষে ওঁদের কিচ্ছু হবে না।

ছেলেটি অস্পষ্ট হেসে বলল, হলে তো আপনিই শায়েস্তা করতে পারতেন।

একটু থেমে আবার বলল, ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আমি অনেক বইপত্র ঘেঁটেছি। এরা দুজন যে-টাইপের, তাতে রুপোর বুলেট দিয়ে গুলি না করলে এরা শেষ হবে না। কিন্তু এখানে রুপোর বুলেট কোথায় পাবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটি। আবার চোখ ফেরাল সিলিংয়ের দিকে।

বুলেট, রিভলবার, কান-ফাটানো শব্দ, রক্তপাত—নাঃ! আমার শরীর অস্থির-অস্থির করতে লাগল। এগুলো আমার একদম ধাতে সয় না। আমার পছন্দ শিশি-বোতল, মড়ার খুলি, কাটাকুটি হাড়। কিন্তু সেভাবে কি শেষ করা যাবে ডক্টর আর নার্সকে? ছেলেটার কথামতো সত্যিই যদি ওঁরা ভ্যাম্পায়ার হন?

ছেলেটা হঠাৎই বিড়বিড় করে বলল, পোষা মুরগির মতো তিলে-তিলে এখানে মরতে হবে। বাঁচার কোনও পথ নেই....।

বাইরে থেকে আবার ভেসে এল নিশাচর প্রাণীগুলোর চিৎকার।

আমি পায়ে-পায়ে বাইরের করিডরে চলে এলাম। মনে-মনে দুশ্চিন্তার জট ছাড়াতে চেষ্টা করছি। খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রশ্নের উত্তর।

খাঁ-খাঁ করিডরে আমার পায়ের শব্দ অপার্থিব প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

দু-দিন পর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। শিশি-বোতল-মড়ার-খুলি-কাটাকুটি-হাড়। কিন্তু আমি ডক্টর পালিতের ল্যাবরেটরি থেকে বোতল সরাতে পারব না। ওঁরা ঠিক টের পাবেন এবং ওইরকম গা-জ্বালা-করা হাসি হেসে আমাকে অপদস্থ করবেন। আমার অসহ্য লাগে। সুতরাং দাড়িওয়ালা ছেলেটিকেই বলব বোতল সরানোর জন্যে।

দুপুরের দিকে ওর ঘরে গেলাম। সব খুলে বললাম। শুনে ও বিশ্বাস করতে চাইল না। আমি ওকে ভরসা দিলাম। বললাম, আপনার সাহায্য না পেলে এ-কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।

ছেলেটা রাজি হল। দুটো দিন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে ও অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ওকে বললাম, ঠিক সময় হলেই জানিয়ে দেব কখন কীভাবে কোন বোতলটা সরাতে হবে।

পরপর তিনদিন আমি গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলাম। যে করে হোক ওজন বাড়াতে হবে। দেখলাম, ওজন বাড়ছেও। নিয়মিত রাউন্ডে এসে ডক্টর পালিত ও তৃষ্ণা পান আমার গা টিপে-টিপে দেখেন। ওঁদের চোখ ধকধক করে। আমি শিউরে উঠি। বুঝি, সময় হয়ে এসেছে। আমাকে ট্রিটমেন্ট রুমে ওঁরা নিয়ে গেলেন বলে।

চতুর্থ দিন বিকেলে আমি খুব উত্তেজিত হওয়ার অভিনয় করলাম, অস্থির হয়ে হাত-পা ছুড়তে লাগলাম। ডক্টর পালিত সেটা লক্ষ করে মিস পানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, সময় হয়ে গেছে। কালই ওঁকে একবার ট্রিটমেন্ট রুমে নিয়ে যেতে হবে, কেমন?

মিস পান আমার ঘাড়ে কোমল হাত রাখলেন। ওঁর টুকটুকে জিভের ডগা দেখা গেল। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আর দেরি নয়, কালকেই—।

ওঁরা চলে যেতেই আমি দাড়িওয়ালা ছেলেটার ঘরে গেলাম। ও উত্তেজিত অবস্থায় আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওকে বললাম, চুপিসাড়ে ডক্টর পালিতের দোতলার ল্যাবরেটরিতে যেতে। তারপর কতকগুলো দরকারি জিনিস নিয়ে আসতে।

ঘন্টাখানেক পরেই ছেলেটি ফিরে এল। সাদা অ্যাপ্রনের আড়াল থেকে বের করে দিল দরকারি জিনিসগুলো। আমার মুখে হাসি ফুটল। ওকে শাবাশ জানিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তারপর সমস্ত নির্দেশ দিয়ে বললাম ঝটপট কাজ সারতে।

ছেলেটি আমার কথামতো কাজ শুরু করল।

আমার বুক শুকিয়ে আসছে, শরীরে আগুন জ্বলছে, চোখের সামনে লাল-নীল তারা নাচছে। শেষপর্যন্ত আমি সইতে পারব তো!

...কাজ শেষ করে ও আমার কাছে সরে এল। উদ্বেগের সুরে জানতে চাইল, আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলাম, আমি ঠিক আছি। আপনি ঘরে চলে যান। কালকেই সব জানতে পারবেন।

ও চলে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। একরকম জেদ ধরেই রাতের খাওয়া পেট ভরে খেলাম। তারপর যন্ত্রণা সহ্য করে শুধু অপেক্ষা। অপেক্ষা। দু-চোখে আমার ঘুম নেই। ঘুম...।

অসহ্য চিনচিনে যন্ত্রণার মধ্যে জ্ঞান ফিরল।

চোখ খুলেই এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেলাম।

ট্রিটমেন্ট রুমের ধবধবে বিছানায় আমি শুয়ে রয়েছি। একটু দূরেই টলমল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছেন ডক্টর প্রিয়লাল পালিত ও মিস পান। দুজনেরই কালো অন্ধকার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখ-ঠোঁট লিপস্টিকে মাখামাখি। নাকি রক্ত? দু-হাতে বুক খামচে ধরে হাঁ করে ওঁরা বাতাস নিতে চাইছেন। টুকটুকে জিভ বেরিয়ে এসেছে অস্বাভাবিক রকম। ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। দাঁতে কি লিপস্টিকের ছোপ?

টলতে-টলতে প্রথমে মুখ থুবড়ে পড়লেন ডক্টর পালিত। মিস পান ট্রিটমেন্ট রুম থেকে বেরোতে যাচ্ছিলেন, দরজার কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সামান্য মাথা তুলে আমি মিস পানের শক্ত হয়ে যাওয়া পা দুটো দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি ডক্টর পালিতের কুঁকড়ে যাওয়া বীভৎস দেহ। আমার ঘাড়ের কাছটা চটচট করছে, বালিশের অবস্থাও তাই। শরীরে অবসাদ, অথচ ভেতরে যেন মরুভূমির আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। এ জ্বালা কি আর নিভবে না?

যাক, তবু নিশ্চিন্ত! ভ্যাম্পায়ার দুটো শেষ!

গতকালের কথা মনে পড়ছে। দাড়িওয়ালা ছেলেটিকে যখন কাজের দায়িত্ব দিয়ে ডক্টর পালিতের ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম, তখন ও কীরকম যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

ওকে বলেছিলাম, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একটা স্যালাইনের বোতল আর নিডল নিয়ে আসবেন। এ ছাড়া ঘরের ডানদিকের প্রথম তাকে দেখবেন একটা ছোট বোতল আছে। তার গায়ে লেখা AgNO3 সলিউশন—সেই বোতলটা নিয়ে আসবেন। ব্যস, কাজ শেষ।

ছেলেটি হেসে বলেছিল, বোতলের গায়ে মড়ার খুলি আঁকা আছে তো?

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছি, না, না, ওটা বিষ নয়, বিষ নয়!

ছেলেটা কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কী যেন জিগ্যেস করতে চায় এমন ভাব।

আমি হেসে বললাম, কোনও চিন্তা নেই। ভুলে যাবেন না, আমি কেমিস্ট ছিলাম।

ছেলেটি চুপ করে রইল। তখন আমি ঘরে ফিরে এসে ওর জন্যে অপেক্ষা করেছি।

ও জিনিসগুলো হাতিয়ে ফিরে আসার পর, আমরা কাজ শুরু করি। ওকে বলেছি, স্যালাইনের বোতলটা বাথরুমে গিয়ে খালি করে নিয়ে আসুন।

কোনওরকম প্রশ্ন না করেই ছেলেটি আমার নির্দেশ পালন করেছে।

তারপর ছোট বোতলের তরলটা ঢেলে নিয়েছি স্যালাইনের খালি বোতলে। পাইপ আর নিডল ফিট করেছি। ছেলেটিকে বলেছি, স্যালাইনের বোতলটাকে উলটোভাবে উঁচু করে ধরে রাখতে। আর আমি নিডল গুঁজে দিয়েছি আমার বাঁ-হাতের কনুইয়ের খাঁজে। বোতলের তরল পাইপ বেয়ে নেমে এসে ঢুকে যেতে লাগল আমার শরীরে, মিশে যেতে লাগল আমার রক্তে। ছেলেটি বোকা-বোকা ভয়ার্ত চোখে আমাকে দেখছিল...।

...একসময় বোতল শেষ হল। নিডল বের করে তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে হাত ভাঁজ করে রইলাম। ছেলেটিকে বললাম, খালি বোতল, পাইপ, নিডল, সব জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে। শুধু আমার রক্তে ছাড়া আর কোথাও যেন আমাদের গোপন কাজের কোনও চিহ্ন না থাকে।

ওঃ, কী যন্ত্রণা যে সহ্য করেছি সারাটা রাত! ভ্যাম্পায়ার দুটোকে নিকেশ করতে পেরে মনে হচ্ছে যন্ত্রণা সহ্য করা আমার সার্থক হয়েছে।

রুপোর বুলেট আমি পাইনি। তবে ল্যাবরেটরি থেকে পেয়েছি AgNO3—আর্জেন্টাম নাইট্রেটের দ্রবণ। আর্জেন্টাম! ল্যাটিন ভাষায় ওটাই রুপোর নাম! সেই সিলভার নাইট্রেট, অর্থাৎ রুপোর পরমাণু ছুঁচ বিঁধিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি আমার রক্তে। রক্তে মিশে গেছে রুপো। রুপোর বুলেটের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং অমোঘ। সেই রুপোলি রক্ত চুষে খেয়ে ডক্টর প্রিয়লাল পালিত আর মিস পান...।

আমার শরীর ভীষণ দুর্বল লাগছে। ট্রিটমেন্ট রুম থেকে কি আর বেরোতে পারব কখনও? দাড়িওয়ালা ছেলেটাই বা কোথায়? আস্তে-আস্তে বাইরে অন্ধকার নামবে। শুরু হবে নিশাচর প্রাণীর আর্ত কান্না, হিংস্র গর্জন। এই নির্জন মৃত্যুপুরী থেকে নিরাপদে বাইরে বেরোতে পারব তো? বাইরে তিনজনকে শেষ করেছিলাম। তার কতদিন পরে এখানে দুজনকে বাগে পেলাম। মোট পাঁচজন! এখনও কত বাকি! অন্তত তেরোজনকে শেষ করতেই হবে! তেরো, আনলাকি থার্টিন! নইলে নরকে যে আমার ঠাঁই হবে না!

রাত বোধহয় বেড়েছে। কারণ, বাইরে শুরু হয়েছে নেকড়ের গর্জন। আর শরীরের ভেতরে প্রতিটি শিরায় ও ধমনিতে রুপোলি রক্তের পাগল করা ছুটোছুটি ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। বাইরের গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোটি-কোটি লোহিত কণিকা কেমন মাতালের মতো নাচছে ...নাচছে...নাচছে...আর চোখের সামনে লাল-নীল-হলুদ তারার মেলা...।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৪



রহস্য-গল্প

প্রতিযোগিতার জন্যে

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

মাননীয় সম্পাদকমশাই, খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপনটা দেখা অবধি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়েছি আমি : এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেব কি দেব না? একদিক থেকে দেখতে গেলে, এসব প্রতিযোগিতায় যোগ না দেওয়াই ভালো। যোগ দিলেই হার-জিতের প্রশ্ন আছে। জিততে, এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো—অর্থাৎ, পুরস্কার পাওয়া, খবরের কাগজে ছবি ছাপা হওয়া ইত্যাদি কার না ভালো লাগে এবং আমি যখন একজন মানুষ, তখন আমারও ভালো লাগবে। কিন্তু যদি না জিতি? ধরুন, আপনাদের রহস্য-গল্প প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম এবং ফলাফলের আশায় ধৈর্য ধরে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা কিনে গেলাম। তারপর যে-সংখ্যায় ফল বেরোল, তার প্রতিটি পাতা তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমার নাম পেলাম না, বরঞ্চ পেলাম রাম-শ্যাম-যদু, এই তিনজন পুরস্কার-প্রাপ্তের নাম। ধরুন, সেই যদু আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। তাহলে? তখন কি ইচ্ছে হবে না, স্টলের সবগুলো পত্রিকাই উনুনে দিতে? কিংবা সেই যদুকে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে 'আপনি তো বেশ, মশাই—আমারই মুখে গল্পটা শুনে, প্লটটা একটু এদিক-ওদিক করে দিব্যি পুরস্কার মেরে দিলেন!'

অবশ্য এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদুকে আমি কোনও গল্পই বলিনি।

আসলে যদু বলেই কেউ নেই আমার পাশের ফ্ল্যাটে। আর আমার ঝুলিতে যে-গল্পটা আছে, সেটা বার করলে আপনি পুরস্কার না দিয়ে যেতে পারেন না। রহস্য-গল্পের রহস্যটা বেশ জোরদার হলে তবেই না গল্পটা পুরস্কার পাবে! সহজেই সমাধান বাতলে দিতে পারলে, সেটা আর রহস্য থাকে না। গল্পগুলোকে তখন বড্ড পানসে মনে হয়। কিন্তু আমার ঝুলির গল্পটার পানসে হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ, সহজে কেন—আজ পর্যন্ত সে-রহস্যের কোনওই সমাধান হয়নি। বিশ্বাস না হয়, পুলিশ কমিশনারকে জিগ্যেস করে দেখুন।

আজকালকার খবরের কাগজ খুললেই এত খুনখারাপি, বোমাবাজি, গণহত্যা এসবের খবর থাকে যে, সত্যিকারের কোর্টকাছারির খবর খুব কমই নজরে পড়ে। তবুও যাঁরা একটু খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, গত এক বছরের মধ্যে কলকাতায় বেশ তিন-চারটে খুন হয়ে গেছে যেগুলোর হত্যাকারীকে আজও ধরা যায়নি। আপনারা হয়তো বলতে পারেন, এই সবগুলো খুনই যে একজন লোকের

কাজ, সেটা আমায় কে বলল। ঠিক কথা, এই তিন-চারটে খুনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র পুলিশ আবিষ্কার করতে পারেনি। এমনকী, এগুলো যে একজন লোকের কাজ, এমন সন্দেহও লালবাজারের ফাইলে কোথাও উল্লেখ করা নেই। আমাদের পাড়ায় একজন রিটায়ার্ড পুলিশ-ইনস্পেক্টর থাকেন। তাঁর বাড়িতে সন্ধেবেলা দাবার আসর বসে—সেই আসরে যাই আমি। সেই ভদ্রলোকই প্রথমে আমায় বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে, এগুলো সব একটা লোকের কীর্তি। দেখছেন, চার-চারটে খুনের সবগুলোতেই পুলিশকে কেমন বাঁদর-নাচ নাচানো হচ্ছে, যেন পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যেই একের-পর-এক খুন করে যাচ্ছে লোকটা!'

আপনারা যাঁরা রহস্য গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করেছেন যে, সব গল্প-উপন্যাসেই খুনি বেচারি যত ভেবেচিন্তেই খুনটা করুক না কেন, শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই পড়বে। রহস্য-সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া আমি সবসময়ই করি। আমার একমাত্র হবিই হচ্ছে ওটা। আমি তো এটা বিশেষভাবেই লক্ষ করেছি। আপনাদের কী হয় জানি না, আমার কিন্তু প্রায়ই মনে হত, এটা এক ধরনের সামাজিক অবিচার। অন্তত দু-একটা উদাহরণও কেন পাওয়া যাবে না যাতে খুনিরা জিতবে—পুলিশেরা নয়? অবশ্য ভুল বুঝবেন না, খুনিদের পক্ষ নিয়ে আমি কিছু বলছি না। তবে আমার কথা হচ্ছে, পুলিশেরা সবসময় খুনিদের চেয়ে বেশি চালাক হবে, এটা এক ধরনের একদেশদর্শিতা নয় কি?

আসলে অবিচার আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে সভা-সমিতি করা আমার ধাতে নেই—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'চলছে চলবে' করতে গেলে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। আমার মা বলতেন, ছোটবেলা থেকেই নাকি আমি মুখচোরা! দাদারা অবশ্য বলত, আমি মিটমিটে শয়তান—আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়াতে ভালোবাসি। আসলে আমি ওসব কিচ্ছু না, আমিও আপনাদের মতোই চাকরি করি। তফাত এই যে, আপনি হয়তো বিয়ে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার ফেঁদেছেন—আমার ওসব বালাই নেই। জনতা স্টোভে প্রেশার কুকার চাপিয়ে রান্না করে খাচ্ছি। দাদারা অবশ্য চুটিয়ে সংসার করছে। ওদের সঙ্গে ছিলামও কিছুদিন, কিন্তু বউদিদের দাপটে টিকতে পারিনি। আসলে দাদারা বেশ হোমরা-চোমরা হয়েছে জীবনে, আর আমি এক ব্যবসাদারের খাতা লেখার কাজ করছি, এটা বউদিদের প্রেস্টিজে লাগছিল। তা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, বেশ ঝাড়া হাত-পা হয়ে স্বাধীনভাবে আছি—কখন যাই, কখন আসি এসবের জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে এটাও ঠিক যে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি দাদারা গেলে যেমন সাজ-সাজ রব পড়ে যায়, যেমন খাতির-যত্ন পায় ওরা, আমি তার সিকির সিকিও পাই না। বরঞ্চ আমাকে দেখলেই সবার ভ্রূ কুঁচকে আসে, যেন আমি কোনও কিছু ধার করতে গেছি। বন্ধুরাও কথায়-কথায় আমাকে নস্যাৎ করে ফেলে, যেন, যেহেতু আমি একটা কেউকেটা নই, সেহেতু আমার কথার কোনও মূল্য নেই। হয়তো ওদের কাছে আমারই কোনও মূল্য নেই।

আসলে বন্ধুই আমার বিশেষ নেই। বড়বাজারে যে-ব্যবসাদারের খাতা লিখি, তার ম্যানেজার হচ্ছেন শান্তশীল দাস। ওই শান্তশীলবাবুর সঙ্গেই দু-চারটে সুখ-দুঃখের কথা হয় আমার—রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টরটির দাবার আসরের কথা বাদ দিলে। শান্তশীলবাবুও আমার মতো ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালোবাসেন। নানা রহস্য-বই নিয়ে আলোচনা করি আমরা। উনি ব্যাচেলার না হলেও সংসারের ঝামেলা নেই বেশি—দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এখন শুধু স্বামী-স্ত্রী। নামে ম্যানেজার হলেও ওঁর মাইনেটা এমন কিছু আহামরি নয়। তাই অবসর সময়টুকু লাইব্রেরির বই পড়েই কাটিয়ে দেন, সিনেমা-থিয়েটার বা অন্য কোনও নেশার পাট নেই—টিভিও কেনেননি। এই শান্তশীলবাবুই একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন যে, পুলিশেরা যে অত চট করে খুনিদের ধরে ফেলে, তার কারণ খুনের উদ্দেশ্য—রহস্য গল্পে যাকে মোটিভ বলা হয়, সেটা সবসময়ই বড্ড স্পষ্ট। মোটিভ না জানা গেলে খুনি ধরা পুলিশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হত।

তারপর থেকে আমার মনে হয়েছে, আচ্ছা, যদি এমন একটা খুন হয়, যার কোনও মোটিভ নেই—না, ভুল বললাম, যার একমাত্র মোটিভ হচ্ছে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া, তাহলে কেমন হয়? মনে হল, খুঁজলে কোর্টকাছারির বিবরণে এমন একটা খুনের দেখা নিশ্চয়ই পাব। কিন্তু না, তা পাইনি। তারপর আমি সেই

রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টরকে নিয়ে পড়েছিলাম, যদি ওঁর ঝুলিতে অমন কোনও খুনের গল্প থাকে। কিন্তু উনি বলেছিলেন, 'তা কী করে হয়, মশাই! কোনও মোটিভ না থাকলে শুধু-শুধু একটা লোক খুন করতে যাবে কেন, নেহাত পাগল-ছাগল না হলে?'

আশ্চর্য, পুলিশকে ধোঁকা দেওয়াটাকে উনি একটা মোটিভের মধ্যেই গণ্য করেন না। অর্থাৎ, উনিও সেই দলে, যারা চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছে যে, খুনির কাজ হচ্ছে খুন করা, আর পুলিশের কাজ তাকে ধরা—এবং পুলিশ তাকে ধরবেই ধরবে। এই ধরনের একগুঁয়ে ধারণা দেখলে, আমার বড্ড রাগ হয়। ইচ্ছে হয়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই মোটিভবিহীন খুন করা যায় কি না এবং এ ধরনের খুনের কথা যারা বলে তারা সবাই পাগল-ছাগল নয়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মোটিভবিহীন খুনের মতো শক্ত কাজ আর কিছু নেই। প্রথমত, এমন একজনকে ঠিক করতে হবে, যার সঙ্গে তোমার কোনও পরিচয় নেই, কোনও যোগসূত্র নেই, যার মৃত্যুতে তুমি বিন্দুমাত্র লাভবান হবে না। এমন একজনকে খুঁজে পেতে আমার খুব বেগ পেতে হয়েছিল। আর তেমন লোককে খালি খুঁজে পেলেই তো হবে না, খুনের সুযোগটিও তো করে নিতে হবে। অনেকদিন অপেক্ষার পর আমি তেমন লোক আর সুযোগ পেয়েছিলাম। ভোরে লেকে বেড়াতে আসতেন বেচারি বুড়ো ভদ্রলোক—সুইমিং ক্লাবের ওদিকটায় একটা বেঞ্চিতে বসে কী একটা বই পড়তেন। ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি, ক্যানভাসের জুতো আর রোগা-রোগা হাত-পা দেখে বেশ বোঝা গেল, ভদ্রলোক স্বচ্ছলতার মধ্যে নেই। একটু বেলায় ওঁর এক বন্ধু আসতেন। তখন দুই বন্ধুতে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করতেন। একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে কান-খাড়া করে সেসব শুনতাম আমি। ভদ্রলোক সরকারি চাকরি করতেন না—পেনশন নেই—তাই ছেলেদের সংসারে সমাদর নেই—ছেলের বউয়েরা ভ্রূকুটি করেই আছে। সামান্য আফিমের নেশা আছে, কিন্তু দুধের ছিটে-ফোঁটা পাওয়ার জো নেই। ভদ্রলোক প্রায় বলতেন, 'যমেও দ্যাখে না আমায়—।' এক-একবার ইচ্ছে হত উঠে গিয়ে বলি, 'এবার আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে—।'

কিন্তু মজা এই যে, সে-কথা শুনলে ভদ্রলোক হয়তো আঁকুপাঁকু করে বলে উঠতেন, 'ওটা কথার কথা।' ছেলেবেলায় একটা গান শুনেছিলাম, 'আমার কিন্তু মোটেই মরতে ইচ্ছে নেইকো ভাই—।' ওই বুড়ো ভদ্রলোকের মনোভাবও ঠিক তাই হত সন্দেহ নেই।

কাজেই একদিন ভোরে লেকে বেড়াতে এসে যখন ভদ্রলোকের ইচ্ছেটা হঠাৎ পূর্ণ হয়ে গেল, তখন বেচারি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। খবরের কাগজে খুনের যে-বিবরণ বেরিয়েছে, সেটা পড়েছেন কি না জানি না। যদি পড়ে থাকেন তো জানবেন, ভদ্রলোকের পকেটে আধছেঁড়া মানিব্যাগের খুচরা পয়সাগুলো যেমনকার তেমনি ছিল, একটু এদিক-ওদিক হয়নি। খুনের অস্ত্র—ধারালো ছোরাখানা—কাছেই পড়ে ছিল, কিন্তু তার বাঁটখানা রুমালে মুছে পরিষ্কার করা। কোনও আঙুলের ছাপ নেই তাতে। আর ছোরাখানাও এমন সাধারণ যে, সব দোকানেই অমন ডজনখানেক ছোরা পাওয়া যাবে। কোন দোকানি কাকে অমন ছোরা বিক্রি করল, সেটা বার করা প্রায় অসাধ্য।

অর্থাৎ, অকুস্থলে যেসব সূত্র পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি থেকে খুনিকে বার করা অসম্ভব। পুলিশ সবচেয়ে ধাক্কা খেয়েছিল মোটিভের বেলায়। কেন ভদ্রলোক খুন হলেন? ওঁকে খুন করায় কার স্বার্থসিদ্ধি হল? এসব প্রশ্নের উত্তর পুলিশ খুঁজে পেল না। বুড়োর ছেলে-বউয়েরা ওকে বোঝা মনে করত হয়তো, কিন্তু বোঝা নামাবার জন্যে ওরা অদ্দূর যাবে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। তা ছাড়া সাক্ষীদের জিগ্যেস করে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, খুনের সময়টায় বুড়োর ছেলে-বউয়েরা সবাই বাড়িতেই ছিল। শেষপর্যন্ত খুনটার কোনওই হদিশ করতে পারল না পুলিশ। অবশ্য আপনারাও নিশ্চয় এতক্ষণে সেটা বুঝতে পেরেছেন। সেই রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টরকে এই খুনটার উদাহরণ দেওয়াতে উনি আমায় এককথায় নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, 'আরে, মোটিভ ছাড়া খুন হবে কেন? আর পুলিশ আজ খুনি ধরতে পারল না বলে কোনওদিন পারবে না, এমন কোনও কথা আছে নাকি! দেখবেন, পুলিশ ঠিক খুনিকে ধরে ফেলবে।'

মাসখানেকের মধ্যেও যখন খুনি ধরা পড়ল না, তখন আমি কথাটা আবার মিস্টার চন্দের (সেই রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টরের) কাছে তুলেছিলাম। উনি কিন্তু কথাটা শেষ করতেই দিলেন না আমাকে : 'আরে রাখুন, মশাই। এতবড় শহরে কোথায় একটা খুন হয়েছে, তার খুনি একমাস পর ধরা পড়ল—এটা একটা খবর হল নাকি যে, কাগজে বেরোবে?'

'কিন্তু এটাও তো হতে পারে যে, খুনি ধরা পড়েনি?'

'কী করে জানলেন আপনি? লালবাজারে খোঁজ করেছেন কি?' নাকে একটিপ নস্যি গুঁজে মিস্টার চন্দ দাবার বোর্ডটা নামিয়ে বললেন, 'ছাড়ুন ওসব আজেবাজে চিন্তা। আসুন, একহাত খেলে নিই—।'

মিস্টার চন্দকে অবশ্য বলতে পারতাম যে, খুনি যে ধরা পড়েনি, এটা আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কিন্তু চুপ করে গেলাম, কেননা, আমার মতো সাধারণ লোকের মতামতকে কেয়ার করবার লোক মিস্টার চন্দ নন। মনে হল, আরও দু-একটা উদাহরণ না দেখলে সত্যকে স্বীকার করবেন না উনি।

এর পরের খুনটা হয়েছিল—না, দক্ষিণে নয়—উত্তর কলকাতায়। কলেজ স্ট্রিট, হ্যারিসন রোডের মোড়টা দেখেছেন তো? ওইখানেই ছোট্ট একটা বইয়ের দোকান আছে। স্কুলের বই, আর কিছু বটতলা মার্কা গল্প-উপন্যাস। এ ছাড়া ছিল খাতা, পেনসিল, রবার—আজকালকার বাচ্চারা যাকে ইরেজার বলে থাকে। দোকানে থাকত বেশ বুড়ো একজন লোক। আশপাশের দোকানে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম, দোকানটা ওর ভাগ্নের। দু-চারদিন সেই দোকানে এসে কিছু খাতা-পেনসিল ও গোটা দুই উপন্যাস কিনেছিলাম। লক্ষ করেছিলাম যে, বুড়োর সাহায্যকারী কেউ নেই। বুড়োর শরীরটাও ভালো মনে হচ্ছিল না। যখনই দেখেছি, খকখক করে কাশছে। তা ছাড়া মুখখানাও ছিল আমসি। দেখেই বোঝা যেত অম্বলের ব্যারামও আছে।

এহেন বুড়ো যে বেঁচে থেকে কারও কোনই উপকারে আসছিল না, এটা বলাই বাহুল্য। অবশ্য বলতে পারেন যে, বেঁচে থেকে ও নিজের উপকারে তো আসছিল! যদিও কবি বলে গেছেন, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' আসলে প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে বই তো নয়! সেদিক থেকে দেখতে গেলে বুড়োর মৃত্যুটা ওর নিজের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি নিশ্চয়ই। আবার দেখুন, কবি তো এ-ও বলে গেছেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে—অমর কে কোথা কবে?' মরতে তো বুড়োটাকে হতই। আজ নয় তো কাল। সেই মরতেই যখন হবে, তখন দু-দিন আগে মরে গিয়ে যদি একটা সামাজিক অবিচারের মুখোশ খুলে দিতে পারা যায়, তাহলে ক্ষতি কী? আপশোস এই যে, বুড়োটা জেনে গেল না যে, ও আসলে মারা গেল না—শহিদ হল। ভবিষ্যতে ইতিহাসে ওর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অবশ্য এই বুড়োর মৃত্যুটাকে স্রেফ ভবিতব্যও বলতে পারেন—নয়তো সেদিনই লোডশেডিংয়ে সারা পাড়াটা অন্ধকার হয়ে থাকবে কেন, আর ঘণ্টাখানেক পর আশেপাশের দোকানগুলোই বা ঝাঁপ ফেলে দেবে কেন? অথচ বুড়োটাই বা একপাশের দরজাটা বন্ধ করেও খদ্দেরের আশায় অন্য দরজাটা খুলে মোম জ্বালিয়ে অপেক্ষা করবে কেন? আর খদ্দেররূপী শমন এলে বই দেখাবার জন্যে তাকে নিয়েই বা বন্ধ দরজাটার ওদিকে ঢুকবে কেন?

আসলে যার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। আপনি-আমি কেউ তাকে ঠেকাতে পারব না। সে যাক—আশা করেছিলাম এই খুনটার বিস্তারিত বিবরণ কাগজে বেরোবে, তাহলে মিস্টার চন্দের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু খবরের কাগজে ব্যাপারটা খুব সংক্ষিপ্ত আকারেই বেরোল। সেদিন সন্ধেবেলা যখন মিস্টার চন্দের ওখানে গেলাম, তখন আশা করেছিলাম, উনিই খুনের প্রসঙ্গটা তুলবেন। কিন্তু উনি খেলাতেই মত্ত রইলেন, খুনের প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেলেন না। অগত্যা কিছুক্ষণ উসখুস করে আমাকেই বলতে হল, 'আজকের খবরের কাগজটা দেখেছেন?'

'হুঁ!'

'কলেজ স্ট্রিটের কাছে আর-একজন খুন হয়েছে। ভেরি স্যাড। আচ্ছা, মোটিভটা কী বলে আপনার মনে হয়?'

মিস্টার চন্দ ভুরু কুঁচকে দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'খুনটা যখন আমি করিনি, বা খুনি ধরার দায়িত্বটাও যখন আমার নয়, তখন মোটিভ নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন?'

'না, এই একটু আলোচনা করা যেত আর কী—।'

'লাভ কী? আর আপনার এসব ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?'

মিস্টার চন্দ কি পুলিশি জেরা শুরু করবেন নাকি? বললাম, 'লাভালাভের প্রশ্ন তুলছেন কেন? নেহাত সময় কাটানোর জন্যেই জিগ্যেস করা। ধরুন, এই খুনিটাও যদি ধরা না পড়ে—।'

'পড়বে—পড়বে—' নিশ্চিন্ত সুরে বললেন মিস্টার চন্দ, 'খুনিরা কখনও ধরা না পড়ে যায়!'

অর্থাৎ, উনি তখনও 'পুলিশেরা জিতবেই', এই মনোভাব ছাড়তে রাজি নন।

এরপর ওই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে শান্তশীলবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, গল্পের খুনখারাপিতে ওঁর যতই ইন্টারেস্ট থাকুক, বাস্তবের খুনখারাপিতে একদম নেই।

'সত্যিকারের খুন-টুনগুলোতে একদম রহস্য নেই, বুঝলেন?' বলেন উনি।

ভেবেছিলাম দু-দুটো কিনারা-না-হওয়া খুনের মামলা নিয়ে পুলিশ বেশ নাজেহাল হবে...খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তে পুলিশ বিভাগের অকর্মণ্যতার বিষয় নিয়ে জোরদার লেখা বেরোবে...ট্রামে-বাসে আলোচনা হবে খুনগুলো নিয়ে। আর সেইসব আলোচনা শুনে সবার অলক্ষ্যেই আমার বুকটা ফুলে উঠবে—কারণ, নিজের কৃতিত্বের কথা শুনতে কার না ভালো লাগে!

কিন্তু আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, ট্রাম-বাসে আলোচনা তো দূরের কথা, খবরের কাগজেও খুনদুটো নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য হল না। এই যে দু-দুটো মানুষ মারা গেল, হোক বুড়ো তাতে কী, এতে কারওরই যেন কিছু যায়-আসে না। অর্থাৎ, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকলেও মানুষের দাম অনেক সস্তা হয়ে গেছে। দু-একজন এদিক-ওদিক হলে কারওরই মাথা-ব্যথা নেই।

কিন্তু সামাজিক অবিচার বন্ধ করার জন্যে শহিদ হওয়া তো নিরর্থক হবে—যদি আত্মত্যাগটা লোকের নজরেই না পড়ে। আর সেই নজরে পড়ার আশায়ই যদি আরও দুটো খুন হয়ে যায়, তাহলে কি আপনি খুনিকে খুব একটা দোষ দিতে পারেন? লেকের ধার আর কলেজ স্ট্রিটের পর যদি খিদিরপুর ব্রিজের পাশে বসে ভিক্ষে করা এক-পা কাটা বুড়ো ভিখিরিটা খুন হয়, আর এ-ক্ষেত্রেও যদি বাঁটটা পরিষ্কার করে মোছা ধারালো ছোরাখানা পাশে পাওয়া যায়, অথচ পুলিশ খুনের মোটিভ বার করতে হিমশিম খেয়ে যায়, তবে কি খুব অবাক হবেন? এবং তারপর যদি খোদ ভবানীপুরের এক এঁদো গলিতে এক শীতের রাতে রিকশায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা এক রিকশাওলা খুন হয়ে যায়, তাহলেও কি আপনার মনে হবে না, এ ছাড়া কী-ই বা করতে পারত বেচারি খুনি?

যদিও খবরের কাগজে এবারও কোনও হইচই হয় না খুনগুলি নিয়ে, তবু এবার যেন মিস্টার চন্দের টনক নড়ে। তখনই উনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, এগুলো একটা লোকেরই কীর্তি। দেখছেন, চার-চারটে খুনের সবগুলোতেই পুলিশকে কেমন বাঁদর-নাচ নাচানো হচ্ছে! যেন পুলিশকে বোকা বানাবার জন্যেই একের পর এক খুন করে যাচ্ছে লোকটা।'

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলি, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম সে-কথা...আপনি তো আমার কথাকে পাত্তাই দিতে চাইলেন না। মনে আছে, সেই প্রথম খুনটার বেলায়ই—।'

'বলেছিলেন নাকি?' মিঃ চন্দ একটু ভালো করে আমার দিকে তাকালেন এবার : 'আপনার দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে। অবশ্য মোটিভটা যে কী এখনও তা ঠিক বুঝতে

পারছি না—।'

'সেকি, এক্ষুনিই তো বললেন যে, পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই—।'

'আরে, সেটা তো একটা কথার কথা। শুধু পুলিশকে বোকা বানাবার জন্যে খুন করে নাকি কেউ, নেহাত পাগল-ছাগল না হলে?'

আমার রাগ চড়ে গেল। যেন মিস্টার চন্দের সঙ্গে যাদের মত মিলবে না, তারা সবাই পাগল-ছাগল। বললাম, 'বেশ তো, আপনিই বার করুন না মোটিভটা—।'

দাবার ছকটা পেড়ে টেবিলে রাখলেন মিস্টার চন্দ। তারপর বললেন, 'আমার কী দায় পড়েছে—।'

কিন্তু আমার জেদ চেপে গিয়েছিল। বললাম, 'কথাটা যখন উঠেছে, তখন ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভালো। এই যে চার-চারজন লোক খুন হল, এদের কি এমন কোনও শত্রু আছে যে এদের খুন করতে চাইবে?'

'খবরের কাগজে যা পড়েছি আর সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়, তাতে নিশ্চয়ই বলব, না—।'

'তাহলেই দেখুন, ব্যক্তিগত শত্রুতার মোটিভটা খাটছে না। তা ছাড়া চারটে খুনই যদি একজন লোকই করে থাকে, তাহলে তার চার-চারজন পরম শত্রু কলকাতার চার কোণে ছড়ানো থাকবে—এটাও কি বিশ্বাস করতে বলেন?'

'নিশ্চয়ই না—।'

'তাহলে বাকি থাকল টাকা-পয়সার ব্যাপারটা। লেকের ধারের সেই বুড়োর টাকা-পয়সা খোওয়া যায়নি—কলেজ স্ট্রিটের দোকানের ক্যাশও একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। ভিখিরিটার কাছে তো বোধহয় ছিলই মাত্র কয়েকটা পয়সা। আর রিকশাওলাটার কোমরে বাঁধা পুঁটুলিটায় যে ন'টাকা পঞ্চাশ পয়সা ছিল, তাও তো খোয়া যায়নি। যদি বলেন যে, খুনির হয়তো ইচ্ছে ছিল ন'টাকা পঞ্চাশ পয়সা নিয়েই যাবে, কিন্তু হয়তো কোনও বাধা পড়ায় ওটা না নিয়েই পালিয়েছে, তাহলে বলব যে, ন'টাকা পঞ্চাশ পয়সার জন্যে কি কেউ—?'

হঠাৎ লক্ষ করলাম, মিস্টার চন্দ আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ন'টাকা পঞ্চাশ পয়সার কথা আপনি জানলেন কী করে? ওটা তো কাগজে ওঠেনি?'

এতক্ষণে হুঁশ হল, বলতে-বলতে অনেক কিছুই বলে ফেলেছি। এবার মুখে কুলুপ আঁটতে হবে। আমতা-আমতা করে বললাম, 'না, ঠিক জানি না, শুনেছিলাম কার কাছে যেন। অবশ্য ওটা স্রেফ অনুমানও হতে পারে।'

'না, ওটা অনুমান নয়—' বললেন মিস্টার চন্দ, 'রিকশাওলাটার কাছে ন' টাকা পঞ্চাশ পয়সাই ছিল। আর ছিলও গামছার পুঁটুলিতে কোমরে বাঁধা। ভবানীপুর থানার ও. সি.-র সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিল। ওঁর কাছেই শুনেছি। উনি তো বলেছিলেন কথাটা গোপন আছে। আপনি যে কী করে জানলেন—।'

একটা চেষ্টাকৃত হাই তুলে বললাম, 'যাকগে ওসব কথা। আসুন, খেলা শুরু করা যাক—।'

কিন্তু সেদিন খেলাটা ঠিক জমল না। মিস্টার চন্দ বারেবারেই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। চলে আসব, এমন সময় উনি জিগ্যেস করলেন, 'গত সোমবার আপনি আমার এখানে এসেছিলেন, না?'

একটা বিপদসূচক ঘণ্টা শুনতে পেলাম যেন মাথার মধ্যে। গত সোমবারই ভবানীপুরের রিকশাওলাটা খুন হয়েছিল। ভাবলাম বলি, 'এসেছিলামই তো। বসে দু-দুটো গেম খেললাম, মনে নেই?'—তারপর ভাবলাম, অতটা করার দরকার নেই। কে জানে, সেদিন মিস্টার চন্দের ওখানে অন্য কেউ এসেছিল কি না, যে বলতে পারবে, 'কই, আপনি তো আসেননি সেদিন!'

তবে মিস্টার চন্দের প্রশ্নে ঘাবড়াবারও কিছু নেই। গলাটা যদ্দূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, 'না, সেদিন আসিনি তো! শান্তশীলবাবুর ওখানে গিয়েছিলাম বোধহয়। নাকি দাদাদের ওখানে? ঠিক মনে পড়ছে না।'

এরপর কয়েক দিন মিস্টার চন্দের ওখানে গেলাম না। ওঁর ভেতরের যে-পুলিশি সত্তাটা জেগে উঠছিল সেটাকে ঘুমোতে দেওয়া দরকার। তবে সন্ধেবেলা একা বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগছিল না। তাই একদিন গেলাম শান্তশীলবাবুর ওখানে। শুনলাম, এর মধ্যে মিস্টার চন্দ এসেছিলেন ওখানে। সেই সোমবার আমি শান্তশীলবাবুর কাছে গিয়েছিলাম কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' শান্তশীলবাবু জিগ্যেস করলেন।

'কী করে জানব বলুন, কার মনে কী আছে। তা আপনি কী বললেন?'

'কী আর বলব! আপনি তো সেদিন আসেননি এখানে। সে-কথাটাই বলেছি। কেন, এ-কথা বলে অন্যায় করেছি নাকি?'

'না, না, অন্যায় করবেন কেন? সত্যি কথা বলায় দোষটা কী!'

খানিকটা ইতস্তত করে এর পরদিন দাদাদের ওখানে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। মিস্টার চন্দ সেখানেও খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। বড়দা বিরক্ত মুখে বললেন, 'পুলিশ অফিসার-টফিসার তোমার খোঁজে আসে কেন? অফিসে কোনও গন্ডগোল করেছ নাকি?'

মনে হল, বড়দার ধারণা আমি হয়তো অফিসের ক্যাশ ভেঙেছি। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'মিস্টার চন্দ তো রিটায়ার করেছেন। আর এটা একটা প্রাইভেট ব্যাপার। একটা বাজি ধরেছিলাম—সেই সূত্রেই এসেছিলেন উনি।'

বড়দা সন্তুষ্ট হলেন কি না বুঝতে পারলাম না, তবে আমার চিন্তাটা যে বাড়ল, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ মিস্টার চন্দ সন্তুষ্ট হয়েছেন কি না জানতে হবে। তাই এর পরদিন ফের গেলাম ওঁর ওখানে। উনি মুখে কিছু বললেন না। যথারীতি দাবার বোর্ডটা নামালেন এবং বাড়ির ভেতর থেকে যথারীতি দু-পেয়ালা চা-ও এল। তবু খেলার চালের ফাঁকে-ফাঁকে উনি কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালেন বারকয়েক। তারপর বললেন, 'শান্তশীলবাবু আর আপনার দাদার কাছে গিয়েছিলাম। যে সোমবার রিকশাওলাটা খুন হয়, সেদিন আপনি দু-জায়গার কোথাও যাননি।'

একটা হাই তোলার চেষ্টা করে বললাম, 'বলেইছি তো, ঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে থাকব।'

মিস্টার চন্দ আর কিছু বললেন না। কিন্তু খেলার শেষে বাড়ি আসব, তখন হঠাৎ বলে বসলেন, 'কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের খুনটা ঠিক কবে হয়েছিল, মনে আছে আপনার?'

'জানিই না তারিখটা। মনে রাখার প্রশ্ন ওঠে কী করে—।'

'থানার ও. সি.-র কাছে গেলে অবশ্য জানা যাবে—।'

ওঁকে আর বেশি কিছু বলার অবসর না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম, মিস্টার চন্দ অতি সহজেই তারিখটা জেনে ফেলবেন এবং তারপরই জেরা শুরু করবেন, 'অমুক তারিখে এতটার সময় আপনি আমার এখানে এসেছিলেন কি? আসেননি? তবে কোথায় গিয়েছিলেন?'

মনে হল, পুলিশ অফিসারদের পুলিশি সত্তা রিটায়ার করলেও মরে না, বরঞ্চ সুযোগ পেলেই মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। মিস্টার চন্দেরও তাই হয়েছে। যে-খুনের কিনারা করতে রেগুলার পুলিশি ডিপার্টমেন্ট হিমশিম খাচ্ছে, সেই খুনের রহস্য ভেদ করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারা রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারের পক্ষে খুব সহজ নয়।

একটা অস্বস্তি নিয়ে শুতে গেলাম সে-রাত্রে। আর হয়তো সেজন্যেই মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলাম একটা। যেন একটা মাকড়সার জালে আটকে পড়েছি আমি—বেরোবার চেষ্টা যতই করছি, ততই আরও আটকে যাচ্ছি। জালের একধারে মাকড়সাটা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। আস্তে-আস্তে মাকড়সার মুখটা যেন মিস্টার চন্দের মতো হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেলে বুঝলাম, ওটা স্বপ্ন—সত্যি নয়—তবু অস্বস্তিটা গেল না। চোখ বুজলেই মাকড়সারূপী মিস্টার চন্দের মুখটা আমায় তাড়া করে বেড়াতে লাগল।

ভোর হয়ে গেলে দিনের আলো দেখে মনের আত্মবিশ্বাস অনেকটা ফিরে পেলাম। যেখানে রেগুলার পুলিশই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, সেখানে মিস্টার চন্দ আর কতটুকু করতে পারেন! আর যাই করুন না কেন, প্রমাণই বা কোথায়? তবু সাবধানের মার নেই। মনে হল, কিছুদিনের জন্যে এখানকার পাততাড়ি গোটানোই ভালো। অবশ্য আমার পাততাড়ি গোটাতে তো আর খুব একটা ঝামেলা নেই! বাক্সখানা গুছিয়ে নিয়ে ঘরে একটা তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। যেখানে চাকরি করি, সেখানে একটা খবর দিতে হবে

অবশ্যই। বললেই হবে, স্বপ্নে হঠাৎ প্রত্যাদেশ পেয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছি। তারপর কে কার পাত্তা রাখে।

কিন্তু তা যদি করি, তাহলে তো আমার এতদিনের পরিশ্রম মাঠে মারা যায়। খুনিদের প্রতি সামাজিক অবিচারেরও কোনও প্রতিকার হয় না। কী করি ভাবছিলাম, এমনসময়েই কাগজে আপনাদের রহস্য-গল্প প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। তাই ভাবছি, এই রহস্য গল্পটা যদি আপনাদের প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠিয়ে দিই, তাহলে এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়ে যায়। খুনিদের প্রতি সামাজিক অবিচারের কথাটাও সবাই জানতে পারে, অথচ আমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকি। মিস্টার চন্দ হাজারটা প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে পারি, 'কী যে বলেন মশাই, গল্প আবার কখনও সত্যি হয় নাকি!'

তাই ভাবছি, প্লটটা একটু এদিক-ওদিক করে, পাত্রপাত্রীদের নাম-ধাম বদলে পাঠিয়ে দেব আপনাদের অফিসে। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ব তীর্থভ্রমণে। গল্পটাকে আপনারা পুরস্কার দেবেন কি না, সেটা তখন আপনারাই বিবেচনা করবেন।

মাসিক রোমাঞ্চ
জানুয়ারি, ১৯৮৫



গন্ডারের খড়্গ

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

রাজা সুমিত্রের জলসাঘরে আজ যেন নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। শুঙ্গ রাজাদের এখন বাড়-বাড়ন্ত। রাজা পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্যকে অনেক বিস্তৃত করেছেন তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্র সেই সাম্রাজ্যকে একটা বিশাল রূপ দিয়েছেন।

রাজা অগ্নিমিত্রের পুরুষবিদ্বেষ সর্বজন-বিদিত। গুপ্তঘাতকের ভয়েই হোক বা স্বেচ্ছায়ই হোক—তিনি নারী-সাজে সজ্জিত থাকতেন। রাজ-অন্তঃপুরের সর্বত্র রমণীদের দাপট ছিল অব্যাহত।

ছেলেবেলা থেকে সুমিত্র দেখছেন রাজপুরী জুড়ে চলেছে ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার বেসাতি। রমণী এখানে পণ্যদ্রব্যের সামগ্রী। রাজা সুমিত্রের রানির অভাব নেই। বিদর্ভ, বিদিশা, কাশী, কোশল, কাঞ্চী—সর্বত্রই একটা করে বিবাহ করেছেন রাজা। তবু তাঁর নারীদেহের ক্ষুধা মেটেনি, ভোগ-বিলাসের শেষ হয়নি। নাচ-গান রাজার খুব প্রিয়। জলসাঘরে নিত্য নতুন নর্তকী না এলে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে যান।

এদিকে রাজ্যের আশে-পাশে শত্রু আস্তানা পেতে বসে আছে। এরই মধ্যে যবনেরা দু-একবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছে। বৌদ্ধরা যবনদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

রাজ্যে যেটুকু শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় আছে তা মন্ত্রী বাসুদেবের জন্য। তিনি রাজা সুমিত্রকে সবসময় আড়াল করে রাখেন। পাটলিপুত্রের প্রান্তে গঙ্গানদীর ধার ঘেঁষে একদল যবন ছাউনি ফেলেছে। তারা নাকি ব্যবসা করতে চায়। অনেক বিচার করে মন্ত্রী বাসুদেব তাদের সম্মতি দিয়েছেন।

রাজা সুমিত্রের ভোগ-বিলাস মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নতুন-নতুন নর্তকী ধরে আনবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে রাজার চর সর্বদাই ব্যস্ত। কৌশাম্বীর প্রখ্যাত নর্তকী মালবিকা রাজার মনোরঞ্জন করে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে গেছে। কাঞ্চীর নর্তকী প্রলভা তো একমাস রাজপুরীতে থেকে গেল। মন্ত্রী বাসুদেব অনেক চেষ্টা করেও রাজাকে এ-পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেননি। রাজা আজকাল রানি-মহলে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন।

রাজা দিনের এবং রাতের বেশিরভাগ সময় জলসাঘরেই থাকেন। সুরাপান করে বিভোর হয়ে থাকেন। অনুচর মুলাদেব রাজাকে সবসময় পাহারা দেয়।

মুলাদেবের জীবনের একটা ইতিহাস আছে। রাজা সুমিত্র একবার মৃগয়া করতে গিয়ে এই শবর ছেলেটিকে দেখতে পান। ছেলেটিকে রাজার ভালো লাগে। তিনি ছেলেটিকে রাজপুরীতে নিয়ে এসে মানুষ করেন। সাপ

ধরাই এদের পৈতৃক ব্যবসা। মুলাদেব ছেলেবেলায় নানারকম সাপ ধরে এনে রাজাকে সাপের খেলা দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করত।

বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মুলাদেব রাজার দক্ষিণ হস্ত হয়ে পড়ে। রাজার হুকুম সে-ই সকলকে জানিয়ে দেয়। সব বিভাগেই তার প্রচণ্ড আধিপত্য। অস্ত্র নির্মাণের কাজে তার জুড়ি নেই। বিভিন্ন সময়ে সে নানারকম অস্ত্র বানিয়ে রাজাকে উপহার দেয়। রাজা তারিফ করেন।

নগরের একপ্রান্তে রাজা মুলাদেবকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে মুলাদেবের বাবা-মা-ভাইরা থাকে। মুলাদেব মাঝে-মাঝে বাড়ি যায়। বেশিরভাগ সময় রাজপুরীতে থাকে। যুবরাজ বজ্রমিত্র মুলাদেবকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু কিছু বলতেও পারে না।

ইদানীং রাজার নজর পড়েছে নর্তকী নয়নার দিকে। নয়না মগধেরই মেয়ে। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বিদিশায় চলে যায়। সেখানে রাজনর্তকী সুধন্যার কাছে নাচ-গান শেখে। ক্রমে নয়নার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাবার সঙ্গে আবার মগধেই ফিরে এসেছে।

রাজার কানে নয়নার কথা উঠেছে। রাজার দূত গিয়ে নয়নাকে এত্তেলা দিয়েছে। নয়না এসে রাজার সঙ্গে দেখা করে গেছে। দুজনের মধ্যে নিভৃতে কথাও হয়েছে।

নয়নার উদ্ভিন্ন যৌবন, উপচে পড়া রূপের জৌলুস, আয়ত চোখ রাজার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। রাজার পাশে যখন নয়না এসে বসল, তখন যেন ঘরটা আলোয় ভরে গেল। রাজা নয়নার চিবুক ধরে মুখটা তুলে দেখলেন। সত্যি! নয়না সুন্দরী!

অনেক স্বপ্ন দেখছেন রাজা নয়নাকে নিয়ে। নর্তকী নয়নাকে বরাবরের জন্য জলসাঘরে রেখে দেওয়া গেলে তবে সকল সমস্যারই সমাধান হয়। রাজবধূ না করলেও রক্ষিতা হিসেবে রাখতে দোষ কী! রমণীর যৌবন আর ক'দিনের। বেচাল করলে রাজপুরী-ছাড়া করতেই বা কতক্ষণ!

এরই মাঝে রাজার মনে ভালোবাসার ছোঁয়া লেগেছে। রাজা মনে-মনে হেসেছেন—এ কী বিভ্রম! রাজাদের আবার প্রেম-ভালোবাসা বলে কিছু থাকে নাকি! রাত ফুরোলেই তো নেশা কেটে যায়! তখন চাই নতুন নারীদেহ। নতুন যৌবন।

মুলাদেবের ওপর ভার পড়েছে জলসাঘর সাজাবার। রাজপুরী থেকে কিছুটা দূরে দ্বিতল জলসাঘর। পিছনে সরোবর। চারদিকে রকমারি ফুলের বাগিচা।

দ্বিতলের মেঝেতে জাজিম পাতা। একপাশে রাজার উপবেশনের জন্য স্বর্ণময় আসন। দু-পাশে মখমলের তাকিয়া।

মেঝের ঠিক ওপরে একটা স্তিমিত ঝাড়লণ্ঠন। ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন একটা দড়ি দিয়ে ছাদের কড়ির সঙ্গে বাঁধা। ঝাড়লণ্ঠনের দড়ি দূরে বাঁধা থাকবে। নৃত্যের তালে তা ওঠানামা করাবে মুলাদেব।

মুলাদেবের পরিকল্পনা রাজা সানন্দে অনুমোদন করলেন।

সন্ধে হতে-না-হতেই রাজা আজ জলসাঘরে এসেছেন এবং আসন গ্রহণ করেছেন। মুলাদেব কোষবদ্ধ তরবারি আসনের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সুরাপান একাকী হয় না, তাই কয়েকজন মোসাহেব রাজার পদতলে বসে নানারকম মনোরঞ্জক কথা বলছে। মাঝে-মাঝে বিদূষক হাসির চমক সৃষ্টি করছে।

আকণ্ঠ সুরাপানে রাজা বেহুঁশ। এমনসময় নর্তকী নয়না প্রবেশ করল। তার বক্ষে শুধুমাত্র কাঁচুলি, কোমরে স্বল্প বেশ। চোখে আকর্ণ সুরমা টানা। পায়ে ঘুঙুর। নয়নার দেহে, মুখে যেন কামনার বহ্নি। তরঙ্গের মতো দুলছে তার দেহ। নৃত্যের তালে-তালে সৃষ্টি হচ্ছে নব মূর্ছনা। যন্ত্রী যেন তাল রাখতে পারছে না নর্তকীর সঙ্গে। রাজা সুমিত্র বিভোর হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে নয়না বারকয়েক বাহুবেষ্টন করে গেছে।

মুলাদেব তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিশ্বস্তভাবে। নৃত্যের ছন্দে-ছন্দে সে ঝাড়লণ্ঠন ওঠানামা করাচ্ছে।

হঠাৎ একটা তোপধ্বনির আওয়াজ হল।

মুহূর্তে ঝাড়লণ্ঠন সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। চারদিকে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল।

তবে কি যবনেরা রাজপুরী আক্রমণ করেছে! চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রাজা সুমিত্র শশব্যস্ত হয়ে তরবারি কোষমুক্ত করতে গেলেন। সেই অন্ধকারের মধ্যে তীব্র আর্তনাদ করে রাজা সুমিত্র আসন থেকে নীচে পড়ে গেলেন।

মুলাদেব ছুটে এল। বাতি আনা হল। রাজা যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন। ডানহাত কাঁপছে।

রাজার দক্ষিণ হস্তে সর্প দংশন করেছে। সকলে প্রাণভয়ে নীচে নেমে গেল। শুধু মুলাদেব রাজার পাশে বসে তাঁর সেবা করতে লাগল।

খবরটা দাবানলের মতো রাজপ্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রী বাসুদেব এবং যুবরাজ বজ্রমিত্র ছুটে এলেন। রানিরাও খবর পেয়ে জলসাঘরে জমায়েত হলেন। রাজা সুমিত্রের দেহ ক্রমশ নিথর হয়ে পড়ল। ওঝা ডাকতে লোক ছুটল।

যুবরাজ বজ্রমিত্র চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী বাসুদেবকে বলল, দেখুন পিতৃব্য! তরবারির বাঁটটা রয়েছে, ফলাটা নেই!

যুবরাজ বজ্রমিত্র তরবারির কোষটা ভালো করে পরীক্ষা করল। দেখল, কোষের মধ্যে দু-তিনটে ছিদ্র রয়েছে।

ইতিমধ্যে ওঝা এবং রাজবৈদ্য এসে উপস্থিত হল।

ওঝা নানারকমভাবে রাজা সুমিত্রের দক্ষিণ হস্তের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করল এবং বলল, বিষধর কালসর্পের দংশনে রাজার মৃত্যু হয়েছে। দংশন করেই সর্প প্রস্থান করেছে। এই ঘরে সর্প নেই। রাজাকে বাঁচানো আমার পক্ষে অসাধ্য।

রাজবৈদ্য নানারকম পরীক্ষা করে একই অভিমত ব্যক্ত করল।

সকলে ধীরে-ধীরে প্রস্থান করল। রাজার মৃতদেহ প্রহরীবেষ্টিত হয়ে জলসাঘরে শায়িত রইল।

চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এল। রাজপুরী থেকে ক্রন্দনের রোল শোনা যেতে লাগল।

পরদিন প্রভাতে সকলে রাজদরবারে সমবেত হল।

মন্ত্রী বাসুদেব অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, রাজপদ কখনও শূন্য থাকে না। সুতরাং যুবরাজ বজ্রমিত্রকে শুঙ্গ বংশের রাজা করা হোক।

যুবরাজ বজ্রমিত্র বলল, পিতৃব্য, আগে আমার পিতার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হোক, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হোক—তবেই আমি সিংহাসনে আরোহণ করব।

মন্ত্রী বাসুদেব বললেন, বেশ, তাই হোক। গতকাল সন্ধ্যায় তোপধ্বনির যে-শব্দ হয়েছে তা আমাদের কামান থেকেই হয়েছে। কিন্তু তার আদেশ কে দিল?

মুলাদেব বলল, আমিই দিয়েছি, মন্ত্রীমহাশয়। কয়েকদিন ধরে কামানটি পরিমার্জনা করেছিলাম। রাজা সুমিত্র গতকাল আমাকে আদেশ করেছিলেন সন্ধ্যার সময় কামানটি পরীক্ষা করে দেখতে। তাই যন্ত্রশালার লোকদের অনুরোধ করেছিলাম তোপধ্বনি করতে।

উপস্থিত সকলেই মত প্রকাশ করল, রাজহত্যার পিছনে যবনদের চক্রান্ত রয়েছে। রাজপথে মাঝে-মাঝে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরও দেখা গেছে। শুধু বজ্রমিত্র মাথা নিচু করে সব শুনতে লাগল।

একজন বলল, রাজ-অস্ত্রশালায় যবনদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কারণ, রাজার পাশে যে-তরবারিটি পাওয়া গেছে তা যবনদের তরবারির ন্যায় খর্বাকৃতি।

মন্ত্রী বাসুদেব বললেন, এটি রাজার প্রিয় অস্ত্রের অন্যতম। রাজা এই খর্বাকৃতি তরবারিটি বহুদিন ধরে ব্যবহার করছেন।

—কিন্তু দ্বিতলে সাপ উঠল কী করে—সেটাই বড় রহস্য।—গম্ভীরভাবে বজ্রমিত্র বলল।

—কালসাপের অগম্য স্থান নেই।—একজন মন্তব্য করল।

—কিন্তু বেছে-বেছে রাজাকেই দংশন করল—এটাই আশ্চর্য! তাও আবার দক্ষিণ হস্তে! পায়ে কামড়ালেও একটা কথা ছিল।

—জাজিমের ভেতরেও থাকতে পারে। কেউ হয়তো লক্ষ করেনি।

নানারকম মন্তব্য শোনা গেল। কিন্তু আসল রহস্যের সন্ধান কেউ দিতে পারল না।

এইভাবে ক'দিন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেটে গেল। সকলেই বিমর্ষভাবে কাজকর্ম করে যেতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যারাত্রে বজ্রমিত্র সবার অলক্ষে নয়নার বাড়ির কাছে গেল! শহরের শেষ প্রান্তে নয়নার বাড়ি। চারদিকে ঝোপঝাড়। জঙ্গলে ভরতি।

বজ্রমিত্র পা টিপে-টিপে নয়নার জানলার কাছে গেল। মৃৎপ্রদীপের স্তিমিতালোকে বজ্রমিত্র ঘরের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল। ভেতরে একটা পালঙ্কের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় মুলাদেব, আর তারই পায়ের কাছে বসে নয়না কাঁদছে।

মুলাদেব : আর কেঁদে লাভ কী! রাজা তো আর বেঁচে উঠবে না।

নয়না : তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দাও—আমি বিদিশায় ফিরে যাব।

মুলাদেব : তা কী করে হয়! তুমি একদিন এ-রাজ্যের পাটরানি হবে। রাজাকে যখন সরিয়েছি তখন রাজকুমারকে সরাতে কতক্ষণ?

—হত্যার মধ্যে দিয়ে আমি সুখ চাই না।

—আমি চাই। জানো তো নয়নে, এ-রাজ্যের প্রতীক গন্ডার। গন্ডারের জেদ আর একগুঁয়েমি আমি এদের কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছি।

—যে-রাজা তোমাকে এত ভালোবাসতেন, তোমাকে সাধারণ অবস্থা থেকে এত বড় করলেন, তাঁকে সরাতে তোমার পাপবোধ হল না, দ্বিধা হল না!

—রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। তা ছাড়া রাজার ব্যভিচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল—সুরাপানও মাত্রাতিরিক্ত করছিলেন।

—কিন্তু আমি তাঁকে সুপথে আনতে পারতাম, তিনি আমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন।

মুলাদেব অট্টহাস্য করে উঠল, বলল, রাজাদের ভালোবাসা! আমি অনেক তরুণীকে দেখেছি, সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে রাজদ্বারে বসে কাঁদছে। হায়রে হতভাগিনী!

—কিন্তু তুমি একদিন ধরা পড়বেই। তরবারির ফলা একদিন বের হবেই।

—অত কাঁচা কাজ আমি করি না, নয়না। তরবারির ফলা সকলের লক্ষ্যেই রয়েছে, অথচ অলক্ষ্যে। ইচ্ছে করলেই দেখা যায়।

মুলাদেব হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল, নয়নাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি অধীর হয়ো না, নয়নে। এসব একদিন স্তিমিত হয়ে পড়বে—তখন তোমাকে আমি তুলে নিয়ে যাব আমার ঘরে।

বজ্রমিত্র স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা তার মনে এক অশান্ত ঝড় তুলল। কোনওরকমে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল।

পরদিন বজ্রমিত্র তোরণদ্বারের পাশ দিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল। এ কী! তোরণদ্বারের নীচের ঘরটি খোলা! এই ঘরটি দিয়েই দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। নীচে সবসময় প্রহরী থাকে। বজ্রমিত্র প্রহরীকে জিগ্যেস করল, এ-ঘর কে খুলেছে?

প্রহরী বলল, আজ্ঞে, মুলাদেব। কদিন আগে কিছু যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে সে ওপরে উঠেছিল। কোথায় নাকি মেরামতি করতে হবে। তারপর অনুমতির অভাবে ঘর বন্ধ করা হয়নি।

—সময়টা কখন?—বজ্রমিত্র জিগ্যেস করল।

—সন্ধ্যার কিছু পরে।—প্রহরী উত্তর দিল।

বজ্রমিত্র দ্রুতপদে তোরণশীর্ষে উঠে গেল। তোরণশীর্ষে যে-গন্ডারের প্রতিমূর্তি রয়েছে, তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল। কষ্টিপাথরের গন্ডারের শিংটি শ্বেতপাথরের। সেই শিং অপসৃত হয়ে প্রোথিত হয়েছে রাজা সুমিত্রের তরবারির ফলা।

ক'দিন নিঃশব্দে কেটে গেল। কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। তবে বজ্রমিত্রকে বেজায় ব্যস্ত বলে মনে হল।

সেদিন সকালে রাজদরবারের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। রাজপুরীর সকল মানুষই এসেছে। এসেছে মুলাদেব, তার ভাই শুকদেব আর নর্তকী নয়না।

মন্ত্রী বাসুদেব একপাশে বসে আছেন।

বজ্রমিত্র আসন ছেড়ে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করল, আজ আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাজা সুমিত্রের হত্যার বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আপনারাই দোষী ব্যক্তির শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

আপনারা অবগত আছেন, রাজা সুমিত্র কিছুদিন পূর্বে জলসাঘরে সর্পদংশনে মারা যান। প্রথমে একে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি কারণ এবং ঘটনায় আমার স্থির বিশ্বাস হল—এ-মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

প্রথমে, দ্বিতলে সাপ উঠল কী করে? এই প্রশ্নই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তারপর অকস্মাৎ তোপধ্বনি, ঝাড়লন্ঠনের পতন, ছিদ্রযুক্ত কোষ এবং ফলাবিহীন তরবারির বাঁট—আমাকে নিশ্চিতের দিকে ঠেলে দিল যে, রাজাকে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু হত্যাকারী কে? তার উদ্দেশ্যই বা কী? নানা চিন্তা আমার মাথায় এল। তখন এক-একটি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। একটি লোকই আমার সামনে এল—সে মুলাদেব। মুলাদেব রাজার বিশ্বস্ত অনুচর। সে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। রাজার সব ক'টি বিভাগে তার অবাধ গতি। রাজার অনেক গোপন খবর সে জানে। সে বিভিন্ন সময়ে রাজাকে বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাণ করে দিয়েছে, রাজাও তারিফ করেছেন।

জলসাঘরে যে-তরবারিটি রাজার সঙ্গে ছিল তা যবনদের তরবারির অনুরূপ বেঁটেখাটো এবং বাঁকানো—যাতে সহজে সন্দেহ আসে কোনও যবন এ-হত্যার পেছনে আছে।

রাজার মৃত্যুর দিন সে তরবারি থেকে ফলাটা খুলে ফেলে, কোষে ছিদ্র করে এবং ভাই শুকদেবকে দিয়ে একটা বিষধর সাপ কোষে ঢুকিয়ে রেখে ফলাবিহীন বাঁট দিয়ে শক্ত করে আটকে রাখে। বন্দোবস্ত এমন নিখুঁত যে, রাজা তরবারির বাঁট ধরে টানলেই তা খুলে যাবে এবং সাপ তাঁকে ছোবল মারবে। এ-কাজে মুলাদেবকে সাহায্য করেছে তার ভাই শুকদেব, কারণ শুকদেব এখনও সাপ ধরার ব্যবসা করে।

কিন্তু এর জন্য চাই পরিবেশ।

পরিবেশ রচনায় মুলাদেব অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় দিয়েছে। নিজেই ঝাড়লন্ঠনের ওঠা-নামার দায়িত্ব নিয়েছে। সে জানে, ঝাড়লন্ঠন ফেলে দিলেই সমস্ত জলসাঘর অন্ধকার হয়ে যাবে।

অস্ত্রশালার লোকদের সাহায্যে সে অকারণে সেদিন তোপধ্বনির ব্যবস্থা করে। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি যবন এবং বৌদ্ধদের ছাউনিতে কোনও কামান ছিল না। আমাদেরই একটা কামানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল।

মুলাদেব ধূর্ত। তরবারির ফলাটা সে ফেলে না দিয়ে তোরণশীর্ষে পাথরের গন্ডারের শৃঙ্গে স্থাপন করেছিল।

রাজা যখন সুরাপানে বেহুঁশ, তখনই সে তোপধ্বনির আওয়াজ শোনামাত্র ঝাড়লন্ঠনের দড়ি ছেড়ে দেয়। রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে তরবারি বের করবার জন্যে বাঁটে হাত দিতেই তা খুলে যায় এবং কোষের মধ্যেকার সাপ রাজাকে দংশন করে। কোষের মধ্যে কয়েকটি ছিদ্র দেখে মনে হয় মুলাদেব সাপের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা রেখেছিল।

কিন্তু মুলাদেবের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই। নয়নাকে লাভ করা। বিদিশা থেকে ফিরে আসবার পর নয়নাকে দেখে সে মুগ্ধ হয় এবং নয়নাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করতে চায়। মুলাদেবের বাড়ির অনতিদূরে নয়নার বাড়ি। সে প্রতি সন্ধ্যায় একবার করে নয়নার বাড়ি যেত।

নয়না রাজার নজর কাড়লে মুলাদেবের ভয় হল—নয়না বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল। তা ছাড়া, রাজ-ঐশ্বর্যের প্রলোভন হয়তো নয়না ছাড়তে পারবে না। আমি এরই মধ্যে নয়নার বাড়ির পেছনদিক দিয়ে গিয়ে সমস্ত বাক্যালাপ শুনে আসি।

ক্ষমতা মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। মুলাদেবকে তাই করেছিল। সে শুঙ্গ বংশের পতন ঘটিয়ে শবর বংশের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। যে-রাজা তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে এনে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন—ক্ষমতার লোভে তাঁকেই হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। রাজার মৃত্যুর পর তার কপট কান্না দেখে সকলেরই মনে হয়েছিল—তারই বুঝি পিতৃবিয়োগ হয়েছে। অথচ রাজাকে সেদিন অতিরিক্ত সুরাপান করিয়ে বেহুঁশ করার পরিকল্পনা তারই। এখন আপনারাই বলুন—এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা—এর কী শাস্তি হতে পারে?

—প্রাণদণ্ড! মৃত্যু! হত্যার বদলে হত্যা!

মন্ত্রী বাসুদেব উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, মুলাদেব সারাজীবন কারারুদ্ধ থাকবে। প্রাণদণ্ড দিলে সে অনুশোচনার সময় পাবে না।

মন্ত্রী বাসুদেবের প্রস্তাব জনতা অনুমোদন করল।

শুঙ্গরাজের কারারক্ষী মুলাদেবের দিকে অগ্রসর হল।

মাসিক রহস্য পত্রিকা

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৫



পান্নার রং

উৎপল ভট্টাচার্য

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতোই। জাস্টিস মৈত্র আবার বিয়ে করছেন। নিউ আলিপুরের এ-অঞ্চলটায় অভিজাত পরিবারের বাস। প্রায় একশো ফুট চওড়া রাস্তা কালিঘাট স্টেশনের পিছন থেকে শুরু হয়ে সোজা চলে গেছে বেহালা পর্যন্ত। দু-ধারে নানা ছাঁদের বড়-বড় বাড়ি। সুসজ্জিত দোকানপাট। রাত্রিবেলা মনে হয় যেন ইন্দ্রপুরী। আর এই রাস্তার ওপরেই বেহালা-কালিঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় জাস্টিস মৈত্রের বাড়ি। সহজেই আর-দশটা বাড়ি থেকে আলাদা।

গেট থেকে বাড়িটা অনেকটা ভেতরে। সরু কুচিপাথর ফেলা রাস্তাটা সোজা গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গাড়ি-বারান্দার সঙ্গে মিশে গেছে। মাঝখানে বাগান। রাস্তার দু-পাশেও বাগান। বাগান বলতে শুধু শৌখিন ফুলের বাগিচাই নয়, নানারকম কৃষিকাজও আছে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই মনে হবে, এ-বাড়ির মনিবের বাগানের শখ আছে।

সত্যিই তাই। জাস্টিস মৈত্র সারাদিন বাগান নিয়ে পড়ে থাকেন। বছরখানেক হল রিটায়ার করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই। গ্যাস্ট্রিকের একটু দোষ আছে। ডাক্তারদের মতে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়। চেহারা দেখলে কিন্তু বোঝার উপায় নেই। বছর পঞ্চান্ন বয়স হবে। পৌনে ছ'ফিট লম্বা। গৌরবর্ণ। কোঁকড়ানো চুল পিছন দিকে ওলটানো। রগের দু-পাশে কিছু-কিছু পেকেছে মাত্র। এককথায় সুপুরুষ জাস্টিস মৈত্র। এবং যৌবনে যে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই জাস্টিস মৈত্রেরই বিয়ে।

জাস্টিস মৈত্রের স্ত্রী বছর-দশেক আগে মারা গেছেন। তাঁর দুটি সন্তান। ছেলে অজয়। মেয়ে রীনা। অজয়ের বয়স বছর চব্বিশ হবে। মেয়ে রীনার বয়সও একুশ বছর। এম. এ. পড়ছে।

বাবাকে নিয়ে কানাঘুষো ওরাও শুনেছে। কিন্তু বাবা ওদের যথেষ্ট স্নেহ করলেও, তাঁর সামনে মুখ তুলে কথা বলার সাহস ওদের কারুরই নেই। তাই ওরা এ-বিয়ে নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই বিয়ে হল। তখন ওরা দু-ভাইবোন পুজোর ছুটি কাটাচ্ছে মামার বাড়িতে। সেখানে থেকেই শুনল, প্রখ্যাত শিল্পী কুমারী অমিতা চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ওদের বাবার। এই অমিতা চৌধুরী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে তারা। মহিলা মোটেই চরিত্রবতী নন। সেইজন্যই অনেক দুর্নাম অমিতা চৌধুরীর। কিন্তু শিল্পী হিসেবে ভারতজোড়া খ্যাতি সত্যিই হিংসে করার মতো। তাঁর আঁকা কিছু ছবি অজয় দেখেছে।

সত্যিই সুন্দর! বিশেষত ল্যান্ডস্কেপ-গুলো। অতুলনীয়। ছবিগুলো অনেক চড়া দামে বিক্রিও হয়। বহু ধনীর ড্রইংরুমে অমিতা চৌধুরীর ছবির দেখা পাওয়া যায়।

পুজোর ছুটি মামার বাড়িতে কাটিয়ে অজয় আর রীনা ফিরে এল বাড়ি। বাবা ওদের কিছু বললেন না। ওরাও কিছু জানতে চাইল না।

ছ'মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে অজয় আর রীনার সঙ্গে ওদের নতুন মায়ের দু-একবার দেখা হলেও কথাবার্তা হয়নি। এ-বিষয়ে কোনও পক্ষেরই তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি।

সেদিন সকালবেলা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে। বিকেলেও থামবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। অজয় কলেজে গেল না—বিকেলবেলা ক্লাবেও গেল না। সত্যি বলতে কী, কোনওখানেই আর যেতে ইচ্ছে করে না ওর। বন্ধুবান্ধবদের অর্থপূর্ণ হাসি আর দৃষ্টিপাত গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দেয়।

রীনাও আজকাল কোথাও যেতে চায় না। কারণ একই। আজ ওর বান্ধবী নমিতা নেহাত ধরে পড়ায় ওর জন্মদিনে ওদের বাড়ি গেছে।

অজয় শুয়ে-শুয়ে ওই মাসের মেডিকেল জার্নালখানা ওলটাচ্ছিল। দেওয়ালঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত ন'টা বাজল।

এমনসময়ে ভৃত্য কালিপদ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চিৎকার করে বলল, খোকাবাবু, শিগগির চলুন। কর্তাবাবু যেন কীরকম করছেন।

ধড়ফড় করে উঠে বসল অজয়—বলল, কী হয়েছে?

—তা জানি না। দেখলাম, কর্তাবাবু বিছানায় পড়ে কীরকম দাঁত-মুখ বাঁকিয়ে কাতরাচ্ছেন। জিগ্যেস করলুম, 'কী অসুবিধে হচ্ছে?' তা জবাব দিলেন না। তাই ভয় পেয়ে আপনাকে ডাকতে এলুম।

—কেন, ইয়ে—মানে কী বললে?

অজয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কালিপদ বলল, আজ্ঞে, গিন্নিমা তো ঘণ্টাখানেক আগে এক বাবুর সঙ্গে গাড়িতে করে চলে গেছেন। আর আজকের রান্না গিন্নিমা করেছেন। আমাকে বলে গেছেন, 'সাড়ে আটটায় বাবুকে খাবার দিয়ো। আর ন'টার সময় খেতে দিয়ো ওষুধটা। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে।' তা খাবার দেওয়ার সময়ে বাবুকে তো ভালোই দেখেছি। ওষুধটা খাওয়াতে গিয়ে অমন অবস্থা দেখে এখানে এলুম।

—হুম।—বলে অজয় বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই অজয় দেখল, ওর বাবা বিছানার ওপর উঠে বসেছেন।

অজয়কে দেখে জাস্টিস মৈত্র বললেন, এই যে অজয়, কালিপদকে একটু পাঠিয়ে দাও তো।

অজয় বলল, আপনার শরীর কেমন আছে, বাবা? একটু আগে—।

অজয়কে কথা শেষ করতে না দিয়েই জাস্টিস মৈত্র বলে উঠলেন, ও কিছু না—কিছু না। খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেছে। তাই পেনটা একটু বেড়েছিল মাত্র।

ইতিমধ্যে কালিপদ ওষুধের শিশি আর গ্লাস হাতে করে এসে ঢুকল। তার হাত থেকে শিশি আর গ্লাসটা নিয়ে অজয় একদাগ ওষুধ ঢেলে জাস্টিস মৈত্রের হাতে দিল। জাস্টিস মৈত্র এক ঢোকে ওষুধটা খেয়ে খালি গ্লাসটা অজয়ের হাতে দিলেন। একটু পরে জাস্টিস মৈত্র বললেন, আলোটা নিভিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিস রে, কালিপদ। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন জাস্টিস মৈত্র।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অজয় মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

—কিন্তু কাকাবাবু, ব্যাপারটা গোড়া থেকেই কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার। —বলল অরুণ।

কথা হচ্ছিল লালবাজারে সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুপুত্র অরুণ রায়ের—মিস্টার চৌধুরীর নিজস্ব অফিস-ঘরে।

—মানে? কী বলতে চাও তুমি?—অরুণকে পালটা প্রশ্ন করলেন মিস্টার চৌধুরী।

—বলতে চাই যে, অজয় মৈত্র জাস্টিস মৈত্রকে—অর্থাৎ ওর বাবাকে কখনওই খুন করেনি। —দৃঢ় স্বরে বলল অরুণ।

মিস্টার চৌধুরী : ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অরুণের দিকে—তারপর ঈষৎ বিরক্তি মাখানো স্বরে বললেন, আচ্ছা, ঘটনাটা তোমাকে বলি, শোনো। গত বুধবার বেলা দশটায় সবে অফিসে এসে বসেছি। এমনসময় একজন সার্জেন্ট একটা চিঠি দিয়ে বলল, খুব জরুরি চিঠি। তক্ষুনি পড়ে দেখতে। জিগ্যেস করলাম, কে দিয়েছে এটা?

সার্জেন্ট বলল, এক ভদ্রমহিলা।

—তাঁকে নিয়ে এসো এখানে।

সার্জেন্ট অভিবাদন করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল সার্জেন্ট—বলল, মহিলাটি নেই।

—নেই!

—না। ট্যাক্সি করে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। গাড়ির ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে চিঠিটা আমার হাতে দিয়েছেন।

—ওঃ। আচ্ছা, তাঁকে দেখতে কেমন?

—কাপড় দিয়ে মাথা ও মুখের নীচের দিকটা ঢাকা থাকায় আমি অতটা খেয়াল করিনি। তবে অনুমান, কুড়ি-বাইশ বছরের সুন্দরী তরুণী।

মিস্টার চৌধুরী বলেন, সার্জেন্টকে যেতে বলে আমি চিঠিটা খুলে পড়লাম। চিঠির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে হচ্ছে এই : লেখিকা জাস্টিস মৈত্রের শুভাকাঙ্খিনী। জাস্টিস মৈত্র গতকাল রাতে কোনও এক সময়ে মারা গেছেন। যদিও হার্টফেল করেছেন বলে সবাই মনে করে, কিন্তু লেখিকার দৃঢ় সন্দেহ যে, বিষই জাস্টিস মৈত্রের মৃত্যুর কারণ। তাই তিনি এ-বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। এবং তা অবিলম্বেই। তা না হলে হয়তো শব পোড়ানো হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি অকুস্থলে গেলাম। তদন্ত করলাম। বুঝলাম, লেখিকার অনুমান সত্যি। অর্থাৎ, জাস্টিস মৈত্র বিষের প্রভাবেই মারা গেছেন। কেসটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার এবং জাস্টিস মৈত্রের ছেলে অজয় মৈত্রই যে খুনি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।—এই পর্যন্ত বলে মিস্টার চৌধুরী চুপ করলেন।

—কিন্তু আমার মনে হয়...।—একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে অরুণ বলল, আপনি যদি আবার একটু ভালো করে চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন খুনি অজয় নয়, খুনি হচ্ছে—।

অরুণকে বাধা দিয়ে মিস্টার চৌধুরী বললেন, জানি, জাস্টিস মৈত্রের বাড়িতে তোমার যাতায়াত আছে। আর অজয় হচ্ছে তোমার বন্ধু। অজয়ের বোন রীনার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে বোধহয়?

এই কথায় অরুণ একটু অস্বস্তি বোধ করল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আছে।

—ওর অনুরোধেই বোধহয় তুমি এসেছ?

—হ্যাঁ।

—ওর চিঠিটাও বোধহয় ওরই লেখা, কী বলো?

এবারে অরুণ মাথা নেড়ে সায় দিল।

—হুম! আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। রীনা মৈত্র ঠিকই বুঝেছিল যে, ওর বাবাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু ও বোঝেনি যে, ওর ভাই-ই কু-কীর্তির নায়ক। বুঝতে পারলে বোধহয় আমার কাছে চিঠি লিখে তদন্তের প্রার্থনা জানাত না। কিন্তু যখন দেখল যে, ওর ভাই এ-ব্যাপারে জড়িত, তখনই ও তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাই না? কিন্তু অজয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো এতই অব্যর্থ যে, ও যে দোষী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমত, বডি এগজামিন করে জানা গেছে যে, জাস্টিস মৈত্রের লিভার আর কিডনিতে এমন পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেছে, যা একজন মানুষকে মারবার পক্ষে যথেষ্ট। আর অজয় তো

মেডিকেল স্টুডেন্ট। ওর পক্ষে আর্সেনিক সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তা ছাড়া অজয় কোনওদিন ওর বাবাকে ওষুধ দেয়নি। কিন্তু ঘটনার দিন রাতে অজয় নিজের হাতে ওর বাবাকে ওষুধ খাইয়েছে। একটা ওজর অবশ্য দেখিয়েছিল অজয়। সেটা হল, ঘটনার দিন রাতে নাকি ভৃত্য কালিপদ ওকে ডাকতেই ও বাবার ঘরে গিয়েছিল। এবং ওষুধের শিশিটা ও কালিপদর হাত থেকে নিয়েই গ্লাসে ওষুধ ঢেলে বাবার হাতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, অজয়ের মতো চালাক ছেলের পক্ষে ওর বাবার চোখকে আর ভৃত্য কালিপদর চোখকে ফাঁকি দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, চাকরবাকরদের কাছে শুনলাম, জাস্টিস মৈত্রের মৃত্যুর দিন-কুড়ি আগে তাঁর সঙ্গে অজয়ের বচসা হয়। অজয় শ' পাঁচেক টাকা চেয়েছিল জাস্টিস মৈত্রের কাছে। জাস্টিস মৈত্র নাকি অজয়কে টাকা দেননি। জাস্টিস মৈত্র কানাঘুষোয় শুনেছিলেন, অজয় নাকি আজকাল কলেজে যায় না। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অসৎ-বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছে। তৃতীয়ত, অজয় ওর বাবার উইলের কথা জানত। মোট পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন মিসেস মৈত্র। আর বাকি অর্ধেক সমান ভাগে পাবে ভাই-বোন। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই অজয় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কারণ ও নতুন মাকে কখনওই সহ্য করতে পারেনি।

খানিকটা থেমে মিস্টার চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন : কাজেই দেখতে পাচ্ছ, অরুণ, এতগুলো প্রমাণ পেয়েই আমি অজয়কে গ্রেপ্তার করেছি। এখন তোমার শখের তদন্ত কী বলে, শুনি?

অরুণ ওর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলতে লাগল দেখুন কাকাবাবু, মৃতদেহের কিডনিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা জানি, সাদা আর্সেনিক জলের সঙ্গে মেশে না। কাজেই অজয় ওর বাবাকে তরল ওষুধের সঙ্গে আর্সেনিক খাওয়াতে পারে না। অবশ্য আর্সেনিকের একটা যৌগিক পদার্থ জলের সঙ্গে সহজেই মেশে। কিন্তু ওটা যদি কাউকে খাওয়ানো যায়, সেক্ষেত্রে তার কিডনিতে আর্সেনিক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। তাহলে কী করে মৃতের শরীরে আর্সেনিক এল?

কোনও জবাব দিলেন না মিস্টার চৌধুরী।

অরুণ আবার বলতে লাগল : অটোপ্সির রিপোর্ট শুধু বলছে, মৃতদেহে আর্সেনিক ছিল। কিন্তু কী করে তা মৃতদেহে এল বা কোন জাতীয় আর্সেনিক, তা বলেনি। তাহলে এইসব পদার্থগুলোর সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া যাক। সাদা আর্সেনিককে বাদ দিতে পারি। কিন্তু সোডিয়াম আর্সেনাইড? এটাকে বাদ দিতে পারি না। এটি জাস্টিস মৈত্রর বাড়িতে আসত। কারণ, জাস্টিস মৈত্রের বাগানের শখ ছিল। আর আগাছা ধ্বংসের জন্য ওটা দরকার। তবে কি সোডিয়াম আর্সেনাইড জাস্টিস মৈত্রের মৃত্যুর কারণ? কিন্তু নাঃ, এই পদার্থটির দ্বারা আগাছাই ধ্বংস করা চলে—মানুষ মারা যায় না। তারপর আছে কপার আর্সেনাইডও। আমার দৃঢ় ধারণা যে, জাস্টিস মৈত্রকে বেশি পরিমাণে কপার আর্সেনিক খাইয়েই মারা হয়েছে।

ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে মিস্টার চৌধুরী বললেন, দ্যাখো অরুণ, ধারণা বা কল্পনা দিয়ে এসব ব্যাপারের সমাধান হয় না—প্রমাণ করতে হয়।

অরুণ রায় মৃদু হেসে টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে বলতে লাগল : খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, মিসেস মৈত্র—অর্থাৎ, শিল্পী অমিতা দেবী—শুধু শিল্পীই নন, আরও অনেক গুণে গুণী। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি এমন এক ব্যক্তির খপ্পরে পড়েছিলেন, যার মুখ বন্ধ করতে গিয়ে আকণ্ঠ ধারে ডুবে যেতে হয়েছিল। তাই তিনি প্রখ্যাত ধনী জাস্টিস মৈত্রকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারে জাস্টিস মৈত্র তেমন উদার ছিলেন না। এদিকে সেই ব্যক্তি অমিতা দেবীকে ভয় দেখিয়েছিল। বলেছিল, 'আগুন যদি নেভাতে চাও, প্রচুর জল ঢালো।' অর্থাৎ, এসব ব্যাপার আপনি যদি একটু খোঁজ নেন, তাহলেই জানতে পারবেন।

—এটা এমন কিছু প্রমাণ নয়। পুলিশ এত বোকা নয়। মিসেস মৈত্রের ধারের কথা তারা জানে। তাই বলে তিনিই যে খুনি, তার প্রমাণ কী? কেউ ধার-দেনা করলেই সে খুনি হতে পারে? অদ্ভুত!

অরুণ আবার একটু হাসল—বলল, অদ্ভুতই বটে। বিশেষ করে ধূর্ত খুনিরা একটু অদ্ভুতই হয়। জাস্টিস মৈত্রের মৃত্যুর রাতে খাবারের তালিকায় পালং শাক দেখেই আমার মনে কৌতূহল জাগে। এমন অসময়ে পালং শাক কেন? বিশেষত গ্যাস্ট্রিকের রুগির পক্ষে পালং শাক খুব উপযোগী নয়। তারপর যখন আমি অমিতা দেবীর আঁকা একটা ছবি দেখলাম, তখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। অতি উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের আকাশ, ঠিক পান্নার রংয়ের মতো। আর এমন সবুজ রং তখনই হয়, যখন সে-রংয়ের সঙ্গে অ্যাসিটো-আর্সেনাইড অফ কপার মেশানো হয়। যে-দোকান থেকে মিসেস মৈত্র আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কেনেন, সেখানে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, শেষ কবে তিনি ওই দ্রব্যটি কেনেন। তা ছাড়া ওই দ্রব্যটিই জাস্টিস মৈত্রের ড্রয়িংরুমে রয়েছে। আর পালং শাক হল, দেখতে সবুজ, স্বাদে কিছুটা তেতোও বটে। কপার আর্সেনাইডও তাই। খোঁজ নিলে আরও জানতে পারবেন, মিসেস মৈত্রের নির্দেশ অনুযায়ীই সেদিন জাস্টিস মৈত্রকে পালং শাক খেতে দেওয়া হয়েছিল। এবং সে-রাতের রান্নাও মিসেস মৈত্র নিজের হাতেই করেছিলেন। আর সে-রাতে জাস্টিস মৈত্রের খাওয়ার সময়ে মিসেস মৈত্রের বাড়িতে না থাকা একটা দোষ কাটাবার বাহানা মাত্র। বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই মিসেস মৈত্র একফাঁকে পালং শাকে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

কথা শেষ করে অরুণ রায় উঠে দাঁড়াল। মিস্টার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন—অরুণের পিঠে মৃদু আঘাত করে বললেন, তোমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রশংসনীয়, অরুণ। আমি অজয়কে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

অরুণের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

মাসিক রহস্য পত্রিকা
জানুয়ারি (পৌষ), ১৯৮৬



ভয়

আনন্দ বাগচী

ঠিক এমনই একটা আশ্রয় মনে-মনে আশা করেছিল মালতী—বাংলাদেশ থেকে ঠিক এতটা দূরে, সভ্য মানুষের বসতি থেকে ঠিক এতটাই বাইরে। তাই বলে অন্ধকারে নয়, আলো আসবে, প্রচুর আলো। বাতাস বইবে, অঢেল বাতাস। চার দিগন্তে বাঁধা একখানা মহাকাশ টাঙানো থাকবে মাথার ওপরে, সারাবেলা তার ওপর খড়্গধার রোদ্দুর ঝলসে গেলেও রাতের বেলা বাংলাদেশের মমতাময় তারাগুলো ফুটে উঠবে এক-এক করে। অর্থাৎ লোহার সিন্দুকের মতো নিরাপদ এবং নির্জন আশ্রয়, যেখানে তার বাবার চোখের আড়ালে সে আর রঘুনাথ অন্তত একটি মাস বেঁচে থাকতে পারবে। কোনও ভয় না পেয়েও।

এবং এই একমাসের মধ্যেই, পিসিমা আশ্বাস দিয়েছেন, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পড়বে : মিলু আর রঘু, তোমরা ফিরে এসো। ফিরে এলে তোমাদের কল্যাণই হবে। টাকার দরকার থাকলে লিখো। ইতি, তোমাদের দুই মা।

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি বিজ্ঞাপনটা হয়তো হুবহু এই রকমেরই হবে এবং মায়ের নাম থাকলেও বাবার রাগ যে এতদিনে একদম জল হয়ে গিয়েছে, এ তো জানা কথাই। শুধু যে একমাত্র মেয়ে তাই নয়, ছোটবেলা থেকে এক হাতেই মানুষ। তাঁর অবর্তমানে বিরাট বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবার আর কেউ নেই। মালতী, এই একমাত্র মালতী, ছাড়া। আর তাই তো অত বড়লোকের মেয়ে হয়েও একজন সামান্য রিসার্চ স্কলারের সঙ্গে পালিয়ে আসতে সাহসী হল মালতী। অঙ্ক কষে যাঁরা মানুষের মন পর্যন্ত বিচার করেন, তাঁদের কাছে রঘুনাথের পরিচয় সামান্য বইকী। মালতী মনে-মনে হাসে। আসল মানুষটাকে সে ছাড়া আর কেই-বা চিনতে পেরেছে সত্যি করে।

রেজিস্ট্রারের বাড়ি থেকে বেরোবার পর একটানা দেড়টা দিন ট্রেন-জার্নিতে কেটেছে। এই দেড় দিনের মধ্যেই পায়ের নীচের ছুটন্ত মাটির রং বদলেছে, ধীরে-ধীরে ঢংও। এঁটেল দোআশের কৃষ্ণ ত্বক ধীরে-ধীরে আরক্ত হয়ে উঠেছে, মসৃণতা মিলিয়ে গিয়ে হয়েছে কাঁকরকুণ্ঠিত।

সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে রঘুনাথ আঙুল বাড়িয়ে একটু দূরের একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওইটেই দীননাথের ঠাকুরদার তৈরি 'প্রবাস নিবাস'।

মালতীর মনে হল, পায়ের নীচে এতক্ষণে সে মাটি পেয়েছে, তা যে-রঙেরই হোক।

খবর পেয়ে মালি আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল, রিকশার সাড়া পেয়ে ছুটে এল। সামান্যই যা মালপত্র ছিল রঘুনাথ মালির মাথায় তুলে দিয়ে পিছন-পিছন চলল।

চওড়া রাস্তা থেকে একটা সরু পায়ে-চলা ঢালু পথ সটান বাড়িটার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। দূর থেকে দেখলে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগে এবং সেই অনুভূতি পরপর ফুটে ওঠা কয়েকটা ছবির শিহরন মাত্র। বিশাল প্রান্তরের মধ্যে দুটিমাত্র দোতলা বাড়ি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশি হবে না। চারপাশে কিছু সরলকাণ্ড গাছের সারি বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শাল আছে, ইউক্যালিপটাস আছে, বিবর্ণ বিরস তালও আছে। সহসা দেখলে মনে হয়, অতীত যুগের কোনও দুটি অতিকায় ম্যামথ যেন হাতিখেদার মধ্যে আটক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ের রং কালের আলপনায় মেঘবর্ণ।

তারপরেই আবার ছবি বদলে যাবে। পিছনে দেখা যাবে বিপুল দীর্ঘ নীলকান্ত পাহাড়। গভীর বনের আচ্ছাদনকে দূর থেকে মনে হয়, নীল রঙের শ্যাওলার আস্তর, জায়গায়-জায়গায় রোঁয়া ওঠা। সেখানে ধূসর কিংবা সাদা রং।

জোর নজর চড়ালে একটা শীর্ণ নদীর ইতিচিহ্ন নজরে পড়বে, প্রায় পাদদেশে সাদা একগাছি পইতের মতো আড়াআড়ি বেষ্টন করে আছে। ধীরে-ধীরে এই বিরাট পটভূমির মধ্যে বাড়ি দুটির সত্তা লোপ পাবে। আগন্তুক তখন হয়তো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। চারপাশে অস্পষ্ট কিছু নেই। পাহাড়ের দুটি প্রকাণ্ড গুহা যেন বৌদ্ধযুগের প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর, চাপা, অমসৃণ একটা দৃঢ় ভঙ্গি। মনে হয়, কক্ষগুলি পাহাড়ের গোপন বুকের মধ্যে দুরন্ত স্মৃতির মতো ঘিরে রয়েছে। আলো এবং বাতাস সেখানে হয়তো প্রচুর পৌঁছত না, কিন্তু চৈতন্য সেখানে প্রখর হয়ে আছে।

'প্রবাস নিবাস'-এর মধ্যে ঢুকে মালতীর আকাঙ্ক্ষা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। মনে হল, এই তো রৌদ্রপক্ক ফলের মতো নিটোল একটি বাড়ি, যেখানে আলো আসবে, প্রচুর আলো। বাতাস বইবে, অঢেল বাতাস। আর মালতী সারাদিন সারারাত বুক ভরে নিশ্বাস নেবে। গল্প করবে। গান গাইবে, আরও কত কী! রঘুনাথ মাঝে-মাঝে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে, ভীত গলায় বলবে, এই, ও কী হচ্ছে!

মালতী তরল গলায় অজস্র হেসে বলবে, এখানে যে কেউ নেই!

কেউ নেই সেইটেই আসল কথা। মালতী তার প্রতিটি পরিপূর্ণ মুহূর্ত দিয়ে অনুভব করবে, কেউ নেই। এখানে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। কলকাতা নেই। ইউনিভার্সিটি নেই, হিন্দুস্থান পার্ক নেই এবং তার বাবা নেই। আর নেই সেই শীতল পিচ্ছিল সাংঘাতিক সরীসৃপটা, যার নাম ভয়। আছে শুধু পাহাড়, পাথুরে প্রান্তর, প্রখর রোদ, প্রসন্ন জ্যোৎস্না, আর শান্তি, আর নির্জনতা, চোখ টিপে-ধরা দু ঘুম এবং একমাস সময়। তার কমও হতে পারে, কিন্তু বেশি নয়। রঘুনাথ। আর রঘুনাথও আছে, যাকে সম্পূর্ণ দেখা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা হয়নি।

'প্রবাস নিবাস'-এর মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে মালতী খুশিমনে এই কথাগুলি ভাবল।

তারপর সেই সকালবেলাটা কী সুন্দরই না কাটল! রঘুনাথ খাবার আনতে চেয়েছিল। বলেছিল, আজকে আর রান্নার হাঙ্গামায় কাজ নেই।

মালতী একটা উচ্ছল তর্জনী তুলে তাকে থামিয়ে দিল। বলল, চুপ করে ইজিচেয়ারে বসে ডাগর-ডাগর চোখ মেলে দ্যাখো কী করি। বড়জোর কথা বলো, চেঁচামেচি করো—জানি তা পারবে না—কিন্তু তার বেশি না।

তরতর করে শুধু কথাগুলোই বলে গেল না মালতী, স্টেজ রিহার্সাল দেওয়ার মতো হাতে-কলমে কাজও শুরু করে দিল। নতুন কোনও একখানা ইংরেজি নভেল হাতে করে দোতলার চওড়া বারান্দাটায় রঘুনাথ শেষপর্যন্ত বসেই পড়ল। বেশ লাগছিল তার এই সকালবেলায়। রৌদ্র-প্রসন্ন প্রান্তর পার হয়ে চোখদুটো বারবার পাহাড়ের বুকে ছুটে যাচ্ছিল। আবার ফিরে আসছিল ইউক্যালিপটাসের ছায়ায়, তালবীথির মর্মরে।

ইঁদারার জলে স্নান করে ততক্ষণে মালতী স্টোভ ধরিয়েছে। আকাশি রংয়ের একটা পাতলা শাড়ি, কোঁকড়া-কোঁকড়া একরাশ ভিজে চুল, নিটোল দুটো হাতে দুটো জমাট রোদ্দুরের রেখার মতো বালা, একটা অনায়াস হালকা ভঙ্গি। রঘুনাথ শিল্পী নয়, তবু তার চোখে একটি সুন্দর ক্যানভাসের ওপর একটা আশ্চর্য ছবি ধরা পড়ে গেল। একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল যেন। একটি সুরের রেখা।

আবছা ঘুমের মতো দুপুর গড়িয়ে গেল। এলোমেলো কথা, হাসি, গল্প, খেতে বসা এবং তারপর বিশ্রাম। সমস্ত দুশ্চিন্তা একমুঠো ধুলোর মতো কোথায় উড়ে গেল, কেউ জানল না। বুকের ওপর থেকে সমস্ত গুরুভার নেমে গিয়ে তারা যে ফের এমনভাবে সহজ হতে পারবে, বেঁচে উঠতে পারবে—কে জানত!

রঘুনাথ যখন ঘুম থেকে জাগল, তখন প্রায় বিকেল। তাকিয়ে দেখল মালতী বিছানা থেকে কখন উঠে গেছে। কবজি-ঘড়িটার দিকে একপলক তাকিয়ে রঘুনাথ সবে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতে যাচ্ছে, এমনসময় মালতী প্রায় অগোছালো মূর্তিতে ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রথমটা রঘুনাথ দেখতে পায়নি স্পষ্ট করে, তাই বুঝতেও পারেনি। মালতী যে ভয় পেয়েছে, মুখ-চোখ অস্বাভাবিক করে ছুটে এসেছে, এ-কথাটা যখন টের পেল, তখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। কিন্তু গা-হাত-পা থেকে-থেকে দুর্বলতায় কাঁপছে। ঠোঁট দুখানা তখনও আড়ষ্ট, গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ।

বিছানার একপাশে বসে পড়তেই রঘুনাথ ব্যগ্র কণ্ঠে শুধোল, কী হয়েছে?

মালতী স্পষ্ট করে কয়েক মুহূর্ত কথা কইতে পারল না।

রঘুনাথ আবার বলল, তুমি ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে। কিন্তু এ-বাড়িতে তো আমরা ছাড়া আর কেউ নেই! মালি অবশ্য আছে ওপাশের বাড়িটাতে, কিন্তু সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষ এ-বাড়ি দুখানার ত্রিসীমানায় নেই—।

ঘুমের ঝোঁকটা রঘুনাথের কথার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল। মালতী ভীত গলায় বলল, আছে।

কে?—রঘুনাথ সজাগ হয়ে বলল, কোথায়?

মালতী আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে বলল, কে তা জানি না, তবে সে আছে, নিশ্চয়ই আছে। এই বাড়িতেই আছে।

শেষ দিকটায় মালতী প্রায় ফিসফিস করে কথা কইল।

রঘুনাথের মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, তবু জোর করে বলল, কী যা-তা বলছ মালতী, শান্ত হও, একটু সুস্থির হয়ে বোসো—।

কথাগুলো মালতীর কানে গিয়ে পৌঁছল কি না বলা শক্ত।

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে তুমি! আমি তো এখানে আসতে চাইনি। আমার ভুলে যাওয়া দুঃস্বপ্ন আবার একদিন এমনি করে—।

বাইরে একটা শব্দ হল দড়াম করে। সঙ্গে-সঙ্গে রঘুনাথ একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মালতী আর মুখ তুলল না। দুটি হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল।

বাইরে তখন পার্বত্য বিকেলের রহস্য নেমেছে। নানা দিক থেকে নানা-কোণ-করা ছায়া এসে ঘিরে ফেলেছে 'প্রবাস নিবাস'কে, একটা জটিল ফাঁসের মতো। সূর্য চলে গেছে পাহাড়ের কাঁধের ওপারে, তালগাছের মাথাগুলো তখনও রাঙা।

কতটা সময় কেটেছে মালতীর হুঁশ নেই, রঘুনাথের ডাকে তার খেয়াল হল। হাতে একখানা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে রঘুনাথ সহাস্যে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভুল! কোনও ছায়া-টায়া দেখে আচমকা ভয় পেয়েছিলে হয়তো, আসলে কেউ নেই! ওপরে, নীচে চারখানা ঘর, মায় ছাদ পর্যন্ত আমি খুঁটিয়ে দেখে এসেছি। মানুষ দূরে থাক, একটা বেড়াল পর্যন্ত নেই। খুব যা হোক!—কথা শেষ করে রঘুনাথ হাসল।

ভিজে ঠান্ডা চোখ তুলে মালতী আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, তাই হবে। কেউ না, কিছু না। সব ভুল।

নিশ্চয়ই! এখনও সন্দেহ আছে নাকি তোমার?—রঘুনাথ হা-হা করে হেসে উড়িয়ে দিল ব্যাপারটাকে।

মালতীর কেমন একটু খটকা লাগল। রঘুনাথ যেন খামোকা জোর করে হাসছে, একটু যেন অস্বাভাবিক গলায়।

রাত্রে যখন 'প্রবাস নিবাস'-এর শোওয়ার ঘর থেকে শেষ আলোর বিন্দুটুকুও মুছে গেল, ঘড়ির ভাষায় রাত তখন বড়জোর সাড়ে আটটা। কিন্তু এই পাহাড়ি অঞ্চলে রাত্রির নিজের ভাষা তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর। বাইরে হাওয়া মাঝে-মাঝে তালের মাথায় থরথর শব্দ তুলছে। ইউক্যালিপটাসের একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

বালিশের ওপর মাথাটা একটু উঁচু করে ধরে রঘুনাথ বলল, দেখতে পাচ্ছ?

মালতী চুপ করে শুয়েছিল। চুড়িগুলো ঠুনঠুন করে বেজে উঠল। কাঁপা গলায় মালতী জেগে উঠল : কী?

রঘুনাথ একটু আহত হল। মালতীর মনটা এমন আনমনা হয়ে গিয়েছে সে কি সামান্য একটা ভয়ে, না অন্য কিছু আছে! এই অন্ধকার ঘরের মতোই সে চুপ করে শুয়ে আছে, কিন্তু তার মনের মধ্যে হয়তো প্রতি মুহূর্তে কত কী ঘটে যাচ্ছে। পুরোনো কোনও স্মৃতি—সুখের হোক, দুঃখের হোক, তাকে হয়তো সহসাই অবশ করে ফেলেছে।

এই কথাগুলো রঘুনাথ যতক্ষণ ভাবছিল, মালতী ততক্ষণে অনেকখানি সরে এসেছে রঘুনাথের কাছে।

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।—বিবর্ণ গলায় রঘুনাথকে সে প্রশ্ন করল, কই?

রঘুনাথ আলগোছে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বলল, পাহাড়ে আগুন দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?

মালতী এইবার দেখল, আকাশের গায়ে কে যেন আগুনের মালা পরিয়ে দিয়েছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাহাড় স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোনওভাবেই দেখা যাচ্ছে না। শুধু অনুমানে বোঝা যাচ্ছে তার এক কোটি থেকে অন্য কোটি পর্যন্ত একটা বিরাট আগুনের রেখা ঢেউ খেলে গেছে। কিন্তু তারপরেই—।

হঠাৎ মালতী আরও ঘন হয়ে এল রঘুনাথের বুকের মধ্যে। রঘুনাথ অবাক হল। এক মুহূর্তের জন্য মালতীকে একটা মরা পাখি বলে মনে হল নরম পালকের মতো শরীরে যেন কোনও স্পন্দন নেই, উত্তাপ নেই, কোনও শিহরন নেই। কিন্তু তারপরেই মনে হল, না, শীতল পিচ্ছিল নিরুত্তাপ পলায়ন নয়, আরও কিছু, মানে আরও অনেক কিছু যেন। অন্ধকারের যেমন সময়-সময় অসংখ্য মানে হয়। এক মুহূর্ত আগে অনেক কিছু দেখতে পায়নি, হঠাৎ যেন রহস্যের পরদাটা বাতাসে একটু সরে গেছে, আর—।

কিন্তু তারপরেই মালতীর মনে হল, আগুনের সেই বিরাট ঢেউ-খেলা রেখাটা মৃত্যুর রং হতে পারে, কিন্তু তা মৃত নয়। তার ধিকিধিকি স্পন্দনটা যেন স্পষ্ট চোখে পড়ল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল, শুকনো পাতায় কেউ আগুন লাগায়নি, একটা বিরাট পাইথন যেন তার আগুনের শরীরটা নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে একটু-একটু করে এগিয়ে চলেছে তার শিকারের দিকে, নির্মম মৃত্যুর মতো। মালতী মিত্তিরের অতীতটার ওপর দিয়েও যেন একটা হিংস্র সরীসৃপ অসহ্য আক্রোশে ছুটে আসছে। ভুলে যাওয়া একটি রাত্রিকে যেন মনে পড়িয়ে দিয়েই এবার আর থামবে না, তার সুন্দর স্বপ্নটাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ঝাড়বাতির মতো নিভিয়ে দেবে। দুটি কালো হাত অন্ধকারে সাঁড়াশির মতো মালতীর কণ্ঠরোধ করতে এগিয়ে আসছে। বাঁচা আর হল না। ছোট্ট হলেও মালতীর একটা অতীত ছিল, সেটাকে আর যে-ই ভুলুক, সে ভোলেনি।

আর, এক মুহূর্ত পরে রঘুনাথের মনে হল, একটা অস্পষ্ট কান্নার মতো মালতী তাকে জড়িয়ে আছে।

দিনের পর দিনের ইতিহাস অনেকটা এইরকম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একরকম কেটে যায়, কোনও কিছু নেই। মালি জল তুলে দিয়ে যায় ইঁদারা থেকে। রঘুনাথ টুকিটাকি কাজ সারে, কিংবা একটু বাইরে ঘুরে আসে। মালতী স্নান সেরে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। এই পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। ভয় নেই, ভাবনা নেই। তারপর যেই বিকেল হয়ে এল, পাহাড় থেকে ছায়া নামল, 'প্রবাস নিবাস'-এর ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার, নির্জন প্রান্তর জুড়ে নানারকম রহস্যময় শব্দ উঠতে থাকে, বাতাস আরও খেয়ালি হয়ে ওঠে, আর ঠিক

তখনই মালতী ভয় পায়। ঠিক তখনই রঘুনাথের এই বাড়ি ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, মালতীকে ছেড়ে কোথাও এক পা-ও যাওয়া চলবে না। মালতী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও, তার মুখের হাসিগুলো ফিকে হতে-হতে মিলিয়ে আসবে, বুকের ওঠা-নামা বাড়বে। মনে হবে, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে সে যেন কীসের প্রতীক্ষা করছে, কে যেন আসবে, কে যেন আসছে। সামান্য শব্দেও চমকে উঠবে তখন।

একটি শিক্ষিত মেয়ে এরকমভাবে ভয় পাবে রঘুনাথ কি আর আগে জানত! আর জানলে কি আর দীনুকে পীড়াপীড়ি করে তাদের দূর প্রান্তের বাড়িখানা জোগাড় করত! দীনুদের বাড়িখানা পড়েই ছিল, দীনু সেজন্য আপত্তি করেনি। করেছিল যেজন্য সেটা আজকে একটু যেন অনুমান করতে পারে রঘুনাথ। বিদায় নেওয়ার সময় মালতীর অলক্ষ্যে প্ল্যাটফর্মের কিনারে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ভাই, আমাকে ভুল বুঝিসনে কিন্তু—।

ভেবেচিন্তে অনেক দ্বিধার পর হয়তো দীননাথ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় গাড়ি স্টার্ট নিল। রঘুনাথের পক্ষে আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। এখন যেন মনে হয়, বাড়িটার সম্বন্ধেই তার কিছু বলবার ছিল, এবং সেইজন্যই সে প্রথমদিকে আপত্তি করেছিল তারপর মালির ব্যবহারটাও একটু আশ্চর্যের। দু-খানা বাড়িরই দেখাশোনার ভার তার ওপরে, তবু 'প্রবাস নিবাস'-এ সে থাকে না। পাশের বাড়িটা এ-বাড়ির তুলনায় যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছে, রং এখন ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, ইটের গাঁথনির জায়গায়-জায়গায় জরার চিহ্ন।

প্রথমটা রঘুনাথ ভেবেছিল বাড়িটার কোনও খারাপ ইতিহাস আছে, হয়তো কারও অপমৃত্যুর জন্য কিংবা অন্য কোনও কারণে। সারা দুপুর ধরে ক'দিন তন্নতন্ন করে দেখেছে বাড়িটার আনাচে-কানাচে, নির্জনতম কোণগুলোতে আচমকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে যদি কিছুর দেখা পায়। কোনও ছায়া কিংবা কোনও অপমূর্তির—কিন্তু পায়নি। বাইরে দমকা বাতাস মাঝে-মাঝে অদ্ভুত শব্দ করেছে, জুতো পায়ে একটি মানুষের চলে বেড়ানোর মতো, দরজার কপাটে আস্তে-আস্তে ধাক্কা দেওয়ার মতো। সঙ্গে-সঙ্গে শিকারি বেড়ালের মতো লাফিয়ে বাইরে বেরিয়েছে রঘুনাথ, কিন্তু কোথায় কী! একটা-আধটা শুকনো শালপাতা হয়তো উড়ে এসেছে দূরের বাতাসে।

কাউকে দেখতে পায়নি সত্যি, তবু তার মনে হয়েছে মালতীর পক্ষে কিছু একটা দেখে ফেলা কি নিতান্তই শক্ত? তার নিজেরই মনে হয়েছে, আজকাল মনে হচ্ছে, কেউ হয়তো সত্যিই আছে। এই বাড়ির চারপাশে সে পাগলা হাওয়ার মতো পাক খেয়ে বেড়ায়। এবং সে রঘুনাথকে চোখে-চোখেই রাখে, কিন্তু রঘুনাথ তাকে দেখতে পায় না, একটা অস্বস্তি অনুভব করে। একটা কালো পিঁপড়ে যেন পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে অস্পষ্ট পায়ে হেঁটে বেড়ায়, এমনি একটা শিরশির ভাব। যেন দেওয়ালগুলো তার দিকে চেয়ে আছে, যেন ওই পঞ্চাশ গজ দূরের বোবা বাড়িটা তার দিকে বন্দুকের একটা নল উঁচিয়ে আছে। খামবন্ধ চিঠির মতো ওর দোতলার বন্ধ জানলাগুলোর পিছনে যেন একটা আশ্চর্য খবর অপেক্ষা করে আছে। সে-খবর ভয়ঙ্করও হতে পারে।

সত্যি, ঘরে বসে থেকে-থেকে রঘুনাথের মস্তিষ্কও অসুস্থ হয়ে উঠেছে ধীরে-ধীরে। নইলে নিজের ঘরের দেওয়াল আর জানলাগুলোকে তার সন্দেহ হয়! পাশের ওই নির্জন দোতলাটাকে অবিশ্বাস হয়! সত্যি, ভয় জিনিসটা এমনিই সংক্রামক, একজনের মন থেকে আর-একজনের মনে সে কত সহজে চলে আসে।

রঘুনাথ জোর করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। স্টেশনে তাকে যেতেই হবে, কলকাতার সংবাদ জোগাড় করতে হবে, খবরের কাগজ চাই। সামান্য একটা ভয়ের আড়ালে আসল সমস্যাটাই চাপা পড়ে রয়েছে। ওদিকে কলকাতার মেজাজ এতদিনে কীরকম দাঁড়িয়েছে কে জানে। একটা ব্যক্তিগত কলমের বিজ্ঞাপন। ব্যস, তারা আবার ফিরে যাবে। এই বানপ্রস্থ আর ভালো লাগে না। কলেজ স্ট্রিটের সন্ধ্যাগুলো একটা বহুদিনের বহুমুখের বিচিত্র অ্যালবামের মতো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আবার শূন্য হৃদয়ে স্টেশন থেকে ফিরে এল রঘুনাথ। খবরের কাগজে কোনওই সিগন্যাল পড়েনি! আবার অনিশ্চিত প্রতীক্ষা, অনির্দিষ্ট কাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকালয়ের বাইরে ধূসর রুক্ষ অর্থহীন মাঠের মধ্যে।

হঠাৎ থমকে যাওয়া ট্রেনের বগির মতো বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। লাল গোলাপি রঙের আস্তর লাগা বিরাট সস কাগজের মতো স্তব্ধ আকাশটার নীচ দিয়ে যেতে-যেতে অসম্ভব শূন্য মনে হল নিজেকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সেই করুণ, বিষণ্ণ, ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা। একটা বোবা আক্ষেপ অন্ধ কান্নায় মোচড় দিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। সমস্ত আকাশ-বাতাস আর ধূ-ধূ প্রান্তরের বুকের মধ্যেও যেন আর-একটি বিশাল কান্নার জাগরণ, আর-একটি অসহ্য বিবর্ণ দগ্ধ অনুভূতি। কে যেন কাকে ছিনিয়ে নিল, মুমূর্ষু আলোকে যেমন করে অন্ধকার লুট করে নেয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকেই রঘুনাথ চমকে উঠল ভূত দেখার মতো। কয়েকবার বুক ভরে ঘ্রাণ নিল সাবধানে। হ্যাঁ, আবার সেই গন্ধের রেশটা নাকে আসছে। একটা অদৃশ্য আঁকাবাঁকা রেখায় গন্ধের ক্ষীণ স্রোতটা যেন এই প্যাসেজ দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে, কিংবা ওপর থেকেই ধীরে-ধীরে নেমে এসেছে। কিছুদিন ধরেই এই গন্ধটা বারবার 'প্রবাস নিবাস'-এর চারপাশে হানা দিয়েছে। রাত্রে যখন মালতী আর তার ছায়া জানলার কাচের ওপর একজোড়া কবিতার লাইনের মতো দিঘল হয়ে এক জায়গায় গিয়ে মিলে গেছে, ঠিক সেই সময় বাইরের অন্ধকার থেকে এই আশ্চর্য তন্দ্রাতুর গন্ধটা ভেসে এসেছে, কিংবা তারও কিছু পরে, বিছানায় যখন রাত্রির যবনিকা কম্পমান হয়েছে।

প্রথম-প্রথম ইউক্যালিপটাসের গন্ধ বলে ভুল করত। ধীরে-ধীরে টের পেয়েছে, এই সুগন্ধ নির্যাসটা অনেকগুলি জিনিসের মিশ্রণ। ঠিক কীসের কে জানে! তবে ম্যাক্রোপোলোর গন্ধের মতো খানিকটা, খানিকটা আর-কিছুর। রঘুনাথ নিজে সিগারেট খায় না, কাছে-পিঠে কয়েক মাইলের মধ্যে ওই জাতীয় ধমপায়ীর অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। তবে কি অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস না করে উপায় নেই? কিংবা কোনও নাম-না-জানা, গল্প-না-শোনা বিষধরের নিশ্বাস বলে মেনে নিতে হবে? রঘুনাথ অবশ্য এতটা মাথা আগে কখনও ঘামায়নি। গন্ধটা সে খেয়ালও করত না মন দিয়ে, যদি না মালতী সেদিন ভয় পেত। তার কাগজের মতো ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ প্রশ্ন করেছিল, আবার কী হল? কোনও শব্দ-টব্দ শুনেছ নাকি?

মালতী বিছানার ওপর অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থেকে বলেছিল, কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছ না, মিষ্টি-মিষ্টি?

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রঘুনাথ, তোমার মাথা খারাপ হল নাকি? মেয়েদের মনের কুসংস্কার জন্মে যায় না দেখছি।

প্রতিবাদ করল না মালতী, ক্লান্ত গলায় বলল, বলতে পারো।

রঘুনাথের মনে হল, সে যত সহজে ব্যাপারটিকে নিতে পারছে, মালতী পারছে না। কিন্তু তার এই সর্বক্ষণের ভয়ের কেন্দ্রটা ঠিক কোথায়, তা সে অনুমানও করতে পারবে না। প্রেতাত্মায় রঘুনাথের কোনওকালেই বিশ্বাস ছিল না, তবু কেমন একটা খটকা লাগল গন্ধটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে। ইউক্যালিপটাসের নির্যাস তো এ নয়! এ-যেন খুব পরিচিত অথচ পরিচিত নয় এমন একটা কিছু, যেন দ্বিতীয় একজনের অতি নিকট উপস্থিতি ঘ্রাণের মধ্য দিয়ে অনুভবে পৌঁছচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিল। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে।

কী বলে তোমার সন্দেহ হয়, মালতী? এ-গন্ধ তোমার চেনা?—রঘুনাথ মালতীকে দু-হাতে আকৃষ্ট করে জানতে চাইল।

মালতীর সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল, কথা বলতে পারল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কীসের ভয় তোমার! আমি আছি, আমাকে স্পষ্ট করে বলো।—রঘুনাথ মৃদু তীকষ্ন গলায় কথা বলল।

আমি আর-এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছি না—দমবন্ধ গলায় মিনতি করল, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো।

রঘুনাথের কপালের পাশটা দপদপ করে উঠল, মালতীকে ধীরে-ধীরে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপরে ব্যালকনিতে যেতে আর কতক্ষণই বা সময় লেগেছে! সেই অবয়বহীন বিশাল অন্ধকারের মধ্যে নীচে ঝুঁকে তাকিয়ে রঘুনাথের মনে হল, একটি লাল আগুনের স্ফুলিঙ্গ বারকয়েক লাফিয়ে তালবীথির

মধ্যে মিলিয়ে গেল। মনে হল, পাহাড়ের যেখানে শুকনো পাতায় পাহাড়িরা আগুন লাগিয়েছে, সেখান থেকে ছিটকে আসা রক্তকণিকা আবার সেখানেই ফিরে গেল। আঃ, হাতে যদি একটা টর্চ থাকত এ-সময়!

শিকারি কালপুরুষ আকাশপ্রান্তে জ্বলজ্বল করছে। রঘুনাথ নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে ঘরে ফিরে এল। মালতী আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল, কিছু দেখলে?

রঘুনাথ ঝাপসাভাবে মাথা নেড়ে জানাল, না।

আর, আশ্চর্য, গন্ধটা তখন থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছে না। মালতীর মুখের রংও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

আমি জানতুম।—মালতী ব্যাপারটার ওপরে যেন পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটার ওপরে সত্যিই কি আর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল!

কিন্তু আজ রঘুনাথ সত্যিই ভয় পেয়েছে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়নি তো? মালতীর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন!

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই রঘুনাথ আর্তনাদ করে উঠল : মালতী! কী হয়েছে তোমার! মাটিতে শুয়ে আছ কেন!

কেউ উত্তর দিল না। ঘরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে মালতীর অনড় দেহটা সেই একইরকম করুণভাবে পড়ে থাকল।

রঘুনাথ রক্তহীন শূন্যতা নিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে দেশলাই খুঁজল। যে-দুঃসংবাদ তার জন্য অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে, সত্যি বলতে কী, তাকে আবিষ্কার করতে না পারলেই সে বেঁচে যেত। মালতীকে ছাড়া সে কলকাতাকে যে ভাবতেই পারে না। আলো জ্বেলে অবশ্য বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ততটা গুরুতর কিছু নয়। ভীষণরকম ভয় পেয়ে মালতী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে মাত্র।

কুঁজোর ঠান্ডা জলের দু-চার ঝাপটা মুখে-চোখে পড়তেই মালতী চোখ মেলে তাকাল। রঘুনাথকে দেখতে পেয়ে তার মুখে এক টুকরো রুগ্ন হাসি ফুটে উঠল ধীরে-ধীরে।

কী হয়েছিল, মালতী?—রঘুনাথ মালতীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আবছা গলায় মালতীর উত্তর এল, ভয় পেয়েছিলুম।

আর কিছু না!—মুহূর্তের জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল রঘুনাথের মনটা,—শুধু ভয়?

হ্যাঁ, শুধু-শুধু।—পাখির গলার ক্ষীণ উত্তর এল, ম্লান হাসির সঙ্গে।

রঘুনাথ গর্জে উঠল, কে?

ফিনকি দিয়ে কান্না বেরোল মালতীর গলা দিয়ে, জানি না।

আর সেইসঙ্গেই দরজার পাশের ছায়াটা ভাঙা-ভাঙা স্বরে উত্তর দিল, আমি, বাবুজি।

মালির ছায়া দেখেই রঘুনাথ অবশ্য চেঁচিয়ে উঠেছিল, এবার শান্ত গলায় বলল, কী ব্যাপার!

আপনার চিঠি আছে।

খামটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত আঙুলে ছিঁড়ে ফেলল রঘুনাথ।

দীননাথের চিঠি। মালতীর বাবা মত পরিবর্তন করেছেন, তারা যেন পত্রপাঠ ফিরে আসে।

মালি ফিরে যাচ্ছিল, রঘুনাথ ডাকল, বাঁশদেও! আমরা আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরে যাব। একটা রিকশা ডাকতে পারো?

বাঁশদেও ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখের ওপর একসঙ্গে বিস্ময় এবং আক্ষেপ ফুটে উঠল।

ইস, একটু আগে যদি জানতাম, বাবুজি, এই রিকশাটাকেই বলে দিতাম। এখন আবার এই অন্ধকারে তিন মাইল পথ—।

কোন রিকশাকে বলে দিতে, বাঁশদেও?—রঘুনাথ তার চামড়ার সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল।

কেন, পাগলাবাবু যে চলে গেলেন একটু আগেই।

পাগলাবাবু কে?—রঘুনাথ ফিরে তাকাল।

আপনি তাঁকে দেখেননি, বাবু?—বাঁশদেও কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ও-বাড়িতে থাকতেন তিনি।—বলে সে পাশের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল।

রঘুনাথ এইবার সত্যি করে চমকে গেল।

মাসিক রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৮৭



আরামকেদারায় বসে গোয়েন্দাগিরি

শোভন সোম

ইদানীং এ-দেশে নানা গোয়েন্দা-সংস্থা গড়ে উঠেছে। রীতিমতো ঘর সাজিয়ে কর্মচারী নিয়োগ করে এঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তথাপি এ-দেশের মানুষদের মধ্যে তদন্ত-মনস্কতা তেমন লক্ষণীয়ভাবে গড়ে ওঠেনি। এ-দেশে এখনও তদন্তের ব্যাপারে সাবেকি পুলিশি ব্যবস্থাই চলেছে আর আদালতের রায়কেই শেষ বলে মেনে নেওয়া হয়। গোয়েন্দা-সংস্থাগুলিকেও প্রকৃত তদন্তের কাজে ডাকা হয় না। এদের মারফত রক্ষী, প্রহরী ইত্যাদিই বিভিন্ন দফতর তলব করে থাকেন। কদাচিৎ কোনও ধনী মহিলা তাঁর সন্দেহভাজন স্বামীর কিংবা কোনও স্বামী তাঁর সন্দেহভাজন স্ত্রীর কার্যকলাপের ওপর নজরদারির কাজে এঁদের লাগিয়ে থাকেন।

যেখানে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিরই এই হাল, সেখানে শৌখিন গোয়েন্দাদের হাল সহজে অনুমেয়। সুতরাং শুভ চৌধুরীর হাতে গত ছ'মাস কোনও কাজ নেই। বই পড়ে, দাবা খেলে, আড্ডা মেরে, সিনেমা দেখে, বিছানায় যখন-তখন শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিয়েও সময় কাটছিল না। এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী আসবেন-আসবেন করছেন।

গল্পে যা ঘটে থাকে, শুভর ক্ষেত্রেও তাই হল। একদা প্রাতে একটি বাহক-চালিত লাল মারুতি তার দোরগোড়ায় এসে থামল। কলকাতায় এই হালেও কালো অ্যাম্বাসাডার রাস্তা দাপিয়ে বেড়াত। অতি সম্প্রতি কালো অ্যাম্বাসাডারকে পিছনে ফেলে তার জায়গা দখল করেছে লাল মারুতি।

লাল মারুতি থেকে সাফারি সুট পরা, দামি জুতো পরা, স্থূল চেহারার এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। শুভ জানলা দিয়ে সবই দেখছিল। তার ধারণা ঠিকই ছিল। ভদ্রলোক শুভর দরজার ঘণ্টিই বাজালেন। দরজা খুলে দিল শুভই।

মিস্টার চৌধুরী আছেন?

হ্যাঁ। আমিই। আসুন।

নমস্কার।

নমস্কার। আসুন ভেতরে।

শুভ দেখতে পেল ভদ্রলোকের আট আঙুলে গোটাকয়েক আংটি। নবগ্রহের হেন গ্রহ নেই যার অধিষ্ঠান এই ভদ্রলোকের আঙুলে নেই। জামার নীচে হয়তো নবগ্রহের তাবিজও দেখা যাবে, কিংবা কোমরে স্বপ্নাদ্য ঘুনসি থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। ভদ্রলোক বিলক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্রে, জ্যোতিষ্কে, বারবেলায়, পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করেন, পথে আসতে-যেতে সব মন্দিরের উদ্দেশে, এমনকী গাছের নীচে বসানো সব সিঁদুর-লেপা পাথরের উদ্দেশেও কপালে হাত ঠেকান। শুভ এ-ও অনুমান করে নিল যে, ইনি নির্ঘাত একজন ব্যবসায়ী, এঁর সুখের ঘরে আগুন লেগেছে, তাই তিনি শুভর মতো একজন গোয়েন্দার দ্বারস্থ। সাধারণত ব্যবসায়ী মানুষেরা থানা-পুলিশের বাইরে তাঁদের ঝুটঝামেলা মিটিয়ে নেওয়া পছন্দ করেন। ভাবনাগুলিকে শুভ মনে-মনে দাবার ঘুঁটির মতো সাজাচ্ছিল এবং তার একটাও বেচাল ছিল না।

ভদ্রলোক সোফায় বসে পকেট থেকে বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট খুলে শুভর দিকে এগিয়ে দিলেন।

শুভ বলল, আমি ব্র্যান্ড চেঞ্জ পছন্দ করি না। ধন্যবাদ।

ও, আই সি।

শুভ মৃদু হাসল।

ভদ্রলোক পকেট থেকে জাপানি লাইটার বার করলেন। এটা টিপলে আগুনও জ্বলে বাজনাও বাজে। বাচ্চারা যেমন নতুন খেলনা দেখলে হাত বাড়ায়, তেমনি এক ধরনের উঠতি বড়লোক যা নতুন দেখেন তাই কেনেন। কে সাবেকি বড়লোক, মানে ধনী, আর কে উঠতি বড়লোক, তা এই স্বভাব দেখেও চেনা যায়। উঠতিদের মধ্যে সৌন্দর্যহীন স্থূল দেখানে-স্বভাব বা ছেলেমানুষি রীতিমতো হাস্যকর।

হ্যাঁ, বলুন।

আমি দেবেন সাধুখাঁ।—ভদ্রলোক বুকপকেটে রাখা দামি ওয়ালেট থেকে এমবস-করা-অক্ষরে ছাপা দামি ভিজিটিং কার্ড বার করে শুভর দিকে এগিয়ে দিলেন : ছোটখাটো ব্যবসা করি, এই এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবসা। জানেনই তো আজকাল ব্যবসায় কত মন্দা!

এই ব্যাখ্যানা শুভর জানা, তাই ভদ্রলোককে আর ভনিতার অবকাশ না দিয়ে বলল, তা আমার কাছে কী প্রয়োজন, সেটা বলুন।

হ্যাঁ, সেই কথাতেই তো আসছি। জানেনই তো, আজকাল ব্যবসায় কত মন্দা আর সেই সঙ্গে রেষারেষি...কে কাকে কী করে ল্যাং মারবে...।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে কী প্রয়োজনে আসা, সেটা খোলসা করুন।

একেই ব্যবসা ভালো চলে না। কলকাতায় এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম তেমন চলেও না, তার ওপর যদি আমাকে, বিশেষ করে আমাকে, পেটে লাথি মারার ষড়যন্ত্র হয়, তা হলে কী করে চলে বলুন তো!

শুভ এ-ধরনের লোককে চেনে। এরা সহজে আসল কথায় পৌঁছতে চায় না। তাই সে বিরক্ত না হয়েই বলল, আমি মশাই ব্যবসার কিছু জানি না। আদার ব্যাপারি, তাই আমার সালিশি আপনার কাজে লাগবে না। আমার কাছে আগমনের হেতুটা বলে ফেলুন তো!

আপনি কি ব্যস্ত আছেন নাকি?

না, ঠিক তা নয়। আপনি একটু বাদে এলেই আমাকে পেতেন না। আমি দাবা খেলতে বেরোতাম। যা-ই বলুন, বুদ্ধির বেড়ে খেলা।

আমার যে আপনার সঙ্গে ভীষণ জরুরি কথা আছে!

সেজন্যেই বলছি, ভীষণ জরুরি কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

ব্যাপারটা আমার কনসার্নের জুনিয়ার এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে। সেল-এর ব্যাপারটা তারাই দ্যাখে। তারাই ব্যবসার ঘুঁটি। এখানে-ওখানে ছোটে, অর্ডার আনে, প্ল্যান্ট-এর তদারকি করে, আফটার সেলস সার্ভিস দেখাশোনা করে। প্রথম ব্যাপারটা ঘটে ঠিক এক বছর আগে। বেলঘরিয়ায় একটা বড় কনসার্ন থেকে বেশ বড় একটা অর্ডার নিয়ে ফেরবার পথে আমাদের জুনিয়ার এঞ্জিনিয়ার ভূনাথ সরকার ট্রেনে কাটা পড়েন—।

ওয়েট এ মিনিট। আপনার এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবসা, এত বড় সব অর্ডার পান, আর তার কোনওটাই নিশ্চয়ই লাখের নীচে নয়। আর আপনার এঞ্জিনিয়াররা অর্ডার আনতে যান বাসে-ট্রেনে! সে কী মশাই! না মশাই, আপনার কী কেস, তা না জানলেও আপনার কেস আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে দাবা খেলে দিন কাটানো ভালো।

ভুল বুঝবেন না, মিস্টার চৌধুরী। তাদের আমরা ট্র্যাভেলিং অ্যালাওয়েন্স দিই। ট্যাক্সিতেই তাদের যাতায়াত করার কথা। সেদিন কোনও কারণে ভূনাথ সরকার ট্রেনে ফিরছিলেন। আমার ধারণা, কেউ এর পেছনে ছিল যার পরামর্শে ভূনাথ সরকার ট্যাক্সিতে না গিয়ে টেন ধরতে ছুটেছিলেন। বেলঘরিয়ায় তো দেখেছেন, কেউ ওভারব্রিজ ব্যবহার করে না, আর কর্তৃপক্ষও ওই বিপজ্জনক ওভারব্রিজ মেরামত করেন না। দলে-দলে লোক প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও লাইন পারাপার করে। ভূনাথ সরকার রীতিমতো স্মার্ট তরুণ ছিলেন। আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস, কেউ তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে, যার ফলে উনি হোঁচট খেয়ে লাইনে পড়ে যান আর উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়তেই একটা থ্রু টেন ওঁর ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যায়।

হুঁ, তারপর?

তার পরের ঘটনা ঘটে তার ঠিক চারমাস বাদে। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

তার মানে দ্বিতীয় মৃত্যু?

মৃত্যু কী মশাই, আগেরটার মতো এটাও সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড!

যেমন?

অঙ্কুর দত্ত সবে যাদবপুর থেকে পাশ করে ঢুকেছিলেন। আমি জানতাম, অত চৌকস ছেলে ডি. কে. এস. এয়ার কন্ডিশনিং-এ বেশিদিন থাকার পাত্তর নয়—নেহাত মনের মতো চাকরি পাচ্ছিলেন না বলে ছিলেন। বেশিদিন থাকবেন না তা জানতাম, কিন্তু এভাবে যাবেন, তা তো জানতাম না!

হয়েছিল কী?

ন'টা থেকে দশটার মধ্যেই জুনিয়ার এঞ্জিনিয়াররা অফিসে এসে যান। এসে কফি খান, কাগজপত্র ঠিকঠাক করেন, তারপর সেলসের কাজে বেরিয়ে পড়েন। সেদিন অঙ্কুর দত্ত এসে দেখতে পান ওঁর টেবিলে সুদৃশ্য কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট রয়েছে। প্যাকেটের ওপরে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো একটা ছোট চিরকুটে টাইপ করে লেখা ছিল, বার্থ ডে সারপ্রাইজ ফ্রম এ নিয়ার ওয়ান—অতি নিকট একজনের কাছ থেকে জন্মদিনের চমক। অঙ্কুর দরোয়ান চাপরাশিদের ডেকে জিগ্যেস করেন, এটা কে রেখে গেছে। কিন্তু ওরা বলে, তেমন কাউকে ওরা দেখেনি। আর অফিসে তো কত লোকই যাতায়াত করে।

আশপাশে আর কোনও জুনিয়ার এঞ্জিনিয়ার ছিলেন না?

ছিলেন, অঙ্কুর দত্ত তাঁদেরও জিগ্যেস করেন। তাঁরাও জানতেন না, কে ওটা রেখে গেছে। তাঁরা ওটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশাও করেন। কিন্তু কৌতূহল বড় বালাই। অঙ্কুর দত্ত প্যাকেটটা খোলেন। সেটা আলগা করে মোড়া একটা হালকা কাগজের বাক্স। তারপরেই সেই কাণ্ডটা ঘটে।

কী কাণ্ড!

বাক্সে ছিল একটা আকাসানো কালকেউটে, জীবন্ত বিষধর। বাক্সের ঢাকনা খোলামাত্র ওটা অঙ্কুরকে মোক্ষম ছোবল মারে মুখে। বহু চেষ্টায়ও ওঁকে বাঁচানো যায়নি। বেচারা জন্মদিনেই মারা যান। ওঁর বিধবা মায়ের কান্না যদি দেখতেন! আপনিই বলুন, এটা কি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নয়!

হতে পারে। তবে হত্যাকারী অঙ্কুর দত্তর নাড়িনক্ষত্র জানত।

সে-কথায়ই তো আসছি।—দেবেন সাধুখাঁ আর-একটা সিগারেট ধরালেন। লাইটার জ্বালতেই আবার সেই একঘেয়ে বাজনাটা বাজল।—এবার আবার মাস-চারেক বাদে ঘটল তৃতীয় ঘটনাটা। এবারের শিকার হাসান আলি। বেগমপুরের বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে, সবে পাশ করে বেরিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন হাসান। তাঁর কাজের দক্ষতা আর মধুর স্বভাবের তুলনা ছিল না। অত হাসিখুশি তরুণ কেন যে পনেরোতলা থেকে ঝাঁপ

দেবেন, জানি না। ওঁর মনে তেমন কোনও দুঃখ ছিল বলেও শুনিনি। পুলিশি মতে এটা আত্মহত্যার ঘটনা। অঙ্কুর দত্তের ব্যাপারে পুলিশ আমাদের সবাইকে জেরায় জেরবার করেও কোনও কিনারায় পৌঁছতে পারেনি।

তা মোদ্দা কথাটা কী? এই তিনটে মৃত্যু...।

তিনটেই নয় মশাই, আরও একটি।

বাপরে! একটা মৃত্যুর ঠিকুজি মেলাতেই জান কাবার, আপনি যে মশাই, মৃত্যুর মেলা জমিয়েছেন।

ঠিক তাই। বেছে-বেছে আমার কনসার্নের দক্ষ এঞ্জিনিয়ারদের একটির পর একটি এভাবে সাবাড় করার পেছনে কোনও পরিকল্পনা নেই, তা আমি কী করে বিশ্বাস করি! আর পুলিশে আমার আস্থা নেই বলেই তো আপনার কাছে আসা।

পুলিশের কাজ করবে পুলিশ, আমার কাজ আমি। না মশাই, আপনি আজ আমার দাবা খেলাটাই মাটি করলেন। এককাপ কফি হোক।

কফি!

হ্যাঁ। আপনার গল্প হতে-হতে কফি তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবার বলুন চতুর্থ হত্যাকাণ্ডের কথা। এটাই শেষ তো!

হ্যাঁ। এবার খুন হন আর-এক এঞ্জিনিয়ার। চন্দ্রদেব সাকসেনা। ইউ. পি.-র লোক। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন। নানা চাকরির পর আমাদের এখানে আসেন। ইনি বিহার ইউ. পি.-র বেশ কয়েকটা কোল্ড স্টোরেজের কাজ জোগাড় করেছিলেন। সাতদিন আগে ইনি নিজের বাড়িতে খুন হন।

কীভাবে?

হত্যাকারী তাঁকে পিস্তল দিয়ে খুন করে। বেনম্বর, বেলাইসেন্স পিস্তল ওঁর বাঁহাতের কাছে টেবিলে পাওয়া যায়। বাড়িতে বৈঠকখানায় বসে উনি লেখাপড়া করছিলেন। সামনের দরজা খোলা ছিল। লোডশেডিং ছিল। গুমোটের সন্ধে। তাই বোধহয় দরজা খোলা রেখেছিলেন। টেবিলে কাচের বাতি ছিল। সেই অবস্থায় চেয়ারে বসে থেকেই খুন হন।

আর পিস্তলটা?

ওটা ওঁর বাঁহাতের কাছে টেবিলে ছিল। গুলি ওঁর বাঁ-চোয়াল ভেদ করে খুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। উনি ন্যাটা ছিলেন না। হত্যাকারী নিশ্চয়ই ন্যাটা। তাই যাওয়ার আগে স্বাভাবিকভাবেই পিস্তলটা ওঁর বাঁ-দিকে ফেলে রেখে চলে যায়।

তা আমার কী করণীয়?

পরপর চারজন বীভৎসভাবে খুন হওয়ায় আমার ব্যবসা লাটে উঠেছে। বাকি চারজন জুনিয়ার এঞ্জিনিয়ার চাকরি ছাড়ার নোটিস দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমার সঙ্গে ব্যবসায় পেরে উঠছে না বলে সূরজপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালা একে-একে আমাদের এঞ্জিনিয়ারদের খতম করে বাকিদের ভয় দেখাচ্ছে, যাতে আমাদের কনসার্নে লালবাতি জ্বলে, আর ও চুটিয়ে ব্যবসা করে।

আপনার এই ধারণা হল কী করে?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে দেবেন সাধুখাঁ বললেন, একটা প্যাটার্ন লক্ষ করছেন না? ঠিক চারমাস পর-পর এক-একজন দক্ষ কর্মীকে এভাবে হত্যা করার পেছনে পরিকল্পনা না থেকে পারে? আপনি তো মশাই, একজন নামি গোয়েন্দা!

তা বটে, তবে সন্দেহের একটা পাকা ভিত থাকা চাই। নড়বড়ে ভিতে দাঁড়ানো সন্দেহ টেকে না।

আপনাকে এই কেসটা নিতেই হবে। হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে আপনি আমাকে বাঁচান। আপনাকে আগাম পাঁচ হাজার টাকা আমি দিয়ে যাচ্ছি। নিষ্পত্তি হলে আপনার যোগ্য ফিজ অবশ্যই আমি দেব।

দেবেন সাধুখাঁকে ওয়ালেট খুলে নোটের তাড়া বার করতে দেখে শুভ বলল, আমার মশাই, সাদা ব্যবসা। তাড়া-তাড়া নোট ওভাবে দেবেন না। আপনি বরং আমাকে চেকেই টাকাটা দিন।

ভদ্রলোক একটু হতচকিত হলেও পরে হেসে বললেন, বেশ। তাহলে আপনি কেসটা নিচ্ছেন। আমাকে বাঁচালেন, মশাই!

চেক হাতে নিয়ে শুভ বলল, আপনার ওই চার এঞ্জিনিয়ারের নাম-ঠিকানা-বৃত্তান্ত আমাকে লিখে দিয়ে যান, কিংবা আজই পাঠান। আর-একটা কথা, আমার তদন্ত চলাকালে অহেতুক খোঁচাখুঁচি করবেন না। মনে রাখবেন, আমার সন্দেহভাজনদের মধ্যে কিন্তু আপনিও পড়তে পারেন।

সে কী?—দেবেন সাধুখাঁ বিষম খেলেন।

হ্যাঁ, তাই। আপনার নিজেরও তো লালবাতি জ্বালার কোনও মোটিভ থাকতে পারে, কিংবা এরা সরে গেলে আপনিও লাভবান হতে পারেন।

মানে! কী বলছেন মশাই! তাহলে আমি আপনার কাছে ছুটে আসব কেন?

অপরাধীরা নিজেদের নিরপরাধ দেখাবার জন্যে এরকম করে থাকে, যাতে তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

দেবেন সাধুখাঁর হতবুদ্ধি অবস্থা দেখে শুভ জোরে হেসে উঠল, দুর মশাই, আপনি এত ভিতু!

নিরঞ্জন সেনমজুমদার এখন লালবাজারে মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে আছে। শুভর ফোন পেয়েই নিরঞ্জন বলল, কেউ হারিয়েছে নাকি রে?

শুভ বলল, কলকাতায় রোজ এত বেশি লোক হারায় যে, তোর বোঝার ওপর আমি শাকের আঁটি চাপাতে চাই না। ভয় নেই। তোর এক্তিয়ার না হলেও, একটা ব্যাপারে তোর সাহায্য চাই।

যথা?

ছ'জন লোকের নাড়িনক্ষত্রের সন্ধান। দুজন জীবিত আর চারজন মৃত। একটা কেস হাতে নিয়েছি, তাই।

তথাস্তু। তালিকাটা পাঠিয়ে দে।

আগে হাতে পেয়ে নিই।

সন্ধের আগেই পিয়ন মারফত দেবেন সাধুখাঁ টাইপ করে মৃত চারজন এঞ্জিনিয়ারের নাম-ঠিকানা-বৃত্তান্ত পাঠালেন। তার একটি কপি করে সেইসঙ্গে দেবেন সাধুখাঁ আর সূরজপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালার নাম যোগ করে শুভ নিরঞ্জনের কাছে গেল।

শুভর ধারণা, সব কাজ পুলিশি সূত্রে হয় না। ফুলবাগানের ফৈজু, শেখ ফৈজুদ্দিনকে ফোনেই পাওয়া গেল। বাইরের জগতে ফৈজু ব্যবসায়ী। তার ব্যবসা ধূপকাঠির। তবে সেটা একটা আড়াল। কলকাতার ভাড়াটে খুনির সমস্ত সুলুকসন্ধান তার হাতে।

ফৈজু, একটা খবর চাই যে।

বলুন, চৌধুরীসাহেব।

জোড়াবাগানের চন্দ্রদেব সাকসেনা। গত সতেরোই নিজের বাড়িতে পিস্তলের গুলিতে মারা গেছেন। এটা কোনও ভাড়াটে খুনির কাজ কি না, যদি হয়ে থাকে, তবে কে তাকে নিয়োগ করেছিল, এই খবরটা যে আমার চাই।

জি পাবেন।

নিরঞ্জনের রিপোর্ট পাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফৈজুরও ফোন এল। সে জানাল, এটা কোনও ভাড়াটে খুনির কাজ নয়। অন্য কোনও খুনির কাজ কি না, তা ওর জানা নেই।

নিরঞ্জনের রিপোর্ট অনুসারে ভূনাথ সরকার ছিলেন সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তাঁর বিয়ের কথা চলছিল। নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারেও কোনও অভিযোগ ছিল না।

অঙ্কুর দত্ত ছিলেন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু অভাব বলে কিছু ছিল না। বাবা কলকাতায় বাড়ি রেখে গেছেন। তার ভাড়া মাসে বেশ মোটা রকমই ওঠে। একলাখ টাকার বিমা করেছিলেন। ওয়ারিশ ছিলেন তাঁর মা। ফুর্তিবাজ, আমুদে ছেলে। দু-একটা প্রেম-ট্রেম করতেন বটে, তবে তার বেশি কিছু না। তবে তিনি ছিলেন খুবই উচ্চাকাঙ্খী। সহকর্মীদের সঙ্গে খুবই সদ্ভাব ছিল। তাঁর প্রেমের কথা সবাইকে বলে বেশ বাহবা নিতেন।

হাসান আলি সবে বিয়ে করেছিলেন তাঁর খালাতো বোনকে। তাঁর স্ত্রী বেগমপুরেই মেয়েদের স্কুলে পড়ান। ওঁদের বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। জমিজমা, পানের বরজ, গাই-গোরু আছে।

চন্দ্রদেব সাকসেনার অতীত ও হাল খুব ভালো ছিল না। যেখানেই চাকরি করেছেন সেখানেই টাকা চুরি, ঘুষ ইত্যাদি মামলায় জড়িয়ে গেছেন। তার ওপর ছিল নানা বদ নেশা। রেসে যেতেন নিয়মিত এবং হেরে আসতেন নিয়মিত। বাজারে তাঁর মোট দেনাই ছিল হাজার পঁচাত্তর। তার ওপর সম্প্রতি তিনি একলাখ টাকার বিমা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান বর্তমান। পৈতৃক বাড়ি তাঁর বাবা পুত্রবধূর নামে লিখে ওঁকে কবুল করে যাওয়ায়, স্ত্রী বাড়িটা স্বামীর হাতে ছাড়েননি কিংবা বিক্রি করেননি।

দেবেন সাধুখাঁ শাঁসালো লোক হলেও খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করেই এতবড় ব্যবসা খাড়া করেছেন। দেব-দ্বিজে, জ্যোতিষে অগাধ ভক্তি এবং একটু ভিতু স্বভাবের লোক। যা করেন আটঘাট বেঁধেই করেন। এমনকী তাঁর ইনকাম-ট্যাক্সের হিসেবও পরিষ্কার।

সূরজপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালা ব্যবসাজগতের রাঘব বোয়াল হলেও এয়ার কন্ডিশনিং তাঁর একমাত্র ব্যবসা নয়। তার বড় ব্যবসা কাগজের কলে প্রেসের ছাঁট, আসাম ও উত্তরবঙ্গের বাঁশ ও কাঠ সাপ্লাইয়ের, মেশিনারি পার্টসের। এয়ার কন্ডিশনিং-এ তিনি দীর্ঘদিন থাকলেও, এ-ব্যাপারে পুলিশের চোখে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা, গত বছর-দেড়েক তিনি নানা অসুখে প্রায়ই নার্সিংহোমে কাটাচ্ছেন। ব্যবসা দেখছে ছেলেরা। সূরজপ্রকাশ ধুতি-কোট-টুপি পরা ফোঁটা-তিলক-কাটা সাবেকি লোক হলেও, তাঁর ছেলেরা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া সাহেবি মেজাজের। তারা আধুনিক ম্যানেজমেন্টে আস্থাবান আর ব্যবসা ডাইভার্সিফিকেশানের কথা ভাবছে। সম্ভবত কম্পিউটারাইজড প্ল্যান্ট বসাবে, তাই ইতালির এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। সল্টলেকে জমি দেখা হয়েছে। রাজ্য সরকার এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

দুয়ে-দুয়ে চার হয়, পাঁচ হয় না। নিরঞ্জনের রিপোর্ট যদি ঠিক হয়, তাহলে শুভর ছকও ঠিক। অবশ্য নিরঞ্জনের রিপোর্ট ভুল হওয়ার কথা নয়।

শুভ আবার নিরঞ্জনকে ফোন করল।

খুবই সাহায্য করলি, নিরঞ্জন, তবে শুধু আর-একটা খবর চাই। জোড়াবাগানের চন্দ্রদেব সাকসেনা পুলিশের মতে খুন হয়েছেন কি না, এই খবরটা একটু আমার দরকার।

ঠিক আছে। আজ সন্ধেবেলা বাড়ি আছিস?

হ্যাঁ। আসবি?

সময় পেলে তোর খবরটা নিয়েই আসব।

বেশ।

সন্ধেবেলা যথারীতি লোডশেডিং। ইদানীং কলকাতার সর্বত্র মশার বিস্তৃতি ঘটেছে। লণ্ঠন-জ্বালা ঘরে মশা তাড়াতে শুভ নিজের গায়ে চড়চাপড় মেরে চলেছিল।

নিরঞ্জন ঘরে ঢুকে বলল, মাইরি, বাড়িতেও আলো নেই, এখানেও তথৈবচ। তার চেয়ে আয়, একটু ঘুরে আসি। গাড়ি আছে।

না হে বন্ধু, আগে খবরটা বলো, শুনি।

পুলিশের মতে চন্দ্রদেব সাকসেনা অজ্ঞাত আততায়ীর হাতেই খুন হয়েছেন। মোটিভ অনেক কিছুই থাকতে পারে। খুনের সময় ওঁর স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। ছেলেরা টিউটরের বাড়িতে গিয়ে পড়ে। লোডশেডিংয়ে ওরা কী করে বাড়ি ফিরবে, তাই তাঁর স্ত্রী ছেলেদের আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর অ্যালিবাই পাকা। পড়শিরা কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। পিস্তলে ছিল সাইলেন্সার লাগানো। হাট করে খোলা দরজা দিয়ে দুই পুত্রসহ ঢুকে তাঁর স্ত্রী-ই লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আচ্ছা নিরঞ্জন, আর-একটা খবর একটু জোগাড় করে দিবি?

কী?

চন্দ্রদেবের মৃত্যুতে কি তাঁর স্ত্রী মুষড়ে পড়েছেন?

তা জানতে তো সরেজমিনে যেতে হয়।

তাই না হয় যাস।

যতই ছদ্মবেশ ধরুক, শুভর চোখকে নিরঞ্জন ফাঁকি দিতে পারেনি। নকল গোঁফ, ব্যাকব্রাশ চুল, মড গগলস আর সাদা শার্ট-প্যান্ট, হাতে ব্রিফকেসে নিরঞ্জনকে পাক্কা সেলসম্যানই মনে হচ্ছিল।

আগে গোঁফ খুলি। চিড়বিড় করছে মাইরি।

যা বাথরুমে, মুখটা ভালো করে ধুয়ে নিস।

ঘরে ফিরে সুস্থির হয়ে বসে নিরঞ্জন বলল, গিয়েছিলাম পেস্ট কন্ট্রোলের সেলসম্যান হয়ে। কড়া নাড়তে একটা বাচ্চা ছেলে দরজা খুলে দিল। আমি বললাম, বাড়িতে কোনও পুরুষ আছেন? সে বলল, না, মা আছেন। শ্রীমতী সাকসেনা এলেন। তাঁর কাছে নিজেকে পেস্ট কন্ট্রোলের সেলসম্যান হিসেবে জাহির করলাম। ব্রিফকেস থেকে লিটারেচার খুলে কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, পেস্ট কন্ট্রোল করাবেন না। আমি বললাম, বাড়ির কর্তাকে কখন পাওয়া যাবে? উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, উনি ক'দিন হল মারা গেছেন। বললাম, সরি ম্যাডাম। পরে আসব। এই অবস্থায় বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। তবে আপনার পুরোনো বাড়ি, ফাঁকফোকরে বিছে-মিছে থাকতে পারে, তাই পেস্ট কন্ট্রোল করিয়ে নেওয়া ভালো।

দেখে কী মনে হল?

ভদ্রমহিলা শক্ত ধাতের। ক'দিন আগে যে স্বামী হারিয়েছেন, দেখে মনে হয় না। মুষড়ে পড়ারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না।

ইউরেকা!—শুভ চেঁচিয়ে বলল, তাহলে আমার ছক ঠিক।

মানে! রহস্যের সমাধান করে ফেলেছিস?

হ্যাঁ রে।

ঘরে বসেই?

হ্যাঁ। ইজিচেয়ার ডিটেকশন—আরামকেদারায় বসে গোয়েন্দাগিরি বলতে পারিস। দাঁড়া, আগে দেবেন সাধুখাঁকে ডেকে আনাই।

বাজনা-লাইটার জ্বেলে বিলিতি সিগারেট ধরিয়ে দেবেন সাধুখাঁ বললেন, আপনার তদন্ত শেষ! খুনি ধরতে পেরেছেন?

হ্যাঁ। আপনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন। দুয়ে-দুয়ে চারের মতো আমার হিসেব। খুনি আর কাউকে খুন করবে না। খুনি আত্মহত্যা করে আপনাকে অব্যাহতি দিয়ে গেছে।

সে কী? কে খুনি?

সবুর করুন। সিম্পল সাইকোলজি। ভূনাথ সরকারের মৃত্যুর পেছনে রহস্য ছিল না। তাড়াহুড়োয় নিজের দোষে বেলঘরিয়ায় প্রায়ই কেউ-না-কেউ কাটা পড়ে। ভূনাথ সরকারও নিজের দোষে ট্রেনে কাটা পড়েন। কিন্তু খুনি তার থেকে একটা ছক পেয়ে যায়। অঙ্কুর দত্তকে সে ঘনিষ্ঠভাবে জানত। না-জানার কারণ ছিল না। অঙ্কুর নিজের কথা হা-হা করে সবাইকে বলত। তাই তার জন্মদিনে বার্থ-ডে সারপ্রাইজ ফ্রম এ ডিয়ার ওয়ান

—টাইপ করা চিরকুট আটকানো উপহার পেয়ে তার ধারণা হয় তাকে তার কোনও প্রেমিকা সেটা পাঠিয়েছে। অঙ্কুরের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে খুনি এই ফাঁদ পেতে কাগজের বাক্সে আকাসানো কালকেউটে পাঠায়। এই খুনিই হাসান আলিকে পনেরোতলার গরাদ ছাড়া জানলা থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়। খুনি হাসান আলির অতি পরিচিতজন ছিল, তাই তার পক্ষে হাসান আলিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওই বাড়ির পনেরোতলায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর চতুর্থ মৃত্যু ছিল একটা সাজানো-গুছোনো আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা! কিন্তু চন্দ্রদেব তো ন্যাটা ছিলেন না?—বিস্মিত দেবেন সাধুখাঁ বললেন।

আসল রহস্য সেইখানে। চন্দ্রদেব তাঁর আত্মহত্যার ব্যাপারটা এমনভাবে সাজান যাতে সেটা খুন বলে মনে হয়। লোডশেডিংয়ের সন্ধে, সদর হাট করে খোলা, বাড়িতে কেউ নেই। মনে হতে পারে, ওঁকে কোনও খুনি হত্যা করে এমনভাবে পিস্তল রেখে গেছে, যাতে মনে হয়, কোনও ন্যাটার কাজ। যাতে মনে হয় ওটা ছিল খুন, কেননা চন্দ্রদেব ন্যাটা ছিলেন না, আর খুনি ন্যাটা ছিল বলে ভুল করে পিস্তল ওঁর বাঁ-দিকে রেখে গেছে। গুলিও চালানো হয়েছে বাঁদিক থেকে। এখানেই খুনি ভুল করেছে মনে হলেও, আসলে ব্যাপারটা খুব ভেবেচিন্তে করা। চন্দ্রদেবই এই পরিকল্পনা করেছিলেন।

বলেন কী!—দেবেন সাধুখাঁ বিষম খেলেন।

হ্যাঁ, তাই।—সূরজপ্রকাশ অসুস্থ। ব্যবসা তাঁর ছেলেরা দেখে। চলতি ব্যবসা নিয়ে ওদের ভাবনা-চিন্তা নেই। ওরা পুঁজি নতুন খাতে নিয়োগ করে দেবে। এই অবস্থায় আপনার ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা ওঠে না।

তাহলে খুনি কে?—দেবেন সাধুখাঁ জিগ্যেস করলেন।

সেই কথাতেই আসছি। আপনাকে সন্দেহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছি, কেননা, এটাই আপনার একমাত্র ব্যবসা। জুনিয়ার এঞ্জিনিয়াররা আপনার লক্ষ্মী। এঁদের কার্যকুশলতার জন্যেই আপনার রমরমা অবস্থা। উপরন্তু আপনার দেব-দ্বিজে, জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস। আপনি নিজের ডাল নিজে কাটবেন না।

তাহলে?

ভূনাথ সরকারের মৃত্যু থেকেই খুনি একটা ছক পেয়ে যায়। আপনি আমাকে বলেছিলেন, ভূনাথকে নিশ্চয়ই কেউ ঠেলা দিয়ে লাইনে ফেলে দিয়েছিল। এই সন্দেহ নিশ্চয়ই আপনি ভূনাথ সরকারের মৃত্যুর পরে-পরেই আরও অনেকের কাছে প্রকাশ করে থাকবেন। এর থেকেই খুনি একটা ছক পেয়ে যায়। সে অঙ্কুর দত্ত আর হাসান আলিকে খুন করে। নিজের আত্মহত্যাও এমনভাবে সাজায় যাতে সেটাও খুন মনে হয়।

তার স্বার্থ?—দেবেন সাধুখাঁ আবার প্রশ্ন করলেন।

স্বার্থ! খুনি, মানে, চন্দ্রদেব ছিলেন দেনায় ডুবে। উপরন্তু একটা খুনের পর তিনি মোটা টাকার বিমা করেন। নিজের মৃত্যুকে তিনি ভূনাথ, অঙ্কুর আর হাসানের হত্যার সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেন, যাতে মনে হয় কেউ আপনার ব্যবসাকে ডোবানোর জন্যে একের পর এক আপনার জুনিয়ার এঞ্জিনিয়ারদের হত্যা করে চলেছে। আর নিজে নিজেকে বাঁ-হাতে খুন করে চন্দ্রদেব এই হত্যা এক কল্পিত ন্যাটা খুনির ঘাড়ে চাপান। তাঁর আত্মহত্যা খুন বলে ধরা পড়লে চন্দ্রদেবের ওয়ারিশ বিমার পুরো টাকাটা পেয়ে যাবেন, দেনার হাত থেকেও তিনি রেহাই পাবেন। গোটা ব্যাপারটাই এক অস্তিত্বহীন খুনির ঘাড়ে চাপিয়ে চন্দ্রদেব আসলে নিজের কাজ হাসিল করার পরিকল্পনা করেছিলেন। চন্দ্রদেব মারা যাওয়ায় বস্তুত তাঁর স্ত্রী দেনার দায় থেকে রক্ষা আর বিমার টাকা—এই দুই পাওয়ায় স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটা এত সহজে মেনে নিতে পেরেছেন। চন্দ্রদেব বেশ মাথা খাটিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে আপনার কোনও ভয় নেই, মিস্টার সাধুখাঁ।

ঠিক বলছেন তো?

নিরঞ্জন সাক্ষী।

আপনার বাকি ফিজটা তাহলে চেকেই লিখে দিচ্ছি।

থাক। খুনি যখন পালিয়েই গেছে...।

তা কেন? আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

নিরঞ্জন হেসে বলল, তাই দিন। শুভর সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারেন।

বাঁচালেন, মশাই। এ না হলে শুভ চৌধুরী!

দেবেন সাধুখাঁ চলে যেতে শুভ বলল, যাই এবার, দাবা খেলে আসি।

নিরঞ্জন বলল, তাই চল। তোকে নামিয়ে দেব।

তাই চল। আরামকেদারায় বসে তদন্ত করে দশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে, এখন কিছুদিন নিশ্চিন্তে দাবা খেলা যেতে পারে। চল।

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৭



আড়ালে তুমি

অমল রায়

এখানে বন্দি-জীবন কাটাচ্ছি।

একটা পোড়োবাড়ির একটা বড় ঘরে আজ দিন-সাতেক হল আমি বন্দি। সোনালি দিনের স্বপ্ন দেখার প্রায়শ্চিত্ত করছি এবং আরও করতে হবে।

মনে হয়, এটা কোনও জমিদারের বাগান-বাড়ি ছিল, কালের আঘাত সহ্য করতে না পেরে জরাজীর্ণ অবস্থায় কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ির অবস্থান ঠিক কোথায় আমার জানা নেই, তবে এইটুকু জানি যে, দীনেশ তার প্রাইভেট গাড়ি করে প্রায় দেড় ঘণ্টা এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে আমাকে এখানে এনে তুলেছে। বাড়িটা ঘেরা আছে জঙ্গলে। এখান থেকে লোকালয় চোখে পড়ে না—এমনকী কোনও গাড়ি চলাচলের শব্দও কানে ভেসে আসে না। পরদিন সকালে আমার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি যে, এখানে এই ঘরে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কারও কানে গিয়ে পৌঁছবে না, তাই সামান্যতম সাহায্যেরও আশা নেই।

এই বন্দি-জীবন আমাকে আর কতদিন কাটাতে হবে আমি জানি না। তবে দীনেশের ভাবসাব দেখে বুঝতে পেরেছি যে, আর বেশিদিন আমাকে এখানে বন্দিদশায় থাকতে হবে না। আমাকে যার কাছে বিক্রি করা হবে সেই খদ্দের একরকম ঠিক হয়ে গেছে—শুধু দেনা-পাওনার হিসেবটা মিটলেই হয়।

দীনেশ সেন যে একজন মেয়ে চোরাচালানকারী, তা ঘুণাক্ষরেও গত তিন মাসে আমি বুঝতে পারিনি। একবার আঁচ পেলে অনেক আগেই সরে পড়তে পারতাম। তার কথাবার্তায়, আচারে-ব্যবহারে, ডালহৌসি পাড়ায় অত সুন্দর অফিস দেখে, আর দামি জাগুয়ার গাড়ি এবং দু-হাতে টাকা উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখে আমার একবারও মনে হয়নি যে, মানুষটা এত নীচ আর প্রতারক। যার বাহ্যিক চেহারা এত সুন্দর, সে এত অসুন্দর হয় কী করে!

আমি সাধারণ পরিবারের একজন অতি সাধারণ মেয়ে। আমার বয়েস উনিশ। রূপ আছে বটে, কিন্তু এত রূপ কোনও গরিব ঘরের সাধারণ মেয়ের থাকা উচিত নয়। এতে বিপত্তি বাড়ে। আমার স্কুল-মাস্টার বাবা একাই সংসারটা কোনওরকমে এগিয়ে নিয়ে চলছিলেন। বেকার দাদা বাবাকে কোনও সাহায্য করতে পারছিল না। তাই স্কুল ফাইনাল পাশ করবার পর আমি টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখে অফিসপাড়ায় মাঝে-মাঝে হানা দিচ্ছিলাম একটা সামান্য মাইনের চাকরি পাওয়ার আশায়। একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন

দেখলাম যে, একটা প্রাইভেট ফার্ম একজন স্টেনোগ্রাফার খুঁজছে। দিলাম বক্স নম্বরে দরখাস্ত পাঠিয়ে। তারপর একদিন ডাক পড়ল। অনেকগুলো মেয়ের মধ্যে থেকে ফার্মের প্রোপ্রাইটার দীনেশ সেন আমাকে চাকরিটা দিলেন। মাইনে পাঁচশো টাকা।

চাকরি পাওয়ার কথা বাড়ি ফিরে সবাইকে জানাতে ভুলিনি! অনেকে আমার মুখের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়েছিল—যেন আমি রাজ্য জয় করে বাড়ি ফিরেছি।

আমাকে বসতে হল দীনেশের সাজানো চেম্বারেই। কাজ আমাকে করতে হত না বললেই হয়। কেউ ব্যবসার প্রয়োজনে চেম্বারে এলেই আমাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তারা আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাত, যেন সারা দেহ জরিপ করছে। প্রথম-প্রথম আমার বড় খারাপ লাগত, কিন্তু একমাস পরে যখন হাতে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা পেলাম, তার পর থেকে আর তত খারাপ লাগত না। সব সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি ধীরে-ধীরে চৌকস হতে লাগলাম।

একটু-একটু করে যে দীনেশ আমার মনের অনেক কাছে এসে পড়েছিল আমি বুঝতে পারিনি। সে তার নির্জন চেম্বারে একদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। আমাকে জড়িয়ে তার চওড়া বুকের কাছে প্রায় চেপে ধরে বলল, আমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে না পেলে সে বাঁচবে না।

আমি অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিলাম, আমি খুব গরিব ঘরের মেয়ে, দীনেশবাবু।

দীনেশ বলেছিল, সুদেষ্ণা, তোমার মনটা তো গরিব নয়।

আপনি হয়তো ভুল করছেন—।

ভুল করে যদি তোমাকে পাই, তবে এরকম ভুল আমি অনেক করতে রাজি আছি।

আপনি আমাকে দুর্বল করে ফেলছেন—আমাকে ছাড়ুন।

তুমি বলো, আমার হবে?

না, সেদিন আমি কিছু বলতে পারিনি।

একদিন মা বলেছিলেন, বেশ তো ভালো কথা, তা একদিন ছেলেটাকে নিয়ে আয়—দেখি।

আমি লজ্জাজড়ানো গলায় বলেছিলাম, ও আসতে চায় না।

কেন?

বলে, একেবারে বর সেজে আসবে।

পাগল ছেলে!

ছেলেটা যে মোটে পাগল নয়, তা আরও মাস-দুয়েক পরে বুঝলাম। এই মাস-দুই আমি শুধু সুখ-স্বপ্ন দেখেছি দীনেশকে ঘিরে, আর ভালোলাগার আনন্দে ভরপুর হয়ে দীনেশের সঙ্গে তার জাগুয়ার গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর দিন-সাতেক আগে সেই বর্ষার রাতে—।

আমার পিঠে একটা আলতো স্পর্শ পেতেই, আমি চমকে তাকিয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম।

সুন্দরী আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে এককাপ ধূমায়িত চা। সে মুখে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করতেই আমি তার হাত থেকে ব্যস্তভাবে কাপটা নিলাম।

এই কুশ্রী মেয়েমানুষটার নাম সুন্দরী নয়। নামটা আমার দেওয়া। সুন্দরী না বলে তাড়কা রাক্ষসী বলাই ভালো ছিল। কালো, মোটা আর হতকুশ্রী চেহারার মেয়েমানুষ। আমার মনে হয়, ওর বয়েস বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর হতে পারে, আবার পঞ্চাশ হলেও বলবার কিছু নেই। সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে হাঁটে। চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। বোবা আর কালা—মুখ থেকে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।

আমি ব্যস্তভাবে চায়ে চুমুক দিলাম। চুমুক দিতে দেরি হলে এখুনি মারধোর করবে আমায়। এ ক'দিন ওর হাতে যে কত মার খেয়েছি তার হিসেব নেই। মেয়েমানুষটা বড় নিষ্ঠুর—শরীরে শক্তিও আছে প্রচুর।

অন্ধকারে ডুবে গেছে চারিদিক। ঝিঁঝিঁপোকার ঐকতান শুরু হয়ে গেছে। আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সুন্দরী একটা মোমবাতি জ্বালতেই ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। আমি জানি, এখন মেয়েছেলেটা রান্না করবে। আমার, দীনেশের, আর তার নিজের জন্যে।

একদিন হঠাৎ জাগুয়ার খারাপ হয়ে গেল। প্রচণ্ড বর্ষা হচ্ছিল। কোনও উপায় না দেখে শেষে বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে এই পোড়োবাড়িটায় এসে উঠেছিলাম। দেখেশুনে মনে হয়েছিল, এই পোড়োবাড়িটার অস্তিত্ব দীনেশ আগে থেকেই জানত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি সেদিন রাতে একবারও বুঝতে পারিনি, দীনেশ আমাকে এখানে বন্দি করে রাখার জন্যে নিয়ে এসেছে। রাত বাড়ছিল, অথচ বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ ছিল না।

দীনেশ আমাকে বলেছিল, সুদেষ্ণা, আজ রাতে আমাদের এখানেই থাকতে হবে।

কিন্তু আমার বাড়িতে যে—।

কোনও উপায় নেই—।

তারপর রাত কেটেছিল এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে।

পরদিন সকাল হতেই সুন্দরী এসে পৌঁছল, তখন আমি দীনেশের সঙ্গে একই টেবিলে ব্রেকফাস্ট করতে ব্যস্ত।

দীনেশ হাত তুলে আমাকে দেখিয়ে সুন্দরীকে বলেছিল, হ্যাঁ, এই মেয়েটার দেখাশোনা করতে হবে তোমাকে। দেখবে, যেন পালাতে না পারে।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, তুমি এসব কী বলছ, দীনেশ!

শোনো সুদেষ্ণা, তুমি আজ থেকে এখানে বন্দি। এই মেয়েমানুষটা তোমার দেখাশোনা করবে।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলাম, না দীনেশ, না—।

পালাবার চেষ্টা কোরো না!—দীনেশ কঠিন কণ্ঠে বলেছিল, বেশি ট্যাঁফো কোরো না, ফল ভালো হবে না।

হঠাৎ সুন্দরী আমার চুলের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে আমায় মারতে শুরু করেছিল—সে কী এলোপাথাড়ি মার!

তারপর থেকে সুন্দরীকে আমার ভীষণ ভয়। এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন ওর হাতের মার আমি খাইনি। বিশেষ করে দীনেশ যেদিন উপস্থিত থাকে, আমাকে পিটুনি আরও বেশি খেতে হয়। আসলে, সুন্দরী মনিবকে তার কর্মতৎপরতা দেখায়।

চায়ে শেষ চুমুক দিতেই সুন্দরী আমার হাত থেকে কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। প্রথম দিন চমকেছিলাম তার নিষ্ঠুর ব্যবহারে, কিন্তু তারপর থেকে আর চমকাই না।

হঠাৎ ঘরের ভেজানো দরজা ধীরে-ধীরে খুলে গেল। ভাবলাম, দীনেশ বুঝি ফিরে এল। কিন্তু মিনিটখানেক পরেও কেউ ভেতরে ঢুকল না। সুন্দরীর নজর এড়ায়নি ব্যাপারটা। সে দরজার বাইরে চলে গেল। বোধহয় পরীক্ষা করতে গেল, দরজা হঠাৎ কেন খুলল বা কে খুলল। তারপর আবার ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে পাশের রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হয়তো দীনেশের কোনও চর এসেছিল। সন্তর্পণে পাশের ঘরে উঁকি দিলাম। দেখলাম, একটা ছোট্ট কাগজের পুরিয়া ধীরে-ধীরে খুলে ফেলল সুন্দরী। লক্ষ করলাম, তার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। আফিম খায় নাকি সুন্দরী? নইলে অত ছোট মোড়কে কী থাকতে পারে?

আমি স্বস্থানে ফিরে এলাম।

রাত দশটার কিছুক্ষণ আগে দীনেশ ফিরল। সাধারণত এইরকম সময়েই সে ফেরে। প্রতিদিনের মতো শার্ট-ট্রাউজার খুলে পাজামা আর গেঞ্জি পরে ব্যালকনিতে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। আমি যেমন বসেছিলাম, তেমনি বসে রইলাম। দীনেশের দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ হয় আজকাল আমার।

দীনেশ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, সুদেষ্ণা, জেনে রাখো, কাল তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ।

আমার বুক কেঁপে উঠল থরথর করে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম পরক্ষণেই। ভেঙে পড়ে তো লাভ নেই। আমি ম্লান হেসে বললাম, খদ্দের কি ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। একজন ডাক্তার কাল তোমায় নিতে আসবেন।

ডাক্তার!

হ্যাঁ। কী নিয়ে যেন ভদ্রলোক রিসার্চ করছেন। তাঁর যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা—সব তোমার ওপর দিয়ে করতে চান।

সেরকম পরীক্ষা তো বাঁদর-গিনিপিগের ওপরেই ওঁরা করে থাকেন, শুনেছি।

উনি করবেন মানুষের ওপর।

ভালো। তাহলে তোমার পাপ কাটল, কী বলো?

দীনেশ বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল, বলল, তোমরা আমাদের লক্ষ্মী, পাপ বলব কী করে?

কত টাকায় রফা হল?—আমি জানতে চাইলাম।

এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না!—দীনেশ বলল, তবে কিছু কমেই আমাকে তোমায় ছাড়তে হচ্ছে।

কেন?—আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, আমার মতো একজন সুন্দরীকে কম টাকায় ছাড়লে তো একবারে লোকসান হয়ে যাবে।

তা যাবে। ভদ্রলোককে আগে যে-মেয়েটা বিক্রি করেছিলাম, সে একদিন সুযোগ বুঝে ওর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। দু-একটা ইঞ্জেকশান পড়তেই মেয়েটা যেন বাঁদরে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল—।

তাতে তোমার লোকসান কেন হবে?

এগ্রিমেন্ট তো তাই ছিল।—দীনেশ বলল, মেয়েটা কিন্তু তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিল।

আহা, বেচারা!

এখন মেয়েটার মতো কুশ্রী আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।—দীনেশ বলল, একদিন ডাক্তার আমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। আঃ, কী বীভৎস! এখন মেয়েটার কথা বলতে কষ্ট হয়। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না—দাঁড়াতেও পারে না।

ছাই মাটিতে ঝেড়ে ফেলে দীনেশ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোমার জন্যে নতুন জামাকাপড় আর একটা বোরখা কিনে এনেছি।

আমায় বোরখা পরতে হবে?

হ্যাঁ। তোমার মুখ একটুকরো কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকবে, যাতে চিৎকার করতে না পারো।

হাতদুটো বাঁধবে না?

হ্যাঁ, ও-দুটোও বাঁধতে হবে।—দীনেশ বেশ কড়া কণ্ঠে বলল, কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করবে না।

তোমার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

সুন্দরী রান্নাঘর থেকে এ-ঘরে এসে ইশারায় জানাল যে, রান্না হয়ে গেছে, খেতে দেবে কি না।

দীনেশ ইশারায় খাবার দিতে বলল।

এ-ঘরে পাতা একটা বড় ডাইনিং টেবিলে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে খাই। আমি উঠে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে এসে বসলাম। আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে দীনেশও বসল।

আমার বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আজই তাহলে এই পোড়োবাড়িতে আমার শেষ রাত! কাল কোথায় থাকব কে জানে! হয়তো ডাক্তারের ঘরে কোনও খাঁচা আছে, সেখানেই আমায় থাকতে হবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না আমার কী হল বা কী হচ্ছে। কে বলতে পারে, সেখানে কতদিন বাঁচব! ভগবান যে আমার ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেছেন, একবারও বুঝিনি। আজ রাতে খানিকটা বিষ পেলে খেয়ে মরতাম।

প্রতিদিনের মতো সুপ পরিবেশন করল সুন্দরী। নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে চামচের সাহায্যে সে নাড়তে লাগল। আমিও গোলমরিচ আর নুন মেশাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খুব খিদে পেয়েছে।

সুপ নাড়তে-নাড়তে দীনেশ বলল, জানি, তুমি আমাকে ঘৃণা করো—।

আমি শব্দ করে হেসে উঠে বললাম, তুমি জানো?

জানি।

শুনে সুখী হলাম।

আমায় ক্ষমা করো, সুদেষ্ণা।

আমার নাম ধরে ডাকবার অধিকার তোমার নেই।

দীনেশ আর কথা বলল না।

সুন্দরীর দিকে তাকালাম। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ মেলে একদৃষ্টিতে সে দীনেশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল, চোখ মেলে তাকিয়ে বেচারা ঘুমোচ্ছে। আমার শরীরের ভেতরটা কেমন পাক খেয়ে উঠল।

একচামচ সুপ মুখে দিয়ে বিকৃত স্বরে দীনেশ বলল, অ্যাঃ, কী বিশ্রী স্বাদ!

সুন্দরী দু-পা পিছিয়ে গিয়ে মুখে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করল। মনে হল, বেচারা ভয় পেয়েছে।

আরও দু-চামচ মুখে দিতেই দীনেশ বুক চেপে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আঃ, বুকের মধ্যে কেমন করছে—।

লক্ষ করলাম, দীনেশের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

দীনেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, হাওয়া—একটু হাওয়া।

আমি চেয়ার ছেড়ে দীনেশের দিকে এক-পা এগোতেই সুন্দরী আমায় একটা ধাক্কা মারল। সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম : তার চোখে-মুখে হিংস্র হাসি—পৈশাচিক আর নিষ্ঠুর।

আমি চিৎকার করে বললাম, সুন্দরী!

দীনেশ যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে বুক ধরে হাওয়া নিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তারপর চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে বারকয়েক হাত-পা ছুড়ে স্থির হয়ে গেল।

আমি কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললাম, ও যে মরে গেল!

সুন্দরী কঠিন কণ্ঠে বলল, মরুক!

আমি বিস্ময়ভরা চোখে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুন্দরী তাহলে বোবা নয়, কথা বলতে পারে! আমি বললাম, সুন্দরী!

আমি সুন্দরী নই।—সুন্দরী বিড়বিড় করে বলল, আমার নাম সুধা।

তুমি ওকে খুন করলে!

করলাম।—আপশোসের গলায় সে বলল, দানবটা আমায় সুস্থ হয়ে বাঁচতে দেয়নি।

কী করব, কী বলব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। অনেক প্রশ্ন আমার মনের দরজায় এসে কড়া নাড়তে লাগল। কাকে আগে দরজা খুলে দেব বুঝতে পারছিলাম না। দেখতে পাচ্ছি, দীনেশের চোখদুটো বিস্ফারিত, মুখের কষ বেয়ে রক্তের একটা ধারা নেমেছে। দুটি মরা চোখে কী অসীম যন্ত্রণা! আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

পালাও!—সুন্দরী বলল, ওর দলের লোকেরা এসে পড়লে মুশকিল হয়ে যাবে। আর দেরি কোরো না।

ঠিক তো। পালাবার এই তো সুযোগ! আমি পরনের কাপড় ঠিক করে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করলাম, দীনেশকে কেন খুন করলে, সুধা?

এই দানবটা আমাকে এক বৈজ্ঞানিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই বৈজ্ঞানিক আমার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে রূপবতী সুধাকে আজকের এই রাক্ষসীতে পালটে দিয়েছে। কে বলবে, আমি একদিন তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিলাম!

তুমি পালাবে না?
না। বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই।
দু-হাতে মুখ ঢেকে সুধা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। এখন দীনেশের মরা চোখের মরা দৃষ্টি তার দিকে। একটা রাত-জাগা পাখি কর্কশ কণ্ঠে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল।

রহস্য রোমাঞ্চ
পুজো সংখ্যা, ১৯৮৭



ভূতাবিষ্ট

নারায়ণ সান্যাল

কলকাতার হেড অফিস থেকে অরবিন্দ নাগকে বম্বে পাঠাল ওখানকার ব্রাঞ্চে অডিট করতে। উঠল গিয়ে সে এক বিলাসবহুল হোটেলে। আমিরি খানাপিনা, দামি-দামি ড্রিঙ্কস, পা বাড়ালেই ট্যাক্সি। কাজের শেষে যত ইচ্ছে বেড়াও, সিনেমায় গিয়ে ঢোকো কিংবা তৃষ্ণা মেটাতে পছন্দসই কোনও রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বারে বসে...।

তবে রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বারের কথা মনে হলেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জোরালো নিয়ন সাইনে লেখা একটিই নাম 'ভি ভি ভি ক্লাব'।

হোটেল থেকে অফিসে যাতায়াতের পথেই পড়ে সেটা। নিত্যই দ্যাখে অরবিন্দ। বিচিত্র নামটা তাকে কৌতূহলী করে তোলে। যোগাযোগের অভাবে ঢোকা আর হয়ে ওঠে না।

অবশেষে আট দিনের দিন আর থাকতে না পেরে, অ্যাকাউন্ট্যান্ট আয়ারকে সে জিগ্যেস করে ফেলল, 'আচ্ছা মিস্টার আয়ার, হোটেল থেকে যাতায়াতের পথে, একটা বাড়ির সামনে ভি ভি ভি ক্লাব বলে যে-সাইনবোর্ডটা দেখা যায়, কী ওটা? জানেন কিছু?'

আয়ার মৃদু হেসে বললেন, 'জানি বইকী। ওখানে মাঝে-মাঝে গেছিও। রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বার হিসেবে হালফিল রীতিমতো রেসপেকটেবল হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু নামটা খুব পিকিউলিয়ার নয়?'

'মালিকটি যে আরও পিকিউলিয়ার, মিস্টার নাগ। পূর্ব জীবনে শুনেছি, কঙ্কনি হেমাদ ছিলেন একজন এক্স-কনভিক্ট—।'

'এক্স-কনভিক্ট?' গভীর বিস্ময়ে অরবিন্দ বলে ওঠে। 'ইউ মিন, ওঁর কয়েদ হয়েছিল? জেল খেটেছেন?'

আয়ার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'শুধু খাটেনইনি, এখনও হয়তো খাটতেন, যদি না—।'

'যদি না?'

'যদি না পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ওঁর সাহায্য নিতে বাধ্য হত।'

অরবিন্দের মুখের হাঁ-টা বেশ বড় হয়ে উঠল। গভীর বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করল, 'ওঁর সাহায্য নিতে? সাপে ব্যাং ধরার বদলে, ব্যাংই সাপ ধরল, বলছেন?'

'এগজ্যাক্টলি।' আয়ার আর-একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, চাপা গলায় বললেন, 'শুনেছি, একটা আন্তর্জাতিক চোরা-চালান চক্রের সন্ধান পেয়েও পুলিশ কিছুতেই তাদের টিকিটা ধরতে পারছিল না। তখন বাধ্য হয়ে তাদের শরণাপন্ন হতে হল জেল-কয়েদি হেমাদসাহেবের। অন্ধকার জগতের উনি ছিলেন ক্রাউন প্রিন্স। তাই পুলিশ শর্ত দিল, চক্রটাকে যদি ধরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে হাজতবাস তো হেমাদসাহেবের মকুব হবেই, সেইসঙ্গে মোটা টাকা পাবেন উনি ভবিষ্যতে সৎভাবে জীবনযাপন করবার জন্যে—।'

অরবিন্দ বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, 'বুঝেছি। সেই টাকাতে মিস্টার হেমাদ ভি ভি ভি ক্লাব—।'

বাধা দিলেন আয়ার : 'একটু ভুল করে ফেললেন, মিস্টার নাগ। অরিজিন্যালি ভিভিভি ক্লাব নাম ছিল না, ছিল টুটি-ফ্রুটি।'

'তাই নাকি? কিন্তু দ্বিজ হল কেন—আই মিন, নতুন নামকরণ?'

'অবশ্য তার ইতিহাস একটা আছে—তবে মরা ইতিহাস নয়, রীতিমতো জ্যান্ত। আমি নিজেই কয়েকবার গিয়ে দেখেছি।'

অরবিন্দ কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করল, 'কী দেখেছেন? মনে হচ্ছে যেন একটা রহস্যের ছোঁয়াচ আছে?'

আয়ার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তা তো আছেই। তবে কোনও গোয়েন্দা কাহিনির রহস্য নয়, দস্তুরমতো অলৌকিক—ভৌতিকই বলতে পারেন।'

'ভৌতিক!' অরবিন্দ অব্যক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে।

'হ্যাঁ! টুটি-ফ্রুটিতে শশী গুপ্তা বলে একজন ভদ্রলোক যেদিন থেকে ড্রিঙ্ক করতে আসতে শুরু করলেন, সেইদিন থেকেই রেস্তোরাঁটার বরাত খুলে গেল। শহরের বহু খানদানি লোক—এলিটস আসতে শুরু করলেন শুধু মিস্টার গুপ্তাকে দেখতে।'

'স্পেশ্যাল ফিচারটা কী?'

'সবাই স্বীকার করেছেন, তিনি ভূতাবিষ্ট।'

অরবিন্দ ঠিক বুঝতে পারে না অর্থটা। তাই প্রশ্ন করে, 'ভূতাবিষ্ট? তার মানে—।'

আয়ার গড়গড় করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন 'মানে, ভূতে ওঁকে ভর করে—ইংরিজিতে যাকে পজেসড বলে—।'

অরবিন্দ গম্ভীর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, 'আপনি নিজে বিশ্বাস করেন তা?'

'না করে উপায় কী। আমি যে ক'দিন তাঁকে বারে মিট করেছি। সবদিনই দেখেছি, এক-একজনের প্রেতাত্মা তাঁর ওপর ভর করেছে—কোনওদিন শেক্সপিয়ার, কোনওদিন সন্ত তুলসীদাস, কোনওদিন বা মহাত্মা গান্ধী—।'

অসহ্য বিস্ময়ে অরবিন্দ বলে উঠল, 'বলেন কী! এ যে বিশ্বাস করা মুশকিল, মিস্টার আয়ার।'

'চলুন না আজ আমার সঙ্গে। শনিবার আছে...মিস্টার গুপ্তা নিশ্চয়ই ভি ভি ভি ক্লাবে আসবেন—নিজের চোখে দেখে সন্দেহভঞ্জন করবেন।'

অরবিন্দ যেতে রাজি হল তখনই। হেসে বলল, 'নিশ্চয় যাব। ভি ভি ভি ক্লাবের নামকরণের কারণটি এবার বুঝেছি। ভি ভি ভি—অর্থাৎ, ভিনি ভিডি ভিসি। এলুম, দেখলুম, জয় করলুম।'

'এগজ্যাক্টলি। শশী গুপ্তা ভূতাবিষ্ট কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রিকেট পাগল বম্বের মেয়ে-পুরুষরা যেমন দলে-দলে আছড়ে পড়েন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে, ঠিক সেইরকমভাবেই তাঁরা ভি ভি ভি ক্লাবে উপচে পড়েন।'

কথাটা যে তাঁর কতখানি সত্যি, সেটা অরবিন্দ মিস্টার আয়ারের সঙ্গে ভি ভি ভি ক্লাবের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই বুঝল। শুধু গাড়ির মেলা। সাদা, লাল, কালো, ছোট-বড়, দেশি-বিদেশি। ভেতর থেকে রং-বেরঙের শাড়ি, সালোয়ার, স্কার্ট, দামি স্যুট পরা নর-নারীর দল নেমে এসে ভিড় করেছেন প্রবেশপথের সামনে।

অগত্যা অরবিন্দকেও আয়ারের পিছনে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

কিন্তু ভেতরে পা দিতেই বিস্ময়ে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। ভি ভি ভির বাইরেটা সুন্দর নিশ্চয়ই, কিন্তু ভেতরের সৌন্দর্যের বোধ করি তুলনা নেই। হেমাদসাহেব যেন কোনও ময়দানবকে দিয়ে তিলে-তিলে তিলোত্তমা গড়ে তুলেছেন।

হলটা যত লম্বা, তত চওড়া। অরবিন্দের মনে হল, কলকাতার রেসকোর্সের মতোই বিশাল। সবুজ গালচের ওপর সাজানো অজস্র টেবিল যেন শ্বেতপদ্মের মতো ফুটে রয়েছে হল জুড়ে। উত্তরদিকের শেষতম প্রান্তে মস্ত বার। সেলফে সাজানো নানা আকৃতির পানীয়ের বোতলগুলো যেন সুন্দরী যুবতীর মতো হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বাঁ-হাতি একটা দরজার মাথায় নিয়ন সাইনে লেখা 'লেডিজ পার্লার'। ডানহাতি কার্পেট মোড়া সিঁড়িটা ওপরে উঠে গেছে। তার পাশেই একটু ভেতর দিকে একখানা ঘরের মাথায় নিয়ন সাইনে লেখা 'বিলিয়ার্ড রুম'।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অরবিন্দ হলের চারদিকে চোখ বুলোচ্ছিল। আয়ার কাছে এসে তাগিদ দিলেন, 'করছেন কী! দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওই কোণের দিকে একখানা টেবিল এখনও খালি আছে। যে-কোনও মুহূর্তে অকুপায়েড হয়ে যেতে পারে।'

সচেতন হয়ে উঠে অরবিন্দ তাঁর পিছন-পিছন টেবিলটার দিকে এগিয়ে চলল।

দেখতে পেয়ে, বারের কাছ থেকে হাসিমুখে এগিয়ে এল কঙ্কনি হেমাদ। আয়ারকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'গরিবের ক্লাবকে কি ভুলে গেলেন, মিস্টার আয়ার? আর তো পায়ের ধুলোই পড়ে না।'

তার বাড়ানো হাতে হাত মিলিয়ে আয়ার বললেন, 'অফিসে অডিটিং চলছে তো।...আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার নাগ, কলকাতা থেকে এসেছেন অডিট করতে। আর ইনি মিস্টার হেমাদ। ভি ভি ভির মালিক।'

সৌজন্যমূলক করমর্দনটা সেরে হেমাদ মৃদু হেসে আয়ারকে জিগ্যেস করল, 'কী খাবেন, বলুন। হুইস্কি? রাম? জিন না বিয়ার?'

আয়ার অরবিন্দের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চট করে জবাব দিলেন, 'স্মল ড্রিঙ্কস কিছু। মিস্টার নাগ রেগুলার খান না তো, কাজেই আপনার স্পেশ্যাল ব্র্যান্ড কোনও বিয়ার—।'

'ও. কে., ও. কে., জেন্টলমেন। আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' হেমাদ দ্রুতপায়ে ফিরে গেল বার স্ট্যান্ডের দিকে।

সিগারেটের প্যাকেটটা আয়ারের দিকে এগিয়ে ধরে অরবিন্দ মন্তব্য করল, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে মদ খাওয়াটাই ছিল নিন্দের। সবাই ঘৃণার চোখে দেখত। আর এখন না খাওয়াটাই নিন্দের—সবাই পিটি করেন।'

'শুধু ঋতুই বদলায় না, মিস্টার নাগ, রীতও তো বদলায়।' মৃদু হেসে আয়ার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

একটু পরেই সুবেশধারী বয় এসে দু-বোতল বিয়ারের সঙ্গে সাজসরঞ্জামগুলো টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

অরবিন্দের চোখ পড়েছিল হলের প্রবেশপথের দিকে। যাঁকে দেখতে আসা, সেই ভূতাবিষ্ট ভদ্রলোক কখন আসবেন কে জানে!

আয়ার তার গ্লাসে নিজের গ্লাসটা ঠেকিয়ে হালকা সুরে বললেন, 'প্রার্থনা করি যে, কোনও ভূত যেন অবিলম্বে শশী গুপ্তাকে এখানে তাড়না করে নিয়ে আসে।'

হেসে উঠে অরবিন্দ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় ক্লাবের সামনে থেকে একাধিক উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল, 'এসে গেছেন...এসে গেছেন!...' 'কই, কোথায়?...' 'ওই তো ট্যাক্সি থেকে নামছেন...!'

হলের সবগুলো মুখই দরজার দিকে ঘুরে গেল। প্রথম দর্শনের কৌতূহল আর উত্তেজনায় অরবিন্দও চেয়ার ছেড়ে একদম দাঁড়িয়েই পড়ল। কিন্তু হলে যে ঢুকল, তাকে দেখে সে বেশ খানিকটা নিরাশ হল।

এই কি শশী গুপ্তা? ভূতাবিষ্ট! মনে-মনে যে-ছবিটা তার আঁকা ছিল, কোথাও তার সঙ্গে মিল খুঁজে পেল না। নেহাত অল্প বয়েস, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, ফরসা রং, পরনের স্যুট দামি বটে, কিন্তু ইস্ত্রির বালাই নেই।

কারও দিকে না তাকিয়ে শশী গুপ্তা সোজা এগিয়ে গেল বারের দিকে সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে-করতে :

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা...।।'

আয়ার ফিসফিস করে অরবিন্দকে বললেন, 'আজ দেখছি কালিদাসের প্রেতাত্মা ভর করেছে।'

অরবিন্দ মুখও ফেরাল না, কোনও জবাবও দিল না।

হেমাদসাহেবের জানা ছিল, তাই বিশেষ ধরনের হুইস্কি পরিবেশন করতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শশী গুপ্তা ঊর্ধ্বমুখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রঘুবংশ থেকে একটা শ্লোক আওড়াচ্ছিল 'ত্বাং সমক্ষমধিয়োগ্য দোময়া...' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে হো-হো করে হেসে উঠল।

চমকে গেল কঙ্কনি হেমাদ, ফিরে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী হল, মহাকবি?'

'মহাকবি!' আর-একদফা হাসল শশী গুপ্তা। বলল, 'আজ যাকে মহাকবি বললে, শ্রেষ্ঠী, উজ্জয়িনীর একদল ঈর্ষাকাতর নাগরিক তাকেই আখ্যা দিয়েছিল মহামূর্খ বলে। ফুলশয্যার রাত্রে, দূর থেকে উষ্ট্রের হ্রেষাধ্বনি শুনে রাজকুমারী নাকি আমাকে প্রশ্ন করেন, ওটা কী ডাকছে? —উত্তরে আমি বলেছিলুম, উট।'

হেসে উঠল শশী গুপ্তা। হেসে উঠলেন হলের আরও বহু নরনারী।

টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালেন সালোয়ার কামিজ পরা এক ভদ্রমহিলা। জড়িত-কণ্ঠে বললেন, 'শুধু উজ্জয়িনীর নাগরিকদেরই দোষারোপ করছেন কেন, কবি? এই নটী বসন্তসেনার কুটিরেই আপনাদের নবরত্ন সভার এক রত্ন বলে গেছেন, কবি কালিদাসের চেয়ে মূর্খ আর হতে পারে না। গাছের যে-ডালে তিনি বসেছিলেন, সেই ডালই কুঠার দিয়ে কাটছিলেন।'

হলে একটা হাসির হররা উঠল। শশী গুপ্তা দু-হাতে মুখ ঢেকে প্রায় আর্তনাদের সুরে বলল, 'এই হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাই একদিন মানুষের মহা সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আবার সেই আদিম অরণ্য জীবনে...এ টোটাল ডেস্ট্রাকশান অফ হিউম্যানিটি।'

আয়ার অনুচ্চকণ্ঠে অরবিন্দকে বললেন, 'কবি কালিদাসের স্পিরিট ওঁকে ছেড়ে গেলেন! এবার উনি নরম্যাল হয়ে উঠবেন।'

হোটেলে ফিরে অনেক রাত অবধি অরবিন্দ ঘুমোতে পারল না। চোখ বুজলেই ভূতাবিষ্ট শশী গুপ্তার চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মহাকবি কালিদাসের প্রেতাত্মা ভর করেছিল তার ওপর। অবশ্য কবিকে অরবিন্দ দেখেনি। তবে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু পড়েছে এবং কলেজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেছে, তাতে তাঁর প্রেতাত্মার ভর করা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার কিছু নেই।

নিজের অজ্ঞাতসারেই সে আবৃত্তি করতে শুরু করল 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী...' কোন সময় যে তার দু-চোখ ছেপে ঘুম নেমে এল, টেরও পেল না। ঘুমপাড়ানি গান নয়, ঘুমের ওষুধ খেয়েছে যেন। এ সিডেটিভ ড্রাগ।

পরদিন অফিসে গিয়ে মোটা খাতাখানা খুলতেই আয়ার হাসিমুখে কাছে এসে বসলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কাল ভি ভি ভি ক্লাবে শশী গুপ্তাকে দেখলেন তো, মিস্টার নাগ। কী মনে হল?'

অরবিন্দ ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'রায় দেওয়াটা আজ মুলতুবি রাখলুম। আরও দু-একদিন না দেখলে...।'

'বেশ তো, তাহলে মঙ্গলবার চলুন। হি ইজ এ মাস্ট অন টুইসডে।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অরবিন্দ হিসেবের খাতায় মগ্ন হয়ে গেল।

মঙ্গলবার দিন দুজনে অবশ্য ভি ভি ভি ক্লাবে গেলেন ঠিকই, তবে একটু দেরিতে। হিসেবের অঙ্কটা কিছুতেই মিলছিল না।

হলে পা দিয়েই অরবিন্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বারের দিকে নজর পড়তে। দেখল, প্রচণ্ড রোদের তাপে চারাগাছের পাতাগুলো যেমন নেতিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই ভাবে শশী গুপ্তা বসে আছে একখানা চেয়ারে। মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর—হাতদুটো কোলের ওপর জড়ো করা।

অরবিন্দের মুখে উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে আয়ার অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, মিস্টার নাগ। এর আগেই আমি একদিন ওঁকে ওই অবস্থায় দেখেছি। ওটা প্রেতাত্মা ভর করার পূর্বাভাস।'

'তার মানে?'

'মানে ওঁর নিজের শক্তি বলুন, ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলুন, এখন আর কিছু নেই। যে-প্রেতাত্মা ওঁকে ভর করছে, সে-ই সবকিছু হরণ করে নিয়েছে।'

শিউরে উঠল অরবিন্দ। সর্বনাশ! তীব্র স্রোতের টানে অসহায় কুটোর মতো এমনিভাবে ভেসে চলা...। যদি...যদি...।

হেমাদকে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অরবিন্দ এগিয়ে গেল। তার কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ওঁর যদি খুব কষ্ট হয়...।'

হেমাদ হিস করে একটা শব্দ করে উঠে সতর্ক করে দিল কোনও কথা না বলতে। এ-অবস্থায় কোনওরকম বাধা পেলে কষ্ট তো ওঁর আরও বাড়বেই, চাই কী 'ডেথ' পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

অরবিন্দের সর্বাঙ্গ বেয়ে তড়িৎ রেখার একটা শিহরন বয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, সবসময় কি গ্রেটম্যানদের, মানে মহাপুরুষদের, আত্মাই ওঁকে ভর করেন?'

'ওঃ, নো, নো,' করুণ হাসি হাসল হেমাদ। বলল, 'পৃথিবীতে যেমন ভালো-মন্দ দু-জাতের লোকই আছে, প্রেতলোকেও তেমনি সাধুসন্তের সঙ্গে পাপী-তাপী, খুনে, বাটপাড়দের আত্মাও তো থাকে, স্যার।'

'তারাও কি ওঁর ওপর ভর করে?'

'মাত্র একদিনই দেখেছি...চম্বলের সেই বিখ্যাত ডাকাত মান সিংকে ভর করতে।'

অরবিন্দ শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল—কোনও কথা খুঁজে পেল না!

এইসময় সমস্ত জড়ত্ব, অবসাদ ঝেড়ে ফেলে শশী গুপ্তা সোজা হয়ে উঠে বসল। কাঁধে পড়ে থাকা উত্তরীয়খানা মাথায় পাগড়ির মতো বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চোখদুটো দিয়ে এক দিব্যজ্যোতি যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগল। ডান হাতখানা বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে সে দৃপ্তভঙ্গিতে বলতে শুরু করল :

'হোলিনেস, পিউরিটি অ্যান্ড চ্যারিটি আর নট দি এক্সক্লুসিভ পজেশানস অফ এনি চার্জ ইন দি ওয়ার্লড —।'

অরবিন্দ আয়ারের কানে-কানে বলল, 'এ কী! এ যে স্বামী বিবেকানন্দের কথা! আজ কি তাঁর আত্মা ভর করেছে?'

আয়ার মুগ্ধ চিত্তে বলে উঠলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেতাত্মা এরপর শশী গুপ্তার মুখ দিয়ে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বই বলালেন। শঙ্করাচার্যই অদ্বৈতবাদের প্রথম উদগাতা। বিবেকানন্দের নিজের মতবাদ তারই পরিপূরক। অবশ্য অনেকে ভগবান বুদ্ধকেও অদ্বৈত মতাবলম্বী বলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মূলত তাঁর একটা পার্থক্য আছে...।

তবে সে-পার্থক্য আর ব্যাখ্যা করা হল না—তার আগেই থেমে গেল শশী গুপ্তা। মুখ-চোখে তার স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল। হেমাদ সাহেবের উদ্দেশে বলল, 'আমার বিল...প্লিজ, কুইক।'

হেমাদ জিভ কেটে, হাতজোড় করে বলল, 'ছিঃ, ছিঃ, আজ বিল নয়। আমরাই এন্টারটেন করছি...।'

বাধা দিয়ে শশী গুপ্তা বলল, 'কারও কাছ থেকে অবলিগেশান আমি নিই না।' পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে টেবিলের ওপর ফেলে দিল সে : 'আপনার বিল, বাকিটা বয়দের টিপস দিয়ে

দেবেন।' কথা শেষে দ্রুতপায়ে সে হল থেকে বেরিয়ে গেল। যেন একটা হৃদয়গ্রাহী নাটক দেখছেন, এমনিভাবে আর সকলে যে-যাঁর টেবিলে বসে রইলেন।

অতঃপর নিত্য সন্ধ্যার পর ভি ভি ভি ক্লাবে যাওয়াটা অরবিন্দের যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। কোনও কারণে যাওয়া না হলে, তার মনে হত দিনটাই বৃথা গেল।

তাই সেদিন আয়ার সঙ্গ দিতে না পারলেও, সে একাই যথাসময়ে ক্লাবে এসে হাজির হল। হেমাদ অমায়িক হাসি হেসে অভ্যর্থনা করল তাকে। বলল, 'আসুন, আসুন। আজ একলা দেখছি। আমাদের গুপ্তাসাহেবও তো আসেননি। কম্পানি দেওয়ার জন্যে কোনও মেয়েকে কি টেবিলে—।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হেমাদ। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে। আমি হচ্ছি, এ-যুগের একটি অচল নিরামিশাষী অ্যাবোমিনেবল ভেজিটেরিয়ান—।'

হেসে উঠল হেমাদ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দম দেওয়া পুতুলের মতোই হলে ঢুকল শশী গুপ্তা।

হেমাদ অরবিন্দকে ইশারায় বলল, 'আপনার সময় কাটাবার খোরাক এসে গেছে।'

কিন্তু শশী গুপ্তার ওপর সেদিন কোনও প্রেতাত্মাই ভর করল না। সহজ সাধারণভাবে সে কয়েক পেগ ব্র্যান্ডি খেয়ে বিল চুকিয়ে দিল। তারপর যেমন এসেছিল ঠিক তেমনিভাবে আবার হল থেকে বেরিয়ে গেল।

অরবিন্দের মনে হল, শুধু সে একাই নয়, হলে যত নারী-পুরুষ খরিদ্দার ছিলেন, সকলেই কম-বেশি নিরাশ হলেন।

বিদায় নেওয়ার জন্য সে উঠে দাঁড়াতেই হেমাদ সহানুভূতি জানাল : 'ব্যাড লাক, মিস্টার নাগ।'

ব্যতিক্রম তো সবকিছুতে থাকেই। এ-সত্যটুকু জানত বলেই অরবিন্দ পরদিনও যথাকালে ক্লাবে এসে হাজির হল এবং হলে পা দিয়েই চোখদুটো তার আনন্দে চকচক করে উঠল। দেখল কোণের দিকে যে-মঞ্চ ছিল, তার ওপর শশী গুপ্তা অতি ধীর পায়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। তবে মাথাটা তার আর-এক দিনের মতোই ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। হাতদুটো কোমরের কাছে জড়ো করা।

হেমাদ চট করে অরবিন্দের কাছে এসে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'আজ রবীন্দ্রনাথের আত্মা এসেছেন...।'

অরবিন্দ সাগ্রহে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'কী করে বুঝলেন? কিছু বলেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ভর করার সময় তাঁর প্রেতাত্মা তো কত কথাই বললেন, আমি রবি ঠাকুর...নোবেল প্রাইজ পেয়েছি...সারা জগতের লোক আমায় বলে বিশ্বকবি...এই সেদিন আমার একশো পঁচিশ বরষের জন্মদিনে কত উৎসব হল...লোকে আমার ছবিতে মালা দিল, গান গাইল—কিন্তু কেউ জানল না, আমার মনে কত দুঃখ লুকিয়ে আছে...নিজের কাছে কীভাবে হেরে গেছি আমি...।'

'হেরে গেছেন?' অব্যক্ত কণ্ঠে অরবিন্দ বলে উঠল, 'তার মানে?'

'আর তো কিছু বললেন না। ব্যস! তারপরই ওইরকম হয়ে গেলেন...।'

অরবিন্দ শশী গুপ্তার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, ধীরে-ধীরে সে মাথা তুলছে। হাত দুটো ফিরে এসেছে যথাস্থানে। একসময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলতে-বলতে সে উঠে দাঁড়াল, 'পাঞ্জাবে গিয়ে একদিন মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলুম :

পঞ্চ নদের তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্মম নির্ভীক—

সেই পাঞ্জাব আজ দু-ভাগ হয়ে গেছে...গুরুর মন্ত্র ভুলে নির্ভীক শিখরা আজ কাপুরুষের মতো খুনোখুনিতে মেতেছে...ধর্মস্থানকে ভিন্দ্রেনওয়ালের দল দুর্গ বানাচ্ছে...মুখ্যমন্ত্রী ''কোনও অন্যায় কাজ করিনি'' বলেও সেই কাজের জন্যে আবার অপরের জুতো সাফ করছে প্রায়শ্চিত্ত করতে...এ যে কী লজ্জা...কতখানি আত্মপ্রবঞ্চনা —' প্রেতাত্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হোক প্রেতাত্মা, তবু রবীন্দ্রনাথের এ-খেদোক্তি শুনে অরবিন্দের বুকের ভেতরেও এক চাপা কান্না যেন গুমরে-গুমরে উঠতে লাগল। হলের অনেকের চোখই নিশ্চয় শুষ্ক ছিল না।

হেমাদ প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রেতাত্মা যে শশী গুপ্তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেই নিজের হাতে ব্র্যান্ডি পরিবেশন করল তাকে।

ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল শশী গুপ্তা। বিল চুকিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই, অরবিন্দ দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল তার কাছে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'রবীন্দ্রনাথের আত্মা যে এত দুঃখ পাচ্ছেন, ভাবতেও পারিনি, মিস্টার গুপ্তা। কবে এর শেষ হবে?'

কাঁধ দুলিয়ে শশী গুপ্তা জবার দিল, 'যদি কোনওদিন দেবগুরু শুক্রাচার্য কি কিরোর আত্মা আমার ওপর ভর করে, তবেই এর জবাব দিতে পারব!'

অরবিন্দ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তাহলে আর জানবার সুযোগ আমার হবে না, মিস্টার গুপ্তা। অডিটের কাজ শেষ হয়ে গেছে। যে-কোনওদিন কলকাতায় ফিরে যেতে পারি।'

'ওঃ! আগামীকাল নয় নিশ্চয়ই?'

'না। সামনের সোমবার, কি মঙ্গলবার...।'

শশী গুপ্তা হেসে বলল, 'তাই? তাহলে তো কালই আমাদের দেখা হতে পারে। শনিবার কাল। আর শনিবারটা আমি আসিই...বিশেষ করে আমাদের বন্ধু হেমাদসাহেবের কথা ভেবে। অন্যদিন না পারলেও, শহরের যত রইস আদমি এদিন ক্লাবে আসবেনই।'

হেমাদ সলজ্জ কণ্ঠে স্বীকার করল : 'হাঁ। ইয়ে তো সাচ্চা বাত।'

'ঠিক আছে, তাহলে কালই আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।' বলে অরবিন্দ বিদায় নিল তাদের কাছ থেকে।

প্রতি শনিবারই শহরবাসীর জীবনে যেন উৎসবের বান ডাকে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে লাখ-লাখ টাকা হাওয়ায় ওড়ে। খেলার মাঠে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি হয়, যে-কোনও হোটেল-রেস্তোরাঁয় খালি টেবিল মেলা ভার।

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ হোটেল থেকে পোশাক বদলে লিফট দিয়ে নামতে-নামতে অরবিন্দ সঙ্গী আয়ারকে বলল, 'নেহাত সোমবারই বম্বে ছাড়ছি—শশী গুপ্তার সঙ্গে জীবনে হয়তো আর কোনওদিন দেখা হবে না। নইলে ভি ভি ভি ক্লাবের ওই উত্তাল জনসমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে আজ কিছুতেই যেতুম না।'

আয়ার মৃদু হেসে বললেন, 'কেন, আপনাদের বাংলাতেই তো একটা চলতি কথা আছে, কষ্ট না করলে, কেষ্ট মেলে না।'

কেষ্ট মিলবে কি না জানে না, তবে ক্লাবের হলে পা দিয়েই অরবিন্দ বুঝল, অন্তত কষ্ট কিছু তাদের করতে হবে না। তাদের আসার কথা জানা ছিল বলেই কোণের দিকে একটা টেবিলে 'রিজার্ভড' লেখা একখানা কার্ড হেমাদ ঝুলিয়ে রেখেছিল।

আয়ারকে নিয়ে অরবিন্দ স্বস্তির শ্বাস ফেলে বসল বটে, কিন্তু চোখদুটো তার নিরন্তর হলের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার মনের কথা বুঝেই যেন বিয়ার পরিবেশন করতে এসে হেমাদ নিচু গলায় বলল, 'গুপ্তাসাব এখনও আসেননি। মাঝে-মাঝে এরকম দেরি হয়!'

ন'টা বাজল। দশটাও বেজে গেল। ভূতে ভর করা দেখতে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে কেউ-কেউ উঠে দাঁড়ালেন ফিরে যাওয়ার জন্যে। ঠিক সেইসময় বাইরে থেকে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি ভেসে এল। যাঁরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা আবার স্ব-স্ব স্থানে বসে পড়লেন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল শশী গুপ্তা। কিন্তু তার আজকের পোশাক দেখে অরবিন্দ অবাক হয়ে গেল। পরনে তার চোস্ত পায়জামা, গায়ে লক্ষ্ণৌয়ের চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি। গলায় সোনার চেন, মাথায় গান্ধী-টুপি।

সোজা সে বারের সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা টুলের ওপর বসে পড়ল। হেঁকে বলল, 'হেমাদসাব!...বহুত তিয়াস...স্মোকিং সামথিং স্ট্রং...।'

তৃষ্ণা মেটাতে বেশ কয়েক পেগ শশী গুপ্তা নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করল। কিছু হালকা ধরনের কথা বলল অরবিন্দ আর আয়ারের সঙ্গে। তারপর একেবারে মগ্ন হয়ে গেল নিজের মধ্যে।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে থাকে। অনেকের মতো অরবিন্দও একসময় অধৈর্য হয়ে উঠল। হেমাদের কাছে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'আর তো দেরি করা যাচ্ছে না, মিস্টার হেমাদ। আপনার সঙ্গে তো খুব দোস্তি —একটু জিগ্যেস করুন না কী হল ওঁর...।'

সে শেষ করার আগেই ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা না বলতে ইশারা করল হেমাদ। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'সত্তনাশ! এ-সময়ে ওঁকে ডিস্টার্ব করা একদম বারণ।'

আয়ার সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'কেন?'

হেমাদ করুণ কণ্ঠে বলল, 'আট-দশ দিন আগে এই ক্লাবে একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল, স্যার। আপনারা হয়তো জানেন না, ছট্টু সিং বলে একজন নটোরিয়াস ট্রাক ড্রাইভার এ-মহল্লায় থাকে। নামে ট্রাক ড্রাইভার, আসলে লোকটা পয়লা নম্বরের গুণ্ডা। ইচ্ছে করে প্রাইভেট গাড়ির সঙ্গে নিজের ট্রাক লড়িয়ে দেবে, আওরত লোককো টিজ করবে, অর্নামেন্ট, ক্যাশ যা পাবে সার্চ করবে। সেদিন বিলকুল মাতাল হয়ে সে আমার ক্লাবে ঢুকল! চেয়ার ভাঙল, টেবিল উলটে দিল, আর যত্ত রেসপেকটেবল কাস্টমার ছিল, সব কোইকো থ্রেটেন করতে লাগল। লেকিন ফরচুনেটলি গুপ্তাসাব তখন ক্লাবেই ছিলেন। এখন যেমনভাবে বসে আছেন, ঠিক ওইভাবেই চুপটি করে বসেছিলেন...।'

অরবিন্দ বলে উঠল, 'ওয়াজ হি ইন এ স্টুপর?'

'হ্যাঁ। বলতে পারেন। ছট্টু সিং মাতোয়ারা ছিল তো। খেয়াল করেনি, ওঁর টেবিলের সামনে গিয়ে খিস্তি করে বলল, ''বে নবাবকো বাচ্চে, নিকালো পঁচাশ রুপাইয়া...জলদি...।'' ব্যস! লাফ দিয়ে উঠে গুপ্তাসাব এমন একখানা আপার কাট ঝাড়লেন যে, ছট্টু সিং ছিটকে মেঝেয় গিয়ে পড়ল। তারপর কোনওরকমে উঠতে যাবে, আরে বাসরে বাস! এইসা একখানা কিক ঝাড়লেন গুপ্তাসাব—ঠিক পিলেকা মাফিক—।'

আয়ার বলে উঠলেন, 'ইউ মিন পিলে, দি গ্রেট ফুটবলার?'

'ইয়েস, স্যার,' হেমাদ হাসি চেপে জবাব দিল, 'নট দি সপ্লিন। ছট্টু সিং তো একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেল। তখন গুপ্তাসাব আমাকে অর্ডার দিলেন, হারামির বাচ্চাটাকে থানায় পাঠিয়ে দাও। যদি থানায় নিতে না চায়, বলে দিয়ো এইচ. টি. ভেজা।'

অরবিন্দ কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করল, 'এইচ.টি.-টা কী?'

হেমাদ সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল, 'হুডেড টেরর।'

তাতে বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু নতুন করে কোনও প্রশ্ন করার অবকাশও পেল না। কারণ এইসময় সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে শশী গুপ্তা সোজা হয়ে উঠে বসল। দেহের পেশিগুলো তার তখন বজ্রকঠিন হয়ে উঠেছে। দু-চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা। হলের চারদিকে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে সে ঝপ করে টুল থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হেমাদের দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল, 'আপনাদের ভালোর জন্যেই বলছি, কেউ একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াবার চেষ্টা করবেন না।'

কোণের দিকের একটা টেবিল থেকে খিকখিক করে হেসে উঠলেন একজন বলিষ্ঠদেহী ভদ্রলোক। সঙ্গে-সঙ্গে হিংস্র নেকড়ের মতোই ঘুরে দাঁড়াল শশী গুপ্তা। হাত দুটো দু-পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যেতে-যেতে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'এতে হাসবার কী আছে, মশাই? কাতুকুতু লাগবার মতো কিছু পেলেন নাকি? এই দেখছেন...' হাতদুটো অকস্মাৎই সে ওপরে তুলল। দু-হাতে ধরা দুটো

রিভলভার হলের তীব্র আলোয় যেন সকলের চোখগুলো ধাঁধিয়ে দিল। শশী গুপ্তা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'এ দুটোয় বারোটা গুলি ভরা আছে। দরকার হলে আরও ডজন-ডজন ভরে নিতে পারব...।'

কোণের টেবিলে বসা সেই ভদ্রলোক যতখানি ভয় পেলেন, অরবিন্দ তাঁর দিকে চেয়ে কিছুমাত্র কম পেল না। অতি সন্তর্পণে হেমাদের দিকে ঘুরে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই, হেমাদ ভীতি-বিবর্ণ মুখে কোনও কথা না বলতে ইশারা করল। অর্থাৎ, বাধা দিয়ো না। যা করছে করুক।

এবার সে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দোস্ত! তোমার গায়ের ওই অ্যাপ্রনটা খুলে চট করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে ফেলো দিকিনি—তুরন্ত...।'

প্রতিবাদ করার এতটুকুও সাহস হল না হেমাদের। শশী গুপ্তার নির্দেশমতো গায়ের ঢিলে আংরাখাটা খুলে টেবিলের ওপর সে বিছিয়ে দিল। তারপর বিনীত কণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'এবার বলুন, কাকে কী সার্ভ করতে হবে।'

শশী গুপ্তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। হালকা সুরে বলল, 'মেঘনাদকে অনেকেই হুডেড টেরর বলেই চেনে।'

সারা হলঘরের প্রতিটি নর-নারীর মুখ দিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এল এক অস্ফুট আর্তনাদ।

শশী গুপ্তা নীরবে উপভোগ করল সকলের মানসিক অবস্থাটা। তারপর হেমাদের দিকে তাকিয়ে অনুজ্ঞার সুরে বলল, 'আজকের বিক্রি বাদে যা টাকা-পয়সা তোমার ক্যাশে আছে, সব বের করে নিয়ে ওই অ্যাপ্রনেতে রেখে দাও, হোটেলওয়ালা...।'

হল জুড়ে আর-একবার অস্ফুট আর্তনাদ উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যে হাত তুলে হেমাদ এবার স্বয়ং সকলকে স্তব্ধ হতে অনুরোধ জানাল 'মেঘনাদ যা বলছেন, আপনারা সবাই তাই করুন। কোনও কারণে আপত্তি করবেন না। ওঁর ওপর চড়াও হওয়ার বা ওঁকে মারধোর করবার চেষ্টাও করবেন না। কেউ যদি কোনও কৈফিয়ত চান, তাহলে যথাসময়েই পেয়ে যাবেন।' কথা শেষে সে ড্রয়ার খুলে ক্যাশ যা কিছু টাকা-পয়সা ছিল, সব ধরে দিল অ্যাপ্রনের ওপর।

'তুমি বুদ্ধিমান লোক, মালিক।' বলে শশী গুপ্তা উদ্যত পিস্তল হাতে হলের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এবার একে-একে সবাই, যার কাছে যা আছে, ওয়ালেট, ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতঘড়ি, হার, চুড়ি, হিরে, মুক্তোর টাব, নাকছাবি—সব অ্যাপ্রনে ফেলে দিন, প্লিজ, আমার সময় বড় অল্প।'

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সবাই একে-একে এগিয়ে এসে নিজেদের মূল্যবান যা কিছু ছিল, সব জমা দিতে লাগলেন অ্যাপ্রনের ওপর। একপাল ভেড়া যেন।

নিরুদ্ধ জ্বালায় অরবিন্দের চোখদুটো দপদপ করে জ্বলছিল। অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল : 'আমরা কি তামাশা দেখতে এসেছি এখানে? আর তাই দেখতে গিয়ে নিজেদের যথাসর্বস্ব...।'

আবার বাধা দিল হেমাদ : 'মিথ্যে বাধা দেবেন না, মিস্টার নাগ। মেঘনাদ যা বলেছে, সেই মতো কাজ করুন আপনারা। আমি বলছি, আপনাদের কারও কোনও লোকসানই হবে না।'

'হবে না মানে? ব্যাগে আমার শুধু টাকা-পয়সাই নয়, সোমবার কলকাতায় ফেরার প্লেনের টিকিটটা পর্যন্ত আছে—।'

'সোমবারের দেরি আছে, মিস্টার নাগ। বলছি তো, তার আগেই আবার সব ফিরে পাবেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অরবিন্দ প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে ছুড়ে দিল অ্যাপ্রনের ওপর।

'গুড।'

নানা ধরনের মালপত্রে বোঝাই অ্যাপ্রনটা শশী গুপ্তা এবার ঝোলার মতো বেঁধে কাঁধে ঝোলাল। হাত দুটোয় ধরা রইল কিন্তু উদ্যত পিস্তল দুটো। সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে-করতে এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল :

'ত্বয়া হৃষিকেশহৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।
ত্বয়া হৃষিকেশ...।'

একসময় হল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তবু সকলে বোবা দৃষ্টি মেলে সম্মোহিতের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন।

নীরবতা ভাঙল হেমাদই প্রথম : 'কিচ্ছু ভাববেন না আপনারা। গুপ্তাসাব এখুনি ফিরে আসবেন।'

কিন্তু সে কখন? এ প্রশ্নটা সকলের মনেই। শুধু অরবিন্দ আয়ারের একখানা হাত চেপে ধরে সংশয় প্রকাশ করল 'আপনি বিশ্বাস করেন, মিস্টার আয়ার? সত্যিকার ফিরে আসবেন?'

আয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'লেটস ওয়েট অ্যান্ড সি।'

মিনিটের পর মিনিট কাটতে থাকে। আধঘণ্টা...একঘণ্টা। রাত নিশুতি হয়ে গেল। এরপর অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আর কারও রইল না। সকলে চড়াও হলেন হেমাদের ওপর : 'এখনও ধৈর্য ধরতে বলেন?—যান, টেলিফোন করুন—টেলিফোন করুন পুলিশকে—।'

হেমাদ কিন্তু রাজি হল না। হাতজোড় করে বারবার বলতে লাগল, 'এক্সকিউজ মি—মাফ করতে হবে—গুপ্তাসাব আমার রেসপেকটেবল কাস্টমার—ওঁর কোনও ক্ষতি যদি হয়—তা ছাড়া আমার ক্লাবের রেপুটেশানের কথাটাও তো ভাবতে হয়—।'

কেউ তাকে, কেউ নিজেকেই, অভিসম্পাত দিতে-দিতে ফিরে গেলেন সবাই। হোটেলে ফেরার পথে মুহ্যমান অরবিন্দকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য আয়ার বারংবার সান্ত্বনা দিতে লাগলেন : 'শেষপর্যন্ত প্লেনের টিকিট যদি ফিরে না পান তো কিছু ভাববেন না। আমাদের অফিসের কুলকার্নি ঠিক ম্যানেজ করে দেবে—আর টাকা যা লাগে আমাদের অফিস থেকে লোন নিয়ে নেবেন।'

অরবিন্দ মনে-মনে শুধু বলল, 'একেবারে জলবৎতরলং!'

পরদিন সকাল থেকেই আগের দিনের নারী-পুরুষ সব খরিদ্দারই গুটিগুটি এসে জমতে লাগলেন ভি ভি ভি ক্লাবের সামনে। সকলের চোখে-মুখে অদম্য কৌতূহল আর উত্তেজনা। আয়ারকে নিয়ে অরবিন্দও হাজির হল কোনওরকমে ব্রেকফাস্টটা সেরে।

রবিবার বলেই কঙ্কনি হেমাদ বোধকরি অনেকটা বেলায় এল। তার মুখের চেহারায় কিন্তু কোনও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠার ছাপও ছিল না। তালা খুলে সে যবনিকার মতো মেঝেস্পর্শী. শাটারটাকে ওপরে ঠেলে দিতেই, তার নজরে পড়ল তার অ্যাপ্রনে খুব সুন্দরভাবে জড়ানো পার্সেলটা দরজার গায়ে ঝুলছে। তার ভেতর থেকে আগের রাতে খোওয়া-যাওয়া সকলের ওয়ালেট, ডায়েরি, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স, চিঠিপত্র, প্রিয়জনের ফটো, সবকিছুই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল না শুধু টাকাকড়ি, হিরে-মুক্তো, হাতঘড়ি, দামি পেন ইত্যাদি।

ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই যে-যার নিজের জিনিস তুলে নিলেন। উলটে-পালটে ঝাঁকানি দিয়ে বারবার দেখতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও থেকে একটা ফুটো পয়সাও বেরোল না।

মাথায় হাত দিয়ে সবাই চিৎকার করে উঠলেন। রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন অভিজাত মহিলারা।

শেষপর্যন্ত হিসেব হল, নগদে এবং জিনিসপত্রে লাখ টাকার ওপর অপহৃত হয়েছে!

হোক, তবু যতটা দুঃখ বা আঘাত পাওয়ার কথা, কেউই বোধকরি তা পেলেন না। মূল্য দিতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এমন অভিনব অভিজ্ঞতার কথাটা জীবনে কেউ কোনওদিন হয়তো ভুলতে পারবেন না।

আয়ার অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ম্যান লিভস টু লার্ন। চলুন, কুলকার্নিকে টিকিটের জন্যে ধরিগে।'

কলকাতায় অবশ্য ফিরে আসতে অরবিন্দকে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। আয়ারের কাছ থেকে ধার করে আনা টাকাটাও তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেইসঙ্গে চিঠিতে লিখেছে, 'ভূতাবিষ্টের প্রকৃত রহস্যটুকু আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, মিঃ আয়ার। জীবন্ত কোনও মানুষের ওপর প্রেতাত্মা ভর করে না। আসলে ভর করে শশী গুপ্তার মতন একজন তুখোড় পরস্বাপহরণকারী। কী অবলীলাক্রমেই না লোকটা ভি ভি ভি

ক্লাবের তাবৎ খরিদ্দারকে জারক লেবুর মতোই জারিয়ে রেখেছিল মাসের পর মাস। আর সেই কারণে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেছে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে। আমার মতে, শশী গুপ্তা এ-যুগের একজন মহত্তম শিল্পী।'

মাসিক রোমাঞ্চ

পুজো সংখ্যা, ১৯৮৮
